

জেমস বন্ড রচনা সংগ্রহ

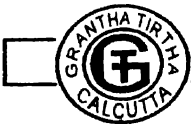
(অখণ্ড সংস্করণ)

ইয়ান ফ্লেমিং

সম্পাদনা ও ভাষান্তর

উত্তম ঘোষ

গ্রন্থতীর্থ



প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

B.C.S.C.L.,

RRFL
SER NO.

PUBLIC LIBRARY

14540

113607

JAMES BOND RACHANA SANGRAHA

Edited & Translated

by

Uttam Ghosh

ISBN 81-7572-202-6

গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে এস. বি. নায়ক
কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪ এন,
ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত

সোনা
মিষ্টি ও টুম্পা
এবং
গুভ ও জিকো-কে
— আশীর্বানী সহ উপহার

ভূমিকা

ইয়ান ফ্লেমিং লিখেছেন- 'বয়েস যখন তেতাল্লিশ, তখন আমি বিয়ে করি। এক ধরনের মানসিক জড়তা সেই বিয়ে থেকে। আর তারই প্রতিষেধক আমার এই সৃষ্টি 'জেমস বন্ড'।...

প্রথম যে অভিনেতা জেমস বন্ডের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, সেই শন কোনারির মতে, জেমস বন্ড এমন একটি পুরুষ যে প্রতিটি নারীর কাম্য। প্রত্যেকের মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতীক।

আধুনিক যুগের অমর নায়ক বন্ড। পুরুষ তার আদর্শ; ভক্ত, গুণগ্রাহী- আবার কিছুটা ঈর্ষাকাতবও বটে। তবু বন্ডের জীবন ও কাজের মধ্য দিয়ে সে নিজের অপূর্ণ ইচ্ছে, আশ্বিন, কামনা বাসনা পূরণ করে সার্থক হতে চায়, তৃপ্ত হতে চায়।

আর নারী জগতে? না, হারকিউলিস, টার্জানরা পিছিয়ে পড়েছে। 'হীরো' বন্ড— নায়ক ও বীর— দুই অর্থের হীরো। একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র। আর তার রোম্যান্স ও পৌরুষ! প্রতিটি নারী তাকে পাশে চাইবে। কাছে চাইবে। প্রয়োজনে নিষ্ঠুর, আবার অবস্থা বিশেষে উদার, কোমল, দয়াবান— চূড়ান্ত অনুভূতিপ্রবণ।

তার দুঃখ কে বোঝে?

এটা ঠিক চলচ্চিত্র জেমস বন্ডকে আরও বেশি জনপ্রিয় করেছে। ইয়ান ফ্লেমিং এর লেখার পাতা থেকে উঠে আসা এই বিস্ময়কর 'অ্যাডভেঞ্চারাস' ব্যক্তিত্ব সিনেমার পর্দায় মূর্ত করেছে— প্রথমে শন কোনারি; তারপর একে একে জর্জ লেজেনবি, রজার মুর ও টিমোথি ডালটন।

ভবিষ্যতের নায়করাও অপেক্ষারত।

কীভাবে লেখকের কলমে (টাইপরাইটাবে) জন্ম নিয়েছিল জেমস বন্ড? আমরা শুনেছি, ইয়ান ফ্লেমিং-এর একটি হোলিডে-হোম ছিল জ্যামাইকা দ্বীপে। নাম 'গোল্ডেন আই'। ১৯৫২ সালের ১৫ জানুয়ারির এক সকালে লেখক হঠাৎ আপন খেয়ালে টাইপ করতে থাকেন। তখন তাঁর বয়েস চুয়াল্লিশ। তিনি বলেছেন— প্রায় অন্ধ পাগলের মতো লিখতাম আমি। টাইপ হয়ে যাওয়া পাতাটার দিকে আর সাহস করে তাকাতাম না পাছে খারাপ লাগলে ছিড়ে ফেলি। সদা আশঙ্কা, বন্ধুরা কী ভাববে!

ঝড়ের মতো কাজ। লেখকই যেন স্বয়ং বন্ড, তার টাইপ মেশিন নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। শুরু ১৫ জানুয়ারি, মঙ্গলবার, ১৯৫২, শেষ ১৮ মার্চ, মঙ্গলবার, ১৯৫২। সেটাই বন্ড সিরিজের প্রথম গ্রন্থ। কয়েকমাসের মধ্যে সেই **enfant terrible**— 'বিরাট শিশু' জন্ম নেয়। ক্যাসিনো ব্যয়াল ছাপা হয় ১৯৫৩ সালে।

একসময় (বহু আগে) বলা হয়েছিল, পাঠকের সংখ্যা দশ কোটি, সিনেমার দর্শকের সংখ্যা পনেরো কোটি। এখন সেই সংখ্যা আরো বহু বহু বেশি— অগুনতি।

বন্ড নায়ক, না ভিলেন? হৃদয়হীন, না হৃদয়বান?

এই প্রশ্ন ও বিতর্ক তাকে আরও 'অলৌকিক' করেছে যাকে একটা পবম্পর-বিরোধী শব্দ দিয়ে ভূষিত করা যায়— অলৌকিক বাস্তব, **real miracle**।

এই সংকলনে আমরা সময়-কাল ধরে সৃষ্টিপত্র সাজাইনি। আণ্ড-পিছু করেছি। সময়-কাল ধরে সাজালে কিছু ঘটনার রেফারেন্স বুঝতে পাঠকের সুবিধা হত ঠিকই, কিন্তু যেহেতু 'সমগ্র'

(সম্পাদিত হলেও), তাই কিছুটা 'বে-হিসাবি' পরম্পরা নতুন ধরনের কৌতূহলের সৃষ্টি করবে।
তবু রচনার সময় কাল এই ভূমিকায় উল্লেখ করা হল—

ক্যাসিনো রয়্যাল — ১৯৫৩

লিভ অ্যান্ড লেট ডাই — ১৯৫৪

মুনরেকার — ১৯৫৫

ডায়মন্ডস্ আর ফর এভার — ১৯৫৬

ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ — ১৯৫৬ (?)

ড. নো — ১৯৫৭

গোল্ডফিঙ্গার — ১৯৫৮

ফর ইণ্ডর আইজ ওনলি — ১৯৬০

থান্ডারবল

দ্য স্পাই হু লাভড্ মি — ১৯৬০

অন হার ম্যাজেস্টিজ্ সিক্রেট সার্ভিস — ১৯৬০

ইউ ওনলি লিভ টোয়াইস — ১৯৬০

দ্য ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন গান — ১৯৫৮

অক্টোপুসি — ১৯৫৮

আমরা এই সংকলনে প্রথমে রেখেছি 'ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ'— যা বোধহয় ইয়ান ফ্লেমিং-এর বন্ড সিরিজের শ্রেষ্ঠ কাহিনি। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। চলচ্চিত্রে নাম ছিল খুব সম্ভব '007 with love'। নানাকাহিনির বহু চরিত্রে ঐতিহাসিক—সাম্প্রতিককালের ঝঞ্জাৎপূর্ণ ইতিহাসে। ঐতিহাসিক মস্কো ট্রায়ালে যারা অভিযুক্ত ছিলেন লাভণ্যময়ী কুটুসোভা। পুরো নাম আনা কুটুসোভা। তিনি নাকি লেসলি থর্নটনের শয্যাসঙ্গিনী ছিলেন। 'ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ'-এ তাতিয়ানা চরিত্রটিকে অনেকে কুটুসোভার প্রতীক বলে মনে করেন। সিনেমায় শন কোনারির সঙ্গে ওই চরিত্রে অভিনয় করেন সুন্দরী দানিয়েলা বিয়াঞ্চি।

ইয়ান ফ্লেমিং প্রচণ্ড সমালোচিত হয়েছেন একাধিকবার। যখন তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে, সেই সময় নিউ স্টেটসম্যান (৫ এপ্রিল, ১৯৫৮) পত্রিকায় পল জনসন মন্তব্য করেন, 'আমার জীবনে পড়া সবচেয়ে জঘন্যতম উপন্যাসটি (ড. নো) শেষ করলাম। এত নোংরা বই আগে কখনও পড়েছি বলে মনে হয় না।... তিন তিনবার ঘৃণাভরে উপন্যাসটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। তারপর মনে জোর এনে বইটা শেষ করি।... এর মধ্যে তিনটে জিনিস আছে। প্রতিটিই বিকৃত অসুস্থ ইংরেজ মনোবৃত্তির প্রকাশ। ... প্রথমত, ধর্ষকামিতা; দ্বিতীয়ত, 'দ্বি-মাত্রিক যৌনকামিতা; এবং তৃতীয়ত, হতাশাগ্রস্ত কঠোর উন্মাসিকতা। ফ্লেমিং-এর একটুও সাহিত্যবোধ নেই।...'

তাই সবসময়ে গোলাপ বিছানো পথে হাঁটা হয়নি লেখকের। সেটা বোধহয় কোনো সাহিত্যিক-শিল্পীর জীবনে সবসময় ঘটেও না।

সব সত্ত্বেও জেমস বন্ডের তুলনা জেমস বন্ডই, সে আজও অপ্রতিরোধ্য অমরত্বের দোরগোড়ায়।

সূচিপত্র

ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ	□ ১১
মুনরেকার	□ ৭৭
ডক্টর নো	□ ১২৭
দ্য স্পাই ও লাভড্ মি	□ ১৬১
ডায়মন্ডস আর ফর এভার	□ ২৩৫
লিভ অ্যান্ড লেট ডাই	□ ২৮৯
ক্যাসিনো রয়্যাল	□ ৩৩৫
অন হার-ম্যাজেস্টিজ্ সিক্রেট-সার্ভিস	□ ৩৭২
থান্ডারবল	□ ৪১১
গোল্ডফিঙ্গার	□ ৫১৩
দ্য ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন গান	□ ৫৯৫
অক্টোপুসি	□ ৬৪১
ফর ইওর আইজ ওনলি	□ ৬৬৯
ইউ ওনলি লিভ টোয়াইস	□ ৬৯৩

ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ

সুইমিং পুলটা সুন্দর।

কিন্তু লোকটা সাঁতার না কেটে এমনভাবে ঘাসে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে যে, সন্দেহ হবে মৃত। কল্পনা করা হবে, সে জলে ডুবে মরেছে, এবং একটু আগে তাকে জল থেকে তোলা হয়েছে। হয়তো, এখনি পুলিশ আসবে।

তার মাথার কাছে ঘাসের উপরেই ছড়িয়ে আছে তার খুচরো টুকিটাকি জিনিসপত্র। কোনো কিছু চুরি যায়নি।

লোকটা যে পয়সাওয়ালা সহজেই বোঝা যায়। এই বড়োলোকদের ক্লাবের সদস্যদের ব্যাচ, নোটের তাড়ার ক্লিপটা মেইড-ইন-মেক্সিকো, গোছাগোছা নোট তাতে আটকানো, সোনার ডানহিল লাইটার, সোনার সিগারেট কেস। সেই কেসে রত্নখচিত বোতাম, ফর্বেজ কোম্পানির কেস।

আর, একটা বই। পি. জি. উডহাউসের 'লিটল নাগেট'। তাছাড়া, সোনার রিস্টওয়াচ, তার ব্যান্ড আবার কুমিরের চামড়ার! সেকেন্ডের কাঁটা এখনও ঘুরছে। ঘড়ি দেখে দিন মাস বোঝা যায়। আজ ১৫ জুন, দুপুর আড়াইটে, চন্দ্রকলা দ্বাদশীতে।

গোলাপের বাগান। আরও ফুল আছে। একটা বড়ো মশা লোকটার মেরুদণ্ডের উপর উড়ছে। নীল-সবুজ রঙের মশা। সোনালি চুল রোদে উজ্জ্বল, দমকা বাতাসে উড়ছে। লোকটা হাঁ-মুখ। নাকের কাছে ঘাস। শরীরটা নড়ল ওর। মশা নিরাশ হয়ে দূরে চলে গেল।

কয়েক বিঘে জুড়ে এই গোলাপ বাগান। জায়গায় জায়গায় মৌমাছির গুঞ্জন। বাগানের শেষে সমুদ্রের কলরোল শোনা যায়।

এখন বিকেল। নিস্তরক চান্দিক।

হঠাৎ নিস্তরকতা ভঙ্গ কবে একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। গেটের সামনে এসে থেমেছে গাড়িটা। ঘরঘর শব্দ করে লোহার গেট খুলে গেল।

কলিং বেল। গাড়িটা চলে যাবার আওয়াজ এল।

লোকটা নড়ল না। কিন্তু চোখ মেলে তাকাল গাড়ি আর কলিংবেলের শব্দে। ঠোটে নিষ্ঠুর হাসি খেলে গেল, বিরাট হাই তুলে সে যেন কার জন্য প্রতীক্ষায় রইল।

লোকটি প্রায় বস্ত্রহীন বলা যায়।

একটি মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে এখন। মেয়েটির পরনে শর্ট নীল স্কার্ট। হাতে ছোটো একটা ব্যাগ। লোকটির কাছে এসে সে জুতো খুলল।

তারপর শার্টের বোতামগুলো একে একে খুলল সে। শার্টের নীচে ব্রা নেই। তার গায়ের ত্বক তামাটে, সুন্দর কাঁধ, উদ্ধত দুই স্তন।

এবার স্কার্টের বোতাম খুলল সে। নিম্নাঙ্গে সাঁতারের ছোটো জাম্বিয়া। অপূর্ব ফিগার, সরু কোমর। যৌবনধন্যা গ্রামা সুন্দরী। দু'হাত উপরে তুলতেই তার বগলের নীচে সোনালি লোমরাজি বকঝক করে ওঠল।

স্কাট খুলে ভাঁজ করল সে। লোকটির পাশে নিলডাউন হয়ে বসে হাতব্যাগের মধ্য থেকে একটা তরল পদার্থের শিশি বের করল। গোলাপের গন্ধ মেশানো অলিভ অয়েল। লোকটার কাঁধে-ঘাড়ের ম্যাসেজ শুরু হল।

এমন বিশালকায় পুরুষকে ম্যাসেজ করা চাট্টিখানি কথা নয়। ঘাড়ের মাসলে আঙুল দাবানো যায় না। সমস্ত শরীরের ভর নিয়ে চাপ দেয় মেয়েটা। বিশেষ কিছু হয় না। যেন নিরেট পাথর। কুলকুল করে ঘামতে থাকে ম্যাসেজ গার্ল।

যাইহোক বেশ কিছুক্ষণ পরে ম্যাসেজ শেষ হয়। ঘর্মান্তনকলেবরে পুলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। সাঁতার কাটে। তারপর গাছের ছায়ায় এসে বসে। গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

উঃ, এমন পুরুষ-শরীর সে জীবনে দেখেনি। দু-বছর ধরে একে মালিশ করছে সে। লোকটার নিখুঁত পৌরুষ! কিন্তু মেয়েটার মনে কেমন একটা ঘৃণার ভাব জাগে ওকে ম্যাসেজের সময়! কেন? অদ্ভুত সব কারণ। লোকটার কোঁকড়া খুঁদে খুঁদে সোনালি চুল ওর ভালো লাগে না।

ম্যাসেজ তো বাকি আছে!

ভাবতেই সে আবার ওর কাছে উঠে এল। এমন শরীর গোটাটাকে একবারে মালিশ শেষ করা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতেই হয়।

এক চামচ তেল নিয়ে লোকটার মেরুদণ্ডে ঢালল সে। আঙুল দিয়ে ঘষতে থাকল।

লোকটার কোমরের নীচে নিতম্বের উপরেও সোনালি চুল। প্রেমিকার কাছে রোমাঞ্চকর আহ্বানের বিষয়। কিন্তু মেয়েটার চোখে লোকটাকে সাপ বলে মনে হয়, মোটা সরীসৃপ। দুই নিতম্ব দুটি শক্ত ঢিবির মতো। এখানে ম্যাসেজের সময় তার বহু খন্দের হাসি-ঠাট্টা শুরু করে। বিশেষ করে ফুটবল টিমের যুবকেরা। ইঙ্গিতে তাদের ইচ্ছে জানায়। উত্তেজিত হয়। তখন তাদের সায়েটিক নার্ভে নখ ঢুকিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া যায়। যদি খন্দেরকে তার পছন্দ হয়, তবে হালকা হাসি হেসে প্রশ্রয় দেয়। তর্ক বাঁধে, কিছুক্ষণ ছোটোখাটো কৃত্রিম বাধাদানের কুস্তি বা ধস্তাধস্তি চলে। তারপরেই আত্মদান, মধুর তৃপ্তিদায়ক আত্মসমর্পণ। ক্ষণস্থায়ী যদিও।

কিন্তু এই লোকটা! এটা একটা কিছূত! গত দু-বছরে মেয়েটার সঙ্গে কোনো কথাই বলেনি সে।

যন্ত্রের মতোই চিৎ হল সে এবার। ডানপায়ের উপর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ম্যাসেজ চলছে। ফর্সা চামড়ায় জায়গায় জায়গায় ট্যান, রোদে-পোড়া দাগ। সারা শরীরে পেশির বাহুল্য! মেয়েটার চোখে অশ্লীল লাগে। এই পেশিবহুল শরীরে একটা অসভ্য ইঙ্গিত রয়েছে।

ওর হাত দুটো তুলে ধরল মেয়েটা। মাথার পেছনে হাঁটুগেড়ে সে এখন বসেছে। লোকটার ভাষাহীন দৃষ্টি আকাশের দিকে।

কী করে লোকটা এমন বিশাল দুই হাত নিয়ে? বস্ত্রিং?

এটা নাকি পুলিশের বাগানবাড়ি! দুজন গার্ড আছে, তারা রান্না এবং অন্যান্য কাজ করে।

মেয়েটাকে মাঝে মাঝে এক কি দু'হপ্তার জন্য ছুটি দেওয়া হয়। তখন সে আসে না। পরে এসে মালিশ করতে গিয়ে বহু সময়েই দেখে, লোকটার শরীর ক্ষতবিক্ষত। পাঁজরার কাছেও দেখা গেছে একটা সেলাইয়ের গভীর দাগ। লোকটার দেখভাল করাদের একজন মেয়েটিকে সবকিছু চুপচাপ দেখে শুনে যেতে বলে। তাদের মালিকের সম্বন্ধে সে বাইরে উৎসাহ প্রকাশ করলে পরিণতি হবে মারাত্মক। এমনকি হাসপাতালের চিফ সুপারিনটেনডেন্ট-এরও বক্তব্য ছিল একই।

লোকটাব সম্বন্ধে মেয়েটি ভাবতে গিয়ে তার কাঁধের ওপর একটু জোরেই চাপ দিয়ে দিল সে। এই চমৎকার শরীর নিয়ে কেমন এত সাবধানতা? তবে এটা কি কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ নাকি অন্য কিছু? লোকটাব চোখেমুখে মাঝে মাঝে সে বিতৃষ্ণ দেখতে পায়। সূঠামদেহী লোকটা এখন একদৃষ্টিতে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকটা এবার চোখ বুজল। মেয়েটি তাব হাত বাড়তেই চমকে উঠল। ওইরকম খোলা জায়গায় টেলিফোনের বনবান শব্দ যেন যুদ্ধের সাইরেনের মতো। শব্দ শুনে সৈনিকের মতোই তৎপর হয়ে ওঠে লোকটা। মেয়েটি বুঝতে পারে, লোকটা কোনো কথা সুবোধ বালকের মতো শুনে যাচ্ছে। একজন চাকরের ইঙ্গিত পেয়ে সে মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সোজা দৌড়ে গিয়ে একটা কাঁচের দরজার মধ্য দিয়ে কোথায় চলে গেল। মেয়েটি ভাবে, এখানে থাকলে আড়িপাতার সন্দেহ কবতে পারে।

সুইমিং পুলের স্বচ্ছ জলে নিজের শরীরটাকে সমর্পণ করল মেয়েটি। সাঁতার কাটতে কাটতে মেয়েটি লোকটার সম্বন্ধে একটা কিছু আন্দাজ কবতে সমর্থ হল। তবে ওর নামটা কী? আবার গভীরে ডুবে গেল সে।

হ্যাঁ, লোকটা রাশিয়ার সর্বোচ্চ গুপ্তসংস্থা MGB-র শাখা SMERSH-এর মুখ্য হত্যাকারী। নাম Donovan Grant বা 'Red' Grant। দশ বছর ধরে 'ক্রাসনো গ্রানিৎস্কি' নামেই তাকে চেনে সবাই। সাংকেতিক নাম 'গ্রানিট'। ফোনে তার হেড কোয়ার্টার থেকে নির্দেশ শুনে যাচ্ছিল।

॥ দুই ॥

গ্রান্ট রুশ ভাষায় কথা বলতে পারে। এবং বেশ ভারী গলাতেই।

চাকরের সংকেত পেয়ে সে এখন একটা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

গ্রান্ট তার ভাবী গলাটা নামিয়ে বলে— কাজটা কী সেটা কি জানা গেছে?

একজন প্রহরী বলে — জানি না। তবে তোমার লাগেজ রেডি করে নাও। প্লেন আধ ঘন্টার মধ্যে এসে পড়বে। তেল ভরতে যেটুকু ময় লাগবে। মাঝরাতের মধ্যে মস্কো পৌঁছে যাবে।

চিন্তাশ্রিত মুখে গ্রান্ট বলে— অন্তত কোনো ইঙ্গিত দিলেও পারত। এবং ওরা তো এটা দেয় কোনো কাজের আগে।

প্রহরী চুপ করে থাকে।

গ্রান্ট তার ম্যাসাজের জায়গায় ফিরে এসে দেখল মেয়েটি আছে কিনা। নিশ্চিত হয়ে সে তার সোনার জিনিসগুলো নিয়ে নিজেব শোবার ঘরে ফিরে এল।

গ্রান্টের ঘরটায় চোখ বোলালে যা দেখা যাবে— রং-চটা জামাকাপড় ভর্তি আলমারি, তোবড়ানো টিনের মুখ ধোওয়ার বেসিন, লোহার পাট, অবিন্যস্ত বিছানা, মেঝেতে ছড়িয়ে আছে নানান উদ্দীপক মলাট দেওয়া ম্যাগাজিন।

খাটের তলা থেকে একটা পুরোনো ইটালিয়ান স্যুটকেস বার করে তাতে কিছু পরিষ্কার কাপড়-চোপড় ভরল। আর কিছু টুকটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস। এরপর বাথরুমে গিয়ে সে বেশ ভালো করে স্নান করে নিজেকে ফ্রেশ করে নিল।

ড্রেস করতে করতে ঘরের দরজায় 'নক' করার আওয়াজ।

— কাম ইন।

লোকটা দরজা অর্ধেক ঠেলে মুখটা ঘরের মধ্যে বাড়িয়ে বলল— গাড়ি এসে গেছে।

গাড়ির সামনে এসে গ্রান্ট দেখে দুজন গার্ড ড্রাইভারের সাথে কথা বলছে। কী বলছে? হযতো বলছে, যাতে আমি ঠিকমতো প্লেনে উঠতে পারি। আমার যাতে কোনোরকম কষ্ট না হয়। গ্রান্ট এগিয়ে গেল। মাথার টুপিটা ঠিক করে একজন গার্ডকে সামান্য ধাক্কা মেরে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল।

ধাক্কা খাওয়া গার্ডটা লাল চোখ করে গ্রান্টের দিকে তাকিয়ে রইল। গ্রান্ট সেদিকে লক্ষ্যও করল না। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ক্রিমিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্রের পাড়ে দুটো জায়গার মাঝামাঝি রুশ রিভিয়েরার পাহাড় ঘেরা সমুদ্রের কোলে এই বাগানবাড়িতে গ্রান্টকে রাখা হয়েছে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবেই। তবে এর অন্য কারণ অবশ্যই আছে।

ত্রিমপারফুলের এয়ারপোর্টে পৌঁছোতে দেড় ঘন্টা লেগে গেল। রাস্তার মাঝে যেসব গোকুরগাড়ি চলে আসছিল, সেটাও একটা কারণ বটে। তার ওপর যখন দেখল এটা সরকারি গাড়ি, তখন কেউ আর বিপদ ঘাড়ে নিতে চায়নি।

বেশ শক্ত করে তারের বেড়া দেওয়া সিভিল এয়ারপোর্টের সীমানা। তার ওপর বেশ উঁচু পাঁচিল। হাতে টমিগান নিয়ে প্রহরারত দু'জন প্রহরীর সামনে এসে ড্রাইভার জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার পাস দেখাল। তারপর কিছুটা সামরিক এলাকা পেরিয়ে তারা এয়ারক্রাফট ল্যান্ডিং জোনের সামনে এসে থামল। গ্রান্ট গাড়ি থেকে দেখল, মিলিটারি মালবাহী প্লেন, নেভিদের হেলিকপ্টার, নানা প্লেন দাঁড়িয়ে।

ড্রাইভার স্টার্ট বন্ধ করে গাড়ি থেকে নেমে বেশ কিছুটা হেঁটে গিয়ে একজনকে কী যেন জিজ্ঞেস করল। সে আবার আর একজনকে দেখিয়ে দিল। ড্রাইভার তার দিকে এগিয়ে গিয়ে কিছু বলল।

গ্রান্ট গাড়ির সামনের কাঁচের মধ্য দিয়ে সব লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

লোকটা এবার ওয়ারলেসে কথা বলে।

গ্রান্ট শুনতে পেল কন্ট্রোল-টাওয়ার থেকে বলছে— 'লেফট। একট্রিম লেফট। নং V-BO!...'

ড্রাইভার এসে গাড়ি চালিয়ে টার্মাকের দিকে এগোতে গেলেই একজন গার্ড চিৎকার করে বলে ওঠে— হন্ট, হন্ট!

আচমকা ব্রেক মেরে গাড়ি থামায় ড্রাইভার। আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের গাড়ির ওপর দিয়ে চারটে MIG 17 যুদ্ধবিমান তীব্র গর্জন করে চলে গেল।

গার্ড এবার তাদের যাবার ইঙ্গিত করল।

গাড়ি চালিয়ে প্রায় একশো গজ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা V-BO প্লেনটার সামনে গিয়ে থামল। প্লেনটা ডাবল ইঞ্জিনের ইলুশিন-১৩। ওরা থামতেই প্লেনটার দরজা খুলে গেল। মই নামিয়ে দিয়ে একজন ফ্রু নেমে এসে ওদের পরিচয়পত্র দেখতে চাইল। ফ্রু এবার ড্রাইভারকে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। এবং গ্রান্টকে স্যুটকেসটা নিয়ে মই দিয়ে প্লেনে উঠতে বলে।

গ্রান্ট প্রথমে ভেবেছিল, স্যুটকেস নিয়ে উঠতে তার অসুবিধা হবে। না, তেমন কোনো অসুবিধা হল না। প্লেনের ভিতর পা রাখলে ফ্রু মইটা টেনে নেয়।

প্লেনের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

গ্রান্ট দেখল ভিতরটা খালি। বোধহয় গোটা কুড়ি পাঁচশ সিট হবে। সামনের দিকে এবং জানলার পাশে বসে সে সিটবেস্ট বেঁধে নেয়। ইঞ্জিনের গর্জন সে শুনতে পায়। প্লেন আস্তে আস্তে এগোতে থাকে।

প্লেনটা এখন মাটি ছেড়ে শূন্যে ভাসতে ভাসতে তাব গতি নিয়ে চলেছে এগিয়ে।

সিটবেল্ট খুলে সিগারেট ধবিয় হেলান দিয়ে আরাম করে বসল গ্রান্ট। জানলা দিয়ে ফেলে আসা পৃথিবীর দিকে তাকাই। কিছু লাগে ক্ষুদ্র, কিছু লাগে অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে সে। অতীতকে যেন সে দেখতে পায়। আকাশেব বুক চিরে এগিয়ে চলা গ্রান্টকে কে যেন পিছনে তাকাতে বাধ্য করে।

বেলফাস্ট শহর থেকে সামান্য দূরে এক সার্কাস তাঁবুর পিছনে ভিজে ঘাসের ওপর নির্জনে দুটি শ্রাণী মত্ত এখন শারীরিক খেলায়। এরা হল এক পেশাদার জার্মান ভারোত্তোলনকারী এবং এক দক্ষিণ আইরিশ ওয়েটলিফট। এদের মিলনের অবৈধ ফসল ডোনোভান গ্রান্ট। মহিলা যখন আসন্ন প্রসবিনী, তখন সে তার এক খুড়ির কাছে গিয়েছিল। সন্তান প্রসবের পর যখন তার মৃত্যু আসন্ন, সে বলে গিয়েছিল ‘মহাবলী ও ডোনোভান’-এব ডোনোভান এবং তার নাম গ্রান্ট মিলিয়ে হবে তাব সন্তানের নাম।

ক্রমে এই সন্তানটি বড়ো হতে থাকে। বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে বেশ জোর হতে থাকে। কারুর সঙ্গে সে মিশত না। তবে কুস্তিতে সে তার থেকে বয়সে বড়ো কয়েকজনকে হারিয়ে দিয়েছিল। অনেকেই তাকে এড়িয়ে চলত।

প্রাক্যৌবনেই তার শরীরের মধ্যে একধরনের কামনা, দপদপানি দেখা দিতে শুরু করে। ষোলো বছর বয়সে একদিন তার শরীরে অসহ্য জ্বলুনি হতে থাকে। সহ্য করতে না পেরে বাড়ি থেকে রাত্রিবেলা বেরিয়ে একটা তাগড়াই বিড়ালকে সে গলা টিপে মেরে ফেলে। তারপর একমাস বাদে অর্থাৎ নভেম্বরে একটা কুকুর এবং বড়োদিনের রাতে একটা গোরুকে সে গলা হত্যা করে। যাতে লোকে তাকে সন্দেহ না কবে, সেইজন্য সে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হাঁস, মুরগি, ভেড়া মেরে বেড়াতে থাকে। একদিন এক ঘুমন্ত যুবককে গলা টিপে খুন করে

১।

বাড়ি-ফেরত প্রেমিকাদেরও সে রেহাই দিত না। তবে খুন করবার আগে সে কোনোরকম ‘শিবিক’ অভ্যাস করত না। কী করে এই রহস্যময় খুন বন্ধ করা যায়, তা নিয়ে সে খেচাটে লোকেদের মুখে আলোচনা স্নাত। কিন্তু তার তো এই নীরবে খুন করেই তৃপ্তি, ‘চরম তৃপ্তি’। কিন্তু কেন?

আঘম্যাকলয় গ্রামের লোকেদের কাছে গ্রান্ট ভীষণ প্রিয়। গ্রান্টকে নিয়ে এই গ্রামবাসীদের আবেগের শেষ নেই। সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়ানো গ্রান্টকে যখন পুলিশ তার সাইকেল থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন তার হয়ে এগিয়ে আসে ঐ গ্রামের সরল মানুষগুলি। তারা গ্রান্টের হয়েই পুলিশকে বলে যে, গ্রান্ট তো নিজের শরীর ফিট রাখার জন্য সাইকেলে চেপে ঘোরাঘুরি করে।

— কেন? — কর্তব্যরত সার্জেন্টের কঠিন প্রশ্ন।

তারা বলে, বক্সিং ম্যাচের জন্য সে নিজেকে ১৬ বি করছে। উত্তর আয়ারল্যান্ডের লাইট-হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়নের সে একজন প্রতিযোগী। গ্রান্টকে সন্দেহ করবার মতো কিছু নেই। সে খেলাধুলা ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।

কিন্তু এই সরল গ্রামবাসীর দল যদি একবার জানতে পারত, গ্রান্ট নামের এই সুন্দর যুবকটি, যে বক্সিং নিয়ে মেতে থাকে, আড়ালে যে এক ভয়ংকর সম্পদশ বর্ষীয় যুবক।

গ্রান্ট আরেকবার বিপদ থেকে বঁচে যায়। আঘম্যাকলয় ছেড়ে সে চলে আসে বেলফাস্ট-এ। আঘম্যাকলয়-এ থাকলে সে ধরা পড়ে যেতে পারে। এখানে এসে গ্রান্ট থাকতে শুরু করে এক বয়স্ক বক্সিং ট্রেনারের কাছে। নিয়ম ছিল খুব কড়া। ওই গ্রাম থেকে বাইরে বেরোনো চলবে

না। কিন্তু গ্রান্টের মাথায় আবার খুনের নেশা চেপে বসেছে। অনুশীলনরত অবস্থায় তার প্রতিপক্ষকে প্রায় শেষ করে দিচ্ছিল সে। তার মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হবার সম্ভাবনা আছে দেখে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হল না। গ্রান্ট বেঁচে গেল।

এইভাবে আরও কয়েক মাস কেটে গেল।

গ্রান্ট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হল আঠারো বছর বয়সে। তখন ১৯৪৫ সাল। গ্রান্টের মধ্যে অসাধারণ ক্ষিপ্রতা এবং শারীরিক শক্তি দেখে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সেনাদলে। 'রয়্যাল কোর অব সিগন্যালস' এ তাকে ড্রাইভারের পদে বহাল করা হল। ইংল্যান্ডে ট্রেনিং-এ থাকতে থাকতে তার মনের পেশাচিকিতা অনেকটা দূর হল। কিন্তু পূর্ণিমার রাত্রি এলে সে যখন পুরোনো হিংস্র চিন্তা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারত না, তখন সে চূড়ান্ত মদ্যপান করত। ক্যাম্পে ফিরবার পথে গার্ডস ধরলে সে জবাব দিত-- কম্যান্ডিং অফিসার তাকে ফিট রাখতে চান যাতে সে আর্মি চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠতে পারে।

গ্রান্টদের পরিবহন বিভাগকে বার্লিনে পাঠানো হয় রুশদের সাথে রাজনৈতিক অশান্তির দরুন। ফলে গ্রান্টের আর্মি চ্যাম্পিয়ন হওয়া হল না। গ্রান্ট রুশদের অকথ্য অত্যাচারের কথা শুনেছিল। ঠিক করল গ্রান্ট, রাশিয়াতেই সে যাবে। কিন্তু গিয়ে সে কী করতে পারে সেখানে? আর কীভাবেই বা যাবে?

গ্রান্ট একটা সুযোগ খুঁজছিল।

'রয়্যাল কোর' দলের হয়ে বক্সিং লড়াইতে গিয়ে গ্রান্ট জানতে পারে, কী করে সে প্রতিপক্ষ দলে মিশতে পারবে।

ভাগ্যচক্রে বক্সিং প্রতিযোগিতার সেই রাত ছিল চন্দ্রিমা। ফলে গ্রান্টের মনে জেগে উঠেছিল খুন করবার নেশা। গ্রান্টকে সাবধান করা সত্ত্বেও সে প্রতিপক্ষকে বারবার বেণ্টের তলায় মেরে যাচ্ছিল।

গ্রান্টকে রিং থেকে বের করে দিতে বাধ্য হয়। প্রবল টিটকিরি গালাগাল সহযোগে সে বক্সিং কম্পিটিশন এরিয়া ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পরদিন সকালে কম্যান্ডিং অফিসার বসে তুমি 'রয়্যাল কোর' টিমের কলঙ্ক।

গ্রান্টকে বদলি করা হয় 'মোটর সাইকেল ডেসপ্যাচ সার্ভিসে'। বা গ্রান্ট চেয়েছিল।

এরপর কিছুদিন নীরব থাকে গ্রান্ট। অপেক্ষা করতে থাকে।

লোক্যাল সামরিক গোয়েন্দা হেড কোয়ার্টার্স থেকে এক বিকেলে গ্রান্টকে ডেকে পাঠানো হয়। কতগুলো চিঠি বিলি করে আসতে হবে। কয়েক মিনিট ধরে চিঠি এবং একটা বড়ো কাগজে লেখা নাম ঠিকানার তালিকাটা দেখে নেয়। গ্রান্টের মুখ চকচক করে ওঠে। সে ব্রিটিশ কন্ট্রোল গেটের কিছু আগে গাড়ি থামিয়ে অন্ধকারে অপেক্ষা করতে থাকে। কন্ট্রোল গেট একটা ট্যান্কে ছাড়বার জন্য গেট খুলে দিতেই আচমকা স্টার্ট দিয়ে ওই ট্যান্কে কাটিয়ে প্রায় যার্ট মাইল বেগে ক্রসিং পার হয়ে রুশ সীমান্তের গেটের কাছে এসে গাড়ি থামায়।

সশস্ত্র গার্ডসরা ছুটে এলে গ্রান্ট শুধু বলে— রুশ গোয়েন্দার বড়ো সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায় সে।

একজন গার্ডস এক হাতে টমিগান ধরে অন্য হাতে গ্রান্টকে বার করতে গেলে মুহূর্তের মধ্যে সে বাইকে বসেই সেই সৈনিকটিকে লাথি মেরে ফেলে দেয়।

গ্রান্ট এখন বন্দি। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত রাইফেলের নল হাঁ করে আছে।

এক অফিসার গ্রান্টকে সজোরে থাঙ্গড় কষায়। মাটিতে পড়ে গেলে তার শার্টের কলার ধরে তাকে তুলে মারতে গেলে গ্রান্ট ঐ অফিসারের হাত ধরে নেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে— এমন

কিছু গোপন তথ্য আমার কাছে আছে, যা গোয়েন্দা দপ্তরকে না দিলে তোমরা সবাই বিপদে পড়বে।

— দেখি সেগুলো।

— না। একমাত্র দেবার জায়গা তোমাদের গোয়েন্দা বিভাগকে।

— ঠিক আছে। কাম উইথ মি।

একটা ঘরে গ্রান্টকে নিয়ে গিয়ে একটা ফর্ম ভর্তি করতে দেওয়া হয়। ইস্ট বার্লিনে যারা যেতে চায় তাদের নাম, ঠিকানা, কী কারণে যেতে চায় এইসব।

পাশের ঘরে সেই অফিসারটি টেলিফোনে কথা বলছিল। তবে বক্তব্য শোনা যাচ্ছিল না।

গ্রান্টের ফর্ম ফিল আপ হয়ে গেলে দুজন লোয়ার র‍্যাঙ্কের অফিসার এসে ফর্মসহ গ্রান্টকে বাইরে নিয়ে এল। তারপর একটা বিশাল গাড়িতে তাকে তার মোটর সাইকেল সুদূর তুলে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

যখন সেই গাড়ির দরজা খোলা হল, গ্রান্ট দেখল এক বিশাল বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে সে ঢুকেছে। বাড়িটা নতুন। গ্রান্টকে লিফটে করে ওপরে নিয়ে যাওয়া হল। প্রথমে যে ঘরে সে ঢুকল, সে ঘরে শুধু একটা বেঞ্চি। তারপর কিছুক্ষণ বাদে একটা সুন্দর সাজানো ঘরে। টেবিলের অপর প্রান্তে বসে আছে এক অফিসাব। যার পোশাকে পরপর তিনটে সোনার মেডেল। অফিসারের কাজের কৃতিত্বস্বরূপ। অফিসাবটি কর্নেল র‍্যাঙ্কের। টেবিলে ফুলদানিতে শুধুই টকটকে লাল গোলাপ।

মনে মনে হাসল গ্রান্ট। তাহলে তার গোপন নথিগুলো এরা সব পড়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে। নইলে তাকে এভাবে এখন—

তখন সেই মুহূর্ত থেকে গ্রান্টের জীবন গোলাপে ভরে উঠল।

গোলাপের সুবাসিত তাকে সুরভিত করে রাখল।

গ্রান্টকে ইশারায় বসতে বলা হল।

গ্রান্ট খুব শাস্ত ছেলের মতো টেবিলের এদিকে একটা গদি আঁটা চেয়ারে গিয়ে বসে।

॥ তিন ॥

গ্রান্ট এখন সেই সুসজ্জিত ঘরে বসে। তখন এবং টেবিলের অন্য প্রান্তে বসে থাকা কর্নেলের মাঝে কিছুটা কোনাকুনি কবে একগুচ্ছ রক্তগোলাপের অবস্থান। গ্রান্টের মনে হল যেন, ওই গোলাপের দল তাদের পাপড়ি ছড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

গ্রান্ট চুপ কবে বসে আছে। কর্নেল একমনে ফাইল নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। দেখে মনে হল, এই মুহূর্তে কর্নেল বেশ গম্ভীর।

উসখুস করতে থাকে গ্রান্ট। অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল। লোকটা কি কাজ করেই চলবে নাকি?

ফাইল বন্ধ করে কর্নেল। সবকিছু যথাস্থানে রেখে এবার সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে গ্রান্টের দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল।

একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে সে গ্রান্টকে বলে — ওয়েল মিস্টার গ্রান্ট, তুমি তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নে কাজ করবে বলে ঠিক কবেছ?

— ইয়েস। সে জন্যই তো আমার এত পরিশ্রম করে আসা।

প্রশ্নকর্তা MGB র কর্নেল আবার চেয়ে থাকে গ্রান্টের দিকে। ভাবে — এই কুৎসিত-দর্শন

ব্রিটিশ সৈনিকের সব নথি সে দেখেছে। একে পরং জেল বা কোনো এক লেবার ক্যাম্পেও চালান দেওয়া যেতে পারে।

কর্নেল এবাব বলে - - কিন্তু আমাদের কাজের জন্য সব বিভাগেই বেশ দক্ষ এবং সাহসী লোক আছে। এমনকি বক্সারও। তা তুমি--

-- আমার মনে হয়, আপনাদের মার্ভার স্কোয়াডে কোনো সাংঘাতিক লোক নেই। এবং আমি সেই বিভাগেই কাজ চাইছি।

MGB র কর্নেল গ্রান্টের চোখেমুখে জ্বলন্তভাবে লক্ষ করল। ভাবে— ছেলেটা পাগল নয় তো? নাকি একে তার দেশেই সব জানিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেবে?

-- হুম! ঠিক আছে, তুমি একটু অপেক্ষা করো।

কর্নেল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে গ্রান্ট বলে - যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আমি এই মুহূর্তে যে কোনো লোককে শেষ করে দিয়ে আসতে পারি।

কর্নেল গম্ভীরভাবে বলে— ওয়েট ওয়েট। -- বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গেল।

ঠিক তখনই দরজা খুলে যে ঘরে ঢুকে গ্রান্টের পিছনে দাঁড়াল, তার হাতে উদ্যত পিস্তল।

পাশের ঘরে কর্নেল ফোনে কথা বলছে- - **SMERSH, SMERSH...** একজন ব্রিটিশ যুবক... গোপন ডকুমেন্টস... মার্ভার স্কোয়াডে সে...

MGB-র কর্নেল এরপর যা উত্তর পেল তাতে তার মুখ অনেকটা হালকা হয়ে এল। সে ক্রমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ভাবল— তাদের সব সৌভাগ্য নির্ভর করছে এই ব্রিটিশ যুবকটির ওপর। ও যদি ফেল কবে তাহলে প্রথমেই তাদের ওপর চড়াও হবে ব্রিটিশরা, তারপর জার্মান। কারণ, তখন গ্রান্টের হিংস্রতা বহু গুণচরেরই ভয়ের কারণ হবে। বামেলা পাকাবে বমগার্টেন-এব অর্থসাহায্যকে কেন্দ্র করে আমেরিকানরা। তাই এই গ্রান্ট ছোকরাকে কাজ সফল না হওয়া পর্যন্ত কতটা ভরসা করা যেতে পারে?

ঘরে ফিরে এসে গ্রান্টকে কর্নেল প্রশ্ন করে— তোমাকে যেভাবে বলা হবে ঠিক সেভাবে পারবে তো?

— বললাম না, আমি মার্ভার স্কোয়াডেই কাজ করতে চাই।

— ও. কে.। শোন, ২২নং, কুরফুবস্টেওয়ান, ফ্ল্যাট নং-৫-এ থাকে ডাঃ বমগার্টেন।

— বুঝে গেছি।

কর্নেল বলে— ওফ্। অত লাফালাফি করছ কেন? বাকিটা তো গুনলে না। আজ রাতে তোমার বাইকের নম্বর প্লেট পালটে তোমাদের জায়গাতেই চলে যেতে হবে। এবং তুমি একটা 'জরুরি' লেখা চিঠিটা নিয়ে বমগার্টেনের সঙ্গেই দেখা করতে চাইবে।

গাবপর—

গ্রান্ট বেশ সপ্রতিভভাবে কর্নেলের মুখের দিকে চেয়ে বলে— এটার পরের অ্যাটেমপট?

— আরে বাছ, আগে এটা করে তোমার কেলামতি দেখাও। — বলে বেল টিপতেই সাদা পোশাক পরা একজন ঢুকতেই কর্নেল গ্রান্টকে বলে— তোমার দায়িত্ব এর ওপর। তোমাকে এ-ই সব খেলনা দেবে। ফিনিশ হলে এই সোভিয়েত এলাকায় চলে যাবে কর্নেল বরিসের কাছে। তার ঠিকানা... ও কে; গুড লাক।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় গ্রান্ট। হাতে একটা গোলাপ নেয়। তারপর সেটার একটা পাপড়ি ছিঁড়ে টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে বলে-- আমার পরের গেমটা রেডি করে রাখবেন।

গ্রান্ট এখন প্লেনে। বসে আছে এয়ারটাইট জানলার সামনে।

রাশিয়ার আকাশসীমার মধ্যে প্রেনটা তার কঠিন ধাতব ডানা মেলে উড়ে চলেছে। পূর্ব দিকান্তে স্টালিনোর চারপাশের ব্লাস্টফারনেসগুলো এখনো বিভীষিকার রূপ নিয়ে জ্বলে চলেছে। পশ্চিমে নিপার নদ, যেটা নোপ্রাপেত্রোভস্কের কাছে নিজেকে দুভাগে ভাগ করেছে। মস্কোর এয়ারপোর্টের সীমান্তের কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত পৃথিবীর সব জ্বলতে থাকা আলোগুলিকে আসল চেহারা দেখা যাবে না।

খুন করবার পর তাকে পাইলটের পোশাক আর হেলমেট পরিয়ে MGB-র একটা খালি প্লেনে তুলে মস্কো পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

হাজতবাসের নামে এক নজরবন্দিশালায় রাখা হয় গ্রান্টকে। ইংল্যান্ড এবং নর্থ আয়ারল্যান্ডের সোভিয়েত স্পাইরা তার অতীতকে বেশ ভালোভাবেই জেনে নিল। গ্রান্টকে দেখে যেত সাইকিয়াট্রিস্টরা।

গ্রান্ট মুক্ত হল এক বছর বাদে। তার সম্বন্ধে সবাই এই মত দিল যে, এই ব্রিটিশ যুবক বিশ্ব রাজনীতি বা সমাজের কোনওরকম রীতিনীতি সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। তবে সে পূর্ণিমার রাতে হয়ে ওঠে হিংস্র। মাঝে মাঝে তার মনমেজাজ বিষমভায়ে ভরে যায়। গ্রান্ট যৌন বিষয়ে অক্ষম, কিন্তু স্বাস্থ্য নিখুঁত। অশিক্ষিত হলেও অসম্ভব চতুর বুদ্ধি ধরে সে।

হ্যাঁ, অনেকেরই মতে গ্রান্ট সভ্য সমাজের এক আতঙ্ক। তার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।

MGB-র পারসোনেল ডিপার্টমেন্টের প্রধান সব তথ্য পেয়ে গ্রান্টের মৃত্যুদণ্ডের কথা ভালোও তাঁকে অন্য সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তিনি প্রথমে ফাইলে লিখতে যাচ্ছিলেন— ‘কিল হিম’। শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করেন।

সাধারণ রুশরা যদিও নিষ্ঠুর নয়। রাশিয়ায় এমন কিছু জাতি-উপজাতি আছে যারা পৃথিবীর ভয়ংকর নিষ্ঠুরদের অন্যতম। তবে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত লোকের ক্ষমা নেই। সেটা রাশিয়া নয়, কোনও রাজ্যেই নেই। তবে যে রাজ্যের লোকসংখ্যা ২০ কোটি, সেখানে বছরে কয়েক হাজারকে খতম করলে নজবেই পড়বে না। সেখানে দুটি বিশাল গণহত্যা হয়ে গেছে। এক বছরে দশ লক্ষ লোককে মারা হয়েছিল। আরও দশ লক্ষকে মারলে এমন কী ক্ষতি!

কিন্তু অন্য একটা সমস্যা আছে। ‘ঘাতক’ের অভাব। ঘাতকদের আয়ু বেশি দিনের হয় না। কোনও-না-কোনও কারণে তাদের খুব শীঘ্রই মরতে হয়। তাছাড়া একজন ঘাতক দিয়ে কত জনকে খুন করা যায়! তারাও খুন করতে করতে ক্লান্তিবোধ করে। দশ-কুড়ি-একশো-দুশো— মানুষ মারার পর একজন জহুদের আর দম থাকে না। যতই হোক, জহুদও মানুষ! খুন-হওয়া লোকেদের আত্মার চিৎকার ও অভিশাপ তার মনোজগতে একটা প্রভাব ফেলবেই। সেটা ধীরে ধীরে গভীর হতে থাকে।

তখন জহুদকেও হত্যা করতে হয়। কারণ সে একেজো, অথচ বিপজ্জনক। নতুন জহুদ নিয়োগ হয়।

MGB শুধু পেশাগত ঘাতক নয়, কসাইদেরও খোঁজ করে। সবরকম হত্যাকাণ্ড পারে এমন লোক চাই। তাদের ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া হয়।

শেষ পর্যন্ত গ্রান্ট সম্পর্কে একটা হালকা হাসির মন্তব্য লিখে ফাইলটা ‘অডিট’-ট্রের উপর ফেলে দেন।

SMERSH-এর দ্বিতীয় বিভাগের দায়িত্বকে বলা যায় ‘অপারেশন অ্যান্ড এক্সিকিউশন’— যথারীতি কাজ করা এবং কাজ শেষ করা।

ডোনোভার গ্রান্টের নাম রাখা হয় গ্রানিৎস্কি। সেই নামটাই বেজিন্টেশন বৃকে নোট করা হয়।

দুটো বছর দুঃখেই মধ্যে কাটে। প্রথমে যেতে হয় একটা বাচ্চাদের স্কুলে। সেটাই তার আশ্রয়। কিন্তু এটা সাধারণ স্কুল বলতে যা বোঝায় তা নয়। এটা বিদেশিদের বিরুদ্ধে যেসব গুপ্তচররা কাজ কববে, তাদের ট্রেনিং সেন্টার। নানা জাতির লোক আছে এখানে— জার্মান, চেক, পোল, চীনা ও নিগ্রোর দল। তাদের ক্লাস নেওয়া হয়।

গ্রান্টও ট্রেনিং নিচ্ছে। কিন্তু ক্লাসের বক্তৃতার মাথামুণ্ড কিছু সে বোঝে না। অন্যদের দেখাদেখি নোট নেয় বটে, সে সবও তার মাথায় ঢোকে না। তবে প্রাকটিকালে সে খুব ভালো মার্ক পায়, লেনিনগ্রাদের আশেপাশে এই 'ফিল্ডওয়ার্ক' চলত। এই ট্রেনিং-এ উপস্থিত বুদ্ধি, আত্মবক্ষা, সাহস আর স্থির বুদ্ধির পরীক্ষা হয়। তাতে গ্রান্ট ফার্স্ট বয়— মানে ফার্স্ট ম্যান।

বছরের শেষে রিপোর্টে গ্রান্ট সম্পর্কে লেখা হয় 'রাজনৈতিক জ্ঞানশূন্য। প্রাকটিকাল ক্ষমতা অসাধারণ।'

এটা স্মার্সের কাছে মূল্যবান। মস্কোর বাইরে যুচিনোর-এ 'Terror and Diversion'— বিষয়ে একটা ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়। এতে কয়েকশো রুশ ছাত্র, দুজন মাত্র বিদেশি। বিদেশি দুজনের মধ্যে অবশ্যই গ্রান্ট একজন। জুডো, বক্সিং, স্পোর্টস, ফটোগ্রাফি এবং রেডিও অপারেশনে তার জুড়ি মেলা ভার। এর দেখাশোনা করে কর্নেল আর্কাডি ফতোয়েভ। তাকে বলা হয় আধুনিক রুশ গুপ্তচরবিদ্যার গুরু।

গ্রান্ট রিভলবার, রাইফেল চালানো শেখে লেঃ কর্নেল নিকোলাই গভলোভস্কির কাছে। গভলোভস্কি রাইফেল চ্যাম্পিয়ন।

মোট কথা, কয়েক বছরের মধ্যে বেশ পারদর্শী হয় গ্রান্ট— অর্থাৎ যেমন লোক স্মার্স চায়।

এক পূর্ণিমা বারে তাকে যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য মস্কোর একটি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তার মাথা কালো ছুড়ে ঢেকে দিয়ে হাতে নানা ধরনের অস্ত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়— লাঠি, কুঠার, সাব মেশিনগান। তার আগে তার ডাক্তারি টেস্ট কবা হয় - - ব্লাড প্রেসার, ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাম ইত্যাদি। এবার বলা হয়, এইসব অস্ত্র দিয়ে কিছু খুন করো।

খুনের পরীক্ষায় সে ভালোভাবেই পাস করে।

১৯৪৯ ৫০। গ্রান্টের দিন কাটে মোবাইল গ্রুপের সঙ্গে কাজ করে। রুশ ভাষায় এদের বলা হয় 'Aramport'। রুশ কর্মচারীদের মধ্যে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তাদের খুন করাই এদের কাজ। এসব কাজ গ্রান্ট ভালোই করে। ঠান্ডা মাথায় খুন করার ব্যাপারে সে সদা অগ্রগণ্য। পুরস্কারও পায়।

১৯৫১ ৫২। সরকারি স্বীকৃতি পায় গ্রান্ট। গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি। গভর্নমেন্ট তার কৃতিত্বের প্রশংসা কবে। বার্লিনের পূর্বদিকে সে অনেক কাজ করেছে। সেই গুণেই তাকে এবার সোভিয়েত নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। ভালো মাইনে, মাসিক পাঁচ হাজার রুবল।

১৯৫৩। 'মস্কোর' পদ লাভ। কর্নেল বরিসের সঙ্গে যোগাযোগ। ক্রিমিয়ায় একটা বাগানবাড়ি পাখি 'দুর্জন' বডিগার্ড। কিন্তু তারা কোনো ব্যক্তিগত কাজ করবে না। শুধু তাব নিরাপত্তা দেখবে। কম্যুনিজমে 'প্রাইভেট' কাজ করানোর নিয়ম নেই। গ্রান্টকে অনুশীলন চালিয়ে যেতে হয়। সেটা হল প্রতি মাসে একবার কশ কারাগারে কিছু অপরাধীকে ইচ্ছেমতো খুন করা। যাতে অভ্যেসটা ঠিক থাকে।

লোকে সঙ্গে মোলামেশা নিষিদ্ধ। ফলে কিছু বান্ধব বলে কিছু নেই। মানুষ সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহল নেই। তাব শুধু যাদের খুন কববে, তাদেরই ভালোভাবে লক্ষ করত। স্মার্স তার

বক্ষক, স্তরং কোনো বিপদকে সে ভয় পায় না। স্মার্টই তার বন্ধু। মাঝে মাঝে গুণ্ড ভাবে, তার কাজে কর্তব্যাক্তিবা খুশি তো।

প্লেন নামছে। তুর্শিনো এয়াবপোর্ট। গ্রান্ট এখন খ্যাতিব শীর্ষে। তবে আবও কিছু চাই তার। আবও উচুতে উঠতে হবে। ফলে আবে গুণ্ড। এবং অবশ্যই আবও হতা।

একটা কথা শুনেছে সে। একটা বড়ো হত্যাকাণ্ড কবতে হবে তাকে। সে এক বিদেশি। তাকে খুন কবতে পারলে সে হবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঘাতক।

॥ চার ॥

SMERSH (স্মার্স) এক কথায় – সোভিয়েতের সবকাবি হত্যা প্রতিষ্ঠান। দেশে এবং বিদেশে— সর্বত্রই এব কাজ। ১৯৫৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানো কাজ কবত এবং মাইনে পেত প্রায় ৭০ হাজার নাবী-পুরুষ। পুবো রাশিয়ান নামটা হল SMIERT SPIONEM, সংক্ষেপে SMERSH। স্মার্স কথাটা ব বাংলা অর্থ ‘গুণ্ডচবদের মৃত্যুদণ্ড’। কর্মচাবী ও অফিসার— দুই-ই কাজ কবত। সাধারণ মানুষ ‘স্মার্স’ বলে কিছু চিনত না। এই নাম উচ্চাবণ করা বও তাই প্রশ্ন ছিল না।

হেডকোয়ার্টার একটা অদ্ভুত আধুনিক বাড়ি। বাড়িটার নাম স্ট্রেভেকপ উলিৎসার। নির্জন নিবুম বাস্তাব ১৩ নম্বব বাড়ি। লোহাব জোড়া দবজা, সশস্ত্র প্রহরী। বাস্তাব লোকেবা বাড়িব সামনে দিয়ে যেত না। ও পাশের ফুটপাত দিয়ে চলাফেবা কবত।

তিনতলাব অফিসেই সর্বাধিক গুরুত্ব। এখন থেকে সবরকম অর্ডার যেত, কোথায় কী কবতে হবে। সাউন্ড প্রফ দবজা। মোবায় কর্কেশীয় কাপেটি। ওক কাঠেব টেবিল, লাল মলমলের উপর মোটা কাঁচ। এরই আডাআডি একটা গোলাকৃতি টেবিল, কনফারেন্সের জন্য। এই টেবিলের ওপর জলেব জাগ, অ্যাশট্রে আছে।

১৯৫৫। ঘবের দেয়ালে চাবটে ছবি সোনাব ফ্রেমে বাঁধানো— স্তালিন লেনিন, বুলগানিন এবং আর্মি জেনারেল ইভান সেরভ। ১৯৫৪ সালেব ১৩ জানুযাবি পর্যন্ত সেরভেব জায়গায় ছিল বেরিযাব ছবি।

কার্যনিটেব ওপর বিশাল এক টিভি সেট। পাশে প্রোজেকশন রুম, টয়লেট, সেরভের ছবিব নীচে বইয়ের আলমাবি। তাতে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের রচনাবলি সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে। তাছাড়া গুণ্ডচর বৃত্তি সংক্রান্ত নানা বই। কিছু মোটা অ্যালবাম। যেসব সোভিয়েত ও বিদেশি গুণ্ডচরদেব খুন করেছে স্মার্স, এব মধ্যে তাদের ছবি ও সংক্ষিপ্ত পবিচয় রয়েছে।

ইতিমধ্যে, ঠিক ১১ ৩০ এয়াবপোর্টে নেমেছে গ্রান্টেব প্লেন।

এটা ১৯৫৪।

স্মার্সের হেডকোয়ার্টারের এই ঘরে এখন অ্যালবামটা দেখছিল একটি বলিষ্ঠ চেহারার লোক। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি।

এই হচ্ছে জেনারেল গ্রন্বজোবোয়স্চিকভ। সংক্ষেপে ‘G’। খাকি টিউনিক, নীল ট্রাউজার, কালো রাইডিং বুট। বুকে সারিসারি মেডেল— দুটো অর্ডার অব লেনিন। তাছাড়া রয়েছে অর্ডার অব সুভোরোভ— ইত্যাদি নানা মেডেল। কয়েকটা মস্কো প্রতিরক্ষা ও বার্লিন দখলের সময় পাওয়া। একটা আমেরিকান ‘মেডেল ফর মেরিট’-ও আছে।

আরেকটি বিশেষ মেডেল— ‘হিরো অব দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন’।

G-এর মাথা কামানো। চওড়া হিংস্র মুখ। কঠোর কর্তৃত্বের চিহ্ন।

টেলিফোন বাজে। হাই ফ্রিকোয়েন্সির টেলিফোন। এটা সবাই পায় না। মাত্র পঞ্চাশ জন অফিসারের ঘবে এহেন ফোন আছে— Vch-মার্ক। এই লাইনের প্রতি কথা আপনা থেকে রেকর্ড হয়ে যায়।

— হ্যালো! কে?

— আমি সেবভ। প্রেসিডিয়ামের মিটিং তো হল। এরপর কী?

— এখানে এখনি আরেকটা মিটিং হবে। যোগ দিচ্ছে RUMID, GRU এবং MGB। এক মতে এলে আমি 'হেড অব অপারেশনস' এবং 'হেড অব গ্র্যাপ্সে'র মিটিং করব। সাবধান থাকব, যাতে খোকলভের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি না হয়।

-- আমায় ফোনে জানাবেন। প্রেসিডিয়ামকে কাল বিপোর্ট দেব।

নিশ্চই করব।

এইবার G বোতাম টিপে একজন সহকারীকে ডাকল।

— যাদের আসার কথা সবাই এসেছে?

— হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল।

— ডাকো তাদের।

পাঁচজন এল। ইউনিফর্ম পরা। কনফারেন্স টেবিলে বসল সবাই। তিনজন সিনিয়র অফিসার, তাদের সহকারীরা। সোভিয়েতে কেউ একলা কনফারেন্সে যায় না। সাক্ষী রাখতে হয়।

একপাশে বসেছে লেঃ জেনারেল স্লাভিল, সে GRU-ব প্রধান। GRU জেনারেলের লোকজনের গুপ্তচর শাখা। পাশে একজন কর্নেল। কোনায় RUMID-এর লেঃ জেনারেল ভজ্‌ডভিশেনস্কি। RUMID বিদেশ দপ্তরের গুপ্তচর বিভাগ। মাঝে আরেক জন। সঙ্গে কর্নেল নিকিতেন, রাষ্ট্র নিরাপত্তার দায়িত্বে। তিনি MGB-র প্রধান— যা রাশিয়ার প্রধান গুপ্তচর সংগঠন। এছাড়া একজন মেজর উপস্থিত।

প্রথাগত শুভেচ্ছা বিনিময় করে G এবং সকলেই সিগারেট ধরাল। তারপরেই 'G' তার বক্তব্য শুরু করল।

— কমরেডস। আজকের এই মিটিং-এর নির্দেশ দিয়েছেন জেনারেল সেবভ। আমরা একমত হয়ে একটা সুপারিশ করব— রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে। সেটা ক্রটিহীন হতে হবে। প্রেসিডিয়ামকে জানানো হবে।... শত্রু এলাকায় একটা খুব বড়ো জাতীয় সন্ত্রাসের কাজ করতে হবে। তার জন্য মাত্র তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে। ভুলবেন না। রাশিয়ার বিদেশ নীতিও একটা নতুন অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে, আগে নীতিটা ছিল এত কঠোর যে পশ্চিমি দুনিয়ায় গোপন উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলছিল, বিশেষ করে মার্কিন মুলুকে। আমেরিকানদের বোঝা মুশকিল, তাদের মাথা সুস্থির নয়, কখন কী করে বসে ধরা কঠিন! সন্দেহ হয়, রাশিয়া এক পারমাণবিক আক্রমণের মুখে এসে গেছে! কিন্তু এখন আমরা এরকম লড়াই চাই না। যদি লড়াই হয়, উপযুক্ত সময়টা আমরাই বেছে নেব।

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে G বলে চলে।

— আমাদের 'হার্ড পলিসি'র জন্য আমেরিকানরা বোধহয় নিউক্লিয়ার আক্রমণের কথা ভেবেছিল। সেটার হোতা অ্যাডমিরাল অ্যাডফোর্ড, পেন্টাগনের নেতা। আমাদের বিদেশ পলিসি তো পালটানো দরকাব। উদ্দেশ্য একই থাকবে, কিন্তু রূপ-কৌশলটা হবে 'নরম-গরম'। জেনেভার সময় আমরা 'নরম' ছিলাম। চিন কয়েকটা দেশকে হুমকি দিচ্ছে, ফলে সেখানে 'কঠোর' হলাম। মস্কো তো এখন আর লৌহ যবনিকা নয়। তাই বহু বিদেশি এখানে আসতে

পারছে -- বহু সাংবাদিক, অভিনেতা, সাংস্কৃতিক শিল্পী। এদের মধ্যে একটা অংশ অবশ্যই স্পাই।

একটু থেমে 'G' আবার শুরু করে - 'পরীক্ষামূলক বোমা ফেলতে হয়, অর্থাৎ কৌশল খাটে কিনা সেটাও আগে দেখে নেওয়া হয়। কূটনীতির ক্ষেত্রে। কমরেড বুলগানিন, ক্রুশ্চেভ, জেনারেল সেরভ ভারত এবং এশিয়ার অন্যত্র গিয়ে ইংরেজদের গালিগালাজ করেন। আবার লন্ডনে গিয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে গুভেচ্ছা বিনিময় কবতে হয়। এই হচ্ছে 'নরম-গরম' বা 'কোমল কঠোর' পলিসি। এই কায়দায় পশ্চিমী শত্রুপক্ষ অনেকটা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না।

এবার হাসিমুখে G বলে-- মরক্কো এবং মিশরে এই পলিসি চলছে। মরক্কোয় বিপ্লব, মিশরকে অস্ত্রসাহায্য ছাড়াও একই কায়দায় আমরা নানা কাজ করছি। যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব, সাইপ্রাসে হাঙ্গামা, টার্কিতে রায়ট, ইংল্যান্ডে স্ট্রাইক, তাছাড়া ফ্রান্সে পলিটিক্যালি আমরা এগিয়েছি। সারা দুনিয়াতেই আমরা এগোচ্ছি।

টেবিলে অন্য মুখগুলো এবার 'নরম'। G বুঝল, এবার 'গরম' কিছু বলা দরকার।

-- কিন্তু কমরেডস! একটা কথা বলুন, আমরা যখন ব্যর্থ হয়েছিলাম, তার জন্য কারা দায়ি? কারা মূর্খামি করেছে, যার জন্য সোভিয়েতের মুখ পুড়েছে? বলুন। তারা কারা?

টেবিলের উপর উত্তেজিত হয়ে ঘুসি মারেন 'G'।

-- পরিষ্কার কথা, আমাদের রাষ্ট্রের গুপ্তচর বিভাগই দায়ি! আমরা অলস, বিশ্বাসঘাতক, অকর্মণ্য! আমরা রাশিয়ার মহান মর্যাদা নষ্ট করেছি। আমরাই দায়ি! তার মূল্য আমাদের যথেষ্ট দিতে হয়েছে। আমরা হারিয়েছি গুজোস্কাকে, তারপরেই কানাডায় বৈজ্ঞানিক ফুস্ককে। আমাদের স্পাই উইং পুবোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। আমেরিকায় হেরেছি, টোকায়োভের লোককে হারাতে হয়েছে। খোকালভ আমাদের লজ্জা। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় পেত্রভ দম্পতিও ভুল করে। মোট কথা বহু পরাজয় হয়েছে, আরও অনেক কথা আর বললাম না।

এইবার গামল G। সবাই চুপ। চিন্তিত।

G বলল - সূতরাং আমাদের ঐক্যমত সুপারিশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর উপর রাশিয়ার ভাগ্য নির্ভর করছে। কী বলব আমরা? কী চাই আমরা? কী পরিবর্তন চাওয়া উচিত? গুনুন কমরেডস, আমাদের সিদ্ধান্ত হবে। না নিতে পারলে ঘোর অসন্তোষের জের আমাদেরই উপর পড়বে। সাবধান!

॥ পাঁচ ॥

G বুঝল-- ভাষণটা ভালোই হয়েছে, চাবুকের মতো।

মোটকথা, সামান্যতম প্রতিবাদী কথা বা সুর শোনা গেল না। রাশিয়ার গুপ্তচর বিভাগ অতীতে বহু সাফল্য অর্জন করেছে, সে কথা একফোঁটা বলার সাহস হল না কারুর। স্মার্শের কর্তাও এর জন্য দায়ি, এবং তাই তার হুমকি দেওয়া সাজে না, একথাটাও কেউ বলল না।

জেনারেল ভজদভিশেনস্কিকে বেরিয়ার মৃত্যুর পর মলোটভ গোপনে জানিয়েছিলেন-- 'G' একসময়ে খুব উন্নতি করবে। G কে বেরিয়া তেমন পছন্দ করতেন না, তাই উন্নতিটা বেরিয়ার মৃত্যুর পরেই দ্রুত হতে থাকে। ১৯৫২ পর্যন্ত যে ছিল এক নগণ্য ডেপুটি, সে এখন স্মার্শের সর্বময় কর্তা।

জেনারেল সেরভ-ও 'হিরো অব দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন' পদক পেয়েছিলেন। ১৯৩০-এ

গণহত্যায যে দশ লক্ষ লোক মারা যায়, তার পেছনে সেরভের দান স্বীকৃত। ১৯৪৪ এ ককেসাসে গণহত্যার পেছনেও সে।

বেরিয়াব ফাঁস হয়। কিন্তু স্মার্স 'G'-কে পায়। সেরভ, বুলগানিন, ত্রুশ্চেভ এখন দেশ শাসক। কে বলতে পারে, এদের সারিতে একদিন G যাবে না।

G লক্ষ করছে ভজর্ডভিশেনস্কিকে। ওর মুখ থেকে কিছু কথা শোনা দরকার। কারণ লোকটা চতুর।

G বলল- কমরেডস, আমরা আশাবাদী। হ্যাঁ, বহু সময় উঁচু গাছের গোড়াতেও কুড়ুল মারা হয়। তাই কেউ-ই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। আসুন, আমরা একসঙ্গে এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করি।.. আমার মতে, গুপ্তচরের কাজের মধ্যে সন্ত্রাস বা নাশকতামূলক কাজের পরিমাণ বাড়ানো হোক। স্মার্সকেই সে দায়িত্বটা নিতে হবে। কিন্তু টার্গেট বাছার কাজটা তো সোজা নয়। সেই দায়িত্বটা আপনাদের সবাইকে বহন করতে হবে।

হ্যাঁ, 'কোমল-কঠিন' কায়দাটা মিটিং-এ ভালোভাবেই প্রয়োগ করছে G।

তবু সবাই চুপ। শ্রোতামাত্র।

G বলে-- একটা বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটানো, বা কোনও একজন প্রধানমন্ত্রিকে গুলি করা যথেষ্ট নয়। ওতে বিশেষ কাজ হয় না। ওর মধ্যে বুর্জোয়া নাটুকেপনা বেশি থাকে। আসলে, সাধারণ লোককে ভয় দেখিয়ে কী হবে? দেখতে হবে, সরকারি মহলে নাড়া দেওয়া গেল কিনা! যদি কোনো সরকারকে চিন্তিত বা ভীত করা যায়। তবেই আসল কাজ হবে। এতে সফল হবে অনেক। আমাদের শত্রুরা আমাদের শক্তিকে ভয় পাবে, চাতুর্যে অবাক হবে। যারা আমাদের বিদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতক হয়েছিল বা হতে যাচ্ছিল, তারা মত বদলাবে। শ্রমিকশ্রেণি আমাদের ভক্ত হবে আরও, অনুগত থাকবে।

এবার GRUMID এর প্রতিনিধির দিকে তাকিয়ে G বলল— সুতরাং লক্ষ্যস্থল ঠিক করতে হবে। তারপর আঘাত। কমরেড ভজর্ডভিশেনস্কি, বিদেশি গোয়েন্দা বিভাগগুলোর খবর রাখতে হয় আপনার। আপনার মতামত দিন। কোনটা সবচেয়ে বিপজ্জনক বলুন। আমরা টার্গেট স্থির করে নেব।

তিরিশ বছরের ঝানু অভিজ্ঞ নায়ক জেনারেল ভজর্ডভিশেনস্কি। স্টকহোম, সোর্জেটক, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড— নানা জায়গায় কাজ করেছে সে। আপাদমস্তক সে একজন পেশাদার স্পাই।

ভজর্ডভিশেনস্কি তাব বক্তব্য শুরু করল।

— মানুষ এবং তার সরকারি পদ সবসময় মিলিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। সারা পৃথিবীতে দক্ষ গুপ্তচরের অভাব নেই। তবে সংখ্যা ও গুণগত তফাত থাকে বৈকি! বিদেশে— নরওয়ে, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, পোর্টুগালেও এমন এক-এক জন এজেন্ট আছে, যারা আমাদের যথেষ্ট বেগ দিতে পারে। তবে, সেগুলো ছোটো দেশ। আপাতত আমি ছোটো দেশগুলোর কথা চিন্তা করছি না। তবে আমার মতে, একটি ছোটো দেশকেই ধরা দরকার যেটা আমাদের বেশ বড়ো রকমের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে -- সুইডেন। কয়েক শতাব্দী ধরে ওরা রাশিয়ার উপর স্পাইং করেছে। এমনকি জার্মানির চেয়ে তারা এই ব্যাপারে এগিয়ে। ভীষণ বিপজ্জনক। ওদের ঠান্ডা করা দরকার!

G বলল -- সুইডেন নিয়ে গোলমাল দীর্ঘদিন চলছে। যাই হোক, বলুন—

- ইটালিকে ছেড়ে দিচ্ছি। চালাক এবং কর্মপটু, কিন্তু আমাদের পক্ষে তেমন বিপজ্জনক নয়। স্পেন সম্পর্কেও একই কথা। এরা ফ্যাসিস্ট, আমাদের অনেক লোক মেরেছিল এক

সময়ে। তবে সেখানে আমরা দুর্বল আছি। ফ্রান্সে আছে, **Deuxieme** পুরো - এরা ডেপ্লারাস। এদের প্রধান হচ্ছে ম্যাথিস। গুড টার্গেট! তাছাড়া ফ্রান্সে আমরা অনেকটা তৈরি।

— আর ইংল্যান্ড?

— ওদের কথা অনারকম। ওদের সিক্রেট সার্ভিস খুব শক্তিশালী। আমরাও তাদের সমীহ করে চলি।... তবে দেশটা দ্বীপ। কিন্তু বরাবর খুব পারদর্শী, যুদ্ধে, কূটনৈতিক চাতুর্যে। ওখানে আমাদের লোকেরা অল্প জায়গা পেয়েও খুব কষ্টে ভালোই কাজ করছে অবশ্য। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সুনাম আছে, কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। আসল সমস্যা, ইংল্যান্ডের এই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সম্পর্কে একটা 'মিথ' তৈরি হয়েছে। তাদের কেউ হারাতে পারবে না— এটাই মানুষ এবং রাজনীতির বিশ্বাস। এটা ভাঙা দরকাব।

— আর আমেরিকানরা?

— হ্যাঁ, ওরাই আমাদের প্রধান শত্রু! রেডিও ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওরা আমাদের উপরে। কিন্তু অত বৃদ্ধি নেই। চট করে গুজবে বিশ্বাস করে অ্যাকশন নেয়। ফলে, প্রায়ই ওদের শক্তির অপচয় হয়। তাছাড়া ওদের স্পাইরা মেয়েছেলের ওপর বহু টাকা ওড়ায়। ওরা ভাবে টাকা ছড়ালেই ভালো গুপ্তচর পাওয়া যায়। এ ধারণাটা ওদের ভুল।

— কিন্তু ওরা বহু জায়গায় সফল হচ্ছে, জয়ী হচ্ছে। ওদের গুরুত্ব দিচ্ছেন না কেন?

— তা সত্যি। ওরা অনেক বেশি সংখ্যক অপারেশন চালায় ১তাই জয়টা চোখে পড়ে। তবে যত প্রচেষ্টা, সে তুলনায় সাফল্য কম। আমি এই মুহূর্তে ওদের নিয়ে খুব ভাবিত নই।

জেনারেল স্লাভিন বলল— সব শুনলাম। আমার কিছু বলার নেই।

কর্নেল নিকিতিন বলল— আমার সুপারিশ, ইংরেজ গুপ্তচর বিভাগ।

G জিজ্ঞেস করল— সবাই কি এতে একমত?

সবাই মাথা নেড়ে সাই দিল।

G বলল— আমিও। এবার আলোচ্য বিষয়, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কোনো লোককে প্রথম টার্গেট করতে হবে? গুজব আছে, সেখানে একজন নাকি নানা অসাধারণ বিস্ময়কর কাজ করে বেড়াচ্ছে। সে কি ওদের প্রধান? কে এই লোকটা?

কর্নেল নিকিতিন বলল— ওদের প্রধান একজন অ্যাডমিরাল। তাকে সবাই 'M' বলে জানে। আমাদের কাছে M সম্পর্কে একটা ফাইল আছে। তবে তাতে বিশেষ খবরাখবর নেই। অবস্থাটা এই যে, তাকে খুন করা খুব সহজ কাজ নয়। সে লন্ডন ছেড়ে কোথাও যায় না, ঘর থেকেই বেরোয় না।

— তাহলে সেই 'হিরো'টা কে? আমাদের একটা জ্বরদস্ত শিকার দবকার, যাতে ইংল্যান্ড একেবারে পঙ্গু হয়ে যায়।

সবাই চুপ করে ভাবছে। কয়েক মিনিট কাটে।

আগে নিকিতিন বলে — আছে। এমন একজন আছে।

-- কে?

-- তার নাম বন্ড। জেমস বন্ড!

॥ ছয় ॥

কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধতা! তারপরেই G-র চিৎকার- ঠিক বলেছ! ইস, এই নামটাই আমাদের মনে পড়ছিল না! কী আশ্চর্য!

ভজদভিশেনস্কি বলল -- বন্ডের নামটা আমিও শুনেছি।

G বলল-- এই লোকটা অস্তুত দু-বার স্মার্শের পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছিল। ফ্রান্সের ক্যাসিনো রয়ালে ল্যাপিজের ব্যাপারটা আমার মনে আছে। অবশ্য বাধ্য হয়ে আমরাই ল্য শিফকে মেরেছিলাম, কিন্তু সেই রকম অবস্থা এই বন্ড-ই তৈরি করেছিল। বন্ডকে তখনই খুন করা উচিত ছিল। আমাদের একজন নিগ্রো এজেন্টকে এই ইংরেজটা খতম করেছিল।

কর্নেল নিকিতিন বলে-- সেই জার্মান এবং 'মুনরেকার'-এর ব্যাপারেও এই লোকটাই ছিল যত অনিষ্টের মূল।

কিছুক্ষণ পরস্পরের মধ্যে কিছুটা কথা কাটাকাটি শুরু হল এবার। বিশেষ করে নিকিতিন ও স্লাভিনের মধ্যে, GRU-র কাজ নিয়ে। MGB-ও জড়িয়ে যায়।

নিকিতিন আফ্রিকায় হিরে স্মাগলিং ব্যাপারটাও উল্লেখ করল।

কয়েকটা টেলিফোন ও জরুরি কথাবার্তার শেষে ঠিক হল জেমস বন্ডই সবচেয়ে উপযুক্ত টার্গেট। জানা গেল, লোকটা চতুর, প্রায় একা-একাই কাজ করে, দেখতে সুন্দর।

'জেমস বন্ড' সংক্রান্ত ফাইলটা নিয়ে আসতে অফিসকে নির্দেশ দিল G। ফাইলের এক কোনায় লেখা : — ANGLISKI SPION —ইংরেজ গুপ্তচর। ফাইলের মধ্যে থেকে বন্ডের নানা ছবি বের করে সকলকে দেখাল G। প্রথম ছবিটি ১৯৪৬ সালের। টেবিলে বসা এক অক্সবয়েসি হ্যান্ডসাম যুবক।

এরপর নানা বছরের নানা ধরনের ছবি। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত। শেষ ছবিটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখল G। দেখা গেল, লোকটার ডান গালে ট্যান্ড চামড়ার ওপর তিন ইঞ্চি ক্ষতের সাদা দাগ। স্থির চোখ, খাড়া নাক চাপা ঠোঁট, পরনে সাদা শার্ট, কালো টাই।

ফাইলে লেখা আছে : প্রথম নাম জেমস। লম্বা ১৮৩ সেন্টিমিটার। ওজন ৯৬ কিলোগ্রাম। পাতলা চেহারা। চোখ নীল। চুল কালো। ডান গাল আর বাঁ কাঁধে ক্ষতচিহ্ন। ডান হাতের পিছনে প্লাস্টিক সার্জারির চিহ্ন। ভালো অ্যাথলেট। পিস্তল চালানো, ছুরি মারা ও বস্ত্রিং-এ দক্ষ। ছদ্মবেশ নেয় না। ভাষাজ্ঞান : ইংরেজি ছাড়া, ফরাসি ও জার্মান। দোষ : মদ্যপান (অতিরিক্ত না হলে) এবং মেয়েমানুষ। খুন সম্ভব। ঘুম নেয় না।

বন্ড সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য আছে। জুজুৎসু জানে, '২৫ বেরেটা পিস্তল রাখে। জুতোর মুখ ইম্পাতের। ১৯৩৮ থেকে ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগে আছে। তার পেশাদারি নং ০০৭। '০০' অর্থ যাদের খুনের রেকর্ড আছে। এবং যাদের খুনের অধিকার দেওয়া আছে। ১৯৫৩ সালে সম্মানিত উপাধি CMG লাভ করে।

টার্গেট সম্পর্কে সবাই যে একমত সেটা সোচ্চারে আরেকবার যাচাই করে নেয় G। ডেথ ওয়ারেন্ট অর্থাৎ মৃত্যু পরোয়ানা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। ইংরেজ গুপ্তচর, রাশিয়ার শত্রু। একটা হলুদ কাগজে সবাই মতামত লিখিতভাবে জানায়।

— 'হত্যা করতে হবে'।— G।

— 'খুন করুন'— নিকিতিন।

— 'খুন করুন'— স্লাভিন।

সবশেষে ভজদভিশেনস্কি। সে লিখল--- 'খুন করুন'।

G কাগজটায় আরেকটা মন্তব্য লিখল-- চরম অসম্মান ও অবমাননা দিয়ে তাকে খুন করতে হবে।

সভা শেষ।

সবাই বিদায় নিল।

G তার অনুচরদের নির্দেশ দিল -- সেরভকে খবর পাঠাও। ক্রনস্টিনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এসো। কোথায় আছে সে, সেটা ২নং থেকে জেনে নাও। আমি দশ মিনিটের মধ্যে ক্লেব-এর কাছে যাব।

সেরভের ফোন এল। G বলল-- ট্যাগেট তো শুনলেন। খুনের ভার দিচ্ছি কর্নেল ক্লেব আর প্র্যানার ক্রনস্টিনের উপর। কাল প্র্যান নিয়ে আলোচনা হবে। কমরেড জেনারেল, এবার আপনার মত বলুন।

— ঠিক আছে। লোকটাকে খতম করুন। খুব ভালো ভাবে যেন কাজটা হয়। এই সিদ্ধান্ত কাল প্রেসিডিয়ামে পাস করিয়ে নেব।

একজন গার্ড এসে জানাল-- কর্নেল ক্লেব এসেছেন।

— ডাকো।

লোকটার চেহারা ব্যাঙের মতো। জলপাই রঙের ইউনিফর্মে 'অর্ডার অব লেনিন' আটকানো আছে।

কর্নেল ক্লেব একজন মহিলা, পরনে স্কাট, মোটা মুখ, স্মার্শের দ্বিতীয় বিভাগের প্রধান।

Planning and Execution শাখার প্রধান।

— গুড ইভিনিং, কমরেড জেনারেল।

G বলল-- গুড ইভিনিং। বসুন।

স্কাট একটু উঠিয়ে একটা বড়ো চেয়ারে বসল কর্নেল ক্লেব।

॥ সাত ॥

ক্রনস্টিনের দাবা খেলা জমে উঠেছে।

ঘরের টেবিলে দাবার ছক। তার উপর টেবিল ক্রকটার দুটি মুখ।

ঘড়িতে এখন একটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি।

মাখালভের ঘড়িতে একটা বাজতে পাঁচ।

টেবিলে বসে ক্রনস্টিন দাবার ছক দেখছে। সে জিতছে। তার শাস্ত চোখের মধ্যেও একটা ভয়াবহ ভাব। মগজ টগবগ করে ফুটছে। মনে হয়, গত দু-ঘন্টার মধ্যে তার ওজন এক পাউন্ড কমে গেছে, এত বেশি ঘাম ঝরেছে।

ক্রনস্টিন পর পর দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এটা তার তৃতীয়বার ফাইনালে ওঠা। প্রতিযোগী মাখারভ।

উঁচু চেয়ারে দুই আম্পায়ার বসে আছে।

এই ফাইনালের ফলাফল নিয়ে সারা রাশিয়ায় তর্কাতর্কি চলবে অন্তত দু-সপ্তাহ ধরে। দর্শক দলের মধ্যেও স্তব্ধ উত্তেজনা।

ক্রনস্টিন অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে চাল দিল। দর্শক ভাবল-- এইবার বাজিমাৎ!

তা ঠিক নয়।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাইক্রোফোনে ঘোষণা হল-- এখন খেলা তিন মিনিট বন্ধ থাকবে। কারণ কমরেড ক্রনস্টিনের একটা ব্যক্তিগত জরুরি বার্তা আছে।

চাপা গুঞ্জন। ক্রনস্টিনও বিরক্ত।

আম্পায়ার একটা খাম দিল তার হাতে। খামটা ছিঁড়ে সে বার্তাটা পড়ল : 'তোমাকে এখনি দরকার!' কোনও সই নেই। তবে হাতের লেখাটা তার চেনা।

এ তো মহাযন্ত্রণা! যখন তখন--

সে আম্পায়ারকে জানাল-- খেলা চালিয়ে যাওয়া হোক।

মাইক্রোফোন ঘোষণা করল— খেলা চলছে।

অবশ্য বুক কাঁপছে ক্রনস্টিনের। স্মার্শের বার্তা তৎক্ষণাৎ না মানলে—

শাস্তি পেতেই হবে। ছোটোখাটো বকুনি অথবা ভয়ংকর কিছু।

একটা বাজার পাঁচ সেকেন্ড আগে মাখারভ হাব স্বীকার করল। সমবেত জনতার করতালি, উল্লাস।

ক্রনস্টিন এবার রাস্তায় এল। হলের বাইরে পুর্শকিন উলিৎসরের মাঝখানে একটা গাড়ি। ইঞ্জিন চালু রয়েছে। ক্রনস্টিন উঠে পড়তেই ঝড়ের বেগে ছুটল ZIK সেলুন গাড়ি।

ক্রনস্টিন এখন স্মার্শের প্র্যানিং শাখার প্রধান। পদ কর্নেলের সমকক্ষ।

রাস্তায় জ্যোৎস্না। ওরা গস্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল।

এবার G-এর ঘর। কর্নেল ক্লেব তো আগেই উপস্থিত। তার দেরিতে G যে ক্ষুদ্র, সেটা বুঝতে অসুবিধা ছিল না। চোখ লাল।

G জিজ্ঞেস করল— ব্যাপারটা কী কমরেড?

ক্রনস্টিন শাস্তস্বরে বলল— আপনি জানেন, আমি একজন পেশাদার দাবা খেলোয়াড়ও বটে! এটা, মানে দাবা খেলা, আমার কাছে এমন জিনিস যে, যদি খেলা শেষ হবার তিন মিনিট আগে শুনতাম আমার স্ত্রী খুন হচ্ছে, তবুও টেবিল ছেড়ে উঠতাম না। আমার ফ্যানরা সে কথা জানে। আপনার খবর পেয়েই খেলা ছেড়ে উঠে পড়লে হাজার পাঁচেক লোক উলটোপালটা কিছু ভাবত। রাষ্ট্রের কাজে গোপনীয়তা থাকত না, রটে যেত সরকারের দিক থেকে একটা মারাত্মক কিছু ঘটছে। তাই বাস্ট্রের স্বার্থেই আমি ইচ্ছে করে তিন মিনিট দেরি করে পাবলিকের সন্দেহ এড়াতে পেরেছি। অবশ্য ব্যক্তিগত নানা মিথ্যে কথা বলতে পারতাম। সস্তান হাসপাতালে, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাইহোক, আমি ক্ষমা চাইছি।

G বাঁকা চোখে তাকিয়ে ভাবল, লোকটা সুন্দরভাবে যুক্তি সাজাতে জানে। লাইটাব দিয়ে চিরকুট মিসেজটা পুড়িয়ে দিয়ে সে বলল— ফটোগুলো দেখুন।

কর্নেল ক্লেব বডেব ছবিগুলো দেখাল।

বন্ড সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানাল G।

ক্রনস্টিন লক্ষ করল— মহিলাদের প্রতি দুর্বলতা বডেবের, অতএব সমকামী নয়। অবশ্য ঘুষ নেয় না, সেটা সঠিক বলা মুশকিল। সব মানুষকেই কোনও-না-কোনও দামে কেনা যায়। তিন মাসের মধ্যে কাজ শেষ করা চাই— সুতরাং সময় কম।

G বলল— এবাব কর্নেল ক্লেব, আপনার বক্তব্য জানান।

মহিলার চোখে চৌকো চশমা। কর্কশ, নীরস গলা। নারীসুলভ কোনও কিছু নেই তার আচরণে।

— এর সঙ্গে সৌলজেনবার্গ কোসের কিছু মিল আছে। তাতে অবশ্য গুপ্তচরের বিকৃত কাম একটা বড়ো ব্যাপার ছিল। যাই হোক—

ক্রনস্টিন এইসব কথায় মন দিল না। ভাবল, এই মহিলাকে নিয়ে তাকে কাজ করতে হবে! ভয়ংকর মহিলা। তবে পোড়-খাওয়া মানুষ ক্রনস্টিন। দুনিয়ার লোক সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি নিজের দিক থেকে একেবারেই উদাসীন। এই মহিলাকেই স্টাডি করা দরকার।

এর পুরো নাম রোজা ক্লেব। প্রচণ্ড মানসিক শক্তি। নইলে মহিলা হয়ে এত উঁচুতে উঠত না। এবং এই ব্যবস্থার মধ্যে টিকে থাকতে পারত না। তবে খুবই কঠোর মহিলা। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় থেকে কাজ করছে। ডবল এজেন্টের কাজ খুব ভালো করতে পারে। আঁদ্রিয়াস

নির্ন এর কাছে ট্রেনিং পেয়েছে। কেউ বলে, নিনের রক্ষিতা ছিল। ১৯৩৫ ৩৭ কাজ ছিল, তারপর মস্কোর নির্দেশে নিনকে খুন করা হয়। গুজব আছে, ক্রেবই তাকে খুন করে। অর্থাৎ শিষ্যা কর্তৃক গুরু খুন! এরপর ক্রমশ উন্নতি। বেরিয়ার মৃত্যুর পর স্মার্শে 'অপারেশন ডিপার্টমেন্টের' চিফ হয় ক্রেব।

ক্রেবের অদ্ভুত যৌন চেতনা আছে। এক সময়ে সে নাকি ক্লীব ছিল— এটা বলা হয়ে থাকে। অদ্ভুত বিষয়টা এই, এখন ক্রেব - বা আগেই— যৌন আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু যে পুরুষের দ্বারা সে সেক্স উপভোগ করে, তার বা তাদের প্রতি তার কোনো অনুভূতি নেই, কোনো আন্তরিকতা নেই। যৌন-আকাঙ্ক্ষা তার কাছে একটা গায়ের চুলকানির মতো। তাকে যে চরম যৌন আনন্দ দেয়, তাকেও সে অনায়াসে খুন করতে পারে। আবেগ, ভাবপ্রবণতা এই সবের ঠাই নেই তার মনে।

সেদিক থেকে ক্রেব যৌন-উদাসীন। দেহ উপভোগে আনন্দ? হ্যাঁ, তা হয়। কিন্তু তাতে কী! এতে নিষ্ঠুরতা পোষণে বাধা কোথায়? এখন তার বয়েস প্রায় পঞ্চাশ। মোটা চেহারা, পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি হাইট। ইউনিফর্মের উপর দিয়ে তার দুই স্তনের রূপ বোঝা ভার। তবে, ক্রনস্টিনের চোখে মনে হচ্ছে, বিশাল বস্তুর মধ্যে একগাদা বালি ঠেসে ভরে রাখা হয়েছে।

ফরাসি বিপ্লবের সময় যেসব মহিলারা উল বুনতে বুনতে গিলোটিনে মৃত্যু দেখত, তারা বোধহয় রোজা ক্রেবের মতোই ছিল— ভাবল ক্রনস্টিন!

ক্রেবের বক্তব্য শেষ।

G জিজ্ঞেস করল— কমরেড ক্রনস্টিন কিছু বলবেন? এখন রাত দুটো। কিছু বলার থাকলে সংক্ষেপে বলুন। কাল অনেক কাজ।

ক্রনস্টিন বলল— কমরেড জেনারেল, ফুশে নামে একটা লোকের বক্তব্য উল্লেখ করছি। সে বলত— কোনও ব্যক্তি শুধু খুন করে করে কোনও লাভ হয় না যদি না সঙ্গে সঙ্গে তার সুনামটাকেও খুন করা যায়। এই বক্তব্য লোকটাকে খুন করা কঠিন ব্যাপার নয়, যে কোনো ভাড়াটে বুলগেরিয়ান খুনিকে বুঝিয়ে দিলেই কাজ হবে। কিন্তু লোকটার সুনাম ধ্বংস করা দরকার। সেটা বেশ কঠিন। ইংল্যান্ডের বাইরেও প্রেস এবং মিডিয়ার উপর তার প্রভাব আছে। অসাধারণ ইমেজ। একটা টোপ চাই। ইংরেজরা নিজেদের খামখেয়ালি আচরণ নিয়ে গর্ব করে। বস্তুর মনস্তত্ত্বের দিকটা দেখতে হবে।

— বেশ। কী করবেন?

— একটা চাঁদ ভাবব আমি। শিকারকে আগে সে ফাঁদে ফেলে ওর সব সুনাম, ইমেজ নষ্ট করব। তারপর একজন গুপ্তঘাতক নিয়োগ করে উপযুক্ত সময়ে—

একটু থেমে ক্রনস্টিন বলল— সুতরাং, আমাদের এই কাজে দরকার একটা যুবতি মেয়ে। খুব সুন্দরী মেয়ে!

॥ আট ॥

জুন মাস। সপ্তকোটা খুব সুন্দর।

তার চেয়েও সুন্দরী কর্পোরাল তাতিয়ানা।

তাছাড়া সে আজ দারুণ খুশি। মনে হয়, আজ তার জীবনে সবচেয়ে খুশির দিন।

মিস তাতিয়ানা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিভাগের কর্পোরাল। তার পুরো নাম তাতিয়ানা রোমানোভা।

এখন এই খুশির মূলে অবশ্য কোনো রোমান্টিক কারণ নেই। নদিও তার মনে যথেষ্ট রোমাঞ্চ আছে।

খুশির কারণ একটা নয়। সব কিছু মিলিয়ে। ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চয়তা নিয়ে সুখবর। প্রফেসর ডেনিকিন তার যে প্রশংসা করেছেন, রান্নাঘর থেকে সুস্বাদু খাবারের সুগন্ধ, রেডিওতে বাজছে মস্কো স্টেট অর্কেস্ট্রায় তার প্রিয় সুরকারের মিউজিক, বরিস গুডোনভের বাজনা। এবং সর্বোপরি— বসন্তকাল শেষ হওয়ার মুখে— এখন সুমধুর জুন মাস।

বিশাল ফ্ল্যাট বাড়িতে তার ছোটো ঘরটা যেন একটা বাস্তু। জায়গাটার নাম বিরাট— সাদা ভোয়া-চের্নোগ্রিয়াজস্কে উলিৎসার এই আটতলা বাড়িতে দু-হাজার ঘর। নানা পদের মহিলাদের আবাসন এটা। কর্পোরাল তাতিয়ানা রোমানোভার সার্জেন্ট থেকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগিয়েছে। ক্যাপ্টেন, মেজর হয়ে একসময়ে সে কর্নেল হবে— এই তার স্বপ্ন।

এখন অবশ্য একটা মাত্র ঘর তার। মাইনে মাসে ১২০০ রুবল্। খাবার সস্তা। মিনিষ্ট্রি তাকে ব্যালো ও অপেরার টিকিট দেয়।

সুগন্ধ রান্নার স্যুপটা পরীক্ষা করল সে।

তারপর আয়নার কাছে এসে দাঁড়াল। প্রথম যৌবনে এক বয়ফ্রেন্ড তাকে গ্রেটা গার্বোর সঙ্গে তুলনা কবেছিল। এখন তার কাঁধ পর্যন্ত চুল, ফর্সা, ত্বক, নীল চোখ। সুন্দর মুখশ্রী। গার্বোর মতোই একটু চওড়া অবশ্য। নিখুঁত ঠোঁট সদাহাস্যময়। বিখ্যাত ফিল্মস্টার গার্বো। তার সঙ্গে কি তার তুলনা হয়! তবুও—

খুশিমনে চুল আঁচড়ায় সে।

শুধু মুখ নয়, তার শরীরও খুব সুন্দর। লম্বা, সুগঠিত ফিগার! হাঁটার স্টাইলটা ছন্দোময়। লেনিনগ্রাদে একটা স্কুলে সে ব্যালো নাচ শিখেছিল। বরফ স্টেডিয়ামে স্কেটিং করত সে। হাত দুটি সুন্দর, দুই স্তন অপূর্ব, নিখুঁত মাপের, উদ্বৃত্ত। নিয়মিত এক্সারসাইজ করে, তাই পশ্চাদদেশটার পেশি সুদৃঢ়।

চিনেমাটির বাটিতে চামচ দিয়ে স্যুপ খাচ্ছে সে। চামচটা একটা পাটি থেকে চুরি করা।

খাওয়া শেষে সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসল। বাজে মিউজিক বাজছে এখন রেডিওতে। ক্লাসিকাল কিছু বাজলে ভালো লাগত।

হঠাৎ টেলিফোন।

— হ্যালো!

— কর্পোরাল রোমানোভা?

চেনা গলা। খুশি হল সে।

— হ্যাঁ, প্রফেসর।

ওপারে প্রফেসর ডেনিকিন। সাধারণত রোমানোভাকে সবাই চেনে।

— রোমানোভা, ঠিক সাড়ে আটটায় নং ২ ডিপার্টমেন্টের কর্নেল ক্লেবের সঙ্গে দেখা করবে। তোমারই বাড়ির আটতলায় সে থাকে, অ্যাপার্টমেন্ট নং ১৮৭৫। জানো বোধহয়।

— কী ব্যাপার কমরেড প্রফেসর, যদি একটু বলেন।

— আপাতত এর বেশি কিছু বলার নেই।

ওপারে লাইন অফ! কয়েকবার 'হ্যালো, হ্যালো' বলে রিসিভার রাখে সে। সমস্ত আনন্দ মাটি হয়ে যায়। তবে সরকারের নিয়মকানুনই এই রকম। যখন যেটুকু তার বেশি কথা বলা যাবে না।

কী জন্যে এই আহ্বান? সে কি কোনও অন্যায় করেছে? অসম্ভব। কোনো মস্তব্য, ঠাট্টা

তামাসা? মোটেই নয়। তবে কি চামচ চুরি করাটা ধরা পড়েছে? দূর, হাসাকর সব কল্পনা মনে ঢুকছে। তবে এটাও ঠিক, স্মার্স ডাকা মানেই সিরিয়াস ব্যাপার।

সাড়ে আটটায় যেতে হবে। আটতলায়।

এখন আটটা তেইশ, মানে সাত মিনিট বাকি!

পোশাক পালটাতে ব্লাউজের বোতাম খুলল। প্যারেডের ইউনিফর্মটাই পরতে হবে। সব সময় মাথায় ঘুরছে এই অশুভ রহস্যটার কথা! স্মার্স মানে 'গুপ্তচরদের মৃত্যুদণ্ড'। এই কথাটা কেউ উচ্চারণই করে না, বরং ঘৃণা করে, ভয় পায়।

২নং বিভাগটা তো আরও ভয়াবহ। বলা হয়, যন্ত্রণা ও মৃত্যুর বিভাগ।

আর রোজা ক্লেব! ওঃ, সে তো এক জীবন্ত দুঃস্বপ্ন। তাতিয়ানা তার কথা কল্পনা করেই শিউরে ওঠে। ক্লেব যে কত নিষ্ঠুর, কথা আদায়ের জন্য তার মাথায় উৎপীড়নের যে কত অদ্ভুত আইডিয়া খেলে, ভাবাই যায় না। তার নাম শুনলে সবাই মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করে। টুলের উপর মুখ রাখত অপরাধীরা। ক্লেব নানা ধরনের শাস্তি জানত। তার কোড নং— ১, ১৫, ২৫, ৩৬ বা ৬৪। অপরাধীরা যখন আর্তনাদ করত, ক্লেব মিষ্টি গলায় বলত— আহা, বাছা, সোনামণি, ব্যথা লাগছে। আহা, এখুনি কমে যাবে, বলে ফেলো, যা জানো, ঝটপট বলে ফেলো। এখুনি সেরে যাবে। তুমি শাস্তিতে ঘুমবে, নরম বিছানা পাতা আছে। কথা বলো, যা জানতে চাইছি বলে দাও, লক্ষ্মী সোনা মানিক আমার!

শুধু তাই নয়। কোনো দুর্বিনীত যদি এতেও হার না মানত, ক্লেব বলত— ইস, তুমি কি দুষ্টু, তাহলে তো তোমার উপর ৮৭ নং আইটেম প্রয়োগ করতে হয়।

সেই যন্ত্রণা সহ্য করা অসম্ভব। সূতরাং স্বীকারোক্তি আদায় করার ব্যাপারে ক্লেব-এর জুড়ি নেই।

শোনা যায়, ক্লেব নাকি কাঁদত, মায়ের মতো। অপরাধীরা বোকা বনে যেত! এ আবার কী বে বাবা!

অপরাধীদের রক্ষে ক্লেব-এর গাউন ভিজে যেত।

স্বীকারোক্তি আদায়ের পর ক্লেব সেই রক্তাক্ত গাউন খুলে পোশাক পালটে টেবিলে বসত। যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে কাজকর্ম শুরু করত।

তাতিয়ানা হাতঘড়ি দেখে। আটটা ছবিশ। চার মিনিট বাকি।

আয়নায় দেখল নিজেই মুখ। কিছুক্ষণ আগের হাসিমুখ এখন ফ্যাকাসে।

লিফটে উঠে বেল টিপল সে।

আটতলায়।

ছোটবেলা থেকে যাকে বহুদিন ডাকা হয়নি, তাকেই মনে মনে সে স্মরণ করতে থাকল--
হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, দোহাই তোমার—

॥ নয় ॥

দরজাটায় নেমপ্লেট নেই।

ক্রিম রং, অদ্ভুত একটা বিশেষ গন্ধ।

ঘরে ঢোকান আদেশ এল। মাঝখানে একটা বড়ো টেবিল। এক মহিলা। হলুদ চোখ। ক্যামেরার লেন্সের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে।

ক্লেব বলল— কমরেড কর্পোরাল, সত্যিই তুমি বেশ সুন্দরী। আচ্ছা, ঘরের মধ্যে একটু হাঁটাচলা করো তো।

এব মানে কী? গলাব সুর অবশ্য মিষ্টি। কিন্তু যত মিষ্টি, ততই তো ভয়ের ব্যাপার হয়।
তাতিয়ানা টান হয়ে পায়চারি শুরু করল।

ক্রুব বলল— জ্যাকেটটা খোলো। চেয়ারে রাখো। মাথাব ওপর হাত তোল। হ্যাঁ, কিন্তু
আরও ওপরে। নীচু হয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল টাচ করো তো। এবার সোজা হয়ে দাঁড়াও। বাঃ,
চমৎকার! এবার বসো।

তাতিয়ানা পুতুলের মতো বসল।

ক্রুব টেবিলের কাগজপত্র ঘাঁটতে থাকল। একটা ফাইল নিল। বেশ মোটা ফাইল। এটা কি
আমার সম্পর্কে— ভাবল তাতিয়ানা।

অরেঞ্জ রঙের মলাট ফাইলটার। পাতা ওলটাচ্ছে ক্রুব।

ক্রুব ফাইল দেখা শেষ করে বলল— কর্পোরাল রোমানোভা, তোমার সম্পর্কে সব
রিপোর্টই ভালো। ভালো ডিউটি করেছ, খেলাধুলা ভালো জানো। স্টেট তোমার উপর খুশি।

অনেক কষ্টে তাতিয়ানা বলল— আ-আ-আমি কৃতজ্ঞ, কমরেড কর্নেল!

— একটা বড়ো কাজের জন্য তোমাকে ঠিক করা হয়েছে। কাজটা তোমার পক্ষে
সম্মানেরও। বুঝেছ?

— বুঝেছি, কমরেড কর্নেল।

— কাজটা ঠিকমতো করলে তুমি প্রমোশন পাবে। অভিনন্দন!

তাতিয়ানার বয়েস এখন চক্কিশ। সে অবাক। তবে প্রচণ্ড ভীত সে। কেমন কাজ কে জানে।
কোনো মতে বলল— আমি সম্মানিত বোধ করছি, কমরেড কর্নেল।

হঠাৎ ক্রুবের কণ্ঠস্বরে মধু ঝরে পড়ল।

— ইস! আমার কী ভুলো মন! তোমার প্রমোশনের খুশিতে একটু ড্রিংকস করা যেতেই
পারে। কী বলো। কখনও ভেব না সিনিয়র অফিসারেরা হৃদয়হীন। আরে, তারাও মানুষ।
এসো, একসঙ্গে একটু চুমুক দেওয়া ঠাক। এক বোতল ফরাসি শ্যাম্পেন আছে আমার কাছে।

উঠে একটা আলমারি খুলল ক্রুব।

— এই দেখ, কী সুন্দর একটা চকোলেট। খাও, খাও। আমি ততক্ষণ কর্কটা খুলি। ওঃ,
শ্যাম্পেনের ছিপি খোলা এক ঝামেলা! ছেলেরাই ভালো পারে এসব কাজ! যাই হোক, তবু—

শ্যাম্পেনের গেলাস হাতে চিয়াঁস করল ক্রুব— আন্তরিক অভিনন্দন, কমরেড তাতিয়ানা!

তাতিয়ানা এতক্ষণে সামলে নিয়েছে। বুঝে নিয়েছে কী আচরণ করা তার দরকার। মিষ্টি
হেসে সে শ্যাম্পেনের অনেকখানি পান কবাব আগে প্রত্যুত্তর দিল— অভিনন্দন, কর্নেল,
আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

গেলাস খালি হয়ে গেল শীঘ্রই।

আবার এক বাউন্ড গুঁড়কামনা জানানোর পালা শেষ হল।

ক্রুব বলল - হ্যাঁ, এবাব কাজের কথা। কখনও বিদেশে যাবার কথা ভেবেছ? সেখানে
গিয়ে থাকার কথা?

— না। আমি মস্কোতেই বেশ আছি।

— বিদেশেও বেশ থাকা যায় যদি তোমার মনমতো সব কিছু পাও। যাই হোক, স্টেট
চাইছে তোমাকে বিদেশে পাঠাতে।

-- তাহলে অবশ্যই যাব।

-- খুশি মনে যাবে তো?

-- স্টেটের আদেশ তো মানতেই হয়।

অর্থাৎ, প্রশ্নটার পরোক্ষ উত্তর দিল তাতিয়ানা। তার নিজের ইচ্ছের কথা জানাল না। ক্লেব এবার মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল— কমরেড, তুমি কি এখন ভার্জিন? কুমারী? একটু ভেবে আবার ঈশ্বরকে স্মরণ করল তাতিয়ানা।

— না, কমরেড কর্নেল।

— ইতিমধ্যে ক'জন পুরুষ জীবনে এসেছে?

ভীষণ লজ্জা পেল তাতিয়ানা। মুখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু ক্লেবের হলুদ চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল— এসব প্রশ্ন হঠাৎ—

ধমকে উঠল ক্লেব। এবার তার গলা অন্যরকম— ভুলো না কার সঙ্গে কথা বলছ। আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

তাতিয়ানা সঙ্কপ্ত— তিন জন।

— কবে? কতদিন আগে? তখন তোমার বয়েস কত?

— স্কুল জীবনে। বয়েস তখন ১৭। তারপর ইনস্টিটিউট অব ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস-এ, ৩খন বয়েস ২২। স্কেটিং করার সময় আলাপ।

একটা প্যাড আর পেনসিল নিয়ে ক্লেব বলল— তাদের নাম বলো।

তাতিয়ানা এবার কেঁদে ফেলল— না, না, তাদের নাম বলতে পারব না। এমন প্রশ্ন করার অধিকার আপনার নেই। এটা ব্যক্তিগত—

আবার ধমক।

— ন্যাকামি করো না। আমায় নিয়ে খেলা করো না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমার মুখ থেকে নামগুলো বেব করতে পারি আমি!... ঠিক আছে, আজ থাক। কাল নামগুলো জানিও। এবার কয়েকটা মামুলি জিজ্ঞাসা। চোখ মুছে উত্তর দাও।

আবার মধুর কণ্ঠ।

— একটু শ্যাম্পেন খাও। সুস্থির হও। তোমার গোপন কথা আমার কাছে গোপনই থাকবে। আমি তোমার মায়ের মতন তানিয়া।

তানিয়া! হ্যাঁ, এই সম্বোধন ক্লেবের মুখে প্রথম। তাতিয়ানাকে অনেকে তানিয়া বলে ডাকে, যারা তার কাছের লোক।

কম্পিত হাতে শ্যাম্পেনের গেল্লাসে চুমুক দিল সে।

— পুরোটা খাও।

ক্লেবের অভিনয় চলছে।

— লক্ষ্মী মেয়ে, এবার আর একটা মাত্র গোপন প্রশ্ন করব। তুমি প্রেম করতে ভালোবাস? কেমন লাগে তোমার প্রেম করতে?

তাতিয়ানা আবার দু'হাতে মুখ ঢাকল। নীচু গলায় বলল— হ্যাঁ, যদি ভালোবাসা হয়—

— ধর, যদি ভালোবাসা না হয়? মানে এমন কেউ যাকে তুমি ভালোবাস না। তার সাথে কি তোমার দেহ দান করে প্রেম করতে ভালো লাগবে?

এবার মুখ থেকে হাত সরাল তাতিয়ানা। মাথা অবশ্য নীচুই রয়েছে।

-- কমরেড কর্নেল, সেটা নির্ভর করছে লোকটা কেমন তার ওপর।

— বাঃ ফাইন! খুব বুদ্ধিমতীর উত্তর এটা।

ড্রয়ার থেকে একটা ফটো বের করল ক্লেব। এগিয়ে দিয়ে বলল— যেমন ধর, এই লোকটা।

তাতিয়ানার হাতে ফটোটা। দেখার আগে মনে হয়েছিল, হাতে যেন আঙুন লাগবে।

নিজেকে সামলে নিল। হ্যান্ডসাম চেহারা, কিন্তু মুখটা কঠোর। নিষ্ঠুরণ্ড বলা যায়। কিছুটা কল্পনা করবারও চেষ্টা করল। ছবিটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল— বলা মুশকিল। লোকটা দেখতে ভালো... যদি নিষ্ঠুর স্বভাবের না হয়...

— ছবিটা তোমার কাছেই রেখে দাও তানিয়া। বিছানার পাশে রেখে লোকটার কথা ভাববে। তোমায় নতুন যে কাজটা দেওয়া হচ্ছে, সেটা এই লোকটাকে নিয়েই। জেনে রাখ, রাশিয়ার সব মেয়েদের মধ্যে তোমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

— কাজটা কী কমরেড কর্নেল?

— কাজটা ভালো। তোমার ভালো লাগা উচিত। ক্রোমায় প্রেমে পড়তে হবে। আমি জানি, তুমি ঠিক পারবে। এই লোকটার প্রেমে পড়তে হবে। একজনেরই। পারবে তো?

— কিন্তু কে এই লোকটা? আমি তো একদমই চিনি না একে।

— একজন ইংরেজ গুপ্তচর।

এতখানি শ্যাম্পেন খাওয়ার পর তাতিয়ানা অবশ্যই কিছুটা নেশাগ্রস্ত। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল— হা ঈশ্বর!

কথাটা বলেই সে ভয় পেল। এই কথাটা উচ্চারণ করলে কি বিপদ হবে?

রোজা ক্রুব বলল— লোকটা খুব সম্ভব ইংল্যান্ডের পয়লা নম্বর গুপ্তচর। তবে এর সঙ্গে প্রেম করার কাজটা কিন্তু খুব সিরিয়াস। কোন ভুলচুক করলে স্টেট তোমাকে ক্ষমা করবে না!... সোজা হয়ে বস। যা যা বললাম, সবকিছু বুঝতে পেরেছ? না বুঝলে তোমার ভীষণ বিপদ।

সোজা হয়ে বসে তাতিয়ানা বলল— বুঝেছি।

— পরে আরও বিশদভাবে বলব। এখন কয়েক সপ্তাহ তোমাকে আদবকায়দা শিখতে হবে। বিদেশীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয়। কেমন সুন্দর সুন্দর পোশাক পরতে হয়, তাদের মন জয় করবার জন্য কী কী বলতে হয়— এরপর তুমি ইউরোপ যাবে। এর সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে, এর মন জয় করতে হবে। সবসময় মনে রাখতে হবে, তোমার দেহটা কিন্তু তোমার নয়। এটা রাষ্ট্রের সম্পত্তি। রাষ্ট্রের জন্য তুমি তোমার দেহ ব্যবহার করবে। যখন যতখানি যতদূর প্রয়োজন।

ক্রুব উঠে দাঁড়াল। বলল— আপাতত কাজের কথা শেষ। এবার আমরা গল্প করব। চকোলেট খাও। আমি আসছি।

তাতিয়ানা এবার ঘরে একা। কাজটা সম্মানের, এবং এমন কিছু কঠিন নয়। রাশিয়ার সব মেয়ের মধ্যে তাকে পছন্দ করা হয়েছে। এটা সত্যিই সম্মানের ব্যাপার। সেই অর্থে সে কৃতজ্ঞ। তাছাড়া কাজটা ভালো লাগছে। ইংরেজ গুপ্তচরের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করার কাজ।

দরজা খোলার শব্দ। এটা ক্রুবের বেডরুমের দরজা।

— এস।

ঘরের মধ্যে ঢুকল তাতিয়ানা।

— কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?

রোজা ক্রুবের পরনে একটা পাতলা গাউন। তার নীচে গোলাপি ব্রেসিয়ার। সত্যি কথা বলতে, এখন তাকে মনে হচ্ছে, পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত একটি বৃদ্ধা বেশ্যা।

ক্রুবের কণ্ঠে এবার আদেশের সুর— আলো নিভিয়ে আমার কাছে এসে বস।

তাতিয়ানা আলোটা নেভাল ঠিকই, তারপরেই বেরিয়ে এসে শ্রাণশে করিডর দিয়ে ছুটতে

থাকল। ভেবেছিল একটি বিরাট গর্জন শুনতে পাবে। শোনা গেল না, কারণ সে দু'হাতে নিজের কান চেপে ধরেছিল।

॥ দশ ॥

পরদিন সকালে নিজের টেবিলে বসে ইউরোপের কতগুলি ম্যাপ দেখছিল ক্রেব। টেপে কতগুলো সাংকেতিক বার্তা আসছিল। ক্রেবের মুখ তখন গম্ভীর। চোখের তলায় ফোঁস্কা।

তার অনুমতি নিয়ে একটি লোক ঘরে এল।

রেড গ্রান্ট।

ঘরের মধ্যে ফ্রনস্টিন আগেই উপস্থিত ছিল। সোফায় বসে দাঁত খুঁটছিল। সে এবার আগন্তকের দিকে তাকাল।

রেড গ্রান্ট নগ্নভাবে টেবিলের কাছে এল। এখন তাকে দেখে মনে হবে, একটা ক্ষুধার্ত কুকুর খাবারের অপেক্ষায়, কিন্তু মালিকের আদেশ পায়নি বলে নিজেকে সংযত রেখেছে।

ক্রেব বলল— তুমি কাজের জন্য তৈরি তো?

— হ্যাঁ কমরেড কর্নেল।

— আগে তোমায় দেখি। জামাকাপড় খুলে ফেল।

রেড গ্রান্ট নির্বিকার। কোর্ট, জামা, জুতো— সবই একে একে খুলে ফেলল। বিশাল বাদামি শরীর, লাল চামড়া। সোনালি চুল, যেন আট ক্লাসের মডেল দাঁড়িয়ে।

ক্রেব উঠে দাঁড়াল। গ্রান্টের গা টিপে টিপে পরীক্ষা করতে থাকল। যেন ঘোড়া কিনছে, তারই পরীক্ষা! তারপর নিজের পোশাকের মধ্যে থেকে কী যেন একটা বের করে হাতে নিল। ফ্রনস্টিন দেখতে পেল— একটা চকচকে ধাতব পদার্থ।

ঘুরে গিয়ে ক্রেব তার তলপেটে ধুলো ঝাড়বার ব্রাশটা দিয়ে সজোরে মারল তার শরীরের মধ্যভাগে।

যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল আচমকা আঘাতে। কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য মাত্র! চোখ বুজে সামলে নিল। পরক্ষণেই চোখ খুলে কটমট করে তাকাল ক্রেবের হলুদ চোখের দিকে। যেখানে আঘাত লেগেছে, বুকের হাড়ের সেই জায়গাটা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। অন্য যে কোনো লোক এই আঘাত পেলে মাটিতে লুটিয়ে কাতরাতে থাকত।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গ্রান্ট। ক্রেব যন্ত্রটা পকেটে পুরে চেয়ারে এসে বসল। ফ্রনস্টিনের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল— সত্যিই লোকটির যথেষ্ট সহ্যশক্তি আছে, তাই না?

ফ্রনস্টিন মাথা নেড়ে স্বীকার করল।

ক্রেব বলল— কমরেড গ্রানিৎস্কি (গ্রান্টকে এই নামটাই দেওয়া হয়েছে), তোমায় একটা বিশেষ কাজ দেওয়া হচ্ছে। সফল হলে মেডেল পাবে। যাকে তুমি খুন করবে, সেও অতি ডেঞ্জারাস লোক। তুমি বিদেশে যাবে, একা। সাহায্য করার কেউ নেই।

— বুঝেছি কমরেড কর্নেল।

গ্রান্টের চোখ জ্বলজ্বল করছে। সে ভাবছে, কল্পনা করছে, মেডেলটা কি 'অর্ডার অব লেনিন'?

— একজন ইংরেজ গুপ্তচর। তাকে তুমি খুন করবে। ঠিক আছে?

— অবশ্যই।

ইংরেজদের ওপর বরাবরের আক্রোশ গ্রান্টের।

ক্রেব বলে— কয়েক সপ্তাহ তোমাকে কিছু ট্রেনিং নিতে হবে। ইংরেজ এজেন্টের ছদ্মবেশে

কাজ করবে তুমি। তোমাকে ভদ্র ব্যবহার শিখতে হবে। এখানে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক আছেন, তিনিই তোমাব গর্ডেপটে ঠিক করবেন। তোমার হাবভাব চেহারা ভালো নয়। তবে তোমাকে বানিয়ে নেওয়া হবে। ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্র বিভাগের প্রাক্তন কর্মচারীটি তোমাকে পুরোপুরি শিক্ষিত করে তুলবেন। যদিও কাজটা করতে হবে আগস্টের শেষ দিকে। পোশাক পরে আমার অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে যাও। বুঝলে কিছু?

জ্যাকেটের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল— হ্যাঁ, সব বুঝতে পেরেছি। ধন্যবাদ কমরেড কর্নেল। গ্রান্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অন্য কোনো প্রশ্ন না করে।

রোজা ক্রুব বেশ আরাম কবে বসে বলল— কমরেড ফ্রনস্টিন, কমরেড জেনারেল গ্রুবোজাবয়শ্চিকভকে আপনাব প্ল্যানটা সব বলেছি। কাজ সারবার সব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে। প্রেসিডিয়ামও শেষ করবার মতো দিয়েছেন। অ্যাকশন স্কোয়াডও তৈরি। এখন, আপনি নতুন কিছু বলবেন?

ফ্রনস্টিন-এর শিরা দপদপ কবছে। সে বলে— গ্রানিৎস্কি লোকটাকে আমরা কি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি?

ক্রুব বলে— দশ বছর ধরে তাকে নজরে রাখা হয়েছে। নেশাখোররা যেমন নেশা ছাড়তে পাবে না, ঐ গ্রানিৎস্কিও তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ছেড়ে যেতে পারে না। বিশ্বাসযোগ্য ঘাতক আমার কাছে।

— আর বোমানোভা মেয়েটি?

বিরক্তির ভাব নিয়ে বলে— মেয়েটি সুন্দরী হলেও ওর মধ্যে সেন্সচুয়াল ব্যাপারটা এখনও সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু ভদ্রতা জানে রোমানোভা। আমাদের হয়ে সে কাজ করতে ভীষণ আগ্রহী। কাজের ব্যাপারে সে দারুণ সতর্ক। তবে তাব কয়েকজন আত্মীয়ের ঠিকানা আমাদের হাতে রয়েছে। আশ্চর্য, তার মধ্যে কয়েকটা বাচ্চাও রয়েছে। তার কিছু পূর্ব প্রেমিকও আছে। প্রয়োজন হলে তাদের জামিন হিসাবে বেখে দেব। মেয়েটার ঠাকুরদা ঠাকুয়ার সঙ্গে রাজ পরিবারেব যোগাযোগ ছিল। তাহলে তো আমাদেরব অনেকেই পূর্বপুরুষরা অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন।

— হ্যাঁ, আমাব পূর্বপুরুষের নামও ছিল রোমানোভা। যাকগে, এই বন্ড লোকটার কোনও পরিচয় পাওয়া গেছে?

— ইংল্যান্ড থেকে MGB জানিয়েছে, লন্ডনে বন্ড দিনে অফিসে যায়। রাতে সে লন্ডনেব চেলসির ফ্ল্যাটে ঘুমোতে যায়।

ফ্রনস্টিন বলে— একটা ভালো খবর দিলেন। মনে হচ্ছে, আপাতত তাব হাতে, কোনো কাজ নেই এখন। তবে ওখানেই তাকে গিয়ে ছোঁয়া ঠিক হবে না। আমি ভেবে দেখলাম, ইসতানবুলে ওদের একটা ছোটোখাটো অফিস আছে। ওখানে আমাদের লোকজনও রয়েছে। ইসতানবুল অফিসের কর্তাকে হাপিস করা খুব একটা কঠিন হবে না।

— লন্ডন বেশি দূরে নয়— সেখানেই বন্ডকে খতম করা হবে। মেয়েটির সঙ্গে বন্ডের কেমন ও কীভাবে যোগাযোগ হবে, সেটা পরে ঠিক হবে। প্রথম যোগাযোগটা ফ্রান্স বা কাছাকাছি কোথাও হলে ভালো হয়। ফরাসি প্রেসকে কাজে লাগানো হবে।

— এর পরেই গ্রানিৎস্কি কাজে যোগ দেবে। সেই সময়টাও কখন, পরে ভাবা হবে। এখন ক্যামেরামান ও অন্যান্য সহকারীদের বাছাই করা দরকার। তারপর তাদের ইসতানবুলে পাঠাতে হবে। সব বিভাগকেই সতর্ক করে দিতে হবে, টার্কির সঙ্গে রেডিওতে খবর চালাচালি দরকার।

কিন্তু ব্রিটিশ দালালরা যেন তাতে আড়ি পাততে না পাবে। একটা মেশিন আছে, SPEKTOR, সেটা কাজে লাগবে।

ক্লেব বলল— কমবেড আমি একমত। কাজটা শুরু করবাব জন্য যথাযথ অর্ডার আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমি কৃতজ্ঞ।

ফ্রনস্টিন সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে বেরিয়ে গেল।

ক্লেব ফোন তুলল।

— কর্নেল ক্লেব বলছি। সবাই তৈরি হও। আমাদের কাজ শুরু হবে। আমাদের টার্গেট ইংরেজ স্পাই জেমস বন্ড।

॥ এগারো ॥

১২ই আগস্ট, বৃহস্পতিবার। সকাল সাড়ে সাতটা।

কিংস রোডের ফ্ল্যাটে বন্ডের ঘুম ভাঙল। গৃহকর্ত্রী জানাল— ব্রেকফাস্ট রেডি।

বন্ডের মনটা ভালো নেই। প্রায় একটা বছর ঘটনাহীন কাটছে। অত্যন্ত একঘেয়ে। লোকে বলবে, শান্তি। কিন্তু এই শান্তিতে বন্ডের দম বন্ধ হয়ে আসে।

চাদরের তলায় বন্ডের নগ্ন দেহ। সেই দেহেও জংকার পড়ার উপক্রম। একমাত্র অতিরিক্ত ব্যায়াম করে আর বারবার স্নান কবে শরীরটাকে ঠিক রাখতে হচ্ছে। কিন্তু কর্মহীন শরীরকে কতখানি আর ঠিক রাখা যায়! অনেকদিন তেমন কোনো কাজ নেই বন্ডের যাতে শরীরটায় নড়াচড়া পড়ে, মগজটাও চনমনে হয়ে ওঠে।

ব্রেকফাস্ট খেতে বসল বন্ড। মে এসে দাঁড়াল। বয়স্কা মহিলা, চুল পাকলেও মুখটা সুন্দর।

— শুড মর্নিং স্যার!... টেলিভিশন বিক্রি করবার জন্য সেই লোকটা কাল বাতে এসেছিল।

— ও সেই নাছোড়বান্দা সেলসম্যানটা। কাল অবশ্য তাড়িয়ে দিয়েছি। বলেছিলাম, পরিচয়পত্র কই? তাতেই পালিয়েছে।

বন্ড বলে— তোমার ধমকে কাজ হবে। আর আসবে না।

ব্রেকফাস্টে কালো কড়া কফি, একটি সেদ্ধ ডিম এবং মধু।

বন্ড কিছুক্ষণ স্টিফানির স্মৃতিতে মগ্ন থাকে। সেই মুনরেকারের ঘটনার সঙ্গিনী। তারপর আর কোনো বান্ধবী জোটেনি বন্ডের। কাজ না থাকলে বান্ধবী পাওয়াও মুশকিল।

এদিকে M-এর মেজাজও ভালো না। হঠাৎ একটা কড়া নোট পাঠিয়ে বন্ডকে জানালেন, তাকে একটি তদন্ত কমিটিতে নেওয়া হয়েছে। কমিটির নেতা পে-মাস্টার ক্যাপটেন ট্রুপ। ৪১২নং ঘরে বন্ডকে উপস্থিত হতে হবে, সময় দুপুর আড়াইটে।

ওঃ ট্রুপ! এই লোকটা সবাইকে জ্বালাতন করে।

অবশ্য সব প্রতিষ্ঠানেই একটা করে ট্রুপ থাকে। বিভাগীয় প্রধান, তাকে সবাই চূড়ান্ত অপছন্দ করে। অথচ তাকে বাদ দিয়ে কোনো কাজ সম্ভব নয়। হিসেব-নিকেশ, ছুটি-ছাটা, কাজে ফাঁকি এবং কাজে পটুতা, সময়মতো অফিসে আসা, ক্যান্টিন— ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে যে লোকটাকে নজর রাখতে হয়, তার ব্যবহার নরম-কোমল হওয়া মুশকিল। সুতরাং বহু লোক চটবে, বহু ধান্দাবাজ তার শত্রু হবে— সেটাই স্বাভাবিক। তাকে ছোটোখাটো ডিস্ট্রেক্টরের ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাই সে-ও ক্ষমতা খাটায়।

এই গুপ্তচর দপ্তরে পে-মাস্টারের পদে রয়েছে এই লোকটা, যার নাম ট্রুপ। একদা নৌবাহিনীর অফিসার, বহুদিন হল রিটায়ার করেছে। এই বিভাগের 'শাসন'-শাখার প্রধান সে।

বলা যায়, সবার সঙ্গেই তার খিটিমিটি, বিরোধ। ইস, M আর লোক পেল না! বন্ডের সঙ্গে আগেও ট্রুপের তর্কাতর্কি হয়েছে। বন্ড বলেছিল— M-15 এবং গোয়েন্দা বিভাগকে যদি পারমাণবিক যুগের 'ইনটেলেকচুয়াল' গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়, তবে ভারতীয় আর্মির রিটার্ডার্ড অফিসাররা সে কাজ পারবে না।

উত্তরে ট্রুপ বলেছিল— তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠানে লম্বা চুল বিকৃত যৌন কামনার লোক নিয়োগ করতে হয়। কারণ সমকামীরা বিভাগের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ— এটা বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করে। কিন্তু আমি বুঝতে অক্ষম— ঝাঁকড়া চুল সেন্ট মাথা মেয়েলি পুরুষরা কী করে আমেরিকানদের কাছ থেকে তথ্য পাবে!

বন্ডও ছাড়বার পাত্র নয়।

— সব বুদ্ধিজীবী সমকামী নয়। অনেকের মাথায় টাক থাকে। তারা যদি—

তর্কটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গিয়ে হালকা হয়ে গিয়েছিল।

তবে কমিটির লোকেরা ট্রুপের সমর্থক।

আজ সেই ট্রুপের সঙ্গেই তাকে—

বন্ড ভাবছিল— যাই হোক, যদি এক মাসের একঘেয়েমিটা কাটে, তাতে ভালোই হবে।

সকাল নটা। গাড়িতে উঠল সে।

কেন জানি মনে পড়ল একটা বহুশ্রুত প্রবাদ। 'ঈশ্বর যাকে ধ্বংস করতে চান, তাহলে প্রথমে তাকে মানসিক একঘেয়েমির মধ্যে ফেলেন।'

॥ বারো ॥

কমিটির রিপোর্টে এই মুহূর্তে বন্ডকে সই করতে হল না।

হঠাৎ লাল ফোনটা বাজল। মানে M, বড়োকর্তার ফোন।

বন্ড বলল— 007 স্পিকিং!

বড়োকর্তার গলা— একবার এসো।

— M?

— হ্যাঁ।

— ব্যাপারটা কী— ধরতে পেরেছেন?

— পেরেছি। তুমিও শুনলে চমকে উঠবে। তবে ওদের কাছ থেকেই শোনা ভালো।

তাহলে কি একঘেয়েমি থেকে মুক্তির দিন আসছে? আবার বন্দুক-পিস্তলের দিন শুরু হবে?

M-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি মিস মানিপেনির চোখে গোপন রহস্য।

— 007 এসেছেন, স্যার।

— পাঠিয়ে দাও।

লালবাতি জ্বলে দেওয়া হল। অর্থাৎ ঘরে এখন আর কেউ ঢুকবে না।

M বললেন— একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন আছে। কিছু মনে করবে না তো?

— না, স্যার!

— তোমার বন্ধু মিস কেস সম্পর্কে। হিরে সংক্রান্ত ঘটনার পর তুমি ওর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করছ বলে শোনা যাচ্ছে। তোমরা নাকি বিয়েও করতে পারো? ব্যাপারটা কি সত্যি?

— হ্যাঁ স্যার! আমাদের বোঝাপড়া ঠিকই ছিল, বিয়ের কথাও একবার ভেবেছিলাম। তবে

ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে। মিস কেস একজন নেভির মেজরকে বিয়ে করবে। ভালো লোক। ওরা দুজনেই আমেরিকা চলে গেছে। এখন এটা ক্রোজড চ্যাপ্টার!

— আই অ্যাম সরি, জেমস! তবে আমার মতে, ভালোই হয়েছে। তুমি যদি এখন বিয়ে করতে, তাহলে এই কাজটাতে তোমায় ডাকা যেত না।

কাজটা কী— জানার জন্য উদগ্রীব বন্দ!

পাইপ ধরিয়ে M বললেন— ইস্তানবুলের খবর। আমাদের তুরস্কের স্পাই সেন্টার T-এর প্রধান একটা উড়ো চিঠি পেয়েছে। টিভিতে বলা হয়েছিল সে যেন সঙ্গে আটটার ফেরি স্টিমারে গালাটা ব্রিজ থেকে বসফোরাস পর্যন্ত একটা টিকিট কাটে। শুধু এইটুকু! T খুব ডেয়ারিং লোক! সে স্টিমারে চড়ে ডেকের রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে একটা অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে তার কাছে আসে। রাশিয়ান গার্ল। প্রথম আলাপে কিছু মামুলি কথা হয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্টিমারের অবস্থা ইত্যাদি। তারপরেই হঠাৎ মেয়েটি অন্য একটি বিষয়ে কথা তোলে। সেটাই খুব বিস্ময়কর।

বন্দ জিজ্ঞেস করে— T-এর প্রধান কে? আমি কখনও টার্কি যাইনি।

— লোকটার নাম ডার্কো করিম, সবাই এককথায় করিম বলেই তাকে চেনে। মিশরবন্ধু— বাবা তুর্কি, মা ইংরেজ। বহুদিন ধরেই T-এর চিফ। আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান লোকদের একজন। বুদ্ধিমান, গোটা পৃথিবীটার বহু বিষয় তার জানা।

M পাইপের ছাই বেড়ে বলেন— এবাব মেয়েটার ব্যাপার বলি। সে MGB-র কর্পোরাল ছিল। বহুদিন সেখানে চাকরি করছে। এখন ইস্তানবুলে সিগন্যাল শাখায় অফিসার হয়ে এসেছে। অনেক কষ্টে এই বদলিটা সে ম্যানজেজ করেছে। রাশিয়া থেকে ভাগতে চায়। প্রথম ধাপ এই। সে ইংল্যান্ডে আশ্রয় চাইতে পারে।

বন্দ বলে— বেশ। সিগন্যালের কাজ জানা মেয়ে আমাদের উপকারে আসতে পারে। কিন্তু ইংল্যান্ডে থাকতে চায় কেন?

— কাবণ, সে প্রেমে পড়েছে।.. সেই প্রেমিক হচ্ছে জেমস বন্দ!

জেমস চমকে ওঠে— আমার প্রেমে?

— হ্যাঁ। তার নামটা কি শুনেছ? তাতিয়ানা রোমানোভা।

— না স্যার, এমন নাম জীবনে শুনিনি। আশ্চর্য! এর মানে কী? কোথায় আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল? আমার কথা জানল কী করে?

— আরে, হাস্যকর ব্যাপার। তবে চব্বিশ বছরের একটা মেয়ে এ ধরনের পাগলামি করতেও পারে। MGB-র সেন্ট্রাল ইনডেস্ট্রি তোমার কথা জেনেছে মনে হয়। তোমার সম্পর্কে একটা ফাইলও আছে ওদের কাছে। তোমার অনেক ফটোও আছে। ধরে নাও, তোমার ছবি দেখেই সে প্রেমে পড়েছে। পরিচয় জেনেছে। এবং তোমাকে খুঁজতে এসেছে। তার কাছে তুমি অসাধারণ পুরুষ!

— আমি মেয়েটাকে দেখতে চাই।

— আগে সব কথা শুনে নাও। লেরমন্ট নামে এক রুশ লেখক তার খুব প্রিয়। সেই লেখকের বই-এর নায়কের সঙ্গে তোমার মিল আছে। সেই নায়ক জুয়া খেলত, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করত, এবং সব বিপদ জয় করত।

— এ তো উদ্ভট কাহিনি। T-এর প্রধান কি মেয়েটির কথা বিশ্বাস করেছে?

— আরে দাঁড়াও। ঝটপট কোনো কিছু ধরে নেবে না, সিদ্ধান্তও নেবে না। পৃথিবী বড়ো বিচিত্র, বহু কিছু মানুষের, অভিজ্ঞ মানুষেরও অজানা। মেয়েটার মনস্তত্ত্বটাও ভাবতে হয়। মস্কোভে যখন কাজ করত, সেখানে কোনও পুরুষ নেই। অস্ত্রত ইমপ্রেস করার মতো কেউ নেই। ফাইলে তোমার একটা দারুণ 'তেজস্বী' ছবি আছে। তাই দেখেই ওর মাথা খারাপ হয়ে

যায়। ভগবান জানেন, আমার প্রেম সম্পর্কে জ্ঞান অতি সামান্য। তবে আমি জানি, নানা অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে থাকে।

বন্দ বলে— বুঝলাম। রুশ মেয়েরাও ইংরেজ মেয়েদের মতো বোকা হতে পারে। তবে মেয়েটাকে ডেয়ারিং বলতেই হবে। সে তো জানে, ধরা পড়লে ওর কী হাল হবে। T-এর চিফ কি ওকে কিছু বলেনি?

— আরে, মেয়েটি এখন অবশ্য নার্ভাস। স্টিমারেও ভয়ে ভয়ে ছিল, কেউ কিছু দেখছে কিনা! রাতের স্টিমার, তবু—

— কিন্তু—

— দাঁড়াও, কাহিনিটা বাকি আছে।

ধোঁয়া ছাড়ে M। বলতে থাকেন— করিম জানিয়েছে, তোমার প্রতি প্রেম তাকে রুশ বিদ্রোহী করে তুলেছে। বিশেষ করে রুশ সরকারের উপর তার প্রচণ্ড ঘৃণা। তোমার বিরুদ্ধে একটা কাজ দিয়েছিল তাকে কর্তৃপক্ষ। তাই সে বদলির দরখাস্ত করে— পালাবার জন্য। ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ খুব ভালো বলে। চাকরিটা নিয়ে নেয় কম মাইনে সত্ত্বেও।

... এরপর ইস্তানবুলে আসে। করিমের খোঁজ পায়। তার খোঁজ পাওয়া কঠিন নয়, কারণ করিম খুব একটা গোপনীয়তার পরোয়া করে না। এরপর মেয়েটি করিমকে সেই উড়ো চিঠিটা পাঠায়। উদ্দেশ্য, তার সঙ্গে দেখা করে সাহায্য চাওয়া।

... হ্যাঁ, তোমার মতো করিমও ওকে প্রথমে সন্দেহ করেছিল। পুরো গল্পটাই মেয়েটা হয়তো বানিয়েছে। তবে এর পেছনে রুশ-চক্রান্ত থাকার কী কাবণ থাকতে পারে। এরপর মেয়েটা বলে, সে রুশ সাইফার মেশিনটা আমাদের এনে দেবে। জানো তো, সেটা কী অসাধারণ মেশিন! আমরা চড়া দামে কিনতে রাজি!

— মাই গড! — বন্দ বলে।

Spector মেশিন! সব দেশের গোপন সাংকেতিক বার্তা ধরে দিতে পারে। মেশিন চুরি গেছে জানলে রাশিয়ানরা সারা বিশ্বে তাদের যত অ্যামবাসি অফিস আছে, শাখা-প্রশাখা আছে, সর্বত্র হই-চই ফেলে দেবে। সব সংকেতলিপি ধ্বংস করবে। ওরা স্কিপ্ত হয়ে উঠবে। কে এমন কাণ্ড করল? কোথায় গেল মেশিন— এবং কীভাবে?

মেয়েটার মাথায় ছিট থাকতে পারে। কিন্তু M ব্যাপারটা অনেকখানি বিশ্বাস করেছেন।

— কী বুঝলে?

— মেয়েটা মেশিনটা চুরি করবে কী করে?

— পরিষ্কার বলেনি, তবে করিম বলছে, মেয়েটি নিশ্চিত সে কাজটা পারবে। সপ্তাহে কয়েক রাত সে একা থাকে। অফিস তখন একদম ফাঁকা। সে জানে, একথা আগে বটলে তাকে গুলি করে মারা হবে। করিম কথা দিয়েছে, সে ব্যাপারটা গোপন রাখবে।

— তারপর কী হল?

— স্টিমার যখন ওটাকায় এসেছে, মেয়েটা নামতে চাইল। মেয়েটি বলে, সে এখন আর কোনো যোগাযোগ রাখবে না। ‘গুড নাইট’ জানিয়ে চলে যায়। করিম অবশ্য মেয়েটিকে কোনও কথা দেয়নি। তাছাড়া, মেয়েটি একটি শর্ত আরোপ করেছে।

— শর্ত?

— তোমাকে ইস্তানবুলে গিয়ে মেশিন সমেত তাকে নিয়ে ইংল্যান্ডে আসতে হবে।

— খুব সুইট কাজ। কিন্তু একটা দ্বিধা হচ্ছে।

— কীসের দ্বিধা?

— মেয়েটা আমার ছবি দেখে প্রেমে পড়েছে। বাস্তবে দেখলে যদি প্রেম ঘুচে যায়?

— ওঃ হে— সেটাই তোমার কাজ। তোমায় সশরীরে দেখেও তার প্রেম যেন অটুট থাকে। মিস কেসের কথা তাই তুলেছিলাম! বুঝেছ।

জেমস বন্ড! কেমন তার শক্তি প্রেমিক হিসাবে— সেই পরীক্ষা দিতে হবে এবার!

॥ তেরো ॥

লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকে ডাইকাউন্ট প্লেন উড়ল।

রোম, এথেন্স, তারপর ইস্তানবুল।

এখন প্লেন কুড়ি হাজার ফুট উঁচুতে। বন্ড সিটবেন্ট খুলল। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর ব্রিফকেস থেকে একটা বই বের করল। মোটা বেঁটে বই, বেশ ভারী।

আসলে ওটাকে ‘ওভারনাইট প্যারা’ বলে চালানো হয়েছে। এর মধ্যে আছে ২৫ পিস্তলের পঞ্চাশটা গুলি, একটা ড্যাগার। তাছাড়া সায়ানাইডের ডেথ পিলও আছে। এছাড়া আছে বেরেটা পিস্তলের সাইলেন্সার এবং পঞ্চাশটা সোনার মোহর।

প্লেনে বন্ডকে নিয়ে মাত্র ১৩ জন যাত্রী।

১৩ সংখ্যাটায় বন্ডের সেক্রেটারি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল।

বন্ড বলেছিল— আমার পক্ষে ১৩ সংখ্যা সদা শুভ।

শিক্ষিত সেক্রেটারি তাকে চুমু দিয়েছিল। শুভকামনার চুমু।

দেখা যাচ্ছে, নীচে সাদা মেঘ নীকোব পালের মতো বয়ে চলেছে।

লাঞ্চ খেতে খেতে দেখা যাচ্ছে— জেনিভার লেক। আলপসের পাইনবন। প্লেন এখন মঁ রাঁ পাহাড়ের চূড়ায়। ছোটবেলায় পাহাড়চূড়ার কথা মনে পড়ে যায় বন্ডের। তারপর কত বছর পেরিয়ে গেল, নদীতে কত জল বয়ে গেল। সেই সরল নিষ্পাপ বালক বন্ড এখন—

এখন সে ছুটছে একটা অবৈধ প্রেমের ভূমিকায় অভিনয় করতে!

মন সুস্থির করে বন্ড। পেছনের কথা ভেবে মন দুর্বল করা ঠিক নয়। বিশেষ করে, এখন তার যা কাজ! কী কাজ তার এখন? বন্ড নিজেই এটার একটা নাম দেয়, ‘ইংল্যান্ডের অবৈধ প্রণয়ের দালালি’।

দালালি? তাছাড়া কী! একটা মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ইংল্যান্ডে আনতে হবে। এমন মেয়ে, যাকে সে আগে কখনও দেখেনি। সে নাকি ‘পরমা সুন্দরী’। তাতে কী! বন্ডের কাজটা অনেকটা— টাকার লোভে বড়োলোকের মেয়েকে বিয়ে করার মতো। এই প্রেমের অভিনয় কবতে গিয়ে দেহ এসে পড়বে, সেই দেহদানের মধ্যে ভালোবাসার ছিটেফোঁটা নেই বন্ডের দিক থেকে। অদ্ভুত উপমা মনে আসে বন্ডের। একটা সোনার খলিকে ‘রেপ’ করার মধ্যে কি যৌন-আনন্দ আছে? থাকতেও পারে। তাবলে একটা ‘সাইফ’র মেশিন’ কে! অদ্ভুত ব্যাপার।

রোম পেরিয়ে গেল প্লেন।

এটা MGB-র জটিল চক্রান্ত কি? M-ব্যাপারটা কতদূর বুঝতে পেরেছেন? রুশদের আসল মতলব কী? তারা কি বন্ডকে কিডন্যাপ করতে চায়? অথবা খুন? খুন করতে হলে তো সোজা পথ আছে। লন্ডনের ফ্ল্যাটেই ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে তাকে গুলি করতে পারত। অথবা রাস্তায়, যে কোনও সময়।

ভূমধ্যসাগরের উপর ঝড় বইছে।

স্টুয়ার্ডেস বলল— সিটবেন্ট বাঁধুন।

প্লেনটা যদি ক্র্যাশ করে! কী আসে যায়। জীবন-মৃত্যুর খেলা অহরহ চলছে এই জীবনে।
লোয়েলিয়া পনসবি বলেছিল— ১৩ তারিখ অশুভ! প্লেনটা কি পুরনো? শেষ পর্যন্ত
ইস্তানবুলে যাওয়া যাবে কি!

কেবিনের আলোগুলো এক সঙ্গে জ্বলল। বিপদ কেটে গেছে।

গান্ফ অব্ করিছ! প্লেনটা এবার নীচে নামছে।

যাত্রীদের ফ্যাকাসে মুখ আবার স্বাভাবিক হচ্ছে। ট্রানসিট লাউঞ্জে এসে পরপর দু'গেলাস
ড্রিংকস্-এর অর্ডার দিল বন্ড।

এখান থেকে ইস্তানবুল আর নব্বই মিনিট— আকাশপথে।

আবার আকাশ।

অবশেষে সুন্দর ইয়েসিলকা এয়ারপোর্ট! মোটরে ইস্তানবুল যেতে ঘন্টাখানেক লাগে।

আধুনিক তুরস্কের লোকগুলোকে পছন্দ হয় না বন্ডের। ওদের চোখগুলো কঠোর। সেই
চোখের সঙ্গে গলার ভদ্র-মোলায়েম সুর ঠিক মিল খায় না। তবে কাস্টমসের কর্তব্য করতে
করতে অনেকেই একই রকম হয়ে যায়। সন্দেহ করাই যাদের একমাত্র কাজ।

হঠাৎ একটি লোক হাজির। রোগা চেহারা, ঝোলা গোর্ফ। মাথায় টুপি।

সে স্যালুট করে বলল— গাড়ি এসেছে।

পুরোনো মডেলের কালো রোলস্ রয়েস।

গাড়ি চলল। ড্রাইভার পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল— করিম বে মনে করেন, আজ রাতে
আপনার বিশ্রাম দরকার। তাই কাল সকাল ন'টায় আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব। কোন
হোট্টেলে থাকবেন?

— ক্রিস্টাল প্যালেস।

— ও. কে., স্যার!

পেছনে একটা স্কুটারের শব্দ। বন্ড পাত্তা দিল না।

॥ চোদ্দো ॥

ঘুমটা যখন ভাঙল তখন কাক-ডাকা ভোর।

বোধহয়, ডান উরুতে একটা বেকায়দায় মাছির কামড়ে ঘুম ভেঙে গেল বন্ডের।

এবার লক্ষ করল— ঘরটা একেবারে বাজে। পুরোনো ফার্নিচার, লোহার খাট, বাথরুমের
গরম জলের পাইপ থেকে পোকা বেরল।

তবে পর্দা সরালে জানলা দিয়ে অতি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়ে। তাতে ছারপোকাকার
কামড় সহ্য করা যায়।

ব্রেকফাস্ট এল। না, তেমন হতাশাব্যঞ্জক নয়। দই, ক্রিম, পাকা ডুমুর, আর কালো টার্কিশ
কফি।

ঠিক ন'টা।

সেই রোলস্ রয়েস হাজির। এবার সে এল একটা সরকারি অফিসে।

প্রথমে কেরানির সাক্ষাৎ।

তারপর কর্তার ঘর।

— আসুন ফ্রেন্ড, প্লিজ কাম— বিরাট চেহারার ব্যক্তিটি হাত বাড়াল। পরনে ক্রিমরঙের
সুট। ব্যক্তিভ্রাশালী ডার্কো করিমকে চিনতে অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। বন্ড ছ-ফুট, করিম
তার চেয়েও দু-ইঞ্চি লম্বা। হ্যান্ডশেক করার সময়েই এর হাতের জোর টের পেল বন্ড। শুধু

করমর্দন করেই যে কোনও লোকের আঙুল ভেঙে দিতে পারে। মুখটা বেদের মতো, কানে সোনার দুল!

সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে যায়— এমনই লোক করিম!

বলল— তোমার গাড়ি ফলো করেছিল একটা ল্যামব্রেটা স্কুটার। টের পেয়েছিলে?

বন্দ মাথা নেড়ে জানাল— হ্যাঁ।

— ওগুলো ‘মুখহীন মানুষ’ খুঁদে ডাকাত। বেশিরভাগই বুলগেরিয়ান। ওরা আমাদের যে কোনো গাড়ি ‘ফলো’ করে।

মিষ্টি তুর্কি তামাকের সিগারেট দেয় করিম! বন্দ উপভোগ করে।

চৌকো ঘর। মেহগিনি কাঠের প্যানেল। দেওয়ালে রানি আর চার্চিলের ছবি। একটা বড়ো বইয়ের আলমারি।

করিম বলে— হাঃ হাঃ, গতকাল একটা মজা হয়েছিল। আমার ‘পরম বন্ধুরা’ আমাকে মাবার জন্য দেয়ালের কাছে একটা টাইম-বোমা রেখেছিল। ফিউজটা এমন যে, চেয়ারে বসামাত্রই বিস্ফোরণ হবে। আমি মরব। কিন্তু এমনই ভাগ্য— ওই নির্দিষ্ট সময়টায় আমি ওই দূরের সোফাটায় এক রুম্যানিয়ান সুন্দরীর সঙ্গে ‘মজা’ করছিলাম। মেয়েটা বোকা, ভাবে শরীর দিলেই লোকে খবর জানাবে! আর বোমাটা আমার ওকে নিয়ে আরাম করার সময়েই ফাটল! হাঃ হাঃ—

করিম বলতে থাকে।

— আমার কিছু নয়। মেয়েটা দারুণ ঘাবড়ে গেল। যাকগে, এমন কাজ কি আমার ‘সহকর্মী’রা করেছে! কিন্তু এতে রুশরা অসুবিধায় পড়বে। তোমার কী মনে হয়, বন্দ?

— আমি আসছি, এটা গোপন থাকলেই ভালো হতো না।

— হাঃ হাঃ! সেটা সম্ভব হত না। এখানকার সব হোটেলেই রুশ আর আমেরিকান স্পাই আছে। তবে প্রায় সবাইকেই আমরা ঘুষ দিয়ে হাত করেছি। বরং উলটে তারাই আমাদের খবর দেয় বিদেশি কেউ এলে। তাই তুমি এসেছ, এটা সবাই জানুক। জানলে, আমাদের সেই বান্ধবীও জানবে। সে তোমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি নিয়ে রেখেছে।... তবে হ্যাঁ, সে বলেছিল, তুমি আসামাত্রই ওদের দপ্তর টের পেয়ে যাবে। হতে পারে।... যাক গে, তুমি যতদিন থাকবে, আরামে থাকো।

করিম অন্য প্রসঙ্গে যায়।

— তোমার হোটেলটা নোংরা। ওখানে উঠলে কেন? তাছাড়া ওটা রাশিয়ানদের বড়ো ডেরা!

একতাড়া নোট দিল করিম।

— এক হাজার টার্কিশ পাউন্ড। আরও লাগলে বলো। মোট কথা, ফুর্তিতে থাকো। সিগারেটগুলো ভালো লাগবে। আমি সবসময় তোমার কাছাকাছি থাকব। আর কী চাই?

— আর কিছু না। একবার লন্ডন ঘুরে যাও।

— ওরে বাস! না, না! ওখানকার মেয়েগুলো একেবারে ঠান্ডা। থাকগে, এসো কফি খাই। কফির অর্ডার দিয়ে কাজের কথায় এল করিম।

— ফ্রেন্ড! এই কেসটা আমার সিনেমার মতো লাগছে। আরেকটা গোলমাল, কেউ যদি দুজন স্টারের প্রেমে পড়ে। আমার সন্দেহ, মেয়েটা কি শুধু কল্পনা করেই তোমার প্রেমে পড়ে গেল! অবশ্য, তোমাকে দেখলে সে ভালোবাসবে, এবং ইংল্যান্ডে পালাতে চাইবে।

কফি এল।

করিম বলল— এই প্রেমের চরিত্রটা বুঝতে আমাদের আরেকটু অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া... শত্রুশিবির হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমি চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছি। আমার নাকটা ভালো, ঘ্রাণ অতি তীব্র! হাঃ হাঃ—

একটু চুপ করে বলল— ভালো না লাগলে কেটে পড়ো। দেশে ফিরে যাও। তাছাড়া, সেই থেকে মেয়েটার পাস্তা নেই।

বন্ড জিঙ্কস করল— মেয়েটার গল্পটা তুমি বিশ্বাস করো? নাকি, MGB-র চাল বলে মনে হয়?

করিম বলে— এটা আমিও প্রথম থেকেই ভাবছি। তবে মেয়েদের মন বোঝা মুশকিল। ওপর থেকে নিষ্পাপ চোখ, ভেজা ঠোঁট, শব্দ করে রেলিং চেপে ধরা দেখলে তাকে বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হবে। তবে মেয়েদের ভালোবাসা বুঝতে হলে এক্সপার্ট হতে হবে, সঠিক জায়গায়—

— ঠিক বলেছ। সঠিক জায়গাটা হচ্ছে— বিছানা।

॥ পনেরো ॥

আরেক রাউন্ড কফি। সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলি জমছে।

এক ঘন্টা আলোচনার পরেও ওরা কোনো পাকা সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। তবু বন্ডকে তার কাজ করতে হবে। মেশিনসমেত মেয়েটাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে।

ট্র্যাভেল এজেন্টকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রাখল করিম।

তারপর বন্ডকে বলল— একটা পাসপোর্ট হলেই চলবে। দু'জনের জন্যই। মেয়েটাকে তোমার স্ত্রী বলে চালাতে হবে। মেয়েটার মতো দেখতে কারুর ফটো তুলতে হবে। গ্রেট গার্বোর পুরোনো ছবিও চলবে। তবে হ্যাঁ, দু'জনেরই নাম পালটাতে হবে। কী নাম চাও?

— তুমিই বলো না।

— সমারসেট। আমার মায়ের দেশ। তোমার নাম ডেভিড সমারসেট, পেশা— কোনো এক কোম্পানির ডাইরেক্টর। মেয়েটির নাম ধরো— ক্যারোলিন। ইংরেজ দম্পতি। দেশভ্রমণে বেরিয়েছে। অন্যান্য নিয়মকানুন আমি সামলে দেব।

বারোটা বাজে। হোটেলে ফেরা দরকার।

করিম বলল— গিয়ে দেখ ওখানে কোনে খবর আছে কিনা। আরেকটা কথা। গিয়ে দেখবে, তোমার জিনিসপত্র কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে কিনা!... গাড়ি তোমায় পরে লাঞ্চে নিয়ে আসবে।

বন্ড হোটেলে ফিরল। গেটে এক নতুন দারোয়ান। হলুদ মুখে অপরাধীর দৃষ্টি। সে জানাল— কর্তৃপক্ষ দুঃখিত বন্ডকে খারাপ ঘর দেবার জন্য। তার ঘর বদলে দেওয়া হয়েছে। নতুন ভালো ঘরে তার মালপত্র সরিয়ে আনা হয়েছে। এটাই হোটেলের সবচেয়ে ভালো ঘর। শুধু হনিমুন-দম্পতিদের জন্য এটা দেওয়া হয়।

নতুন ঘরে এসে বন্ড দেখল ঘরটা সত্যিই ভালো। ঝাড়লগঠন, কার্পেট, বিশাল খাট, সোনালাই ফ্রেমের আয়না।

অভ্যাসমতো যা যা সাবধানতার জন্য খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন, সেগুলো একবার চেক-আপ করে নিল বন্ড।

তার জিনিসপত্রগুলো শিফট করার সময় কেউ ঘেঁটেছে কি? মনে হচ্ছে না। সুটকেসে কোনো আঙুল বা আঁচড়ের চিহ্ন নেই।

কোনও খবরও আসেনি।

খেলাটা কীভাবে শুরু হবে? যেভাবেই হোক খেলতে হবেই। মাঠে যখন নেমে পড়েছে। করিমকে তার ভালোই লেগেছে। প্রাণবন্ত, বন্ধুবৎসল লোক। কী করে যে গোয়েন্দা বিভাগে এল, কে জানে!

গাড়ি এসে আবার বন্ধকে তুলে নিল। গালা ব্রিজ পেরিয়ে স্পাইস বাজার। করিমের অফিস-বাড়ির সামনে থামল গাড়ি।

সাদর অভ্যর্থনা।

— আরে ফ্রেন্ড! এসে গেছ। এক গেলাস 'রাকি' ঝাণ্ড এখন। তারপর লাঞ্চার অর্ডার দেব। এখানে কাবাবটা ফাস্ট ক্লাস। সুগন্ধী চাল, কাঠ-কয়লার আঁচে তৈরি কচি ভেড়ার মাংস। তবে লোকগুলো গণ্ডমূর্খ, বেয়াদব! সুলতান, যুদ্ধ, রেশ— এছাড়া আর কিছু বোঝে না। ...মরুক গে। কী খবর বলো?

— কিছু বলার মতো নেই।

— শোনো, আমি যা ভেবেছি। লাঞ্চার পর আমরা একটা ছোটো অপারেশন চালাব। মাটির তলার শত্রুদের এক গুপ্তঘাঁটিতে হানা দেব।

খাদ্যতালিকায় কাঁচা মাছ। করিম ব্যাখ্যা দিল— আমি একবার কুস্তির ট্রেনিং নিয়েছিলাম। সেই ট্রেনার এটা শিখিয়েছিল, গায়ের জোরের লড়াই-এর জন্য দরকার কাঁচা মাছ, কাঁচা মাংস, লেটুস পাতা!

— পালোয়ান না হয়ে এই কাজে এলে কেন?

— সে আরেক কাহিনি। সংক্ষেপে বলছি।

সিগারেট ধরায় করিম। বলতে থাকে— আমি ট্রেবিজেন্ডের লোক। বাবা পেশাদার জেলে, কৃষ্ণসাগরে মাছ ধরত। তার বিশেষত্ব এক ধবনের মাছ ধরা যাকে বলা হয় 'তরোয়াল মাছ'। খুব লড়াই করে এই মাছ ধরতে হয়। মেয়েছেলে ভোগ করেছে খুব— কারণ সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা দেখে মেয়ের দল আসত। দু-চারটে খুন-খারাপিও করেছে, ওই মেয়েছেলে সংক্রান্ত ব্যাপারেই। বাবার কিছু রক্ষিতা ছিল, বলতে পারো বিয়ে না-করা বউ। তার মধ্যে একজন ইস্তানবুলেব ইংরেজ গভর্নেস।

বন্দ মন দিয়ে শুনতে থাকে। গহলে ওই ইংরেজ গভর্নেসই করিমের মা!

করিম বলে— বাবা ষাট বছর বয়েসে মারা যায়। বাবার আগের বউ ছিল ইতালিয়ান। তার ছেলের নাম বিয়কেপ। ফর্সা রং। আমার শম ভাকো, কালো রং। মোট পনেরো জন ভাই-বোন ছিলাম আমরা।

— বলো কী!

— আশ্চর্যের কী আছে! শিক্ষায় বাবাকে ছাড়িয়ে যাই। মা বলেছিল— ইংল্যান্ডকে শ্রদ্ধা করবি। নিজের একটা নৌকা নিয়ে কুড়ি বছর বয়েস থেকেই রোজগাব শুরু করি। আমি বরাবরই দুঃসাহসী। ভয়-ডর কিছু ছিল না। সমুদ্রপারে দুটো ছোটো ছোটো বাড়ি নিলাম। বান্ধবীদের সঙ্গে সেখানেই মিশতাম। একবার জিপসিদের সঙ্গে মারামারি করে একটা মেয়েকে বাগাই। ওরা তাড়া করায়, নৌকা করে পালাই। মেয়েটিকেও মাথায় রড মেরে অজ্ঞান করে নৌকায় তুলে নিয়েছিলাম।

— সে কী!

— হ্যাঁ, নতুন যৌবনের দাপটে এরকম অনেক কাজ করেছি। জিপসি মেয়েটাও কম যায় না। ট্রেবিজেন্ডে আমাকে একবার খুন করার চেষ্টাও করেছিল। আমি ওকে তাই ন্যাংটো করে

টেবিলের নীচে বেঁধে রাখতাম। কুকুরের মতো ব্যবহার করতাম, কুটির টুকরো ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিতাম। এই মেয়েটাকে নিয়েই বাবা-মায়ের সঙ্গে আমার গোলমাল বাধে। বিরক্ত হয়ে মেয়েটাকে ছেড়ে দিলাম।

— তারপর?

— তারপর আরও মজার ব্যাপার! মেয়েটা আমাকে ছেড়ে যেতে চায় না। এ তো ভারি মুশকিল! সে আরেক কাণ্ড!... এরপর হঠাৎ বাবার কাছে হাজির এক ইংরেজ সাহেব। এক চোখে কালো পট্টি। ওরা রাশিয়ানদের সম্পর্কে কথা বলছিল। ট্রেবিজোন্দ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে বাটুম। সেখানে রুশদের তেলের ঘাঁটি আর নৌবহর। আমি রুশ ভাষা জানতাম। যদি রুশদের খবর জোগাড় করতে পারি, ভালো টাকা দেবে।

... ভদ্রলোকের নাম মেজর ড্যানসে। অতএব সেই থেকে—

— কুস্তির কী হল?

— সেটা আসলে আমার ছদ্মবেশ। লোকে যাতে সেটাই আমার আসল পরিচয় বলে মনে করে— তাই কুস্তি শিখেছিলাম। রুশরা সার্কাস ভালোবাসে। আমি নানা কসরৎ দেখাতে পারতাম। দাঁত দিয়ে ওজন তোলা, শেকল ভাঙা— এসব আর কী! ওদের কাছে বোকা সেজে থাকতাম আর খবর সংগ্রহ করতাম। ব্যাস, স্পাইং-এর কাজে রণ্ড হয়ে গেলাম ক্রমশ।

কাবাবের পর ড্রিংকস্।

করিম বলল— গায়ে জোর দরকার। আমি প্রচুর পরিমাণে নারীদেহ উপভোগ করি। বাবার মতোই। কিন্তু বাবা মদ খেত না, স্মোক করত না। আমি অবশ্য দুটোই করি। তবে প্রেমের পক্ষে এই অভ্যেসগুলো না থাকাই ভালো। আমি একদিন হার্টফেল ক্লরে মরব। আমার কবরের ফলকে লেখা থাকবে : এই লোকটা অনেক বেঁচে তারপর মরেছে।

বন্ড হাসল— তুমি বাট করে হার্টফেল করো না। অন্তত M-এর জন্য। তিনি তোমাকে খুব সমীহ করেন, উঁচু ধারণা পোষণ করুন।

— হাঃ হাঃ, তাই নাকি! তাহলে এখন মরা চলবে না আমার!... হ্যাঁ, একটু পরে হানা দেব রুশদের মিটিং-এ। মনে আছে?

॥ ষোলো ॥

অফিস ঘর।

আলমারি থেকে দুটো নীল রঙের ওভার-অল বের করল করিম। এগুলো ইঞ্জিনিয়ারদের পোশাক। স্যুটের ওপর ওভার-অল চড়াতে হল।

একজোড়া টর্চ। ক্লার্ক রেখে গেল।

করিম বলল— এইটা আমার বড়ো ছেলে। আমার অফিসে আমার ছেলেরাই কাজ করে। ড্রাইভার আর দারোয়ান আমার কাকা। অফিসটাই আমার সংসার। সবাইকে স্পাইং-এর ট্রেনিং দেওয়া আছে। এদের বলেছি— ঈশ্বরের পরেই তোমরা স্থান দেবে M-কে। এবার চলো।

আলমারির পেছনে একটা লুকানো দরজা। সেখান থেকেই একটা সুড়ঙ্গ শুরু হয়েছে। একটা দুর্গন্ধ নাকে এলো। সাঁাতসেতে।

— তুমি আগে যাও। আমি দরজাটা বন্ধ করব।

পাথরের দেওয়াল, নর্দমা।

কেমন আওয়াজ কানে আসছে! আরে ক্বাস! কয়েক হাজার ইঁদুর। তারা ঘাপটি মেরে আছে।

বন্দ টর্চ নেভাল।

আগে করিম এসে দাঁড়িয়েছে। ইঁদুর ও বাদুড়ের গন্ধ। সুড়ঙ্গের ছাদে বাদুড়।

এটা একটা চোরা কুঠুরি। ইঁদুর-বাদুড়ের উৎপাতটা তুচ্ছ করার নয়। করিম বন্দকে সতর্ক করে দিল।

— এই ইঁদুরগুলো যখন মরবে তখন ইস্তানবুলে প্লেগ ছড়াবার আশঙ্কা আছে।

এরপর হাতঘড়ি দেখে করিম বলে— আর পাঁচ মিনিট। ওদের মিটিং-টা সম্পর্কে জেনে রাখো। এখানে MGB-র তিনজন লোক থাকবে। GRU-র লোকও থাকতে পারে। গ্রিস এবং পারস্য থেকেও নাকি লোক এসেছে। তাতিয়ানা নামে মেয়েটাও এখানে আসে, সাংকেতিক বার্তা সংগ্রহের জন্য। তাকে দেখলে তুমিও মুগ্ধ হবে, অপূর্ব সুন্দরী! আগেই বলেছি।

ছাতের ত্রিপল থেকে একটা 'পেরিস্কোপ' বের করল করিম। বলল— এটা টার্কিশ নেভি থেকে জোগাড় করেছি। একটা ইঁদুরের গর্তে এটা আমরা ব্যবহার করি। তবে ভালোভাবে অপারেট করা কঠিন। আমরা এর কাছাকাছি কয়েকটা বাড়ি তৈরি করেছি। রুশরা সন্দেহ করে তল্লাশি চালায়। যাই হোক—

বন্দ বলে— আর ওটা কী দেখছি!

— ওটা এক বড়ো বোমার তলার অংশ। বিপদে পড়লে বা বড়ো রকমের সংঘর্ষ বাধলে ওটা রিমোট কন্ট্রোলে ফটানো হবে।

পেরিস্কোপের আই-পিস-এর সাহায্যে এবার গুপ্ত বৈঠকের দৃশ্য দেখতে পেল ওরা। করিম বলল— ওই দেখ, টেবিলের একদম শেষে বসে আছে রেসিডেন্ট ডিরেক্টর। বাদিকের দুজন ওর সহযোগী। উলটো দিকে তিন নবাগত।

ওদের দেখা যাচ্ছে, কিন্তু একটা কথাও শোনা যাচ্ছে না।

কী আর করা যাবে! দেখেই আইডিয়া করতে হবে, ওরা কী চক্রান্ত করছে।

বন্দ জিজ্ঞেস করল— এই সুড়ঙ্গ কেন তৈরি হয়েছিল?

— এটা হল অব পিলার্সের অবলুপ্ত একটি নালা। আমাদের মাথার ওপর সেন্ট সোফিয়া। হাজার বছর আগে এটা তৈরি হয়েছিল। জলাশয় করে শত্রুকে আটকানোর জন্য। চারশো বছর আগে গিলিয়াস নামে একজন এটা আবিষ্কার করে। কাহিনিটা আমি পড়েছিলাম। বিরাট পাইপের সাহায্যে এটা জলে ভর্তি করা হত, আবার খালি করাও যেত। এটা চলে গেছে একেবারে পাহাড়ের নীচে— 'স্ট্রিট অব্ বুকস্'-এর তলায়। সেখানে রুশদের ঘাঁটি।

হঠাৎ চুপ করে যায় করিম।

বন্দ বলে— কী হল।

— ভালো করে দেখো মেয়েটি আসছে।

॥ সত্তরো ॥

হোটেলে ফিরে ন্নান সারে বন্দ। শর্টস পবে খালি গায়ে বসে টনিক মেশানো ভদকায় চুমুক দেয়।

সূর্যাস্ত দেখছিল বন্দ। সাদা চোখে।

মানসচোখে দেখছিল সেই অপূর্ব মোহময়ীকে। এক টুকরো কাগজ সে টেবিলের কর্তার হাতে দেয়। সবাই তার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকায়। সুন্দরী লাজে রাঙা হয়ে আরও সুন্দর হয়।

কিন্তু লোকগুলোর চাউনির মধ্যে লালসাও প্রকট! তাছাড়া সামান্য ঘণাও আছে। কেন? যেন এক আকর্ষণীয়া গণিকাকে দেখছে তারা।

আসলে গুপ্তচর মাত্রই সন্দেহপ্রবণ। আব সন্দেহপ্রবণদের দৃষ্টি ওই রকমই হয়ে থাকে। ওরা কি মেয়েটিকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে? কাগজের টুকরোতে কী বার্তা ছিল কে জানে! যারা স্তনল, তাদের মুখ ভাবলেশহীন। ডিরেক্টরের সঙ্গে মেয়েটির সামান্য কথাও হয়েছিল। সেই কথা শুনে মেয়েটির মুখ আরও লাজুক রাঙা হয়েছিল। ওর ঠোঁট নাড়া দেখে মনে হয় 'ইয়েস স্যাব' জাতীয় কিছু বলল।

যেন বায়োস্কোপের দৃশ্য— যখন 'টকি' হয়নি।

মেয়েটার সতি সপ্রাঞ্জীর মতো চেহারা। সতি গ্রেটা গার্বো! ইয়ং কুইন! নীল চোখ, রক্তিম ঠোঁট, উদ্ধত স্তন. ঢেউখেলা নিতম্ব— একটা সার্থক সৃষ্টি।

তাতিয়ানা রোমানোভা! এই মেয়ে কি প্রেমে পড়তে পারে কারুর? তবে রোমানভ বংশের রক্তে প্রেম কামনা-বাসনা থাকা অসম্ভব নয়।

করিমের ফোন— কী খবর?

— বলার কিছু নেই। মানে, নতুন কিছু।

— সঙ্কে আর্টটায় তৈরি থেক। দেখা হবে।

— আচ্ছা।

সেদিন করিম দু-একটা দামি কথা বলেছিল।

— দেখো বন্ড, তুমি ওর কাছে কল্পলোকের প্রেমিক। কল্পলোকেই থেক।

— তার মানে?

— মানে, নিজেকে উর্ধ্ব বাখবে। সাধারণের উর্ধ্ব। তু করে ডাকলেই সাড়া দেবে না। তোমার কাছে একটি চুমু পেতে হলেও ওকে যেন আকুল মিনতি জানাতে হয়। তবে তুমি সাড়া দেবে। এটা তোমার অভিনয়, মনে যাই থাকুক।

করিম বলেছিল— আজ এক জিপসি বন্ধুব বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে। আমরা ওখানেই ডিনার সারব। নাম ভাভ্‌রা, ট্রাইবাল সর্দার। তোমার মনোরঞ্জনের জন্য মেয়েরা নাচবে।

ওদের গাড়ি ছুটছে।

করিম বলল— ল্যামব্রেটা স্কুটার পিছু নিয়েছে। সেই 'মুখহীন' লোক। করুক।

রাত সাড়ে আটটা। জায়গাটা ইস্তানবুলের বাইরে। পাহাড়ি এলাকা।

গাড়ি থামল একটা মামুলি কাফের কাছে। করিমের পিছু পিছু চলল বন্ড। কাউন্টারের লোকটা হাসল। নার্ভাস হাসি।

সামনে ফলবাগান। গাছের তলায় টেবিল পাতা। বাগানের মাঝখানে গোল নৃত্যস্থলী। রঙিন লণ্ঠনে আলোকিত।

আকাশে পূর্ণ চাঁদ জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে।

এক বিরাট চেহাবাব জিপসিব সঙ্গে কবিমেব কথা হল। হিংস্র চোখ। ঝুলো গৌফ! হাতে বাঁকা ড্যাগাব। ঝাপে ভরা অবশ্য। লোকটা ঝুঁকে বন্ডকে অভিবাদন জানাল, বন্ডও প্রত্যুত্তর দিল।

হঠাৎ হাততালির শব্দ। দুজন মেয়ে এগিয়ে এল।

বিশাল জিপসি ধমক দিতেই তারা সরে গেল।

করিম বলল— আজ বাতে এখানে একটা ঝামেলা আছে।

-- ঝামেলা?

— হ্যাঁ, একটা পারিবারিক ঝামেলা। তার মীমাংসা হবে। আমরা আমন্ত্রিত, তাই আমাদের সামনেই হবে। শুধু দেখে যাবে চুপচাপ, আর কিছু করবে না।

ঝামেলাটা এই : এই উপজাতিদের দুটি মেয়ে একই ছেলের প্রেমে পড়েছে। দুজনে পরস্পরের সঙ্গে লড়বে। সেই লড়াই এ একজন অপরজনকে খুন করবে। যে জয়ী হবে, অর্থাৎ খুন করতে হবে, সে-ই ছেলোটিকে, মানে তার প্রেমিককে পাবে। মেয়ে দুটোকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। ওরা পরস্পরের রক্তপান কবতে চায়। এই ভাবেই প্রেমের ফয়সালা হবে। একজনের মরণ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে। শাস্ত থেকে সব দেখবে। বাধা দিলে আমাদের জীবনহানি হতে পারে— কবিম জানায়।

লড়াই আসন্ন।

তার মধ্যে করিমের ঘরে বোমা ফাটার প্রসঙ্গটাও উঠল।

করিম বলল— ওটা ওই ‘মুখহীন’ মূর্খদের কাজ! তবে উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয়। আমায় খুন করার চেষ্টাই হয়েছিল। আমি ব্যবস্থা নেব।

আখ গেলাস ‘রাকি’ পানের পর এল অভিনবভাবে তৈরি করা ক্রটি। এক বুড়ি গরম গরম বানাচ্ছে। তারপর মাংসেব স্টু। বেশ পাতলা, ভেতরে মাংসের টুকরো ডুবে আছে। খাওয়া শেষে হাত ধোওয়ার জলের পাत्रে গোলাপ-পাপড়ি ছড়ানো। আঙুল ডুবিয়ে হাত ধুলো ওরা।

এবার একটা ছোটো ভাষণ দিল বন্ড, অনুবাদ করে দিল করিম। বক্তৃতার শেষে মৃদু প্রশংসা-ধ্বনি। জিপসি সর্দার বন্ডকে বুক জড়িয়ে ধরে বলল— আমি সব বিদেশিকেই ঘৃণা করি। তুমিই একমাত্র ব্যতিক্রম। আমি তোমার বন্ধু।

লোক গেছে মেয়ে দুটোকে আনতে।

সুতরাং আবহাওয়া উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। ঘোড়ার ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ওরা জিপসি সর্দারেরা দু-ভাগে আসন গ্রহণ করল।

দড়াম!

একটা দরজা খুলে গেল। দরজা, না খাঁচা বলা মুশকিল। দুপাশ থেকে ছুটে এল দুটি মেয়ে। উপজাতি কন্যা, আদিম বন্য। ওবা নাচের রিং-এর মধ্যে এসে ঢুকল। দুজনেই হিংস্র, রাগে ফুঁসছে। মনে হচ্ছে, পবনস্পর্কে ছিঁড়ে খাবে!

॥ আঠারো ॥

জিপসি সর্দার ভাড়া সবাই, শাস্ত হতে বলল।

তারপর ঘটনার পটভূমি সংক্ষেপে জানাল।

সে বলল— এরা লড়াই করবে। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার ভাব রাখবে না। নিজেদের মধ্যে উপজাতিরা কেউ-কাউকে ঘৃণা করবে না। শুধু বিদেশিরা ঘৃণ্য। এই লড়াই মরণ-বাঁচনের লড়াই। যেকোনো একজনকে মরতে হবে। এটাই প্রথাগত মীমাংসার পথ।

করিম বলল— বুনো জন্তুর লড়াই দেখেছ কি! দেখবে, মানুষ— এক্ষেত্রে দুই নারী— সেইরকমই লড়বে।

মেয়ে দুটির রাগস্ত মুখ, রিং-এ দাঁড়িয়ে ছটফট করছে। শুধু আদেশের অপেক্ষা।

বন্ড দেখল— মেয়ে দুটি সুন্দরী। পরনে রং-বাহারি পোশাক। একজনের হাড় বেশ মোটা। বোধহয়, তারই গায়ের শক্তি বেশি। চোখ দুটিতে অবশ্য বুদ্ধির চিহ্ন নেই। তবু তাকে সিংহীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। বড়ো বড়ো স্তন।

এ যদি সিংহী হয়, তবে আরেকটা চিতাবাঘিনি। চটপটে, শিকারি বাজপাখির মতো। তীক্ষ্ণ নখ। স্তন দুটো খুব বড়ো নয়।

ভাড়া লড়াই শুরুর অর্ডার দিল।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ঝটাপটি। বড়ো চেহারার মেয়েটার নাম জোরা। দ্বিতীয়টার নাম ভিদা। জোরা ছুটে এসে ভিদার পেটে প্রচণ্ড এক লাথি কষাল। পর মুহূর্তেই একটি ঘুঁষি ঝাড়ল তার মাথার ডানদিকে। ভিদা পাথরের উপর চিং হয়ে পড়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে একজন ভিদার সমর্থক আর্তনাদ করল— হয়, হয়!

ভিদা অজ্ঞান হওয়ার ভান করেছে। এবার জোরা কাছে এসে ভিদার পাঁজরে লাথি মারার চেষ্টা করলো, কিন্তু তৈরি ছিল ভিদা। সে পা-টা আঁকড়ে ধরে মোচড় মারল। মোচড়ের পর মোচড়। জোরার পা-টা ভেঙে যাবার উপক্রম। জোরে টান মারল ভিদা। দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল জোরা। তার ভারী শরীরের পতনে মাটি কেঁপে উঠল।

তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভিদা। দু'হাতে তার চুল ছিঁড়তে লাগল।

জোরা শেষ পর্যন্ত হাতের প্যাচ আর হাঁটু দিয়ে ভিদার হাত থেকে বাঁচাল নিজেকে। বিধ্বস্ত ভিদার ছিন্নভিন্ন পোশাকের ভিতরে জুলজুল করছে তার মোহময়ী শরীরটা। জোরা আক্রমণ করল আবার। জামাটা আরও ছিঁড়ে গেল। সবল হাত দিয়ে ভিদাকে সে প্রচণ্ড জোরে চেপে ধরল। নিজেকে ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল সে।

আচমকা আর্তনাদ। জোরার বুকটা ভিদা ক্ষণিকের সুযোগে কামড়ে দিয়েছে। আর এই সুযোগে ভিদা পাগলের মতো খামচাতে লাগল।

যুদ্ধরত মেয়ে দুটি তখন বজ্রারদের মতো পিছু হটে লম্বা শ্বাস ফেলছে। তাদের ছিন্নভিন্ন জামার মধ্য দিয়ে শরীর বেরিয়ে পড়েছে। জোরার স্তন থেকে রক্ত ঝরছে।

এক সময় তারা দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দিল তাদের পোশাকের ছোঁড়া টুকরোগুলো।

মেয়ে দুটির প্রায় নগ্ন দেহ দেখে বন্ডের পাশে বসা করিম অবশ্যই চরম উত্তেজিত। বন্ড চোখ ঢাকল এক হাত দিয়ে। বন্ড বুঝতে পারল, উপস্থিত সকলের এখনকী অবস্থা।

শেষ পর্যন্ত জোরাকে মাটিতে ফেলে ভিদা যখন তার বুকের কাছে এগিয়ে এল, ঠিক তখনই একটা বোমার শব্দে লোকজন ছিটকে গেল চারদিকে।

নাচের জায়গাটার পিছনে অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল আগুন। বন্ডের কানের পাশ দিয়ে কী যেন সাঁ করে বেরিয়ে গেল। জিপসীদের সর্দার এগিয়ে চলল হাতে ছুরি নিয়ে। পিস্তল হাতে পিছনে করিম। যাবার সময় মেয়ে দুটিকে কিছু বলতেই তারা ফলবাগানের মধ্যে ছুটে চলে গেল। অন্য মেয়ে আর বাচ্চারা আগেই পালিয়ে গেছে।

বোমায় বাগানের পাঁচিলের যেখানটা ভেঙে গেছে সেইদিকে 'বেরেটা' পিস্তল হাতে নিয়ে কী হয়েছে দেখবার জন্য করিমদের পিছু নিল বন্ড।

ওখানটায় গিয়ে দেখল অনেকে মারামারি করছে। আরেকটু এগোতেই জিপসীদের ভিড়ের মধ্যে আলুমার্কা চেহারার বুলগেরিয়ানদের ঠিক চিনতে পারল। সেই মারামারির মধ্যে পেটে হাত দিয়ে এক জিপসী যুবক বন্ডের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ছুরি নিয়ে তাকে দু'জন তাড়া করেছে।

বন্ড গুলি চালাল। লোক দুটো মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল। আর ছটা বুলেট আছে। একটা ছুরি বন্ডের মাথার পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। বন্ড সতর্ক হল।

এগোতে গিয়ে বন্ড দাঁড়িয়ে পড়ল। করিমকে দু'জন লোক তাড়া করেছে। একজনের হাতে ছুরি। তাহলে ছুরিটা করিমকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া হয়েছিল, যেটা এইমাত্র বন্ডের মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আবার ফায়ার। একজন শেষ, অন্যজন পালিয়ে গেল বাগানের মধ্যে। করিম বন্ডের পাশে বসে কাঁপা হাতে গুলি ছুঁড়বার চেষ্টা করছে।

বন্ডেব দিকে তাকিয়ে করিম বলে— পিস্তলটা কাজ করছে না। ঐ লোকগুলো সব শয়তান বুলগেরিয়ান। ওরা যে কী চায় তা—

আচমকা এক প্রচণ্ড ঘুমি বন্ডকে মাটিতে ফেলে দিল। তার ওপর বুটের আঘাত। তিনটে লোক। ওরা এবার বন্ডকে ছেড়ে কবিমকে মারতে উদ্যত।

আঘাতটা সামলে নিয়ে বন্ড পিস্তলের পিছন দিকটা দিয়ে টেকো বুলগেরিয়ানটার মাথায় বসিয়ে দিল। জিপসী সর্দারের বাঁকা ছুবি দ্বিতীয়টাকে বিদ্ধ করল। তিন নশ্বরটা দৌড়ে পালিয়ে গেল পাঁচিলের ভাঙা জায়গাটায়। সেখানে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করতে থাকলে, বাকি আক্রমণকারীরা ওই পথেই পালিয়ে গেল।

করিম চোঁচিয়ে উঠল— বন্ড ঐ লোকটাই ক্রিলেস্পু। মার ওকে।

কিন্তু লোকটা ততক্ষণে আয়ত্তের বাইবে। বন্ড তার পিস্তল নামাল। ল্যামব্রেটারের শব্দ শোনা গেল। তার মানে, ওরা পালাচ্ছে।

এখন আহত মানুষগুলোর করুণ আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। করিম আর ভাভরা আহত লোকগুলোকে পা দিয়ে উলটে দেখছে। অন্যান্য জিপসীদের সঙ্গে বয়স্কা মেয়েরা বেরিয়ে এসে আহতদের সেবায় লেগে গেল।

বন্ড ভাবে— বারো জন মারা পড়েছে। কিন্তু এরা কাকে খুন করতে এসেছিল? তাকে মেরেছিল ঠিকই, কিন্তু খুনেরা এগিয়ে গেছে করিমের দিকে। কেন? এই নিয়ে দু'বার করিমকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। রোমানোভার ঘটনার সাথে এই ঘটনার কি কোনও যোগ আছে?

উদ্বেজনায বন্ডের সর্বাঙ্গ অস্থির লাগছিল। যে লোকটা করিমকে ছুরি ছুড়ে মেরেছিল, সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে মাটিতেই পড়ে গেল। একদম নিশ্চল হয়ে গেল। বন্ড করিমের কাছে এগিয়ে গেল।

বন্ডকে দেখে করিম বলে— এস জেমস। তুমি আমার অনেকবার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তোমার কাছে আমি ঋণী হয়ে রইলাম।

রেগে গিয়ে বন্ড বলে— চুপ কর ডার্কো করিম। আগে থেকে সাবধান হও না কেন? যে পিস্তল কাজ করে না, সেইসব যন্ত্র সঙ্গে রাখ কেন? সত্যি করে বল তো, ব্যাপারটা কী? দেখ আমার ভীষণ অস্থিত লাগছে। আগে বরং ওই 'রাকি'-র বোতলটা খাওয়া যাক।

টেবিলের কাছে যেতেই ফলবাগানের ভিতর থেকে একটা ভয়ংকর আর্তনাদ শোনা গেল। বন্ড যেন বিরক্ত হল। সে তার পিস্তলে হাত রাখল।

বেশ গভীরভাবে করিম বলে— আমার লোকেরা জানবার চেষ্টা করছে, ওদের উদ্দেশ্যটা কী? এত রাতে আমার এখানে আসাটা ঐ বুলগেরিয়ানরা মেনে নেবে না। ওদের পাঁচজন মারা পড়েছে। ওরা কিছু একটা খুঁজছে।

বন্ড বলে— কবিম, তুমি এক মহিলার প্রাণ বাঁচিয়েছ। আর এই জিপসীরা নিশ্চয়ই জানত, আমার আসাটাও একটা বিপদ হতে পারে?

ওরা মদ খেতে লাগল।

জিপসী সর্দার তার বাঁকানো ছুরি নিয়ে ওদের পাশে এসে বসল। এক পেগ 'রাকি' নিল বন্ডের হাত থেকে। তারপর সর্দার বলে— বন্ড খুব ভালো পিস্তল চালাতে পারে। আমাদের অনেককে বাঁচিয়েছে। ঐ দুটো মেয়েকে দিতে চায় সর্দার বন্ডকে।

করিমের মাধ্যমে বন্ড বলে— তার প্রয়োজন নেই। মেয়ে দুটি খুব ভালো। বরং ওদের লড়াইটা 'ড্র' ঘোষণা করলে সে খুশি হবে। তবে তাদের জাতির ভবিষ্যৎদের জন্য এ দুটি মেয়েকে সে-ই নিক।

বন্দ বুঝল, সর্দার অসন্তুষ্ট। সর্দারের কথা করিম বুঝিয়ে দেয় বন্দকে— এটা বেশ কঠিন ব্যাপার সর্দারের কাছে। তবে বন্দ যখন বলেছেন, তখন সে চেষ্টা করবে।

পান চলাকালীন সর্দার ও করিমের কথার মধ্যে 'ক্রিলেসু'র নাম শোনা গেল।

এবার করিম বলে— বন্দ, ঐ বুলগেরিয়ানদের বলা হয়েছিল, তারা ভাভরা আর তার দলের লোকদের খুন করবার জন্য। ওরা জানত যে, এই জিপসী তার দল নিয়ে আমার হয়ে কাজ করছে। আর একটা ব্যাপার, তোমার সব বিবরণ দিয়ে ওদের বলা হয়েছিল, তোমায় যেন ওরা খুন না করে। মনে হয়, কূটনৈতিক ঝামেলার মধ্যে ওরা জড়াতে চায়নি। আব ওরা ঘুরপথে এসেছিল, কেননা গাড়ির শব্দ চট করে পাওয়া যাবে না। আর কাছাকাছির মধ্যে কোনো পুলিশ টোকি নেই।

বিয়গ্ন হেসে করিম বলে— ভোর হতে আর ঘন্টা চারেক বাকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোলস এসে লাশগুলিকে নিয়ে বসফরাসে ভাসিয়ে দেবে। পাঁচিলটাও সারাতে হবে। হ্যাঁ, সর্দার তোমার মঙ্গল কামনা করে তোমাকে আবার আসতে বলেছে। জোরা আর ভিদাকে তোমাকেই দিতে চায় সে। তাদের স্তনকে তোমার হাতের চাপে শিথিল দেখতে চায় সর্দার। এখন এস, সর্দারের সাথে হ্যান্ডশেক করে বিদায় নেব। সর্দার চায় না, কোনো বিদেশি তাদের মেয়েদের কান্না দেখুক।

ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। রোলস-রয়েস গাড়িতে সোফারের পাশে বসা এক যুবককে দেখিয়ে করিম বলে— এটি আমার দশম পুত্র। নাম বোরিস। ওকে আমাব প্রয়োজন।

বোরিস মুখ বাড়িয়ে বলে— গুড ইভিনিং সাব।

বন্দ শুধু হাসে ওর কথা শুনে।

গাড়ি পাহাড়ি পথ ধরে চলতে শুরু করলে করিম ইংরেজিতে সৌফাবকে বলে— 'হিম্পোড্রোম স্কোয়ার'-এব পাশের সব বাস্তুটা ধবে চল। যেখানে বলব, সেখানে থামবে। জিনিসপত্র সব ঠিকঠাক এনেছ তো?

— আজে হ্যাঁ।

স্মিটে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে করিম বলে— জিপসী সর্দার বলছিল, আমাদের দুজনের মাথার ওপরেই নাকি মৃত্যুর কালো মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। তুমি 'চাঁদের সম্পত্তি'-র কাছ থেকে আব আমি যেন 'তুমার দেশেব সন্তান'-এব কাছ থেকে সাবধান থাকি। বুঝলে বন্দ, এই জিপসীদের কথাবার্তাও কেমন যেন রহস্যময়। আবার সর্দার বলেছে, ক্রিলেসু ওই দুটোর একটাও নয়।

— কেন? —বন্দ বলে।

— দেখ যতক্ষণ না লোকটাকে আমি শেষ করতে পাবছি, ততক্ষণ আমি শাস্তি পাব না। কিন্তু কী কারণে আমার পিছনে লাগা হয়েছে, সেটাও ধবতে পারছি না। তাই এখন আমরা চলেছি সামারা-তে।

॥ উনিশ ॥

গাড়ি ছুটছে।

'কলম অব্ কল্টালিন'। তারপর ডানদিকের রাস্তা।

করিমের নির্দেশে একটা লাইমগাছের ছায়ায় গাড়ি থামাল। জায়গাটা অন্ধকার। ওরা নামল। ড্রাইভারকে জানাল, পুলিশ এলে কী বলতে হবে। বলতে হবে— 'আমি করিম বে-ব পার্টনার।'

বন্ডের সঙ্গে করিমের সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছিল।

করিম বলল— আমরা ঠান্ডা মাথায় খুন করব। এ দেশে আমরা ঘুমন্ত কুকুরকে জাগাই না, কিন্তু কামড়ালে গুলি করতেই হয়। ডুয়েল লড়ার প্রশ্ন নেই। কথাগুলো তোমার ভালো নাও লাগতে পারে।

বন্ড বলল - আমার পিস্তলে আর একটিমাত্র গুলি আছে।

— চল। হাঁটাপথ অনেকটা।

ইস্তানবুলের রাত প্রায়ই বিভীষিকাময়। কয়েকশো বছর রক্ত ঝরে ঝরে জায়গাটা কুখ্যাত হয়ে গেছে। মনে হয়, মানুষ নয়, এখানকার রাতের বাসিন্দারা সব প্রেতাত্মা। সফ্র দুর্গন্ধভরা সব গলি।

দশ মিনিট ধরে তারা হেঁটে চলেছে।

করিম বলল - ওই যে রেললাইন। তার পাশেই কুখ্যাত ফ্রিজ্লেসু থাকে। সামনে একটা দরজা ছাড়াও চোরা দরজা আছে। আমি সময় বুঝে গুলি চালাব। বুঝেছ?

একটা বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং। তার একশো গজ দূরে জায়গাটা ছায়াময়।

করিম বলল— এখানে অপেক্ষা করতে হবে।

চামড়ার কেস থেকে একটা যন্ত্র বের করল করিম। মাইপারস্কেপ। এর লেন্স দিয়ে অন্ধকারেও দেখা যায়। টিউবের আলোতে উদ্ভাসিত হল একটা সিনেমার বিজ্ঞাপন— 'নায়েরা'। মেরিলিন মনরো আব জোসেফ কটন এর ছবি।

করিমেব হাতের ছড়িটা আসলে একটা সাইলেঙ্গার ফিট করা বাইফেল।

করিম বলল— তোমার সাহায্য চাই। তোমার কাঁধের উপর পিস্তলটা রাখব। রাজি?

- বাজি।

সামনে পুলিশ। সে পথ ছেড়ে দিল।

একটা ট্রেন চলে গেল।

এবার হোর্ডিং এ বিরাট মুখটা যেন একটা গর্ত। তার মধ্যে থেকে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল। লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল। কে লোকটা? লোকটা উলটো দিকে দৌড়বে। বন্ড অনুভব করল তাব কাঁধের উপর মৃদু শব্দ। আইলেঙ্গার!

লোকটা মাটিতে মুখ খুবড়ে পড়ল। কিছুক্ষণ শূন্য হাত-পা ছুঁড়ে স্থির হয়ে গেল। এই রকম দৃশ্য অজস্র দেখেছে বন্ড! সে চুপ করে রইল। একেই বলে 'ঠান্ডা মাথায় গুলি করা'। করিমের মাথা ঠান্ডা, গুলিও সে ই চালিয়েছে।

কিন্তু বন্ড নিজে কাউকে 'ঠান্ডা মাথায় গুলি' করেনি কখনও। খুন করা আর খুন দেখায় ঘণা ধরে গেছে তার। তবু—

ওরা ফিরে গেল।

করিম দার্শনিকের মতো বলল— ফ্রেন্ড! জীবন ভর্তি মৃত্যু! মানুষ এখন একটা যন্ত্র, খুন-করার যন্ত্র। রুশীরা নিষ্ঠুর। সেই নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচতে হলে আমাদের খুন করতে হবে। সেই রকমই একটা কাণ্ড ঘটাতে হল এখন। আরও কত বাকি— কে জানে!

বন্ড বলল— তুমি পাওয়ার-পলিটিঙ্গে অভিজ্ঞ। যাকে মারলে, সে একটা চুনোপুটি। এদের মেরে আসল সমস্যা শেষ হবে না। রুশরা 'ম্যাসোকিস্ট'! তারা প্রেমিক-প্রেমিকাদের দিয়ে নিজেদের দেহেও নির্যাতন চালায়। স্তালিনের মার খেয়েছে তারা। ক্রুশ্চেভ কতটা কী পারবে— জানি না! আর ইংল্যান্ডের রাজনীতি হচ্ছে এখন সবাইকে খুশি রেখে তোয়াজ করে চলা।

-- তুমি কি আমার কাজে অসন্তুষ্ট?

— সেটা অনা কথা। তুমি সুদক্ষ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বুঝতে পারছি না, আমার কাজ কতদূর এগোল! তোমার পিছু-পিছু চলছি শুধু। M নিশ্চয়ই অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।
করিম বলল -- আজ রাতে ঘুমাও। কাল কথা হবে।

হোটেলের ঘরে ঢুকে ক্রান্ত বস্ত্র পোশাক ছাড়ল। ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালার দরকার বোধ করল না। ঘড়িতে দুটো বাজে।

হঠাৎ চাপা হাসি। সুরেলা মেয়েলি কণ্ঠ বিছানার ওপর থেকে।

— আহা! মি. বস্ত্র। তুমি খুব পরিশ্রান্ত। বিশ্রাম চাই। এসো, বিছানায় চলে এসো।

॥ কুড়ি ॥

খুবই অস্বাভাবিক চমক, সন্দেহ নেই।

তবু বিছানার দিকে তাকাল না বস্ত্র। জানলার বাইরে চাঁদের আলো, আর এই প্রায়-অন্ধকার ঘরে শুধু বেড-সাইড ল্যাম্পের মৃদু আলো।

এবার তাকাতেই হল। সাদা চাদরের নীচে একটি মেয়ে। অন্ধকারে যতটুকু দেখা যায়, তাতেই সুস্পষ্ট, সেই দীর্ঘদেহী, বাদামি চুল বালিশে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখও চাদরে ঢাকা, তবে চাদর ধরা হাতের সুন্দর চম্পাকলি আঙুলগুলো দেখা যাচ্ছে। চাদরের তলায় দুই স্তন, উদ্ধত একজোড়া পাহাড়চূড়াকে মনে করিয়ে দেয়, তুবারধবল।

বিছানায় বসে প্রথমে চুলগুলোয় মৃদু টানল বস্ত্র। মৃদু প্রতিবাদ। চাদরের একটা কোনা তুলতেই দেখা গেল সমুদ্রের মতো একজোড়া নীল চোখ তাকে দেখছে। *

— তুমি তো অসভ্য!— মেয়েটি বলল।

— আর তুমি! এখানে কেন? কী করে এলে?

— আমিও এখানেই থাকি। দোতলায়। নেমে এলাম।

— আসছি।

— না, না, বিছানায় এসো না।

— এটা আমার বিছানা। তাছাড়া, তুমিই তো বলছিলে আসতে!

— সেটা এমনি বলেছি। আলাপ করতে হলে কথা বলতেই হয়।

— আলাপ? বেশ। আমার নাম জেমস বস্ত্র।

— আমার নাম তাতিয়ানা রোমানোভা। বন্ধুবা তানিয়া বলে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

মেয়েটি বলল— তোমাকে তোমার ফটোর মতোই দেখতে।

বস্ত্র জিজ্ঞেস করল— কী আছে তোমার পরনে?

মেয়েটির গলায় একটা মখমলের রিবন। বলল— শুধু এইটে।

— বাকি পোশাক?

— বিছানার তলায়।

— যদি ঘর থেকে এখন বেরিয়ে যেতে হয়, সম্ভব কি?

— এটা কি ভদ্র প্রস্তাব?

বস্ত্র স্মিপিং স্যুট পরল।

— তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরীদের একজন।

— কিন্তু আমার হাঁ-মুখটা বড়ো। সবাই বলে, আমি নাকি গ্রেটা গার্বোর মতো—

— তার চেয়েও বেশি। উজ্জ্বল। হাঁ-মুখ মানানসই।

— এত কথা কেউ কখনও বলেনি। শুনতে ভালো লাগছে।

সত্যি কথা বন্ধকে দেখার পর তাতিয়ানারও আশঙ্কা দূর হয়েছে। সত্যিই সুপুরুষ! কোনো হ্যাংলামি, ইতরতা নেই। লন্ডনে পৌঁছে যদি কখনও শোনে তার মন জয় করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে, তখন কী ভাবে লোকটা?

— তুমিও খুব সুন্দর। আমেরিকান ফিল্ম স্টারদের মতো।

— ওঃ, একথাটা অপমানের। আমেরিকান ফিল্ম স্টার—

— না, না, আমার এক প্রিয় হিরোর মতো।

— বুঝেছি। শোন, তুমি কি ইংল্যান্ডে যেতে চাও?

— নিশ্চই।

— ভয় নেই তো?

— একটু ভয় আছে। তাতে কী? তুমি তো পাশে থাকবে।

— ঠিক আছে।... কিন্তু মেশিনটা কই?

এইবার তাতিয়ানা যেন একটা সপাট চড় খেল।

— তাই বলো। তুমি শুধু মেশিনটা চাও?

— আমি না। আমার লন্ডন অফিসের লোকেরা চায়।

— তুমি মিথ্যে বলছ।

তাতিয়ানার চোখে জল। সে চাদর দিয়ে মুখ ঢাকে।

বন্দ বলে— ঠিক আছে। মেশিন গোপনীয় যাক্। কিন্তু তাদের কী বোঝাব। তারা আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে নিয়ে যেতে, মেশিন সমেত। মেশিন নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। গায়ের উপর থেকে চাদর কিছুটা সরাল তাতিয়ানা। চোখ মুছল।

— শোনো, মেশিন নিয়ে ভেব না। সেটা আমি আনব। কিন্তু আজ রাতেই আমাদের পালাতে হবে।

শেখানো কথাগুলো মনে পড়ে গেল সুন্দরী রাশিয়ান স্পাই গার্লের।

বন্দ ভাবল, রুশীরা কেমন ফাঁদ পাততে পারে। প্লেনে বোমা রাখবে নাকি?

বন্দ বলে— কোনো চিন্তা নেই। আমরা কাল ভোরের প্লেন ধরব।

যা শেখানো হয়েছে, এখন তাই বলতে হয় তাতিয়ানাকে।

— না, না, বোকামি করো না। আমরা ট্রেন ধরব, ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস। আজই রাত নটা। আমি সব কথা ভেবে রেখেছি। তোমার কোনো চিন্তা নেই। আমরা একটা ‘ক্যুপে’ থাকব। খুব সুন্দর কাটবে আমাদের জার্নিটা— দিনরাত।

— কিন্তু ট্রেনে লন্ডন যেতে লাগে চার দিন, পাঁচ রাত। এতটা সময় পাবে রুশীরা। আমাদের ধরে ফেলবে।

— না, না, ট্রেনেই যাব। তুমি বুদ্ধিমান। ওরা আমাদের ধরতে পারবে না। কর্তৃপক্ষের উপদেশ মনে পড়ে যায় তাতিয়ানার। বন্ধকে লোভ দেখাবে, চারদিন ধরে প্রেম করা যাবে। চুটিয়ে আরাম করব আমরা। মনে রেখো, প্লেনে গেলে— সোজা ব্রিটিশ জেল। আর ট্রেনে অনেক সময় আছে। বন্ডের উপর কড়া নজর রাখবে। কেউ ট্রেন ছেড়ে পালাবে না।

হায় ঈশ্বর!

তাতিয়ানা যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না বন্ডের কথার উত্তর দিতে।

বন্দ বলে— কিন্তু তোমার প্ল্যানটা পাগলের মতো লাগছে। পাসপোর্ট সমস্যা হবে।
বুলগেরিয়ার মধ্যে দিয়ে লোকে ভাববে তোমা? কিডন্যাপ করছি।

— আমি চাই, লোকে তাই ভাবুক।

— হাসির কথা নয়। আমি নয়, অন্য একজন তোমার সঙ্গে থাকবে। মনে পেরো, তোমার নাম এখন ক্যারোলিন সমারসেট। তুমি ট্রেনে গেলে পৌঁছবে কী করে।

— ক্যারোলিন সমারসেট? তাহলে তুমি নিশ্চই মি. সমারসেট। বাঃ। ভাবি মজাব। আমাব জন্য ভেব না। সিরকোসি স্টেশন কোথায় আমি জানি।

— যদি তোমায় ওবা ধরে ফেলে—

— পারবে না। ববং তোমার সম্বন্ধেই আমার ভয় ছিল। এখন নেই।

বন্দ ভাবছে - মেয়েটা কী ঠগ। প্ল্যানটা ভেঙে দেবে? নাকি, সত্যিই আত্মবিক।

তাতিয়ানাকে বৃকেব ওপব টেনে নিল বন্দ।

তারপর চুমুর পর চুমু। অন্তহীন, অশেষ চুম্বন। শেষ হয় না।

একটা হাত রাখল তাতিয়ানার বাম স্তনের উপর। স্তনের বোঁটা উত্তেজনায়ে কঠিন হয়ে উঠেছে। এবার পেটের উপর দিয়ে হাত নামল নীচের দিকে। তাতিয়ানার দু-পা কাঁপছে।

চাদরটা ওর গা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল বন্দ। সত্যিই, তাতিয়ানার শরীরে গলার রিবনটা ছাড়া কিছু নেই। পায়ে কালো মোজা ছিল অবশ্য। তাতিয়ানা বন্ডের সারা শরীর হাতড়াতে লাগল।

আয়নাটা, সেই সোনালি ফ্রেমের আয়নাটার পেছনে স্মার্শের দুজন ফটোগ্রাফার ঘাপটি মেয়ে বসে ছিল। এই ঘরটা হনিমুন দম্পতির জন্য! ভালো কথা। বন্দ-তাতিয়ানার মধুচন্দ্রমাংব দৃশ্য তাদের ক্যামেরায় ভালোভাবেই ধরা পড়ল।

ওরা কেউ এক-বিন্দু টের পেল না সেটা।

রাশিৎ মুভি ক্যামেরা। অল্প শব্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু সেটা ওদের কানে যাবার কথা নয় এখন। ওদের উদ্দাম দৃশ্যে ক্যামেরাম্যানরাও উত্তেজিত, ঘর্মাক্ত। ওরা ওদের কাজ কবছে, কেউ বিছানায়, কেউ আয়নার পেছনে ক্যামেরা নিয়ে। যার যা কাজ!

॥ একুশ ॥

ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ইউরোপ যায় সপ্তাহে তিনবার।

ইস্তানবুল থেকে প্যারিস। ১৪০০ মাইল।

অন্য ট্রেনগুলো বাজে, কুৎসিত। ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস সবচেয়ে ভালো ট্রেন। গন্তব্যস্থলগুলো উজ্জ্বল হরফে লেখা : ইস্তানবুল, থেসালোনিকি, বেলগ্রেড, ভেনিস, মিলান, লুসান, প্যারিস।
বন্ডের হাতঘড়িতে এখন আটটা একাল। আরও চার মিনিট কাটে— আটটা পঞ্চাল। কিছু ট্রেন চলে গেল। প্যাসেঞ্জাররা অনেকেই চাষা শ্রেণির লোক। খুব হইহই করছিল।

স্টেশনমাস্টারের গায়ে বাদামি ইউনিফর্ম। কয়েকজন ধনী তুর্কিও আছে। তারা ট্রেনে ওঠার আগে তাদের শ্রেমিকা বা রক্ষিতাদের চুমু খেল। ফাঁকা হয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম।

নটা বাজে। বন্ডের মাথার উপরে জানলাটা সশব্দে নেমে এল। একজনকে দেখা গেল। কালো ওড়নাটা পাতলা হওয়ায় নীল চোখ দুটো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। ট্রেন সবে চলতে শুরু করেছে, ধীর গতি।

—ওঃ, কী করছে কী! শির্গাগর ওঠো।

বন্ড এবার ক্যাপে ঢুকল। একজন রেল কর্মচারী বলল— ম্যাডাম আসতে লেট করে ফেলেছেন। উনি করিডর দিয়ে কামরায় চলে গেছেন। কম্পার্টমেন্টের কেবিনগুলোর নম্বর পর পর লেখা— ৭, ৮, ৯ ইত্যাদি।

মেয়েটা বসে আছে কোনার দিকে। এই ক্যাপটাই ৭ এবং ৮ নম্বরের। ফারের কোটের বোতাম খোলা। ভিতরে চিনা সিল্কেব জামা, কুমিরের চামড়ার জুতো আর বেন্ট।

— জেমস, আমার উপর তোমার কোনও ভরসা নেই। তাই না?

— তানিয়া, আমার ইচ্ছে করছে তোমার পাছায় একটা চড় মারি। আরেকটু হলে আমার হার্টফেল হত। কী হয়েছিল তোমার?

-- কিছু হয়নি। আসব বলেছিলাম, এসে গেছি, ব্যস।

— ওঃ, গ্যাংক গড।

মেশিনটা এসেছে। তানিয়া বলল— যে যৌতুকটায় তোমার আগ্রহ বেশি, সেটা আনতেই—

বন্ড খুশি, কিন্তু তার চিন্তা— এই মুহূর্তে মেয়েটা কী ভাবছে?

তাতিয়ানা আসলে ভাবছে— এবার কী কী কাজ তার করণীয়। মনে পড়ে, ডিরেক্টর বলেছিল— কর্পোরাল, এই তোমার ইংল্যান্ডের পাসপোর্ট। আব এই ব্যাগে রয়েছে 'স্পেস্টর' মেশিন, দেখে নাও। এটা নিজের কাছেই রাখবে। ইংরেজটার হাতে দেবে না। কারণ, এটা পাওয়াই ওর উদ্দেশ্য।

বন্ড তাতিয়ানার কাছে ঘেঁষে বসল।

মনে পড়ল, কাল রাতের কথা, বিবসনা সুন্দরীর কথা। এ সেই দেশের মেয়ে, যে দেশ ইংল্যান্ডের শত্রু! সে নাকি বন্ডের প্রেমিকা!

তাতিয়ানাকে কাছে টানল বন্ড। ফার কোটের মধ্যে দিয়ে হাত চালিয়ে তার স্তনে হাত রাখল। তারপর চুম্বন, জোরালো, নির্মম!

কে দরজা ঠক ঠক করছে! রুমাল দিয়ে নিজের ঠোঁট থেকে লিপস্টিকের দাগ মুছল বন্ড।

— খুব সম্ভব করিম! ওর সঙ্গে কিছু কথা আছে। আমি এখন আসছি।

বেরিয়ে যাবার আগে বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল— গোটা রাতটা রয়েছে আমাদের জন্য। তবে, তার চেয়েও বেশি ভাবতে হবে, তোমার নিরাপত্তার কথা।

কামরার বাইরে একটা রেলিং-এ ভর দিয়ে করিম দূরে 'সি অব মারমাবা' দেখছিল। ট্রেনটা এখন সাপেব মতো একেবোঁকে চলছে। বন্ড কাছে আসতেই বলল— খারাপ খবর। শত্রুপক্ষের তিনজন এই ট্রেনে উঠেছে

চমকে উঠল বন্ড— সে কী!

— মেয়েটি ডাবল এজেন্ট নয় তো?

বন্ড আবার মানসিক দ্রব্দের শিকার। তাতিয়ানা একটা টোপ! না, না, তা মনে হয় না। এতটা শুধু অভিনয়! অসম্ভব। আচ্ছা, সাইন্সের মেশিনটা ওই ব্যাগের মধ্যে আছে তো? বন্ড কিন্তু এখনও সেটা স্বচক্ষে দেখেনি।

— এক মিনিট—

বলেই ক্যাপে ঢোকে বন্ড।

-- কথা শেষ হল?

-- শোনো, তানিয়া এবার তোমার সঙ্গে কথা আছে।

তাতিয়ানা নিকটবেগ।

বন্দ বলল— ব্যাগটা খোলো। আমি একটু মেশিনটা দেখব।

— তুমি নিজেই খুলে দেখো।

দেখল বন্দ।

— এটাই কি ‘স্পেক্টর’ মেশিন?

— হ্যাঁ।

— এই ট্রেনে MGB-র তিনজন লোক উঠেছে। আমরা জানি, সোমবার তারা তোমাদের সেন্টারে গিয়েছিল।... কিন্তু এখানে তারা কী চাইছে, তানিয়া?

তাতিয়ানার চোখে জল। নিষ্পাপ শিশুর মুখ।

— বন্দ, তুমি মেশিনটা পেয়ে গেছ। এবার আমাদের ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলে দেবে না তো?

— বাজে কথা বলো না। কিন্তু লোকগুলো কী চাইছে? তুমি কি জানতে এই ট্রেনে ওরা উঠবে?

তাতিয়ানা এবার কি কিছু গোপন করার চেষ্টা করছে?

— না জেমস, আমি জানতাম না ওরা কেউ এই ট্রেনে উঠেছে। শুনেছিলাম, ওরা জার্মানি যাবে। প্লেনে যাবার কথা। আর কিছু জানি না। আমরা আগে ইংল্যান্ডে পৌঁছাই। আমরা বিশ্বাস করতে পারো।

মনে মনে তাতিয়ানাও চিন্তিত। কর্নেল ক্লেব কি ওকে সব সত্যি কথা বলেছিল? ওই লোকগুলো কি ট্রেনে উঠেছে শুধু লক্ষ রাখতে ওরা ট্রেন থেকে পালায় কি না! অবশ্য একবার লন্ডনে পৌঁছে গেলে বন্দ তাকে স্মার্টের নজর থেকে সরিয়ে ফেলতে পারবে। তখন বন্দকে প্রয়োজনে সব কিছুই বলা যাবে। কিন্তু লোকগুলো সম্বন্ধে এখন বন্দকে আর বেশি কিছু বলা যাবে না। ওরা টের পেলে বন্দ আর তানিয়া দুজনকেই মেরে ফেলবে।

বন্দ বলল— তানিয়া, কিছু মনে করো না। তুমি আমার কাছে অনেক কথা গোপন করছ। কিন্তু আমার পক্ষে সেগুলো জানা জরুরি। লোকগুলো হঠাৎ ট্রেনে আসেনি। যাই হোক, আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

দরজাটায় তালা ঠিকমতো আটকানো আছে। আজ রাতে ঘুম হওয়া মুশকিল। ‘চাকার উপর হনিমুন’ কাটবে কেমন ভাবে!

দরজায় টোকা। কনডাক্টর। বন্দ বাইরে গেল।

তানিয়ার চোখ বিষণ্ণ, কিন্তু সতর্ক।

করিম বলল— জেমস, এখন তুমিই লিডার। ট্রেনের গুণ্ডা, মেশিন, মেয়েটা— সবই তোমাকে সামলাতে হবে। মেয়েটা তোমার কাছে নিঃশর্তে সারেন্ডার করতে পারে। মনে হয়, তুমি তাই করবে। M- চান, সেটা হোক। তিনি তোমার পলিসিতে সায় দেবেন। তবে এই লোকগুলো—

— এটা আমরা আগে আঁচ করিনি।

— হঁ! কিন্তু এখন ওদের ট্রেন থেকে তাড়াতে হবে। ওরা প্ল্যানমাফিকই এসেছে। তবে ওদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

— কী ব্যবস্থা?

— সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও। এই কাজটার দায়িত্ব আমি নিলাম। এখনও ট্রেন আমার এলাকার মধ্যে রয়েছে। টাকা আর ক্ষমতা আছে আমার। কিন্তু ওদের খুন করা ঠিক হবে না। অন্য ব্যবস্থা হবে। তুমি মেয়েটাকে দেখো।

ট্রেনে অন্যান্য প্যাসেঞ্জার সম্পর্কে খবর নেওয়া হল। ৬ নম্বরে গৌফওয়ালার বেঁটে লোকটা, সঙ্গে জার্মান পাসপোর্ট। ১২ নম্বরে একটা আর্মেনিয়ান, সে নাকি কম্প্রোকশন ইঞ্জিনিয়ার! একজনের টিকিট করিমের পকেটে। কনডাক্টর সেজে সেটা সে যোগাড় করেছে। ফার্স্ট ক্লাসের। কায়দা করে সেটা নিতে হয়েছে। দরজা আটকে রেখে, তলা দিয়ে। ওকে ট্রেন থেকে আগেই নামিয়ে দেওয়া যাবে। কারণ, ও টিকিট দেখাতে পারবে না।

— অন্য দুজন ?

— মাথায় একটা-না-একটা মতলব এসে যাবে। দাঁড়াও না, ওদের এমন প্যাঁচে ফেলব! নিজেরাই আত্মহত্যা করবে!

করিম এবার বন্ডের কাছে হাত রাখল।

— যাও, বাস্কবীর কাছে যাও। কাল সকালে দেখা হবে।

চলে গেল করিম। বন্ড বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইল এই বিশাল চেহারার লোকটার দিকে। শুধু চেহারায় বিশাল নয়, করিম সব দিকেই বিশাল।

॥ বাইশ ॥

বন্ডের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে তাতিয়ানা। ছটফট করছে।

বন্ড বলছে— চিন্তা নেই। আমি জেগে আছি। তুমি ঘুমোবাবু চেষ্টা করো। আমি সতর্ক আছি।

কালের মাথাটা উষ, ভারী। গায়ে একটা চাদর। তার মধ্যে ঢুকলে দুজনে ঘেঁষাঘেঁষি করে শুতে হবে।

ভোর চারটে। টার্কির সীমানায় পৌঁছতে আর ঘন্টাখানেক বাকি।

বন্ড ভাবল— দিনের বেলা ঘুমাতে পারা যাবে। তখন তাতিয়ানা পাহারা দেবে। বন্ডের পিস্তলটা তাকে দেওয়া হবে।

সত্যিই পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল তাতিয়ানা। ঘুমন্ত তাতিয়ানাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। চোখের পিছি স্থির, ঠোঁট দুটোর মধ্যে সামান্য ফাঁক, বন্ডের ভীষণ ইচ্ছে হল একটা চুমু খেতে। কিন্তু তাহলে ঘুম ভেঙে যাবে।

অবশ্য ঘুমাবার আগে তাতিয়ানা জিদ ধরেছিল।

— আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাও। আমার তাহলে ভয় করবে না।

উত্তরে ওর চুল মুঠো করে দেখে অনেকগুলো চুমু দিয়েছিল বন্ড। অভয় দানের চুমু। সেই চুমু খেতে খেতেই চোখ বুজেছিল তাতিয়ানা।

বন্ড এবার অন্য চিন্তায় মন দিল। তুরস্ক পেরিয়ে যাবে ওরা। কিন্তু গ্রিস অতিক্রম করা যাবে কি? তারপর যুগোস্লাভিয়া। টিটো কাদের পক্ষে, কে জানে! তবে দুই দেশের সঙ্গে সঙ্ঘাত রেখে চলছে টিটো।

ওই লোকগুলো কী করবে? ইস্তানবুলে নিশ্চই খবর গেছে— ‘স্পেস্টর’ চুরি গেছে। বেলগ্রেডের রুশ অ্যামবাসি উদ্যোগ নিলে হয়তো তাতিয়ানাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে। ওর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আসতে পারে। তাহলে কি ওরা ট্রেন থেকে নেমে পালাবে? পরে প্লেনে লন্ডন পৌঁছবে?

নানা চিন্তা!

এখন ভোর পাঁচটা। একটু পরেই ওরা যেখানে পৌঁছবে, সেই জায়গটার নাম উজ্জ্বলকোপক।

করিমের খবর কী? ওর কাজ কতদূর সফল, হল। যদি ওই লোকগুলোকে তাড়ানো যায়, ভালো কথা। না হলে গ্রিসের কোথাও মেশিন সমেত ওরা নেমে গিয়ে অন্য পথে লন্ডন পাড়ি দেবে। বেলগ্রেডে অবশ্য করিমের একজন সুদক্ষ সহকারী আছে। দেখা যাক---

কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে পালাতে গেলে আরও বেশি বিপদ হতে পারে। এক ফাঁদ থেকে আরেক ফাঁদ— সেটা জানা নেই।

কতগুলো মালগাড়ি পাস করল। ট্রেনের গতি মস্থর। ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস লাইন বদল করল। থেমে গেল ট্রেন।

তাতিয়ানার মাথার নীচে একটা বালিশ দিয়ে উঠে এল বন্ড।

সব স্টেশনগুলোর চেহারা প্রায় একই রকম। চামি'দর হই-চই।

করিম এল। সঙ্গে দুজন পুলিশ-- সবুজ ইউনিফর্ম! ওয়াগন-লিট কনডাক্টরও রয়েছে।

ওরা করিডোর ধরে এগোচ্ছে। জার্মান ভাষায় কথা বলছে। বিষয়টা হল— একজনের টিকিট ও পাসপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে না। তার নাম হার কুর্ট গোল্ডবার্গ! পরে তদন্ত হবে।

গোল্ডবার্গ MGB র লোকগুলোর একজন। করিম তার সঙ্গেই কথা বলছিল। পাসপোর্ট পরীক্ষা চলছে, সকলেরই। দুজন বয়স্ক ফরাসি মহিলা। তাবা করিম-বে-র সঙ্গে যাচ্ছে।

হঠাৎ চমক।

হার গোল্ডবার্গকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। সে নাকি কনডাক্টরকে ঘুষ দিয়ে বিনা পাসপোর্ট ও টিকিটে ট্রেনে করে যাবার চেষ্টা করছিল। গোল্ডবার্গ উত্তেজিত হয়ে রুশ ভাষায় চিৎকার-টেচামেচি করছে।

দ্বিতীয়জনের নাম হার বেনজ্। তাব কাগজপত্র ঠিক আছে। তবে মালপত্র সার্চ হবে। লোকটার ড্রেসিং গাউনের বা অংশটা ফুলে আছে! বন্ড কিছু বলতে গিয়েও বলল না। এই লোকটা পার পেয়ে গেল।

বন্ড মনঃক্ষুণ্ণ।

গোল্ডবার্গকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন পুলিশ তাকে ধবে নিয়ে যাচ্ছে। ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস আবার যাত্রা শুরু করল। ট্রেন যাচ্ছে বুলগেরিয়ান সীমান্তে ড্রাগোমনের মধ্যে দিয়ে।

ভোরের বাতাস। সূর্য উঠছে।

বন্ড সিদ্ধান্ত নিল— ট্রেন থেকে নামা হবে না।

॥ তেইশ ॥

ট্রেন ছুটছে গালফ্ অব্ এলেজে-র দিকে।

ডার্ক বলেছিল— আরেকটা নতুন দিন শুরু হচ্ছে।

বন্ড দাড়ি কামিয়ে স্নান সাবল। তাতিয়ানা কৌতূহলী চোখে দেখছিল।

করিম এল। বলল— বাঃ, এত সুন্দর গুপ্তচর-দম্পতি আমি আগে কখনও দেখিনি। হ্যাঁ, একটা খবর। মিসেস সমারসেট, তোমার দু-জন কমরেডের চাকরি খুব ট্রাজিকভাবে শেষ হয়েছে।

বন্ড জিজ্ঞেস করল--- কী হল ওদের?

— দুজনের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ— বে-আইনি টাকা, কনডাক্টরকে পাঁচশো ডলার ঘুষ, আরও অনেক মিথ্যে কথা বলা। তবে একটা এখনও টিকে রয়েছে। ওই বদমাস বেনজ্টা!

ওকে এখন কিছু করা যায়নি। যাই হোক, প্রথম রাউন্ডে জিতেছি। বেনজ্ পাশের ঘরেই আছে।
সুতরাং, সাবধান!

চলে গেল করিম। ওদের লাঞ্ছ দেখা হবে।

তাতিয়ানা করিমের ভাষা-ভঙ্গিতে কিছুটা বিরূপ।

— যাই বলো, তোমার বন্ধু যথেষ্ট শিক্ষিত নয়।

— ও একটা অদ্ভুত লোক। ওটাই ওর স্টাইল। তোমার মতো একটা মেয়ে পাওয়ার খুব ইচ্ছে ওর। তাই তোমাকে একটু রাগানোর চেষ্টা করে। এটা আসলে প্রশংসা ও ঘুরিয়ে প্রেম নিবেদন।

সুন্দর দুটি নীল চোখে তাকিয়ে তাতিয়ানা বলে— নিজের আর নিজের রাষ্ট্রপ্রধান সম্বন্ধে কথাগুলি বলা কিন্তু বানিকে অসম্মান করা। এটা রাশিয়াতে অসভ্যতা বলেই পরা হয়।

ওদের কথা চলাকালীন ট্রেন তার গতি মস্থর করে থামল অ্যালেকসান্ড্রোপোলিস স্টেশনে।

লাঞ্ছের টেবিলে তাতিয়ানার সঙ্গে করিমের বেশ আলাপ জমে গেল। MGB-র বেনজ্কে বিয়ার কিনতে দেখে করিম লোকটাকে ব্রিজ খেলার জন্য প্রস্তাব দিতে বলল বন্ধকে। তাতিয়ানাকে রেস্টোরাঁ কার থেকে বেরোতে দেখে বন্ধও উঠে পড়ল। করিম ব্র্যান্ডি আর সিগারেটের অর্ডার দিল।

কামরায় ফিরে তাতিয়ানাকে নিজের পিস্তলটা দিয়ে দরজায় ছিটকিনি আটকে বন্ড তার নরম কোমল থাই-এর ওপর মাথা রাখল।

গোধূলিবেলায় বন্ড চোখ মেললে তাতিয়ানা তার মুখটা বন্ডের মুখের ওপর নামিয়ে এনে বলে— ডার্লিং, ঠিক কতদিন আমবা এভাবে কাটাৰ?

দেহ মনের আলস্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বন্ড ভাবে, লন্ডনে কী হবে পৌঁছোবার পর সেটা জানা যাবে। এটা সত্যি, তাতিয়ানা শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। বিভিন্ন গুপ্তচর দপ্তরও জানতে চাইবে, যে মেশিনটার সাহায্যে তাতিয়ানা চলছে, তাব ব্যাপারে বন্ড কী বলে। তাতিয়ানাকে ডোভারে যেখানে যে ঘরে ঢোকানো হবে সেটার চারদিকে গোপন ফাঁদ বাধা থাকবে। সাদা পোশাকের সুদক্ষ অফিসাররা তাকে তাদের মতো জিজ্ঞাসাবাদ করবে। বেকডিং এবং নেস্টট রুপিং। প্রয়োজনে কোনো সরল সুন্দরী রাশিয়ানকে এনে তাতিয়ানাকে তাতাবে। প্রশ্নকারীরা যদি মনে করে ৩বেই বন্ডকে তাতিয়ানা সাথে মিলিত হতে দেবে। যদি তাতিয়ানাকে নাম পালটে গোপনে হাজার পাউন্ড দিয়ে কানাডা বা অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বন্ডের কি ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষ জানাবে? ওখন ১০ সে তাতিয়ানাকে পারবে কাছে টেনে রাখতে?

তাতিয়ানা চুম্ব খেতেই বন্ড বলে— সেটা ভবিষ্যৎ কর্মধারাই বলে দেবে। আমবা একসঙ্গে থাকতে পারব কিনা সেটা আমি নিজেই জানি না।

মিষ্টি হেসে তাতিয়ানা বলে— তাই বলে যে কটা দিন পাচ্ছি, সেটা আমরা একদম নষ্ট করব না।

বন্ড উঠে বসে।

করিম এলে বন্ড তাকে বলে— আচ্ছা ৩র খবর কী?

করিম বলে— আমার হয়ে কনডাক্টর নজর রেখে যাচ্ছে। আমাদের গন্তব্যস্থল পর্যন্ত দৈনিক সে ১০০ ডলার করে পাবে। — করিম এবার মুদু হাসি হেসে বলে— কনডাক্টরের ধারণা আমরা কোনো স্মাগলারের পিছু নিয়েছি। তুরস্ক থেকে প্যারিসে আফিং স্মাগল হয় এই ট্রেনেই। তবে লোকটা টাকা পেলেই দারুণ খুশি। হ্যাঁ এবার বল, ওই রুশী রাজকন্যার খবর কী? আমার মনে হচ্ছে, বেনজ্ ভয়ে কামরা থেকে বেরোচ্ছে না। তাহলেও বলব যে, আমরা

কিন্তু— মানে, তুমি আমি আর তাতিয়ানা ওই দাবা খেলার বোড়ে— সবচেয়ে ক্ষুদ্র সৈনিক, আমরা যা কিছু এগোচ্ছি, ওরা এগোতে দিচ্ছে বলেই পারছি।

বন্দ অস্থির— কিন্তু ওরা চায়টা কী? চক্রান্ত আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাতিয়ানাও জানে না, সে নিজেও ওই চক্রান্তে জড়িত। সে-ও কিছু একটা গোপন করছে। তবে, অনেক কিছুই বলেছে, ওর উপর বিশ্বাস রাখতে বলছে।

করিম কোনও মন্তব্য করল না।

বন্দ বলল— স্বীকার করা যায়, আমি তাতিয়ানাকে ভালোবেসে ফেলেছি। কিন্তু বোকার মতো ভালোবাসি না আমি। এখন তাতিয়ানার কাছ থেকে আরও কিছু সত্যি কথা জানা আমার পক্ষে সহজ হবে। মনে হয়, তাতিয়ানা শতকরা ৯০ ভাগ সত্যি কথাই বলেছে। সে জানে, আমাকে ঠকানো মানে তার নিজেকেও ঠকানো।

— খেলাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা— হাঃ হাঃ, যাই হোক— আমি হলে মেয়েটাকে মেশিন সমেত নিয়ে সালেনিকা স্টেশনে নেমে পড়তাম। তারপর এথেন্স হয়ে লন্ডন যেতাম। তবে তোমরা জুয়াড়ি, তুমি বা M—দুজনেই। আমি ঝুঁকি নিই না, তোমরা নাও।

খুব সুন্দর করে বোঝাবার চেষ্টা করল করিম।

— ধরো, এটা একটা বিলিয়ার্ড টেবিল। সবুজ কেন্টির ওপর সাদা বলটাকে তুমি ঠিক হিট করেছ। বলটা পকেটে পড়েছে। কিংবা, পাইলটের কাজের সঙ্গেও তুলনা করা যায়। যখন বাজ পড়েছে, বা গ্যাসের মেইন পাইপটা ফেটেছে, খেলায় তো একটা আইন থাকে না!

বন্দ বলল— এসব কথা তো শুনেছি!... এবার তাতিয়ানাকে খেতে আসতে বেলো।

করিম তবু ঠাট্টা করল— আসলে, বিপদের সময় আমি বুকো নয়, পেটের ওপর ক্রশ চিহ্ন আঁকি।

ট্রেন এবার থেস্যালোনিকি স্টেশনে ঢুকেছে।

ডিনার শেষ।

করিম বলল— আমরা সীমান্তে পৌঁছাব রাত একটায়। গ্রিকরা বিশেষ গোলমাল করে না। কিন্তু যুগোশ্লাভরা চাঁচামেচি করে। কেউ জ্বালাতন করলে আমরা খবর পাঠিও। পরের গাড়ির দ্বিতীয় কামরায় আমি আছি। কাল ওই হতভাগা খোল্ডবার্গের বিছানাটা দখল করব, ১২ নম্বরে।

বন্দ নিজের কামরায় এল। তাতিয়ানা আবার তার কোলে মাথা রেখে ঘুমাতে থাকল। আরও তিনটে দিন কাটবে এই মেয়েটার সঙ্গে ট্রেনের মধ্যেই। বন্দ আর বিশেষ চিন্তা করছে না। M-এর সম্পূর্ণ আস্থা আছে বন্ডের উপর।

ইন্ডোমেনি স্টেশন, একেবারে গ্রিক সীমান্তে এসেই।

দরজায় টোকা।

— কে?

— আমি কন্স্ট্রার! আপনার বন্ধু করিম বে-র অ্যান্ড্রিডেন্ট হয়েছে।

পিস্তলটা পকেটে নিয়ে দরজা খুলল বন্দ।

— কী হয়েছে?

— আসুন আমার সঙ্গে।

করিমের কামরার দরজার কাছে ভিড়। সবাই বিমূঢ়। দৃশ্যটা দেখে শিউরে উঠল বন্দ। আপাদমস্তক কেঁপে উঠল তার। দুটো ডেড বডি, মনে হবে মরার দৃশ্যে অভিনয়ের জন্য সিনেমার ক্যামেরার সামনে 'পোজ' দিয়েছে।

একটা দেহ উপরে, একটা নীচে। নীচেরটা করিমের। গলায় ছুরিকাবিদ্ধ, আমূল! শুধু হাতলটুকু বেরিয়ে আছে। মাথাটা ঝুলছে। লাল চোখে শূন্য দৃষ্টি। রক্ত গড়াচ্ছে।

ওপরে MGB-র মোটা লোকটা। ওর নাম বেনজ্। করিমের বাঁ হাতটা তার গলা জাপটে আছে। করিমের ডান হাতের ছুরি সম্পূর্ণ গিঁথে গেছে লোকটার পিঠে। দুজনে দুজনকে ছুরি মেরেছে।

বন্দ কল্পনা করল— প্রথম আঘাত করে বেনজ্, পরমুহূর্তেই করিম।

সেই করিম— উচ্ছল প্রাণবন্ত, এখন নিষ্প্রাণ। জীবন-মৃত্যুর মধ্যে বোধহয় একচুল ফারাক নই! হয়—

এই করিম লোকটা বন্ডের জন্যই প্রাণ দিল।

॥ চব্বিশ ॥

বেলগ্রেড। বিকেল তিনটে।

বুলগেরিয়ার কম্পার্টমেন্টটা এসে যুক্ত হবে। তার জন্য আট ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। জানলা দিয়ে দেখছিল তাতিয়ানা। এই মর্মান্তিক দৃশ্যের শেষ অংশটুকু। তার পরনে এখন সেই ফারের কোট। পুলিশ ফটোগ্রাফার এবং বন্দ যথারীতি ব্যস্ত।

সন্ত্রস্ত তাতিয়ানা ভাবছে, সে যদি একবার বন্ডকে জানায় তার স্মার্সের সঙ্গে যোগাযোগের কথা, তাহলে বন্ড তাকে ছেড়ে চলে যাবে তখুনি। তাই সেটুকু বলা হয়নি।

কামবায় একজন ঢুকল। সে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল— আমার নাম ট্রেসপো, লোকে বলে টেম্পো!

বন্ড কামরায় এল। বুঝল, এ করিমের এক ছেলে।

— বসো।

সব কিছু জানান হল তাকে। ওর মুখে ভয়, সন্দেহ। সব শুনে উঠে দাঁড়াল। কোটের পকেটে হাত রেখে বলল— থ্যাংকস্! এবার আপনারা আমার ফ্ল্যাটে চলুন। অনেক কাজ সারতে হবে।

বৃষ্টি পড়ছে।

একটা পুরোনো মরিস অক্সফোর্ড। তাতে চড়ে ওরা এল টেম্পোর ফ্ল্যাটে। দুটো মাত্র ঘর। টেবিলে মদের বোতল, ফল, দি. ফুট।

— আপনারা একটু রেস্ট নিন। বাথরুম পাশেই। স্নান সারতে পারেন। আমায় কয়েকটা জরুরি টেলিফোন করতে হবে।

সে তার বেডরুমে চলে গেল।

এই ঘরে বন্ড আর তাতিয়ানা, কেউ কোনো কথা বলছে না। বন্ড চুপচাপ পায়চারি করছে। তাতিয়ানা বাথরুমে গেল, স্নান করবে বোধহয়।

টেম্পো আবার এল।

— স্যাব, কিচেনে খাবার আছে। তারপব আপনাদের ট্রেন নটায়। আমি ট্রেনে উঠিয়ে দেব। ততক্ষণ আরামে থাকুন।

আরামে থাকার অবস্থা যে নয়, সেটা সকলেই জানে।

এবার ওর শোবার ঘর থেকে বন্ড টেলিফোনে M-কে ধরল।

— আমার পার্টনার খুব অসুস্থ। কোনো অর্ডার আছে?

— খুবই অসুস্থ?

ইয়েস স্যার।

- অনারা কেমন আছে?

তারা তিনজন ছিল। একজন খুবই অসুস্থ। অন্য দুজনও—

কেউ কি লাইনে আড়ি পেতেছে?

বোধহয় তাই ভেবে M-বলেন— তুমি সত্ৰীক কোন পথে লন্ডনে ফিরতে চাও?

-- আপনিই বলুন, সত্ৰীকে নিয়ে চিন্তা নেই।

- কারও সাহায্য চাও?

- না, তবে যদি আপনি উচিত মনে করেন—

-- তুমি ব্যাপারটা শেষ অবধি দেখতে চাও তো?

ওরা দু'জনে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করছিল। তাই 'ফার্ম' ট্র্যাভেলিং সেলসম্যান—
এসব শব্দ ব্যবহার হচ্ছিল। বলা হচ্ছিল, এই 'সেলস ক্যাম্পেনে'র শেষ পর্যন্ত দেখতে বন্ড
রাজি কিনা!

— মাঝপথে এসেছি। শেষটুকু না দেখলে অনুতাপ হবে।

-- বেশ। তবে আমি আরেকজন সেলসম্যান পাঠাচ্ছি। এনিথিং মোর?

— নো, স্যার।

এরপর ইটালি। তারপর একে একে সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স। এরা ব্রিটেন মিত্র, কিন্তু
তাতিয়ানার ব্যাপারটা কীভাবে শেষ হবে। করিমের মৃত্যুর জন্য কে দায়ী? তাতিয়ানাকে হযতো
গুপ্তচবের কাজেই লাগানো হয়েছে, কিন্তু সেটা সম্পর্কে সে নিজে জানে না। তাকে সেটা
বোঝানো হয়নি। করিমের মৃত্যু যে কারণেই হয়ে থাকুক, তার সঙ্গে তাতিয়ানার কোনো
যোগাযোগ থাকতে পারে না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল তাতিয়ানা। তাকে জড়িয়ে ধরে এতক্ষণে একটা চুমু দিল বন্ড।
বোধহয় বোঝাতে চাইল, তাকে সন্দেহ করে না সে। তাতিয়ানার মুখ উজ্জ্বল।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সারল ওরা।

এবপর আবার ট্রেন। টেম্পো ওদের 'সি-অফ' করল। এই ট্রেনটা যাবে সাজা উপত্যকা
দিয়ে।

কনডাক্টর, স্ত্রী— সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত।

একে একে ভিনকোসি, ব্রড, তারপর জাগনেব। এখন লজ্জলিয়ানা, পাহাড়ি অঞ্চল।

ভোর হয়েছে। ওরা প্রেকফাস্ট সারল। রুটি, এগফ্রাই, কফি।

রেস্তোরাঁ কারে ইংরেজ ও আমেরিকানদের ভিড় এবার। এরপর পশ্চিম ইউরোপ।
আরেকটা বাত এগিয়ে আসছে!

এক সময় আরও কিছুটা এগিয়ে ট্রেন থামল ট্রিয়েন্ট-এ।

হঠাৎ জানলা দিয়ে একটা মুখ দেখা গেল। চেনা-চেনা লাগছে। লোকটার হাতে
'রেভেনশন' সুটকেস। সোনালি চুল, সোনালি গৌফ।

লোকটা এগিয়ে এসে বন্ডের দিকে তাকাল। সে কি বন্ডকে চেনে? চোখ দুটো ঝাপসা, কিন্তু
কী যেন বলতে চায়। লোকটা ফার্স্ট ক্লাসে ঢুকল।

এবার বুঝতে পারল বন্ড। হ্যাঁ, একেই M পাঠিয়েছেন। নতুন সহকারী। লোকটা ঝাপসা
চোখে শুধু সেটুকুই বোঝাতে চেয়েছিল। যথাসময়ে যোগাযোগ করবে।

M প্রথমেই ছড়োমুড়ি করেন না। এই স্টাইলেই চলেন বরাবর।

এখন রোদ উঠেছে।

বন্দ বাইরে করিডোরে এল। সেই সোনালি মুখটা খুঁজে পেতে দেরি হল না।

লোকটা এগিয়ে এল— এক্সকিউজ মি, ম্যাচিস আছে?

— আমি লাইটার ব্যবহার করি। — লাইটার এগিয়ে দিল বন্দ।

— হুঁ, ভালোই তো।

— হুঁ, যতক্ষণ না খারাপ হয়ে যায়।

লোকটা রেনকোট খুলেছে। পরনে টুইড কোট, ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার, হলুদ শার্ট, লাল ডোরাকাটা টাই। আঙুলে সোনাব আংটি।

বন্দ লোকটার কাজ, অভিজ্ঞতা, স্বভাব-চরিত্র বুঝে নিল। খুব সম্ভব মিলিটারি পুলিশ থেকে গুপ্তচরবাহিনীতে এসেছে। পদোন্নতি হয়েছে নিশ্চয়ই।

পরিচয় হবার পর আরও খবর জানা গেল। হঠাৎ ‘জর্করি আহান’ পেয়ে আতঙ্কিত হয়েছিল। তারপর বন্দের সাহায্যে কাজ করতে হবে জেনে আরও নার্ভাস। বুদ্ধি কতটা ধবে কে জানে, তবে বেশ শক্তিশালী লোক। প্রহরী হিসেবে উপযোগী বটেই।

একটা মুদ্রাদোষ আছে। কথায় কথায় ‘ওল্ডম্যান’ শব্দটা ব্যবহার করে। কেন যে করে, ও-ই জানে। তাছাড়া, ওপর থেকে খানিকটা পাংগল-পাংগল মনে হয়। বন্দ ওকে বুঝবার চেষ্টা করে।

— শোনো, তুমি আসায় খুশি হয়েছে আমি। এখন তোমার বিশেষ কিছু করার নেই। তিনজন রুশ স্পাইকে ইতিমধ্যে তাড়ানো হয়েছে। তবে এই ট্রেনে আবার শত্রুপক্ষের লোক আসবে কি না কে জানে! আমার প্রথম কাজ, এই সঙ্গিনী মেয়েটাকে নিরাপদে লন্ডনে পৌঁছে দেওয়া। আমার নাম জেমস বন্দ, মেয়েটার নাম ক্যারোলিন সমারসেট! আমিও তাই ওর স্বামী সেজে ডেভিড সমারসেট ছদ্মনাম নিয়ে চলেছি।

লোকটা বন্দকে একটা প্যাকেট দিল। নোট ভর্তি। আর একটা কার্ড— লেখা আছে, ‘ক্যাপ্টেন নরমান ন্যাশ! রয়াল অটোমোবাইল ক্লাব।’

— থ্যাংক ইউ, মিঃ ন্যাশ। এসো, মিসেস সমারসেটের সঙ্গে আলাপ করো।

ওরা কেবিনে ঢুকল। তাতিয়ানা চমকিত।

— এ হচ্ছে ক্যাপ্টেন ন্যাশ, আমাদের সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছে।

তাতিয়ানা হেসে তাকে বসতে বলা সত্বেও দাঁড়িয়ে রইল সে। সহজবোধ করার জন্য তাতিয়ানা একটা সিগারেট চাইল। তখন সিগারেট দিয়ে নিজের লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিল ন্যাশ। বন্দকে বলল— আপনি নেবেন না, ওল্ডম্যান?

বন্দ বলল— থ্যাংকস!... আচ্ছা ন্যাশ, তুমি কি টেনিস খেল?

— না, সাঁতার কাটি।

— তাই এত ফিট চেহারা তোমার! ট্রিয়েন্ট কতদিন রয়েছ?

— প্রায় তিন বছর।

— কাজটা কেমন?

— সেটা তো আপনিই ভালো জানেন, ওল্ডম্যান।

মহা মুশকিল। কথাবার্তা চালালে, এই ‘ওল্ডম্যান’ কথাটা শুনতে হবে বারবার।

হঠাৎ ন্যাশ একটা খবরের কাগজের পাতা এগিয়ে দিল।

— এটা দেখেছেন, ওল্ডম্যান?

হেডলাইন : ইস্তামবুলে মারাত্মক বিস্ফোরণ, সোভিয়েত অফিস চূর্ণ।

বন্ড ব্যাপারটা বুঝল। কাগজের কাটিংটা ফেরত দিয়ে বলল— সত্যিই মর্মান্তিক ব্যাপার! বোধহয় গ্যাসের মেইন পাইপ ফেটেছিল!

করিম-সুডঙ্গ, সেই অ্যাডভেঞ্চার, বিস্ফোরণ— সব কথাই মনে পড়ে গেল বন্ডের। এমনকি সেই ইঁদুর-বাদুড়ের কথাও। কয়েক হাজার ইঁদুরও মরেছে, মিটিং ঘরে মরেছে শত্রুপক্ষের তিনজন।

ন্যাশ মামুলি সুরে বলল— বোধহয়, সেইরকমই কিছু হবে। গ্যাস পাইপটাই—
লাঞ্ছনের ঘন্টি বাজল।

— ন্যাশ, তুমিও তো লাঞ্ছ খাবে। চলো।

— আমার খাওয়া শেষ। ট্রেনটা একটু ঘুরে দেখব।

— ও, আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখা হবে।

— নিশ্চই!

ষাত্রীরা দুজনকেই দেখছে। পুরুষরা তো তাতিয়ানাকে দেখবেই, কিন্তু মেয়েরাও দেখছে। বন্ড মদের অর্ডার দিল— কিয়ান্তি ব্রোগলিও। তারা বলল— যাক, লোকটা আসাতে ভালোই হয়েছে। তবে ইংল্যান্ডে না পৌঁছানো পর্যন্ত শাস্তি নেই। লন্ডনে ফিরে গোটা এক হপ্তা ঘুম মারব।

এরপর কিছুক্ষণ ন্যাশকে নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হল।

তাতিয়ানা বলল— লোকটার চোখ দুটো বিশ্বাসযোগ্য নয়। N-A-S-H কথাটার রুশ অর্থ 'আমাদের'।

বন্ড বলল— না, না, লোকটা সাদামাটা।

এবারে কথায় হালকা সুর। তাতিয়ানা বলল— তুমি আমাকে খাইয়ে খাইয়ে এমন মোটা করে দিও না যাতে আমার প্রেম করতে অসুবিধে হয়। বেশি খেলে আমাকে ধোলাই দিও।

— বেশ।

— অনেক খেয়েছি। ঘুম পাচ্ছে।

ট্রেন এবার মায়োস্টে ঢুকেছে।

বন্ড বলল— ভেনিসে পৌঁছতে আর এক মিনিট লাগবে। ভেনিস তোমার ভালো লাগে না?

— ওঃ, এখন তো শুধু একটা স্টেশন। এখন চাইছি, তোমাকে ভালোবাসতে।

এবার শয়্যায় মিলন পর্ব। ছেড়ে ফেলা জামাকাপড় মেঝেয়। দুটো শরীর এক, প্রেমের উত্থান, ভেনিসে থামার সময় তাতিয়ানার কণ্ঠে তৃপ্তির আর্তনাদ!

কিছুক্ষণ হাঁক-ডাক, হুন্না। আবার যাত্রা শুরু। পাদুয়া, ভিসেনজী পেরিয়ে গেল ট্রেন।

হঠাৎ জানলার কাঁচে ন্যাশের মুখের ছায়া। বন্ডের কনুই ধরে বলল— শত্রুদের একটাকে চিনেছি, ওল্ডম্যান।

বন্ড জানত, আজ রাতে কিছু একটা ঘটতে পারে।

— কে সে?

— আমেরিকান পাসপোর্টে নাম আছে উইলবুর ফ্রাঙ্ক। কিন্তু ওটা ছদ্মনাম। টিয়েস্টে দু-বার এসেছিল। খুব সম্ভব আলবেনিয়ায় শত্রুপক্ষের রেসিডেন্ট ডাইরেক্টর।

— কোথায় সে?

— তোমার ঠিক পাশের কামবায়, ৯ নম্বরে, ওল্ডম্যান।

— তুমিও আমাদের কাছে থাকো। আজ রাতে, মানে মেয়েটাকে—

— ও. কে, ওল্ডম্যান।

ডিনার টেবিলে ওর উপযুক্ত ম্যানাসের অভাবে আবার বিরক্ত তাতিয়ানা। ন্যাশও বুঝতে পেরে বারকয়েক অ্যাপোলজি চেয়েছে।

হঠাৎ তাতিয়ানা অসুস্থ হয়ে পড়ল। খুব সম্ভব মাথা ঘুরছে। সিট থেকে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম।

ন্যাশ ওকে তুলে ধরে বলল -- চিন্তা করবেন না! আমি কামরায় নিয়ে যাচ্ছি। বিল মিটিয়ে দিয়ে আপনি ঝটপট চলে আসুন।

তাতিয়ানা বলার চেষ্টা করল 'আমি ঠিক আছি', কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আরও টলে পড়ল। ন্যাশ কিন্তু অত্যন্ত সুদক্ষ হাতে তাকে ধরে বাইরে চলে গেল। বন্দকে স্বীকার করতে হল— ওপর থেকে আনাড়ি মনে হলেও লোকটা আসলে খুবই কাজের।

তাতিয়ানার কামরায় এসে দেখল— ঘুমিয়ে পড়েছে।

ন্যাশ বলল— আমার ধারণা হঠাৎ মাথা 'রিল' করেছিল। এখন ভালো আছে। ঘুমাচ্ছে। তাতিয়ানার হাতটা বেশ ঠান্ডা। মরার মতো ঘুমাচ্ছে।

ন্যাশ একটা মোটা বই বের করল— 'ওয়ার অ্যান্ড পিস', বলল— আপনিও ঘুমান। আমি বই পড়ছি, নজর রাখছি। লোকটা কিছু করলেই আপনাকে ডাকব!... পিস্তল আছে তো?

— তোমার পিস্তল কই?

— নেই। বাড়িতে একটা পুরোনো 'লুগার' আছে।

— তাহলে আমার পিস্তলটাই তোমার কাছে রাখো। আটটা গুলি আছে। সেমি-অটোমেটিক।

ন্যাশ ওটা নেড়েচেড়ে বলল— একটু হালকা বটে, তবে ঠিকমতো চালালে খুন করা কঠিন হবে না।

একটা কোনায় জুত কুরে বসল সে।

— এটাই ভালো পোজিশন।

বন্দ আলো নিভিয়ে দিল, শুধু শোবার সময়ের ডিম আলোটা জ্বলছে।

ট্রেন এবার একটা টানেলের মধ্যে ঢুকছে।

॥ ছাঞ্চি ॥

হঠাৎ ঘুম ছুটে যায় বন্ডের। পায়ে মৃদু চাপ।

চোখ খুলে দেখে,— না, কিছু তো নয়। সবই ঠিক ঠিক আছে। জানলার পাশে ন্যাশ বসে আছে। কোলের ওপর বই।

ন্যাশ বলল— ওঠো ওল্ডম্যান! আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমার সঙ্গে কথা বলি।

এখন হঠাৎ ন্যাশের গলার স্বরে আদেশের সুর!

এবার 'ক্লিক' শব্দ। কী একটা যেন বন্ডের কবজিতে আছড়ে পড়ল। মাঝামাঝি আঘাত! মনে হল, কবজিটা ভেঙে গেল!

সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো কাঁচের টুকরো ছিটকে এল।

বারুদের গন্ধ। ধোঁয়ায় ভবে গেছে।

প্রচণ্ড আতঙ্কিত বন্দ!

তাহলে এটাই চাল! কোনো সন্দেহ নেই, মস্কো থেকে এসেছে ক্যাপ্টেন ন্যাশ। M তাকে মোটেই পাঠাননি। আর পাশের কামরায় MGB এজেন্টের কথাটা নিছক গল্প। তাছাড়া, বন্ডের পিস্তল এখন ন্যাশের হাতে।

ন্যাশের গলা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। উদ্ধত স্বর।

— সোজাসুজি কথা বলাই ভালো। এই বইটা আসলে একটা যন্ত্র। এর মধ্যে দশটা বুলেট আছে। ২৫ দমদম, ইলেকট্রিক ব্যাটারি দিয়ে ছুড়তে হয়। রুশরা এর ব্যবহার বেশ ভালো জানে।

সবই সংক্ষেপে জানাল ন্যাশ। এখন তো বন্ড তার হাতের মুঠোয়। বলতে বাধা কোথায়?

— আধ ঘণ্টা মাত্র সময় আছে তোমার বিদায় নেবার। এখন তাকে ওল্ডম্যান না বলে ব্লাডি-ফুল বলাই ভালো। বুঝলে তো, তুমি মোটেই বুদ্ধিমান নও, তুমি একটা খড়ের পুতুল!

বন্ডও কঠোর গলায় বলল— হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমায় শোনাও। আমি তোমায় আধ ঘণ্টা সময় দিতে রাজি আছি।

লোকটার কাছে মানসিকভাবে হার স্বীকার করা চলবে না।

— ওল্ডম্যান, আবার ছল-চাতুরির চেষ্টা করো না। তুমি ঠিক সময়েই মরবে। তোমাকে মারাই আমার কাজ। আর জীবনে কোনও কাজে আমি কখনও ভুল করিনি।

— কে তুমি?

— আমি স্মার্শের প্রধান জহুদ! স্মার্শ, স্মার্শ! নামটা তোমার খুবই পরিচিত, তাই না ওল্ডম্যান?

স্মার্শ!

সত্যিই বন্ডের কাছে এর চেয়ে ভয়ংকর নাম আর কিছু নেই। সেই স্মার্শের প্রধান ঘাতক তার সামনে এখন! এর চোখের লাল আগুন দেখে বন্ডের সন্দেহ হয়েছিল একবার। এরা 'সাইকোপ্যাথিক' খুনে— মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এরা খুনি হতেই জন্মেছে। গ্রহরাশিচক্র কাজ করে বলে জানা গেছে। এরা উন্মাদ, বিশেষ ধরনের উন্মাদ! উন্মাদনায় খুন করে। খুন করে উন্মাদনা কমে, তখন আসে ডিপ্রেসন, মানসিক অবসাদ। ভাভরা এই রকম রাশিচক্রের কথা বলেছিল খুনিদের সম্পর্কে।

বন্ড বলল— ন্যাশ, তোমার উপর চাঁদের কোনো প্রভাব আছে। মুন তোমাকে অবস্থা বুঝে পাগল করে দেয়। অথবা সিংহ রাশি, লিও—

— ওঃ, মিস্টার সিক্রেট সার্ভিস! চূপ করো, বেশি পাণ্ডিত্য ফুটিও না। ভাবছ, আমি পাগল! আরে, পাগল হলে স্মার্শ কি আমায় বড়ো একটা দায়িত্ব দিত?

— কিন্তু মেয়েটা—

— আঃ, ও এখন অবাস্তর। ওর মদের গেলাসে এক চিমটে 'ক্লোরাল হাইড্রেট' মিশিয়ে দিয়েছিলাম। বাস, যথেষ্ট! আজ রাতে ওর জ্ঞান ফিরবে না। পরে অবশ্য যা করা হবে যাতে কোনো সময়েই জ্ঞান না ফেরে। সেটা পরের কথা!

— শুনলাম। এবার তোমার পুরো কাহিনিটা শোনাবে?

— ওল্ডম্যান, আবার বলছি, সাবধান। বেশি স্মার্ট হয়ে চাল চালতে যাবে না। আমার পিস্তলের বুলেট সঙ্গে সঙ্গে তোমার হার্ট ফুটো করে বেরিয়ে যাবে। একটা বুলেটই যথেষ্ট। আমার টিপ কেমন ভুলে গেছ? সেই রিস্টওয়াচটার কথা ভাব!

— তুমি ভয় পেয়ো না। তোমার কাছে যে পিস্তলটা সেটা তো আমার। ওটাকে আমি অনেক ভালো চিনি। যাই হোক, গল্পটা—

— ঠিক আছে। গল্পই শোন। নড়ো না। এমনকি কান চুলকাতে গেলেও হার্ট ফুটো হয়ে যাবে। যাক, এখন কথা বলতে বাধা কই! বিশেষ করে এক মৃত্যুপথযাত্রীর সঙ্গে।... হ্যাঁ, তোমায় স্মার্স খুন করতে চেয়েছিল, কারণ সেটাই হতো ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরকে একটা জোর ধাক্কা!

— কেন? আমায় বাছা হল কেন? এত লোক থাকতে—

— তোমার বেশ কুখ্যাতি আছে। নাম-ডাক। সেই কুখ্যাতি বা সুখ্যাতি এবার অবশ্য গুঁড়ো হয়ে যাবে। যাই হোক, এর আগে স্মার্স বেশ কয়েকটা ভুল করেছে। খক্লোভের ব্যাপারটা, তাছাড়া—। যাই হোক, তোমার নামটা সাজেস্ট করেছিল ফ্রনস্টিন নামে একটা লোক। নাম-করা দাবা খেলোয়াড়।

— ও, তাই বুঝি? তাবপর?

— আমাদের অপারেশন ডিপার্টমেন্টের হেড এক অদ্ভুত মহিলা। আবার কিনা, সে পৃথিবীতে খুনি নস্বর ওয়ান। অজস্র খুন করেছে সে, অসংখ্য। নাম রোজা ক্রেব।

ওঃ, স্মার্সের মধ্যে মহিলাও আছে। মহিলা খুনি। পৃথিবীতে এক নস্বর খুনি। ইস, তার সঙ্গে যদি একবার দেখা হত— বন্দ ভাবল।

ন্যাশ বলতে থাকে— এই রোমানোভা মেয়েটা তারই আবিষ্কার। ওকে ট্রেনিং দেওয়া হয়। তার কাজে পাঠানো। তা, কেমন কাজ কবল? বিছানায় কেমন লাগল ওকে? মনে হয়, ভালোই! যাক, সেসব ছবি তোলা আছে। ওটা যাদের কাজ, তাবা বুঝবে। আমার সেদিকে আগ্রহ নেই। শুনেছি ১৬ মিলিমিটারের রিল। কাগজে স্টিল ফটোগুলো ভালোই ছাপা যাবে।

বন্দ বলল— মেয়েটা কি জানত, এসব ছবি তোলা হচ্ছে? সে কি জানত স্মার্স তাকে দিয়ে কাজ করচ্ছে?

— না, ছবিগুলোর কথা জানত না। এসব তাকে বলাই হয়নি। রোজা তো তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। তাছাড়া তাতিয়ানা বেশ ইমোশনাল মেয়ে। ইমোশন থাকলে অসুবিধা, সেটা তো তুমিও বোঝ! তবে হ্যাঁ, সে যে স্মার্সের হয়ে কাজ করছে, এটা অবশ্যই জানত।

বন্দ ভাবে— ইস, মেয়েটা সত্যি বুদ্ধিহীন! কেন বলেনি সে স্মার্সের লোক। আসলে ভয় পেয়েছিল। ভেবেছিল, শোনামাত্র বন্দ ওকে জেলে পাঠাবে। শুধু বন্দ নয়, স্মার্স তাতিয়ানাকেও বোকা বানিয়েছে। অবশ্য অনেক সহজে।

ন্যাশ বলে— আগে তোমার তুর্কি বন্ধুটাকে খতম করা দরকাব হয়ে পড়ে। ও-ই আমাদের ইস্তানবুলের সেন্টার ধ্বংস করেছে। তোমাকে মারার পর আমার প্রথম কাজ ওই ট্যানেলটায় ঢোকা। তোমার হার্টে গুলি কবব, তারপর মেয়েটার ঘাড়ে। মেয়েটার ডেডবডি জানলা দিয়ে ফেলে দেব। তারপর তোমায় আরেকটা গুলি করে তোমার পিস্তলটা তোমার হাতেই ধরিয়ে দেব। প্রথমে লোকে আত্মহত্যা বলে ধরুক না! প্রেমঘটিত? হতে পারে। ‘স্পেক্টর’ মেশিন পেলে ওকে বিয়ে করবে বলেছিলে। সেটা কাটতেও পারে। যদি ‘বুথিট্র্যাপ’ লাগানো থাকে। মেয়েটাকে দিয়ে একটা চিঠি লেখানো হয়েছে হয়তো। সে তোমায় মেশিন দেবে, আর নিজের দেহ দেবে! মোটকথা, সেক্স, স্পাই, লাস্সাণি ট্রেন, ছদ্মবেশী মি. আন্ড মিসেস সমারসেট— সবই আছে। জমট গল্প! ইন্টাবেস্টিং! তাই না ওল্ডম্যান? বোধহয় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাহিনি হতে পারে।

বন্দ ভাবে— এ কথাগুলো সত্যি! শ্রেষ্ঠ কাহিনি হবার মতো উপাদান আছে এই অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে।

কিন্তু, সংকট থেকে মুক্তি পেতেই হবে। ঈশ্বরকে স্মরণ করে বন্দ।

‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’-টা পড়ে আছে।

মরিয়া হয়ে আরও বেশ কিছুক্ষণ ন্যাশের সঙ্গে বকবকানি চালায় বন্দ।

টোকিওতে কী হয়েছিল? তারপর ট্রিয়েটের কার্যকলাপের বিশদ কথা। ন্যাশের কতরকম দক্ষতা, কায়দা-কানুন! সব শুনে বন্দ মস্তব্য করল— ওঃ, আমাকে মারার জন্য স্মার্মাকে এত পরিশ্রম করতে হয়েছে!

ট্রেন এবার ইতালির সীমান্তে পৌঁছেছে। জায়গাটার নাম দামাদোস্যোলা।

বন্দ বলল— আমার শুধু একটা প্রশ্ন—

— বলে ফেলো, ওল্ডম্যান!

— একটা সিগারেট দাও না!

— নাও। কায়দা করো না। আগেই বলেছি।

সাবধানে কেস থেকে সিগারেট বের করে বন্দকে দিল ন্যাশ।

— হ্যাঁ, এবার বলো, কী প্রশ্ন তোমার?

— শেষমেষ তুমি কী করবে। টানেল থেকে বেরোনোমাত্র তো তোমায় কন্ডাক্টর ধরবে।

— আরে, দূর দূর! ডিঞ্নে একটা গাড়ি থাকবে। সেটা আমাকে প্যারিস নিয়ে যাবে। আমার নাগাল কেউ পাবে না। গল্পে আরেকটা ক্যারেকটার থাকতে পারে, যে তোমার বুক থেকে বুলেটটা বের করবে। সে ভাববে— নানা কথা—

— সে কথা থাক, তুমি তারপর—

— আমি রোজা ক্রেবের কাছে রিপোর্ট দেব। রিংজ্ হোটেল, রুম নং ২০৪। তার গাড়ির ড্রাইভার সেজে সোজা বার্লিন। দুজনেই চম্পট দেব। ওঃ, এবার আমি নিশ্চই ‘অর্ডার অব লেনিন’ পাব!

ট্রেন চলছে। আর কতক্ষণ?

বন্দ ভাবে, সে নিজেও কিছু ভুল করেছে। তাতিয়ানা তো মহা ভুল করেছেই। একটু সাবধান থাকলেই তারা এই রকম চরম বিপদ এড়াতে পারত। কেন বন্দ এককথায় ‘ন্যাশ’কে M-এর লোক বলে মেনে নিল? সামান্য পরীক্ষা করল না? তাতিয়ানার প্রেমে এত অনুরক্ত হবার আগে কেন ভালো করে সবদিক ভেবে দেখল না?

প্রথম রাত্রিটা মনে পড়ে। তাতিয়ানার উলঙ্গ শরীরে শুধু গলায় রিবন, আর পায়ে কালো মোজা। বলতে গেলে, বন্দ সেই নগ্ন সৌন্দর্যের কাছে নিজের মস্তিষ্ককে বিসর্জন দিয়ে দিল। ওঃ গড! হোয়াট আ ব্লান্ডার। বন্দ অনুশোচনায় দক্ষ হতে থাকে।

মৃত্যু আর কয়েক সেকেন্ড দূরে!

ট্রেনের শব্দটাই যেন তার আগমন ঘোষণা করছে, গুরুগুরু গর্জন!

বইটা তো একটা যন্ত্র। তার পুট থেকে গুলি ছুটে আসে। মলাটে ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস লেখা। টলস্টয়ের ছুতো করে এক ধাঙ্গা।

— শেষবারের মতো তোমার ঈশ্বরকে ডাকো—

বলার সঙ্গে বুলেট ছুটে আসে। মাত্র দু’গজ দূর থেকে। বন্ডের বুকে বিদ্ধ হয়।

॥ সাতাশ ॥

মেঝের উপর লুটিয়ে আছে বন্ডের দেহ।

হ্যাঁ, নিখুঁত টিপ বটে। একটি বুলেটই নাকি যথেষ্ট হবে! তাই হয়েছে।

কিন্তু বুলেটটা বন্ডের হার্ট ফুটো করেনি। সেক্ষেত্রে লক্ষ্যটা নিখুঁত হয়নি। এক চুলের জন্য হার্ট বেঁচে গেছে, কিন্তু পাজরগুলো জ্বলে যাচ্ছে।

বন্দ বুঝল -- না, আমি মরিনি। কিন্তু এই অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে কতক্ষণ বাচব, জানি না।
মরার ভান করে হাত-পা ছড়িয়ে নিজীব হয়ে শুয়ে রইল বন্দ। চোখে সামান্য দেখতে
পাচ্ছে সে— নাকেব সামনে ন্যাশের জুতোর মুখটা!

আটাচিসি কেসটার কাছে ক্ষুরের মতো ছুবিটা আছে! কিন্তু সেটার কাছে হাত পৌঁছবে না।
বন্দ টের পেল, ন্যাশ উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার তার গুলি বিদ্ধ করবে তাতিয়ানার ঘাড়।
বন্ডের 'বেরেটা' পিস্তলটাকেই কাজে লাগাবে ন্যাশ। বন্ডের পিস্তলের গুলিতেই তাতিয়ানা
মরবে! হায়! কী ট্রাজেডি, মর্মান্তিক!

অর্ধ অচেতন অবস্থায় বন্ডের মস্তিষ্ক কিন্তু কাজ করছে।

পুরুষের শরীরের কোনো অঙ্গে আঘাত করলে সে মাঝে মাঝে পাবে? অ্যানাটমি অনুযায়ী,
অবশ্যই পুরুষের নিম্নাঙ্গের কোনও অংশ। সেটা লড়াঙ্কু বন্ডের বিলক্ষণ জানা ছিল। যেখান
দিয়ে প্রধান শিরাটা গেছে। উরুর হাড় আর নিতম্বের হাড়— femora এবং iliac — যেখানে
ডোঁড় খেয়েছে। কুঁচকির ঠিক মাঝখানে। সেই মোক্ষম জায়গাতে হিট করতে পারলে মানুষ
মরবে, অথবা চিরকালের মতো অক্ষম, পঙ্গু হয়ে যাবে! কিন্তু লোকটাব চেহারা বিকট দৈত্যের
মতো। খালি হাতে কাবু করা অসম্ভব। তাই—

তাই, ওই ধারালো, দুদিকে ধার-ওয়াল ছুরিটা চাই।

কী করছে ন্যাশ? নাকেব সামনে বাদামি জুতোর ডগাটা নেই। তার মানে, ন্যাশ উঠে
দাঁড়িয়েছে! বোঝা যাচ্ছে, বন্ডের শবীবটাকে ডিঙিয়ে যাবে ও। একটা পা উঠিয়েছে। ফলে ওর
দুই-উরুর মাঝে, কুঁচকির সেই মাঝামাঝি প্রাণঘাতী অংশ বন্ডের হাতের কাছে! আর কয়েক
মুহূর্তের মধ্যেই এসে যাবে।

অতি কৌশলে, প্রচণ্ড যন্ত্রণা চেপে কেস-এর পাশ থেকে ছুরিটা হাতে পেল বন্দ।

হ্যাঁ, লোকটা বন্ডের শরীর ডিঙাবে। এক পা-উঠিয়ে বন্ডের দেহ পেরিয়ে ওপাশে
রেখেছে। তাতিয়ানার কাছে যাবে সে! ওর দু-পায়ের মাঝখানে বন্ডের আহত দেহ, মৃতবৎ।
দ্বিতীয় পা-টাও উঠছে। দুই পায়ের মধ্যস্থল, সন্ধিস্থল এবার বন্ডের হাতের নাগালে।

বিদ্যুৎবেগে ছুরি চালান বন্দ! এক আঘাতে প্রায় সম্পূর্ণটা ঢুকে গেল নাশের দুই কুঁচকির
মাঝখানে! প্রাণদায়ী শিরা দু-টুকরো হয়ে গেল, ছিন্ন হয়ে।

— আঃ, আঃ —

এক বিকট মরণমুখী জন্তুর আর্তনাদ!

ঠং করে বেরেটা পিস্তল মোঝতে পড়ে গেল। পরমুহূর্তেই ন্যাশের অতিকায় দেহ আছড়ে
পড়ল মেঝের ওপর।

দড়াম!

এক হাত বাড়িয়ে একটা পায়ের গোড়ালি চেপে ধরল বন্দ। জুতো সুদু পা-টা মোচড়াতে
লাগল। নিদারুণ মোচড়, যাতে গোড়ালির হাড় ভেঙে যায়। আরেক হাতে বাংকের রড ধরে
ব্যালেন্স রেখে ওঠার চেষ্টা করল বন্দ। টের পেল, ন্যাশের আঙুলগুলো ওর উরুতে আঁচড়
কাটার চেষ্টা করছে, মৃতপ্রায় জন্তুর মতো!

কিন্তু বন্ডের পক্ষেও লড়াই চালানো সম্ভব নয়। মাথা ঘুরছে তার, চোখের তারায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আসছে। আর বেশিক্ষণ নয় মৃত্যু তার জন্যেও এগিয়ে আসছে!

হঠাৎ এটা কী? কী যেন হাতে ঠকল!

আরে সেই বই-যন্ত্রটা, যার পুটের ফুটো দিয়ে গুলি বেরায়, কিন্তু মলাটে লেখা থাকে
'ওয়ার অ্যান্ড পিস'।

মরিয়া হয়ে বোতাম টিপল বন্ড।... ক্রিক, ক্রিক, ক্রিক—

ঝাঁঝরা হয়ে গেল ন্যাশ, প্রায় নিঃশব্দে। তার শিথিল দেহ গড়িয়ে গেল। প্রাণহীন।

হাঁপাচ্ছে বন্ড! মৃত্যু আর কতদূর!

এখনও চোখে দেখতে পাচ্ছে সিলিং-এ বেগুনি আলোটা, তবে সেটা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে।

ক্রমাগত ঘামছে সে। চোখে জ্বালা।

বুঝতে পারা যাচ্ছে না, ট্রেনের শব্দটা কী স্রিয়মাণ! ট্রেনটা চলছে তো! হ্যাঁ, টানেলের মধ্যে দিয়ে পাস করার ঝামঝাম শব্দ-শোনা গেল, কিন্তু তারপর ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস অতি মস্থর।

দাঁতে দাঁত চেপে কোনও মতে উঠে বসল বন্ড। এবার চোখ কাজ করছে। লাইনের ওপর আলোর ঝকঝকি, ট্রেন থামছে।

ন্যাশ মরেছে কি? নিশ্চিত হওয়া যায় না।

অবশ্য দেখা যাচ্ছে ওর শরীর মরা কাঠের মতো স্থির। শক্ত হয়ে উঠেছে।

আঃ, ট্রেন ছাড়বে কখন? এরপরে থামবে আল্লাসে— ক্যান্টন ভ্যালেস।

মানুষের দেহে নাকি দশ পাইট রক্ত থাকে। ক্রমশ, সমস্ত রক্তটাই ভ্যালেসের শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে। গড়িয়ে প্যাসেজের দিকে না যায় যেন! বিছানার চাদর কেটে টুকরো করে রক্ত মুছতে শুরু করল বন্ড।

জল ছিল, এক জাগ ভর্তি জল শেষ হয়ে গেল।

তাতিয়ানা বেঁচে আছে তো! ওকে কি লোকটা বিষ দিয়েছিল?

তাতিয়ানার গলায় হাত রেখে ত্বকের উষ্ণতা টের পেল বন্ড। কানের লতিতে চিমটি কাটায় সামান্য নড়ে উঠল তাতিয়ানা। বাব্বার চিমটি কাটতে থাকল বন্ড, যাতে মেয়েটার এই মুহাম্মান অবস্থা কেটে যায়। যেন ঘুমের ঘোরে তাতিয়ানা বলে উঠল— আঃ, বিরক্ত করো না!

যাক, তাতিয়ানা সুস্থ, জীবিত।

বন্ড তাকে মৃদু ঝাঁকুনি দিতে থাকল। চোখে মুখে জলের ছিটে দিল। পাশ ফিরে চোখ মেলল তাতিয়ানা। নীল চোখ।

গলার স্বরে বিরক্তি— কী, হয়েছেটা কী?

আবার চোখ বুজল তাতিয়ানা। তার ঘোর কাটছে না।

অবশ্য তাতিয়ানার মুখটা অসুস্থ অসুন্দর দেখাচ্ছে। জোরালো ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। বন্ড ওর চুলের ঘাম মুছে দিল। তাতিয়ানাকে উপর থেকে নামিয়ে আনল নীচের বাংকে।

ট্রেন পৌঁছল ভান্সেরবেস— এটা ফ্রান্সের সীমান্ত অঞ্চল।

করিডোরে এল বন্ড। কিছু লোক নেমে গেল ট্রেন থেকে।

কামরায় ফিরে ন্যাশের হাতঘড়িটা নিজের হাতে বাঁধল বন্ড। এখন সাড়ে চারটে।

তাতিয়ানা চোখ মেলে আবার চোখ বুজল।

কনডাক্টরের সাহায্য নিল বন্ড : ম্যাডামের শরীর খারাপ। আমরা ডিজনে নামব।

— কোনো চিন্তা নেই। তাছাড়া ট্রেনে ডাক্তার আছে। আমরা আপনাদের ঠিকমতো সাহায্য করব।

মোটো বকশিশ পেয়ে খুশি কনডাক্টর।

স্টেশন। ডিজন। তাতিয়ানাকে বের করে এনে দরজা টেনে দিল বন্ড। ভিতরে পড়ে রইল
ন্যাশের মৃতদেহ।

সুন্দর প্র্যাটফর্ম।

তাতিয়ানা টলতে টলতে হাঁটছে। বলাই হয়েছে, সে অসুস্থ।

ওবা হাঁটছে, হাঁটছে। চলে গেল ট্রেন!

॥ আঠাশ ॥

ঘড়িতে এখন এগারোটা পঁয়তাল্লিশ।

ট্যান্ড্রি এসে দাঁড়াল যে হোটেলটার সামনে, তার নাম রিজ্‌। ক্যান্সেল দিয়ে প্রবেশপথ।

বারের দিকে এগিয়ে গেল বন্ড। ডবল ভদকা-মার্টিনেব অর্ডার দিল। কয়েক চুমুক দিতে
মনটা চান্সা হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে তার ট্রিটমেন্ট হয়েছে। গুলি বের করা হয়েছে। মনের খুশিতে শরীর চান্সা হয়েছে
অনেকটা।

মনে হচ্ছে, এ যাত্রা কর্মকাণ্ড শেষ।

তাতিয়ানা এখন অ্যামব্যাসিতে। নিজের শোবার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে।

বিশ্বেস্বারক-সমতে স্পেস্ট্রটা নিয়ে গেছে Deuxieme Bureau-র বন্ড ডিসপোজাল
স্কোয়াড। সেখানকার চিফ ম্যাথিসের সঙ্গে কথা হয়েছে বন্ডের।

এই হোটেলের দ্বাররক্ষীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছিল পুলিশ। বন্ডকে যেন এক চাবি
দেওয়া হয়— ‘পাস-কি’— যা দিয়ে হোটেলের যে কোনো ঘরের দরজা খোলা যায়।

কৌশলগত কার্যকলাপও ভেবে নেওয়া হয়েছে। একটা বাস্কেট থাকবে, তার মধ্যে থাকবে
যা যা প্রয়োজন।

খবর আছে, তাতিয়ানা অ্যামব্যাসি থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে গেছে। লাঞ্চার
পরে ফিরবে বলে জানিয়ে গেছে।

মার্টিনি শেষ করে বন্ড এবার এল নির্দিষ্ট কক্ষের দরজায়।

এটা চারতলা। রুম নম্বর ২০৪। হ্যাঁ, তাই তো ন্যাশ বলেছিল!

দরজায় টোকা মারার পর শুনতে পেল— ভেতরে আসুন!

কণ্ঠস্বর এক বৃদ্ধার, মৃদু কম্পিত।

পাস-কি’র দরকার হল না। দরজা খোলাই ছিল; হ্যান্ডেল ঠেলে ঢুকল বন্ড।

বেশ সাজানো ঘর। লাল কার্পেট।

ডেস্কে বসে এক বৃদ্ধা কী যেন বুনছিল। জানলার রোদ এসে পড়ছে তার সর্বাস্কে। চোখে
হালকা নীল বাই-ফোকাল চশমা।

— কুই মঁসিয়ে।

অর্থাৎ, ‘হ্যালো মিস্টার’— বৃদ্ধা বলল।

বৃদ্ধার চোখে বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। বন্ডকে দেখেও। তবে কি সে ভুল ঘরে ঢুকে
পড়েছে? সাদা চুল এক বৃদ্ধা। একে তো মোটেই স্মার্শের কর্মচারী বলে সন্দেহ করা যায় না!
রিটায়ার্ড লাইফ যাপনকারী এক ধনী বৃদ্ধা মাত্র! বুকো বুলছে সফ্রু চেনে বাঁধা চশমা। পায়ের
কাগো বোতাম লাগানো জুতো।

এ কী করে রোজা ক্রুব হবে?

বন্ড বলল— আমি বন্ড, জেমস বন্ড।

— আমি কমটেস্ মেট্রস্টেন। বলুন কী চাই?

উচ্চারণে ফরাসি সুর, মনে হয় জার্মান-সুইস।

— ক্যাপ্টেন ন্যাশের মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে। তিনি তাই আজ আসতে পারছেন না। তার বদলে আমাকেই আসতে হল।

চোখ কঁচকে বৃদ্ধা বললেন— ক্যাপ্টেন ন্যাশ? দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, কিন্তু এই নামে কাউকে আমি চিনি না। আপনিও অপরিচিত। বসুন। আমি কী করতে পারি বলুন?

একটা আর্মচেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল বৃদ্ধা।

খুবই ভদ্র আচরণ। বস বসল, প্রায় ছ-ফুট দূরে এই চেয়ারটা। এবার বৃদ্ধাকে একটু খুঁটিয়ে লক্ষ করল— সাদা চুল, পাউডারের প্রলেপ, কুৎসিত ব্যাণ্ডের মতো মুখ, হলুদ চোখ, পাতলা গোর্গের রেখাও আছে নাকের নীচে।

উল বুনছে বৃদ্ধা। কিন্তু বোনার কাঁটাগুলো একটু অদ্ভুত ধরনের।

— বলুন, মঁসিয়ে!

বস এবার পরিষ্কার সিদ্ধান্তে এল। বেশি মারপ্যাচে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। খুব দৃঢ় অথচ সহজভাবে বলল— শুনুন, আমার সঙ্গে অ্যাকটিং করার কোনো দরকার নেই। তুমি আসলে রোজা ক্লেব। স্মার্শের দ্বিতীয় বিভাগের প্রধান। তুমি দুর্দান্ত খুনি। তাছাড়া, কীভাবে অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়ে স্বীকারোক্তি বা কথা আদায় করতে হয়, সে ব্যাপারে তোমার অপারিসীম দক্ষতা। আমাকে আর তাতানিয়াকে তুমি খুন করতে চেয়েছিলে। যাই হোক, তোমার সঙ্গে অবশেষে দেখা করে আমি খুশি।

কোনো ভাবান্তর নেই বৃদ্ধার। শুধু গলার স্বর কিঞ্চিৎ কঠোর হল।

— মঁসিয়ে, আপনি উন্মাদ। বন্ধ উন্মাদ! আমি লোক ডাকছি, আপনাকে গेट পর্যন্ত এগিয়ে দেবে।

বৃদ্ধা কলিং বেলের বোতামের দিকে হাত বাড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বস। টুকরো হয়ে গেল চেয়ারটা। পিস্তল হাতে নিল বস।

এবার রোজা ক্লেব ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। টেলিফোনের মুখে ধোঁয়া কেন? ওর উলের কাঁটাগুলো ধারালো অস্ত্রের মতো ঝকঝক করছে। একটা কাঁটা বন্ডের পায়ে বিদ্ধ হচ্ছিল, কিন্তু লাথি মেরে ক্লেবকে ছিটকে ফেলে দিল বস।

এবার বুঝল বস— কাঁটার মুখে নিষ্প্রভ নীল রং আসলে নার্ভের বিষ, জার্মানদের তৈরি। দেহে আঁচড় লাগলেই—

ক্লেব আবার ছুটে এল। এবার কাঁটার আঘাত আসছে মাথার উপর। চট করে মাথা সরাল বস। কাঁটাটা গিয়ে বিঁধল দেয়ালে।

ক্লেবের মাথার পরচুলা খুলে গেছে। সাক্ষাৎ ডাইনি।

এবার সে রুশ ভাষায় বিড়বিড় করছে। বন্ডের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। পিস্তলটা ঠিকমতো বের করতে পারছে না বস। খাপের সঙ্গে আটকে গেছে। তাই চেয়ারটা তুলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল।

ক্লেব এবার এগিয়ে গেল সেই তথাকথিত ফলস টেলিফোনের দিকে। বোতাম টিপতে গেল।

নিজের আর্ম চেয়ারটা মাথার উপর তুলে ক্লেবের গায়ে প্রচণ্ড জোরে আছড়ে দিল বস।

আশ্চর্য। একগাদা বুলেট ছিটকে পড়ল চারদিকে। কিছু প্লাস্টারের গুঁড়ো ঝরে পড়ল বন্ডের মাথায়।

এবার চেয়ারের পায়াগুলো দিয়ে বৃদ্ধাকে আটকে দিল বন্ড। ঠেলতে ঠেলতে দেয়ালের দিকে নিয়ে গেল। ক্রুবের পিঠ ঠেকে গেল দেয়ালে। কিন্তু লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ক্রুব। অসম্ভব শক্তি তার। তাকে আটকে রাখতে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছে বন্ডকে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ডের গায়ে, মুখে ক্রমাগত থু-থু ছেঁটছে রোজা ক্রুব। তার হাতে বিষ-মাখানো কাঁটা উদ্যত এখনও।

চেয়ারে চার পায়ের মধ্যে আটকে তাকে দেয়ালে ঠেলে রেখে হঠাৎ তার কবজিতে একটা জোর লাথি কষাল বন্ড। রোজা ক্রুবের হাত থেকে বিষ-মাখানো কাঁটা ছিটকে গেল। কাঁটাটা বন্ডের মাথার উপর দিয়ে উড়ে পিছনের দিকে পড়ে গেল।

ক্রুব ভাষায় নিশ্চই কোনো গালাগাল দিল ক্রুব। এখনও সে সমানে থু-থু ছিটিয়ে চলেছে।

বন্ড বলল— শোনো রোজা ক্রুব, তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। খেল খতম। *Deuxieme* এখানে আসছেন এখনই। তোমাকে লন্ডন নিয়ে যাওয়া হবে। তোমাকে হোটেল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া কেউ-ই টের পাবে না। তুমি এখন আর কোনো ব্যক্তি নয়, একটা নম্বর মাত্র। ফাইলে তোমার নামের পাশে একটা নম্বর পড়বে। সেটাই তোমার পরিচয় হবে। তারপর তোমার শেষ আশ্রয় হবে উন্মাদ-গারদে।

ক্রুবের মুখ যেন তেলমাখা।

— আমি যখন পাগলা গারদে থাকব, তখন তুমি কোথায় থাকবে বন্ড?

— থাকব। কোনো এক জায়গায় থাকব! বেঁচে থাকব।

— ওহে ইংরেজ গুপ্তচর, সে সম্ভাবনা নেই। জেনে রাখো।

দরজা খুলে হাসতে হাসতে ম্যাথিস ঢুকল। সঙ্গে দুজন লোক, তারা লন্ড্রিতে কাজ করে।

ম্যাথিস বলল— আহা, মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যাও, তোমার একটা বড়ো বেতের ঝুড়ি নিয়ে এসো। সেখানে ওকে আরাম করে শুইয়ে দাও।

ওরা ওদের কাজ করছে। ক্রুব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বন্ডের দিকে। এবার এক পায়ের জুতো দিয়ে অন্য পায়ের গোড়ায় চাপ দিল ক্রুব। সঙ্গে সঙ্গে একটা আধ-ইঞ্চি ফলার ছোট্ট ছুরি বেরিয়ে এল। সেই ছুরির মূণ্টাও ধোঁয়াটে নীল রং, অর্থাৎ বিষ-মাখা।

এদিকে ওই দুজন লোক বেতের ঝুড়িটা ক্রুবের কাছে নিয়ে এল। ম্যাথিস হুকুম দিল— এই ঝুড়িতে ঢেকে ওকে বাইরে নিয়ে যাও।

বন্ড বলল— আবার দেখা হবে।

হলুদ চোখ মেলে রোজা ক্রুব বলল— বাই, মি. বন্ড!

নাটক হয়তো এই রকম শাস্তভাবেই শেষ হবে বলে সবাই ভেবেছিল। তা হল না।

রোজার জুতোর আগাটা ইম্পাতের। এবার সে বন্ডের গায়ে লাথি ছুড়ল। সেই স্টিলের মুখে একটা ধারালো ধাতব জিভ এক ইঞ্চি বেরিয়ে ছিল। বন্ডের পায়ের ডিমে অসহ্য যন্ত্রণা! পিছু হটে এল।

লোক দুটো পাকড়ে ধরল রোজা ক্রুবকে।

ম্যাথিস বলল— স্মার্শের লোক কখনও বদলায় না। যাই হোক, বন্ধু তুমি ক্লাস্ত। অ্যামব্যাসিতে গিয়ে বিশ্রাম নাও। ডিনারে দেখা হবে। প্যারিসের সবচেয়ে ভালো ডিনার। সঙ্গে থাকবে সবচেয়ে সুন্দরী এক মেয়ে।

এই হাসি-ঠাট্টার অবস্থা নয় বন্ডের। তার শরীর ক্রমশ ঢলে আসছে। হাত-পা শিথিল। হাত বুলে পড়ছে, অবশ্য হয়ে যাচ্ছে।

নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অথচ কাউকে বলা যাচ্ছে না।

ম্যাথিসরা রোজা ক্রেবকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মনে মনে বলল— সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা তো রাশিয়া থেকেই এসেছে। তার দেখা পেয়েছি।

কিন্তু একথা মুখ দিয়ে বের হল না বোধহয়।

কার্পেটের উপর আছড়ে পড়ল বন্দ!

কাহিনি কি অসমাপ্ত?

কী হল বন্দের। চিরজয়ী বন্দ এখন কীভাবে বাঁচবে?

আসবে নিশ্চই ঈশ্বর প্রেরিত কেউ! যেমন বরাবর এসেছে, যেমন বরাবর ঘটেছে!

মুনেরকার

॥ এক ॥

রিভলবারের গর্জন। দুটো আটত্রিশ ক্যালিবার একসঙ্গে গর্জে উঠল।

সাধারণত এমন হয় না। ঘরের দেয়াল কাঁপছে। চরম আত্মবিশ্বাস নিয়ে বন্দ অপেক্ষা করছে। নিজের বন্দুকের নল এখন কিছু তাক করেনি।

ইনস্ট্রাক্টর এগিয়ে এল। বন্দ বলল— তাহলে কি আপনাকে হারাতে পারলাম না?

— আমি হাসপাতালে, কিন্তু আপনি মৃত। — হাসল ইনস্ট্রাক্টর!

তারপরে আধখানা ছবি, পোস্টকার্ড সাইজের অর্ধেক। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে থাকল ওরা। কালো জ্যাকেটের বাঁদিকে হার্টের উপর একটা ছোটো আলোর স্পট।

বন্দ বলল— যখন পেটে গুলি লেগেছে, তখন আমি কত দেব?

— কুড়ি রাউন্ডের জন্য ছিয়াত্তর।

— সোমবার বাজিটা দ্বিগুণ ধরব।

— ধরতে পারেন। লাভ নেই। আমি এখনও বলব পুরোনো রিভলবারটা ছেড়ে রেমিংটনটা নিন। টার্গেট প্রায় সেন্ট পারসেন্ট বিধতে পারবেন। প্রতিযোগিতার নাম 'ভিউ অ্যান্ড ট্রফি!'

— বাদ দিন, আমি আপনাকে হারাতে চাই।

— ঠিক আছে, কাল সকাল দশটা, ভুলবেন না।

সিক্রেট সার্ভিসে বন্দ দক্ষ নিশানদার। কিন্তু এই কথাটা গোপন ফাইলে আছে। জানেন শুধু M এবং বন্ডের বস।

এই বাড়িটা গুপ্তচর বাহিনীর মূল অফিস। লিফটে চড়ে বন্দ ন-তলায় এল।

বন্ডের মাথায় এখনও সেই গুলি ছোঁড়ার খেলা ঘুরছে। ইস্, আরও ভালো, সুদক্ষ হতে হবেই। রিভলবারটার বিশেষত্ব আছে। ফটোতে মনে হয় চক্ দিয়ে মার্কামারা বন্ডের মশো সে দাঁড়িয়ে।

লিফটে আরেকটু আলো থাকলো ভাে' হত। লিফটম্যানটা নুলো, এক হাতে হ্যান্ডেল ঘোঁরায়। স্মল আর্মস ডিফেন্স ম্যানুয়ালে লেখা আছে, 'এক টুকবো কার্ডবোর্ড বিধলেই দক্ষতার প্রমাণ হয় না।'

লিফট থেকে নেমে বন্দ করিডোর দিয়ে হাঁটতে থাকল।

মিনিষ্ট্রি অব্ ওয়ার্কস। ডানদিকের দরজায় থামল সে। দরজায় টোকা দিল সে।

এখন সকাল এগারোটা।

এখানে নানা গোলমালে ব্যাপারের ছবি ও কাগজপত্র থাকে। চুরি-ডাকাতি, স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ সংগম ইত্যাদি। ওয়াশিংটন, ইস্তামবুল, টোকিও থেকে স্পেশাল প্যাকেট আসে।

দরজা খুলে সুন্দরী সেক্রেটারি বলল— শুভ মর্নিং।

— শুভ মর্নিং। লিল।

সুন্দরীর মুখে একটা অস্বস্তি।

--- কোটটা খুলে আমার দিন। কার্বাইডের কটু গন্ধ আসছে। আরেকটা কথা—

— কী ?

— আমাকে লিল বলে ডাকবেন না।

— ওঃ! কিন্তু তোমার পুরো নামটা বড়ো খটমটে— লোয়েলিয়া পন্সোনবি!

মেয়েটা সুন্দরী। বস্তুকে 'তুমি' বলে, বেগে গেলে 'আপনি'। আকর্ষণীয়, কিন্তু একটু বয়েস হয়েছে। ঠিক সময়ে বিয়ে না হলে মেয়েদের মধ্যে একটা অকারণ কর্তৃত্বের ভাব এসে যায়। ০০-সেকশনের কয়েকজন কর্মী লিল-এর সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে চোট পেয়েছে। ওরা রাগ করে বলে— মেয়েটা ফ্রিজিড! যৌনপ্রবৃত্তি নেই, একেবারে নীরস।

এই ব্যাখ্যাটা অবশ্য আদৌ সত্য নয়। সিক্রেট সার্ভিসে চাকরি অনেকটা দিনমজুরের মতো। কেউ আজ আছে, কাল নেই। তাই হৃদয়বৃত্তি দিয়ে কারুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চায় না লিল, কিন্তু শরীর নিয়ে শুচিবাই নেই। এখানে মেয়েদের সামনে দুটি পথ। যে কোনো একটা বাছতে হবে হয়, বিয়ে করে, প্রেম করে সংসার নিয়ে থাকো; নয়, দেশসেবা করো, আজীবন কুমারী থেকে যাও।

তাই মাঝে মাঝে রেজিগনেশন দেবার ইচ্ছে হয়। কিন্তু তার পদে সে এখন গুরুতর দায়িত্বে।

বস্তু ঠাট্টা করল— শুধু সোমবার তোমাকে লিল বলব। অন্যান্য দিন মিস পন্সোনবি। কী খবর আছে, বল।

মেয়েটির পরনে সাদা শার্ট, নীল স্কাট।

— 'পাউডার-ডাইনে ০০৪' ফিরেছে। বার্লিনে বিশ্রাম করছে।

কাজটা হাসিল হয়েছে। বার্লিনে বিশ্রাম, মানে অবস্থা ভালো নয়। 'পাউডার ডাইন', মানে এই বাড়িতে যেটা মেয়েদের রেস্টরুম। সেখান থেকে খবরগুলো ধীরে ধীরে আসে।

একটা ফোল্ডারের উপর লেখা : 'একান্ত গোপনীয়', ০০১১-এর খবর কী? (বস্তুর নম্বর ০০৭)। এক জায়গায় টাইপ করা : মেন লাইন : পূব থেকে পশ্চিমে পালাবার পথ।

ম্যাসিডোনিয়ান ব্লেন্ড-এর সিগারেট ধরিয়ে ফাইলে মন দিল বস্তু।

যতই হোক, ডিউটিটা কিন্তু একঘেয়ে। কাজ, তাস খেলা, নিকরুপ প্রেম। তবে যখন বিপদ আসে—

বস্তু কখনও ছুটি নেয় না। নিয়ম আছে, একেকটা কাজের শেষে পনেরো দিন বিশ্রাম। বছরে আয় ১৫০০ পাউন্ড। তা ছাড়া আরও নানাভাবে উপার্জনের পথ তো আছেই।

কিংস রোডের ছোটো ফ্ল্যাটে থাকে বস্তু। সুপারচার্জড বেন্টলি গাড়িটাও আছে, যেটা ঘন্টায় একশো মাইল বেগে এমনিতেই চালানো যায়।

পাঁচটা সিগারেট শেষ হল ফাইল-পড়া শেষ করতে।

'মেনলাইন' ফাইলটা এবার সই করে 'out'-ট্রেতে রাখল বস্তু।

বেলা বারোটা।

আরেকটা ফাইল নিল বস্তু। NATO-র ফাইল। রেডিও ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের। নানা পয়েন্ট দেওয়া আছে :

১। ইনসপেক্টরস্কোপ — বে-আইনি জিনিস খোঁজার যন্ত্র।

২। ফিলোপোন — খুনের জন্য জাপানি ওষুধ।

৩। ট্রেনে লুকোবার জায়গা। নম্বর II। জার্মানি।

৪। স্মার্স-এর নানা পদ্ধতি। নম্বর ৬। অপহরণ।

৫। পিকিং যাবার পাঁচ নম্বর পথ।

৬। ব্লাডিভোস্টক। ইউ. এস থান্ডারনেটের গুপ্ত পরিক্রমা।

এই ফাইলটা তেমন জকবি নয়।

NATO-ব কাগজপত্রে কিছু তথ্য আছে। রেডিও অপারেটরদের কৌশল বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৪০ সালে পেড্রো নামে এক তরুণ জার্মানি চিলি থেকে খবর পাঠাত। এক বছর পরে সেই বে-আইনি ট্রান্সমিটার ধরা পড়ে। বাঁ হাত দিয়ে সে খবর 'ট্রান্সমিট' করত। এখন বহু ট্রান্সমিটার অপারেটরদের কবজিতে বেঁধে দেওয়া হয়।

টেলিফোনে বস-এর গলা।

— একবার আসবে?

— কে বলছেন? M?

— ইয়েস।

-- খবর এইটুকু · তুমি এলে তিনি দেখা করবেন।

— আসছি।

লিফটে দশতলার দিকে উঠল বন্ড।

॥ দুই ॥

কার্পেটে ঢাকা করিডোর। দু'পাশে কর্মচারীদের গুঞ্জন।

M-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি মিস মনিপেনি। গায়ে তার নীল দাগওয়ালা শার্ট। সামান্য হাসি-ঠাট্টা হল দুজনের মধ্যে।

— লাক্ষে আসবে?

— নিশ্চই।

— আগে কর্তার সঙ্গে দেখা করে আসি।

M-বললেন— এসো। ছুটি কেমন কাটল?

— মন্দ নয়। ধন্যবাদ। তবে প্রচণ্ড গরম ওখানে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে M বললেন— শোনো জেমস, এখন তুমি কী করছ?

— তেমন কিছু নয়। শুধু ফাইল দেখছি, কাজ পেলে ভালো।

— করবে তো? তবে ঠিক দপ্তরের ব্যাপার নয়, একটু ব্যক্তিগত।

— বলুন।

— মাত্র এক সপ্তের কাজ। জাস্ট ওয়ান ইভিনিং! ...আচ্ছা, একটা লোকের নাম শুনেছ, স্যার হিউপোড্রাক্স।

— হ্যাঁ! 'সানডে এক্সপ্রেস' তার জীবনী ছ'পছে।

— কী জানো তাব সম্বন্ধে?

বন্ড একটু ভাবল। তারপর বলল— প্রথম কথা, তিনি এখন দেশের মহানায়ক, আ ন্যাশনাল হিরো। লোকে তাকে প্রায় মহামানব ভাবে। মুখে যুদ্ধেব ক্ষতচিহ্ন। বড়োবড়ো কথা বলতে ভালোবাসেন। মেয়েরাও মুগ্ধ। তবে নিজের টাকা দিয়ে কিছু দেশসেবা করেছেন। ঠাট্টা করা হয়, তিনি বোধহয় প্রধানমন্ত্রী হতে চান! মোট কথা, সফল ব্যক্তি।

M-এর চোখে শীতল দৃষ্টি।

বন্ড বলতে থাকল— যুদ্ধের বিপদ থেকে দেশকে বাঁচিয়েছেন, আমার চোখে এটাই তার বড়ো কাজ। বয়েস... চল্লিশের কিছু বেশি। তবে এই কোটিপতি লোকটার ব্যক্তি-পরিচয় রহস্যময়। আসলে তিনি কে— সেটা কেউ জানে না। কিন্তু, মনে হয়, লোকটা খুব একলা, নিঃসঙ্গ!

M-বললেন— হ্যাঁ, তোমার কথায় 'সানডে এক্সপ্রেস'-এর গল্পের গন্ধ পাচ্ছি। আমি খুব একটা জানি না।...আচ্ছা, সানডে এক্সপ্রেস-এ আর কী কী লেখা হয়েছে?

— জার্মানরা কিছু লোককে 'পিশাচ' বলত। মানে, ১৯৪৪-এ আর্ডেন আক্রমণের সময় যাদের সাহায্যে জার্মানরা নাশকতার কাজগুলো করত। অবশ্য আর্ডেন দখল কবতে তারা পারেনি। আমরা রাইন পেরেই, ওরা তখন পালিয়ে যায়।

— তারপর?

— ওরা অ্যাংলো-আমেরিকান লিয়ার্সো অফিস উড়িয়ে দেয়। মিত্রশক্তি ৩ পাঁচমেশালি চরিত্রের। 'পিশাচের' হাতে মাইন বিস্ফোরণে মেগ-হল ধ্বংস হয়। ড্রাক্স এই যুদ্ধে আহত হয়। তার মুখের অর্ধাংশ উড়ে গিয়েছিল। এক বছর সে ছিল স্মৃতিশক্তিহীন উন্মাদ। নিজের পরিচয় ভুলে যাওয়ার কাউকে জানাতোও পারেনি— আসলে সে কে!...অনেক পরে কর্তৃপক্ষ একটা নাম পায়— হিউগো ড্রাক্স। সে লিভারপুল ডকে কাজ করত। তার চেহারার সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায়। বোঝা যায়, একই লোক। ক্রমশ স্মৃতিশক্তি ফিরে আসে তার। ডাক্তাররা নানা ট্রিটমেন্ট করে সফল হয়। ওয়ার ডিপার্টমেন্টের একজন তাকে শনাক্ত করে। ১৯৪৫-এ সে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিল। বকেয়া বেতন, পেনসন সবই পায় সে।

M বলেন— কিন্তু সে নিজের রহস্য চালিয়ে যাচ্ছে। বলছে— তার নিজের সঠিক পরিচয় সে এখনও জানে না। এখন সে 'ব্রডস্' ক্লাবের মেম্বর। আমার সঙ্গে তাস খেলে। সে বলে— লিভারপুলে যাবার পর সে অতীতের কোনো কথা আর স্মরণ করতে পারে না।

বন্দ কিছু তথ্য জানায়।

— আমি শুনেছি, যুদ্ধের পর সে পুরো তিন বছর বেপাজ ছিল। তারপর খবর আসে সে ধাতুর ব্যবসা শুরু করেছে। 'গেলামবাইট' নামে একরকম ধাতু নিয়ে তার একচেটিয়া ব্যবসা। জেট যুগ আসছে, একথা ড্রাক্স আগেই ধরতে পেরে ওই ধাতুটা তৈরি করে। এখন আমেরিকার নানা বিশাল কারখানায় ওই ধাতুর খুব প্রয়োজন। নানারকম ধাতু তার নামে, 'ড্রাক্স মেটালস্' বলে পরিচিত। বর্জ্য পদার্থ থেকে সে নাকি ইউরেনিয়াম তৈরি করেছে— এমন বটনাও আছে।

পাইপ টানতে টানতে এই অদ্ভুত ইতিহাস মন দিয়ে শুনতে থাকেন M। বন্দ কাহিনি বলতে থাকে।

— এবার দালালদের মুখে মুখে ড্রাক্সের নাম ছড়াতে থাকে। ১৯৫৬ সালের মধ্যে সে কোটি কোটিপতি হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ডে এসে নানা সম্পত্তি কেনে। বাড়ি, গাড়ি, সুন্দরী মেয়ে— সবই টাকার বিনিময়ে তার করায়ত্ত। রেস খেলে, লাক্সারি বোট আছে তার। বহু দান-খ্যান করে। 'আশ্চর্য মানুষ' বলে পরিচিত হয়। উপকৃত লোকেরা তার গুণগান করে। এরপর সে একটি বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটায়।

— বিস্ময়কর কাণ্ড!

— হ্যাঁ, রানির কাছে একটা চিঠি লিখে বসে। 'ইয়োর ম্যাজেস্টি' বলে সম্বোধন করে সে জানায়, সে নাকি বিরাট অ্যাটমিক রকেট বানাবার জন্য ব্রিটেনকে তার সমস্ত 'কোলামবাইটে'র স্টক উজাড় করে দান করেছে। যারা ব্রিটেনের উপর আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে চাইবে— যতদূর থেকেই হোক— এই রকেট পালটা জবাব দেবে। ডিজাইন প্রস্তুত। তৈরির জন্য যা খরচ হবে, তাতে সে নিজে ব্যক্তিগতভাবে এক কোটি পাউন্ড দেবে। তাছাড়া, এই অস্ত্র তৈরির টেকনিক্যাল টিম তার রয়েছে।

— তারপর?

— হই-চই পড়ে যায়। হাউস অব কমন্সে প্রশ্ন ওঠে। প্রধানমন্ত্রী বলেন - ডিঙাইন সঠিক, মনোনীত হয়েছে। বানি তাকে 'সাব' উপাধি দেন।

M বলেন-- থা, এবাব আমার কাগজেব হেঙলাইনটা মনে পড়ে 'জাতিব জীবনে শান্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত'। তাবপব নাকি সেই বকেট তৈরিব ক'র এখন শেষ হওয়ার মুখে। নাম দেওয়া হয়েছে— 'মুনবেগাব'।

আশ্চর্য, প্রায় অবিশ্বাস্য কাহিনি এই পর্যন্ত আলোচনা হল সেদিন।

সবশেষে M বললেন-- একটা কৌতূহলেব বিষয় আছে।

বন্দ বলল-- কী!

— লোকটা তাস খেলার সময় ভয়ানক প্রতারণা করে!

॥ তিন ॥

ফলে, আরেক দফা আলোচনা চলে।

একজন কোটি-কোটিপতি তাসখেলায় জোচ্ছুরি করে। এ কেমন কথা!

বন্দ বলে— আমার কাছে খুব অদ্ভুত লাগছে না। অদ্ভুত লোকেরা কিছু কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে আরো অদ্ভুত হয়। তবে একটা কথা—

— বল।

— সে কি অনেক সময় নিজের সঙ্গেই জোচ্ছুরি করে?

— কথটা আমিও ভেবেছি। এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কী? এমন করার পেছনে সাইকোলজিকাল কারণ কী আছে? ধরো, ব্রেডস ক্লাবের চেয়ারম্যান ব্যাসিলডন। তিনি কিছু খবর জানেন। তবে আমি এই নিয়ে ওর সঙ্গে বিশেষ আলোচনা করতে চাইনি। কমন্স-এর বহু সদস্য এই ক্লাবে আসে। ড্রাক্সের এখন যে 'ইমেজ' হয়েছে, তাতে তার সম্পর্কে কোন হালকা কথা ক্ষতিকর হতে পারে।.. আমি শুধু তোমার সাহায্য চাই।

এরপর তাস খেলা নিয়ে কিছু আলোচনা হল। 'রাইফেল-স্ট্যাক' কায়দাটার ব্যাখ্যা করল বন্দ। টঙ্কার পিঠে মোম লাগানো ইত্যাদি অদ্ভুত সব কৌশল! তাসের পিঠে খুর দিয়ে চিহ্ন করা! প্রসঙ্গক্রমে, তাস খেলায় অসাধারণ ধর্মী জর্জ স্টেফফি এমপোসিটোর কথাও ওঠে।

M বলেন— ড্রাক্স তেমন পেশাদার জোচ্ছোর নয়। তেমন বিস্ময়কর কিছু করতে পারে না। খাপছাড়া পদ্ধতিতে খেলে। একমাত্র ব্রিজই খেলে। অন্য খেলা তেমন জানে না। কিন্তু সে সবসময়েই জেতে। এক বছর হল ক্লাবে এসেছে। ৫ কবারও হারেনি আজ পর্যন্ত!

লাঞ্ছের টাইম হয়ে গেছে। বন্দ ক্ষুধার্ত। তবু আলোচনা শেষ হচ্ছে না।

— আচ্ছা, সে কি সবসময় একই পার্টনার নিয়ে খেলে?

— — সোম আর বৃহস্পতি 'গেস্ট নাইট'। সে রাতে যে খেলোয়াড় আসে তার সাথে, সেই পার্টনার হয়। একজনের নাম মেয়ার।

বন্দ বলল-- আমি ক্লাবে যাব। ড্রাক্সের জোচ্ছুরি ধরিয়ে দেব। আর কী বলুন?

— না, আর কিছু নয়।.. তবে এমন কিছু করে; না যাতে 'মুনরেকার' প্রকল্পটা ব্যর্থ হয়। তুমি বরঞ্চ তোমার তাসের বিদ্যে দেখাতে তৈরি হও। আমরা আজ রাতে ডিনার সুট বা জ্যাকেট পরছি না।

বন্দ উঠল।

তাস খেলার চ্যালেঞ্জ! ভালোই। এ ব্যাপারটায় তার যথেষ্ট আগ্রহ আছে।

লাঞ্ছটাইম উতরে গেছে। বন্দ অন্যত্র বসে কিছু খাবাব খেল। ভাজা মাংস, চিজ, স্যালাড।

মিনিট পনেরো পরে বাড়ি পৌঁছাল সে। ঘরে শেলফ থেকে একটা বই বের করল—
'Scarne on Cards'।

শাওয়ারে চান করল সে। মুখে দাড়ি হয়েছে।

তবু ভাবল, না, শেভ করার দরকার নেই। এই কর্কশ মুখ নিয়েই তাসের আসরে যাবে সে।

বইটার পাতা উলটে কিছু বিচিত্র পদ্ধতি জানল সে। নিজের আঙুল নাড়াচাড়া করে পরীক্ষা করল। এক প্যাকেট তাস হাতে নানা অনুশীলন করল একা একা।

সাড়ে পাঁচটা। বই শেষ। তৈরি হতে হবে। দুটো সাদা রুমাল পকেটে রাখল। সঙ্কের অঙ্ককারের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকল— কী ফলফল হবে আজ তাসের প্রতিযোগিতায়!

ব্রেডস্ ক্লাবের ও ইতিহাস আছে। তবে কোন সালে প্রতিষ্ঠিত, তা সঠিক জানা যায় না। ১৭৭৪ সালে Scavoir Vivre প্রতিষ্ঠিত ক্লাব পরে নাম বদলে 'ব্রেডস্' হয়। ঐতিহাসিক গিবনের চিঠিতে এর উল্লেখ আছে। লঙচ্যাপ্ নামে এক জার্মান এই ক্লাব নতুন করে তৈরি করেন। তাস খেলার ক্লাব হিসাবে এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

জুয়া খেলা অবশ্যই। কিন্তু ক্লাবের কতগুলো নিজস্ব নাম আছে : প্রত্যেক মেম্বারকে বছরে পাঁচশো পাউন্ড জিততে হবে, নয়তো হারতে হবে। নইলে বছরে আড়াইশো পাউন্ড ফাইন। ক্লাবের কর্মচারী ও বয়রা এককথায় খুব উন্নতমানের। ডাইনিং রুম দেখাশোনা করে আধ ডজন ওয়েট্রেস। সবাই দারুণ সুন্দরী। পেছনদিকে সদস্যদের জন্য গোটা বারো বেডরুম আছে। মেম্বাররা ইচ্ছে করলে সেখানে তার পছন্দমতো ওয়েট্রেসকে নিয়ে যেতে পারে— পারস্পরিক ডিল বুঝে। ক্লাব এ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

ব্রেডস-এ প্রবেশমূল্য একশো। আর বার্ষিক চাঁদা পঞ্চাশ পাউন্ড। সদস্যরা নানারকম সুবিধা পায়। বাথরুমের, বেডরুমের সাবান-লোশন সব পাঠায় 'ফ্লোরিস' নামে বিখ্যাত কোম্পানি।

ছ-টা বাজতে কিছু বাকি। কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।

ঠিক তাই! চারদিক ঘোর কালো হয়ে এল। বামবাম বৃষ্টি, বিদ্যুতের ঝিলিক! রাস্তার আলো জ্বলছে, নিভছে।

বন্ডের গাড়িতে একটা বিজ্ঞাপনের আলো এসে পড়েছে। SHELL কোম্পানির : Summer Shell is here!

কেন জানি, বন্ডের মনে হল, Hell is here!

॥ চার ॥

গাড়ি থামিয়ে পার্ক স্ট্রিটের পাশ দিয়ে এগোচ্ছে বন্ড।

ব্রেডস ক্লাব শুধু নয়, আশেপাশের বাড়িগুলোও বেশ সুন্দর। বিখ্যাত জুয়ার হলে তিনটে ঝাড়লগুন বুলছে।

পোর্টারের ঘরে এল বন্ড। তার নাম ব্রেভেট।

— ওড ইভিনিং!

— ওড ইভিনিং স্যার! অ্যাই বয়, কম্যান্ডার বন্ডকে অ্যাডমিরালের ঘরে নিয়ে যাও।

লম্বা ঘর। এক কোণে বসে M পেশেপ খেলছেন।

— এসো। ...এক মিনিট। দানটা শেষ করি। কী ড্রিংকস নেবে?

— থ্যাংকস্। এখন নয়।

নতুন তাসের প্যাকেট চাইলেন M। বললেন — 'পিকেট' খেলাটা জানো তো?

M হুইস্কি খেলেন সোডা মিশিয়ে। বললেন— ব্রিজেব টেবিলে এখন ড্রাক্স খেলছেন।
ব্যাসিলডরের টেবিলে।

টেবিলের উপর সবুজ ঢাকনা। গোটা দৃশ্যটা উপভোগ করছে বন্ড। ঠুং-ঠাং গেলাসের
আওয়াজ, হা-হা, হো-হো হাসি।

ব্রেডসের চেয়ারম্যান বলছেন— ভালো হাত পেয়েছি। সুতরাং রি-ডাবল্!

পার্টনার বলল— দূর দূর! আগে ড্রাক্সকে বাঁচাও।

ড্রাক্সের পার্টনার বলল— নো চিট।

এইভাবে তাসের দান এগোচ্ছে।

M বন্ডকে পরিচয় করিয়ে দিল— বেসিল, আমার বন্ধু কম্যান্ডার বন্ডকে ভোলোনি নিশ্চই।
ওকে নিয়ে এসেছি। আজ সন্ধ্যাবেলা ব্রিজ খেলবে।

ব্যাসিলডন হাসলেন— গুড ইভিনিং। এরা.. মেয়ার, ডেঞ্জারফিল্ড, ড্রাক্স! আর তোমরা তো
অ্যাডমিরালকে চেনো।

ড্রাক্স হইহই করে উঠল।

— আরে, স্বয়ং অ্যাডমিরাল হাজির। হইচ ড্রিংক?

— সবেমাত্র খেয়েছি।

বন্ডের প্রতি ততটা খাতির নেই— তুমি কি ড্রিংক নেবে?

— নো, থ্যাংকস্।

ড্রাক্স তাস সাজানোয় মন দিল। সাবধানীবা এইভাবে তাস সাজায়— বন্ড লক্ষ করল।

একটু দূরে গেল বন্ড, ফায়ারপ্লেসের কাছে। সিগারেট ধরিয়ে আবার তাসের টেবিলের দিকে
তাকাল। ড্রাক্সের দিকে নজর রাখতে হবে।

বড়ো চেহারা ড্রাক্সের। মুখের ডানপাশটা ক্ষতচিহ্নে পরিপূর্ণ! কিছুটা প্লাস্টিক সার্জারি করা
হয়েছে যদিও। তবু ডান কান বাঁ কান মিলছে না। মুখের একটা অংশ ঢাকার জন্যই বেশ মোটা
গোঁফ। জুলফিও বেশ বড়ো। কষের দাঁত দুটো বৃহৎ; খুব খারাপ দেখায় হাসলে।

চেহারা দেখে মনে হতে পারে (যদি সে ড্রাক্সের পরিচয় না জানে) লোকটা গুণ্ডা বদমাস,
অভদ্র।

বাইরে ঝড় কমেছে। সিগারেট খেতে খেতে ক্রমাগত মুখ মুছছে বন্ড। বলিষ্ঠ হাতের বুড়ো
আঙুল দুটো কদর্য।

বন্ড এবার খেলাটা দেখতে শুরু করল।

ড্রাক্সের তাস বিলির সময় সে বলল— আমার ডিল। ম্যান্ড, এবার কিছু করো, টেকা-টেকা
ছাড়ো। আমি তো হয়রান।

হঠাৎ M-এর দিকে ঘুরে ড্রাক্স বললেন— ডিনারের পব একটা চ্যালেঞ্জ গেম খেলা যেতে
পারে। আমি আর ম্যান্ড একদিকে, তুমি আর কম্যান্ডার— কী নাম যেন— আরেক দিকে।

— বন্ড, জেমস বন্ড।

বন্ড তাস বিলি দেখছিল। মনে মনে বলল- বাছাধন, এবার তোমার জোচ্চুরি ধরেছি।

M বললেন— গুড প্রোপোজাল। আমরা খেলব।

ওরা উঠে পড়ল। ঠিক হল, রাত ন-টায় খেলা শুরু হবে।

M জিঞ্জেস করল— কী বুঝলে?

বন্ড বলল— ওর জোচ্চুরি বুঝে গেছি।

— কী করে বুঝলে ?

— তাস বিলির সময়। রূপোর সিগারেট কেসে তাসের ছায়া পড়ে। ব্যবসায়ী তো, তাই স্মৃতিশক্তি খুব ভালোই আছে। সকলের তাস নিজের কাছাকাছি রাখে। এটাও একটা কায়দা, এই 'আয়নাবাজি', রিফ্লেকশন দেখে তাস বুঝে নেওয়া। আরও সব টেকনিক আছে। সবার তাস বুঝে যায়, তাই প্রতিবারই জিতে যায়। তাছাড়া, নানারকম জোকস আর হালকা গল্প করে অপরদের অন্যানমনস্ক করতে ওস্তাদ।

ব্যাসিলডন এলেন। হেরে যাওয়ার জন্য চোটপাট করছেন।

বন্ড এবার ড্রাস্কের জোচ্চুরির টেকনিক আবার ব্যাখ্যা করল।

ব্যাসিলডন ত্রুঙ্ক— সে কী! লোকটা কোটিপতি! সে এমন কাণ্ড করে। অথচ ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের পর থেকে এই ক্লাবে কোনো জোচ্চুরির কেস হয়নি।

কথাটা এবার ঘুরে গেল।

— লোকে বলছে, রকেট তৈরি নাকি শেষ হয়ে এসেছে! কিন্তু লোকটা... আজ সপ্তেটাই ধরো না। সবাই ওর কাছে হাজার হাজার পাউন্ড হেরেছে। কিন্তু ওর আসল চরিত্রটা কেউ ধরতে পারে না।

বন্ড বলে— ওর জোচ্চুরি বন্ধ করা যায়। ওর কায়দাতেই ওকে টাইট দেওয়া সম্ভব! আপনার আপত্তি নেই তো ?

— না, না, যেমন খুশি করো।

— ওদের পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। তবে ওর পার্টনার মেয়ারও বহু পাউন্ড হারবে। উপায় নেই।

— হারুক। বহুদিন এই জোচ্চুরির অংশীদার মেয়ার।

M বললেন— আমি কিন্তু কোনো মারপ্যাচ জানি না। বন্ড যা করার একাই করবে।

হঠাৎ বন্ড বলে— এই ঘরে দশ মিনিট একলা থাকতে চাই আমি।

॥ পাঁচ ॥

চোখ-খাঁধানো ডাইনিং রুম। রাত আটটা।

সেন্টার টেবিলে ব্যাসিলডন দলবল নিয়ে বসে আছেন। নিজের টেবিলের দিকে M আর বন্ডকে ডাকলেন তিনি। কিন্তু M ভান করলেন যেন শুনতে পাননি। ওরা ছোটো ছোটো টেবিলগুলোর দিকে গেল। সেখানেই পাশাপাশি বসল ওরা।

মেনু কার্ড ফেলে বললেন— সেই 'বেলুগা' ক্যাভিয়ার আছে ?

— ইয়েস স্যার।

-- জেমস্, কী নেবে ?

— স্নোকড স্যামন! ল্যান্স কাটলেট আর আনারসের টুকরো।

এসবের শেষে ওয়াইনের লোক হাজির।

— গ্রিমলে!

— ইয়েস স্যার।

— ভোদকা আনো। ওই উইলফিসমিট, রোগা থেকে এসেছে। বন্ড, শ্যাম্পেন নেবে তো ?

— নেব। তার একটা কারণ আছে অবশ্য।

ওয়েট্রেস এল। সুন্দর চেহারা, সুন্দর পোশাক। যুদ্ধের সময় ফরাসি মেয়েরা অনেকটা এই ধরনের ড্রেস পরত।

M জিজ্ঞেস করলেন— বিশেষ কারণটা কী? মানে, শ্যাম্পেনের—

— খানিকটা মাতাল হওয়া প্রয়োজন। মানে, মাতাল হবার অ্যাকটিং করতে হবে। আপনি কিস্তি ভুল বুঝবেন না।

— বাঃ, দারুণ ব্যাপার। দেখা যাবে। এই যে, ভোদকা এসেছে।

চুমুক দিয়ে বললেন— ড্রাক্স মানুষটাকে তোমার এমনিতে কেমন মনে হচ্ছে?

— ভাবভঙ্গি মোটেই ভালো না। এখানে সবাই ওকে সহ্য করে কী করে।.. তবে সেটা তো আসল ব্যাপার নয়। এমন লোক না হলে আবার ক্লাব জমে না। কিছু ছিটিয়াল লোক চাই। যদিও আসলে সে মোটেই... যাক গে, ভালো তাস খেলে, ধূর্ত, নিষ্ঠুর এবং বেশ তেজিয়ান। বোঝা যায়নি, জোচ্চুরি করে কী আনন্দ পায় সে!

বন্ড বলতে থাকল— শুধু তাই নয়। তাস খেলা তার কাছে যেন এক হিংস্র যুদ্ধ। শুধু বিরোধীর প্রতি নয়, নিজের পার্টনারের সঙ্গেও অসভ্য ব্যবহার করে। আমি সুযোগ পেলে ওকে দেখে নেব।

M বললেন— মনে হচ্ছে, তুমি ওব উপর ক্ষিপ্ত। তাই এত ধারালো সমালোচনা করছ। দেখ, শুধু গুণ থাকলেই মানুষ বড়োলোক হতে পারে না। পরিবেশ এবং ভাগ্য— এ দুটোর অনুকূল অবস্থা থাকা দরকার। যুদ্ধের পর ব্যবসা করে অনেকেই ধনী হয়েছে। তাদের মধ্যে একটা বড়ো দল জানে, কী করে অফিসারদের হাত করতে হয়। মোট কথা, ব্যবসায়ীর মধ্যে তারাই সফল, যাদের বলা যায় পেশাদার ব্যবসায়ী।

একটি বয় টেবিলে এসে জিজ্ঞেস করল— কম্যান্ডার বন্ড কে আছেন?

তার হাতে একটি খাম।

সাবধানে খামটি খুলল বন্ড। সাদা পাউডার, রূপোর পাতলা ছুরি, যা দিয়ে ফল কাটা হয়। বন্ড জিনিসগুলো সযত্নে নিল।

— এগুলো কী?

— এটা বেন্জিড্রিন। আমার সেক্রেটারি পাঠিয়েছে। পাওয়া মুশকিল, সার্জারি থেকে সংগ্রহ করতে হয়।... যাই হোক, আমার কাজে লাগবে।

M একটু চমকে উঠলেন। এই প্রসঙ্গে না গিয়ে কথাবার্তা ডিনারের দিকে নিয়ে গেলেন।

তার মাঝে আবার তাস খেলার 'টেকনিকে'র কথা এসে গেল। সাধারণভাবে, ব্রেন্ডস-এ ব্রিজের রাবার হচ্ছে দশ পয়েন্ট। খেলুড়েরাও সব বিচিত্র মতিগতির— কেউ ধীর-স্থির, কেউ বেপরোয়া।

M একজনকে দেখালেন। জেনারেল বিলি। খেলা জানেন না, তবু শুধু হারার জন্যই এখানে আসেন। তিনকূলে কেউ নেই তাঁর। আরেকজন ডাফ সাদার্নল্যান্ড। পাটের ব্যবসায় প্রচুর টাকা কামিয়েছেন। একসময়ে ইংল্যান্ডে দাবা খেলতেন।

বন্ড চুপচাপ শুনছে। শ্যাম্পেন খেয়ে যাচ্ছে। সব কথাই যে কানে নিচ্ছে তা নয়। ঘরভর্তি লোক এখন। তবে পঞ্চাশ জনের বেশি হবে না। ঝাড়লঠনের আলো পড়ছে সাদা টেবিল ক্লথের উপর। রূপোর বাসনগুলো ঝকঝক করছে। মোমবাতিদানের উপর লাল সিল্কের শেড।

স্যার হিউগো ড্রাক্সের মুখ জ্বলজ্বল করছে। সে ওদের দিকে এগিয়ে এল। সঙ্গে মেয়ার, তার পার্টনার।

— ওঃ হো, ভেড়ার ছানা ও হাঁসের দল কি তৈরি? তাহলে শিগগিরই কোতল হবার সময় এসে যাবে! আমরা অস্ত্র হাতে প্রস্তুত। হাঃ হাঃ।

খুব ভালো। এখুনি আসছি আমবা।— M বললেন। ওরা চলে গেল।

বন্ড বলল — আমার কায়দা দেখে ঘাবড়াবেন না। প্রথম থেকে চড়া দান দেব। তবে ড্রাক্সের তাস বিলির সময় সাবধান থাকবেন। তাছাড়া আপনি ড্রাক্সের ডান পাশে বসবেন। সাদা রুমাল নেব আমি। সেটার কাবণ আছে।

— বেশ। মনে রাখব।

১ ছয় ১১

ড্রাক্স হাভানা চুরুট টানছিল। পাশে মেয়ার। নতুন মোড়কের তাসেব প্যাকেটটা ছিঁড়ছিল সে। বন্ড ড্রাক্সের বাঁদিকে বসল।

কফি আর ব্রান্ডির অর্ডার দেওয়া হল।

ড্রাক্স জিজ্ঞেস করল — বাজিটা কত? ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান, নাকি ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ?

M বললেন— ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান দিয়েই শুরু হোক না।

ড্রাক্স বন্ডকে বলল— কত পর্যন্ত হারতে রাজি আছ?

— সবটাই। ফুরিয়ে গেলে বলব।... আচ্ছা, ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ দিয়েই শুরু হোক।

একশোতে একশো পাউন্ড! সাইড-বাজি পাঁচশো। সামান্য ভুল হলে সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে যাবে। কথাটা বলে ফেলেই বন্ড এর গুরুত্ব বুঝে নিল। কপালে ঘাম। M বারবার বলেছেন মাথা ঠান্ডা রাখতে, কিন্তু ড্রাক্সকে দেখামাত্র বা তার দু-একটা কথা শোনামাত্র বন্ড সচিব পাকতে পাবে না। যদিও সে জানে, এটাই ড্রাক্সের কায়দা। নিজেকেই কিছুটা অভিশাপ দিল বন্ড। সে নিভেই জেনেশুনে ড্রাক্সের প্যাঁচে পড়ে যাচ্ছে! শ্যাম্পেন আর বেনজিড্রিন মিলে তার মাথাব পোকাগুলোকে খেলাচ্ছে!

ড্রাক্স একটু অবাक! দৃষ্টিতে অবিশ্বাস; ঠাট্টার ভাবও আছে। M-কে বলল— আশা করি, হারলে বাজির টাকা মেটাবার ক্ষমতা তোমার সঙ্গীর আছে।

M বললেন— তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলছি— হ্যাঁ, আছে।

— তাহলে, ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ-ই শুরু হচ্ছে। মেয়ার, কিছু বলবে?

মেয়ার বলল— ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান হলেই ভালো হত।

— আরে, চড়া বাজিতে শুরু করার সুযোগ খুব কম আসে। ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ-ই ভালো। বন্ড নিজেকে সুস্থির করল। ওই লোমশ বুনো লোকটাকে আজ উচিত শিক্ষা দিতে হবে। যেন, জীবনের মতো জোচ্ছুরি—

‘মুনরেকার’ এখন বিস্মৃত। দুই ব্যক্তির মুখোমুখি ডুয়েল!

ড্রাক্স বিড়বিড় করছে। বন্ড বুঝল, তাঁস মুখস্থ করছে ড্রাক্স। হালকা চালে খেলা শুরু করল বন্ড। ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিল।

ড্রাক্স বলল— থ্রি ক্লাবস্।

বন্ড বলল— নো বিড।

মেয়ার হাঁকল— ফোর ক্লাবস্।

M বললেন— নো বিড।

তিনটির বেশি ডাক দেবার তাস নয় ড্রাক্সের, কিন্তু ক্লাবস্-এর বাকি তাসগুলো মেয়ারের হাতে।

খেলা চলল। নানা ‘কল’ চলাচ্ছে। এখন পর্যন্ত ড্রাক্স খুশি। দুটো দান সফল হয়েছে তার।

মেয়ার বলল — কী করে পারলে হিউগো?

বন্দ বলল- - স্মৃতিশক্তি ।

অবাক হয়ে ড্রাক্স বলল-- তার মানে ?

— কিছু না, মানে, ওই আর কী! তাস সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ।

এখন পর্যন্ত সমান-সমান। সেয়ানে-সেয়ানে যুঝছে। কোনো পক্ষই খুব ঝুঁকি নিয়ে খেলছে না। M দুটো ডাউন পেলেন। ড্রাক্স থ্রি-নো ট্রাম্প দিয়ে রাবার করলেন। প্রথম রাবার বন্দ জিতেছিল, এবার ড্রাক্স। সুতরাং কাটাকাটি।

M আবও ড্রিংকস-এর অর্ডার দিলেন।

ড্রাক্স কিন্তু মনে মনে দারুণ উত্তেজিত। এই উত্তেজনাটা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। বন্দ বলল— পরের ডিল-এ একই বাজি থাকবে।

— অল রাইট! তুমি যত খুশি টাকা জলে ফেলতে পার।

— আপনি দেখছি, অতি-নিশ্চিত, ওভার-সিওর।

ড্রাক্স অবশ্য মোটামুটি জিতে যাচ্ছে। সে খুশি হয়ে হুইস্কিতে চুমুক দিল। বলল— ঈশ্বর সবসময় সাহসীর সহায়! আরও খেলবে? দম আছে, মানে টাকা আছে তো?

— অব্ কোর্স।

— অলরাইট। পরের দুটো একশো-একশো!

আবার রাবার হারল বন্দ ও M।

বন্ডের গলায় এবার মাতাল সুর— বাবার বাজিটা এবার ডবল করব। ও. কে. ?

ড্রাক্স বলল— ও. কে। আমার হাতের তাস কিন্তু খুব ভালো। ভেবে দেখো।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে।

ড্রাক্স বলল— থ্রি নো-ট্রাম্পস্!

বন্দ হার্টস্-এর ডাক দিল। স্মল স্যাম!

ড্রাক্স মুশকিলে।

বন্দ বলল— ঈশ্বর সাহসীর সহায়!

কথাটা চিমটি কাটার মতো।

বন্দ আবার বলল— কিন্তু এই আমার শেষ রাবার।

ড্রাক্স বলল— শেষ রাবার? তাহলে চড়া বাজি হোক। ফিফটিন অ্যান্ড ফিফটিন। ও. কে. ?

একশোতে দেড়শো পাউন্ড! রাবার: দেড় হাজার!

বন্দ বলল— ও. কে.!

॥ সাত ॥

এখন চারপাশে দারুণ স্তব্ধতা। পিন পড়লে আওয়াজ পাওয়া যাবে।

মেয়ার ভয় পেয়েছে আমায় বাদ দাও।

ড্রাক্স হুংকাব দিল— ডোন্ট বি আ ফুল। যেমন পারো খেলে যাও।

বন্দ সিগারেট ধরাল। শুরু হল জীবন-মরণ খেলা!

দু-পক্ষে দর চড়ানোর প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। যেন উন্মাদ। হত্যা বা আত্মহত্যা— একটা করতেই হবে। এমন মনোভাব।

একশো, আরো একশো, দেড়শো,...

ড্রাক্স বলল— নো বিড।

বন্দ হাঁক দিল— ফোর স্পেডস।

অবশেষে ক্লাইমেক্স।

এবার তাস তুলল বন্দ। মুখে তারছা হাসি।

-- কত যেন বাজি?

-- ফিফটিন অ্যান্ড ফিফটিন।

ড্রাক্স-এর এবার টানটান উদ্বেজনা। টেবিলের ওপরে তাস রাখল বন্দ। তারপর শান্তভাবে বলল - এর চেয়েও চড়া বাজিতে জিতেছি। কায়রোতে, রাবার পিছু দু-হাজার।

ড্রাক্স বলল — এখন আমরা সমান-সমান।

বন্দ বলল-- চলুক। রিস্ক নেওয়া যাক।... সেভেন ক্লাবস।

ড্রাক্স একটু হতচকিত। এমন 'কল' আশা করেনি। তার হাত থেকে হইফির গেলাস মেঝেতে পড়ে গেল। বানবান করে শব্দ হল কাঁচের।

ড্রাক্স এবাব সাইড-কেটএ ডবল দিল।

বন্দ বলল— রি-ডাবল। পিট পিছু ৪০০ পাউন্ড!

সবাই এবার 'নো'।

ব্যাসিলডন ঘুরে ঘুরে সবার তাস দেখলেন।

বন্দ : ডায়মন্ডস : বিবি, ৮, ৭, ৬, ৫, ৪, ৩, ২

ক্লাবস : টেকা, বিবি, ১০, ৮, ৪।

ড্রাক্স : স্পেডস্ : টেকা, সাহেব, বিবি, গোলাম

হার্টস : টেকা, সাহেব, বিবি, গোলাম

ডায়মন্ডস : টেকা, সাহেব

ক্লাবস : সাহেব, গোলাম, ৯।

মেয়ার : স্পেডস . ৬, ৫, ৪, ৩, ২

হার্টস : ১০, ৯, ৮, ৭, ২

ডায়মন্ডস : গোলাম, ১০, ৯।

M : স্পেডস : ১০, ৯, ৮, ৭

হার্টস : ৬, ৫, ৪, ৩

ডায়মন্ডস : ৭, ৬, ৫, ৩, ২।

এই হচ্ছে পুরো চিত্রটা— এই মুহূর্তে।

এককথায়, বন্দের এবার 'গ্যান্ড স্ল্যাম' অবধারিত। যুদ্ধের শেষ পর্যায়।

ড্রাক্স রীতিমতো অসহিষ্ণু। মেয়ারের মুখ দেখে মনে হবে মৃত।

পরপর তাস পড়ছে। মেয়ারের ডায়মন্ডসের পর বন্দের হাত থেকে পড়ল ক্লাবস্-এর টেকা।

তারপর সব তাস টেবিলের উপর চিৎ করে সাজিয়ে দিল একে একে— ৮, ৭, ৬, ৫, ৪-- ইত্যাদি।

মেয়ার চেয়ারের উপর গুয়ে পড়ল।

ড্রাক্স এবার টেবিলের ওপর সজোরে ঘুঁষি মারল। চাপা গলায় বন্ডকে বলল— তুমি একটা—

বন্ড হাসল— জোচ্চার! তাইতো?

ব্যাসিলডন বলল— ড্রাক্স, অনেক হয়েছে। এখন চুপ করে যাও! কেউ কাউকে গালাগাল করবে না। আমার ক্লাবে ওসব চলে না। এটা হেঁদিপেঁচি জুয়ার আড্ডা নয়। টাকাটা মিটিয়ে দাও।

— হ্যাঁ, দেব। শুধু আমার নয়, মেয়ারের ধারটাও।... তবে কম্যান্ডার বন্ড, যে মোটা টাকাটা পেলে, সেটা তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেল। জমাবার চেষ্টা করো না। বুঝেছ?

রাত দুটো।

এখনও বিছানায় শোয়ানি বন্দ। সিগারেট খেতে খেতে ঘরে পায়চারি কবছিল। যদিও কাল সাড়ে-দশটায় হেড কোয়ার্টারে যেতে হবে।

সময়মতো অফিসে অবশ্যই এসেছিল সে। নীল প্যাকেটের তাসটা ছিল বাঁ পকেটে। এটা অবশ্য সাফাই করে আনা। নিজের নীল প্যাকেটটার বদলে এটাই এসেছিল। বাঁ পকেটে লাল প্যাকেট। এটা ব্যবহার করার দবকার হয়নি কাল রাতে।

ব্যাসিলডন সব শুনে চমৎকৃত হয়েছিল। বলল— ড্রাক্স বোধহয় আব ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে খেলবে না। শনিবাব চেকটা পেয়ে যাবে।

আজ সকালে লোয়েলিয়া পনসোনিবর সঙ্গে দেখা।

বন্দ বলল— অনেক রাত পর্যন্ত পুরুষসঙ্গীদেব সঙ্গে কেটেছে শুধু!... যাকগে ০০৮-এর খবর কী?

— ওয়ারেন হাইড হাসপাতালে। শক পেয়েছে। ট্রিটমেন্ট চলছে।

— শক! — বন্দ এর মানে ঠিক জানে না।

অফিসে The Inspectorcope-এব ফাইলটা নিয়ে বসল সে। এই যন্ত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে। ফ্লুরোস্কোপিক পদ্ধতিতে কাজ করে। ধাতব পদার্থে গোপন ভাণ্ডার খুঁজে বের করে। যন্ত্রটার দাম সাত হাজার ডলাব। আফ্রিকা ও ব্রেজিলের বে-আইনি হিবে পাচার ধরার জন্য কাজে লাগে। . . ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যন্ত্রপাতির দপ্তরের সঙ্গে কিছু আলোচনা দরকাব।

পরের ফাইলটা— ‘ফিলোপোন জাপানি মাদক, খুন করতে লাগে’।

এতে কিছু তথ্য আছে। এই মাদকে আসক্ত লোকসংখ্যা এখন ১৫ লক্ষ। এর মধ্যে দশ লক্ষের ব্যেস কুড়ির নীচে। টোকিও পুলিশ মনে করে, যুবকদের ৭০% অপরাধের মূলে রয়েছে এই মারাত্মক ড্রাগ। মারিজুয়ানার মতো ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। তাড়াতাড়ি আসক্তি আসে। আসক্ত ব্যক্তি যেসব অপরাধে ব্রতী হয়ে থাকে— তার মধ্যে প্রধান দৈহিক আক্রমণ ও খুন। এর সঙ্গে একটা নির্যাতনপ্রিয় মানসিকতা (persecution complex) মিশে থাকে। তারা মনে করে— খুন করা নিষ্পাপ। জানা গেছে, কুখ্যাত Bar Mecca মার্ডার কেসের মূলে ছিল ফিলোপোন। পাঁচ হাজারের বেশি স্মাগলারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।... ইত্যাদি, ইত্যাদি।...

দূর! এইসব পড়ে কী স্বর্গবাজ্য লাভ হবে। বন্দ বিরক্ত। ফাইলটা সই করে ‘out’ ট্রে-তে ছুঁড়ে দিল।

ড্রাক্স সম্বন্ধে চিন্তা এল। কোটিপতি। জাতীয় হিরো! ‘মুনরেকার’ যার কীর্তি হতে চলেছে। সে কেন তাস খেলতে বসে জোচ্চুরি করে? অতি সামান্য ব্যাপার! এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ জনসাধারণকে উপেক্ষা, তুচ্ছ করা। দেখো, তোমরা কত আবর্জনা, মূর্খ!

তাছাড়া, জুয়ার উত্তেজনা। কর্কশ স্বর, দাঁত দিয়ে নখ কাটা, ক্রমাগত ঘাম, গোয়ার্ডুমি। চুরির উন্মাদনা অনেকটা যৌন উন্মাদনার মতোই। কিন্তু কেন? একি এক ধরনের ‘প্যারানোইয়ার’, বাতুলতা? যা মানুষ অজান্তে ভুলবশত করে যায়? বিশাল খ্যাতির মোহ কি এর পেছনে কাজ করছে? নিজেদের ক্ষমতায় অন্ধ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস! এরা ভাবে এরা সব পারে। এরা পরশপাথর! এরাই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

ইংল্যান্ডকে সে অতিকায় রকেট উপহার দিতে চলেছে।

একসময় লোকটা পুরোমাত্রায় উন্মাদ হয়ে যাবে।

আচ্ছা, ওই কথাটার মানে কী? 'কম্যান্ডার বন্ড, ঢাকাটা তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেলো। জমিও না।'

পনেরো হাজার পাউন্ড! বেশ, সে তাড়াতাড়িই খরচ করবে।

প্যাডের কাগজে লিখল— ১। রোলস্-বেন্টলি কনভার্টিবল— প্রায় ৫০০০ পাউন্ড। ২। হিরের ক্লিপ তিনটে। এক একটা ২৫০ পাউন্ড = ৩ × ২৫০ = ৭৫০ পাউন্ড। ৩। বিবিধ : ফ্ল্যাট রং করা, কিছু বাসনপত্র, কয়েক ডজন টিনটিনজার শ্যাম্পেন। বাকি টাকায় সোনার শেয়ার। এত টাকার মালিক হবার পর—

রিটার্ন!

বনবন করে টেলিফোন বাজল। যেন প্রতিবাদ ওই 'রিটার্ন।' কথাটার।

— হ্যালো?

বস বলছেন— M ডাকছেন। একবার এসো।

— অল রাইট! কিন্তু—

টেলিফোন কেটে গেল।

॥ নয় ॥

M বললেন— এসো। চেহারাটা এমন দেখাচ্ছে কেন, ০০৭?

আজ ০০৭। জেমস্ নয়। এর অবশ্যই তাৎপর্য আছে।

M-এর মুখ থেকেই জানা গেল, ড্রাক্সের কারখানায় জোড়া খুন হয়েছে। বন্ড সবই জানে। তবু সে নিরীহ মুখে বলল— এটা পুলিশের ব্যাপার। আমরা কেন এ নিয়ে চিন্তা করছি! *

পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করলেন এম। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছে কিছু জার্মান। সীমানা পাহারা দেয় এয়ারফোর্স। দুশো একর জুড়ে ড্রাক্সের কারখানা। কিন্তু এখন সেখানে রয়েছে শুধু ড্রাক্স আর বাহাম্বজন কর্মী। কনস্ট্রাকশন কোম্পানির বাকি লোকেরা চলে গেছে।

M জানালেন— এই পঞ্চাশজন জার্মান ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষজ্ঞ। রুশরা এদের নিয়ে যেতে পারেনি। ড্রাক্সই এদের জোগাড় করেছে, পালন করছে। মেজর ট্যালন নামে এক সিকিউরিটি অফিসারও আছে।

M বললেন— গত রাতে খুন হয়েছে সেই মেজর ট্যালন। একজন জার্মানের গুলিতে। সে-ও পরে নিজের উপর গুলি চালায়। সম্পর্কটা হল, একে এখানে আসার অনুমতি আমরাই দিয়েছিলাম। লগ্ বুক লেখা আছে। সেই রাতে ড্রাক্সের সঙ্গে কাটিয়ে তুমি কিছু মন্তব্য করেছিলে!

বন্ড চুপ করে রইল। আরও কিছু জানা দরকার।

M বললেন— শুক্রবার 'মুনরেকার' লঞ্চ করার কথা। অর্থাৎ আকাশে নিষ্ক্রিপ্ত হবে পরীক্ষার জন্য।

নোটের দিকে তাকিয়ে M আবার বললেন— ডোভার থেকে তিন মাইল উত্তরে সমুদ্রতীরে একটা জায়গা আছে। এটাকে আমরা নাম দিয়েছি 'ওয়াল্ড উইদাউট ওয়ান্ট'— যে জগতে অভাব বলে কিছু নেই। সস্কেবেলা ট্যালন সেখানে হইস্কি খেতে গিয়েছিল। খুনি সেখানে গিয়ে ট্যালনের বুক পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করার আগে বলে— গালা ব্রান্ডকে আমি ভালোবাসি, তুমি তাকে পাবে না।

— এই গালা ব্রান্ড মেয়েটি কে?

— স্পেশাল ব্রাঞ্চার এজেন্ট। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চিফ ভ্যালেন্স সাহেবের অফিসের সবচেয়ে দক্ষ মেয়ে। সে-ও জার্মান। কায়দা করে তাকে ড্রাক্সের প্রাইভেট সেক্রেটারি করা হয়। ব্রান্ড বলেছিল— সে নাকি একজনের সঙ্গে এনগেজড। তবুও ড্রাক্স তার সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। লাভ হয় না। ওদের মধ্যে নাকি এখন বন্ধুত্বের সম্পর্ক। খুনির নাম— এগন বারৎস। ট্যালন যেহেতু মেয়েটাকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিল—

আরও খবর। বারৎস নাকি গালাকে ভালোবাসত। কিন্তু এক ইংলিশম্যানের জন্য এগোতে পারেনি।

কাগজে গোটা ব্যাপারটা প্রকাশ পাবে। গালার মতো দেখতে একটি মেয়ে পাওয়া গেছে। তাবই ছবি ছাপা হবে।

বন্ড প্রসঙ্গান্তরে গেল।

— মুনরেকার পরীক্ষা কবে হবে?

— বললাম তো, শুক্রবার দুপুরে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করবেন।

— সরকার কেন কারখানাটা বন্ধ করছে না?

— প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করছেন না, মুনরেকার প্রজেক্টে নাশকতা হতে পারে। সপক্ষে বহু যুক্তি, বিপক্ষে কোনো যুক্তি নেই। তবে রুশরা কী করবে—

— মন্ত্রী কী বলছেন?

— তিনি আমার কাছে একজন উপযুক্ত লোক চাইছেন। যে ট্যালনের কাজটা পালন করতে পারবে। তাকে অবশ্যই জার্মান ভাষা জানতে হবে।

একটু চুপ করে তিনি বললেন— এই পদ তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। তুমি আজ রাতে ড্রাক্সের সঙ্গে ডিনারে দেখা করো।

॥ দশ ॥

এটা মে মাস।

আজ মঙ্গলবার, সপ্তে ছ'-টা।

বন্ড ড্রাইভ করে সেভস্টোনের রাস্তা ধরে ছুটছে।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ভ্যালেন্সের সঙ্গে দেখা করার কথা।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর ডাক এল।

বুদ্ধিমান মানুষ ভ্যালেন্স। M সমেত সকলের খবর নিলেন।

ট্যালনের বেকর্ড খুঁটিয়ে পড়ল বন্ড। সৎ-সাহসী লোক। তার নামে মন্তব্য আছে কর্ম-অনুরাগী এবং দক্ষ-পরিচালক।

মিনিষ্টি অব অপারেশনের অফিসে প্রফেসর ট্রেনের সঙ্গে দেখা করে বন্ড। মোটা চেহারা, গুজব ছিল গত বছর ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ পাবেন। 'গাইডেড মিসাইল' বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

প্রফেসর ট্রেন কিছু বিষয় সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। তিনি বললেন— ড্রাক্স এটার নাম দিয়েছে 'মুনরেকার'। এর সঙ্গে অনেক জটিল বিষয় যুক্ত— যেমন নোজল্ এক্সপানসন, রেশিও, একুহস্ট ভেলোসিটি, র্যাপলেরিয়ান এলিম্ব— ইত্যাদি ইত্যাদি। ওসবে যাওয়ার দরকার নেই। মুনরেকার সিঙ্গল-স্টেজ রকেট। ড্রাক্সের 'কোলানবাইট'-এর জন্য আমরা অনেক বেশি দাহ্য জ্বালানি ব্যবহার করব যেটা 'মুনরেকার'-এর ইঞ্জিন গলাতে পারবে না। কোলানবাইট গলে ৩৫০০ সেন্টিগ্রেডে। যে ইম্পাত দিয়ে V₂-র ইঞ্জিন তৈরি হত, সেটা গলে যায় ১৩০০ সেন্টিগ্রেডে। এ ক্ষেত্রে ফুরিন এবং হাইড্রোজেন মেশানো জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে।

আরও অনেক কিছু বোঝালেন প্রফেসর ট্রেন। মুনরেকার ৪০০০ মাইল জুড়ে কাজ করতে পারবে। ফলে ইংল্যান্ডের নাগালে থাকবে ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশের রাজধানী।

নকশাটা দেখে ওয়ারহেড সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দিলেন তিনি। রাডার, জাইরো কম্পাস, বিদ্যুৎ সাপ্লাই, ফুয়েল ট্যাঙ্ক ইত্যাদি সব বিষয়েই আলোকপাত করলেন। জানা'লেন, পেছনদিকে টারবাইন চালাবার দুটো ট্যাঙ্ক আছে। চারশো পাউন্ড হাইড্রোজেন পারোক্সাইড চল্লিশ পাউন্ড পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সঙ্গে মিশিয়ে বাষ্প তৈরি হবে। সেটাই টারবাইন চালাবে।

বন্দ বলল— অনেকটা জেট প্লেনের টেকনিক।

— হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ।

আরও বিশদ টেকনিক্যাল আলোচনা হল কিছুক্ষণ।

বন্দ বলল— কেউ যদি রকেটটা বিকল করতে চায়, তার সহজ পথ কী?

— অনেক। জ্বালানির মধ্যে বালি, পাম্পের মধ্যে পাথরকুচি, ডানার মধ্যে ফুটো — এই রকম ছোটোখাটো খুঁত থাকলেই এটা বানচাল হতে পারে। তবে ড্রাক্স নিখুঁত কাজ করেছে। ওর ইঞ্জিনিয়ারিং টিমটাও এক্সসেলেন্ট!

এবার অন্য চিন্তা। ড্রাক্স তাকে কেমনভাবে গ্রহণ করবে? শোনা গেছে, বন্ডের নাম শুনে বলেছিল— ওই ছোকরাকে আমি চিনি। ডিনারে পাঠিয়ে দিও।

বন্ডের গাড়ি এখন চিলহাম ক্যাসল ছাড়িয়ে সোজা এগিয়ে যাচ্ছে। 'মুনরেকার' অবশ্য দেশরক্ষার কাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাতে মাত্র তিনটে দিন রয়েছে। তবে কাজটা বেশ কঠিন।

ডোভার উপকূলে এসে সে বাঁদিক ধরে চলতে থাকল। আবার উঁচু রাস্তা। একটু দূরে একটা দুর্গ।

মেয়েটা সম্পর্কেও ভাবতে হচ্ছে। বিগ বস-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি। সুঁতরাং ড্রাক্সকে ভালোই চেনে। কিছু স্পেশাল ট্রেনিং-ও পেয়েছে। সুন্দরী, কিন্তু পুরুষের পোশাকে চেহারাটাকে কঠোর করে ফেলেছে। চেহারার বিশদ তথ্য নোট করা আছে ফাইলে— চুল : সোনালি। চোখ নীল। হাইট : ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। ওজন : ৯ স্টোন। নিতম্ব : ৩৮"। কোমর : ২৬"। বুক : ৩৮"। আইডেনটিটি মার্ক : ডান স্তনের ওপরে তিল।

গাড়ি থামল কিংস ডাউনের একটা ছোটো সরাইখানার কাছে। লেখা আছে : ওয়ার্ল্ড উইদাউট ওয়ান্ট। দরজা বন্ধ। পাশের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল বন্দ। বারে এসে অর্ডার দিল— লার্জ হুইস্কি এবং সোডা।

দু-পেগ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এল।

সার্ভিস করছে যে লোকটা তার সঙ্গে কিছুটা আলাপ হল।

— আপনি কি স্যার প্রেসের লোক?

— না, আমি মেজর ট্যালনের জায়গায় এসেছি। আচ্ছা, সে কি প্রত্যেক দিন আসত এখানে?

— না স্যার। ওই প্রথম, ওই শেষ। কী ট্রাজেডি। সেদিনই মরতে হল।

লোকটি ড্রাক্সের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। উদার হৃদয়, ভালো ব্যবহার, সদাহাস্যময় মুখ— ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বন্দ জিজ্ঞেস করল— তুমি ওই গুলি চালা-চালি দেখেছিলে?

— প্রথম গুলিটা দেখিনি। তারপর বেসামাল, হই-চই-এর মধ্যে দেখি বন্দুকবাজ খুনিটা নিজের মুখে নলটা পুরে গুলি করল।

— নিজেই গুলি করার আগে কোনো কথা বলেনি।

-- শুধু বলেছিল— হাইল!

জায়গাটায় কাটা তারেব বেড়া। বিমানবার্হীন। 'জেন্ট বন্ডের 'পাস' চেক করে স্যালুট জানাল। তারপর কাকে যেন ফোন করল।

ভেতরটা যেন একটা ছোটো জঙ্গল। নানারকম গাছ। কয়েক মাইল দূরে একটা গম্বুজ।

সাদা জ্যাকেট পরা বাটলার দরজা খুলল — গুড ইভিনিং সার।

সে বস্তুকে একটা ঘরের দরজার সামনে এসে টোকা দিল।

— কাম ইন!— ভেতর থেকে আওয়াজ এল।

লম্বা উজ্জ্বল ঘর। ফায়ার প্লেসের কাছে ড্রাক্স। দরজার দিকে পিঠ। সঙ্গে দুজন পুরুষ, একটি মেয়ে।

— আরে, এসো, এসো।

হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল— এত তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে ভাবিনি।... তু, জেতা টাকাটা খরচ হয়েছে তো?

— এখনও টাকাটাই পাইনি।

— ও আচ্ছা, শনিবার এক ইস্যু করা হয়। পেয়ে যাবে।... এই যে আমার সেক্রেটারি মিস ব্রান্ড!

মেয়েটির নীল চোখ। বলল— গুড ইভিনিং।

ড্রাক্স পরিচয় করিয়ে বলেছিল— এ আমার ডান হাত, ডা. ওয়ালটার।

মেয়েটি উচ্চারণ শুধরে দিল— ভানটার!

আরেকজন পুরুষ, বডিগার্ড— উইলি ফ্রেবস।

ড্রিংকস-এর অর্ডার দিল ড্রাক্স— উইলি, মার্টিনি বানাও।

মেয়েটি পান করে না। রুক্ষসুক্ষ স্বভাবের। বেশি হাসি-ঠাট্টার মধ্যে নেই। সময় বিশেষে ড্রাক্সকেও দু-কথা শুনিয়ে দেয়।

মার্টিনি এল।

— বন্ডের গেলাসটা ভরে দাও। আমরা আটটায় ডিনারে বসব।

সাইরেনের আওয়াজ।

ড্রাক্স বলল— আবে, এরই মধ্যে আটটা বেজে গেল। এখানে সব দিকে মিলিটারি নিয়মকানুন। এদিক-ওদিক হবার যো নেই।

ডিনার টেবিলে ড্রাক্স নানাবকম বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে আলোচনা করল। তার জ্ঞান দেখে বস্তু অবাক। খানিকটা শ্রদ্ধা জাগল অবশ্যই।

মিস ব্রান্ড 'হ্যাঁ' বা 'না' ছাড়া কথাই বলেনি। ওর সঙ্গে ভালো করে আলাপ করার আশা ত্যাগ করল বস্তু। গান্ধীর্ষটা বাড়াবাড়ি বটে, কিন্তু প্রকৃতই সুন্দরী। উঁচু স্তন, রেকর্ডে লেখা ছিল ৩৮"। তাই হবে নিশ্চয়। পারফেক্ট ফিগারে পারফেক্ট একজোড়া বুক। ডান বুকে তিল থাকার কথা! মেয়ে পুলিশ, জুজুৎসু জানে নিশ্চই। এখন বুকের একপাশে নীল পাথরের ব্রোচ!

ডিনারের পর ওরা সকলেই বাইরে এল। জ্যোৎস্না, দূরে গম্বুজটা চকচক করছে। দুধ-সাদা গম্বুজ।

ড্রাক্স বলল— ওই দেখ, ওটাই মুনরেকার! চল্লিশ ফুট পাথর কেটে বসানো হয়েছে। টেলিভিশন স্ক্রিন আছে, সবকিছু দেখা যায়। রকেট লঞ্চের সময় শুধু বিশেষজ্ঞদের দল আর বি বি সি-র টিম থাকবে।

ওরা এগোল। সাইনবোর্ডে লাল আলোয় লেখা : ডেঞ্জার। লাল বাতি লাল আলো দেখলে অপেক্ষা করুন। ঘন্টা বাজান।

একটা বোতাম টিপল ড্রাক্স। বলল— ওই যে ভেন্টিলেটর শাফট, ভেতরটা ৭০ ডিগ্রি এয়ারকন্ডিশনড।

একজন সশস্ত্র গার্ড দরজা খুলল।

ড্রাক্স বলল— এইবার জুতো খুলে এই চটিগুলো পরতে হবে। বন্ড, তুমি কোটাও খোলো। ভেতরে গরম।

কোটের পকেটে পিস্তল। বন্ড বলল— না, গরম লাগছে না।

ভেতরে ঢুকল ওরা। প্রথমেই স্পট লাইটের ফোকাসে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সামনে লোহার রেলিং। তারপর—

তারপর এক অদ্ভুত বিস্ময়কর সৌন্দর্য।

ভয়ংকর মারণাস্ত্রের এক ভয়াল-ভয়ংকর সুন্দরতা!!

॥ বারো ॥

ঝকঝক করছে রকেট মুনরেকার। যেন পালিশ-করা কামানের নল। চল্লিশ ফুট উঁচুতে বেদির উপর বসানো। ইস্পাতের ফ্রেমে ঢাকা। লম্বায় পঞ্চাশ ফুট।

ড্রাক্স বলল— কেমন? অবশ্য জটিল ডিজাইন! সামনের দিকে নানা যন্ত্রপাতি, নানা কাজের জন্য।

তারপর গম্ভীর স্বরে বলল— সবই টপ সিক্রেট। কেউ জানে না।

এরপর রকেট লঞ্চিং-এর বিষয়টা বুঝিয়ে দিল ড্রাক্স। পাহাড়ের তলায় বিশাল গর্ত কাটা হয়েছে।

গোটা কারখানার কিছু অংশ ঘুরে দেখাল ড্রাক্স। দেখতে দেখতে ভয় করে। কিন্তু ড্রাক্সের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ছে তার। এ তো তাদের টেবিলের ড্রাক্স নয়। এ এক বৈজ্ঞানিক। যোরানো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে এ কথাই ভাবছিল বন্ড। সে মনে মনে এখন লজ্জিত।

শাফটের ইস্পাতের মেঝে। এখানে থামল ওরা।

— কেমন লাগছে? সর্বনাশা কাণ্ড? গণহত্যা!... এস ওয়ান্টার।

ডা. ওয়ান্টার মেয়েটি বলল— খুন? ওঃ, এটাও হাসির ব্যাপার!

দশজন লোক এল। ড্রাক্স বলল— ইনি আমাদের নতুন সিকিউরিটি অফিসার; কম্যান্ডার বন্ড!

কেউ বিশেষ পাস্তা দিল না। স্বাভাবিক, ওদের মাথায় এখন একটাই চিন্তা— রকেট লঞ্চিং। তবে লোকগুলো এক-এক জন এক-এক ধরনের। স্বভাবে, চেহারা। তবে সবারই ন্যাড়া মাথা, বুলো গোঁফ। সবাই এক দৈর্ঘ্যের। প্রায় একরকম ফিগার। এই কাজের জন্য যেন মেপে-ছেঁটে তৈরি, যাকে বলে টেলর-মেইড!

এরা অনেকটা রোবট!

ড্রাক্স বলল— ডা. ওয়ান্টার, কাজ শুরু করো।

অনোরাও কাজে যোগ দিতে গেল। বন্ডকে বলল ড্রাক্স— তুমি আমার অফিসে চলো। রকেটের মুভমেন্টটা বুঝিয়ে দেব।

ড্রাক্সের অফিসের দুটো দরজার চারপাশ রবাব দিয়ে মোড়া। এয়ার-প্রফ। দরজায় দাঁড়িয়েই ইলেকট্রিশিয়ানস্, জেনারেটর, ফ্যুয়েলিং কন্ট্রোল, ওয়াশরুম প্রভৃতি দেখিয়ে দিল ড্রাক্স।

-- পাশে ঘরটা আমার সেক্রেটারির।

ড্রাক্সের অফিসঘর তেমন জমকালো কিছু নয়। ডেস্ক, ফাইলিং ক্যাবিনেট। একটা বড়ো বেডিওসেট, দেয়ালে বিরাট সাইজের দুটো ম্যাপ। 'মুনরেকার'-এর অবস্থান দেখানো হয়েছে। ইংল্যান্ডের পূর্বদিকে পোর্টসমাউথ থেকে হাল-এর মধ্যবর্তী অংশ। আশি মাইল দূরে সমুদ্র। বাতাসেব গতিবেগ, আবহাওয়াব চাপ, রকেটের স্পিড এবং পাল্লা— ইত্যাদি সর্বকিছুর হিসেব দেওয়া আছে। প্রথমে বায়ুহীন আকাশে মুনরেকার ছুটবে— প্রায় কুড়ি মাইল। এই সময়টাই সমস্যা, তাছাড়া মাধ্যাকর্ষণ থাকবে।

দ্বিতীয় ম্যাপে দেখানো হয়েছে— লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত যাত্রাপথ-- অনেকটা অর্ধবৃত্তের মতো, ফিরে এল বৃত্ত সম্পূর্ণ! রকেট ওড়ার সময় পৃথিবীর গতি পূর্বদিকে।

-- ঠিক আছে তো বন্ড! কী মনে হয় তোমার?

— চমৎকার।

— সিকিউরিটি কেমন দেখলে? সরকার তো জোর দিয়েছে।

— খুব ভালো।

— তাহলে ঘুমাতে যাও।... আর কিছু বলার আছে?

— আচ্ছা, আপনার সেক্রেটারি ও মেজর ট্যালনের মধ্যে কি কোনো অ্যাফেয়ার ছিল? ড্রাক্স হাসল।

— থাকা তো স্বাভাবিক! মেয়েটা সুন্দরী। ওরা একসঙ্গে কাজ করতে কবতে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিল। আর সুন্দরীর রূপ দেখে ওই বারৎস, মানে যে ট্যালনকে মেরেছে, তার মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

— আচ্ছা, বারৎস 'হাই হিটলার' বলেছিল কেন?

— জানি না। আমিও শুনেছি সে কথা।

— আপনার দলের সব লোক গোঁফ রেখেছে।

— ওটা আমার অর্ডার। ব্যস, সেটাই বড়ো কথা।

॥ তেরো ॥

ট্যালনের বিছানায় সেই রাতে শুতে হয়েছিল বন্ডকে। সেখানেই ঘুম ভাঙল। তবে, বেডরুমটা সুন্দর। ভালো করে সাজানো। দামি ফার্নিচার সব। বিছানার পাশে এখনও রয়েছে বিস্কুট আর এক বোতল জল। ড্রেসিংটেবিলের ওপর একটা দূরবিন। ফাইল ক্যাবিনেট তালো বন্ধ। তবে ওপরের ড্রয়ারটা খোলা যায়।

রাতে সেই ড্রয়ারের মধ্যে কিছু ম্যাপ আর চাট দেখেছিল বন্ড। নানা ছোটোখাট যন্ত্রপাতি, ম্যাগনিফাইং গ্লাস। প্রধানত আঙুলের ছাপ দেখার। পাউডার ছড়ানো চাটের উপর লাল পেনসিলের দাগ, একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন, ' ? '। পাহাড় থেকে ৫৫ গজ দূর পর্যন্ত দাগ দেওয়া।

হলঘরে পায়ের শব্দ। কে যেন 'টুক্' করে আলো নেভাল!

তেমন কিছু নয়। ড্রাক্স শুয়ে পড়ল।

আরেকটা ড্রয়ারও খোলা। তাতে কর্মচারীদের ছবি এবং বায়ো-ডাটা। সেটা পড়ে পবিষ্কার হল যে, পঞ্চাশজনই রাজনৈতিক অপরাধমুক্ত। তাছাড়া অপরাধ জগতের সঙ্গে কেউই যুক্ত নয়। কিন্তু একটা ব্যাপার আশ্চর্য! ফাইলে যে ফটো আছে, তাতে তাদের মুখে গোঁফ নেই। এটা কেন?

বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ ট্যালনের কথাও ভেবেছিল বন্ড! হায়, দু-রাত আগেও লোকটা বেঁচে ছিল, এই বিছানায় শুয়ে ছিল। হয়তো ওই দূরবিনটা দিয়ে চাঁদ দেখেছিল। নাইট-গ্লাস দূরবিন. যা

দিয়ে রাতেও দেখা যায়। লাল দাগগুলো কেন টেনেছিল? জিজ্ঞাসা চিহ্ন ‘?’-টাই বা কেন? মনে হয়, ট্যালন যেন কোনো শব্দ গুনতে পেয়েছিল। শুনেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ‘?’ চিহ্নটা দিয়ে ফেলে! হোয়াট ইজ্ দ্যাট?

চার্টের উপর আঙুলের ছাপ আছে। ট্যালন এবং ফ্রেবস-এর আঙুলের ছাপ! ফ্রেবস্ কি সেই ফ্রেবস যে একসময় আঙ্কারায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিল? সব চিন্তাগুলোকে সারিবদ্ধভাবে সাজায় বন্ড : হাইল হিটলার, পঞ্চাশজন জার্মান, সকলের গোঁফ, চার্ট, নাইটগ্লাস দূরবিন,... এবং ফ্রেবস্!

বন্ড ভাবে— ট্যালন অন্য ষড়যন্ত্রের শিকার। এর সঙ্গে গালা ব্রান্ডের প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই।

আজ সকালে বেরিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল বন্ড। সারা বাড়িটা চক্কর দিয়ে দেখল। দূরে মুনরেকার-এর গম্বুজ, নির্জন।

ভোরের কুয়াশা! সাইরেন বাজছে। ডোভারের কাফে-রয়্যালের কাছে থামল বন্ড। মালকিন এক ইতালীয়-সুইস মহিলা, এক পুত্র আছে। বন্ডের পূর্ব-পরিচিত। সুতরাং স্বাগতম!

বন্ড খাবারের অর্ডার দিয়ে ভ্যালেন্সকে ফোন করল।

ভ্যালেন্স বলল— গালা ব্র্যান্ড খুব বুদ্ধিমতী। হ্যাঁ, ট্যালন কোনো শব্দ শুনে থাকতেও পারে! খবরের কাগজে চোখ বুলোতে গিয়ে দেখল— ‘এক্সপ্রেস’ মেয়েটির ছবি খুব বড়ো করে ছেপেছে। সে জানে, জাল-মেয়ের ছবি। পুলিশ তাই নিয়েই কাজ চালায়।

নিজের ঘরে ফিরল বন্ড। এখন বেলা ন’টা।

সাইরেন বাজল। বাড়ি থেকে বারোজন ছুটল গম্বুজের দিকে।

॥ চোদ্দো ॥

গালা ব্র্যান্ডের পরনে সাদা শার্ট, নীল স্কার্ট।

নিজের অফিস টেবিলে এসে বসল সে। কী সব হিসেব কষে নোট করল। বহুদিন ধরে সংখ্যাতত্ত্ব অনুধাবন করছে গালা। নিখুঁত তার কাজ। অঙ্কে ভুল থাকলে চলে না।

ন’টায় ড্রাক্স অফিসে আসে। প্রথমেই ডা. ওয়ান্টারকে ডাকে। গালা তাকে বিষনজরে দেখে।

গালা একদিকে প্রাইভেট সেক্রেটারি, আরেকদিকে গুপ্তচর। লন্ডনে খবর দেবার জন্য সে ড্রাক্সের উপর নজরদারি করে বটে, কিন্তু আন্তরিকভাবে চায়, ‘মুনরেকার’ সফল হোক।

সারাদিন টাইপের কাজই বেশি। চিঠিপত্রের খাম ছিঁড়ে সাজিয়ে রাখা। একঘেয়ে কাজ।

তবে এখন তার কাজ বন্ডের সঙ্গে। দাস্তিক! একে কেন পাঠানো হল। সময় ছিল না, তাই অন্য কাউকে পাওয়া যায়নি? বন্ড কেমন লোক? ভালো বন্দুক চালায়। নানা ভাষা জানে। তবে সুপুরুষ, এটা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে প্রেম করার মতো কে আছে এখানে? একবার বন্ডের গায়ে গা ঠেকিয়েছিল সে। অন্য কারণে। নিশ্চিত হতে যে ওর পকেটে খাপে ভরা পিস্তল আছে কিনা!

বেল বাজল। শর্টহ্যান্ডের খাতা নিয়ে গালা ড্রাক্সের ঘরে এল।

বন্ড সেখানেই। বলল— শুভ মর্নিং।

গালা সাড়া দিল গম্বুজের মুখে।

তবে ইতিমধ্যে কিছু হালকা কথা হয়েছে বটে। যেমন, ‘গাড়ির শব্দ শুনেছিলে?’ ‘ডিকটেশন’ নেবার সময় পেনসিল দিয়ে মাথা চুলকানো ভালো নয়— ইত্যাদি ইত্যাদি। গালা বলে— ‘গার্ডরা বলল— তুমি সকাল সাতটা বেরিয়েছিলে!’

বন্দ বলল— হ্যাঁ একটা টেলিফোন করতে গিয়েছিলাম।

ড্রাক্স বলল— আমার স্টাডিতে তো একটা ফোন আছে। স্ট্যালন ওখান থেকেই ফোন করত।

বেচারি ট্যালন!

ড্রাক্স হো হো করে হেসে উঠল— তোমাদের রুচি আমি জানি। তবে এখন আমার লোকেরা ভীষণ নার্ভাস। আর দুর্ভাবনা বাড়িয়ে লাভ নেই। বাকি সব খবর তোমাকে গালা ব্র্যান্ড বলবে। ট্যালনের ঘরে ফাইলগুলো দেখেছ?

— ওখানে ক্যাবিনেটের চাবি নেই।

--- সরি, এখনই পেয়ে যাবে।

বন্দ প্রশ্ন করল— ফ্রেবস লোকটা আপনার কাছে কতদিন কাজ করছে?

--- ওর কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? আসলে আমি কাউকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। লোকটার বিরুদ্ধে অবশ্য কোনো আপত্তিকর প্রমাণ নেই, তাহলে অনেক আগেই তাড়িয়ে দিতাম। তবে আমি ওকে সন্দেহ করি। একবার আমার প্রাইভেট কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। তবুও হাতেনাতে ধরা যায়নি।... তা তোমার সন্দেহ কীসের?

— লোকটার চাউনিটা কীরকম সন্দেহজনক।

ড্রাক্স বলল— গালা, তোমার কী ধারণা?

গালা বলল— লোকটাকে আমি সন্দেহ করি। আমার ঘরের কাছে ঘুরে বেড়ায়। চিঠিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে।

ড্রাক্স বলল— ইস দ্যাট সো? ঠিক আছে, উই স্যাল বি কেয়ারফুল।

॥ পনেরো ॥

আলোচনা চলতে চলতে এই পয়েন্টটার সময় সবাই হঠাৎ চুপ করে গেল। ফ্রেবস কি কোনো দলের স্পাই? না কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য আছে? যদি থেকেও থাকে, সম্প্রতি দুটো মৃত্যুর সঙ্গে ওব কী সম্পর্ক?

ড্রাক্স বলল— এখন বোঝা যাচ্ছে ফ্রেবস আমাদের সকলেরই সন্দেহভাজন। ওকে কখনও কারখানায় ঢুকতে দেবে না। কাল ওকে নিয়ে আমি লন্ডন যাচ্ছি। ডাঃ ওয়ান্টারের ওখানে কাজ আছে। সে যাবে না... আচ্ছা তুমি কি এখনই ফ্রেবসকে গ্রেপ্তার করতে চাও।

বন্দ বলল— না, এখনই নয়।

ফ্রেবস কিন্তু ডাঃ ওয়ান্টার আর ভৃত্যগুলো ছাড়া কারুর সঙ্গে কথা বলে না। আমার মতে লোকটা তেমন খারাপ নয়। শুধু একটা দুর্বলতা আছে, কিছুটা ডিটেকটিভগিরি করা।

পায়চারি করতে করতে ড্রাক্স আবার বলল— আজকে বুধবার, জালানি ভরতে হবে। তাই কারখানাটা বন্ধ রাখতে হবে। আমি তদারক করব, টেলিভিশন ক্যামেরাও রাখা হবে।

ব্যাপারটা আর একটু ব্যাখ্যা করল ড্রাক্স।

— যদি ওয়েদার ভালো থাকে, তাহলে ছাদটা খোলা হবে। একশো গজ দূরে গার্ড থাকবে, একেকটা দলে দশজন। ওড়বার জন্য তৈরি থাকবে 'মুনরেকার'। শুক্রবার সকালে আমি ফাইন্যালি একবার দেখে নেব... হ্যাঁ, আর একটা কথা, বৃহস্পতিবার মাঝরাতে জাহাজগুলো সরিয়ে ফেলা হবে। তবে একটা জাহাজে বিবিসি-র একজন ভাষ্যকার থাকবে।

ঘুরে এসে চেয়ারে বসল ড্রাক্স। বলল— একটা খুনির খবর আছে। প্রাইম মিনিস্টারের

একজন দূত আমায় জানিয়েছে যে, বেতার ভাষ্য শোনার জন্য ক্যাবিনেট মিটিং হবে, প্যালেসের সবাই রকেট ছোঁড়ার বর্ণনা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

বন্দ বলল— চমৎকার, নিখুঁত ব্যবস্থা।

— তবে ক্রেবস একটা সমস্যা রয়ে গেল। সে টেলিভিশন ভ্যান থেকে নোট নেবে— অন্য কোনো ঝামেলা তার দিক থেকে আশা করছি না।... আচ্ছা বন্দ তুমি একবার সমুদ্রপার আর পাহাড়ের নীচটা দেখে নিও। ওগুলো খুব সুরক্ষিত নয়। যেকোনো দুষ্কৃতি একজস্টের গুহা দিয়ে আসতে পারে।

বন্দ বলল— আমি আজ লাঞ্ছের পরই ঐ দিকটা দেখতে চাই। মিস গালা ব্র্যান্ড যদি ফ্রি থাকে—

গালা বলল— স্যার হিউগো ড্রাক্স বললে নিশ্চয়ই যাব।

— ঠিক আছে, আমার এখন কাজ আছে। লাঞ্ছ দেখা হবে।

বন্দ বলল— আমি কন্ট্রোল রুমটা দেখে আসি।

গালা ব্র্যান্ড আর বন্দ কন্ট্রোল রুমে এল। সেখানে ডাঃ ওয়ান্টার দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই সুন্দরী মেয়েটি। ওখানে একটা পাইপ রকেটের মধ্যে ঢোকানো হচ্ছিল।

মেয়েটি পঞ্চাশ ফুট উঁচু মুনরেকারের দিকে তাকিয়ে আছে। পাতলা সাদা সাটের তলা থেকে ওর দুই স্তন উদ্ধত গর্ব নিয়ে যেন মুনরেকারকে ছুঁতে চাইছে। অত সুস্পষ্ট স্তন না হলে, ওকে স্কুলের কোন বাচ্চা মেয়ে বলে মনে হত।

মেয়েটি সম্পর্কে কিছুটা খবর রাখা বন্দ। আপাতত নিরীহ। কিন্তু অত্যন্ত দক্ষ, জুজুৎসু জানা এক মেয়ে-পুলিশ। সবচেয়ে ভালো জানে, শরীরের কোন জায়গায় লাথি ছুঁড়লে বিপক্ষ কাবু হয়ে যায়। বন্ডের মতো লোকও ভাবল, আমি যত সহজে ওর হাত ভাঙতে পারি, খুব সম্ভব তার চেয়ে অতি সহজে আরও কম সময়ে ও আমার হাতটা ঘায়েল করে দিতে পারে।

হলঘরে জানালার নীচে একটা গুঞ্জল! আসলে একটা গ্রীষ্মের ভোমরা! ব্যারাক থেকে অস্পষ্ট আওয়াজ আসছে। বন্দ পিস্তল হাতে বারান্দা দিয়ে চলতে থাকল। একটা তালার খট খট আওয়াজ কানে এসেছে।

একটু দূরে অপরাধী। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সর্বশক্তি নিয়ে লাথি ছুঁড়ল বন্দ। আর্তনাদ করে পড়ে গেল লোকটা।

ক্রেবস!!

চিৎ হয়ে পড়ে আছে লোকটা। কপাল ফেটে রক্ত বের হচ্ছে। চোখ বোজা। অনেক কষ্টে দম নিচ্ছে।

ক্রেবসের পকেট হাতড়ে বিশেষ কিছু পেল না বন্দ। শুধু একগোছা সরু চাবি, একটা স্প্রিং-এর ছুরি, আর চামড়ায় মোড়া একটা ছোটো ডাল্ডা।

ক্রেবসের জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করল বন্দ। জ্ঞান ফিরতেই পর পর কয়েকটা প্রশ্ন করল।

ক্রেবস বলল— আমি স্যার হিউগো ড্রাক্স ছাড়া কারুর প্রশ্নের জবাব দিই না।

বন্দ বলল— আমি তোমার গলাটা ভেঙে দেব। তারপর প্রাস্টিক সার্জারি হবে।

অশ্লীল গালি দিয়ে ক্রেবস বলল— আমি তোর মুখে থুতু ছেঁটাব।

বোতলটা দিয়ে ক্রেবস-এর হাঁটুর হাড়ে প্রচণ্ড আঘাত করল বন্দ। আশ্চর্য! আঘাত খেয়েও ছোটোর চেষ্টা করল ক্রেবস। আরও আশ্চর্য দ্রুতবেগে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বন্দ চেষ্টা করেও ওর পিছু নিতে পারল না।

বন্দ বুঝল, এহেন লোকের মাথাব ঘিলু বের করলে তবে হয়তো কথা বলানো যেতে পারে। তবে লোকটা বড়ো রকমের চোট পায়নি। যাক, ড্রাক্স যা করার করবে।

আবার সেই প্রশ্নটা মাথায় আসলে—ট্যালন এবং বারৎস-এর মৃত্যুর মধ্যে কীসের যোগাযোগ রয়েছে।

বাটলার ঘরে এল, পেছনে একজন পুলিশ সার্জেন্ট। একটা টেলিগ্রাম ছিল বন্ডের হাতে, ড্যালাস পাঠিয়েছে; প্রথম কথা, টেলিফোন কল বাড়ি থেকে করা হয়েছিল। দ্বিতীয় কথা, কুয়াশার জন্য সিগন্যাল বাজানো যায়নি এবং জাহাজটা থেকে সন্দেহ করার মতো কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি। তৃতীয় কথা, তুমি যে তীরের কথা বলেছ সেটা সেন্ট মার্গারেটস্-এর কোস্ট গার্ডদের দৃষ্টির বাইরে।

ওরা চলে গেল। টেলিগ্রামটা ফায়ার প্রেসে ফেলে দিল বন্দ। একটাই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ট্যালনের ফোন বাড়ির কোনো লোক গুনতে পেয়েছিল, তাই তার ঘর তল্লাশ করা হয় এবং তাই তাকে খুন করা হয়, কিন্তু বারৎস এর ব্যাপারটা কী?

সুতরাং জোড়া খুনের রহস্যটা রয়ে গেল।

এবারে মনরেকারের বিস্ময়কর শক্তির কথা মাথায় চাড়া দিচ্ছে। দুটো জগৎ— একটা সূর্যের আলোর মতো পরিষ্কার; আর একটা পাপে জর্জরিত দুঃস্বপ্নে ভরা অন্ধকার।

দূর ছাই এসব কথা এখন থাক। বিকেলটা গালা ব্র্যান্ডের সঙ্গে কেমন কাটবে, সেটাই ভাবা যাক।

॥ ষোলো ॥

আজকের দিনটাকে বলা যায় নানা রঙের দিন। দিন মানে বিকেল।

সমুদ্রে নানা জাহাজের ভিড়ে, কোনটা কাছে, কোনটা দূরে। সমস্ত পরিবেশটায় যেন রোমাঞ্চ থমথম করছে।

বন্দ আর গালা পাহাড়টার কাছে দাঁড়াল। স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ দু-দুবার সাইরেনের চিৎকার। লক্ষিৎ সাইটে গম্বুজটার ওপরে একটা লাল পতাকা।

বন্দ বলল— ওটা কিছু নয়, জ্বালানি ভরার কাজ শুরু হবে।

গালা বলল— চল আমরা ওঁদিকে যাই।

আজ ওর পরনে লাল স্কার্ট, কালো ডোরা কাটা সার্ট, কোমরে চামড়ার বেল্ট। আজকে সে আর গম্বীর নিরুত্তাপ গালা নয়, কথায় কথায় খিল খিল করে হেসে উঠছে।

একটা ফুল তুলতেই বন্দ বলল— তোলার সময় ফুলেরা আর্তনাদ করে জানলে, তুমি কি ফুলটা তুলতে?

— আর্তনাদ! তার মানে?

— প্রফেসর জগদীশ বোস নামে এক ভারতীয় ফুলেদের স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে রিসার্চ করে একটি বই লিখেছেন। ফুলেদের যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়া তিনি জানতে পেরেছেন। এমনকি ফুল ছেঁড়ার সময় ফুলের কান্না তিনি রেকর্ড করেছিলেন। আমার মতে ফুলের কান্নাই পৃথিবীর সবচাইতে মর্মান্তিক কান্না... সত্যি বলছি। তুমি যখন অর্কিডটা তুললে, তখন আমি যেন তার কান্না গুনতে পেলাম। বুকফাটা কান্না।

গালা ভু কঁচকে বলল— মোটেই ওসব কান্নাটান্না কিছু নেই! তাছাড়া বন্দ, আমি ভাবতেই পারিনি তুমি এত ইমোশন্যাল। তোমাদের মতো লোকদের তো খুন করাই অফিসিয়াল ডিউটি। একধরনের পেশা। তবে ফুল নয়, তোমরা মানুষ খুন করো। তাই না?

বন্ড বলল— ফুলেরা তো গুলি চালাতে পারে না।

এবার অর্কিডটার দিকে তাকিয়ে গালা বলল— তোমার এইসব কথা শুনে আমাব নিজেকে খুনি মনে হচ্ছে। ঐ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের বইটা আমি পড়ব। যদি সত্যি কথা হয়। আর কখনও ফুল ছিঁড়ব না... কিন্তু এখন এই ফুলটা.. মনে হচ্ছে আমার হাতে রক্ত লেগে রয়েছে।

— ফুলটা আমায় দাও তাহলে। আমার হাত তো অনেক দিন থেকেই বক্তমাখা। একটা ফুলের রক্ত লাগলে কী আর আসে যাবে বল?

ফুলটা দেবার সময় বন্ডের হাতটা ধরে গালা বলল— এটা তোমার রিভলবারের মুখে আটকে রাখো।

— রিভলবার ঘরে রেখে এসেছি।

নিজের নীল সার্টের বোতামঘরে গুঁজে বন্ড বলল— ফ্রেবস-এর ঘটনাটা তোমায় বলি।

সব শুনে গালা বলল— ঠিক শিক্ষাই হয়েছে লোকটার। কিন্তু স্যার হিউগো কী বললেন?

বন্ড বললে— লাঞ্জে আগে তাঁব সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখন তাঁকে প্রমাণ হিসাবে ফ্রেবস-এর ছুরি আর চাবির গোছাটা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি। সেটা পেয়ে প্রচণ্ড রেগে নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে তিনি বের হয়ে যান। কিছু পরে ফিরে এসে বলেন— লোকটা খুব জখম হয়েছে। তারপর আমায় জিজ্ঞেস করল— এই জখম হওয়াটা তার পক্ষে কি যথেষ্ট হয়েছে? পরে শেষ সময়ে দলের অন্য লোকদের বিভ্রান্ত করে না দেবার কথাও বললেন। তারপর বর্তমানে তাকে নজরবন্দি করে রেখে পরের সপ্তাহে তাকে জার্মানিতে পাঠানো নিয়ে আমরা দুজনেই একমত হলাম। সেই লোকটাকে তার ঘরের মধ্যে রাখা হবে। কিন্তু বাইরে থেকে ভালোভাবে নজর রাখা হবে।

পাহাড়ের খাড়াই রাস্তা ধরে তারা নামল— পরে বেলাভূমিতে নেমে তারা ডানদিকে চলল। এই জায়গাটার পাশে রয়েছে ডিল-এর নৌবাহিনীর জন্য জনশূন্য চাঁদমারি। তাদের মুখে কোনো কথা নেই। দুমাইল রাস্তা তারা নীরবে হেঁটে নুড়ি-বিছানো সমুদ্রতীরে পৌঁছল। এই সমুদ্রতীরের পাশেই রয়েছে সেট মার্গারেটস্ বে-র পাহাড়ের সাদা চূড়াগুলো।

এই নুড়ি-বিছানো রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বন্ড, গালাকে, গতকাল থেকে যেসব কথা ভেবেছে সব বলল। আরও বলল— তার মনের কিছু অস্পষ্ট সন্দেহ আর হাতের কাছে কতকগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া সূত্র আর প্রমাণ। কিন্তু এর রহস্যটা কী? আর এইসব সূত্র যেখানে জোড়া যাবে সেই জায়গাটা কোথায়?

গালা উদ্বিগ্ন। শত্রুদের হাত থেকে 'মুনরেকার' বাঁচবে তো?

মনের উত্তেজনা দমন করতে গিয়ে ইচ্ছে হল ঠান্ডা জলে সাঁতার কাটতে। পাশের লোকটা তো সারা জীবন বিলাস উপভোগই করেছে, যদিও ঝুঁকির চাকরি।

বন্ড জিজ্ঞেস করল— গালা, তোমার কী ধারণা?

— দেখ, মুনরেকার এখন শুধু স্যার হিউগোর নয়, সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রাণকেন্দ্র। নিখুঁতভাবে প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। আমার ধারণা, ফ্রেবস যা কিছু করছে, সবই হিউগো ড্রাক্সের আদেশ অনুযায়ী করছে। ড্রাক্স আমাদের সম্পর্কেও নিশ্চিত হতে চায়, তাই ফ্রেবস আমাদের উপরেও তল্লাশি চালায়। ড্রাক্সের ব্যবহার বা আচরণ সব সময় সভ্য নয়, কিন্তু লোকটা সিনসিয়ার। তাই 'মুনরেকার' এটাই আমার প্রার্থনা। শুধু ড্রাক্স নয়, এতগুলো লোকের বিরামহীন প্রচেষ্টা, পরিশ্রম—

— ঠিক বলেছ। আমারও ধারণা, মুনরেকারের কোনো বিপদ নেই।... চলো, আমরা এগিয়ে যাই।

পাশাপাশি নয়, বন্ডের পিছু পিছু চলল গালা। সারা জায়গাটা আগাছায় ভর্তি। শামুক, গুগলি রয়েছে।

দুটো পাহাড়ের মাঝখানে টানেলের গর্ত শুরু হয়েছে। রকেটের লেজের ইস্পাত উঠে গেছে পাহাড়ের মধ্যে যে সমতলটুকু আছে। বেরোচ্ছে খড়ি-পাথর, নুড়ি-পাথর।

গম্বুজের একটা অংশ পাহাড়ে মাথা ছাড়িয়ে আকাশে দশ ফুট উঠে গেছে। কল্পচোখে বন্ড দেখল, ওখানে চারটে লোক কাজ করছে। তাদের পরনে অ্যাসবেসটসের পোশাক, মুখে গ্যাস মুখোশ। ওরা জ্বালানি তেল ভরছে। যদি বিস্ফোরণ হয়--

বন্ড বলল— চলো গালা, এবার আমরা যাই।

এরপর কী হবে? মই নিয়ে গুহামুখে যাওয়া, ইস্পাতের দেয়াল বেয়ে ওঠা, প্রয়োজনে ট্যাংক ধ্বংসকারী কামান দাগা, ফসফোরাসের গোলা ছোঁড়া।

বন্ড এবার ভাবছে— প্ল্যানটা তত নিখুঁত নয়। অবশ্য সাফল্যের সম্ভাবনাই বেশি। শত্রুপক্ষকে হালকা করে দেখা উচিত হবে না। কারণ, রুশ সুইসাইড-স্কোয়াডের লোকেরা চূড়ান্ত বেপরোয়া। ‘মুনরেকার’ ধ্বংস করার জন্য তারা আত্মাহুতি দিতে রাজি! এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। অতীতে ওরা এমন ব্যাপার ঘটিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে বন্ড হিসেব আর মাপজোক করছে, মনে মনে।

— কী ভাবছ?— গালার জিজ্ঞাসা।

-- না, তেমন কিছু নয়।

— আমিও স্বীকার করছি, খুব নিশ্চিত বোধ করা ঠিক নয়। যে কোনো মুহুর্তে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটতে পারে। অবশ্য রক্ষীদের নির্দেশ দেওয়া আছে। বিন্দুমাত্র আপত্তিকর কিছু দেখলে আগে গুলি, পরে প্রশ্ন।

রাতে, সারারাত, ফ্লাডলাইট জ্বলবে। রক্ষীদের কাছে ব্রেনগানের সঙ্গে বোমাও মজুত আছে। সারা পাহাড়টা আলোকিত রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

বন্ড বলল— হ্যাঁ। কিন্তু এটাও যথেষ্ট নয়। ধরো যদি সাবমেরিন বা কোনও গোপন অজানা জাহাজ থেকে গুলি আসে!

হঠাৎ বন্ড বলল— জলটা দেখতে হবে। আমি সাঁতার দেব। বেশ গরম, কিন্তু ঠান্ডা জল। তুমিও সাঁতার দিতে পারো। ভালো লাগবে।

— হ্যাঁ, ঠিকই। ভীষণ যেমে গেছি। কিন্তু কী পরে জলে নামব?

পোশাকের নীচে অবশ্য নাইলনের প্যান্টি আর ব্রা আছে! খুবই স্বচ্ছ। শরীর লুকনো সম্ভব নয়। তবুও একরকম পোশাক তো বটে।

বন্ড বলল-- ওপরে জামার নীচে কিছু নেই তোমার। আমার ছোটো আন্ডারওয়ারে আমাকে খারাপ দেখাবে না!... তাছাড়া, দেখার কে আছে এখানে?

— কিন্তু --

— আরে তুমি যদি চাও, আমি একদম তাকাব না তোমার দিকে।

গালা হাসল। তারপর পাথরের আড়ালে গিয়ে পোশাক ছাড়ল।

বন্ড বলল— শোনো, এটাও আমাদের একটা কাজ।

জামা খুলে, স্কাটের বোতামে হাত দিল গালা। উঁকি দিয়ে দেখল, বন্ড ততক্ষণে জলের ধারে চলে গেছে। তার বাদামি শরীরে নীল জাঞ্জিয়া, বেশ আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে।

নিজের পোশাক ছেড়ে চূপিচূপি বন্ডের পিছনে এসে হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিল গালা।

আঃ, ঠান্ডা জীবন-জুড়নো জল! জলে মুখ ডুবিয়ে কিছুক্ষণ সাঁতার দিল সে। জেটির কাছে এসে মুখ তুলে নিশ্বাস নিল।

আরে, বন্ড কোথায়? জলের গভীরতা মাপতে বালির নীচে চলে গেছে নাকি! ওর বাদামি শরীর, নীল জাঙিয়া পরা চেহারাটা মনে পড়ল তার। মনে মনে খুশি হল।

বেশ কিছুক্ষণ পান্ডা নেই বন্ডের। চিন্তিত গালা।

হঠাৎ হস্ করে ঠিক তার পেছনে জল থেকে উপরে উঠল বন্ড। কোমর পর্যন্ত। দুহাতে পেছন থেকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলল গালাকে। গালা ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার মুখ টেনে নিয়ে চুমু খেল।

গালা অপ্রস্তুত, বলল— ওঃ, গো টু হেল!

বন্ড এবার ওকে ছেড়ে দিয়ে সাঁতরে দূরে চলে গেছে।

গালা তখনও হতচকিত। খুব আস্পর্ধা তো লোকটার। কড়া সুবে কিছু বলা দরকার এবার। সিক্রেট সার্ভিস! সিরিয়াস ন্যূকির কাজ! কিন্তু তার মধ্যে ওরা দুষ্টুমি, প্রেম, এমনকি তারও বেশি কিছু করার উপায় তৈরি করে নেয়। এটাই ওদের বিশেষত্ব!

কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নেই, বন্ডের আলিঙ্গনে পুলকে শিহরিত তার দেহ। তার চোখে সোনালি বিকেলটা আরও সোনালি হয়ে উঠেছে। দূরে উপকূলে সাদা পাহাড় ধবধব করছে। আকাশে শঙ্খচিল।

না, বন্ড এমন কিছু দুষ্টুমি করেনি। বরং—

তবু, বেশি আশকারা দেওয়া ঠিক হবে না।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। ওরা বালির ওপর পাশাপাশি গুয়ে। অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলছে না। ওরা কাছাকাছি, কিন্তু তবু কেউ কাউকে স্পর্শ করছে না।

সমুদ্র থেকে বন্ড একটা গলদা চিংড়ি তুলে এনেছিল। অবাক হয়ে সেটা দেখছিল গালা। মাছটাকে আবার জলে ছেড়ে দিল।

কখন জামাকাপড় পরবে? ঠিক আছে, শরীরটা শুকিয়ে যাক—

বন্ডের পাশে প্রায়-নগ্ন এক নারী, সুন্দর চেহারা, কিন্তু সেটা ছাঁপিয়ে মাথায় ঘুরছে 'মুনরেকারে'র চিন্তা।

এখন বিকেল পাঁচটা।

ড্রাক্সকে বলতে হবে যাতে রক্ষীর সংখ্যা বাড়ায়। যদি হঠাৎ কোনো সাবমেরিনের আবির্ভাব হয়—

এবার ফিরতে হবে। কিন্তু তার আগে—

বন্ডের মনে পড়ল গালায় উদ্ধত দুই স্তন তার বুক পিষ্ট হয়েছিল। যদি মুহূর্তের জন্য! নীল আকাশ, মাটিতে স্বচ্ছ পোশাকে প্রায় নগ্ন কন্যা!

— তোমার নাম গালা রাখা হয়েছিল কেন?

— গালা? আরে, কতবার নাম পালটাতে হয়েছে! স্কুল থেকে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে কাজের মধ্যে।

একটু দূরে উঁচু জায়গায় দুটো পাখি পরস্পরকে ঠোকরাচ্ছিল। প্রেমের ঠোকর! দুটো শঙ্খচিল। আকাশ থেকে নেমে এসেছে পরস্পরকে ভালোবাসার জন্য।

হঠাৎ ওরা চিংকার করে উড়ে গেল।

দুম! দুম!— দুটো গুলির শব্দ।

ও কী! পাহাড়ের একটা অংশ যেন একপাশে হলে পড়ছে। ওই খড়মাটির অংশটা। অজস্র ফাটল জেগে উঠেছে।

হঠাৎ পিঠে আঘাত পেল বন্ড। মাটি নালি থেকেই আঘাতটা এল নাকি।
গালার শরীরের উপর উপড় হয়ে গড়িয়ে পড়ল বন্ড।
আর কিছু মনে নেই। শরীর অসাড়। পৃথিবী অন্ধকার।

একসময় জ্ঞান ফিরল।

‘স্পেশাল ব্র্যাঞ্চে’র কথা কী যেন বলছিল গালা ?

কিন্তু এখন ডান হাতটা নাড়া যাচ্ছে না। কী হল! দুপাশে অজস্র পাথরকুচি!

মুনরেকারের বিস্ফোরণ হল নাকি ?

মাথা ঘুরিয়ে দেখল— না, ওই তো মুনরেকার। গম্বুজ অটুট! কিন্তু— তবে হ্যাঁ—

মাথার ওপরে পাহাড়ের একটা অংশ ধসে গেছে।

তাহলে তো বিপদ সমাগত।

গালা কোথায় ? ওঃ, ওই তো, পাথরের নুড়ির স্তূপে ঢাকা পড়ে গেছে। টের পেল সে, পিঠের হাড় ভাঙেনি বটে, কিন্তু রক্ত ঝরছে।

নুড়ির স্তূপ থেকে অতি কষ্টে গালাকে টেনে বের করল। সারা মুখে খড়ির গুঁড়ো। কিছুটা রক্ত! একটু আগে এই গালা ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের একজন। এখন সে ধুলো-রক্ত মাথা একটা বোঝামাত্র। চুলগুলো পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে।

একটু পরে চোখ মেলল গালা। বন্ডের বুকের উপর থেকে যেন একটা পাথরে-চাপ নেমে গেল। যাক, শেষ পর্যন্ত—

না, ওরা মরেনি।

কিন্তু শ্বাসরোধ করা কাশির গমকে, আর বমির তোড়ে অস্থির দুজনে।

॥ সতেরো ॥

বন্ডের চেহারাও এখন অদ্ভুত। যে কেউ চমকে উঠবে।

ওর মুখটা পাহাড়ের দিকে তুলে ধরল গালা।

কোনও মতে উঠে দাঁড়াল দুজনে। বমির তোড় এখনও আসছে।

ওবা হাঁটতে থাকল, অনেক কষ্টে।

পাহাড়ের রূপও এখন অন্যরকম। অজস্র ফাটল ধরেছে। দু-বিঘে জমি জুড়ে শুধু পাথরকুচি। আকাশে একটাও পাখি নেই। ওরাও বোধহয় বিপদের গন্ধ পেয়েছে।

একটা বড়ো পাথরের চাঙ নেমে এসেছিল। গড়িয়ে পড়েছিল ঠিক যেখানে বন্ড শুয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে গালার শরীরের উপরে উঠে এসেছিল বন্ড। তাই বেঁচে গেছে।

আরেকটু কিছু হলে ওরা দুজনেই এখন মৃত।

এখন ওদের কারুর দেহেই পোশাক নেই। সামান্য যেটুকু আবরণ ছিল, তা ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেছে। ওরা দুজনেই এখন উলঙ্গ। মনে হবে পাথরের ধুলো আর সাদা খড়মাটি মাথা দুই আদিম নরনারী হেঁটে চলেছে।

নগ্নতা-সভ্যতা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই।

আবার জলে নামল ওরা। গা-খুয়ে পরিচ্ছন্ন হল। যেন জাহাজডুবি থেকে রক্ষা পেয়েছে দুজনে।

একটুকরো ছেড়া পটি বেঁধে চরম লজ্জা আড়াল করেছিল গালা। হাতব্যাগটা পেয়ে লিপস্টিক লাগিয়েছিল। বন্ড খুঁজে পেয়েছিল একটা সিগারেটের অক্ষত টুকরো আর দেশলাই। পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে ধোঁয়া ছেড়ে বন্ড বলল— একেই বলে ভাগ্যা। নইলে এতক্ষণে আমরা দুজনেই—

বন্ডের হাত ধরে গালা বলল— তুমিই আমায় বাঁচিয়েছ।

বন্ড বলল— পাথরটা কিন্তু ইচ্ছে করেই আমাদের দিকে গড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাতে পাথরচাপা পড়েই আমাদের মৃত্যু হয়।

গালা অবাক! কে ওদের মারতে চাইছে?

বন্ড বলল— ওপরে গেলে ডিনামাইটেব চিহ্ন দেখতে পারে। আমি বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। তার আগে দুটো পাখির প্রেমদৃশ্য দেখছিলাম। ওরাও শব্দ শুনে পালিয়ে গেল।

— পাখি?

— হ্যাঁ, দুটো শঙ্খচিল, মিলন-উন্মুখ। ওরাও বেঁচে গেছে নিশ্চই।

— এটা কি ক্রেবসের কাজ?

— না। কারুর একার নয়। তাছাড়া ক্রেবসের চেয়ে অনেক পারদর্শী হাতের কাণ্ড। কেউ হয়তো আমাদের কোনও একসময় থেকে ‘ফলো’ করছিল।

— কারা?

— যারা আমাদের মৃত্যু চায়। কিন্তু এখন আমাদের বেঁচে থাকতেই হবে।

— কী করব আমরা এখন?

— ওরা ভেবেছে আমাদের জীবন্ত কবর দিতে পেরেছে। আমরা পাথরের তলায় নিশ্চিহ্ন! কুড়ি মাইল লম্বা পাথরের একটা অংশ এমনিতেই ভেঙে পড়তে পারে। ডিনামাইট ফাটানো হয়েছে, সেটা সবাই বুঝবে না। তাছাড়া, বসন্তকালে পাহাড়ে প্রায়ই এমন ধস নামে। অর্থাৎ, ওরা দেখাতে চাইবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ‘মুনরেকার’ ধ্বংস হয়েছে, এবং বন্ড-গালা পাথর-চাপা পড়ে মরেছে।

একটু চুপ করে বন্ড আবার বলল— এ-ও হতে পারে, মুনরেকার ওদের টার্গেট নয়। টার্গেট আমরা। শুক্রবার মুনরেকারের লঞ্চিং হবে। ঐই হতভাগা জার্মানগুলো তার আগেই আমাদের মারতে চায়।

গালা বলল— ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া দরকার। কর্তৃপক্ষ আমাদের হাতে মাইন দিয়েছে এই জন্যই। পাহাড় ধসে পড়ছে, আর আমরা আরামে জলক্রীড়া করছি— এ শুনলে ওবা হাসবে।

— আসলে তো আমরা আমাদের কাজই করছিলাম। জলে নেমেছিলাম আরাম করতে নয়, জল পরীক্ষা করতে। দশ মিনিট মাত্র বিশ্রাম করছিলাম। ... পুলিশের লোকদের মনটাই সন্দেহে ভরা—

কথাটায় গালাকেও একটু ঠেস দেওয়া আছে।

বন্ড আবার বলল— রাগ করো না। সবদিক ভাবতে হচ্ছে, আমরা শত্রুদের উদ্দেশ্য বুঝেছি। এখন জানতে হবে— কারা এই শত্রু? কেন আমাদের তারা মারতে চায়? তেমন হলে, লঞ্চিং-এর দিন পিছিয়ে দেওয়া হবে।

গালা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

— ঠিক বলেছ। এখুনি ওদের খুঁজে বের করতে হবে। আমি এক বছর এখানে কাজ করছি। তুমিও মুনরেকারের সফলতার জঁন্য এসেছ। সিকিউরিটির দায়িত্বে। তাহলে শুধুমাত্র আমাদের

শত্রু হবে কেন কেউ? তারা মুনরেকারের শত্রু। আবার উলটোটাও হতে পারে। আমরা অজানা শত্রুর কবলে পড়েছি, কারণ যাই হোক! তাবা হয়তো মুনরেকারের শত্রু নয়, কিন্তু আমাদের খতম কবতে চায়।

ছ'-টা বাজে।

বন্দ বলল— চল।

এখন জোয়ারের জল বাড়ছে। ওদের এখন সেন্ট মার্গারেটস-এ পৌঁছতে হবে। গ্রানভিলে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারবে। ডিনারের পর ঘরে প্রত্যাবর্তন। সেখানে কেমন অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে, কে জানে!

বন্দ বলল— সেন্ট মার্গারেটস পর্যন্ত হাঁটতে হবে। পাববে তো?

— ভুলো না, আমি পুলিশের মেয়ে।

ওরা নুড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে চলল।

সাড়ে আটটা।

গার্ডদের দ্বিতীয় ফটকে ওরা ট্যান্ড্রি থামল। প্রথমে গাছ, তারপর কংক্রিট বাঁধানো জায়গা। এখানে পৌঁছবার আগে ওরা দু-পেগ ব্র্যান্ডি আর সোডা খেয়েছিল। তার সঙ্গে সোল মাছ আর ভাজা-পনির। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার সময় পেয়েছিল।

সারা শরীরে কাটাছেঁড়ার দাগ। পোশাক ম্যানেজ হয়েছিল, কিন্তু অন্তর্বাস পাওয়া যায়নি। লোকের সামনে হাজির হওয়া অস্বস্তিকর।

ড্রাক্সের হাসির শব্দ শোনা গেল। হো-হো হাসি।

টেবিলে এক কোণে বসেছিল ড্রাক্স। পরনে কিসমিস রঙের স্মোকিং জ্যাকেট। খাচ্ছিল সে। ওদের দেখে মুখের খাবার মুখেই রয়ে গেল তার।

ক্রুবস উপস্থিত। তার হাতের গেলাসে মদের রং লাল। রক্তের মতো। ডা. ওয়ালটোয়ারও আছে। ওদের দেখে, এককথায়, সবাই যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে স্থির হয়ে গেছে। আসলে উঠতে সময় লাগছে।

ডা. ওয়ালটোয়ারই প্রথমে কথা বলল— আরে। এখানে আমাদের ইংরেজ বন্ধুরা হঠাৎ উপস্থিত!

ড্রাক্স সামলে নিয়েছে। বলল— তোমাদের জন্য আশংকা হচ্ছিল। সার্চ পার্টি পাঠাবার কথা ভাবছিলাম। পাহাড়ে ধস নেমেছিল, সেঁ খবর পেয়েছি। আর গালা, তুমিও আমাকে না জানিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলে?

বন্দ বলল— সেটাও আমারই দোষ। আমার কথায় ও সঙ্গে এসেছিল। জায়গাটা তদারকি করতে গিয়ে অনেকটা হাঁটতে হয়েছে। ভেবেছিলাম, আট-টার আগেই ফিরতে পারব। হঠাৎ— সবাই ওদের সাদর আমন্ত্রণ জানাল ডিনারে যোগ দিতে।

বন্দ বলল— আমরা ভীষণ ক্লান্ত। মিস ব্র্যান্ডের বিশ্রাম খুব দরকার। আমিও একটু রেস্ট চাই। যার যার ঘরে যেতে পারলে ভালো হয়। আমরা কফিতে যোগ দেব। কাল সকালে।

বন্দ ক্রুবসের পাশের চেয়ারে বসেছিল। ইচ্ছে করেই। ক্রুবসের ফাটা মাথায় স্টিক প্লাস্টার লাগানো আছে।

ড্রাক্স গালাকে চলে যাবার অনুমতি দিল।

বন্দ তখনও থেকে গেছে। সে পাহাড় ধসে পড়ার বর্ণনা দিল।

— অদ্ভুত পাহাড় গুলো! দেখে মনে হবে, এই বুঝি ধসে পড়ল। কিন্তু এই ধসে সাধারণত লোকক্ষয় হয় না।

হঠাৎ গোঁ গোঁ আওয়াজ, পবনক্ষণেই ক্রেবসেব মাথা আছড়ে পড়ল টেবিলেব ওপর। বনবান করে ভেঙে পড়ল কাঁচের বাসন।

ড্রাক্স বলল- ডা ওয়ালটার, দেখ তো, ক্রেবস বোধহয় অসুস্থ। এত ড্রিংক করলে এমন তো হবেই। যাই হোক, ওকে ওর ঘরে শুইয়ে দাও।

ওয়ালটার ক্ষুদ্র। তারপর উঠে এসে 'অসুস্থ' ক্রেবস-এর কলার ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে দাঁড় করাল। তারপর তাকে টেনে নিয়ে গেল। টলমল করে হাঁটল ক্রেবস। চাপা গলায় ক্রেবসকে গাল দিল ওয়ালটার— হতভাগা, বদমাস, মাতাল... ইত্যাদি।

বন্ড বলল — লোকটা খুব পরিশ্রমী।

ড্রাক্স বলল — আরে দূর! আসলে পাঁড় মাতাল।

কফি এল। সার্ভ করল যে বাটলার, সে-ও জার্মান। লোকটা কি সন্দেহজনক? বন্ড জানে— ড্রাক্স বেশ দাঙ্কিক। কোনো তুচ্ছ কর্মচারী তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সাহস পাবে। এ-কথা সে বিশ্বাস করতে চাইবে না। সারা বিকেল 'মুনরেকাবে'র তদারকি করেছে সে নিজেই।

সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে ড্রাক্স বলল— সব কিছু ঠিক আছে। গার্ডরা চলে গেছে। সকালে পরিষ্কারবেব জন্য দু-ঘন্টা লাগবে। . . কাল বিকেলে আমি গালা ব্র্যান্ডকে নিয়ে লন্ডন যাচ্ছি। মানে, ক্রেবস ছাড়াও একজন সেক্রেটারি দরকার। তোমার প্ল্যান কী?

— আমাকেও লন্ডন যেতে হবে। মিনিষ্টিকে রিপোর্ট দিতে।

— কীসের রিপোর্ট? নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন বুঝ?

— খুব ভালো। সে কথাই বলব।

— বেশ। তাহলে.. এখন গুডনাইট।

ড্রাক্স চলে যাবার পর নিজের ঘরে গেল বন্ড।

আরে একী! ঘর এমন অগোছালো করল কে? আবার সার্চ করা হয়েছে তার ঘর। চামড়াব কেসটা অবশ্য রয়েছে।

বন্ডুকটা বের করে বালিশের তলায় রাখল। গরম জলে স্নান করে, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। দারুণ অবসাদ, ক্লান্তি।

গালা কোথায়? ঘুমের পিলটা খেয়েছে কি? ড্রাক্সের সঙ্গে কাল ওকে লন্ডনে যেতে হবে। ব্যাপারটা কি ঠিক হচ্ছে? কেন?

যাক গো! সব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামালে পাগল হতে হবে।

তবু চিন্তার জট ছাড়ে না। সব কাগজপত্র, তথ্য-প্রকাশের মানে বোঝা যাচ্ছে না এখনও। একটা কোটি-কোটিপতি ব্যক্তি তার বুদ্ধি, জ্ঞান ও অর্থ বিনিয়োগ করেছে এই ধ্বংসাত্মক রফেট বানাতে। দেশ উৎসাহী, সরকার এই উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে প্রশংসা করেছে। কিন্তু—

এক বা একাধিক ব্যক্তি চায় বন্ড আর গালাকে খুন করতে। উদ্বেজনা, ঈর্ষা! অথচ, সন্দেহ করাব মতো লোক নেই!

রাজনৈতিক অস্থিরতা কিছু নেই।

ড্রাক্সই বা তাব শত্রু হবে কেন? কোনও কারণ নেই।

আবার গালাব কথা মনে পড়ে। তাকে নিয়ে ফিরতে পারলে ভালো হয়। অবশ্য, যদি রাতটা তাব সঙ্গে লন্ডনেই কাটানো যায়—

তবু তার সিক্ত স্নেহ বলছে— একটা বিপদ সমাগত।

একটা প্রশ্ন।

ডিনাব টেবিলে মাত্র তিনজনের চেয়ার ছিল কেন? বন্ড আর গালার জন্য চেয়ার ছিল না, তাব মানে, ওবা কি ধবে নিয়েছিল বন্ড আর গালার ফিবে আসাব কোনও সম্ভাবনা নেই?

॥ আঠারো ॥

এটা নতুন মার্সেডিজ গাড়ি। ড্রাক্সের।

গালা আর ক্রেবসকে নিয়ে এখন লন্ডন পাড়ি দেবে ড্রাক্স।

বন্ড বলল— আপনার গাড়িটা অপূর্ব!

প্রশংসা শুনে ড্রাক্স খুশি।

— হ্যাঁ, হাইস্পিডে ছোটো। তোমার ওই ওল্ড বেন্টলি গাড়িও ভালো, তবে এখন ওসব গাড়িতে চড়ে লোকে শুধু সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যায়।

ক্রেবস পেছনের সিটে বসল। গালার সিট সামনে, ড্রাক্সের ড্রাইভিং আসনের পাশে। গালার পরনে টুপি, রেনকোট, হাতে গ্লাভস।

বন্ড আগেই গালাকে বলেছিল, সাড়ে সাতটায় ডিনারে দেখা হবে।

এখন তারা কেউ পরস্পরের সঙ্গে কোনও কথা বলল না। হুঁ করে বেরিয়ে গেল ড্রাক্সের গাড়ি।

নিজের গাড়িতে উঠল বন্ড। ওই গাড়ি ব পিছু নিল।

বাতে আর কিছু ঘটে না! তবু জোরে-চলা মার্সেডিজের মধ্যে বসে গালা ভাবল, ড্রাক্স তার সঙ্গে একটাও কথা বলল না কেন? অঙ্ক কষা, নম্বর টোকা, সবই ডা. ওয়ালটারের সঙ্গে সেরেছে সে। এখনও সেই ছোটো নোটবইটা তার হিপ পকেটে।

বন্ডের কথাও ভাবছিল গালা। ‘মুনরেকার’ গালার মূল এবং একমাত্র চিন্তা ছিল। সেই ‘একমাত্র’ চিন্তার সঙ্গে বন্ড কখন যেন কিছুটা উড়ে এসে জায়গা নিয়ে নিল।

যাইহোক, নোটবইটা সম্পর্কে এখন আগ্রহ বাড়ল গালার। একবার হাতাতে পারলে ভালো হয়। দেখা যেত, কী লেখা আছে!

ট্রাফিক আলোয় গাড়ি থামল। ড্রাক্স অধৈর্য। রাগত ড্রাক্স এবার সামনের গাড়িগুলোকে ওভারটেক করে যাচ্ছে একের পর এক। এমন গোঁয়ারের মতো চালাচ্ছে যে, পথচারীরা কোনওমতে বেঁচে যাচ্ছে।

গালার সুযোগ আসছে না। কোনও এক জায়গায় স্বাভাবিক প্রয়োজনে গাড়িটা যদি এক-আধ মিনিট না দাঁড়ায়—

শেষ পর্যন্ত কায়দা করতে হল।

— মি. হিউগো!

— বল।

— গাড়িটা একটু থামাতে হবে। লেডিজ টয়লেট কোথায় পাওয়া যাবে?

— আঃ, কী যন্ত্রণা! তোমরা যে কেন আগে থাকতে—

— প্লিজ!... ওই তো মোড়ে একটা দোকান দেখা যাচ্ছে।

বাধ্য এবং বিরক্ত হয়ে গাড়ি থামাল ড্রাক্স, বলল— কুইক! হারি আপ!

নোটবইটা এর আগেই এসেছিল কোটের মধ্যে। সে কোটটা খুলে গালার কোলের উপর রেখেছিল ড্রাক্স। তাব মন এখন জোরে ড্রাইভ করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে চায়।

এই সুযোগটাই নিল গালা। যেন অন্যমনস্ক, তাই কোটটা বুকে জড়িয়েই গাড়ি থেকে নেমে টয়লেটের ছুতো করে দোকানটার মধ্যে ঢুকে গেল। ল্যাভেটরির দরজা বন্ধ করে নোটবইটা বের করল। প্রতি পাতায় পরিসংখ্যান। আবহাওয়ার চাপ, বাতাসের বেগ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষ পাতা!

কী আশ্চর্য! এখানে লেখা আছে, সম্ভাব্য গতিপথ। সেটা ভুল, প্রায় ৯০ ডিগ্রি পার্থক্য।

হিসেব অনুযায়ী, রকেট তাহলে আছড়ে পড়বে ফ্রান্সের কোনও স্থানে।

এটা মারাত্মক ভুল! ড্রাক্স কি এটা জানে না? মুনরেকার যেভাবে যাবে, তাতে হিসেবের মধ্যে ৯০ ডিগ্রি ফারাক আসছে!

খবরটা লন্ডনে দিতে হবে— যে করেই হোক। মিনিষ্টি নিশ্চই এ ব্যাপারটা জানে না। অথবা বোঝেনি। কাঁচি দিয়ে ওই পাতার বিশেষ অংশটুকু কেটে নিল সে। টুকরোটা গ্লাভসের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। এবার টয়লেট থেকে বেরিয়ে, মুখ মুছে ছুটল গাড়ির দিকে।

গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করেনি ড্রাক্স। প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে বলল— আরে, উঃ, তাড়াতাড়ি এসো। কী যে করো—

এবার কি নোটবইটা ড্রাক্সের হিপ পকেটে ঢোকাতে হবে। ওটা এক সময় তুলে কোটের মধ্যে কি গালাই রেখেছিল?

সস্তুর মিটার স্পিডে চলছে গাড়ি। পুলিশ ট্রেনিং-এ যেসব কায়দাগুলো শিখেছিল, সেগুলো স্মরণ করল গালা। হাইস্পিডে যে গাড়ি চালায়, সে কখনও তার অঙ্গে আলতো স্পর্শ টের পায় না।

কোটের আড়ালে নোটবইটা লুকিয়ে হিপ পকেটের দিকে এগোল গালার স্বস্ত।

সঙ্গে সঙ্গে বিষাক্ত ছোবল!

ফ্রেব্‌সের একটা হাত পেছন থেকে এসে নোটবই সমেত গালার হাত চেপে ধরল।

— পাকড়াও! ধরে ফেলেছি তোমায়!

হাত ছাড়াবার চেষ্টা কবে ব্যর্থ গালা। ড্রাক্স তখন ফুল স্পিডে চালিয়ে একটা গাড়ি ওভারটেক করল।

ফ্রেবস চিৎকার করল— স্যার, ক্যাপ্টেন! গাড়ি থামান। ধরে ফেলেছি।

— হোয়াট!

— মিস ব্রান্ড, সে স্পাই!

জার্মান ভাষায় বলল ফ্রেবস।

এক সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাপারটা দেখে নিল ড্রাক্স! হিপ পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখল— ডায়েরিটা নেই।

বলল— ওকে ধরে রাখো। নড়তে দিও না।

স্পিডের মাথায় ব্রেক কষল ড্রাক্স। ক্যাচক্যাচ! এটা সেমারওয়ার্থ যাবার মোড়।

— এর মানে কী?

গালা বলল— মি. হিউগো, ভুল বুঝবেন না। আমার একটা ভুল হয়ে গেছে।

গ্লাভস দুটো খুলে সিটের ফাঁকে গুঁজে দিল। তার মধ্যেই সেই টুকু-নেওয়া পাতাটা আছে।

কোট সরিয়ে নোটবইটা দেখা গেল।

ফ্রেবস বলল— ক্যাপ্টেন, ভালো করে দেখুন।

— বুঝেছি।

ড্রাক্স এখন হিংস্র। কিন্তু গলাব স্বর শান্ত। কিন্তু ছোটোখাটো লড়াই শুরু হয়ে গেল। ড্রাক্স নিজের একটা গ্লাভস খুলে গালার মুখে চড় মারল। গালা মারামারি শুরু করল। ফ্রেবস ঝুঁকে পড়েছিল, ওর চোখটা খামচে দিল গালা। নখ দিয়ে ফ্রেবসের গলার চামড়া চিরে দিল।

কিন্তু কতক্ষণ আর লড়তে পারে গালা? তার শরীর এলিয়ে পড়ছে।

ড্রাক্স আবার গাড়ি চালাতে থাকল।

অনেক দূরে গিয়ে নির্জন জায়গায় গাড়ি থামাল।

হঠাৎ গালার মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। আর্তনাদ করল সে। কোনও লাভ নেই। প্রচণ্ড আঘাত। কেউ একজন করেছে— ফ্রেবস অথবা ড্রাক্স স্বয়ং।

চোখে অন্ধকার নেমে এল গালার।

এক ঘন্টা কেটে গেছে।

এবুরি স্ট্রিট। বাকিংহাম প্যালেসের একদম শেষে গাড়ি থামাল ড্রাক্স। ওরা দুজনে যখন ধরাধরি করে সংজ্ঞাহীন গালাকে নামাচ্ছে, তখন রাস্তার লোকেরা মনে করল, এক অসুস্থ মহিলাকে তার আত্মীয়েরা নামিয়ে আনছে। আর কোনও সন্দেহ হবার কথা নয়।

ওপর তলায় একটা বড়ো ঘর। চারপাশে নানা যন্ত্রপাতি।

জ্ঞান ফিরে গালা দেখল, তার দেহ একটা চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। মাথায় দারুণ যন্ত্রণা। ঠোঁটে-গালে জ্বালা।

ঘরটায় ভাপসা গন্ধ, পর্দাগুলো টানা থাকায় বাতাস আসছে না। সবদিকে ধুলো উড়ছে। এটা কি হাসপাতাল?

যন্ত্রপাতির মধ্যে একটা বিরাট রেডিও সেট। এক এরিয়াল ইম্পাতের, সেটা সিলিং ফুটো করে চলে গেছে। ছোটোছোটো কয়েকটা বাল্ব জ্বলছে। ফ্রেবস একটা জেনারেটর পরীক্ষা করছে। স্টার্টিং হ্যান্ডেল টানছে, কিন্তু স্টার্ট হচ্ছে না।

ড্রাক্স ধমক দিল— আরে উল্লুক! ঝটপট কর। আমার এখন যাওয়া দরকার। মিনিষ্ট্রির গাধাগুলো ওয়েট করছে।

— হয়ে যাবে। এখুনি হয়ে যাবে।

— জোরে শব্দ করিস না।

— না, ক্যাপ্টেন! ঘরটা তো সাউন্ড প্রুফ—

গালা বুঝল অজ্ঞান থাকার ভানই প্রয়োজন। ওদের মতলব হয়তো গালাকে খুন করা! আধবোজা চোখে মেশিনগুলোর উপর লক্ষ রাখল গালা। আচ্ছা, ফ্রেবস ড্রাক্সকে ‘ক্যাপ্টেন’ বলে ডাকছে কেন? ওই জটিল সংখ্যাগুলোর মানে কী! নব্বই ডিগ্রি ফারাক কেন?

ঠিক করা আছে, মুনরেকারের লক্ষ্যস্থল আশি মাইল দূরে উত্তর সাগরে। সেক্ষেত্রে ফ্রান্স কখনও টার্গেট হতে পারে না। কিন্তু ড্রাক্সের হিসেব অনুযায়ী টার্গেট হবে উত্তর সাগরের নব্বই ডিগ্রি বাঁদিকে। তার মানে সেটা হতে পারে হয়তো ইংল্যান্ডেরই কোনও অংশ। হতে পারে ডোভার থেকে ৬০ মাইল।

এই কি ‘ফায়ারিং প্র্যান?’ মানে, মুনরেকার হিট করবে প্রকৃতপক্ষে মধ্য লন্ডন!!

ভাবতে বুক ধড়াস করে উঠল গালার। জনবহুল মিড-লন্ডন এর টার্গেট।

সব গুলিয়ে যাচ্ছে! এটা কি ডুপ্লিকেট যন্ত্র? নকল? ওই নর্থ-সির যন্ত্রটার মতোই? এই যন্ত্র রকেটটাকে এনে বিস্ফোরণ করাবে বাকিংহাম প্যালেসের একশো গজের মধ্যে?

এবার মনে হল, মুনরেকারের মাথায় অ্যাটম বোমা থাকবে।

দুই, ড্রাক্স ইংল্যান্ডের ঘোরতর গোপন শত্রু!

তিন, আগামীকাল লন্ডন চূর্ণবিচূর্ণ করবে ড্রাক্স।

একপলকে চোখেব সামনে সিনেমার মতো দৃশ্যটা দেখতে পেল সে। রকেটের তীক্ষ্ণ শিব নেমে আসছে মাটিতে। পথে জনতার ভিড়। কাছেই বাকিংহাম প্যালেস। পার্কে শিশুর দল খেলা করছে, সঙ্গে পরিচারিকারা রয়েছে। গাছে গাছে পাখি। হঠাৎ আকাশে অগ্নিশিখা। কয়েক মাইল আকাশ জুড়ে মেঘ! তারপর--

তাবপর বিনাশ, ধ্বংস, সব শেষ।

সিনেমার দৃশ্য মুছে গেল।

— না, না, অসম্ভব। এমন হতে পারে না।

চিৎকার করে আবার জ্ঞান হারাল গালা।

॥ উনিশ ॥

লন্ডনে এটা তার প্রিয় রেস্টোরাঁ। জানলা দিয়ে বন্ড দেখছিল পিকাডেলি আর হে-মার্কেটের জনসমাগম।

ঘড়িতে সাতটা পঁয়তাল্লিশ! ভোদকায় চুমুক দিচ্ছিল বন্ড।

এত দেরি করছে কেন গালা? ভ্যালেন্সের কাছে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আটকা পড়ে গেলে, অস্ত্রত ফোন করত নিশ্চই।

‘মুনরেকার’-এর সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে বন্ডও ভ্যালেন্সকে জানিয়েছিল। মনে হয়, ভ্যালেন্স পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি।

এদিকে হ-হ করে স্টার্লিং বিক্রি হচ্ছে মার্কেটে। ট্রানজিয়ারে শুরু হয়ে ক্রমশ জুরিখ, নিউ ইয়র্কে ছড়িয়ে যায়। সারা বিশ্বে ঘন ঘন পাউন্ডের মূল্যের ওঠা-নামা চলছে। ফাটকাবাজার লাভবান।

এটার মূলেও নাকি ‘ড্রাক্স মেটাল লিমিটেড’ কোম্পানির হাত আছে। তারাই কলকাতা নাড়ছে।

ট্রেজারি প্রশ্ন—ড্রাক্স নিজেই এইসব কাণ্ড শুরু করেছেন, নাকি তার কোনও এজেন্ট দিয়ে করাচ্ছেন? পাউন্ডের দাম যাতে আর পড়ে না যায়, তার জন্য ব্যাংক অব ইংল্যান্ড পাউন্ড কিনতে বাধ্য হচ্ছে।

ভ্যালেন্স নাকি ব্যাংককে বলেছে—মুনরেকার ব্যর্থ হবে। খবরটা ড্রাক্সও শুনেছে। মিনিষ্ট্রি কিন্তু মুনরেকার-এর সফলতায় দৃঢ়বিশ্বাসী। স্টার্লিং-এর ব্যাপারে অন্য দেশের হাত থাকতেও পারে—আর্জেন্টিনা বা রাশিয়া।

মোটকথা, মুনরেকার গুত্রবার ঠিক বারোটায় উৎক্ষিপ্ত হবে। এতে নড়চড় নেই। হয়তো মিনিষ্ট্রি ঠিকই বলছে, তবু ভ্যালেন্স দৃষ্টিস্তাগ্রস্ত।

— আচ্ছা গালা, তুমি ট্রানজিয়ারের কোনও টেলিগ্রাম দেখেছ?

— না।

— সম্প্রতি ড্রাক্স সম্পর্কে অন্য কোথাও কোনও মন্তব্য করেছে?

— না।

বন্ড জানে, সেরকম কিছু হলে গালা বন্ডকে জানাত।

M নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে যাচ্ছেন অবশ্য।

— দেখ, ০০৭, ওখানে গোলমালে কিছু নিশ্চই হচ্ছে। যদিও আমি ঠিক অনুমান করতে

পারছি না। স্পেশাল ব্রাঞ্চ বা মিনিস্ট্রি অনেক খবর রাখে। কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই না। সন্দেশটা মিথ্যে নয় বলে আমি মনে করি। কিন্তু... আচ্ছা, তোমার ওই মেয়েটি কী করছে?

বন্ড বেরিয়ে আসে। নিজের অফিসে তার সেক্রেটারি মিস লোয়েলিয়া পনসেবিকে চমকে দিয়ে চুমু খায়। চমক, কারণ একমাত্র তাব জন্মদিন ছাড়া লোয়েলিয়াকে কখনও চুমু দেয় না বন্ড। না, আর দুটো দিন আছে চুমু দেওয়ার - খ্রিস্টমাস এবং যখন বন্ড কোনও বিপজ্জনক কাজে যায়!

ওর মুখে বন্ড শুনল, অ্যাসিস্ট্যান্ট কর্মশনার ভ্যালেন্স তার খোঁজ করছিল। ম্যান হাউসের ডিনারে তাকে যেতে বলা হয়েছে।

বনবান করে টেলিফোন বাজে। ওপরে ভ্যালেন্সের গলা।

- হ্যালো বন্ড, মিস গালা ব্র্যান্ডকে দেখেছ?

- না। সে ওখানে যায়নি?

— না। লন্ডনে আসার পর তার কোনও পাত্তা নেই। ড্রাক্সের গাড়িতে এলে এখানে তার মাড়ে চারটের মধ্যে পৌঁছবার কথা। ডোভার রোডে কোনও পথদুর্ঘটনা ঘটেছিল তো?

— সেটার খোঁজ নিতে হয়।

- - শোনো, মেয়েটা ভালো। ওকে বিপদমুক্ত রাখা দরকার। খোঁজ নাও। খবরের কাগজের লোকদের কিছু না বলাই ভালো। ওরা ছুতো পেলেই প্রেম, খুন, আত্মহত্যার গুজব ছড়াতে শুরু করবে।

ভ্যালেন্সের মুখে বন্ড জানল, মুনরেকার সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেবেন। স্বাভাবিকভাবেই, সাংবাদিকরা গালা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে। তাই আমরা একটা পালটা কাহিনি রটিয়ে দেব— তার আগেই। কোথাও পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে— এই শরনের কিছু আর কী! তুমিই সেটা ভেবে নাও। এছাড়া মেয়েটির খোঁজ নাও। প্রকৃতই তার অবস্থাটা কী?

— ঠিক আছে। খোঁজ নিচ্ছি। কিন্তু ড্রাক্সের খবর কী?

— মিনিস্ট্রিতে তার যাবার কথা সাতটায় - -

হঠাৎ লাইনে গোলমাল। নানা গলা! ক্রস কানেকশন, না অন্য কিছু।

— ধন্যবাদ— বলে ফোন রেখে দিল ভ্যালেন্স।

একটু পরে আবার ফোন এল।

— শোনো, সিটি পুলিশ জানিয়েছে, হিউগো ড্রাক্স মিনিস্ট্রিতে গিয়েছিলেন সাতটায়। ব্লের্ডস্ এ ডিনার করবেন। এগারোটায় কারখানায় ফিরবেন।... তার মানে ন'টায় লন্ডন ছেড়ে চলে যাবেন।... হ্যাঁ, দাঁড়াও... ড্রাক্স জানিয়েছেন গালা ব্যস্ত লন্ডনে এসে অসুস্থ হয়ে যায়। পৌনে পাঁচটায় তাকে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে নামিয়ে দেওয়া হয়, গালায় কোনও এক বন্ধুর বাড়িতে। তারই ইচ্ছায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে-ই কোনও এক বন্ধুর বাড়ি বিশ্রাম নিতে চায়। না, না, সে বাড়ির ঠিকানা ওদের জানা নেই। গালা জানিয়েছিল— সাতটায় মিনিস্ট্রিতে আসবে বা খবর দেবে। কিছুই করেনি।

বন্ড চুপ করে থাকে।

এবার তাকে চমকে দিয়ে ভ্যালেন্স বলে— আমাদের কাছে আরেকটা খবর আছে। তোমার সঙ্গেও নাকি ছ-টার সময় তার দেখা করার কথা ছিল। তুমিও যথার্থীতি অপেক্ষা করেছিলে, কিন্তু সে তোমার সঙ্গেও দেখা করেনি।

বন্ড বলল— ঠিক কথা।.. আচ্ছা, লন্ডনে কি ড্রাক্সের কোনও ফ্ল্যাট আছে?

ভ্যালেন্স বলল— যতটুকু জানি, ড্রাক্স এখানে বেশিরভাগ সময় হোটেল রিভজ্ এ ওঠেন।

গ্রোসেভনর স্কোয়ারে একটা বাড়ি ছিল একসময়ে, কিন্তু ডোভারে যাবার সময় ওটা বিক্রি করে দিয়েছেন, তবে এবুরি স্ট্রিটে তার একটা আস্তানা আছে। খুব গোপনীয়। ভাড়াটে মেয়েদের ফুর্তির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যস্, আর কিছু এ ব্যাপারে জানা নেই!

— ঠিক আছে। থ্যাংকস্। আমি দেখছি—

— উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট—

বন্দ এবার ব্লডস-এ টেলিফোন করল।

— আমি মিনিস্ট্রি অব সাপ্রাই থেকে বলছি। ওখানে স্যার হিউগো ড্রাক্স আছেন?

— ডাইনিং হলে। কথা বলবেন?

— না, আছেন কিনা জানতে চাইছিলাম।

আটটা পঁয়তাল্লিশ।

বন্দ গাড়ি চালিয়ে সেন্ট জেমস্ স্ট্রিটে এল। গাড়িতে বসেই খবরের কাগজে মুখ ঢেকে খালি মার্সেডিজটার ওপর নজর রাখল।

একটু পরেই বিশাল বপু ড্রাক্স বেরিয়ে এল ব্লডস্-এর দরজা দিয়ে। চোখ-ঢাকা টুপি। মার্সেডিজ নিয়ে ছুটল সে— সেন্ট জেমস্ স্ট্রিটের বাঁদিক দিয়ে। বন্দ ওর পিছু নিল, জোরে চালাতে বাধ্য।

লোকটা সত্যি ভালো ড্রাইভ করে— মনে মনে স্বীকার করল বন্দ। ওর পেছনে জোরে গাড়ি ছোটাতে হচ্ছে।... বাকিংহাম প্যালেস গেট! এবার কি এবুরি স্ট্রিটের দিকে। লোয়ার গ্রোসেভনর প্লেসে গ্রিন সিগন্যাল! ড্রাক্স এগিয়ে গেল। বন্ডের সামনে লাল সিগন্যাল— স্টপ! সিগন্যাল অগ্রাহ্য করে বন্দ পিছু নিল, উপায় নেই। তাহলে আর ওকে 'ফলো' করা যাবে না। ড্রাক্স মোড় ঘুরেছে। গাড়িতে বসেই হর্ন দিল।

হঠাৎ দেখা গেল, ফুটপাথে একটি মেয়েকে টানটানি করছে ফ্রেবস। টানতে টানতে তাকে মার্সেডিজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। হুশ করে উধাও হয়ে গেল ড্রাক্স তার গাড়ি এবং বন্দিনীকে নিয়ে।

বন্দ যথারীতি আবার পিছু নিল। হর্ন বাজাতে পারছে না, হেডলাইট জ্বাললেও সন্দেহ হবে কেউ 'ফলো' করছে!

ভাগ্য মন্দ! খালি ট্রাফিকে লাল আলোর সামনে পড়তে হচ্ছে। অথচ, ড্রাক্সের সৌভাগ্য— সবুজ আলো পেয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এক-এক করে চেলসিয়া ব্রিজ, তারপর ব্ল্যাকহাম কমন্স! পথে গাছের সারি। এবার ড্রাক্সের গাড়ির সামনে লাল আলো। আশি মাইল স্পিডে তাড়া করে বন্দ ওর কাছাকাছি এল। দেখতে পেল, ড্রাক্সের পাশে ফ্রেবস বসে আছে।

লাল সিগন্যাল শেষ হতেই আরও সজোরে দৌড়াল মার্সেডিজ, বন্ডের বেন্টলি গাড়ি পুরানো, কিন্তু শক্তিমাম। সমানে ছুটে চলল।

কিন্তু গাড়ির মধ্যে গালা কই? পিছনের সিটে কতগুলো কন্সল পড়ে আছে!

গালা যদি গাড়িতে না থাকে, তবে সে এখন কোথায়? বন্দি? কেন? সমস্ত ব্যাপারটার অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে? আমি কি তাহলে ভুল করলাম? এত বোকা আমি? ড্রাক্সকে এত সময়-সুযোগ কেন দিলাম আমি? ওকে কি আগেই খুন করলে ভালো হত? এবং খুন করলে কি ফাঁসির হাত থেকে রেহাই পেতাম?

যাইহোক, এখন এই গাড়ির পেছনে দৌড়ে কী লাভ হবে?

তবে গালা যদি এই গাড়ির মধ্যেই থেকে থাকে, তাহলে ওরা অবশ্যই তাকে খুন করার জন্য

নিয়ে যাচ্ছে। ডোভারের পথেই যাতে গালাব মৃতদেহ গুম কবে দেওয়া যায়, তাবই চেষ্টা করবে ড্রাক্স।

না, ড্রাক্সের গাড়ির পিছু ছাড়া চলবে না।

বন্ড আবার হাইস্পিডে গাড়ি ছোটাল। সব চিন্তাই মিলেমিশে যাচ্ছে - M, ভালেন্স, কোসেব দায়িত্ব। এক অথে সে এখন একা। সবাই সাহায্য করবে বলা সন্তোষ! গুলি চালিয়ে মার্সেডিজের টায়ার ফুটো করে দিলে কেমন হয়!

স্পিড নব্বই মাইল!

রথাম হিল পেরিয়ে উইন্ড অব কেন্ট!

একি? মার্সেডিজের হেডলাইট কোথায় গেল?

॥ কুড়ি ॥

গালাব জ্ঞান ফিরছে। কিন্তু কোথায় সে এখন?

নানা যন্ত্রণা— মাথায়, শক্ত দড়ি বাঁধা কজিতে, বাঁধা পায়ের কাছে। গাড়ি যতবার বাঁক নিচ্ছে, ততবারই যন্ত্রণার তীব্রতা বাড়ছে।

রবার পোড়া গন্ধ আসছে। রাস্তার বাঁকে ঘষা খেয়ে টায়ারগুলো প্রায় জ্বলে উঠছে। আর ওই ফ্রেবস! কী ভয়ংকর!

ড্রাক্স ইংল্যান্ডকে ঘৃণা করে। এটা বুঝতে অসুবিধা নেই, যতই জার্মান ভাষায় কথা বলুক।

মনে পড়ল শেষ অবস্থা। চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় জ্ঞান ফিরলেও সে অজ্ঞান হয়ে থাকার ভান করেছিল। তারপর যন্ত্রগুলোর প্রতি ফ্রেবস-এর বিদ্বেষ— ও, সোনারগি, এবার ঘুম থেকে ওঠো। হ্যাঁ, এবার পাক খাও লক্ষ্মীটি। হাজার পাক। মুখ মুছিয়ে দিচ্ছি। দেখি, ডায়াল বাবা এখন কী বলছে।

এইভাবে বিড়বিড় করে যন্ত্রগুলো টেস্ট করতে করতে কথা বলছিল সে। মাঝে মাঝে গালাকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে।

হঠাৎ উঠে এসে গালাব শার্টের বোতাম খুলতে থাকে। আঁতকে উঠে গালা বলে— জল!

ফ্রেবস বাথরুম থেকে জল আনে।

গালা বলে— আমি এখানে কেন?... ওগুলো কী মেশিন?

— মেশিনগুলো দিয়ে ছোটো ছোটো পাখি ধরা হয়। পাখিগুলো পরে ডিম পাড়ে। তারপরেই টেচিয়ে বলে— তুই হতভাগী ইংরেজ কুস্তি। এবারে বল— তুই এখানে কী করতে এসেছিস? কার হয়ে কাজ করছিস তুই? বলতেই হবে। তোর বক্ষে নেই, চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না!

গালা বলে— আশ্চর্য, কী যা-তা বলছ? আমি স্যার হিউগো ছাড়া কাউকে চিনি না, ও ছাড়া কার কাজ করব? 'ফ্লাইট প্ল্যানটা' সম্পর্কে আমি আগ্রহী ছিলাম...

মোট কথা গালা বোঝাতে চাইল সে মুন'রেকার-এর সাফল্য সম্পর্কে কত উৎসাহী।

ফ্রেবস বলল— না, না, এসব বাজে কথা—

তার কর্কশ দুটো হাত গালাব দিকে এগিয়ে এল—

এবার তার সারা দেহ খিমচে, চিমটি কেটে, হাতড়ে হাতড়ে গালাকে উপভোগ এবং অত্যাচার দুই-ই করছিল ফ্রেবসের হাত।

ক্রুদ্ধ গালা একরাশ থুথু ছিটিয়ে দিয়েছিল ফ্রেবসের মুখে।

ততোধিক ক্রুদ্ধ ফ্রেবস জোরে গালাব গলা টিপে ধরে। আবার জ্ঞান হারায় গালা।

এর কিছু পরে তাকে মুহম্মান অবস্থায় গাড়িতে তোলা হয়। গায়েব উপর একগাদা কস্বল। গাড়িটা পাগলেব মতো ছুটতে থাকে। জ্ঞান ফিরে পাওয়ায় যন্ত্রণাগুলো বেশি করে টের পায়। সামান্য নড়াচড়া করে তার শরীর। ক্রেবস সেটা দেখে। কঠিন হাতে তাকে চেপে ধরে থাকে।

আরেক রাউন্ড বন্ধন! গালা প্রার্থনা করে— এসো, কেউ এসে আমায় বাঁচাও!

এই ভাবে এক ঘন্টা কেটে যায়। গাড়িটার স্পিড কমেছে।

ড্রাক্সের গাড়ি এখন মেডস্টোনে।

— ক্যাপ্টেন! লক্ষ করছি, একটা গাড়ি বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমাদের ‘ফলো’ করছে। এখন মাত্র একশো মিটার পিছনে। মনে হয় কম্যান্ডার বন্ডের গাড়ি।

চমকে উঠল ড্রাক্স। গর্জন করে বলল— অল রাইট! তার মানে ওর সেই বুড়ো লকড গাড়িটা আমাদের পিছু পিছু আসছে। ঠিক আছে। আরও কিছুটা ছুটুক। মেঘেটার সঙ্গে ওকেও ব্যাগে ভরে নেব।

রেডিওতে প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর : উনি পারদর্শী... মারাত্মক অস্ত্র. . উর্ধ্ব হাজার মাইল— এটা আমাদের দীপপুঞ্জের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা। শক্তির পথ প্রশস্ত হবে। মানুষ অন্য গ্রহে যেতে পারবে... স্যার হিউগো ড্রাক্স দেশপ্রেমিক...

হো হো করে হেসে উঠল ড্রাক্স! রেডিও বন্ধ করে দিল।

গালা মনে মনে বলল— জেমস, জেমস, কী করছ তুমি? সাবধান! কিন্তু তুমিই তো একমাত্র পারো—

বন্ডের গাড়ির স্পিড এখন ঘন্টায় ৯৫। সামনে ‘লিডস্ ক্যাসল’

এই সময় হঠাৎ আরেকটা গাড়ির হর্ন শোনা গেল। বন্ড দেখল— তার পাশে এসে গেছে একটা ছোটো লাল গাড়ি। রেসিং-কার টাইপের। বনেটে লেখা : **Attaboy II**। একটা তরুণ ড্রাইভার।

ছেলেটা সুশ্রী, হাসিমুখ।

বন্ড ওকে দেখে ভদ্রতা করে হাত নাড়ল। গাড়িটা পুরোনো। তরুণ ড্রাইভার ড্রাক্সকে ওভারটেক করার চেষ্টা করছে। দুজনেই পাশাপাশি চলছে। ড্রাক্স ক্ষিপ্ত।

— শুরারের বাচ্চাকে আচ্ছা টাইট দেব এবার।

ছোকরা মনের আনন্দে হর্ন বাজাচ্ছে— পম পম পম। মিউজিকের মতো। এবং চূড়ান্ত স্পিডে চালাচ্ছে।

ড্রাক্স হঠাৎ ডাইনে চেপে ছোকরার গাড়িটাকে ধাক্কা মারল। মার্সেডিজের ধাক্কা! ছোকরার হালকা গাড়ি ছিটকে গেল। ক্রেবস চিৎকার করল— ব্রেভো, ক্যাপ্টেন, ব্রেভো!

— কী হল ক্রেবস?

— ব্যাটা উলটে পড়েছে। গাড়িটা জ্বলছে।

— বন্ড এটা দেখেও কি শিক্ষা পাবে না?

বন্ড পিছন পিছন সমান বেগে ছুটে আসছে, সব কাণ্ড দেখেও।

চোখের সামনে আরেকটা হত্যাকাণ্ড ঘটল। সুতরাং প্রতিশোধম্পূহা আরও কয়েক ডিগ্রি চড়ে গেল বন্ডের।

হ্যাঁ, স্যার হিউগো ড্রাক্স এক অর্থে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে!!

অতএব তার সম্মুখীন হতেই হবে।

ড্যাশবোর্ডের ভিতর থেকে রিভলবার বের করল বন্ড। মার্সেডিজটাকে থামাতে হবে এবার। বাঁদিকে ঘুরেছে ড্রাক্স। উঁচু পাহাড়ি রাস্তা এবার। সেই রাস্তাতেই উঠছে ড্রাক্স।

সামনে একটা প্রকাণ্ড আট চাকার ডিজেল কার্ভিয়ার। তাব উপর বোম্বাই ১৪ টন নিউজপ্রিন্টের রোল। বোম্বা যাব, কোনও সংবাদপত্র অফিসের অর্ডার, সেইদিকেই যাচ্ছে ওই কার্ভিয়ার।

ব্রুঙ্ক ড্রাক্স।

গাড়িটায় কুড়িটা বান্ডিল। একেকটায় পাঁচ মাইল লম্বা নিউজপ্রিন্ট।

ড্রাক্স বলল— ফ্রেবস, ছুরিটা নাও। লরিটার কাছে স্পিড কমাও আমি। তুমি আমার গাড়ির বনেটে লাফিয়ে ওঠো। বান্ডিলগুলোর দড়ি কাটবে পেছন থেকে। ওই ভাবী বোলগুলো গড়িয়ে পড়তে থাকবে। সাবধান!

উইন্ডস্ট্রিন দিয়ে বনেটে উঠল ফ্রেবস। তারপর একলাফে লরিব পেছন দিকে উঠে পড়ল। ছুরি দিয়ে দড়িগুলো কাটতে থাকল।

দুম, দুম, দুম, দুম!! বান্ডিলগুলো গড়িয়ে পড়ছে।

একটা কি নেমে এসে বন্ডের গাড়িটা চূর্ণ করে দেবে না!

হাসতে হাসতে লরিটাকে ওভারটেক করে বেরিয়ে গেল ড্রাক্স।

লরি-ড্রাইভার চিৎকার করল।

গাড়ির ভেতর থেকে গালাও বুঝেছে, বিরাট কোনও বিপদ আসছে।

বন্ডের গাড়ির হেডলাইট নিভে গেছে। এবার পুরো গাড়িটা নিউজপ্রিন্টের বিশাল রোলার ধাক্কায় চুরমার হয়ে যাবে।

॥ একুশ ॥

— সাবাস, ক্যাপ্টেন, সাবাস!

হাততালি দিয়ে হাসছে ফ্রেবস।

ড্রাক্সও খুশি— তোমাকেও সাবাস দিচ্ছি।

— বন্ড এখন চাপা পড়ে নিজেই একটা বান্ডিল হয়ে গেছে।

— কিন্তু লোকটাকে রাস্তায় ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না।

বন্দুক হাতে গাড়ি থেকে নামল ড্রাক্স। ফ্রেবসকে নিয়ে পাহাড়ের পথে ফিরে এল।

লরিটা যেখানে থেমেছিল সেখানে ড্রাইভারের কোনও হদিশ নেই। গাড়িটায় ফিরে এসে আবার ড্রাইভ করে পাহাড়ি পথে এগোল ড্রাক্স। ড্রাইভারটা গেল কোথায়? কোম্পানিতে ফোন করতে? কোথা থেকে ফোন করবে?

সারা পথে রোল করা কাগজের টুকরো। ঝোপের মধ্যেও জড়িয়ে গেছে। রাস্তার রেলিংগুলো ভেঙেছে, খুব সম্ভব বন্ডের গাড়ির ধাক্কায়।

ঝিঁঝিঁর ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

পিস্তল হাতে ফ্রেবস আর ড্রাক্স এগোল। পেট্রলের সঙ্গে সঙ্গে রবার-পোড়া গন্ধ। ওই তো বন্ডের গাড়িটা! রেডিওটার ফেটে গেছে। সেখান থেকে গরম ধোঁয়া বেরচ্ছে।

বন্ড কোথায়?

ওই তো, ঢালের পাশে মুখ খুঁড়ে পড়ে আছে। ফ্রেবস ওকে চিৎ করে দিল, বন্ডের মুখ রক্তাক্ত। মৃদু শ্বাস পড়ছে। পোশাক খুঁজে বেরোটা বন্দুকটা পাওয়া গেল। সেটা নিজের পকেটে নিল ফ্রেবস।

এবার মার্सेডিজ্জে তোলা হল বন্ডকে, প্রায় গালায় দেহের পাশেই। গালা টের পেল— এটা বন্ডের আহত জ্ঞানহারা শরীর। সে চিৎকার করার চেষ্টা কবল।

— শাট আপ! - ড্রাক্স ধমকে উঠল— অ্যাঁই ফ্রেবস, দুটোকে টাইট করে বেঁধে রাখ।... তারপর, ওর গাড়ির নম্বর প্লেটটা খুলে আন।

ওদের দেহের কম্বল চাপানো হল। নম্বর প্লেট নিয়ে এল ফ্রেবস।

মার্সেডিজ স্টার্ট দিল। রাস্তায় টর্চ হাতে কিছু লোক হাঁটছে। কাগজের ধ্বংসস্তূপের উপর আলো ফেলছে তারা। পথের দুপাশে ফুল ফুটে রয়েছে— রুবেল আর সেলানডাইন। ফুলের ওপর মার্সেডিজের আলো পড়ছে। অতীতের কিছু অবস্থা বকথা মনে এল।

গালার মুখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। বন্ড আর গালার মুখ এবার পাশাপাশি। গালা বুঝতে চাইছে— কতটা আহত হয়েছে বন্ড!

— জেমস! জেমস!

অস্ফুট কিছু বলে গালাকে জড়িয়ে ধরল বন্ড — গালা! মাই—

— কেমন আছ তুমি? হাড় ভেঙেছে কি?

— বোধহয় ভাঙেনি। কিন্তু মাথায় জোর চোট লেগেছে।

এই সুযোগ! সুস্থ সময়ের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না।

বন্ডকে ফিসফিস করে নোটবইয়ের যাবতীয় ব্যাপার সংক্ষেপে জানিয়ে দিল গালা। বন্ডের আহত দেহ আরও কঠোর হয়ে উঠল।

গাড়ি ছুটছে ক্যানটরবেরির কাছ দিয়ে।

বন্ড বলল— চলন্ত গাড়ি থেকে আমাকে ঠেলে ফেলে দাও। তবে আমি কোনওমতে একটা টেলিফোন করতে পারব—

উঠে বসার চেষ্টা করতেই মাথায় আবার প্রচণ্ড আঘাত পড়ল। লুটিয়ে পড়ল বন্ড। ফ্রেবসের ত্রুন্ধ গলা— হারামজাদা, এক ফোঁটা নড়লে একেবারে খতম করে দেব।

গাড়ি কারখানায় এল। গালা দুঃসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছে বন্ডের জ্ঞান ফেরাতে। একহাতে বন্দুক নিয়ে আরেক হাতে ওদের বাঁধন খুলছে ফ্রেবস। কংক্রিটের বিরাট ঢাকাটায় জ্যোৎস্নার আলো পড়েছে।

লক্ষিঃ ডোজ! অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে রকেট। মনে হবে, দৈত্যদের খেলনা। কিন্তু যেন একটা নিষ্পাপ শিশু। অতিকায় চেহারার শিশু! বন্ডের চোখের দৃষ্টিতে অন্য ছবি— এটা একটা হাইপোডার্মিক সূচ, ইংল্যান্ডের কলজেতে বিদ্ধ হবে। মুনরেকার-এর মুনটায় ভেসে উঠছে লক্ষ লক্ষ মরণোন্মুখ মানুষের ছবি।

কী করে বাঁচবে এরা? ঈশ্বর, কী উপায় আছে?

পিঠে ফ্রেবসের বন্দুকের নল। সিঁড়ি দিয়ে নামছে বন্ড। না, হেরে গেলে চলবে না। একটা উপায় বের করতেই হবে।

একটা চেয়ারে বন্দুক হাতে বসল ড্রাক্স। বলল— যুদ্ধের সময় ব্রানড্রেনবুর্গ ডিভিশনে আমি ছিলাম সেরা মার্কসম্যান।... ফ্রেবস, গালাকে চেয়ারে-বাঁধো। তারপর এই ইংরেজটাকে।

বন্ড বলল— গুলি চালালে জ্বালানিতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

— না, না। কিছু হবে না, আমি তোমার পেটে পিস্তল চালাব।

দুজনকে চেয়ারে বেঁধে বেরিয়ে গেল ফ্রেবস। একটা ব্লো-টর্চ হাতে ফিরে এল। ওর মধ্যে বাতাস ভরা হল। জ্বলে উঠল আগুনের শিখা। সেটা হাতে নিয়ে গালার কাছে এল ফ্রেবস।

ড্রাক্স বলল— বন্ড, এই যন্ত্রটাকে আমরা বলি ‘কথা-বলাবার যন্ত্র’। যখন কারুর পেট থেকে কথা বের করার দরকার পড়ে— বুঝেছ? একটা স্পাইকে— ওঃ, ফ্রেবস তার যে কী অবস্থা করে ছেড়েছিল! মনে আছে ফ্রেবস?

-- হ্যাঁ, লোকটা ছিল এক বেলজিয়ান শুরোরের বাচ্চা।
-- হুঁ! শোনো, আমরা ছেলেখেলা করছি না। গালা, আগে তুমি বালো, কাদের হয়ে কাজ করছ তুমি?

গালা নিশ্চুপ।

-- ফ্রেবস, তোমার যন্ত্র কাজে লাগাও।
জিভ চাটল ফ্রেবস। ক্ষুধার্ত পশুর মতন। আগুনের শিখা হিস হিস আওয়াজ করছে সাপের মতো।

-- স্টপ! -- বন্ড বলল-- আমি উত্তর দিচ্ছি। আমরা দুজনেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেব হয়ে কাজ করছি।

ড্রাক্স বলল ভালোই তো। যাক. তোমরা এখন বন্দি, এটা কেউ জানে? ওদের কাউকে খবরটা দিয়েছ?

-- না। টেলিফোন করতে পারলে তো ওরা এতক্ষণে এসে যেত।
-- তা ঠিক। বুঝেছি... ওরা পরিষ্কার স্বীকার করেছে।... ফ্রেবস, তোমার যন্ত্রটা সরাও। তুমি এবাব যাও! বাইরে যা দরকার, সেসব করো। গাড়িটা যেন ধোয়া মোছা হয়। তেমন অবস্থা হলে গাড়িটা পুড়িয়ে ফেলবে। যদি ওটা কাজে না লাগে।

-- ইয়েস ক্যাপ্টেন! -- ফ্রেবস চলে যায়। ব্রো টর্টটা টেবিলের উপর রেখে দেয়--
ক্যাপ্টেন, এটা রইল, যদি--

পিঙ্কলটাও টেবিলে। সিগাব ধরাল ড্রাক্স।

-- বন্ড! আমি সত্যিই কিছু বলার জন্য একজন ইংরেজ শ্রোতা চেয়েছিলাম। গল্পটা বলার জন্য হুটফুট করছে আমার মন। শোনো, বিশদ তথ্য এবং পুরোটাই রয়েছে এডিনবরার একটা সলিসিটার ফার্মের হাতে। বিখ্যাত ফার্ম। তারা অবশ্য বিপদ এলাকার বাইরে। আর তোমাদের সৌভাগ্য পুরো অপারেশনটা দেখতে পারে।

বন্ডের কঠোর মুখ। গালা শঙ্কিত।
হাসতে হাসতে ড্রাক্স বলে-- কাল দুপুরে প্রথমে ওই টারবাইনগুলো থেকে গ্যাস বেরতে

থাকবে। বাস, আর কিছু দেখার -- যাগ পাবে না, কারণ আধ সেকেন্ডের মধ্যেই তোমারা মারা যাবে। পুরো ব্যাপারটা --

বন্ড চিৎকার করল-- ইউ, ব্লাডি জার্মান, মাসল কথাটা বলো।
-- অ্যা? হ্যা, আমি অবশ্যই বনেদি জার্মান। ইতিহাসে লেখা থাকবে, একা একটা জার্মান

ইংল্যান্ডকে শেষ করেছে। আমাকে গালি দেবার সুযোগ থাকবে না তাদের!
সিগারে টান দিল ড্রাক্স! লাল গৌফের তলায় কুৎসিত দাঁত। আঙুলের নখগুলো কামড়াতে থাকল সে।

॥ বইশ ॥

-- এবার আমার কথা একটু বলি।... আমার পুরো নাম এবং... আসল নাম গ্রাফ হিউগো, ফন ডার ড্রাক্সে। আমার মা যেহেতু ইংরেজ, আমাকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত ইংল্যান্ডে লেখাপড়া করতে হয়। কিন্তু এই জঘন্য দেশটাকে আমি সহ্য করতে পারতাম না। তাই পরে বার্লিন আর লিপজিগে আমার শিক্ষা শেষ হয়।

...কুড়ি বছর বয়সে। পার্শ্ববর্তিক ব্যবসায় যোগ দিতে হয়। বিখ্যাত স্টিল কোম্পানি 'রাইনমোটাল বোর্সিকের' অংশ ছিল সেটা। এখানে তৈরি বহু শেল ইংল্যান্ডের ওপর পড়েছে।

ওখানে বিমান সম্বন্ধেও কিছু শিখি। তখনই কানে আসে 'কোলানবাইটে'র কথা। সেই পাটিতে যোগ দিই। যুদ্ধের সময় ছিলাম ১৪৫ প্যানজন রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট। ফ্রান্সে ব্রিটিশ আর্মিকে আমরা কচুকাটা করি।

আঃ বন্দ। কী আনন্দের দিন ছিল সেগুলো। পরে যাই ব্রাভেনবুর্গ ডিভিশনে। ইতিমধ্যে খুব এনজয় কবেছি সুন্দরী মেয়ে আব শ্যাম্পেন। আবার জার্মানি এসে ইংল্যান্ড আক্রমণের ট্রেনিং দিই। যেহেতু ইংরেজি ভাষা জানতাম, তাই ভালোই শিক্ষা দিয়েছিলাম। এরপব আমাকে S.S-এর বিদেশি গোয়েন্দা দপ্তরে ট্রান্সফার করা হয়।... হ্যাঁ, তখন বহু ইংরেজকে দারুণ শিক্ষা দিয়েছি। জেনারেলগুলো ভুল পরামর্শ দেয় হিটলারকে। ইংরেজ আর আমেরিকানদের ফ্রান্সে যেতে অনুমতি দেওয়া হয়।

বন্দ বলে - সত্যিই তো! ভাবি অন্যান্য!

-- সে তো বটেই। তবে আমার পক্ষে স্মরণীয় সময়। শত্রুসৈন্যের পেছনে কাজ করার জন্য সমস্ত টেরোরিস্ট আর অন্তর্ঘাতীদের জড়ো করা হয়। নানা 'হানাদার' আর কম্যান্ডো তৈরি হয়। আমার প্রমোশন হয়। 'ড্রাখে কম্যান্ডো'র চিফ হয়ে আমি ১৫০ প্যানজার বিগ্রেডে যাই। আমেরিকান সেনাকে টপকে আমি আর্ডেনে পৌঁছেছিলাম। মনে আছে, সেটা ছিল ডিসেম্বর, ১৯৪৪। আমরা আমেরিকান ইউনিফর্ম পরে, আমেরিকান ট্যাঙ্ক নিয়ে পৌঁছেছিলাম।

...আমরা ছিলাম মাত্র কুড়িজন। দশজন সেনা আর দশজন হিটলারের যুবদল 'পিশাচ বাহিনী'র মেম্বর। সবাই অল্প বয়েসি, উনিশের নীচে। ফ্রেবসকে ওদের মধ্যেই পাই। ও যে পদ পায়, তাকে বলা যায় 'কিলাব' বা 'টার্চারার'।...

ফ্রেবস নিজের অতীত স্মরণ করে গর্বিত। ড্রাক্স বলতে থাকে :

- ছ-মাস কেটে যায় বন্দ এ। রেডিও মারফত জার্মানিতে খবর পাঠাতাম। এই সময়েই একটা গোলমাল হয়।

... 'নিসেন হাট' নামে একটা জায়গায় একটা বাড়ি উড়িয়ে দেব ভেবেছিলাম। গোপনতা রক্ষার জন্যই সেটা দরকার ছিল। ইংরেজ ও আমেরিকান ইউনিফর্ম পরে আমাদের লোক যাবে। সন্ধে সাতটায় ফিউজ সেট করে চলে আসবে।

... সেদিন আমি আমার পববতী অফিসারের উপর দায়িত্ব দিয়েছিলাম। আমার কাজ ছিল অন্য। এক ব্রিটিশ ডেসপ্যাচ রাইডারকে গুলি করা। ওর পিঠে গুলি করে মারি। তারপর সব কাগজপত্র নিয়ে আশুন্ লাগিয়ে দেব ভেবেছিলাম। ফেব্রার পথে একটা প্লেন ইনস্পেকশন করতে হয়। হঠাৎ সেই প্লেনটা থেকেই কেউ আমাকে গুলি করে। আচমকা ছিটকে একটা নর্দমার মধ্যে পড়ে যাই। জ্ঞান ফেব্রার পর টুপি-জ্যাকেটের মধ্যে কাগজপত্রগুলো জড়িয়ে সেখানেই ফেলে দিই। আবার অজ্ঞান হয়ে যাই। পরে একটা সামরিক কনভয় আমাকে উদ্ধার করে।

.. হাসপাতালে বুঝতে পারি, আমার একটা পা ভাঙা, আর গালের অর্ধেকটা উড়ে গেছে।

... এর পর থেকেই অভিনয়। আমার পরিচয় বদলে যায়, আমি এক অজ্ঞাতকুলশীল ইংরেজ, বিস্ফোরণে আহত, পরনে ইংরেজ পোশাক। এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে-- নিজেই দৈহিক ভাবে সুস্থ করার জন্য।

... মনে সৃষ্টি হল জ্বলন্ত প্রতিশোধের আশুন্। বদলা, বদলা, বদলা! ইংল্যান্ডকে চুরমার করব আমি। ইংরেজদের উপর তীব্র বিদ্বেষ আমার। হ্যাঁ, তোমরা শুয়োরের জাত। ভিত্তু, তোমাদের হয়ে অন্যদের লড়াই করাও। আমেরিকানদের তেল দাও, নিজেরা লুকিয়ে থাকো। আসলে 'ভদ্রলোক' সেজে তোমরা গর্দভের আচরণ করো। ক্লাবে তাস খেলে ওই গাধাগুলোর কাছ থেকে আমি হাজার হাজার পাউন্ড জিতেছি। বেশ চলছিল। হঠাৎ সেই তাসের আড্ডায় তোমার আগমন।

ইতিমধ্যে আমি স্যার হিউগো ড্রাক্স বলে পরিচিত হয়ে গেছি। বহু খুন করেও টাকা সঞ্চয় করেছি। পিকার্ডেলির উপরে অফিসঘরে একটা ইহুদি সুদখোরের টাক ফাটিয়ে ওর সিঁদুকে পানরো হাজার পাউন্ড পাই। ইংল্যান্ডকে শেষ করতেই হবে।

... ক্রেবসকে খুঁজে পাই। আরও পঞ্চাশ জন জার্মানকে। সবাই জার্মান দেশপ্রেমিক। দক্ষ টেকনিশিয়ান। তাদের পরিচয় পালটাতে হয় আমার মতোই।

... এবার নতুন প্ল্যান। ডা. ওয়ালটেরারকে পাই। স্কেপণাস্ত্র বিশেষজ্ঞ। খবর পাই, রুশরা পারমাণবিক বোমা বানাতে শুরু করেছে। একটা বোমা আমরা পাই। সেটাই মুনরেকারের মুখে বসানো রয়েছে। এরপরের কাহিনি সংক্ষিপ্ত : লন্ডনে প্রত্যাবর্তন. করোনেশন, রানিকে চিঠি লেখা। পজিটিভ উত্তর, বিশাল সুনাম— ছররে! স্যার হিউগো ড্রাক্স —থ্রি চিয়ার্স!...

... এরপর পাহাড়ের চূড়ায় কাজ শুরু করি আমরা। ইংলিশ চ্যানেলে একটি জেটি তৈরি করতে হয়। রুশ বন্ধুরা মালপত্র পাঠাতে থাকে। এই তো, গত সোমবারেও তারা সাপ্লাই দিয়ে গেছে। ওই ব্যাটা আগের সিকিউরিটি অফিসার ট্যালন আমাদের কিছু-একটা গুপ্ত কথা জানতে পেরে গিয়েছিল। সে মিনিষ্ট্রিকে সেই গুপ্ত খবর জানায়, আর ক্রেবস সেটা ধরে ফেলে। লোকটাকে খুন করতে হয়। সবাই ওকে খুন করতে চায়। লটারি করে একজনকে বাছা হয়— বার্থস! তারপর নিজেও সুইসাইড করে— হ্যাঁ, রিয়েল হিরো! পুলিশের কিছু করার থাকে না।

... একটা সাবমেরিন আসত-যেত। সেটা আর কিছুক্ষণের মধ্যে লুকিয়ে ইংলিশ চ্যানেলে ঢুকে পড়বে। আমাদের শেষ প্রয়োজনটা কাল দিয়ে যাবে— ঠিক ঘড়িতে যখন, বারোটা বেজে এক মিনিট।

...আমরা সাবমেরিনে উঠে 'বিখ্যাত গৌফ' গুলো কামিয়ে ফেলব। অনেকে সাধারণভাবে তখন চিনতেই পারবে না, চেহারা এত বদলে যায়! দেখবে, তোমার মা পর্যন্ত তোমায় চিনতে পারবে না -- মেক আপটা এত গুরুত্বপূর্ণ। এই কায়দার ছদ্মবেশটা আমার আবিষ্কার।

একটু থেমে অধৈর্য ড্রাক্স বলে— কী বন্ড! বোবা হয়ে গেলে নাকি! ক্রেবসের সেই কথা-বলাবার যত্ন ব্যবহার করতে হবে নাকি? অ্যা!

এরপর কিছু রোগ ও ডাক্তারি বিদ্যা নিয়ে তার জ্ঞান জাহির করে ড্রাক্স। বন্ড স্বীকার করে— জ্ঞান আছে বটে লোকটার। জ্ঞানী শয়তান! কী করে স্কুল-কলেজের ছেলেদের আগে উন্মাদ বানাতে হয়। তারপর নাজিজম, নাৎসি দর্শন দিয়ে তার ব্রেনকে একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়। প্যারানেইয়াক! খ্যাপা কুকুর হয়ে যায় তারা।

বন্ড বলে— তুমিও এক বন্ধ পাগল বৃদ্ধ। এখনও কিছুক্ষণ তোমার অভিনয় চালিয়ে যেতে হবে।

ড্রাক্স রাগে ফেটে পড়ল। লাফিয়ে উঠে এসে বন্ডের মুখে কয়েকটা এলোমেলো ঘুঁষি চালাল। বন্ডের সহ্যশক্তি অসীম। তার মাথা এখন একপাশে হেলে গেছে।

গালাকে ড্রাক্স বলল-- ওর জ্ঞান ফিরলে বলে দিও, কাল দুপুরের একটু আগে দরজাটা খুলবে। তার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তোমরা নিশ্চিহ্ন!

চলে গেল ড্রাক্স।

রক্তাক্ত মুখে বন্ড অতি কষ্টে বলল— কিছু ভেব না। লন্ডন টিকে যাবে। মাথায় আবার একটা প্ল্যান এসেছে।

॥ তেইশ ॥

ড্রাক্সের ঘুঁষিতে এখন মাথা ঘুরছে বন্ডের।

সেই অবস্থাতেই আপবোজা চোখে টেবিলের ওপর সেই ব্লো-টর্চটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। জ্বলজ্বল কবছে চোখ।

-- লাইটারটা আমাকে দাও। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওই বাঁধা অবস্থায় চেয়ার সুদ্ধ এগোও, গালা। এটুকু তোমায় করতেই হবে। লোকটাকে নানা কটু মন্তব্য করে খেপাচ্ছিলাম ইচ্ছে করেই— যাতে সে ওই টর্চটা কথ্য ভুলে যায়। প্লিজ, আরেকটু তাড়াতাড়ি চেষ্টা করো, খববদাব, পড়ে যেও না— গালা—

গালার এগোনো দেখে মনে হবে বাচ্চাদের কোনও গেম খেলছে।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত সে দাঁত দিয়ে বনসন লাইটার তুলে নিল। ক্রেবস ব্লো-টর্চটা ঠিক তাব পাশেই রেখেছিল।

বন্ড বলল— এবার সবচেয়ে কঠিন কাজ। টর্চটা জ্বালতে হবে। আমি চেষ্টা করছি। গালা, তোমাব ডানহাতটা আমার সামনে রাখো।

টর্চের ভালভ-টা দাঁত দিয়ে বন্ধ করল বন্ড। তারপর পিস্টনটা ঠোঁট দিয়ে টেনে চিবুক দিয়ে ঠেলে দিল।

-- এইবার লাস্ট গেম! গালা, তোমার হাতে একটু যত্নগা সহিতে হবে।

-- আমি রেডি।

খট করে আঙন জ্বালাবাব বোতামটা দাঁত দিয়ে টিপল বন্ড। ঝলকে উঠল শিখা। নাকের কিছুটা পুড়ে গেল, মুখ সরিয়ে নিল সে। নীল শিখা দিয়ে হাতের বাঁধন কাটতে লাগল— গালাব হাতের বাঁধন। অবশ্য দাঁড়ি পোড়াব সঙ্গে সঙ্গে হাতের চামড়াও পুড়ছে গালাব। কিন্তু বন্ধনমুক্ত হল সে অচিরেই। নিমেষের মধ্যে বন্ডের বাঁধন খুলল।

বন্ডের মাথা ঝুঁকে পড়েছিল। এই অবস্থায় তাব গালে চুমু দিল গালা। চমকে মাথা তুলল বন্ড। গালা হাসছে।

-- তোমার প্রথম পুরস্কার!

-- আশ্চর্য মেয়ে তুমি।

গালার মনে পড়ে গেল, সে বাথরুমে পেরোক্সাইডের প্যাকেট দেখেছে। বাথরুমে গেল সে। একটা ভিজে পেয়ালায় পেরোক্সাইড এনে বন্ডের চোখ-মুখ পরিষ্কার করল সে।

বন্ড উঠে বাথরুমে গেল। কিছুক্ষণ উলঙ্গ হয়ে শাওয়ারে স্নান করল। সর্বাঙ্গে জ্বালা কিছুটা কমল। আয়নায় নিজের ছিন্ন মুখটা লক্ষ করল। পোশাক পরে ড্রয়ার হাতড়াল। ভাগ্য ভালো, পাওয়া গেল আধবোতল হুইস্কি— ‘হেগ অ্যান্ড হেগ’।

গালাও স্নান সেবে ফ্রেশ হয়েছে। আবার সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। গালাকেও একটু হুইস্কি দিল বন্ড, এনার্জি পেল গালা।

বন্ড বলল— এবাব আমার প্র্যানটা শোনো। তোমাকে বাথরুমে আটকে শাওয়ার ছেড়ে দেব। তাবপর শেষ সিগারেটটা ধরাব মুনরেকার-এর তলায়।

— কী সর্বনাশ।

— কীসেব সর্বনাশ! আব কী করার আছে। বিস্ফোরণটা সাংঘাতিক হবে বটে, কিন্তু কেউ টেব পাবে না। জ্বালানির গ্যাস চারদিকে। তাই বিস্ফোরণ হবেই। আমি একা মরব, কিন্তু ইংল্যান্ডের লক্ষ লক্ষ মানুষ বেঁচে যাবে। কারণ বোমাটা ফাটেবে না, এভাবে বোমা ফাটে না। তুমিও বেঁচে যাবে।

গালার মুখ কালো হয়ে গেছে।

বন্ড বলল— চিয়ার আপ।

গালা বলল— আমি যাব তোমার সঙ্গে। ভুলো না, এই দায়িত্বটা তোমার একা নয়, আমাদের দুজনের।

গালাকে জড়িয়ে ধরে বসে — ডার্লিং!

গালা বলল — একটা কথা মনে পড়ল। জাইরো, জাইরো! ওই সেটিংগুলো আমরা ঠিক করলে মুনরেকার নর্থ সি-তে গিয়ে পড়বে।

— সেটিংগুলোর ব্যাপারে তুমি জানো?

— জানি, আমি এই ব্যাপারেই একবছর ধরে কাজ করছি।

— আশ্চর্য! তবে তো... আচ্ছা. আমরা লুকান কোথায়? একজহস্ট সুড়ঙ্গ?

— না, না, সেটা একশো ফুট নেমে গেছে — একদম খাড়া!... তাছাড়া, সমুদ্রতীরে গার্ডার রয়েছে।

— রকেটগুলোতে কাজ হবে।

— না, ওদের রেঞ্জ মাত্র একশো মাইল। তাহলে আমরা—

— শাফ্টের ভেন্টিলেটরে চলে এসো। কুইক্‌

এবার বন্ডের অ্যাকশন!

ভাবী হাতল 'অন' করল বস! আর্ক বাতিগুলো জ্বলছে। দূরে সমুদ্রের গর্জন। ফিরে এসে বাথরুমের পর্দাটা ছিঁড়ে গিট বেধে মোটা দড়ি বমতো তৈরি করল। একটা মুখ মুনরেকার একটা ডানার সঙ্গে বাঁধা হল, আরেকটা প্রান্ত ঝুলতে থাকল শাফ্টের মধ্যে।

ওপরে কংক্রিটের অসমান জায়গা। ওবা ভেন্টিলেটাব গুহায় পৌঁছে গেল। তখন সূর্য উঠছে। দূরে শঙ্খচিলের ডাক।

দেখা গেল, তিনটে লোক এগিয়ে আসছে— ড্রাক্স, ডা. ওয়ালটার ও ফ্রেবস। ড্রাক্স দরজার চাবি খুলে ঢুকল। ওরা এখন বস ও গালায় কয়েক ফুট নীচে।

দশ মিনিট কাটল।

হঠাৎ ড্রাক্সের চিৎকার— ওরা কোথায় গেল? ওই ইংরেজগুলো?

ফ্রেবস বলল— ক্যাপ্টেন, ওরা নিশ্চয়ই ভেন্টিলেটারের গর্তে লুকিয়েছে। গরম ধোঁয়া ছাড়লেই চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসবে।

গরম বাষ্পের হোস-পাইপ ছাড়া হল।

এটা নাবিক বিদ্রোহ দমনের অন্যতম ঐতিহাসিক কায়দা।

ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে, অনেকটা এক-দেহে পরিণত হয়ে পড়ে রইল। মনে হবে, গাট আলিঙ্গনে সংগমে যুক্ত দুই প্রেমিক-প্রেমিকা।

ড্রাক্সরা এখন বোধহয় ইঞ্জিনরুমে!

ফিসফিস শব্দ। ক্রমশই জোরালো হচ্ছে। বস-গালা পরস্পরকে সাহস জোগাচ্ছে।

হুশ্ হুশ্ আওয়াজ এবার। শব্দটা এগোচ্ছে। এবার ভেন্টিলেটারের পাশে। গ্যাসের গন্ধ আসছে। সমুদ্রের গর্জন।

তারপরেই ওঃ! অসহ্য যন্ত্রণা!

এরপর সুড়ঙ্গ। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। গায়ে ফোসকা পড়ছে। এবার বাষ্প আর নেই। যন্ত্রণাও কমল। দারুণ স্তব্ধতা। বন্ডের হাতঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

আধ ঘন্টা এইভাবে শুয়ে রইল ওরা। দেখতে পেল, তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল ড্রাক্স, ওয়ালটার, ফ্রেবস।

অবশ্য গম্বুজের গার্ডগুলো রয়ে গেল।

সাপ্লাই মিনিষ্টারকে ড্রাক্স জিপ্সেস কবল — তাহলে, আমরা সবাই একমত হলাম।
ইয়েস।

এবার ড্রাক্স কাগজপত্র হাতে গম্বুজের দিকে বণ্ডনা হল। সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানরা ঘিরে ধরল। ক্লিক্ ক্লিক্ ফটো উঠছে, ফ্ল্যাশগান ঝলসে উঠছে। প্রশংসা ধ্বনিব বন্যা বইছে। সবকারি কর্মচারীরা তার নির্দেশের জন্য প্রতীক্ষাবত।

এগারোটা পঁয়তাল্লিশ।

বন্ড গালাকে এই সময়ে বলেছিল— তুমি রেডি তে? ?

গালা হাসছে— অবসোল্যুটলি!

এগারোটা-সাতান্ন। গালা বলল— গুড লাক!

এবার ইস্পাতের মেঝে পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছুটছে বন্ড। দুই-পা রক্তাঙ্ক!

রকেটের উপর সেই প্রকাণ্ড সূচটা! আকাশের দিকে মিলেমিশে গেছে।

বন্ড লিভার টিপতেই ফ্রেনটা বেরিয়ে এল। সেটা এসে ঠেকল জাইরো-জাইরো দরজায়। ওপরে চেম্বার। হামাগুড়ি দিচ্ছে বন্ড। দরজার কাছে মুদ্রার মাপের একটা গোল-চাকতি। চাপ দিতে একটা মৃদু শব্দ হল।

আর চার মিনিট বাকি।

ড্রাক্সের অফিসের দরজা খুলে গালা দাঁড়িয়ে। ফ্যাকাশে মুখ। দুজনে ছুটে বাথরুমে গিয়ে শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে গেল।

বি-বি-সি ঘোষণা করছে : 'একটু দেরি হবে। এই পাঁচ মিনিট। স্যার হিউগো রাজি হয়েছেন দু-একটা কথা বলতে।'

রিলে হচ্ছে। ধারাভাষ্যকার বলছে : 'সুন্দর দিন, মনোরম আবহাওয়া। বিশাল ভিড়— কুড়ি হাজার তো হবেই। ওই যে স্যার হিউগোব টিম, তার দলবল সাবমেরিনে উঠছে। দর্শকের উচ্ছ্বসিত হাততালি। স্যার হিউগো ড্রাক্স এসে গেছেন।

বন্ড আর গালা সব শুনতে পাচ্ছে। ওরা সর্বাঙ্গ সিজ্ঞ। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছে।

ড্রাক্স ভাষণ শুরু করল।

— ইওর ম্যাজেস্টি অ্যান্ড লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন অব ইংল্যান্ড, আমি এই দেশের ধাৰা বদলে দিতে চলেছি। 'মুনরেকার' আপনাদের জীবন বদলে দেবে। এটা ক্ষেপণাস্ত্র, দেশের সামরিক শক্তির বৃহত্তম নিদর্শন। এই দায়িত্ব পেয়ে আমি সম্মানিত। আমাদের শত্রুদের ভাগ্যে আজ থেকে থাকবে শুধু ধুলো, ছাই, কান্না এবং... অবশ্যই রক্ত। সবাইকে ধন্যবাদ—

রেডিওতেই শোনা গেল হাততালি ও হর্ষধ্বনি।

ভাষ্যকার বলছে : স্যার হিউগো বক্তব্য রাখলেন। তিনি এখন যাচ্ছেন 'ফায়ারিং পয়েন্টে'র দিকে। দেয়ালের সুইচ টিপলেই মুনরেকার উৎক্ষিপ্ত হবে। এবার মিনিষ্টি অব সাপ্লাই এর গ্রুপ ক্যাপ্টেন ট্যান্ডি বর্ণনা দেবেন। এইচ. এম. এস. কারগাঞ্জা জাহাজ থেকে পিটার ট্রিসবলয়ও বলবেন।

বন্ড হাতঘড়ি দেখল— আর এক মিনিট।

তারপর গালাকে বলল— ভয়ংকব শব্দ হবে। এই ছোটো সাবানের টুকরোটা কানের ফুটোয় রাখো। প্রচণ্ড উত্তাপ হবে, তবে সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না।

গালা বলল - তুমি আমায় জড়িয়ে থাকো। ছেড়ে দিও না।

ধারাভাষ্য শোনা যাচ্ছে : সুইচে আঙুল রেখেছেন স্যার হিউগো। দশ... নয়... আট... সাত ..

হয়.. এইবার ভালভগুলো খুলে যাবে, জ্বালানি জ্বলবে. পাঁচ... পিনহইল আঙুন জ্বালাবার পর ফুয়েল রকেটের মোটরে যাবে... চাব... পেরোক্সাইড আর পার্মানেট মিশে যাচ্ছে, বাষ্প সৃষ্টি হয়েছে, পাষ্প ঘুরবে.. তিন. ফুয়েল রকেটের পেছন দিয়ে একজ্হস্ট চ্যানেলে ঢুকছে. গরম, ৩৫০০ ডিগ্রি... দুই... সুইচ টিপবেন স্যার হিউগো... এক.

ফায়ার!!--

কিন্তু—? আবার ভাষাকারের গলা শোনা গেল।

— স্যার হিউগো ফায়ারিং পয়েন্টে লিফটে উঠলেন। হ্যাঁ, এবার তিনি জেটিতে এসেছেন। হ্যাঁ, এইবার, এইবার, এইবার...

প্রথমে একটা গুরুগুরু ধ্বনি! যেন বহু দূরের কোনও বাজের গর্জন। সেই ধ্বনির তীব্রতা চকিতে বাড়তে থাকে। মেঝে কাঁপছে, দেয়াল টলমল করছে।

হঠাৎ কানফাটানো বজ্রগর্জন।

বন্ড বলল— গালা, গালা, স্থির থাকো—

বলতে বলতে নিজেই জ্ঞান হারাচ্ছে বন্ড।

অস্ফুট স্বরে তবু বলতে চাইছে— গালা, এবার বাইরে বেরিয়ে যাও, এবার বাইরে চলে যাও, গো আউট—

বিকট বিস্ফোরণের শব্দ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল।

আমরা কি বেঁচে আছি? কী ভয়ংকর স্তব্ধতা! শ্বশানের সাইলেন্স। ওরা টের পেল, ড্রাক্সের অফিসের মেঝেতে পড়ে আছে ওরা। নাথকমের আলোটা দেখা যাচ্ছে। ধোঁয়া কমছে। লোহা আর রঙের পোড়া গন্ধ! কিন্তু এয়ারকন্ডিশন মেশিন কাজ করছে।

গালা চোখ মেলল। হ্যাঁ, আমরা বেঁচে আছি। ঈশ্বর করুণাময়।

হাসল গালা। বন্ড অস্থির— রকেটের কী হল?

বলা মুশকিল!

রেডিও সেট থেকে আবার কথা ভেসে আসছে।

— নিখুঁতভাবে ছোঁড়া হয়েছে মুনরেকার। প্রচণ্ড গর্জন, তাই অন্য কিছু শোনা যায়নি। একজ্হস্ট দিয়ে আঙনের লোলুহান শিখা! গম্বুজ ছেড়ে ধীরে ধীরে আকাশের দিকে মুখ বাড়ায় মুনরেকার। উড়ে যায়, মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা রূপোর পেনসিল। পাহাড়ে বড়ো ধস নামছে। কাঁপছে সমস্ত পর্বতশ্রেণি।

... গতি বাড়ছে মুনরেকারের। ঘন্টায় একশো মাইল। ঘন্টার এবার হাজার। এখন এটা তিনশো মাইল উপরে, শূন্যে। একটা ছোটো তারা যেন!

... স্যার হিউগো চ্যানেলে পৌঁছেছেন। সাবমেরিনগুলো চলে গেছে। কিছু জাহাজ আসবে, টহলদারী করতে। আশ্চর্য, আশ্চর্য! আমাদের নেভি পর্যন্ত অবাক!

... এবার অন্য স্পট থেকে ভাষ্য শোনা যাবে। এইচ-এম-এস মার্গাঞ্জার জাহাজ থেকে পিটার ট্রিম্বল বলবেন।...

একদিকে রেডিওর বকবকানি। আরেক দিকে বন্ড এখনও জলে থেঁথে মেঝেতে শুয়ে আছে। পাশেই গালা। একই অবস্থা। রেডিওর ভাষ্য শেষমেষ জানাবে— মুনরেকার সফল, না ব্যর্থ!

ভাষ্যকার বলছে . আমি পিটার ট্রিম্বল। নাইস আফটারনুন। আমরা গুডউইন স্যান্ডের উত্তরে। সমুদ্র শান্ত। টার্গেট এলাকা জাহাজশূন্য। কিন্তু রাডার পর্দায় এখনও কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবে যা ধরতে পারব— সবটা বলা যাবে না। নিষেধ আছে, নিরাপত্তার খাতিরে।

... এইমাত্র স্কিনে টাগেট গেল। .. আবার মিলিয়ে গেছে। খুব সম্ভব ৭০ মাইল উত্তরে চলে গেছে। আশ্চর্য! একটা বিশাল সাবমেরিন সমুদ্র-পৃষ্ঠে উঠেছে। এতেই কি রয়েছেন স্যার হিউগো, সদলবলে? মাত্র একমাইল দূরে।

... এদিকে 'অ্যালডিস' ল্যাম্পের কোনও সাড়া নেই। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস, আমার সঙ্গী, তাই জানাচ্ছেন। কোনও ফ্ল্যাপ নেই কেন? এটা রহস্যজনক লাগছে। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস এবার বলছেন— ওটা সাবমেরিন নয়। আরে, আরে এটা কী! ওখানে রুশ পতাকা ওড়াচ্ছে কেন?

.. আবার জলের মধ্যে গোলার আওয়াজ পাচ্ছি। ওটা পালাচ্ছে। জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। হাইস্পিডে—-পঁচিশ নট!

.. এখন বারোটাবারো। মুনরেকার নিশ্চই হাজার মাইল উঁচুতে- - অন্তত আমরা তাই আন্দাজ করছি।

... রুশরা কি বিপজ্জনক এলাকার মধ্যে রয়েছে?

... ওই তো রাডার অপারেটর হাত তুলছে, তার মানে, এবার মুনরেকার আসবে.. আসছে, আসছে, এখন স্তব্ধতা!

... আরে, ওটা কী? সাবধান, সাবধান!

... প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! অতি প্রচণ্ড! কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেছে। সমুদ্রে প্রকাণ্ড ঢেউ আসছে। মাই গড, সাবমেরিন ছিটকে গেছে, উলটে গেছে! কী প্রকাণ্ড ঢেউ আসছে! এত বিশাল উঁচু, তীর ঢেউ কখনো—

॥ পঁচিশ ॥

একটা অবিশ্বাস্য ওলটপালট হয়ে গেল। বর্ণনার অতীত।

ভয়ংকর পৃথিবী তোলপাড় করে, জলস্থল মথিত করে অপার্থিব কোনও অতি-প্রাকৃত দানব সব ছারখার করে দিল।

পরের দিনের বিকেল। বন্ডের চেয়ারে একটা রাবার-আঁটা লাঠি। রাবারটা লাঠির আগায়। তার সামনে ডেস্কে একটি শাস্ত্র লোক, শাস্ত্র চোখ। বন্ড এখন যথেষ্ট আহত।

M তার সামনে বসে। তিনি খবর দিচ্ছিলেন।

— এখন পর্যন্ত ২০০ মৃত, ২০০ নিখোঁজ। হল্যান্ডের ডিফেন্স লাইন বিধ্বস্ত। ইংল্যান্ডের দুটো টহলদারী জাহাজ ডুবে গেছে, কম্যান্ডিং অফিসার মিসিং। বি.বি.সি-র ভাষ্যকারকেও পাওয়া যাচ্ছে না। বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স থেকে খবরের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।

— সাবমেরিনটা কোথায়?

— সেটা জলের তলায় উলটে পড়ে আছে। রেসকিউ টিম রকেটের ভাঙা টুকরো কুড়িয়ে আনছে। ওরা সাবমেরিনের কাছেও গেছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত জানিয়েছে, বাস্টিক থেকে একটা উদ্ধারকারী জাহাজ আসছে। ক্যাবিনেট মিটিং চলছে ঘনঘন। এডিনবরার স্বেই সলিসিটর ফার্মের কাছ থেকে দলিলটা আদায় করেছে ভ্যালেন্স। ভয়ংকর এক দলিল!

— সব মিলিয়ে ফলাফল কী দাঁড়াচ্ছে?

— ধামাচাপা দেবার চেষ্টা চলছে অবশ্যই। বৈজ্ঞানিক কারণ দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে— অর্ধেক ফুয়েলও নাকি খরচ হয়নি। সমুদ্রের ধাক্কায় অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণ হয়েছে। সবাই ক্ষতিপূরণ পাবে।

একটু থেমে M আবার বলতে থাকলেন।

— স্যাব হিউগো ড্রাক্স আর তাব টিমের শোচনীয় মৃত্যু হয়েছে। এমন মহান দেশপ্রেমিকের মৃত্যু একটা ঘোর ট্রাজেডি।... তাছাড়া বিবিসি ভাষাকারের মৃত্যুতেও দেশ শোকার্ত। আরেকটা কথা। 'হোয়াইট এনসাইন'কে সে সোভিয়েট ফ্ল্যাগ কেন যে ভেবেছিল— কে জানে!

বন্ড জিজ্ঞেস করল-- আচ্ছা এই পারমাণবিক বিস্ফোরণ সম্বন্ধে কী ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে?

— ওটা নিয়ে সরকার তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না। অবশ্য আসল তথ্যগুলো মিনিষ্ট্রি অব সাপ্লাই জানে। বিশাল ছাই উড়ে গেছে, সেগুলো কোথাও না কোথাও বারে পড়বে এক সময়। বাতাস বোধহয় সেগুলো উত্তরে টেনে নিয়ে যাবে।

পাইপ ধরালেন M। বললেন— জানো, কিছু কাজে গুজব রটছে। কারখানা থেকে তোমাকে আর গালাকে স্ট্রচারে নিয়ে আসাটা বহু লোক নাকি দেখেছে। 'বৌ-এর্টাস' কোম্পানি ড্রাক্সের বিরুদ্ধে মামলা করেছে নিউজপ্রিন্টের ক্ষতিপূরণ চেয়ে। এমনকি তোমার ভাঙা গাড়িটার জন্য জবাবদিহির প্রশ্ন উঠছে। তার মধ্যে একটা লম্বা 'কোন্ট' বন্দুক পাওয়া গেছে। তাছাড়া পলিটিস্ম এবং মিলিটারি ম্যাটার জড়িয়ে যাচ্ছে। জার্মানির সঙ্গে সংঘর্ষ, রুশদের সঙ্গে লড়াই— এইসব আর কী! বহু লোক ছুতো খুঁজছে। ম্যালনকভের গদি টলছে। ক্রেমলিনে বিদ্রোহ সম্ভব। নাজিসম্ এখনও সক্রিয়। হিটলারের পরেও নাতিসিরা কাজ করে যাচ্ছে।

— সাংবাদিকরা কী বলছে?

— প্রধানমন্ত্রী এডিটরদের সঙ্গে মিট করেছেন। অনেকটা কন্ট্রোল করেছেন তাদের। সাধারণ জনতা এখনও 'মুনরেকার' নিয়ে গর্বিত।

হঠাৎ টেলিফোন। M রিসিভার তুললেন।

— ইয়েস। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, আমি একমত। তবে আইন তো মানতেই হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা মেয়েটার প্রাপ্য।

আহত বন্ডের মনে পড়ল— জানালায় কার্নিশে একটা পায়রা এসে বসেছিল, সেটা অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছে।

ড্রাক্সের প্রকৃত কাজ আর তার পরিচয় ক'জন জানতে পারবে? থাক।

— প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন, তুমি আর গালা দেশের বাইরে চলে যাও। তোমরা এখন দেশের পক্ষে ঝুঁকি! এই কেসে অনেকে তোমাদের চেনে। তোমাদের যা প্রয়োজন, টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চান, তোমরা কাল বিকেলের আগেই ইংল্যান্ড ত্যাগ করো। এক মাসের জন্য বাইরে কোনও গোপন আশ্রয়ে কাটিয়ে দাও। মেয়েটার অবশ্য একটা খবর আছে। বাকিংহাম প্যালেসে তাকে 'জর্জ ক্রস' দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী তোমাকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

— মেনি মেনি থ্যাংকস স্যার— বন্ড উঠে দাঁড়াল।

M বললেন— অফিসে যেও। তোমার জন্য একটা সামান্য উপহার রাখা আছে।

অফিসে প্রত্যাবর্তন। সেক্রেটারি জানাল— ০০৮-কে রাতের প্লেনে আনা হচ্ছে।

বন্ড বলল— তুমি সঙ্গী পাচ্ছ। আমাব কিন্তু একমাস নির্বাসন। অজ্ঞাতবাস। M-এর অফিস থেকে কি কোনও প্যাকেট এসেছে আমার জন্যে?

— হ্যাঁ। এই নিন।

বাক্সটা দেখে বন্ড বুঝল এর মধ্যে কী আছে। কার্ডে লেখা 'তোমার কাজে লাগতে পারে। কোনও স্বাক্ষর নেই।

ভেতরে একটা 'বেরেটা' পিস্তল। উপহার নয়, একটা রিমাইন্ডার বলা যায়।

বন্ড বলল— অন্য বাঞ্জে একটা বন্দুক আছে। রেখে দাও তোমার কাছেই। ফিরে এসে নেব। প্র্যাকটিস করব।

কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

- আপাতত ফ্রান্সে। আমার ঠিকানা পেয়ে যাবে। খুব জরুরি হলে তবেই—

লোয়েলিয়া হাসল-- কতটা জরুরি হলে ?

নতুন একটা গাড়ি। বন্দকে 'বার্ডকেজ ওয়াক' এবং 'কুইন অ্যানস্ গেট' এ পৌঁছে দিল
ড্রাইভার।

গাড়িটা কিনল বন্দ।

ক্যাঁলেতে যেতে হবে কাল।

সক্ষে, পার্কের গাছে শেষ বিকেলের রোদ।

- জেমস!

চমকে তাকাল বন্দ। গালাকে প্রথমে চেনা মুশকিল। মাথায় কালো 'বেবে' টুপি। কিন্তু এ
মেয়ে তো আমার জন্য নয়।

বন্দ গালায় হাত ধরল। আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিল গালা।

— জেমস, কাল বাকিংহাম প্যালেসে আসছ ?

— তারপর ?

--- কাল, তারপরে ওকে আমি বিয়ে করছি।

একটু দূবে একজনের দিকে আঙুল দেখালেন গালা। লম্বা এক যুবক। ধীরে ধীরে পায়চারি
করছে। গালা জানাল, ও ইনস্পেক্টর ভিভিয়ান।

গালায় হাতে 'এনগেজমেন্ট রিং'-টা প্রথমেই দেখেছিল বন্দ। তবু সাবধান হয়নি। ভুলে
গিয়েছিল বোধহয়। তার সাঁতার, বিস্ফোরণ, বালির উপর শোয়া, জলেব তলায় আলিঙ্গন, নগ্ন
গালায় দেহ জড়িয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই, শাওয়ারে স্নান, গভীর চুম্বন, সেবা-যত্ন, কত কথা—
ইত্যাদি ইত্যাদি। বন্দ কী ভেবেছিল, ড্রাস্ককে ঠেকাবার জন্য ওই মিথ্যে একটা 'বাগদত্তা' আংটি
পরেছিল গালা ? সত্যি মূর্খামি হয়েছে। বেশি কল্পনা কবা হয়েছে।

সারফল্যের আনন্দের চেয়ে বিফলতার আঘাত অনেক তীব্র !

একটি তরুণী ও তরুণ। তারা নতুন জীবনের পথে।

বন্দকে চলে যেতে হবে। সে একাকীত্বে, আক্ষেপ, ভাবালুতাও মূর্খতা, তাকে বলিষ্ঠ অভিনয়
করতে হবে।

গালাও বোধহয় তাই চায়।

বন্দ গুপ্তচর। সে যেন একটা ছায়া মাত্র। মানুষ বলে কিছু নয়, তার কাজ তার পরিচয়—
০০৭।

বন্দ হাসল— খুব হিংসে হচ্ছে আমাব।

— কীসের হিংসে ?

— কাল রাতে ফ্রান্সের খামারবাড়িতে তোমায় নিয়ে উঠতাম।

— তারপর।

— তারপর শুনতাম, লোকে যাকে বলে গোলাপের আর্তনাদ! বুঝতাম, কথাটা সত্যি না
মিথ্যে!

— না, সে ব্যাপারে তোমায় সাহায্য করতে পারছি না। তোমার জন্য অনেক গোলাপ আছে।
তারা অপেক্ষা করছে, কখন তাকে তুলবে তুমি।

— হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। বাই—

— বাই, জেমস—

গালা জেমসের হাতে হাত রাখল। শেষবারের মতো। তারপর বিদায়। দুজন দুদিকে।

ডক্টর নো

॥ এক ॥

সূর্য ডুবেছে রু মাউন্টের পেছনে। হলুদ রঙের আলোর ছটা ছড়িয়ে আছে চারদিকে। এখানকার বিশাল বাড়িগুলো এখন শান্ত। বাড়ির মালিকবা বেশিবভাগই মোটা মাইনার কর্মচারী। কেউ ব্যাংকের কেউবা অন্য কোনো কোম্পানির। এঁরা অনেকেই ঘরে ফিরেছেন অফিস সেরে। এখন তাঁবা হয়তো বিশ্রাম করছেন, অথবা স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু একটু পরেই এই জায়গাটা জমজমাট হয়ে যাবে পানীয় অভিলাষীদের ভিড়ে।

রিচমন্ড রোড। জ্যামাইকার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপথ। আশপাশের বাড়িগুলো সুন্দর। এখানে বাগান আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বাহারি ফুলের গাছ লাগানো আছে। আছে একটা ‘রাজবাড়ি’ যেখানে জ্যামাইকা দ্বীপের রাজ্যপাল আর তাব সেনাপতি থাকেন।

বাস্তার পূব দিকে ১ নম্বর রিচমন্ড রোডের বাড়ি। এখানে ঢুকতে গেলে নুড়ি-বিছানো পথে পা দিতে হয়। দুপাশে আছে টেনিস কোর্ট। এটা হল কুইন্স ক্লাব। সমাজের সেরা লোকদের যাতায়াত এখানে। কিন্তু এই ক্লাবের সদস্য হওয়া কঠিন ব্যাপার। দরখাস্ত করলেই সদস্য হওয়া যায় না। কিন্তু এই দেমাক কি চিরকাল থাকবে? যাইহোক ক্যারিবিয়ানদের কাছে এটা একটা গর্বের ব্যাপার। মদ আর খাবারের শ্রেষ্ঠ জায়গা।

অন্যদিনের সন্ধ্যার মতো যথারীতি চারটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ক্লাবের সামনে। চারজন ব্রিজ খেলোয়াড় এই গাড়ির মালিক। এবং ঠিক চারটেয় আসেন আর মাঝরাত পর্যন্ত খেলা চলে। এরা যে সে মানুষ নন। একজন হলেন অধ্যাপক, আর একজন উকিল, অন্যজন অবসরপ্রাপ্ত সৈন্য বাহিনীর বিরাট অফিসার, নাম স্ট্যাংওয়েজ। বর্তমানে ব্রিটিশ গুপ্তচর বাহিনীর প্রতিনিধি আর শেষের জন প্রতিরক্ষা বিভাগের অফিসার।

এবার একটা অন্যরকম দৃশ্য। তিনজন যেন অন্ধ ভিখারির মতন লোক, এগিয়ে গেল গাড়িগুলোর দিকে। ভারী চেহারার লোকগুলো দেখতে খানিকটা নিগ্রো আর খানিকটা চিনেদের মতো। পরনে এদের ছেঁড়া পোশাক, চোখ বোজা দুজনের। প্রথম জনের হাতে টিনের কাপ, ও লাঠির বাঁকা দিকটা। একে অপরের কাঁধে হাত দিয়ে এগিয়ে চলেছে। জ্যামাইকার কিংসটনে এরা বেমানান নয়, তবে এই ক্লাবের সামনে এদের উপস্থিতি ঠিক যেন মেনে নেওয়া যায় না।

তাস খেলা জমে উঠেছে। এরই মধ্যে স্ট্যাংওয়েজ উঠে দাঁড়ালেন। কয়েকটা তাস টেনে টেবিলে রেখে দিলেন। জানালেন মিনিট কুড়ি পরেই আসবেন। ব্রিগেডিয়ার টেমগলার ওনার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বললেন, “তাড়াতাড়ি ফিরে এস”।

স্ট্যাংওয়েজ অবশ্য ঘরের বাইরে চলে গেছেন। অন্য তিনজন চুপচাপ, বেয়ারা এসে পানীয়ের অর্ডার নিয়ে গেল।

ব্যাপার হল স্ট্যাংওয়েজকে এই সময়ে বাইরে গিয়ে একটা জরুরি ফোন করতে হয়। কেন ফোন, কোথায় ফোন, এসব নিয়ে অবশ্য বাকিদের মাথাব্যথা মেই। এরা শুধু জানে তাদের পানীয়ের খরচ স্ট্যাংওয়েজই দিয়ে দেবেন।

লন্ডনের রিজেন্ট পার্কে গুপ্তচর বিভাগের সদরদপ্তর। এর ছাদে আছে একটা শক্তিশালী ট্রান্সমিটার। এর মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতে হয় তার সঙ্গে। বেতারে দৈনিক খবর দেওয়া ও নির্দেশ নেওয়া ও তার কাজের মধ্যে পড়ে। স্ট্র্যাংওয়েজের বেতাব যন্ত্রে নীল বা লাল আলো জ্বলতে পারে যদি তার নিয়ন্ত্রণকারী অফিস সহজে তার খোঁজ না পায় কোনো কারণে। তবে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। কারণ সেরকম কোনো ঘটনা আজও ঘটেনি।

আর আছে একটি মেয়ে। সুগঠিত শরীর। নাম মিস টুরাড। অনেকে মনে করে এ হল স্ট্র্যাংওয়েজের সেক্রেটারি কিন্তু আসলে মেয়েটি হল সহকারী গুপ্তচর। এর আবার ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। সুন্দর হাঁটুর উপর শর্টহ্যান্ড প্যাড রেখে তৈরি সে। তারই পাশে বসে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে স্ট্র্যাংওয়েজ ষ্টিক ছটা আটাশে লন্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই রকম একটা নিয়মে কাজ করতে হয় তাকে। একটু ভুল হলেই শত্রুরা আক্রমণ হানবে।

এই হল স্ট্র্যাংওয়েজ যিনি একটু আগেই সুন্দর হলঘরটার দরজা ঠেলে কুইনস্ ক্লাবের বাইরে গেছেন।

ক্ষিপ্ৰগতি সম্পন্ন এই ভদ্রলোক হেঁটে চলেছেন। সন্ধ্যার নির্মল হাওয়া ভালোই লাগছিল তার। একটু আগের রাউন্ডের তাস খেলায় জয়ী হয়েছেন। তবে এই জয়ের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। কারণ তাকে দেওয়া হয়েছে জরুরি কাজ। দিয়েছেন মি. এর্ম। কিন্তু সেই কাজের জট এখনো পাকিয়ে আছে। তবে একটা যোগসূত্র তৈরি করা গেছে কিছু চিনে সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে। তবুও কাজের ভাবনাটা মাথায় ভারী হয়ে আছে, যাই হোক এগিয়ে চলেছেন তিনি রিচমন্ড রোডের দিকে নুড়ি-বিছানো পথ ধরে। একবার ভাবলেন ব্যাপারটা কোনো একটা নাটকীয় মোড় নেবে। পরক্ষণে ভাবলেন না সেরকম কিছু হবে না। তবে তিনি লক্ষ রেখে চলেছেন ওই তিনজন অন্ধ লোকের দিকে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী স্ট্র্যাংওয়েজ এই অন্ধদের দেখে যেন দুঃখ পেলেন। পকেটে দ্রুত হাত ঢুকিয়ে পেলেন একটা শিলিং এটা অন্ধদের ভিক্ষার থালায় পড়ামাত্র ঠং করে শব্দ করল। দুজন ভিখারি বলে উঠল “ভগবান আপনার মঙ্গল করুন”। এরপরেই যেন একটা নাটকের ভয়ংকর চমক। মুহূর্তের মধ্যেই তিন ভিখারি তিনটি রিভলবার তাক করে ফেলেছে স্ট্র্যাংওয়েজের দিকে, একটা গুলি লাগবে কাঁধের মাঝখানে, আরেকটা পিঠের মাঝখানে, আর তৃতীয়টা মেরুদণ্ডের একদম নীচে। এরপরই গুলির গর্জন। স্ট্র্যাংওয়েজের শরীরটা সজোরে বেশ ছটকে গেল সামনের দিকে, একটু পরেই রাস্তায় খুলার উপর নিশ্চল হয়ে গেল। কয়েকটা মিনিটের নীরবতা। কালো একটা শবাধারবাহী গাড়ি ঘুরে দাঁড়াল। তিনজন এসে স্ট্র্যাংওয়েজের মৃত দেহটা শবাধারে শুইয়ে দিল। এরা এবার ভিখারির পোশাক ছেড়ে নিজেদের পোশাক পরেছে। গাড়ির চালকটিও এক নিগ্রো। আর দেরি না করে গাড়ি চলল ঘন্টায় তিরিশ মাইল বেগে রাজপথ ধরে পাহাড়ের দিকে।

মেরি টুরাড হাতে ট্রান্সমিটার নিয়ে বসে আছে। ঘড়িতে দুটো আটাশ। ভাবছেন আর এক সেকেন্ডের মধ্যেই এসে পড়বেন স্ট্র্যাংওয়েজ। এসে হয়তো বলবেন সরি মেরি, গাড়িটা স্টার্ট নিতে দেরি হয়ে গেল, কিংবা হাফওয়ে ট্রির কাছে ট্রাফিকের সিগন্যালে আটকে গেলাম।” ভাবতে ভাবতে মেরি দ্বিতীয় ইয়ারফোন জোড়া পাশে রেখে দিল। ঘড়িতে এখন দুটো উনত্রিশ। কিন্তু কোথায় তিনি? না এলে লন্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ হবে কী ভাবে? ওনার হয়ে তো আর মেরি কথা বলতে পারেনা। কিন্তু উপায় কী? মেরি নিজেই এবার চেষ্টা করল। লন্ডনের একাট ঠান্ডা ঘরে একটা যন্ত্র আছে। স্ট্র্যাংওয়েজ ছাড়া অন্য কেউ ফোন করলে সেই যন্ত্রের চাবির উপর একটা

চাপের সৃষ্টি হয় আর তখনি বোঝা যায় কে কী করছে। অথবা গুপ্তচর বন্দি হয়ে আছে কিনা ইত্যাদি।

লন্ডনের সাড়া পাওয়া গেছে। মেরি যোগাযোগ করে ফেলেছে। কিন্তু হলঘরের মোঝতে পায়ের আওয়াজ। তাহলে কি স্ট্র্যাংওয়েজ এসে পড়ল! কিন্তু কী করে? না স্ট্র্যাংওয়েজ নন, এল এক নিগ্রো, হাতে পিস্তল, এক গুলিতে তালাটা ভেঙে ফেলেছে সে। কয়েকপা এগিয়ে এসে মেরির দিকে তাকিয়ে হাসল একটা বুক-কাঁপানো হাসি, পরের মুহূর্তে রিভলবারের মুখটা মেরির বাঁ স্তনের চারপাশে ঘুরিয়ে তিনবার গুলি চালালো।

চেয়ারের পাশে ঢলে পড়ল মেরি। ইয়াকোথি মাটিতে পড়ে গেল। ফোনের মধ্যে যেন অপর প্রাপ্ত থেকে আসা কিছু শব্দ শোনা গেল। লন্ডনের কন্ট্রোলার ডেস্কে একটা ঘণ্টি বেজে উঠল। অর্থাৎ WXN এর কিছু গোলমাল হয়েছে।

খুনি চলে গিয়েছিল। আবার ফিরে এল। মেয়েটার মৃতদেহটা হিঁচড়ে ঢোকাল একটা বিশাল থলের মধ্যে, এরপর লন্ডন থেকে ভেসে আসা সঙ্কেতের বইগুলো, কিছু সিন্দুকের ভিতর থেকে বের করা জরুরি কাগজপত্র এবং জানালার পর্দা ছিঁড়ে ফেলে সব একজায়গায় করে জ্বালানির বাস্ক খুলে আশুন লাগিয়ে দিল। আশুন ক্রমশ ছড়িয়ে সব কিছুকে গ্রাস করল। মেরির দেহটা সমেত থলেটা নিয়ে ঢুকিয়ে দিল সেই কালো গাড়ির কফিনের মধ্যে। তারপর উঠ বসল গাড়িতে। গাড়ি চলল মোনা সরোবরের দিকে। সেখানে দেহটাকে একদম জলের নীচে ফেলে দেওয়া হবে। আর ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের এই কর্মীদের এবং জরুরি নথিপত্রের সম্পূর্ণ বিধ্বংস করার কাজটা শেষ হবে।

॥ দুই ॥

এরপর তিনসপ্তাহ কেটে গেছে। মার্চ মাসে লন্ডনের আবহাওয়া অতি কঠিন রূপ ধারণ করেছে। শিলাবৃষ্টি আর ঝড় আছড়ে পড়েছে। এমনকি মি. এম পর্যন্ত তার ড্রাইভার স্মিথকে গাড়ি গ্যারাজ করতে বললেন আর জানালেন যে এই আবহাওয়ায় মাটির তলার ট্রেনই অনেক ভালো। মি. এম এর গাড়িতে ভূয়ো নম্বর প্লেট লাগানো। একটু আগেই এটা রিজেন্ট পার্কের বাড়িটার কাছে দাঁড়িয়েছে।

ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে মি. এম লিফটে চড়ে নয় তলায় এলেন। পুরু কার্পেটে ঢাকা একটা ঘরে ঢুকে ওভারকোট খুলে বুলিয়ে রাখলেন। এশর ইন্টারকমের কাছে একটা সুইচটিপে জানালেন আমি এসে গেছি মিস্ মানিপেনি। বেতার সংকেতগুলো পাঠাও। আর জেমস সলোনিকে ফোনে ধরে দাও। এখন বোধ হয় উনি সেন্ট মেরি হাসপাতালে রাউন্ড দিচ্ছেন। স্ট্র্যাংওয়েজের ফাইলটা পাঠাও বলে সুইচটা বন্ধ করে দিলেন।

ইন্টারকমের হলুদ আলোটা জ্বলে উঠল। মি. এম ফোন তুললেন। অপর প্রান্তে জেমসের কঠম্বর। ইনি একজন ন্যায়তন্ত্র বিশারদ। জেমস মি. এম এর এক কর্মচারীর চিকিৎসা করেছেন। গতকাল তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন মি. এম। এই জানতে চাইলেন যে লোকটি কাজ শুরু করতে পারবে কি না। গম্ভীর গলায় জেমস উত্তরে জানালেন যে লোকটি এখন অনেকটাই সুস্থ, তবে তার উপর যে মানসিক চাপ ছিল সেটা পুরোটা কাটিয়ে ওঠা সময়ের ব্যাপার। কাজেই একে হালকা ধরনের কাজ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু হালকা কাজ দেওয়ার ব্যাপারটি তো মি. এম এর ভাববার কথা। এম এর ধারণা লোকটা বেশ ভালোই আছে। এর চাইতে অনেক বেশি আশাওপ্রাপ্ত রুগি পাঠানো হয় জেমসের কাছে। কিন্তু জেমসের বক্তব্য হল

এর আঘাত গুরুতব না হলেও যন্ত্রণা কিন্তু কম নয়। বোধ হয় মি এম জানেন না যন্ত্রণা জিনিসটা কী।

কিন্তু জেমসের কাছে যন্ত্রণা উপব লোকচার শোনার মতো সময় নেই মি. এম এর। এবাব গলার স্ববটা একটু চেপে বললেন মি. জেমস আপনি ডকটর পিটার স্টাইনক্রোন এর নাম শুনেছেন। ইনি একজন আমেরিকান ডাক্তার। এর একটা বইয়ে এই যন্ত্রণা সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ আছে। অর্থাৎ মানুষ কতটা যন্ত্রণা সহিতে পারে। আর আছে শরীরের কী কী অংশ কতটা না থাকলেও বেঁচে থাকা সম্ভব স্বাভাবিক ভাবে। যেমন লেখা আছে যে গল ব্লাডার, দুটো টনসিল, অ্যাপেনডিকস একটা কিডনি একটা ফুসফুস কয়েক সের রক্ত ইত্যাদিব একটা নালিকা যা না থাকলেও বেঁচে থাকা যায়।

এসব শুনে জেমসের খুব একটা ভালো লাগছিল না। বললেন “এর সঙ্গে একটা হাত একটা পা এসব জুড়ে দিলে তো আরো ভালো হোত।”

যাই হোক মি. এম আর তর্ক করতে রাজি নন। শুধু জানালেন যে লোকটার চোট তার মতে খুব ভয়ংকর নয়। এবং ও ফিরে এলে হালকা কাজই পারে।

জ্যামাইকাতে একটা ব্যাপার ঘটেছে। মি. এম এর দুই কর্মচারী একজন মেয়ে, আরেকজন ছেলে, পালিয়ে গেছে। এদের ব্যাপারটা জানবার জন্য ওই লোকটিকে জ্যামাইকায় পাঠানো হবে। আর ওখানে গেলে এর শরীরের বিশ্রামও হবে আর নতুন আবহাওয়ার উপকারটাও পাওয়া যাবে। কিন্তু জেমসের একটা কথা হচ্ছে যে ওই লোকটাকে মি. এম যে কাজে পাঠাচ্ছেন তাতে খানিকটা ঝুঁকি থেকেই যায়। কারণ তার মতে সাহস জিনিসটা অফুরন্ত নয়। বরং অনেকটা মূলধনের মতো খরচ করলে কমে যায়। কাজেই যে কাজই হোক সাবধানে এগোলেই ভালো। সব কিছুই একটা সীমা আছে। কথাটা ঠিকই। তবে যাই হোক লোকটা এবার জ্যামাইকায় থাক। কাজটা কল্লক। কোনোরকম চাপ তো তার উপর দেওয়া হচ্ছে না।

এখন মি. এম এর প্রশ্ন হল, কে বিষটা দিয়েছিল? সে কি কোনো রাশিয়ান মহিলা? হতে পারে। জেমস জানালেন যে বিষটা সাংঘাতিক ধরনের। জাপানি গ্লোব মাছের যৌন অংশে এটা থাকে। আর ওই লোকটার শরীরে যে পরিমাণ ঢুকেছিল, তাতে মৃত্যু একেবারে আসন্ন ছিল। কিন্তু কপাল ভালো, সেই ফরাসি ডাক্তার যিনি দক্ষিণ আমেরিকায় বহুদিন কাজ করেছেন তিনি কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করে ফেলেন। আর এ লোকটা নতুন জীবন পেয়ে গিয়েছিল। অবশ্য সেই মহিলাটি এখন আর নেই। তিনি মারা গেছেন।

যাই হোক জেমসকে নিশ্চিত করে মি এম ফোন রেখে দিলেন। এবার বেতার সঙ্কেতের ফাইলের উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। ইন্টারকমের আলো জ্বলল। অর্থাৎ ০০৭ এসেছেন। এম একটা পাইপ ধরালেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে সতর্ক দৃষ্টি মেললেন। জেমস বন্দ ভেতরে এসে দবজা বন্ধ করে এম এর সামনে বসল। বাইরে শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। বাইরে তাকিয়ে তার মনে হল নতুন একটি জীবন পাওয়া গেছে। কিছু সময় হাসপাতালের আরোগ্যলাভের দিনগুলিও তার মনে পড়ল। এম এব ক্ষুরধার দৃষ্টি অবশ্য বন্দ এর দিকে। তাহলে বন্দের কপালে দুঃখ আছে? কাজ করতে গিয়ে যে ভুল সে করে ফেলেছে তার জন্য অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে?

এবার মি. এম এর ঠাণ্ডা গলার স্বর শোনা গেল জানতে চাইলেন বন্দ তার ভুলটা ধরতে পেরেছে কিনা। হ্যাঁ বন্দ বুঝেছে, যে সেই মেয়েটি তাকে ঘায়েল করে ফেলেছিল, আর বন্দ তার বেরেটা পিস্তলটা সময়মতো কাজে লাগাতে পারেনি।

বন্দ অবশ্য অন্য কোনো কাজে নাবাজ। ঝুঁকিপূর্ণ কাজই তার ভালো লাগে। পিস্তলটাও পালটাতে সে নারাজ। কারণ ওটা ওর অভ্যাস হয়ে গেছে।

এবার আবার দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকলেন এক বেঁটে চেহারার মানুষ। উনি বস্ত্রের পাশে বসলেন। এনার নাম আর্মারার। এম কে সুপ্রভাত জানালেন উনি। এম এবার জানতে চাইলেন ০২৫ বেরেটা পিস্তল কী রকম। আর্মারারও একজন অস্ত্র বিশেষজ্ঞ হেসে ফেললেন, বললেন— “মোটাই ভালো না, একেই ভারী, আর এব সাইলেনসারও ভালো না, এসব যন্ত্র ব্যবহার করে লাভ নেই।”

বন্দ কিন্তু কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানাল অন্য কথা। বলল, “বেরেটা চালানো সুবিধাজনক। বিশেষ করে যখন লক্ষ্যবস্তু কাছেই আছে। তবে হ্যাঁ সাইলেনসার খুব একটা ভালো না।” এম অবশ্য সব শুনেও বন্দকে অস্ত্র পালটাতে আদেশ দিলেন। এবার বুথরয়েড যাকে এম ডাকেন আর্মারার বলে, বন্দকে তার পিস্তল ও খাপ দিতে বললেন। এগুলো পরীক্ষা করে উনি জানালেন এর চেয়ে ঢের ভালো অস্ত্র আছে এবং সেইটাই পরীক্ষা করা দরকার।

বুথরয়েড অনেক রকম পিস্তলের কথা বললেন। সব রকমই আছে। রাশিয়ান জাপানিস ইত্যাদি। তবে ওনার পছন্দ হালকা ট্রিগারওয়ালা অস্ত্র। আর ওয়ালযারের গুলি হল পৃথিবী বিখ্যাত। ব্যাপারটা শেষমেশ বস্ত্রের পছন্দই হল। অতএব ওয়ালযার পি. কে পিস্তলটাই নির্বাচন করা হল। এটাকে বুকের কাছে বা প্যাণ্টের বেগের বঁদিকে সুন্দর ভাবে লুকিয়ে রাখা যায়। মি. এম এর কথাও তাই। আরেকটা পিস্তল অবশ্য আছে। ০.৩৮ ক্যালিবারের। এটাও একটা নামজাদা কোম্পানির তৈরি। এবার এম একটু যেন চটে গিয়ে বললেন, “ঠিক আছে বন্দকে দু'চারটে পিস্তল অভ্যেস করিয়ে নিজে যেটা সব চেয়ে সহজ সেটাই দেওয়া হবে। আপনাকে এখানে আর আটকাতে চাইনা।”

ধন্যবাদ দিয়ে বুথরয়েড বেরিয়ে গেলেন। তখন ঘড়িতে দশটা বেজেছে।

কিন্তু সেই বেরেটা পিস্তলটাই বন্দকে অন্যান্যনক করে দিচ্ছে। এটা এখন ডেস্কের উপর পড়ে আছে। পাশে আছে খাপটা। বন্দ ভুলতে পারে না এই পিস্তলের কথা। এটা তাকে অনেকবার বাঁচিয়েছে, বিপদকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

মি. এম এ ব্যাপারটা বোধ হয় শুনলেন। গলার স্বরটা একটু গভীর করে বললেন, “বন্দ আমি দুঃখিত। আমি জানি এটা শুধু একটা লোহার টুকরো নয়। এই অস্ত্রটা তোমার জীবনে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তবুও আমি মনে করি যে এখন তোমার সময় হল একেবারের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র কাছে রাখা।”

পিস্তলের কথা আপাতত বাদ। জ্যামাইকায় একটা বিশেষ কাজ আছে। এম এর কর্মচারীদের নিয়ে গোলমাল। বন্দকে ওখানে যেতে হবে।

॥ তিন ॥

এম এখন একটা জরুরি ফাইলের পাতা খুলে দেখছেন। বন্দ উলটো দিক থেকে পড়ে ফেলল কথাগুলো— স্ট্র্যাংওয়েজ আবার কী করল? আব টুরাডই বা কে? এম ডেস্কের বোতাম টিপলেন। একটু পরেই প্রধান কর্মসচিব ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোক কর্নেল। রসিক মানুষ, সুগঠিত শরীর। বস্ত্রের সমানই বয়স।

এবার বস্ত্রের সঙ্গে মি. এম কথা বলতে লাগলেন, কাছে আছেন প্রধান কর্মসচিব। বন্দকে এবার স্ট্র্যাংওয়েজ আর টুরাডের কেসটা হাতে নিতে হচ্ছে। মি. এম জানেন না কী হল এই দুজনের। এরা কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? স্ট্র্যাংওয়েজের বই, ঘর সব পুড়ে গেল। সেও নেই।

আব ওই মেয়েটা? সেতো ছিল একসময়ে নৌবাহিনীর গুপ্তচর বিভাগের লোক। সেই বা কোথায় গেল? পালিয়েও যেতে পারে অবশ্য। সেইদিন অনেক চেষ্টা করেও লাল বা নীল সন্দেশে এর সাড়া মেলেনি। আর ওখানকাব পুলিশ রিপোর্টেও বিশেষ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। বরং এদের ধারণা স্ট্র্যাংওয়েজ নিশ্চয়ই নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়ে। কারণ সে যেখানে কাজ করছিল সেখানে এইসব কেলেংকারি প্রায়ই হয়। অতএব ওইরকম কিছু একটা ঘটেছে, আর তারপর থেকেই এদের হৃদিশ নেই। এমন কি ওখানকাব রাজ্যপালও এই মত পোষণ করেন।

প্রধানসচিব মানুষটা অবশ্য একটু অন্য ধারণা পোষণ করেন। এম এর দিকে তাকিয়ে জানালেন যে ব্যাপারটা ঠিক সেই রকম নয়। এটা ঠিক প্রেমঘটিত পলায়ন পর্ব নয়। কারণ স্ট্র্যাংওয়েজের বন্ধুদের মতে উনি সেইদিন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিলেন, তাস খেলেছেন, এবং অন্য দিনের মতো ফোন করতে বেরিয়ে যান। এমনকি মদ খাওয়ার ব্যবস্থাও করে গেলেন। আর যদি পালাতে চাইতেন তো সকালেই মেয়েটাকে নিয়ে পালাতে পারতেন, কুইন্স ক্লাবে আসার প্রয়োজন কোথায়? কাজেই এ ধরনের মনোভাব সঠিক নয় বলে প্রধান সচিব মনে করেন।

মি. এম কিন্তু এটা মানতে রাজি নন। তার মতে প্রেমে পড়লে ওসব গোয়েন্দাগিরি মাথায় উঠে যায়। পাগলামি শুরু হয়ে যায়। আর জায়গাটি একেবারে শান্ত। বিশেষ কোনো কাজও ছিল না স্ট্র্যাংওয়েজের। দু একটা কমিউনিস্ট বা ইংরাজ গুপ্তার যাতায়াত থাকতেই পাবে জ্যামাইকায়। কাজেই প্রেমছাড়া অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে ওর জড়িয়ে যাবার কথা নয়।

কিন্তু বন্ড কী ভাবছেন, জানতে চান এম। না বন্ডের ভাবনাটা একটু আলাদা। ওর মতে স্ট্র্যাংওয়েজ পালাতে যাবে কেন? মেয়েটি যার নাম টুর্নাড সেওতো একজন কুম্ঠ নৌবাহিনীর অফিসার ছিল। আর স্ট্র্যাংওয়েজ প্রেমে জড়ালেও এই রকম ভাবে বেইমানি করতে যাবে কেন? প্রেম তো কাজের মধ্যেও হতে পারে।

এসব শুনে মি. এম একটা ধন্যবাদ দিলেন বন্ডকে। বললেন, “হ্যাঁ ঠিকই, এই কথা আমার মাথাতেও আছে। কাজেই ঝট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়।” স্ট্র্যাংওয়েজের ব্যাপারটা সত্যিই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে হয়ে গেছে।

প্রধান কর্মসচিব এবার সেই পাখিগুলোর কথা বললেন যারা প্রায় বিলুপ্তির পথে। কাজেই অভোবন নামে এক আমেরিকান সোসাইটি লেগে পড়েছে এদের সংরক্ষণের কাজে। এই সমিতি এতই শক্তিশালী যে এই পাখিদের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেইজন্য আমেরিকান সরকারকে বাধ্য করেছিল পারমাণবিক অস্ত্রাগার বা অস্ত্র পরীক্ষার জায়গা পরিবর্তন করতে। বন্ড জানতে চাইল এর সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক অর্থাৎ অভোবন সোসাইটি বন্ডদের কী করতে বলছে? মি. এম কিছু বললেন না শুধু স্ট্র্যাংওয়েজের ফাইলটা কর্মসচিবের সামনে টেবিলে রেখে দিলেন অর্থাৎ এর মধ্যেই জানবার মতো তথ্য রয়েছে।

এবার প্রধান কর্মসচিব চোখ বুজে একটা ঘটনা বললেন। রোজেট স্পুনবিল নামে একরকম পাখি আছে। এরা একসময়ে প্রায় অবলুপ্তির পথে চলে গিয়েছিল। জ্যামাইকা এবং কিউবার মাঝে ফ্রাব নামে একটা দ্বীপে পাখিগুলো টিকে ছিল কোনো রকমে। এরা মাটি বা কাদা খুঁড়ে খাবার বার করার চেষ্টা করে। অনেকটা গোলাপি রঙের বকের মতো দেখতে। অভোবন সোসাইটি এ সব জানতে পেরে এদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয় এবং সেই দ্বীপের ওপর দুজন ওয়ার্ডেনকে পাহারায় রেখে দেয় যাতে কোনো উড়োজাহাজ এদের বিরক্ত না করে। এক বুদ্ধিমান ভদ্রলোক একসময় এই দ্বীপটি যার নাম একসময়ে ছিল ওয়ানো কিনে নেন পাঁচ পাউন্ডে জ্যামাইকা সরকারের

কাছ থেকে। তখন ১৯৪৩ সাল। ভদ্রলোক এখানে একটা ভালো ব্যবসা করতে শুরু করেছেন। কুলি-মজুর কাজে লাগিয়েছেন। কিছুকাল পবে অবশ্য ব্যবসায় মন্দা এল।

এনার নাম ডক্টর, জুলিয়াস নো। এনার শরীবে নাকি চিন ও জার্মানির রক্ত আছে। ইনি সবসময় একটা গোপনভাব বজায় রাখেন। আব ওই দ্বীপের সঙ্গে বহির্জগতের তেমন যোগাযোগ নেই। বোধ হয় এটা ওনার পছন্দের মধ্যেই পড়ে।

অনেকটা ঘটনার কথা জানা গেল। অভোবন সোসাইটির একজন ওয়ার্ডেন নাকি সেই দ্বীপে এসে ছিল। একটা নৌকা চালিয়ে কোনোক্রমে পালিয়ে এসেছিল জ্যামাইকার উত্তর উপকূলে। তার শরীর আগুনে ঝলসে গিয়েছিল। পরে সে মারা যায়। অবশ্য সে তার অভিজ্ঞতা জানিয়ে দিয়ে যায়। ওই দ্বীপে নাকি এক আগুনমুখো ড্রাগন আছে যে সব কুটিরগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তার পর গর্জন করতে করতে স্পুনবিল পাখিদের বাসাগুলোর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। অনেক পাখি পালিয়ে কোনো ক্রমে নিজেদের বাঁচায়।

আরো ভয়ংকর ব্যাপার হল অভোবন সোসাইটির দুই কর্তা বীচক্র্যাফট বিমানে চড়ে আসেন ওই দ্বীপ পরিদর্শনে। কিন্তু সেই বিমান ভেঙে পড়ে আরোহী দুজন মারা যান। কিন্তু এতে দমে পড়ার মতন দুর্বল নয় সেই পাখি বাঁচানোর সমিতি। তারা আমেরিকান ট্রেনিং স্কোয়াড্রন থেকে একজন কর্ভেট পাঠায় ডক্টর নো এর সঙ্গে কথা বলার জন্য। আর সেই কর্ভেটও ডক্টর নো এর সঙ্গে কথা বলে রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে ফিরে গেলেন। ডক্টর নো তাকে বলেন যে দুজন লোক এই গরম পরিবেশের দরুন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধায়। একজন আরেকজনের কুটিরে আগুন লাগায়। আর এই সব কাণ্ড বন্ধ করবার মতন কেউ নেই এই পাণ্ডুবর্জিত জায়গায়। অর্থাৎ ঘটনাটা কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়।

প্রধান কর্মসচিব এবার বললেন, “ব্যাস এই পর্যন্ত-ই জানা গেছে। মুশকিল হল কলোনিয়াল অফিস অথবা জ্যামাইকার কেউই এ নিয়ে মাথা ঘামালো না। কাজেই দায়িত্ব এখন আমাদের। আর শেষে ব্যাপারটা স্ট্র্যাংওয়েজের ওপর চাপাতে হয়।”

মি এম এতক্ষণ শুনছিলেন, এবার বললেন— “বুঝলেন তো বন্দ কি ফালতু সব ব্যাপার। কিছু বয়স্ক লোক আছে। মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক, আজগুবি জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালোবাসে। এরা সব জিনিস সংরক্ষণ করতে চায় যেমন পুরানো বাড়ি, গির্জা, ছবি ইত্যাদি। ভগবান জানেন এরা এত নিকাই বা কোথায় পায়, আর কাজের পাগলামি এমন ধরনের যে রাজনৈতিক মহলেও এরা ঢুকে পড়ে। আর যখন কাজের কাজ কিছু হয় না তখন অনুসন্ধান করার জন্য আমাদেরকে দরকার হয়ে পড়ে। তুমি স্ট্র্যাংওয়েজের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলে তাই এই সব বললাম। আর কিছু জানতে চাও কি?”

বন্দ প্রায় হেসে ফেলেছিল কারণ মি. এর স্বরে রাগের ভাব। ব্যাপারটা অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ গুপ্তচরবৃত্তি মানে তো সময় নষ্ট করা নয়।

বন্দ উঠে দাঁড়াল, বলল “ফাইলটা নিজে শরি? মনে হচ্ছে পাখিগুলোর জন্য স্ট্র্যাংওয়েজ টুল্লাড এবং আরো দুজন প্রাণ দিয়েছেন।”

এম-এর অনুমতি নিয়ে ফাইলটা তুলে এবার রেবেটা পিস্তলটা নিতে হাত বাড়তেই এম ওটা নিতে নিষেধ করলেন। ওনার ইচ্ছা বন্দ নতুন দুটো অস্ত্রে হাত পাকাক।

বন্দ বেরিয়ে গেল। কিন্তু এম-এর গলার স্বরে রাগের ভাবটা তার ভালো লাগল না। গতবার এম-এর কাজ করতে গিয়ে প্রাণটা প্রায় যেতে বসেছিল। এবার তুলনায় সহজ দায়িত্ব পালন করতে হবে বন্দকে অর্থাৎ বন্দ একটু আরামে থাকতে পারবে হয়তো, কারণ পরিবেশটা বৃষ্টি

ভেজা হবে না। এবং সূর্যের আলো পাওয়া যাবে। বোধ হয় এই এম লোকটা একটু হিংসুটে ধরনের।

॥ চার ॥

প্লেনটার নাম সুপার কনস্টোলেশন। ওজন ৭০ টনের মতো। ভেতরে অনেক লোক। তাদের মধ্যে বন্ডও একজন। কিউবা পেরিয়ে এটা এখন জ্যামাইকার দিকে। বোধ হয় আরো একশো মাইল যেতে হবে। কিন্তু একশো মাইল একটা প্লেনের কাছে তেমন কোনো ব্যাপার নয়। কিউবার ধননীল আকাশ আর দুধের মতো সাদা উপকূল পেরিয়ে প্লেন এখন প্রায় গন্তব্যের কাছে। পাহাড়গুলোর নীচে আর কিংসটনের পথে পথে আলো ঝলমল করছে। পোর্টারয়াল লাইটহাউসের চারপাশে চক্কর মেরে প্লেনটা এবার জমির দিকে নাক বাড়িয়েছে। এরপর কয়েকটা মিনিট। তারপরই রানওয়ের মাটিতে প্লেনের চাকার কয়েকটা নরম ঝাঁকুনি, তারপরে এয়ারপোর্টের সাদা বাড়িটার কাছে প্লেনটি থামল।

বন্ডের পাসপোর্টে লেখা আছে যে সে একজন ব্যবসায়ী আমদানি রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত। ইমিগ্রেশন আর কাস্টমস অফিসারদের সঙ্গে দু একটা কথাবার্তা সেরে বাইরে এল বন্ড। এবার দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে চেনামুখ সেই লোকটা। গায়ের রংটা বাদামি। বন্ডকে দেখে সেলাম দিল। এর নাম কোয়ারেল। কচ্ছপ শিকার করতে ওস্তাদ। বন্ডের চেহারা দেখে কোয়ারেলের মনে হয় ক্যাপ্টেনের শরীর ঠিক নেই। জিজ্ঞেস করতেই বন্ড মাথা নাড়ালো। অর্থাৎ সে ঠিকই ধরেছে।

কোয়ারেল ও বন্ড এগিয়ে চলেছে। নিজেদের মধ্যে কথা বিনিময় করছে। গতবারের কাজটা যে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল তারই কিছু লক্ষণ এখনো বোধহয় বন্ডের চোখেমুখে, কোয়ারেল বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে।

এরই মধ্যে ফ্ল্যাশগানের ঝলক। বোধ হয় প্রেসের লোক হবে। একটা চিনা মেয়ে এসে তার স্পিডগ্রাফিক ক্যামেরা তাক করছে বন্ডের দিকে, দৈনিক গ্লিনার পত্রিকার সাংবাদিক সে। জিজ্ঞেস করল, “আপনি মি. বন্ড না? তা আপনি এই দ্বীপে কতদিন থাকবেন?” “অল্প কয়েক দিন থাকব” বন্ডের উত্তর।

কোয়ারেল ও বন্ড এবার তাদের জন্য অপেক্ষমাণ গাড়ির কাছে এল। এটা একটা সানবিম অলপাইন। কিন্তু এটা স্ট্র্যাংওয়েজের মনে হচ্ছে। অবশ্য এ ব্যাপারে কোয়ারেলও কিছু জানে না। তবে জানাল যে রাজ্যপালের এ.ডি.সি এটা পাঠিয়েছেন। বন্ড পিছনের সিটে বসল। গাড়ি এগিয়ে চলল, দুধারে ফনীমনসা গাছ দেখা যাচ্ছে। ক্রমাগত ঝিঝির ডাক শোনা যাচ্ছে। বন্ড যেন একটু অনামনস্ক। কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছিল না। তবে কোয়ারেল বেশ কাজের লোক। কালো লোকেদের সাথে মেলামেশা আছে। আর কেমান দ্বীপের লোকেদের মতন অনেক কিছুই জানা তার।

কিন্তু মুশকিল হল বন্ডের ধারণা যে এখানে তার আসাটা বোধহয় জানাজানি হয়ে গেছে। বোধহয় কোয়ারেলের সঙ্গে যোগ আগে থাকত নাহলে এমনটা হত না, আর গ্লিনার পত্রিকায় তার সম্বন্ধে বিপোর্ট বেরোলেও কিছু বিশেষ ক্ষতি হত না।

বন্ড বোধ হয় কোনো পরিকল্পনা করেছে। হঠাৎ ঘুরে গিয়ে কোয়ারেলকে বলল, “দূরে যেখানে কিংসটনের দিকে রাস্তাটা চলে গিয়েছে সেখান থেকে মরাস্টের দিকে মোড় নেবে। আর গাড়ি থামিয়ে আলো নিভিয়ে অপেক্ষা করবে।”

এটা শুনে কোয়ারেল খুবই আনন্দিত, গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল। গাড়ি ছুটলো সাদা পথ ধরে।

বন্দু যা ভেবেছে তাই হল একটা গাড়ি ওকে অনুসরণ করছিল। কোয়ারেল গাড়ি থামিয়ে আলো নেভাতেই এক বড়ো ট্যাক্সি ওদেব দিকে আলো ফেললো। কিন্তু বন্ডের গাড়ি আড়ালে। অতএব ট্যাক্সিটা কাউকে না পেয়ে সোজা চলে কিংসটনের দিকে। এটা একটা বড়ো আমেরিকান ট্যাক্সির মতন দেখতে।

বন্ডের মনে হল এই বড়ো গাড়িটাতে একমাত্র ড্রাইভার ছাড়া কেউ ছিল না।

কিন্তু সেই ড্রাইভারটা বোকা বনে গেছে কি? না বোধ হয়, অন্য কোনো জায়গায় ওৎ পেতে থাকতে পারে। তাই বন্দু কোয়ারেলকে বলল গাড়িটা কিংসটনের দিকে নিয়ে যেতে। ধুলোর একটা ছোটো ঝড়ু যা এতক্ষণ সবদিক একটু অস্পষ্ট করে দিয়েছিল, এখন অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে।

এবার কিংসটনের গাড়ির স্রোতের মধ্যে ঢুকতে হল। চারিদিকে ভিড়। তবে বেশির ভাগটাই গাড়ির, ঘোড়ায় টানা গাড়ি আর আছে ঠালা গাড়ি। এই ভিড়ে ঐ ট্যাক্সিটাও লুকিয়ে থাকতে পারে। যাইহোক এবার বন্ডের গাড়ি পাহাড়ের ডান দিক ধরে উঠে পৌঁছে গেল হাফওয়ে ট্রি পর্যন্ত। এরপর জংশন রোড এটাই চলে গেছে দ্বীপের আরেক প্রান্তে। একটু পরেই এসে গেল সেই বিখ্যাত “ব্লু হিলস” হোটেলে। ওরা নেমে সোজা ঢুকে গেল। বন্ডের জন্য ঘর রিজার্ভ ছিল। ঘরটা বারান্দার কোণে। বাইরের দৃশ্য অনেকদূর দেখা যায় এখন থেকে। বাথরুমের সাওয়ারের তলায় দাড়িয়ে গা ঠান্ডা করে নিয়ে বন্দু এবার পোশাক পালটে নিল। তার পরনে এখন একটা ছোটো একটা প্যান্ট যেটা সেমিআইল্যান্ডে তৈরি।

ওয়েটার এবার বন্ডের কথামতো তিনটে জিনিস জিন, আর টনিক, সঙ্গে একটা লেবু। বরফের গ্লাসে এই সব এক সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি হল পানীয়। সেটি হাতে করে নিয়ে বারান্দায় চেয়ারে বসে বন্দু একটা নিশ্বাস ছাড়ল। মনটা এখন ভালোই আছে যদিও এবাবের কাজটা একটু শক্ত ধরনেরই হবে।

জিনের নেশাটা বন্ডের ভালোই জমেছিল। কিন্তু কোয়ারেলের আসার কথা সাড়ে সাতটায়। একসঙ্গে ডিনার খাওয়ার একটা জায়গা আছে নাম “জয় বোট”। খাবার সঙ্গে নাচগানও আছে। কোয়ারেল এই জায়গাটা চেনে। এর মালিকের নাম “অক্টোপাস ভায়া” কারণ এ একবার অক্টোপাসের সঙ্গে লড়াই করেছিল।

নীল একটি সুট পরে কোয়ারেলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল বন্দু। গাড়ি দাঁড়িয়েছিল আগে থেকেই। বেশিক্ষণ লাগলনা। একটু পরেই পৌঁছে গেল তারা সেই জায়গায়, গাড়ি রাখার জায়গা আছে। একটা তাল গাছের তলায় অনেক টেবিল চেয়ার পাতা আছে। গান হচ্ছে। নিগ্রো ছাড়াও কিছু সাদা চামড়ার লোকও বান্ধবীদের নিয়ে বসে আছে। এবার সেই বিশাল চেহারার নিগ্রো অর্থাৎ অক্টোপাস ভায়া এসে হাজির। বন্ডদের একটা ভালো জায়গায় বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী পানীয় লাগবে? বন্দু চাইল জিন, কোয়ারেল নিল রেড স্ট্রাইপ বিয়ার। এবার তিনজনে একটু নাচনাচি। বন্ডের ভালোই লাগছিল। হঠাৎ একটি পাখির আওয়াজ। বন্ডের ভালো লেগেছে বুঝে কোয়ারেল বলল, “এই অক্টোপাস ভায়া আমার বন্ধু প্রিন্সটনের সব খবর রাখে যদিও ওর বাড়ি কেমানসে।” তারপর জানা গেল কী করে একদিন সে ক্রাব-কীতে হাঁসের ডিম সংগ্রহ করতে গিয়ে অক্টোপাসের খপ্পরে পড়ে। অনেক লড়াই করে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিল যদিও একটা ফুসফুসে ভয়ংকর

আঘাত লেগেছিল। ক্র্যাব-কী-জায়গাটা ভয়ংকর কোয়ারেলের মতে। এক চিনা ভদ্রলোক জায়গাটা কিনে নেয়। পাখিদের নোংরা ঘাটাঘাটি করা এব কাজ। এই চিনে ভদ্রলোকের লোকজন আছে। আছে মেশিনগান ও রেডার। কেউ ঘেসতে পারে না ওই জায়গার কাছে। এটা শুনে বন্ড একটু ভাবল। এরপর স্ট্র্যাংওয়েজ নিয়ে আলোচনা হল। এবপর ক্র্যাব কীর পাখিদের ব্যাপারটা, বিমান ভেঙে পড়া ইত্যাদি শুনে কোয়ারেল বেশ ঘাবড়ে গেছে। চাপা গলায় জানাল, “স্যার-ক্র্যাব কীতে কমান্ডার সাহেবকে ওরা মেরেছে। আর ওর মেয়ে-বন্ধুকেও শেষ করেছে।”

বন্ডের প্রশ্ন, “কিন্তু কোয়ারেল এসব জানল কী করে?” কোয়ারেল অবশ্য উত্তরে যা বলল তা হল এই যে ওই চিনা লোকটা চায়না ওখানে কেউ যাক। লোকটা ক্ষমতাবান। খুনখারাবিও করেছে প্রয়োজনে। হঠাৎ একটা আলো। ও হ্যাঁ সেই চিনা সাংবাদিক মেয়েটা ছবি তুলতে উদ্যত। হাতে একটা লাইকা ক্যামেরা। বন্ডের কথায় মেয়েটিকে হাতের প্যাঁচে ধরে ফেলল কোয়ারেল। চেয়ারে বসে মেয়েটা বলল, “লাগছে ছাড়ো।” মেয়েটার সঙ্গে কোয়ারেলের পরিচয় আছে। বন্ড জানে এ সেই গ্লিনার পত্রিকার লোক, এর নাম “অ্যানাবেল চুং”।

এবার সেই অক্টোপাস ভায়াকে ডেকে এনে বন্ড জানতে চাইল একে সে চেনে কিনা। অক্টোপাসের উত্তর, “হ্যাঁ মাঝে মাঝে এখানে আসে।” কিন্তু বন্ডের ছবি তোলাটা তো কোনো অন্যায় নয়, এটাতো মেয়েটার পেশার সঙ্গে যুক্ত। তবে পুরুষ মানুষের সঙ্গী হিসাবেও মেয়েটাকে বেশ মানায়।

কিন্তু এই আনাবেল চুং এর ব্যবহারটা কেমন যেন! বন্ডের সঙ্গে ঠিক যেন ভালো ব্যবহার করছে না। কোয়ারেল তো খেপে গিয়ে আগেই মেয়েটার একটা হাত মুচড়ে ধরে আছে। মেয়েটা হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে। এমন সময়ে দুম করে একটা আওয়াজ, ক্যামেরায় ফ্লাস্ বাস্‌টা টেবিলে রাখা একটা গ্লাসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ফেটে গেল। চোট লেগেছে কোয়ারেলের মুখে রক্ত বেরোল। কোয়ারেল আরো জোরে মেয়েটির হাত চেপে ধরেছে। কিন্তু না এতে লাভ নেই। কোনো খবর দিতে রাজি নয় এই অ্যানাবেল চুং। কোয়ারেল বলল, “আমাকে মারার শোধ নেব।” তারপর মেয়েটাকে ছেড়ে দিল। ছাড়া পেয়ে সে বলল, “তোমাদেরও শেষ করা হবে খুব তাড়াতাড়ি। যত সব বদমাইসের দল।” এই বলে লাইকা দোলাতে দোলাতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বন্ডের চোখে একটা সন্দেহের ছায়া। একটু ভেবে সে কোয়ারেলকে বলল, “মেয়েটার কথা ভুলে যাও। বাড়াবাড়ি করলে ছুরি খেতে হবে। আর মুখের চোটটাতে একটা প্লাস্টার লাগাও, পারো তো বিয়ে করে ঘর সংসার কর গে যাও।”

॥ পাঁচ ॥

বন্ডের মনে এখন একটা চিন্তা। মেয়েটা বলেছে ওদেরকে শেষ করা হবে। কফির কাপটা হাতে নিয়ে বারান্দায় বসে বন্ড এই কথা ভাবছিল। মনে পড়ল স্ট্র্যাংওয়েজ আর সেই মেয়েটির অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা না এদেরকে মারাই হয়েছে। আর খুন করার প্রমাণ লোপাট করে দেওয়া হয়েছে। শত্রুপক্ষের কাছে বন্ডের ছবিও খুবই প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ বন্ড যদি স্ট্র্যাংওয়েজের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালায় তাহলে তাকেও সরিয়ে ফেলা হবে। একটা গাড়ির ধাক্কা, কিংবা কিছু লোক হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর আর বন্ডের জীবনের সেখানে সমাপ্তি হতে পারে। আর কোয়ারেলও বাদ যাবে না। সেও মরবে। প্রশ্ন হল শত্রুটা কে বা কারা? সন্দেহের তির ডক্টর ‘নো’-র দিকে। লোকটা ক্র্যাবকীর মালিক, অনেক টাকা আছে। আর ওই দ্বীপে কাউকে আসতে দেন না উনি। আর কতগুলো পাখির মল বা যাকে বলে “গুয়ানো” নিয়ে কীসের গবেষণা? ওই দ্বীপে যেতে

গিয়ে চারজন মারা গেছে আগেই। কোয়ারেল ভাঁতু না হলেও ডক্টর 'নো'-কে ভীষণ ভয় পায় সে। অভোবন সোসাইটির ভূমিকাটাও কী রকম? এই সব চিন্তার জট খোঁচা মারছিল বন্ডের মাথায়।

যাইহোক আজকে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করার কথা। দশটার সময়। একবার কলোনিয়াল সেক্রেটারিকেও ধরতে হবে যদি কোনো খবর পাওয়া যায় ক্রাব কী আর ডক্টর 'নো'-র সম্পর্কে।

একটু পরেই মুখের প্লাস্টার লাগানো কোয়ারেলের আগমন। একটু মদ্যপানও করেছে সে। বন্ড বলল, শোন আমি আজ “রাজবাড়ি”তে কাটাব। খানিকটা সময় জ্যামাইকা-ইনস্টিটিউটেও থাকব। তুমি সোজা চলে যাও সেই জলের ধারে। গাড়িটা পালটে একটা অন্য গাড়ি ভাড়া করো। এক মাসের জন্য আর দেখো আমাদের দুজনের চেহারার সাথে মিল আছে এমন লোক পাও কিনা। গাড়ি চালাতে জানা চাই। আমাদের মতন পোশাক ও টুপি কিনে দিও তাদেরকে। বলে দিও তারা যেন একটা গাড়ি মস্টেগোতে নিয়ে গিয়ে লেডির গ্যারাজে রেখে দেয়। লেডিকে একটা ফোন করতে হবে। আর হ্যাঁ, এদেরকে বলবে আমি একজন ধনী আমেরিকান, মায়ামি একটু খারাপ আছে। দরকারি কাজে লোক দরকার। এদের প্রত্যেককে দশ পাউন্ড দেবে। তুমি আসবে অন্য গাড়ি করে। সকাল ছটার সময় আসতে হবে ওদেরকে। আর দরকার একটা থাকার জায়গা, বাড়ি হলেই ভালো। বাড়ি-ভাড়া করার সময় আমার নাম জেমস বলে জানিয়ে দেবে। মাসখানেকের জন্য বাড়িটা লাগবে। বাংলা হলেও চলবে। টাকা অনেক আছে। এই নাও দুশো পাউন্ড। আর আমি কোথায় থাকব তুমি তো জানোই।” এতটাকা পেয়ে কোয়ারেল একটু চমকে গেছে। বন্ড তাকে সাবধানে থাকতে এবং চিনেদের ওপর নজর রেখে চলতে বলল। এরপর একটা ট্যাক্সি করে সোজা “রামবাড়ি” একটু পরেই দোতলায় গভর্নরের ঘরে এলো।

গভর্নর সাহেবের বয়স ষাটের গোড়ায়। সামনে একটা টেবিল। তাতে আছে ফুল আর খবরের কাগজ। চোখ তুলে নমস্কার জানালেন, বললেন, “আপনিতো মি. বন্ড, তাইনা?” বন্ডও নমস্কার জানালো।

বন্ড আগেই জেনেছিল কলোনিয়াল অফিস থেকে যে এই গভর্নরের চাকরি প্রায় শেষ। এরপর তার ইচ্ছা কোনো ব্যাংকে ডিরেক্টর হওয়া আর ইনিই স্ট্র্যাংওয়েজের ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান করার কাজে বাধা দিয়েছিলেন।

বন্ড এবার স্ট্র্যাংওয়েজের প্রসঙ্গ তুলতেই উনি জানালেন এ ব্যাপারে নতুন কিছু নেই। কিন্তু বন্ড মনে করে কিছু সংকেতবর্তী এর কাছে আছে। “নতুন কিছু মানে কী একটু যদি স্পষ্ট করে বলেন।” অনুরোধ জানাল বন্ড। গভর্নর উত্তরে জানালেন যে মেয়েছেলে নিয়ে বাড়িবাড়ি করলে সব গোলমাল হয়ে যায়। স্ট্র্যাংওয়েজের সেইরকমই কিছু হয়েছিল। এসব কাজে একটু শক্ত চরিত্রের লোক দরকার, এটা নিশ্চয়ই আপনি বোঝেন।”

বন্ডের মাথাটা ঠান্ডাই আছে। বলল, “ঠিক আছে। এখন আমি কলোনিয়াল সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে চাই। ক্রাব-কীতে কিছু গোলমাল আছে। অনুসন্ধান করতে হবে।” এটা শুনে গভর্নর খুশি। বললেন খুব ভালো, এখনই আমি জানিয়ে দিচ্ছি মিস্টার স্মিথকে।”

এবার একজন দেহরক্ষী এল, গভর্নর ধন্যবাদ জানিয়ে বন্ড বেরিয়ে গেল।

এবার বন্ডের দেখা কলোনিয়াল সেক্রেটারির সঙ্গে। বয়সে প্রায় বন্ডেরই সমান। বন্ডের পরিচয় পেয়ে যেন খুশি হলেন। ভদ্রলোকের তামাকের নেশা। একটা তামাকপাত্র কাছে টেনে নিয়ে বললেন, “বলুন কী করতে পারি আপনার জন্য মি. বন্ড।” ভদ্রলোকের নাম মি. স্মিথ। ইনি আগেই বন্ডের

সম্বন্ধে কিছু খবর পেয়েছেন একটা ফাইল থেকে। একথাটা ভদ্রলোক নিজেই বললেন। বড় জানালো স্ট্র্যাংওয়েজ নিয়ে একটা কাজে সে এসেছে।

যাইহোক প্রশ্ন হচ্ছে ক্রাব কী সম্পর্কে ভদ্রলোক কিছু জানেন কিনা। একটা ঘন্টা বাজলো। দরজা খুলে গেল। মিস তারো নামে এক সেক্রেটারিকে একটা ফাইল রেখে যেতে বলা হল এর মধ্যে ক্রাব কী সম্বন্ধে লেখা আছে কিছু রিপোর্ট।

তবে গুয়ানো সম্বন্ধে ভদ্রলোকের অনেক জ্ঞান। উনি জানালেন কী করে বহু বছর ধরে পাখির নোংরা জমে বিশাল পাহাড়ে পরিণত হয়েছিল। ১৮৫০ সালে প্রমাণ হল এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সার যার মধ্যে আছে নাইট্রেট, ফসফেট ইত্যাদি। দুরকম পাখি যারা বছরে পাঁচ লক্ষ টন মাছ খায় তাদের শরীর থেকেই বেরিয়ে ওই গুয়ানো যা নিয়ে এক সময় পৃথিবীর নানা জায়গায় ব্যবসা শুরু হয়, জাহাজের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এই সার কেনার জন্য।

ক্রাব কী বিখ্যাত হল গুয়ানো ব্যবসা জমজমাট হবার পরে। জার্মানরা নকল গুয়ানো তৈরি করে বাজারে ছেড়েছিল যখন পেরুর সরকার এই ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণ চালু করে। কিন্তু জার্মানদের চেষ্টা সফল হয়নি। ফলে সবার ওই ক্রাব কীর গুয়ানোর উপর নজর পড়ে।

এও জানা গেল ওই চিনে ভদ্রলোক নাম ডক্টর নো ক্রাব কী কিনে পঞ্চাশ ডলার করে প্রতি টন গুয়ানো বেচলেন, মাল পাঠালেন, ইওরোপের বিশাল ধনী হলেন কিন্তু মজুরদের পয়সা দিলেন কম। বন্ড ভাবছিল অন্যকথা। ক্রাব কী জায়গাটার দাম কেন অনেক।

এবার স্মিথ-এর গলায় রাগের সুর। কারণ এখনো ফাইলগুলো মিস তারো দিয়া যায় নি। স্ট্র্যাংওয়েজ ওই ফাইলগুলো একবার নিয়ে গিয়েছিল। ফেরতও দিয়েছিল। মেয়েটা জানাল ফাইলের মলাটগুলি সুন্দর আছে কিন্তু ভেতরে কিছু নেই।

ব্যাপারটা বন্ডকে একটু যেন চমকে দিল। সে চেয়ারে ঘুরে বসল। কোথায় যেন একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। জেমস বন্ড নামটা তাহলে বিশেষ জায়গায় পৌঁছে গেছে। মিস তারোদ্রোগ, ডক্টর নো আর অ্যানাবেল চুং এর কথা মনে এল।

॥ ছয় ॥

অনেক খাওয়ার পর বন্ডকে বেশ রসিয়ে কিছু কাহিনি শোনালেন কলোনিয়াল সেক্রেটারি— জ্যামাইকা তাঁর প্রিয় জায়গা। জানালেন এখানকার লোকেরা ঠিক টাকা বানাবার মন্ত্র জানে না। এরা একটু অলস অথচ আরামপ্রিয়। ইংরাজরাও বহুদিন চেষ্টা করে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। অবশ্য পর্তুগিজ ইহুদীরা গাড়ি এবং ইনসিওরেন্স ব্যবসা ভালোই ফেঁদেছে। এদের পরেই আছে সিরিয়ার কিছু ব্যবসায়ী।

অবশ্য চিনেরা এখানে সবচেয়ে শক্তিশালী সম্প্রদায়, চুটিয়ে ব্যবসা করে। কিংসটনে এদের দাপট খুব বেশি, আর আছে চিনে এবং নিগ্রোর মিশ্রণ এক জাত। বন্ডের মনে হল স্মিথ সেক্রেটারি মেয়েটি ওইরকম জাতেরই হবে।

ফাইলগুলো বোধ হয় পাওয়া যাবে না। স্মিথ বললেন যে ওগুলোর মধ্যে বিশেষ কোনো তথ্য আছে বলে তাঁর মনে হয় না।

উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “চলুন এবার একটু জ্যামাইকা ইনস্টিটিউটে যাওয়া যাক।”

ওখানে পৌঁছে ক্রাব কীর-উপর সার্ভে ম্যাপটার উপর চোখ বুলিয়ে নিল বন্ড। হ্যাঁ এই ক্রাব কীর অনেকটাই জলাভূমি। বাড়িঘর কিছু নেই। আছে পাশে দু- একটা পাহাড়। জলাশয়টি ঐকৈবেঁকে সমুদ্রের দিকে চলে গেছে।

এবার একটু ক্লাস্ত বোধ করল বন্ড। কিংসটনের গরম তাকে যেন পোয়ে বাসেছে। একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা হোটেলে। হোটেল রিসেপশন থেকে জানা গেল কোয়ারেল কোনো খবর পাঠায়নি। তবে কে একজন কালো লোক একটা ফলের ঝুড়ি নিয়ে এসেছে। এ. ডি. সি অফিস এটা পাঠিয়েছে। কিন্তু এই ফল কি খাওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে? বন্ড তো তা মনে করে না। হোটেলের দবজা খোলার আগে পিস্তল বার করে দুম করে ঘবে ঢুকে পড়ল। ফলের ঝুড়ি উলটে দিল। অনেক রকম ফল। আছে একটা সাদা খাম যাতে লেখা “রাজ্যপালের শুভেচ্ছা সহ”, প্রথমে আছে একটা পিচ ফল, ওটাকে তাড়াতাড়ি ওয়াশ বেসিনে রেখে দিল।

একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ঠুলি বার করে চোখে লাগিয়ে ওটা পরীক্ষা করল। ফলটার গায়ে অনেক ছোটো ছিদ্র আছে যে গুলো দেখতে একটু বাদামি। মনে হল বিষাক্ত ফল। তার মানে আক্রোশ শুরু হয়েছে স্ট্র্যাংওয়েজ আর ওই মেয়েটাকে আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে পৃথিবী থেকে, এবার বন্ডের পালা বোধ হয়, কিন্তু কে সেই আক্রমণকারী বন্ডুকের ট্রিগারের ওপর আঙুল রেখেছে? মনে হচ্ছে সেই ডক্টরনো-ই হবে।

বন্ড আর দেরি করলেন না। ফলগুলো বেইমানি করবার আগেই কাজটা সেরে ফেলা ভালো। একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সের মধ্যে পুরে ওগুলো পাঠিয়ে দিল রাজবাড়ির উদ্দেশ্যেই। তার আগে অবশ্য স্মিথকে সব জানিয়ে দিল। অর্থাৎ একজন কেমিকাল এনালিস্টকে দরকার যিনি এগুলো পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেবেন। ট্যাক্সি চলে গেল ফলের বাক্স নিয়ে রাজবাড়ির দিকে।

বন্ডের স্নান হয়ে গেছে। পানীয়ের গেলাস হাতে নিয়ে বারান্দায় বসল সে। ফোন বেজে উঠল। কোয়ারেলের ফোন, জানাল কাজ অনেকটা হয়ে গেছে। টেলিফোন ছেড়ে বন্ড আবার বারান্দায়। মাথার উপর একটা প্লেন, সেই সুপার কম্পিটিলেশন, যাতে বন্ডও একবার চড়েছিল। গর্জন করে প্লেনটা চলে গেল প্যালিসাগেস এয়ারপোর্টের দিকে।

মি. এমকে খবরটা দিলে কেমন হয়? বিশেষ কোনো লাভ নেই। উনি চট করে মানবেন না হয়তো। কাজেই লাভ নেই।

গরম লাগছে। বন্ড জামা খুলে বিছানায় চলে গেল। সঙ্গে রয়েছে তার ওয়ালথার PPK পিস্তল। রাত তিনটেয় ঘুম ভাঙল। কিন্তু পায়ের উপর দিয়ে কী যেন একটা হেঁটে যাচ্ছে, শিরশির করছে শরীরটা। হঠাৎ যেন একটা অদ্ভুত আওয়াজ, এটা কি কোনো বিছে টিছে নাকি? হতে পারে কিন্তু বন্ড এখন শোয়া, হঠাৎ উঠতে গেলে বিপদ হতে পারে। প্রাণীটা মনে হচ্ছে অনেক লম্বা, পা থেকে আসতে শুরু করে এখন পেটের কাছে, তারপর বন্ডের গলার উপর দিয়ে একেবারে চুলের উপর। ভয়ে বন্ডের ঘাম হয়ে গেল গোটা শরীর। কী হতে পারে এটা?

উঠে দাঁড়াতে গেলে হয়তো মরণ কামড় খেতে হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেছে। এইভাবে শুয়ে থাকলে তো হবে না। এবার সাহস করে এক লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে, ঝটকা এবার ওটা মাটিতে পড়েছে। আরে দূর একটা মাকড়সা। বন্ডকে চমকে দিয়েছে। আর দেবি নয়, জুতোর পাটির এক বাড়ি। ব্যাস পোকাটা ফেটে গেল, হলদে রস বেরিয়ে এল এটা থেকে। কিন্তু মাকড়সা এল কী ভাবে? বন্ডের যেন গা গুলিয়ে উঠল।

॥ সাত ॥

বন্ড ও কোয়ারেল গাড়িতে করে চলেছে। এবার মাকড়সা নিয়ে একটা প্রশ্ন বন্ডের। হ্যাঁ কোয়ারেল জানাল এখানকার মাকড়সা যেগুলো বেশ লম্বা। মানুষ মারতে পারে। তবে মাকড়সাগুলো ঝোপে ঝাড়েই থাকতে পারে, পরিষ্কার বাড়িঘরে থাকার কথা নয়। কিন্তু কেন এই

প্রশ্ন? কোয়ারেলের চোখে জানার আগ্রহ। বন্দ ভাবলো না— “কোয়ারেলকে কিছু জানালে ভয় পেয়ে যেতে পারে। তাই হঠাৎ বলল, “আচ্ছা ওই লোক দুটো গাড়ি নিয়ে মন্টেগোতে রওনা দিয়েছে?” কোয়ারেল জানাল যে ওরা চলে গিয়েছে এবং এই কাজে ওরা খুবই খুশি। একজন বন্ডের মতন ও আরেকজনকে কোয়ারেলের মতন দেখতে।

কিন্তু বন্দ ভাবছে অন্য কথা অর্থাৎ স্ট্র্যাংগয়েজে আর তার সেক্রেটারির হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। এরা খুন হয়েছে। কে খুন করেছে? বন্ডের মতে ডক্টর নো। এটা শুনে কোয়ারেল বলল আমার ধারণাই ঠিক। ওই চিনে ডক্টর নো তার এলাকায় নাক গলালে খুনই করেন।

তবে এবার খেলাটা একটু অন্য রকম হবে বোধ হয়। কারণ শত্রুকে ধাওয়া দেওয়ার জন্য সানবিম গাড়িটা মন্টেগোতে পাঠানো হয়েছে। অথচ বন্দ আর কোয়ারেল থাকবে এখন বো ডেজার্টে। এরপর শরীর টাকে একটু চাক্সা করে দুজনে ঘুরে আসবে ওই ক্র্যাব-কী থেকে। একটা নৌকায় রাত্রিবেলা যেতে হবে, সঙ্গে থাকবে খাবার পাউরুটি আর শুয়োবের মাংস। সিগারেট খাওয়া যাবে না কারণ আশুন দূর থেকে দেখা যায়। আর থাকবে দুটো শিকারি ছুরি, আর রিভলবার। কোয়ারেল একটু ঘাবড়ে গেছে তাই বলল এর আগে তার একটা জীবনবিমা করা যাবে কিনা। বন্দ কথা দিল— “হ্যাঁ হয়ে যাবে।”

গাড়ি এগিয়ে চলল। এবার এটা মর্গান্স হারবারে ঢুকল আর একটু পরেই এসে গেল সেই বো ডেজার্টে। জায়গাটা প্রায় সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। বাংলোর গেটে ওরা পৌঁছে গেল। এখানকার কিছু স্মৃতি বন্ডের মনে পড়ে। বিশেষ করে সেই সলিটের এর কথা। মেয়েটাকে সে স্কৃতবিস্কৃত অবস্থায় তুলে এনেছিল। কয়েকটা ভালো খাওয়া বিশ্রাম আর ব্যায়ামের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল।

কিন্তু একটা বিপদ উঁকি দিয়েছে। সেই গ্লিনার পত্রিকা জানাচ্ছে যে একটা সানবিম আলপাইন মন্টেগো যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় পড়েছে। একটা লরি গাড়িটাকে ধাক্কা দিয়েছে। দুজন আরোহী মারা গেছে। জনৈক মি. বন্দ এই গাড়িটা ভাড়া করে এদেরকে দিয়েছিলেন। মৃত আবোহীদের নাম বেন গিবনস ও জোসিয়া স্মিথ। কোয়ারেল যাতে কিছু না জানতে পারে তাই গ্লিনারের এই কপিটা পুড়িয়ে দিল বন্দ। আরেকটা রিপোর্টও পুড়িয়ে দিল যাতে লেখা আছে “প্রতিটি ফলের মধ্যে পটারশিয়াম সায়ানাইড ছিল যা একটা ঘোড়াকেও মেরে ফেলতে পারে। ইতি স্মিথ”

ইতিমধ্যে কোয়ারেল একটা নৌকা ভাড়া করে চালানো অভ্যাস করতে শুরু করেছে। বন্দও জীবনবিমা করলো কোয়ারেলের জন্য। বন্ডের মনে নতুন উত্তেজনা। কারণ এবার রীতিমতো একটা অ্যাডভেনচারের রহস্য ভেদ করতে বেরোবে ওরা। শত্রু খুবই নির্দয়। তবুও দৃঢ় সৈনিকের মতন এগোতে হবে। মি. এম হয়তো ভাববেন যে বন্দ এখানে সূর্যের আলো উপভোগ করবে। তার বন্ডের কাজটার কোনো ঝুঁকি নেই। কিন্তু বন্দ প্রমাণ করে দিতে চায় মি. এম. এর ধারণা ভুল, অর্থাৎ মুখের মতো একটা জবাব দিতে পারা যাবে হয়তো। এবার শোবার ঘরে গিয়ে পিস্তল পরীক্ষা শুরু করলো। বেরেটা পিস্তল এবার নয়। এখন ওর বেস্টে বুলবে সেই বিখ্যাত স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা পিস্তল।

বন্ডের পেটে পড়েছে কানাডিয়ান হুইস্কি। কোয়ারেলও কিছু একটা খেয়েছে বোধ হয়। শুরু হল নৌকা চালানো। রাতের গভীর অন্ধকার ঘিরে রেখেছে ওদেরকে। তবে বন্দ নিশ্চিত ওদেরকে নৌকায় উঠতে কেউ দেখেনি। বন্দ চালাতে লাগল, কোয়ারেল হাল ধরে রইল। এটা অবশ্য রীতিমতো শত্রু কাজ। গাছপালা আর পাথরে নৌকা প্রায়ই আটকে যাচ্ছে। কিন্তু এটা হল সমুদ্র যদিও টেউয়ের ঝটকা তেমন প্রবল নয়।

একটু পরে কোয়ারেল পাল টাঙালো। ভোব না হওয়া পর্যন্ত নৌকা চলবে। আকাশে প্রচুর তারা। একটা ছায়াপথ দেখা গেল। ঠান্ডা হাওয়া বন্ডের মুখে লাগছে। কোয়ারেল বলল, “ক্যাপটেন আপনি যদি ঘুমতে চান ঘুমিয়ে নিন, মনে হয় আপনি ক্লাস্ত।” কিন্তু না বন্ড এখনি ঘুমোবে কি? রাত বারোটো বেজে গেছে। বন্ড কিন্তু একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। অর্ধেক পথ পেরিয়ে গেছে তারা। এবার বন্ড হাল ধরলো পাল বাঁধা আছে একটা পেরেকের সাথে।

নৌকা বয়ে চলেছে। শরীরে ব্যথা ধরে গেছে ওদের। কিন্তু থামবার উপায় নেই। একঝাঁক উড়ন্ত মাছ যেন জল ভেদ করে উঠে পড়ল। তারপর বোমার টুকরোর মতন ছড়িয়ে গেল। এতো কিছুই না। আরো কত আছে সমুদ্রের নীচে— হাঙর, ব্যারাকুডা, টারপন জেলফিশ— এতো আর এক রহস্যময় জগৎ। যদি কোনো বড়ো ঢেউ এসে একটা ধাক্কা মারে তাহলে তো সবকিছুর ইতি এখানেই। কাজেই সাহসের সঙ্গে সাবধানতাও দরকার।

ভোর চারটে বেজে গেছে। এবার মাটির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আকাশে যদিও হলুদ চাঁদ এখনো আছে। ঢেউয়ের আওয়াজও যেন ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

আরো কুড়ি গজ নৌকাটাকে টানতে হল। ডাঙা আগেই এসে গেছে। ভোর হয়েছে। এবার ওরা নৌকাটাকে গাছের পাতা লতা দিয়ে ঢেকে ফেললো। ঝাঁটা দিয়ে বালির উপরের চিহ্ন মুছে দিল।

দুজনেই ভীষণ ক্লাস্ত। বালি খুঁড়ে শোবার জায়গা করে নিল। হাতের কাছে পোকা এবং কাঁকড়া যা পেল ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

বালিতে শুয়েই বন্ড ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ আট ॥

বেলা দশটা বেজেছে। কোয়ারেল একটা পাথরের ফাঁকে শুয়ে আছে। কিন্তু বন্ডের ঘুম ভেঙেছে। একটা আওয়াজে। কে যেন চলে গেল। এরপর যে দৃশ্য বন্ডের চোখে পড়লো তাতে তার পাগল হয়ে যাওয়ার কথা। হ্যাঁ সামুদ্রিক আগ্রের পাতার ভেতরে একটি অর্ধনগ্ন মেয়ে। কোমরে একটা চামড়ার কোমরবন্ধ। আছে একটা শিকারি ছুরি। অসাধারণ শরীরের গঠন। শরীরের উপরের অংশ খোলা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে সে। দূরে লতাপাতার মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা ছোটো নৌকা। বোধ হয় খুব হালকা হবে সেটা। কিন্তু মেয়েটা এখানে এলো কী ভাবে? জ্যামাইকা থেকে এসেছে নৌকা নিয়ে? এর সঙ্গে আর কেউ আছে কি? বন্ড জানে না। মেয়েটা বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে। বালির উপর বেগুনি রঙের কী সব পড়ে আছে। ওমা মেয়েটি গানও গাইছে। গানটি বেশ জনপ্রিয়। বন্ডেরও জানা। বন্ডও শিস দিল। বোধহয় আনন্দে। কিন্তু এবার মেয়েটা বন্ডকে দেখে ফেলেছে। বন্ড ভেবেছিল হাত দুটি দিয়ে সে শরীরের উপরের নগ্ন অংশ ঢেকে দেবে। না তা হল না। বন্ডের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে শিকারি ছুরিটার কাছে মেয়েটার হাত নেমে এল। বন্ড তাড়াতাড়ি বলল, “আমাকে দেখে ভয়ের কিছু নেই। আমি একজন ইংরেজ, পাখি সম্বন্ধে কিছু জানবার ইচ্ছায় এখানে আসা”।

মেয়েটার নাম জানা গেল। পুরো নাম হানিচালি রাইডার। লোকে হানি বলে ডাকে। বন্ডের সঙ্গে গভীর ভাবে কিছু কথা বলে গেল। জানতে চাইলো বন্ডের নৌকা কোথায়। বালিতে এদের আসার চিহ্ন নেই কেন ইত্যাদি। হঠাৎ তার মনে হল সে যে প্রায় নগ্ন। এখনি পোশাক পরা দরকার। সাঁতারের মুখোশটা দোলাতে দোলাতে সে বলল “— আমি এখন আসছি, কিন্তু এখানে পড়ে থাকা ঝিনুকগুলোতে হাত দেবেন না।” তা সত্ত্বেও বন্ড একটা ঝিনুক কুড়িয়ে নিল। এখন শুধু তার ভাবনা কী করে এই মেয়েটা এখানে এলো? এর বাবা-মাই বা কে?

একটু পরেই মেয়েটা এল। পরনের পোশাক ছেঁড়া। তালিমারা একটা বাদামি স্কাট। কাঁধে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ ঝোলানো। বন্ডের সঙ্গে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলছে। সে জানালো এখনকার এই বিনুক মায়ামিতে বিক্রি হয় অনেক দামে। বিনুকের নাম ভেনাস্ এলিগ্যান্ট গুধু এগুলো কষ্ট করে খুঁজে নিতে হয়।

এবার পাখির প্রসঙ্গ উঠতেই মেয়েটা বলল যে এখনকার বেশির ভাগ পাখিই হল সুনবিল, প্রচুর ছিল, তবে কোনো কারণে এরা বেশিরভাগই পালিয়ে গেছে, কিছু অবশ্য মরেছে। একটি চিনা লোক ড্রাগন লেলিয়ে এই সব কান্ড করেছে, পাখিদের বাসা পুড়িয়ে দিয়েছে। হাঁটু মুড়ে বসে এইসব কথা বলে গেল মেয়েটা। আর বন্ড শুনলো সব আধশোয়া হয়ে বালির উপরে। মেয়েটা এখনকার ড্রাগনটাকেও নাকি দেখেছে। কালো আর বাদামি রঙের শরীর নিয়ে গর্জন করতে করতে সেটাকে দেখা গিয়েছিল জলাভূমির দিকে চলে যেতে। মেয়েটা যার নাম হানিচাইল রাইডার অকাতরে বকে চলেছে। ওডাস আছে, অনেক। ‘সে দেখেছে কী করে একটা মাকড়সা প্রেম করাব পর তার সাথীকে গিলে ফেলে। কী করে বেজি নাচে আনন্দে। কী করে কাঁকড়া বিছের সানস্টোক হয়। কী করে এরা-আত্মহত্যা করে, হামিং বার্ড কতটা লম্বা হয় ইত্যাদি। বন্ড চুপ করে শুনে গেল সব। হ্যাঁ মেয়েটা জানে অনেক কিছু। তবে হয়তো জানেনা তার পাল তোলা নৌকাটা এখন ওই ডক্টর নোর একটা টার্গেট— কারণ এটা রেডারে ধরা পড়েছে। এবাব মেয়েটাকে আটকে দিতে পারে ওই চিনাটা। হানি এসব শুনে বলল, “হতে পারে, তবে আপনার ভাগ্যটাও বোধ হয় একই সূত্রে ধরা।” বন্ড একটু হাসলো, কঠিন স্বরে বলল, “হ্যাঁ লোকটা সর্বশক্তি দিয়ে আমাকে ধরবার চেষ্টা করবেই। যাই দেখা যাক কোয়ারেল কী বলে।”

কোয়ারেলকে ঘুম থেকে তুলে বন্ড বলল, “দেখ কে এসেছে, তুমি বোধ হয় ওই চিনা মেয়েটিকে স্বপ্নে দেখছিলে, এখন এদিকে দেখ কে বসে আছে।” কোয়ারেল এবার উঠে বসেছে। কিন্তু সে যেন চুপ করে হঠাৎ। হ্যাঁ একটা খড় খড় আওয়াজ আসছে কোথা থেকে? বন্ড ঝট করে তৈরি অর্থাৎ বিপদ এলেই লড়ে যেতে হবে। কোয়ারেল উত্তেজিত, বলল, “ক্যাপ্টেন ওরা মনে হয় এসে গেল।”

॥ নয় ॥

হ্যাঁ একটা আওয়াজ আসছে। বোধ হয় শত্রুপক্ষের লোক আসছে। আওয়াজটা বোধহয় একটা বড়ো কেবিন ক্রজারের। কিন্তু কারা এই অনুসন্ধান চালাচ্ছে। ডক্টর নো? মনে হয় না। হঠাৎ দেখা গেল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে আকাশটা যেন কালো কবে ফেলল। একটু পরে এরা টেচামেচি করে সমুদ্রে ডুব দিল। বোধ হয় মাছ খেতে শুরু করল। এবার বোটটাকে দেখে ফেলেছে বন্ড। কাঁচের ওয়াইন্ড শিল্ড, সাইরেন আর নীচু কেবিনটা স্পষ্ট। এটা একটা ব্রিটিশ টর্পেডো বোট। স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসা লোকটাকে অবশ্য পরিষ্কার দেখা গেল না। কিন্তু বোটের পিছনে দুজন লোক, হাতে লাউড স্পিকার। একটা মেশিনগান মাথায় টুপি, হাফপ্যান্ট, কোমরে বেল্ট লাগানো। কী সর্বনাশ! বাইনোকুলার দিয়ে এরা বোধ হয় সব দেখে নিয়েছে। নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করছে বোধ হয়। মনে হয় এরা মেয়েটার লুকানো নৌকাটা দেখে ফেলেছে। ঠিক তাই।

লাউডস্পিকারে চোঁচিয়ে বলা হল, “বন্ধুগণ সোজা চলে এসো, আমরা গুলি চালাচ্ছি না।” না আর দেরি নয়। মেয়েটির নরম গাল চেপে ধরে বন্ড বলল, “বালিতে গর্ত করে ঢুকে যাও। যাতে একটাও গুলি লাগতে না পারে।” ঢুকে গেল ওরা। শুধু চোখ আর নাকটা একটু খোলা হাওয়ার

দিকে রাখতে হল। এরপবই গুলিব ভয়ংকব আওয়াজ। আওয়াজটা অনেকটা বন্ডের জানা। হ্যাঁ এই আওয়াজ সে শুনেছিল আর্ডেস এর রণক্ষেত্রে জার্মান শিবির থেকে। বুলেটের ঝড় বয়ে চলেছে। হানির মাথাটা চেপে ধরে বন্ড যতটা পারলো আড়ালে রইল। বুলেটের আঘাতে মাথার উপর ঝোপটা গুড়িয়ে গিয়ে ওদের দুজনকে প্রায় ঢেকে দিল। হানি ভয়ে এবার কেঁদে ফেলেছে। বন্ড বলল, “শাস্ত থাকো একটু পরেই এবা চলে যাবে।” হঠাৎ লাউডস্পিকারে ঘোষণা, “বন্ধুগণ আপনারা হয়তো মরে গেছেন, মৃতদেহ আনবার জন্য আমরা একটু পরে আসবো, সঙ্গে থাকবে কুকুরগুলো।”

এবার ডিজেল ইঞ্জিনের গর্জন। একটু পরেই বোটটা অদৃশ্য হল। কিন্তু হানির নৌকাটা গুলির আঘাতে প্রায় গুড়ো হয়ে গেছে। হানি কেঁদে ফেললো। বন্ড সান্ত্বনা দিল, “ভেবোনা ওই নৌকা নিয়ে যদিও এটা তোমার খুব প্রিয় নৌকা ছিল। আমাদের নৌকা আরো ভালো, যাবার সময় আমাদের নৌকায় তোমার জায়গা হয়ে যাবে। এখন দেখি কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা আর নতুন একটা প্রাস করতে হবে।” খাবারের মধ্যে আছে বুনো কলা আর সী-আর্চিন। কোয়ারেলও এসে গেছে। সেও একটা নিরাপদ আশ্রয়ে ছিল গুলি চলবার সময়ে। একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, “ওই কুকুরগুলো আসলে পুলিশের হয়। এদের নাম ‘পিনশার’। একেবারে সাংঘাতিক ধরনের।”

এবার নৌকাটাকে আরো ভালোভাবে লুকিয়ে রাখা হল। সঙ্গে রাখা খাবার তিনজনই ভাগ করে খেয়ে নিলো। এবার ছোটো অগভীর নদীটার খানিকটা পেরিয়ে গেল ওরা প্রায় তিনজনই অর্ধনগ্ন। কাদা আছে। পায়ের তলায় ছোটো চিংড়িমাছ খেলা করছে। দু একটা টারবান মাছ লাফ দিয়ে জলে মিলিয়ে গেল।

এবার এরা এমন একটা খোলা ডাঙায় এসে পড়েছে যেখানে ওদেরকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জমিটা এখন থেকে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। আর কাছেই আছে গুয়েনারা। ঘোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে আসছে ওখান থেকে। এখানেই তাহলে আছে পাখির নোংরার চকচকে পাহাড়টা। অর্থাৎ ডক্টর নো-এব রাজত্ব।

ওই দূরে ওটা কী? একটা লরি মনে হচ্ছে। ঠিক তাই। লরিটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে একটা কুটিরের কাছ থেকে।

কোয়ারেল বলল, “ক্যাপ্টেন ওরা কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপর কুকুর নিয়ে। আমরা মৃত ভেবে নিয়ে কিন্তু ওরা আক্রমণের তীব্রতা কমাতে না।” হানি বলল, “একটা কাজ করতে হবে। বাঁশের নলের সাহায্যে নিশ্বাস নিয়ে জলে ডুবে থাকতে হবে।”

বাঁশবনের দিকে কোয়ারেল চলে গেল। বন্ড যা ভাবছিল পেয়ে গেল। একটা প্রণালি দশগজ লম্বা খুব গভীর নয়। পায়ের তলায় কাদা। এখানে ডুবে থাকতে হবে। তবে রিভলবারটার কী হবে? ভিজ়ে নষ্ট হয়ে যাবে না তো? যদি কুকুবগুলো টের পায় তখন তো গুলিই ভরসা। বন্ড আগেই ডুবে দিয়েছে। হানিও তৈরি। বন্ড জলটা জিভ দিয়ে পরখ করলো। একটা গন্ধ আছে। বাঁশের টুকরোগুলো টেঁচে ঠিক করা হয়েছে। মাথার উপর গাছের পাতার আচ্ছাদন ভেদ করে সূর্যের আলো আসছে গায়ে। চাপা উত্তেজনায় তিনজনকেই সজাগ থাকতে হচ্ছে। কুকুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

॥ দশ ॥

অনুসন্ধানকারী দলটি আক্রমণ করতে তৈরি। গামবুট পরা দুই চিনা নিগ্রো, বিশাল চেহারা, একদল ডোবারম্যান কুকুব নিয়ে এসেছে। কুকুরগুলো সাঁতার দিতে শুরু করেছে। ওরা খুঁজছে বন্ডদের পাগলের মতন। বাগে পেলে আর রক্ষা করার কেউ নেই।

কিন্তু না, ভাগ্য ভালো। প্রশালির চারদিকে কুকুর লাগিয়ে আর বন্ডরা যে ঝোপের কাছে জলের কোন গোপন জায়গায় লুকিয়ে আছে জেনেও কিছু করতে পারলো না আক্রমণকারীর দল। তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরিই আছে। শুধু বন্ডদের একবার দেখতে পেলেই হল। রাগের চোটে জলের উপর চাবুক মারতে মারতে চলে গেল ওরা।

একটু পরে বন্ডকে দেখা গেল। মুখটা জলে ভেজা হাতে রিভলবার।

বাঁশের নলটা জলে ভেসে উঠেছে। হানি আর কোয়ারেল এখনো জলের তলায়। তবে ঠিক আছে, বন্ড হাত দিয়ে ওদের ছুঁয়ে বুঝে নিয়েছে সেটা। কিন্তু কুকুরগুলো জল ছেড়ে ওঠেনি। জলের খোলা জায়গাগুলো ওদের মনে সন্দেহ তৈরি করেছে। হ্যাঁ ঠিক তাই। জলের নীচে সাবধানে নিশ্বাস নিতে হচ্ছে। কিন্তু কালো একটা বিশাল দেহ হঠাৎ বন্ডের মুখের সামনে। একটা রাইফেলের কুঁদোও জলে ঢুকেছে। ব্যাস বন্ড এর দ্রুত সিদ্ধান্ত। রিভলবার হাতে উদ্যত। কোনো আক্রমণ হানবার আগেই সেটা গর্জে উঠল, সামনে দাঁড়ানো একটা বিশাল কদাকার বুকের পাঁজর ভেদ করে ফেলেছে সে। আরে এটা সেই চিনে নিগ্রো, গামবুট পরা, উলটে গেছে জলের উপর, রক্তে ভেসে গেছে শরীর, চোখ উলটে গেছে।

আর দেরি নয়। হানি আর কোয়ারেল তৈরিই ছিল। বন্ড বলল, “অন্য কোনো উপায় ছিল না, কিছু মনে কোরনা।” এবার সুড়ঙ্গ দিয়ে পেরিয়ে তিনজনে ছুটলো খোলা নদীর দিকে।

গুলিতে ঝাঁঝেরা লোকটির শরীর ঝোপের মধ্যে আটকে গেছে। ভালোই হয়েছে। তার মৃতদেহ খুঁজতে তো ওরা আসবে। সঙ্গে হয়তো কুকুরগুলো থাকবে। হানি যেন একটু মনমরা হয়ে গেছে যদিও বন্ডের সঙ্গে একটা যেন ভাব হয়েছে। সে জানতে চাইলো এই সব কেন হল? পাখির খোঁজ করতে রিভলবার নিয়ে বন্ড কেন এসেছে? তবে কি সে পুলিশের লোক?

বন্ডের উত্তর হল এ সব ব্যাপারে আলোচনা পরে হতে পারে। তবে এটা ঠিক যে বন্ডদের খুন করার জন্য একদল লোক অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এখন ঘড়িতে প্রায় পাঁচটা। সূর্য অস্ত চলে যাচ্ছে। “পাখিওয়ালাদের তাঁবুটা কতদূর?” বন্ডের প্রশ্ন। “তা প্রায় এক ঘন্টার পথ” হানি জানিয়ে দিল। এখানে লুকিয়ে থাকা যেতে পারে। তবে সেই ড্রাগনটা কাছাকাছিই থাকে আর জলের উপর দিয়ে যেতে পারে। এবার কোয়ারেল এসে হাজির। একটা রাইফেল পাওয়া গেছে। ওই মৃত নিগ্রোটীর কাছ থেকে। একটা রেসিংটন কারবাইন ৩০০। এগুলো সাধারণত সেনারা ব্যবহার করে।

যাই হোক শত্রুপক্ষ ভয়ংকর ধড়িবাজ। কখন আক্রমণ হানবে বলা মুশকিল। ওরা চলতে শুরু করল পাহাড়ের তলা দিয়ে। সঙ্গে খাবার এখনো আছে। ভেজা পাঁউরুটি পনির আর নোনা মাংস। বন্ডের মাথায় এখন চিন্তার জট। কাজ তাড়াতাড়ি করতে হবে, মেয়েটা সঙ্গে রেখে নিরাপত্তার কথাও ভাবতে হচ্ছে। আবার আগের স্থানে ফিরে যেতে হবে। তবে মি. এমকে একবার এই সময়ে কাছে পেলে হত। “সূর্যের আলোয় জুটিভোগ” না মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা সেটা বুঝে যেতেন ভদ্রলোক।

কোয়ারেল হঠাৎ থেমে গেল। তার দৃষ্টি জলাভূমির দিকে। সেখানে দুটো গভীর দাগ। হান বলল যে ড্রাগনটা এখান দিয়েই গিয়েছিল। বন্ড একটু এগিয়ে গেল। দাগটা গাড়ির চাকারও হতে পারে। দেখা গেল একটা ঝোপ যেটা একেবারে পুড়ে গেছে। সবই অদ্ভুত লাগল বন্ডের। ছাপটাও দিঘির দিকে গিয়ে মিলিয়ে গেছে।

এবার দেখা গেল একটা খড়ের কুটিরের ধ্বংসের চেহারাটা। দুদিকে জলের গণ্ডী দিয়ে সুরক্ষিত। রাত কাটানোর পক্ষে ওটা হয়তো ভালোই হবে।

দূরে দিঘির জল স্নান করার পক্ষে ভালো। অস্ত্র নদী আর জলাভূমির কাদার গন্ধ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

তবে এই বাইডাব পরিবার অনেক আগে রীতিমতো নামকরা ছিল। এদের এক পুরুষ ক্রমওয়েলেব কাছ থেকে বো ডেজার্টের জমিটা পান। যাই হোক ওই ধাই মাই হানিকে পড়াশুনা খানিকটা করিয়েছেন। হানিকে এক সময়ে অতীব সুন্দর দেখতে ছিল। পুরুষরা চাইত ওর সঙ্গে প্রেম করতে।

বন্ড এতক্ষণ শুনছিল, বলল, “তুমি তো এখনো সুন্দর”। হানি — “না না মোটেও না, দেখছ না আমার নাকটা কীরকম চেপটা।”

বন্ড — “যাক্গে, তোমার কথা বল।” হানি দেখে আমাদের বাড়ির চারিদিকে আখের খেত। আর আখ মারাইয়ের সময় বেজী, সাপ, এরা ঢুকে পড়ে বাড়িটার আশেপাশে। একটা সময় এল যখন আমি এদের সঙ্গে মিশে গেলাম, সময়মতো খেতে দিতাম, হাতে নিয়ে আদর করতাম, অনেক সময় সাপ গলায় বুলিয়ে ঘুরতাম। তাই ডাইনী বলে আমার একটা বদনামও ছিল। মানুষজনদের সঙ্গে আমার খুব একটা পরিচয় ছিল না, তবে ধাইমাকে খুবই ভালো লেগেছিল।”

একটু থেমে হানি একটু দম নিয়ে নিল। জীবনের পনেরোটা বছর ভালোই কেটেছে যখন বাবা মা ছিল। এরপর একটা আঘাত এসেছিল যেটা এখনো মনে আছে হানির। ম্যান্ডার নামে একটা লোক খেতের মালিকদের ওভারসিয়ার হিসাবে কাজ করত। হানি তাকে পাত্তা দিত না। কিন্তু একদিন সুযোগ বুঝে হানির উপর পাশবিক অত্যাচার করে চলে গেল। হানির ইঞ্জন্স লুটের আগের লড়াইয়ে হানি পালটা আঘাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারে নি। পালটা মার খেয়ে তার নাক দিয়ে রক্ত বেরোল। হানি প্রায় সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছিল। ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে অবশ্য সেই দুর্নাম থেকে বেঁচে গিয়েছিল। এবার প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। “ব্লাক উইডো” নামে এক ধরনের বিষাক্ত মাকড়সা যোগাড় করে একদিন সেই শয়তানের বাড়িতে হানা দিল হানি। লোকটা উলঙ্গ হয়ে আবারে নিদ্রায় মগ্ন। আকাশে চাঁদ ছিল না। আন্তে করে মশাবু তুলে ভেতরে ছেড়ে দিল সেই ভয়ংকব মাকড়সাগুলোকে। ব্যাস, কয়েকদিনের অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে লোকটা খতম।

তারপর এই ভাবেই জীবনটা কেটে যেতে লাগল। কিন্তু বিশ্বকোষ পড়ে হানি আগেই জেনেছে বিনুক সম্পর্কে। এদের নিয়ে কাজ করতে করতে এক সময় ব্যবসা শুরু হয়ে গেল। ফর্মালিন দিয়ে বিনুকের গন্ধ দূর কবে তাদের নতুন রূপ দিল। পাঠিয়ে দিল মায়সিতে খরিদদারের কাছে। আর এইভাবেই বেশ কিছু পাউন্ড রোজগার করে ফেলল।

এবপরই ত্র্যাব-কী তে আসা। দু একটা বিনুক বেঙনি রঙের দেখতে, পাঠিয়ে দিল সে মায়সিতে, প্রত্যেকটা বিনুক পাঁচ ডলার তাকে এনে দেবে। বন্ডকে এখানে দেখে সে ভেবেছিল বোধ হয় আর একজন তার ব্যবসায় ভাগ বসাতে এসেছে। আর বন্ড বোধ হয় ডক্টর নো-এর কর্মচারী হবে। সে ধারণা অবশ্য এখন আর নেই।

কিন্তু তারপরে? এর পরের জীবনটা দেহের রূপ বিক্রি করে কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল হানি। সে জানে রূপ বিক্রি করে পুরুষদের কাছ থেকে অনেক টাকা পাওয়া যায়। আর এই ধরনের মেয়ে পৃথিবীতে অনেক আছে। আর তারপর যদি সম্ভব হয় একটি বিয়ে করবে হানি আর ঘর সংসার করে বো ডেজার্টে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে। এসব শুনে বন্ড যেন আহত হল। বলল, “না না ওই কাজ মোটেও ভালো না। এই পেশায় সম্মান নেই। আছে পুলিশের ভয়। আইনের ভয়। তবে হ্যাঁ টাকার অভাব নেই — এই পেশায়। আমার মনে হয় তুমি জীবজগৎ পোকামাকড়ের জীবন নিয়ে যে জ্ঞান লাভ করেছ সেটা কাজে লাগাও। হয়তো একটা চাকরি পেয়ে যেতে পারো জ্যামাইকা ইন্সটিটিউটে। আর ওই সুন্দর শরীরটা নষ্ট করার দরকার নেই। একজন ভালো বর তোমার জুটে যাবে।” হানি বলে, “ওসব কথা বইয়ে লেখা থাকে।” বন্ড — ওঃ এখন ঘুমাও, পরে কথা হবে।

জায়গাটা প্রায় নীরব। একটু ঠান্ডা পড়েছে। বন্ডের চিন্তা হল কী কবে মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়। ওর ভাঙা নাকটার জন্য একজন সার্জেন এর কাছে যাওয়া দরকার। একটা চাকরি আব থাকার একটা জায়গার ব্যবস্থাও করতে হবে হানির জন্য। তবে হানির দেহের প্রতি বন্ডের আকর্ষণে তাহলে কী হবে? হঠাৎ হানিব গলাব স্বর, “কিগো ঠান্ডা লাগছে না, আমাব ব্যাগে ঢুকে পড় না।” বন্ড -- ওঃ না, তুমি আরামে ঘুমাও। চিন্তা কোরনা। জ্যামাইকা ফিরে গিয়ে সব হবে। হানি, তাই! বেশ তাহলে কথা দিচ্ছ বন্ড? “হ্যাঁ কথা দিলাম। হানি তাহলে শুভরাত্রি প্রিয় জেমস।” “জেমস শুভরাত্রি প্রিয় হানি।”

॥ বারো ॥

এবার সেই ভয়ংকর ব্যাপারটা ঘটে গেল। কোয়ারেল এসে জানাল একটা সাংঘাতিক ধরনের জিনিস জলে ভেসে তাদের দিকে আসছে। কী ওটা? বন্ড সাহসী লোক, বলল, “ভেবোনা, তৈরি হয়ে যাও রাইফেলটা নিয়ে। আমি আর হানি এদিকটা আছি।”

কিন্তু কী ওটা? জ্বলন্ত একটা দানব যেন আগুন জ্বলে এগিয়ে আসছে। তবে এটা ড্রাগন নয়। এটা একটা এঞ্জিন যার মুখে আগুনের শিখা লকলক করছে। চাপা একটা গর্জন করছে।

কিন্তু বন্ডদের পালাবার উপায় নেই। মাটির তলায় গর্ত করে ঢুকে গেলেও প্রাণ বাঁচানো যাবে না। অতএব লড়ে যেতে হবে।

এবার দানবটা পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে গেছে। নীল আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। ভয়ে কঁকড়ে গেছে হানি। এবার গুলি মারতে শুরু করল বন্ড আর কোয়ারেল। বুলেটগুলো যন্ত্রটার মাথায় আঘাত করে নিজেরাই টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে গেল। দানবটা এবার একেবারে সামনে এসে একটি প্রকাণ্ড আগুনের শিখা ছড়িয়ে দিল কোয়াবলের দিকে। বন্ড আরো কয়েকটি গুলি চালাল। যা কিছুই হল না।

লাউডস্পিকারে শোনা গেল একটা কথা “এই ইংরাজের বাচ্চা, তাড়াতাড়ি চলে আয়। আর এ মেয়েটাকেও আনবি। বেশি সময় দেবোনা। দেরি কবলে নবকে পাঠিয়ে দেব কয়েক সেকেন্ডে।” ব্যাস বন্ডের আর কিছু করার নেই। এক চিনে নিগ্রো বেরিয়ে এল। হাতকড়া পরিয়ে বন্ডের হাতে। বন্ড যেন কী ভাবছিল? ও হ্যাঁ, ত কোয়ারেলকে বিদায় দিতে হবে। বন্ড এক মিনিটের জন্য ছেড়ে দেওয়া হল। মৃত কোয়ারেলের মুখের কাছে বসে বন্ড প্রার্থনা করল, একটু বালি ছড়িয়ে দিল মুখে।

আর দেরি নয়। হানি আর বন্ড এখন সেই ভয়ংকর দানবটার ভেতরে বসে পড়েছে। চারিদিকে তেলের আর ঘামের গন্ধ। বন্দুকধারী লোকটা ড্রাইভারের পাশে বসল। বলল, “চলো স্যাম, যাওয়া যাক।” ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। চলতে শুরু করল সেই দানবটা। ভয়ে হানির ঠোঁট দুটো ফ্যাকাশে দেখাল।

এরা কোথায় নিয়ে চলেছে বন্ড আর হানিকে। ডক্টর নো-র কাছে বোধ হয়। এই লোকগুলো খুদে গুণ্ডা ছাড়া কিছু নয়। আর ডক্টর নো-ও কি এদের মতন? মনে হয় না, বন্ড ভাবলো। দুটো লোক ওদের পিছনে বসে আছে। পাহারা দিচ্ছে, তবে বন্ডদের পালাবার কোনো রাস্তা নেই। জলে ঝাঁপ দিয়েও হবে না।

কিন্তু যে ভাসমান যানে ওরা চলেছে সেটা আসলে কী? বন্ড এখনো সেটা বুঝে উঠতে পারে নি। এটা ট্র্যাক্টর জাতীয় একটা কিছু। চাকাগুলো বিশাল শক্ত রাবারের তৈরি। ইঞ্জিনটা একটা গম্বুজের মতো। সোনালি কালো লোহার ডানা লাগানো। ভয় দেখানো আর আগুন লাগানোর ব্যবস্থা আছে এতে। বোধহয় ঝোপঝাড়, জলাভূমির উপর দিকে অনায়াসে যেতে পারে এটা।

মানতে হবে এটা অদ্ভুত ধরনের জলযান এটা। বন্ড চিন্তিত। একবার ডক্টর নোর কাছে পৌঁছলে কী হবে? জীবন নিয়ে ফিরে আসা যাবেনা সেটা ঠিক। কথার জাল বিস্তার করেও ফল হবে না। আর হানিকে প্রাণে না মেরে কারো রক্ষিতা করে রেখে দেবে। অনেকক্ষণ হল জলযান চলছে। এবার বোধহয় গন্তব্যের কাছে এসে গেছে ওরা। ভোর হয়ে আসছে। বাইরের গরম হাওয়া আর মার্স গ্যাসের পচা গন্ধ আসছে। কোয়ারেলের কথা ভেবে বন্ডের মনটি খারাপ হয়ে গেল। বেচারী সাহস করে লড়ে গেছে। বন্ডের সম্মান রেখেছে। কিন্তু বন্ড যেন কথা রাখতে পারে নি।

এবার জলযান থামল। লাউডস্পিকারে বলা হল, “সব ঠিক আছে। একটা ইংরেজ আর মেয়েটাকে ধরা হয়েছে। অন্য লোকটা মারা গেছে। দরজা খোল।” দরজা খোলার একটু পরেই কয়েকটা রক্ষ হাত বন্ডের কাঁধ ধরে হেচড়ে দাঁড় করাল সিমেন্টের মেঝের উপর। বন্ডের হাত দুটো বাঁধা। ক্ষমতা থাকলে বন্ড হয়তো ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু সঙ্গে আছে হানি। তার কোনো ক্ষতি সে চায় না। “গলাটা গভীর করে বন্ড ওই সব পাহারাদার রিভলবারধারী লোকগুলোকে বলল, আশা করি আপনাদের মাথায় বুদ্ধি আছে, দেখবেন হঠাৎ যেন রিভলবারের গুলি বেরিয়ে না আসে। আর বেশি বাড়াবাড়ি কোরনা। ডক্টর নো-র সেটা পছন্দ নাও হতে পারে।”

বন্ডের মুখে ডক্টর নো-র নামটা শুনে চমকে গেল ওরা। কেমন যেন দুর্বল স্বরে বলল, “না না সেই রকম কিছু করবো না। আপনি ঠিকই বলেছেন।” লোকগুলোর সঙ্গে এবার বন্ড আর হানি একটা লম্বা ঘর পেরিয়ে যেখানে পৌঁছল সেখানে একটা দরজা। কলিংবেল টিপতেই খুলে গেল। দেখা গেল একটা কাপেট বিছানো লম্বা গলি। এবার ক্রিম রঙের একটা দরজায় টোকা মারতে হল। এবার যা দেখা গেল সেটাই বোধ হয় রিসেপসন রুম।

॥ তেরো ॥

এবার এক বিচিত্র পরিবেশের সম্মুখীন বন্ড। রিসেপসন রুমটা যেন কোনো বিশাল শিল্প সংস্থার সভাপতির ঘর। এখানে ঢুকে মনে হল যেন নিউইয়র্কে এসে পড়েছে তারা। ঘরটি লম্বায় প্রায় কুড়ি বর্গফুট। লাল কাপেটে ঢাকা মেঝে। দেয়ালে নাচিয়ে মেয়েদের ছবি। আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতির আলোয় আলোকিত ঘরটা। বন্ডরা একটা মেহগনি কাঠের ডেস্কের কাছে বসে। এবার দুজন মহিলাকে দেখা গেল। রীতিমতো সুন্দর করে সেজে আছে তারা। ডেস্কের এখানে ওখানে দামি ইন্টারকমের ছড়াছড়ি।

এদের নাম সিস্টার লিলি আর সিস্টার রোজ। সিস্টার লিলি বলেন— সিগারেট খাবেন? এগুলো আমেরিকান বোলায়ার্ম আর ওগুলো টার্কিশ।” কিন্তু বন্ডের হাত বাঁধা দেখে বলে উঠলেন, “আরে দূর ওই লোকগুলো যে কী করে? এবার একটু আপশোষ করতে করতে চাবি দিয়ে দুজোড়া হাতকড়া খুলে ফেললেন। হানিচাইল বসে আছে একটা চেয়ারে। ভয়ে সে হাতলে হাত চেপে রেখেছে।

এবার একটা ফর্মে বন্ডের নাম-ঠিকানা লেখার পালা। একটা সিস্টার রোজ লিখবেন, হাতে পেন নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে। বন্ড বলে গেল “লিখন নাম জম ব্রাইস। ঠিকানা কেয়ার অব জুলজিকাল সোসাইটি। রিজেন্টস পার্ক, লন্ডন, ইংল্যান্ড। পেশা— অর্নিথোলজিস্ট (পক্ষী বিশেষজ্ঞ)।

অগমনের কারণ— পাখি — আমি অভাবন সোসাইটির প্রতিনিধি, এই দ্বীপের কিছু অংশ তাদের ভাড়া নেওয়া আছে।”

হানিচাইলকে বন্ডের স্ত্রী বলে পরিচয় দেওয়া হল। হানিচাইল নামটি সিস্টারের ভালো লাগল। এবার একজন নিকট আত্মীয়ের নাম - বন্ড বললে সিস্টার M-এর আসল নামটা। সিস্টার

লিলিব সঙ্গে ওরা দুজন এগিয়ে গেল, নিশাল জায়গাটা একটা দুর্গের মতো। দুই সিঁটারের ব্যবহাব বন্ডের ভালো লেগেছে। এবার গলির শেষ প্রান্তে এসে একটা দরজায় সিঁটার কলিং বেল টিপলেন, দরজা খুলে গেল। এক অতি সুন্দর চিনা মেয়ে, পরনে হালকা বেগুনী বণ্ডের কিমোনো, হেসে অভ্যর্থনা জানালো। মেয়েটির নাম নে। তাকে বলাহল শ্রী আর শ্রীমতী জন ব্রাইস এসেছেন। এরা ক্রান্ত। তাই খাওয়া এবং ঘুমের ব্যবস্থা করতে হবে। নে নামে মেয়েটি হেসে বলল, “চলুন খাবার রেডি আছে, এবাব ওবা এগিয়ে চলল একটা করিডোব দিয়ে, সঙ্গে আছেন লিলি ও নে। এবার দুটো দরজা, ১৪ আর ১৫ নম্বর। ১৪ নম্বরটা খুলে গেল। দেখা গেল একটা জোড়া বেডরুম, আয়াসী স্টাইলে তৈরি সবুজ রঙের দেওয়াল, মেহগনী রঙের মেঝে, আর একটা বিলাসবহুল বাথরুম। বন্ডের চোখ অবশ্য একটা জিনিস এড়ায়নি। ঘরে জানালা নেই আর ভেতরের দিকে দরজায় হাতল নেই। এবার একটা মেয়ে খাবারের ট্রে নিয়ে ঢুকলো। এবাব সিঁটার লিলির চলে যাবার সময় বললেন কোনো অসুবিধা হলে বলবেন। ডক্টর নো-র সঙ্গে ইচ্ছে করলে নৈশভোজ করতে পারেন। উনি খুশি হবেন।” এটা শুনে বন্ড খুব খুশি, বলল, “জানিয়ে দেবেন ওনার সঙ্গে নৈশভোজে এক সঙ্গে থাকতে পারলে আমরা বাধিত হব।”

হানি চাইলের জড়তা এখনো কাটেনি। বন্ডের মনে হল মেয়েটা এই সব দেখে একেবারে চমকে গেছে। বন্ড বলল, “হানি জামাকাপড় বদলে, খাওয়া দাওয়া সেরে নাও। ওগুলো গরম আছে আর দুশ্চিন্তা ছাড়ে।”

হানি একটু হাসল জানতে চাইল ওরা কোনো ফাঁদে পড়ে গেল নাকি? ‘হতে পারে’ বন্ডের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ঘরে একটা বড়ো আলমারি। ওটা খুলতে চোখে পড়ল কয়েকটি সিল্কের এবং সুতির কিমোনো। বাথরুমটাও অসাধারণ, আছে লাইম বাথ এসেন্স আর মেয়েদের জন্য বাথকিউব, আয়না, টুথব্রাশ ও পেস্ট রাখার জায়গা লোশন, ইলেকট্রিক শেভার, আরো কত কি?

এই ঘরের পরিবেশটা এখন একটু অন্য রকম। দুই যুবক যুবতি অর্থাৎ বন্ড ও হানি একে অপরকে জাপটে ধরল। কামনার আশ্রয় ওদের চোখে। উৎকট যৌন চিন্তায় একে অপরের দেহকে চুমু খেতে শুরু করেছে। মেয়েটার বুক দুটোকে প্রায় চ্যাপ্টা করে দিতে চাইছে বন্ড। কিন্তু এই সময়ে এ সব করা ঠিক কি? বন্ড যেন নিজেকে জিজ্ঞেস করল। হানি কিন্তু বন্ডকে উত্তেজিত করেই চলেছে। কিন্তু না। আগে বাঁচতে হবে। তারপর ওসব।

জোর করে হানিকে বাথরুমে ঢুকিয়ে বন্ড বলল, “হানি বাড়াবাড়ি হচ্ছে, মন সেরে নাও চটপট। মাথাটা ঠান্ডা করে বন্ড এবার ঘরটা ভালো কবে দেখল। দরজাগুলো হালকা ধাতুর তৈরি। একগাদা কলিং বেল। বেল বাজালেই পরিচারিকা এসে যাবে। হয় খাবার দেবে নয়তো কোনও কাজ করে দেবে। এ এক এলাহি ব্যাপার।

বন্ড এবার খাবার টেবিলে বসল। বাটিতে রাখা আছে খাবার— গ্রীল্ড কিউনি, ইংলিশ সসেজ, ডিম ভাজা, গরম রুটির টোস্ট, স্ট্রবোরি জ্যাম আর কফি।

বাথরুম থেকে মন সেরে বেরিয়ে এসেছে। মুখে একটা হাসি। বন্ডের দিকে তাকিয়ে একটা রসিকতা করতে করতে ড্রেস করার জন্য এগিয়ে গেল। নতুন পোশাকে হানিকে দারুণ দেখাচ্ছে। বুকের খানিকটা খোলা জায়গা দেখা যাচ্ছে। চুলগুলো ফুলিয়ে কাঁধের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে। বন্ড খানিকটা অবাধ হয়ে দেখলো, বলল, “তোমার দেহের খোলা অংশগুলো ঢেকে দাও হানি। এখন এসব করার সময় নয়।

চমৎকান বামা হয়েছে। খাবার খেতে আবস্ত করল হানি। বন্ড আব দেরি না করে বাথরুমে ঢুকে পরিষ্কার হয়ে নিল। একটু পরেই জোর ঘুম এল। বিছানায় বসতে না বসতেই চোখ জুড়ে এল। হানিও গুয়ে পড়েছে একটু আগে। বন্ড বুঝল ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হয়েছে ওদেরকে।

এবার এক অদ্ভুত দৃশ্য, এক আগন্তুকের আগমন। কৃষ্ণকায় লম্বা চেহারা বুকের মধ্যে সুইচ লাগানো, টিপতেই জ্বলে উঠলো। লোকটা এগিয়ে গিয়ে হানির চাদরটা সরিয়ে ওর নগ্ন দেহটাকে ভালো করে দেখে নিল। এর হাতটা ইম্পাতের তৈরি একটা কৃত্রিম হাত। এবার সে এগোলো বন্ডের দিকে। এবার কতকগুলি ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করল লোকটা যেমন বন্ডের হৃদস্পন্দনের গতি, বাহু ও উরুর স্ফীতি, হাতের তালু এবং বেথা ইত্যাদি। এবার ইম্পাতের হাতটা বন্ডের চাদর ঢেকে দিল। ঘুমন্ত বন্ডকে একটু দেখে এবার বেরিয়ে গেল সে।

॥ চোন্দো ॥

ক্রম কীতে গরম বাতাস এখন আর নেই। পাখির দল ঝাঁকে ঝাঁকে এসে মাছ খাচ্ছে, গুয়ানো ছড়াচ্ছে যা থেকে সেবা সার তৈরি হয়। পাখির ডিম থেকে আবার নতুন পাখি জন্ম নিচ্ছে।

পাহাড়ের নীচে নিগ্রো শ্রমিকেরা কাজ করছে। স্ত্রী ও পুরুষ সবাই আছে।

দিনের শেষ একটা ট্রাক একেবেঁকে চলে গেল কারখানার দিকে।

কালকের দিনটা ছুটি। অতএব ফুটি হবে। থাকবে খাবার আর অনেক পরিমাণে মদ। নাচও হবে। বাড়াবাড়ি হলে একটু মারপিট হবে। ঝরবে রক্ত। তারপর আবার সব শান্ত।

বন্ডের ঘুম ভেঙেছে। হানি আগেই জেগেছে। কিমোনো গায়ে তাকে অসাধারণ দেখাচ্ছিল। হানিকে কাছে পেয়ে বন্ড তাকে জড়িয়ে ধরল। “একটা নখ পরিষ্কার করা বন্দোপেলে ভালো হোত। ডক্টর নো এর সঙ্গে দেখা করতে হবে, এটা তো যে সে ব্যাপার নয়” বলল মেয়েটা। বন্ড ভাবছে অন্য কথা অর্থাৎ একটা কাঁচিও যদি পাওয়া যায়। খালি হাতে কাজ হবে না। বন্ডের চোখ পড়ল একটা খাদ্য তালিকাতে — নিউইয়র্কের শ্রেষ্ঠ খাবারও এখানে পাওয়া যায়।

এবার দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকল সেই মেয়েটা যার নাম মে। সঙ্গে আরো দুটো চিনে মেয়ে। সে জানতে চাইল নৈশভোজে বন্ড কী খাবে। বন্ড দ্রুত বলে দিল তার মেনুটা — অর্থাৎ তার পছন্দ হল গ্রিল করা মাংস, ক্যারিভিয়ের, মাংসের কাটলেট, স্যালাড ইত্যাদি। হানি চাইল কিছু চাইল না। তার জন্য অবশ্য থাকবে তরমুজ মুরগির রোস্ট আর ভ্যানিলা আইসক্রিম। মে বলল “ডক্টর নো জানতে চেয়েছেন আটটা নাগাদ আপনারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন কিনা।” “হ্যাঁ পারবো” বন্ড উত্তরে জানাল।

হানি চাইলের সাজ পর্ব শেষ হয়েছে। ম্যানিকিওরিস্ট এসে তার কাজ করে দিয়েছে। একটা নতুন কিমোনোতে হানিকে দারুণ দেখাচ্ছিল। বন্ড একটা গ্লাসে বুরবোঁ আর সোডা ঢেলেছে। যথা সময়ে দরজায় টোকান আওয়াজ। হ্যাঁ এবার বন্ডদের যাওয়ার সময় হয়েছে। একটা লিফটে উঠল ওরা। লিফটা প্রায় যেন দুশো ফুট নীচে নেমেছে। একটা আওয়াজ করে থেমে গেল। এবার একটা বিশাল ঘর। বইয়ে ভর্তি। লাইব্রেরি নাকি? নাতো এটা কি একটা অদ্ভুত জায়গা। ঘরের মাঝখানে ডেস্ক আর টেবিল। সবুজ কার্পেটে ঢাকা মেঝে। সাইডবোর্ডে লম্বা কাঁচের দেয়াল। ভেতরে রূপালি মাছ খেলছে। একি আকাশ দেখা যাচ্ছে কেন? সামনে মনে হচ্ছে সমুদ্র। হ্যাঁ আপাতত ওরা সমুদ্রের কুড়ি ফুট গভীরে।

দুজনে রীতিমতো চমকে গেছে। সমুদ্রের ভেতরের দৃশ্য মনে হচ্ছে টর্নেডোর মতো একটা হাঙরের লাফালাফি দেখা যাচ্ছে। এবার একটা তীব্র আলো এসে পড়ল। সোনালি পুঁতির মতো দুটো চোখ দেখা গেল। হঠাৎ হাঙরটা ঘুরে গিয়ে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

সার্চলাইট দুটো নিভে গেছে। এ এক বিচিএ ঘর যেখান থেকে সমুদ্রের ভেতরটা অনেকটা দেখা যায়। কী অসাধারণ কারিগরিবিদ্যায় এটা তৈরি। এখানে বসে সমুদ্রের জগৎকে রাতে ও দিনে কি একই রকম দেখায়। বন্ডের জানা নেই। ওরা ভাবতেই পারছেন। এই দ্বীপে এ রকম একটা জায়গা। কী ভাবে হল? পাহাড় কেটে, তারপর আস্তে আস্তে সমুদ্রের জল পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে? কে জানে!

হঠাৎ একটা বুক-কাঁপানো গলার স্বর। কে যেন বলল “দশ লক্ষ ডলার।” বন্ড ঘুরে দাঁড়াল। হ্যাঁ ইনিই ডক্টর নো। মুখে একটা মৃদু হাসি।

ডক্টর নো— “কী ভাবছেন? কত খবচ হয়েছে এটা করতে?”

বন্ড “আজ্ঞে হ্যাঁ তাই।”

নো— “এখানে এলে সবাই এটাই আগে ভাবে।”

এনার চেহারাটা অদ্ভুত। হাঁটে না ভেসে বেড়ান বোঝা মুশকিল। লম্বাটে মুখ। পেটানো চেহারা, কেশহীন মাথা, বন্ডের চেয়েও লম্বা। ভাবলেশহীন মুখ, চোখ ছোটো ও ভয়ংকর।

এবার একটা চমক। একটু থেমে ডক্টর বললেন, “করমর্দন করা যাবে না। আমার কিন্তু একটা হাতও নেই।” হঠাৎ এক জোড়া ইম্পাতের সাঁড়াশীর মতো দুটো জিনিস বেরিয়ে এল ওনার জামার হাতা থেকে এবং আবার যথাস্থানে চলে গেল।

হানি ও বন্ড নিজেদের বুক ধড়ফড়ানির আওয়াজ শুনতে পেল। এবার নো সাহেব চৌবাচ্চার মাছগুলির কথা বললেন, শুনে বন্ডও খুশি হল। একটু থেমে বললেন, “অনেক কথা আছে। চলুন বসা যাক।”

ওরা তিনজনে তিনটে চেয়ারে বসল। নোর নিগ্রো দেহরক্ষীরা পিছন দিকে ঘোরাফেরা করছে।

ডক্টর নো— কী পানীয় আপনার চাই বন্ড? আমার এক গ্রাস রাশিয়ান বা পোলিশ ভদকা হলেই হবে। আর হানি চাইলের জন্য কোকাকোলা হলেই হবে। যথারীতি এগুলো এসে গেল। ডক্টর নো এবার একটু গম্ভীরভাবে জানালেন— “দেখুন এই পৃথিবীতে উঁচু আশা থাকলে সব হয়। সাধারণ ছোটোখাট ইচ্ছায় বিশেষ কিছু করা যায় না। আমার এইটাই ধারণা। আপনার কী মনে হয়?”

বন্ড— আজ্ঞে ব্যাপারটা ঠিক তাই। আরো গণীয় এল। হঠাৎ নো সাহেব চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন— “গুপ্তচর বিভাগের মি. জেমস ব ড আসুন আমরা গোপনীয় কথা বলি। আমি কিছুই লুকাবো না।” আব আপনিও সত্যিই বলবেন কেমন? মিথ্যা বললে,— হঠাৎ সেই ইম্পাত দুটো বেরিয়ে এল। নিজের কপালে ওগুলো ঠোকিয়ে বললেন ডক্টর নো— এ দুটো মস্তকের চেয়েও শক্তিশালী জানেন। কোনো ধাপ্পাই চলবেন। “আসি কেমন, নটার সময় নৈশভোজে দেখা হবে।”

॥ পনেরো ॥

বন্ড পানীয়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে মনকে শক্ত করে নিয়েছে। একটা মহা সেয়ানার সঙ্গে লড়াই হবে। হানি চুপ থাকুক। তবে হ্যাঁ সত্যিই কোনও বানানো গল্প কাজে আসবে না।

বন্ড বলল- - “দেখুন ডক্টর নো - হতে পারে আপনি এক শক্তিশালী মানুষ। হাত না থাকলেও আপনি কিছু করতে পারেন আপনি কনটাক্ট লেন্স, পরেন, ওয়াকিটকি ব্যবহার কবেন। কিন্তু এসব ব্যাপার আমাদের মুগ্ধ করে না। আমি তো আপনার গুয়ানো কারখানার একজন শ্রমিক নই, এটা ভুলে যাবেন না আশা করি।”

ডক্টর নো একটুও ঘাবড়ালেন না বরং একই স্বরে বললেন. “আপনার সাহস আছে মি. বন্ড। তবে আমার সব কিছুই ভেলকি ভাববেন না, দুর্ভেদ্য বস্তুকে ঘায়েল কবার অস্ত্র আমার হাতের মুঠোয়। যাই হোক মন দিয়ে যদি শোনেন তাহলে বিচিত্র এক মানুষের কথা বলব আপনাকে।”

বন্ড — “সে যাই হোক। এখন এই হানি যে আমার স্ত্রী নয়. ওকে পাঠিয়ে দিন ওর বাড়িতে। এ বেচারী কিছুই জানে না। শামুক কুড়োয় আর আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল। আপনার লোকেরা ওর নৌকা ভেঙেছে সেই জনাই আমার নৌকায় আসতে বাধা হয়েছিল।”

নো— কিন্তু আমার দ্বীপে এলে বেরোতে পারবে নাতো। কাউকে ছেড়ে দেয়া আমার নীতি নয়।

বন্ড— “যা ইচ্ছে তাই করুন। আপনি নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বা ইংল্যান্ডের রাজার মতন শক্তিশালী ভাবেন। এ এক ধরনের পাগলামি।”

নো— “আরে এদের ক্ষমতা কতটুকু? এদের ক্ষমতা এক সময়ে তো শেষ হয়ে যায়। আর আমার ক্ষমতা এদের চেয়ে অনেক বেশি।

আমার উপর এখানকার লোকের প্রাণ নির্ভর করে। বন্ড -- “আপনার ক্ষমতালিপ্সা একটা মায়া।”

নো— “সবই মায়া। সৌন্দর্য, মৃত্যু সবই। আর এসব ব্যাপারে আমার পড়াশুনা আপনার চাইতে ঢের বেশি জানবেন। তাই বলছি আসল কথা শুনুন।

বন্ড — “স্টালিনও লোকের মৃত্যুদণ্ড ঠিক কবতেন।”

নো — “হ্যাঁ তাই। আমার ক্ষমতা স্টালিনের চেয়ে কম নয়।”

বন্ড — “যাক গে শুরু করুন আপনার কথা।”

নো এবার তার কথা শুরু করলেন— “আমি ছিলাম একজন জার্মান ধর্মযাজক। এক চিনা মহিলার সন্তান। জন্ম পিকিং এ। দারিদ্র্যের মধ্যে মায়ের এক পিসিমা আমায় বড়ো করে তোলেন। বুঝতেই পারছেন ভালোবাসার স্বাদ আমি পাইনি। সাংহাইতে জীবিকার জন্য গিয়ে চুরি খুন, সম্পত্তি লোপাট ইত্যাদিতে হাত পাকালাম। এ ব্যাপারে কুখ্যাত টং দলের কাছে আমার হাতেখড়ি। এরপর আমার আগমন নিউইয়র্কে। আমার কাছে ছিল একটা অদ্ভুত সাংকেতিক পরিচয়পত্র যেটা “হিপসিং” নামে আরেকটা দলের উদ্দেশ্যে লেখা।

এরপর একটা সময় এল যখন আমি প্রায় দশ লাখ ডলার কামিয়ে নিয়েছি। কিন্তু শীঘ্রই দাঙ্গা লাগল। টংদের গৃহযুদ্ধ। টং, হিপ সিং আর অনলী সঙ নামে একটা দল এতে জড়িয়ে পড়ল। পুলিশের হানা শুরু হল। আমি লুকিয়ে গেলাম হার্লেমে। কিন্তু দলের সর্দাররা আমাকে খুঁজে বার করল। আমার হাত দুটো কেটে দিল। বুকের বাঁ দিকে গুলি চালাল। কিন্তু আমার হৃৎপিণ্ড ছিল বুকের ডানদিকে। ইচ্ছাশক্তির জোরে বেঁচে গেলাম। ডাক্তার বা অপারেশনের সাহায্য বিশেষ লাগেনি।

কথা বলতে বলতে নো সাহেব কেমন যেন হয়ে গেলেন আর বন্ড ভাবলো এখনই একে যদি একটা মরণ আঘাত দেওয়া যায়। কিন্তু বোধ হয় বুঝে ফেলেছেন ব্যাপারটা বললেন মি. বন্ড, “আমাকে নিয়ে কিছু ভাববেন না? বন্ড একটু অবাক, বলল ‘না আপনি বলে যান’। নো— এরপর পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান ডাকটিকিট যোগাড় করলাম। যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে, কাজেই ভাবলাম ডাক টিকিটের দাম খুব বেড়ে যাবে। চেহারাটাও বদলে দিলাম। মেরুদণ্ডের ব্যায়াম করে লম্বা হলাম। নিজেকে নাম দিলাম জুলিয়াস। চশমা ছেড়ে কনটাক্ট লেন্স লাগলাম। দস্তানার নীচে মোমের হাত ব্যবহার শুরু করলাম।

এরপর মিলওয়াকর্কতে ডাক্তারি পড়লাম। মানুষের দেহ, মন ইত্যাদি আমার বিষয় হল। জীবনে কষ্ট পাওয়ার ফলে পালটা যার কষ্ট কী করে দেওয়া যায় সেই চিন্তাও এল। আর একটা দুর্বার স্বাধীন হওয়ার ক্ষমতাও বেশি আমার পেয়ে বসল। আর আমার নাম যে নো সেটাব মানে হল কোনো কিছুকেই আমি মানি না।

এরপর আমি ক্রাব কী দ্বীপটা কিনে ফেলি। গত চোদ্দো বছর আমি এখানেই আছি। আর পাখির নোংরার ব্যবসা করে আমি খুবই লাভবান। পাখিগুলার বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না। কেবল বিরক্ত না করলেই হল। কিউবা এবং জ্যামাইকা থেকে বেশি মজুরি দিয়ে মজুর আনালাম। আর মাইনে বাড়াবার প্রশ্ন নেই। দু একজন একটু বাড়াবাড়ি করেছিল, ঠান্ডা করে দিয়েছি। এরপর নিয়ে এলাম একদল চিনে নিগ্রোকে পবিবাব সমেত। কাজ শিখিয়ে দেওয়া হল। এরা এখন খুবই কাজের। দ্বীপের লোকসংখ্যাও বেড়েছে। দু একজন ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতি এল। পাহাড় কেটে বিদ্যাতের লাইন আনা হল। লিফট তৈরি হল। জলের ব্যবস্থা আগেই করা হয়েছিল। একটা ভুয়া শ্যামাটেরিয়াস করেছি অতিথিদের ধাপ্পা দেবার জন্য, যদি কোনো নাবিক বা জ্যামাইকার রাজ্যপাল এসে পড়তে পারেন তাই এসব ব্যবস্থা। প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৃথিবীর যেকোন জায়গা থেকে আনার জন্য জাহাজ আছে। আব মাটির নীচের কাছাকাছি এক সাংঘাতিক একটা দুর্গ বানিয়ে ফেলেছি। যেখান থেকে পৃথিবীতে আমার শত্রুদের ঘায়েল করা কোনো ব্যাপার নয় মি. বন্ড। আর এরপরের অধ্যায়ের জন্য তৈরি আমি। একটু থেমে নো সাহেব আবার শুরু করলেন “দেখুন মি. বন্ড যা ভাবলাম ঠিক তা হল না। পরিষ্কার আকাশে কোথাও একটু মেঘ ছিল। জানেন তো ওই স্পুনবিল পাখিরাই আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করল। ওদের দেখবার জন্যই নাকি বহু লোক এই ক্রাবকীতে আসবে। কাজেই সুযোগ বুঝে অভোবন সোসাইটি এখানে হোটেল খুলবে এবং ক্রাব কীর অনেকটা কিনে নেবে। এই ব্যাপারে আমাকে চিঠিও দেওয়া হল। অভোবন সোসাইটির ভাড়া করা একটা জায়গা আছে এই ক্রাবকীতে। আমার এসব ভালো লাগলো না জানালাম অভোবন সোসাইটির জায়গাটি আমি অনেক টাকায় কিনতে চাই। কিন্তু এ প্রস্তাব ওরা প্রত্যাখ্যান করলেন।

এরপরই আমার মনে অন্য চিন্তা এল। ফ্লোরিডা থেকে “জলাভূমির বগী” আনালাম একটা। এর চেহারাটা একটা রক্তচক্ষু ড্রাগনের মতো করে দিলাম। ভেতর থেকে আগুন ছড়াবার ব্যবস্থা হল। আক্রমণ হানলাম। পাখি মরলো অনেক। মানুষ পালালো। দুটো ওয়ার্ডেনকেও খতম করা হল। আর আতঙ্কে মারা গেল অনেক স্পুনবিল। এবারে বিমানে করে দুজন তদন্তকারী টুকতে এসেছিল এখানে। একটি লরির সঙ্গে ধাক্কাগ বিমান গেল ভেঙে, মরলো সেই দুজন তদন্তকারী। এবার তদন্তে ডেপুটিয়ারে করে এলেন ক্যাপটেন। তার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করে বুঝিয়ে দিলাম ব্যাপারটা অর্থাৎ বিমানটা দুর্ঘটনায় পড়েছিল। আর ওই ওয়ার্ডেন দুটো গরমের চোটে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে একে অপরের কুটিরে আগুন লাগিয়েছিল। ক্যাপটেন ফিরে গেলেন খুশি হয়ে।”

বিবরণ শুনে বন্ড চাপা উত্তেজনায় ছটফট করছিল। এবার বলল, “তাহলে এই আপনার কথা আর স্ট্র্যাংওয়েজকে আর ওই মেয়েটিকেও সরিয়ে ফেলা হয়েছে এ জন্মের মতো’। নো— “হ্যাঁ ওরা এখন মোনা সরোবরের নীচে।

আমার লোকেরা সব কাজে ওস্তাদ। জ্যামাইকায়ও আমার চর আছে। স্ট্র্যাংওয়েজ আর ওই মেয়েটাকে হত্যা করে আমি ঠিক পথেই চলছি। আপনি ধরা দেবেন ভেবেছিলাম। পরে মনে হল আপনি অন্যরকম লোক। তবে আমার র্যাডার ঠিক কাজই করেছে, আপনার নৌকা স্ক্রিনে দেখা গেছে।

বন্দ — “ভুল করছেন মি. নো, ওটা আমার নৌকা ছিল না, ওটা হানি চাইলের।

নো — তাহলে মেয়েটার ভাগ্য খারাপ। ওকে আমি ছাড়ছি না। একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়ে আমার দরকার। আসলে মি. বন্দ মানুষ যা চায় সেটা পায়। যদি সে জানে কী করে পেতে হয়।

বন্দ — শুনুন মি. নো। লন্ডনে আপনার নামে একটা ফাইল খোলা আছে। বিষাক্ত ফল, দানব মাকড়সা এসব নিয়ে কী হচ্ছে তাতে লেখা হয়ে গেছে। মিস চুং আর মিস তারোর নামও আছে ওতে। আর তিন দিনে জ্যামাইকায় না গেলে, ক্র্যাব কীতে অনুসন্ধান শুরু হয়ে যাবে। তবে হানির নিরাপত্তা দরকার। তাই আমার কথা হল মি. নো — আপনি বেশি দেরি না করে প্লেনে করে আপনার ডাকটিকিটের খামটা নিয়ে চলে যান এখান থেকে। কী হল আমি কি ভুল বললাম। বন্দ হেলান দিয়ে চেয়ারে বসল।

॥ ষোলো ॥

খাবার সাজানো হয়েছে। নোর জীবন সত্যিই অদ্ভুত। বন্দ লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাল। আর লাইটারটা বাঁ পাশে চেপে রাখল। লাইটার আগুন জ্বালায়, কাজেই এটা একটা অস্ত্র। বন্ডের মাথায় রক্ত গরম হয়েছে। ভালো খাবার খেয়েও সেটা ঠাণ্ডা হয়নি। পায়ের তলায় নীল কার্পেটে পা দুটো ঘসলো। একটা মওকা পেলে নো-কে যমলোকে পাঠাবে সে। নো-এর কনটাক্ট লেন্স, ইম্পাতের হাত এ সব বারোটা বাজাতেই হবে। এর পর একের পর এক পানীয় এল। বন্দ পান করল নিজেকে সামাল দিয়ে। এর মধ্যে নো-এর বড়ো বড়ো কথা আবার শুরু হয়েছে। বাতের খাবারের পর আরো কিছু আনন্দের খোরাক এই নো-র কাছে আছে। অর্থাৎ মেয়েমানুষ পাওয়া যাবে, কিন্তু একেবারে সাবধান হয়ে গেছে। নো বললেন, “দেখুন মি. বন্দ, আমার চরদের মধ্যে কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে সেটাও বুঝতে পারছেন আমার লাগবে শুধু কয়েকটা মুহূর্ত, ব্যাস, তারপরই মিনিটেই খতম করে দেবো। কাজেই বুঝতেই পারছেন আমার অবস্থাটি কোথায়। মি. বন্দ পাখির নোংরার ব্যবসা ছাড়াও ক্র্যাব কী তে আরো সব ব্যাপার আছে। আপনি বোধ হয় জানেন না এটা (guided missiles) গাইডেড মিশাইলস্ পরীক্ষার ঘাঁটি। এ ব্যাপারেও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমার কাছে আছে। আমার কিছু কর্মচারী এই ক্ষেপণাস্ত্র বিদ্যায় শিক্ষিত। এরা জানে বেতার তরঙ্গক্রমে বা কোন তরঙ্গরশ্মির সাহায্যে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হচ্ছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক গুপ্তচর বৃত্তিকে বাগে এনে ফেলার অস্ত্র আছে। এমন কি আমাদের তরঙ্গের মাধ্যমে স্ট্র্যাটোসফিয়ারে পাঠানো আমেরিকান রকেটকে বিকল করে দিয়েছি আমরা। প্রমাণ চান দেখিয়ে দেবো। এবার নো একটু থামলেন।

এটাও আমার একটা নতুন ব্যবসা। পয়সাও কামানো যায় অনেক। এমনকি চিনেও আমি লোক পাঠিয়েছি। কারণ কমিউনিস্ট চিন এই ক্ষেপণাস্ত্র বিদ্যায় বড়ো হতে বিশেষ আগ্রহী।

বন্ডের মাথা গরম হয়ে গেল লোকটির দুঃসাহস দেখে। কিন্তু মাথাটাতো বরফের মতো ঠাণ্ডা রাখা যাবে কি?

বন্দ — “দেখুন মি. নো আপনি এমন সব কাজের সঙ্গে যুক্ত যেখানে লোক ঠকানো আর নর হত্যা লেগেই থাকছে। আপনার সম্পত্তির শক্তি আরো বেশি বলে আমার ধারণা ছিল। তবে একটা বিপদ হতে পারে। কারণ যারা আপনার সম্পত্তি চাইতে আসবে তাদের মধ্যে কেউ আপনাকে শেষ করতে পারে। যেমন এখানে বিদেশে ট্রেনিং প্রাপ্ত অনেক লোকই আছে। যে কেউ হয়তো সেই কাজটা করতে পারে।”

নো, “আরে দূর মশাই। আপনি দেখছি একগুয়ে। বলি বুদ্ধিটা খাতান ভালো করে। এই সামান্য ব্যাপারটা আমার মাথায় নেই কী করে ভাবলেন। শুনুন আমার একটা চর আছে ওই

পাহাড়ের কোলে, সবাই জানে সে মৃত কিন্তু তা নয়। যে কোনো ষড়যন্ত্রের আভাষ আমি আগেই পেয়ে যাই তার পাঠানো সঙ্কেত থেকে।

বন্দ - - আপনাবও দেখছি মাথায় বিশেষ বুদ্ধি নেই। এটা তো জানেন আপনার চারিদিকে অনেক শত্রু। এফ্ বি. আই এখন আপনাব বন্ধু হতে পারে কিন্তু কখন পালটে যাবে আপনার জানা আছে কি? গুপ্তচর দলে কি ধরনের ভয়ংকর লোক থাকে সেটা পুরো জানেন বলে তো মনে হয়না। একটা কথা আমার সঙ্গে এই মেয়েটির কোনো ক্ষতি যেন না হয়।

ক্ষতি হলে আপনার চেয়ে অনেক শক্তিশালী লোককেও চোখে সরষে ফুল দেখতে হবে। এটা কিন্তু বানানো কথা নয়। আব আপনার এই ক্র্যাব কী কয়েক ডেলা মাটি ছাড়া কিছু নয় সেটাও জেনে যাবেন।

ডক্টর নো - “তবুও আমার পথ থেকে সরছি না। আমার দ্বিতীয় অধ্যায়েব কাজ অনেক বড়ো পুরস্কার আনবে। আর সেটা হাত ছাড়া করার মতো বোকা এখনো হইনি। যে শক্তির বলে রকেট ওড়ে তা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে দিক পালটে দিতে পারি যে কোনো সময়ে। আর যার ক্ষেপণাস্ত্র সেটা তার দেশেই পড়ে ফাটবে। এ ব্যাপারে আমেরিকাকেও কোণঠাসা করে দেবো। আর বেশ কিছু লোক মরার পর ক্ষেপণাস্ত্র বন্ধ করার জন্য অস্ত্র খুঁজতে সব দেশ টাকা দেবে আমাকে। আরে এর আনন্দই আলাদা।

বন্দ রাগে গুম হয়ে গেছে মি. এম-এর বিদ্রুপ মাখানো কথা মনে এল। উনি বলেছিলেন, “আরে দূর এটা আবার সাহসের কাজ কী? শুধু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য অনুসন্ধান।”

বন্দ বলল, “মি. নো আর ফালতু কথা না বাড়িয়ে যা করবার করে ফেলুন।”

নো চিৎকার করে উঠলেন, ধমক দিয়ে বললেন, “চুপ, কত ব্যথা সহ্য করতে পারেন দেখছি। জানেন তো জার্মানরা জীবন্ত মানুষ নিয়ে এ ব্যাপারে গবেষণা করত। এবার আমার খেলাটা দেখুন।”

কয়েকটা ষণ্ডামার্কী লোক এসে হানি ও বন্ডকে হিঁচড়ে নিয়ে বসাল চেয়ারে। নো বললেন— “দেখো মেয়ে এই ক্র্যাব কী হল বিষাক্ত কঁকড়ার রাজত্ব। সৈন্যবাহিনীর মতো মার্চ করে এরা বেরিয়ে পড়ে। তোমার নগ্ন নারীদেহ খুবলে এরা খাবে। আর সেটা নিজেই দেখতে পাবে। হঠাৎ হানির মাথাটা কাত হয়ে গেল চেয়ারের উপর। জ্ঞান হারিয়েছে সে। এই রকম বর্ণনা তার হৃদয়স্থকে আঘাত করেছে।”

ওদিকে বিশাল ইম্পাতের মধ্যে বন্ডকে রেপ রাখা হয়েছে। তবুও বন্দ বলল, “বেজম্মা কোথাকার। নবকের আগুনে মববি তুই।”

নো— হেসে উঠে বললেন, “নরক আবার কি, আমার জানা নেই।” এবার চিনা ভাষায় কি একটা ইঙ্গিত করলেন। একজন প্রহরী এসে হানিকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গেল।

নো মি. বন্দ এবার আপনার পালা। মেয়েটার কথা ভুলে যান। আপনার জন্য মৃত্যুর ব্যবস্থা আরো অভিনব। আপনার সাহস আছে। সহশক্তিও আছে। অনেকক্ষণ লড়তে পারবেন বলে আমার আশা। আর ওইযে বললাম মানুষের দেহ সহ্য ক্ষমতা এসব আমি গবেষণার জন্য রেকর্ড করি। তবে পুরোটা বলবনা। হঠাৎ মৃত্যুর হাজিরা কেমন লাগে সেটাও জানানো ঠিক নয়। তাতে খুন কবার মজাটা থাকে না, আপনাকেও বলব না, তবে লড়ে যান এবং অন্য সব গোয়েন্দাদের জন্য একটা দৃষ্টান্ত রেখে যান। প্রাণটা খাবলে নেওয়ার ব্যাপারটাতো আমার হাতে। কী করবেন ভেবে দেখুন।”

বন্দ ভাবল একবার ওই লাইটার আব ফল কাটার লম্বা চাকুটা হাতের কাছে পেলেই বন্ডের কাছে চলে যেতে যেটুকু সময় লাগবে তারপূর্ব্য সব বকবকানি বন্ধ।

বন্ডকে নিয়ে একটা লিফট অনেক উঁচুতে উঠে গেল। শ্রহবী বন্ডকে একটা করিডোরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে একটা ঘবেব মধ্যে ঢুকিয়ে চলে গেল। ব্যাস সব বন্ধ। লিফটও চলে গেছে। এবার বন্ড কী করবে? লিফট চালককে একবার বন্ড বলেছিল যে তারা একসঙ্গে পালাতে পাবলে ভালো। এতে সেই লোকটা বন্ডকে খেঁচিয়ে উঠেছিল।

এ ঘরটার মধ্যে কিছুই নেই। আছে শুধু একটা চেয়ার। তবে ছাদের নীচে একটা ঝাঁঝরি লাগানো ঘুলঘুলি। বেশ চওড়া আছে। ওটা এটাকেই কাজে লাগাতে চাইল বন্ড। প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে কাজ শুরু করে দিল। ঝাঁঝরিটাকে টেনে খুলছে পারলে বর্ষাব মতো একটা অস্ত্র তৈরি করা যাবে। কিন্তু হাত লাগাতেই একটি বিদ্যুতের শক। কিন্তু দমবাব পাত্র বন্ড নয়। কিমোনো থেকে একফালি কাপড় কেটে আঘাত লাগা জায়গাটা বেঁধে নিল। আবার হাত বাড়াল, না কোনো শক নেই। বোধ হয় ওটা ফিউজ হয়ে গেছে।

এবার ঝাঁঝরিটা টেনে বার করল বন্ড। এটাকে টেনে লম্বা করতেই কেমন একটা অস্ত্রে পরিণত হল, এটা পালটা মার দেওয়া যাবে অতর্কিতে এটা দিয়ে। ঝাঁঝরি ফাঁকা হতেই লম্বা সুড়ঙ্গ। এবার বন্ড উপুড় হয়ে সুড়ঙ্গের বুকো গুয়ে গেল। লাইটার জ্বলে দেখল সুড়ঙ্গটা সোজা চলে গেছে। একটা ঠান্ডা হাওয়া আসছে। বন্ডের ভালো লাগল। সুড়ঙ্গটার শেষের দিকটা খুব সামান্য আলোয় ঢাকা। কিন্তু সুড়ঙ্গের দুপাশের জায়গাটি মসৃণ। এগিয়ে যাওয়া মুশকিল। তবে হ্যাঁ দুপাশে নলের মতো কিছু আছে যেখানে হাত লাগিয়ে আগানো যায়। বন্ড উঠতে লাগল সে যেন একটা পোকা। কিন্তু এ যাত্রা ভয়ংকর, পা পিছলে নীচে পড়ে গেলে অর্ধমৃত হয়ে থাকতে হবে।

বন্ড ঘেমে গেছে। অনেক পথ এগোতে হবে। মুখটা মুছে নিয়ে দম নিল সে। কিন্তু একি, ওই আলোটা যেন আরো জোরালো হয়েছে।

বন্ড যেন স্বপ্ন দেখছে একটা শূন্যাপোকা বাথরুমের দিকে যাচ্ছে। সেখানে একজন উলঙ্গ নারী গায়ের জল মুছেছে। একটা লোক দাড়ি কামাচ্ছে। বন্ডের মাথাটা যেন কীরকম হয়ে গেছে। হঠাৎ দুম করে আবার ধাক্কা। একটা গুঁতো খেল বন্ড। সুড়ঙ্গটা শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু এরপর আর একটা সুড়ঙ্গ। এবার বোধ হয় শুয়ে শুয়ে এগোতে হবে। এখন একটু বিশ্রাম। মিনিট কয়েক পরে আবার কাজ শুরু। সুড়ঙ্গের উপরে বড়ো পোর্ট হোলটার দিকে নজর গেল। কিন্তু ওকি? এক জোড়া চোখ যেন বিদ্যুতের আড়াল থেকে ওকে লক্ষ করছে। তার মানে ডক্টর নো কে সব জানানো হচ্ছে।

কোনোক্রমে পঞ্চাশ গজ এগোনো গেছে। সুড়ঙ্গের বাতাস যেন গরম হয়ে গেছে। ছুরিটা দাঁতে চেপে এগোতে হচ্ছে বন্ডকে। বন্ড বুঝেছে এখানে ধাতুর তাপ ছড়ানো আছে। ওটা লক্ষ করতে হবে। পায়ের তলাটাকে বাঁচাতে হবে। কয়েক ফালি কাপড় কেটে পায়ের তলায় বেঁধে ফেলল। পেটটাকে ছোটো করে কাঁধটাকে চেপে এগিয়ে চলল এমনভাবে যাতে মেঝের গরম তাকে ধরতে না পারে।

হঠাৎ যেন চোখের সামনে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ল। অনেক কষ্ট করেছে বন্ড। এবার ওই স্ফুলিঙ্গ আর গরম হাওয়া তার ভেতর থেকে একটা আর্তনাদ বের হয়ে আসছে। আর্তনাদ থামছে না।

আর্তনাদ করছে আব বন্ড এগোচ্ছে। মৃত্যু এসেও যেন আসছেন। কিন্তু বন্ডকে এগোতে হবে আর আর্তনাদও চলবে। চলুক।

এবার হঠাৎ পালটা হাওয়া। আর সুড়ঙ্গটা ডানদিকে ঘুরে গেছে। ঠান্ডাটা যেন তার ফুসফুসে ঢুকে গেল। শরীরে অনেক ফোসকা বেরিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। বন্ড অসাড হয়ে পড়ে রইল। এবই মধ্যে সেই চোখজোড়া তাকে আবার দেখে নিল। তবুও শ্রাণ যাবে না। অস্বিজেন আর কিছুক্ষণের বিশ্রাম শরীরে দিল নতুন শক্তি।

এবার বন্ড জেগে উঠল, যেন অনেকদিন ঘুমিয়েছে সে। নো এর সব রকম অত্যাচার আব যন্ত্রণা দেওয়ার কৌশলগুলো একের পর এক জয় করে ফেলতে হবে। ডক্টরকে দেখিয়ে দিতে হবে যে মরিয়া হলে একজন বলিষ্ঠ লোক কতটা যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে।

এবার হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হচ্ছে। এবার চোখের সামনে লাল লাল ফোঁটা দেখা যাচ্ছে, এগুলো কী? লাইটার জ্বালাবার পরেই যেন ওগুলো অদৃশ্য হল, আর দেখা গেল সুড়ঙ্গের মুখটা যেন একটা সূক্ষ্ম মসলিনের জাল দিয়ে ঢাকা। মনে হল ওটা একটা খাঁচা অনেক প্রাণী যেন আছে সেখানে। আবার এক ঝাঁক লাল ফোঁটা তারই দিকে আসছে মনে হল, এগুলো কী? মাকড়সা? জালটার মধ্যে আটকে আছে অনেক রোমশ পা, মাথার উপরে অনেক চোখ, হঠাৎ এসব প্রাণীগুলো ছিটকে জালের অপর প্রান্তে যেন একদল মাংস হয়ে গেল। বন্ড বুঝল আসলে এগুলো বিষাক্ত মাকড়সা। জন্তু জানোয়ার মারতে পারে। তবে মানুষকেও কি মারতে পারে? দেখা যাক।

বন্ডের হাতে লাইটার আর ছুরি। মাথাটা ঠান্ডা আছে। ডক্টর নো র শেষ খেলা নাকি এটা। বন্ড তৈরি আছে। লাইটারের সলতে লম্বা করে জ্বালিয়ে দিল বন্ড মাকড়সাগুলো গেল সরে। এবার ছুরির এক আঘাতে জালটা ছিঁড়ে দিল। এবার বন্ডের ছুরিবু খেলা। কয়েকটা মাকড়সা চেপটে ফুটো হয়ে গেছে। আরো হবে। ছুরির আঘাত নখন শেষ হল তখন দেখা গেল সব কটা মাকড়সাই খেঁতলে একেবারে কাদা হয়ে গেছে। আরো দশ গজ মতো এগোতেই ঠান্ডা হাওয়া, বন্ডের ভালো লাগল। আক্রমণকারী বিষাক্ত মাকড়সাগুলো এখন পরলোকে।

কিন্তু মাথার উপর আলো জ্বলছে।

আবাব সেই একজোড়া চোখ তাকে দেখছে বোধ হয়। যেন কোনো একটা ইঙ্গিত দিল। অর্থাৎ বন্ডের সময় শেষ হয়েছে।

বন্ডেব অস্ত্রগুলো শরীরে যথাস্থানেই আছে। আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে অভিযান শুরু। কিন্তু এবার এটা যেন ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে। হ্যাঁ সত্যিই বন্ডের শরীর নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। বন্ড এবার আছড়ে পড়েছে। আবার তির বেগে দেহটা নীচে নামছে। কী দেখা যাচ্ছে আকাশ না সমুদ্র? আলোটাও এবার ওর দিকে ছুটে আসছে। হ্যাঁ আরো একশো ফুট নীচে ইস্পাতের মতো দেখাচ্ছে সমুদ্রের জলকে।

॥ আঠারো ॥

হ্যাঁ বন্ডের দেহ আছড়ে পড়েছে চলমান সমুদ্রের বুকে। পড়বার সময় সে দম বন্ধ রেখেছিল। হাত দুটো সোজা করেছিল ডাইভারদের কায়দায়। অনেকটা তৈরিই ছিল সে। কাজেই শরীরটা টুকরো না হয়ে জলের উপর ভেসে রইল। একটা কাশি গলাটা আটকে দিয়েছিল। যেন সমুদ্রের জল ঢুকে গিয়েছিল গলায়। তবুও হাত পা নেড়ে নিজেকে চলমান রাখল বন্ড। আর সেই রক্তবর্ণ চোখ জোড়া এখানেও যেন নির্দেশ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এবার বন্ডের দেহটা যেখানে ঢুকে গেল যেটা একটা মশান। অর্থাৎ পাহাড়ের গায়ে লাগানো জল ভর্তি একটা যেন লোহার খাঁচা। ভোর হয়েছে। বন্ডের মনে হ'ল তার বমি পাচ্ছে। বন্ডের পায়ের তলায় ছোটো মাছের ঝাঁক যেন ওর রক্ত খাচ্ছে। কিন্তু এই জলের বেড়াটা কেন? বোধহয় সমুদ্রের কোনো প্রাণী যাতে এখানে না আসতে পারে সেই জন্যে।

বন্ডের শরীর রক্তাক্ত। কাঁধ, হাটু, পা সব জায়গায় রক্ত লেগে আছে।

হঠাৎ দেখা গেল জলের নীচ থেকে কী একটি উপরে আসছে। একটা লম্বা শুঁড় দেখা যাচ্ছে। গোল দেখতে, তার মধ্যে ফুস্কুড়ির দাগ। এবার বন্ডের গায়ে কাঁটা। জল ভেদ করে কুড়ি ফুট দূরে একজোড়া রক্তচোখ তার দিকে তাকিয়ে। এটাই তাহলে সেই দানব স্কুইড। যেটা নাকি জাহাজকে উলটে দেয়। তিমিকে ঘায়েল করে। এই সেই শ্রাণী যার গায়ে হারপুন বোমা লেগে ফেটে যায়, কোনো ক্ষতি হয় না। এদের চোখ ক্যামেরার নিয়মে কাজ করে। শ্রাণীটাব মাথা থেকে বেরিয়ে আছে কয়েকশো শুঁড়ের জাল। শুঁড়ের তলায় আছে শোষক সাবি দিয়ে।

কী করা যায়? জলের বেড়াটাকে শক্ত করে ধরে এগোবে নাকি? কিন্তু এরই মধ্যে এক বিশাল শুঁড় বন্ডের পায়ের দিকে এগিয়ে এলো। হাত দিয়ে শুঁড়, ধরতে যাওয়াটা বোকাব কাজ হবে। এরই মধ্যে বন্ডের হাটু রক্তে ভরে গেছে। যন্ত্রণায় বন্ড দাঁত চেপে রইল। দূরে একটা জাহাজের সাইরেন শোনা গেল। একঝাঁক পাখি শব্দ করতে করতে উড়ে গেল। জাহাজটা কোথা থেকে এল, বোধ হয় আন্তওয়ার্ন থেকে। এখন জাহাজের লোকেরা বিশ্রাম করছে, খাচ্ছে, ডিম ভাজার গন্ধ নাকে এল। ওরে বাবা, ওই শুঁড়টা এবার বন্ডের পেট ছাড়িয়ে প্রায় পাঁজরের কাছে। আর দেরি নয়। ছুরির কোপ বসিয়ে দিল। এবার শুঁড়টা রক্তে ভরে গেছে, এক ঝটকা দিয়ে জলে মিলিয়ে গেল। আবার শুঁড়ের আক্রমণ বন্ডের বুকের কাছে। বন্ডের ছুরিও চলল তড়িৎ গতিতে। বন্ডের দম বন্ধ হয়ে আসছিল, কিন্তু তার আগেই শয়তানকে অনেকটা টুকরো করে দেওয়া গেছে। তবে বন্ডের গায়ে লাল দাগ হয়ে গেছে, ফেঁটা ফেঁটা রক্ত বেরুচ্ছে।

সমুদ্রের জল এবার ফেনা হয়েছে। দানব স্কুইডের মাথা জলের উপরে। বন্ডকে টাগেট করে ওটা আসছে। একটাই উপায় আছে এখন। এবার সড়কিটা বন্ডের হাতে। বন্ড সর্বশক্তি দিয়ে, দাঁত চেপে ভয়ংকর আঘাত হানবে। ওই শয়তানটার কালো চোখের মনিটার ঠিক মাঝখানে। সবকি ঝড়ের বেগে ঢুকেছে সেইখানে। এবার সমুদ্র যেন ফেটে পড়ল। কী হল ব্যাপারটা? তাহলে আহত স্কুইডের শরীর থেকে সব কালো বেরিয়ে গেছে। জল এবং বন্ডের শরীরও কালো হয়ে গেছে। কিন্তু স্কুইডটা গেল কোথায়?

জাহাজটা দেখা যাচ্ছে। বন্ডকে এখনি সেরে পড়তে হবে। তারের বেড়াটা পেরিয়ে গেলে কুড়ি গজ দূরে পাথুরে জমি, গায়ে গন্ধ রক্ত কাদা, আর কালো রং, শরীরে নানান আঘাতের চিহ্ন, তবুও গাটা ধুতে হবে। শরীরের প্রাণের স্পন্দন এখনো আছে। অতএব আবার তৈরি হতে হবে। লড়াই বাকি আছে। জামাকাপড় পালটে, নাড়ীর গতি মেপে শান্ত হল। সব ঠিক আছে। আচ্ছা মেয়েটাব কী হল পরে ভাবতে হবে। পাথুরে রাস্তাটা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। জাহাজের ইঞ্জিনের আওয়াজ আসছে। একটা ফ্রেন দিয়েও কোথাও কোনো কাজ হচ্ছে। সমুদ্রের জলের আওয়াজ তো আছেই। হঠাৎ কে যেন বলল, “সব ঠিক আছে”। উত্তর এল, “হ্যাঁ ঠিক আছে। ফ্রেনটার আওয়াজটা বাড়ল। বন্ড পাথুরে জমিতে উপুড় হয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করল।

॥ উনিশ ॥

এবার বন্ড আবার নতুন করে ভাববার শক্তি পাচ্ছে মনে। ছোরাটা আর লাইটারটা ঠিক জায়গাতেই আছে। তবে লাইটার থেকে আগুন বেরোবে কি না সন্দেহ, কারণ ওটা অনেকটা ভিজে গেছে আর ভেতরে বোধ হয় জ্বালানি তেলও শেষ।

দূরে একটা ফ্রেন দেখা যাচ্ছে। সেই বদমাস চিনে নিগ্রোটা একটা সিটে বসে আছে। এই সেই লোক যে জলাভূমির বর্গ চাণিয়েছিল। একটা বিশাল জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, এটার নাম ব্লাঁ।

জাহাজের উপর একটা লোক দেখা যাচ্ছে। পাখির নোংরা যাকে বলা হয় গুয়ানো – গুঁড়ো করে জাহাজের বিশাল খোলের মধ্যে প্রবেশ করানো হচ্ছে। ফ্রেনের কাজ হল ওই জাহাজের খোলকে সোজা রাখা যাতে ওই মূল্যবান গুঁড়ো করা গুয়ানো আশেপাশে পড়ে না যায়।

নাচে জেটিব ওপরে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল চেহারার লোক। ইনিই ডক্টর নো। পাহাড়ের ওপারে বহু শ্রমিক কাজ করছে, আর রাশি রাশি গুয়ানো এসে ঢুকছে জাহাজের মধ্যে। দু একজন কর্মচারী লক্ষ রাখছে ফ্রেনেব গতিবিধি।

বন্দ ভাবছে ওই ফ্রেনের ড্রাইভারকে এক বার বাগে পেলে হয়। কিন্তু কী করে? ছোরাটাকে চেপে ধরে একটু চিন্তা করলো বন্দ। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে একটা ছোটো দৌড় দিল। এবার ফ্রেনের নীচের দিকে যেখানে কারো চোখ পড়বে না সেখানে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাবে। ফ্রেনের ইঞ্জিন আওয়াজ করে চলেছে। লোকটাকে পেলে ছোরা দিয়ে ওর জুগুলার শিরা দু টুকরো করতে হবে। এবার একটা লাফ। আর লাফটা চিতাবাঘের ক্ষিপ্ততার চেয়েও ভয়ংকর। সবশক্তি এক করে বাদামি বগেব ছোবাটা লোকটার ঘাড় ফুটো করে আর এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল। আর এক হ্যাঁচকায় ছোরাটা বের করে নিল। ব্যাস লোকটার রক্তাক্ত দেহ গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়ে গেল। ফ্রেনটার সবকিছু এখন বন্ডের হাতে। ইঞ্জিনের গতি বাড়াল। জাহাজের খোলে যে ক্যানভাসের মধ্যে দিয়ে গুয়ানো ঢোকানো হচ্ছিল সেটা সরে গেল। ফলে মূল্যবান গুয়ানো জলপ্রপাতের ন্যায় অন্য জায়গায় পড়ে নষ্ট হল।

ডক্টর নো বোধহয় এসব দেখে ফেলেছেন। কিন্তু দেখলে কী হবে। বন্ডের শরীরে ও মনে এখন এক অতিদানবীয় শক্তি কাজ করছে। এবার ফ্রেনের চাকাটাকে কায়দা করে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল। ব্যাস কাজ খতম। এখন ওই বেজন্মাটা কী করবে। গুয়ানোর স্রোতে এখন কবরস্থ হবেন ডক্টর নো। এবার গুয়ানোব স্রোত বন্ডের আকার ধারণ করল। সব কবরস্থ করে ফেলবে বন্দ। কিন্তু সাইরেন বেজেছে। তবে এখনো প্রহরীরা টের পায়নি। এর আগেই বন্ডকে কাজ করতে হবে। চট করে ফ্রেন থেকে এসে মৃত নিগ্রোর রিভলবারটা পকেটে পুরে নিল। বেরিয়ে এসে কিছু করবার আগেই যেন এক আক্রমণকারী বন্ডকে জাপটে ধরল। বন্দ এক বাটকায় তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে এমন সময় শোনা গেল একটা মেয়ের গলার স্বর “আমি হানি”। চট করে হানিকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল সে। এখন কথা বলার সময় কম। মেয়েটাকে শয়তানরা কষ্ট দিয়েছে খুব। ওর পোশাক ছেঁড়া গুয়ানো ভরা সারা শরীরে। বন্দ — ডার্লিং মন শক্ত করো।” ওই শয়তান নো-কে গুয়ানোর কবরে পুঁতে ফেলেছি। ওর ভবলীলা এতক্ষণে সঙ্গ হয়ে গেছে। তবে আমাদের পালাতে হবে। এবার একটা সুডঙ্গ দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে চলল বন্দ। রিভলবারের ছটা গুলিই রেডি আছে। হঠাৎ কারা যেন বলছে, “ওঃ অনেক টাকা কামানো গেছে, এবার ওই মেয়েটাকে একবার দেখে আসলে হয়।” কিন্তু না, তা হবে না, বন্ডের তিনটি গুলিই ফেটে গেল পর পর। ব্যাস তিন নিগ্রোর লাশ পড়ে রইল সুডঙ্গের মধ্যে। মনে হয় এরাই স্ট্র্যাংওয়েজ আর ওর সেক্রেটারিকে খুন করেছিল। এবার দেখা গেল সেই চলমান ড্রাগনকে। কারা যেন বলছে যে অনেক অস্ত্র তাদের সঙ্গে। একজন বলল আরে ওই বিরাট অস্ট্রোপাসটা বোধ হয় খেপে গিয়ে এসব কাণ্ড করছে। ওই ইংরাজটার এত ক্ষমতা নেই। তবে ওই মেয়েটাকে পেলে ভালোই হত।” আর দেরি না করে বন্দ ও হানি সেই চলমান ড্রাগনের পেটে একটা খুপরীর মতন জায়গায় চূপ কবে বসে রইল। এরপর একটু চূপচাপ, বন্দ লুকিয়ে গিয়ে অ্যাকসেলটরে পা দাবালো। ড্রাগন ছুটলো বেশ জোরে। কেউ গুলি ছুঁড়ছে না তবে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা দল বেঁধে সাঁতরে আসছে বন্ডদের দিকে। এবার আবার গুলির ফোয়ারা, ফোয়াবা বেরলো একটা চুরি করা

রাইফেল থেকে। কাবণ বন্ডের রিভলবারে মাত্র তিনটে গুলি ছিল। কুকুরদের লাশ জলে ভেসে বস্তু লাল হয়ে গেল। এবার ওরা নদীর মুখের কাছে চলে এসেছে। হানিকে এবার জাপটে ধরে চূষনের পালা।

॥ কুড়ি ॥

ডক্টর নো-র কবর এক অসাধারণ কবর। জ্যাস্ত লোকটাকে কি সুকৌশলে তারই তৈরি গুয়ানো দিয়ে ঢেকে দম বন্ধ করে পগার পার করে দিল বন্ড। এ ঘটনার খবর জেনে জ্যামাইকাব রাজ্যপালও প্রায় পাগলা হয়ে গেলেন। এই রকম একটা শয়তানকে কত কষ্ট সহ্য করে তবে শেষ করতে পাবা গেল। বন্ড হল সত্যিকারের মরদ। উপরওয়ালার তার সঙ্গে ছিল মানতে হবে। বন্ড হল এক নতুন যুগের সৈনিক। তাঁকে আটকাবে কে? ওই রকম হাজার শয়তান নো-কে তাদেরই তৈরি হাজারটা কৌশলে শেষ করে দেওয়া যায়। এরা লোভী খুনির দল যারা কোয়ারেল, স্ট্র্যাংওয়েজের মতন সাহসী লোকদের এবং কয়েকটি ফুলের মতন সুন্দর মেয়ে কর্মচারীকে নরকের যন্ত্রণা দিয়ে মেরেছে।

রাজ্যপাল বন্ডের প্রতি খুব একটা ভালো দৃষ্টি দেননি। বন্ডকে তুচ্ছ একটা লোক ভেবেছিলেন উনি— মি. এম ও তাই। বন্ড ঠিক করল মি. এমকে একটা চিঠি দিয়ে জানাবে— “অসুস্থতার জন্য ছুটি চাই। আর আপনার প্রিয় স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলবার সেই আগুন ছোঁড়া ড্রাগনের মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে।” তবে একটা কাজ বাকি আছে। মোনা সরোবরের নীচ থেকে ওই সব নিরপরাধ মানুষগুলির দেহ বার করার চেষ্টা করতে হবে। আব নিগ্রো গুন্ডাগুলো যদি কিউবাতে পালিয়ে যায় তবুও তাদের ধরে হাড় গুঁড়ো করতে হবে।

বন্ড এখন মুক্ত। মনে পড়লে ক্রাভ কীর কথা। বদমাস নো এখন সমাধিতে ভূঁত হয়ে কাঁদছেন নাকি দেখতে ইচ্ছা করছে বন্ডের। বন্ডের এখন অনেক সম্মান, অনেক বড়ো বড়ো মানুষ তাকে দেখতে চায়, তার সঙ্গে ডিনার বা লাঞ্চ খেতে চায়। গ্লিনার কাগজে ওই সব ঘটনার বিবরণও বোধ হয় বেরিয়েছে। বন্ড এখন সুপার হিরো।

কিন্তু আসল কাজটা সবে শুরু হয়েছে। বো ডেজার্টের আখের খেতের কাছে হানির বাড়িতে বসে আছে বন্ড। হানির শরীরটা কামনার আগুনে জ্বলেছে বহুদিন। বন্ডকে সে ভালোবেসেছে। বন্ডের এখন উচিত সেই কামনাকে ঠান্ডা করে দেওয়া। হানি বলল, “জেমস কত দেরি, এটা আমাদের বাড়ি। খাওয়া হয়ে গেছে। দেখো আমি সব জামাকাপড় খুলে ফেলেছি। তুমিও তাই করো। চলে এস, আমরা এই স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে যাই। তুমি কিন্তু এই কথাই দিয়েছিলে আমাকে।”

বন্ড — “এটা কি দাসখৎ”?

হানি— “হ্যাঁ ঠিক তাই।”

দ্য স্পাই লু লাভড্ মি

॥ এক ॥

আমার বাস ইংল্যান্ডে। আমি সেখান থেকে নিজেকে আড়াল করতে চাইছি। আমার শিশুকাল, এই শীতকাল, নোংরা আকর্ষণ ছাড়া ভালোবাসার ঘটনাতে, অল্প কিছু আসবাবপত্র, আর লন্ডনে থাকার সময়কার বহুদিনের ব্যবহার করা জামা কাপড়ের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করছি। এই পৃথিবীর চারধারের ভাপসা নাক-উঁচু, দম-বন্ধ-করা বন্দিত্ব থেকে নিজেকে আড়াল করছি। আড়াল করছি আমার অক্ষমতা থেকে, যদিও এই পৃথিবীতে আমার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমার আছে। এক কথায়, আইনের চোখ আর আমার পরিবেশের চারধার থেকে নিজেকে আড়াল করছি।

নিজেকে আড়াল করতে করতে আমি চলেছি — আর এই চলা চলতে থাকে। প্রায় পৃথিবীর অর্ধেকটা পার হয়ে এসেছি। লন্ডন ছেড়ে আমি এসেছি — ‘দি ড্রিমি পাইনস্ মোটর কোর্টে’— যেখানে বহু পাহাড়, হ্রদ আর নিউ ইয়র্ক-এর উত্তর অঞ্চলের সেই অনন্ত পাইন বন দিয়ে মোড়া আমেরিকার নাম-করা পর্যটন কেন্দ্র আডিরোনডাকশেব লেক জর্জ যেখান থেকে দশ মাইল পশ্চিম দিকে।

আমার নিজেকে আড়াল কবে চলা শুরু হয় পয়লা সেপ্টেম্বর আর আজ তেরোই অক্টোবর শুক্রবার। আমার যাত্রার আগে আমার বাগানের গুরুগম্ভীর চেহারার মেপ্ল গাছের লম্বা সারি ছিল সবুজ। আর এখন কানাডার সীমানার দিকে অজস্র লক্ষ লক্ষ পাইন গাছের মধ্যে একেবারে আদি যুগের মেপ্ল গাছের শাখায় প্রশাখায় ফুটে উঠেছে ফুল, যেগুলো চোখে পড়লেই মনে হয় যেন আগ্নেয়গিরির আগুনের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে। আমার গায়ের রংও কী করে যেন লন্ডনে থাকার দরুন সেই পাদুর বং ছেড়ে এই মনের জ্বালা ধরানো রং-এ পর্যবসিত হল বুঝতে পারছি না। এটা যেন আমার শবীরের উপর আলাদা ভাবে একটা নকল চামড়া খুলে ফেলে নিজের স্বরূপ বেরিয়ে এল। আমি যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখি তখন মনে হয় আমি একটা ছোট্ট শিশু। তাকে দেখে খুশির আনন্দে মন আমার ভরে যেত। আমার মন চাইত না। তার ওপর আবার পেন্ট কবে একটা নকল মুখোশ পরি। এতে যে আমার খুব একটা পরিতৃপ্তি লাভ হত তা নয়। আসল কথা হল, আমি নিজেকে আমার গত পাঁচ বছরের অবস্থান থেকে আড়াল করে রাখবার চেষ্টা করছি। বর্তমানে আমি যে অবস্থায় আছি, তাতে যে আমি খুব খুশি তা বলছি না। কিন্তু বলছি আমার অবস্থানটাকে আমি মোটেই পছন্দ করতাম না, যেম্মার চোখে দেখতাম। আমার সেই আমির কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে আজ আমার মতো খুশি কেউ নয়।

আমার বর্তমান বাসস্থানের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে, নিউ ইয়র্কের রাজধানী আলবেনির উয়োকো (আর কী নাম ছিল না?) বেতার থেকে জানানো হল ছটা বেজেছে। তারপর আবহাওয়ার সংবাদে বলা হল বিরাট ঝড় আসার সম্ভাবনা আছে। রাত আটটার সময় উত্তর দিকে এই ঝড় এসে আঘাত করবে আলবেনিতে। এবার বোঝাই যাচ্ছে যে আমার রাত কাটবে ঝড়ের দাপট দেখতে দেখতে। অবশ্য ঝড়ের রুদ্ধরূপকে আমি মোটেই ভয় করি না। এতে ভাববারও কিছু নেই। আমি জানি কাছাকাছি জ্যান্ত প্রাণী বলতে একজন আছে লেক জর্জে যাবার মোটামুটি পরের উৎসাহ বাস্তব

পব দশমাইল যাবার পর ঐ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পাইন গাছের উথাল-পাথাল করাটা চিন্তা করে আমি মনে মনে বেশ উত্তেজিত এবং সুরক্ষিত মনে কবছিলাম।

আমি নিঃসঙ্গ। সকলের চেয়ে নিঃসঙ্গ।

নিঃসঙ্গ হয়ে গেছ প্রিয়তম,

আর নির্জনতা সে তো মধুর মধুব পাপ।

এটা কে লিখেছিলেন বা আমিই বা কোথায় পড়েছিলাম মনে করতে পারছি না। আমি শৈশবে ভাবতাম আমার জীবন এই বিরাট সংসার-সাগরে ঢোকার আগে এটা আমার অনুভূতিতে আসে।

এই দু'নম্বর রাস্তাটা গেছে লেক জর্জ আর দক্ষিণ দিকের গ্রেন ফলসের মধ্যে সুন্দর যোগাযোগ হিসাবে অরণ্যের মাঝপথ দিয়ে। 'ড্রিমি ওয়াটারস' বলে চমৎকার একটা ছোট্ট হ্রদ আছে যেখানে পিকনিক করার আদর্শ স্থান বলে বিবেচিত হয়। এই হ্রদটার দক্ষিণ দিকে একটা মোটেল তৈরি করা হয়েছিল এর রিসেপশনের লবির রাস্তাটার দিকে রয়েছে। আর এর ঘরগুলো রয়েছে প্রধান বাড়িটাকে আধা গোল করে ঘিরে। এগুলো এমনভাবে তৈরি যে, এর রান্নাঘর, শৌচাগার প্রায় প্রত্যেকটি জায়গা থেকে সেই হ্রদের দৃশ্য চোখে পড়ে। এখানের ঘরের সংখ্যা চল্লিশ। এই বাড়ির গঠন-প্রণালি অতি আধুনিকতায় ভর্তি। চকচকে পালিশ করা পিচ — সামনের দিকটা পাইনের তক্তা বসানো। ছাদগুলো সুন্দর বিমের ওপর। সব ঘরই এয়ার কন্ডিশনড এবং প্রত্যেকটাতে একটা করে টেলিভিশন-সেট আছে। এই হ্রদের ওপারে রয়েছে খেলার জায়গা, সুইমিং পুল, গল্ফ খেলার মাঠ — অর্থাৎ কি না সব রকমের ব্যবস্থা আছে। আর খাওয়া-দাওয়ায় ব্যাপার — লবিতে রয়েছে কাফেটেরিয়া। আর দিনে দুবার করে মুরগি আর মদের জোগান আসছে লেক জর্জ থেকে। দশ ডলারের এক শয্যার ঘর অথবা ষোলো ডলারের জোড়া-খাট সমেত ঘর ভাড়া করলেই এসব পাওয়া যাবে। আশ্চর্যের কিছু নেই। দু-লক্ষ ডলার খরচ করিয়েও পয়লা জুলাই থেকে অক্টোবরের শুরু অবধি অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত 'ঘর খালি নেই' নোটিশটা টাঙানো হয়। অর্থাৎ চোদ্দোই জুলাই থেকে লেবার-ডে পর্যন্ত সময়টা বাদ দিলে, এই ব্যবসা চালানো বেশ কষ্টকর। ফ্যাল্লিরা আমায় বলেছিল রিসেপশনিস্ট হিসেবে আমায় নিয়োগ করলে সপ্তাহে তিরিশ ডলার মাইনে আর খাওয়া-থাকা দেবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। বিপদ কেটেছে।

এই খবরটা শুনে আমার মনে সপ্তসুরের মূর্ছনা বেজে উঠল। ঐ পরিষ্কার স্টেশন ওয়াগনটা যেটা ওদের নিয়ে ট্রয় মানে যেখান থেকে ঐ অপদার্থগুলোকে এনেছিল সেখানেই দূর হল গ্রেন ফলস হয়ে। তারপর সকাল ছটা থেকে আমার বুকো বাজতে লাগল স্বর্গের সুর। মিস্টার ফ্যাল্লি আমায় কবজা করার চেষ্টা করেছিল আর শয়তানটা তার হাতটা ছুঁতে কাঠবেড়ালীর মতে। আমার গায়ে বুলিয়ে নিল — আমি আমার জুতোর হিল দিয়ে ওর পায়ের পাতাটা পর্যন্ত মাড়াতে পারলাম না। অবশ্য বেশিক্ষণ আমায় বিরক্ত করেনি। আমাব মুখটা তখন ওর ঐ নোংরা ছোঁয়ায় ঘেম্নায় কুঁচকে গিয়েছিল — তারপর মুখটা স্বাভাবিক হলে মিষ্টি গলায় বললে — 'সুন্দরী, ঠিক আছে। আগামীকাল দুপুরবেলায় মালিক সব চাবি-টাবি বুঝে নিতে আসবে। ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই কুটির দেখভাল ভালোভাবে কোরো। পরে একটা বিশ্রী ইঙ্গিত করে বললে — 'আজকের রাতের স্বপ্নে আশাকবি তোমায় পাব' বলে কান এঁটো করা একটা হাসি হাসলে — যার মানে বুঝলাম না। স্টেশন ওয়াগনের ড্রাইভারের জায়গায় বসে ওর বউ সমস্ত ঘটনাটা দেখে কর্কশ গলায় বলে উঠল — 'জেড শীঘ্র এদিকে এস'। ও এখান থেকে পালিয়ে গেল।

তারপর গাড়িতে বসে আমার দিকে মিষ্টিভাবে চেয়ে বললে — 'মিষ্টি সোনা, তাহলে এখন চলি। রোজ একটা করে চিঠি আশা করছি। এই কথাগুলো বলে ওর বউটা তার মুখের কুটির

হাসিটা মুখে গাড়িটা স্টার্ট করল। চলে যাবার সময় তার বহু ঝড়-ঝাপটা খাওয়া ক্রুর মুখটার একপাশ শেষবারের মতো দেখতে পেলাম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম যেন আমি। আচ্ছা একটা পেয়ার। যেন কোনো নাটকের চরিত্র থেকে বেরিয়ে এসেছে — এবং কোনো বই — যেমন -- ‘প্রিয় গুপ্ত কথা’ গোছের। আর যাবা অমন চরিত্রের হয়ে আসে তারা এমন হয় না। যাক, ওরা এখন বিদেয় হয়েছে। এবার যেখানেই যাব আশা করি সুস্থ মানুষের দেখা পাব।

এখন আমার মনটা বেশ হালকা লাগছে — ফ্যান্সিদের চলে যাওয়া রাস্তার দিকে চেয়ে ওদের বিষয়েই চিন্তা করছিলাম। চিন্তা শেষ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আবহাওয়াটা বোঝবার চেষ্টা করছিলাম। সত্যি অক্টোবরের মাঝ বরাবর আবহাওয়া খুবই সুন্দর। পরিষ্কার আর উপভোগ্য। সূর্যের শেষ আলোকরশ্মির গোলাপি রংটা সুন্দর কারুকার্য করা মেঘ-শ্রেণির গায়ে মেখে দস্যুর মতো সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো ঝোড়ো হাওয়া বনাঞ্চলের মাথার ওপর উঠে নিজের পথ খুঁজে না পেয়ে ঘুরছিল আর শেষে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে দুলিয়ে দিল হ্রদের শেষ প্রান্তে পড়ে থাকা গ্যাস স্টেশনের হলুদ বাতিটা।

হঠাৎ একটা ঠান্ডা হাওয়া এসে আমার শরীরে লাগল আর দূরের দৌল্যমান বাড়ির ক্যাচ-ক্যাচে শব্দের মধ্যে একটা ফিসফিস করে কথা মনে আসতে আমার শরীরে এক ভুতুড়ে মিষ্টি শিরশির ভাব খেলে গেল। হ্রদের ছোটো ছোটো ডেউগুলো দূরে শেষ কুঠুরিটার পাড়ে আছড়ে পড়ছিল। হ্রদের জলের ওপরের ডাঙটা যেন পাতলের মতো দেখাচ্ছে — তার ওপর মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে যাওয়াতে সাদা সাদা রেখা দেখা দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে তেড়ে-ফুড়ে ওঠা লম্বা লম্বা বাতাস ছাড়া আবহাওয়া বেশ সুন্দর। রাস্তার অপর দিকে মোটেলের পেছনের দিকে— প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা গাছের দল বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের ওপর গা রেখে আমার পেছনের আলোয় সাদা বাড়িটা ঘিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল।

সব কিছুই বেশ তৃপ্তির। এই তৃপ্তিটাকে বৃকের মধ্যে চেপে ধরে রাখলাম। চিন্তা করছি — একটু পরেই আকাশে মেঘের বুক চিরে বিদ্যুৎ বলকাবে আর তার তীব্র গর্জন আর ঝড়ের নাচন থেকে আমি আমার ঘরে সুক্লং করে ঢুকে পড়ব। নিজের মনোমতো একটা পানীয় তৈরি করে রেডিও শুনব আর উপভোগ করব একটা মিষ্টি নিরাপদ আশ্রয়, আরাম।

ক্রমশ রাত্রি নেমে আসছে। ঝড়ের পূর্বাভাস পেয়ে পাখিরা বনের মধ্যে নিজের নিজের বাসায় চলে গেছে। ওদের কলকাকলি আর শোনা যাবে না। বন্য প্রাণীরাও বাদ নেই। যেমন — কাঠবেড়াল, কাঠবেড়ালী, আর হরিণরাও। এই হাদিস্ত বনরাজির মধ্যে একমাত্র আমিই আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছি। ফিরে যাবার আগে বুক ভরে নিশ্বাস টেনে নিলাম কয়েকবার এই কোমল ঠান্ডা বাতাস। বাতাসের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছিল ভেজা পাইন আর শ্যাওলার জোরালো গন্ধ। তার সঙ্গে মিশেছে মাটির ভেজা সৌন্দা সৌন্দা গন্ধ। এই পরিবেশে আমি যেমন মনের মধ্যে সুখের উত্তেজনা বোধ করছি তেমনি বনরাজিও সেই উত্তেজনা বোধ করছে। চারিধার এত নিঃশব্দ যে ভয় পেয়ে একটা পঁচা ডেকে উঠল — ‘হঃ’। মাত্র একবারই— তারপর চুপচাপ। পথের আলোর বলকানি ছেড়ে আমি একটু সরে ধুলোয় ভর, পথের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম, উত্তর দিক থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা এসে আমার চুলগুলো উড়িয়ে দিল। আকাশের বুক চিরে জুলে উঠল বিদ্যুতের নীলাভ আভা। তারপরই মেঘ ডেকে উঠল। যেমন পাহারা দেবার জন্য কুকুরগুলো হঠাৎ জেগে উঠে ডাকে -- ‘গুড়-গুড়’।

এরপরেই এল প্রচণ্ড ঝড়।

ঝড়ের নাচন শুরু হল বনের গাছগাছালির মাথার ওপর আর তাদের শাখা-প্রশাখা আছড়ে পড়তে লাগল। ঝড়ের দোলায় দোল খাচ্ছিল গ্যাস-স্টেশনের ওপরের হলুদ বাতিটা — সে যেন

চোখ মটকে আমায় সতর্ক করে দিল। নামল বৃষ্টি, বাতিব নাচুনী আবছা হয়ে গেল — ওর আলোর রশ্মি ঢেকে দিল বৃষ্টির ছড়িয়ে দেওয়া আঁচলে। আমার গায়েও দু-চার ফোঁটা পড়ল— মারলাম ছুট।

ছুটে এসে ঘরের চাবি লাগিয়ে শেকল আটকে দিলাম। খুব তালে ফিরেছি। এর পরেই মেঘের উদ্দামতা বেড়ে গেল, শুরু হল বৃষ্টির নির্বারণতা। কাঠের চালু ছাদের ওপর পড়ে সেটা যেন মাদলের গুরু-গস্তীর তাল-ফেরতা আর সেটা যখন জানালার ওপর পড়ছে সেটা তখন নাচের নূপুর-ধ্বনি। পর মুহূর্তেই এদের সঙ্গে যোগ দিল ছাদের জল-নিকাশি পাইপের ভেতর দিয়ে নেমে আসছে ছড়-ছড় করে জলের তোড়। ঝড়ের মুখর চিৎরনাট্য রচিত হল।

আমি তখনও ওখানে দাঁড়িয়ে চিত্রনাট্যের রূপ দেখছি। আমার মনে হল বজ্র-বিদ্যুৎ লুকিয়ে লুকিয়ে আমার পেছনে আসছিল। দেখতে দেখতে বাড়ি কাঁপিয়ে কড় কড় শব্দে বাজ পড়ল চারদিক আলোকিত করে আর তার সেই অনুরণন যেন কোনো যন্ত্রের আওয়াজ মনে হল। বাড়ির খুব কাছাকাছি যদি কোনো শক্তিশালী বোমা ফাটে এই শব্দ অনেকটা সেই রকমের। এই আওয়াজে জানলার কাঁচ ভেঙে পড়ার বনবন আওয়াজ শোনা গেল আর তারপরেই ঘরের মেঝেতে বৃষ্টির ছাঁট আসতে লাগল।

এত জোরে আওয়াজ আর বিদ্যুতের চোখ বলসানো আওয়াজে আমি ওখান থেকে নড়তে পারছিলাম না। পারাব ক্ষমতাও ছিল না। দুহাতে কান চাপা দিয়ে আওয়াজকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করলাম। এ রকম যে কিছু একটা হবে ভাবতেও পারিনি। যে ভয়ংকর আওয়াজ চারধার তখনছ করছিল তা বৃষ্টির ঝরনাধারায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। এই ধারা স্বস্তিনিয়ে এল — মুখর হয়ে বলে উঠল এটা যে এত খাবাপ তা চিন্তাই করতে পারি নি। এই পাহাড়ের মাথায় এমন ঝড় তো এর আগে দেখা যায়নি। তোমার আশ্রয় যেখানে রয়েছে, সেটা তো মজবুত নয়। আর আরম্ভ করার আগে যদি ঘরের বাতিগুলো নিভিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কেমন হয়? আর তোমার ঘরের ছাদের ওপর যদি জোরে বজ্রপাত হয় বা, তার আশুনে বাড়িতে আশুনে ধরে যায়— তোমাকে তড়িৎস্পৃষ্ট করে নেয়? তাছাড়াও এমনভাবে তোমাঘ ভয় দেখাতে পারি। যার জন্যে তুমি এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও বাড়ির বাইরে এসে ছুটেতে শুরু করবে এবং দশ মাইল ছুটে লেক জর্জের দিকে ছুটেবে। তবুও একা চাও না কি? ঠিক আছে এবার এই চেহারাটার পরীক্ষা নেওয়া যাক।

বলতে বলতে ঘরের মধ্যে আবার আলোর ঝলকানি আর কান-ফাটানো বোমার মতো আওয়াজ।

এবার দেখা গেল আগেব বারের আওয়াজে তৈরি ফাটলটা বেড়ে গেছে। চারদিকে ছিটকে পড়ছে এমনভাবে যেন গোলাবর্ষণ হয়েছে আর তার জন্যে মদের ঘরটায় কাপ আর গেলাসগুলো ঝনঝন করে নেচে উঠল এবং বিশাল শব্দতরঙ্গে বাড়ির কাঠের অংশগুলো বিস্তীর্ণ শব্দ করে তার প্রতিক্রিয়া জানাল।

এই অবস্থায় কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরের ভেতরে চেয়ারে বসে পড়লাম মাথায় হাত রেখে। আমি যে এতটা বোকা জানতাম না। যদি কেবল কেউ আমার কাছে আসত, থাকত আর বলত এটা তো ঝড়। কিন্তু এটা তা নয়, এটা তো পৃথিবীতে প্রলয় আসার পূর্বমুহূর্ত। আর সব কিছুর মূলে যেন আমিই! এখনিই সে আসবে। যে কোনো সময়ে। আমার তো একটা কিছু করতেই হবে। আমার চাই সাহায্য। কিন্তু কী ভাবে? আমি ছুটে গিয়ে টেলিফোন করতে পারছি না। ফ্যান্সিরা টেলিফোনে সব কিছু চুকিয়ে দেওয়ার পর তার কেটে দেওয়া হয়েছে। আমি দৌড়ে বাড়ির সামনে হাতায় 'ঘর ভাড়া দেওয়া হবে' আর 'ঘর খালি নেই' লেখা নিওন আলো

জ্বালাবার জন্য যেই বড়ো সুইচে হাত দিতে দরজার কাছে গেলাম, ‘ঘর ভাড়া দেওয়া হবে’ আলো দেখে কোনো পথযাত্রী একটু আশ্রয়ের খোঁজে খুঁশিই হবে। কিন্তু সুইচে হাত দেওয়া মাত্রই, অদৃশ্য বিদ্যুৎ যে আমার ওপর নজর রেখেছিল, সেই নজর নির্মমভাবে আমার ওপর বলসে উঠল ঘরের মধ্যে— আর একটা রাক্ষসের বিরাট লম্বা হাত দিয়ে আমায় ঘরের মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল।

॥ দুই ॥

এইবার আমি বুঝলাম আমার অবস্থান কোথায়। যাতে আর আঘাত না পাই — তাই মেঝেতে চূপচাপ শুয়ে রইলাম। জানলাম কী ঘটেছে। প্রায় মিনিট দশেক পড়ে রইলাম আশ্রয়প্রার্থীর মতো। বৃষ্টির তর্জন গর্জন শুনে মনে হচ্ছে যদি ঐ ইলেকট্রিক শকের দ্বারা আমার শরীরের ভেতরের কোনো অংশ বা কলকবজা পুড়ে গিয়ে থাকে। ভাবছি এতে হয়তো ভবিষ্যতে আমি মা না-ও হতে পারি, বা আমার মাথার চুলের রং পুড়িয়ে পাটের মতো সাদা করে দিয়েছে। ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম — নাঃ কিছুই হয়নি, পুড়ে যায়নি, বা বেরংও হয়নি। সব ঠিক আছে। কিন্তু পুড়ে গিয়ে আমার মাথার পেছনে খানিকটা ফুলে গেছিল। আস্তে আস্তে নড়ে চড়ে দেখলাম — নাঃ আমার শরীরের কোনো অংশ ভেঙে যায়নি।

আমি বুঝতে পারলাম যে, জগৎ সংসার তার নিয়মমতো ঠিকই চলছে। যখন দেখলাম, ঘরের মধ্যের জি. ই. সি. ফ্রিজটা তার দৈনন্দিন কাজ শুরু করে দিয়েছে। দুর্ধোঁগ-বাহিনী বিদায় নিয়েছে।

অতি কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলাম। ভয় পাচ্ছিলাম হয়তো অনেক কিছু ক্ষতি হয়েছে। না, সে রকম কিছু হয়নি। যে যার জায়গায় ঠিক মতো বহাল রয়েছে। সেই গুরুগম্ভীর রিসেপশন ডেস্ক, পেপার র‍্যাক, বই, পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন রাখার ম্যাগাজিন র‍্যাক, কাফেটেরিয়ার লম্বা কাউন্টার, রামধনু রং-এর পালিশ করা দশ বারোটা পরিষ্কার টেবিল, ধাতুর তৈরি চেয়ার সহ বরফ-জলেব জলাধার, আর চকচকে কফি পার্কেলোটারটা — সবাই যে যার নিজের জায়গায় রয়েছে। একটুও কেউ তাদের স্থান পরিবর্তন করেনি। হয়েছে জানালায় একটা ফুটো, আর আমার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে যে ঝঙ্কা তার সাক্ষ্য হিসাবে ঘরের মেঝেতে কিছু জলের ধারা।

আমার মাথার মধ্যে কেবল ‘প্রায়’ কথাটা কেবল ঘুরছে কেন বুঝতে পারছি না। ঝড় ছিল, বজ্র-বিদ্যুৎও ছিল। বিরাট বিরাট বাজ পড়ার ফলে ছোট্ট ছেলেমেয়েদের মতো ভয়ে কঁকড়ে গিয়েছিলাম। বিদ্যুৎ জ্বলার বিরতির জন্য অপেক্ষা না করে আবার সুইচ বোর্ডে হাত দিতে গিয়েছিলাম বোকার মতো আর ঠিক তখনই আবার বিদ্যুৎ চমকেছিল। সেই বিদ্যুতের কারেন্ট আমায় মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। আর তার পুবন্ধার হিসেবে পেয়েছি মাথার পেছন দিকে ফুলে ওঠা জায়গাটা। যেমন বোকা, বুদ্ধ, ঠিক হয়েছে। একটু সবুর করো, সত্যি সত্যি আমার চুল সাদা হয়ে যেতে পারে। মনে হতেই ছুটে ঘরে গিয়ে আমার ব্যাগটা নিয়ে কাফেটেরিয়ার কাউন্টারের পেছনে তাকের ওপর যে বড়ো আয়নাটা আছে সেদিকে ভালোভাবে তাকলাম। বেশ ভালোভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে দেখলাম আমার প্রতিবিশ্ব দিয়ে। আমার চোখ নীল পরিচ্ছন্ন কিন্তু আশ্চর্য হয়ে বড়ো বড়ো করে আমার দিকে তাকাল। চোখের পাতা, খয়েরি ভ্রু, প্রশস্ত কপাল, আর বাদামি রং-এর টিকোলো নাক সবই অটুট রয়েছে। আর আমার খুব গাঢ় বাদামি রং-এর চুল আমার বুকের দুপাশে ঢেউয়ের মতো স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে চিক্রনি বার করে চুলের ওপর কয়েকবার চালিয়ে ঠিক কবে নিয়ে আবার ব্যাগে রেখে ডালা বন্ধ করলাম। ঘড়িতে দেখলাম প্রায় সাতটা।

কী করব ভেবে রেডিও চালিয়ে দিতে গুনলাম উষোকো বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হচ্ছে এই ঝড়ের সংবাদ যা শ্রোতাদের ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। বৈদ্যুতিক পরিষেবা বিপর্যস্ত। গ্রেন ফলসের কাছে হাডসন নদী বিপদসীমা ছাড়িয়ে গেছে, স্যাঁবাটোগা প্রশ্রবণের কাছে একটা এলম গাছ পড়ে গিয়ে ন-নম্বর রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়েছে। মেকানিক্যাভিলে প্রবল বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর পর আমি উঠে জানালার ভাঙা কাঁচের জায়গায় একটা কার্ডবোর্ড এঁটে দিলাম। এক টুকরো কাপড় দিয়ে ঘরের মেঝের জল মুছে একটা বালতি রাখতে লাগলাম। সব কাজ হয়ে যাবার পর পেছনের ঢাকা বারান্দা দিয়ে ছুটে এসে পেছনের ঘরের সারির মধ্যে ডান দিকে লেকের দিকের আমার ন-নম্বর ঘরে ঢুকে পড়লাম -- তারপর জামাকাপড় ছেড়ে ঠান্ডা জলে মনের আনন্দে স্নান করলাম।

আমার টেরিলিনের জামাটা আমি মাটিতে পড়ে যাওয়ার জন্য ময়লা হয়ে গিয়েছিল -- সেটাকে ধুয়ে শুকোবার জন্য মেলে ধরলাম।

ঝড়ের দেওয়া শিক্ষা আমি ভুলতে বসেছি এর মধ্যেই।

সেই সময় আমি যে একটা ছোট্ট বোকা মেয়ের মতো কাজ করেছিলাম -- তা-ও ভুলে যেতে বসেছি। আমার মন তখন শান্ত সঙ্কায় এক গীতিময় স্বপ্নে ভরে উঠল। আগামীকাল সকালে বিভাসের জন্য আনন্দ জেগে উঠল আমার মনে।

কিছু না ভেবেই আমার ওয়ার্ডারোবে অল্প-বিস্তর যা জামাকাপড় ছিল তার মধ্যে থেকে ভালোটা নিয়ে পরে ফেললাম।

কালো ভেলভেটের প্যান্ট তার সোনালি জিপ-ফায়নারের গতিটা বিস্মীভাবে কোমর থেকে এমন নীচে নেমে গেছে, বুলফাইটারের মতো, যে বসলেও বেশ টের পাওয়া যায়। আজ প্যান্টটা আমার শরীরের সঙ্গে খুব বাজে ভাবে সঁটে বসে আছে।

এরপর একটা গোল গলাওয়ালা সোনালি সোয়েটার পরে নিলাম -- ভেতরে আর ব্রা পরার দরকার হল না।

আয়নার সামনে নিজেকে দেখে নিজেরই প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করছিল।

মনে হল সোয়েটারের হাতাটা কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নিই।

পায়ে সোনালি স্যান্ডেল পরে লবিতে চলে এলাম।

ওখানে গিয়ে দেখলাম 'ভার্জিনিয়া জেন্টলম্যান' ব্র্যান্ডের বুরব্ মদের দু পাইন্টের বোতলের তলায় তখনও কিছুটা রয়েছে। সেটা একটা সুন্দর কাজ করা গেলাসের ওপর ঢেলে নিলাম। তার ওপর টুকরো চোকো বরফ ফেলে দিলাম। বোতলের তলায় একফোঁটাও অবশিষ্ট রাখিনি। শেষ সবচেয়ে ভালো চেয়ারটা রিসেপশন থেকে টেনে নিয়ে রেডিওর কাছে নিয়ে এলাম। রেডিওটা চালিলাম, পার্লামেন্ট সিগারেটের প্যাকেট খুলে দেখলাম পাঁচটা রয়েছে, তাই থেকে একটা নিয়ে ধরলাম, তারপর গেলাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে চেয়ারটাতে আরাম করে শরীরটা এলিয়ে দিলাম।

এদিকে বাইরে একটানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে তার মধ্যে রেডিওতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বাড়ির পোষা বেড়াল 'পুশিফুট প্রাইম লিভার মিল' কী খেতে ভালোবাসে সেই সব খবরাখবর। এক ঘেয়ে বৃষ্টির ঘ্যানঘ্যানানিটাকে কেটে দিচ্ছিল, যখন হঠাৎ করে বাতাসের তীব্রতা বেড়ে গিয়ে পাখিমারা বন্দুকের গুলির মতো কাঁচের সারির ওপর পড়ছিল। যেটা আমার মনে হয়েছিল যে, আমি ঝড়ের তাণ্ডবটাকে দূরে সরিয়ে আরামে-খুশিতে আলো ঝলমলে ঘরে রয়েছে। 'মনের মতো গান'-এর অনুষ্ঠান শুরু হবে চল্লিশ মিনিটের জন্য ঘোষণা করল উষোকো বেতার কেন্দ্র থেকে। 'আমার

স্বপ্নতরিত্রি দোলায় কে' গানটা শোনা গেল 'ইক্স স্পটস' সম্প্রদায়ের গলায়। গান শুনেও শুনেও মনে পড়ে যায় পাঁচ বছর আগে টেমস নদীর বুকে ছোট্ট একটা শালতিতে, 'কিংস ইয়ট' পেরিয়ে, বেশ দূরে উইন্ডসর ক্যাসেলটা বেখে, আমবা এগিয়ে চলেছি। সেই শালতিটা ডেরেক প্যাডেল করে চালাচ্ছিল আৰ আমি চালাচ্ছিলাম ছোট্ট রেকর্ড প্রেয়ার। মাত্র দশটা রেকর্ড আমাব কাছে ছিল, কিন্তু যখনই 'ইক্স স্পট'-এর লং প্রেয়িংটা চালালাম, আর 'স্বপ্ন-তরি' গান শেষ হতেই ডেরেক বলেছিল, — 'ওই গানের জায়গাটা ভিভ চালাও না'। আর আমি আন্দাজ করে গানের সেই জায়গাটায় পিন বসিয়ে দিলাম। হাঁটু মুড়ে বসে।

সেই সময় আমার চোখ যে জলে ভরে উঠেছিল — সেটা ডেরেকের জন্য নয় সেটা ছিল দুই সম-বয়সি ছেলেমেয়ের মধুর বেদনা এবং সূর্যের আলোক, প্রেমের প্রথম সংগীতগুলো, আৰ ক্যামেরায় আটকে থাকা বহু বহু মধুর স্মৃতি - - 'ভালোবাসার চুমোয় ভরা ঠোঁটের চিহ্ন দিয়ে সিলমোহর' করা প্রেমপত্রগুলোর জন্য।

আমার শৈশবের হারিয়ে যাওয়া স্পন্দনকে যে বেদনা আমায় দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, আমার এই চোখের জল তারই জন্য। আর তাই সেই জল না মুছে সেটাকে মুক্ত হয়ে গড়িয়ে পড়তে দিলাম আমার গাল বেয়ে। শেষে সেটাকে মুছে মনেমনে স্থির করলাম যে, এই অতীতের হারিয়ে যাওয়া স্পন্দনের যে যন্ত্রণা আছে, তাকে কিছুক্ষণ ধরে মনে করে সেই যন্ত্রণা উপভোগ করব।

আমি কে? আমি ভিভিয়েন মিশেল। এন 'ড্রিম পাইনস মোটোলে' বসে আমার অতীতকে মনে করে যাচ্ছি।

সেই সময় আমার বয়স ছিল তেইশ। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা ছিলাম। 'আস্ট হাউস' এর ইংরেজ মহিলাদের মুখে একটা কথা না শোনা পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল আমার ফিগার সকলের দৃষ্টিনন্দন। তারা বলত আমার পাছা একটু বেশি বড়ো আর আমার আরও টাইট ব্রা পরা অতি আবশ্যিক। আর আগেই তো আমি বলেছি, আমার চোখ নীল।

আমার মাথার চুল আপনা থেকেই ঢেউ খেলানো — রং বাদামি। আমার ইচ্ছে এই চুলের ওপর আরও অন্য রং-এর প্রলেপ লাগালে আমায় বেশ পরিণত আর ঝুঁকি নিতে সক্ষম বলে মনে হতে পাবে বলে মনে হবে।

আমার পছন্দের মতোই আমি 'গালের হাড় উঁচু। অবশ্য ঐ ইংরেজ মহিলারা মস্তব্য করত আমি যেন 'পরদেশী'দের মতো দেখতে। আমার নাক ছোট্ট, আর হাঁ-মুখ বেশ বড়ো হওয়াতে আমাকে বেশির ভাগ সময়ই খুব কামাসক্ত-ক'মাসক্ত মনে হয়, এমনকী আমি যখন যৌন-স্কুধায় পীড়িত না হচ্ছি তখনও। আমার স্বভাবটা একটু বাবমুখো গোছের এবং এতটাই স্বাধীনচেতা গোছের যে, কনভেন্টের মিসটাররা তাতে খুবই চিন্তিত হয়ে থাকত সব সময়। মিস্ থ্রেডগোল্ড ভীষণ উত্যক্ত হয়ে আমায় বলেছিল, দেখ ভিভিয়েন, সবসময় মনে রেখো মেয়েরা হবে উইলো গাছের মতো নবম, আর ছেলেবা হবে 'ওক' আর অ্যাশ গাছের মতো দৃঢ় এবং শক্তিম্যান, যেটা তাদের মানায়।

কিন্তু আমার বস্তুে বয়ে চলেছে ফরাসি-কানাডীয় ধারা।

সেন্ট লরেঞ্জ নদী যে জায়গায় কুইবেক প্রণালির দিকে এগিয়ে চলেছে সেখানে একটা বিরাট ডুবে যাওয়া জাহাজের মতো নদীর মাঝখানে একটা চর জেগে রয়েছে। এই চরটার বাইরে ইল দর্লিয়ানের উত্তর উপকূলে স্যাং ফার্মিয়ে নামে ছোট্ট একটা জায়গা হচ্ছে আমার জন্মস্থান।

আমাব বার-মুখো হওয়ার অভ্যাসটা আসে, এই মহান নদীর বুকে আর তীরে তীরে আমার ঘুরে বেড়ানো, মাছ ধবা আর তাঁবু নিয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানো থেকে নানা রকমের খেলার মাধ্যম থেকে।

আমার মনের মধ্যে মা-বাবাকে মনে রাখার জায়গা নেই বললেই চলে। তবে এটুকু আমার মনে আছে যে, আমি বাবাকে খুব ভালোবাসতাম — মাকে খুব একটা পছন্দ করতাম না। আমার বাবা-মা মন্দিরিয়েলে একটা বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটা যুদ্ধকালীন প্লেন-ক্রাশে তারা মারা যান। তখন আমার বয়েস মাত্র আট বছর। তারপর আমার অভিভাবিকা নিযুক্ত হয় আমার বিধবা মাসি শ্রীযুক্ত ফ্লোরেন্স কোর্টের আদেশ অনুযায়ী। অতএব তিনি চলে এলেন আমাদের ছোটো বাড়িটাতে।

আমরা দু'জনে দু'জনকে বেশ ভালোভাবেই মেনে নিয়েছিলাম। আমি তাঁকে সত্যিই খুবই ভালোবাসতাম। তাঁর একটা গুণ ছিল তিনি প্রোটেষ্ট্যান্ট হয়েও আমায় ক্যাথলিকদের মতোই মানুষ করেছিলেন। পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত আমি উরসুলিন কনভেন্টে পড়ি। তারপর ষোলো বছর বয়সে ঠিক হয়, আমি ইংল্যান্ডে গিয়ে নিজেকে তৈরি করব। এই কথায় আমাদের এলাকায় বেশ হই-চই পড়ে গিয়েছিল।

ভিক্টোরিয় যুগের শেয়ার-বাজার -এর যত থ্যানিংডন এলাকায়, ঠিক এই জাতীয় ইংরেজ বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির মতোই মিস থ্রেডগোল্ডের 'অ্যাস্টার হাউস'। বাড়িটার ওপরের তলা গুলোতে পঁচিশ জোড়া মেয়ের থাকার অর্থাৎ শেয়ার ঘর করা হয়েছিল প্লাস্টার বোর্ড দিয়ে ভাগ ভাগ করে। যেহেতু আমি 'পরদেশী', 'কৃষকায়', বাহুমূলে ছাইরঙের চুলের চাবড়া বিশিষ্টা, ধনী বহু লক্ষ লক্ষ টাকার মালিকিন এক লেবানন-দেশী 'পরদেশিনী'কে আমার ঘরে রাখা হল। এই মেয়েটির বড়ো সাধ চকোলেট খাওয়া আর একজন মিশরীয় চিত্রতারকা বেন সৈয়দ-এর প্রতি।

আসলে ঐ লেবানন-জায়া-ই আমায় বাঁচিয়েছিল। আমায় বাঁচিয়েছিল ওর খিটখিটে বদ মেজাজ, গায়ের দুর্গন্ধ আর ওর টাকার গরম। এর জন্যে স্কুলের অন্যেরা নিয়ম না মেনে আমায় সহানুভূতি দেখাত, আমার প্রতি তাদের মায়াও ছিল। আবার আরো অন্যেরা যারা আমায় তা দেখাত না, আমি যন্ত্রণায় ভুগতাম — আমার ভুল উচ্চারণ, আদব-কায়দা, খাবার টেবিলের নিয়ম-কানুন যেটা সত্যিই খুব বিসদৃশ। আমায় কানাডার মেয়ে হবার জন্য চাল-চলন, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার শিখতে হবে।

আসলে আমি ছিলাম অতিরিক্তভাবে স্পর্শকাতর — যা মনে করব তাই করতাম, কিছুতেই কেউ আমায় বিরক্ত করুক, পেছনে লাগুক, বরদাস্ত করতাম না। যারা আমার সঙ্গে এই রকম করতে এসেছে তাদের উচিত শিক্ষা দিয়েছি এবং তারপর তারা দল বেঁধে একদিন রাগে আমার ঘরে এসে আমায় চেপে ধরে, মেরে, চুল টেনে, চিমটি কেটে, জল টেলে ভিজিয়ে শেষ পর্যন্ত আমায় কাঁদিয়ে ছাড়ল। আর প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছাড়ল যে, ভবিষ্যতে আর কখনও এলেক হরিণ যেমন সবসময় মারকাটা হয়ে থাকে, ওরকম হবে না। তারপর থেকে, আমার মেজাজ ঠান্ডা হল, আমি চুপ মেরে গেলাম আর 'সম্রাজ্ঞ মহিলা' হবার আদব-কায়দা শিখতে লাগলাম।

আমার যা কিছু অসুবিধা বা ক্ষতি হত সেগুলো মিটে যেত ছুটি এলেই। আমার বন্ধুত্ব হল স্কটল্যান্ডের মেয়ে সুসান ডাফ-এর সঙ্গে, যে মেয়েটা আমারই মতো নীল আকাশের নীচে ঘুরে ঘুরে আনন্দ করত। বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ের বাস্ববী হওয়ায় তাঁরা আমার ওপর খুশি হয়েছিলেন। সেই সুবাদে গরমকালে স্কটল্যান্ড এবং সমস্ত শীতকাল ধরে সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ইটালি — সারা ইউরোপ ঘুরে 'শী' করে বেড়ানো। আমরা দু'জনে এমনভাবেই একত্র হয়ে গিয়েছিলাম যে স্কুল ছাড়ার পর আন্টিফ্লোরেন্স হাইড পার্ক হোটেলে যে যুগল নৃত্যের আয়োজন করেছিল একজন বোকা নির্বোধ পাঁচশো পাউন্ড খরচ করে, তাতে আমিও অংশগ্রহণ করেছিলাম। এই রকম আরো অনেক নাচের আসরে দেখেছি এখানকার তিলে পড়া যুবকেরা বেশ রুক্ষ এবং তাদের ব্যবহার ঠিক পুরুষের মতো নয় যে জিনিসটা আমার জানা কানাডার যুবকদের মতো সভ্য নয়।

ডেরেকের সঙ্গে এখানেই আমার আলাপ পরিচয় হয়।

এই সময় আমার বয়স সতেরো বছর ছুন্মাস হয়েছে। এখন আমরা কিংস রোডের কাছে একটা তিন ঘরের ফ্ল্যাটে — আমি আর সুশান থাকছিলাম। যেহেতু এখন জুনের শেষ অতএব নাচ-গানের কোনো অনুষ্ঠান না থাকায় আমরা সেইসময় পরিচিতদের মধ্যে যাদের ভালো লেগেছিল— তাদের একটা পার্টিতে নেমস্তন্ন করব। আমাদের ফ্ল্যাটের সামনে অন্য একটা ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা ছুটিতে বিদেশে যাবেন। তাই তাদের কাছে আমরা বলি যে, আমরা আপনার ফ্ল্যাট পাহারা দেব। প্রতিদানে আমরা ঐ ফ্ল্যাটটা ব্যবহার করব।

বর্তমানে আমাদের হাত প্রায় খালি হয়ে গেছে। ঐ যে-সব পার্টিতে আমরা তার উপযুক্ত হতে। তাই আমি আন্টি ফ্লোরেন্সকে টেলিফোন করতে তিনি একশো পাউন্ড পাঠিয়ে দিলেন আর সুসানের কাছ থেকে পঞ্চাশ পাউন্ড পাওয়া গেল। মোট দেড়শো পাউন্ডে ভালো পার্টিই হবে। আমরা ত্রিশ জনকে নেমস্তন্ন করলাম — তার মধ্যে কুড়িজন আসবেন, জানা গেল। এবার আমরা আঠারো বোতল গোলাপি শ্যাম্পেন কিনলাম যেটা শুনতেই উত্তেজক। ক্যাভিয়ারের দশ পাউন্ডের টিন, ফোয়ে গ্রা-র সস্তা কয়েকটা টিন, মাইস করে ঠিকঠাক ভাবে কাটা হল। আর রসুনের তৈরি প্রচুর জিনিস কেনা হল সোহো থেকে। বাদামি পাঁউরুটি কেটে মাখন লাগিয়ে আমরা অনেক স্যান্ডউইচ তৈরি করলাম। সেকাঁ স্যামন মাছ আর স্যালাড দিয়ে। বড়োদিনের আমেজটা জড়িয়ে এর সঙ্গে যোগ হল এলভাস প্লুম আর চকোলেট। এটাই আমাদের মস্ত বড়ো ভুল হয়েছে কারণ কেউ এর একটা জিনিসও ছোঁয়নি। দরজার কবজা খুলে একটা পাঁজা সরিয়ে তার ওপর সমস্ত জিনিসগুলো সাজিয়ে রেখে সাদা চাদর চাপা দিয়ে বুফে তৈরি করা হল — সমস্ত ব্যাপারটা পুরোপুরি বড়োদের মতো হল।

পার্টিটা যেমন হওয়ার তার চেয়ে অনেক ভালোভাবেই শেষ হয়েছে। শেষপর্যন্ত ত্রিশ জনের সকলেই এসেছেন, কেউ কেউ আবার অন্যের অতিথি হয়ে এসেছেন — সবাই ঠেসাঠেসি করে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে — দেখা গেল একটি ছেলে একটি মেয়েকে তার কোলেই বসিয়ে রাখল। হই হট্টগোল আর উন্মাদনা হয়েছে পুরো মাত্রায়। সব চেয়ে খারাপ ব্যাপার হল শ্যাম্পেনের সব কটা বোতল শেষ। আমি টেবিলের ওপর থেকে শুনতে পাচ্ছি একটা অপদার্থ শ্যাম্পেনের শেষ বোতলের শেষ ফোঁটা গলায় ঢেঁচি চিৎকার করছে বিশ্রীভাবে — জল— জল — একটু জল না পেলে আর ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে পারব না।

আমার বেশ ভয় লেগে গেল। বলে ফেললাম — আর তো এক ফোঁটাও নেই।

একটা লম্বা ছেলে যে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে এসে বললে — ‘কে বললে নেই! মদের ভাঁড়ারটা তো দেখতে ভুলে গেছেন।’

সেই ছেলেটি আমার কনুই ধরে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, — ‘চলুন কাছের দোকান থেকে কিনে আনি। এমন আসর নষ্ট হবে?’

ঠিক আছে। কাছের বার থেকে দু বোতল জিন আর বেশ কিছু লেবু কিনে ফিরলাম। সেই যুবকটি জিনটার দাম দিল অতএব আমায় লেবুর দামটা দিতে হল। আমার সঙ্গেই তরুণ যুবকটি বেশ মৌজেই রয়েছে, বললে — এখানে আসার আগে আর একটা পার্টিতে সুসানের বন্ধু নর্মান দম্পতির সঙ্গে এখানে চলে এসেছেন।

ছেলেটির নাম বললে — ডেরেক ম্যালাবি।

আমার নজর ছিল এই জিন আর লেবুগুলো তাড়াতাড়ি আসরে পৌঁছবার, তাই ওর কথায় খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছিলাম না।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে আসরের হই-ছল্লোড় কানে আসতে লাগল।

আসরের অনঙ্গ চবমে উঠে এখন থিতিয়ে যাওয়ার মুখে। বারা পরস্পরের সঙ্গে মিলন-মেলায় মেতেছিল তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যার ঘরে যাচ্ছে। আর যে সমস্ত বিশিষ্টদের এর পরেও আর কোথাও নৈশভোজের নেমস্তন্ন নেই তারাই কেবল রয়ে গেল।

অবশেষে একে একে এরাও চলে গেল। নর্মান দম্পতি যাবার সময় বলে গেল ডেরেক ম্যালাবিকে যে, দবজার চাবিটা মেঝের ওপর ঢাকা দেওয়া কাপড়ের তলায় থাকবে।

শেষ মুহূর্তে সেই সুদর্শন ডেরেক ম্যালাবি আমাব কানের পাশের চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে তার গন্তীর গলায় বললে, আমি তার সঙ্গে বাইরে যাব কিনা — তাতে সুসান বলল রাস্তার অপর পারে প্যোপ্যাট। যেটা আমার সম্পূর্ণ অজানা। আমরা যেতে পারি। তখন আমি রাজি হয়ে গেলাম।

মনে হয় সে বেশ লম্বা বলে।

তার ওপর যখন আমাব অবস্থা কী করবে বুঝতে পারছি না, তখন সে আমার সব দায়িত্ব বুঝে নিল।

আমরা সামনে এগিয়ে পড়লাম।

আমরা আর পেছন দিকে তাকালাম না যেখানে চলছে মত্ততার হই-ছল্লাও।

আমাদের পর সুসান তার বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আমরা একটা ট্যান্সি পেলাম কিংস রোডে। সে আমাদের নিয়ে গেল লন্ডনের বুক চিরে টোটেমহ্যাম কোর্ট রোডের 'দাবাম্বু' নামের যে স্প্যাগোটি হাউস আছে, সেখানে। আমরা স্প্যাগোটি রলোনিজ আর এক বোতল ইনস্ট্যান্ট বোজোলে নিলাম— (এ নামটা তার কাছেই শুনেছিলাম)। বোজেলের প্রায় কিছুই সে বাকি রাখেনি। খেতে সে বর্লোছিল — বর্তমানে তার বয়স আঠারো এবং স্কুলের জীৱনেব শেষ বছব। আর বাসস্থান উইন্ডসর এর প্রায় খুব কাছে।....

তাছাড়া ক্রিকেটের প্রথম একাদশ জনেব মধ্যে ও রয়েছে।

ওকে আজ সারাদিনই লন্ডনে উকিঙ্গদের সঙ্গে কাটাতে হবে। কারণ ওর মাসি মারা যাবাব সময় ওর নামে কিছু টাকা রেখে গেছেন, সেটার স্বত্ত্ব নেবার জন্য।

ওব বাবা-মা সকাল থেকে ওর সঙ্গে থেকে লর্ডসের মাঠে এম. সি. সির খেলা দেখতে গেলেন। তারপর নর্মানদের কাছে ওকে রেখে তারা উইন্ডসর-এ ফিরে গেলেন।

ওর প্ল্যান ছিল থিয়েটারে যাবার, তারপর ঘুম। কিন্তু ঐ পাটির পরে আমার পাটির আমন্ত্রণ পেল। আচ্ছা 'ফোর হানড্রেড'-এ গেলে মন্দ হয় না!

অস্বীকার করে লাভ নেই যে আমি খুবই রোমাঞ্চিত হলাম।

লন্ডনেব সেরা নাইট ক্লাব — 'ফোর হানড্রেড'।

আমাব দৌড় বলতে চেল্‌সির 'সেলার প্রেস' পর্যন্ত ওই নৈশ কুঞ্জ বলতে।

আমিও নিজের কিছু কিছু ঘটনা বললাম।

ওর সঙ্গে কথা বলতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। 'অ্যান্টার হাউস' সম্বন্ধে অনেক রকমের মজার কথা হল।

ও যে স্কুলের ছাত্র হয়েও খুব বেশি পাকা সেটা বোঝা গেল, রেস্টোরাঁর বিল যখন এল তাতে কতটা বকশিস দিতে হবে, তা দেখে। আর এটাও বোঝা গেল যে, ইংল্যান্ডের পাবলিক স্কুল ছাত্রদের খুব শিগগির মাতব্বর তৈরি করে দেয়, আদব কায়দায় চৌকস করে দেয়। ট্যান্সি ডেকে আমরা উঠলাম — ও পাশে বসে আমার হাত ধরল, এটাকে আমি ধর্তব্যের মধ্যে ধরলাম না।

পরিষ্কার হয়ে গেল যে, 'ফোর-হানড্রেড' রেস্টোরাঁর সবাই ওর জানা।

ভেতরে ঢুকেই আমরা বেশ মিষ্টি উপভোগ্য অঙ্ককারে গা ভাসিয়ে দিলাম।

জিন আর টার্নকেব অর্ডার দিল ও। একটা আধ বোতল জিন দিয়ে গেল দেখে মনে হয় যেন কাল ও বাকি অর্ধেকটা খেয়ে রেখেছে।

সামনে একটা মঞ্চ রয়েছে যার ওপর মরিস স্মার্ট তার মিষ্টি, নরম সুর চাবদিকে ছাড়িয়ে দিচ্ছিল। এই সুবের সঙ্গে আমরা নাচ শুরু করলাম। এই জাজ সুরটা আমার বেশ চেনা তাই তাল মেলাতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

অস্বীকার করার কিছুই নেই যে, আমি আরামে আমোদে ভরপুর। লক্ষ করলাম ওর কপালের কালো চুলগুলো সুন্দর ভাবে রয়েছে। ওর হাত দুটোও বেশ দৃষ্টিনন্দন। আর ওর হাসিটা কারুর মুখের দিকে চেয়ে নয় — তার চোখের দিকে চেয়ে।

এই মিষ্টি কোমল উপভোগ্য অন্ধকারে আমরা ভেসে বেড়ালাম ভোর চারটে পর্যন্ত। ও জিনেব বোতলটা শেষ করল — তারপর রাস্তায় যখন বেরোলাম তখন আমায় ওকে ধরলে, তবে ও চলতে পারছিল।

একটা ট্যাক্সিকে ও ডাকল।

ট্যাক্সিতে উঠে আমরা পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলাম। তারপর ও আমায় চুমু উপহার দিল। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। আমিও ওর উপহারের প্রতিদান দিলাম। এটা যেন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

তারপর ও আর একটু এগল। আমাব বুক হাত রাখল। একবার নয় দু-দুবার। হাত আমার বুকের ওপর পড়ল। তখন আর বাধা দিলাম না। দিলে খুবই খারাপ হত।

এই বাধা না দেওয়াতে ওর হাতের সাহস মনে হল বেড়ে গেছে। তাই ওর হাতটা আমার বুক থেকে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে থাকল। তখন ওকে বাধাই দিলাম। এই সাহসে আমার সম্মতি দিলাম না।

বাধা দিলাম বটে কিন্তু আমার শরীর, সারা শরীর কী এক অজানা উষ্ণতায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

ঈশ্বরই আমায় বাঁচালেন। তাঁকে ধন্যবাদ। ঠিক সেই সময়েই ট্যাক্সিটা আমাদের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়াল। ও বেরিয়ে আমরা হরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

দুজনেই বললাম — আবার দেখা হবে।

ও চিঠি লিখবে বলল।

শেষে ও আমায় বিদায় চুম্বন দিল। আর হাতটা আমার পিঠ থেকে নেমে এলো অনেক নীচে আর সেইখানের মাংসটা সে খামচে দিল। ওঃ কী আরাম! ওর ট্যাক্সি চলে গেল — তবুও ওর হাতের মধুর নিপীড়ন আমার সুডৌল নিতম্বে অনুভব কবছিলাম।

বিছানায় আস্তে আস্তে শুয়ে মুখ তুলে বেসিনের ওপরের আয়নায় নিজের মুখ দেখলাম। দেখতে পেলাম আমার মুখের ওপর যেন কোথা থেকে একটা উজ্জ্বল জ্যোতি ভেসে উঠল। সেই জ্যোতির মধ্যে যদিও জিনের প্রভাব বেশি, তবুও আমি চিন্তা করলাম — হে ঈশ্বর, এ যে আমার প্রথম প্রেম। প্রেম আমায় গ্রাস করেছে।

॥ তিন ॥

মনের মিষ্টি মধুর কথা মনে করতে সময় লাগে মাত্র কয়েক মিনিট। কিন্তু লিখতে গেলে লেগে যায় কয়েক ঘন্টা।

মোটেলের সুখপ্রদ চেয়ারে বসে অতীতকে মনের মধ্যে এনে, যখন সুখ-স্বপ্ন দেখতে দেখতে

বিভোর — তারপর যখন সেটা ভেঙে গেল তখনও দেখলাম উয়োকো বেতারকেন্দ্রের ‘মনের মতো গান’ চলছে।

চেয়ার থেকে উঠে আরও কতকগুলো বরফের টুকরো গেলাসে নিলাম, কারণ আগের গুলো সব গলে গিয়েছিল। আবার চেয়ারে গুছিয়ে আরাম করে বসে একমুখ ভর্তি করে বুরবৌ নিলাম যাতে অনেকক্ষণ থাকে, আবার একটা সিগারেট ধরলাম। আর সেই মুহূর্তে আমার মন চলে গেল নিঃশেষ নিদাঘের তীরে।

আমি আর ডেবেক দু’জনে দু’জনকে চাবটে করে চিঠি লিখেছি। ডেরেকের স্কুলের শেষ বছর শেষ হল।

আমার কাছে ওর প্রথম চিঠি এল তার সম্বোধন ছিল ‘প্রিয়তমেষু’ আর শেষ হল অনেক অনেক ভালোবাসা আর চুমু দিয়ে। এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে আমি লিখলাম ‘প্রিয়’ আর শেষে ‘ভালোবাসা’।

ওর চিঠিটা ভর্তি থাকত ও খেলায় কত রান করেছে। আর আমার চিঠিতে থাকত আমি কোন কোন সিনেমা আর থিয়েটার দেখেছি। গরমের ছুটিতে ও বাড়িতেই থাকবে। ও মানসিক ভাবে খুব চনচনে হয়ে রয়েছে — কারণ ওর ‘বাবা-মা ওকে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড এম. জি. গাড়ি কিনে দেবে বলেছেন। ও আরও লিখেছে আমি কি ওর সঙ্গে ঐ গাড়িতে বেড়াতে যাব?

আমার ইচ্ছে কিছুদিন ওর সঙ্গে ফ্লাটে থাকব, এবার আর স্কটল্যান্ডে যাব না। আমার কথা শুনে সুসান বিশ্বাস করতে চাইছে না। ডেরেকের কথা সুসান জানে না। আমাদের দুজনের মধ্যে যেহেতু আমি সকলের আগে ঘুম থেকে উঠি, তাই চিঠির কথা সুসান জানতে পারে না। কোনো জিনিস লুকোনো আমার স্বভাব নয়, তবু আমার ‘প্রণয়ের ব্যাপারটা অতি মূল্যবান সম্পত্তির মতো লুকিয়ে রাখতাম। এটা এতই ঠুনকো আর নিরাশায় ভরা। আমার ধারণা এ কথাটা প্রকাশ করলে খুবই দুঃখের হত। আমি নিশ্চিত জানতাম যে, ডেরেকের যা বাঙ্কবী আছে, আমি তাদের অনেকের মধ্যে একজন মাত্র। আমি আমার কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি যে, ডেরেকের চেহারা এতটাই আকর্ষক ছিল যে, কলেজের ছাত্রী হলেও, লন্ডনের সম্রাজ্ঞী আর অভিজাত মেফেয়ার এলাকার সমস্ত মেয়েরা অর্গান্ডির পোশাক পরে তার সাহচর্য পাওয়ার জন্য লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আমি একটা চাকরির খোঁজে ঘোরাঘুরি করব, সেটা সুসানকে বললাম, পবে আবার যেতেও পারি। ঠিক সময়ে সুসান উত্তরাঞ্চলে চলে গেল আর ঠিক সেই সময়েই ডেরেকের পঞ্চম চিঠি পেলাম। সেই চিঠির মূল বক্তব্য ছিল, আমি যেন আগামী শনিবার বেলা বারোটোর ট্রেনে প্যাডিংটন থেকে উইন্ডার স্টেশনে আসি — আর সেখানে ও গাড়ি নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

এখান থেকে নিয়মিত ভাবে শুরু হল আমার মিস্তি মধুর সাপ্তাহিক মিলনের।

প্রথম শনিবার ও আমায় অভ্যর্থনা জানাল প্ল্যাটফর্মে এসে।

আমার নিজেরই মনে হচ্ছিল আমি লাজুক, লাজুক।

গাড়িটা তার কাছে এতই প্রিয় ছিল যে, সেটা আমাকে দেখাবার জন্য সে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গাড়িটা দেখলাম — দেখার মতো গাড়ি-কালো-লাল চামড়ার গদি আঁটা, চাকায় সর্ক সর্ক শিক বসানো, এবং একটা রেসিং কার-এর যা-যা থাকা প্রয়োজন, সবই আছে, যেমন — ছাউনি ঢাকনির ওপর বাঁধা, গ্যাস ট্যাংকের ওপর একটা বিরাট গোছের ঢাকনি। তার সঙ্গে রয়েছে ইংরিজি অঙ্করে লেখা বি. আর. ডি. সি.। গাড়ির ভেতরে দেখলাম ডেরেকের রেশমি রুমাল রয়েছে সেটা আমার চুলে বেঁধে নিলাম। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল রাস্তার আলো ছাড়িয়ে নদীর দিকে যেতে যেতে। আর সঙ্গে সঙ্গে এক ফুট পাইপ থেকে একটা বিকট আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

সাধাবণ গলিব মুখে বাঁক নেবার সময়ও সে অহেতুক জোরে বাঁক নিচ্ছিল। যেন বেস-কোর্সে গাড়ি চালাচ্ছে, আসনগুলি মাটির কাছাকাছি রয়েছে। তাই যখন পঞ্চাশ মাইল জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল মনে হচ্ছিল যেন একশো মাইল জোরে গাড়ি ছুটছে। ব্যাকবোর্ডে ওপর নিরাপত্তা-হাতলটা ধরে ভাবছি ভালোয় ভালোয় যাত্রা শেষ হোক।

আমার ভয়টা ক্রমশ দূর হল, যখন দেখলাম, ডেরেক চালক হিসাবে বেশ ভালো।

‘হোটেল দ্য প্যারিস’ নামে একটা সাংঘাতিক সাজানো জায়গায় ডেরেক নিয়ে গেল। আমরা সেকা স্যামন মাছ, মুরগির রোস্ট আর আইসক্রিম নিলাম। পাশেই নৌকোর ডেরা। সেখান থেকে ব্যাটারিচালিত একটা নৌকো ভাড়া করে আমাদের নিয়ে নদীতে ভাসল, তারপর নদীর স্রোত কেটে, ঘুম ঘুম ভাবে মেইডেনহেড সেতু অতিক্রম করে একটা খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে নৌকোটা নোঙব করল একটা গাছের ছায়ার নীচে। ও সঙ্গে করে একটা ছোট্ট গ্রামোফোন এনেছিল। তাতে রেকর্ড চালিয়ে নৌকার একপাশে গিয়ে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম। গ্রামোফোনে গান চলছে আর আমরা দেখছি মাথার ওপর গাছে একটা পাখি নাচছে। ঘুম-ঘুম বিকাল বেলাটা খুবই সুন্দর লাগছিল। আমরা দুজনে দুজনকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলাম। আমরা আমাদের চুমু খাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলাম। এতে ডেরেক বুঝল, আমি অত সহজলভ্য নই। ডেঁও পিঁপড়ের মতো পোকা উড়তে থাকায় আমরা নৌকো নিয়ে খাঁড়ির পেছন দিকে যেতে না পারায় স্রোতে দ্রুত এগিয়ে চললাম। নদীর বুকে দেখলাম আরও অনেক নৌকো চলেছে — তাতে অনেক নর-নারী রয়েছে। অনেক পরিবার রয়েছে। অনেক যুগলও রয়েছে, কিন্তু সকলের মধ্যে আমরাই ছিলাম সবচেয়ে প্রাণবন্ত। ডাঙায় উঠে ডেরেকের জন্যে ‘দ্য থ্যাচড হাউস’ নামে একটা পাছনিবাসে গিয়ে কফি আর ডিমের বুনিভাজা খেলাম। খাওয়ার পর ডেরেক প্রস্তাব দিল সিনেমায় যাওয়ার।

ফারকুয়ার স্কোয়ার ‘দ্য রয়্যালটি’ সিনেমাটা হচ্ছে ক্যাসল থেকে অ্যাসকট রোডে যাওয়ার মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট বাস্তুগুলোর ধারে। বেশ ছোটো মতন দেখতে। ওখানে একটা কার্টুন ছবি, আর তথ্যচিত্র গোছের অর্থাৎ একমাস আগে ইংল্যান্ডের মহারানি কী কী করেছিলেন তার হিসাব।

আমি বুঝতে পারলাম না ও কেন বারো শিলিং দিয়ে বস্ত্রের টিকিট কাটল। প্রজেকশান রুমের দুপাশে দুটো বাস্ক। একটাতে আমরা বসলাম — ছ’ফুট বর্গক্ষেত্রের জায়গা। ভেতরে ঢুকেই ডেরেক তার চেয়ারটা আমার চেয়ারের পাশে টেনে আনল। ঘূটঘূটে অঙ্ককার। তার মধ্যে ডেরেক আমার পাশে বসে আমায় জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছিল আর তার হাতটা আমার শরীরের সমস্তটা জুড়ে খেলা করে বেড়াতে লাগল।

আমার মনে হল — হায় কপাল, এইখানেই তাহলে ও ওর মেয়েবন্ধুদের নিয়ে আসে।

এরপর যাকে বলে গলে যাওয়া — আমারও তাই হল।

এইবার ওর হাত আমাব শরীরের অনেক কিছুই না জানা জায়গা খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু ওর ছোঁয়া এত মিষ্টি যে, তা বলবার নয়। আর এটা একটা বাইরের জায়গা বলে আমার কিছুটা লজ্জা লজ্জা করছিল। ওর কাঁধে মুখ লুকোলাম। সারা শরীরটা এত শিরশির করছিল যে, সেটাকে রুখতে নিজের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলাম। ও ওর কাজ করে চলল — আমার তরফে কোনো বাধা নেই — বেশ ভালোই লাগছে। একসময় ও তার কাজ শেষ করল — আমার সারা শরীরের ভেতরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। আমার চোখের জলে ওর জামার কলার ভিজে গেল।

সবশেষে একটা খুব সুন্দর মিষ্টি চুমু দিল — ওর বক্তব্য আমিই পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি মেয়ে ওর কাছে।

এবার ঠিক হয়ে বসলাম। চোখের ভেজা পাতা মুছে ফেললাম। এবার আমার চিন্তা হতে লাগল যে, আমার কুমারীত্ব চলে গেল — এবার ও আর আমায় সম্মান দেবে না।

ও আমার জন্য আইসক্রিম নিয়ে এল ইন্টারভ্যালের সময়। তারপর আমায় পিছন থেকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে — আজকের দিনটা ওর জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় দিন — এই দিনটা যেন ওবা বহু বছর ফিরিয়ে আনতে পারে।

এই ধরনের কথা পুরুষরা বলেই চলে — এটা তাদের সান্ত্বনা বাক্য। আর বোকার মতো ডুবে যাব না।

তা সত্ত্বেও এই আত্মদাম এমনিই যে যেন নিজেকে কোনো আরকে ডুবিয়ে রাখে। এর ফল হিসেবে আমার অন্তঃসত্ত্বা হওয়া আর কোনো ঝগড়াটে পড়তে হবে না।

আর ছেলেরা তো একটু আদর-তাদর করবেই। যদি বাধা দিই, সে সেখানে চলে যাবে যেখানে কোনো বাধা থাকবে না।

ওর জন্যে কী রকমের একটা খু উ ব মমত্ববোধ অনুভব করতে লাগলাম। ওকে আমার একটা ছোট্ট শিপি চুমু উপহার দিলাম। আমার কী হল এই সময় থেকেই আমরা একটা বিশেষ ধরনের বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়লাম।

আমাকে গাড়ি করে লন্ডনে ফেরার শেষ ট্রেন ধরার জন্যে স্টেশনে নিয়ে এল এবং ঠিক হল পরের শনিবার ঠিক একই সময়ে আমরা মিলিত হব।

ছোট্ট স্টেশনটার হলদে আলোর নীচে দাঁড়িয়ে ও হাত নাড়ছিল। ট্রেন ছাড়ল। যতক্ষণ ওকে দেখা যায় চোখ ভরে দেখে নিতে লাগলাম।

এইখান থেকেই আমাদের সত্যিকারের ভালোবাসা বলতে যা বোঝায় তাই শুরু হল।

একই ছাঁচে সব কিছুই চলে যাচ্ছে। কেবল স্থান পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন— দুপুরের লাঞ্চার জায়গা, বিকেলের চা খাবার রেস্তোরাঁ, নদী, গ্রামোফোন বা সিনেমার সেই চিরপুর্নচিত্ত বাস্তব।

এর সঙ্গে যোগ হল শরীরের বাড়তি রোমাঞ্চকতা। যেখানেই থাকি — সে গাড়ি হোক, নদী হোক বা সিনেমাই হোক — সব জায়গাতেই আমাদের দুজনের হাত খুবই ব্যস্ত থাকত একে অপরের দেহ পরিচর্যায় — বেশ অনেক সময় ধরে, নিষ্ঠা সহকারে।

এইভাবে সেপ্টেম্বরের শেষ শনিবার এসে গেল।

ঘটনাটা উপেক্ষা করতে চাইলে কী হবে — আমাদের সম্পর্ক একটা নতুন পর্যায়ে এসে পড়েছে। সোমবার সুসান ফ্ল্যাটে আসবে। আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে। ডেরেক অক্সফোর্ডে পড়তে যাবে। আমাদের ভাব এমনিই যে, আমাদের বর্তমান সম্পর্কের কোনো ঘটটি ঘটবে না। ঠিক করলাম, সুসানকে সব কিছু খুলে বলব — আর সপ্তাহের শেষে হয় আমি অক্সফোর্ড যাব, নচেৎ সে লন্ডনে আসবে। আমাদের মেলামেশা সম্পর্কে কোনো কথাই হয়নি — এটা ঠিকই ছিল যেমন চলছে, তেমন চলবে।

ডেরেক তাব বাবা মায়ের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিতে চাইছিল তবে খুব একটা তাড়া ছিল না তার বলার মধ্যে। প্রতি শনিবার আমাদের মিলনের সময় এতসব কিছু করার ছিল। আর আমার ধারণা ছিল যে, সপ্তাহের বাকি ছ'টা দিন ডেরেকের আমার কথা ভাববার সময়ই ছিল না। ঐ ছ'টা দিন ডেরেক-এর ছিল ক্রিকেট, টেনিস খেলা, আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারা। আমি চাইতাম না ওর ঐ জীবনের সঙ্গে আমার জীবন মিশিয়ে দিই। কারণ, সপ্তাহের একটা দিন তো ওকে আমি পুরোপুরি পাচ্ছি, তাতেই আমি খুশি। আমি অন্য বন্ধুদের সঙ্গে লন্ডনের মধ্যে অপরের সঙ্গে থাকতে চাই না। অতএব ঐ দেখা করার কথা, কথাতেই রইল, আমি আগামী শনিবার ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করছি না।

পরের শনিবার ডেরেক এল যেন সে অনুরাগে পরিপূর্ণ হয়ে। বিকেলে আমাকে নিয়ে ব্রিজ হোটেলেরে নিয়ে গিয়ে তিন রাউন্ড জিন আর টনিকের অর্ডার দিল। আমরা সচরাচর মদ্যপান করি

না। তবুও সেদিন খেলাম। তাব পরেও ডিনাবের সময় শ্যাম্পেন খাবার জন্য আমার ওপর জেদ ধরল। অতএব খেতেই হল। শেষে সেই ছোট্ট সিনেমায় গিয়ে যখন পৌছালাম, তখন দুজনেরই বেশ নেশা ধরেছে। তখন মনটা খুশি লাগছে এই ভেবে যে, আগামীকাল আমাদের ছকে-বাঁধা মিষ্টি জীবনযাত্রা ভেঙে যাবে। নতুন জীবন শুরু হবে। অতএব এটা ভোলা সহজ হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে আমাদের চিরপরিচিত বন্ধুটার মধ্যে ঢুকে দেখলাম ডেরেকের মনটা যেন বিষণ্ণ হয়ে আছে। কারণ, প্রতিবারের মতো সে আমায় তার বাহুডোরে জোরে জড়িয়ে ধরল না। উপরন্তু আমি তার কাছে সরে যেতে সে তার চেয়ার সরিয়ে নিয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে সিনেমার পর্দায় তার মনোনিবেশ করল। জিজ্ঞেস করলাম : হল কী?

একটু থেমে বেশ জেদের সঙ্গে বললে -

আমি চাই তুমি আমার পাশে শোবে। অর্থাৎ শোয়ার মানে বা হওয়া উচিত তাই।

আমি আঁতকে উঠলাম ওর গলার স্বরে।

এসব ব্যাপারে আমাদের আগে আলোচনা হয়েছে এবং আমরা এটাকে সামঞ্জস্য-এর মধ্যে রাখার পবিকল্পনা করেছিলাম — সেটা পরিপূর্ণতা লাভ করে 'পরে'। আমি তাকে আমাদের আগের কথাগুলো বলতে লাগলাম। কিন্তু আমার বেশ ভয়ও করছিল। আমার কেবল ভয় হচ্ছে যে, আমাদের শেষ সন্ধ্যাটি বোধ হয় মাটি হয়ে গেল। সে পাগলের মতো তর্ক জুড়ে দিল। আমি একেবারে শুদ্ধ কুমারী হয়ে যাচ্ছি। সেটা ওর কাছে ভালো নয়। যখন আমরা প্রেমিক-যুগল, তবে আমাদের মধ্যের ব্যবহারে তার বিভেদ থাকবে কেন? আমি বললাম — এতে তো আমার 'মা' হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। ও সেটা উড়িয়ে দিয়ে বললে — ওর জন্যে ভাবনার কিছু নেই — সেটা থেকে বাঁচবার জন্য যা-যা করণীয় তা সে করবে এবং পরবে। আমি তাকে ঠেকাতে চেষ্টা করলাম — তা এখন কেন? এখানে তো সে কাজ করা সম্ভব নয়!

সম্ভব নয় কেন? যথেষ্ট জায়গা আছে এখানে। ও অক্সফোর্ডে যাবার আগেই এই কাজ করে ফেলতে চায় — কারণ এটা ওর কাছে প্রাথমিক বিয়ের মতো।

আমার মধ্যে বেশ কাঁপুনি লেগে গেল। ভাবলাম — নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু কারণ আছে। আমাদের ভালোবাসার এটা হবে একটা রবার স্ট্যাম্প। ভাবছি বটে তবে ভয়ও করছে।

আচ্ছা, 'ওসব জিনিস' কি তুমি সঙ্গে করে সবসময় রাখো?

আরে না-না। একটা ওষুধের দোকান আছে কাছেই। সারারাত খোলা থাকে। সেখান থেকে নিয়ে আসছি। বলে আমায় আবার একটা গভীরভাবে চুমু খেয়ে চলে গেল।

একলা বসে বসে আবোল-তাবোল ভাবতে লাগলাম। ওকে এখন আর ফেরানো যাবে না। এই এল বলে। সিনেমাব এই নোংরা জায়গায়, নোংরা বক্সে এ কাজ করা হবে খুবই সাংঘাতিক কেচ্ছার ব্যাপার। ও খুব কষ্ট পাবে। আমি যদি এখন পিছিয়ে যাই তো ও আমাকে ঘেন্না করতে শুরু করবে। আমার মনে হতে লাগল যে, এখান থেকে পালিয়ে স্টেশনে গিয়ে পরের ট্রেনে লন্ডন ফিরে যাই। তাতে ও আরও খেপে যাবে। ওর অহংকারে বাধবে। খেলতে বসে নিয়ম ভাঙা হবে। আমাদের বন্ধুত্বের ভিত্তি ফাটল ধরবে।

ভাবছি, এ ব্যাপার থেকে বঞ্চিত রাখা ঠিক নয়। যদি ও পরিপূর্ণভাবে জিনিস না পায়, তাহলে সেটা হবে ওর পক্ষে খুবই খারাপ ব্যাপার। আর একদিন তো এটা হবেই। এই বিশেষ কাজটার জন্যে কি পাজিপুঁথি দেখার দরকার আছে। আর একটা কথা, কোনো মেয়েই প্রথম বারের করাটা খুব একটা আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে পারে না। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলাই ভালো, ওকে না রাগিয়ে। আমাদের ভালোবাসায় চিড় না খাইয়ে যা করার করা।

হঠাৎ দেখি লবি থেকে একটা আলোর রেখা এসে ঢুকল। বুঝলাম কেউ দরজা খুলল। দেখি, সে এসে হাজির। বেশ বোঝা যাচ্ছে, ও খুবই উত্তেজিত — পাওয়া গেছে। কানে কানে কথাটা বলে আমায় জ্ঞাপটে ধরল। দারুণ অস্বস্তিতে পড়েছি। কাউন্টারে একটা মেয়ে বসেছিল। কী বলব কিছুই জানি না, অবশেষে বললাম — আচ্ছা, বাচ্চা-কাচ্ছা না হয় যাতে এমন একটা জিনিস দিন তো। মেয়েটাকে দেখে মনে হয় একেবারে শশার মতো ঠাণ্ডা। সে আমায় কোন ধরনের জিনিসের কথা বলতে বলি সবচেয়ে দামি জিনিস চাই। আমি ভেবে চলেছি এবার হয়তো আমার মাপ কত জিজ্ঞেস করবে!

বলে হেসে উঠে আমায় আরও জোরে জড়িয়ে ধবল।

কী আর বলব — লজ্জা মিশিয়ে হেসে উঠলাম।

এই জিনিসটাকে স্পোর্টস হিসাবে নেওয়াই ভালো। নাটকীয়তা না করাই ভালো। যা আজকাল কেউ করে না। তাহলে ওর পক্ষে সমস্ত ব্যাপারটা একটা অস্বস্তিকর হবে।

প্রথম কাজটা এমন হড়বড় করে করল যে, আমি কেঁদে ফেললাম। তাই সে বস্ত্রের পেছনের চেয়ারটা সরিয়ে গায়ের কোটটা খুলে মাটিতে পেতে দিল। তারপর আমায় বলার পর আমি ওর পাশে শুয়ে পড়লাম। ও হাঁটু মুড়ে আমার পাশে বসল। তাতে আমার এমন চাপ লাগছিল, এত অস্বস্তি, অসুবিধে হচ্ছিল যে, আমি বলেই ফেললাম — ডেরেক, দোহাই তোমার, এখানে আর নয়।

এই বলা শেষ হওয়ার আগেই ও আমার শরীরের ওপর উঠে আমায় সপাটে জড়িয়ে ধরেছে। আর সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত সুগুণ প্রবৃত্তি জেগে উঠে ওকে সবরকমভাবে সাহায্য করতে চাইছিল — যাতে সে অন্তত বেশ সুখ পায়। আমার ওপর খুশি হয়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। একরাশ হলদে আলো এসে পড়ল।

আমার পেছনে একটা উঁচু জায়গা থেকে একটা রক্ষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল — ‘আমার সিনেমাতে তোমরা এইসব করার জায়গা ভেবেছ। উঠে পড় কুস্তির বাচ্ছা।’

আমি যে কেন অজ্ঞান হয়ে পড়িনি তা জানি না।

ডেরেকের মুখ কাগজের মতো সাদা। সে উঠে দাঁড়িয়েছিল, আমি হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়লাম। ওঠার সময় দেওয়ালে ধাক্কা খেলাম। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন একটা বুলেট আমার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে আমার মৃত্যুদণ্ড দেয়।

ঐ ছায়ামূর্তিটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মাটিতে আমার ব্যাগ আর প্যান্টির দিকে আঙুল দেখিয়ে তুলে নিতে বলল।

মার খাওয়ার পর যেমন হয় ঠিক সেইভাবে ওগুলো তুলে নিলাম।

বেরিয়ে যাও এঙ্কুনি।

দরজার অর্ধেকটা জুড়েই সে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে কোনো রকমে পাশ কাটিয়ে আমরা দুজনে কোনোরকমে পালিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ম্যানেজার বস্ত্রের দরজাটা সজোরে বন্ধ করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তার ধারণা ছিল হয়তো আমরা পালিয়ে গেছি। বিশ্রাম করার ঘর থেকে দুতিন জন লোক আমাদের তাকিয়ে দেখল (ম্যানেজারের গলা নিশ্চয়ই দর্শকরা শুনেছে। নিশ্চয়ই বস্ত্রের নীচের দর্শকরা গোড়া থেকে সব শুনেছে। আমাদের তর্ক-বিতর্ক-আবার নিশ্চূপ তারপর করার ব্যাপার নিয়ে ডেরেকের নির্দেশ। ইস্-স্-কী লজ্জা)। টিকিট কাউন্টারের মেয়েটা সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। দু’একজন রাস্তার লোক বিজ্ঞাপন দেখতে ভেতরে ঢুকল। সস্তা দামের আলোর মধ্যে দেখতে লাগল।

ম্যানেজার বেশ মোটা, বাদামি রঙের চেহারা। পরনের পোশাক বেশ আঁটসাঁট। জামার বোতামের সঙ্গে একটা ফুল গোঁজা। আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখতে দেখতে তার মুখ লাল হয়ে গেল।

— ‘এই নচ্ছার খুদে শয়তানরা’ আমার দিকে তাকিয়ে বললে।

— এখানে তোমাকে আমি আগেও দেখেছি। তোমাকে বাজারের বেশ্যা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। মনে হচ্ছিল পুলিশে খবর দিই। তোমার গায়ে কোনো জামা নেই। বে-আক্র, অশান্তি সৃষ্টি করা।

এই সমস্ত নোংরা কথাগুলো তার দিক থেকে আসতে লাগল।

— এই তোমাদের নাম বল।

পকেট থেকে নোট বই বার করল। তাব নজর ছিল ডেরেকের দিকে।

ডেরেক কোনো রকমে তোতলাতে তোতলাতে বললে —

— ‘জেমস গ্রান্ট’। ক্যারি গ্রান্ট অভিনয় করেছে। চক্ৰিশ অ্যাকামিয়া রোড। নেটলবেড।

ম্যানেজার বললে — নেটলহেড হেনলে — অস্কফোর্ড রোড ছাড়া ‘রোড’ দিয়ে আর কোনো রাস্তার নাম নেই।

ডেরেক বেশ জোর দিয়েই বললে — হ্যাঁ আছে, অনেকটা লেনের মতো।

এবার আমার দিকে তাকাল ম্যানেজার। আমার গলা, বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। কোনো রকমে বললাম —

— ‘মিস টমসন, অড্রে টমসন’। চক্ৰিশ — বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেল ডেবেকেব-ঠিকানার নম্বরও ওই চক্ৰিশ। কিন্তু আর কোনো সংখ্যা মনে পড়ল না। ‘টমাস’ — আবার টমসন বলতে যাচ্ছিলাম — রোড, লন্ডন।

— ‘ডিসট্রিক্ট?’ এটাতে কী জানতে চায় না বুঝে তার দিকে তাকালাম।

— পোস্টাল ডিসট্রিক্ট।

— ‘এল, ডব্লু. ও.’ ও কী এলাকার কথা মনে আসতেই বললাম।

নোটবইটা বন্ধ করে আমাদের দুজনকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বললে।

আমরা কোনো রকমে তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলাম। তখনও সে তার আঙুল রাস্তার দিকে তুলে রয়েছে।

— মনে রেখো, তোমরা দুজনে আর কখনও আমার সিনেমা হলে আসবে না। যদি দেখি তবে নির্ঘাৎ পুলিশে খবর দেব।

কয়েক জোড়া তচ্ছিল্যভরা চোখ আমাদের দেখছিল। আমি ডেরেকের হাত ধরে চললাম (ও কিন্তু আমার হাত ধরছিল না)।

অস্বস্তিকর আলোর ভেতর থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম। নিজের থেকেই ডানদিকে মোড় ঘুরলাম, পাহাড়ি পথ দিয়ে জোরে নামতে লাগলাম যতক্ষণ না একটা শাখাপথ পেলাম। তারপর শাখাপথ দিয়ে যেখানে ডেরেকের এম. জি. গাড়িটা রাখাছিল সেদিকে চলতে লাগলাম।

গাড়ির কাছে যাওয়া পর্যন্ত ডেরেকের মুখে কোনো কথা নেই। গস্তীরভাবে বললে — ‘আমি একাই গাড়িটা নিয়ে উইন্ডসর হিল-এ ফুলারের দোকানের উলটো দিক থেকে তোমায় তুলে নেব। গাড়ির নম্বরটা যাতে নিতে না পারে। বেশি দেরি হবে না, মাত্র দশ মিনিট।

এই বলে আমার হাত ছাড়িয়ে রাস্তা বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

ওর চলে যাওয়া দীর্ঘকায় সুপুরুষ দেহটা দেখলাম যা একসময় গর্বের ছিল। তারপর ক্যানেলের দিকে যেতে কারকুহার স্ট্রিটের যে গলিটা বেরিয়েছে সেখানে এলাম।

হঠাৎ খেয়াল হল যে, আমার প্যান্টিটা হাতে দলা পাকানো অবস্থায় রয়েছে। ব্যাগের মধ্যে সেটা রাখলাম। আমার ইচ্ছে হল মুখ খোলা ব্যাগের ভেতর থেকে আয়নায় আমার বর্তমান মুখচ্ছবিটা দেখার।

একটা ল্যাম্পপোস্টের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে আয়নাটা বের করে নিজেকে দেখলাম।

— ই-স- কী কিব্বুতকিমাকার মুখের চেহারা হয়েছে আমার।

মুখটা এত পাংশু দেখাচ্ছে যে, মুখের রং পালটে প্রায় শ্যামলা হয়ে গেছে। একটা জন্তুকে তাড়া মারলে তার মুখের যে অবস্থা হয়, ঠিক সেই রকমের। মেঝের ওপর লুটোপুটি খাওয়ার জন্য আমার পেছনের আঁচড়ানো চুল উসকো খুসকো হয়ে গেছে। ডেবেকের গভীর চুমু খাওয়ার চিহ্ন এখনও মুখে লেগে আছে দেখে চমকে উঠলাম।

নোংরা কুস্তির বাচ্ছা। একেবারে নির্ভুল। আমার সমস্ত শরীর অপরিচ্ছন্ন। নোংরা, অশুচি, কলঙ্কে ভর্তি। কী আমাদের ভবিষ্যৎ। আচ্ছা, ওই লোকটা কী আমাদের পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেবে, ঐ ঠিকানায়। আমার মনে হয় আজ অথবা আগের কোনো শনিবার কেউ নিশ্চয়ই আমাদের লক্ষ করেছে। হয়তো বা কেউ ডেরেকের গাড়ির নম্বর মনে রেখেছে। এটা প্রমাণিত যে, যে কোনো অপরাধই হোক না কেন, ফ্রি-পার্কিং জোনে হয়তো কোনো বুদ্ধিমান, সজাগ গাড়ি-রক্ষক থাকে। অপরাধ?

‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। রক্ষণশীল ইংল্যান্ডের পক্ষে এটাত অপরাধই। যৌনতা, নগ্নতা, নোংরা ভাবে গায়ে কোনো আবরণ না রাখা।’

ম্যানেজার নিশ্চয়ই সেই দৃশ্যটা দেখেছে, যখন ডেরেক, আমার শরীরের ওপর থেকে উঠল— সেই দৃশ্যটা যেন আমার চোখের সামনে বেরিয়েছে।

উঃ মাগো!

মনটা অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে। এদিকে ডেরেক আমার জন্য অপেক্ষা করবে। নিজের অজান্তে আমার হাত দুটো নিজের মুখটাকে ঋনিকটা পরিষ্কার করল। আবার আয়নাটা নিয়ে নিজের মুখটা দেখলাম। যথেষ্ট হয়েছে। এর থেকে আর ভালো হয়না।

খুব দ্রুতগতিতে রাস্তা দিয়ে ওপরে উঠে উইন্ডসর হিল-এর দিকে পা চালালাম। যাচ্ছি কিন্তু ফুটপাথের পাশের বাড়ির দেওয়াল ঘেসে কারণ কেবলই মনে হচ্ছে, হয়তো কেউ না কেউ আমার দিকে আঙুল তুলে বলছে।

— ঐ তো সেই মেয়েটা যাচ্ছে।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ — সে-ই তো।

— ঐ তো নোংরা কুস্তির বাচ্ছাটা যাচ্ছে।

॥ চার ॥

সেই অস্বস্তিকর রাতের তখনো শেষ হয়নি আমার জীবন থেকে।

ফুলারের দোকানের সামনে যখন পৌঁছলাম, দেখলাম উলটো ফুটপাথে ডেরেক একজন পুলিশ সার্জেন্টের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। ডেরেক এদিকে মুখ ঘোরাতে আমায় দেখে — ‘এই যে স্যার উনি এসেছেন। আমি তো আপনাকে বলেছি — উনি এখুনিই এসে পড়বেন। মানে বাথরুমের সন্ধানে যাওয়া — তাই না সোনামণি?’

আরে বাপস্। আবার মিথ্যে বলতে হবে। কোনোরকমে — হ্যাঁ বলে ডেরেকের গাড়িতে উঠে ডেরেকের পাশে বসে পড়লাম। সার্জেন্ট ভদ্রলোক দাঁত বার করে আমার দিকে চেয়ে হাসতে

লাগল। তারপর বললে — মনে রাখবেন যে, উইন্ডসর হিলে গাড়ি দাঁড় করাবার নিয়ম নেই -- এমন কি আপনি যে কারণ দেখালেন -- তাতেও নয়।

সার্জেন্ট ডেবকে কথামতো বলে সে তার গোর্গে তা দিতে লাগল। ডেরেকও সার্জেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা রসের কথা বলে গাড়ি স্টার্ট দিল। ওঃ, নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম যেন।

নীচের আলোর ওখানে গিয়ে ডান দিকে মোড় না ফেরা পর্যন্ত ডেবকে একটা কথাও বলল না। ভাবলাম ও বুঝি আমায় স্টেশনে পৌঁছতে যাচ্ছে। কিন্তু দেখলাম ওর গাড়ি ডাচড রোড ধরেই চলেছে। আশ্বস্ত হয়ে বলল —

—ওঃ কানের পাশ দিয়ে গুলি বেবিয়া গেছে। এটা অক্সফোর্ড। একটা ঝামেলায় পড়ে যাব। কালকের খবরের কাগজে বেশ একটা মুখবোচক খবর পাবে আমাব বাবা-মা। এটা ঘটনা এমন কিছু একটা অস্বাভাবিক নয়।

‘সাংঘাতিক ব্যাপার।’

বলতে গিয়ে আমি এত আবেগতড়িত হয়ে পড়লাম যে, ও আমার দিকে না তাকিয়ে পারল না।

ও বেশ সহজ আর রসিকতা কবে বলল — ‘হ্যাঁ, একপাৰে ভালোবাসার পথ আর অন্যধারে কাঁটা।’

ও তো বেশ নিজেকে সামলে নিয়েছে। কিন্তু আমি! এখনও পারিনি। ও আবার বেশ সহজ ভাবেই বলল —

আরে বাবা, লজ্জা-ফজ্জা দূরে সবিয়ে দাও তো। এবার সব আমরা ঠিকঠাক করে নেব।

এবার বেশ উৎসাহ নিয়ে বললে—

— দেখ, ট্রেনের আসতে এখনও এক ঘণ্টা দেরি। অতএব আমরা নদীর ধারে একটু বেড়াতে পারি। উইন্ডসরের এই জায়গাটা জোড়া পায়রাদের ঘোবার পক্ষে একটা আইডিয়াল জায়গা। আর এটা বেশ গোপনীয়ও বটে। সব কিছু এবং সময় ওসব নষ্ট করতে ইচ্ছে করে না।

আব তাছাড়া আমরা তো মনস্থির কবেই ফেলেছি।

আমি ভাবলাম ‘ওসব’ মানে ‘যেটা’ ও কিনে এনেছিল।

আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি বললাম—

— না, ডেরেক, আমি আর পারব না। সত্যিই না। কারণ, যা হয়ে গেল। তাতে আমার যে কী লেগেছে, তা তোমাকে বলতে পারব না।

ও আমার দিকে তাকিয়ে বললে —

— তার মানে? সাংঘাতিক? শরীর খারাপ লাগছে? না, আর কিছু হয়েছে?

— না, না, তা নয়। এটা সুন্দু এই যে — এই ব্যাপারটা খুবই বাজে। একেবারে ধান্নাবাজি!

ও বিদ্রূপের সঙ্গে বলল — ‘ওঃ এই ব্যাপার! আরে, আমরা তো সেটা কাটিয়ে উঠেছি। এটাকে স্পোর্টস হিসেবে নিতে পারছো না কেন?’

আমি চমকে উঠলাম — কী বলছো? আঃঃঃঃ

আমি ডেরেকের বুকের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়ে সাঙ্ঘনা পেতে চাইছিলাম। এখন এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যদিও ওর সব গুণগোল হচ্ছে তবুও আমায় ও বেশ ভালোবাসে। আবার আগের মতো করতে হবে। যেই ভাবছি আমাব পা দুটো কাঁপতে লাগল। হাত দিয়ে হাঁটু চেপে ধরে কাঁপুনি থামাতে চাইলাম। খুবই অসহায়ভাবে বললাম।

— বেশ, তাই হবে।

— এই তো আমার সোনামার্গ।

ডেরেক সেডু পেরিয়ে গাড়িটা একপাশে রাখল। আমায় সাহায্য করল বেড়া টপকাতে। তারপর মাঠে নেমেই আমায় হাত দিয়ে বেশ ভালো করে জড়িয়ে ধরে নদীর ধার ঘেঁষে গুণ টানার সুরু পথ দিয়ে উইলো-গাছের নীচে নোঙর করা কয়েকটা বজরা পেরিয়ে বললে— এরকম যদি আমাদের একটা থাকত। এর একটার মধ্যে ঢুকে পড়লে মন্দ হয়না। বেশ নরম জোড়া-বিছানা আর কাবার্চে কিছু মালও পাওয়া যাবে।

— দেখ ডেরেক, আব না! ঝঙ্কাটের সীমা নেই।

হঠাৎ আমার মানসপটে একটা লোকের কর্কশ গলা শুনতে পেলাম।

— অ্যাই এখানে কী হচ্ছে? এটা কি তোমাদের সম্পত্তি না কি? তোমাবা বাইরে বেবিয়ে তোমাদের মুখটা দেখাও তো দেখি।

আমাব কথা শুনে ডেরেক হেসে উঠল।

— তোমার কল্পনা হয়তো ঠিক। যাকগে। ঘাসও তো ঐ একই রকম নরম। ওখানে মন্দ লাগবে না দেখো! আমরা এখন আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকা হব।

ওর কথা বেশ ভালো লাগল। বললাম —

— বেশ তোমার কথাই ঠিক। তবে ডেরেক এবারে কিন্তু একটু বুঝে সুঝে কাজ করো। একটু আস্তে, আস্তে। কী মনে থাকবে তো? পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার দরুন আমি ভালোভাবে পারব না। ডেরেক আমায় চেপে ধরল।

— কিছু ভাববার দরকার নেই। প্রমাণ ঠিক পাবে।

চাঁদনী রাতে ওর সঙ্গে বেড়াতে বেশ ভালোই লাগছিল। আগের চেয়ে ভালো। আব আমিও শক্তি ফিরে পাচ্ছিলাম। মাথার ওপর কয়েকটা গাছ ঝুপসিমতো রয়েছে।

হঠাৎ আমার মনের ভেতর থেকে কে যেন বললে যে কাজটা ওখানেই করা হবে।

ওর তৃপ্তির জন্য, ওর ভালো লাগার জন্য আমি এবার কাজটা সহজভাবে কবব। বোকার মতো কান্নাকাটি করব না।

ওই গাছের ঝোপের ভেতর দিয়ে রাস্তাটা গেছে। চারপাশ দেখে নিয়ে, ডেরেক বললে —

— ঐ খানেই বুঝতে পারছ? তুমি আমার পিছু পিছু মাথা নীচু করে এস।

আমরা মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। যাবার রাস্তাটা পরিষ্কার আছে। দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল এর আগে অন্য কেউ এসেছিল। একটা সিগারেটের প্যাকেট, একটা খালি কোকাকোলার বোতল পড়ে থাকতে দেখা গেল। ওখানে পাতাগুলো যেন পিষে গেছে।

মনে হতে লাগল এটা একটা বেশ্যাবাড়ির বিছানা। যেখানে রাতের পর রাত বহু-বহু প্রেমিক প্রেমিকারা তাদের সুন্দর দেহ তার ওপর রেখে মনের সুখে রতি খেলায় নিজেদের মগ্ন রেখেছিল। এখন আর এখান থেকে চলে আসার কোনো মানে হয় না। তবে এই 'কাজ' করার জন্য এই বৃক্ষ-কুঞ্জটি খুবই মনোমুগ্ধকর।

ডেরেক আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। সে তার কোটটা খুলে মাটিতে পেতে দিল। আর আমি শুতে না শুতেই সে তার কাজ শুরু করে দিল। প্রায় উন্মাদের মতো তার হাত দিয়ে আমায় পিষছিল। আমি একটু পিছল হবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না কারণ আমার ন্নায়ুগুলো তখনো বেশ জমাট বেঁধেছিল। আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিরশির করতে করতে কাঠ-কাঠ হয়ে গেছে। খুব ইচ্ছে করছিল এই সময় ওর কাছ থেকে কিছু ভালোবাসার ভালো ভালো মিষ্টি কথা শুনতে। কিন্তু তখন ও ওর কাজে এতই ব্যস্ত যে সেদিকে কোনো নজর নেই। আমায় নিষ্ঠুর ভাবে পশুর মতো দলে চলেছে। যেন আমি একটা ভস্কা যুবতি।

ওঃ ভগবান, এ কী সব ঘটছে?

তারপর সূচীমুখ এক বলক যন্ত্রণা বোধ করলাম।

আমার মুখ দিয়ে একটু আওয়াজ বেরোল — আমি আমার দমবন্ধ করে সামলে নিলাম।
দেখলাম ও আমার বুকের ওপর শুয়ে আছে।

আমি বেশ অনুভব করতে পাবছি যে, ওর বুকটা যেন হাপরের মতো উঠছে নামছে। ওর বুকের ভেতরের হৃৎপিণ্ডটার ধক-ধকানি আওয়াজ আমার বৃকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

আমিও ওকে দুহাত দিয়ে বেশ ভালোভাবে জড়িয়ে ধরলাম। অনুভব কবলাম ওব ঘামে ভিজ়ে গেছে।

কতক্ষণ যে এভাবে শুয়েছিলাম তা জানি না।

আকাশের চাঁদের জ্যোৎস্না গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে একটু একটু কবে যেন চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। আমার দু'চোখ জলে ভরে গেছে। থামাতে পারছি না।

তাহলে এই হল ঘটনা।

এই যে মহা মহা সুখ। এই মুহূর্ত আর তো পাওয়া যাবে না।

আমি আর এখন বালিকা নই। আমি এখন নারীতে পরিণত হয়েছি।

সুখ কোথায় — সকলে যে বলে শুধু কষ্ট। কিন্তু কিছু তো থাকেই। আমার বুকের ওপর আমার হাতের মধ্যে ধরা রয়েছে যে পুরুষটি, আমি তাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম। এখন আমি সম্পূর্ণভাবে, পুরোপুরিভাবে ওর। আর ও আমার। একেবারে আমার। আমরা একে অপরের পবিপূরক। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকব না। ডেবেক আমার গালে তার একটা সুন্দর মিষ্টি চুমু এঁকে দিল। এবার সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। আমার হাত ধরে আমায় উঠতে সাহায্য করল। আমি আমার স্কাটটা নামিয়ে নিলাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হাসছে। যেন অস্বস্তিতে ভবা।

-- হ্যাঁ গো, লাগেনি তো ?

— না, তোমার কাজ ঠিকঠাক হয়েছে তো ?

— হ্যাঁ, সে তো হয়েছেই।

এবার তার কোটটা তুলে ঘড়ি : দিকে তাকাল।

— ট্রেনের সময় আর দেরি নেই মাত্র পনেরো মিনিট আছে। এখনই যাত্রা করতে হবে।

এলোমেলো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় এলাম। এব মধ্যে চিকরনি দিয়ে চুলটা ঠিক করে নিলাম। স্কাটটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিলাম। কোনো কথা না বলে ডেরেক আমার পাশে পাশে হাঁটছিল। চাঁদের আলোয় দেখলাম ওর মুখটা থমথমে। আমি ওর হাত জড়িয়ে ধবে থাকলেও ওর কোনো সাড়া ছিল না। শুধু একটু চাপ দিল। ভাবছিলাম যদি একটু ভালোবাসার কথা বলত। আমরা আবার কবে মিলিত হব। কিন্তু মনে হল ও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। এত শীতলতা কেন ? এইসব কাজের পর পুরুষদের মুখের পরিবর্তন সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই নেই। আমি নিজেই দোষী। বোধহয় ওকে পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে পারিনি। আমার মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে পড়েছিল। আমার জনেই কি তবে সব জিনিসটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে ?

গাড়ি করে আমরা স্টেশনে এলাম। কোনো কথা নেই কারোর মুখে। স্টেশনে ঢোকান জায়গায় থামাতে বললাম। চড়া আলোয় ওর মুখ দেখলাম। মুখের রেখাগুলো টানটান দেখাচ্ছিল। আমার দিকে তাকিয়ে আছে অর্ধনেত্রে। বললাম —

— তোমায় ট্রেনের কাছে যেতে হবে না। আমি একা যেতে পারব। আচ্ছা সামনের শনিবার কী হবে ? আমি কি অক্সফোর্ড আসব। অথবা একটু ঠিক ঠাক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কবব ?

— দেখ ভিভ, অক্সফোর্ডের সব কিছুই আলাদা, এটাই একটা অসুবিধার কারণ, তোমায় আমি চিঠি লিখে জানাব। — নিজেকে আড়াল করে ও বলল।

ওর মুখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করলাম। সাধারণত আমাদের বিদায়ের মুহূর্তগুলো যেমন হয় এবার তার ব্যতিক্রম দেখলাম। সে হয়তো খুবই ক্লান্ত। কিন্তু আমিও কি ক্লান্ত নই? বললাম — নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তবে আমার সোনা তাড়াতাড়ি চিঠি দিও। তোমার কুশল জানার জন্য ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করব।

ওর কাছে গেলাম। ওর ঠোঁটে আমার গভীর চুমু একে দিলাম। ওর তরফ থেকে কোনো সাড়া পেলাম না। শুধু মাথা ঝাঁকাল—

— ভিভ তবে ততদিন...

কোনোরকমে কষ্ট করে একটু হেসে সে গাড়িতে উঠল।

ওকে দু-দবার চিঠি দিয়েও কোনো উত্তর পাইনি।

দু'সপ্তাহ পরে সেই চিঠি এল।

আর থাকতে না পেরে ওকে একদিন ফোন করলাম। যে ভদ্রলোক ফোন ধরেছিলেন তিনি একটু ঘুরে এসে বললেন যে, মিঃ ম্যালাবি এখন বাড়িতে নেই।

ওর চিঠিতে ছিল — ‘প্রিয় ভিভ, এই চিঠিটা হয়তো তোমার অনারকম লাগবে। এই পর্যন্ত পড়ে ছুটে শোবার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে বিছানায় বসে মন শক্ত করতে লাগলাম। তারপর লেখা রয়েছে — এই গ্রীষ্মকালটার জবাব নেই। আমি তার মন থেকে কখনও মুছব না। বর্তমানে তার জীবনে চলার গতি পালটে গেছে। মেয়েদের সঙ্গে মেশার সুযোগ সেখানে নেই-ই। আমার কথা ও ওর বাবা-মাকে বলেছে। কিন্তু আমাদের পুরো ব্যাপারটা তাঁরা অনুমানের মধ্যে রাখেননি, তাঁদের বক্তব্য, যদি কোনো মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছে না থাকে, তবে তার সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত নয়। তাঁরা ভীষণ দ্বীপকেন্দ্রিক মনোভাবাপন্ন। ‘পরদেশি’দের ওপর তাঁদের ধারণা খুবই হাস্যকর কিন্তু ভগবান জানেন যে, আমি তোমাকে অন্য ইংরেজ মেয়েদের মতোই মনে করি। আর তোমার উচ্চারণটা আমি খুব পছন্দ করি। ওদের গ্রামের জনৈক প্রতিবেশীর সঙ্গে ওর বিয়ের ঠিক করেছেন ওর বাবা-মা। এ ব্যাপারে তোমায় যে আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছি সেটা আমার পক্ষে দুঃস্থমি হয়েছে। আসল ঘটনা হচ্ছে এমন ভালোভাবে সব কাটছিল আর তুমি এমন সুন্দর আমার লীলাসঙ্গিনী। এই সমস্ত জিনিস আমি নষ্ট করতে চাইনা। সে আরও লিখেছে যে, আবার আমরা দু’জনের মধ্যে দু’জনে ডুব দেব, এর মধ্যে সে ফরচুনকে আমাদের প্রথম মিলনের সাক্ষী হিসেবে রেখে এক ডজন শ্যাম্পেনের বোতল পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর আমি জানি এই চিঠি তোমায় খুব বিচলিত করবে না ভিভ, কারণ, আমি জানি তুমি এক আশ্চর্য মেয়ে। সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়ে, আমার মতো লোকের কাছে অনেক অনেক ভালো। সুন্দর স্মৃতিসহ এবং অসংখ্য ভালোবাসার সঙ্গে — ডেরেক।’

এই চিঠিটা পড়তে আমার লেগেছিল মাত্র দশ মিনিট এবং আমার মন-প্রাণ ভেঙে তখনই হতে এই সময়টা যথেষ্ট। কিন্তু এটাকে সামলাতে আমার সময় লেগেছিল ছ’মাস।

কষ্ট বা দুঃখের ঘটনা সকলের কাছেই প্রায় একই রকমের হয়। তাই কেউ আর তাতে খুব একটা আগ্রহ দেখায় না। সেইজন্যে বিস্তারিত কিছু আর বলছি না। এমনকি সুসানকেও বলিনি। এখন দেখতে পাচ্ছি যে, তার সঙ্গে আমার প্রথম সন্ধ্যায় আমি যে বোহেমিয়ান আচরণ করেছিলাম — সেটাই আমার পরিচয় হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ডের এই নোংরা সমাজে আমিই একমাত্র পরদেশি, বিদেশিনী, ক্যানাডিয়ান — অপূর্ব লীলা খেলা। সেটাই আমার পক্ষে বোকামির কাজ হয়েছিল।

ওহে সেদিনের বোকা মেয়ে। জগৎটাকে চেনো, বোঝো, নচেৎ আবার আঘাত পাবে। এত শত যুক্তি তর্ক-এর মধ্যেও আমার ভেতরের সজ্ঞাটা গুমরে গুমরে কেঁদে মরত। এমন কি রাত্রেও লুকিয়ে লুকিয়ে আমি কাঁদতাম আব হাঁটু মুড়ে ঈশ্বরের কাছে আকৃতি প্রার্থনা করতাম যে আমার ডেবেককে তিনি ফেন আমার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তিনি তা শোনেননি। সেই জন্যে তার চিঠির সামান্যতম প্রাপ্তিস্বীকার করা বা ঐ শ্যাম্পেনের বোতলগুলি ফেরত দিতে আমার আত্মসম্মানে বাধল। যা শেষ পড়ে রইল তা 'ইক্স স্পট' সম্প্রদায়ের গানের সুরের স্মৃতি — আর একটা হল সেই উইন্ডসর হিলের সিনেমা হলের সেই দুঃস্বপ্ন, যেটা মনে হয় সারা জীবন আমাকে কুরে কুরে খাবে। তবে আমার কপালটা নেহাতই ভালো যে, যে চাকরিটার কথা চলছিল আমার বন্ধুস্য বন্ধু মারফত সেটা ঠিক হয়ে গেল একটা ছোটো লোকাল পত্রিকায়— 'চেলসি ক্ল্যারিয়ন' এই কাগজে ছোটো ছোটো বিজ্ঞাপন ছাপত। যেমন লন্ডনের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের লোকেদের ঘরবাড়ি, ফ্লাট ভাড়া, গৃহ-ভৃত্য-এর কর্মখালি, দুধের বোতল চুরি এই সমস্ত টুকটাক খবর ছাপত। নতুন বালবের নিম্নমান, এগারো রুটের বাসের দুরবস্থা এই রকম স্থানীয় খবরে সম্পাদকীয় ছাপা থাকত।

এব প্রধান আকর্ষণ ছিল একটা পুরো পাতা ভর্তি গুজবের খবরা-খবর — 'চেলসি' সম্বন্ধেই অনেক কিছু থাকত। যেটা সকলের পক্ষে খুবই আকর্ষণীয়। তারা কিন্তু খুব সাবধানে মান-হানির মামলা বাঁচিয়ে চলত। তাছাড়া থাকত — অনুগতদের সঙ্গে মিশে যাওয়া স্থানীয় রাজনীতির খবর— এই বিষয়ে কড়া সম্পাদকীয় লিখত। সেই পুরোনো আমলের পিমালিকোতে যে-সব পুরোনো অক্ষরের ছাঁচ থাকত তাই থেকে। হাবলিং বলে একজন কারিগর প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন নতুন বিজ্ঞাপনের ছাঁচ তৈরি করত। কারণ পত্রিকাটা ছিল সাপ্তাহিক। আসল কথা কাগজটা বেশ ভালোই ছিল যার জন্য তার কর্মচারীরা আগস্ট মাস বা ছুটির দিনগুলোতে সামান্য মাসোহারা বা কিছু না নিয়েই কাজ করত।

সপ্তাহে পাঁচ পাউন্ড আমার মাইনে ঠিক হল আর যত বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে পারব তার ওপর কমিশন (তবে সুখের কথা এখানে কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেই)। অতএব মনের দুঃখ চেপে রেখে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চললাম। আমি ঠিক করলাম ইংরেজ গর্বিতদের দেখিয়ে দেব ওদের সঙ্গে জীবনে না চললেও আমার বুদ্ধির জোরে ওদের সমাজ থেকেই অর্থ উপার্জন কবছি। তাই আমি দিনের বেলায় কাজ করি আরা রাতে কাঁদি। এই ভাবে আমি একজন সক্রিয় কর্মচারী হয়ে উঠলাম।

আমি কর্মীদের চা করতাম, অস্ত্যোপ্তিতে যেতাম, শোকাহতদের তালিকা ঠিক করতাম, গুজব-সমাজেব জন্য অনুচ্ছেদ লিখতাম। আরও টুকটাক কাজ করতাম। তার ওপর বাড়তি কাজ হিসাবে গোমড়ামুখো, রেস্তোরাঁ মালিক, দোকানি, হোটেলওয়ালাদেব কাছ থেকে বিজ্ঞাপন এনে তার ওপর কুড়ি শতাংশ কমিশন আমাদের বড়ো অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে জমাতাম।

কাগজের সম্পাদক আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমার সপ্তাহে পনেরো পাউন্ড মাইনে দিয়ে আমায় পাকাপাকিভাবে সহকারী সম্পাদক করে দিলেন, তাতে কোম্পানির সুরাহাই হল। সম্পাদকের ঘরের পাশের একটা ছোটো ঘরে আমার বসার জায়গা হল। এতে সুবিধে হল তার শয্যাসজ্জিনী হতে পারার সুযোগ। কিন্তু আমার শরীরের পেছনে চিমাটি কাটার পর তাকে সাফ জানালাম কানাডার একজনের আমি বাগদত্তা। শুনে তার মুখের চেহারা পালটে গেল আর বেগে মেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যাই হোক, অবশেষে সহকারী সম্পাদক হিসেবে পাকাপাকি বহাল হলাম। বাইরে ঘোরার হাত থেকে বাঁচলাম। একবছর পরে অন্য শাখায় বদলি হলাম। আমার মাইনে বেড়ে হল কুড়ি

গিনি। আমার মানুষের সঙ্গে নিভীকভাবে চলাতে তিনি সন্তুষ্ট। আমায় শেখালেন কীভাবে পাঠককে আটকে রাখতে হয় প্রথম কলম থেকে শেষ কলম পর্যন্ত। ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার করে বাজে কথা পরিহার করা আমায় শেখালেন। তিনিও এটা এক্সপ্রেস কাগজ থেকে শিখেছেন। আমি এখন একটা গণ্যমান্য লোক হয়ে গেলাম।

লেন তাঁর পেনসিল দিয়ে এগারো নম্বর রুটের বাস কন্ডাকটরদের ভিড়ে বেশি খাটতে হয়— লাইনটা কেটে দিয়ে বললেন — জনসাধারণ জনসাধারণ....এটা এইভাবে লেখা হবে।

‘ফ্রাঙ্ক ডোনাল্ডসনের বয়স সাতাশ, স্ত্রী গ্রেসি। ছেলে বিলের বয়স ছয়, মেয়ে এমিলি পাঁচ। অভিযোগ — গরমের ছুটির পর কোনো দিন বিকেলবেলা ছেলে মেয়েদের সঙ্গে দেখা হয় না।

৩৬ নম্বর বোন্টন লেনের সুন্দর ঘরে বসে ভদ্রলোক বললেন — আজকাল কাজ থেকে ফিরে দেখি তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। এগারো নম্বর রুটে আমি কন্ডাকটর। নতুন টাইম টেবল চালু হওয়ার পর রোজ এক ঘন্টা বেশি কাজ করতে হয়।’

লেন এবার বললেন —

‘আসলে আমার বক্তব্য হল বাস চালাচ্ছে জনসাধারণ — তারাই বেশি চিত্তাকর্ষক। এখন এই ফ্রাঙ্ক ডোনাল্ডসনকে খুঁজে বার করে, তার গল্পটাকে সজীব করো।

খুবই সাধারণ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি। এটাই আমার কাজ — আমি এভাবেই লিখি — তাই আমার লেখার জবাবে কাছের ডোনাল্ডসনরা, তাদের স্ত্রী এবং সঙ্গীরা লিখতেন। সম্পাদকরা চিঠি আসা পছন্দ করে — এরাই কাগজের চেহারা পালটায়, পাঠক বাড়ায়।

আমার একুশ বছর পূর্ণ হল — আমি ক্ল্যারিয়নে কাজ করতে করতে, ‘ন্যাশনাল’, ‘এক্সপ্রেস’ ‘মেল’ প্রভৃতি কাগজ থেকে কাজ করার সুযোগ পেলাম— মনে হল এবার ওয়েস্ট-এ এই এলাকার বাইরের জগতে পা দিই।

এখনও সুসানের সঙ্গে থাকি। বোধহয় আর থাকা যাবে না। সুসান বিদেশ দপ্তরে যোগাযোগ বিভাগে কাজ করে আর ওখানেরই একটা ছেলের বাগদত্তা খুব শীঘ্রই হবে।

আমার ব্যক্তিগত জীবন বলে আর কিছু নেই। প্রেম-ভালোবাসা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। একটা উন্নতিকামী মেয়েতে পরিণত হওয়া হত — যে খুব সিগারেট, ভদকা, টনিক খায় আর টিনের খাবার খায়।

মিউনিকে বারোক উৎসবের সাহায্যে একটা প্রেস শোতে আমার সঙ্গে পরিচয় হল ভি. ডব্লিউ. জেড-এর রাইনার-এর সঙ্গে আলাপ হল।

॥ পাঁচ ॥

পশ্চিম জার্মানির যত সংবাদপত্র আছে তাদের সমবায় সমিতির অর্থসাহায্যে রয়টারের মতো একটা প্রতিষ্ঠান হল ভি. ডব্লিউ. জেড বা ভেস্ট্‌ডয়টচার সাইটুঙ্গেন। এই কোম্পানির লন্ডনের প্রতিনিধি হচ্ছে কুরট। সে আমার সঙ্গে আলাপের পর থেকে আমার মতো একজন স্থানীয় সংবাদপত্র থেকে খুঁজছিল যে জার্মান-এর খবরাখবর জোগাড় করতে পারবে।

একজন রোদ-বৃষ্টিতে পুড়ে শক্তসমর্থ যুবক। কুচকুচে চুল, নীল নিভীক চোখদুটো তাকে তিরিশ বছর বলে মনে হয়। সে সেদিন রাতে পার্লট স্ট্রিটে স্মিসং-এ আমায় ডিনারে নেমস্তন্ন করল। তার নিজের কাজের এবং ইস্ট জার্মান সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার কাজের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন।

মিউনিকের কাছে ওগ্‌সবার্গ-এ তাদের বাড়ি। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তাঁরা দুজনেই ডাক্তার। নাৎসি বন্দি শিবির থেকে আমেরিকানরা তাঁদের উদ্ধার করে। যুবক কুরট যাতে হিটলারের

যুব আন্দোলনে যোগ না দিতে পাবে তাই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তার শিক্ষা মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে সাংবাদিকতায় স্নাতক হয় আর ইংরাজিতে ভালো দখল থাকার জন্য তাকে লন্ডনের এই কাজটার জন্য মনোনীত করে।

আমার কাজ সম্বন্ধে জানতে চাওয়ায় চ্যাম্পেরিলেন এর পাশের ঘরে আমার কাজের নমুনা দেখালাম। প্রেস ক্লাব থেকে আমার কাজ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জোগাড় করেছে। আমার মাইনে বেড়ে সপ্তাহে ত্রিশ পাউন্ড হল। আমার টেবিলের পাশে রয়টার এবং এক্সচেঞ্জ টেলিগ্রাফ হরদম টরেটকা করে যাচ্ছে। কাজটা পছন্দ হল। হামবুর্গে আমাদের হেড অফিসে রীতিমতো যোগাযোগ করছি যাতে প্রভাতী ও সাক্ষ্য জার্মান পত্রিকা বের হবার আগে আমাদের খবর চলে যায়।

জার্মান ভাষা ভালো না জানা থাকলেও কোনো অসুবিধে হয়নি কারণ কুরটের কাছ থেকে যে খবর পেতাম এবং যা যেত সবই ইংরিজি ভাষা হত। আমার লেখা ছাপার পর বিভিন্ন জার্মান পত্রিকায় ছাপা কাটিং নিয়ে আমার লেখা পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিশিয়ে আমার সাফল্য-ব্যর্থতা বিচার হত।

সময়মতো সুসান বিয়ে করল। অতএব আমি জুমস বারি স্কোয়ারে একটা সুসজ্জিত ফ্ল্যাট নেবার জন্য মনস্থির করলে কুরট একটা ভুল বুঝতে পারত। আমি কুরটের একই বাড়িতে ফ্ল্যাট নেওয়ায় প্রায় প্রতিদিন রাতের খাবার আমরা একসঙ্গে খেতাম। আর অফিস থেকে বাড়ি এক সঙ্গে হেঁটেই ফিরতাম। পরে খরচ বাঁচাবার জন্য সে তার প্রয়োজন আমায় জানালে দুজনের জন্য কিছু রান্নাবান্না করতাম। আমি সময় কাটাবার জন্য রাতের খাওয়ার পর কোনো সিনেমায় গেলে লোকে অন্য চোখে দেখত — কারণ এত রাতে একটা যুবতি মেয়ে একলা থাকলে পুরুষরা তাকে তোলবার চেষ্টা করবে।

কুরটের সম্বন্ধে আমার যে সব ভয় বা আশঙ্কা ছিল, কিছুদিন থাকার পর সেটাকে আমার নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হল। কারণ সে ছিল খুবই শালীনতা সম্পন্ন আর আমাদের সম্পর্কও ছিল বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সোজাসুজি। আমাদের বন্ধুত্ব মিত্রতাপূর্ণ হচ্ছে কারণ সে রীতিমতো সম্ভ্রান্ত এবং প্রাপ্তমনস্ক বলে। আমার আরও আস্থা বেড়ে গেল যখন আমাদের এই সহাবস্থানে মাস তিনেক পর সে জার্মানি ঘুরে এসে বলল — যে সে তার বাল্যবান্ধবী ক্রুদের সঙ্গে বাগদত্ত হয়ে এসেছে। ওদের পরিচয় জেনে বুঝলাম — খুবই সুন্দর মিল হয়েছে। তার ক্রুদের বাবা হাইডেলবার্গে দর্শনের অধ্যাপক। ক্রুদের যে ফটোটো দেখলাম তার দুই শাস্ত্র চোখ, কাঁধের দু'ধারে ঝোলানো বেণী এবং পরিষ্কার পোশাক-আশাক দেখে তাকে খুবই জীবন্ত মনে হচ্ছিল।

কুরট আমাকে ক্রুদ-এর জার্মান ভাষায় লেখা চিঠিগুলি দোভাষীর মতো বোঝাতে লাগল যে তাদের তিন বছরের সীমা পার হলেই যখন হাতে বিয়ের জন্য অনেক টাকা জমবে তখন ওরা হামবুর্গে একটা সুন্দর ফ্ল্যাট কিনবে। সেটা কী ভাবে সাজাবে তার পরামর্শ আমার কাছে চায় এবং সর্বোপরি তাদের একটা সন্তান হবে সে বিষয়ে আলোচনা পর্যন্ত আমার সঙ্গে করতে দ্বিধা করল না। আমি যেন তাদের একটা মাসিমা গোছের সেজে গেলাম। আমিও একটা বড়ো সড়ো পুতুলের বিয়ে দেওয়ার খেলাটা খুবই স্বাভাবিকভাবে নিলাম।

এরপর কুরট আমার সঙ্গে খুবই মনোযোগের সঙ্গে অথবা বলা যায় বিকৃতভাবেই তাদের যৌন জীবনের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আলোচনা করত, এমনকি পরিকল্পনাও করত। এটা আমার কাছে খুবই অস্বস্তির কারণ হয়ে দেখা দিল। পরে বুঝলাম — ও বেশ বৈজ্ঞানিকভাবে এবং শিক্ষাগত দিক দিয়ে আলোচনা করত। ওদের বিয়ের পর ওরা 'হানিমুন' করতে 'ভেনিস' যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে যা সব জার্মানোরাই করে। এবং প্রতি রাতেই ওরা মিলিত হবে। কুরট এর বক্তব্য নিখুঁত ভাবে অনুশীলন না করে সহবাস-ক্রীড়া করা উচিত নয়। তাই রাতে অল্প খাওয়া,

রাত্রে শুতে এগারোটার বেশি না করা। কারণ পরবর্তী কালে কাজ করার উদ্যম বা শক্তি ফিরে পেতে হলে আট ঘন্টার ঘুমের প্রয়োজন। সে বলত ক্রন্দ-এর মধ্যে এখনও যুবতি সত্তার উন্মোচন হয়নি, সে এই যৌনতার ব্যাপারে একটু নিশ্চিন্ত অথচ কুরট এই ব্যাপারে তীব্র যৌনবোধসম্পন্ন। তাই তাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। যদি সত্যিকারের সুখী স্বামী-স্ত্রীর জীবন যাপন করতে হয় তবে দুজনের যৌন-চেতনা-আবেগকে চরমে উঠতে হবে এক সঙ্গে। তবেই চরম সুখ। এগুলো কুরট এমন বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করত — এমনকি টেবিলের ওপর কাঁটা চামচ দিয়ে নক্সা এঁকে দেখাত।

ওর কথা-বার্তা বা বক্তৃতা এমনই সুন্দর ছিল যা থেকে এটাই প্রমাণিত যে কুরট প্রেমিক হিসেবে খুবই সূক্ষ্মতাসম্পন্ন। আর স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে, ক্রন্দ এর জন্য যে পুলক-আনন্দ অপেক্ষা করছে তা দেখে আমিও পুলকিত এমন কি কিছুটা ঈর্ষাও জেগেছে। আমাব অনেক রাতি এমন কেটেছে যখন কল্পনায় কুরটকে আমি মনে মনে আশা করেছি, উপভোগ করেছি, ওর মহান যৌন শিল্পের কাছে আমার দেহটাকে সমর্পণ করে বলি — 'বাজাও তোমার বীণা আমার ওপর। আর এটাও জানি আমার স্বপ্নে কুরট আসত — ওর ওপর ভরসা করা যায় — অতি নিরাপদ। ভদ্র। নারীর শরীরের প্রতি রসজ্ঞানসম্পন্ন।

বেশ কয়েক মাস কাটার পর ক্রন্দ-এর যে চিঠি আসতে লাগল তার ভাষা পালটাল সংখ্যাও কমে গেল। এটা আমারই নজরে প্রথমে আসে তবে প্রকাশ করিনি। দেরি করা নিয়ে অনুযোগ আসছে — চিঠির মধ্যে থেকে মধু আর ঝরছেনা, ঝরছে তিজতা। কোনো রকমে শেষ করা। কুরটের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল টিগারলসীর গরমের ছুটিতে। সেগুলির উল্লেখমাত্র একবার। এরপর তিন সপ্তাহ ক্রন্দ-এর নীরবতা থাকার পর একদিন বিকেলবেলা কুরট অশ্রুসিক্ত মুখে আমার কাছে এল।

সোফার ওপর শুয়ে একটা বই পড়ছিলাম। হঠাৎ সে এসে হাঁটুর ওপর ভর করে আমার বুকের মাঝে তার মুখ গুঁজে দিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল সব শেষ হয়ে গেল। টিগারলসীতেই মিউনিকের এক বিপত্নীকের সঙ্গে তার প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়েছে। সামনের মাসেই তাদের বিয়ে। কুরট নিশ্চয়ই বুঝবে যে, কোনো মেয়ের জীবনে এই রকমের ঘটনা একবারই ঘটে আর তার জন্য ক্রন্দকে ক্ষমা করা উচিত। ও-তো তার উপযুক্ত নয় — আবার বাজে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারা দু'জনে সম্মানিত বন্ধু হিসেবেই থাকবে। কুরট তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার চেষ্টা করবে। ক্রন্দ তোমার অতি দীন কুরটকে বিদায় দাও।

কুরট দু'হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরেছিল। এখন আরও জোরে আঁকড়ে ধরল।

সে আস্তে আস্তে কাঁদতে কাঁদতে বললে — 'এখন তুমিই আমার সব — আর কেউ নেই। তুমি আমায় শাস্তি দাও।

আমি খুব প্রেম-প্ৰীতির সঙ্গে ওর মাথার চুলে হাত বোলাচ্ছিলাম। এই রকম একটা সুপুরুষ, শক্ত-সমর্থ লোক এইরকম হতাশায় ভেঙে পড়েছে দেখে কীভাবে তাকে সাহায্য দিয়ে তার হাতের আঁকড়ে ধরা থেকে কীভাবে মুক্ত করব নিজেকে — তাই বললাম —

— যদি আমার মতামত চাও তবে বলব যে, তুমি রূপাল জোরে বেঁচে গেছ, ঐ রকম অস্থিরমনা মেয়েকে কখনও স্ত্রী হিসাবে নিয়ে ঘর করা যায় না। জার্মানিতে তুমি যদি খোঁজ করো তবে ওর চেয়ে অনেক ভালো মেয়ে পাবে। মন থেকে ওসব ছেড়ে দাও কুরট।

কোনো রকমে উঠতে উঠতে বললাম —

চলো, আমরা দুজনে বাইরে কোথাও গিয়ে ডিনার খেয়ে সিনেমা দেখে আসি — এতে মনটা হালকা হবে। যা হয়েছে তাকে ভুলে যাও। এবার ওঠ কুরট।

একরকম জোর করেই নিজেকে মুক্ত করলাম। কুরট ও উঠে দাঁড়াল।

কুরট নিজেব মাথাটা ঝাঁকিয়ে উঠে বলল — সত্যিই তুমি বিপদের সময় আদর্শ বন্ধু।

একটা কষ্টের দুঃখময় হাসি হেসে সে দবজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর এর মাএ দু সপ্তাহের পব দেখলাম আমরা 'প্রেমিক-প্রেমিকা' হয়ে গেছি। এটা যে হবে তা আমি জানতাম এবং এটার শেষ কতদূর সেটা বুঝেছিলাম বলেই একে মেনে নিয়েছি। আমি যে ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি তা যেমন নয়, তেমনি আমরা পরস্পরের এত কাছে এসে গেছি যে এরপর 'সহবাস'টা কিছুই নয়। ওর ছোট্ট ছোট্ট চুমু আমার গালের ওপর এক আধবার পড়তে লাগল — যার মানে অন্য — আবার এই মানেটা ক্রমশ পালটে যেতে লাগল যখন দেখলাম যে সেই গালের চুমুর স্থান হয়েছে 'ঠোঁটের ওপর, এরপর উড়ে এল মুখের ওপর। এরপর কিছু বিরতি — এটা এবার মেনে নিলাম।

তারপর — তারপর দেখি তার হাতটার মৃদু সঞ্চরণ আমার বুকের ওপর।

তারপর সারা শরীরে বিচরণ করতে লাগল।

এর সব কিছুর মধ্যে ছিল প্রগাঢ় সুখানুভূতি এবং নাটকীয়তা বর্জিত। এরপর এল এক সঙ্ক্যা— যে সঙ্ক্যায় সে আমার বসবার ঘরে আমার শরীরের ওপর থেকে একটার পর একটা আবরণ উন্মোচন করতে করতে সম্পূর্ণভাবে আবরণ মুক্ত করে বলল—

—আমি দেখতে চাই তোমার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য।

প্রথমটা আমি অহেতুক প্রতিবাদ করার পর দেখলাম ক্রন্দ-এর জন্য যে সব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলো অপেক্ষা করছিল সেগুলি একের পর এক আমার ওপর আরোপ করা হল।

আমার নিজের ঘরের গোপনীয়তা যে কত মধুর লেগেছিল তা বলতে পারব না। কোনো বিপদ নেই!

কেমন সুন্দর সতর্কভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এটা খুবই স্বস্তির।

আর সবচেয়ে বড়ো কথা শক্তিমান কুরট। তবুও কত ধীরে ধীরে সহবাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কী স্বর্গীয় নম্রতা।

প্রত্যেকবার শৃঙ্গার ক্লাস্তির পর একটা করে ফুল উপহার। আর চরম তৃপ্তি পাওয়ার পর ঘরদোর গুছিয়ে ফেলা, পরিষ্কার করা। অফিসে বা বাইরের লোকের সামনের ব্যবহার শালীনতা বজায় রেখে। কোনোরকম অশোভন ব্যবহার নয়। কখনো রুঢ় বা অসভ্য ব্যবহার নয়। এ যেন একজন পাকা শল্য চিকিৎসকের সব রকম বিধি-ব্যবস্থা মেনে শয্যাকক্ষের মধ্যে তার অসাধারণ অস্ত্রোপচারগুলি করে যাচ্ছেন। যদিও এগুলি কিছুই নয়। তবুও আমার ভীষণ ভালো লাগত।

তারপর হঠাৎ করে যা ঘটল তা ঘটল। ঠিক যখন থেকে সহবাস শুরু হয়েছে তার ঠিক পর থেকেই—

এরপর কুরট আমায় একজন অভিজ্ঞ মহিলা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। তিনি আমায় গর্ভনিরোধ সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দিলেন। আর তিনি এটাও বলেছিলেন যে, এইসব সাবধানতাও অনেকসময় ঠিক পথে চলে না। আর তা-ই হয়েছিল। প্রথমে চূপচাপ চেপে যাওয়াই ভালো বলে আর কুরটকে কিছু জানাইনি। তারপর আর এটাকে নিজের একলা ঘাড়ে না রেখে দুজনের দায়-দায়িত্ব ভেবে কুরটকে সব বললাম। তাতে মনে খুব ক্ষীণ আশা ছিল যে সে সুখী হবে আর আমায় বিয়ের প্রস্তাব দেবে। এর প্রতিফল স্বরূপে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আশা করেছিলাম হয়তো একটু সহানুভূতি, একটু কোমলতা বা ওপর ওপর একটু ভালোবাসাও পাব।

যেদিন বিদায় নেব, তার আগের দিন রাতে আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। যদিও সে পরিপূর্ণভাবে পোশাকে সুসজ্জিত ছিল। আমার শরীরে কোনো আবরণ ছিল না। কথা বলা শেষ হতেই সে তার গলা থেকে আমার দু-হাত নামিয়ে আমার সারা শরীরের ওপর রাগ আর ঘৃণামিশ্রিত

দৃষ্টি মেলে দেখল। দরজাব হাতলে হাত রাখল। আমার দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলাব বললে— তা হলে? বলে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ঘরে ফিরে এসে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বিছানার ধাবে বসলাম। আমি কি খুব অন্যায় করেছি — তাকে ভুল কথা বলেছি? ভাবতে ভাবতে বিছানায় গুয়ে কাঁদতে লাগলাম। শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম। কাঁদার মধ্যে ভুল ছিল না। পরের দিন সকালে অফিস যাবার সময় তাকে যখন ডাকতে যাই দেখি সে আগেই চলে গেছে। অফিসে গিয়ে দেখি আমাদের দুজনের ঘরের মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মিনিট পনেরো পরে সে দরজা খুলে তার ঘরে যেতে বললে কিছু কথা আছে বলে। তার মুখের চেহারা বরফের মতো ঠান্ডা শক্ত মনে হল। তার ঘরে তার টেবিলের সামনের চেয়ারে বসলাম। যেন একজন কর্মচারীকে হাঁটাই করার জন্য তাকে তার মালিক ডেকেছে। শেষ পরিণতি তা-ই হল। সে যা বলল তা হল —

দেখ, আমরা দুজনে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম (হ্যাঁ ছিলাম বলছি), তা ছিল, খুবই উপভোগ্য। সুন্দরভাবে শৃঙ্খলতার সঙ্গে চলবে। আমরা বন্ধু ছিলাম— চমৎকার বন্ধু — আর তার মধ্যে কোনোরকম বিয়ের কথা ছিল না। দুজন বন্ধুর (আবার সেই কথা) মধ্যে সমঝোতা থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। দুজনের বন্ধুত্ব খুবই সুখের। কিন্তু একজনের দোষে (যেন আমারই) যা ঘটেছে সেটার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। বিয়ে—?

আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমাদের রক্ত বৈষম্য। আমার যে স্ত্রী হবে সে হবে সম্পূর্ণভাবে জার্মান বংশোদ্ভূত। অতএব দুঃখের সঙ্গে বলছি অবিলম্বে তিন মাস পূর্ণ হবার আগে তোমার একটা অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন।

জিনিসটা খুবই সহজ সবল, প্লেনে জুরিখ গিয়ে হস্টারবানোফের কাছে একটা হোস্টেলে বিমান বন্দরের যে-কোনো ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললে সে নিয়ে যাবে। হোটেলের ভাবপ্রাপ্ত ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নেবে, জুরিখে অনেক ভালো ডাক্তার আছে। সুইজারল্যান্ডের সব ডাক্তারই ভালো। তিনি আমার রক্তচাপ পরীক্ষা করবেন। আমার মায়ু যে সন্তানের জন্ম দেওয়ার মতো ঠিক জায়গায় নেই। একজন স্ত্রী-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন।

সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে ভালো স্ত্রী-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আমি কথা বলব। তিনি নিশ্চয়ই হোটেলের ডাক্তারবাবুকে সমর্থন করবেন এবং কাগজপত্র সই করবেন।

কোনো একটা ক্রিনিকে একটা কেবিনে ব্যবস্থা হবে এবং এ সপ্তাহের মধ্যেই সব কিছুর অবসান হবে। এটা সুইজারল্যান্ডে আইনসম্মত। আমায় কোনো পাসপোর্ট দেখাতে হবে না। আমি যে-কোনো সধবা মহিলার নাম নিতে পারি। তবে খরচ একটু বেশি — একশো কিংবা দেড়শো। সেই সমস্ত ভেবেই সে একটা খাম বের করে টেবিলের ওপর রাখল। দু'বছর যোগ্যতার সঙ্গে চাকরি করে বিনা নোটিশে একমাসের মাইনেসম্মত বরখাস্ত। খামে একশো কুড়ি পাউন্ড ছিল। আর তার নিজের থেকে টুবিষ্ট ক্লাসের বিমান ভাড়া ও জরুরি ব্যবস্থার জন্য আরও পঞ্চাশ পাউন্ড ছিল। সব অর্থই জার্মান মুদ্রায় ছিল কারণ পরে যাতে কোনো ঝামেলায় পড়তে না হয়।

কুরট একটু হাসল। সে আশা করছিল তার এই উদারতা বা কর্মকুশলতার জন্য একটা ধন্যবাদ পাবে। কিন্তু আমার মুখে আতঙ্কের ছোঁয়া দেখে সে বুঝতে পেরে কথা বলার মধ্যে একটু স্ফিপ্রগতি এনে ফেলল। আমার কোনো দৃষ্টিস্তা নেই। এসব দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা জীবনে ঘটেই থাকে। যদিও খুবই বেদনাদায়ক এবং নোংরা। সে খুবই দুঃখিত এইরকম একটা সুখকর সম্পর্কের ইতি টানতে হচ্ছে বলে। কথা শেষ করল এই বলে যে, আমি নিশ্চয়ই বুঝব।

মাথা ঝাঁকিয়ে খামটা তুলে নিলাম। শেষবারের মতো তার সোনালি চুল, অধরোষ্ঠ, যা আমার খুব প্রিয় ছিল— দেখে নিয়ে চোখের জল চেপে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আস্তে দরজা বন্ধ করলাম।

কুরটের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমি ছিলাম একটা ডানা কাটা পাখি
আর এখন আমার আর একটা ডানা ছেঁটে দেওয়া হল।

॥ ছয় ॥

অগাস্টের শেষ। এসব ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন জরিখের গোমড়া মুখে হাসি হাসি ভাবটা যতটা থাকা সম্ভব তাই ছিল। হ্রদের বরফগলা পরিষ্কার জল, পালতোলা নৌকা আর 'শী' করা লোকদের ভিড়ে সব পরিপূর্ণ। সেখানের সুন্দর আবহাওয়া আর কার্নিভালের সুন্দর পরিবেশ আমার ক্ষত-বিক্ষত মনে খুবই আঘাত দিচ্ছিল।

হোটেলের দারোয়ান তার অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে আমায় ভালোভাবে দেখে নিয়ে বললে হোটেলের ডাক্তারবাবু বর্তমানে ছুটিতে আছেন যদিও, কিন্তু অপরজন খুবই দক্ষ (সে কি আমায় দেখে কিছু বুঝেছিল?)

ডাঃ সুম্ কিন্তু আমায় পরীক্ষা করে প্রথমেই জানতে চাইলেন আমার টাকাকড়ি ঠিকমতো আছে কিনা! আর সেটা জেনে একটু আহত হলেন বোঝা গেল। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এই ডাক্তার আমায় খোলাখুলিভাবে বললেন — পাহাড়ে তাঁর একটা গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাবার কুটির আছে।

যেহেতু জরিখের হোটেলগুলো খুবই ব্যয়সাপেক্ষ, তাই অপারেশনের আগের কয়েকদিন সেখানে বিশ্রাম নিলে ভালো হয়। আমি তার দিকে বেশ কঠোর চোখে তাকিয়ে বললাম যে, আমার কাকা স্থানীয় ব্রিটিশ কনসাল। রোগমুক্তির পর তাঁর পরিবারের সঙ্গে অবকাশ যাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অতএব আর দেরি না করে ক্লিনিকে ভর্তি হলেই আমি খুশি হব। তিনিই আমায় ডাঃ সুস্কিন্ডের নাম সুপারিশ করেছেন। আশাকরি ডাঃ তাকে চেনেন।

আমার এই ধাম্মাটা আগে থেকেই আমি ছকে রেখেছিলাম। তাতে কাজ হল। ডাক্তার খুবই আহত হয়েছেন। পরমুহূর্তেই টেলিফোন তুলে ক্লিনিকে যোগাযোগ করে বললেন — আগামীকাল অপরাহ্নে। আমায় কেবল একরাত্রের জিনিষপত্রের ব্যবস্থা করলেই হবে।

এই অপারেশন যতটা যন্ত্রণাবিহীনভাবে করা হল শরীরের দিক থেকে, মনের দিক থেকে ততটাই হল দুঃখজনক, বেদনাদায়ক। তিনদিন পরে হোটেল ফিরলাম। মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম। ইংল্যান্ডে ফিরলাম প্লেনে। কিংসন-বন্দরের কাছে এরিয়ল হোটেল উঠে আমার যৎসামান্য জিনিসপত্রের বিনিময়ে হোটেলের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে 'ভেস্পা' স্কুটারের বিক্রয়তার সঙ্গে যোগাযোগ করে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

আমি মনে মনে ঠিক করেছি এক বছরের মতো একা-একা ঘুরে বেড়াব আর বাকিটা এই পৃথিবীকে দেখব। লন্ডন আমারই ছিল। একসময় সে আমায় প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছে। আমার পা-এর ঠিক নেই। আমি ধরে নিয়েছি আমি এখানের কেউ নই। ডেরেকের শালীনতার পৃথিবী আমি বুঝতে পারিনি আর কুরটের বৈজ্ঞানিক 'প্রেম' আমি সামলাতে পারিনি। না পাবার কারণ আমার হৃদয়। যে হৃদয়কে এদের দুজন চায়নি। যা চেয়েছে, তা হচ্ছে আমার শরীর। এই ঘটনা থেকে এটাই পরিষ্কার হয়েছে যে, আমার সরলতায় এই শহরকে চিনতে পারিনি। আমায় সহজেই লুঠন করে নেয়। ইউরোপের প্রতিযোগিতায় আমি হেরে গেছি।

বেশ তাই হোক।

আমি সরল। সরল দেশেই চলে যাব। সেখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াব। গোটা শীতের সময় আমি আমেরিকা ঘুরে বেড়াব — কখনো রেস্টোরার পরিচারিকা, কখনও বাচ্চা সামলাব, আবার কখনও রিসেপশনিস্ট হিসেবে কাজ করে যাব, ফ্লোরিডায় পৌঁছন পর্যন্ত। সেখানে একটা খবরের কাগজে কাজ জুটিয়ে নেব। আর ঋতুরাজ্য বসন্ত না আসা পর্যন্ত রোদ্দুর পোয়াব।

মন আমার প্রস্তুত। আমার দুঃখকে দূরে সরিয়ে আমাব পাপবোধ, আমার লজ্জাকে অসাড় করে দিয়ে। পলমল-এ আমেরিকান অটোমোবাইলের সদস্য হলাম। মানচিত্র পেলাম। যানবাহনের বিষয়ে আলোচনা করলাম। একটা মোটর স্কুটার কেনার কথা মাথায় এল। ঘন্টায় একশো মাইল যাওয়া খোলা আকাশেব নীচে দিয়ে। অল্প মালপত্র নিয়ে আর গ্যারেজের বামেলায় থাকতে হবে না — আর সব চেয়ে বড়ো কথা যেখানেই যাব — এই যানবাহনটি সবাইকে চমকে দেবে। তারপর হ্যামারস্মিথের স্কুটার বিক্রয়তা তার কাছে গেলাম, বাকিটা তিনি করলেন।

উত্তর আমেরিকার প্রতিটি শিশু মোটরগাড়ির সঙ্গে বড়ো হয়। আমি ঠিক কবলাম সবচেয়ে দ্রুতগামী ১৫০ সি. সি. মডেলের গাড়ি কিনবো, এটা ঘন্টায় একশো মাইল যায় — এটা না হলে দক্ষিণে যেতে কয়েক মাস লেগে যাবে। আর আমেরিকায় পেট্রোল খুব সস্তা। হোটলে গিয়ে মানচিত্রে কুইবেক থেকে যাত্রা শুরু রাস্তাটা দেখে নিলাম। ফ্লোবেস মাসিকে টেলিগ্রাম কবলাম। আর সবচেয়ে সস্তার খরচে কানাডা বিমান পথে মন্ট্রিলে যাবার টিকিট কিনে, কোনো এক পয়লা সেপ্টেম্বর আমরা যাত্রা শুরু করলাম।

মাসির কাছে ছ'বছর বাদে ফিরে এলাম বিস্ময়কর ভাবে। প্রথমে তো তিনি আমায় চিনতেই পারলেন না। কুইবেককে দেখেও আমি আশ্চর্য। যাবার সময় যে কেপ্লাটা আমার কাছে বিশাল ছিল, ফিরে দেখি সেটা ডিজনিয়াল্যান্ডের খেলনার মধ্যে একটা বড়ো খেলনা। আমি বাইরের জগতে ঘুরেছি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতভাবে। তাই ভাগ্যের জোরে ফিরে এসেছি।

মাসির কাছে সবকিছু গোপন রেখেছি। ইউরোপে আমার অর্জিত সম্পত্তি দেখে তিনি চমকিত। আমি যতই ভেতরে সহজ সরল হই না কেন মাসি কিন্তু আমায় শহুরে চালু মেয়ে ধরে নিয়েছেন। তাই তাঁর বহু প্রশ্নেব মুখোমুখি আমায় হতে হয়েছে। আমার চেহারার মধ্যে ফে লাভণ্য ছিল সেটা কোথায় গেল? আর দ্রুতগতির জীবনযাত্রা আমায় কতটা নোংরায় নামিয়েছে।

সত্যি কথাটা মাসির কাছে সম্পূর্ণ গোপন রেখেছি। তিনি সহ্য করতে পারতেন না, তাঁকে বলেছি। যদিও বহু ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তবুও কোনো বিরাট ধনী বা সাধাবণ ছেলে আমায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি এবং এরকমের কোনো ছেলেকে আমি কালাপানির ওপারে রেখে আসিনি।

আমি জানি মাসি এসব বিশ্বাস করেননি। তিনি আমার চেহারার প্রশংসাই করলেন। আমার লালিত্যকে তিনি প্রশংসা করলেন। সেই প্রশংসার অর্থ আর কিছুই নয়, এর ফরাসি ভাষায় অর্থ হল আমার মধ্যে 'যৌন আবেদন' যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আর আমি যে এতদিন বাইরে ঘুরে এলাম অথচ কোনো পুরুষের সঙ্গে আলাপ হল না, প্রেম হল না — এটা তিনি বিশ্বাসই করতে চাইছেন না। আর দেশ ঘেরা, বিশেষ করে মোটর স্কুটারে, তিনি খুবই উৎকণ্ঠিত। কারণ বিপদ যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। আর আমেরিকা তো ডাকাতির দেশ। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার রাস্তাগুলি এতই বিপজ্জনক যে, যে-কোনো মুহূর্তে আমার সব কিছু লুণ্ঠ করে আমায় কাঙাল করে দিতে পারে। তাঁর আমার প্রতি আদেশই বলা যায় যে, আমার স্কুটারটা এমনই হওয়া দরকার যাতে আমি আমার দুটো পা একদিকে ঝুলিয়ে রাখতে পারি। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে 'ভেসপা' হচ্ছে খুবই নামি কোম্পানি তারা ঠিক জিনিসই দেবে আর তাতে আমি মাইলের পর মাইল পাড়ি দেব। তারপর সেইদিন এল— পনেরোই সেপ্টেম্বর, যে দিন আমি 'আমেরিকান এক্সপ্রেস'-এ আমার যে সামান্য পুঁজি ছিল তা থেকে হাজার ডলারের ট্র্যাভেলার্স চেক নিয়ে স্কুটারের দুদিকে খুবই প্রয়োজনীয় না নিলে নয়, এমন কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ফ্লোরেন্স মাসিকে বিদায় চূষন দিয়ে লরেন্সের পাশের দু'নম্বর সড়ক দিয়ে এগিয়ে চললাম। এই পথের দু-ধারে যুদ্ধের পর বহু বাড়ি আর স্নান করায় কুটির গজিয়ে উঠে এই রাস্তার সৌন্দর্য নষ্ট করে দিয়েছে।

এই মহান নদীর পাশের প্রধান সড়ক আমার ছোটবেলায় চেনা চড়ুইভাতি করতে আসার জন্য। তাই জাহাজের ভেঁ ভেঁ আওয়াজ আজও মনে আছে।

চল্লিশ মাইল বেগে আমার ভেসপা চলেছে। ঠিক করলাম রোজ ছ'ঘন্টা গাড়ি চালাব। তবে যদি কোনো নতুন বাড়ির সন্ধান পাই, তবে সেই রাস্তায় যাব-বা যদি কোনো নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখে পড়ে তবে থেমে তা উপভোগ করব।

কানাডা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর দিকে পিকনিক করার সুন্দর সুন্দর সব জায়গা করেছে, জঙ্গল কেটে মাঝে মাঝে নদী বা হ্রদের পাশে জায়গা পবিষ্কার করে গোপনীয়তা রক্ষা করে টেবিল ও বেঞ্চ পাতা রয়েছে। ভাবলাম সেখানেই আমার দুপুরের খাওয়া সেরে নেব, অবশ্য যদি বৃষ্টি না হয়।

আমি ঠিক করলাম দোকান থেকে দামি খাবার না কিনে কোনো মোটেল যখন ছেড়ে দেব তার আগে ডিম আর নোনতা শুকনো শুকরের মাংস দিয়ে স্যান্ডউইচ আর এক ফ্লাস্ক কফি করে নেব। ঠিক করেছি আমার প্রাত্যহিক খরচ পনেরো ডলার। মোটেলের ভাড়া বাবদ সরকারি কর সমেত ন'ডলার। ভোরবেলায় খাবার কফি আর মাংসের রুটি। এক ডলার পেট্রোল এবং এতে দুপুরের খাওয়া। একটু আধটু পান করা আর কিছু সিগারেট-এর জন্য থাকবে পাঁচ ডলার। আমি সব ঠিক কুলিয়ে নেব।

আমার কাছে অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনের যে পথের ম্যাপ ছিল তার সঙ্গে বহু দর্শনীয় জায়গারও তালিকা রয়েছে যেমন রেড ইন্ডিয়ানদের রাজ্য ফেলিমোর কুপার। মার্কিন বিপ্লবের বহু স্মৃতিবিজড়িত জায়গা— এতে প্রায় এক ডলারের মতো প্রবেশ মূল্য পড়বে। আর যদি কিছু বেশি খবচ হয় তবে অন্যদিন খাওয়া কমিয়ে ম্যানেজ করে নেব।

আমার 'ভেসপা'-কে যতটা ভেবেছিলাম, এ তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তপোক্ত। মাত্র কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে পঞ্চাশ মাইলের স্পিড তোলা এমন কিছু অসুবিধে নয়। এর গিয়ার যতই হাতের কবজার মধ্যে এসে যাচ্ছে ততই সে যেন উড়ে চলেছে পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে। আমার যাওয়া দেখে ছোকরা শিষ দিচ্ছে আর বড়োরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। এসব সহ্য করতে হয়েছে। মাসির সাবধানবাণী মনে পড়ে যাওয়ায় সকলের দিকে তাকিয়ে শুধু হেসেছি।

উত্তর আমেরিকার বেশির ভাগ রাস্তাই খুব খারাপ। ভয় ছিল আমি স্কুটার নিয়ে খুব বিপদে পড়ব। আমার স্কুটার দেখে খুব ভিড় হবে ভেবেছিলাম। তবে বড়ো গাড়ির ড্রাইভাররা আমায় একটা খেলার পুতুল ভেবে রাস্তায় মাঝের অনেকটা জায়গা আমার জন্য ছেড়ে দেওয়ায় রাস্তার বেশিভাগ অংশ আমারই হয়ে গেল।

প্রথম দিন আমার বেশ ভালো ভাবেই চলল। আমি মন্ট্রিল পার হয়ে গেলাম সঙ্কের আগে। তখন আমি জাতীয় সড়কে ন' নম্বর দিয়ে চলছি শ্রায় কুড়ি মাইল এগিয়ে। পরের দিন সকালে নিউইয়র্ক রাজ্যে ঢুকলাম। 'দ্য সাদার্ন স্ট্রেন্ট মোটলে' রাতের অতিথি হতে অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা পেলাম। স্কুটার নিয়ে আমি যেন আমেরিকায় ইয়ার বাট বা মলিসন। কাফেটারিয়াতে সব কিছুই দাম মিটিয়ে কুষ্ঠার সঙ্গে মালিকের দেওয়া এক গ্লাস পানীয় খেয়ে নিজের ঘরে আরাম করে শুতে গেলাম। ভেসপা আমার স্বপ্নের সব কিছুই রূপায়িত করেছে।

একদিনে প্রথম দু'শ মাইল গেলেও পরের আড়াইশো মাইল যেতে আমার দু'সপ্তাহ লাগল। মার্কিন সীমারেখার মধ্যে ঢুকে অনেক দর্শনীয় জায়গা দেখলাম যেমন— নদী, হ্রদ, জাদুঘর, গুহা কিছুই বাদ দিইনি। এখানে হই-চই করে ঘুরে বেড়াবার মধ্যে আমার আসল উদ্দেশ্য রাতের জন্য একটা ভালো থাকার জায়গা খোঁজা।

দু'সপ্তাহের শেষ দিকে লেক জর্জে এলাম। এখান থেকে ন'নম্বর জাতীয় সড়কের ভীষণ ব্যস্ততা ছাড়িয়ে বনের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে তার ভেতর দিয়ে 'দোড্‌জি পাইনস্' মোটর কোর্টে পৌঁছে সেখানে আরামে চেয়ারে বসে ভাবছি আমি এখানে কী করে এলাম!

॥ সাত ॥

এখানে আসার পর প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হল।

বৃষ্টির জল বের হবার জন্য বাড়িটার চারপাশের জলনিকাশি পাইপ দিয়ে বেশ তোড়ে জল বের হচ্ছে, যেন একটা সংগীতের সুর।

আমার ছোট্ট সাদা ঘরটা বেশ সুন্দর করে সাজানো। মনে হচ্ছে খুব ভালোভাবে একটা ঘুম দেব। এলিয়ট ফ্রে-র বিছানা, ম্যাজি কাস্টমের নকশা করা কার্পেট, ফিলকো কোম্পানির টেলিভিশন, সিম' ভিভ্যার তৈরি দামি আসবাবপত্র, আর স্নানাগারটিও খুবই যত্নের সঙ্গে সাজানো — এখানে টমিলেট পেপারের পরিবর্তে রঙিন বাথরুম টিসু রাখা আছে।

এত সাজ-গোজ থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হল দ্য ড্রিম পাইনস মোটেই ভালো চলছিল না। গত দু-সপ্তাহ আগে যখন এসেছিলাম তখন মাত্র দু-জন লোক রাত্রে থাকার জন্য ছিল। মরশুম শেষ হতে মাত্র দু-সপ্তাহ বাকি তবুও কোনো লোক কোনো ঘর রিজার্ভ করেনি।

সেদিন বিকেলে যখন এখানে এলাম — মিসেস ফ্যান্সি আমার দিকে বেশ তিত্তিবিরক্ত এবং অবিশ্বাস মাখানো দৃষ্টি দিয়ে আমার আপাদমস্তক মাপলেন পরে আমার ঘরের কার্ডটা নিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন যে ন'নম্বর সড়ক দিয়ে ভেসপা ফুটারে করে আমি যে এলাম, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা সঠিক না ভুয়ো।

মিসেস ফ্যান্সির স্বামী জেডকে বেশ উদার মনে হল কারণ ক্যাফেটারিয়াতে তিনি যাবার সময় তাঁর হাতটা আমার বুকে বেশ ভালোভাবে ঘসটে গেলেন। তারপর তিনি ফাইফরমাশ এবং ছোটো খাটো রান্নার মাঝে আমার শরীরের ওপর তাঁর চোখ বেশ ভালোভাবে বুলিয়ে যাচ্ছেন। এমন কী আমার জন্য কফিও নিয়ে এলেন। কেবল বকবক করে যাচ্ছেন যে, তার হোটেল বন্ধ করার আগে অজস্র কাজ রয়েছে। যে-সমস্ত লোকেরা মাল বইছে তাদের জন্য ডিম ভেজে দেবার জন্য ওর ডাক পড়ছে হরদম। বোঝা গেল মালিক ল্যানসুইনেত্তি ট্রয় শহরে আসে এবং তাঁর দুজন ম্যানেজার।

কোহেম রোড থেকে নেমে একটা জায়গার প্রচুর সম্পত্তির মালিক। তারপর আলবেনির ন'নম্বর রাস্তায় 'ট্রোজান হর্স' নামে যে বিরাট বাড়িটা রয়েছে সেটারও মালিক তিনি। এটা কি আমি জানি?

'জানি না' — বলতে মিস্টার ফ্যান্সি খুব ধূর্ত চোখে আমায় দেখলেন।

'হর্সের কাছে লোকে মজা করতেই যায়। তবে আপনার মতো সুন্দরীর একা না যাওয়াই ভালো। বিপদ হতে পারে। যদি যাবার ইচ্ছে হয় আমার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করবেন। আর আপনার সঙ্গী হতে পারলে নিজেই ধন্য মনে করব। মজার জায়গাগুলো দেখিয়ে দেব।'

তাকে ধন্যবাদ দিলাম। বললাম আপাতত আমায় ডিমের হলদে দিকটা ওপরে রেখে ভাজা শুয়োরের মাংস দেন বড়ো ভালো হয়। আর আমার গস্তব্য তো দক্ষিণের দিকে যাবার জন্য।

আমার এই কথা শুনেও মিঃ ফ্যান্সি আমায় ছাড়বার পাত্র নন। আমার ছোট্ট টেবিলটার সামনে বসে, আমার বাবা-মা-এর কথা জানতে চায়। তার জীবনের টুকরো-টুকরো আলতু-ফালতু

কথা কেবল বলেই চলেছেন। আমি বাড়ি ছেড়ে এত দূর এসে মন খারাপ করছি কিনা, বা মার্কিন মুলুকে আমার কোনো বন্ধু আছে কিনা—।

ভদ্রলোক আমার বাবার বয়সি, বয়েস পঁয়তাল্লিশের মতন। তাঁর স্ত্রীটিও কমতি যান না। তিনি রিসেপশনের বসার জায়গা থেকে আমাদের ওপর নজর রাখছেন।

শেষমেষ মিঃ ফ্যান্সি তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলেন, খুব-নীচু গলায় কীসব আলোচনা করছেন। আমি এক কাপ কফি খেয়ে দ্বিতীয় আর একটা খেয়ে (এর জন্য পয়সা লাগবে না — দ্য ড্রিম পাইনস্-এর শুভেচ্ছা) একটা সিগারেট খাচ্ছি, এমন সময় মিসেস ফ্যান্সি আমার কাছে এসে আমার মা-মাসির মতো আমায় স্কুটার অভিযানের জন্য উদ্বিগ্ন প্রকাশ করলেন। এরপর আমার এখানে আরও কিছুদিন থেকে কিছু রোজগার করে — মানে তাঁর এখানে রিসেপশনিস্টের কাজ যদি করি তবে পবিত্রের্তে থাকা-খাওয়া ছাড়া সপ্তাহে ত্রিশ ডলার পাওয়া যাবে।

ফ্যান্সিদের প্রস্তাবটা মন্দ নয়। বাড়তি যাট ডলার রোজগার। আমি আবার এখারে টুরিস্টের মেজাজে কিছু বেশি খরচ করে ফেলেছি। সেটা পুষিয়ে যাবে। আর আমি পথে যে সব লোকের সংস্পর্শে এসেছি এরা তার চেয়ে খুব একটা খারাপ নয়। অতএব বললাম প্রস্তাবটা মন্দ নয়। আর এখান থেকে যাবার সময় একটা সার্টিফিকেটও এরা দেবে। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

আমার কথায় ওরা খুব খুশি। তাড়াতাড়ি আমায় মোটেলের সব ঘরদোর দেখিয়ে দিল। মিলিসেন্ট নামে যে মহিলা ছিল, সে আমায় রেজিস্টার দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল আর বলে দিল যারা স্টেশন-ওয়ান নিয়ে আসবে তাদের ওপর যেন ভালো করে নজর রাখি।

এই কাজটায় কোনো বামেলাই নেই। কেবল ভাবছি ওরা আমায় বহাল করল কেন? আসলে ওরা ভীষণ গঁতো। তার ওপর ফ্যান্সির মতলব ছিল একটা শয্যা-সঙ্গিনী পাবে। ওর ওই স্কুধার্ত হাতটাকে সামলে নিয়ে আমার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে একটা চেয়ার দিয়ে আটকে রেখে দিলাম। যাতে দ্বিতীয় রাত্রের মতো চাবি দিয়ে আমার ঘর খোলার চেষ্টা যেন আর না করতে পারে।

প্রথম সপ্তাহে কয়েকজন অতিথি এল রাত কাটানোর জন্য। গেরস্থালির কাজ দেখাটাও আমাকে করতে হচ্ছে। এরপর দশই অক্টোবরের পর সব ফাঁকা।

পনেরোই অক্টোবর এমনই একটা তারিখ যে, এই তারিখের পর বড়ো রাস্তায় আশপাশ ছাড়া সব বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আসে শিকারের সময়। যাদের পয়সা আছে তারা তাদের দলবল নিয়ে পাহাড়ে যায় হরিণ শিকার করার জন্য। আর যাদের তেমন নেই তারা গাড়ি নিয়ে চড়ুইভাতি করার জায়গায় যায় হরিণের সন্ধানে। আর এই পনেরোই অক্টোবর পার হলেই অ্যাডিয়োনডাকসে বাড়তি রোজগারও বন্ধ।

পনেরোই অক্টোবর যতই এগিয়ে আসছে ফ্যান্সিদের সঙ্গে মোটেলের মালিক ট্রয়বাসী সান্‌গুইনেস্তির ফোনে বার বার যোগাযোগ হতে লাগল। একদিন আমায় ডেকে মিসেস ফ্যান্সি বললেন — তেরো তারিখে তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ট্রয়ে চলে যাচ্ছেন। আর চোদ্দো তারিখে দুপুরে মি. সান্‌গুইনেস্তি এখানে আসবেন মোটেলটা পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। এই সময়টুকুর জন্য সে এই মোটেলের দায়িত্ব নিতে পারবে কি না। তিনি এলে তাঁর হাতে চাবিটা দিয়ে দেবে।

প্রথমটা আমার খুব অস্বস্ত লাগল যে, একটা অচেনা মেয়ের হাতে এতবড়ো বিরাট সম্পত্তি রেখে দিয়ে ওরা চলে যাবে। পরে বললে — তারা টাকা-কড়ি, রেজিস্টার খাতা, অস্থাবর জিনিস মাল-পত্র সব ওদের সঙ্গে নিয়ে যাবে। সে শুধু রাত্রের শোবার আগে যেন সব ঘরে চাবি দিয়ে,

আলো নিভিয়ে দেয়। পরের দিন মিস্টার সান্‌গুইনেস্তি এসে ট্রাকে করে বাকি সব মালপত্র নিয়ে যাবে। তারপর আমি আমার মতো চলতে পারব। অতএব রাজি হলাম।

মিসেস ফ্যান্সির আর আনন্দ ধরে না। আমি খুব ভালো মেয়ে। কিন্তু যখন তাকে, আমার একটা সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা বললাম। তার সব আনন্দ নিভে গেল। বললেন, সেটা মিস্টার সান্‌গুইনেস্তির ওপব ছেড়ে দেওয়াই ভালো। তিনি নিশ্চয়ই লিখবেন যে, আমি কতটা সাহায্যকারী।

অতএব আমার জন্য আর ট্রাক নিয়ে যারা আসবে, তাদের জন্য প্রচুর শুকনো গুয়োবেব মাংস আর ডিম রেখে সারা দিন ধরে কাফেটারিয়া আর মাল গুদাম ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র স্টেশন-ওয়াগানে ভর্তি হতে লাগল।

আজকের শেষ দিনটা ওদের কাছ থেকে একটু ভালো ব্যবহার আশা করেছিলাম। এতদিন তো আমরা মোটেই খারাপভাবে কাটাইনি। আর আমিও আমার কাজ ছাড়াও ওদের বাড়তি সাহায্য করেছি।

কিন্তু সেটা মোটেই তা হল না। ওরা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে লাগল যে, আমি যেন তাদের কাজের লোক। মিসেস ফ্যান্সি আমাকে বেশ আদেশ করে কাজ করতে লাগলেন। আর জেড, তার বউ শুনতে পায় এমনভাবে খুব নোংরা নোংরা কথা বলতে লাগল। আর আমায় আওতার মধ্যে পেলেই মিস্টার ফ্যান্সি আমার গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। এইরকম ব্যবহার যে কেন বুঝতে পারলাম না। আমার মনে হল আমার কাছ থেকে যা পাওয়ার তা তো পেয়ে গেছে। অতএব এখন খারাপ ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধে নেই।

শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে না পেয়ে মিসেস ফ্যান্সিকে গিয়ে বললাম — আমি চলে যাব অতএব আমার পাওনা টাকা-কড়ি কি এখন পেতে পারি? উত্তরে বললে — মিস্টার সান্‌গুইনেস্তি এসে তাঁর কাঁটা-চামচ ইত্যাদি মিলিয়ে দেখে তারপর দেবেন। কারণ আমরা চলে যাওয়ার পব এ সবেই দায়িত্ব আমাদের নয়। আব ওদের সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি না হওয়ায় আমি কিছু জ্যাম জেলি-পাউকটি নিয়ে ঘরে চলে গেলুম — চাবি দিবে বসে রইলুম আর তার আগমনের জন্য প্রার্থনা কবতে লাগলাম। অবশেষে ভাব ছটা বাজল। সেই দানব দানবী চলে গেল।

এই 'দ্য ড্রিমি পাইনস'-এ আমার শেষ রজনী। আগামীকাল থেকে আমি আমার। এখানে থেকে একটা কাজ শিখতে পেরেছি, যেটা ভবিষ্যতে আমার কাজে লাগবে। ভীষণ খিদে পেয়েছে। কাফেটারিয়াতে গিয়ে ইলেকট্রিক উনুন জ্বালিয়ে তিনটে ডিম আর বেশ কিছু হিকোরী সেকা গুয়োরের মাংস দিয়ে তাতে চড়িয়ে দিলাম।

ঘড়িতে নটা বাজল আলবেনী বউয়োকো-বেতারে আবহাওয়ার খবরে জানা গেল মধ্যরাত্রির মধ্যে আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতএব কাল সকালে রাস্তা বেশ শুকনোই পাওয়া যাবে।

আর ঠিক এই সময়েই দরজায় খুব জোরে ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

॥ আট ॥

দরজা ধাক্কানো চলছেই। আমার মস্ত ভুল হয়েছে 'ঘর খালি আছে' নিওনের আলোটা জেলে ছিলাম কিন্তু বৃষ্টির জন্য সেটা আর নেভানো হয়নি। হয়তো কোনো অতিথি এসেছে। তার কাছে গিয়ে বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে লেক-জর্জে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই দরজা চাবি খুলে শেকল টেনে ভয়ে ভয়ে দরজাটা ফাঁক করলাম।

দরজার সামনে দুজন লোক বর্ষাতি পরে মাথায় টুপি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিওনের লাল

আলোয় তাদের বর্ষাতি আর মাথাব টুপিও পব চকচক কবছে। তাদের পেছনে একটা কালো রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সামনের জন বেশ বিনীতভাবেই বললে — মিস মিশেল ?

— হ্যাঁ আমি। ঘর খালির বিজ্ঞাপনের আলোটা নেভাতে ভুলে গেছি।

লোকটি বললে — ভয়ানক বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের কি ভেতরে আসতে দেবেন ? আমরা মিস্টার সানগুইনেস্তির কাছে থেকে আসছি। তিনি যে কোম্পানিতে বিমা করেছেন আমরা তারই লোক। আমাদের পরিচয়পত্র ভেতরে গিয়ে দেখাচ্ছি। কাল সব মাল-পত্তর যাওয়ার আগে আমরা তার একটা লিস্ট তৈরি করতে চাই।

তারা এমনভাবে বর্ষাতি আর টুপি পরেছে যে, তাদের মুখ মোটেই দেখা যাচ্ছে না। আমার খুবই সন্দেহ হচ্ছে যদিও তাদের কথা বলার মধ্যে কোনো রকম ফাঁক ছিল না। একটু ভয়ে ভয়েই বললাম —

— তবে ম্যানেজার, মানে ফ্যাপ্সিরা তো আপনাদের আসার কথা কিছু বলে যাননি।

— সেটা তাদের উচিত ছিল। মিস্টার সানগুইনেস্তির কাছে সব জানাতে হবে।

পেছনের লোকটির দিকে চেয়ে বলল — ঠিক তো মিস্টার জোন্স ? লোকটা হাসল — বড়ো বাজে লাগল।

— অবশ্যই মিস্টার টমসন। আবার তার ঐরকম বাজে রকমের হাসি।

— মহাশয়া, আমাদের ভেতরে আসতে দিন — বাইরে তো অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।

— আমাকে কিন্তু কাউকে ভেতরে আসতে বলার কথা কেউ বলেনি। তবে যেহেতু আপনারা মিস্টার সানগুইনেস্তির লোক —

আমি খুবই ভয়ে ভয়ে চেনটা খুললাম।

চেন খোলার সঙ্গে সঙ্গে তারা বেশ অসভ্যের মতো আমায় পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঘরটাকে ভালোভাবে দেখতে লাগল। মিস্টার টমসন খুব হাঁচল। তার বিস্তী চোখ দুটো যেন আমায় খেয়ে ফেলেছিল।

— সিডারেল চলবে ?

— মাঝে মাঝে খাই।

— আমাদের মনে হয় আপনি সঙ্গ পেতে পারেন।

দরজার হ্যান্ডেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে চাবি দিয়ে চেনটা আটকে দিল। তাদের ভেজা বর্ষাতি দুটো খুলে বিস্তীভাবে ঘরের মেঝেতে ফেলে দিল। বুঝতে পারলাম আমি বেশ বিপদে পড়েছি।

— মিস্টার টমসন।

নিশ্চয়ই দলের পাণ্ডা। লম্বা বোণা, ছাই ছাই গায়ের চামড়া। চোখ দুটো ঢুকে গেছে। লোকটা বোধ হয় ঘরের বাইরে বের হয় না। লোকটার কালো চোখ আস্তে আস্তে ঘুরছে। ঠোঁটদুটো এমন ভাবে ফাঁক হয়ে আছে যে যেন কাটা ঠোঁট সেলাই করা হয়নি।

তার গায়ে ছাই-ছাই রংয়ের কোট, গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা। টাই নেই, পায়ে ইটালিয়ানদের মতো সরু মুখওয়াল ছাই রং-এর সোয়েত সু। সবই নতুনের মতো দেখতে। আমি ভয়ে শিউরে উঠছি। দেখতে একটা বীভৎস গিরগিটির মতো।

এই লোকটাকে যেমন ভয়াবহ দেখতে সঙ্গের সাথীটা তেমনি বেঁটে খাটো। গোল গাল মুখ। ফ্যাকাশে নীল রঙের চোখ। মোটা ঠোঁট দুটো ভিজে ভিজে। বোধ হয় কোনোরকম অসুখ আছে -- যাতে তার গায়ের রং সাদা, কোনোরকম লোম নেই। ভুরু নেই চোখের পাতা নেই। পুরো মাথায় একটাও চুল নেই। টাকটা যেন বিলিয়ার্ড বলের মতো তেলা তেলা। লোকটাকে দেখে

আমার দুঃখ হত, যদি না ভয় পেতাম। লোকটার পরনের পোশাক খুবই নোংরা গোছের। আঁটসাঁট পোশাক।

এবার ওর নাকঝাড়া শেষ করে আমায় দেখতে লাগল। দাঁত বার করে হাসতে লাগল। আমার চারপাশে ঘুরে সামনে এসে অসভ্যের মতো শিষ দিতে লাগল। সঙ্গীকে চোখ টিপে ইশারা করে বললে — হরর বল, খাসা ডবকা মাইরি, মালটা বড়ো ভালো। এর জোড়া নেই।

— স্নাগাসি ওসব পরে করার সময় পাবে। এখন কেবিন-টেবিন দেখি। ততক্ষণ ঐ ছুঁড়িটা আমাদের কিছু খাবার তৈরি করে দিক।

স্নাগাসি নামের জানোয়ারটা আমার দিকে চেয়ে শিষ দিতে দিতে বললে — ডিমের এলোঝালো ভাজা তৈরি করত খুকু। বেশ নরম নরম করবে। ঠিক মগ্নতা নাহলে একটা থাপ্পড়।

তারপর সেই লোকটা বস্ত্রারদের মতো হাত গুটিয়ে আমার দিকে এগোতে লাগলে আমি যতটা পেরেছি তার চেয়ে বেশি অভিনয় করে দরজায় দিকে পেছোতে লাগলাম। লোকটা আমার নাগালের মধ্যে এলে তাকে আচ্ছা করে কষে একটা চড় মারলাম।

রোগা লোকটা হেসে ফেলল।

— কী হল স্নাগাসি। বলছি তো এখনো সারা রাত পড়ে রয়েছে। আমি যেমন যেমন বলেছি তাই করে যাও।

ফ্যাকাশে গোল-গাল মুখে লোকটার চোখ দুটো উত্তেজনায় লাল হয়ে গেল। গালে হাত বুলিয়ে ভিজা ঠোটে হাসি ফুটে উঠল।

এই যে খুকুমণি তুমি আজকের রাতটা শুধু তোমার জন্যই তৈরি করলে। অনেক অনেকবার নানারকমভাবে, ঘুরে ফিরে।

আমি ছুটে গিয়ে টেবিলের পাশে গিয়ে স্টিলের চেয়ারের পা দুটো ধরে তুলে ধরেছি। এবং পাশ থেকে ওদের দেখছি আর ভাবছি কী দুঃখের রাত এল আমার। গলার স্বর সহজ রেখে বললাম—

— এসবের মানে কী? তোমরা তোমাদের পরিচয়পত্র দেখাও। বাইরে কোনো গাড়ির আওয়াজ পেলেই জানলা ভেঙে আমি সাহায্যের জন্য চিৎকার করব। আর কাল সকালে এর মজা টের পাবে।

স্নাগাসি হেসে বললে — কালকের কথা কাল দেখা যাবে। ঘাবড়াচ্ছ কেন খুকু?

হরর আমার দিকে ঠান্ডা মুখে চেয়ে থাকলে —

স্নাগাসিকে মারাটা ঠিক হয়নি। ও ভীষণ কঠিন লোক। ওকে মেয়েরা অপছন্দ করে এটা আবার ও খুবই অপছন্দ করে। ওর চেহারাটা এ রকম একটা রোগের কারণে। ডাক্তাররা বলেছে — অ্যালাপেসিয়া, টোটালীস। অর্থাৎ সমস্ত শরীরে কোনো লোম নেই। মাথায়। ভুরুতে। গায়ে। হাতে। এমনি ভাবে ইশারায় তার সারা শরীর দেখাল।

— এখানে নয়। ওখানে নয়। কোথাও নয়। তুমি জানো না খুকু।

হরর তাই বললে —

— স্নাগাসি সহজেই খেপে যায়। ওর খুব শক্তি। ওর ধারণা সমাজ ওকে সম্মান দেয়না। ট্রয়েতে ও হচ্ছে মস্তান। কাউকে ঠান্ডা করতে হলে ওকে ভাড়া করা হয়। সানগুইনেস্তি আমাদের এখানে পাঠিয়েছে ট্রাক না আসা পর্যন্ত সব জিনিস পাহারা দেওয়া আর তোমার মতো একটা বাচ্চা মেয়েকে যাতে একলা না থাকতে হয়।

— ঠিক কথা বলেছ।

সে একটা চাপা হাসি হাসল।

-- কেবলমাত্র তোমাকে সঙ্গ দেওয়ার বিষয়ে। বদমায়েসগুলোকে দূর করে দেওয়ার জন্য। আব সেই সঙ্গে তোমার সারা অঙ্গের খাদ খোদগুলোব মাপ যাতে ঠিকঠাক থাকে সেটা দেখার জন্য। অবশ্য একটা সময় তোমার নিশ্চয়ই আসবে যখন তোমার পাহারাব প্রয়োজন। তাই না?

হাতের চেয়ারটা নীচে টেবিলের ওপর রেখে বললাম —

— তোমাদের আসল নাম বল। পরিচয়পত্র দেখাও।

হঠাৎ স্নাগাসি একটু নড়ে উঠল। ওকে পিস্তল বার করতে দেখলাম না কিন্তু হাত থেকে নীল আগুনের মতো কী একটা বেরিয়ে গিয়ে বার কাউন্টারের ওপরের তাকে রাখা ম্যাক্সওয়েল হাউস কোম্পানির এক টিন ভর্তি কফি ছিল, সেই টিনটা লাফিয়ে মাটিতে পড়ে গড়াতে লাগল। পিস্তলের আওয়াজ। সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধতায় ভবে গেল। আব কফির বাদামি গুঁড়োতে ঘরটা ছেয়ে গেল। স্নাগাসি আমার দিকে চেয়ে বলল —

— আর কী আমাদের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হবে খুব?

আমার পা ভয়ে কাঁপতে লাগল। নীল ধোঁয়াটা আমার দিকে এগিয়ে এল। ঘৃণার সঙ্গে বললাম — ‘অনেক কফি নষ্ট করলে। এখন তোমাদের নাম বল।’

রোগা লোকটা চিবিয়ে চিবিয়ে বললে — ঠিক, ঠিক বলেছেন ইনি। অতটা কফি নষ্ট করা তোমার উচিত হয়নি স্নাগাসি। দেখুন — লোহার অস্ত্রের ব্যাপারে ও খুব তুখোড়। তাই ওর নাম স্নাগাসি। আমি — একটু হেসে বলল — হরব বলে ডাকে সবাই — স্নাগাসি তুমি কারণটা বলতে পার?

স্নাগাসি হাসতে হাসতে বললে — হরর মানে তো ভয়। বোধহয় তুমি কাউকে বা কোনো দলকে ভয় দেখিয়েছিলে।

হরর চুপচাপ। শুধু বললে — আপনি আমাদের খাবার বানিয়ে দিন। গায়ে কোনো আঁচড় পড়বে না। হ্যাঁ স্নাগাসি চল আমরা কেবিন-টেবিনগুলো দেখে নিই।

স্নাগাসির চোখে নোংরা দৃষ্টি। সে বললে — ব্যস, ব্যস, আর নয় বিষয়ে। তারপর ডেস্কের পেছনে চাবির র্যাক থেকে চাবির খোলো নিয়ে পেছনের পথ দিয়ে বেরিয়ে গেল। চেয়ারটা নামিয়ে রাখলাম। আমার আঁট-সাঁট প্যান্ট পরাটা বড্ড বিস্ত্রী ভেবে কাউন্টারের পেছনে ঢুকলাম।

হরর খানিকটা দূরে কাফেটেরিয়ার টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে উলটোভাবে বসে ঠেসান দেওয়ার জায়গায় থুতনিটা রেখে লোভীর দৃষ্টিতে আমায় দেখতে লাগল। আমায় বললে — ‘আমার জন্যেও ডিমের ভাজা বানাতে। আর শুকনো শুয়োরের মাংস, টোস্ট করা রুটিতে মাখন লাগাবে। আর কফি?’

দেখা যাক, কিছু বাঁচল কি না! বারের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে দেখি টিনটার গায়ে চারটে ফুটো। ইঞ্চিখানেক ভালো কফি আছে, ওটা আমার জন্যে রাখব। ওদের জন্যে মাটি থেকে পড়ে থাকা কফি হেঁকে একটা প্রেটে তুলতে লাগলাম। ওর সঙ্গে কিছু ধুলোও উঠে এল।

কফি তুলতে কিছুটা সময় নিলাম ভাববাব জন্যে। ঐ লোকদুটো মিস্টার সানগুইনেস্তির পোষা গুণ্ডা। ওরা ফ্যান্সিদের কাছে আমরা নাম শুনে থাকবে। এরা আর যা বলেছে সব মিথ্যে। এদের পরের ব্যাপাবটা জানতে হবে। এই বড়ের মধ্যে এদের পাঠানোর কোনো নির্দিষ্ট কারণ আছে। কী সেটা? আমি যে কানাডার লোক এটা ওরা জানে। কাল সকালে পুলিশের কাছে নালিশ করলে ওরা বিপদে পড়বে, সেটা জানে। স্নাগাসি সান কেনটিনের লোক, সেটা ওর চেহারা দেখেই বোঝা যায় — মরা পাংশুটে। মনে হয় খুব শীঘ্রই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।

এরা একটা সাধারণ গাড়ি করে এসেছে। এদের আসল উদ্দেশ্যটা কী জানতে হবে। মালপত্রের জন্য তো ট্রাক আনা উচিত ছিল। আবার এ ও হতে পারে সত্যিই জায়গাটা পাহারা দেওয়ার

জানো ওদেব পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওদের ব্যবহার মোটেই ভদ্রোচিত নয়। গুন্ডার মতো। জানি না আজ রাতটা আমার কীভাবে কাটবে?

আমি উঠে ওদের মনোমতো রান্নাই করতে গেলাম। তাহলে আবে আমার কোনো দোষ থাকবে না।

ঘরের কোণে জেড-এর আ্যপ্রনটা পড়েছিল, সেটাই কোমরে জড়িয়ে নিলাম। অস্ত্র চাই। কাঁটা চামচের দেরাজে একটা বরফ তোলার চিমটে। একটা বাকানো লম্বা ছুরি ছিল, ওগুলো আ্যপ্রনের নীচে প্যান্টের সামনে গুঁজে রাখলাম।

বাসন মোছার জন্য একটা তোয়ালে ছিল। সেটা দিয়ে ছুরিটা ঢেকে রাখলাম।

কাপ ডিশ গুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখলাম, প্রয়োজনে ছুড়ে মাঝা যায়। ছেলেমানুষী? এ ছাড়ো তো আমার কাছে উপস্থিত কিছু নেই।

আমি ঘরের দিকে ভালোভাবে নজর রাখছিলাম। আর ঐ রোগা লোকটা-অপরাধী জগতের লোক। সেও আমার দিকে তার নজর বেখে চলেছে। আমার আত্মরক্ষাব ব্যাপারটা বুঝে থাকবে নিশ্চয়ই। ইংল্যান্ডে স্কুলের পড়ার সময় শিখেছিলাম যে ওরা যখন আঘাত করবে, সেটা আঘাত করার জন্যই কববে। আর সেইমতো ওদের আঘাত করতে হবে। ওরা আমায় কাবু করতে পারলে ধর্ষণ তো করবেই আবার খুনও কবতে পারে।

উঃ! ভাবতে পারছি না। আমি ধর্ষিতা হব, খুন হব। গুধু বুঝতে পাবছি আমি বিপদে পড়েছি। ওদেব কঠিন শাস্ত মুখগুলি তাই আমায় বোঝাচ্ছে। ওবা যে আমায় বিপদে ফেলবে এটা বেশ বুঝতে পারছি।

একটা বড়ো বাটিতে আটটা ডিম ভেঙে কাঁটা দিয়ে ফেটলাম। সসপ্যানে মাখন দিয়ে শুয়োবের মাংস. ডিম দিয়ে নাড়ছি যেমন তেমন মনও আমার নড়ে চলেছে কীভাবে এখন থেকে পালাব। অবশ্য সেটা সম্ভব হবে যদি স্নাগাসি ঘরে ঢুকে দরজা লক করতে ভুলে যায়।

আমায় ছুটেই যেতে হবে। কারণ, এই ঠান্ডায় ভেসপা স্টার্ট দিয়ে তাকে গরম করে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার আশা আমায় ছাড়তে হবে। এতে সময় বেশি নেবে। ঘর থেকে বেরিয়ে আমায় বাঁদিকেই দৌড়তে হবে। ওদিকে গাছেব পর গাছ। অবশ্য পায়ের চটি নেই, ছুটেতে ছুটেতে পা ছড়াবে। বৃষ্টিতে ভিজে আমসি হব। উপায় নেই। তবুও ছুটেতে হবে। এদের হাত থেকে বাঁচতে হবে।

ডিমের এলোঝোলো ভাজা তৈরি হয়ে গেছে। বেশ নরম নরমই আছে। একটা ট্রেতে সেগুলি, গুয়োরের মাংস সব সাজিয়ে রাখলাম। টোস্টাব থেকে টোস্ট করা কুটিগুলো অন্য আর একটা ট্রেতে রাখলাম, পাশে একতাল মাখন। সবগুলো একটা বড়ো ট্রেতে সাজিয়ে ধুলোমাখানো কফি নিয়ে সেই বোগা লোকটার কাছে এলাম।

ট্রে নামাতেই পেছন দিকের দরজা খোলার আওয়াজ— স্নাগাসি এল। দরজাটা ভেজালো। লক-এর ক্লিক আওয়াজ হল না। তার হাত খালি, আমার বুকের মধ্যে যেন একটা দূরমুস-এর আওয়াজ বেড়ে চলেছে। খাবারগুলো টেবিলে রাখলাম। স্নাগাসি ঢুকে খাবারগুলো দেখে আমার পেছনে গিয়ে দু'হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে তার কদাকার মুখটা আমার ঘাড়ে চেপে ধরল। বলছে—

ঠিক যেমন মা তৈরি করে, সেই রকম হয়েছে খুকু। তোমাতে আমাতে ঘর বাঁধব আর তুমি এবকম রাঁধবে, আমার স্বপ্নের রানি হবে। কী হল, কোনো জবাব দিছ না কেন? ঠিক নয়? রোগা লোকটা বলল, বেশ রাগতভাবেই—

-- স্নাগাসি ওকে ছেড়ে দাও। বলেছি তো পরে সব হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমায় ছেড়ে দিল।

তুমি চোখদুটো জ্বাফুলেব মতো লাল করেছ। কেবল ঐ মেয়েটার দিকে নজব। আমরা একটা কাজ করতে এসেছি এটা ভুলে যেওনা।

ম্যাগাসির মুখটা ভাবলেশহীন হলেও বাধাতার ছাপ সেখানে রয়েছে।

গুরু তুমি তোমার হৃদয় দিয়ে একটু অনুভব কর। এই ডবকা মালের এক খামচা আমার এখনই চাই যে।

সে চেয়ার টেনে বসল আর আমি সঙ্গে সঙ্গে সরে গেলাম।

পেছনের দরজার কাছে রেডিও-টেলিভিশনটা একটু উঁচু বেদির ওপর রয়েছে। তার কাছে গিয়ে তাব আওয়াজটা সবচেয়ে জোরে করে দিলাম। ওরা নীচু স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, কঁটা চামচেব আওয়াজ হচ্ছে। দরজার হাতলটা কতটা দূরে মনে মনে ঠিক করে নিলাম। এই সুযোগ! আর না—! বাঁদিকে ঝাঁপ দিলাম।

॥ নয় ॥

একটা বুলেট দরজার ফ্রেম ভেদ করে গেল। আমি বরফ তোলার চিমটেটা সাবধানে রাখলাম যাতে গায়ে না বিঁধে যায়। ভগবানের অশেষ দয়া বৃষ্টি থেমে গেছে, ভিজে ঘাসের ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছি। পা পিছলে যাচ্ছে। আরও জোর ছুটতে হবে। পেছনে দরজাটা জোরে খুলল। ম্যাগাসি চৈচাচ্ছে — ‘শীঘ্র থামো। নইলে তোমার দেহ মাটিতে লুটোবে।’ কোনো কথা না শুনে ছুটিছি। আমার নিশানা ঐ কেবিনের কোনার অন্ধকারে চলে যেতে পারব আত্মগোপন করার জন্য। দেখলাম আমার পাশ দিয়ে বুলেটগুলো মাটিতে পড়ছে। আমি এঁকেবঁকে ছুটিছি। একটা শার্সির কাঁচ ভাঙার আওয়াজ পেলাম। শেষপর্যন্ত সেই অন্ধকার কোনায় গিয়ে পৌঁছলাম। ছুটে যেতে যেতে একটা মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ পেলাম। ওটা কী?

এইভাবে এগোনো খুবই শক্ত ব্যাপার। পাইনের গাছগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন পরস্পরে পরস্পরকে জড়িয়ে রয়েছে। দু’হাত দিয়ে মুখটাকে বাঁচাতে গিয়ে হাত দুটো ছুড়ে গেছে। আমার জামাপ্যান্ট ছিঁড়তে শুরু করেছে। দুর্ভেদ্য অন্ধকার, দু হাত দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ দেখা গেল গাড়ির হেডলাইট জ্বলে উঠে আমায় অনুসরণ করছে। এবার নিশ্চয়ই ধরা পড়ব। গাছের ফাঁক দিয়ে দৌড়াচ্ছি। মাত্র ষাট হাত দূর হবে বোধহয়। এবার নিশ্চয়ই পিস্তলের গুলি আমায় ঝাঁঝরা করে দেবে। কিন্তু কই গুলির তো আওয়াজ পাচ্ছি না। যেতে যেতে হেঁচট খেলাম। একটা গাছের ঝোপ পেলাম। তার তলায় হাঁটু মুড়ে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়লাম। মুখ হাঁ কবে জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছি।

ওদের একজনের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার সন্ধানে এগিয়ে আসছে। মাটিতে কান পেতে শুনছিল। সন্ধানকারী আমার কোনো আওয়াজ না পেয়ে বুঝতে পেরেছে আমি মাটিতে রয়েছি। ওদের যদি বনের মধ্যে চলার অভ্যেস থাকে তবে মাটিতে, গাছপালার ঘসটানো দেখে আমার অবস্থান বুঝতে পারবে। তারপরে.. আর ভাবতে পারছি না। আমিও চুপিচুপি ঝোপের পর ঝোপ পেরিয়ে ওদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে লাগলাম। তারপর দেখলাম আমার মাথার ওপর আলোর বৃষ্টি।

পায়ের শব্দ ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল। এমনকি তাদের নিশ্বাসের আওয়াজও কানে এল। ম্যাগাসি আমায় খুব আস্তে আস্তে বলল — ঝুকুসোনা। এবার বাইরে বেরিয়ে এস। আর খেলা খেলতে হবে না। বাড়ি চল। না হলে তোমার বাপজান হয়তো চড়াপড়া দিতে পারে।

গাড়ির আলো আমার চারপাশের গাছের ওপর পড়তে পড়তে আমার গাছের ওপর পড়ল। তারপর বেশ খুশি মনেই বললে — এই তো খুকুসোনা, তোমার বাবা দেখে ফেলেছে।

আমি তো দম বন্ধ করে শুয়ে আছি, ওরা দেখেছে কি?

এমন সময় একটা গুলি আমার মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে সামনের গাছের গায়ে লাগল। ও বললে — এটা তোমায় ওঠার জন্য। না উঠলে পরেরটা তোমার মাথার খুলি ওড়াবে।

এবার নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে — তাই ভয়ে ভয়ে বললাম — ঠিক আছে বাইরে আসছি, গুলি ছুড় না। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। নিজের প্রাণদণ্ডের জন্য সামনে এগিয়ে গেলাম।

হাতে পিস্তল নিয়ে লোকটা সামনে দাঁড়িয়ে। হাতের পিস্তল দিয়ে ইঙ্গিত করল ওর সামনে যেতে — আর যদি অন্য কোনো মতলব করলে আমার পিঠের নরম মাংস ভেদ করবে ঐ গুলি। সামনে দেখলাম গাড়ির হেড লাইট জ্বলছে। মনের মধ্যে দুঃখের পাহাড় জমে উঠল। আমি কী এমন অপরাধ রুইয়েছি যে, ভগবান আমাকে ঐ দুই বদমায়েসের হাতে তুলে দিলেন। ওরা আমায় মারতে মারতে শেষে মেরেই ফেলবে। পুলিশের কাছে আমায় লুকোবার জন্যে হয়তো মাটিতে পুঁতে ফেলবে নয়তো গলায় পাথর বেঁধে হুদে ফেলে দেবে।

গাছের ধার ঘেঁসে বেরিয়ে এলাম। দেখি রোগা লোকটা গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে— স্ল্যাগাসি, ওকে ঘরে নিয়ে যা। এবার আমি ওকে পাহারা দেব। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। স্ল্যাগাসি আমার পাশে এসে তার কামনাসিক্ত হাত দিয়ে আমার শরীর চটকাতে লাগল। শুধু বললাম — এই না-না। ওদের বাধা দেবার ইচ্ছেটা যেন চলে গেছে।

সে সাঙ্ঘনা দেবার সুরে বললে — দেখ হরর খুব বাজে মেজাজের লোক। তুমি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর, ভালো করে কথা বলো। ওকে আমি ঠিক বুঝিয়ে নরম করব। আজকের রাতটার জন্যে আমার কাছে রাজি কি না বল। নইলে ও তোমায় বেধড়ক মারবে।

আমি মনে সাহস সঞ্চয় করে বললাম — তুমি যদি আবার আমার গায়ে হাত দাও, তবে তার আগে আমার মরণ ভালো।

— ‘ও, তাহলে রাজি নও। ঠিক আছে। আমাকেই আমার জিনিস আদায় করে নিতে হবে। আজকের রাতটা খুব একটা ভালো যাবে বলে মনে হয় না। বলে এত জোরে একটা চিম্টি কাটল যে, ব্যথায় আমি চিৎকার করে উঠলাম।

হাসতে হাসতে বলল — যাঃ, এই তো গলার স্বর বেরিয়েছে। গানের গলা তোমার বেশ ভালো তো।

পেছনের খোলা দরজা দিয়ে সে আমায় ঠেলা মেরে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজায় লক করে দিল। ঘরের অবস্থা যেমন ছিল তেমনই আছে। আলো জ্বলছে, রেডিওতে বেশ মজাদার বাজনা বাজছে। ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস বকমকে পালিশ করা। এই ঘরেই আমি কয়েক ঘণ্টা আগে রানির মতো ছিলাম। আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে নিজের অতীত জীবনের সুখ-দুঃখের স্মৃতি মনে করে কত আনন্দ-দুঃখ অনুভব করছিলাম। সেগুলো যেন সত্যিই ছেলেমানুষী ছিল। উইন্ডসর— সেই সিনেমা হাউস—। এটা কী নাটক না কোনো প্রহসনের গল্প! সেখানে কী স্বর্গ-কী সুখ। জুরিখে? পৃথিবীর আদিম অরণ্যে দুই মানব-মানবী। সেখান থেকে দুটো দানব আমার জীবনে এসে হাজির হল। নিজের হিসেবে যদি কোনোরকম ভুল হয়, তাস খেলতে বসে যদি ভুল চাল দেওয়া হয়, তবে আর নিজেকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কোনো বুদ্ধি বা অস্ত্র নেই যে তোমায় সাহায্য করবে। এমন কোনো মস্ত্র নেই যা তোমায় ঠিক পথ দেখাবে।

হবর খুব ঢিলেঢালা ভাবে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমায় আঙুল তুলে তাব কাছে যেতে বলল। আমাব ক্ষত-বিক্ষত পা নিয়ে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ আমার হারিয়ে-যাওয়া চেতনা ফিরে এল। বুঝতে পারলাম আমার কোমরে বরফ তোলার চিমটেটা গৌজা বয়েছে। কিন্তু সেটা তো তোলা সম্ভব হচ্ছে না। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ওর ডান হাতটা সাপের মতন উঠে আমার ডান বাম গালে পটাপট চড় কষাতে লাগল। আমার চোখে জল এসে গেল। আবার মারের হাত থেকে বাঁচবাব ভান করে মাথাটা নীচু করেই কোমর থেকে চিমটেটা টেনে বার করে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ওর মাথায় প্রচণ্ডভাবে মারতে লাগলাম। ও-ও পাশ কাটাতে লাগল। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে আমার হাত দুটো পিছমোড়া করে ধরে ফেলল।

লোকটার গালে একটা বড়ো ক্ষত থেকে বক্ত বেরিয়ে ঠোঁটের পাশ দিয়ে দাড়ি হয়ে নেমে আসছিল। ওব কালো চোখে একটা রক্তের বিন্দুর মতো দেখলাম। ওর মুখে কিন্তু যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই, আছে কেবল প্রতিহিংসা। রোগা লোকটা ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে চিমটেটা ফেলে দিল। আর আমার করার কিছু নেই। অতএব আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই করলাম।

তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। যেন সোহাগ করছে এমন ভাবে আমার শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় সে হাত বোলাতে লাগল আবার পরক্ষণেই ঘৃষি ছুঁড়ে দিতে লাগল। আমিও লাথি মেরে তার প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করলাম। তারপর চিৎকার করে কেঁদে ফেললাম। সে তার ভয়াল নিশ্চুপ চোখ দিয়ে আমায় কেবল দেখে যাচ্ছে আর তার হাত চালিয়ে যাচ্ছে।

আমার ঘরের স্নানের টবে আমি শোয়া। ঘরেব মেঝেতে শুয়ে আছি। শরীরে সুতোর লেশ-মাত্র নেই। আমার ছেঁড়া পোশাকগুলো আমারই পাশে পড়ে রয়েছে। স্ন্যাগাসি দেওয়ালে হেলান দিয়ে একটা খড়কে কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে আমার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। সে ঠান্ডা কলের জলের ট্যাপটা বন্ধ করে দিল। কোনোরকমে উঠে দাঁড়লাম। আমার বমি পাচ্ছে। আমি একটা পোষা কুস্তির মতো হয়ে গেছি। বমি করে ফেললাম।

মনের সুখে স্ন্যাগাসি হেসে চলেছে। এগিয়ে এসে আমার পেছনে চড় মারতে মারতে বললে— এ রকম হয় গো খুকুসোনা। প্যাঁদানি খাওয়ার পর এরকম হয়। এবার তুমি একটু পরিষ্কার হয়ে একটা ভালো পোশাক পরে বাইরে এসো। আর বেশি চালাকি করতে যেও না। তোমার জন্য ডিমভাজাটা দরকচা মেরে গেছে। আমি পেছনের দরজার দিকে নজর রাখব। নতুন জামা-টামা পরে নাও। অবশ্য তোমার আর পরবার ক্ষমতাও নেই। মেয়েদের ওপর হররের একটু মায়া থাকে, তাই আর তোমার শরীরে রক্তগঙ্গা বয়নি। সামান্য একটু আঁচড় কাটা। তুমি খুব ভাগ্যবতী। ও আবার হিপি। একবার রেগে গেলে আর রক্ষা ছিল না। হয়তো তোমাব শোবার স্থান হত কবরে। ঠিক আছে, আবার দেখা হবে।

ঘরের দরজা বন্ধ হল। এবার শরীরের শক্তি ফিরে পাওয়া।

নিজেকে গুছিয়ে নিতে আমার প্রায় আধঘণ্টা সময় লাগল। আমার কেবলই মনে হচ্ছে বিছানার ওপর শুয়ে পরে প্রাণভরে কাঁদি। ওরা এসে আমার ওপর মাত্র একটা গুলি খরচ করে আমায় মুক্তি দিক। কিন্তু পরমুহূর্তেই বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছে আমায় জাগিয়ে তুলল। আমি আমার অভ্যাসমতো চুল আঁচড়লাম। আমার ব্যথা বেদনায় ভরা শরীরটা ঠিক করতে লাগলাম বটে কিন্তু ভেতরটা যন্ত্রণায় ভরে রয়েছে। মনে হল হয়তো সবচেয়ে খারাপ সময়টা আমি উত্তরে গেছি। ওরা আমায় বাঁচিয়ে রাখতে চায় নইলে স্ন্যাগাসি তো আমায় খুব কাছ থেকে গুলি করেছে। কিন্তু মারেনি। ভয় দেখিয়েছে।

আমার প্রিয় সাদা পোশাকটা পরে নিলাম। পকেটে কিছু টাকাপয়সা নিয়ে নিলাম। যদি প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন! পালানো! সে বোধহয় আর সম্ভব নয়। বেড়ালছানার মতো অপটু চেহারা নিয়ে কোনো রকমে বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম।

বৃষ্টি থেমে রয়েছে, রাত এগারোটা বাজে। আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ মেঘের সমুদ্রে সাঁতাঁব কেটে বেড়াচ্ছে। বনের মধ্যেও চাঁদের পর্দা ছড়ানো। দরজার মাঝখানে স্ল্যাগাসি স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটিছে। আমি যেতেই পথ ছেড়ে দাঁড়াল।

— আরে। একেবারে নতুন রং-করা সোনামণি যে। একটু-আধটু ছুড়ে গেছে কোথাও কোথাও, তাই না।

আমার কোনো জবাব দিতে প্রবৃত্তি হল না। চুপ করে রইলাম। সে আমার হাত ধরল।

- ছিঃ ছিঃ সামান্য ভদ্রতাও জানো না। তোমাব দেখছি একটু উলটো পিঠেও কিছু ওয়ুধ দেওয়া দরকার হয়েছে। ভাবনাব কিছু নেই। তার ব্যবস্থাও হবে।

সে তার হাতটা ছুড়ে একটা ভয়ংকর ভঙ্গি করল।

— আমি দুঃখিত।

— ও. কে।

আমায় ছেড়ে দিল।

- তুমি এবার রান্নার জোগাড়ে যাও। আর হ্যাঁ, ওখান থেকে আমাদের ওপর কিছু ছোঁড়ার চেষ্টা করো না যেন। দেখো দিকিনি, আমাব বন্ধুর অমন সুন্দর মুখটার তুমি কী অবস্থা কবেছ।

রোগা লোকটা তার আগের জায়গাতেই বসে রয়েছে। তার সামনে রেড ক্রসের বাস্ক খোলা। ওরা হাতে স্টিকিব প্লাস্টার লাগানো বয়েছে। একবার ভয়ে ভয়ে ওর দিকে তাকিলা কাউন্টারবেব ওপাশে চলে গেলাম। আব ওরা নিজেদের মধ্যে বসে বসে নীচু স্বরে গুজ গুজ করে কথা বলছিল, আর আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল।

হঠাৎ অনুভব করলাম আমাব খিদে পেয়েছে, বোধ হয় ডিম ভাজার গন্ধে। এই লোকদুটো ঘরে ঢোকান পর থেকে ভয় আমায় এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে কফি খাওয়ার কথাও মনে থাকছিল না। আর একটা কারণ হতে পারে বমি করার পর পেটটা খালি হয়ে গেছে। আর আমার বলতে লজ্জা নেই যে ঐরকম মার খাওয়ার পর আমাব মনে অনেক ভার কমে গেছে। ওরা আমায় আবার মারবে - এই ভয় এবং ভাবনা আমার মানসিক যন্ত্রণাকে ঢেকে রেখেছে সত্যিকারের মার খাওয়ার যন্ত্রণা। আমার মনের স্নায়ুতন্ত্রকে ভারমুক্ত করেছে। এ একটা অপূর্ব শক্তি। তবু ভয় আমার সঙ্গ ছাড়ছে না। এইসময় আমার শরীর বললে — সে ক্ষুধার্ত। তার শক্তি চাই। সে বাঁচতে চায়।

সেই জন্যে ওদের খাবাবের সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্যেও ডিমভাজা, টোস্ট তৈরি করলাম। ওদের পবিবেশন করার পব কাউন্টারের পেছনে ওদের চোখের আড়ালে বসে খেয়ে নিলাম নিশ্চিন্তে। তারপর একটা সিগারেট ধরলাম। পরে বুঝলাম মস্ত ভুল হয়েছে। ওরা এখুনিই ভাববে যে ওদের মারার ধকলটা আমি সামলে নিতে পেরেছি। এর কিছু পরে ওদের কথা বলা থেমে গেল। ভিয়েনার অরণ্য কাহিনি চলছিল রেডিওতে খুব আন্তে আন্তে। আমার সিগারেটের টুকরোটা কফির কাপের তলানিতে নিভিয়ে দিলাম। পরে কল খুলে প্লেট, ডিসগুলো ধুতে লাগলাম। বুঝতে পারছি স্ল্যাগাসি এদিকে আসছে। সে কাউন্টারে হেলান দিয়ে খড়কে কাঠিটা মুখে নেড়েই যাচ্ছে। ওর দিকে আশ্চর্য হবার ভান করে তাকলাম। ঐ কাঠিটা মুখেব এপাশ ওপাশ করছে। পাতলা কাগজ ভর্তি একটা বাস্ক টেবিলে রাখল। ঐ বাস্ক থেকে কয়েকটা টিসু পেপার নিয়ে নাক ঝেড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বেশ ভালোভাবে বলল — ‘খুকুসোনা, তুমিই আমার ঠান্ডা লাগিয়ে দিয়েছ।

আমার তো ঐ ঝামেলা – ঐ অসুখটা আলোপেসিয়া – শরীরের সব জায়গা থেকে লোম খসে যায়। কোথাও নেই। এমনকি নাকের ভেতরও না। এতে হয় কি ঠান্ডা লাগলেই হাঁচি। এক বাঞ্ছ কী হবে? হঠাৎ পাতাহীন চোখ দুটো রেগে উঠল – বলল, তোমরা মেয়েরা কেবল নিজেদের কথাই ভাব। অন্যের কথা একদম ভাব না। তোমরা কেবল লক্ষা পায়রার সঙ্গে ঘুবে ঘুবে নেড়াবে।

রেডিও চলছে, তাব মধোই বেশ মোলায়েম স্ববে বললাম -- ‘তোমার এই অসুখের জন্য আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।’ বলে আর একটা কথা ছুড়ে দিলাম। আর আমার এই অবস্থার জন্য তুমিও দুঃখিত হচ্ছ না কেন? আমি তোমাদের কী করেছি যে তোমরা দুজনে আমার পেছনে লেগেছো! যদি তোমরা আমায় ছেড়ে দাও তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি কাউকে এ বিষয়ে কিছুই বলব না। আর আমাব যা পূজি আছে তা থেকে তোমাদের দুশো ডলার দিতে পারি। এর বেশি নয়। বাকিটা দিয়ে আমি কোনো বকমে চালিয়ে নেব। তোমাদের কাছ থেকে এটুকু করণাও কি আমি আশা করতে পারি না?

স্ল্যাগাসি খুব খানিকটা হেসে নিয়ে রোগা লোকটাকে বলল — হরর চোখের জল মোছার জন্য তোয়ালেটা দাও। ও শুধু শুনে কাঁধ নাচাল। কোনো মন্তব্য করল না। স্ল্যাগাসি এবার আমার দিকে তাকাল — সে দৃষ্টি কঠিন, কঠোর, নির্মম।

একটু বোঝার চেষ্টা করো খুকুমণি। তুমিও আমাদের সঙ্গে এই খেলায় মেতে ওঠ। তোমায় একটু সুড়সুড়ি দেওয়া উচিত যাতে তুমি, আমার আব হররের মতো কড়া এবং মিস্টার সান্‌গুইনেস্তির মতো অনেক বেশি কড়া লোকের সঙ্গে তোমার কাজ করতে সুবিধে হবে।

‘কাজ? কী কাজের জন্য দরকার আমাকে?’

সেটা কাল সকালেই বুঝতে পাববে। স্ল্যাগাসি বললে। এবার তোমার কচবকচর বন্ধ করো তো, কান ঝালাপালা হয়ে গেল। আচ্ছা তুমি কি শুনতে পাচ্ছ। রেডিওতে কী সুন্দর বাজনা বাজছে। এসো না আমরা তালে তালে নাচি। বলে সে দুহাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল।

— ‘মাফ করো। আমাব খুব ক্লান্ত বোধ হচ্ছে।

স্ল্যাগাসি রেগে মেগে কাউন্টাবে চলে গেল। বললে —

— ঐ ধুমসি গতর থেকে আমায় একটু দিলে কিছু কমে যাবে না। মনে হচ্ছে এবাব তোমায় এমন ওষুধ দেব যাতে তুমি সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়। এমন সময় তার হাতে একটা আংটাওয়াল চামড়ার চাবুক টেবিলের ওপর পড়ল। টেবিলে একটা দাগ পড়ল। কাউন্টারের শেষ পর্যন্ত সে আমার চোখে চোখ রেখে এগিয়ে আসতে লাগল। আমিও পেছিয়ে যাচ্ছি! শেষ চেষ্টা করতে হবে। আমায় মার দেওয়ার আগেই আমায় আঘাত হানতে হবে। হাতড়ে কাঁটা চামচের দেরাজটা খুঁজে পেতেই তা থেকে নিয়ে ছুড়ে মারতে লাগলাম; মাথা নীচু করে নিজেকে বাঁচাতে লাগল। আব আমি প্রাণপণে ছুড়ে যাচ্ছি। শেষে আমায় গাল দিতে দিতে পেছিয়ে গেল। তাবপর আমি একটা বাঁকানো ছুরি নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ও ত্বরিত-এ টেবিলের তলায় ঢুকে গেল। কারণ আমায় আগেই ও লক্ষ করেছিল। হরর মুখে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ না করে তার কোটটা খুলে বগলদাবা করে নিল। তারপর দুজন দুটো চেয়ার উলটো করে নিয়ে ষাঁড়ের সিং-এর মতো দু’দিক দিয়ে আমায় চেপে ধরল। আমি তাদের থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা কবলাম। ছুবিটা পড়ে গেল হাত থেকে। আমি কাউন্টারের দেওয়ালের পেছনে চলে গেলাম।

স্ল্যাগাসি চেয়ার নিয়ে এগোচ্ছে আর আমার হাতে মাত্র দুটো রেকাবি। দুজনে মুখোমুখি। রোগা লোকটা হঠাৎ লাফিয়ে এসে আমার চুলের গোছা ধরে টেবিলে নামিয়ে আনল। আমি রেকাবি দুটো ছুড়লাম, কিন্তু কোনো কাজ দিল না। স্ল্যাগাসি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এবার হরর বলল -- বহৎ খুব দোস্ত। আভি হাম দেখেঙ্গে।

এবপর আমায় তাব শক্ত হাত দুটো দিয়ে পিষতে লাগল। ওর বীভৎস মুখটা আমার মুখেব ওপর এনে পশুর মতো চুমুর পর চুমু খেতে লাগল। এই ফাঁকে সে তার হাত দিয়ে আমার পেছনে ঘাড়ের কাছে জামাব চেনটা আছে সেটা পেয়ে গিয়ে আমার কোমর পর্যন্ত নামিয়ে দিল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার কলিং বেল বেজে উঠল। সেই শব্দটা সবাইকে নিখর কবে দিল।

॥ দশ ॥

— ও ক্রাইস্ট! কে ও?

চামড়ার কোটে হাত ঢুকিয়ে স্ল্যাগাসি পিছিয়ে গিয়ে ঞ্ছস্তে নিজের মনে বললে। হরব নিজেকে সামলে নিয়েছে। তাব মুখ কঠিন হয়ে উঠল। স্ল্যাগাসি দরজাব পিছনে গিয়ে দাঁড়াও। আর আমাব আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত শিকল দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। আর এই যে তুমি—

যেন একদলা থুতু ফেলল — এমন ভাবে আমায় বললে —

এবার তুমি নিজেকে একটু গুছিয়ে নাও। আমাদের হয়ে তুমি কথা বলবে। আমাদের সময় যা-যা কথা বলেছিলে ঠিক সেইভাবে কথা বলবে। অন্যরকম কিছু হলে তোমায় গুলি করে মেরে ফেলব। তোমার চেনটা টেনে নাও। তোমার মুখের বোকা-বোকা ভাবটা এবার সবিয়ে ফেল।

সমস্ত জিনিসটা বুঝে নিতে চেষ্টা করলাম।

হাতের জিনিসপত্র বুকব কাছে নিয়েই এগোও। আমি তোমার পেছনেই আছি। উলটো পালটা কিছু হলেই একটা গুলি তোমার পিঠের এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। আর ঐ লোকটাও মরবে। যাও, এবার এগোও।

আমার বুক খুব খড়ফড় করছিল। যা হয় হোক। নিজেকে বাঁচাতে হবেই।

এবাব জোরে ধাক্কা পড়ল দবজায়। আমার জামার দুটো মুখ এক করে এগিয়ে গেলাম। কী করতে হবে ভেবে নিয়েছি।

স্ল্যাগাসি ধার থেকে ঝুঁকে দবজাব লকটা খুলে দিল। এবার আমার হাতের ক্ষিপ্ততার ওপব সব কিছু নির্ভর করবে।

দরজার হাতলটা ঘুরিয়েছি। ডান হাত দিয়ে আমার জামা ছেড়ে শেকলটা খুলে দিলাম। দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। পেছন থেকে কেউ গালাগাল দিল। পিঠে পিস্তলের নল ঠেকানো রয়েছে বুঝতে পারছি। এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। বাইরের আগন্তুক যদি পুলিশের লোক অথবা টহলদারী পাহারাদার হয় তবে এরা গুলি করবে না। আর যদি কোনো পথচারী হয় তো তার ওপরই সব নির্ভর করছে। দরজার বাইরে সে দাঁড়িয়েছিল।

হে ভগবান, এ কাকে দেখছি। এ যে ওদেব দলেরই কোনো লোক হবে। সিনেমায় গুণ্ডা বদমাশরা যেমন পোশাক পরে এরও পরনে সেই রকম পোশাক। কোমরে নীল কোমরবন্ধ, আঁটা বর্ষাতি, মাথার টুপিটা এমনভাবে নামানো যে মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এই আগন্তুক খুব ধৈর্য নিয়ে শাস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর দেখতেও সুদর্শন। ওর বাঁ চোয়ালে একটা কাটা দাগ দেখা গেল। আমি আমার লজ্জা ঢাকবার জন্য তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে শরীর ঢাকলাম।

আমার মনে হল আমি বেঁচে গেছি। তিনি হাসলেন। আর যখন কথা বললেন বুঝলাম তিনি ইংরেজ।

— আমি খুবই দুঃখিত। আমার গাড়ির টায়ার ফেটে গেছে (আমেরিকান হলে ফেঁসে গেছে বলতো)। ঘব খালি বিজ্ঞাপন দেখে এসে গেলাম। আজ রাতে কি একটা ঘর খালি পাওয়া যাবে?

এই কথাগুলো বলে আমায় ভালোভাবে লক্ষ করতে লাগলেন আর মনে হল হয়তো বুঝতে পেরেছে, কিছু গণ্ডগোল হয়েছে।

আমি আমার বুকের কাছে হাত তুলে তাকে ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করলাম। তিনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন মনে হল না। আর একটু বোঝাতে হবে।

— আচ্ছা আপনার টায়ারের কী এক বকম অবস্থা আছে যে লেক জর্জ পর্যন্ত যেতে পারেন। এই মোটেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

— তাহলে তো কোনো ভাবনাই ছিল না। শেষ এক মাইল টায়ারের রিমের ওপর ভরসা করে এসেছি। এবার এটাও যাবে।

আমি কায়দা করে মাথা নাড়িয়ে ভেতরে আসতে বললাম।

— বিমা কোম্পানির লোকেরা মালিকের তরফের, তারা ভেতরে আছে। তাদের জিজ্ঞেস করতে হবে।’ বলে সরে গিয়ে তাকে ভেতরে ঢোকানোর সুবিধে করে দিলাম। এমনভাবে আমি দাঁড়লাম যে যাতে ওরা হঠাৎ করে দরজা বন্ধ করে দিতে না পারে। ওরা দুজনে পকেটে হাত রেখে পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর আমার দিকে খুব রাগান্বিতভাবে চেয়েছিল। মনে হয় বর্ষাতি পরা আগস্তক আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছেন। তাই তিনি অনেকটা ভেতরে চলে এসে ওদের লক্ষ করে বললেন —

— আপনারা নিশ্চয়ই সব শুনেছেন — আজ আমায় এখানে রাত কাটাতে হবে। আশা করি আপনাদের আপত্তি নেই।

রোগা লোকটা কোনোরকম না ঢেকেই বললে —

— এটা কি রাষ্ট্রসংঘ? আশ্রয়? ওঃ ক্রাইস্ট। আমরা দুঃখিত জায়গা হবে না। ঐ মহিলাটি তো বলেই দিয়েছেন যে মোটেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বরং আপনার টায়ার পালটাবার জন্য আমরা সাহায্য করছি।

ইংরেজ আগস্তক খুব সহজভাবেই বললেন — দেখুন, পথে যাওয়ার পক্ষে অনেকটা রাত হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া আমি দক্ষিণমুখে যাব। গ্রেন ফলসের এধারে আর কোনো থাকার জায়গা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তার চেয়ে এখানে থেকে যাওয়াটাই শ্রেয়। আর তার ওপর ‘ঘর খালি’ — আলো এখনও জ্বলছে।

— আশা করি, আমাদের কথা শুনেছেন তো। হরর বেশ কর্কশ কণ্ঠেই কথাগুলো বলে স্ল্যাগাসিকে বললে —

— চলো ফাঁসা টায়ারটা পালটে দিই।’

দরজার দিকে ওবা এগোলেও ইংরেজ ভদ্রলোক সেখান থেকে একটুও নড়ল না, ভগবান তাঁকে আশীর্বাদ করুন। তাঁর বক্তব্য হল—

— শুনুন আলবেনিতে আমার কয়েকজন প্রতাপশালী লোক আছে, তাদের বলে এই মোটেলের লাইসেন্স বাতিল করতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হবে না। এখানে বিজ্ঞাপনে ‘ঘর খালি’ রয়েছে। আর আমি একটা ঘর দাবি করছি।

তারপর আমায় বললেন—

— আপনার কি খুব অসুবিধে হবে?

— না, না। কিছুমাত্র নয়। আমি এক মিনিটের মধ্যেই আপনার জন্যে একটা ঘর ঠিক করে দিচ্ছি। আর মিস্টার সানগুইনেস্তি নিশ্চয়ই চাইবেন না এই সামান্য কারণে এই মোটেলের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়।

আমি বোকাব মতো মুখ কবে গুন্ডাদুটোব দিকে তাকালাম। রোগা লোকটা পাশে সরে গেল। ম্যাগাসিও ওর কাছে আলোচনার জন্য গেল। ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে হব। তাই আমি খুব মিনতি করে ওঁকে ইশারা করলাম। উনি বুঝলেন মনে হয়। তাই আমায় অভয় দিলেন তাঁর সেই সুন্দর হাসি দিয়ে।

রোগা লোকটা ঘুরে বললে — ঠিক আছে আপনাকে একটা ঘর দেওয়া যেতে পারে। তবে ঐ আলবেনির গল্প আমাদের বলে খুব একটা সুবিধে হবে না। কারণ মিস্টার সানগুইনেস্তিরও বন্ধু-বান্ধবের অভাব নেই রাজনীতিতে। তবে ঐ আলোর ঘব খালি আপনার পক্ষে আছে জানি।

— ধন্যবাদ, এটাই যথেষ্ট। আমি ব্যাগটা নিয়ে আসছি।

তিনি বেরোবার জন্য পা বাড়াতেই আমি বলি—

— না, না, আমিই নিয়ে আসছি। বলে চেনটা ঠিক করতে করতে বেরিয়ে এলাম।

তিনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। আমি জানি ওরা দরজার কাছে আমাদের ওপর নজর রাখছে। তাই আমি ঠোঁটের কোণ দিয়ে কায়দা করে ওঁকে বললাম—

— ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আপনাকে ধন্যবাদ। ওরা গুন্ডা। আমায় খুন করতে চায়। আমি পালাবার চেষ্টা করায় ওরা গুলি পর্যন্ত করেছে। আসলে ওরা কী চায় জানি না।

আমি গাড়িটার কাছে এলাম। গাঢ় ছাই রং-এর দুজনের বসার মতো থান্ডারবার্ড গাড়ি। ওপরের অংশটা ঘিয়ে রং-এর। আমি তাই বললাম। উনি বললেন — গাড়িটা ভাড়া করা। গাড়িটাব ওপাশে চলুন। গাড়ির প্রশংসা করে যান। তিনি নীচু হয়ে গাড়ির ভেতর ঢুকে বসে প্রশ্ন করলেন—

— ওরা দুজনেই কি সশস্ত্র?

— বলতে পারব না। তবে বেঁটেটা গুলি চালাতে খুব ওস্তাদ। বিশ ফুট পর্যন্ত নিশানা অব্যর্থ।

তিনি একটা কালো সুটকেস মাটিতে রেখে কী একটা বার করে ভেতর পকেটে বাখলেন আর একটা কালো পাতা মতন পকেটে বাখলেন। মনে হল গুলির প্যাকেট। সুটকেসটা বন্ধ করলেন।

— বেশি গুলি থাকা ভালো। বলে ওরা যাতে বুঝতে পারে সেই মতো জোরে গাড়ির দরজা বন্ধ করলেন। তারপর আমরা দুজনে গাড়ির পেছনে টায়ারটা পরীক্ষা করতে গেলাম। তিনি বললেন —

— টেলিফোন আছে?

— ছিল, কেটে দিয়ে গেছে।

— আপনার পাশের ঘরটাই আমায় দেবেন।

— একশো বার।

- এবাব যাওয়া যাক। সব সময় চেষ্টা কববেন আমার কাছাকাছি থাকতে। ওবা যা-ই বলুক বা করুক।

— খুব ধন্যবাদ।

তারপর হেসে বললেন —

— উপায় নেই। আমাদের ধৈর্য ধরতেই হবে। এখান থেকে নিষ্কৃতি না পাওয়া পর্যন্ত।

আমরা একসঙ্গে হেঁটে ফিরে এলাম। ম্যাগাসি দরজায় দাঁড়িয়ে। আমরা ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ করে লক কবে দিল। তারপর 'ঘব খালি' লেখা নিওনের সুইচটা নিভিয়ে দিয়ে বলল—

— এই যে মশাই, আপনার চাবিটা।

টেবিলের ওপর ছুড়ে দিল।

চাবিটা তুলে দেখি বাঁদিকের শেষ ঘরটা চল্লিশ নম্বর। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম —

— না, ভদ্রলোক আমার পাশের ঘরে মানে দশ নম্বর ঘরে থাকবেন।

এদিকে স্ন্যাগাসি যে আর সব চাবির গোছা নিয়ে নিয়েছে জেনে আমি রিসেসপশন টেবিলের দিকে গেলাম।

স্ন্যাগাসি দাঁত বের করে হেসে বলল

— খুক সোনা, আর ঘর নেই। ওনার পবিচয় আমরা জানি না। তাই তোমার যাতে কোনো ক্ষতি না হয় তাই আমরা দুজনে তোমার ঘরের দুপাশের দুটো ঘরে থাকব। আর বাকি চাবিগুলো নিয়ে খাবার ব্যাগে রাখা হয়েছে।

— এই যে, আপনার নামটা জানতে পাবি কি?

— বন্ড, জেমস বন্ড।

— বড়ো খটমট নাম। ইংল্যান্ড থেকে নিশ্চয়ই আসা হচ্ছে?

— রাইট। রেজিস্ট্রি খাতায় আপনাদের সুবিধার জন্য আমার নামের বানানটা লিখে দিচ্ছি।

— বেশ বুদ্ধি ধরে লোকটা। তা কী করা হয়?

— পুলিশে চাকরি করি।

শুনে স্ন্যাগাসির মুখটা হাঁ হয়ে গেল। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে হরর-কে বলল—

— অ্যাঁই হরর, বুঝেছো, মশাই পুলিশের লোক। টিকটিকি।

— আমার ধারণায় এটা ঠিকই ছিল। তবে আমরা পরোয়া করি না, আমরা কি কিছু অন্যায় করেছি?

— ‘ঠিকই তো’ স্ন্যাগাসি, হররকে সমর্থন করল। পরে জেমস বন্ডের দিকে ফিরে বলল—

— ‘দেখুন, আমরা মিস্টার সানগুইনেত্তির হয়ে কাজ করছি। বিমা কোম্পানির লোক। মিস্টার সানগুইনেত্তি এই মোটেলের মালিক। তিনি ট্রয় শহরের খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি। ম্যানেজারদের কাছ থেকে মিস্টার সাইগুইনেত্তি খবর পেয়েছেন যে, এখানে কিছু টাকা চুরি গেছে। জিনিসপত্রের তছনছ হয়েছে। তাই তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন সেই সমস্ত জিনিস দেখভাল করার জন্য। আর এই ভবঘুরে মেয়েটার কথা একদম শুনবেন না। দেখুন না, বরফ তোলার চিমটে দিয়ে আমার বন্ধু মাথায় শুধু শুধু কী রকম মেরেছে। নিজের চোখেই দেখুন। আপনি আসার আগে অবধি আমবা শুধু ঠেকাচ্ছিলাম। তাই তো হরর!

হরর বললে — একেবারে একশো ভাগ সত্যি।

আমি রেগে বললাম — সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।

আমি পেছনের দরজার কাছে গিয়ে দরজায় বুলেটের গর্ত দেখালাম।

হররের দিকে ফিরে বললে — আচ্ছা হরর তুমি কি কোনো বুলেট উড়তে দেখেছ?

— কই না তো?

হরর বেশ বিরক্তির সঙ্গে খাবার কাউন্টারের দিকে এগিয়ে বললে — দেখুন, এই মহিলাকে প্রচুর জিনিসপত্র ছুড়তে দেখেছি আমার বন্ধুর দিকে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে -- ঠিক কথা বলছি তো মিস? আর সেই ফলাওয়াল ছুরিটা! কাল সকালে আমরা মামলা করব এই রকম ব্যবহারের জন্য।

আমি বেশ জোর দিয়েই বললাম -- আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যই এইসব জিনিস ছুড়েছি। আর টাকা চুরি যাওয়ার কথা আমি এই প্রথম শুনলাম।

ইংরেজ ভদ্রলোক বেশ শান্তভাবে বললেন—

-- তবে আমার আগমন ঠিক সময়েই হয়েছে। শান্তিরক্ষা করার জন্য। তা রেজিস্ট্রি খাতাটা কোথায়, আমি সই করব।

— রেজিস্ট্রি খাতা মালিকের কাছে চলে গেছে। আর মোটেল তো বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা আপনাদের খন্দের বলে ধরতে পারি না। আর পয়সাও আপনাকে দিতে হবে না।

— অশেষ ধন্যবাদ। এটা আপনাদের সহৃদয়তার পরিচয়। জেমস বন্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলল —

— কিছু ডিম, মাংস আর কফি যদি পাওয়া যায় তো আমি নিজেই রোধে নিতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে আমি কাউন্টারের ওপরে গিয়ে বললাম — তা কেন, আমার রান্না করে দিতে খুবই ভালো লাগে।

— অজস্র ধন্যবাদ।

তারপর একটা টুলে তাঁর অ্যাটাচিটা রেখে অন্য টুলে নিজে উঠে স্ন্যাগাসির দিকে পেছন ফিরে কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে বসলেন। আমি আড়চোখে দেখলাম স্ন্যাগাসি রোগা লোকটার কাছে সরে গিয়ে কীসব কথাবার্তা বলছে।

জেমস বন্ড তাঁর বর্ষাতি, মাথার টুপি খুলে অ্যাটাচির ওপর রেখে আবার কাউন্টারের ওপর উঠে বসে দেওয়ালে আয়না দিয়ে ওদের ওপর নজর রাখতে লাগলেন। আমি রান্নার ঠিক-ঠাক করার ফাঁকে একবার তাঁকে দেখে নিলাম।

প্রায় ছ'ফুট লম্বা মজবুত গঠনের দোহারা চেহারা। রোদে পোড়া লম্বা মুখে, তাঁর চোখ দুটি খুব সুন্দর, সবসময় কিছু পর্যবেক্ষণ করছে যেন। ওদের ওপর যখন নজর দিচ্ছিলেন তখন চোখটা সরু হয়ে এলে খুব বীভৎস মনে হচ্ছিল, যা দেখে প্রথমে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন তাঁর হাসিটা খুবই সুন্দর লাগছে আমার কাছে। এর আগে কোনো পুরুষের এমন হাসি আমায় উত্তেজিত করেনি। গায়ে নরম রেশমের সার্ট। সরু লেসের টাই। হিপ পকেট থেকৈ তামার একটা সিগারেট কেস বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন

— একটা সিগারেট হবে নাকি? সিনিয়র সার্ভিস ব্রান্ড। পরে চেস্টারফিল্ডস হবে।

— এখন না। রান্নাটা আগে সেরে নিই। ধন্যবাদ!

— আপনার নামটা তো এখনও জানা হল না। নিশ্চয়ই আপনি কানাডার মেয়ে!

— ঠিক ধরেছেন। কুইবেক থেকে আসছি। তবে গত পাঁচ বছর ইংল্যান্ডে ছিলাম। আমার নাম ভিভিয়েন মিশেল। বন্ধুরা আমায় ভিভি বলে ডাকে।

— এবার শুনি কী করে আপনি এদের মধ্যে এসে পড়লেন। আমার জীবনে এমন দুর্বল গুন্ডা দেখিনি। ট্রয় শহরটা গুণ্ডার জায়গা। রোগা লোকটা মনে হয় খুব শীঘ্রই জেল ফেরত। আর ওটা একটা মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি। এটা কী করে হল?

রান্না করতে করতে তাঁকে স্তম্ভে কিছু বাদ দিয়ে সবই বললাম। খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন তিনি। রেডিওতে গান চলছে। আর ঐ দুটো আমাদের লক্ষ করছে। তাই গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম — আপনি কি সত্যিই পুলিশের লোক?

— ঠিক পুলিশ নয়। তবে আমায় কাজ করতে হয় ওদের সঙ্গেই।

— অর্থাৎ আপনি একজন গোয়েন্দা।

— আপনার অনুমান ঠিক।

— আমিও তাই ভেবেছিলাম।

— কীভাবে? তিনি হাসলেন।

— তা ঠিক বলতে পারব না। প্রথমে আপনাকে দেখলেই একটা সাংঘাতিক কিছু মনে হয়। আর যেটা জামার মধ্যে রাখলেন সেটা পিস্তল, আর কার্তুজ। আপনি —

আমার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি রয়েছে। জানা দরকার — একজন অফিসার? মানে সবকারি —

আবার তাঁর সম্মতিসূচক হাসি দেখলাম।

— ওসব ভাববার কিছু নেই। ওয়াশিংটনের কর্তাব্যক্তিবাদী আমার পরিচিত। আজকের এই ঝামেলা যদি ঠিকমতো কেটে যায়, তবে আমি দেখব ঐ দুটো বদমাশ যাতে ঠিকমতো শাস্তি পায়, আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তার জন্যে।

— আপনার বিশ্বাস হয়?

— কেন নয়! আর আমি ভাবছি যে, এদের এখানে আসার কারণটা কী? ওরা ভেবেছে, আপনার ওপর যা খুশি তাই করে যাবে? আর আমি আসায় খুব ভালো ব্যবহার করেছে। মদ বা সিগারেট খায়?

— দুজনেব কেউই নয়।

— এটা ভালো লক্ষণ নয়।

রান্না শেষ। রাতের খাবার টেবিলে সাজানো হল। তাঁর খাওয়া দেখে মনে হয় খুবই ক্ষুধার্ত। কী রকম হয়েছে জিজ্ঞেস করায় তাঁর খুব ভালো লেগেছে বলায় আমার যে কী ভালো লেগেছে বলতে পারব না। আর ভগবানের আশীর্বাদে এই ভদ্রলোক ঠিক সময়েই যেন ভোজবাজির মতো অবতীর্ণ হয়েছেন আমায় বাঁচাবার জন্য। এর জন্য আমি আজ বছবছর পরে রাত্রে প্রার্থনা করব বলে মনে মনে স্থির করলাম। তাঁর কথামতো তাঁর কাছে কাছেই থাকছি। আবার কফি ঢেলে দিলাম। টোস্ট জ্যাম দিলাম। তিনি হেসে বললেন — আমার অভ্যাস খারাপ করে দিলেন। কেস-ভর্তি সিগারেট আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন সব কটিই আপনার প্রাপ্য হয়ে গেছে।

তিনি আমার লাইটারে আমার সিগারেট ধরিয়ে দেবার সময় তাঁর হাতে আমার হাত লাগলে — সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি কাঁপছি। রেকাবগুলি ধুতে গেলাম, বললাম এমন কিছুই আমি করিনি, ওঁর আসাটা খুবই অলৌকিক। ভাবতে আমার চোখে জল এসে গেল। মুছে ফেললাম। মনে হয় তাঁর নজরে পড়েছে। অথচ ভাবটা এমন কিছুই দেখেননি।

— ‘নিশ্চয়ই ভাগ্যের ব্যাপার তো বটেই। অবশ্য যার শেষ ভালো তার সব ভালো।’ চুপি চুপি বললেন — ‘ঐ বদমাশ দুটোর জন্যে আজ সারারাত বসে কাটাতে হবে। ওদের কোনো কিছু করার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আর আমার এখানে আসার কারণটা শুনুন। তবে এর সঙ্গে আমার নাম জড়াবেন না। কাউকে বলবেনও না।

আমি প্রতিজ্ঞা করলাম — না, কাউকে বলব না।

॥ এগারো ॥

বেসিনের পাশে উঁচু জায়গাটার ওপরে আমি উঠে বসলাম দুটি কারণে — প্রথমত ওঁর কাছাকাছি থাকা যাবে আর দ্বিতীয়ত ওঁনার কথা যাতে আস্তে বললেও আমি শুনতে পাই। তিনি একটা সিগারেট আমায় দিতে এলে নিইনা। তিনি নিজে একটা ধরিয়ে আয়নার ভেতর দিয়ে ঐ গুন্ডা দুটোকে বেশ ভালো ভাবে লক্ষ করেন। আমিও দেখলাম যে, ওদের চোখের চাউনি। কিছু না দেখা, না শোনার ভান করা আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। ওদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ওরাই যেন এই পৃথিবীর সর্বময় কর্তা।

জেমস বন্ডের মুখে কোনো বকমের উদ্বেগের ছায়া দেখলাম না। তিনি কেবল ওদের মেপে চলেছেন তাঁর বিচক্ষণ চোখ দিয়ে। তিনি তো এদের কিছুই দেখেননি বা জানেন না। যে কোনো মুহূর্তে এদের পিস্তল গর্জে উঠতে পারে। যে কোনো সময়ে। সার্কাসেব খেলা দেখানোর মতো

আমাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারে ওদের পিস্তল দিয়ে। জেমস বন্ড তাঁর গল্প-কাহিনি বলতে শুরু করলেন আব আমি ঐসব দৃশ্যচক্ৰ মন থেকে দূর করে ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ওঁর গল্প শুনতে শুরু কবলাম।

ইংল্যান্ডের সীমান্তের ওপারে, অর্থাৎ রাশিয়া থেকে কোনো পুরুষ বা কখনও নারীও প্রয়োজনীয় সংবাদ নিয়ে এপারে আসে। তাদের একটা ছকের মধ্যে আসতে হয় - - বার্লিন পথটাই দেশত্যাগের ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়। তখন এদের গোয়েন্দা দপ্তরে নিয়ে গিয়ে খুব ভালো ভাবে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ওরা দুমুখো চব হিসেবে এসেছে। মানে, যখন তাদের নিরাপত্তা বিভাগের ছাড়পত্র দেওয়া হয় তখন ওরা আমাদের সঙ্গে মিশে আমাদের খবর রাশিয়ায় পাঠায়। আর তিনমুখো গুপ্তচর যারা, তাবা পরে মন পলটে আমরা যে সব ভুলো সংবাদ দিই সেগুলো পাচার করে। কিছু বুঝলেন? এ হচ্ছে একটা বিবর্তিত ভাষা। এ খেলা থেকে কেউই বের হতে পারে না। এ হচ্ছে মানুষের মধ্যে একটা সহজাত শিকার করার খেলাব মতো।

— ঠিক। এ যুগের ছেলেমেয়েরা এটাকে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা মনে করে। যুদ্ধ করে কোনো কিছুব সমাধান হবে না। এসব অতীতের প্রস্তর যুগের মতো। জ্যাক কেনেডির মতো কিছু লোক হলে ভালো হয়। অকর্মণ্য বৃদ্ধদের এখন সব ভার তরুণদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।

আমার কথা শুনে তিনি হাসলেন।

তিনি আমায় সাবধান করে দিলেন— যদিও আমার সঙ্গে তিনি একমত। তবুও এ ব্যাপারে যেন বাইরে কারুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন না। তাহলে আমার চাকরিটা আর থাকবে না। ঐ রকম ভালোভাবে দেখে শুনে নেওয়ার পর ঐসব বার্লিন থেকে আসা স্মরণার্থীদের প্লেনে করে নিয়ে যাওয়া হয় ইংল্যান্ডে — বলা হয় কী চান! আপনি রাশিয়ার গোপন রকেট-ঘাঁটি বা অন্য কিছু সম্বন্ধে যা জানেন আমাদের বলুন। আমরা আপনাদের নতুন নাম, পাসপোর্ট এবং লুকিয়ে থাকার জন্য আস্তানা দেব। যাতে ওরা আপনাদের খুঁজে বের করে মেরে ফেলতে না পারে। আর হলে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড অথবা আফ্রিকার মতো দেশে তাদের ইচ্ছে মতো পাঠিয়ে দেওয়া হবে প্লেনে করে। সেইসব দেশের পুলিশদের দ্বারা পরিচালিত একটা অভ্যর্থনা সমিতি, গোপনে তাদের দেখভাল করবে। পরে তাদের জীবনধারণের জন্য কাজও জোগাড় করে দেওয়া হয়। পরে তারা বিদেশিদের মতো এখানে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

জেমস বন্ড আবার সিগারেট ধরালেন। ‘আপনি যে সব কথা শুনলেন এসব রাশিয়ানরা জানেন, শুধু জানে না তাদের ঠিকানা। এই ধরুন একজন। তার নাম ধরা যাক, বোরিস, তাকে কানাডার টোরন্টোয় থাকতে দেওয়া হয়েছে। তিনি একেবারে নিস্পাপ। তিনি ক্লোনস্টারে একজন উচ্চপদস্থ নৌ-ইঞ্জিনিয়ার — পরমাণু চালিত ডুবো জাহাজ পরিচালনা বিভাগের উচ্চপদস্থ হোমরা চোমরা। তিনি ফিনল্যান্ড পেরিয়ে স্টকহোমে এসেছিলেন। এদের রাশিয়ানরা কিছু করতে পারে না কেবল গালাগাল দেওয়া ছাড়া। কেবল তাদের আত্মীয়দের সুদূর সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেয় অন্যদের কিছুটা ভয় দেখানোর জন্য। এসব কাজ দেওয়া হয় গুপ্ত বাহিনীকে। স্পেক্টর নামের একটা সংস্থাকে এটা দেওয়া হয়েছে।

ঘরের অন্যদিকে বসে থাকা গুন্ডাদুটোকে জেমস বন্ড একবার দেখে নিলেন। ওরা যেন দুটো নিখর পাথরের মূর্তি। ওরা চুপচাপ বসে নজর রেখেছে। অপেক্ষা করছে। কিন্তু কীসের জন্য? আমায় বললে — খুব প্যানপ্যানে লাগছে না তো?

— না, না, বেশ রোমাঞ্চকর। আচ্ছা আমি কি খবরের কাগজে ঐ স্পেক্টর ঘাতকদলের কথা পড়েছি?

হয়তো তাই। 'থাডাবল অপারেশন পাবনার্ণবিক বোম্বার কবলে হাবা' প্রাপ্ত খাচিলা বাহামা দ্বাপপুঞ্জ। তিন যেন তাব চাখেব সামনে সব দেখতে পাচ্ছেন। এচ খাচিলা প্রায় একবতব আগে, মনে পড়েছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। কাগজে পড়েছি। যেন মনে হয় বোম্বাধ সিংগেল গল্প একটা। আপনি নিশ্চয়ই এব মধ্যে জাডিয়ে ছিলেন।

তিন হাসলেন। 'কাছাকাছি ছিলাম। আমবা তখনও ডে স্পেকটব খাতকদলকে সম্পূর্ণভাবে শেষ কবতে পারিনি। কারণ যিনি দলেব পাণ্ডা, তিনি নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছেন। এটা হচ্ছে একটা স্বাধীন গুপ্তচব সংস্থা। যাইহোক, তাবা আবাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তাবা জেনেছে যে, বাঁশযানাবা বোবিসকে খুন কবতে চায় আব তাব ঠিকানাও জোগাড় কবতে। কেমন কবে? সেটা আব আমায় জিজ্ঞেস কববেন না। ওবা এসব খবব বাখে।

এবাব এবা বাঁশযাব গুপ্ত বাহিনীব কে জি বি ব কোনো কর্তাব্যক্তিকে জানিয়ে দিল যে, এবা একলক্ষ ডলার এব পারিবর্তে এই কাজ কবতে পাবে। মস্কো বাঁজি হল। এব পরেব ঘটনাগুল অটোযায়। 'মাউন্টিস' দলটা আমাদেব জানাল এদেব একটা বিশেষ শাখাব সঙ্গে এইভাবে আমবা কাজ কাঁব। এবা জানাল ওস্ট উলম্যান নামে এক নাৎসি বাহিনীব পুবোনো গোয়েন্দা আবাব টোরোন্টোব গুল্ডা দলেব সঙ্গে যোগাযোগ কবছে। তিনি কোনো অচেনা বিদেশিকে খুন কববেন পারিবর্তে হাজাব ডলাব পাবেন। এইগুলো থেকে আমাদেব একজন অভিজ্ঞ সহকর্মী ধবে নিলেন যে এটা বাঁশযানদের কাজ। জেমস মুখ নীচু কবে রাখলেন - আমাব ওপব তদন্তের ভার পবল। হঠাৎ আমায় বললেন -- আপনি কি এখন টি ভি দেখবেন?

-- না, না, আপনি বলে যান।

-- আপনি জানেন যে টোরোন্টো গুল্ডাদের দেশ। ওখানে ওবা খুব অসুবিধায় পড়ে। 'মাউন্টি' সম্প্রদায় যাব জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে দুজন চোস্ট গোয়েন্দাকে ডেকে আনে। এদেব একজন শিকাগো এবং ডেট্রয়েট সীমান্তে কর্মবত। 'মেকানিকস' নামেব দুর্ধর্ষ গুল্ডাদলটিব ১৩৩র একটা চালাক কানাডিয় ছেলেকে চুকিয়ে দেওয়া হল। এই ছোকরা উলম্যানের সব খবর আনতে লাগল। আব আমিও মাউন্টি সম্প্রদায়েব বন্ধুদেব নিয়ে নেমে পড়লাম।

- ছোট্ট কবে বললে বলতে হয় বোরিসকে হত্যা কবাই এদেব লক্ষ এবং গত বৃহস্পতিবার অথাৎ আজ থেকে ঠিক সাতদিন আগে 'মেকানিকস' দলটা এই কাজ করবে। উলম্যান লুকিয়ে পড়েছে। 'মেকানিকস' দলের সেই ছেলেটি শুধু জানাল তিনজন তুখোড় বন্দুকবাজকে নিয়ে উলম্যান সমস্ত ব্যাপাবটা পরিচালনা কববে। বোবিসেব অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে তার সাবমেশিনগান দিয়ে দবজা ভেঙে বোরিসের সামনে গিয়ে তাকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে। মাঝরাতেব ঠিক আগেই ঘটনাটা ঘটবে। ওরা বোরিসের আসা যাওয়ার ওপব কড়া নজর রেখেছে।

আমার প্রধান কাজ ছিল উলম্যানকে ধরা। বোরিসকে বাঁচানো ছাড়াও। এটা ঠিক হয়ে গেছে যে, সে স্পেকটর দলের সঙ্গে যুক্ত। তাই আমি ঠিক করলাম ওই দলের একটু হদিশ পাওয়া মাত্রই তাব পেছু ধাওয়া করা। আমরা দেখলাম বোরিসকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে বাঁচানো হয়তো যাবে। কিন্তু উলম্যানকে ধরা যাবে না। তাই দেখলাম বোরিসের সঙ্গে আমার উচ্চতা, মুখ, চোখ, গায়ের রং এমন কয়েকটি জিনিসের বেশ মিল বয়েছে। তাই একদিন লুকিয়ে বোরিস কী পোশাক পরে এবং কী ভাবে হাঁটে লক্ষ কবলাম। ঠিক হল যেদিন অপারেশন হবে ঠিক তার আগেব দিন বোরিসকে সরিয়ে দিয়ে আমি নকল বোরিস হয়ে ওই অ্যাপার্টমেন্টে থাকব।

আমি আব নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না — ‘আশ্চর্য! এভাবে বিপদের মুখে নিজেকে ঠেলে দেওয়া ঠিক হয়নি আপনার। হয়তো ওরা ওদের প্ল্যান পালটাল। ফেরার পথে একটা বোমা মেরে দিল।

— সব রকমের চিন্তাই করা হয়েছে। এটা তো একটা ঝুঁকি নেওয়া যার জন্যে ওরা আমায় পয়সা দেয়। তিনি জানালেন। ‘যাক এখন তো আমি আপনার সামনে বসে গল্প করছি। বোরিসের মতো হেঁটে যেতে পেরে আমি খুশিই হলাম। ‘মাউন্টি’রা বোরিসের উলটোদিকের ফ্ল্যাটে ছিল। আমি শুধু শিকারের টোপ হয়ে কাজ করলাম। আমি অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারতাম। তারপর সব কিছু মিটে গেলে ফিরে আসতাম। তবে আমি জানতাম ওরা সঠিক হয়ে নেবে যে, ওদের লক্ষ্যবস্তুটি ঠিক আছে তো? আর ঠিক তাই। রাতে টেলিফোন বেজে উঠল — জিজ্ঞেস করল মি. বোরিস কথা বলছেন? আমি বিদেশি ঢঙে বললাম, হ্যাঁ বলছি। তবে আপনি? উত্তর হল টেলিফোন ডাইরেকটরি ঠিক করার জন্য ফোন করে সব মিলিয়ে নিচ্ছি। শুভরাত্রি। আমিও জানালাম শুভরাত্রি। এবং ভাগ্যকে বললাম বোরিসের নিখুঁত অভিনয়ের জন্য সেই রাতে ভুয়ো টেলিফোন ধরার জন্য আমার সেখানে উপস্থিতি।

— শেষ সময়টা স্নায়ুর ওপর খুব চাপ পড়েছে। একটা ছোটোখাটো যুদ্ধ হবে। লোকক্ষয় হবে। আর যদি অক্ষতই থাকে তবে কেউ সেটা পছন্দ করবে না। আমার এক জোড়া বন্দুক ছিল। ভারী গুলি দিয়ে রুখে দেওয়া অতি সহজ। সময়ের কাঁটা এগিয়ে চলেছে। যেন বৃকে পাথরের বোমা। বারোটো বাজতে দশ মিনিট আগে আমি ডানদিকে নিরেট কোন বেছে আমার জায়গা নিলাম। কারণ উলম্যানরা তার কোন সহচর যদি মাউন্টিদের টপকে দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে, সেইজন্যে এই সাবধানতা। মিনিটের কাঁটা ঘুরছে অনুমান করছি ওরা গাড়ি থেকে নেমে ওপরে উঠে আসছে। মাউন্টিরা তাদের একজনকে আমার সঙ্গে থাকতে বলেছিল। আমি রাজি হইনি। এরকম কাজ আমি একলা করতেই পছন্দ করি। অবশেষে বারোটো বাজতে পাঁচ মিনিট আগে বাইরে রবার শোলের জুতোর আওয়াজ পেলাম। আর সেই মুহূর্তে যেন গোটা নরকের গর্জন এসে পড়ল।

হুসে হাত দিয়ে মুখটা মুছে নিলেন জেমস বন্ড। যেন মন থেকে সব কিছু মুছে ফেললেন। আর একটা সিগারেট ধরালেন। শুরু করলেন — আমার কানে এল ‘মাউন্টি’র একজন উচ্চপদস্থ অফিসার চিৎকার করলেন — আমি সরকারের তরফ থেকে বলছি। ঐ লোকটাকে ধরো। তারপর গুলি, বোমার আওয়াজ। সবই সাব-মেশিনগানের। একজনের আর্ত আওয়াজ। সেই অফিসার বললেন — ঐয়ে, ওকে ধরো। তার পরেই আমার দরজায় লক উড়ে গেল। একজন লোক ঢুকল হাতে তার একটা মেশিনগান ধরা।

লোকটা বোরিসকে খুঁজছে শোবার ঘরের ডাইনে বাঁয়ে। এই হচ্ছে উলম্যান — নাৎসি বাহিনীর প্রাক্তন গোয়েন্দা। আমরা সহজেই বুঝতে পারি কে জার্মান আর কে রাশিয়ান — তাদের গন্ধ শুঁকে। আমার হাতের বন্দুক গর্জন করে উঠল তার হাতের মেশিনগান পড়ে গেল। সে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পেছনের খোলা দরজা দিয়ে পালাল। দরজাটা পাতলা কাঠের।

আমি ইংরিজি জেড অক্ষরের মতো গুলি চাললাম হাঁটু মুড়ে। কারণ সে যখন গুলি ছোঁড়ে তখন আমি হাঁটু মুড়ে বসেছিলাম। আমার মাথার চুল ছুঁয়ে চলে গেছে। আমার ছোঁড়া বুলেট ওর বাঁ কাধে আর ডানদিকের পাছায় লাগায় সে জানলার বাইরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়।

বাকি বন্দুকধারীদের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গিয়েছিল। সেই সময় একজন আহত মাউন্টি আমার ঘরে আসে আমায় সাহায্য করার জন্যে। তার কণ্ঠস্বর লক্ষ্য কবে উলম্যান গুলি কবে। আর আমিও তার পিস্তলের উচ্চতা হিসাব করে গুলি চাললাম। সেই মাউন্টি লোকটা মারা

গেল। তাড়াতাড়ি ঘরেব মাঝে এলাম যাতে আরও গুলি ছুঁতে পারি। দরকার হয়নি। সে তখনও জীবিত। তাকে ধরাধরি করে অ্যাশ্বুলেঙ্গে করে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয় যাতে তার কাছ থেকে আরও কথা বার করা যায়। কিন্তু সে আর কথা বলেনি। পরের দিন সকালে সে মারা যায় ?

আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেও জেমস বন্ড কিন্তু আমায় দেখছিল না। বললেন আমাদের দুজনকে আমরা হারিয়েছি আর ওরা জার্মান উলম্যান। আরও দুজনকে এবং আরও দুজন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। তাঁর মুখটা খুব ক্লান্তই লাগছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের এরকম দৃশ্য দেখে দেখে আমাদের সঙ্গে গেছে। ময়না তদন্তের পর আমি চলে আসতে চাইলে, আমার সদর দপ্তর আমায় ওয়াশিংটনে আমার পুরো ঘটনাটা যেন ব্যক্ত করি যাতে আমেরিকায় ‘মেকানিক্স’ সম্প্রদায়কে শেষ করতে পারে আমাদের উদ্ভবসূরিবা।’

বড়ো জোরে ধাক্কা খেয়েছে ‘মেকানিক্স’ এবং মাউন্টরা গরমে গরমে এগোতে চাইছে তাদের পববর্তী কার্যক্রমে। রাজি হয়ে গেলাম। বললাম আমি গাড়িতেই যাব।’

রাস্তায় আসতে মাত্র তিনদিনের বেশি লাগবে না। তাই এই গাড়িটা ভাড়া করলাম। আজ ভোরেই রওনা হয়েছি। বেশ ভালোই আসছিলাম। একটা বড়ো ঝড়ের মুখে পড়লাম। যার লেজটা এখান দিয়ে গেছে। লেক-জর্জের কাছে এসে ভাবলাম রাতটা এখানে কাটাই। কিন্তু জায়গাটা সুবিধের নয় আর দূরে এই মোটেলের নিওন লাইট দেখে এখানে চলে এলাম।

তিনি হাসলেন। আবার আগের মতো উচ্ছল দেখাচ্ছিল। মনে হয় কেউ বোধ হয় আমায় বলে দিয়েছে যে, আপনি এখানে আছেন এবং বিপদের মধ্যে। এখান থেকে এক মাইলটাক আগে আমার টায়ার ফেটে যায়। আমি এসে গেলাম। তিনি আবার হাসলেন। কাউন্টারের ওপর রাখা আমার হাতের ওপর তাঁর হাতটা রাখলেন। যা ঘটল তা বড়ো অদ্ভুত।

— এতটা রাস্তা আসার পর আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

— পরিবর্তে আমার কিছু প্রাপ্তিযোগ হয়েছে। এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো এক কাপ কফি করে দিন তো।

কফি তৈরিতে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি অ্যাটাচি থেকে দুটো বড়ি বার করে কফির সঙ্গে খেয়ে নিলেন। ‘বেনজিড্রিন’ এটা আজ আমায় বাত জাগতে সাহায্য করবে। কাল একটু ঘুমিয়ে নিলেই হবে। তাঁর চোখ আয়নার দিকে।

— ওরা আমাদের দিকে আসছে। নির্ভয়ের আভাস পেলাম তাঁর হাসিতে। মোটে ভয় পাবেন না। একটু ঘুমিয়ে নিন। যাতে রাতে কোনো গোলমাল না হয় আমি দেখব। রেডিও স্তিমিত হয়ে গেছে। মধ্য রাত্রির সূচনা হয় টুংটুং আওয়াজে।

॥ বারো ॥

পেছনের দরজা দিয়ে ম্যাগাসি বাইরে বেরিয়ে গেলে বোগা লোকটা আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে —

— এবারে আপনারা উঠুন তো। আমরা এবার মেন সুইচ নিভিয়ে দেব। বিজলি বাতি অহেতুক খরচ করা নিষেধ মিস্টার সানগুইনেস্তির। হঠাৎ আলো জ্বালাবার প্রয়োজন যদি হয় সেই জন্যে আমার বন্ধু গুদাম থেকে তেলের বাতি আনতে গেছে।

ওদের কথাগুলো খুবই যুক্তিযুক্ত। তবে কি বন্ডের উপস্থিতির জন্য ওদের প্ল্যান পালটেছে? জেমসের গল্প শুনে মনের মধ্যে থেকে যে চিন্তাগুলো দূর হয়েছিল সেগুলো আবার এল। আমার ঘরের দুধারে এই দুজনকে নিয়ে শুতে হবে। আমার ঘরটাকে ভালোভাবে দেখে নিতে হবে। এদের ডুপ্লিকেট চাবি আছে। জেমস বন্ডকে বলতে হবে আমায় সাহায্য করার জন্য।

বেশ ভালো কবে খাড়া ভাঙলেন জেমস বন্ড।

- তা তো বটেই। আমরাও ঘূমেণ খুব প্রয়োজন। আজ অনেকটা পথ আসতে হয়েছে।
আবার আগামীকাল যেতেও হবে অনেকটা। এবার আপনিও নিশ্চয়ই শুভে যাবেন এইসব ভাবনা
চিন্তা নিয়েই।

রোগা লোকটা ব্রু কুঁচকে বললে অর্থাৎ ?

- মানে, বেশ দায়িত্বপূর্ণ কাজ আপনাদেব।

-- কাজের পরিমাপ জানেন ?

— এতবড়ো প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের সম্পত্তি তার মূল্য ঠিক কবতে হবে বিমা কোম্পানির
জন্য। আচ্ছা একটা কথা আপনাদেব কারুর সিকিউরিটি বন্ড আছে ?

না, মিস্টার সান উইনোভ তাঁর কর্মচারীদের কাছ থেকে ও লেন না।

-- বাঃ, খুব ভালো কথা। আপনাদেব ওপব তো তাঁর সাংঘাতিক বিশ্বাস। তা কোন বিমা
কোম্পানির হয়ে কাজ করছেন ?

রোগা লোকটা তখনও কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবারে বেশ বিবস্ত্র হয়েই
বলল — মেট্রো অ্যাকসিডেন্ট এন্ড হোম। আর এতে আপনার কি মশাই। আপনি ভাবছেনই বা
কী ?

ও কথায় কোনো বকম আমল না দিয়ে জেমস বন্ড বললেন — আমি মিস মিশেলের কাছ
থেকে জানলাম মোটেলটা ভালোভাবে চলছে না। আর এরা কোয়ালিটি কোর্টস বা হলিডে ইনস
বা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত নয়। তা না হলে ব্যবসা ভালো চলতে পারে না। আব আপনাদেব দিয়ে
কাঁটাচামচ গুণতে আর বিজলি বাতি নেভানোর জন্য পাঠানো— জেমস বন্ড বেশ সহানুভূতি
সহকারে বলল কথাগুলো। — দেখুন, আমার মনে হচ্ছে এই ব্যবসাটাতে বেশ কিছু গুণগোল
আছে। যেটা খুবই খারাপ। জায়গাটা খুবই ভালো আর আপনাদের ঘর-দোর বেশ পরিষ্কার আর
সাজানো-গোছানো।

রোগা লোকটার চোপ দুটো আবার লালচে হয়ে উঠল। নীচু গলায় বললে -- ‘আপনি এবার
দয়া করে চুপ ককন তো। আপনার ব্রিটিশ কায়দায় বকবকানি ভালো লাগছে না। আমার মনে হয়
আপনার ধারণা হয়েছে যে, এই মোটেলটা বেআইনি আর আমরাই এটার পত্তন করেছি। যতো
সব।’

জেমস বন্ড হেসে উঠে বললেন — ‘মিস্টার হোরাউইজ, অতটা চটবেন না বা অতটা শাসাবেন
না। আপনাদের এই রকমের ভাষা আমার অজানা নয়।’ তারপর হঠাৎ গাঁকে গস্তীর হতে দেখা
গেল— আর এগুলো কোথা থেকে আসে, তাও আমার অজানা নয়। আশা করি, আমি কী
বলতে চাই বুঝতে পেরেছেন।’

মনে হল, বন্ডের কথা বোগা লোকটা বুঝতে পেরেছে যে সে কয়েদি, ও বুঝতে পেরেছে,
নিজের রাগ সামলে নিল। তারপর বললে - আমি বুঝছি। আপনারা মানে টিকটিকিরা, সব
সময় নোংরা খুঁজে বেড়ান, যেখানে তা নেই। সেখানেও। ওয়েল। মিঃ লার্নেড জেন্টলম্যান,
এবার ঘুমোনোব ব্যবস্থা করা যাক। আমরা বন্ধুকে তো দেখতে পাচ্ছি না কোথায় গেল ?

পেছনের দরজা দিয়ে সকলে একে একে বের হচ্ছি। আলো নিভে গেল। আমরা দু’জনে
দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম বোগা লোকটা অন্ধকারে ঠিক এগিয়ে চলেছে। যেন সে অন্ধকারেও
দেখতে পায়। স্ল্যাগাসিকে দেখা গেল দুটো ঢাকা-দেওয়া প্রদীপ নিয়ে আমাদের দিকে এগোচ্ছে।
আমাদের দু’জনের হাতে দুটো দিয়ে বললে — আপনাদের সুখ-নিদ্রা হোক। তার লোমবিহীন মুখে
দেখলাম দৈতো হাসি।

আমাব সঙ্গে জেমস বন্ড ঘবেব কাছে এলেন শেষে ঘবেব মধ্যে ঢুকে দবজা বন্ধ কৰে দিলেন। ওদেব কি মতলব বোঝা দায়। তৰে আজকেব বাওতৰ মতো আপনি যাতে নিবাপদে থাকতে পাবেন, তাব বাবস্থা কৰে দিচ্ছি। এটাই আমাব প্ৰথম কাজ।’ তিনি ঘবেব প্ৰতিটি কোণ দবজা জানলা ঘলঘলি আমাব সঙ্গে কৰে নিয়ে নিজেব তাঁক্ষদৃষ্টি দিয়ে পৰীক্ষা কবলেন। বললেন ওদেব কাছে তো ‘মাস্টাৰ কি’ আছে তাই না? আপনি এক কাজ কৰুন। এটাই একমাত্ৰ দবজা। দবজা বন্ধ কৰে ঐ টেবিলটা দবজাব ওপৰ বেখে একটা দেওয়াল সৃষ্টি কববেন। তাবপৰ বাথকমে ঢুকে টয়লেট পেপাব ভাঁজয়ে এনে কীলকেব আকাৰে দবজাব তলায় দিয়ে হাতলে চাপ দিলেন টানলেন। কীলকগুলো খুলে আমাব হাতে দিলেন। তাবপৰ নিজেব প্যাণ্টেব পাশে থেকে ছোটো মোটা একটা বিভলবাব বাব কৰে জিঞ্জেস কবলেন ‘চালানো অভ্যাস আছে?’

ছোটোবেলায় খবগোস মাৰাব জনা ১২ বোৰেব লক্ষ্য বন্দুক ব্যবহাৰ কৰেছি।

- ঠিক আছে। তিনি হেসে বললেন ‘এটা স্মিথ এন্ড ওয়েলনেব তৈবি পুলিশ পজিটিভ। নীচু কৰে ছুঁডবেন। ঘোড়াটা চেপে দেবেন। টানবেন না। গুলিব আওখাজ পেলেই আমি হাজিব হব। আপনাব নিবাপত্তা সম্পূৰ্ণ। জানলাগুলো ভালো। কাঁচ ভাঙলে তৰে ঢোকা যাবে।

— শুনুন, এই সব মোটেল যাঁবা তৈবি কৰেছেন, তাঁদেব ওপৰ বিশ্বাস রাখা যায়। এই ঘব সম্বন্ধে আমাব যা যা দবকাৰ সব জানা হয়ে গেছে, আপনি খাটেব ওপৰ না শুয়ে ঘবেব ঐ দিকেব কোণে লেপ পেতে একটা বিছানা কৰে শুয়ে পড়ুন। বিভলবাবটা বালিসেব তলায় রাখবেন। টিভি সেটটা টেবিলেব ওপৰ রাখবেন, যা বাইবে থেকে কেউ জোৰে দবজায় ধাক্কা দিলে সেটটা পড়ে যায় আৰ আপনাব ঘুম ভেঙে যায়। তখন আপনি দবজাব হাতলেব দিকে লক্ষ্য কৰে গুলি কববেন, কাৰণ সে তখন ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। একটা আওখাজও আপনি শুনতে পাবেন।

মনেব সমস্ত আনন্দ নিয়ে বললাম ‘বুঝেছি।’ আৰ ভাবাছিলাম, আজ ঘবে যদি উনি থাকতেন। হয়তো ওনাব অন্যবকম কিছু প্লান আছে।

হঠাৎ আমাব ভাবনাটা ভেঙে গেল। দেখলাম তিনি ধীৰে ধীৰে আমাব সামনে এগিয়ে আমাব ঠোটে আলতো কৰে একটু চুমু দিলেন। আমি স্থাণুব মতো দাঁড়িয়ে বইলাম। বললেন - ভিভ, আমি দুঃখিত। আমাব এত দিনেব অভিজ্ঞতায় আমাব চোখে তুমি একটি অতি সুন্দৰী মেয়ে। যাও ঘুমোতে যাও। তোমাব ওপৰ আমাব নজৰ থাকবে।

আমি আৰ নিজেকে ঠিক রাখতে পাবলাম না। আমাব দু’হাত দিয়ে তাব গলা জড়িয়ে ধৰে খুব নিবিড়ভাবে তাঁব ঠোটে আমাব চুমু এঁকে দিলাম।

— তোমাব এখানে আসাব জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাব জীৱনে তুমিই হচ্ছে আশ্চৰ্য্যতম পুৰুষ। তুমি আমায় কথা দাও তুমি সাবধানে থাকবে। আমি ওদেব যতটা দেখেছি তুমি তাব কিছুই জানো না।

খুব আলতো কৰে আমায় তিনি চুমু খেলেন। আমাব হাতেব বাঁধন থেকে তাঁকে মুক্তি দিলাম। তিনি বললেন — তোমাব কোনো ভাবনা নেই। এবকমেব বহু জীৱ আমি দেখেছি। যাও ঘুমিয়ে পড়ে। শুভবাৰ্ত্তি ভিভ।

তিনি চলে গেলেন।

নিঃশব্দে তাব চলে যাওয়া দেখলাম। তাবপৰ শুয়ে শুয়ে ভাবলাম — না ওকে আমি যেতে দিবনা। আমাব কৰেই রাখব। আয়নায় নিজেকে দেখে কী বিশী লাগল। ভূতেব মতো দেখতে। চোখেব কোণে কালি পড়েছে। সাৰ্বাদিনটা কী ভয়ানক গেছে। এখনও বাতটা বাকি বয়েছে কিন্তু আমি বুঝেছিলাম ওকে কোনো মায়াব বাঁধনে বাঁধা যাবে না। কেউই বাঁধতে পাবেনি। আমিও পাবব না। আমি ওকে ছেড়ে দেব, যেতে দেব, মন খাবাপ কবব না। কাঁদবও না ও চলে গেলো।

আমি তো ঠিক করেই ফেলোছি যে, আর কারুর সঙ্গে মন-দেওয়া-নেওয়া করব না। অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল।

আমার ঘরের বাইরে বড়ো বড়ো পাইন গাছগুলো নিজেদের মধ্যে যেন কোলাকুলি করছে। এন্ত জোরে বাতাস বইছে। আকাশে মেঘের ফাঁক দিয়ে দিয়ে চাঁদ যেন জোরে ছুটে চলেছে। চাঁদের জ্যাংলা ঘরের জানালার শার্সির মাথায় দুটো কাঁচের চৌখুপিতে যেন হলদে আলো জ্বলছিল। আর লাল নকশা-করা পর্দার ভেতর দিয়ে যেন একটা ভুতুড়ে ভুতুড়ে ভাব লাগছিল। আলোর সলতে থেকে যে সামান্য আলো ঘরের কোণে পড়ছে তাতে ঘরটাকে মনে হচ্ছে কোন পরিচালকের অগোছালো একটা সেট। তিনি এখনই এসে এই সেটের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সব কিছু বুঝিয়ে দেবেন।

নিজেকে শক্ত করতে চেষ্টা করছি। দরজা বন্ধ করব আগে বাইরে বেরিয়ে সবটা দেখে নিলাম। আমার ঘরের দুপাশে ঘর আর দূরে চল্লিশ নম্বর ঘরের ভেতর থেকে বাতির আলো ঠিকরে পড়ছে। সব চুপচাপ শান্তিপূর্ণ। ঘরে এসে তাঁর নির্দেশমতো ঘরটা ঠিক করলাম। নৈশ প্রার্থনা করার জন্য ঘরের মাঝখানে হাঁটু মুড়ে বসলাম। পরম মঙ্গলময় তোমায় ধন্যবাদ আর তাঁকে আমার মনের বাসনা জানালাম। দুটো অ্যাসপিরিন খেয়ে ঘরের কোণে যে বিছানা করে ছিলাম সেখানে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমে ঢলে পড়লাম। চলে গেলাম যেথা, সেখানে কোনো বিপদ নেই, কোনো অশান্তি নেই। আছে শুধু সেই কামনার সুখটা। আলোটা নিভিয়ে দিলাম।

তাঁর কাছে আমার পাওনা অনেক উপহার — লাইটার জ্বালাবার সময় প্রথম তাঁর স্পর্শ, তারপর তাঁর প্রতিটি মিস্তি মধুর চুমু পৃথক পৃথক ভাবে। হঠাৎ তাঁর দেওয়া রিভলবারটার কথা মনে হতে বালিশের তলায় হাত দিয়ে দেখলাম, সেটা আছে তো! মনের সুখে ঘুমের রাজ্যে পাড়ি দিলাম। শোবার আগে আমার ওভারলের সামনের চেনটা খুলে দিয়েছিলাম।

পরের যা ঘটনা তাতে মনে হচ্ছে আমি ঘুমোইনি। চিন্তা করছি আমি কোথায়? হাওয়া থেকে গেছে। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার জন্য ঘুম হয়নি। হঠাৎই আমার চোখটা জানলার চৌখুপি কাঁচের ওপর পড়ায় দেখলাম চাঁদ আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। চারধার শান্ত। দেওয়ালের পেছন ফিরে পাশ ফিরে শুলাম। ঘরটা আবার দেখার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ খুলে দেখলাম পোশাকের কাবার্ড আর দরজায় ফ্রেমের মধ্যে থেকে একটা স্কীণ আলো চোখে পড়ল। ছিঃ ছিঃ ঠিক মতো দরজা বন্ধ হয়নি বোধহয়। উঠে একটু এগিয়েই ভাবলাম মেন সুইচ তো নেভানো। তাহলে—?

দাঁড়িয়ে একটু চিন্তা করে পিস্তলটা আনতে যেই ঘুরেছি অমনি দেখলাম একহাতে টর্চ আর অন্য হাতে কী একটা নিয়ে স্ল্যাগাসি হামাণ্ডি দিয়ে বেরিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মনে হয় একবার চিৎকার করেছিলাম। তবে সেটা তেমন জোরে হয়নি। পরমুহূর্তে মাথার কাছে বিকট আওয়াজ হল। জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করলাম জ্ঞান হতেই। মনে হল মাটি দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমায়। পোড়া পোড়া গন্ধ। চিৎকার করতে গেলাম; হল না। একটা গোঙানি ছাড়া আর কিছুই নয়। পা ছুড়তে পারছি না, বাঁধা। আড় মুখটা একটা হাত দিয়ে চেপে ধরা। কানের কাছে জেমস বন্ডের ফিসফিস গলার আওয়াজ পেলাম। বললেন — ‘আওয়াজ না করে চুপচাপ শুয়ে থাকো। আমি বলছি। চারদিক আগুন জ্বলছে।’

আমি হাত বাড়িয়ে তার খোলা কাঁধে মৃদু চাপ দিলাম তাকে ভরসা দেবার জন্য। আমার মুখের ওপর থেকে হাত সরে গেল, আবার বললেন — একদম নড়বে না, আমি এখনই ফিরে আসব চুপচাপ চলে গেলেন।

তাঁর চুপচাপ যেতে যা আওয়াজ হয়েছে, তার চেয়েও জোরে আওয়াজ হচ্ছে সামনে জ্বলন্ত আগুনের লকলকে জিবের। যেন আমার দিকে তেড়ে আসছে। কোনোরকমে উঠে দাঁড়লাম। মোটেলের ঘরের একটা জ্বলন্ত পাঁচিল আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। ওরা কি তবে মোটেলটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! আমি আমার সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে দেখলাম কোথাও কোনো আঁচ লাগেনি। কেবল ঘাড়ের কাছে কিছুটা ছুড়ে গেছে আমার ঐ গাছের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়।

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম সে আমার পাশে এসে গেছে। গায়ে কোনো জামা নেই। তার রোদে পোড়া দেহের বাঁ বগলের তলায় ঝুলছে একটা স্বয়ংক্রিয় পিস্তল। তার চোখ উদ্বেজনায জ্বলছে। এখন তাকে দেখতে অনেকটা জলদস্যুর মতো। দেখলে ভয় হয়।

তিনি হাসলেন। হাসির মধ্যে স্বচ্ছ ভাব। বললেন, ‘বিমা কোম্পানির কাছ থেকে টাকা আদায় করার জন্য এই মোটেলটা পুড়িয়ে দেওয়া হল। ওরা মোটেলের বাইরের বাড়িটা পুড়তে সাহায্য করছে ঢাকা পথে থার্মাইটের গুঁড়ি ছড়িয়ে দিয়ে। আমি মিস্টার সানগুইনেস্ত্রির সম্পত্তিটা বাঁচাতে পারব। আমি যদি সাক্ষী দিই তবে আর বিমা কোম্পানিকে তিনি সুবিধে করতে পারবেন না। তাতে তাঁর জেল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অতএব আমরা আর একটু অপেক্ষা করব মোটেলটা শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

মনে পড়ে গেল আমার ভেস্পা-টা-ব কথা। খুব ধীর ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমার ভেস্পাটার কী অবস্থা হবে?’

— ভাববার কিছু নেই। তোমার নষ্ট হওয়ার মধ্যে যদি তুমি তোমার ছেঁড়া প্যান্টটা বাথরুমে রেখে এসে থাকো তো সেটাই পুড়বে। তোমায় বার করে আনবার সময় তোমার ব্যাগটা নিয়ে এসেছি। আর গাড়িটা ওই গাছের আড়ালে রেখে এসেছি। ওই জায়গায় সব শেষে আগুন লাগবে কারণ দুধারে তো বাড়ি। ওরা প্রতিটি ঘরে থার্মাইট বোমা ফাটিয়েছে যা পেট্রলের চেয়েও ভয়ংকর আর বিমা কোম্পানির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

— তোমার গা-হাত-পা পোড়েনি তো? আমার গলায় উৎকর্ষা প্রকাশ পেল।

সুন্দর করে হেসে বললে — কোটটা সেইজন্যই খুলে রেখেছি। ভদ্রভাবে সেজে-গুজে তো ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে হবে।

মজা করে বললেও আমার মোটেই মজা লাগল না। বললাম — তোমার জামাটা কোথায়?’

জেমস বন্ড বললেন — ঐ দেখ। আমার সার্টটা উড়ছে। দেখলাম বিকট শব্দে ছাদটা ভেঙে পড়ছে আর তার সার্টটা আগুনের ফুলকির সঙ্গে উড়ছে। তার হাত দিয়ে ঘর্মান্ত মুখটা মুছতে গিয়ে মুখটা আরও ময়লা হয়ে গেল। বললেন — ‘যতটা প্রস্তুত থাকার আমার প্রয়োজন ছিল ততটা পারিনি। বাইরে বেরিয়ে যদি গাড়ির চাকাটা পালটে রাখতাম তাহলে আমরা ঘরের সারির পেছনের পথ দিয়ে বেরিয়ে এতক্ষণে লেক জর্জ বা গ্লেন-ফলস্ থেকে পুলিশ বাহিনী পাঠাতে পারতাম। তাহলে আমাদের বন্ধুরা আমাদের পালানোটা একটা অজুহাতের মধ্যে পেয়ে যেত।’

— তোমায় বলতে পারতাম নিয়ে যাব না। আবার গুলি ছোড়াছুড়ি হবে। আমি প্রথম গুলি ছুড়লে ওদের হারানো ভাগ্যের ব্যাপার। আর আমি এখন থেকে সরে গেলে তোমার অবস্থা সেই যথা-পূর্ব-তথা পরং-এর মতো হত। ওদের এই ব্যাপারের সঙ্গে তোমার প্রধান যোগ ছিল।

— আমি সব সময়েই ভাবতাম যে, ওরা আমাকে কীভাবে কাজে লাগাবে? কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আর আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছিল যে, আমি যেন খরচের খাতায়।’

— তুমিই হতে দাবার চাল, আগুন লাগানোর কারণ, অবশ্য ফ্যান্সি দম্পতিও বাদ যেত না।

এবার মনে পড়ল শেষ দিনে আমাব সঙ্গে ওদেব জঘনাতম ব্যবহার, যেন আমি একটা নোংবা আবর্জনা। ফেলে দিলেই হয়।

— তোমাব ওপর দায়িত্ব ছিল, যেহেতু মোটেল বন্ধ হয়েছে, বিদ্যুৎ নেভাতে বলেছে, তোমায় বাতি জ্বালিয়ে রাখতে বলেছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে বাতিটা কোনো রকমে পড়ে গিয়ে আগুন লেগে যায়। বাকিটা বাতাসের জোরের জন্য। আমার এখানে আসাটা খুবই বাজে ব্যাপার হয়েছে। আমার পোড়া দেহটা অথবা গাড়িটা, রিস্টওয়াচ আব ব্যাগেব ভেতর পিস্তলের শেষ অংশটুকু পাওয়া যেত।

— আমার এবং তোমার বালিশেব তলার পিস্তলটা ওদের খুব অসুবিধায় ফেলত। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন কানাডায় আর ইংলন্ডে পিস্তলের নম্বর মিলিয়ে পুলিশ আমাকে সনাক্ত করত। কিন্তু অন্য পিস্তলটাও আবার পুলিশকে চিন্তায় ফেলত। ধরা যাক, আমরা দুজনে দুজনের প্রতি অনুরক্ত হওয়া সত্ত্বেও কেন অত দূরে দুজনে শুলাম। তার কারণ, আমরা খুবই ভদ্র এবং শালীনতা বজায় রাখার জন্য আমরা যতটা পারা যায় দূরে গিয়েছিলাম। আর তোমার পিস্তল হচ্ছে একজন তরুণী একলা থাকবে আর তাব কাছে একটা পিস্তল থাকবে না, তা হতে পারে না। আর সেই পিস্তলটা যে আমিই দিয়েছি, সেটা খুবই স্বাভাবিক। এই বন্ধুদের কাছে আমার পরিচয় আমি একজন পুলিশের লোক। তারা পিস্তলের কথা ভাবত অন্য ধাতুর তৈরি কিছু জিনিসের কথা, যা আগুনে নষ্ট হবে না। ওরা খুব সজাগ। ওরা খুবই সাবধানি, পোড়া ছাইতে যাতে তাদের পায়ের ছাপ না পড়ে।’

— তোমাকে ওরা খুন না করে ছেড়ে দিল কেন ?

ওরা আমায় ছাড়ত না। ওরা জেনেছে যে, আমি খতম হয়ে গেছি। তোমাব কাছ থেকে যখন চলে এলাম তখন ভাবলাম যদি ওবা তোমার কিছু ক্ষতি করে তাহলে আমায় প্রথম সরাবে। সেই জন্যে বালিশ, তোয়ালে আর বিছানা দিয়ে আমার একটা ডামি তৈরি করে বিছানায় গুইয়ে দিলাম আর পাইন গাছের পাতা দিয়ে মাথার চুল করে এমনভাবে চাদর চাপা দেওয়া থাকবে মনে হবে আমি শুয়ে আছি। আগেও এরকম করেছি।

আমার গায়ের সার্টটা চেয়ারে ঝোলানো রইল যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় যে সার্টের মালিক বিছানায় শুয়ে রয়েছে। তেলের বাতিটা কমিয়ে বিছানার কাছেই রাখলাম। যাতে তাব নিশানা সঠিক হয়। কাগজের মণ্ড পাকিয়ে দরজার নীচে কীলক তৈরি করে রাখলাম। আত্মরক্ষার জন্য চেয়ারটা দরজার কাছে রাখলাম। শেষে আমার ব্যাগটা নিয়ে ঐ গাছের ঝোপের মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ‘তারপর হেসে জেমস বন্ড বললে — ওরা আমায় এক ঘন্টা সময় দিয়েছিল। এত আস্তে যে শুনতে পাইনি। ওরা শব্দহীন পিস্তল ব্যবহার করেছিল তারপর ঘরের মধ্যে থার্মাইট দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাল।

— যদিও ভেবেছি খুব চালাকি কবেছি, কিন্তু তা নয়। তোমার ঘরে যেতে আমার পাঁচ মিনিট লেগেছিল। ওদেরও এইরকমই সময় লাগার কথা। তুমি পিস্তল ছুঁড়বে আর আমিও ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত হব। আসলে স্লাগাসি বিকেলে যখন কেবিনগুলো দেখতে বেরিয়েছিল তখন তোমার ঘরের জামা-কাপড়ের কাবার্ড রাখার দেওয়ালে গর্ত করেছিল, কেবল প্লাস্টার বোর্ডটা রেখেছে। পরে একটা ছুরি দিয়ে সেটাকে কেটে ভেতরে ঢোকার রাস্তা করা।

— পাথরটা খুব সাবধানে রাখতেও পারে আবার না-ও পারে। আর সেটার দরকার হত না। আট নম্বর ঘরের গাড়ি বাখা জায়গায় আমাদের কারুর যাবার প্রয়োজন হয়নি। তোমার কেবিনে আগুনের আলো দেখে আমি দৌড়ই। ওরা প্রত্যেকটা ঘরে বোমা ছুড়তে ছুড়তে এগোচ্ছে। পরে খুব সাবধানে ঘরের দরজা বন্ধ করেছে। সত্যিই ওরা শিল্পী।

জ্বলা ঘরের ওপর দিয়ে জেমস বন্ড মাথা উঁচু করে লক্ষ্য করছিল বাইরের ঘরের দিকে।

এবাবে তারা সেই বাইরের ঘরে আঙুন লাগাল। আচ্ছা ভিভ, তোমাব কেমন লাগছে। এবাব ওদেব পেছনে লাগতে হবে। ভিভ বেষ মজা পাচ্ছ তো। শরীর খাবাপ লাগছে না তো?

‘না. না. আমি ঠিক আছি।’ আমি অধীর হয়ে বললাম। কী দনকাব ওদের পেছনে লাগাব। তোমাব ক্ষতি হতে পারে।

সে বেষ দৃঢ়ভাবে বললে — উই ওবা আমায় আব তোমাকে তো প্রায় খুন করেই ফেলেছিল। ওরা ফিরে এসে দেখবে ভেসপা টা নেই। ওদের ছেড়ে দেওয়া যাবেনা। ওদেব পেশাই হচ্ছে খুন করা। তার ওপর ওবা আমার সার্টটার সর্বনাশ কবেছে।

আমি তার দিকে হাত বাড়ালাম। ‘আমাকেও, তোমায় সাহায্য করতে দাও। খুব সাবধানে থাকবে। আমি একা থাকতে পাববনা। তোমাকে ছাড়া আমি কিছু কবতে পাবব না।

সে বেষ নিরুত্তাপ গলায় বললে — সোনা মেয়ে হাত ধরে ঝুলো না। আমায় যেতেই হবে। আমার কর্তব্য এটা। স্মিথ এন্ড ওয়েলসের পিস্তলটা আমায় দিল। তুমি এক কাজ কর, গাছপালার মধ্যে দিয়ে তিন নম্বর ঘরের দিকে চলে যাও। ওখানে থেকে লুকিয়ে সব নজর রাখবে। প্রয়োজনে তোমায় ডাকব। খুঁজে নেব। যদি আমার কিছু হয় তো হুদের ধার দিয়ে বেষ কিছু ছুটে যাবে। আগামীকাল পুলিশের অনেক লোক আসবে। তুমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমার সম্বন্ধে সব বলবে। তারা তোমাব কথা বিশ্বাস কববে। দেখ, আমাব সার্টে একটা সংখ্যা লেখা আছে, ০০৭। সংখ্যাটা মনে রাখার চেষ্টা কববে। যদি তাবা তর্ক করে তুমি সি. আই. এ. অর্থাৎ সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সিকে ফোন কববে। দেখবে সব ঘুরে গেছে।

॥ তেরো ॥

— ‘আচ্ছা আমি কে? কোথায় ছিলাম?’

ভগবান অথবা যে অদৃশ্য শক্তি, যিনিই আজকের বাতের পরিচালক, তিনিই ওর চিন্তা মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ও, ওসব কথা কেন বলল?

খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই জেমস বন্ড কথাগুলো বলেছে। যেমন, আচ্ছা বলেত এই আঙুলে কি ভেবেছি অথবা ইউরোপে ‘শী’ করতে যাবার সময় যখন ঢালু পথে নামে বন্ধুরা বলে ঘাড় মটকে এস — এই হল তাদের শুভেচ্ছা।

এই যে কথাটা — ‘পা আর ঘাড় ভেঙে এস’ এর ভেতরের কথা হচ্ছে তুমি সুস্থভাবে ফিরে এস। অশুভের বিপরীত শক্তিকে জাগরিত কবা। যেহেতু জেমস ইংরেজ তাই এবকম কথা সহজ ভাবে বলেছে। তবুও মন মানছে না — না বললেই ভালো হত। ওর কাজ বা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে বয়েছে পিস্তল, গুলি বা খুন। কিন্তু আমার তা নয়। তাই আমি আমার মনের দিক থেকে ওকেই দায়ী করব। না বললেই পার তো। শত্রুরা কি গুলি করার জন্য অপেক্ষা করছে। হঠাৎ পিস্তল গর্জে উঠবে আর চিৎকাব। সে কি এখন ঐ আঙনের লেলিহান শিখার ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে চলেছে!

এবড়ো-খবড়ো পাথরের দেওয়ালের সঙ্গে লেপটে আমি পা-পা করে তিন নম্বর ঘরের দিকে এগোতে লাগলাম। আর দেখছি অগ্নিদেব কেমন ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নেচে চলেছেন ঐ ঘবগুলো আব তার বাড়ির ওপর।

কাউকে সেখানে দেখতে পেলাম না। শুধুমাত্র অগ্নিদেবের নৃত্য। আর মাঝেমাঝে প্রবল বাতাস এসে সেই নৃত্যকে নতুন প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আশ-পাশের গাছে আঙুন ছড়িয়ে পড়ে তার ফলকি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রবল বাতাস না হলেও চামড়ার জ্যাকেট পরা একটা মেয়ে এই

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিরকালের মতো থেকে যেত। এই বড় কতটা সাহায্য করত? দশ, বিশ, ত্রিশ মাইল—? সাক্ষী থাকত কিছু গাছ, পাখি, কুইবেক থেকে আসা একটা মেয়েকে শেষ করে দিতে।

একের পর এক ছাদ ভেঙে পড়ছে। বার-বাড়ির কাঠের ছাদটা যেন একটা দেশলাই-এর বাজের মতো ধসে গেল। হলুদ রঙের আরও আগুনের ফুলকি চারধারে ছড়িয়ে পড়ল নাচতে নাচতে। তার পাশ দিয়ে দুটো গাড়ি দ্রুত পেলাম। খান্ডারবার্ড আর কালো লম্বা গাড়িটা। কিন্তু সেই গুস্তা দুটো বা জেমস বন্ড কারুরই দেখা পেলাম না।

ঘড়ি দেখলাম। রাত দুটো। অর্থাৎ পাঁচ ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। এটা যে আরও বেশ কয়েক সপ্তাহ আগের ঘটনা তা-ও মনে করতে অসুবিধা হল না। কাল বিকেলে যখন আমার ফেলে আসা জীবনের কথা মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল সেটাও বহুদিনের মনে করা যেতে পারে। এখনকার অবস্থা যেন একটা বিরাট প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার পরের ঘটনা। এ এমনই একটা ঘটনার সময় প্রতিটি মুহূর্ত খুবই সচেতনতার মধ্যে কাটাতে হবে, যেন জীবনের শেষ প্রান্তে আমরা উপস্থিত। কিন্তু সেই জায়গাটা কোথায় তা জানা নেই।

চারধারে আগুন জ্বলছে। সেই আভায় দেখলাম মোটা আর বেঁটে লোকদুটো একটা করে টিভি সেট নিয়ে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই ওগুলো বিক্রি করে কিছু টাকা পাবে। আমি আগে যদিকে ছিলাম সে দিকে যাবার সময় বার-বাড়ির দিকে চেয়ে দেখল যে, সেই জ্বলন্ত দেওয়ালটা হেলে পড়ছে কি না। এখন ওদের হাত জোড়া। এটাই তো ওদের ধরার মোক্ষম সময়। জেমস বন্ড গেল কোথায়?

আমি দেখলাম ওরা, আমি যে গাড়ি-ঘরটার আড়ালে রয়েছি, সেখানে এসেছে। মাত্র হাত চল্লিশেক দূরে। আমার সাদা ওভারকোট কি ওরা দেখতে পাবে? আরও অন্ধকারে ঢুকে গেলাম। আমি কি ওদের গিয়ে ধরব? যদি অসফল হই তবে তো আমার মৃত্যু অনিবার্য। দরকার নেই বোকামি করে। কিন্তু বন্ড কোথায়? এই সুবর্ণ সুযোগ হারালে ওরা তো পালাবে। জ্বলন্ত কেবিনগুলোর আলোর আভা ওদের যেমো মুখের ওপর পড়ে বীভৎস দেখাচ্ছে।

হাতে জিনিস দুটো নিয়ে ওরা এবার দাঁড়াল। হঠাৎ ওদের দুজনের মাঝখানে জেমস বন্ড তার পিস্তল নিয়ে এসে দাঁড়াল। ওরা হতভম্ব হয়ে গেছে। বন্ডের পিস্তল তাদের দিকে তাক করা। সে দৃঢ়কণ্ঠে যেন চাবুক মেরে বলল।

— ও এইসব ব্যাপার ঠিক আছে। ঘুরে দাঁড়াও। যে প্রথমে হাত থেকে জিনিস নামাবে তাকেই গুলি করব।

বন্ডের কথামতো ওরা ঘুরে দাঁড়াল আমি যদিকে রয়েছি। এমন সময় বন্ড আমায় ডাকল — ‘ভিভ, এদিকে এস। আমার লোকের দরকার।’

আমি আমার ভারী পিস্তলটা নিয়ে ঘাসের ওপর দৌড়ে এগিয়ে গেলাম। প্রায় বিশ হাত দূরে গেছি জেমস আমায় ওখানে দাঁড়াতে বলল। আমি দাঁড়লাম। যখন যা করার আমি বললে করবে। শয়তান দুটো ক্রুর দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। রোগাটা ভয়ে দাঁত বার করে ফেলেছে। স্ন্যাগাসি, গালাগাল দিচ্ছে। আমার খুব রাগ হচ্ছে। ওর পেটের কাছে ধরা টেলিভিশনটার দিকে পিস্তলের লক্ষ রেখে বললাম — বেশি বাজে কথা বলবেনা। চুপচাপ থাক। নইলে গুলি করতে বাধ্য হব।

স্ন্যাগাসি খানিকটা তাজিল্যের ভাবে বললে— ‘তুমি— তুমিতো গুলির আওয়াজে অজ্ঞান হয়ে পড়বে।’

জেমস ধমকে উঠল— বেশি কথা বলবে না— তাহলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। ভিভ, তুমি

হরর লোকটার পেছনে গিয়ে ওর পিঠে তোমার পিস্তলটা ঠেকিয়ে ওর বগলের তলায় হাত দিয়ে দেখবে যদি পিস্তল থাকে তবে যা করতে হয় বলব। অন্যটাকে আমি দেখছি। যদি কিছু উলটোপালটা করে তবে গুলি করতে দ্বিধা করবে না। কাজটা মোটেই সহজ নয়। তবে করতে হবে।

জেমসের কথামতো কাজ করলাম। ওর ডান বগলের তলায় হাত দিতে বিশ্রী দুর্গন্ধে নাকটা আমার সিঁটকে গেল। তাতে হয়তো আমার হাতটা কেঁপে গিয়ে থাকবে।

আর এই সুযোগে ও ওর হাতের টেলিভিশন সেটটা ফেলে দিয়ে চকিতে ঘুরে আমায় জাপটে ধরল আমার হাতে একটা চড় মেরে পিস্তলটা ফেলে দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে জেমসের পিস্তল থেকে একটা গুলি পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর আমিও রাফসের মতো, চড়, ঘুসি, খামচে ওর সঙ্গে লড়তে লাগলাম। আর ও-ও আমাকে আরও শক্তভাবে ধরে বললে — ঠিক আছে সাহেব। এবার মেয়েটা মরুক। তাই তো!

বুঝতে পারছি ও হাত দিয়ে পিস্তলটা নেবার চেষ্টা করছে। বন্দ বললে — ভিভ তোমার পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়াও।

তার কথামতো কাজ করলাম। পিস্তল গর্জে উঠল। রোগা লোকটা আমায় ছেড়ে দিল। হঠাৎ পেছনে হররা গুলির আওয়াজ পেলাম। সেই গুলি ছোড়ার সময়ে স্ল্যাগাসি নিজের মাথার ওপর দিয়ে টেলিভিশনটা ছুড়ে বন্ডের দিকে ছুঁড়েছিল। তাতে সে টাল সামলাতে পারল না।

স্ল্যাগাসি চিৎকার করে হররকে পালাতে বললে। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে পিস্তলটা তুলে স্ল্যাগাসিকে গুলি করলাম। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে গুলি লাগল না। সে দৌড়তে আরম্ভ করেছে। মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে যেন ফুটবল দিয়ে গোল করবে। রোগাটাও দৌড়ছে। আবার আমি গুলি ছুড়লাম। এটাও লাগল না। স্ল্যাগাসি এক নম্বর ঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

ছুটে জেমস বন্ডের কাছে গেলাম। দেখলাম তার চুলের নীচে বেশ বড়ো গোছের একটা ক্ষত। সে শপথ করতে লাগল। কিছু না বলে বার-বাড়ির কাচের জানালায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে ভেঙে ফেললাম। ভেতর থেকে গরমের আভাস পেলাম। তবে আগুন নেই। শয়তানগুলো টেবিল ব্যবহার করেছে দরজায় কাছে। বন্দ আমায় নিরস্ত হতে বললে। তার কথা না শুনে জানলার ফ্রেমে উঠে ভেতরে নেমে গিয়ে ফার্স্ট-এড বক্সটা কোনোরকমে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

যতটা সম্ভব ক্ষতটা পরিষ্কার করলাম। এক ফালি ব্যান্ড-এইড আর মার্খিওলেট বার করলাম। ক্ষত বেশি হয়নি বটে তবে শিগগির খারাপ হতে পারে। বন্দ দুঃখ প্রকাশ করল যে সে সুযোগ নষ্ট করেছে বলে।

আমার ভাবনার সঙ্গে ওর ভাবনার প্রায় মিল আছে। বললাম — ওর হাতে সেট ছিল তো গুলি করে মারা উচিত ছিল।

সে বলল — ঠিক, তবে ঠান্ডা মাথায় কথা সম্ভব হল না। ওর পা-টা উড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সামান্য ঘসটে গেছে। এবার তার সঙ্গে খেলা শুরু হবে।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম — আমার ভাগ্য ভালো যে, তুমি এই সময় এসে গেছ। আচ্ছা স্ল্যাগাসি তোমায় ছেড়ে দিল কেন?

— তোমার, আমার অনুমান প্রায় সমান সমান। আমার ধারণা এক নম্বর ঘরে ওদের যাবতীয় জিনিসপত্র আছে। এই আগুনের মাঝে বের হবার সময় তাজা কার্তুজ নিতে সাহস পায়নি। যাই হোক, আমাদের গাড়ির দিকে নজর রাখতে হবে। কারণ ওরা পালাবার চেষ্টা করবে। অবশ্য তার

আগে আমাদের ওবা মেৰে ফেলবাব চেপ্টা কববে। ওদেব সৰু আমাদেব যুদ্ধ শুব হুমে গোছ। খুব সাবধানে থাকতে হৰে।

বন্ডেব ক্ষত্ৰেব সেবা কৰে ব্যান্ড এইড লাগিয়ে দিলাম। বন্ড এক নম্বৰ ঘাবেল দিকে নজব বেখেছে বললে চলো, আমবা লুকিয়ে পডি। ওদেব কাছ আবও শক্তি-শক্তি আন্ত্ৰ থাকা আশ্চৰ্য কিছু নয়। ওবা সামলে নিয়েছে। তাবপৰ দাঁড়িয়ে উঠেই আমায় হাত বৰে টোনে সৰিয়ে দিলে। কাচ ভাঙাব শব্দ পেলাম। পবক্ষণেই মেশিনগানেব মতো কিছু থেকে অবিবান্ৰ এনিবয়ণেব আওযাজ কানে এল। আব সেওলো আমাদেব পেছন থেকে বাব বাডিব দিকেই য'গছ।

বন্ড আবাব দুঃখ প্ৰকাশ কৰে বলল ভিভ, সব উলটোপালটা হুমে যাচ্ছে। এস। একট বসে ভালো কৰ ভেবে নিই।

চিত্তাব সময় একটু বোঁশই লাগল। সামনে ফটাৰেব দিকে আমবা মেখানটায় লুবি যে আছি সেই দেওয়ালটা এখনও অক্ষত বয়েছে। কাৰণ বাতাস বইছিল তাব উলটো দিক দিয়ে। চাববাবে আওনেব লীলাখেলা অব্যাহত বয়েছে। প্ৰায় সব কেবিনই শেষ হুয়ে যাঁছিল। আওন এত জোৰে তাব লেলিহান শিখা আকাশেব দিকে মেলে ধবেছে যে, লেক জৰ্জ বা গ্ৰেন ফলস থেকে সেই আওন দেখা যাবে। কিন্তু এখনও কোনো সাহায্য পাওয়া গেল না। মনে হয ঝড়েব জন্য দমকল বাহিনী খুবই ব্যস্ত হুয়ে পড়েছে।

— এখন আমাদেব যা যা কবণীয় মন দিয়ে শোন, বন্ড বললে — তোমাকে এমন একটা জায়গায় থাকতে হৰে যেখন থেকে তুমি সাহায্য কবতে পাববে আব তোমাব ভাবনা আমায় ভাবতে হৰে না। আব আমাব নিশ্চিত ধাবণা যে, ওবা তোমাব ওপৰ আক্ৰমণ এবং আমি তোমায় বাঁচাতে ওদেব চলে যেতে সাহায্য কবব।

— তাই নাকি?

— ছেলেমানুষেব মতো কথা বলো না। এক কাজ কৰো — এই বাডিটাব আডাল দিয়ে বডো বাস্তায় গিয়ে দাঁডাবে আব ওদেব গাডিও ওপৰ নজব বাখবে। আব চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাব গুলি কবতে বলাব জন্য অপেক্ষা কববে। ঠিক আছে।

— আব তুমি?

— আমবা এখানেই থাকছি গাডিটাকে উদ্দেশ কৰে। যাতে ওবা আমায় দেখতে পায় আব আমাব দিকে এগিয়ে আসে। ওবাই তো আমাদেব খুঁজবে তাবপৰ পালাবে। চেপ্টা চলাক।

ঘডিতে এখন তিনটে বাজে। ভোব হতে আব দেবি নেই।

— এখনও দু ঘন্টা বাকি পাঁচটা বাজতে। ওবা দুজনে যদি দুদিক থেকে তোমায় আক্ৰমণ কৰে?

— একজন তো বেশ জখম হুয়েছে এক কাজ কৰো আমি ওদেব দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুৰিয়ে বাখছি। সেই ফাঁকে তুমি বাস্তা পাব হুয়ে যাও।

বন্ড বাডিটাব কোণ দিয়ে ঘুবে ডানদিকেব ঘব লক্ষ কৰে গুলি কৰে জানালাব শাৰ্চি ভেঙে দিল। পবমুহূৰ্তে সব মেশিনগানেব গুলিব বৃষ্টি হতে লাগল। জেমস পেছিয়ে এসেছে। বাডিটা পাব হুয়ে বাস্তা ক্ৰশ কৰে গাছেব পাশ দিয়ে গুলি চলতে লাগল। আমায় আদেশ কবল — 'এই সুযোগ'।

আমি বাব বাডি আব ওই ঘবগুলিব মধ্যে থেকে বাস্তা পাব হুয়ে গাছেব সাৰিব মধ্যে গিয়ে পডলাম। তাবপৰ ওদেব গুলিব আওযাজ। আমাব জুতোব ফিতে বেঁধে নিবেছি। আমি বনেব মধ্যে ঢুকে বাঁদিকে গেলাম। যখন বুঝলাম বেশ দুবড়ে এসে গেছি, এবাব ডডি মেৰে ওই

অগ্নিবলয়েৰ দিকে এগোৱে লাগলাম। ওদেৰ শাৰ্ভৰ সামনে গাছেৰ সান্ধৰ মখে এসে নিজেৰে লুকিয়ে বাখলাম। এই জায়গাটা প্ৰায় চম্পাশ হাত দুৰে আৰু এখানাতকৈ সৰ্ব্বাক্ষু ভালোভাবে দেখা যায়।

আকাশে এখন চাদ আৰু মেঘে লুকোচৰি খেলা চলছিল। তলে বাৰ বাডিৰ আলোই কেৱল দেখা যাচ্ছিল। চাদ এবাৰ পৰিষ্কাৰ। আৰু পৰিষ্কাৰ দেখতে পেলাম যে বোগা লোকটো সাপেৰ মতো বুকু হেঁটে গাডিৰ দিকে এগোছে। ৭ৰ হাতেৰ বন্দুকটা চাদেৰ আলোয় চিনতে অসুবিধে হল না।

আমি চলে আসাৰ জায়গায় বন্দু হাজিৰ। আৰু সে যাতো ওখান থেকে নডতে না পাবে, তাই স্নাগাসি হবদম গুলি কৰে যাচ্ছে। জেমস সেটা বুঝতে পৰে বাদিকে জ্বলন্ত বাডিটাব দিকে এগোৱে লাগল। পনেৰে নম্বৰ ঘৰেৰ সামনে শাসক এৰুখানিৰ জনো দেখতে পেলাম বসু আৰু নেই। মনে হয় পেছনেৰ গাছ পলাব মध्ये ঢুকে স্নাগাসিক। পছন থেকে আশ্ৰমণ কৰে।

দেখলাম বন্দু বাডিটাব কোণে এসে পড়েছে স্নাগাসি এবাৰ একটা কৰে গুলি না ছুড়ে তাৰ অ্যাটাৰ্চিটা উদ্দেশহীনভাবে চালিয়ে শেষ কৰল। আমি আৰু বন্দু যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেই দিকে।

আমাৰ নজৰ ছিল বোগা লোকটাব ওপৰ। সে প্ৰায় বাডিৰ কোণায় উপস্থিত। যখন দেখল আৰু কোনো গুলিৰ আওয়াজ নেই তখন কোনাব ঘৰে এসে দাঁডাল আৰু ইঙ্গিতে জানান দিল যে আমবা চলে গেছি।

এক নম্বৰ ঘৰেৰ দিক থেকে পৰপৰ দুটো গুলিৰ আওয়াজ। তাৰপৰই চিল চিৎকাৰ। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। স্নাগাসি তাৰ ডান হাতে মেশিনগান গায়েৰ সঙ্গে লেপটে বেখে মাঠেৰ মধ্য দিয়ে ছুটতে লাগল গুলি ছুডতে ছুডতে।

যন্ত্ৰণায় চিৎকাৰ কৰছে তবুও মেশিনগান থেকে গুলিবৰ্ষণ। স্নাগাসি ওৰ নিশানা ঠিক কৰে গুলি ছুডতে লাগল। বন্ডেৰ দিক থেকে সব নীৰব। কিছু পৰে একটা গাছেৰ আডাল থেকে আৰাব আওয়াজ। নিৰ্ঘাৎ সেই গুলি মেশিনগানে লেগে থাকবে তাই সেটা ফেলে দিয়ে স্নাগাসি ছুটে গেল বোগা লোকটাব কাছে যেখানে সে দুটো বন্দুক নিয়ে অপেক্ষা কৰছিল। মেশিনগানে কিছু গুণ্ডগোল থাকায় মাটিতে পড়েও সেখান থেকে গুলি বেৰ হতে থাকে। এমন সময় বোগা লোকটা গাডিৰ ড্ৰাইভাবেৰ সিটে বসে পড়েছে। গাডিতে স্টাৰ্ট দিয়েছে। ধোঁয়া বেৰ হচ্ছে। পাশেৰ দবজা খুলে দিল। স্নাগাসি ঢুকে পড়ে দবজা বন্ধ কৰল।

বন্ডেৰ জন্য আৰু অপেক্ষা না কৰে গাডিৰ কাৰ বৰাবৰ এসে আমিও গুলিবৰ্ষণ শুক কৰলাম। সেই গুলি গাডিতে লেগে থাকবে। আৰু কোনো শব্দ নেই। গাডিটা এলোমেলো ছুটতে লাগল। হঠাৎ একটা লম্বা বাক নিয়ে মাঠেৰ দিকে গেল। জেমসকে দেখলাম। সে ও অবিশ্ৰান্তভাবে গুলি ছুডতে লাগল। মনে হল বোধহয় তাকে চাপা দেবে। আমিও দৌড়ে গেলাম। ততক্ষণে গাডি তাৰ গিয়াৰ থেকে আওয়াজ কৰে বেবিয়ে গেল হুদেৰ দিকে।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে, গাডিটা হুদেৰ দিকে ছুটে চলেছে। সেখানে বাস্তাটা একটা পাহাডেৰ নীচে গিয়ে মিশেছে। পাশে হুদ। যাবা বনভোজন কৰে তাৰেৰ জন্য কিছু চেয়াৰ টেবিল বাখা আছে। তাৰ পাশ দিয়ে কোনো বকমে গিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ হাবিয়ে গাডিটা হুদেৰ মध्ये নেমে গেল। এগজস্ট পাইপ দিয়ে বেণ্ডনি বঙেৰ বুদ্ধবুদ্ধ ফুটে উঠল। জলেৰ ওপৰ একটা বিবাট আলোডন তুলল। তাৰপৰ ধীৰে ধীৰে গাডিটা ডুবে গেল। কেবল পেছনেৰ দিকটা আকাশেৰ দিকে চেয়ে বহিল।

বন্দু তাৰ চাখ বডো বডো কৰে আমাৰ দিকে দেখছে। তাৰপৰ আমাৰ কোমৰটা বেশ শক্ত

করে ধরে তার কাছে টেনে নিয়ে বলল — ভয় নেই। আমি এখনও আছি। হৃদের দিকে তাকিয়ে বলল— রোগা লোকটা, যে গাড়ি চালাচ্ছিল, তার গায়ে গুলি লেগেছে। ওর শরীরের পুরো চাপটা একসেলিটরের ওপর পড়েছে। তার কবরের ব্যবস্থা আপনাই হল। ওই দুটোই হচ্ছে শয়তান। এবার আমায় ছেড়ে পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রাখল। তার গা থেকে বারুদ আর ঘামের একটা মিশ্র মিষ্টি গন্ধ আমায় মোহিত করে দিল। আমি তাকে দু'হাত দিয়ে টেনে প্রাণ ভরে চুমু খেলাম। ঘাসের ওপর দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম। যুদ্ধক্ষেত্র এখন নিষ্প্রভ। ঘড়িতে এখন সাড়ে তিনটে। আমার মনে হল — আমার সব শেষ হয়ে গেছে।

আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বললে — বেনজিড্রিনের কাজ শেষ হয়েছে। এবার একটু ঘুমিয়ে বিশ্রাম করার প্রয়োজন। দুই আর তিন নম্বর এখনও অক্ষত। অসুবিধে হবে না নিশ্চয়।

আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেছি। বললাম — তোমার ভাবনা তোমার কাছে থাক। আজ রাতে আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না। তুমি যে কোনো একটা ঘর বেছে নাও। আমার বিছানা মাটিতে হবে।

জেমস আমায় আদর করে তার বুক টেনে নিল। বললে — তুমি যদি মাটিতে শোও, তবে আমারও তাই হবে। এসো তিন নম্বরটাই নিই। আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টিমি-ভরা হাসিতে বললে — 'নাকি দু'নম্বর?'

— না, তিন নম্বরই হবে আমার স্বর্গ।

॥ চোদ্দো ॥

তিন নম্বর ঘরই যখন আমার পছন্দ ভেতরে গিয়ে দেখলাম ঘরটা ভীষণ চাপা আর বাতাস নেই। জেমস বন্দ গাছের আড়ালে রাখা আমাদের জিনিসপত্র আনতে গেল। আর আমি জোড়া খাটের চাদরটা পালটে ফেললাম। ওর জন্য ঘরের কাজ করতে বেশ ভালোই লাগছিল। পরে বাথরুমে গিয়ে শাওয়ারটা পরীক্ষা করলাম — না ঠিক আছে। প্রথম দিকের ঘরগুলো জলাধারের কাছে রয়েছে অতএব জলও প্রচুর। নিজের সমস্ত জামাকাপড় খুলে ফেললাম। শাওয়ারের তলায় দাঁড়ালাম। 'ক্যামে' ফরাসি সুরভিযুক্ত সাবানের নতুন প্যাকেট খুলে সারা গায়ে বেশ ঘসে ঘসে মাখলাম। প্রচুর ফেনা হল। অবশ্য কাটা-ছড়া জায়গাগুলো বাদ দিয়ে।

শাওয়ারের নীচে জলের তলায় দাঁড়িয়ে আছি, সে যে ঢুকেছে খেয়ালই করিনি। হঠাৎ অনুভব করলাম দুটো বলিষ্ঠ হাত সুন্দর ভাবে আমার গায়ের ময়লা ধুয়ে দিতে সাহায্য করছে। আরও অনুভব করলাম আমার দেহে আর একটি নগ্ন শরীরের স্পর্শ।

ঘাড় ঘুরিয়ে তার বলিষ্ঠ মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠলাম। তার গা থেকে ঘাম আর বারুদের মিষ্টি গন্ধ পেলাম। এখন সব কিছুই ভালো লাগছে। সে আমায় তার বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেলল। আমাদের দুটো ঠোঁট দুজনে মিলিত হল নিজেদের মধুর আশ্বাদ নিতে। এই নেওয়ার যেন শেষ নেই।

শাওয়ারের জলের তলায় চোখ বন্ধ রাখতে হচ্ছিল।

আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমায় পাশে সরিয়ে আনল। আবার আমরা দুজনে দুজনকে বেশ মিষ্টি করে ধীরে ধীরে চুমু খেতে লাগলাম। জেমসের হাতটা এবার আমার সারা শরীরে তার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। আমার সারা শরীর শিরশির করে উঠল — তন্দ্রার মতো এসে যাচ্ছে। ভেতর থেকে যেন একটা সুপ্ত বাসনা মাথা চাড়া দিচ্ছে। সহ্য করতে পারছি না। বললাম — 'আঃ জেমস - লক্ষ্মীসোনা আমার। আব না'— আমি দাঁড়াতে পারছি না। তোমার ডাকাতিপনা সহ্য হচ্ছে না' ত, লক্ষ্মী না বৃকি আমার।'

বাথরুমে জ্যোৎস্নার আলোয় তাব চোখদুটো সুরু হয়ে হিংস্র লাগছিল। এখন সেটা হেসে উঠল।

— ভেরি সরি ভিভ, আমার হাত দুটো সময় বিশেষে আমার কথা শোনে না — তাবা বডো অবাধা হয়ে ওঠে, নিজেদের মতো কাজ করে। দেখ, আমার গায়ে কত ময়লা — সেগুলো পরিষ্কার করতে সাহায্য করছে না। এ কাজটা তোমাকেই করতে হবে।

হাসতে হাসতে তাকে শাওয়ারের নীচে নিয়ে এলাম। বললাম — বেশ তাই হবে। আমি কিন্তু আস্তে করতে পারব না — যখন আমার বারো বছর বয়স তখনই শেষ কাউকে স্নান করিয়েছি।

— কে সে?

— একটা টাটু ঘোড়া। আমি বুঝতে বা দেখতে পাচ্ছি না তোমার শরীরের কোথায় হাত দিচ্ছি কি না। — সাবান নিয়ে বললাম — মুখটা নীচে নামাও। যাতে তোমার চোখে বেশি সাবান না লাগে চেষ্টা করব।

— যদি লাগে-এ তবে—

হাত দিয়ে তার কথা বলা বন্ধ করে দিলাম। তার মুখ, চুল, বুক সব সাবান দিয়ে বেশ ভালো করে সাবান দিয়ে দিলাম। সে জলের পাইপ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি বললাম — এবার তোমার কাজ।

— উহ-উ-। এটা তোমাকেই কবতে হবে। হয়তো বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেল। তোমার নার্সের কাজ করতে হবে। তোমার জানা দরকার একজন পুরুষকে কীভাবে চান করাতে হয়। আচ্ছা, এটা কি সাবান? সুন্দর গন্ধ তো। গা থেকে যেন ক্রিপেট্রার গন্ধ পাচ্ছি।

— এটা একটা ফরাসি দামি গন্ধ লাগানো সাবান। অবশ্য প্যাকেটের ওপর তাই লেখা আছে। আব এর গন্ধটা তোমার বারুদের চেয়ে অনেক ভালো।

হেসে উঠে বলল — বেশ, তবে তাড়াতাড়ি করো।

অতএব আমার কাজ শুরু করলাম। নীচু হয়ে ওকে সাবান মাখাতে লাগলাম। হলে কী হবে। আবার আমরা দুজনে দুজনের মধ্যে বাঁধা পড়ে গেলাম। শাওয়ারের জলে দুজনের গায়ের সব ময়লা সাবান দিয়ে ধুয়ে যেতে লাগল। জল বন্ধ করে, তোয়ালে দিয়ে বহুক্ষণ ধরে আমার শরীর মুছিয়ে দিতে লাগল। আর আমিও তার হাতের ওপর হেলান দিয়ে তার মধুর স্পর্শ অনুভব করে যেতে লাগলাম। এরপর আমিও াকে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিলাম। আর দেরি করা মুর্খামি। তাই সে আমার নগ্ন শরীর তার কোলে তুলে নিয়ে শোবার ঘরে এসে বিছানায় শুইয়ে দিল। আর আমি আধ খোলা চোখ দিয়ে সে যে জানলায় পর্দা টানছে, দরজা বন্ধ করছে, তার সেই সুন্দর সুঠাম নগ্ন দেহটা চোখ ভরে দেখলাম।

সব দিক ঠিকঠাক করে সে আমাব পাশে এসে শুয়ে পড়ল।

তাঁব দুটো বলিষ্ঠ হাত আর ঠোঁট দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। আমি যখন বৃকে চেপে ধরে আলিঙ্গন করে রেখেছি মনে হচ্ছে কত স্নেহ ঝরছে। কিন্তু কর্মক্ষমতায় দারুণ হিংস্র, দারুণ পটু।

সে ধীরে ধীরে আমায় গ্রাস করতে লাগল। সেই গ্রাস থেকে নিজেকে মুক্ত করতে কোনো ইচ্ছেই হচ্ছে না। আরও গ্রাস করুক আমায়। সেই গ্রাস যে এত মধুর, এত মিষ্টি তা জানি না। মনে হচ্ছে ক্রমশ 'কোথায় যেন' ডুবে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে সে-ও আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই সেই 'কোথায় যেন' ডুবে যাচ্ছে। আমি সেই গ্রাস থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছি না। কিন্তু সেই গ্রাসের চরম মুহূর্ত যখন এল তখন আমি আব নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। আনন্দে কী না জানিনা কেঁদে ফেললাম। আমার হাতের নখ দিয়ে তাব পিঠে বিধিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হলাম যে, সে-ও আমাব সঙ্গে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। দুজনেই স্থির হলাম। সে বোধ হয় কিছু মিষ্টি কথা বলেছে,

খেয়াল নেই। আমায় আবার খুব মিস্তি কবে চুমু খেল। তারপর তার শরীরটা আমার শরীর থেকে তুলে নিয়ে পাশে স্থির হয়ে গুয়ে পড়ল। আমিও চিৎ হয়ে গুয়ে সুন্দর অঙ্ককারে তাব শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগলাম।

এই যে গ্রাসের স্বাদ এত মধুর, এত সুন্দর, এত আরামদায়ক, এর মধ্যে এত পরিপূর্ণতা আছে আমি আগে তা জানতাম না। পূর্বে ডেরেকের সঙ্গে রটা ছিল শুধু মিস্তি, কুরটের সঙ্গে রটা ঠান্ডা তবুও তৃপ্তি ছিল। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, ভিন্নস্বাদের। কারণ এ যে পূর্ণগ্রাস। শেষে বুঝলাম এই তৃপ্তি নিশ্চয়ই কারো কারো জীবনে ঘটতে পারে।

আমি এখন ভাবছি — এর কাছে, এর গ্রাসের কাছে আমি কী করে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করলাম, তা তো জানিনা। সময় মাত্র ছ'ঘণ্টার! আমি দেখলাম আমার চরম বিপদের সময়ে আমার সামনে আবির্ভূত হল। নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কৃপায়। পৃথিবীর মানচিত্রের বাইরে থেকে, কোনো নাম-না-জানা ভুলোক থেকে এক শাস্ত, সুন্দর অথচ বীর রাজপুত্র তার উল্লেখ্যক চেহারা নিয়ে যে আমায় উদ্ধার করেছে এক নরখাদকের কুটিল হাত থেকে। সে-তো তার গাড়ির চাকা বদলে নিজেকে বাঁচাবার জন্য চলে যেতে পারত। তা না করে, সে আমাকে বাঁচাবার জন্য এমনভাবে লড়াই করে গেল যেন সে নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত। তারপর যখন সেই নর-খাদক বিনাশ হল সে এল তার পুরস্কার নিতে — ‘আমাকে’। উঃ সে যে কী স্বস্তি, কী তৃপ্তি, তা আমি প্রকাশ করতে পারছিলাম। জানি সে কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে চলে যাবে — হয়তো কোনো রকম দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষমা প্রার্থনা করে। হয়তো বা কোনো প্রেম নিবেদনও করবে না। এটাই একটা ছোট্ট নাটকের শেষাংশ — ‘যবনিকা পতন’। সব শেষ হয়ে গেল।

এইসব চিন্তার মধ্যে আবার এল আমার পাশে যে সুন্দর বলিষ্ঠ, নগ্ন পুরুষটি আরামে ঘুমোচ্ছে, তাকে নিয়ে আমার এত নাটক করার কী আছে? সে তো একজন পেশাদার গুপ্তচর মাত্র। সাহসী, শক্তিশালী, ভালো বন্দুকবাজ, মানুষ খুন করতে ওস্তাদ। সেই সঙ্গে নারী মাংস পেলে তাকে চরমতম ভাবে উপভোগ করতে। এই সব গুণের অধিকারী যে, তার তো সেই রকম কাজের জন্য ডাক পড়ে। তার জন্য সে বেতন পায়। সে একজন গুপ্তচর যে আমায় ভালোবাসল, আমার মনের মহলে যার আগমন। সে কি আমায় ভালোবেসেছিল — না বোধ হয়। সে আমায় কেবল গ্রাস করেছে। পূর্ণভাবে গ্রাস করেছে। তাকে আমার জীবন-নাট্যের নায়ক ভাবব কেন? একটা জেদ চাপল — তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জিজ্ঞেস করি — আচ্ছা, তুমি তো সুন্দর, তুমি কি তোমার হৃদয় দিতে পার না?

আমি পাশ ফিরে গুয়ে দেখি সেই নগ্ন রাজপুত্রের ঘুমোচ্ছে। বাঁ হাতের ওপর মাথা, আর ডান হাত বালিশের নীচে বেখে। বাইরে চাঁদ উঠেছে আর নিক্ত জ্যোৎস্না বরনাধারার মতো ছড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের ঘরের দরজার লাল পর্দা ভেদ করে। তন্দ্রালু চোখ দেখে মনে হল প্রকৃতির কেন এই আয়োজন? বাইরের অশান্ত ঝড় এখন শান্ত হয়ে মৃদু সমীরণ হয়ে আসছে হৃদেব দিক থেকে। আয়-আয় ঘুম আয়।

এই সুন্দর চিন্তার জাল হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। দেখলাম জানলার লাল পর্দাটা ছিঁড়ে গেল। পাশে ঝুলে পড়ল — আর সেই ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একটা ওলকপির মতো ফ্যাকাসে মুখ।

ধারণা ছিল যে লেখকরা কল্পনা করে লেখেন — ‘গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে’। সেরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনও ছিল না। বালিশের কাছে একটা আঁচড়ানোর শব্দ পেলাম। শান্ত বাতাস আমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল।

চিৎকার করে তাকে জাগাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। আমি ভীত, আতঙ্কিত,

অসাড হয়ে পড়ে রয়েছি। আমি শুধু তাকিয়েই রইলাম। ভয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে দেখতে দেখতে আমার চোখ ব্যথা করতে লাগল। চলৎশক্তিবিহীন অবস্থায় পড়ে রইলাম।

ওই জন্তুর মতো মুখটা বিশ্রীভাবে দাঁত বার কবে হাসতে লাগল। তার দাঁত, মুখ আর চুলবিহীন মাথায় চাঁদের আলো পড়ে বাচ্চা ছেলের মতো দেখাচ্ছে।

সেই ভৃত্যুড়ে মুখটা ক্রমশ সমস্ত ঘরটা ভালোভাবে চেয়ে দেখল যে একটা শুভ্র চাদরের ওপর দুটো নগ্ন মানব-মানবী শুয়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে তার হাতটা ওপরে উঠল। একটা ধাতুর জিনিস দিয়ে জানলার শার্সি ভেঙে ফেলল।

সেই শব্দে আমার অসাডত্ব ঘুচে গেল। চিৎকার করে হাত দিয়ে তাকে জাগাতে গিয়ে দেখি সে জেগে গেছে কাচের শব্দে। সেই জন্তুর হাত থেকে গুলি বের হল বটে কিন্তু সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আবার জোড়া গুলি। আমার মাথাব পেছনে দেওয়ালে লাগল। ওলকপিষ মতো জন্তুব মুখটা সরে গেল।

— ভিভ, তুমি ঠিক আছো তো?’

তার জিজ্ঞাসার মধ্যে খুব ব্যস্ততা এবং উদ্ভিগ্নতা লক্ষ করলাম।

আমি যে অক্ষত রয়েছি সেটা বুঝেই সে চটপট উঠে পড়ল। ঘরের দরজা খুলে দিতেই একঝলক চাঁদের আলো ঘরে ঢুকল। সে এত নিঃশব্দে ছুটছিল যে, গাড়ি রাখার মসৃণ জায়গাতে তার পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। মনে হল দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গেছে। আমি চুপচাপ শুয়ে আছি বিস্ময়িত নয়নে। ভাবছি এটা বোধ হয় একটা ভূত।

শুয়ে শুয়ে এইসব ভাবছি। দেখি জেমস বন্দ ফিবে এসেছে। এসেই আমায় এক গ্রাস জল দিল, ঠিক যেমন বাবা-মা তাদের সন্তান ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ কেঁদে উঠলে করে। পরে একটা তোয়ালে নিয়ে জানলাব ধারে গিয়ে চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে জানলার ভাঙা শার্সিটা ঢেকে দিল। সমস্ত ঘরটা যেন আবার নতুন রূপ ফিরে পেল।

আমি তার নগ্ন সুঠাম চেহারা যেখানে পেশিগুলি তাদের কাজ করে যাচ্ছে, দেখতে লাগলাম। বললাম — জেমস, তুমি নজর রেখো যেন তোমার শরীরে কখনও চর্বি না লাগে।

জানলায় তোয়ালের পর্দা টাঙানোর পর বলল — না-না, মোটেই ঠিক নয়।

আবার চেয়ারটাকে স্বস্থানে বেখে তার পোশাকের পুঁটলিটা এনে পুরোনো ক্লিপ পালটে নতুন লাগিয়ে তার বালিশের নীচে রেখে দিল।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম — এঁ ভাবে তার ঘুমোবার কারণ। সে সব সময়ই বিপদের আশঙ্কা করে। যেন দমকল কর্মী। প্রতি মুহূর্তেই আশা করছে এই বোধহয় ডাক এল। এটাই ভাবছি।

চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। সে এসে আমার বিছানার ধারে বসল। সেই চাঁদের আলোতে তার মুখের রেখাগুলি খুবই শক্ত দেখাচ্ছিল। সে হাসল, কিন্তু রেখাগুলো তেমনই বইল। বললে — ‘আমি খুবই দুঃখিত ভিভ, আবার আমার জন্যই দুজনের মৃত্যু ঘটতে যাচ্ছিল। নিজেকে হারিয়ে ফেলছি। তাহলে তো আবার বিপদ আসবে। মনে করো গাড়িটা জলে পড়ে গেলেও গাড়িটার মাথাটা এবং পেছনটা জ্বলব ওপরেই ছিল। সেখান থেকে কাচ ভেঙে স্ল্যাগাসি এখানে এসেছে। যদিও তার শরীরে গুলির চোট রয়েছে। সে যে আসতে পারে এটা না চিন্তা করাটাই আমার বোকার মতো কাজ হয়েছে। যাক। ভোরবেলা আর বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করো না।

আমি যাতে ভয় না পাই — তাই সে আমার দিকে তাকাল — বললে — সত্যিই ভিভ আমি খুবই দুঃখিত। এরকম ঘটনা আবার ঘটা উচিত হয়নি।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাকে আমার দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম, তাব শরীর

ভীষণ ঠান্ডা লাগছে। তাকে জড়িয়ে ধরে আমি আবার চুমু খেলাম। বললাম — আমার জন্যই তোমার এই হাল। আমি না থাকলে তুমি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে না। আর তুমি না থাকলে আমি কখন মবে ভূতই শুধু হতাম না, আশুনে বলসে যেতাম। তোমার সবচেয়ে অসুবিধা যে তুমি ভালোভাবে ঘুমোতে পারোনি। তার পা ধরে আমি টানলাম।

সে-ই আমায় তার কাছে টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে সজোরে পিষতে লাগল।

আমাকে বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে সে তার বুকের মধ্যে আমায় চেপে ধরে রাখল। আমার শরীর থেকে উত্তাপ নিয়ে নিজেকে উষ্ণ করতে লাগল। পরে আমায় তুলে বিছানায় আলতো ভাবে বসিয়ে দিল। তারপর তার মধ্যে সেই আদিমতার প্রকাশ পেল। প্রায় নির্মমভাবে আমায় কাছে টেনে নিল। তাতে আমার শরীরের ভেতর থেকে আবাব ‘কী যেন একটা জিনিস’ বেরিয়ে এল। আমরা পাশাপাশি শুয়ে। আমার উদ্ধত স্তন দুটো তার বুকের উদ্দামতা গ্রহণ করল। আমিও আর ঠিক থাকতে পারলাম না। আমার ডান হাত দিয়ে তার মাথার এক গোছা চুল চেপে ধরলাম।

আমার হাতের মুঠো আলগা করলাম। জিজ্ঞেস করলাম — ‘আচ্ছা জেমস, বিস্বো মানে কি?’

— হঠাৎ। কেন?

— আগে জানি। পরে বলব।

— গুন্ডা-বদমাসদের পরিভাষায় এর অর্থ হল ‘গণিকা’। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে বললে।

— আমারও তাই মনে হয়েছিল।

— তোমায় কিন্তু সে রকম মনে হয়না।

— সত্যি বলছ। শপথ করে বল তুমি আমায় তা ভাবো না।

— শপথ করে বলছি তুমি একটি আদুরে পুতুল। তুমি আমার মুগ্ধবোধ।

— অর্থাৎ।

— অর্থাৎ, যে মেয়েকে দেখে কেউ মুগ্ধ হয়েছে। নাও, আর নয় এবার ঘুমোও।

সে আমায় বেশ মিষ্টিভাবে চুমু খেল। তারপর পাশ ফিরে শুলে। আমিও তাকে পেছন থেকে তাব পিঠ আর উরুর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

— বেশ সুন্দর ভাবে শোয়া হয়েছে কী বল? ঠিক যেন দুটো চামচে পাশাপাশি রয়েছে। তাই না! শুভরাত্রি জেমস।

॥ পনেরো ॥

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙলে দেখলাম আমার পাশে ফাঁকা। লাফিয়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দেখলাম তার গাড়ি নেই। সে চলে গেছে। শুধু পড়ে রয়েছে বিছানায় তাব শুয়ে থাকার খাঁজ আব বালিশে তাব দেহেব সুগন্ধ।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দু মুক্তোর মতো জ্বল জ্বল কবছে। দিনটা বেশ সুন্দর লাগছে। দেখলাম ঘর থেকে গাড়ি পর্যন্ত তার পায়ের ছাপ পড়েছে ঘাসের ওপর। একটা বিরহী ঘুমুর করুণ ডাক শোনা যাচ্ছে বনের কোনো গাছ থেকে। মোটেলটা একটা বীভৎস ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এখনও গুমরে গুমরে ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে।

ঘবে এসে শাওয়াবে স্নান সারলাম। দুটো ব্যাগে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে টেবিলের কাছে আসতে দেখলাম একটা চিঠি। নিয়ে বিছানায় বসে পড়তে শুরু কবলাম।

মোটেলের প্যাডেই লেখা। সুন্দর হাতের লেখা—

আমার প্রাণের ভিভ,

অম্মি তোমায় যে চিঠিটা লিখেছি, সেটা তুমি পুলিশকে দেখালেও দেখাতে পার। আমি বর্তমানে

গ্রেন-ফলসের দিকে যাচ্ছি পুলিশকে সব খবরাখবর দেওয়ার জন্য। আর রাস্তার ভ্রাম্যমাণ পুলিশকেও খবর দিচ্ছি। তারা তোমায় সাহায্য করবে। আমি ওয়াশিংটনেও যোগাযোগ করব। তারা নিশ্চিতভাবে এই ঘটনার ভার দেবে আলবেনির ওপর। আর তোমার বিবৃতি নিয়েই যাতে তাবা তোমায় ছেড়ে দেন, সে ব্যবস্থাও আমি করব। গ্রেন-ফলস থেকে আমার পরবর্তী কাজের খবর নেব। গাড়ির নম্বর নেব। তাই এখন থেকে আমায় যদি তোমার প্রয়োজন হয় বা কোনো সাহায্যের দরকার হয়, তবে তারা আমায় ঠিকই খুঁজে বার করবে। আব তোমার সকালের খাবারের জন্য ভ্রাম্যমাণ পুলিশকে এক ফ্লাস্ক কফি আর কিছু স্যান্ডউইচ পাঠাবারও ব্যবস্থা করব। আমি তোমার কাছে থাকতাম যদি মি. সানগুইনেত্তি আজ ওখানে আসতেন। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি আসবেন না। কাবণ তিনি তাঁবু বিশ্বস্ত অনুচরদের কাছ থেকে কোনো খবর পাবেন না। এবং সেই মুহূর্তে তিনি দক্ষিণ গামী কোনো প্লেনে উঠে পালাবেন। আমি আমার ধারণাব কথা ওয়াশিংটনকে জানালে তারা একটু চেষ্টা করলেই তাকে ধরতে পারবে এবং তার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। আর একটা কথা শোন, তুমি, আর কিছুটা আমি এই দুজনে বিমা কোম্পানির প্রায় পাঁচলক্ষ ডলার বাঁচিয়েছি। তার জন্য তারা বেশ ভালো রকমের পুরস্কার দেবে। কিন্তু আমি চাকরির শর্ত অনুযায়ী আমি কোনো রকম উপহার নিতে পারব না। যেহেতু তুমিই এই ঘটনার নায়িকা তাই কাগজে খুব হই-চই পড়বে এবং বিমা কোম্পানি সুবিচারই করবে। আর একটা কথা, আমি দেখব যাতে ঐ দুই গুন্ডার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয় বা তাদের মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। খুব সাবধানে বাকি পথ গাড়ি চালাবে। মনে করো কোনো রকম মোটর দুর্ঘটনায় পড়ে প্রাণে বেঁচে গেছ। এরকম ঘটনা জীবনে ঘটেই থাকে। আব দুঃস্বপ্ন দেখো না। তোমার চেহারার লাভ্য বজায় রেখে এগিয়ে যাও। আমাব সঙ্গে যোগাযোগ বা কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে নীচের ঠিকানায় তার বা চিঠি দিও।

অবধারক : প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

স্টোরিজ গোট,

লন্ডন

এস. ডব্লু.—১

তোমার চিরকালের

জ্জ. বি.

পুনঃ। দক্ষিণ দিকের পথে যাওয়ার জন্য তোমার টায়ারের হাওয়ার চাপ বড়ো বেশি। কম কবে নিতে ভুলনা।

গের্লেনের 'ফ্লোর দ্য আলপস' সাবানটা ব্যবহার করো, ক্যামের বদলে।'

বাইরে মোটর বাইকের আওয়াজ পেলাম। তাদের উপস্থিতির জন্য সাইরেন বাজাল। চিঠিটাতে একটা চুমু দিয়ে ওভারলের বুকের ভেতর পকেটে রেখে জিপ টেনে বাইরে এলাম।

রাজ-রক্ষী বাহিনীর দুজন তরুণ এসেছিলেন। এরা এত ভদ্র যে আমি আশা করতে পারিনি। আমি যেন কোনো রাজবংশের কেউ হব। সেহেতবে আমায় অভিবাদন করে বললে -- মিস ভিভিয়েন মিশেল? যিনি লেফটেন্যান্ট তিনিই আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন আর অন্যজন তাদের আগমন বার্তা বেতারে পাঠাচ্ছিলেন।

-- হ্যাঁ, আমিই ভিভিয়েন মিশেল।

-- আমি লেফটেন্যান্ট মরো। আপনি গত রাত্রে বিপদে পড়েছিলেন আমরা জানতে পেরেছি। তিনি দস্তানা পরা হাত দিয়ে ধ্বংসস্তুপের দিকে দেখিয়ে বললেন -- যা শুনেছি তা ঠিকই।

আমি খুব গুরুত্ব না দিয়ে বললাম — ‘ঠিক! হৃদের মধ্যে একটা গাড়ি আছে তার মধ্যে মৃতদেহ সমেত। আর একটা পাবেন তিন নম্বর ঘরের পেছনে।’

— ঠিক আছে মিস।

আমার কথা বলার ভঙ্গিতে বোধ হয় তিনি আপত্তির কিছু ছায়া দেখে থাকবেন। তাই তাঁর সহকারীকে বললেন — ‘ও’ ডানিয়েল এই মোটেলের চারদিকটা ভালোভাবে ঘুরে দেখে নাও একবার। আসুন, মিস মিশেল। আমরা কোথাও বসি।’

লেফটেন্যান্ট তাঁর মোটর সাইরেন কার থেকে একটা প্যাকেট বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন — ‘সামান্য কিছু আপনার ব্রেকফাস্টের জন্য এনেছি। বাদাম আর কফি। আশাকরি এতে আপনার হবে।’

তার দিকে চেয়ে হাসলাম, বললাম — ‘এক কাজ করি, চলুন হৃদের পাশে বসার অনেক টেবিল-চেয়ার আছে। সেখানে একটায় বসব, যেখান থেকে হৃদের মধ্যে ডুবে যাওয়া গাড়িটা দেখা যাবে না। সেই রকম একটা জায়গায় আমরা বসলাম। ভীষণ খিদে পেয়েছে।’

আমার খাবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য লেফটেন্যান্ট তাঁর নোট বই আর পেনসিল বার করে কিছু পড়তে লাগলেন।

এই প্রথম তিনি মুখ তুলে আমার দিকে থামলেন — এখন এদের নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আর আমি কোনো বিবৃতিও নেব না। যেটা নেবেন ক্যাপ্টেন, যে কোনো সময় এসে পড়তে পারেন। আমি আগেই কিছু সংবাদ সংগ্রহ করেছি। তাঁদের জরুরি তলব পাওয়ার আগে। আর সবচেয়ে অস্বস্তি এই বেতার থেকে রেহাই পাচ্ছি না। ন’ নম্বর সড়ক দিয়ে আমি বাইকের স্পিড মোটেই তুলতে পারছি না, কারণ তাহলে বেতার-বার্তা শোনা যাবে না। এত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এর আগে আমি পাইনি। গ্রেন ফল্‌স এই খবর পাওয়ামাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওয়াশিংটন কীভাবে এতে জড়িয়ে পড়ল সে বিষয়ে আপনি কি কিছু জানেন?

আমার হাসি পেয়ে গেল তাঁর আগ্রহ দেখে। তিনি চিৎকার করে ও’ড্যানিয়েলকে বলছেন — কী সাংঘাতিক! এখন যে কোনো মুহূর্তে জর্জ কেনেডিও এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে ফেলবেন। আমি বললাম — ‘জেমস বন্ড নামে এক ভদ্রলোক যিনি গুপ্ত বিভাগে বা ঐ জাতীয় গোয়েন্দা ধরনের কাজ করে টরেন্টো থেকে ওয়াশিংটনে তাঁর বিবৃতি দিতে যাওয়ার সময় তাঁর টায়ার ফেঁসে যায়। তিনি এখানে আশ্রয় নেন। তিনিই আমায় বাঁচিয়েছিলেন — না হলে আমার মৃতদেহ এখানে ভাসত। তিনি আমায় বলেছিলেন মিস্টার সানগুইনেস্তি মেস্কিকো বা অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চান। তাঁর সম্বন্ধে যা জানি, তা হল এই। এর বেশি কিছু বলতে বললে বলব — তিনি একজন ভীষণ চমৎকার লোক।’

লেফটেন্যান্টের দৃষ্টি সহানুভূতি সূচক।

— আমারও তাই মনে হয়েছিল মিস। তিনিই আপনাকে বাঁচিয়েছেন। আমার মনে হয় তাঁর সঙ্গে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ আছে — তাই এরকম একটা আঞ্চলিক ঘটনা এতটা গুরুত্ব পেয়েছে।

হঠাৎ রাস্তা থেকে সাইরেনের আওয়াজ আসতেই লেফটেন্যান্ট মরো উঠে মাথায় টুপি পরে বললেন — ‘দেখুন মিস আপনাকে ধন্যবাদ। আমি শুধু আমার নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য আপনার কাছে এসব জানলাম। কিছু মনে করবেন না।’ ইতিমধ্যে ও’ ডানিয়েল এসে গেছে। তাকে নিয়ে সরে গিয়ে তার বিবরণ শুনতে লাগলেন। আর এই ফাঁকে আমি কফিটা শেষ করে আস্তে আস্তে খেতে খেতে দক্ষিণ থেকে ছুটে আসা একটা চলন্ত আন্টারবোর্ড আর তার স্টিয়ারিং-এ বসা তাব্রাড হাত দেখে তার কথা ভাবলাম।

দেখা গেল পাইন গাছের মধ্যকার পথ দিয়ে একটা বিরাট সৈন্যবাহিনী এসে হাজিবে। অ্যান্ডুলেস, দুটি পুলিশের গাড়ি, মাল বইবার ট্রাক সব আমায় ছাড়িয়ে হ্রদের দিকে চলে গেল। তারা তাদের ওপর যা নির্দেশ আছে সেই মতোই কাজ করবে। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা জলপাই সবুজ অথবা গাঢ় নীল পোশাক পরা মূর্তিতে ভবে গেল।

ঠিক ছায়াছবির গোয়েন্দাদের ক্যাপ্টেনের মতো বলিষ্ঠ চেহারা, ধীর ভাবে হাঁটা এবং মমতা ভবা মুখ নিয়ে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য এলেন, সঙ্গে তাঁর এক ঝাঁক স্টেনোগ্রাফার।

— সুপ্রভাত মিস মিশেল। আমি ক্যাপ্টেন, স্টেনেব গ্রেন ফলস্ থেকে আসছি। আমাদের কথা বলার জন্যে কোনো ঘরে যাবেন, না, এখানে বাইরে কোথাও?

— কেবিনের মধ্যে যাবার আমার আর ইচ্ছে নেই। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তবে, আমার ওই ব্রেকফাস্ট খাওয়ার টেবিলে বসেই বলা যেতে পারে। আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করার জন্যে। ওরা না আসা পর্যন্ত আমি অভুক্ত ছিলাম।

ক্যাপ্টেন হাঁ হাঁ করে উঠলেন — না, না, ধন্যবাদ যদি দিতেই হয় তো আপনার ইংরেজ বন্ধু কম্যান্ডার বস্কে। অন্য সব পরামর্শের সঙ্গে তিনি এটাও দিয়েছিলেন।

আচ্ছা! আমি যেটা পছন্দ করি উনি সেটাই — অর্থাৎ কমান্ডার! একজন ইংরেজ উচ্চপদে সি. আই. এ. এবং গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি। সেই জন্যেই সাধারণ পুলিশ এতটা গুরুত্ব দিয়েছে। মনে মনে ঠিক করলাম আমার কথা বলার ধরন হবে একজন বিশিষ্ট কূটনীতিবিদের মতো।

আমরা বসার পর মামুলি কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর সমস্ত ঘটনাটা সম্বন্ধে আমায় বলতে বলা হল।

সমস্ত ঘটনাটা বিশদভাবে বলতে আমার প্রায় দুঘন্টা সময় লাগল।

ক্যাপ্টেনের সহকর্মীরা আমাদের প্রশ্নোত্তরের মাঝে এসে চুপিচুপি তাঁর কানে কী সব বলে যাচ্ছিল। আমি বেশ ক্লান্ত বোধ করছিলাম। কফি, সিগারেট, আমার জন্য, ক্যাপ্টেন ডিউটি থাকাকালীন ধূমপান করেন না, এর পর আমাদের বিশ্রামের পালা। স্টেনোরা অন্যদিকে চলে গেল। লেফটেন্যান্ট মরোকে ডেকে ক্যাপ্টেন ওধারে সরে গিয়ে বেতারে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। জল থেকে সেই ভাঙা গাড়িটা তুলে মাঠের মধ্যে দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এসবই দেখছিলাম।

জল থেকে তোলা গাড়িটার পাশে অ্যান্ডুলেসটাকে নিয়ে যাওয়া হল। ওই গাড়ি থেকে একটা তাল মতো জিনিস মাটিতে শুইয়ে রাখা হল। ঘেঞ্জায় আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। মনে পড়ল হররের সেই লাল বীভৎস চোখদুটো। তার নোংরা স্পর্শ। এটা যে সত্যি মনে করতে দ্বিধা লাগছে।

ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিতে শুনলাম যে, ওই রিপোর্ট আলবেনি এবং ওয়াশিংটন যাবে। তারপর আমার সামনে এসে বসলেন।

আমার বিবরণ দেওয়াটাকে তিনি খুব প্রশংসার চোখে দেখেছেন এবং আমি বিনয়ের সঙ্গে এড়িয়ে গেলাম। পরে এখান থেকে আমার মুক্তি পাওয়ার সময়টা তাঁর কাছে জানতে চাইলাম।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলাম না। দেখলাম মাথার টুপি টেবিলে রেখে একটা পায়ের ওপর

অপরটা তুলে হেলান দিয়ে বেশ আরাম করে বসলেন। পকেট থেকে সিগারেট বের করে একটা আমায় দিয়ে নিজে একটা ধরালেন তাঁর লাইটার দিয়ে। হেসে বললেন — ‘আমার ছুটি। ডিউটি শেষ। এখন দেখে মনে হচ্ছে একজন মধ্যবয়স্ক সাংসারিক ভদ্রলোক। আরাম করে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন —

- মিস মিশেল আপনার ইংরেজ বন্ধু কম্যান্ডার বন্ড আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাতে ছেড়ে দেওয়া যায়, তার জন্য আমাদের বলেছেন আর আমিও তাঁর কথামতো যথা সম্ভব অল্প স্বল্প জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। ওই দুই গুন্ডার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা বুলছে। আপনি যেকোনো সময়ে যেতে পারেন।

আপনি খুবই সাহসী। না হলে ঐ রকম পরিস্থিতিতে নিজেকে লড়াই করে বাঁচাতে পারতেন না। আমি আপনার নাম পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করব। মনে হয় বিমা কোম্পানিও সঠিক বিচার করবেন।

জালিয়াতি এবং গভীর বড়বস্ত্রের অপরাধে ওই ফ্যান্সি দম্পতিকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কম্যান্ডার বন্ডের কথামতো দেখা গেল মিস্টার সানগুইনেত্তি সকাল থেকে বেপান্ডা। ট্রয়ে আমরা খোঁজ করেছি। পুলিশের সব বিভাগকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। তিনি ধরা পড়লে সাক্ষী হিসেবে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। অবশ্য আপনারা আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়া সব কিছুই বায়ভার সরকার বহন করবে।’ ক্যাপ্টেন তার সিগারেটের শেষাংশ ফেলে বললেন, ‘পুলিশ তার পথে চলবে। কিন্তু এই কেসটার শেষ বেশ জমাটে হল না। তিনি আমার দিকে কী রকম ভাবে তাকালেন। ‘আমি এখন ডিউটির বাইরে। এখানে এখন শুধু আপনি আর আমি।’

নিজেকে বেশ শক্ত দেখালেও ভাবছি এ কথার অর্থ কী? •

-- কম্যান্ডার আমায় বলেছিলেন যে, তিনি ভোরবেলায় আপনাকে না জানিয়ে চলে গেছেন। মনে হয় ভোর ছটায়। আচ্ছা, তিনি কি আপনাকে কোনো নির্দেশ দিয়ে গেছেন চিঠি মারফত। কম্যান্ডার আর আপনার কথায় বোঝা যাচ্ছে যে, গতরাতে আপনি এবং তিনি একই ঘরে ছিলেন। অবশ্য এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ ওই রকম একটা ভয়ানক রাত্রিতে এছাড়াই বা কী করা যায়। আচ্ছা, তাঁর সঙ্গে কি আপনার কোনো রকম মন কষাকষি হয়েছিল? আশাকরি আমার কথার অর্থ বুঝতে পারছেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, দৃষ্টিতে ক্ষমা প্রার্থনার ইস্তিহা।

ছি, ছি, কী লজ্জার কথা। লজ্জায় আমার মুখ নিশ্চয়ই লাল হয়ে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে বলি — ‘না, না ক্যাপ্টেন সাহেব। আপনি যা যা বললেন তা-ই-ই তিনি লিখে গেছেন। সেই জন্যে আর চিঠিটা দেখাই নি।’ সামনের জিপটা খুলে ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে লজ্জার সঙ্গে তাঁর হাতে দিলাম।

চিঠিটা পড়ে আমায় ফেরত দিয়ে বললেন — ‘সবই কাজের কথা। ভারী সুন্দর চিঠি। আচ্ছা, ওই সাবানের ব্যাপারটা তো বুঝলাম না।’

হেসে ছোট্ট করে বললাম — ‘ওটা একটা ঠাট্টা মাত্র, আসলে ওই সাবানটার গন্ধটা বড়ো চড়া।’

তিনি আমার দিকে চেয়ে আছেন — তাঁর দৃষ্টিটা যেন বড়ো কোমল, করুণা মাখানো। তিনি বললেন — ‘দেখুন আমি যদি ঠিক সময়ে বিয়ে করতাম তবে আপনি আমার নাতনির মতো হতেন। যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে, বা কিছু মনে না করেন, তবে আপনাকে আমার মেয়ের মতো মনে করে দু-একটা ব্যক্তিগত আলোচনা করতে পারি?’

— আপনার যা খুশি প্রশ্ন করতে পারেন, আপত্তির আর কি আছে?

— কম্যান্ডার সাহেবেব কথাই ঠিক মিস মিশেল। সত্যিই আপনি একটা মোটর দুর্ঘটনায় পড়েন, তার জন্য দুঃস্বপ্ন দেখবেন না। এছাড়াও অন্য কিছুর গন্ধ আমি পাচ্ছি। আপনি হঠাৎ করে একটা অপরাধ জগতের গুহায় পড়েছেন, সেখানে আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন - আর সিনেমা বমতো, তা আপনারা যেমন পড়েন, সেইরকমভাবেই পুলিশ এসে এক কুমারী কন্যাকে উদ্ধার করল।

এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে আমার চোখের দিকে তাকালেন।

আপনি এবং কম্যান্ডার বন্ড যে গত রাতে বেশ সুন্দর মধুর রাত কাটিয়েছেন এটা আমি জানতে পারছি আমার অধস্তন কর্মচারীদের রিপোর্টেব ভিত্তিতে। অবশ্যই তারা খুবই বিশ্বাসী। অবশ্য এসব জানা আমাদের কাজ নয়। তবে এটা তো ঠিক যে, যে সুদর্শন যুবক নিজের জীবন বিপন্ন করেও ভনোপলির জীবন রক্ষা করলেন — তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা তো হৃদয়ের ব্যাপাব ঘটতে পারে।' যদিও পিতৃসুলভ আচরণ, কথাবার্তা, তবুও তাঁর কথার আড়ালে কি কোনো ব্যঙ্গ উঁকি মারছে? উপন্যাস বা সিনেমায় যেমন উপসংহারটা বেশ মধুরভাবে ঘটে, তখন বাস্তব জীবনেই বা তাব দোষ কোথায়?

পরিশেষে আপনার জন্যে একটা চিন্তা রেখে যেতে ইচ্ছে করছে— ওয়াশিংটনে কম্যান্ডার বন্ডের সম্বন্ধে। কথা বলে যা জেনেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, তিনি জেমস বন্ডই হোন বা স্ল্যাগাসিই হোন, দুজনেই এক গভীর অরণ্যের বাসিন্দা, এরা কিন্তু আপনার জন্য নয়। কয়েক ঘণ্টা আপনি তার মধ্যে থেকেছেন আবার বেরিয়েও এসেছেন। এর জন্য কাউকে নিয়ে সুখস্বপ্ন বা বিপরীতকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। এরা সম্পূর্ণ অন্য গ্রহের বাসিন্দা।' আমি চুপচাপ থাকছি দেখে তিনি উঠে পড়ে বললেন — 'এবার তাহলে ওঠা যাক।'

দুজনে উঠে পড়লাম। কী বলব বুঝতে পারছি না। মোটেলের দরজায় জেমস বন্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে এল -- 'ওঃ ভগবান এরা সবাই একই গোত্রের। ওর মধুর হাসি, ডালি ডালি চুমু, আমায় তার দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকা, সবই মনের মধ্যে এসে পড়ছে। ওই সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, মমতায় ভরা মন নিয়ে যে এসেছিল, তার পাশে অনুগত মেয়ের মতো হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি — দ্য ড্রিমি পাইনস মোটর কোর্টের থেকে একলা দূরে কোথাও গিয়ে বেশ পেট পুরে একটি দুপুবের খাওয়া আর তারপর আরাম করে একটা বেশ বড়ো করে ঘুম।

ওখান থেকে বের হলাম বেলা বারোটোর পর। ক্যাপ্টেন স্টোনর আমায় কথা দিয়ে ছিলেন যে, তিনি দেখবেন যাতে সাংবাদিকরা আমায় বেশি বিরক্ত না করে। জেমস বন্ডের সম্বন্ধে যা জানার আমি জানতে পারি কেবল তার পেশা এবং ঠিকানা ছাড়া। একজন সত্যি ভদ্রলোক ঠিক সময়ে আবির্ভাব হলেন আবার চলেও গেলেন।

তরুণ লেফটেন্যান্ট মরো আমার সব জিনিসপত্র নৈঁধে, আমার ভেসপাটাকে রাস্তায় এনে দাঁড় করালেন। যাবার সময় তিনি বললেন — 'দেখুন মিস, গ্রেন-ফলস পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তাটায় বেশ গর্ত আছে। আর তার মধ্যে কয়েকটি এত বড়ো যে, তার মধ্যে কোনো লোক আগেই তার স্কুটার নিয়ে পড়ে আছে। অতএব সেখানে এসেই আগে হর্ন বাজাবেন। শুধু একটু হাসলাম। এই তরুণটি তার চাকবিব মতো দুঃসাহসী এবং দুর্দান্ত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখব ভাবছি সে-ও তো সেই জাতের।

আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন স্টোনরকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালাম। নিজের যদি কোনো বোকামি ধরা পড়ে তাই মাথায় হেলমেট পরে বড়ো সানগ্লাসটা চোখের সামনে নামিয়ে নিয়ে আমার ভেসপার কাছে এগিয়ে এলাম। পেছনের চাকাটা স্ট্যান্ডের ওপর যেমন আছে তেমনি

রেখে গাড়িতে বসে পা দিয়ে স্টার্ট দিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি গর্জে উঠল। গিয়াব দিলাম – কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘন্টায় চল্লিশ মাইল গতিতে আমার ভেসপা স্ট্যান্ড থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়ল। চারদিকে ধুলো উড়িয়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। সামনের রাস্তাব অবস্থাটা দেখে নিয়ে পেছন ফিরে হাত তুলে সবাইকে বিদায় জানালাম। সমস্ত রক্ষীবাহিনীও তাদের হাত তুলে ঢেউ খেলিয়ে তার প্রত্যভিনন্দন দিল। গাড়ি ছুটে চলেছে। দু'ধারে পাইন গাছগুলো গ্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমায় ক্ষতি স্বীকার না করিয়ে ছেড়ে দেওয়াতে তরুকুল মনঃক্ষুণ্ণ।

ক্ষতিবিহীন? ক্ষতচিহ্ন বলতে গোয়েন্দাদের ক্যাপ্টেন কী বলতে চেয়েছে, বিশ্বাস করিনি। ক্ষতচিহ্ন সেটা আতঙ্কের। তাকে মুছিয়ে দিয়েছিল সে। যে বালিশের তলায় হাতে রিভলবার নিয়ে গুত। একটি সংখ্যাই যথেষ্ট তাকে চিনতে, সেই গুপ্তচরকে। কী তার কাজ, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তার সংখ্যা মনে নেই। তবে আমার অজানা নয় তার কাজ কী? কে সে? এবং তাব সবকিছুই ধরা পড়ে রয়েছে আমার বিশাল ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে।

ডায়মন্ডস আর ফর এভার

॥ এক ॥

জঙ্গলের মধ্যে এদিক ওদিক ছোটো ছোটো ঝোপঝাড়। একদিকে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে একটা ঘন কাঁটাগাছের ঝোপ। হাওয়াতে কাঁটাঝোপের সরু সরু ডালপালাগুলি নড়ছে। ভালো করে কান পাতলে মৃদু বয়ে চলা বাতাসের মধ্যেও একটা শব্দ কিন্তু মাঝেমাঝেই হচ্ছে।

এখন সন্ধ্যা। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে ওই কাঁটাঝোপটার মধ্যেও। দেখা গেল একটা গর্তের মধ্য থেকে শরীরের সম্মুখভাগ বার করে যে জীবটি নিজেকে দেখা দিচ্ছে, সেটা ভয়ংকর বিচ্ছে— প্যাণ্ডিনাস। ঘন কালো ছ-ইঞ্চি আকৃতি, সামান্য নীলাভ; ল্যাজের কাছে ছিল, পেটের নীচে বিষের থলি। তার লক্ষ্য, এই মুহূর্তে, এক ফুট দূরে একটা গুবরে পোকা।

বেশি দেরি নয়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে শিকারের উপর ঝাঁপ দিল। জড়িয়ে ধরল পোকাটাকে, বিদ্ধ হল তীক্ষ্ণ ছল— এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। পাঁচ মিনিট পরে সে যখন নিশ্চিত যে শিকার এখন প্রাণহীন, তখন থাবার প্যাঁচ আলগা করে দুটো ছোটো ছোটো দাঁত দিয়ে বেশ আনন্দের সাথে তার খাদ্য ভক্ষণ করল।

এই জায়গাটা ফ্রেঞ্চ গিনির দক্ষিণ-পশ্চিমে। কিসিভোজ থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। রুক্ষ-জংলী পাহাড়ি এলাকা। প্রায় মরুভূমি। ওটা কাঁটাঝোপটার হলুদ-সবুজ— বেশ উঁচু ঝোপটা। উত্তরে সাইবেরিয়া, পূবে সিয়ারা লিওন। বোধহয় অনেকটা মাটি খুঁড়লে জল পাওয়া যাবে।

ওপারেই সেফাদু-র বিশাল হীরক খনি-অঞ্চল। তার মালিক সিয়েরা ইন্টারন্যাশনাল। এটা অবশ্য আফ্রিকা ইন্টারন্যাশনাল-এর খনি সাম্রাজ্যের অংশ। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর অর্থনৈতিক ভাগ্য এর সঙ্গে যুক্ত।

বিছের আহার-পর্ব শেষ। হঠাৎ একটা পাথর এসে তাকে খেঁতলে দেয়।

একটা লোক, খাকি প্যান্ট। দূরে একটা মোটর সাইকেল। সে-ই ‘কালেশয়তান’ বলে চিৎকার করে পাথরটা ছুঁড়ে বিছেটাকে পিষ্টে মেরেছিল। লোকটা তার মোটর সাইকেলের বাস্ক থেকে একটা মোড়ক তুলে নেয়, ইলেকট্রিক টর্চ বের করে। জায়গাটার তিন কোণে তিনটে টর্চের গোড়া পুতে আলোকিত করে। অন্য কোণে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন অপেক্ষা করছে।

তার মাথার উপর একটা হেলিকপ্টার। চালক ও তার মধ্যে আলোর সিগন্যাল বিনিময় হয়। হেলিকপ্টার এবার মাটিতে নামে।

ঝিঝির ডাক ছাড়া সমস্ত জায়গাটা নিস্তব্ধ। রাতপাখি উড়ে যায়। পাইলট অ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে।

হেলিকপ্টার আধঘন্টা দেরিতে এসেছে। লোকটি তাই অনুযোগ জানায়। একদা জার্মান সৈনিক এই লোকটি আফ্রিকানদের মোটেই পছন্দ করে না। তবু সামান্য অভিবাদনের ভঙ্গিতে হাত তোলে। পাইলট বলে—সব ঠিক ঠিক মনে আছে?

—আরে, তুমিই তো দেরি করলে? রাতের অন্ধকারেই আমাকে বর্ডার পেরোতে হবে। দেরি হয়ে গেল।

— স্যারি! মালটা পেয়েছ?

-- হ্যাঁ।

— দাও তাহলে।

পকেট থেকে সেই মোড়কটা বের করে পাইলটকে দেয়।

-- বাঃ। ও কে! আমি চলি।

পাইলট হেলিকপ্টারের দিকে এগোয়।

বোঝা যায়, লোকটি হিরের স্বাগলার। চোরা-চালানে পাকা হাত।

— একটা কথা! — সে বলে।

— আবার কী?

-- খনিতে দিন দিন সমস্যা বাড়ছে। লন্ডন থেকে একটা ডিটেকটিভ এসেছে, নাম সিলেটা। ডায়মন্ড কর্পোরেশন ওকে এনগেজ করেছে। নিয়মকানুন খুব কড়া হয়েছে। শাস্তিও বেড়েছে। আমার দলের লোকেরাও ভয় পাচ্ছে। ধরা পড়লে আড়ৎ-ধোলাই খাবে, সব ফাঁস করে দেবে তখন।

-- এসব এ-বি-সি কে জানিয়েছ?

— তোমাকেই জানাচ্ছি। চাইছি, ওরাও জানুক যে, বিষয়টা এখন বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিলেটা সম্পর্কেও খবর নিক। বার্ষিক রিপোর্ট-টা দেখুক। খনিগুলো বছরে কুড়িলক্ষ পাউন্ড লোকসানে চলছে। সরকার এখন কড়া হাতে আটকাবে, মানে, আমাকেই টাইট দেবে। এই আর কি!

--- তুমি কি আরও টাকা চাইছ?

--- হ্যাঁ, মাল আমার শেয়ার অস্তুত কুড়ি পার্সেন্ট বেশি করো।

-- বেশ। তোমার কথাটা আমি ডাকার-কে বলব। ওরা উচিত মনে করলে লন্ডনকে জানাবে। আমার নিজের কিছু করার নেই।... অবশ্য, আমি বলে এখনি চাপ দিতাম না। ওরা তো এমনিতে খুব নির্মম হয়েছে। ইতিমধ্যে, ওরা তিনজনকে শেষ করেছে— এই ধরনের অপরাধেই— টাকা খাওয়া, মাল চুরি। তোমার একজন ক্লায়েন্ট অদ্ভুত শোচনীয় দুর্ঘটনায় মারা যায়। সবই তো তুমি জান!

— সেই জন্যেই তো বলছি। কিছু পাউন্ড বাড়াতেনই হবে। আমারও তো খরচ বাড়ছে! না হলে..... থাকবে.... এসো, সিঁড়িটা তোল।

পাইলট উড়ে যায়। পুব দিকে য়োরে। লোকটা দেখতে থাকে। ঐ মুহূর্তে এক লক্ষ পাউন্ডের হিরেও উড়ে গেল! গত একমাস ধরে চোরাই পথে খনি থেকে সংগৃহীত! দাঁতের ডাক্তারের সাহায্য নিতে হয়েছে। হিরের নকল দাঁত! গুণতি হয়। ৫০, ৭৫, ১০০।

বেদম কড়াকড়ি খনিতে। কাউকে বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। একটুকরো বের করা প্রায় অসম্ভব! সন্দেহ হলে, পেটে পুরেছে কিনা দেখা হয় ক্যাস্টার ওয়েল খাইয়ে, মলত্যাগ কবিয়ে! কতরকম পরীক্ষা আছে। আর ধরা পড়লে তো—

সীমাস্তরের দিকে এগোয় লোকটা। ওপরে সিয়েরা লিয়োন। উঁচু-নীচু জমি দিয়ে মোটর সাইকেল ছোটো। আর দশ মাইল যেতে হবে রাত ফুরাবার আগে। এক লক্ষ পাউন্ডে তার শেয়ার এক হাজার পাউন্ড। লন্ডনে সেফ ডিপোজিট জমছে। কিন্তু কতদিন এই প্রচণ্ড ঝুঁকির কাজ চলবে? ঠিক আছে। কুড়ি হাজার পাউন্ড হলেই কিছুদিন পরে এ লাইন সে ছেড়ে দেবে।

উঁচু-নীচু পথ! এটাই তার জীবনের পথ। সে সমতল চায়।

M অধৈর্য। বস্তুকে নির্দেশ দিতে গিয়ে ঈষৎ বিরক্ত।

— আরে ঠিক ভাবে সাজাও। ওভাবে নয়।

কাটা পাথরের টুকরোটা টেবিলে ল্যাম্পের আলোয় ঝকঝক করছে।

এটা জুলাই মাস। বস্তুর চোখে যে ঠুলিটা রয়েছে, সেটা স্যাকরাদেব।

বস্তু বলে— কী পাথর এটা? কত দাম।

— এটা স্ফটিক। দাম ... কাটার জন্য কয়েক পাউন্ড! আরেকটা বেছে নাও। নম্বর মেলাও।

পাথরগুলো একেকটা বিশ ক্যারেট। নীলা-সাদা আলো বিচ্ছুরিত! স্ফটিক আব হিরে পাশাপাশি তুলে পরীক্ষা করে বস্তু। হিরের জ্যোতির কাছে স্ফটিক নিতান্তই সাদামাটা, নিস্প্রভ।

হিরে পরীক্ষা করে বস্তু বুঝতে থাকে, সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে এই রত্নখণ্ড নিয়ে কত ঘটনা ঘটেছে! হিরে যে দেখবে, সেই প্রলুব্ধ হবে, হতে বাধ্য। এমনই হিরের রূপ!

চোখের ঠুলি খুলে হিরেটা কাগজে মুড়ে রাখে।

— বুঝেছি।

M-বলেন— জ্যাকবিও একই কথা বলছিল। এই ব্যাপারে জড়ালো, সমস্তটা বিশদভাবে জানতে হবে। এর ব্যবসা দুরন্ত নেশা! লোকে চোরা-চালানের লোভ সামলাবে কী করে। স্ফটিক দিয়ে জাল হিরে— যেমন, এই দেখ। এটা শ্বেতকমল। আর ওটা দশ ক্যারেটের টপ কৃষ্টাল। শ্বেতকমলের অর্ধেক দাম। আর এটা হল ‘কেপ’। সামান্য বাদামি আভা আছে। জহুরি ছাড়া ধবা মুশকিল!

বস্তুকে নানা রকমের পাথর দেখালেন। হিরে, পান্না, চুনি— নানা রত্নরাজি। পাইপে টান দিয়ে বললেন— এবার হিরে সম্পর্কে মোটামুটি আইডিয়া পেলে তো?

টেবিলে দু-একটা ফাইলের ওপব ‘অতি-গোপনীয়’ মার্কা দেওয়া।

M -জিজ্ঞেস করলেন— ফ্রান্সে ছুটি কাটিয়ে কবে ফিরেছ?

— এই তো কিছুদিন!

— কেমন কাটালে?

— ভালোই। শেষে দিকে একঘেয়ে লাগছিল অবশ্য।

— বেশ। ও, হ্যাঁ, তোমার রেকর্ড দেখছিলাম। অস্ত্র এবং বিনাঅস্ত্র— দুই লড়াই-এ তুমি পাকা। ডাক্তাররা তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভালো বলেছে। -- আসল কথা, একটা কঠিন কাজের জন্য তোমায় ডেকেছি। পাববে কিনা বল?

— অবশ্যই পাবব।

— দেখ ০০৭, কাজটা কিন্তু খুব হালকা নয়। আমি তো অকারণ নাটক করি না। এমন সব লোকের সাথে মোকাবিলা করতে হবে, যারা অত্যন্ত পাকা শয়তান, দুর্দান্ত বদমাশ। তাই তোমার মতো লোককেও এই কাজটা দিতে আমাকে যথেষ্ট ভাবতে হচ্ছে।

— দিতে পারেন স্যাব। আমি খুশি হব।

— আগে ব্যাপারটা শুনে নাও।

পাইপে টান দিয়ে ‘M’ বলতে থাকেন— কিছুদিন আগে ট্রেজারির এক কর্তাব্যক্তি আমাব সঙ্গে দেখা করে। তার সাথে ছিল ট্রেড সেক্রেটারি। বিষয়টা হিরে নিয়ে। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পৃথিবীর বেশিরভাগ হিরের খনিগুলি ব্রিটিশের কর্তৃত্বের এলাকায়। শতকরা নব্বই ভাগ কেনাবেচা লন্ডনে হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ব্রিটেন এই ব্যবসায় হাত পাকিয়েছে। এখন

পর্যন্ত আমরা ভালোই চালিয়েছি, ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে। বার্ষিক আয় প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন পাউন্ড.... তবে মনে রাখা দরকার, প্রতি বছর অন্তত কুড়ি লক্ষ পাউন্ডের হিরে আফ্রিকা থেকে স্মাগল হয়ে যায়।

— সেকী! কোথায় যায় এত হিরে?

— সবাই মনে করে আমেরিকায়। হতে পারে, কারণ, হিরের সবচেয়ে বড়ো মার্কেট আমেরিকা। আর যে ধরনের দুর্দান্ত দুর্বৃত্তের দল এসব কাজ করতে পারে, তারা বেশিরভাগই আমেরিকায় থাকে।

— তা হলে মাইন কোম্পানিগুলো কি এদের কন্ট্রোল করতে পারে না?

— চেষ্টা করে। পেরে ওঠে না। আমাদের সিলিটো মখন এম-১৫ ছেড়ে দেয়, তখন ডিবিয়াস ওকে নিয়ে নেয়। সে এখন ওখানে। সাউথ আফ্রিকার সিকিওরিটি ফোর্সের সঙ্গে কাজ করছে। সে কিছু কড়া ব্যবস্থা, তবে খুব সুবিধে হচ্ছে না। তাই এখন গভর্নমেন্ট অ্যাকশনের কথা উঠছে।

— কী হয়েছে স্যার?

— এই মুহূর্তে চোরাপথে আনা একটা বড়ো হিরের প্যাকেট রয়েছে লন্ডনে। এটা আমেরিকায় যাবে। কে নিয়ে যাবে, সেটা স্পেশাল ব্রাঞ্চ জানে। আমিও লোকটার ওপর নজর রাখবার অর্ডার দিয়েছি। তবে লোকটা একা নয়। আরেকজনও ওর সঙ্গে যাচ্ছে। খবরটা প্রথম পেয়েছিল রনি ভ্যালেন্স। সে ট্রেজারিকে জানায়, তারপর ওই ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত চলে যায়। প্রধানমন্ত্রীর হুকুম, আমরা এই ব্যাপারে যেন দায়িত্ব নিই।

‘M’ আরও জানান যে, লোকটা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। ওকে অ্যারেস্ট করা দরকার। তবে এরা হেঁদিপেঁচি স্মাগলার নয়। পেট থেকে একটি কথাও বার করা যায় না। হাতে হাতে, ম্যান-টু-ম্যান মালটা বাইরে চলে যায়। কোথায় এদের চোরাপথ, সে ব্যাপারে এফ. বি. আই-ও বিশেষ সাহায্য করতে পারবে না। এটা এফ. বি. আই-এর কাছে ছোটো কাজ। আসল কথা, আমেরিকার তো লোকসান নেই, ইংল্যান্ডেরই ক্ষতি হচ্ছে।

— কিন্তু আমরা কীভাবে এগোতে পারি?

— বন্ড তুমি হাউস অব ডায়মন্ডের নাম শুনেছ?

— শুনেছি। ওদের দুটো অফিস আছে। নিউইয়র্কের ওয়েস্ট ফর্টি সিক্সথ স্ট্রিট, আর প্যারিসের ক্যু দ্য রিভোলি-তে। ওদের বিরাট কারবার।

‘M’ বলেন— এরাই এর মূলে। লন্ডনে এদের একটা ছোটো অফিস আছে, হ্যাটান গার্ডেন। ওদের দারুণ বাড়বাড়ন্ত এখন।

— আচ্ছা, এই লোকটার নাম কী? কী করে?

— নাম রাফাস বি সেয়। বিশেষ কিছু জানা নেই। পিকাডেলির আমেরিকান ক্লাবে লাঞ্চ করে। সানিং ডেল-এ গলফ খেলে, স্যাভয়ে থাকে। ড্রিঙ্কিং বা স্মোকিং, কোনো আসক্তিই নেই। বলতে পারো, আদর্শ নাগরিক।... তবে হিরের কারবার সাধারণত বংশগত হয়। ওর ক্ষেত্রেও তেমন কিছু থাকতে পারে।

এরপর বন্ডকে নির্দেশ দেন ‘M’।

— একঘন্টা পরে ভ্যালেন্সের সঙ্গে দেখা কর। যে লোকটার মাল নিয়ে যাবার কথা তার বদলে ওরা তোমাকেই পাঠাবে।

বন্ড চমকে ওঠে। চেয়ারের হাতল আঁকড়ে জিঞ্জের করে— তার মানে?

— মানে তুমিই হিরেগুলি আমেরিকায় স্মাগল করে নিয়ে যাবে!

বন্দ রাখায় বেরিয়ে আসে। তার আগে মিস মানিপেনির ঘর পেরিয়ে বড়োবাবুর ঘরে ঢোকে। বড়োবাবু বলেন— তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমাকে ভিড়িয়েছে?

— হ্যাঁ।

— আচ্ছা, আমাদের এর মধ্যে জড়ালো কেন বল তো? তাছাড়া আমেরিকা আমাদের বন্ধু দেশ, সভ্য দেশ। আমরা এখন নানা ঝামেলা নিয়ে বাস্তু। স্মার্স তো আছেই। তাছাড়া জার্মান সাইফারে-ব্রেকার, মানে যারা সাংকেতিক গুপ্ত বার্তা পাঠায় — চিনের আফিং চক্র। ব্রিটিশ বিরোধী নানা কুখ্যাত মাফিয়া, নানা জায়গায়। এর মধ্যে আমেরিকানরা—

বন্দ বলে— মোটেই ওরা আমেরিকান নয়; মনে হয় কিছু ইতালীয় ভ্যাগাবন্দ।

বড়োবাবু প্রতিবাদ করেন— দেখতে হবে আমার কথাই ঠিক। ড্রাগের কারবারটা দেখছ তো। এখন নেশাখোরের সংখ্যা তিরিশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। আর চলছে জুয়াখেলা। আইনসিদ্ধ জুয়াখেলার ব্যবসা। বিরাট ব্যবসা, স্টিল ইন্ডাস্ট্রি বা মোটর গাড়ির বিজনেসকেও হার মানায়। আর এই হিরের ব্যাপারটা! কেপডার রিপোর্টে আছে, বছরে ষাট লক্ষ ডলার আয় হয়।

বন্দ চুপ করে থাকে।

বড়োবাবু বলেন— এফ.বি.আই. রিপোর্টটা পড়ে নিও। দৈনিক খুনের সংখ্যা চৌত্রিশ। এদের সঙ্গেই তোমার লড়াই..... এবং একলাই লড়াইতে হবে।

বন্দ বলল— আরও কিছু কথা আছে। আজ আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবে।

এখন বেলা দুটো।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এই ঘরে সবরকম গোপন সংবাদ জমা হয়। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ভ্যালেন্স বন্ডের পরিচিত, সেই 'মুনরেকার'-এর সময় থেকেই।

ভ্যালেন্স টেবিলের ওপর এক আকর্ষণীয় চেহারার যুবকের ছবি রেখে বলে— ভালো করে ছবিটা দেখ। তোমার সঙ্গে অনেকটা মিল পাওয়া যায়। নাম পিটার ফ্র্যাংকস। দুর্ভাগ্য ওকে এই কাজে নামিয়ে দিয়েছে। দু'দু'বার ধরা হয়েছিল। প্রমাণাভাবে ধরে রাখা যায়নি। না জেনে পিটার-এর মতো ছেলেরা এইসব চক্রে জড়িয়ে পড়ে। সোহো-তে আমার যে ফলোয়াররা আছে, তাদের একজনকে পিটার অন্য চোখে দেখে। মেয়েটারও বিশেষ নজর আছে। ছোঁড়াটা খেলার ছলে এই পাচারের কথা বলতেই আমার টনক নড়ে যায়। তখনই মনে হল তোমার কথা। তোমায় কিন্তু আগে কখনো কেউ দেখেনি।

বন্দ বলে— পাক্সা অপরাধীরা আমাকে না চিনলেই হল।

— আমার ফলোয়ারকে পিটার বলেছে যে, যে জিনিসটা একেবারে বরফের মতো সাদা। ছেলেটি কাল সন্ধ্যাবেলায় ট্রাফালগার প্যালেসে গিয়ে একটা মেয়েকে মিট করবে। এবং মেয়েটিই ওকে বলে দেবে, কী করতে হবে। তবে যারা এইরকম বড়ো ধরনের চোরা কারবার করে থাকে, তারা দুজন থাকে। সাবধানের মার নেই।

অ্যাশ-ট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে বন্দ ভাবতে থাকে, আবার সেই কাজ। প্রতি পদে বিপদের ঝুঁকি। প্রতিমুহুর্তে প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা।

বন্দ বলে— এই পিটার ফ্র্যাংকসের ডিটেলস আমি চাই।

— ফাইন। শোন, হিরেগুলো আসছে সিয়েরা লিয়োনের মাইন থেকে। ওখানে সিলিটো আছে। লাইবেরিয়া বা ফ্রেঞ্চ গিনির মধ্য দিয়ে সেই পাথর ফ্রাঞ্চে চলে যাবে। মনে হয়, লন্ডনও ওদের এই চোরাকারবারের একটা ঘাঁটি।

ভ্যালেন্স এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে কয়েকবার ঘরে হাঁটা-হাঁটি করে। তাবপর বলে— দেখ বন্ড, হিরের পেটিটা আমেরিকায় গিয়ে কাটাকাটি করা হবে না। খরচা বেড়ে যাবে। তাই যেখানে আইনসম্মতভাবে ব্যবসা চলে সেখানেই ঢুকে যাবে। কোনো ভয় থাকবে না। হ্যাঁ, একটা কথা বলব। যদি রাগ না করো।

— মাথা খারাপ!

— শোন তাহলে। মাল পাচারের পর পিটার ফ্যাংকসকে যে পাঁচ হাজার ডলার দেওয়া হবে, সেটা ওকে কে কোথায় দেবে? সেটা জানা গেলেই, আসল মাথাকে ধরতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না। মাল পাচারের বিশ্বাসী লোক পাওয়া শক্ত। এবং মনে হয়, তুমি এ কাজের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।

বন্ড চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। এবার সে বলে — সবই ঠিক আছে, কিন্তু আইডল ওয়াইল্ড-এর কাস্টমস অফিসে ইন্সপেক্টরস্কোপ যন্ত্রে ধরা পড়ে গেলে তখন? আর ঐ মহিলাই যদি কিছু করে বসে?

— ওসব ভাবনা আমাদের। আমরা পিটারকে অন্য একটা কেসে ধরে আনছি। তুমি শুধু ঐ মহিলাকে ট্যাকেল করবে।

— মানে?

— যে মহিলা পিটারকে একটু মানে অন্য চোখে দেখে। অবশ্য যে ব্যক্তির সাথে পিটার - এর যোগাযোগ হবে, তাকে মহিলা চেনে কিনা সেটা জানি না। এদেব কাজের ধারা খুবই রহস্যময়।

— ঐ মহিলা সম্বন্ধে কতটুকু জানা গেছে?

— পাসপোর্ট দেখে বলা যায়, মেয়েটি আমেরিকান নাগরিক। জন্ম সানফ্রান্সিসকোতে, বয়স ২৭। নীল চোখ, উচ্চতা ৫'৬"। আত্মীয় প্রিয়জন কেউ নেই, জীবনে, মোটামুটি একা। অনেকবার নাম পালটেছে, গত তিন বছরে বারোবার এখানে এসেছে। সাধারণত ট্রাফালগার প্যালেসে ওঠে, দু-এক সপ্তাহের বেশি কখনো থাকে না। আর কী সাহায্য চাও?

বন্ড বলল— আমি সেখানে যাব কী করে?

ভ্যালেন্স ইন্টারকামের সুইচ টিপে দুজনকে ডেকে পাঠাল— ভ্যাকুয়েটস এবং লবিনিয়ের। তাছাড়া হাউস অব ডায়মন্ডসকেও লাইন দিতে বলল।

হঠাৎ দরজায় টোকার আওয়াজ। অনুমতি নিয়ে সার্জেন্ট ভ্যাকুয়েটস ঢুকল। তার সঙ্গে বন্ডের আলাপ কবিয়ে দিল ভ্যালেন্স।

— আপনি কমান্ডার বন্ডকে নিয়ে একবার হ্যাটান গার্ডেন যান। মানে হাউস অব ডায়মন্ডসে। পরিচয় দেবেন, ও আপনার স্টাফ, সার্জেন্ট জেমস। নিশ্চই জানেন, অ্যাসকটের সেই হিরেগুলো আমেরিকা হয়ে অর্জেন্টিনায় পাচার হচ্ছে। সেখানে কর্তাব্যক্তি হচ্ছেন মি. সেয়। খুব ভদ্রভাবে কাজটা করতে হবে। ওদের চটালে চলবে না।

এখন থেকে বন্ড হয়ে গেল সার্জেন্ট জেমস। ভ্যালেন্স আবার টেলিফোনে নির্দেশ দেয়— মি. সেয়কে বলবেন, আমার দুজন লোক সাড়ে তিনটের সময় তার সাথে দেখা করবে। ও, তিনি সাড়ে তিনটের আগে ফিরছেন না। ঠিক আছে, ওরা একটু দেরি করেই যাবে।

ইতিমধ্যে সার্জেন্ট লবিনিয়েরও এসে গেছে। সে বন্ডকে একটা ছোট্ট হাত-আয়না দেয়। মেকআপ করে মুখের কাটা দাগটা ঢাকা হয়েছে। দুর্দান্ত সিক্রেট সার্ভিস অফিসার ০০৭-কে চেনা যাচ্ছে না।

গাড়িতে সবাই চূপচাপ।

স্ট্যান্ডের ভিতর দিয়ে প্রথমে চ্যাম্পারি লেন, তারপর হর্বন। ওরা হ্যাটন গার্ডেনে ঢোকে গ্যামেজের দিক থেকে। গাড়িটা দাঁড়ায় ডায়মন্ড ক্লাবের গাড়ি-বারান্দার নীচে।

ওরা ওপরে ওঠে। একটা নেমপ্লেটে লেখা— ‘রাফাস বি সেয়, ভাইস প্রেসিডেন্ট ফর ইউরোপ।’ একটি স্মার্ট ইন্সদি মেয়ে দরজা খোলে।

— বসুন। মি. সেয় আসছেন।

সাজানো ঘর। লাল কার্পেট, গোলাপ কাঠের টেবিল, গোটা ছয়েক চেয়ার। টেবিলে নানা ম্যাগাজিন। ‘ডায়মন্ড নিউজ’-ও রয়েছে। দেওয়ালে চারটি বড়ো ছবি, সোনারলি ফ্রেম। বড়ো বড়ো ফুলের ছবি। দেওয়াল ঘড়ির সামান্য শব্দ ছাড়া ঘরটা নিস্তব্ধ। পাশের দরজাটা একটু ফাঁক থাকায় কিছু কথাবার্তা কানে আসছে : ‘প্লীজ গ্রুপসপ্যান, বোঝার চেষ্টা করুন। সকলকে নিয়েই চলতে হবে। এই পাথরটার জন্য আমরা দিতে হয়েছে দশ হাজার পাউন্ড।... বিলিভ মি.... ঈশ্বরের দিব্যি।’ আরো টুকরো কথাবার্তা : ‘.... পাঁচ পাউন্ড বাজি.... আরে এটা তো ঘুঁটি নয়.... পাথরটা ন’ হাজারের বেশি হতেই পারে না.... ঠিক আছে আরও একশো দেব.... বাজারে গিয়ে দেখ....’ ইত্যাদি ইত্যাদি।

হঠাৎ একজন ঘরে ঢুকে পড়ে। সে ওদের দেখে চমকে ওঠে— ‘এক মিনিট’ বলে তখনই বেরিয়ে যায়। দরজা বন্ধ।

ভ্যাকুয়েটস বন্দকে বলে— ওর নাম উইলি বেহরেন্স। খুব পরিচিত দালাল। সেয়র কোনো ক্রেতা হতে পারে।

বন্দ ফুলের ছবি দেখতে থাকে।

হঠাৎ সেয়র প্রবেশ করে। নিজের পরিচয় দিয়ে সে রক্ষণ গলায় বলে— এখানে আপনাদের কী চাই?

সেয় বিরাট চেহারার লোক। গায়ের রং-টা অবশ্য পোড়-খাওয়া।

ভ্যাকুয়েটস বলে— আমরা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে এসেছি। আমি সার্জেন্ট ভ্যাকুয়েটস। ইনি সার্জেন্ট জেমস। হিরে চুরির ব্যাপারে একটু খোঁজখবর করতে হচ্ছে। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন—

— ভালো কথা। খুব ভালো কথা। কী জানতে চান বলুন?

একটা নোট বই দেখে ভ্যাকুয়েটস কিছু প্রশ্ন করতে থাকে, মি. সেয় উত্তর দিয়ে যায়। টাইট বলিষ্ঠ চেহারা। কালো চুল, কালো চোখ। সিংগল ব্রেস্ট স্যু, সাদা শার্ট, কালো টাই, পায়ে দামি জুতো।

কয়েকটা পাথরের ব্যাপারে তথ্য দেয় মি. সেয়— এটা হচ্ছে বিশ ক্যারেটের ওয়েসেলটন। এ দুটো দশ ক্যারেটের শ্বেতকমল। আর এটা হলুদ প্রিমিয়ার, তিরিশ ক্যারেট হবে।... আর এগুলো কেপ ইউনিয়ন—

— এগুলো কি আপনার হাত থেকে কিংবা নিউইয়র্কের আপনাদের ফার্ম থেকে—

— না, সেভাবে যায়নি।

এইটুকু বলে কথা থামিয়ে দেয় মি. সেয় — ও.কে., আজ এই পর্যন্ত! বলেই বেরিয়ে যায় সেয়। ওরা একটু অপ্রস্তুত। রাস্তায় বেরিয়ে আসে। নিজেদের মধ্যে কিছু কথা হয়। বন্দ বলে- লোকটা সত্যিই একটা চিঞ্জ!

ভ্যাকুয়েটস হাঙ্গে— ও মোটেই হিরের ব্যবসায়ী নয়

কী করে জানলেন?

— যে চুরি যাওয়া পাথরগুলোর নাম করেছিলাম, তাতে লেখা ছিল, একটা হলুদ প্রিমিয়ার, আর দুটো কেপ ইউনিয়ন.... আসলে ওই নামে কোনো পাথরই নেই।

॥ পাঁচ ॥

লিফট থেকে নেমেই বারান্দা। শেষ প্রান্তে রুম নং ৩৫০।

দরজার কাছে গিয়ে বন্দ পিয়ানোর আওয়াজ শুনতে পেল।

— কাম ইন।

বন্দ ঢোকে।

— দরজাটা একদম বন্ধ করে দিন।

লং প্লেয়িং রেকর্ড বাজছে, বেডরুমের দরজা খোলা। মেয়েটি বসে আছে ড্রেসিং টেবিলের সামনে। গায়ে নামমাত্র জামাকাপড়। খোলা পিঠ। ব্রায়ের ফিতে, কালো লেসের টাইট প্যান্ট। টেবিলের তিনদিকে তিনটে আয়না।

হঠাৎ বন্দের রক্তে উত্তেজনা।

মেয়েটি বলল— আপনাকেই সাহায্যের জন্য বোধহয় পাঠানো হয়েছে। বসুন। একটু গান শুনুন।

বন্দ বলে— সিগারেট খেতে পারি?

— মরতে চাইলে স্মোকিং করুন। এক মিনিট, আমি আসছি।

রেকর্ডটা বন্ধ পিঠ শেষ হয়ে গেছে। নম্বর এক্স ৫০০। বন্দ উলটো পিঠটু সেট কবে। এ পিঠে কোনো নম্বর নেই।

মিউজিকটা উদ্দাম। মেয়েটার শরীরের মতোই।

এর নাম মিস কেস। সে-ই তাকে ছায়ার মতো ফলো করে আমেরিকা যাবে। বন্দ কল্পনা করেছিল, কোনো জাঁহাজ মেয়ে হবে! অবশ্য হতেও পারে। তবু আলাদা একটা প্রাণ আছে মেয়েটার মধ্যে। কিন্তু নামটা কী? ওর লাগেজের লেভেলে লেখা আছে মিস টি। টি, তার মানে টেরেসা, বা টেস, টুডি অথবা টিলি? না, এর কোনোটাই ওর চেহারার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে মেয়েটা কখন যে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, বন্দ আদৌ টের পায়নি। পোশাক পালটেছে সে। জামা জুতো সব কালো। এমনকি ঘড়ির ব্যান্ডটাও। সোনালি চুল, মুক্তার দুল। বাইরে যাবার জন্য তৈরি।

বন্দ ভাবল, মেয়েটা সুন্দর ঠিকই, কিন্তু বিপজ্জনকভাবে সুন্দর। চোখের রং ঘন ঘন বদলায়। এইমাত্র অবশ্য তাব চোখে কোনো ভাষা নেই।

মেয়েটির মিষ্টি গলা— তাহলে আপনিই পিটার ফ্র্যাংক্স?

— হ্যাঁ।

— আচ্ছা, এই কাজ আপনি নিলেন কেন?

— একজন মারা গেছে। আর তার জায়গায় আমায় আসতে হয়েছে।

— তাই নাকি? .. ওরা যে বলেছিল আপনার কাজ হচ্ছে চুরি-চামারি করা . যাকগে, মরল কী করে? ঠান্ডা খুন না গরম খুন?

— এক দম গরম। মুখোমুখি লড়াই।

— তাই আপনি সব পড়ছেন?

— তাও বটে, আবার টাকার ব্যাপাবও আছে।

— ঠিক আছে। কিন্তু আপনার পায়ে কোনো খুঁত আছে? দাঁত কি বাঁধানো?

— না না, নো ডিফেক্ট। এভরিথিং অলরাইট।

মেয়েটি ভুরু কৌচকায়।

— আমি একটা কাঠের পা ওয়ালা লোক চেয়েছিলাম। যাকগে, কোনো বিষয়ে শখ বা নেশা আছে? মাল কেনার পর কীভাবে পাচার করবেন?

— শখ বলতে, আমি মানে মাঝে তাস আব গলফ খেলি। আর পাচার, সবচেয়ে ভালো হয় ট্রাক্কের বা সুটকেসের হ্যান্ডেলে মাল বেখে।

— হ্যাঁ। তবে কাস্টমসের লোকেরাও তাই ভেবে থাকে।

হঠাৎ একটা পেন্সিল আর কাগজ টেনে নেয় মেয়েটি।

— আপনার গল্ফ বল কী ধরনের?

— ডানলপ ৬৫।

মেয়েটি টুকতে টুকতে বলে— পাসপোর্ট আছে?

— আছে, সেটা নিজের নামেই।

মেয়েটা ভুরু কৌচকায় — সেই নিজের নামটা কী?

— জেমস বন্ড।

— জেমস! জো রাখলেই তো ভালো হত। থাক, নাম দিয়ে কী হবে! দু'দিনে একটা মার্কিন ভিসা জোগাড় করতে পারবেন?

— মনে হয় পারব।

মেয়েটি এবার সোজা হয়ে বসে।

এবার আসল কথা শুনুন— আপনি আমেরিকায় যার কাছে যাচ্ছেন, তার নাম মাইকেল ট্রি। থাকবেন নিউইয়র্কের অ্যাস্টার হোটেলে। ধরে নিন, সে আপনার বন্ধু, সেই যুদ্ধের সময় থেকেই!... ঐ নামেও কোনো একজন লোক সত্যিই আছে কিন্তু। তবে সে হচ্ছে ছায়াভরা গাছ, হা হা.... শেডি ট্রি।

বন্ডের হাসি দেখে মেয়েটি বলে— লোকটি মোটেই হাসার মতো নয়।

বন্ড চুপ করে যায়। মেয়েটি ড্রয়ার থেকে পাঁচ পাউন্ড নোটের একটা বান্ডিল বার করে। রবার গার্ডারে জড়ানো। অর্ধেক টাকা গুনে নিয়ে ড্রয়ারে রাখে। বাকিটা রবার ব্যান্ডে জড়িয়ে বন্ডের দিকে ছুঁড়ে দেয়। ক্যাচটা লুফে নেয় বন্ড।

— ওতে পাঁচশো পাউন্ড আছে। রিজ হোটেলে একটা ঘর ভাড়া করুন। আর ইমিগ্রেশনকে সেই ঠিকানাটাই দেবেন। বলবেন, ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন গলফ খেলে। সেইরকমই একটা সুটকেস কিনবেন। তবে একদম নতুন না হলেই ভালো। এক কথায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলায় আপনি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে নিউইয়র্ক যাচ্ছেন। গলফ বলগুলো আপনি ড্রাইভারের কাছ থেকে পাবেন।

এতগুলো কথা বন্ড একমনে শুনছে। প্রতিটি কথা মনে রাখতে হচ্ছে।

— আপনি সব কাজ মোটেই একা একা করতে পারবেন না। আপনার মালপত্র প্লেনে ওঠা পর্যন্ত ড্রাইভার আপনার সঙ্গে থাকবে। তাছাড়া আমি তো থাকছিই। আর কোনো চালাকি নয়। ও. কে.?

বন্ড বলে— কিন্তু এতসব জিনিস এ—

— কাস্টমস ঝামেলা করলে আপনি বোবা সেজে যাবেন। আপনি নিজেই জানেন না, বলগুলো কী করে আপনার ব্যাগে এল। দরকার হলে ব্রিটিশ কনসালের সাহায্য নেবেন। আমরা কিছু

করতে পারব না। সেইজন্যই আপনাকে টাকা দেওয়া হয়েছে। মানে আপনার প্রয়োজনে। ও কে. ?

বন্দ বলে, অফ কোর্স! কিন্তু ইচ্ছে করলে তো আমি আপনাকে ডুবিয়ে দিতে পারি।

— তাই নাকি! হা হা! ডিয়ার ফ্রেন্ড, আমি আপনার ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমাকে নিয়ে না ভাবলেও চলবে। আর যে কাজে আমি রয়েছি, তাতে আমাকে তো খুকি ভাবার কারণ নেই। তবে পরে আমি আপনার উপকারেই লাগব। সবসময় কাজের কথা বলবেন না.... নিউইয়র্কে দেখা হবে তো?

বন্ডের মনেও একই প্রশ্ন। মেয়েটিকে তার ভালো লেগেছে। তবে চোরাপথের কাজে এসে বন্ধুত্ব হয় কিনা, সেটাই একটা প্রশ্ন।

মেয়েটি বলে— গুরুবার রাতে আমরা একসঙ্গে ডিনার করব। রাত আটটা। টোয়েন্টি ওয়ান ক্লাব, ফিফটি সেকেন্ড স্ট্রিট। ট্যান্সি ড্রাইভারকে বললেই নিয়ে যাবে। কাজটা উত্তরোলে তবেই।

— ফাইন। আর কোনো কথা আছে?

— কটা বাজে এখন?

— ছ'টা দশ।

— আমি এবার বেরোব।

বন্দ লিফটে আসে। শুনতে পায়, গ্রামোফোনে আরেকটা রেকর্ড বাজছে।

ছ'টা পনেরো। ওয়েলবেক-এর একটা নম্বর ডায়াল করে মেয়েটি। ওপাবে প্রথমে হিস্‌হিস্‌ শব্দ। তারপর শুধু একটি কথা— বল।

চমকে ওঠে সে। এই তার অদেখা প্রভু। বর্তমান কাজের মালিক।

মাউথপিসে মেয়েটি বলে— এ.বি.সি.কে কেস বলছি। পাচারের লোক ঠিক আছে। তার আসল নাম জেমস বন্দ। পাসপোর্টেও তাই আছে। গলফ খেলে, গলফের বলের নাম ডানলপ ৬৫। পর কল করব, আপাতত এই।

আবার হিস্‌হিস্‌ শব্দ। মেয়েটি রিসিভার রাখার সঙ্গে সঙ্গে লন্ডনের কোনো হোটেলের একটি ঘরে কাজ শুরু হয়ে যায়।

॥ ছয় ॥

আজ বৃহস্পতিবার। সঙ্গে ছটা। রিজ হোটেলে বন্ডের সুটকেস গোছানো হয়ে গেছে। কিছু গলফের বইও সুটকেসে ভরে নেয় বন্দ। অ্যাটাচির পিছনদিকে চামড়ার ব্যান্ডের তলায় রাখে পিস্তলের সাইলেন্সার আর প্রায় তিরিশ রাউন্ড .২৫ বুলেট।

নীচ থেকে ফোন আসে। একজন পিওন বন্ডের জন্য চিঠি এনেছে, এবং সেটা সে বন্ডের হাতেই দিতে চায়।

অনুমতি পেয়ে সে ওপরে আসে। মুখ চেনা। লোকটা আবার নীচে গিয়ে অপেক্ষা কবতে থাকে বন্ডের নির্দেশের জন্য।

সিলড্‌ খাম। নীল কাগজে ব্যক্তিগত চিঠি।

— ওয়াশিংটন জানিয়েছে, কদাস বি সেয় ওরফে স্যাক স্প্যাংগ এক কুখ্যাত অপরাধী। কেফভার রিপোর্টে তাব নাম আছে। মেব্রাফিনো স্প্যাংগ তার যমজ ভাই, ওদের দলের নাম 'স্প্যাংগল্ড মব'। পাঁচ বছর আগেই ওবা হাউস অব ডায়মন্ডস্‌-এর কর্তৃপক্ষ হয়। তবে ওদের ব্যবসার বিরুদ্ধে বে-আইনি কাজের অভিযোগ নেই।

....এছাড়া। ওরা লা ভেগার টায়ারা হোটেলের মালিক। ওরা ড্রাগ ও শক্তিবৃষ্টির কাববারও চালায়। ব্রাঞ্চ বয়েছে— মিয়ামি, ডেট্রয়েট ও শিকাগোয়।।... বেশি বিপদ হলে তোমাকে এই কাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। এই কথাগুলো 'আদেশ' বলে গণ্য করতে হবে।

চিঠিতে কোনো সই নেই। খামের মধ্যে চিঠিটা আবার ভরে লোকটাকে দিয়ে দেয় বন্দ, যেমন বলা হয়েছিল। ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যায় লোকটি।

একা ঘরে বসে বন্দ ভাবে, কাজটা কী তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এফ. বি. আই -কে দেওয়া হবে? আর এই 'বিপজ্জনক মুখোমুখি' কথাটার মানে কী? হতে পারে এই দলটা, মানে 'স্প্যাংগল্ড মব' খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু বন্দ তো বরাবর বিপজ্জনক কাজই করে এসেছে।

ছটা পঁচিশ। কোটের ভিতরে হাত দিয়ে অটোমেটিক রিভলবারটা বের করে বন্দ। এর খাপে 'M' ইংলিশে নিজের হাতে লিখেছিলেন 'এটা তোমার কাজে লাগতে পারে।'

টেলিফোন বাজে। বন্দ জানতে পাবে তার গাড়ি এসে গেছে। তার মানে এখুনি বেরোতে হবে।

লন্ডনে এখন গ্রীষ্ম চলছে। জানলার বাইরে ওই গাছগুলো হয়তো বেশি দিন আর সবুজ থাকবে না।

বাইরে আসে বন্দ। কালো আর্মস্ট্রং সিডলে গাড়ি, লাল নম্বর প্লেট। ড্রাইভারের গলায় যেন নির্দেশের সূর— আপনি নিশ্চই সামনে বসতে চান?

গাড়ি পিকার্ডিলিভ দিকে চলল। ড্রাইভারের হাত পাকা। সে বলল— কথা বলবেন না, আমার অসুবিধা হয়।

এইবার গ্রেট ওয়েস্ট রোডের কাছে এসে গাড়ি থামে। গলফ খেলার ডানলপ ৬৫ বলগুলো বেব করা হয়, অন্য পুরোনো বলের সঙ্গে সেগুলো চালান হয়ে যায়। আবার গাড়ি চলতে থাকে। এবার কাস্টমস। নিয়মমাফিক কথাবার্তা হয়। কাজ শেষে হওয়ার পর ড্রাইভারটি বন্দকে 'গুডনাইট' জানিয়ে সেলাম ঠোকে। আশ্চর্য, তখনও তার ঠোটে বাঁকা হাসি।

এবার পাসপোর্ট প্রদর্শন। তারপর ডিপার্চার লাউঞ্জ। বন্দ খবরের কাগজের পাতায় মন দেয়। লাউঞ্জে ভিড়। কিন্তু চেনামুখ কেউ নেই। তবে দু'জনকে লক্ষ করে বন্দ। যাদের আগে মনে হয়েছিল আমেরিকান ব্যবসায়ী। হঠাৎ ওরা দু'জন উঠে যায়। চুপিচুপি ভাবল ব্র্যান্ডির অর্ডার দিচ্ছে ওরা।

হঠাৎ সেই মেয়েটিকে দেখতে পায় বন্দ। হ্যাঁ! ওর ওপরেই তো বিমান ছাড়ার দায়িত্ব। টেলিফোন তুলে ফ্লাইট কন্ট্রোলকে জানাল— দেখা যাচ্ছে, মোট চল্লিশ জন যাত্রী।

প্লেনে ওঠে বন্দ। এটা একটি বৃহৎ বোয়িং। ঘোষণা হয়, এর প্রথম ল্যান্ডিং স্যাননে। সেখানেই ডিনাব সাবা হবে। দেড় ঘন্টা দেরি আছে।

সিগারেট ধরায় বন্দ। একটা বই হাতে নেয়।

হঠাৎ পাশের হেলান দেওয়া সিটটা তার হাঁটুর কাছে নেমে আসে। সেই দুই আমেরিকান ব্যবসায়ীর একজন ভীষণ ঘামছে; ভীতমুখ, নীলবর্ণ। একটা ব্রিফকেস দু'হাতে সে জড়িয়ে আছে। তাতে নাম লেখা : Mr. W. Winter, ব্লাড গ্রুপ 'F'।

বন্দ ভাবে, লোকটা নিশ্চই বোকা এবং বর্বর। ও কী প্লেন ক্র্যাশের ভয় পেয়েছে? আরে ক্র্যাশ করলে মৃত্যু অনিবার্য, ব্লাড গ্রুপ দিয়ে কী হবে! বন্দ মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

মেয়েটির নাম সে জেনে গেছে— মিস স্টিফানি কেস। সে বন্দের পাশ দিয়ে চলে গেল। একটু কথা বলতে পারলে ভালো হত! দেখা যায় স্টুয়ার্ট ককটেল ট্রে নিয়ে আসছে। বইয়ে চোখ রাখলেও মনের মধ্যে মেয়েটির চিন্তা ঘোরাফেরা করে।

হঠাৎ প্রচন্ড আওয়াজ! আসলে বিমান দ্রুতবেগে নীচে নামছে। পঞ্চাশ মাইল নীচে আয়ারল্যান্ডের পশ্চিম তীর। সিট বেন্ট বেঁধে নেওয়ার নির্দেশ আসছে।

অবশেষে স্যাননে ল্যান্ডিং। রাতের খাবার ভালোই— মাংসেব স্নাইস, শ্যাম্পেন, সঙ্গে আইরিশ হুইস্কি মেশানো হট কফি উইথ ফ্রিম।

বিমানবন্দরে সারি সারি দোকান। নানা সামগ্রী। এবার পনেরো হাজার ফুট উঁচুতে উঠতে হবে। নোভা স্ফাটিয়ার দক্ষিণ উপকূলের দিকে যাচ্ছে বিমান।

বন্ডের ঘুম ভাঙে। মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে নেয়। অন্যান্য যাত্রীরাও ঘুম ভাঙা চোখে উদ্ভিত সূর্যের আলো দেখছে। নীচে পৃথিবীর বাড়িগুলোকে মনে হয় যেন বাদামি কাপেটের ওপর চিনির দানা। ট্রেনের ধোঁয়ার ছোটো ছোটো কুন্ডলী, যদিও বিশেষ নজরে পড়ে না।

ব্রেকফাস্ট আসে। ছোটো সরকারি ফর্মে সই করতে হয়। গোপনে জিনিস নিয়ে গেলে জেল বা জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে।

তিন ঘন্টা কেটে যায়। আবার নামছে প্লেন। নীচে ছড়িয়ে আছে বোস্টন, নিউ জার্সি। এইবার নিউইয়র্কে ল্যান্ডিং।

॥ সাত ॥

কাস্টমস অফিসারের বিরাট ভুঁড়ি। ঘামে ভেজা পোশাক। সামান্য কিছু কথাবার্তা হয় তার সাথে। একটু দূরে মেয়েটি।

হঠাৎ অফিসার জিজ্ঞেস করে— আপনি কী শিকার করেন মি. বন্ড?

এগুলো আমেরিকান ভাষাব টেকনিক। বন্ড পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে না। যাই হোক, কাস্টমস থেকে মুক্তি পায়।

এবার আরেকটি অজানা মুখ। বলে— আপনার গাড়ি এসেছে।

কালো ওল্ডসমোবাইল। সামনের সিটে বসে বন্ড। মামুলি কথাবার্তা শুরু হয়। আবহাওয়া বেশ গরম। গাড়ি চলতে থাকে। বন্ড জানতে পারে, শেডীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তার। বিরক্ত হলেও কিছু করার নেই। বেশি স্বাধীন ভাব দেখালে হয়তো ভাগিয়ে দেবে। নানা চিন্তার মধ্যে গাড়ি এগোতে থাকে।

ম্যানহাটান বস্তু। তারপর ওয়েস্ট ফার্ট সিন্সথ স্ট্রিট, এটাই আমেরিকায় হ্যাটনগার্ডেন। সরু নোংরা প্রবেশপথ। একপাশে ঝুটো গমনার দোকান। হঠাৎ চোখে পড়ে— ‘দ্য হাউস অব ডায়মন্ডস ইনকর্পোরেশন।’

একটা লোক এগিয়ে আসে। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করে— বস আছে?

— আছে।

ড্রাইভার এবার বন্ডকে বলে— চলে এস ফ্রেন্ড। জিনিসপত্রগুলো নামাও।

গলফের ক্লাবগুলো যে ব্যাগে আছে, সে ব্যাগটা ড্রাইভার তুলে নেয়। বাধ্য ছেলের মতো বন্ডও পিছুপিছু হাঁটতে থাকে।

এই বাড়িটা কি কুলিদেব জন্য! কে জানে! একটা লোক কাগজ পড়ছিল। ড্রাইভার তাকে জিজ্ঞেস করে— এই জিনিসপত্রগুলো তোমার কাছে রাখব?

— রাখতে পাব।

এরপর লিফট। ড্রাইভারের কাঁধে গলফের ক্লাবগুলো। ওরা পাঁচতলায় উঠে আসে। আবার একটা বারান্দা। এখানে গরম হাওয়ার চাপ।

সামনের টেবিলে একজন লাল চুল গোল মুখ লোক বসে আছে। ওর সামনে এক গ্লাস দুধ। লোকটার পিঠের কুঁজ বন্ড লক্ষ করে। ভাষাহীন মুখ, চিনাম্যানদের মতো চোখ।

লোকটা বলে— মি. বন্ড, আমরা যাদের কাজে নিই, তাদের বিলক্ষণ বাছাই করতে হয়.... লন্ডন বলেছে, আপনি একজনকে খতম করেছেন। দেখে মনে হচ্ছে, সেটা মিথ্যে নয়। আপনি কি আমাদের পক্ষে কাজ করতে ইচ্ছুক?

বন্ড বলে— কেমন কাজ দেবেন, তার ওপর নির্ভর করে।

লোকটা হেসে ওঠে। ড্রাইভারকে বলে— রকি, বলগুলো বের করো, তারপর আমার সামনে সেগুলো কেটে ফেল।

আদেশ অনুযায়ী রকি কাজে মন দেয়।

বন্ড লোকটির কুঁজের ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই সে খেঁকিয়ে ওঠে। রকি বলগুলো টেবিলে সাজায়। তারপর হ'নস্বর বলটায় ছুরির ফলা দিয়ে একটা গোলমুখ তৈরি করে। লোকটা সেই বল থেকে তিনটে দামি পাথর বের করে। একেকটার ওজন দশ থেকে পনেরো ক্যারেট হবে।

রকি সেইভাবেই অন্য বলগুলো কেটে যাচ্ছে। বন্ড গুনে দেখে, মোট আঠারোটা হিরের টুকরো জড়ো হয়েছে। এগুলোর দাম অন্তত এক লক্ষ পাউন্ড।

কুঁজো এবার বলল— রকি, গলফ স্টিকগুলো এখান থেকে নিয়ে যাও। অ্যাস্টরে এর জন্য যে ঘর আছে, একে সেইখানে স্টিকগুলো সমেত ঢুকিয়ে দাও।

রকি চলে যায়। সিগারেট ধরিয়ে বন্ড বলে— যদি এখন আপনি খুশি থাকেন, তবে আমার পাওয়া পাঁচ হাজার ডলার দিলে খুব ভালো হয়।

— দেওয়া হবে, হয়তো কিছু বেশিই পাবেন। তবে আপনার হাতে দেওয়া যাবে না। ঝুঁকির ব্যাপার হবে। পুলিশ ধরে ফেলতে পারে। বুঝেছেন?

— বুঝেছি।

— আচ্ছা, এবার একটা কথা বলে নিই। আপনি তো এখানে মি. শেডী ট্রি-র সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমিই সে। একজন সম্মানিত নাগরিক। আপনার সঙ্গে ১৯৪৫ সালে দেখা হয়েছিল। সেইসময়ে স্যাভয়ে ব্রিজ খেলার জন্য আপনার কাছ থেকে পাঁচশো ডলার ধরে নিয়েছিলাম। এরপর নানা বাজি জিতে এবং হেরে হিসেবে ফাইন্যান্সি একটু কাটাকাটি করতে হচ্ছে। তাছাড়া আমি তো ট্যাক্স দিই। তাই সেক্ষেত্রে এই ধার ও বাজির ব্যাপারে আপনার পাওনা হয় এক হাজার ডলার।

বন্ড একটু চমকে উঠলেও টাকাটা নিয়ে কোটের পকেটে রাখে।

কুঁজো বলে— আপনি তো রেস খেলেন। তাহলে সারাটোগায় যান। সেখানে গিয়ে একটা ঘোড়ার পিছনে বাজি ধরবেন। এখন আপনার পকেটে এক হাজার ডলার তো আছেই। বাজি জিতে পাঁচ হাজার ডলার পাবেন।

বন্ড বলে— আমার ঘোড়া যদি হেরে যায়?

— না, হারবে না।

বন্ড আবার চমকে ওঠে। এই তাহলে ক্রিমিনালদের দুনিয়া। রেস খেলার রহস্য থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কুঁজোর চোখে এখনও ভাষাহীন দৃষ্টি।

বন্ড বলে— বেশ!... আরেকটা কথা, আমি কিছুদিন ইংল্যান্ডের বাইরে থাকতে চাই। আপনাদের কি বাড়তি লোকের দরকার আছে?

দরকার হতে পারে। আপনার জন্য কিছু কাজের সম্ভাবনা আছে। এ পর্যন্ত আপনি ঠিক ঠিক চলছেন। চলতে থাকুন। অকারণে অন্য বিষয়ে উৎসুক হবেন না। যা যা বললাম, সেটুকু করুন। রেস খেলা হয়ে গেলে আমাকে জানাবেন।

বন্দ বলে - আমি কাজ চাই। তেমন কোনো পছন্দ অপছন্দ নেই। উচিতমতো টাকা পেলেই আমি সন্তুষ্ট।

কুঁজো এবার রেগে যায়— আপনি কী আমাদের ঠগ জোচ্চোর ভাবছেন? এত সহজে আমাদের চিনতে কোনো ইংরেজ ভূত পারে না। চুপচাপ শুনুন, আমার নম্বরটা লিখে নিন— উহসকনসিন ৭ ৩৬৯৭। গোপন থাকে যেন, নইলে আপনার জিভ ছিড়ে নেওয়া হবে!

এই লোকটাই শেডী ট্রি। অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে। বলে— চার নম্বর রেস হবে মঙ্গলবার। তিন বছরের ঘোড়া সোয়া মাইল দৌড়বে। বুকিং বন্ধ হবার আগে টাকাটা নেবেন। আপনাব ভাগ্য ফিরে যাবে। ঘোড়ার নামটা লিখে নিন — ‘শাই স্মাইল’। বড়ো ঘোড়া। মুখে সাদা ছোপ, চার পায়ের নীচটাও সাদা, যেন মোজা পরে আছে।

॥ আট ॥

বেলা সাড়ে বারোটা। বন্দ রাস্তায় হাঁটছে।

‘হাউস অব ডায়মন্ডস’-এর দুটো শো-উইন্ডো। নীল ভেলভেটের মধ্যে একটা করে হিরের গয়না। কানের দুল! প্রত্যেকটার নীচে প্রেট, তাতে সোনালি অক্ষরে লেখা — ‘ডায়মন্ডস আর ফর এভার’, হিরে চিরকালের।

হঠাৎ মনে হল, কেউ পিছু নিয়েছে। যদিও নিশ্চিতাবে ধরা যায় না, কিন্তু শর্পছনে, দু’পাশে চলন্ত লোকগুলি অতি সতর্ক। হঠাৎ একটা শো উইন্ডোর সামনে দাঁড়ায় বন্দ। ভাবে, এত হিরে আমেরিকায় জমা হল কী করে? যাই হোক, একটা এয়ার কন্ডিশন বার পেলে ভালো হত, বেশ গরম পড়েছে!

অকস্মাৎ বন্ডের হাতটা কেউ একজন পিছন থেকে চেপে ধরে। এই হাতেই তার পিস্তল লুকোনো আছে। বন্দ টের পায়, পিঠের ঠিক মাঝখানে একটা শব্দ জিনিস। তার সঙ্গে একটা কর্কশ গলা — অ্যাই ইংরেজ ভূত, আগে কিছু খাওয়াবি কিনা বল?

পুলিশ? না, ক্রিমিনালদের কেউ? পিঠে ঠেকা শব্দ জিনিসটা একটা লোহার লুক বলে মনে হচ্ছে। এটা কি কাটা হাতের অংশ?

বিদ্যুৎবেগে বাঁ হাতে ঘুসি চালায় বন্দ। লোকটি তার বাঁ হাত দিয়ে সেই ঘুসি আটকে দেয়। তারপর হেসে ওঠে — হায় হায় জেমস, পারলে না! তোমার শরীরে কি শূঁয়োপোকা বাসা বেঁধেছে?

ফেলিক্স লিটার, হাসি মুখ। বন্দ অবাক হয়ে যায়। লিটারকে সে শেষ দেখেছে ফ্লোরিডার হোটেলে। রক্তমাখা ব্যান্ডেজ বাঁধা।

খুশিমনে দুজনের ঠাট্টা তামাশা চলে কিছুক্ষণ। বন্দ লক্ষ করে লিটারের কাটা হাতে লুক, এখন ডান পকেটে। বাঁ হাতে বন্ডের হাত ধরে সে হাঁটছে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

লিটার বলল, চল, সামনেই একটা ভালো খাবার জায়গা আছে, ‘মার্ভি’, এখানে নামকরা লেখক-অভিনেতারা আসে। ওরা ওপরে ওঠে। টেবিলে বসার পর বন্ধুকে ভালো করে লক্ষ করে বন্দ। ডান হাত এবং বাঁ পা খুইয়েছে লিটার। ডান চোখের উপর থেকে চুলের তলা পর্যন্ত গ্রাফট করতে হয়েছে। তবু মনেপ্রাণে সবল সতেজ রয়েছে ফেলিক্স লিটার। মুখে পরাজয়ের বিন্দুমাত্র

চিহ্ন নেই। চুলে আদৌ পাক ধরেনি। তার অঙ্গহানিব জন্য গ্লানি নেই। তবু তবু কী যেন গোপন রাখতে চাইছে লিটার।

লেমন দেওয়া ড্রাই মার্টিনি আসে।

লিটার বলে -- ক্রেস্টা ব্লাস্কা দিয়ে তৈরি। নতুন ক্যালিফোর্নিয়ার ব্র্যান্ড। ভালো ভারমুখ!

আহার পর্ব চলতে থাকে। লিটার জিজ্ঞেস করে -- একটা কথা আমায় জানাও। শেডী ট্রি-র সঙ্গে আবার নতুন সম্পর্ক কিসের?

— আগে বল, তুমি কী সি. আই.এ-তে আছ?

— না। বন্দুক ধরার হাতটা তো নেই, তবে বসে কাজ করবার উপায় ছিল। আমার ইচ্ছে হয়নি। মোটা টাকা দিয়েছে ওবা। এখন আমি একজন শৌখিন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

-- আচ্ছা, ঘোড়ার ব্যাপারে তুমি কিছু জান?

-- এখন আর কিছু জানা নেই, মানুষ নিয়েই কারবার করছি।

কথাবার্তায় বন্দ জানাল, সে পুরোনো সংস্থায় আছে। তাদের কাজেই সে এখানে আছে। এবং ছদ্ম পরিচয়ে।

লিটার বলে — মনে হয়, ভুল করেছ। স্প্যাংগলড্ সব মহা শয়তানদের দল। ওদের সঙ্গে লড়া বেশ কঠিন। হয়তো আবার বিপদে পড়বে তুমি ... তবে আমিও শেডীর পিছনে লক্ষ রাখছি। অন্য কারণে। মনে হয়, পরস্পরকে সাহায্য কবতে পারব।

বন্দ বলে — ফেলিস্ত, তোমার সাহায্য আমার একান্ত দরকার .. আচ্ছা, তুমি এমন কোনো ঘোড়াকে চেন, যার নাম শাই স্মাইল।

— ঘোড়াটার পা দেখে কী মোজা পবা মনে হয়? মঙ্গলবার কী সেটা দৌড়োচ্ছে?

বন্দ বলে — এগজ্যাক্টলি।

— কিন্তু এর সঙ্গে ব্রিটিশরাজের কী সম্পর্ক?

— সেটা ভালো জানি না। তবে আজ আমি এক লক্ষ পাউন্ডের হিরে নিয়ে এসেছি এ স্প্যাংগদের জন্য। ওরা আমাকে পাঁচ হাজার পাউন্ড দেবে। ওই ঘোড়াটার পিছনে বাজি রাখলেই আমার টাকা উঠে আসবে।

লিটার বলল — ‘শাই স্মাইল’ কিন্তু খোঁড়া ঘোড়া। আমার ধারণা, সে জিতবে না। অন্য ঘোড়া বাজি জিতবে। তিন তিনবার এইরকম ঘটেছে। তাছাড়া ‘শাই-স্মাইল’ আছে কিনা সন্দেহ! শুনেছি, ওকে মেরে দিয়েছে। তবে এইরকম মাজা পরা পা-জাতীয় আরও ঘোড়া আছে। আমার ধারণা, যেটা জিতবে, তার নাম ‘পিকে পেপার’! খেলাটায় ২৫০০০ ডলার জড়িত। ওরা টাকা ছড়াবে সারা দেশে—দৌড়ের আগেই।

জানা গেল, ‘পিকে পেপার’কে শাই-স্মাইলের মতো সাজিয়েছে ওরা। ‘বয়সের চোখ’ বলে একটা কথা আছে এই লাইনে। এর অর্থ ঘোড়ার হাঁটুর পেছনে কড়ার মতো একটা জিনিস। জকি ক্লাব তার ছবি তুলে রাখছে। লিটার বলে — আমি স্প্যাংগদের আস্তাবলের এক ছোকরাকে হাত করেছি। ওর নেশার খরচা দিই।

— কী হবে তাহলে?

— দাঁড়াও, রবিবার সারাগোড়ায় চাই। ... তা, তুমিও তো আমার সঙ্গে যেতে পার। সাগামোর, ভালো হোটেল। তবে অন্য জায়গায় শোওয়াই তোমার ভালো। এখনই আমার সঙ্গে এক সাথে

— এনি ওয়ে, সঙ্কেবেলা দেখা হবে।

— ফাইন!

লিটারের কাছ থেকে স্প্যাংগদের আর কিছু তথ্য জানতে পারে বন্দ।

লিটার বলে — সেরাফিসোর ভাই জ্যাক স্প্যাংগ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানিনা। জ্যাক স্প্যাংগ-ই মি. সেয় কিনা বলা মুশকিল। তবে টিফানি কেস সম্পর্কে শুনেছি। মেয়েটা করিৎকর্মা, অনেকদিন দলে আছে। ওর উপর হামলা যখন হয়, তখন ওর বয়েস মাত্র ষোলো। সেই থেকে ওর পুরুষ বিদ্রোহ! সানফ্রান্সিসকো থেকে মায়ের বাস্তু ভেঙে যা পেয়েছে হাতিয়ে ও পালিয়ে যায় এক পাহাড়ি অঞ্চলে। তারপর যেমন হয়ে যাকে — নর্তকীর জীবন, ফিফ্লেম এক্সট্রা, হোটেলের পরিচারিকা ... এই করে বেড়ায় কুড়ি বছর বয়েস পর্যন্ত। এরপর খারাপ সময় আসে। তখন মদ ধরে। ফ্লোরিডার গলিতে, মদে চুর হয়ে থাকত। হঠাৎ একটা নাটকীয় ব্যাপার হয়। একটা বাচ্চা ছেলেকে জলে ডোবা থেকে বাঁচায়। এতে ওর প্রশংসা কাগজে বেরোয়। সেই সূত্রেই এক ধনী মহিলার পাল্লায় পড়ে। তিনি ওকে নিয়ে সারা পৃথিবী চক্কর মারেন।

বন্ড কৌতূহল নিয়ে শুনেছে — বাঃ, তারপর?

— এক জায়গায় বেশি দিন থাকা টিফানির ধাত্ নয়। সুতরাং ও ঘুরতে থাকে — হ্যারল্ডের ক্লাব, সেরাফিসোর সঙ্গে পরিচয়। সেই সূত্রে লাভেগাতে টায়ারায় কাজ পায়। এখানেই রয়েছে এখনও। বেশ কয়েকবার ইউরোপ ঘুরে এসেছে। তবে ওই মাস্তানদের অত্যাচার ভোলেনি। তাই পুরুষ বিদ্রোহ রয়ে গেছে।

বন্ডের মনে পড়ে যায়, নিঃসঙ্গ মেয়েটির ঘরে রেকর্ডে কী সুর বাজছিল।

বন্ড বলে — আমার অবশ্য মেয়েটিকে ভালোই লাগে। ... আচ্ছা ফেলিক্স, আমরা দুজনেই এখন একই বাঘকে শিকার করতে যাচ্ছি। তাইতো? দুজনে, দুদিক থেকে।

লিটার বলে — তাই জন্যেই এখন থেকে একটু দূরে থাকা ভালো। ঠিক আছে, প্লাজার সামনে তোমাব সঙ্গে দেখা হবে। নটার সময়। দুই বন্ধু আপাতত বিদায় নেয়।

॥ নয় ॥

— তুমি মোটেই ভেবনা তোমার সঙ্গে আমি বিছানায় রাত কাটাব!

টিফানি কেস্ -এর সাফ কথায় চমকে ওঠে বন্ড। যদিও হেসে একটা স্মার্ট উত্তর দেবার জন্য তৈরি হয়।

টিফানি বলে — কেন। মিছিমিছি আমার পেছনে পয়সা খরচ করছ? যতই মদ খাওয়াও, আমি একটার পর একটা খেয়েই যাব। সে ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু আমি মোটেই মাতাল হব না। তোমার ইচ্ছেও পূরণ হবে না। আমিও চাইনা। তুমি একটা মিথ্যে আশা মনে পুষে রেখে আমার জন্য দেদার ভদ্রকা মাটির পিছনে পয়সা ঢালবে।

বন্ড বলে — বাঃ! সুন্দর বলেছ। ডিনারের অর্ডার কিন্তু দেওয়া হয়নি। এস। আমরা শেল ফিস আর হক্ খাই। তাতে নাকি মন ভালো থাকে!

— খাবার খাইয়েও কোনো লাভ নেই। বিছানায় আমাকে কিছুতেই পাবে না। তবে যদি পয়সা ওড়াতে চাও তাহলে কেভিয়ার খাওয়াও, একে ইংরেজরা বলে কাটলেট। আব কিছুটা শ্যাম্পেন। আজ হঠাৎ এক হ্যান্ডসাম ইংরেজের সঙ্গে এখানে খেতে এসে গেছি। তখন একটু সেলিব্রেট তো করতেই হবে।

বন্ডের হাতে হাত রাখে টিফানি। তারপর বলে— শোনো, আজকে আমিই পেমেন্ট করব। 'সেলিব্রেট' বললাম যখন!

ওর নাম ধরে ডাকে বন্ড— টিফানি, ডোন্ট বি আ ফুল! সঙ্কেটায় আমিই ইচ্ছেমতো খরচ করব। আমি মি. ট্রির সঙ্গে বাজি জিতেছি।

শেডী ট্রি-ব নামটা সুর কাটিয়ে দিল। টিফানি বলল— তোমার পাওনা মিটে যাবার কথা!

মার্টিনী আসে। টিফানী এক চুমুকে অর্ধেকটা সাবাড় করে দেয়। বলে— এখনি হঠাৎ বৃকের একটা আচমকা ব্যথা সামলে নিলাম।

কিছুক্ষণ হালকা গল্প চলতে থাকে। আবেকটা মার্টিনী চায় টিফানি। তাবপর বলে— আর ডিনার করে কী হবে?

বন্ড খাবারের অর্ডার দেয়। ঠাট্টার সুরে মন্তব্য করে— আমার ছেলে থাকলে উপদেশ দিতাম— যত খুশি খাও, কিন্তু এমন কিছু খেয়ো না যা তোমাকে খায়।

— দূর! গো টু হেল! এইটুকু তো জীবন! কখন হঠাৎ শেষ হয়ে যাবে!

জামা-কাপড় নিয়ে ঠাট্টা হয়। বন্ডের কথায় তোষামোদের সুর।

— এই কালো পোশাকে আজ বাজে তুমি নিউইয়র্কের সবচেয়ে সুন্দরী স্মাগলার।

ঘুরিয়ে দু-চারটে ‘সেক্সি’ জোক্ কবে বন্ড। গাছের ফল খাব কী! গাছের গায়ে হাতই দিতে পারছি না। ঠাট্টাটায় খিলখিল করে হেসে উপভোগ করে টিফানি। হাসতে হাসতে মার্টিনার গেলাস খালি করে ফেলে। এই নিয়ে তিনবার।

তার বৃকের উন্মুক্ত অংশটায় যে বন্ডের চোখ বারবার যাচ্ছে সেটা বুঝতে বাকি থাকে না। টিফানি প্রশ্নয় দেয়। তার দৃষ্টির ভাষা অনেকটা এই রকম : ‘ধৈর্য ধরো, জোর খাটাবে না। তোমাকেও আমায় ভালো লাগে।’

রেস্টুরেন্টে সামান্য হল্পাবাজি শুরু হয়েছে। টিফানি বলে— আচ্ছা, কাল আমাদের কী কাজ? লা ভেলায় যাবনা কেন? তুমি কী করছ?

শ্যাম্পেনে চুমুক দেয় বন্ড।

— আমি যাচ্ছি সারাটোগায়। বেস খেলব। একটা ঘোড়া আমায় কিছু পাইয়ে দেবে।

— ওঃ! ওটা একটা চালিয়াতি!

শ্যাম্পেনে চুমুক দেয় টিফানি।

— শোনো, শেডী ট্রি তোমায় দলে নিতে চায়।

বন্ড বুঝছে, মেয়েটা ছল-চাতুরি জানে। এখন মনের আবেগকে প্রশ্নয় দিয়ে লাভ নেই। অভিনয় চালিয়ে যেতে হবে।

— ভালো কথা। আমিও তো কাজ খুঁজছি। আচ্ছা, মি. শেডী ট্রি-র দলটা কিসের?

গুপ্তচর মেয়ে। চোখ-মুখ দেখে কিছু বোঝা মুশকিল।

টিফানি বলে— ‘স্প্যাংগল্ড সব’। স্প্যাংগরা দুই ভাই। আমি ওদেরই একজনের হয়ে লা ভেগাতে কাজ করি। আরেকজনের কথা ঠিক জানি না। শুনেছি ইউরোপে থাকে। আরেকজন আছে, তার নাম এ-বি-সি। ইনি হিরের চোরাচালানের হুকুমদাতা। আর সেরিফেসো, ওদের এক ভাই, তার কথা তো বললাম, আমার বস্। জুয়া এবং ঘোড়া— তার প্রধান দুই নেশা।

— কী কাজ কর সেখানে?

— কাজ করি। দ্যাটস্ অল।

— ভালো লাগে?

কথার জবাব এড়িয়ে টিফানি বলে— শেডী লোকটা তো খারাপ নয়। যদিও মারাত্মক জটিল! ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার পর দেখে নেবে তোমার আঙুলগুলো ঠিক ঠিক আছে কিনা! একগাদা গুন্ডা রয়েছে ওর দলে। হাঃ হাঃ, তোমার মতোই।

বন্ড বলে — দেখ, আমার কাছে এটার একটা মানে। আমার রোজগারের পথ। আমার চলবে কী করে?

- অনেক রকম পথ আছে বোজগারের।
- তাহলে, তুমিই বা এই পথে রয়েছ কেন?

বেয়ারা কাটলেট আনে। সঙ্গে মুসেলাইন সস- দেওয়া অ্যাসপারাগাস।

আরেকজনের আগমন। ক্রীগলার ব্রাদার্স-এর একজন। ওবা এই টোয়েন্টিওয়ান ক্লাবের মালিক।

— আরে, টিফানি। অনেক দিন বাদে—

— ওঃ ম্যাক! হ্যালো— কেমন চলছে কারবার।

— মন্দ বলা উচিত না। কী লাগবে বল।

— সাদা ক্রিমের সঙ্গে স্টিংগার।

— ও. কে.।

চলে যায় লোকটি। ওরা দুজনে আবার হিরের ব্যবসার খুটিনাটি আলোচনা করে। বন্ড একবার বলে বসে — আচ্ছা, আমরা দুজনে মিলে তো এই কারবারটাই করতে পারি।

বন্ডকে সতর্ক করে দিয়ে আপত্তি জানায় টিফানি।

— জেনে রাখো, আমাদের উপরেও নজর আছে। এদের রহস্য আমার কাছেও পরিষ্কার নয়। এ-বি-সিকে আমি এখনও চোখেই দেখিনি। এটা সাধারণ অপরাধের লাইন নয়। এই ব্যবসা ভয়ংকর জটিল!

বন্ড ভাবছে, যদি মেয়েটার কাছ থেকে এ-বি-সির টেলিফোন নম্বরটা পাওয়া যায়। সে বলে— থাক, অনেক হয়েছে। এসব আলোচনা এখন বাদ দাও। ... কোথাও যাবে?

— না, আমার নেশা এসে গেছে। ঘরে ফিবব।

বাইরে আসে ওরা। টিফানি বলে — আমিও অ্যাস্টরে আছি।

ভালো কথা। তবে সাবধানে চলতে হবে এর সঙ্গে।

হোটলে ওরা এমন ভাবে নামে, যেন স্বামী-স্ত্রী। অসুস্থ স্ত্রীকে ধরে নামাচ্ছে স্বামী! লিফটম্যান বন্ডের নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচতলায় আসে। লিফট থেকে নেমে জোরে জোরে হাঁটে টিফানি। বন্ড ওর পিছনে। টিফানি আপত্তি করে না।

নিজের ঘরের দরজার কাছে থামে টিফানি। তারপর ঝট করে ঘুরে দাঁড়ায়। কঠোর গলায় শুরু করে— শুনুন মি. বন্ড—

তারপরেই ছলছল করে ওর চোখ। বলে— সাবধানে থেকো জেমস।

হঠাৎ আবেগে বন্ডের গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে। বলে— তোমাকে আমি হারাতে চাইনা। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুজ্ ইউ।

বন্ডকে আবার চমকে দিয়ে তার সুদীর্ঘ চুম্বন!

বন্ড অবাক হয়ে লক্ষ করে— এই চুম্বন মध्ये দেহ বা সেক্স প্রধান নয়, যেন অন্য কিছু—

ওকে জড়িয়ে কাছে টেনে পালটা চুম্ব দিতে যায় বন্ড। ছিটকে সরে যায় টিফানি। দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করার আগে বলে— এখন আমার সামনে থেকে চলে যাও। যাও, এখুনি যাও!

॥ দশ ॥

শনিবার। বাইরে ভীষণ গরম।

তাই অ্যাস্টরে নিজের ঘরেই দিনটা কাটিয়ে দিল বন্ড। লন্ডনে একটা ম্যাসেজ পাঠাতে হবে : 'আজ সপ্তাহের ষষ্ঠ দিন। অষ্টম মাসের চার তারিখ।

তারপর রিপোর্টে কিছু তথ্য। রিপোর্ট শেষ হয়েছে এই কথা জানিয়ে যে, মি. সেয়-ই হচ্ছে আসলে জ্যাক স্প্যাংগ! তাছাড়া আরও কিছু পয়েন্ট। শেভী ট্রির মাধ্যমে হিরে হাউস অব ডায়মন্ডস

এ যায়। অবশ্য এ বি সি হচ্ছে স্মাগলিং-এর কর্তা। মি সেয ব উপব লন্ডন যেন কড়া নজর বাখে। খুব সম্ভব আফ্রিকা থেকে হিবে আসে।

বন্ড জানায়। গোপনে অগ্রসব হওয়াই তার কাম্য। টিফানি কেস নামে একটি মেয়ের সাহায্য নিচ্ছে সে যাতে সেয়াকিমো স্প্যাংগকে পাকড়াও কবা সম্ভব হয়।

এবাব স্নান করে বন্ড। দারুণ গবমে এই নিয়ে চারবার স্নান কবা হল। বেসের খবর পড়তে গিয়ে দেখে। 'শাই-স্মাইলে'র নাম কোথাও নেই।

পরদিন রবিবার।

ন'টার সময় একটা ছুডখোলা স্টুডিবেকার এসে থামে। লিটারেব গাড়ি। বন্ড স্যুটকেস নিয়ে তৈবি ছিল। সে ওঠা মাত্র বোতাম টিপে ছুড লাগিয়ে দেয় লিটার। এক হাতে গাড়ি চালায় লিটা,ব, স্টিয়ারিং ধরে। 'ছক-হাত' দিয়ে গীয়ার!

গাড়ি ছোট্টে সেন্ট্রাল পার্ক পেরিয়ে। সামনে হাডসন নদী। তার মানে, এখনও প্রায় দুশো মাইল।

লিটার বলে— টেকোনিকের রাস্তা ধরেই আমরা যীবে সুস্থে যাব। তাছাড়া তাড়াও নেই বিশেষ। প্রয়োজনে হাই স্পিড তুলব। পুলিশ ধরবে না। কেননা ধরতে না পারলে ওদের মান থাকবে না।

গাড়ির এক্সেলেটারে চাপ দিয়ে লুকিং গ্লাসে দেখে নিয়ে গতি বাড়িয়ে দেয়। আশি, নব্বই, একশো দশ। সামনে একটা ব্রিজ, লিটার ব্রিজটা পেরোল সম্তর স্পিডে।

কিছুক্ষণ লিটারের গাড়ির গুণাগুণ নিয়ে কথা হয়। এটা স্টুডিবেকার নয়, স্টুডিল্যাক। অর্থাৎ, স্টুডিবেকারের সঙ্গে ক্যাডিল্যাক ইঞ্জিন। ওরা হাডসন ব্রিজে পৌছে যায়। এখানে চুঙ্গি কর দিতে হয়। দু'পাশে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু বন্ডের মাথায় সবসময় ভবিষ্যতের চিন্তাগুলো সব কিলবিল করে— টিফানি, যোড়াদৌড়, শক্রপক্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাড়ে বারোটা। ওরা লাঞ্চ সারতে একটা হোট্টেলে ঢোকে, 'চিকেন ইন দ্য বাস্কেট'। লাঞ্চ সেবে দু'বোতল হাই লাইফ বীয়াব নেয়, তারপর বরফ দেওয়া কফি। এরপর সারাটোগার পথে আবার।

লিটার জানায়, সারা বছরের প্রায় এগারো মাস জায়গাটা প্রায় মরুভূমি। লোকে উষ্ণ প্রস্রবণ থেকেও জল পায় না। জীবন বলতে কিছু নেই। লোকেরা রাত নটার মধ্যে শুয়ে পড়ে। একমাত্র আগস্ট মাসটা গমগম কবে। নানা উৎসব বিশেষ কবে আমেরিকার বডোরকম যোড়াদৌড়। রেস কমিটি এইসময় নড়েচড়ে বসে। পুকুব, ফোয়াবা সাজানো হয়।

এবার ট্রব-এর আঁকাবাঁকা বাস্তু। তারপর সারাটোগা গ্রাম। একসময় সমাজবিরোধীদের ডেন। টেলিভিশনে এসব প্রকাশ হয়ে যায়। চাষিরা খেপে উঠে সমাজবিরোধীদের তাড়িয়ে দেয়। তারা লা ভেগায় পালিয়ে যায়। তবুও বলা যায়, দুর্বৃত্তরা এখানে বছবছর রাজত্ব করেছে। নিজেরা একটা মিউনিসিপ্যাল গভর্নমেন্ট তৈরি করেছিল। পাততাদের দালাল আর রেসকোর্সের জোচ্চোররা জমিয়ে বসেছিল। এখনও কিছু গোপন জুয়া আব নারীদেহের ব্যবসা চলছে। কিছু ভালো খেলোয়াড় অবশ্য এখনও এখানে আছে। তবুও সামগ্রিকভাবে সারাটোগা এক জঘন্য জায়গা।

বন্ড জিজ্ঞেস করে— শুনেছি আগের চেয়ে অবস্থা কিছুটা ভালো হয়েছে।

— হ্যাঁ, কিছুটা। তবে পুরোনো ক্রিমিন্যালদের শিষ্যরা নতুন মালিক হয়ে ফিরে আসছে, যেমন এই স্প্যাংগরা, ওদের নতুন কায়দা যোডা নিয়ে যোঁকাবাজি।

ডানদিকের রাস্তায় বিরাট সাইনবোর্ড: সাগামোর -এ আসুন। এয়ার কন্ডিশনড সুন্দর ঘর, টেলিভিশন। এখান থেকে সারাটোগা হট স্প্রিং মাত্র পাঁচ মাইল দূরে।

বন্ড জিঞ্জেরস করল— হোর্ডিং-এর লেখাগুলি কী সত্যি?

- তা ঠিক। থাকার পক্ষে সাগামোর খুব সুন্দর জায়গা।

॥ এগারো ॥

হ্যাঁ, অবশ্যই সুন্দর জায়গা। 'রাস্তার দুধারে' সবুজ গাছের সাবি। পুরোনো স্টাইলের বাড়িগুলোকে খেলনার মতো লাগে। সর্বত্র ঘোড়া আর ঘোড়া নিয়ে যত্ন আর চিকিৎসার ব্যবস্থা। রাস্তায় চিহ্নি চিহ্নি ডাক। প্রায় কান ফাটিয়ে দেয়।

সাগামোর-এ এই মোটেলটা একদম শহরের শেষে। এখান থেকে রেসকোর্স প্রায় সাত আট মাইল হবে। প্ল্যান হয়েছিল, বন্ড আর লিটার প্রকাশ্যে মিশবে না। শুধু মাঝে মাঝে রেসের মাঠে ভিড়ের মধ্যে ওদের দেখা হবে। তাছাড়া রাতে 'দ্য টেয়ার' রেস্তোরাঁয় ওরা কথা বলতে পারবে।

সাগামোর অফিসের খাতায় বন্ড সই করে— 'জেমস বন্ড, হোটেল অ্যাস্টার, নিউইয়র্ক ইত্যাদি।

বন্ডের ঘরটা ছিমছাম। বিছানার পাশেই টেবিল চেয়ার। দেওয়ালে ছবি, টেবিলে প্ল্যাস্টিকের অ্যাশট্রে। খাবার জায়গাটাও ভালো, আমেরিকান স্টাইলে। বিছানায় শুয়ে 'সারাটোগিয়ান' পড়তে পড়তে দেখল, টি বেল নামে একজন শাই স্টাইলের জকি হবে।

রাত দশটা। লিটার আসে। বলে— কিছুটা এগিয়েছি। ভোর পাঁচটার উঠতে হবে। ওরা সাড়ে পাঁচটায় শাই স্টাইলকে চার ফার্লিং ছুটিয়ে প্র্যাকটিস করবে। ওই সময় কে কে থাকে, সেটা দেখা দরকার। আশ্চর্য, এই ঘোড়াটার এবং টায়ারা-র পরিচালকের একই নাম, 'পিসারো'। এরও আবার নানা ক্রিমিন্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। জকির নাম বেল। ভালো জকি, তবে সুযোগ পেলে ঘুস-টুস খায়। আমি ওকে একটা টোপ দেব। অবশ্য ঘোড়ার একটা ট্রেনার আছে। সে ব্যাটার নাম বাড-রোজি বাড। হেন পাপ নেই যা ও করে না। তবে গত কয়েক বছর কিছু দোষ কেটেছে। মোট কথা, এই হচ্ছে নাটকের চরিত্রগুলি। সবাই একে একে মঞ্চে হাজির হবে। আমাদের কাজে, এদের অভিনয় ভুল করা।

-- এদের খরচপত্র কে যোগায়?

— ঘোড়াদের বিগ বসরা.... যা হোক তুমি ভোর পাঁচটায় রেডি থেক। আমি চলি।

পরদিন ভোরের বাতাসে সুগন্ধ। ঘোড়ার দল আস্তাবলে। ওরাও ভালো বুঝতে পারে যে, আজ ভালো দৌড় আছে। পাখির কলরব, বাতাসে মিশ্র গন্ধ— কফি, কাঠের ধোঁয়া আর শিশির। গাছগুলো থেকে একে একে ঘোড়া আর মানুষ বেরিয়ে এসে মাঠের পাশে একটা ঘেরা জায়গায় জমা হচ্ছে, ঘোড়াদের পিঠে কন্ডল, লাগাম ধরে এক একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে।

বন্ড আর লিটারও ঠিক সময় হাজির। তবে যথেষ্ট সতর্ক ওরা। দেখতে পায়, বাঁদিকের একটা গাছের নীচ থেকে অকস্মাৎ তিন ব্যক্তির আগমন। ওরা যেন কোনো ইশারা দেখে ছুটে এসেছে, সঙ্গে একটা বড়ো ঘোড়া, বাদামি রং। ঘোড়াটার চারটে পা যেন সাদা মোজায় ঢাকা।

লিটার চাপা গলায় বলল— ওদিকে তাকিয়ে লাভ নেই। বরং ওই দেখ, পিছন দিক দিয়ে যেগুলো আসছে, আর ওই যে একটা ঘোড়া দেখছ, সেটা আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ট্রেনারের আন্ডারে, 'সানি জিম'। ওদিকে উডওয়ার্ডের ঘোড়া।

বন্ড সুবাধ্য ছাত্রের মতো শিক্ষা গ্রহণ করছে।

লিটার বলে— আমি এক দিকটা দেখছি, তুমি ওপাশটা দেখ.... ওই দেখ একটা ছেলে শাই স্টাইলকে নিয়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে রয়েছে বাড। মালিকও আছে। যাকে লোকে বলে 'মাথায় গোবর

পোরা।' তবে ঘোড়াটা দেখতে খুব সুন্দর, তাই না? .. এবার দেখ। কার্লং পোস্ট দিয়ে ছুটেছে হ্যাঁ, আমাদের দেখতে পেয়েছে। সে নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। শাই স্মাইল ট্র্যাকের একদম শেষে। আর পিসারো পাঁচ নম্বর পোস্টে।

বন্ড দেখল, বাদামি ঘোড়াটা যেন উড়ছে। একটা পাক শেষে করল। ওর ছোট্টা দেখে বন্ডের মনেও উত্তেজনা। মাটিতে ঝড় উঠছে। বাচ্চা জকিটা কোনোমতে রেকাবে পা রেখে ঘোড়াটার পিঠে চেপে রয়েছে।

লিটার বলল— এই ঘোড়াটা কিন্তু নকল শাই স্মাইল। তবে আসল শাই স্মাইলের চেয়ে ভালো। স্টপ ওয়াচ লক্ষ রেখো। বাজিমাত হতে পারে। ... আরেকটা দেখতে হবে, ওই বেল নামে জকিটা কী চাল চালে।

এরপর দুজনে ব্রেকফাস্ট সারে, দিনটা খুব সুন্দর। স্থানীয় ভাষায় কথা বলছে বেশিরভাগ মানুষ। নানা টাইপের ঘোড়ার মালিক হাজির। বেশ কিছু নিগ্রোও রয়েছে। এই রেস সংস্থাদের আইন একটু অন্য ধরনের। বৈধ অবৈধ মিশিয়ে। অর্থাৎ, রেসের সঙ্গে মদ ও মেয়েমানুষের ব্যবসা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ফলে লক্ষ লক্ষ ডলারের লেনদেন চলে।

লিটার বলে— আমরা যে জিনিসটা খাচ্ছি, তার নাম বুরবোঁ, প্লেন ওয়াটারের সাথে।

ওরা স্টেক খায়। তারপর উঠে পড়ে। এন্টি-গেটটা কাঠের, পাশে কোনো দেওয়াল নেই। একটা লোক ঘোড়ার বংশ পরিচয় জানাচ্ছে, নীলাম ডাকছে। নেহাতই একঘেয়ে সুর।

বন্ড গিয়ে এক মহিলার পিছনে বসে, মহিলা ভীষণ রোগা। গায়ে একগাদা গয়না। তার পাশে বসা লোকটা হয় স্বামী নয় ট্রেনার। মহিলা ন হাজার ডলারে ২০১ নং বে'কোন্ট ঘোড়াটা কিনল।

লিটার ফিসফিস করে বলল— লোকটাকে ঘুস দিয়ে ম্যানেজ করেছি। তিন হাজার ডলার নেবে। চলি। কাল সকালে দেখা হবে।

বন্ড সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে। লিটারের দিকে মুখ ঘোরায় না। ওই তো ওর টি বেল জকিটা!

কেন জানি মনটা খারাপ হয়ে যায় বন্ডের।

॥ বারো ॥

দূরবিন হাতে দেখতে থাকে বন্ড।

শাই স্মাইলের মালিক এক মনে কাঁকড়া খাচ্ছে। তার সামনে আর একটা ক্রিমিন্যাল। সে রোডি-বাড। সে আহায়ে মস্ত।

পিসারোকে বলা যায় এক নাযক— বিভীষিকা এবং চূড়ান্ত প্রহসনের। ছুঁচের মতো চোখ, বড়ো বড়ো নাকের ফুটো, মাথাটা একটা ব্লাডার। বিশাল বিদ্যুটে শরীরে ব্রাউন সুট। সেও একমনে খেয়ে যাচ্ছে।

ওদের আইসক্রিম খাওয়া শেষ হল।

এখন তিন নং রেসের ফলাফল নোটিশ বোর্ডে ঝোলানো হল। বন্ড দূরবিন সরিয়ে হাতে প্রোগ্রামটা নেয়। লেখা আছে : দ্বিতীয় দিন, ৪ আগস্ট, দ্য পারপিচুইটিজ স্টেক। বাজি— পঁচিশ হাজার ডলার। পাঁচ হাজার পাবে দ্বিতীয়, আড়াই হাজার তৃতীয়, বারশো পঞ্চাশ চতুর্থ। ঘোড়ার মালিক ট্রফি পাবে। এর পর রয়েছে ঘোড়া, মালিক, ট্রেনার, জকি প্রমুখের পরিচয়।

দুটো জোরালো ঘোড়ার মধ্যে একটা হচ্ছে 'কাম এগেন' (সি-ভি. হোয়াইটেস); আরেকটা 'প্লে অ্যাকশন' (উইলিয়াম উডওয়ার্ড)। প্রথমটা এক নং, দ্বিতীয়টা তিন নং। বন্ড দেখল, শাই

স্মাইল বয়েছে দশ নম্বরে, তার মানে তলার দিকে। আর পনেরো মিনিট পরেই দৌড় শুরু হবে। সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে থাকে বন্ড। লিটার নাকি জকির বাড়িতে গিয়েছিল। নিজের লাইসেন্স, পরিচয় ইত্যাদি জানিয়ে ওকে কাত করেছে। খুব গোপন ব্যাপার। কায়দাটা হচ্ছে, শাই স্মাইল জিতবে। কিন্তু তাকে বাতিল করে দেওয়া হবে। তবে জকি আপত্তি তুললে সেটা সহজ হবে না। পাশের ঘোড়ার বিরুদ্ধে ফাউল বা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হবে। যাই হোক, কাজটা জটিল। এখন দেখা যাক, লিটারের কায়দা আর বেল-এর ঘুস খাওয়ার কী ফল হয়।

বন্ডের পকেটে রয়েছে ঘুসের টাকা। অর্থাৎ, দুহাজার ডলার। শাই স্মাইল হারলে বন্ড সেই টাকাটা পৌঁছে দেবে।

দূরবিন চোখে সারা মাঠটা সার্ভে করে বন্ড। মোটা মোটা পোস্টে অটোমেটিক ক্যামেরা। রেসের ছবি তোলা মাত্রই স্টুয়ার্টদের কাছে পৌঁছে যাবে।

আর পাঁচ মিনিট। একশো গজ দূরে প্রথম গেটটা খুলছে। বন্ড বোঝে, ক্যামেরাই সব। যেটা শেষ পোস্টে লাগানো। প্রথমে আসে 'কাম এগেন', যেটা দ্বিতীয় ফেভারিট। তারপর একে একে 'প্লে অ্যাকশন' এবং অন্যান্য ঘোড়াগুলো। শাই স্মাইলের দর একটু বেড়েছে। লাউড স্পিকারে ঘোষণা চলছে। প্রচন্ড জোরে বেল বেজে ওঠে এবার। দর্শকদের হুলা। পাশাপাশি চাপা উত্তেজনা। ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়তে থাকে। বাতাসের চেয়েও দ্রুত গতিতে যেন ছুটছে ওরা। দূরবিনে জকিদের পিঠের অংশ দেখা যায়, কিন্তু নম্বর পড়া কঠিন।

তবু বন্ড বুঝতে পারে, দশ নম্বর বেশ এগিয়ে আছে।

কিন্তু সব মিলিয়ে সবচেয়ে এগিয়ে পাঁচনম্বর কালো ঘোড়া। এটা কার কে জানে? রেসে এবার আণ্ড-পিছু শুরু হয়েছে। এক নম্বর এবং তিন নম্বর এবার এগিয়ে পাঁচ নম্বরকে ধরে ফেলে। ওদের পেছনেই দশ নম্বর। বাকি ঘোড়াগুলো অনেক দূরে পিছিয়ে পড়েছে। টি-বেল-এর বাদামি ঘোড়া জোর কদমে এগোচ্ছে। তিন নম্বরও এগিয়ে এল। ফলে পাঁচ নম্বর পিছনে পড়ে গেছে। এক নম্বর কিছুটা এগোল। তিন নম্বর এক নম্বরকে ছাড়িয়ে গেল। তার ঠিক পেছনে দশ নম্বর — মানে শাই স্মাইল, যে এখন এক নম্বরের সমান্তরাল ছুটে চলেছে।

উত্তেজনায় সকলের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত কী হবে!

বেল ঘোড়ার পিঠে মাথা গুঁজে ছুটছে। শাই-স্মাইল কী আইন ভঙ্গ করল? কারণ সে তিন নম্বরের মাথা ঢেকে দিয়েছে। প্লে-অ্যাকশন-এর জকি রেকাবে পা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে নাকি? কিন্তু হাওয়ার বেগে এগিয়ে গেছে শাই-স্মাইল।

দর্শকের একটা বড়ো দল ক্ষুব্ধ। তারা চিৎকার করছে।

বন্ড দূরবিন রাখে।

ফলাফল: প্রথম—বাদামি ঘোড়া শাই স্মাইল। বেশ পিছিয়ে প্লে-অ্যাকশন দ্বিতীয়। 'কাম এগেন' তৃতীয়, যদিও সে প্লে অ্যাকশনকে হারানোর আশ্রয় চেষ্টা করেছিল শেষ দিকে।

শাই-স্মাগলিং মোটেই বে-আইনি কিছু করেনি, নিয়ম ভাঙে নি। করলেও, সেই অভিযোগ প্রমাণ করা শক্ত। মাথা নীচু করা নিয়ে কোনো গোলমাল হতে পারে না। কিন্তু প্রতিবাদের ঝড় চলছে, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাট-কল, সিটি মারা, জোরালো শিস্।

বোর্ডে লেখা হচ্ছে রেজাল্ট: শাই-স্মাইল, নং ১০, ফাইভ লেংথস্; প্লে-অ্যাকশন, নং ৩, ১/২ লেংথ। কাম এগেন, নং ১, ফ্রি লেংথস্। পিরানদোলা, নং ৭, ফ্রি-লেংথস্।

ঘোড়ারা ফিরেছে। ওজন নেওয়া হবে। টি. বেল এর হাসি মুখ।

ঘোষণা হচ্ছে : প্রিন্স শুনুন ! প্লে-অ্যাকশনের জকি টি লাকি শাই-স্মাইলের বিরুদ্ধে নিয়মভঙ্গের অভিযোগ এনেছে। টিকিটগুলো যত্নে রাখুন।

বিচারকরা এবার ক্যামেরায় ধবা দৃশ্যগুলো দেখবে। বন্ডের হাত ঘামছে। বেল এবং ৩নং এব জকি, উভয়েই ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

আবার ঘোষণা : প্রিন্স শুনুন। ১০নং ঘোড়া শাই স্মাইল বাতিল। ৩নং ঘোড়া প্লে-অ্যাকশন জয়ী। এটাই ফাইনাল সিদ্ধান্ত !

দর্শক উল্লসিত। উচ্ছ্বসিত হর্ষধ্বনি !

বন্ড আড়ম্বল্য কাটিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বার-টা কোন দিকে ?

টাকাটা দিতে হবে। বেলকে টাকাটা কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় ?

এবার শেডী ট্রিকে জানাতে হবে, তার পাওনা পাঁচ হাজার ডলার সে পাঠায়নি। শাই-স্মাইল জেতেনি।

লিটারে কায়দা জয়ী হয়েছে, জকিকে হাত করতে পারায়।

বন্ডকে এবার নিজের খেলা শুরু করতে হবে।

॥ তেরো ॥

একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। ছোটো লাল বাস, গায়ে লেখা 'রোগ প্রতিকারের কাদা এবং গন্ধক স্নান', এক ঘন্টা অন্তর অন্তর ছাড়ে। যাত্রী নেই বলা যায়। মাত্র একজন নিগ্রো স্ত্রীলোক।

চলতে থাকে বাস। মোড়ে এসে কোনও যাত্রী জোটে না। রাস্তার দুপাশে ফার গাছ। কিছু ঘিঞ্জি বাড়ি, খোলার চাল। চিমনি দিয়ে সরু ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

হটস্প্রিং-এর সামনে ভিড় নেই। বাস থামে। এটাই ঢোকর গোট। দুই বৃদ্ধ আর এক নিগ্রো মহিলা বাইরে আসে।

এটা আদিম পরিবেশ। তীব্র গন্ধকের গন্ধে গা ঘুলিয়ে ওঠে।

বন্ড চূপচাপ দেখতে থাকে। বাস চলতে শুরু করে। বাস থেকে নেমে বন্ড দেখে, সে একদম একা। চারপাশ ফাঁকা। কেমন একটা অস্থিরতা আসে। একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সে উপরে উঠে যায়।

রিসেপসন। প্রায়- অন্ধকার। এখানে ধোঁয়াও আছে। গন্ধকের গন্ধ আরও কটু। শো-কেসে একগাদা প্যাকেট। উপরে লেখা আছে! রোগ সারাতে এক প্যাকেট নিয়ে যান। নিজের চিকিৎসা নিজেই করুন।

রোগা-শীর্ণ এক মহিলা একটা প্রেমের গল্পের বই পড়ছিল। সে বলল — আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি ?

— কীসের স্নান এখানে ? কাদা, না গন্ধক ?

— কাদা।

— একটা টিকিট দিন।

— যদি একাধিক নেন, সস্তা হবে।

— না, একটাই দরকার। কত দিতে হবে ?

— পঞ্চাশ ডলার।

— কোন দিকে যাব।

— ডান দিকে, সোজাসুজি। আপনার জিনিসপত্র এখানেই রেখে যেতে হবে। ওপরে নাম লিখবেন।

ঘড়ি এবং পকেটের ছোটোখাটো জিনিস খামে ভরে নাম লেখে বন্দ। কিন্তু শার্টের পকেটে দু-হাজার ডলার আছে। সেটা---?

— থ্যাংকস। যান, এবার চান করে আসুন।

দুটো দরজা। দুটো কাঠের হাতের তির-সংকেত। লেখা আছে। ডান দিকে 'কাদা'; বাঁদিকে 'গন্ধক', ডাইনে যায় বন্দ। সুইং ডোর ঠেলে ঢোকে।

গরম ঘর। স্কাইলাইট আছে অবশ্য কিন্তু ধোঁয়ার গন্ধে ছেয়ে গেছে। খালি গায়ে, কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে দুটো ছেলে তাস খেলছে। একটা প্লেটের উপর অনেকগুলি চাবি। একজন বন্ডের দিকে একটা চাবি এগিয়ে দেয়। স্নানের জায়গা দেখিয়ে দেয়।

একটা ছোটো খুপরি। একটা ছিন্ন-জীর্ণ তোয়ালে রয়েছে শুধু।

পোশাক ছাড়ে বন্দ। অগত্যা সেই ছেঁড়া তোয়ালেই কোমরে জড়ায়। সাঁট খোলার সময় খেয়াল করে টাকাটা পকেটেই রয়েছে। রিভালবারটা হুকে ঝোলায়।

এবার পাশের ঘরে ঢোকে।

ওঃ, ঘর তো নয়, যেন একটা পোস্টমর্টেম রুম, অথবা মর্গ বলা যেতে পারে। মুখোমুখি একটা মোটাকা টেকো নিগ্রো। সে জিজ্ঞেস করে — কী অসুখ আপনার?

— কোনো অসুখ নেই। শুধু একটু কাদা মেখে মান করব।

— অল রাইট! হার্ট ঠিক আছে?

— আছে।

— আসুন। আমার সঙ্গে আসুন।

মেঝেতে পা পিছলে যাবার উপক্রম। চৌবাচ্চা টাইপের স্নানের জায়গা। কিছু লোক উলঙ্গ সারা গায়ে কাদা-মাটি মেখে পড়ে রয়েছে।

লোকটা বলে — এক মিনিট। আমি আসছি।

আরে, এর হাতেই এবার নিজেকে ছেড়ে দিতে হবে নাকি! ওকে স্নান এই করাবে বিদ্যুটে লোকটা! বন্ডের চরম বিতৃষ্ণা জাগে।

বর্ণ বৈষম্য, সাদা-কালো, ইংল্যান্ড-আমেরিকার চিন্তা আসে মাথায়। স্নানের জায়গাটা ভালো করে দেখে। বড়ো চৌকো পাকা ঘর। ইলেকট্রিক আলো। তবে মেঝেতে মরা পোকা ভর্তি। একটা কাঠের কফিনও রয়েছে। তার উপরে শুয়ে জ্যাস্ট লোক।

জঘন্য পরিবেশ!

কফিন নয়। বাস্ক। একটা খোলা হয়, তার মধ্যেই ঢুকতে হবে হয়তো। নিগ্রোটা সেটা টেনেটুনে সোজা করে। বাস্কে হাত ঢুকিয়ে কাদা-মাটি মছন করতে থাকে। রঞ্জে ভেজা রুমাল আনে।

নিঃসঙ্গ চারদিক। শুধু হোস পাইপের জলের শব্দ। একটা মোটা লোমশ লোক ওই কফিনের মতো বাস্ক থেকে উঠে পড়ে। নিগ্রোটাকে বলে —মি. ওয়েস, আমার আজ এই পর্যন্ত! ওয়েস তার গা মুছে দেয়। বেরিয়ে যায় সে।

কাদা-মাটি মিস্টিং চেক আপ করে ওয়েস এবার বন্ডকে বলে—অল রাইট, এবার আসুন!

ওয়েসের হাতে এবার চাবি আর তোয়ালেটাও দিতে হয়।

সম্পূর্ণ উলঙ্গ বন্দ!

— এ রকম স্নান আগে করেছেন?

— না।

— বুঝেছিলাম। তাই কাদা-মাটি ১১০-এ দিয়েছি। সহ্য হলে ১২০-১৩০ পর্যন্ত দেব। শুয়ে পড়ুন।

শুয়ে পড়ে বন্দ। গরম কাদা। ওয়াটার-প্রফ বালিশ! লোকটা বন্ডের গায়ে চাপড়ে চাপড়ে কাদা মাখায়। চকোলেট রঙের আঠালো মাটি! মুহূর্তের মধ্যে একটা কাদা মাখা ঢিবি হয়ে যায়। ঘড়িতে ছটা।

লোকটা বলে কুড়ি মিনিট থাকবেন!... কেমন লাগছে?

বন্দ পরিষ্কার কোনো উত্তর দেয় না। নিগ্রো চলে যায়।

হঠাৎ একটু পরে টি. বেল, মানে সেই জকির প্রবেশ। সেও সম্পূর্ণ উলঙ্গ। রোগা হাড় জিরজিরে চেহারা!

এক জনের গলা — এই যে টিংগালিং! আজ নাকি ঘোড়ার মাঠে কীসের গন্ডগোল হয়েছে।

— দূর দূর! ফালতু! আমি টমি লাকির উপর ঘোড়া চালাব কেন? মিথ্যে নালিশ করল।

সেই নিগ্রো ওয়েস এল এবার।

টি. বেল বলল— এই যে কালাচাঁদ, আমার দিকে একটু নজর দাও।

— ওজন কমাবে। একটা হাত ভেঙে দিলেই তো ওজন কমে যাবে?

এই রকম টুকরো টুকরো রঙ্গ-রসিকতা, পুরুষদের স্নানের আসরে। টি. বেলের বক্সে ১৩০ ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে।

টাকাটা তো ওকেই দিতে হবে! ও স্নান সারুক, তারপর—হঠাৎ কর্কশ স্বর।

— ডোন্ড মুভ এনিবডি! খুলি উড়ে যাবে।

দরজাটা খোলা। সেখানে দাঁড়িয়ে একজন আরেকজন এগিয়ে এসেছে। দুই বন্দুকধারী। কালো পোশাকে মুখ-শরীর ঢাকা, শুধু চোখের কাছে দুটো ছোটো ফুটো!

সবাই থমকে গেছে। ওয়েস বালতি হাতে দাঁড়িয়ে। বন্দুকের বাঁটের আঘাত লাগল বালতিতে, ছিটকে গেল সেটা। পেট চেপে গৌ গৌ কবছে ওয়েস।

- বদমাস জকিটা কই?

নিগ্রো ডান হাত দিয়ে টি. বেলকে দেখায়। রঙের ঠিক পাশের বাক্সেই তার আশ্রয়। বন্দ চিং হয়ে শুয়ে আছে। পাশেই টি. বেল।

— এই যে বাছা টিংগালিং বেল।

বেল চি চি করে — কেন? হয়েছেটা কী?

— ওং, ন্যাকা! যেন কিছু জানেনা! এংন তুমি বোধ হয় শাই স্মাইল বলে কোনো ঘোড়াকেও চিনতে পারবে না! ফাউল হল কেন?

— আরে, দিবি কেটে বলছি, কিন্তু ফাউল করিনি। অন্যায় কমপ্লেন করা হয়েছে।

— ওরা বলেছে, তুমি শালা বিট্রে করেছ! ইচ্ছে করেই ফাউল করেছ! তোমার ঘর তন্নাসি করে টাকা পাওয়া গেছে। কোথা থেকে এল?

হতচকিত বেল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুঁতো।

বেল চাঁচায় ওটা আমার টাকা।

আলোর সুইচে লুকিয়ে রাখা কেন?

— চুরি যাবার ভয়ে। আরে ঈশ্বরের দোহাই—

লোকটা বন্দুক হাতে টি. বেলের বাক্সের দিকে এগিয়ে আসে।

— বড়ো খাটনি গেছে তোমার। বিশ্রাম দরকার।

হঠাৎ নিষ্ঠুর উদ্ভাসে টি. বেলের বাক্সের ডালাটা ঢেকে ওকে আটকে দেয়। গরমে সিদ্ধ হয়ে যাবে টি. বেলের শরীর।

শয়তানের হাসি। - হাঃ, হাঃ, ওখানেই বিশ্রাম নাও। তারপর ঘুরে অন্যদের বলে--কেউ চালাকি করো না। পুলিশ আসবে না। লোকটার চোখের মণি দুটো সেন্দ্র হবার আগে কবর দাও।

॥ চোদ্দো ॥

ঘরে ফিরে অস্থির ভাবে পায়চারি করে বন্ড।

সামনের চেয়ারে উৎসুক লিটার।

— তারপর?

— শেষ পর্যন্ত আমরা অবশ্য উদ্ধার পাই। তবে বীভৎস ব্যাপার। নিগ্রোটা খাবি খাচ্ছে। লোকগুলো কাটা মুরগির মতো ছটফট করছে। ওঃ, বন্দুকধারী দুটো চলে যাবার পর, ওই এনট্রি-রুমে তাস-পেটা ছোঁকরাগুলো ছুটে এসে আমাদের, বাঁচায়। আগে টি বেলকে ল্যাংটো অবস্থায় কলের তলায় নিয়ে যায়। এক-এক করে সবাই বেরিয়ে আসি। নারকীয় দৃশ্য, কাদা-মাখা উলঙ্গ পুরুষের দল! অ্যান্থুলেপে খবর যায়। সবাই তখন কোনওমতে পালাতে চাইছে।

হইন্সির গেলাসে চুমুক দেয় বন্ড।

লিটার বলে— বন্দুকধারী দুটোকে ভালো করে দেখেছ?

— দরজার লোকটাকে পারিনি। যেটা কাছে এসেছিল, সেটাকে দেখেছি, বেঁটে, রোগা, ছাইরঙের প্যান্ট। বন্দুকটা মনে হয় যে °৪৫; কোন্টও হতে পারে। আর, লোকটার বুড়ো আঙুলে মস্তবড়ো একটা আঁচিল।

— ও, এবার বুঝেছি। ও ব্যাটার নাম উইন্ট! আর দরজার লোকটা নিশ্চয় কিড। ওরা মানিকজোড়, সবসময়ে একসঙ্গে কাজ করে। বলতে পার, স্প্যাংগদের বড়ো হুতিয়ার ওই দুটো। তবে, দুটোই মহা-শয়তান! এসব লোকদের অনেকরকম চুটকি নাম থাকে। বেশির ভাগই হোমো-সেঙ্কুয়াল, সমকামী। লোক দুটো অবশ্য এতক্ষণে ট্রেনে চড়ে পালিয়েছে। পুলিশকে কিছু বলব না, ওরা খুঁজে দেখুক!

উঠে পড়ে লিটার।

— এখন যাই। টি. বেলকে খুঁজে টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। ব্যাটা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে! এক ঘন্টার মধ্যে ফিরব। তারপর স্পেশাল ডিনার খাব দুজনে।

স্নান সারে বন্ড। গায়ে এক বিন্দু যেন কাদা না থাকে।

তার শেড়ী ট্রি-র কল্ বুক করে।

অপারেটর বলে— ওর লাইন এনগেজড। খুললে আপনার লাইনটা দেব কি?

— প্লিজ, অবশ্যই।

একটু পরে কুঁজোর গলা— ইয়েস, কে বলছেন?

— জেমস বন্ড। আগেও আপনাকে ধরার চেষ্টা করেছি, পারিনি।

— হ্যাঁ, বলুন।

— শাই-স্মাইলের টাকা আমি পাইনি।

— শুনেছি। ওই জকিটাই বিশ্বাসঘাতক। আর কি?

— আমার টাকাটা?

— ও, হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি একটু পরে ফোন করব। কোথায় উঠেছ তুমি? ঠিক আছে। আশাকরি, কাল সকালের মধ্যে পেয়ে যাবে। আমি পরে জানাচ্ছি।

অগত্যা—

একটু পরে সতিই ফোন আসে।

— কে বলছে? বন্ড তো? শোনো, লা-ভেগায় গিয়ে বাকি টাকাটা পাবে। নিউইয়র্কে এসে প্লেন ধবো। টিকিটের টাকা আমার নামে চালান করবে। সোজা লস্ এঞ্জেলস্ যাও। আধ ঘন্টা বাদে বাদে প্লেন ছাড়ে। টায়ারায় থাকার ব্যবস্থা আছে।.... আরেকটা কথা। বৃহস্পতি রাত দশটা পাঁচে বার-এ যাবে, পাশের ঘরটায জুয়ার টেবিল পাতা। মাঝের টেবিলে বসবে। ঠিক আছে?

— আছে।

— খেলবে। ৫ x ১০০০। বুঝেছ? তার বেশি খেলবে না। উঠে যাবে। খেলার পরে কাছাকাছিই থাকবে। টায়ারায় তোমার আগের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর পরে কী করতে হবে, সেই নিয়ে কথা হবে। বুঝেছ?

— বুঝেছি।

— কথা কম বলবে। কালকের খবরের কাগজ দেখে নিও।

ফোন কেটে দেওয়া হয়।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ে বন্ডের। ব্ল্যাকজ্যাক নামে লাল-নীল ঘুঁটি নিয়ে খেলা হত।

লিটার এখনও আসছে না! শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করে বন্ড।

একটু পরে লিটার আসে। শেষ খবরগুলো জানা যায়। কুখ্যাত দলের কেউ এখন নেই এখানে। পিসারো, বাড, উইন্ট, কিড— সবাই কেটেছে। এফ. বি. আই, এতক্ষণে তদন্ত শুরু করেছে। লিটারকে ভেগায় যেতে হবে, কোম্পানির নির্দেশে। সাই স্মাইলকে কোথায় পুঁতেছে, খুঁজতে হবে। হাড়গোড় অস্তত চাই।

লিটার বলে— এক কথায়, আমাকে এখন বাঘের গর্তে হাত ঢোকাতে হবে।

ওরা 'প্যাভিলিয়নে' আসে। সারাটোগার নামি রেস্তোরাঁ। মাখন মাখনো ভাপা চিংড়ি! ড্রাই মটিনা।

বন্ড বলে-- আশ্চর্য কাকতালীয়! তুমিও লা-ভেগায় যাচ্ছ, আমিও।

— আর কিছু আমার সম্বন্ধে আশ্চর্য লাগেনা এখন! এক গাদা রিপোর্ট লেখা বাকি। ওখানে কিউরিও নামে একটা লোক আছে। সে তোমায় সাহায্য করবে। জুয়াড়ি ডাকাতদের খবরাখবর ভালোই জানে! বিশাল জুয়া পট্টি— প্রায় পাঁচ মাইল জুড়ে।

এরপর জুয়া খেলার টেকনিক ও রুলস্ নিয়ে কিছু কথা হয়। ব্ল্যাক জ্যাক টেবিলে খেলার নামে কেমন জোচ্চুরি হয়, সেটাও ব্যাখ্যা করে লিটার। জনা যায়, ওদের কাছে গাদা গাদা সোনার তাল আছে। রাজ্যটার নাম নেভাদা— রেনো আর লা-ভেগা নিয়ে। এই জুয়ায় অনেকের বরাত ফিরে যায়। সুন্দব, সুখী জীবনে বিজ্ঞাপন চলতে থাকে। কোনও কোনও ক্যাসিনোয় দিনে আশি জোড়া ছকা-পাঞ্জা পড়ে। শ্লটমেশিনে গ্লাভস্পরা মেয়েরা কাজ করে। বুড়ি বুড়ি খুচরো পয়সা বওয়া হয়। মেয়েরা গ্লাভস্ পরে কেন জানো? না পরলে হাত কেটে রক্ত ঝরে!

বন্ড কয়েকটা পয়েন্ট নোট করে নেয়।

লিটার আরেকটা বিচিত্র বীভৎস অভিজ্ঞতার গল্প শোনায়। একবার পথে একটা গাড়ি চাকায় আটকে গিয়েছিল একটা কাটা হাত, আর সেই হাতের মুঠোয় ধরা ছিল গোটা এক প্যাকেট তাস! খুলি উড়ে গিয়েছিল, কিন্তু কবর দেওয়ার সময় ইচ্ছে করে মৃতের হাতে তাসের প্যাকেট গুঁজে দেওয়া হয়।

— নট ব্যাড! — বন্ড মন্তব্য করে।

দিনারেও নানারকম তথা জানা যায়। দলীল, খদ্দের ক্যাসিনোর খেলার টেবিলে নানা কৌশল। আলোর কাজ, টেবিলে গর্ত, টেলিভিশন ক্যামেরা— ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি। সবই ইলেকট্রিকালি অপারেটেড!

বন্দ বলে— চোরা পথের শেষ কোথায় কে জানে? আমি শুধু— ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছি। তাস খেলাই শুধু কাজ হতে পারেনা। স্প্যাংগ দলটাকে আচ্ছা শিক্ষা দিতে হবে। ওদের নিষ্ঠুর পাগলামির যেন শেষ নেই। নিগ্রোটাকে যেভাবে পেটালো, জকিটার গায়ে যেভাবে গরম কাদা লেপটে দিল, একেবারে পিশাচের মনোবৃত্তি!

লিটার বলে— আমি ওখানে তোমাকে ধরে ফেলব। এরনি কিউরিও নামে লোকটাকে যা বলার বলে দিচ্ছি। তবে ওখানে কিন্তু আইন বলে কিছু নেই। যদি থেকে থাকে, তা হল বন্দুকের আইন।

হুইকি খেয়ে মনটাকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করে বন্দ। বলে ফেলিঙ্গ, তুমি শাই-স্বাইলের ব্যাপারে কিন্তু দারুণ কান্ড করেছ। এখন স্প্যাংগ-এর ব্যাপারে জবরদস্ত কিছু একটা করতে হবে।

লিটার জানায়, সে এগোচ্ছে। সে স্প্যাংগ-এর পিছু নিয়েছে। আগে কবর থেকে ঘোড়াটাকে তুলতে হবে— মানে কঙ্কালটা। কিন্তু একটা সুবিধে আছে। ওরা বন্ডের আসল পরিচয় জানেনা। যদিও বন্দ কাজ সেরে ইংল্যান্ড চলে যেতে পারে, কিন্তু লিটারকে তো এই দেশেই থাকতে হবে। তাছাড়া ওরা ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ। লিটার যদি ওদের মেরেও ফেলে। ওদের দলের কেউ লিটারের বোনের বাড়ি পুড়িয়ে দেবে। ওদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। নেভাদায় সরকার চালাতে চায় ওরা।

হঠাৎ লিটার বলে— তোমার সেই জিনিসটা কোথায়? সাম্য-স্বাধীনতা শান্তির হাতিয়ার?

— মানে?

— মানে, সেই বেরেটা পিস্তলটা!

— সেটা ভালোই আছে।

যাবার আগে লিটার বলে— লক্ষ্যভেদ করা চাই।

॥ পনেরো ॥

প্লেনটা এখন উড়ছে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে।

হলিউড পেরিয়ে ক্যাজন পাস! সামনে হাই-সিয়েবার! ঝলমল করছে।

বন্দ দেখছিল, পামগাছে ঢাকা পথ! নানারঙের বাড়ি। বিমান তৈরির কারখানা। জেট রেসের ট্র্যাক। তারপর কিছুটা মরুভূমি, তারপর লস এঞ্জেলস। এর পরেই বারসেটা জংশন। ক্যালিকো পাহাড়গুলো ডানদিকে। পেছনে ধুধু ডেথ-ভ্যালি, হাডের গুঁড়োয় ভর্তি। সামনে আবার কয়েকটা পাহাড়।

ঘোষণা হল : বেস্ট বাঁধুন। সিগারেট নেভান। প্লেন এবার নামছে, টার্মিনাল বিল্ডিং প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে। স্টেপ্ ফেলতেই সি-সি শব্দ করে দরজা খুলে যায়। আবাব বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাগটা স্লোপ্ বেয়ে নেমে আসবে। তার জন্য দাঁড়াতে হয় বন্দকে। একটা প্রকাণ্ড ‘অক্সিজেন বার’। লাউড স্পিকার জানায় যার যার মাল তুলে নিন।

সুটকেসটা বুক জড়িয়ে বাইরে আসে বন্দ।

ভীষণ গরম। পাশ থেকে কে যেন বলে— আপনি কী টায়রায় যাচ্ছেন?

মুখটা চেনা-চেনা। বন্দ বলে— হ্যাঁ।

— গাড়ি এসেছে। আমার সঙ্গে আসুন। সূটকেসটা দিন।

ওরা এগিয়ে যায়। একটা সুন্দর শেভলে।

কে লোকটা?

গাড়ির নম্বর লাইসেন্স দেখে মেলায়। ‘আরনেস্ট কিউরিও, নং ২৫৮৪’। অর্থাৎ গাড়িটা কিউরিও পাঠিয়েছে। নাকি, এই ড্রাইভারই কিউরিও!

বন্দ জিজ্ঞেস করে— তুমি কী ফেলিক্স লিটারের বন্ধু?

— ইয়েস স্যার। তিনিই আপনার আসবার খবর পাঠিয়েছেন। যা দরকার হয় বলবেন। মি লিটার ওয়ান্ডারফুল ম্যান! ক’দিন থাকবেন?

— এখনি বলা মুশকিল।

— তবু আপনাকে জানিয়ে রাখি, আমাব সঙ্গে ‘ডিল’ হলে, ফুরনে কাজ হবে। ধরুন, দিন পঞ্চাশ ডলার।

— বেশ তো, ওই কথাই রইলো।

— খুব ভালো। তাছাড়া, আমি তো আপনার সাহায্যের জন্যই কাজ করব।... লক্ষ করেছিলেন টার্মিনালে একটা লোক আপনার কাছে ঘুরঘুর করছিল?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

— ওর কাছে যে শেভিং বক্স ছিল, তার মধ্যে আসলে ক্যামেরা রয়েছে। পঞ্চাশ ফুট দূরের ছবি তোলা যায়। আপনার সঙ্গে যদি বন্দুক না থাকে, তাহলে ঘরের দরজায় আর্মড গার্ড রাখবেন। কোটপরা লোক দেখলেই সন্দেহ হবে অস্ত্র লুকানো রয়েছে।

বন্দ বলে— ধন্যবাদ। সাবধানে থাকব।

এইবার একটা মেটেল। সুইমিং পুল আছে। একটা মেয়েকে ডাইভ দিতে দেখা যায়। রেস্টুরেন্টটার নাম ‘গ্যাসটেরিয়া’। পাশে বিজ্ঞাপনের বোর্ডে নানা প্রলোভনের কথা বলা হয়েছে। তদারকি করছে যে মেয়েগুলো, তাদের পরণে বিকিনি, অর্থাৎ টু-পীস স্নানের পোশাক। ব্রা ও জ্যাকিয়া। বেশ গরম পড়েছে এখন।

— এই জায়গাটার নাম ‘রু দ্য লা পের্’। আপনাব ডানদিকে ফ্রেমিংগো। এটা ১৯৪৬ সালে তৈরি হয়। জুয়ার স্বর্গ, তাছাড়া লাইসেন্সধারী বেশ্যার দল প্রচুর। বাগসি মিয়েরাল, এর নির্মাতা, গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ওদিকে রয়েছে ‘দ্য সান্ডস্’! কারবার চালায় জ্যাক ইনট্র্যাটার নামে একটা লোক। ভালো লোক, বোধহয় নাম শুনে থাকবেন!

ড্রাইভার পুরো জায়গাটার পরিচয় দেয়। ডেজট ইন, দ্য সাহারা, তাস খেলা নিয়ে নানা মজা ও গোলমাল! দ্য লাস্ট ফ্রন্টায়ার, তারপর থান্ডারবার্ড, তারপর দ্য টায়াব।

একসময় কিউরিও জিজ্ঞেস করে— স্প্যাংগ সম্পর্কে জানেন তো?

— বেশি কিছু নয়। তুমি কিছু জানালে ভালো হয়। এখন কী করব?

— যেমন আপনার ইচ্ছে।

বন্দ ভাবে, লাঞ্চ সেরে একটু সাঁতার কাটলে মন্দ লাগবে না। রাতটা অলসভাবেই কাটুক।

কিউরিও বলে— বেশ, কিন্তু প্রথম রাতে বুট-ঝামেলা এড়িয়ে চলবেন। সব ব্যাপার সহজভাবে নেবেন।

তারপর আবার বলে— শুনছি, ভারতে ‘টাওয়ার অব সাইলেন্স’ আছে। সেখানে মৃতের শরীর শকুনরা দশ মিনিটের মধ্যে সাবাড় করে দেয়। টায়ারায় হয়তো একটু বেশি সময় লাগে। ওরা ধীরে ধীরে মারতে ভালোবাসে।

গাড়ি থামে। প্ল্যাস্টার কবা গোলাপি রঙের বাড়ি। এটাই সেরাফিমো স্প্যাংগ-এর প্যালেস। বন্ড শুনতে পায়, কিউরিও বেয়ারাকে বলছে — এটা একটা ইংরেজ ভূত। দিন পঞ্চাশ ডলার দেবে। সুতরাং আমার ব্যাপারটা ... বুঝেছ তো?

॥ বোলো ॥

সাঁতার কেটে খুব একটা ভালো লাগল না।

ঘরে ফিরে সব জামা কাপড় খুলে শুয়ে রইলো বন্ড। ঘরটা এয়ারকন্ডিশনড। তাই গরম থেকে রেহাই পাওয়া গেছে!

টায়ারায় ছ-টা বাড়ি। সবগুলোই এক না-একটা রত্নের নামে। বন্ডের বাড়িটার নাম 'নীলকান্তমণি'। বেশ সাজানো। ঘুমিয়ে পড়ল সে।

টেপেরেকর্ডারটা খাটের তলায় চালু রেখেছিল। টেপে কিছু ধরা পড়েনি, একশো ফিতে শুধু খরচ হল।

রাত সাতটা। টিফানিকেও ফোন করে পাওয়া গেল না। মেসেজ রেখে দিল বন্ড।

আবার স্নান, কলঘরে।

বেয়ারা একটা ফলের বাস্কেট নিয়ে ঢুকল। কার্ডে লেখা, 'কর্তৃপক্ষ শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।' ফলের বাস্কেটের মধ্য থেকে একটা ফিল্মের রিল বের করে লোকটা, সেটার বদলে নতুন রিল রাখে।

রেকর্ডার ঘোরে। কোনো আওয়াজ নেই।

বার-এ যায় বন্ড। যা বলা হয়েছিল, সেই দৃশ্যই চোখে পড়ে। জুয়াড়িরা মার্শনের কাছে বসে কয়েন গ্রহণ করে। বহু বয়স্ক মহিলাও আছে। বোবিং!

হঠাৎ একজন 'জ্যাকপট' বলে চিৎকার করে। দৃশ্যটা বদলে যায়।

মার্টিনীতে চুমুক দিয়ে বন্ড জানলার দিকে তাকায়। নিওন আলোয় লেখা : দা হাউস অব ডায়মন্ডস! বেয়ারাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে— আচ্ছা, মি. স্প্যাংগ এসেছেন কি?

— দেখিনি। এগারোটা নাগাদ আসেন। তাকে চেনেন নাকি?

— না। মানে.... আলাপ করতে চাই।

ওদের নির্দেশ মনে পড়ে যায়। বিশদ নির্দেশ, ভুললে চলবে না। পাশের ঘর, মাঝের টেবিল। কত ডলার পর্যন্ত খেলতে হবে যেন!

একঘেয়ে খেলা। এগিয়ে যায়। দুটো দরজার লেখা : 'স্মোকিং রুম' এবং 'পাউডার রুম'! আরেকটা দরজা। লেখা 'দ্য ওপ্যাল রুম'। গোলা বন্দুক হাতে গার্ডেরা দাঁড়িয়ে।

একজন সুন্দরী হোস্টেস বন্ডকে একটা কোণের টেবিলে নিয়ে যায়। খোলা জামাব মধ্য থেকে অর্ধেকটা বুক দেখানোর চেষ্টা করে। সুন্দর বুক, কৃত্রিম নয়। হাসি মুখ। আরেকজন ওয়েট্রেস আসে। বলে— ওয়াইন ওয়েটার আসছে!

দেহের হলেও ডিনার আসে। অপূর্ব প্রতিভা খাবাব। তবে সার্ভিস খুব দেরি করে। বেশ কিছু বুড়ো খোকান ভিড়।

স্প্যাংগ কোথায়? বন্ড স্টেক এ কামড় মারে।

মেজাজটা খারাপ হতে থাকে।

ঠিক দশটা। তাস খেলতে হবে। সে যেন যন্ত্র।

অপেক্ষা করা, কখন অঘটন ঘটবে!

জুয়া খেলার পরিবেশ আপাতত শান্ত। মেয়ের সংখ্যা কম। ইভিনিং ড্রেস-এ দু-একজন সুন্দরী অবশ্য রয়েছে। একটা মাতাল অবশ্য বকে চলেছে।

হঠাৎ ওই তো! ব্ল্যাক জ্যাক টেবিলে টিফানি কেস। তাস বাটছে। এই কাজই করে নাকি এখানে?

ওই টেবিলে তাস দিচ্ছে সুন্দরী তরুণীর দল। গ্রে-স্কার্ট-ব্লাউজ, কালো বেন্ট। টিফানির মুখোমুখি বসলো বন্ড।

গুড্ ইভিনিং।

— হাই!

— সবচেয়ে কতবড়ো দান ধরা যায়?

— একহাজার ডলার।

— বেশ।— বলে বন্ড দশটা একশো ডলারের নোট দেয়। একজন নতুন তাসের প্যাকেট দেয়। টিফানি তাস নিয়ে শাফল্ করে চালাকি খাটায়। হাত-সাফাই-এর প্রশংসা করে বন্ড, মনে মনে।

টিফানি দুটো তাস নেয়। দুটো দেয়। ওপাশে লেখা . 'ডলার ষোলোয় টানবে, সতেরোয় টাকা দেবে। বন্ডের হাতে দশ আর গোলাম, টিফানির হাতে ষোলো। খেলা চলে, তাস তোলাতুলি, নানা নম্বর।

হঠাৎ গ্যাম্বলিং রুমে গাদাগাদা লোক ঢুকতে থাকে।

বন্ডের শেষ খেলা এখন। তারপর টেবিল ছাড়তে হবে। খেলা শেষ হয়।

টিফানি একটা চাকতি ছোঁড়ে। বন্ড পকেটে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এখন টিফানির টেবিলে আটজন পুরুষ, সে রানির মতো বসে আছে। বন্ড পায়চারি করে। এখন ওই টেবিলে আর যাওয়া যাবে না। শেডী ট্রি-র বারণ।

কাছেব রুলেং টেবিলে যায়। অল্প টাকার খেলা।

টেবিলে একটা ছোটো বল নিয়ে নানা কায়দা চলছে। রঙের ডাক চলছে। চাকা ঘুরছে।

এবার আরেকটা লোক আসে। নীল জ্যাকেট গায়ে।

চাকা ঘুরছে, দুটো খাঁজ আছে চাকায়।

স্টিকম্যান হাঁকে -- ডবল জিরো। তারপর টেবিলেব সব টাকা বাঁকা স্টিক দিয়ে টেনে নেয়। শেষ খেলা। কল চলে।

বন্ড বলে — স্টিক নেব আমি।

মোটামুটি লাভ হয়। ক্যাশিয়ার গুনে মনে তিনটে পাঁচ হাজার আর পাঁচটা এক হাজারের নোট দেয়। একটা এয়ারমেল খাম নিয়ে টাকাটা রাখে। তিনটে আলাদা আলাদা খামে। ঠিকানা লেখে ব্যক্তিগত, ডাইরেক্টর ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট, রিজেন্টস পার্ক, লন্ডন, NW-1, ইংল্যান্ড!

মাঝ রাত। পাঁচমিনিট বাকি।

এখন পর্যন্ত স্প্যাংগ এর পাত্তা নেই।

নিজের ঘরে ফিরে আসে বন্ড।

বন্দ চলেছে এখন লা-ভেগা শহরের দিকে এরনি কিউরিওর ট্যাক্সিতে চেপে।

জুয়ার ঠেক দিয়ে যেতে যেতে এরনি বলে - কীরকম মনে হচ্ছে?

--খুব একটা খারাপ না। কাল ঐ মক্কেলের লোকদের ডাঙার ঘায়ে কিছু মালকড়ি বাগাতে পেরেছি। যতদূর জানি এ ব্যাটার প্রচুব মালকড়ি আছে। আচ্ছা, এ ব্যাটা আর কী কী ব্যাপারে খরচা করে?

এরনি কিউরিও বলে ওর যত আমেরিকার পুরোনো জিনিসের ওপর নজর। এইতো কিছু দিন আগে ও একটা জরাজীর্ণ ছোট্ট শহর কিনে সেটাকে বেশ ঢেলে সাজিয়েছে। যদিও সব কিছু প্রাচীন ঢং-এ। বাগান, রাস্তা, বাড়ির দরজা, জানলা, টালিঃ চাল। আচমকা দেখলে মনে হবে যেন, ভৌতিক নগর। জায়গাটার নামও সেরকম--‘প্রতপুরী’।

১৯০৫ সাল পর্যন্ত এখান থেকে রূপো মাটি খুঁড়ে বার করে পাহাড়ি অঞ্চলের রেলপথ ধরে আরেকটা বিখ্যাত শহর রোয়োলাইটে যেত। ভাবুন, লোকটা সেখানে একটা বাড়ি বানিয়েছিল শুধু হুইস্কির বোতল দিয়ে। রোয়োলাইট ছিল একটা রেল স্টেশন। এই স্টেশন থেকে রূপো যেত উপকূলে।

— ওই সব প্রতপুরীতে আবার রেল স্টেশনও ছিল। ওখান থেকে স্প্যাংগ নিজে ট্রেন চালিয়ে তার ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে বেড়াতে বা স্ফূর্তি করতেও বেরোত। আর যুবতি মেয়ের দল তো থাকতই। তবে আমি কোনো দিন দেখিনি।

বন্দ এবার বোঝে, সে সারা দিনে ঐ স্প্যাংগ আর তার বাহিনীর কোনো টিকি দেখেনি। সাতার কাটার সময় বা লনে বসে থাকবার সময় বন্দ এটা লক্ষ কবেছে। কোন্টো না কোনোভাবে তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। কিন্তু কেন? বন্দ তো হোটেলের আর পাঁচজনের মতোই।

এরনি কিউরিও-র ট্যাক্সি ছুটে চলেছে মাঝামাঝি স্পিডে।

গাড়িতে যেতে যেতে হঠাৎ বন্ডের মনে হল, সেলুনে চুল কাটাতে গিয়ে স্প্যাংগের দেখা পেয়েছে সে।

সেলুনে চেয়ারে বসে সামনের আয়না দিয়ে যাকে দেখছিল বন্দ, তার মুখটা গরম জলে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে ঢাকা। তার শরীরের আকৃতি সাধারণ মাপের থেকে অনেক গুণ বেশি। একটা সুন্দরী লাস্যময়ী যুবতি লোকটার একটা হাত নিজের কাঁধের ওপর রেখে তার পরিচর্যায় ব্যস্ত। মেয়েটির সামনে একটা টুলে কতগুলো যন্ত্র।

এবার নাপিত এসে লোকটার কানের চুল একটা ছোটো পাতলা কাঁচি দিয়ে বেশ সাবধানতার সঙ্গে কেটে দিল। এবং লোকটাকে জিজ্ঞেস করে তার নাকেব থেকে নির্গত লোম পর্যন্তও।

এদিকে অন্য নাপিত বন্ডের চুল কাটাতে শুরু করেছে।

হেলান দিয়ে লোকটার চেয়ার হাতল ঘুরিয়ে সোজা করতেই বিপত্তিটা তখন ঘটে গেল। মেয়েটার কাঁধ থেকে হাতটা পড়ে গিয়ে মোটাটা বোধহয় চোট পেয়েছে হাতে। সঙ্গে সঙ্গে সে ওই অবস্থাতেই মেয়েটাকে ঘুরিয়ে থাপ্পড় মারতেই সে ছিটকে গিয়ে বন্ডের চেয়ারের সামনে গিয়ে পড়ে।

বন্ডের চুল কাটাও বন্ধ হয়ে যায়।

লোকটার মুখের ওপব থেকে তোয়ালেটা পড়ে যায়।

নাপিত কাঁচুমাচু মুখে বলে--আপনার লেগেছে মি. স্প্যাংগ?

— হারামজাদি। হাতটা কাঁধের ওপর ধরে রাখতে পারিসনি? — স্প্যাংগ চিৎকার করে বলে।

পড়ে গিয়ে মেয়েটারও লেগেছে। তাব মুখটা কাঁদ কাঁদ।

নাপিত বলে— আমি আজই মেয়েটিকে দূর করে দেব মি. স্প্যাংগ।

— হ্যাঁ, তাই করো।

বন্ড চেয়ারে ছেড়ে নেমে এসে বলে— - আমিতো মেয়েটার কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছি না। আরে কী হচ্ছে কী এসব?

স্প্যাংগ ড্রেস-আপ করে সেলুন থেকে বেরিয়ে যায়।

মেয়েটি বলে — আমি কী করব বলুন। মি স্প্যাংগের হাত আজকে মাঝেমাঝেই কেঁপে উঠছিল। আমি—

বলতে বলতে মেয়েটি কেঁদে দেয়।

বন্ড তার মাথায় হাত দিয়ে বলে— এবাব থেকে কাস্টমাবের দিকে আরও বেশি নজর রাখবে। আর —

— মি. বন্ড।

ভাবনায় ছেদ পড়ে বন্ডের। বলে— হ্যাঁ, বল এরানি।

লুকিং গ্লাসে দেখুন একবার।

— লুকিং গ্লাসে চোখ রেখে বন্ড বলে— বুঝতে পেরেছি। ফেউ-এর মতো পিছু নিয়েছে আমাদের।

এরনি বলে— শুধু পিছনে নয়। সামনের এই কালো শেভলে স্বেডানটা দেখেছেন, ওতে দুজন আছে। ওদের সামনে-পিছনে আয়না। আব পিছনে পুরোনো মডেলের স্পোর্ট জাগুয়ার। ওতে দুজন শয়তান আছে। ওরা ডেট্রয়েট সংঘের লোক। ওদের কাছে গলফ ক্লাব যদিও আছে কিন্তু আসল মাল আছে কোমরে, পকেটে। আমি যা বলছি করুন। যেন ওদের বুঝতেই পারেননি এরকম ভাব করে থাকুন।

এরনি হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে দেয়। বন্ড গুলির শব্দ পায়। দেখে পিছনের ট্যাক্সির যাত্রীদের পকেটে হাত চলে গেছে। তার মানে এরনির গাড়ির পাইপ থেকে গুলি বেরিয়েছে।

এরনি বলে—আপনি নিশ্চিত থাকুন মি. বন্ড, ওরা আমায় ছুঁতে পর্যন্ত পারবে না।

বন্ডের এক হাত কোটের ভিতরের পকেটে। অন্য হাতে প্যান্টের পকেট থেকে টাকা বার করে এরনিকে দিয়ে বলল, রেখে দাও। পরে লাগবে।

এরনি টাকা পেয়ে আনন্দে বলে ওঠে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি শুধু চুপ করে যত্নে হাত ঠেকিয়ে বসে থাকুন।

এরনির গাড়ির স্পিডোমিটার চল্লিশ ছাড়িয়ে চলেছে। পিছনে দূরত্ব রেখে আসছে দুই শয়তান ভর্তি জাগুয়ারটা। অঙ্কার হবে হবে কবছে। একটা পাহাড়ের চূড়ার পিছন দিকে ডুবন্ত সূর্যের একফালি সোনালি অস্তিত্ব।

আচমকা বন্ড হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে পড়ে যায়। এবং পিছনে অন্য কোনো গাড়ি এসে ধাক্কা মারে তাদেরকে।

এক্সেলোটারে চাপ দিয়ে গাড়ির টপ গীয়ার তুলে সামনের দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে এরনি বলে, চিন্তা করবেন না স্যার। আমার গাড়ির ক্ষতি তেমন কিছু না। তবে ওই শয়তান দুটোকে শিক্ষা দিয়েছি।

বন্ড বলে--সামনের উইং দুটো তো গেছে একেবারে। পেছনের কাচ, ব্যাক সিট ডোর সবই তো কম বেশি ক্ষতি হয়েছে। গাড়িটা থামাও, নেমে দেখি আর কী ক্ষতি হল তোমার। আমার মনে হয় আমার জন্য তোমাকে এত বিপদে পড়তে হয়েছে।

— কিছু না, কিছু না। আপনি মাথাটা নীচু করে থাকবেন। সামনের ব্যাটারা গুলি চালাতে পারে।

এরনি গাড়ির গতি তীব্র বাড়িয়ে দেয়। সামনের শেভলেরটাকে ওভারটেক করতে গিয়ে দুটো গুলি খেতে হয় এরনির গাড়িকে। কাচের বনবন শব্দ।

বন্দ মাথা নীচু করে নেয়। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে এরনিও বাঁচায় নিজেকে। ঘাড় ঘুরিয়ে খিস্তি করে ওদের উদ্দেশ্যে।

শেভলকে ছাড়িয়ে ওরা এগিয়ে চলেছে।

শেভলে এরনির গাড়িকে তাড়া করেছে। গুলি চালাচ্ছে।

একটা বাঁক ঘুরেই এরনি দাঁড়িয়ে গেল।

— কী হল? -বন্ডের প্রশ্ন।

এরনি বলে এই সুযোগ মি. বন্দ।

শেভলেটা ধাক্কা মারতে গিয়েও পাশ কাটিয়ে নেয়। প্রায় উলটে যাচ্ছিল। কিন্তু ওই চালক সামলে নিয়ে আবার ব্যাকে আসতেই বন্দ পরপর পাঁচবার গুলি চালায়।

ড্রাইভারের গায়ে গুলি লেগেছে।

এরনি দেখে শেভলেটা টাল খেতে খেতে গাছে গিয়ে ধাক্কা মারল। এবং শেষে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল একটা খাদে।

বন্দ একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেল।

উঠে দাঁড়ায় বন্দ। একটা আগুনের কুন্ডলী ও কালো ধোঁয়া দেখতে পায বন্দ।

বন্দ মনে মনে শেভলের আর তার দুই আরোহীর অপমৃত্যুটা কল্পনা করেছিল। ভাবছিল এগিয়ে গিয়ে দেখবে। কিন্তু একটা মৃদু গোঙানির শব্দে সে দিকে তাকায়।

এরনি আহত। তার এক হাতে প্রচন্দ আঘাত লেগেছে। এতক্ষণ বুঝতে দেয়নি এরনি। ভীষণ রক্ত বেরোচ্ছে। বন্দ এরনিকে হেলান দিয়ে বসায়।

এরনি কাতরকণ্ঠে বলে— এখান থেকে তাড়াতাড়ি কেটে পড়তে হবে মি.বন্দ। নইলে জাণ্ডয়ারটা আমাদের শেষ করে দেবে। আর আমাকে কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে চলুন।

পাশের সিটে এরনিকে খুব সাবধানে বসিয়ে বন্দ এবার ড্রাইভারের সীটে।

প্রচন্দ স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে বন্দ।

— কষ্ট হচ্ছে এরনি?

— ও কিছু না। এই রাস্তাটা সোজা চলে গেছে কোন্ডার বাঁধের দিকে। ওখানে গিয়ে ঘাড় ঘুড়িয়ে বন্ডকে লক্ষ্য করতেই দেখে বন্দ মাঝে মাঝে লুকিং গ্লাসের দিকে দেখছে। এরনি বলে-- ওরা কী পিছনে আসছে?

--হ্যাঁ।

—তাহলে একটা কাজ করুন, একটু এগিয়ে নাইনটি ফাইভ হাইওয়েতে 'প্যাসান পিট' নামে একটা সিনেমা আছে। সেটা ড্রাইভ-ইন সিনেমা। মানে গাড়িতে বসেই সিনেমা দেখা যায়। ওখানেই আমাদের কিছুক্ষণ থাকতে হবে।

* রাত্রির অন্ধকার এখন তার রূপ মেলে ধরেছে। বন্দ হেডলাইট জ্বালায়।

এরনি বলে, লাইট অফ করে দিন।

ওরা ড্রাইভ ইন এ ঢোকে। পিছনে পরপর কয়েকটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। বন্দ বেশ ভালো করে দেখে নেয়। না, জাণ্ডয়ারের মতো কোনো গাড়ি দেখা যাচ্ছেনা।

ঠিক সিনেমার পর্দা নয়। ধবধবে সাদা দেয়ালে সিনেমা চলছে। এরনি চোখ বুজে আছে।

শাট প্যান্ট পরা একটা মেয়ে এসে পিক আপ লাগিয়ে দেয় গাড়ির লাইনের সামনে থাকা একটা প্র্যাগের সঙ্গে। একটা ছোট্ট স্পীকার বন্ডের পাশের জানালায় ঝুলিয়ে দেয়।

বন্ড মেয়েটিকে এক ডলার দেয়।

মেয়েটি 'থ্যাংকস' বলে পিছনের দিকে চলে যায়।

বন্ড স্পীকারের সাউন্ড বাড়িয়ে দেয়। সিনেমার ডায়লগগুলি স্পীকারে শোনা যায়। এরনি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বলে মি. বন্ড, আমার ডাক্তারের কাছে এই মুহুর্তে যাওয়া ভীষণ প্রয়োজন।

বন্ড বলে— তোমার কষ্টটা আমি বুঝতে পারছি এরনি। একটু ধৈর্য ধর। চারিদিকটা ভালো করে দেখে নিই।

বন্ড গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে। চারদিক অন্ধকার। এরনি সিটে মাথা এলিয়ে আছে।

— একদম নড়বার চেষ্টা করবে না। --বন্ডের মাথার পিছনে রিভলবারের নল ঠেকিয়ে একজন বলে।

লোকটা বলে, বেশি চালাকির চেষ্টা কর না। তোমার সঙ্গীও কিন্তু আমাদের কবজায়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিতে পার। হ্যাঁ, যন্ত্রে কিন্তু সাইলেন্সার লাগানো আছে।

আহত এরনির মাথায় আর্মস ঠেকানো আছে।

বন্ড ঠান্ডা মাথায় বলে — এদের সঙ্গে আমাদের একজন যাওয়াই ভালো। তুমি বরং এখানেই থাক। আমি ঘুরে এসে তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

— আচ্ছা, রসিকতা হচ্ছে। — বলে লোকটা এরনিকে রিভলবার ঠেকিয়ে রাখা তার স্যাঙাৎকে বলে— ওই—

রিভলবারের বাটের একটা আঘাতেই আহত রক্তাক্ত এরনি সিটের সামনে ঝুঁকে পড়ে যায়।

বন্ড এখন অসহায়। ওর রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

বন্ড ভাবে যদি কোনো রকমে রিভলবারটা বার করতে পারত সে। কিন্তু কোনো চালাকি করতে গেলে ওরা নির্দয় হয়ে উঠবে।

বন্ডকে যে লোকটা রিভলবার ঠেকিয়ে ছিল, সে বেশ মোটাসোটা। মোটা বলে— সামনের দিকে হেঁটে এগোতে থাক। যেন কিছুই হয়নি।

ড্রাইভ-ইন থেকে বেরিয়ে ওরা এখন রাস্তায়। দূরে পাহাড়ের মাথায় চাঁদ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে।

তিনটে মূর্তিকে এখন ছায়ামূর্তির মতো লাগছে।

বন্ড বুঝতে পারে, পিছনের লোকদুটো যথাস্থানে হাত রেখেই তাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এরনির কথা ভেবে বন্ডের খুব খারাপ লাগে।

॥ উনিশ ॥

গেটের কাছে একটা লাল গাড়ি —জাণ্ডাঃ।

বন্ডের বন্দুক কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ওদেরই নির্দেশে গাড়িতে ওঠে বন্ড। গশ্ফের স্টিকগুলো ব্যাক সিটে।

বন্ড জিজ্ঞাসা করল-- আমরা কোথায় যাচ্ছি।

— দেখতেই পাবে।

জ্যোৎস্নায় ছেয়ে যাওয়া পথ দিয়ে ওদের গাড়ি বোধ হয় পাহাড়ের দিকে চলেছে।

স্প্যাংগই তাহলে পাঠিয়েছিল বন্ডকে ধরে নিয়ে যেতে। সাইনবোর্ডে লেখা '৯৫'। গাড়ি এখন

ঘন্টায় ৮০ মাইল বেগে চলছে। 'স্প্যাংগলড মব'-এর কাছে সে কী ধরা পড়ে গেছে? ওর আসল পরিচয় ওরা জেনে ফেলেছে? যা যা প্রশ্ন আসতে পারে। 'সেগুলো কল্পনা করে মনে মনে উত্তর ঠিক করে নেয় বন্দ। তবে, স্প্যাংগ-ও নিশ্চয় স্বীকার করবে। এদের কাজ করার মতো ক্ষমতা বন্ডের আছে। তাহলে--

কল্প চোখে স্প্যাংগ-এর সঙ্গে কথাবার্তার রিহার্সাল দেয় বন্দ।

দু'ঘন্টা কেটে যায়।

গাড়ির গতি কমায়ে বড়ো বোর্ড চোখে পড়ে : 'প্রতলোক, শহর শেষ। কুকুর থেকে সাবধান। প্রবেশ নিষেধ।'

ড্রাইভার গাড়িতে বসেই হাত বাড়িয়ে গেটের বেল বাজায়। একটা গলা ভেসে আসে : বলো। ড্রাইভার বলে ফ্র্যাসো আর ম্যাকগনিগল।

গেট খুলে যায়। গাড়ি ভেতরে যায়। আবার বন্ধ হয়ে যায় গেট।

যাই হোক, লোক দুটোর নাম জানতে পারা গেল।

পাথুরে রাস্তা, রসকষ হীন পরিবেশ। গাছপালা বলতে শুধু ফণী মনসার ঝোপ। চারপাশে সব মিলিয়ে গোটা বিশেষ বাড়ি। দূরে একটা রেললাইন চেনা যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় চকচক করছে।

পিংক গার্টার সেলুন। লেখা আছে : বিয়ার আর ওয়াইন পাওয়া যায়। পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণা করে বন্দ। ড্রাইভারের চিংকারে সেই ঘোর কাটে--ওরে ইংরেজ ভূত, বের হয়ে আয়। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে গুঁতো — তাড়াতাড়ি চল।

সামনের ঘরটায় অটোমেটিক পিয়ানো বাজছে। খালি ঘর।

বন্দ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ফ্র্যাসোর কনুই চেপে সজোরে ধাক্কা মারে। অপ্রস্তুত ফ্র্যাসো ছিটকে পড়ে। এক ঝটকায় ওর কবজিতে জোর চাপ দিয়ে পিস্তল কেড়ে নেয় বন্দ। কিন্তু পিস্তলটা ছিটকে যায় ম্যাকগনিগলের পায়ের কাছে। তবুও পিস্তলটা আঁকড়ে ধরে বন্দ এক হাতে। সে হাতটা বুট দিয়ে চেপে ধরে ম্যাকগনিগল। গুলি চালায় বন্দ ছাদের দিকে। আবার ছিটকে যায় পিস্তল।

দুজনেই ঝাঁপায় পিস্তল নিতে। নিঃশব্দে লড়াই চলে। শারীরিক মারপ্যাঁচের লড়াই। ম্যাকগনিগল ছুঁ মারে শূয়োরের মতো, বন্ডের সারা মাথা বনবন করে। এবারে পাঁজরে ঘৃষি খায় বন্দ। একটু অপেক্ষা করে বন্দ; তারপরেই ম্যাকগনিগলের ঘাড়ে প্রচণ্ড রন্দা ঝাড়ে। উলটে পড়ে বদমাসটা। এবার ঝড়ের মতো একটানা ঘৃষি চালিয়ে যায় বন্দ। কয়েক মিনিটেই শিথিল হয়ে যায় গুল্ডটা। ওর গোড়ালি ধরে পাক খাইয়ে ঘরের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বন্দ। একদম পিয়ানোর ওপর। কাঠের বাস্তু থেকে পুরোনো পিয়ানো মেঝেয় পড়ে চুরমার হয়ে যায়।

বারের দিক থেকে একটা মেয়ের গলায় ভেসে আসে--কাট!

তার মানে বারে লোকজন এসে গেছে।

এবার এই ঘরে কয়েকজনের প্রবেশ। তিনজন। তার মধ্যে একজন অবশ্যই প্রতলোকের নায়ক — শ্রীল শ্রীমান মি.স্প্যাংগ! চকচকে পোশাক দিয়েই — বোঝাতে চায়, সে-ই এখানকার প্রভু। কালো কোর্ট-প্যান্ট-জুতো। চামড়া বেণ্টে অজস্র গুলি। উরুর কাছে ডবল-ব্যাৱেল রিভলবার। হাতের দাঁতের হ্যান্ডেল।

শীতল চোখে ভয়ংকর ভাব! সিনেমার অভিনেতার পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাল ঠোঁটের মাঝখানে ফাঁক, যেন এইমাত্র কাউকে চুমু খেয়েছে।

অপর দুটো লোকের হাতেও অস্ত্র। মুখে কালো মুখোশ।

বন্দ রুমাল দিয়ে মুখ মোছে।

স্প্যাংগ বলে -ওকে নিয়ে এসো। ডেট্রয়টে খবর দাও। আরও লোক পাঠাও। আর এই জঞ্জাল সাফ করে দাও।

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় স্প্যাংগ।

লোক দুটো বন্ডকে নিয়ে ঘরে আসে, সেটাকে দেখলে মনে হবে যেন কোনো স্টেশনের ওয়েটিং রুম।

বোঝা গেল, সত্যিই ওয়েটিং রুম। দূরে একটা ট্রেন। ইঞ্জিনটা অবশ্য 'হাইল্যান্ড লাইট', ১৮৭০ সালের। পুরোনো হলেও সুন্দর ট্রেনটা। তিনটে বড়ো বড়ো পিতলের ল্যাম্প জ্বলছে। লেখা আছে: ক্যানন বল। ভিক্টোরিয়া আমলের ডিজাইন। ড্রাইভারের সামনে মেহগনি কাঠের টেবিল। এক জোড়া পুলম্যান জানলা।

গাড়িটার নাম দ্য সিয়েরা মেল।

পুরোনো কোচে উঠতে হয় বন্ডকে। সশস্ত্র গার্ড দুটো সমানে গালিগালাজ চালিয়ে যায়।

খাবার ঘরে তিনটে দরজা। এখানে ওরা বন্ডকে এনে কী করবে?

এবার দরজার ওপরে এক সুন্দর কামরা। র্যাকে বই, ফায়ার প্রেস। টেবিলের চেয়ারে টান হয়ে বসে আছে।

টিফানি কেস! হাতে সিগারেট, সামান্য আড়ষ্ট ভাব। আর—

ফায়ার প্রেসের কাছে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে—

মি.স্প্যাংগ! মুখে চুরুট, ধরানো হয়নি এখনও।

বন্ড ক্লান্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়েছে। মি.স্প্যাংগ ওর মুখোমুখি দাঁড়ায়।

—তোমার আসল পরিচয়টা ঠিক করে বল! কী করছে তুমি এখানে?

ক্লান্ত বন্ড শান্ত হয়ে বলে— কথা বলতে হলে আগে একটা ড্রিংক দরকার আমার।

—দাও, ওকে একটা ড্রিংক দাও।

ড্রিংক আসে। চুমুক দেয় বন্ড। আঃ আরেকটা বড়ো চুমুক। তারপর পাশে গেলাসটা রেখে বলে — শুনুন, আমি বুট ঝামেলার বিরোধী। টাকা পেলে কাজ করে দিই। জুয়াও খেলি, যদি কেউ টাকা দেয়। জিতে যাই। হারতেও পারতাম। অহেতুক কিছু লোক কেন যে ঝামেলা পাকালো, গুলি চালালো... তাতে আমার রাগ হওয়া তো স্বাভাবিক।

— আঃ! আসল ব্যাপারটা তুমি এখনো বোঝ নি। শোন—এই কাগজের টুকরোটা আমার লন্ডনের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু লিখেছে— পুলিশ পিটার ফ্র্যাংকসকে ধরে রেখেছে। তার বদলে একজন গেছে। তাকে ধরতে হবে। কারবারের ক্ষতি হলে তাকে কোতল করে দাও।

স্প্যাংগ-এর চোখে এখন আশুণ।

— তাহলে তুমি হচ্ছ মি.এনিবডি। কিন্তু একটা মারাত্মক কিছু তো ঘটবেই মনে হচ্ছে।

বন্ড বুঝল, এবার তার শেষ সময় সমাগত। সে যে কাজে এসেছিল, যে খবর জানতে চেয়েছিল হিরে চালান সম্পর্কে, সে ব্যাপারটা চুকে গেছে। দুটো মুখ, একেক মুখে আছে একজন করে স্প্যাংগ! এবার ওরা যদি বন্ডের আসল পারচয় বুঝে গিয়ে থাকে, তাহলে ইহলীলা শেষ হতে দেরি হবে না।

বন্ড ড্রিংকটা শেষ করে বলে — পিটার ফ্র্যাংকস আমাকে কাজটা দিয়েছিল, টাকা দিয়েছিল। কাজটা খুব পছন্দ হয় নি। কিন্তু টাকার দরকার ছিল। তাই—

হাঃ হাঃ, চালাকি করো না। তুমি পুলিশ অথবা টিকিটকি। তোমার সব খবর আমি জেনে গেছি। কার হয়ে কাজ করো, ইতিমধ্যে কতটা খবর জেনে গেছ। বন্ধুটো কীসের দরকার তোমার? বলতে বলতে স্প্যাংগ হঠাৎ টিফানির প্রতি মারমূর্তি হয়ে ওঠে।

আর তুই একটা মুখ ছুঁড়ি, তুই ভুল করলি কেন?

টিফানি ঝাঁঝালো জবাব দেয়-- গোপলায় যাও তোমরা। লোকটাকে যুগিয়েছিল এ-বি-সি বলেছিল পরীক্ষা করে দেখ। বাস এটুকু কাজ আমি করেছিলাম। মিছিমিছি আমায় দোষ দেবেনা বলে দিচ্ছি।

টিফানির চোখ জ্বলছে। সে বন্ডের দিকে তাকায়। বন্ড কিছুটা ঘাবড়ে যায় অবশ্যই।

স্প্যাংগ বলে- অল রাইট, আমরা আরও খবর নিচ্ছি।অ্যাই উইস্ট, কিড বল বুটগুলো আনতে।

বুট গুলো কেন?

বন্ড ভাবে, যতক্ষণ ওরা ওকে মেরে না ফেলে, ততটাই বাঁচবার ভরসা টিকিয়ে রাখতে হবে সহায়করা তো রয়েছে-- ফেলিক্স লিটার, এরিক কিউরিও--এমনকি হয়তো টিফানি কেসও! সে এখন মুখ নিচু করে নখ খুটছে।

স্প্যাংগ গার্ডদের বলল —ওকে প্র্যাটফর্মে নিয়ে যাও। আর, ব্রুকলিন মার্কা দলাই-মলাই আশি পারসেন্ট! বুঝেছ?

সাংকেতিক কথা। বোধহয় অত্যাচারের ধরন এর কোড-নেম! বুটগুলো মেঝের ওপর স্নেহে ওর নিজেদের জুতো খুলতে থাকল।

অতঃপর কী?

॥ কুড়ি ॥

গভীর জলের তলদেশ।

বন্ডের গায়ে ডুবুরির পোশাকটা ফিট করেনি, কেটে বসে গেছে। শ্রোতের উলটো দিকে সাঁতার দেওয়া কষ্টকর!

কানের কাছে টিফানির মুখ। বন্ডের রক্তাক্ত হাতে চিমটি কাটে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে-- জেমস, প্লিজ, ভগবানের দোহাই--

বন্ডের স্ত্রান আছে। কিন্তু বুঝতে পারছেন না শরীর কতটুকু টিকে আছে! বন্ড এখন এক মারাত্মক জখম জানোয়ার বিশেষ।

টিফানি বলে— হাঁটতে পারবে?

— প্লিজ, ওয়েট! — বন্ড নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে।

যন্ত্রণাগুলো সারাদেহে হাজার হাজার ছুরি মেরে চলেছে।

মনে পড়ে যায় কিছু আগের ঘটনা। দু-জোড়া কাঁটাওয়ালো বুট জুতো। যেগুলো লোক গুলে তখন পায়ে গলিয়েছিল। লক্ষবার লাথি কষিয়ে গেছে। লক্ষ বছর ধরে! মুখোশপরা সেই যমদূত দুটোর চারটে পা! ওঃ, কী ভয়ঙ্কর।

টিফানি বলে-- জেমস, শুনতে পাচ্ছ? আমরা এখন ওয়েটিং রুমে। স্টেশনে যাওয়া দরকার দরজা বাঁ দিকে।

এতক্ষণে কথা বলে বন্ড — আমার হামাগুড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আই অ্যাম ক্রলিং টিফানি দরজা খোলার পর ওরা কোনও মতে বেরিয়ে আসে।

রেল লাইনের পাশে ঢালু জমি।

প্র্যাটফর্মের মাটিতে লাল-কালো রঙের দাগ। লাইনে দাঁড়িয়ে আছে 'হ্যান্ডকার', অর্থাৎ এক কামরার গাড়ি। টিফানি জানালো, গাড়িটায় পেট্রোল ভরা হয়েছে। সোজা রায়োলাইট যাবে এবং এই গাড়ি টিফানিই চালাবে। বাহাদুর মেয়ে বটে!

টিফানির পরনে স্ল্যাকস আর শার্ট। বলল- আর দেরি করা ঠিক করা হবে না। লাইটাব জ্বলে কাগজে আগুন ধরায় বন্দ, সেই জ্বলন্ত কাগজের টুকরো পেট্রোলের টিনের ওপর পড়তেই গাড়ি স্টার্ট দেয় টিফানি। চলাতে থাকে গাড়ি।

পেছনে ফিরে বন্দ দেখে, আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। টিফানির পাশে বসে কাঁধে হাত রাখে বন্দ। বন্দের ক্ষতে জর্জরিত মুখটা দেখে টিফানি বলে— তোমার মুখটা এখন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। বন্দ বলল—তবুও গুলির চেয়ে লাখি ভালো।

— তোমার মার খাওয়ার সময় আমি কত কষ্টে নিজেকে সামলেছি। অভিনয় করতে হচ্ছে, যেন আমার কিছু আসে যায় না। এদিকে যন্ত্রণায় ছটফট করছি। ওরা তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। তারপর—

— টিফানি, আমি সুস্থ হলে তোমার সঙ্গে আমার মনের কথা বলতে পারবো। এখন শুধু চিন্তা, ওরা যদি আমাদের আবার ধরে ফেলে! মুখোশ পরা লোকদুটো কে? ওরা কী উইন্ট এবং কিড?

— আমিও ওদের মুখ কখনো দেখিনি। ওরা বোধহয় ডেট্রয়েট থেকে এসেছে। কুখ্যাত গুন্ডা সব!

গাড়ি চলছে। একটু পরে টিফানির খুশি খুশি মুখ।

— আগে রায়োলাইট। তারপর একটা অন্য গাড়ি ধরতে হবে। সীমান্তে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় পাব। আমি অনেক টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছি। প্রথমে তোমার স্নান, ড্রেস চেঞ্জ -- তারপর ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব তোমায়। তোমার পিস্তলটা আমাব কাছে আছে।

টিফানি নিজের শার্টের বোতাম খুলে হাত ঢোকাল। স্ল্যাকসের কোমরের কাছে ম্যাগাজিন, তিন রাউন্ড গুলি আছে। বন্দ নিজের পোশাকের দিকে তাকাল। কোটটা নেই, শার্টের একটা হাত ছেঁড়া। বাঁ পকেটে, পাসপোর্ট ও ম্যানিব্যাগ ছিঁড়ে খুঁড়ে গেলেও, রয়েছে। এমনকি টাকাটাও আছে।

বাঁ দিকে বিশাল মরু প্রান্তর। দূরে স্পেকটব পাহাড়ের অন্ধকার।

হ্যান্ডকার ছুটছে। আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে এই ছোটো রেলগাড়িটা চালাচ্ছে টিফানি। আকাশটা এখন লাল। ওই প্রেতপুরী শহরে বাধহয় আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, তাই আকাশেও আগুন।

— দূরে ওটা কী!

— ওটা ক্যাননবল।

— কত স্পীড?

— যাটের কাছাকাছি উঠতে পারে।

— আর কতদূর? রায়োলাইট কখন পৌঁছাবে?

— তিরিশ মাইল দূরে।

বন্দ দেখছে, এবার পিছনের ক্যাননবল এগিয়ে আসছে।

-- পেট্রোল যথেষ্ট আছে তো?

— আশা করি, আছে।

ইঞ্জিনে সামান্য গোলমাল দেখা দিচ্ছে। সর্বনাশ। টিফানি মিনতি জানালো -হে আমার ছোটো লাভলি ইঞ্জিন, প্রসন্ন হও।

কিন্তু ভাগ্য খারাপ। ইঞ্জিন অকেজো হয়ে গেল।

— আর কত দূর?

— অন্তত দুমাইল। পাহাড়টা কাছেই। ওখানেই লুকাতে হবে।

এদিকে ক্যাননবল ছুটে আসছে। ইস, এখন যদি ওটা বে-লাইন হয়ে ছিটকে পড়ত।

টিফানি হাত লাগাও। আমার সঙ্গে এই গাড়িটা ঠেল। তাছাড়া পুরোনো জং ধরা রেললাইন। এইখানে দুটো লাইন জুড়ে গেছে। আলাদা করতে হবে—টেনে টুনে।

সে কী সম্ভব!

ক্যাননবল বজ্রবেগে আসছে। শিকারি যেন শিকারের সন্ধান পেয়েছে। তাই ছোট্ট হ্যান্ডকারকে বধ করতে আসছে। পিস্তল হাতে নেয় বন্দ।

প্রথম গুলি। ড্রাইভারের কেবিনে আলোর চমক। আবার গুলি চালায় বন্দ—দুম, দুম—

একটা গুলি লাইনে লেগে ছিটকে গেল। সাবধানে লড়তে হবে। আর মাত্র চারটে গুলি আছে। বন্দ দেখে ইঞ্জিনটা বেসামাল। ব্রাঞ্চ লাইনে ধাক্কা খায়। ছ-ফুট ড্রাইভিং হুইল ঘুরে যায়। বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

ওই তো স্প্যাংগ! কেবিনে দাঁড়িয়ে, পরনে সেই কালো রূপালি পোশাক। গাড়ি থামাবার হ্যান্ডেলটা ধরার চেষ্টা করছে।

এবার পরপর চারটে গুলি চালায় বন্দ। যা থাকে কপালে। একটা সাদা মুখ আকাশের দিকে উঠে গেল। ইঞ্জিনটা ছুটে বেরিয়ে গেল পাহাড়ের দিকে। অটোমেটিক বেল্টা বেজেই চলেছে অবিরাম।

বোধহয় স্প্যাংগ আবার নিজের কফিনে শুয়ে পড়েছে।

কোমরে পিস্তল গুঁজে বন্দ এগোয়। ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে চারিদিক। টিফানি ছুটে আসে।

ওকি! পাহাড়ে কীসের আওয়াজ! বুম, বুম, বুম।

সর্বনাশ! গোটা ক্যাননবল পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। অঙ্কের মতো। তারপরেই বিশাল বিস্ফোরণ। আকাশ-পাতাল কাঁপতে থাকে।

কিছু পরে বিস্ফোরণের শব্দ স্তিমিত হলেও গানের সুরের মতো রিনরিন প্রতিধ্বনি চলতে থাকে। তারপর স্তব্ধ নীরবতা। সেই নীরবতার মধ্যেও যেন একটা মিউজিক আছে।

‘স্প্যাংগলড মব’ নির্মাতা অম্লনুষ মানিকজোড় তাহলে খতম!

টিফানি বলল—চলো।

দেড় ঘন্টা হাঁটাপথ। বন্দ মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছে। টিফানিই ওকে শাস্ত করে নিয়ে যাচ্ছে। ফণীমনসা, অভ্রস্তুপ, এবার প্রচণ্ড রোদ।

বন্দ এলিয়ে পড়ে। ওর মাথাটা তুলে নেয় টিফানি। দূরে লা-ভেলা ভ্যালি।

একটা গাড়ি আসছে।

শার্টের বোতাম আটকে উঠে দাঁড়ায় টিফানি। হাত নেড়ে গাড়িটাকে থামতে ইশারা করে।

ঈশ্বর করুণাময়। গাড়ি থেকে উঁকি দেয় ফেলিক্স লিটার। হাসিমুখ।

— অ্যাট ইওর সার্ভিস, ম্যাডাম! বলুন কী আজ্ঞা!

॥ একুশ ॥

লিটার তার খবর বলতে থাকে।

— বন্ধু এরনির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। জেমস তাকে চেনে। এরনি হাসপাতালে, ওর স্ত্রী অসুস্থ। ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে যেটুকু জানাবার জানাল। প্রেতপুরীর কাছে আকাশ লাল দেখে ভাবলাম স্প্যাংগরা বোধ হয় কোনও উৎসবে মগ্ন। ভাবছিলাম ঢুকে যাব কিনা।

— আপনার হয়তো বিশ্বাস হবে না, জায়গাটা একেবারেই নির্জন। হঠাৎ একটা লোককে দেখলাম। পা-টা মনে হয়েছে ভেঙেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। এরনির কথা অনুযায়ী এ ব্যাটা সেই ডেট্রয়েট গুন্ডা। ব্যাটাকে ধরতেই সে সব বলল। ওর নাম ফ্র্যাসো। ফায়ার

ব্রিগেড আসবার আগেই ফ্র্যাসোকো ওই গেটের কাছে নিয়ে গেলাম এবং ওখানে দেখলাম বিধ্বস্ত অবস্থায় একটি মেয়েকে।

ঝড়ের গতিতে ছুটে চলা গাড়িটায় সামান্য একটু ঝাঁকুনি লাগে। টিফানির কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকা বন্দ চোখ মেলে তাকায়। ওরা গাড়ির পিছনের সিটে। বন্দ ভাবছিল — একটা নিরাপদ জায়গা, ডাক্তার, শাওয়ারের তলে আরামদায়ক স্নান, বেশ ভালো খাওয়া এবং ঘুম।

বন্দের অস্বস্তি দেখে টিফানি ওকে আশ্বস্ত করল— চিন্তার কিছু নেই। লিটারও তো সঙ্গে আছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে লিটার বলে—থ্যাঙ্কস ম্যাডাম। ভাগ্যিস আপনি ছিলেন। তবে যে দুজন স্প্যাংগলড মবকে কাঁদিয়ে ছেড়েছেন, বাকিরা কী আপনাদের ছেড়ে দেবে?

— ভেগার সিডিকিটের সদস্য ছিল স্প্যাংগ। ওদের মধ্যে ভীষণ ইউনিটি আছে। হ্যাঁ, আমাদের খুব কুইক এ অঞ্চল ছাড়িয়ে যেতে হবে।

—সেটার চিন্তা নেই। দশ মিনিটের মধ্যে বিয়াটি; তারপর আধঘন্টার মধ্যে বর্ডার ক্রশ করে যাব। ওলাঞ্চা হয়ে হাইওয়ে সিক্স-এ পৌঁছে বন্দকে ডাক্তার দেখাতে পারলে ভালো হয়। হাইওয়ে সিক্স ধরে লস এঞ্জেলসে পৌঁছে আমাদের লাঞ্চ সেরে নিলে ভালো হয়।

গাড়ি চলছে ঝড়ের বেগে। টিফানির কোলে বন্দ মাথা রেখে শুয়ে আছে। টিফানি মাঝে মাঝে বন্দের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, গাড়ির জানলা দিয়ে রাস্তার দুধারের শোভা দেখতে দেখতে।

লিটার বলে— তবে আমার যেটা মনে হচ্ছে, আজ রাতে যদি আপনাদের দুজনকেই নিউইয়র্কের ফ্লাইটে তুলে দেওয়া যায় আর কালকেই ইংল্যান্ডের দিকে যাত্রা করিয়ে দেওয়া যায়। ওরা আপনাদের মরিয়া হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

— আচ্ছা, জেমস বন্দ কী ডিটেকটিভ নাকি ক্রাইম ব্রাঞ্চের কোনো—

— সময় হলেই সেটা জানতে পারবেন।

টিফানির কথাটা বন্দের কানকে না এড়িয়ে যেতে পারেনি। চোখ বুজেই মৃদু হাসে বন্দ। টিফানির চোখে সেটা ধরা পড়ে না। বন্দ এবার নিশ্চিত্তে ঘুমায়।

ক্যালিফোর্নিয়ার মাঝামাঝি পৌঁছে বন্দকে ডাক্তার দেখানো হয়। ওরা এরপর একটা হোটেলের চুকে স্নানাহার সেরে আবার বেরিয়ে পড়ে।

গাড়ি ছুটে চলেছে আশীরও ওপরে। টিফানি এখন নিজেকে কিছুটা নরম প্রকৃতির করে রেখেছে।

বন্দ বলে— লিটার, আমার মনে হয়, পুলিশ জেনে গিয়েছে যে, ওই গাড়ি কে চালাচ্ছে। তাই বোধ হয় ওরা পিছু নিতে লজ্জা পাচ্ছে।

বন্দের কথায় সবাই হেসে ওঠে।

দীর্ঘ সময় এবং পথ ধরে চলা ওদের গাড়িটাকে পথ চলতি অন্যান্য গাড়িগুলোর মাঝে এটুকু বেমানানই লাগছে।

এখন সন্ধ্যা। ওদের গাড়ি এসে থামল বেভারলি হিলস হোটেলের সামনে। শীততাপনিয়ন্ত্রিত বারে বসল ওরা। বন্দের মুখ দেখে মনে হবে সে বোধহয় এই মাত্র হলিউড থেকে সুটিং সেরে ফিরছে।

লিটার এর মধ্যে নিউইয়র্কের সাথে চারবার ফোনে কথা বলেছে।

বন্দ আর টিফানি মৃদু স্বরে কথা বলছিল।

লিটার ফোনে কথা বলে ওদের কাছে এসে বলে — যাক সমস্যা মিটেছে। ‘এলিজাবেথ’

জাহাজে তোমাদের জন্য কেবিন বুক করা হয়ে গেছে। একটু দেরি হল বটে। হ্যাঁ, অ্যাস্টর হোটেল থেকে জেমসের কিছুক্ষণ সব উদ্ধার করা গেছে। আর টিফানির পাসপোর্ট পাওয়া গেছে ওয়াশিংটন থেকে। একটা ফর্মে তোমাদের সই করতে হবে শুধু। এয়ারপোর্টে যে থাকবে। সে সি.আই.এ...র।

— হ্যাঁ, বিকেলবেলার খবরের কাগজ বলছে-- পোডোশহর শেষ.....এই সব আর কি।

তবে ওদের কাছে বন্ডের মাথার দাম দশ হাজার ডলার।

— তাহলে আমার মাথাটা বেশ দামি, কী বল?

আবার হাসির ফোয়ারা।

লিটার বলে-- তোমরা কিন্তু প্লেনে যে যার মতো উঠবে বন্ড। একটা কথা কী জান, ওই গাড়ি দুর্ঘটনার পর ওরা যখন জানবে তুমি জীবিত, তখন--

— তখন ওদের খোঁজার স্পীড তোমার গাড়ির স্পীড থেকেও বেশি হয়ে উঠবে।

আমি তখন টিফানির নরম কোলে মাথা দিয়ে ঘুমাব।

এবার হাসি আরো দ্বিগুণ হয়ে যায়।

টিফানি বলে--তবে এটা নিশ্চিত, আমরা কিন্তু নিশ্চিতই প্লেনে গিয়ে বসব।

এয়ারপোর্টে ওদের নামিয়ে দিয়ে সামান্য কিছু কথাবার্তার পর লিটার ফিরে গেলে টিফানি সেই দিকে চেয়ে বলে-- আ রিয়েল ফ্রেন্ড ইন ইওর লাইফ।

শোনা গেল ঘোষিকার কণ্ঠস্বর--এ্যাটেনশন প্লিজ, ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ারলাইন্স, ফ্লাইট নং নাইনটি থ্রি, পাঁচ নম্বর গেট থেকে ছাড়ছে। ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ারলাইন্স.....

ওরা এখন শূন্য ভেসে চলেছে উড়োজাহাজে করে।

বন্ড চোখ বুজেছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে সে এবার টিফানির দিকে তাকায়। কী নিষ্পাপ লাগছে টিফানিকে। চোখ বুজে আছে সে। বন্ড ভাবে, সানফ্রান্সিসকোতে ধর্ষিতা হওয়ার পর টিফানি কী পুরুষদের ওপর ক্ষুদ্ৰ? সে কী ঘণা করে এই পুরুষ জাতটাকে? বন্ড যদি ওর প্রেমে পড়ে, তবে টিফানি কী ওর অন্তরের সব জ্বালা, যন্ত্রণা বিদ্রোহ সরিয়ে এক সরলমনা নারীর অন্তর নিয়ে ধরা দেবে বন্ডের কাছে?

টিফানির সাথে কথাবার্তার মধ্যে ওর মেয়ে স্মাগলার, ঠগবাজ, তাসের ডিলার সব কিছু মুছে গিয়ে ধীরে ধীরে ধরা দিয়েছিল ওর মনের শিশুসুলভ সরলতা।

বন্ড ভাবতে থাকে একবার যদি টিফানি তার কাছে সত্যিই ধরা দেয়, তাহলে সে কী তাকে বেঁধে রাখতে পারবে? আর যদি সে টিফানিকে গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে তো তার প্রতি অমানবিকতা করা হবে। তার জন্য নিজের মনকে বন্ড কী তৈরি করেছে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বন্ড ভাবে, না, ওসব চিন্তা পরে করা যাবে। এখন যে কাজের জন্য সে বেরিয়েছে, সেটা শেষ করতে হবে।

টিফানিকে হিরে স্মাগলের ব্যাপারে শেডি ট্রি-এর সাথে জড়ানো যেতে পারে। তবে এই চোরাকারবারের আসল লোক হল জ্যাক স্প্যাংগ আর রহস্যময় এ.বি.সি.। মাল নিয়ে বেচার কারবারটা করে সেরাফিমো। এ.বি.সি. -র ফোন নম্বরটা জানে টিফানি।

বন্ড ভাবে, শেডি ট্রি টিফানির পলায়নের সংবাদটা নিশ্চই চেপে রাখবে না। ফলে হয়তো ফোন নম্বরটা চেঞ্জ করে দেবে।

তাহলে এইমুহুর্তে দেরি না করে এম কে সব জানিয়ে দেওয়াই ভালো। তারপর ওরা যা করবে।

শূন্য অন্ধকার ভেদ কবে সুপার-জি কনস্টেলেশান উড়ে চলেছে।

অবশ্য ভ্যালেনস -এর লোকজন সব কাজ শুরু করে দেবে। ফিরে গিয়ে কিংস রোডের কাছে তার ফ্ল্যাটের আরেকটা ঘরে টিফানি আরামে থাকতে পারবে। রাত্রি বেলা তো রইলই।

লা গার্ডিয়ার ওপর দিয়ে নিচে মহাসমুদ্রকে রেখে প্লেন নামল প্রায় দশ ঘন্টা বাদে।

দিনটা রবিবার। সময় সকাল আটটা।

লাউঞ্জ ধরে এগোতে গিয়ে এক অফিসারের হাত ওদের থামাল। একটা কাঁচের গেট দিয়ে ওদের নিয়ে গেল। পিঙ্কারটন আর স্টেট ডিপার্টমেন্টের দুজন ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। একটা গাড় লাল পন্টিয়াক ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বন্ড দেখল, পন্টিয়াকে ওদের মালপত্র উঠেছে। বন্ড আর টিফানি গাড়িতে উঠে পড়ে।

পিঙ্কারটনের লোকটির ফ্ল্যাটে ওরা কয়েকটি ঘন্টা বেশ আরামেই কাটায়।

এখন বিকেল চারটে পাঁচ। বন্ড আর টিফানি জাহাজ 'এলিজাবেথ' -এর দিকে এগিয়ে চলেছে।

এখন বিকেল চারটে কুড়ি। বন্ড আর টিফানি ওদের কেবিনে ঢুকছে। 'এম' ডেকে ওদের কেবিন বুকড হয়েছে।

বন্ড দেখতে পেল না, যখন ওরা জাহাজে উঠছিল, তখন অ্যানাস্টাসিয়া জাহাজের এক খালাসি কাস্টমস অফিসের এক টেলিফোন বুথে নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে।

ঘন্টা তিনেক বাদে একটা কালো সেডান থেকে দুজন আমেরিকান ব্যবসায়ী সব চেकिং -এর পর জাহাজে পা রাখে।

যাত্রীদের আত্মীয়স্বজনদের জাহাজ থেকে নেমে যেতে বলা হচ্ছে।

ঐ দুজন ব্যবসায়ীদের একজন যুবক। দেখতে সুন্দর। মাথায় টুপি। দুপাশের ঝুলপিতে সাদা কালো চুল দেখা যাচ্ছে। ব্রিফকেসে লেখা আছে : বি. কিটরিজ।

অন্যজন লম্বা মোটা। চোখে বাইফোকাল লেন্সের চশমা। তার ব্রিফকেসে লেখা আছে : ডবলিউ উইন্টার। ব্লাড গ্রুপ : এফ।

ওরা দুজন ওদের কেবিনের দিকে এগিয়ে যায়।

মোটা লোকটা ভীষণ ঘামছে। ওর মুখে ভয়ের ছাপ।

॥ বাইশ ॥

এখন সাতটা পঞ্চাশ। জাহাজ ছাড়বার ব্যস্ততা। কেউ কেবিনে, কেউ জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে। বন্ড তার কেবিনে বসে।

টাগ বোটগুলো জাহাজটাকে বন্দর থেকে সমুদ্রের নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যাবে, যেখান থেকে এই 'এলিজাবেথ' জাহাজটা তার গতি শুরু করবে।

তারপর 'এলিজাবেথ' তার নিজের মূর্তি ধরে অসীম নীল জলের ওপর শ্বেত ফেনিল ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চলবে সাদাস্পটনের দিকে। ইংল্যান্ডের কোলে।

ভীষণ এক বেসুরো ভেঁপু বাজিয়ে এলিজাবেথ জ্ঞানান দিল, এবার আমার যাত্রা শুরু হবে। আমার বক্ষে, সমুদ্রের কোলে তোমরা সবাই নিরাপদ, নিশ্চিত্তে থাকতে পার।

জাহাজ চলতে শুরু করেছে। জাহাজের দু'লনের সাথে সাথে সব কিছু যেন দু'লতে লাগল।

ড্রেসিং টেবিলে রাখা পেনসিলটা এদিক ওদিক গড়াচ্ছে।

বন্ডের মনে পড়ে যায় সেই যুদ্ধের দিনগুলোর কথা। ইউরোপ তখন জ্বলছে। আজকের মতো এত নিরাপত্তা, প্রমোদ উপকরণ এতসব ছিল না। এখন তো র্যাডার, ফোন, ইকোসাউন্ডার সবই আছে। যাত্রা নিরাপদই হবে — বন্ড ভাবে।

এইরকম অনেককিছু ভেবে যাছিল বন্দ। হঠাৎ ওর টিফানির কথা মনে হতেই ওকে ফোন করল— যদি অসুস্থ বোধ কর, তবে ড্রামামাইন আর শ্যাম্পেন খাও।

ডাক্তারকে খবর দিছি; তাছাড়া টার্কিশ বাথের ব্যবস্থা করো। ভালো হবে।তবে ওরা আমাদের খোঁজ পেয়েছে মনে হয়। খুব সম্ভব্ নিউইয়র্কেই।

— ঠিক আছে। কিন্তু তুমি রোজ ফোন করবে তো? ভেরান্ডা গ্রিলে নিয়ে ক্যাভিয়ার খাওয়াবে?

— অলরাইট!.. একটা ব্যাপারে খবর নাও। আচ্ছা, এ.বি.সি.আর লন্ডনের স্মাগলিং ব্যাপারটা সম্বন্ধে তোমার স্মরণশক্তি ঠিক আছে তো? টেলিফোন নম্বরটা? আমি সব কিছু করে ফেলব, একটু সময় লাগবে। কিন্তু আমার ওপর বিশ্বাস আছে তো?

ফোন শেষ হয়। ডিনারের অর্ডার দেয় টিফানি। রিপোর্ট লিখতে হবে। সাংকেতিক ভাষায়।

জাহাজ এখন আটল্যান্টিকে।

দশটায় খবর আসে : এ.বি.সি.। কেয়ার অব হাউস অব ডায়মন্ডস। হ্যাটিন গার্ডেন। লন্ডন পার্টিদের খোঁজ পাওয়া গেছে। হয়তো জরুরি ব্যবস্থা দরকার। ডলারে কত দাম দিতে হবে? -- উইন্টার।

এবার পোর্টসহেড রেডিও জানায়: উইন্টার। ফাস্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার। কুইন এলিজাবেথ। কুড়ি হাজার ডলার দিতে রাজি আছি। লন্ডনে এসে সব বন্দোবস্ত হবে। পাকা কথা জানাও। -- এ-বি-সি।

উইন্টার মেসেজটা পাঠিয়ে দেয় এ-ডেকে।

বন্দ ও টিফানির কেবিনের তলায় দুটো লোক জুয়া খেলছিল।

বন্দ লাঞ্চার পর একটা মেসেজ পায়। 'আজ দেখা করবে অবশ্যই।

দেখার পর টিফানি প্রথমে হাসি-মস্করা করে।

— এত দূরে দূরে বসেছ কেন? আমি কি বুড়ি হয়ে গেছি?

— তুমি তো পুরুষদের একটু উস্কে দিতে চাও।

— তাছাড়া করবোটা কী? মাছ ধরব?

— শোন বন্ধু, এখন একজন হ্যান্ডসাম ইংরেজের সঙ্গে আমার দিন কাটছে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য রত্ন চুরি।

হঠাৎ বন্দের হাত জড়িয়ে ধরে টিফানি।

— বন্দ, এখানে খুব খুশি আমি। অঙ্ককারে তোমার সাথে হাত ধরে বসে থাকতেও ভালো লাগছে। হয়তো ঠাট্টা ভাববে। কিন্তু সত্যি আমি আনন্দে মত্ত, নেশাগ্রস্ত।

ক্রীমরঙের শার্ট আর কালো স্কার্টে টিফানিকে সুন্দর দেখাচ্ছে।

সোনালি চুল, আর মুক্তোর মতো দাঁত। চোখে রোম্যান্স!

— আমারও ভালো লাগছে। -- বন্দ বলে।

ড্রিংক আসে।

টিফানি বলে--এবার বলো, কে তোমার বস, তুমি কী কাজ করো?

প্রথমে তোমায় ঠগ ভেবেছিলাম। কিন্তু বুঝলাম--

— আমি গভর্নমেন্টের লোক। সরকার হীরে স্মাগলিং বন্ধ করতে চায়।

— তার মানে, স্পাই?

— না, আমি অসামরিক অফিসার।

— লন্ডনে আমাকে কোথায় রাখবে? জেলে?

— সেই জেলটা হচ্ছে আমার ফ্ল্যাট।
 —আমি কি কুইনস্-এর রাজ্যের সিটিজেন হয়ে যাব?
 —সে ব্যবস্থাও হতে পারে।
 —তুমি কী বিবাহিত, অথবা—
 —না। কাউকে কাউকে মাঝে মাঝে হঠাৎ ভালোবেসে ফেলি।
 —পুরোনো লোকেরা প্রেম করতে ভালোবাসে। তুমি বিয়ে করনি কেন?
 —বিয়ে ছাড়া জীবনটা আরও ভালোভাবে কেটে গেল। আমার মতে বিয়ে জীবনের ‘যোগ’ নয় ‘বিয়োগ’।

—বোধহয় ঠিক বলেছ! সব নির্ভব করে—তুমি কী হতে চাও!

—তুমি কী চেয়েছিলে?

—মানুষ হতে চাইনি।...জানো, আমি কাকে বিয়ে করতাম?

তোমার ধারণা, হয়তো শেভী ট্রিকে!

—আর পুরুষ ছিল না?

—না, জেমস আমি ভাগ্য মানি।

—টিফানি, অতীত নিয়ে অত ভাববে না। এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

—কী প্রশ্ন?

—তোমার নাম টিফানি কেন? কেন টায়ারায় তাসের ডিলারের কাজ করছ? এত এক্সপার্ট হলে কী করে?

—আমার বাবা ছেলে চেয়েছিল। দেখলো, মেয়ে জন্মেছে। খেপে মাকে ছেড়ে যাবার আগে এক হাজার ডলার আর টিফানির দোকানের পাউডার কেস দিয়ে চলে যায়। আমার নাম হয়ে যায় টিফানি কেস।

টিফানি বলতে থাকে — আমাব মা কিছু কলগার্ল নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। পরে লোভ আরও বেড়ে যায়।

বন্দ বলে — কিন্তু তুমি তো কলগার্ল ছিলে না। অবশ্য তাতে কিছু—

—শোনো। একদিন গুন্ডার দল হানা দেয়। আমি পালিয়ে যাই। প্রথমে রেনো। তাসের ডিলে স্কুলে ঢুকি। সারাদিন খাটনি, কিন্তু ড্রাগপস রুলেৎ আর ও-ব্ল-জ্যাকজ্যাক-এ ভালো নম্বর পাই। হুণ্ডায় দুশো ডলার পেতাম। ছেলেরা মেয়ে-ডিলার ভালোবাসে। আমার কাছে ছেলে মেয়ে দুই ক্লায়েন্টই আসত।...থাক সে কথা! বন্দ তুমি কেমন মেয়ে চাও?

—যে মেয়ে ভালো প্রেম করে। ভালো সস্ বিয়ারনাই বানাতে পারে।

—হায় ঈশ্বর! যে মেয়ে শুধু রাঁধতে পারে, আর চিৎ হয়ে শুতে পারে!

—না,না। তার সোনালি চুল চাই, নিখুঁত ফিগার, শয়তানিঠোঁট, ধূসর চোখ! ঠাট্টা করতে জানে, ভালো ড্রেস পরে, এমন কী ভালো তাস খেল জানে!

—এমন মেয়েকে পেলে তুমি বিয়ে করবে?

—না। একজনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। তার নামের প্রথম অক্ষর ‘এম’। তাকে ডিভোর্স করতে পারলে...মানে কোনো বিয়েই আমার টিকবে না।

—এই যে বললে তুমি অবিবাহিত। যাকগে— তোমার সম্ভান?

—এখন নেই, থাকলে ভালো হত।...কিন্তু সেটাও আমার রিটায়ারমেন্টের পর। না হলে ওদের দেখার সময় কই! যাকগে তোমার কথা বলো টিফানি।

— আমি ঠিক লোক খুঁজে পাইনি। হয়তো খুঁজিনি। ঠিক জায়গায় যাইনি। স্প্যাংগদের সঙ্গে মন্দ ছিলাম না। রুটিনে চলা যন্ত্রের মতো। কিছু টাকা জমেছিল। কিন্তু ওদের সঙ্গে তো বন্ধুত্ব হয় না। তবে একলা থাকতে থাকতে এখন আমি ক্লাস্ত। একটা লন্ড্রির বিজ্ঞাপন মনে পড়ে। পুরুষের শার্ট না থাকলে কাপড় কাচতে বড়ো একলা লাগে।

—মি. সেরাফিমোর ব্যাপারটা কী! পুলম্যানে দুটো বেডরুম, দুটো ডাইনিং টেবিল! হঠাৎ চোখ জ্বলে ওঠে টিফানির। সে টেবিল ছেড়ে চলে যায়।

—টিফানি!

—ইস! তুমি কী নীচু মনের লোক! এমন কথা— তুমি কিছুই বোঝ না।

টিফানির চোখে জল। বন্ড ওকে কাছে টানে।

বন্ড বলে--তুমিও আমায় বুঝতে পার না।

—ট্রেনে আমাকে তোমার ভালো লেগেছিল।

—সেটা কী তুমি বোঝনি?

হঠাৎ টিফানি 'অ্যালিস ইন ওয়াডারল্যান্ডের' কতগুলো লাইন যেন মুখস্থের মতো বলে।

— 'ও ইউর! আমার চোখের জলের পুকুরটা সাঁতারে পেরবার পথ জানো? আমি তো সাঁতার কেটে কেটে ভীষণ ক্লাস্ত। ও ইউর!'

—তার মানে?

—বন্ড, আমি ভেবেছিলাম, তুমি পথ দেখাবে। কিন্তু তুমিই আমাকে জলে ফেলে দিলে। আমি নিজেই হারিয়ে ফেললাম!...কিন্তু তুমি নিশ্চই আঘাত দিতে চাও নি? তাই না?

বন্ড ওর ঠোঁটে চুমু দেয়। প্রগাঢ় চুম্বন।

বন্ডের হাত ধরে লিফটের দিকে এগিয়ে যায় টিফানি।

যাকে বলে পুরুষের সঙ্গে রাত কাটানো, সে রকম আমার জীবনে হয়নি। চল, স্নান করবে। এই স্নানকে বলে 'হট ডোমেস্টিক!'

স্নান শেষ হয়। গরম ঠান্ডা দুইরকম জলে।

নিজের ঘরে একা বন্ড। কল্পনারত।

স্টুয়ার্ট আসে। হাতে ট্রে।

—কি হল?

ট্রের উপর বোতলে খানিকটা শ্যাম্পেন, টোস্টের ওপর স্টেক। ছোটো সসের পাত্র। কাগজের উপর পেঙ্গিলে লেখা: 'এই সস বিয়ারনাই মিস টি. কেস বানিয়েছেন। আমার সাহায্য ছাড়া।'

লেখাটা চিফ কুকের কাছ থেকে এসেছে। শেফ।

বন্ড ফোন তোলে--'টিফানি!'

ওপরে মিষ্টি হাসি।

বন্ড বলে, স্বীকার করছি, তুমি সস বিয়ারনাই তৈরি করতে পার।

দারুন হয়েছে।

॥ তেইশ ॥

রক্ত কখন গান গেয়ে উঠে? কোন প্রেম মুহূর্তে?

যখন, ধরা যাক, কোনো রেস্টুরেন্ট বা থিয়েটারে নিভৃত্তে একটি ছেলে তার প্রেমিকার উরুতে হাত রাখে, আর মেয়েটি সেই হাত চেপে ধরে। এই হাত-রাখা, হাত-ধরার মধ্যে দিয়েই অব্যক্ত কথা বলা হয়ে যায়, অলিখিত শর্ত তৈরি হয়ে যায়।

এখন রাত এগারোটা। জাহাজ এখন আটলান্টিকে। সমুদ্রের জলে জ্যোৎস্না।

বন্দ আর টিফানি গ্রীলের কোণে বসে।

— এখন আমরা কী করব জেমস?

— যা তোমার ইচ্ছে।

— চলো, অকসান্ পুলে গিয়ে ড্রিংক নিই। ক্রীম দ্য মেনথ্।

ওরা স্মোকিং রুমে আসে। প্রায় ফাঁকা।

ওরা অর্ডার দেয়।

একটু পরেই দরজা খুলে যায়। এক ঝাঁক লোক ঢোকে, শ-খানেক হবে। নিলামদার একজন মিড-ল্যান্ড ব্যবসায়ী। হাতুড়ি ঠুকে সকলকে হল্পা থামাতে বলে।

— গুনুন, বাজী হচ্ছে জাহাজের গতি নিয়ে। কত স্পীডে যাবে? ৭২০ না ৭৩৯। ৭২০-র নীচে গেলে লো ফিল্ড, ৭৩৯-এর উপরে হাই ফিল্ড। সবাই মিলে ২৪০০ পাউন্ড বাজীর টাকা জমা দিন।

এরপর একজন স্টুয়ার্ট নম্বর লেখা কাগজের বাস্তুটা নিয়ে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সামনে ধরে। মহিলার তোলা কাগজটি দেখে নিলামদার বলে—দারুণ নম্বর উঠেছে। ৭৩৮। আচ্ছা, এই ৭৩৮-এর জন্য কত বাজী ধরবে? চল্লিশ না পঞ্চাশ পাউন্ড।

— ২০ পাউন্ড।

— বেশ ২০ পাউন্ডেই গুরু করা যাক।—নিলামদার বলে।

— ২০-এক দুই, তিন..

— ৪৫ পাউন্ড।

— আমার বন্ধু মি. রথরাট এই মাত্র পঁয়তাল্লিশ বললেন—

— ৫০ পাউন্ড।

নিলামদার বলে—৫০-এক, দুই, তিন...কেউ কী ৫৫ বা তার উপরে বলবেন? তাহলে ৫৫, ৬০, ৬৫...

ঢং করে ঘন্টা বেজে উঠল। নিলাম পর্ব শেষ করবার ঘোষণা।

মৃদু গুঞ্জনধ্বনি চলে।

বন্দ বলে— মনে হচ্ছে, হাই ফিল্ডে আজ প্রচুর টাকা গলবে। আর আবহাওয়া যখন ভালোই দেখছি, তখন জাহাজ ৭৩৯ মাইলের বেশিই যাবে। টিকিটটা সস্তায় বেরিয়ে যাবে।

—কত টাকা হবে?

— প্রথম টিকিট পরের টিকিটের থেকে কম দামে ছাড়া হয়। মনে হয়, একশো পাউন্ডেই পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, গ্রাহকরা তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না। তুমি যদি একদম প্রথমটা কিনতে পার, মনে হয়, ঠকবে না।

কথা চলতে চলতেই ওদের চোখের সামনে এক সুন্দরী ৯০ পাউন্ডের পরের টিকিটটা কিনে নেয়। টাকাটা দেয় ওর সঙ্গী এক সরলদেহী বন্দলোক। বন্দ সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

টিফানি বন্ডের কাঁধে হাত রেখে বন্ধুকে পড়ে বলে— আমি জানি তোমার মনটা খুব উদার।

— দেখ টিফানি, বন্দ অকারণে পয়সা খরচা করে না। আমার বয়স যদি ৫৫ কী ৬০-এর কাছে হত, তাহলে মেয়েদের জন্য পয়সা খরচা করতে হত। আমি এখন চল্লিশের ঘরেই আছি। সুতরাং, মেয়েদের নিয়ে আমি খুব একটা ভাবি না।

— তবে বুড়োর নাকি দারুণ প্রেমিক হয়। মেয়েদের ওরই বেশি ভালোবাসতে জানে।

— তাহলে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মিস টিফানি কোনো বুড়ো ঘোড়ার সন্ধান পেয়েছে।

বন্দ ও টিফানি দুজনেই হেসে ওঠে।

টিফানি বলে— আচ্ছা, এই জাহাজে তো জুয়াখেলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে না?

— তিন মাইল ছেড়ে এলে বে-আইনি নয়। তবু কিন্তু এরা কাউকেই এদের নিলামের মধ্যে জড়ায়নি। এই অরেঞ্জ রঙের কার্ডটা দেখলেই বুঝতে পারবে, এদের দৈনন্দিন কারবারের সব ব্যাপার।

টিফানি কার্ডটা তুলে পড়তে থাকে : ‘.... কোম্পানির ভূমিকা ও নিয়মাবলি সব বলা হয়েছে। স্মোক রুমে স্টুয়ার্ট বা জাহাজের অন্য কোন কর্মচারী নিলাম খেললে, তা কোম্পানির আইনকে লঙ্ঘন করা হবে। নিলামের ব্যাপারে যাত্রীরা নিজেরাই কমিটি তৈরি করে নিলামের কাজে সাহায্য করতে পারে। প্রয়োজনে স্টুয়ার্টের সাহায্য নিতে পারে।’

বন্দ বলে— যাত্রীদের কাঁখে দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আর একটা ঝামেলার ব্যাপারও আছে। কোম্পানি বলছে, ‘ইউনাইটেড কিংডামের ফিনান্স, রেগুলেশন অ্যাক্টে স্টার্লিং চেক ও স্টার্লিং ব্যাংক নোট ইংল্যান্ডে আমদানি করতে হবে, এটাই লেখা আছে।’

বন্দ এবার টিফানিকে কাছে টেনে নিয়ে বলে— নিলাম জিতে তুমি যে ডলার আর পাউন্ড পেলে, সেগুলো ভাঙিয়েও তুমি স্বস্তি পাবে না। তোমাকে টাকাগুলো লুকিয়ে বা স্মাগল করে নিয়ে যেতে হবে। অবশ্য ততক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে থাকব। এটাই ভরসা।

টিফানি বন্ডের কথাগুলি বেশ মন দিয়ে শুনছিল।

টিফানি বলে— দেখ বন্দ, অ্যাবডাবা নামে এক লোক ছিল, যে তার নিজের বুদ্ধির জোরে বলে দিতে পারত, কোন নম্বরের টিকিটে কি পার্সেন্টেজ ধরা যাবে। সবাই ওকে নিলামের জাদুকর বলে জানত। ওর দুর্ভাগ্য, অন্যের বদলে সে-ই খুন হয়ে যায়। — হাসতে হাসতে টিফানি বলে— তুমি তো দেখছি, ওই অ্যাবডাবার চেয়েও কয়েক কাঠি ওপরে যাচ্ছ।

— তাই! — বলে বন্দ স্টুয়ার্টকে ডেকে ড্রিংকসের অর্ডার দেয়।

টিফানি বলে— আজ রাতে আমি চোখ রঙিন করতে চাই না। আমি শুধু তোমার সাথে আজ—

— কী ব্যাপার, সব চূপচাপ কেন? আবার নিলামের আসর শুরু করা যাক।

— করলেই হয়। — বন্দ বলে।

স্টুয়ার্ট এসে ড্রিংকস রেখে যায়।

নিলামদার রেলিং-এর এক সাইডে গিয়ে চেষ্টা করে বলতে শুরু করে— লেডিজ এ্যান্ড জেন্টলমেন, এবার আরও বড়ো মাপের নিলাম শুরু করা যাক। হাই ফিল্ড বা লো ফিল্ড, এতে একশো পাউন্ড বাজী ধরা আছে। এবার বলতে থাকুন।

নারী পুরুষ নানা কণ্ঠে ডাক শুরু হয়— ১১০, ১২০ থেকে শুরু করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ২০০ পাউন্ডে পৌঁছে যায়। বন্দ ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, কে ডাকল ২০০ পাউন্ড! হ্যাঁ, ঘাড়ের গর্দানে এক সেই মোটা চেহারার লোকটা। ডাক অবশ্য থামে না। ২২০ এসে যায়।

এই মুখটা বন্ডের চেনা! কোথায় দেখেছে, ঠিক স্মরণে আসছে না। কণ্ঠস্বরও খুব পরিচিত। বাদামি চোখ, হাঁ-মুখটা যেন লেটার বক্সের ফাঁকের মতো।

সেই লোকটাই এবার ডাক দিল ২৫০।

বন্দ টিফানিকে জিজ্ঞেস করল— ওই লোকদুটোকে আগে কখনো দেখেছ বলে মনে হচ্ছে?

— নাতো! মনে হয়, ব্রুকলিনের লোক। তুমি ওদের চেন নাকি?

— না।

নিলাম টেবিলে এবার হস্তা উঠেছে। ঘন ঘন হাতুড়ির শব্দ। চাঞ্চল্যের কারণ আছে। গোলাপি ইভিনিং ড্রেস পরা এক সুন্দরী ৩০০ পাউন্ড ডেকেছে।

নিলামদার উত্তেজিত।

সেই মোটা লোকটি বলে— ৩৫০।

এবার শ'য়ে শ'য়ে দর চড়ছে। ৪০০, ৫০০। হ্যাঁ, ৫০০-তেই থেমে যায় এবারের দান। মোটা লোকটাই জয়ী হয়। সবাই অবশ্য সুন্দরী মেয়েটার জয় চেয়েছিল।

কিছুক্ষণ আবার হাই ফিল্ড লো ফিল্ড নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। নিলামদার আবার হাই ফিল্ডের ওপর ডাক শুরু করবে।

বন্দ তরুণীটির দিকে তাকায়। তারপর লোকদুটোকে দেখে। বলে— ওরা কী তোমাদের দেখছে?

টিফানি বলে— আগে বোধহয় দেখেছে, এখন বোধহয় নিজেরা কোনো ভুলচুক করে বোকা বনে গেছে।... জেমস, ওদের কথা থাক। চল অন্য কোথাও—

ওরা উঠে পড়ে। ডেকে নামার সময় বন্দ টিফানির কোমর জড়িয়ে ধরে। বন্দের কাঁধে মাথা রেখে টিফানি বলে— আমার ঘরে নয়, তোমার ঘরে।

বন্দের নিভৃত ঘরে দু'জনের দৃঢ় আলিঙ্গন। বন্দ ডাকে— 'ডার্লিং'। আরেক হাতে টিফানির পোশাকের পিছন দিকের জিপে টান দেয়। এবার নিজেই পোশাক খুলে ফেলে টিফানি। চুম্বনবৃষ্টি হতে থাকে।

টিফানি বলে— জেমস আমাকে গ্রহণ কর তুমি। এখনি, এইমুহূর্তে তোমায় আমি চাই।

টিফানিকে বিছানায় নয়, মেঝেতে শুইয়ে দেয় বন্দ।

॥ চব্বিশ ॥

রাতটা কাটতে থাকে রোমান্স আর উপভোগে।

টিফানির উপদেশ— মাই ডিয়ার, বাঁ পাশ ফিরে ঘুমিও না। হার্ট খারাপ হয়ে যায়। অনেক সময় ফেল করে। এদিকে ফের।

আটলান্টিকে জাহাজ এবার দোল খাচ্ছে। সেই দোল খেতে খেতে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ টেলিফোন।

— সরি স্যার। অত্যন্ত জরুরি একটা টেলিগ্রাম এসেছে আপনার নামে। পড়ে শোনাব না পাঠিয়ে দেব?

— পাঠিয়ে দিন। থ্যাঙ্কস্

আবার উত্তেজনা, উৎকর্ষা। এতক্ষণের নিভৃত আনন্দের রেশ শেষ হয়ে যায়। অস্থির লাগে। উঠে গিয়ে সোজা শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ে বন্দ।

স্নান সেরে ঘরে এসে টেলিগ্রামটা পড়ে। চিফ অব স্টাফ জানিয়েছে, প্রথম কথা— গোপন সার্চে সেয়ে-র অফিস থেকে এ.বি.সি.-র নামে একটা বার্তা পাওয়া গেছে। কুইন 'এলিজাবেথ' থেকে উইন্সটন জানিয়েছে, তুমি ও মিস টিফানি কেস জাহাজে রয়েছ। তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে? এ. বি. সি. নির্দেশ দিয়েছে, টিফানি কেসকে হত্যা করার। তার জন্য সে কুড়ি হাজার ডলার পাবে। দ্বিতীয় কথা, আমাদের ধারণা রফাস বি সেয় আসলে নিজেই এ.বি.সি.। ফরাসি অঙ্করে ওর নামের বানান সেইরকমই হয়। তৃতীয় কথা, সেয় কাল খুব সম্ভব প্যারিস চলে গেছে, ডাকারে আছে। সিয়েরা লিয়ন থেকে হীরে ফ্রেঞ্চ গায়োনায় যায়। আমরা সেই ডেস্টিস্টকে সন্দেহ করছি।

চতুর্থ— কাল রাতে তুমি সিয়েরা লিয়ন যাও। বসকম ডাউনে আর এ এফ ক্যানবেরা তোমায় নিয়ে যাবে।

বন্দ স্তম্ভিত। তার মানে, স্প্যাংগল মবের কোনো লোক জাহাজে রয়েছে। শত্রু সহযাত্রী! কে সে?

ফোন তোলে বন্দ।

টিফানি অবশ্য নিজের ঘরেই ঘুমোতে গিয়েছিল। তার বিছানার পাশেই টেলিফোন। ফোন বেজে চলে, কিন্তু তোলে না কেউ। এ কী রহস্য!

টিফানির ঘরের দিকে দৌড়ায় বন্দ। একি! শূন্য বিছানা, নিভাঁজ, অর্থাৎ, কেউ স্পর্শ করেনি পর্যন্ত। আলো জ্বলছে। কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে আছে টিফানির ব্যাগের নানা জিনিস। ধারণা হয়, খুনি আগে থাকতেই দরজার পাশে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। টিফানি ঢোকামাত্রই মাথায় আঘাত করেছে।

কিন্তু এরপর কী হতে পারে? কোথায় টিফানি? নাকি টিফানির দেহ? ভাবতেই বন্ডেব সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে আসে।

করিডর ধরে দৌড়ে যায় বন্দ। এখন রাত তিনটে। টিফানি ঘরে গিয়েছিল দুটো নাগাদ। কিন্তু এখন কী করণীয়! ক্যাপ্টেনকে খবর দেবে না অ্যালার্ম বাজাবে? তাতে লাভ হবে কি? সবাই হয়তো তাকেই সম্প্রহ করবে। জাহাজের সার্জেন্ট ভাবতে পারে, এটা প্রেমিক-প্রেমিকার খেলা অথবা মাতলামি।

নিজের ঘরে ফিরে আসে বন্দ। প্যাসেঞ্জার লিস্টে উইন্টারের নাম চোখে পড়ে — A 49। তার মানে নীচের ডেকে। উইন্টার। অর্থাৎ, উইন্ট এবং কিড, মুখোশ পরা দুই গুন্ডা। ওবা ডেট্রয়টের মস্তান।

বন্দুকের সঙ্গে সাইলেন্সর আটকে নিয়ে ঘরের বাইরে যায় বন্দ। ওরা বন্ডকেও খুন কবতে পারে! তার আগে কি ওরা পোর্ট হোল দিয়ে টিফানিকে জলে ফেলে দেবে? তারপর শাস্ত মনে তাস খেলবে বা বই পড়বে?

কথাটা মনে আসতেই কাছাকাছি একটা পোর্ট হোল খুলে ফেলে বন্দ। মাথা গলিয়ে দেখে, নীচে দুটো গোল ফুটো দিয়ে আলোর আভাস। জাহাজের দড়িটা প্রথমে ঝুলিয়ে দেয় বন্দ, তারপর সেই দড়ি বেয়ে নামতে থাকে।

রাতের বাতাস ও শরীরটাকে দোলা দিচ্ছে। বেশ নিচে সমুদ্রের কলরোল। আবার বহু ওপরে আকাশে স্থির নক্ষত্রের দল। টান পড়ছে, দড়িটা ছিঁড়ে যাবে নাতো! সমুদ্র যেন ক্ষুধিত। বন্দ কল্পনা করে, সে নিজে যেন একটা বাচ্চা ছেলে। আপেল গাছের পাতলা ডাল ধরে ঝুলছে। নীচে বাগানের ঘাস। ভয় কি!

এইবার একটা পোর্ট হোলে ডান পা ঢোকাতে সক্ষম হয় বন্দ। নরম কেন? এখানে একটা পর্দা রয়েছে। বন্দ ধীরে ধীরে পোর্ট হোলের বুকো পৌঁছায়।

ভেতরে ঘরে কর্কশ পুরুষ কণ্ঠ কী যেন বলে! নারী কণ্ঠে চিৎকার— ‘না’! ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড়ের আওয়াজ। বন্দ এবার পোর্ট হোলের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে দেয়। তিন ফুট ৮ওড়া গোল গর্ত। ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দ।

বন্দুক তুলে ধরে লোক দুটোর দিকে।

ওরা তেমন একটা ঘাবড়ায় না। মোটা বলে— তুমি আবার এখানে কেন বাছা?

আরেকজন বলে— তাসের বারো নম্বর খেলোয়াড় হতে এসেছ নাকি?

সত্যি লোকদুটো দুর্দান্ত! বন্ডেব নাটকীয় আগমনে একটুও চমকেছে বলে মনে হয় না। টুলে বসা টিফানি এখন বন্ডের দিকে পিছন ফিরে আছে। টিফানির খালি গা, শুধু ছোটো একটা প্যান্ট

পরা। ওর হাঁটু দুটোর ওপর চেপে বসে আছে মোটাটা। আর সাদা চুল লোকটা অলসভাবে বিছানায় শুয়ে আছে।

স্পষ্ট গলায় বন্দ বলে— টিফানি নিল ডাউন হও। ঘরের মাঝখানে যাও।

টিফানি বলে— আমি তো ঘরের মাঝখানেই রয়েছি জেমস।

বন্ডের বন্দুক দুই ভিলেনের দিকে। চোখও তাদের দিকেই স্থির। না তাকিয়েও বুঝতে পারে, টিফানি উঠে দাঁড়িয়েছে। বাথরুমের দরজায় শব্দ হয়। তাহলে টিফানি এখন বাথরুমে। খুব ভালো, দুমদাম ফায়ারিং হলেও টিফানির কোনো ক্ষতি হবে না। গুন্ডাগুলো অপেক্ষা করছে, বন্দ পথম কখন গুলি ছোঁড়ে। লোকদুটো কিন্তু সংখ্যা গুনছে— 45, 65, 86 — খুব সম্ভব গুলি ছোঁড়ার সাংকেতিক শব্দ। মোটা লোকটাই জোরে জোরে আউড়াচ্ছে।

বিছানায় শোয়া লোকটা মাটিতে জাম্প দেয়। তারপরেই বুক চেপে ধরে। কিন্তু বন্ডের গুলিটা লেগেছে ঠিক ওর কপালের মাঝখানে। ফুটো করে বেরিয়ে গেছে।

দুম! বন্ডের দ্বিতীয় গুলি। গুলিটা বিছানায় লাগে। মোটা লোকটা পিস্তল তোলার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ডের হংকার— ফেলে দাও।

পিস্তলটা কার্পেটের ওপর পড়ে থাকে। বন্ডের আদেশ— উঠে দাঁড়াও.... এবার বোস। লোকটা পিছন ফিরে মাথার ওপর হাত তুলে চেয়ারের দিকে যায়। মনে হবে, আদেশ পালন করতেই যাচ্ছে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কী যেন একটা ছুঁড়ে মারে। চকচকে ধাবালো ছুরি, বন্ডের বুকের একপাশে গেঁথে যায়। একই মুহূর্তে তৃতীয় গুলিটা চালায় বন্দ। লোকটা মেঝেতে পড়ে যায়। তার ঘোলাটে চোখের তারা স্তব্ধ।

বন্ডের শার্ট রক্তে ভিজে উঠেছে। ছুরির ফলাটা অনেকখানি বিঁধেছে, তবু বাঁটটা ধরে আস্তে আস্তে বুক থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে ফেলে দেয় বন্দ। বন্দুকে সেফটি ক্যাচ লাগায়। বাথরুমের দরজায় টোকা দেয়— টিফানি, আমি জেমস।

দরজা খুলে চমকে ওঠে টিফানি। এ কি! এত রক্ত ঝরছে! বন্ডের শার্ট খুলে পাঁজবার ক্ষত জায়গাটা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলে টিফানি। বাথরুমে পড়ে থাকা একটা খুর দিয়ে ফালি ফালি করে তোয়ালেটা। তাই দিয়েই বন্ডের বুকটা শক্ত করে বেঁধে দেয়।

ঘরের মাঝে আসে ওরা। কেউ কোনো কথা বলে না। শুধু নরম চুমু। যা বুঝিয়ে দেয়— হ্যাঁ, আমরা এখনও বেঁচে আছি।

এরপর আরো কান্ড করতে হয়। রোগা লোকটাকে গলায় শার্ট বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মনে হবে, আত্মহত্যা করেছে। পরে অবশ্য সবই বোঝা যাবে। মোটাটার হাতে বন্দুকের ট্রিগারটা ধরিয়ে দেওয়া হয়। ওপর থেকে মনে হবে, দুটোই সুইসাইড কেস।

নাঃ, এই কায়দাটা চলবে না। কিডের লাশটাকে টেনে হিঁচড়ে পোর্ট হোলের কাছে নিয়ে আসে বন্দ। তারপর ফোকর দিয়ে গলিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। আর উইন্ট বন্দুক হাতেই পড়ে থাকে। অর্থাৎ মনে হবে, কিডকে জলে ফেলে দিয়ে পরে অনুতাপে সুইসাইড করেছে উইন্ট। তাসগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, তাসখেলা নিয়েই ওদের ঝগড়া মারামারির সূত্রপাত।

এরপর পুলিশ আসবে। তখন তো বন্দ আর টিফানি এখানে আর নেই। অবশ্য বন্ডের বন্দুকটা পুলিশ পাবে। কিন্তু সিক্রেট সার্ভিস লোকেদের বন্দুকে নস্বর থাকে না। যা হবার হবে।

পোর্ট হোল থেকে ঝুলন্ত দড়িটাকে কেটে সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে। তার সঙ্গে বাকি বুলেটগুলো এবং শূন্য খাপটাও। তারপর -

তারপর টিফানিকে বুক জড়িয়ে ঘুমোতে হবে যুগ যুগ ধরে।

বেরিয়ে যাবার আগে মৃত মোটা লোকটাকে চিনতে পারল বন্দ। এরই ব্লাড গ্রুপ— ‘এফ’।
মৃতের চোখ দুটো যেন শিকার করছে— হ্যাঁ, মানছি, জগতে একমাত্র চিরন্তন সত্য মৃত্যু।

॥ পঁচিশ ॥

কাঁটাঝাড়ের গোড়ায় এখন আর বিছে বাসা বাঁধে না। তবে তিন ইঞ্চি সরু ফাঁক দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক রাস্কুসে পিঁপড়ে সার বেঁধে এগিয়ে চলেছে। মিলিটারির মতো। যেন একটা পঁচিল তৈরি করতে চাইছে।

এটা সেই আফ্রিকার তিন রাজ্যের মাঝামাঝি জায়গা।

লোকটা অনেকক্ষণ কাঁটাঝোপের আড়ালে বসে আছে। অপেক্ষা করতে করতে অস্থির। গভীর রাত, অসহ্য গরম। না, এইভাবে আর পারা যায় না। এ কারবার ছাড়তে হবে। ওদের জানিয়ে দিতে হবে ব্যাপারটা। বলতে হবে, নতুন ডেন্টিস্টটা আসলে স্পাই। তাছাড়া, সরকার সব জায়গায় ডালকুস্তার মতো পাহারা বসিয়েছে।

উফ্, আবার প্লেনটা দেরি করছে। স্মাগলারটা ছটফট করতে থাকে। একমুঠো ধুলো নিয়ে পিঁপড়েগুলোর ওপর ছোঁড়ে। ওদের মিলিটারি মুভমেন্ট তখনই করতে চায়। পায়ের জুতো খুলে মারতে থাকে পিঁপড়েগুলোকে। কালো শয়তান। কালো শয়তান! আফ্রিকান ভাষায় গালাগাল দিতে থাকে। নিষ্ঠুর ভাবে পায়ের পাতা দিয়ে পিষে দেয় পিঁপড়ের দলকে।

কালো জানোয়ার, কালো জীব, পোকা-মাকড়, কালো মানুষের উপর তার ঘৃণা।

উত্তর দিকে তাকায়। প্লেন আসছে কি? ঝোপের ভেতর গিয়ে ওর টর্চ আর হিরের প্যাকেট বের করে আনে।

প্রায় একমাইল দূরে ছোটো ঝোপের আড়ালে সাউন্ড ডিটেক্টর তার কাজ সম্পন্ন করেছে। তিনজনের টিম। অপারেটর জানায় : তিনশমাইল, একশো কুড়ি স্পিড। হাইট নশো ফুট।

বন্দ বলে— আরে, এই রকম পূর্ণিমা রাতে ওদের অভিসার হয়। চাঁদের আলোয় চোরচালান চলে। আজ বোধহয় দশ মিনিট দেরি হবে লোকটার।

বন্ডের সঙ্গে আছে ফ্রিটাইন গ্যারিসন কোর্সের একজন অফিসার। সে বলে— সেটার সম্ভাবনাই বেশি স্যার।

আরেকজন কর্পোরাল। সে বলে— চাঁদের আলোতেই ওদের ধরা সহজ হবে।

স্মাগলারের ট্রাকটাও একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে। ওর মোটর সাইকেলের আওয়াজ থেকে সব কিছুই সাউন্ডটেকারে ধরা পড়েছে। ট্রাকের ওপর রয়েছে ডবল-ব্যারেল অটোমেটিক অ্যান্টিএয়ারক্রাফট বোফর্স।

আকাশে এবার হেলিকপ্টার। বন্দ বলে— আপনারা সবাই তৈরি তো?

হ্যাঁ স্যার।

এইবার তাহলে আসছে— শেষ নায়ক। এত কান্ডের হোতা। শ্যাটন বন্দ তাকে একবারই মাত্র দেখেছিল। স্প্যাংগলড্ মব-এর এক নম্বর ব্যক্তি। বন্ডের কাছে টার্গেট এখন এই। হয় মারো, নয় মরো। মধ্যপথ নেই। শেডী ট্রি এখনও রয়েছে, তবু সে সহ্যসীমার বাইরে নয়। কিন্তু এই ব্যক্তি—

হিংসার অবতার। নিষ্ঠুরতা ওদের মনের শক্তি। কতবার বন্দকে ওরা মৃত্যুর মুখে ফেলতে চেয়েছে। অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে! কতজনকে খুন করেছে! বন্ডের ভাগ্যে সহায়ক জুটেছিল— লিটার এবং টিফানি— তাই বেঁচে গেছে বন্দ।

আজ শেষ ভিলেন। সে-ই হুকুম দিয়েছিল বন্দ ও টিফানিকে খতম করার।

সময় মতো M তাকে সব জানিয়েছিলেন।

বন্দ সব ঘটনা খুলে বলেছিল।

M বলেছিলেন — চুনোপুটিদের কথা ছাড়া। আমি চাই রাখব বোয়ালটাকে। সে জ্যাক স্প্যাংগ বা এ.বি.সি যে নামই ধরুক না কেন। দাঁতের ডাক্তারটাকেও ধরার বেশি করবে। হিরে খনির কাছে আমি ২৮০৪ কে নিয়োগ করেছি। স্পটে গিয়ে বাকি কাজটা শেষ করে এসো। আর মেয়েটির খবর কী। ভ্যালেন্স ওকে অভ্যুক্ত করতে চায়না।

— সত্যি স্যার। মেয়েটা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

— কোথায় সে?

— লন্ডনের পথে। আমার অতিরিক্ত ঘরটায় আপাতত উঠবে। কাজ ভালোই পারে। আমার ফিরে আসা পর্যন্ত—

— অল রাইট! উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট!

এখানে আসার আগে এই কথাই হয়েছিল M -এর সঙ্গে।

এখন এই অকুস্থলে স্মাগলারের হাতে চতুর্থ টর্চ। টর্চের আলোয় A-B-C লেখা হল। হেলিকপ্টার নামল।

পাইলট আসছে। চোখে গগলস, মাথায় হেলমেট। কিন্তু এ কে? যে আসে, তার চেয়ে অনেকটা লম্বা।

— মাল এনেছ?

— হ্যাঁ। কিন্তু ওই জার্মান লোকটা কই। যে বারবার আসে?

— আর কোনদিনও আসবে না সে। আমি এ.বি.সি। এই চোরাপথের কারবার এবার ছেড়ে দেব।

আমেরিকানের গলা। গুরুগম্ভীর। স্মাগলার বলল— ও,—

আগের মতোই রুটিন কাজকর্ম আপাতত। তারপর স্মাগলার বলে— ব্যাপারটা থামানোর আগে আরেকবার ভেবে দেখে যায়—

কথা শেষ হয় না তার। পাইলটের পিস্তলের তিনটে গুলি যথেষ্ট। সে ইহলোক ত্যাগ করে।

হিরের প্যাকেটটা আগেই নিয়ে নিয়েছিল এই নতুন পাইলট।

হঠাৎ লাউডস্পিকারে ঘোষণা— একদম নড়বে না। তোমাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে।

পাইলট হতচকিত। তবু সে মই ধরে হেলিকপ্টারে উঠে যায়। ককপিটে ঢুকে যায়। এমনকি হেলিকপ্টার শূন্যে উঠে যায়।

ঝোপের তলায় ট্রাকের উপর রাখা বিমানধ্বংসী বোফর্স তৈরি হয়।

বন্দ বলে— কর্পোর্যাল, স্টেডি!

গোলা ভরা হয়। সঙ্গে একটি গোলা আকাশে ছুটে যায়। তারপরেই আরেকটা। বুম-পা! বুম-পা! বুম-বুম-বুম— পরপর গুলি চলে হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে।

কিছুক্ষণ রক্ষা পায় হেলিকপ্টার। তবে বেশিক্ষণ নয়।

হঠাৎ রোটোরের লেজ ঝলসে ওঠে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

অফিসার বলে— ডান্!

বন্দ দূরবিনে দেখে কেবিনটা দাউদাউ করে জ্বলছে। বলে— আরে, পাইলট, ওই প্রধান খলনায়ক যে জ্বলে যাচ্ছে—

অফিসার বলে— চলুন। জ্যাঙ্গু ধরার বেশি করি। কিন্তু ওটা যে ক্র্যাশ করছে।

হেলিকপ্টার এখনও কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে। টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ছে।

ওইখানেই আছে জ্যাক স্প্যাংগ। বন্ডের মৃত্যু দন্ডদাতা। বন্ডের সঙ্গে টিফানিকেও মৃত্যুদাণ্ডা জারি করেছিল সে। বন্ড একে ফোরেস্ট গার্ডেনের ঘরে দেখেছিল— রুকাস বি সেয়। দ্য হাউস অব ডায়মন্ডসের ইউরোপ বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট। গলফ খেলে, প্যারিস যায়। আদর্শ নাগরিক বলে যাকে অভিহিত করেছিলেন M।

এই লোকই মি. স্প্যাংগ। একমাত্র আরেকটা খুন করল সে।

স্প্যাংগ এখনও বেশি চালাচ্ছে। কিন্তু অলটিমিটারের কাঁটা ছড়মুড় করে নীচে নামছে। হাজার হাজার পাউন্ডের হিবে ওর কাছে এখন! বন্ডুক-ও আছে। কিন্তু সবই অর্থহীন এখন!

আকাশে ভন্ট খাচ্ছে হেলিকপ্টার। পবমুহুর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ঝোপটার ওপরেই। আগুনের কুণ্ডলী উঠছে আকাশে। আগুন আর ধোঁয়ায় আকাশের চাঁদ ঢেকে গেল।

ক্যাপ্টেন বলে— সব শেষ! কাল সকালে জায়গাটা যাব। তখন হয়তো খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে কিছুটা। ফ্রেঞ্চ গার্ডরাও তার মধ্যে এসে যাবে। — এবার স্যার, একটু ঘুমাবার অনুমতি যদি দেন—

— ঠিক আছে, আপনি রেস্ট নিন। — বন্ড বলে।

— আপনি ?

— আমি জেগে থাকব।

অফিসার অবাক চোখে বন্ডকে বুঝতে চেষ্টা করে।

— থ্যাংক ইউ, স্যার!

কামানের ট্রিগার থেকে পা সরায় বন্ড! সিগারেট ধবায়।

তাহলে ?

হিরা চোরাচালানের ইতিহাসেব এখানেই ইতি। ফাইলে শেষ পাতা লেখা বাকি। ছ-টা মৃত্যু, বিচিত্র নিষ্ঠুর খেলা!

আগুনের আভায় লালচে বন্ডের মুখ। ঙ্গেখের মণিতেও আগুনের শিখা নাচছে।

আশ্চর্য. যা নিয়ে এত কাণ্ড, সেগুলোর কী অবস্থা? হিরেগুলোর। আগুনের আঁচে পুড়েও হিরে নাকি বেঁচে থাকবে। হিরে নাকি অক্ষয়! সেই চিরন্তন, মৃত্যুর মতোই। ডায়মন্ডস আর ফর এভার—

ট্রাক থেকে নামে বন্ড। আগুনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেই দিকেই হাঁটতে থাকে।

আশ্চর্য, এর মধ্যেই টিফানির মুখটা মনে পড়ে। সেই উজ্জ্বল তিস্ত-মধুব মুখটা।

সব মিলিয়ে কিন্তু খুশি নয় বন্ড। কী জন্য এত কাণ্ড!

তবে একটা শিক্ষা। হিরেকে চিনতে পারা গেছে, জানা গেছে তার আসল চরিত্র। মৃত্যু এবং হিবের মধ্যে মিল আছে— গান্ধীর্ষ আব মর্যাদার মিল। দুজনেই চিরন্তন।

লিভ অ্যান্ড লেট ডাই

॥ এক ॥

জেমস বন্ডের মতো এক দামি সিক্রেট এজেন্টকেও কখনো কখনো বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে এই সমাজেই আত্মগোপন করে থাকতে হয় আত্মরক্ষার্থে।

বন্ড এখন নিউইয়র্কের আইভল ওয়াইল্ড এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নেমে এগিয়ে চলেছে এক খানদানি অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে।

বন্ডের আশঙ্কা ছিল তাকেও অন্যান্য যাত্রীদের মতো এই বিমানবন্দরের বিভিন্ন বিভাগে ঢুকে সবকিছু পরীক্ষা দিয়ে বেরোতে হবে। যেমন — কাস্টমস, হেলথ, পাসপোর্ট, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি। কিন্তু অতটা দুর্ভোগ তাকে পোহাতে হল না।

এগোতে এগোতেই বন্ডের চোখে পড়ল কম্পিউটারে তার নাম. নম্বর। পাসপোর্ট সেকসনের মুখে সে যখন দাঁড়িয়ে, তখন একজন কর্মচারী বন্ডের কাছে এসে তার পাসপোর্টটা দিয়ে বলল — হ্যাভ এ নাইস ডে স্যার।

একটা ব্যাপারে বন্ড নিশ্চিত হতে পারছিল না। সে যে ধরনের কাজ করে, তা বিপজ্জনক প্রতি পদে। সুতরাং, তার যাবতীয় কর্মবৃত্তান্ত গোপন থাকাই ভালো। নিউইয়র্কে যতই তার বন্ধুস্থানীয় কেউ থাক, তাহলেও প্রতি মুহূর্তে তাকে সাবধানে চলতে হবে।

বন্ড পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে কিছুটা এগোতেই স্পেশাল ইনফরমেশন সেকসনের সামনে থেমে মি. হ্যালোরান বেরিয়ে এসে বন্ডকে অন্তত তিনটে সিকিউরিটি ডোর পার করে বাইরে নিয়ে এল।

বাইরে অপেক্ষমাণ কালো বাইকে উঠে বসে বন্ড আর হ্যালোরান।

গাড়ি চলছে।

বন্ড বলে — আমি অবাধ হচ্ছি হ্যালোরান, কী করে তুমি এত কায়দা করে ওই ষণ্ডামার্কা পুলিশ দুটোকে ম্যানেজ করে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলে? তবে যাই বলুন, এ যেন ভি ভি আই পি-দের মতো সমাদর!

— আমার দায়িত্বটুকু আমি পালন করেছি মাত্র। এখন আমার বাকি কাজ হল নির্ধারিত স্থানে যথাযোগ্য লোকের হাতে আপনাকে তুলে দেওয়া। আপনি এখানে সরকারের সম্মানিত অতিথি। ডোন্ট মাইন্ড, আমি আপনার পাসপোর্টটা দেখতে চাই।

পাসপোর্টটা নিয়ে হ্যালোরান তার ব্যাগ খুলে মার্কিন মুলুকের ভিসার ছাপা মেরে বন্ডকে আবার ফেরত দিয়ে দিল। তারপর সে ওই ব্রিফ থেকেই এক হাজার ডলার বার করে বলল — এটা রাখুন মি. বন্ড।

-- এটা। কী ব্যাপার হ্যালোরান?

— এক হাজার ডলার। পরিষ্কার জানিয়ে রাখি, টাকাটা আসলে কম্যানিস্টদের। আমরা পেয়েছি স্মিট-কিনাঙ্কি তল্লাশি থেকে। রেখে দিন, প্রয়োজনমতো ব্যবহার করবেন। আর এ ব্যাপারটা আপনার চিফ জানেন।

— ও. কে., ধন্যবাদ হ্যালোরান।

হ্যালোরান বলে — তাহলে এবার আমি আমার ওয়ার্কিং রিপোর্ট লিখতে শুরু করে দিই।
নইলে তো আমাকে চিফের কাছে তা আবার—

— ও সিওর সিওর! — বলে বন্ড সিগারেট ধরিয়ে বাইরের দিকে তাকায়।

ট্যান্সিতে যেতে যেতে বন্ড ভাবে — যুদ্ধের পর এই প্রথম তার আমেরিকায় আগমন। মন দিয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে দেখতে লাগল সবকিছু — ক্যানসার ও পোলিওদের বাঁচানোর জন্য বড়ো বড়ো করে লেখা বিজ্ঞাপন, ফ্যাশনসমৃদ্ধ যুবতির দল, পেশিবহুল স্মার্ট যুবক, ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের সাবধানসূচক বিজ্ঞাপন — শত্রুর আক্রমণে থমকে যাবেন না, কোনো ক্রসিং-এ আবার রোড ম্যাপ, এইরকম কত কি।

কোনো বিপদে পড়লে এতক্ষণ ধরে দেখা সবকিছুই তার কোনো না কোনো কাজে লেগে যাবে।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে দীর্ঘক্ষণ চলা মুক্তবায়ু গ্রহণ এবার শেষ হতে চলেছে। ট্রিলবরো ব্রিজের ওপর থেকে নিউইয়র্ক মহানগরের আরম্ভের দৃশ্যই বিস্মিত করে তুলল।

— আমরা বোধ হয় এসে গেছি, তাই না?

হ্যালোরানের চোখে বিস্ময়। সে বলে — সত্যিই, আপনি প্রখর বুদ্ধি ধরেন।

এই কথার কোনো জবাব না দিয়ে বন্ড বলে — ভাবছি, এই এত বড়ো সুন্দর শহরে যদি কোনো পরমাণু বোমা পড়ে, তাহলে এই নিউইয়র্কেই হবে আমার সমাধিক্ষেত্র।

হ্যালোরান বোকার মতো চেয়ে থাকে বন্ডের দিকে।

গাড়ি এখন সুসজ্জিত, যানবাহনপূর্ণ নিউইয়র্কের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সামনের একটা ফোর পয়েন্ট ক্রসিং পার হয়ে গাড়ি এবার এসে থামল ফিফ্থ অ্যাভিনিউ আর ফিফ্টি ফিফ্থ স্ট্রিটের ক্রসিং পার হয়ে।

জানলা দিয়ে বন্ড দেখল একটা লেখা — সেন্ট রেগিস।

— আমি ক্যাপ্টেন ডেব্রটার। — বন্ড গাড়ি থেকে নামবার সাথে সাথেই ডিপ নীল রং-এর ওভারকোট পরা এক মাঝবয়সি লোক এগিয়ে এসে বলল — ক্যাপ্টেন ডেব্রটার।

হ্যান্ডশেক করে বন্ড বলল — সত্যি, আপনার দৃষ্টি আছে।

হ্যালোরান বলে — ক্যাপ্টেন, এবার আপনি সব বুঝে নিন।

ক্যাপ্টেন ডেব্রটার বলে — মি. বন্ডের সব লাগেজ রুম নং ২০০০-এ পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করুন। চলুন মি. বন্ড।

ডেব্রটারের সাথে এগোতে গিয়েও পা আটকে গেল বন্ডের তীব্র একটা হর্নের আওয়াজে। দেখল — একটা কালো ক্যাডিলাক অন্য একটা ট্যান্সির পথ আটকে দেওয়াতে পিছনের ট্যান্সিটা অনবরত হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তকাল হলেও, ক্যাডিলাকের চালক এক নিগ্রো তরুণী এবং পিছনের আসনে কৃষ্ণবর্ণের এক বড়ো মুখওয়ালা লোক তাকে লক্ষ্য করছে, এটা বন্ডের দৃষ্টি এড়াল না।

সিগন্যাল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাডিলাকটা অদৃশ্য হয়ে গেল ফিফ্থ অ্যাভিনিউয়ের দিকে। ওপরে উঠতে উঠতে মনে হল বন্ডের, সে একটু দেরি করে ফেলেছে।

কুড়ি তলার রুম নং ২০০০-এ ঢোকবার আগে ডেব্রটার বলল — একটা সারপ্রাইজ আছে আপনার জন্য।

— সেটা কী?

- আগে ঢুকুন তো ঘরে --- মৃদু হেসে বলে ডেক্সটার।

ঘরে ঢুকে দ্বিতীয় দরজা খুলতেই বন্দ দেখে তার থাকবার জন্য ঘরটা সুন্দরভাবে সাজানো এবং বেশ আবামদায়ক। এবং ওই ঘরে যে পুষ্পসুবক ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখছে, সে গেলিক্স লিটার।

— আরে লিটার, প্যারিস ছেড়ে তোমাকেও কি এখানে কাজে লাগানো হয়েছে?

বিগলিতভাবে লিটার বলে — তুমি ঠিকই ধরেছ। ক্যাসিনোর ঘটনাব পর ওয়াশিংটন হয়ে ওরা আমাকে এখানে পাঠাল। সি. আই. এ. আর এফ. বি. আই. আমাদের সাথে ঠিক যোগাযোগ রেখে চলেছে। সি. আই.-এর সব দিকেই সতর্ক দৃষ্টি। তুমি ব্রিটিশদের হয়ে জ্যামাইকার ঘটনাটার দায়িত্ব নিয়েছ। তুমি নিশ্চিত থাক।

বন্দ হঠাৎ বলে বসে — ক্যাপ্টেন, আমি যেটার ভার নিয়েছি, তার প্রভাব পড়বে ক্যারিবিয়ান ও জ্যামাইকা পর্যন্ত। যার দেখাশুনা করবে লিটার। এবং আমি সি. আই.-এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে লন্ডনে মেসেজ পাঠাব। আর আপনি এখানে আছেন আমার পাশে ছায়ার মতন

লিটার বলে — আমি মাটিনি বানাচ্ছি। পরে লাঞ্চও এসে যাবে এর মধ্যে।

ডেক্সটার রুক্ষ হেসে বলে — আপনি সঠিক জানেন, কী করতে হবে আপনাকে। মি হভার কিন্তু আপনার আগমনে বেশ স্বস্তি বোধ করছেন। হ্যাঁ, সি. আই.-এর কাজ নিয়ে আমার কোনো উদ্বেগের কারণ নেই।

দরজায় টোকা পড়ল!

লিটার বলে — কাম ইন।

দুজন বেয়ারা খাবার পাত্র, ড্রিংকস ও লাঞ্চ নিয়ে ঘরে ঢুকল।

খেতে খেতে ডেক্সটার বলে — মি. বন্দ, কেসটার ব্যাপারে যদি কিছু বলেন।

বন্ডের মুখ দিয়ে শুধু বেবোয় — কুয়াশা....লন্ডন...

ডেক্সটার বলে — হোয়াট?

॥ দুই ॥

তখন জানুয়ারির কনকনে ঠান্ডা, কুয়াশার মধ্য দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছাই রঙের বেন্টলে কনভার্টিবল নিয়ে রওনা দিল বন্দ।

মধ্যরাতে এম-এর এক চিফ স্টাফ ফোনে জানায়, জরুরি কাজে ইমিডিয়েট এম তাকে আসতে বলেছেন। চিফ তাকে এটুকু বলেছিল 'এ' ফর অ্যাপেল, 'সি' ফর চার্লি। তারপরেই লাইনটা কেটে যায়।

ঘন কুয়াশার মধ্যে ডিপার জ্বালিয়ে যতটা দ্রুত যাওয়া যায়, সেই স্পিডেই বন্দ এগোতে লাগল।

গাড়ি এখন কিংস রোড, স্লোন স্ট্রিট পার হয়ে হাইড পার্ক ক্রস করতেই গাড়ির স্পিড স্লো করে। নিজের হাতের ছুরি খাওয়া জায়গাটার দিকে নজর পড়ে তার।

এম. বলেছিল — 'কিউ'-এর কাছে যাও, ও তোমাকে ওই এম দাগটা মুছে দিতে সাহায্য করবে।

দাগটা মুছে গেলেও এখনও হালকা চিহ্ন রয়ে গেছে। হঠাৎই বন্ডের মুখটা ক্রোধে লাল হয়ে ওঠে। প্রতিশোধপরায়ণ রাশিয়ান সংস্থা 'স্মার্শ' — যার অর্থ হল, গুপ্তচরদের শেষ করো। প্রকৃত মানেটা বন্দ ঠিক জানত না। রয়্যাল লেজোর সেই বিদ্রোহী জুয়াকীর্তির ঘটনার পর বন্দ ওদের চরম

শিক্ষা দেবে ঠিক করেছিল। আর এখন বেরিয়া নেই। তাহলে এই এম-এর সঙ্গে গ্রীষ্মের পব আজকের এই দর্শন কি কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে?

এক প্রহরারত পুলিশের জিন্মায় গাড়িটা পার্ক করে রেখে সে প্রধান প্রবেশ পথের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এক জন লোক তাকে বলল — আসুন।

লিফট থেকে নেমে বন্ড সোজা ঢুকল চিফ অব স্টাফের ঘরে।

ইন্টারকামে খবর পাঠাল চিফ অব স্টাফ।

বন্ড এখন এম-এর সুন্দরী পি. এ. মিস মানিপেনির সামনে দাঁড়িয়ে, যে বন্ডকে মিষ্টি হেসে বলল — ওয়েলকাম। বস হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ। প্লিজ। — মানিপেনি এম-এর ঘরের দরজা দেখিয়ে দেয়।

— থ্যাঙ্কস। — বলে বন্ড এম-এর ঘরের দরজা খুলে ঢুকতেই বাইরে সবুজ আলো শব্দ করে জ্বলে ওঠে। এর অর্থ, এখন কেউ এম-এর ঘরে ঢুকতে পারবে না।

— ভেরি ভেরি গুড মর্নিং ০০৭। দেখি হাতটা। — বন্ড আসন গ্রহণ করবার আগেই এম বলে ওঠে।

চেয়ারে বসে বন্ড হাতটা বাড়িয়ে দেয়। এম হাতটা দেখে বলে — ফাইন। তবে মনে হয়, এই পোরশনটায় একটু বেশি লোম গজাবে। ওয়েল, — বলে ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা প্রায় এক ইঞ্চি গোলাকার একটা সোনার মোহর রাখে। তারপর বলে — ফোর্থ এডওয়ার্ডের আমলের। দাম হবে প্রায় পনেরো পাউন্ড। অবশ্য যারা এইগুলো কিনে থাকে।

— স্ট্রেঞ্জ।

— আরও আছে। — বলে কোটের অন্য পকেট থেকে একে একে বার করতে লাগল — ফ্রেঞ্চ, নবম চার্লস, ১৫৭৪, কোয়ার্ড্রুপল, জেনোয়া, ১৬১৭, ফ্রেঞ্চ, চতুর্দশ লুই, ১৬৪৪, স্প্যানিশ, দ্বিতীয় ফিলিপ, ১৫৬০ — এইরকম আরো অনেক।

বন্ড গভীর দৃষ্টি নিয়ে সবগুলো দেখতে থাকে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে এম বলে — ইংল্যান্ডের মুদ্রাটা ছাড়া আর সবগুলো অন্যরকম। এবং ১৫৬০ এর আগেকার। ডাকসাইটে জলদস্যু ব্লাডি মর্গ্যান ছিল জ্যামাইকার গভর্নর ও কম্যান্ডার - ইন চিফ — ১৬৭৪ থেকে ১৬৮৩। ব্রিটিশ মিউজিয়ামেরও ধারণা এগুলো সব ব্লাডি মর্গ্যানেবই ধনসম্পদ থেকে এসেছে। অন্য কোনো জলদস্যুর লুণ্ঠিত সম্পদ থেকে নয়।

পাইপে তামাক ভরে এম আবার বলতে লাগল — এইরকম অজস্র মুদ্রা এসেছে কিউরিও সংগ্রহকারী, সোনার মার্কেট বা ব্যবসাদারদের কাছে। এখন রটে যায় যদি, এগুলো সব চোরাই মাল তবে এর আমদানি বন্ধ হয়ে যাবে। হয়তো তখন গলিয়ে শুধু সোনা আসবে। সোনা যাতে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। সেইজন্য বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে লাগানো হচ্ছে।

এরপর এম একটা বাদামি রঙের খাম খুলল। যার ওপব একটা লাল রঙের তারা আঁকা। খামের ভিতর থেকে একটা কাগজ বার করে বন্ডের সামনে মেলে ধরল এম—

প্লমপিং কারে কর্মরত এক কুলি জ্যাচারি স্মিথ, বয়স — ৩৫, ঠিকানা - ৯০ বি ওয়েস্ট, ১২৫ স্ট্রিট, নি. ই. সিটি, ফেন জুয়েলস ইনকরপোরেটেডের আর্থার ফেনকে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর দুটো মুদ্রা একশো ডলারে বিক্রি করে। স্মিথ হার্লেমের এক গুঁড়িখানায় একজন নিগ্রোর কাছে থেকে কুড়ি ডলারে কিনে নেয়। পরে স্মিথ সেই গুঁড়িখানায় গিয়ে নিগ্রোটোর কাছ থেকে আরও তিনটে মুদ্রা কেনে ষাট ডলারের বিনিময়ে। তবে এই স্মিথের অপরাধের কোনো পূর্ব ইতিহাস নেই। সত্যি বলতে কি, এফ বি. আই. পড়েছে এখন মহা দুশ্চিন্তায়।

বন্ড এবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে। বলে — মি. এমের এখনও অনেক বাকি আছে।

সামনের দিকে ঝুঁকে সামান্য হেসে এম বলে, ঠিক ধরেছ তুমি বন্দ। হ্যাঁ, এখন ঘটনা হল, মিডলম্যানের থেকেও অনেক কম দামে পাচ্ছে সর্ব প্রথম ক্রেতা। এবং অধিকাংশ কেনাবেচার পর্ব চলছে ফ্লোরিডা অথবা হার্লেমে। প্রায় প্রতি অনুসন্ধানই দেখা যাচ্ছে যে, লোকগুলির বেশির ভাগই শিক্ষিত নিগ্রো। অনুমান করা হচ্ছে, কুখ্যাত জলদস্যু ব্ল্যাকবেয়ার্ডের লুণ্ঠিত রত্নভাণ্ডার থেকে এইসব মুদ্রা বেরিয়ে আসছে।

— হ্যাঁ, এখন বলবে যে — বলে এম বলে — কী খাবে বল?

-- স্যান্ডউইচ আর হট কফি।

খেতে খেতে এম বলে — যেটা বলছিলাম, তোমার মনে হতে পারে হঠাৎ জলদস্যু ব্ল্যাকবেয়ার্ড কেন? দেখ, এই ধনসম্পত্তির অনেকটাই পাওয়া গেছে প্লাম পয়েন্টে ২৫ শে ডিসেম্বর, ১৯২৮ সালে। উত্তর ক্যারোলিনার নোফোর্ট কান্টিতে বার্থ ক্রিক নামে যে ছোটো নদী পড়েছে পামলিকো নদীতে। গুপ্তধন কেউ সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করেছিল, কেউ আবার ধরে রেখেছিল। কিন্তু এখন দুটো ব্যাপারে গলদ দেখা যাচ্ছে।

— এক, ব্ল্যাকবেয়ার্ডের দাপাদপি ছিল ১৭১০ পর্যন্ত। আবার জ্যামাইকা যাবার পথে ইংলন্ডের কোনো জাহাজ লুঠ হয়েছে বলে খবর নেই। তাহলে চতুর্থ এডওয়ার্ডের মুদ্রা পাওয়া গেল কীভাবে?

— দুই, গুপ্তভাণ্ডার ছিল জ্যামাইকায়। যার মালিক দস্যু মর্গ্যান।

বন্দ বলে — তাহলে আমরা কী ভাবছি?

এম বাদামি খামের ওপর হাত রেখে বলে — আমাদের স্টেশন সি সিকিটর নামে প্রমোদভ্রমণকারী এক জাহাজের ব্যাপারে খুব উৎসাহী। এই জাহাজের মালিক এবং সমুদ্রের দ্বীপের মালিক একই লোক — মি. বিগ। আসলে এক নিগ্রো গুন্ডা। থাকে হার্লেমে। চেনো কি তাকে?

— না।

-- এবার শোন — এম পাইপে আঙুন ধরিয়ে বলে — যে কুড়ি ডলারের নোটটা এবং নম্বরটা পাওয়া গেছে, সেটা নাকি মি. বিগের দলের। এবং মজার ব্যাপার হল, এই নোটটাই কোনো সিক্রেট নিউজের বিনিময়ে এফ. বি. আই-এর ডাবল এজেন্টকে দেওয়া হয়েছিল, আদতে যে কমিউনিস্ট। এবং আমেরিকাতে সোভিয়েট স্পাইরা এই সব টাকাতাই পুষ্ট। আর মি. বিগের আসল পরিচয় শুনলে তুমিও চমকে উঠবে বোধহয়।

— রিয়েলি!

— ইয়েস। মি. বিগ একদিকে যেমন সোভিয়েত এজেন্ট, আবার অন্যদিকে ভুড়ু তান্ত্রিকে বিশ্বাসী নিগ্রোদের কাছে সে হল ব্যারন সেমাতি কিংবা তন্ত্রগুরুও বলা যেতে পারে। আর, বিগ যুক্ত আছে স্মার্স-এর সাথেও।

— হুঁ একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বন্দ বলে — এরকম অপরাধ আমি আগে হ্যান্ডেল কবেছি বলে মনে হয় না। বিশেষ করে নিগ্রোদের সম্বন্ধে। চিনারা — মুঞ্জো আর, জাপানিরা — মাদকদ্রব্যের সাথে যুক্ত বলে জানি। নিগ্রোর সাধারণত আইন মেনেই চলতে ভালোবাসে।

— তবে বিগ অন্য ধরনের। জন্ম হাইতিতে। ফরাসি রক্ত বইছে ওর শরীরে।

— বেশ ইন্টারেস্টিং।

এম বলে — এদের দলের ট্রেনিং এখন মস্কোতেও হচ্ছে। তুমি ফাইলটা নিয়ে যাও। কাজে লাগবে। হ্যাঁ, তুমি প্লেভার ও কম্যান্ডার ডেমনের কাছে চলে যাও। এফ বি. আইকে একটু সামলে চল। গুড লাক্।

বন্দ এখন কম্যান্ডার ডেমনের সামনে। সি. আই. এ.-র সঙ্গেই ডেমনের কাজ।

ডেমন বলে — তুমি পাতা উলটিয়ে যাও। স্মামি কফি নিয়ে আসছি।

বন্দ এখন হোটেল সেন্ট রেগিসের কুড়ি তলার ঘরে জানলার কাচের মধ্য দিয়ে বাইবেটা দেখছে। হাতে কফির কাপ।

বন্দ ভাবছে — নিগ্রো ফরাসি মিশ্রণজাত বছর পঁয়তাল্লিশের মি. বিগ সম্বন্ধে লিটার বা ডেক্সটার তাকে অতিরিক্ত তথ্য দিতে পারেনি। তবে একটা খবর বন্দ জেনেছে। মি. বিগ, আসলে — বোনাপার্টি ইগনেস গালিয়া, সংক্ষেপে — Big নামের মানের সাথে চেহাবারও সাদৃশ্য আছে। তার নামটা নথিবদ্ধ আছে — বার্থ সার্টিফিকেটে এবং এফ. বি. আই-এর খাতায়। কোনো বাজে নেশায় সে আসক্ত নয়। সম্প্রতি তার হাটের অসুখ ধরা পড়েছে।

১৯৩৮ সালে তার ব্যবসার পার্টনারের মৃত্যুর পর পুরো মালিকানাই তখন বিগের হাতে। ফরাসিতে যথেষ্ট দখল থাকার জন্য আমেরিকার যুদ্ধকালীন গোপন রেজিমেণ্টে তার চাকরি হয় ১৯৪৩ সালে। মার্সিই থেকে সে অনেক গোপন খবর সংগ্রহ করে। এক রাশিয়ান গুপ্তচরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। সম্মানজনিত বিদায় নেওয়ার পর অজ্ঞাতবাসে গিয়ে সে কতগুলো নিষিদ্ধ ব্যবসা চালাতে থাকে।

বিগ তার কর্মচারীদের বছরে কুড়ি হাজার ডলার মাইনে দিত। তার দলে বেইমানির শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড।

হার্লেমে ভুড়ু-তন্ত্রের প্রসারের ফলে নীচু তলার নিগ্রোরা বিগকে মানত ভয়ানক জোমবি বা চলন্ত মৃতদেহের দেবতা হিসেবে। সুতরাং, বিগ সমাজের এই দিকটাতে এক আতঙ্কেব পরিবেশ সৃষ্টি করে তার ব্যবসা চালাত।

এফ. বি. আই.-এর শ্রলোভনে পা দিল এক সোভিয়েট গুপ্তচর। সেটা ১৯৫১ সাল। পেনসিলভেনিয়া মেট্রো স্টেশনে একজন ইকোনোমিস্ট নামবেন। তাকে আনতে গিয়ে সেই সোভিয়েট স্পাই-এর দেহ হল রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন। পরে জানা গেল এক দৈত্যাকৃতি চেহারার কোনো লোক তাকে নাকি ধাক্কা মেবেছিল। তাকে বিগ বলে শনাক্ত করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্য পুলিশের — প্রমাণভাবে সে মুক্তি পায়। হার্লেমের ডাকসাইটে উকিল বিগের জন্য লড়েছিলেন।

তবে কি এই বিপুলাকৃতি নিগ্রো-ফরাসি জাতের সঙ্গে স্মার্শের ট্রেনিং-এর কোনো সম্পর্ক আছে? লিটার, ডেক্সটার-এর কথাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

ভুড়ু-তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাবে নিম্নশ্রেণির নিগ্রোরা বিগের বশীভূত। ওরা জানে, তাদের জোমবি দেবতাকে অবিশ্বাস করা মানেই মৃত্যু শিয়রে। এবং এই সুবিধার ফলে বিগ আমেরিকার পরিবহন এবং ট্রাকের ড্রাইভার, কুলিদের কাজের যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহ করত ওই অশিক্ষিত ধর্মভীরু নিগ্রোদের দিয়ে। বেচাল হলেই চরম শাস্তি — মৃত্যু!

বন্দ ভাবে — কী নৃশংস এই লোকটা!

বিছানায় নিজের দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বন্দ ভাবতে থাকে — হোটলে ঢোকবার মুখে এক বলক দেখা দিয়ে লোকটা উধাও হয়েছে। বিগের এই নৃশংসতাকে শেষ করতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

অস্থির হয়ে ওঠে বন্দের ভিতর। জানলার সামনে উঠে এসে সে পর্দা সরাতেই দেখে উত্তর দিকে একটা লোক শুয়ে আছে।

বন্দ টেলিফোনের কাছে আসতেই দরজায় আঘাত। বন্দ যদিও সতর্ক। বলল — কাম ইন।

বন্দকে পুরোদস্তুর আমেরিকান হতে হবে। দর্জি এসেছে তাই মাপ নিতে, সঙ্গের লোকটি বাকি জিনিসপত্রের ব্যাপারে। বন্দ জানিয়ে দিল -- খুব গাঢ় রঙে তার আপত্তি। আর যা আসবে — টুপি, সাদা টি শার্ট, মোজা, হালকা ওভারকোট। এছাড়া অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

ব্যক্তিদ্বয়ের বিদায় ঘটলে বন্ড টেলিফোনে তার খাবারের অর্ডার দেয়।

বন্ডের কাছে মেসেজ এল -- তার চুলের ছাঁট হবে মিলিটারিদের মতো। তার বাড়ি বোস্টন। সে কাজ করে ইংল্যান্ডের গ্যারান্টি ট্রাস্ট কোম্পানিতে। যতদূর সম্ভব সে যে আমেরিকান স্টাইলে কথা বলে।

বন্ড এখন আয়নার সামনে। এ যেন তার নতুন জন্ম। ঝাঁকড়া চুল বিদায় নিয়েছে। তবে কালো চুল আর দৃঢ় চোয়াল বলছে — এ ব্যক্তি আমেরিকান। তার চোখের ধূসর নীলাভ বর্ণ তো আর পালটানো যাবে না মনে হয়। শত্রুদের চোখকে সে ঠকাতে পারবে। কিন্তু —

না থাক। এখন ওসব চিন্তা মাথায় না আনাই ভালো।

জরুরি ভিত্তিতে আসা পোশাক পরে এখন আমেরিকান বন্ড এম-এর দেওয়া একটা প্যাকেট খুলল। একটা বই, 'দ্য ট্রাভেলার্স ট্রি' বইটা ১৯৫০ সালে হাইতি এবং মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে লেখা। বইয়ের বাকি অংশটা বন্ড পড়তে লাগল :—

'... ভুড়ু-তন্ত্রের অপদেবতারা হলেন — ডন পেড্রো, কিটো, বাকালো, জ্যানডোর ইত্যাদি। ভুড়ু প্রথাটির উৎপত্তি কঙ্গোতে। কোনোরকম বশীকরণ, শত্রুনিধন — এই জাতীয় কাজে ভুড়ু দেবতাকে পূজো করে আহ্বান জানানো হয়। ধর্মভীরু নিগ্রোদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভুড়ু-তান্ত্রিকরা ইচ্ছেমতো শরীরের রূপ পবিবর্তন কবতে পারে। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হল, এদের মধ্যে মায়াজীল সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীদের দেবতা জানোয়ারের পবিবর্তে মানুষের রক্তই বেশি পছন্দ করে।'

'একটা ছোটো কুঁড়েঘর। যা একটা মানুষেরও অনুপযুক্ত। এই ঘরে রয়েছে তন্ত্র-উপাচারের যাবতীয় সরঞ্জাম। ঘরে একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দুটো তলোয়ার, একটা চিমটে রয়েছে। তাব পিছনে একটা কালো ক্রসের মধ্যে টুপি ফুটো করে বসানো, নীচে আঁকা খুলির চিহ্ন। ক্রসের দু দিকের কোণে ঝুলছে ছেঁড়া কালো কোট। মৃত্যুর উপদেবতা ব্যারন সেমাডির প্রতীক এটা।

'দেখা গেল শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। সেই ধোঁয়া এগিয়ে আসছে, আর তার সাথে ড্রামের আওয়াজ। ক্রমশ স্পষ্ট হল বিভিন্ন বয়সি নাচিয়েদের। যারা বিকৃত ভঙ্গী করতে করতে এগিয়ে চলেছে। তাদের কণ্ঠে দুর্বোধ্য কিছু শোনা যাচ্ছে। কখনো পৈশাচিক চিৎকার, কখনো বা বিড়বিড় করছে তারা।

'এবার সুর বদলে গেল ড্রাম আর মল্লোচ্চারণের। এক তরুণ নিগ্রো হাউসেনিকন মাথায় আঙনের পাত্র নিয়ে উন্মাদেব মতো নৃত্য করতে করতে ক্লাস্ত হয়ে একসময় পাত্রটা ফেলে দিয়ে মাটিতে শুয়ে তীর যন্ত্রণায় এমন বিকৃত ভঙ্গী করতে থাকে যেন, তাকে বোধহয় বেদম পেটানো হয়েছে। অন্য এক নিগ্রো যুবক হাতে একটা ছুঁচলো ছুরি নিয়ে বীভৎস মুখে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করতে করতে ছুরিটা শূন্য ছুঁড়ে দেয়। পতনশীল ছুরিটা এসে বিদ্ধ করে তরুণ হাউসেনিকনকে। সমবেত নিগ্রোরা ভয়ে পিছিয়ে যায়। ড্রাম এবার আবণ্ড উচ্চনাদে বাজতে থাকে।'...

বন্ড অরেঞ্জ জুসে চুমুক দিল। দরজায় টোকা।

— কাম ইন। — বলেই বন্ড নিজেই বেশ প্রসন্ন হল। একেবারে খাঁটি আমেরিকান স্টাইলে উচ্চারণ করেছে সে।

রুম-বয় এসে একটা প্যাকেট দিয়ে গেল। বোধ হয় লিটার পাঠিয়েছে।

জুসটা শেষ করে গ্লাসটা টেবিলের ওপর রাখতেই টিক টিক টিক টিক শব্দ সে চোখ তুলে তাকাল। আওয়াজটা আসছে সদ্য আগত এই প্যাকেট থেকে। মন দিয়ে শুনল — আরে, এতো ঘাড়!

ভয়ের কিছু নেই ভাবতেই টুং টাং টুং টাং শব্দ। বন্ড এবার সতর্ক হল। তবে কি পার্সেল বোমা? আর—

কিছুক্ষণের মধ্যে ১২ বোর কার্টিজের চেয়েও কম শব্দে ওই পার্সেলটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বন্ড সতর্ক থাকলেও কিছুটা ছিটকে গেল।

ফোন বেজে উঠল। ডেঙ্গটারের গলা।

বন্ড বলল — কয়েকটা গ্লাস আর বোতল। ও. কে.। আমার ঘরে এইমাত্র ভাঙা কাচের টুকরো বাঁচিয়ে দরজায় বাইরে টানিয়ে দিয়ে এল — ডোন্ট ডিসটার্ব।

কিন্তু দরজায় ধাক্কা পড়ল।

বিরক্ত বন্ড বলল — কে?

— ডেঙ্গটার।

ডেঙ্গটার ঘরে ঢুকে বলল — ট্রিপ ফ্রম সার্বোটাঙ্গ।

বন্ড বলল — আমাব গোপনীয়তা রক্ষায় কোথাও কোনো ফাঁক আছে। ও. কে.। ওরা আমাকে উপহার দিয়েছে। আমাকেও তাহলে কিছু দিতে হয়।

বন্ড ট্রিপের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল — ওয়েল মি. ট্রিপ আপনার তদন্ত শুরু করে দিন তাহলে।

ডেঙ্গটার বন্ডের কথায় বিস্মিত।

॥ চার ॥

তদন্তের কাজ করে ওরা চলে গেলে, বন্ড রুম-বয়কে ডেকে ঘরটা পরিষ্কার করতে বলে কোট আর টুপি হাতে নেয়।

বন্ডের পা এখন সেন্ট রেগিসের সামনে ফুটপাথে।

বন্ড ঘন্টা চার পাঁচেক ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউ ও তৎসংলগ্ন এলাকা, দোকান, বাজার ঘুরে বেড়াল। দেখে নিল আমেরিকাবাসী ও বিদেশীদের চালচলন। নিজেও আমেরিকানদের মতো হবার চেষ্টা করে গেল। না, সেরকম সন্দেহ কেউ তাকে করেনি।

পথে লাঞ্চ খেয়ে ট্যাক্সি নিয়েই বেরিয়ে পড়ল সে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে।

এম এবং ডেঙ্গটারের দেওয়া তথ্যগুলোই সে পেল পুলিশের খাতায়, বিগ সম্বন্ধে। আর পেল বিগের দু একজন সাগরেদের তথ্য।

এরপর বন্ড এল আমেরিকান কোস্ট গার্ড সার্ভিসের অফিসে। রেকর্ড বলল — গত ছ'মাসে সিকেটর নামে জাহাজটা সেন্ট পিটার্সবার্গ বন্দবে এসেছে বেশ কয়েকবার। অরবুরো নামে মাছের চারা নিয়ে এক কোম্পানির ডকে এসে নোঙর ফেলত। কোম্পানিটির ঝিনুক, মুস্তো এবং গবেষণার জন্য এক বিষাক্ত মাছের কারবারও করত।

গ্রিসদেশীয় পাপাগোস এই কোম্পানির মালিক। জ্যামাইকা থেকে জাহাজে করে যেসব মাল আসত, সারা উপকূল জুড়েই পাপাগোস তা নিয়ে ব্যবসা করত।

ওই জাহাজে যে ভাষায় রেডিও বার্তা ব্যবহৃত হত, খুব সম্ভবত তা ভুডু বা ওইজাতীয় কোনো ভাষা। একজন ভাষা বিশেষজ্ঞকে হাইতি থেকে নিয়ে আসছেন এর পাঠোদ্ধারের জন্য।

বন্ড ফিরে আসে হেডকোয়ার্টারে। ডেঙ্গটার বসে আছে একজন অফিসার রয়াক্সের লোকের সাথে কথা বলছে। লোকটার মুখ চিন্তিত। নাম — বিনসওয়্যাঙ্গার।

— আশা করি, আপনার খিদে কিছুটা মিটেছে। — ডেঙ্গটার বলে।

বন্ড চেয়ারে বসতে বসতে বলে — জোরালো কিছু নয়।

বিনসওয়্যাঙ্গার বলে — আপনাকে একটা তথ্য দিই মি. বন্ড।

— শুনি আপনার খবর কী বলে ?

— নিউইয়র্ক আর হার্লেমেই এক সপ্তাহে একশোর ওপর মোহর এসেছে। আমার মনে হয়, এই টাকাটা যদি কম্যুনিষ্টদের সতিই হয়, তাহলে আমাদের চূপ করে থাকা উচিত নয়। অবশ্য, এই ব্যাপারটা আপনারাই ভালো বুঝবেন, কী করতে হবে ?

ডেক্সটার বলে — কিন্তু চিফ কিছুটা দেখে শুনে তবেই এগোতে চাইছেন। আর ওর বিরুদ্ধে কোনো জোরালো প্রমাণ চাই।

— জোরালো প্রমাণ, সেটা তো করাই যায়। যেমন — বেআইনি পার্কিং, কিংবা কোনো অ্যাকসিডেন্ট, কর ফাঁকি দেওয়া, বা কোনো —

বিনসওয়াল্ডারকে বাধা দিয়ে ডেক্সটার বলে — তাহলে তো কোনো কথাই নেই। এরপরেই লেগে যাবে সাদা কালোতে খুনোখুনি। '৩৫ আর '৪৩ সালের ঘটনাটা মনে আছে নিশ্চই আপনার। শেষপর্যন্ত সৈন্য ডাকতে হবে। এটা প্রেসিডেন্টের কেস। এখন এফ. বি. আই হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তখন আমাদের চিন্তা করতে হবে।

দরজার সামনে লিটার কখন এস ঢুকে দাঁড়িয়ে চূপচাপ কথা শুনছিল।

বিনসওয়াল্ডার বলে — আরে আপনি ? তা আপনার কী মতামত ?

বন্দ শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখে।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে লিটার বলে — এটা ঠিক, বিগকে ধরা অত সহজ নয়। একদা সে যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে ছিল। এবং বর্তমানে তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে সে তার কাজকর্ম করে চলেছে। দেবতার গায়ে আঘাত তাব একনিষ্ঠ ভক্তরা চট করে মেনে নিতে পারবে না।

হঠাৎ বন্দ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে — থ্যাঙ্ক ইউ, মিঃ বিনসওয়াল্ডার ফর ইনফরমেশন। ওরা এখন লিফটে। তিনজনেই চূপচাপ।

লিফট এসে একতলায় থামে। ওরা বেবিয়ে বাইরে পা রাখে।

রাস্তায় হাঁটতে থাকে ওরা তিনজন। মাঝখানে বন্দ।

ডেক্সটার বলে — মি. বন্দ, ওয়াশিংটনের কথামতো আমি হার্লেমের দিকে নজর রাখছি। আপনি ও লিটার আগামীকাল পিটার্সবার্গ রওনা হচ্ছেন। সব সংবাদ সংগ্রহ করবে লিটারই। আর যদি জ্যামাইকায় আপনি যেতে চান তবে —

— আজ বিকেলটা আমি ওই বিগের রাজ্যে একটু হাওয়া খেয়ে আসতে চাই।— বন্দ বলে।

দাঁড়িয়ে পড়ে ডেক্সটার। তারপর বলে — ঠিক আছে। তবে সাবধানে চলবেন। কেননা, ওখানে কোনো ঝামেলা হলে, সেই মুহূর্তে আপনাকে বাঁচাবার কেউ নেই। যতক্ষণ না কোনো জোরালো কিছু পাচ্ছি, ততক্ষণ বিগ আর আপনি — দুজনকেই পাশাপাশি থাকতে হবে।

সামনে এগোতে গিয়েও বন্দ ঘুরে দাঁড়ায়। ডেক্সটারের দিকে তাকিয়ে শাস্তকণ্ঠে বলে — কথাটা খারাপ বলেননি। তবে কি জানেন, আমার প্রোফেসন থেকে কেউ যদি আমাকে সরিয়ে দিতে চায়, তবে আমিই তাকে আগে সরিয়ে দিই।

কথাটা শুনে লিটার মিটিমিটি হাসতে থাকে। ডেক্সটারের কথাটা মনঃপূত হয় না।

ডেক্সটার বলে — এখানে আমার হুকুমমতো চললে আমি খুশি হব মি. বন্দ। যাই হোক, ওয়াশিংটনকে আমি যা যা জানাবার দরকার জানাচ্ছি। আর লিটার —

— লিটার তাকায়।

—তুমি তো ফ্লোরিডাতে আমাদের লোকদের নাম, ঠিকানা এমনকি সাংকেতিক ব্যাপারগুলো তো সবই জান। মি. বন্ডকে তুমি দেখে রেখ।

ডেক্সটার একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে তাতে উঠবার সময় বলল — আশা করি, মি. বন্ড ভালো থাকবেন। তবে ডেক্সটার আপনার পাশে আছে।

ট্যাক্সি চলে যেতেই লিটার বলে — ওর এই বেশি খবরদারি জনা পুলিশ আর আমাদের সঙ্গে প্রায়ই খটাখটি লাগে। কী যে চায় ও, তা—

বন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লিটারের দিকে। লিটারকে থামিয়ে দিয়ে বলে — আচ্ছা লিটার, তুমি বোধহয় ঐ মি. বিগকে একবার হলেও দেখতে চাও। অবশ্য ডেক্সটারকে তো এটা বলা যেত না।

থতমত খেয়ে যায় লিটার।

— হোটেল ফিরবার পথে তোমাকে নামিয়ে দেব। ঠিক সাড়ে ছটায় কিং কোল বারের সামনে আমি তোমাকে আবার দেখব।

একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ওরা উঠে পড়ল। ট্যাক্সির মধ্যে পোড়া সিগারেটের ভ্যাপসা গন্ধ।

হোটেল ফিরে বন্ড ইন্টারকামে জানিয়ে দিল ঠিক ছটার সময় তাকে ডেকে দিতে। এখন পৌনে চারটে। জানলার কাচ দিয়ে দেখল স্ট্রিট লাইটগুলো জ্বলতে শুরু করেছে একে একে। কুড়ি তলার ওপর থেকে নীচের পৃথিবী এখন বাহারি আলোতে সেজে উঠতে শুরু করেছে।

জামাকাপড় খুলে বিছানায় গা এলিয়ে দেয় বন্ড। ঘুম এসে বন্ডকে ঘিরে ধরে। দূব থেকে দেখা যায়, পড়ন্ত সূর্যের আলো রেগিসের সর্বাঙ্গে মিশে গেছে। আর তার মধ্যে রেগিসের ওপরতলাব কোনো কোনো কাচের জানলা ভেদ করে বেরিয়ে আসছে বিদ্যুতের আলো।

ঘড়িতে চারটের ঘন্টা বেজে উঠল। বিকেল চারটে।

বিকেল চারটের সময় হার্লেমে কোনো একুটি জায়গায় একটা বড়ো মাপের লাল বাতি জ্বলে উঠতে দেখে আডমোডা ভাঙতে থাকা একুটি লোক সচকিত হল। লোকটির বাড়ি সেভেস্থ অ্যাভিনিউ আর ১৪২ নং, রাস্তার ক্রসিং-এ। শোনা যায়, এই অঞ্চলে নার্কি যক্ষ্মার প্রকোপ বেশি।

কানে হেডফোন লাগিয়ে নিল লোকটি। একটা জরুরি নির্দেশের অপেক্ষায় সে।

— ইয়েস ইয়েস ... হিয়ার.... ইয়েস ইয়েস...হিয়ার — ফিসফিস করে সংকেতে খবর গ্রহীতা উত্তর দিল।

যে গোপন নির্দেশ সে পেল -- খুব শীগগিরই বন্ড, ডেক্সটার, লিটার আসছে। কোনো শারীরিক অত্যাচার নয়, খুব বেশি বাধা না পেলে। আমাদের কবজায় পুরোপুরি এসে গেলে কোড-এ মেসেজ দেবে। নজর রাখতে হবে ফার্স্ট অ্যাভিনিউ থেকে এইটখ্ অ্যাভিনিউ পর্যন্ত। এমনকি নাইট ক্লাবেও। ওভার।

— ও. কে., ও. কে.।

লাইট বোর্ডের অন্যান্য আলোগুলিও দপদপ করতে লাগল। অর্থ — খবর ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং... ..ঘন্টা বেজে উঠল। অর্থাৎ মেসেজ রুমে আর কোনো কাজ নেই।

ডিং ডং ডিং ডং..... ছটার ঘন্টা বন্ডের ঘরে।

মান করে বন্ড এখন আয়নার সামনে। টাইটাকে বেঁধে নিয়ে রুমালটা কিছুটা বার করে রাখল পকেট থেকে। কাঁধে পিস্তলটা খাপসহ ঝোলাবার আগে পিস্তলটা ভালো করে পরীক্ষা করে, সেফটি ক্যাচ লাগিয়ে নিল।

খাটের তলা থেকে জুতো বার করল সে। যা এফবি. আই.ও জানে না। জুতোর গোড়ালির দিকে চামড়ার নীচে একটা স্টিলের আবরণ ছিল।

কিং কোলে বারের বন্ড রাস্তা দেখা যায়, সেরকম পর্জিশন নিয়েই বসল। হাতে তার জিনের গ্লাস। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাস্তার দিকে।

আরে কে আসছে ও? মুখটা যেন চেনা চেনা লাগছে।

চেনা চেনা লোকটা কাচের দরজা খুলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে এবাব সে বন্ডের সামনে এসে দাঁড়ায়। বাদামি চুল এখন কুচকুচে কালো, মুখের চামড়ার বং-ও কিছুটা পালটে গেছে। নীল সুট, হোয়াইট শার্ট, রঙিন টাই।

জিনে চুমুক দিয়ে বন্ড বলে — ওয়েল ডান। তবে তোমার এই কৃত্রিম রং ধুলেই উঠে যাবে। বাস। মার্টিনব অর্ডার দিয়েছি। তবে এ জিনটা বেশ স্ট্রং। একটু সাবধান হতে হবে আমাদের।

— আপনার কথা আমি ধরতে পেরেছি। তবে আগেকার মতো আর নেই হার্নেম। সঙ্কেবেলায় স্মৃতি করো, মেয়ে নিয়ে মৌজ করো। তারপব না হয় সেরকম বুঝলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাবে। অনেক জায়গা বন্ধ হয়ে গেছে। পুলিশও সেরকম সাহায্য করে না।

বারে ক্রমশ লোক আসতে লাগল। ওরা বেরিয়ে অন্য একটা নাইট ক্লাবে গেল। নিগ্রোদের ভিড় সেখানে। তবে এখানে এক অজানা আশঙ্কা আঘাত করতে পারে।

লিটার বলে — নিগ্রোদের আমি সেরকম অপছন্দ করি না। অর্সন ওয়েলস নিগ্রোদের দিয়ে ম্যাকবেথ অভিনয় কবানোর সময় লাফায়েতে নিগ্রো থিয়েটার নিয়ে আমাকে কিছু লিটারেচর লিখতে হয়েছিল। তার ফলে হার্নেমে আমাকে যথেষ্ট হাঁটহাঁটি করতে হয়েছিল। এই নিগ্রো দুনিয়ার রাজধানী হল হার্নেম। কোনো জাতিব জনসংখ্যা পাঁচ লাখ হলে তার মধ্যে কিছু অ-সামাজিকের গতিবিধি থাকবেই। হ্যাঁ, বিগ ভালো ট্রেনিং পেয়েছে মস্কো আর ও. এস. এস. থেকে।

ওই নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে ওরা বাস-স্টপেজের দিকে হাঁটতে লাগল।

লিটার বলে — আমরা কি বাসে যাব?

বন্ড বলে — সন্ধ্যার পর ট্যাক্সি ওদিকে যেতে চাইবে না।

বন্ড বাস স্টপে দাঁড়িয়ে সেন্ট্রাল পার্ক অঞ্চলের দিকে তাকাল। লোকটা ওই অঞ্চলেরই কোনো একটা বাড়িতে আছে। উত্তেজনায় বন্ডের দুই হাতের মুষ্টি গুটিয়ে এল। এখনও বাত্রির অনেকটা সময় পড়ে আছে।

টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি শুরু হল।

— লিটার! — বন্ড ডাকে।

— বলুন।

— না থাক। তবে আমরা এখন এক দেবতার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। কী হবে জানি না।

ঠান্ডা মাথায় কথাগুলি বলে বন্ড।

॥ পাঁচ ॥

বাস স্টপে তিনজন নিগ্রো। এই রাস্তাটা ফিফথ অ্যাভিনিউ এবং ক্যাথিড্রাল পার্ক ওয়ের ক্রসিং। একটু আগে সামান্য বৃষ্টি হয়ে গেছে। অবশ্য এখনও পুরোপুরি থামেনি।

এই মুহূর্তে একটা বাস এল। একজন বলল — অ্যাই মোটকা, এবার তোর কাজ তুই কর।

মোটা লোকটা বাসে উঠে পড়ল — টুপিটা একটু নামিয়ে যাত্রীদের লক্ষ করতে থাকল। হ্যাঁ, ওই দিকেই দুটো সাদা চামড়া! তাদের পিছনের সিটে গিয়ে বসল সে।

জানালায় একপাশে বন্দ। জানলার কাচ দিয়ে বন্ডের গালের কাটা দাগটা নিগ্রোটার নজরে গেল। পরের স্টেপে বাস থামতেই সে নেমে পড়ল। একটা ওষুধের দোকানের টেলিফোন থেকে সে জানাল — বস, একটা খবর দিচ্ছি। ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউয়ে সেই কাটা গাল ইংরেজটাকে দেখা গেছে। তার সঙ্গে আরেকজন আছে।

বাসের নম্বরটা জানাল সে। ‘আরেকজন’ বলতে বর্ণনানুযায়ী লিটারের চেহারাটাই ফুটে উঠল।

— কোন দিকে যাচ্ছে ওরা?

— উত্তর দিকে।

— ঠিক আছে। যাদের জানাবার জানিয়ে দাও, আর নাইট ক্লাবগুলোকেও সতর্ক করে দাও। নাইটক্লাব, নাম সুগার রে। এটা সেভেস্থ অ্যাভিনিউ এংং ১২৩ নং রাস্তার মোড়ে। বক্সার সুগার রে রবিনসনের নামে রাখা হয়েছে এই নাম।

বন্ড ও লিটার দরজা ঠেলে ঢুকল। ওদের সামান্য মাত্র ধারণা নেই, যে ওদেব ওপর নজরদারি চলছে।

ওরা একটা দেওয়াল ঘেঁসে ছোটো কেবিনে বসল। স্কচ আর সোডার অর্ডার। বেশ ভিড়। দেওয়ালে বক্সার রবিনসনের লড়াইয়ের দৃশ্য।

লিটার বলল — সুগার রে লোকটা নানা ক্লাবে খেলা দেখায়। প্রচুর টাকা জমিয়েছে। সময়মতো রিটারের করে শুধু টাকা রোজগারে মন দিয়েছে।

বন্ড বলল — চাকরিটা আমার ভালো লাগে না ঠিকই। কিন্তু রিটারের করে লাভ কী? ব্যবসা করলে সবই হারাব। যেমন ধর, যদি নাটক প্রযোজনা করি বা কেনটে গিয়ে ফলের বাগান বানাই —

বিল মেটাবার সময় ওয়েটারকে লিটার জিজ্ঞেস করল — আজ মি. বিগ কোথায় আছেন, বলতে পারেন?

লোকটা বলল — আমরা নিরীহ মানুষ স্যার —

বলেই চলে গেল। লিটার বলল — সবারই ভয়ে মুখ বন্ধ।

ওরা এখন সেভেস্থ অ্যাভিনিউয়ে। বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু ঠান্ডা বাতাস, পথঘাট ফাঁকা।

বন্ড বুঝল, কেউ কেউ হয়তো ওদের লক্ষ্য করছে। একটা দোকানে ঢুকে কিছু জিনিস লক্ষ্য করল — মাপের চামড়ার জুতো, এরোপ্লেনের ছাপ মারা শার্ট, স্ট্রাইপ দেওয়া প্যান্ট ইত্যাদি। শিক্ষামূলক এবং কমিকসের বইও আছে। তুচ্ছতাক করবার কবচ, মাদুলিও বিক্রি হচ্ছে।

তার মানে, পশ্চিম সভ্যতার এই রাজধানীতে প্রাচীন কুসংস্কার সর্গোরবে বিরাজ করছে।

লিটার বলল — চল বাড়ি যাই, মি. বিগ সম্বন্ধে আরেকটু ভাবনাচিন্তা দরকার।

মা ফ্রেজিয়ার হোটেলে ওরা খাওয়া সারল। সেখানেও একজন ওয়েটারকে মি. বিগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল লিটার। ওয়েটার উত্তর দিল — না স্যার, এ নামে কাউকে চিনি না।

রাত সাড়ে দশটা। ওরা এবার স্যাভয় বলরুমে এল। লিটার বলল — কিছুক্ষণ নাচগানের মধ্যে সময় কাটানো যাক।

বিরিট রেলিং দিয়ে ঘেরা নৃত্যস্থল। অনেক মেয়ে বেশ সুন্দরী। এটা নাকি জ্যাজের স্বর্গরাজ্য! বন্ডের বেশ ভালোই লাগছিল।

লিটার বলল -- তুমি দেখছি বেশ জমে গেছ। কিন্তু ভুলো না, এবং আমাদের স্মলস প্যারাডাইসে যেতে হবে।

বাইরে এসে লিটার বলল — একটা খবর পাওয়া গেছে। ও আজকে থাকবে বোনইয়ার্ডে। সেটা লেনক্স অ্যাভিনিউয়ে। ওখানে স্ট্রিপ-টিজ্‌ চলছে। একটি মেয়ে আছে, নাম — ডি. জি. সুমাত্রা, চল আমরা একটু পিয়ানো শুনি। তারপর সাড়ে বারোটায় কাজ শুরু করব।

কিন্তু বন্ড বা লিটার কেউই ভালোভাবে জানে না, ওদের ওপর নজরদারি চলছে।
সাড়ে বাবোটায় যখন শেষ খবর এল, তখন কয়েক ব্লক দূরে সুইচ বোর্ডের কাছে কী ঘটছে।
মি বেগ হেড ওয়েটারকে ফোন করলেন --- শোনো, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দুটো সাদা চামড়া
টুকবে। ওদের জন্য 'Z' টেবিলটা দেবে।

'Z' টেবিলে দুজন পুরুষ আর দুটি মেয়ে ছিল। হেড ওয়েটার কড়া সুরেই ওদের অন্য টেবিলে
পাঠিয়ে দিল। ফাঁকা টেবিলের ওপর একটা কার্ড রাখল --- 'রিজার্ভড'।

আবার মি. বিগের ফোন এল --- শোনো জি. জি.-র নাচের পর সব আলো যেন নিভে যায়।
--- ইয়েস স্যার।

॥ ছয় ॥

নির্দিষ্ট জায়গায় এসে গেল ওরা --- বন্ড এবং লিটার।

বোনইয়ার্ড। নীচ থেকেই মিউজিকের জোরালো আওয়াজ আসছে।

হেড ওয়েটার খাতির করে বলল --- আসুন স্যার, একটা টেবিল রিজার্ভ করা ছিল। কিন্তু
পার্টি আসেনি। মনে হয়, আসবে না। আপনারা এইখানেই বসুন।

স্কচ আর হ্যাম স্যান্ডউইচের অর্ডার। বন্ড বলল --- মারিজুয়ানার গন্ধ পাচ্ছ?

এই সময় নাচগান কিন্তু থেমে গেছে। যে যার টেবিলে এসে গেছে। নাচের আসরেও সব
আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্ধকারে লোকগুলোকে দেখাচ্ছে আধা-ভৌতিক। মেয়েগুলির
লিপস্টিকের রং মনে হচ্ছে পোড়া কালো বা মডার মতো সাদা।

অবশ্য টুকরো-টাকরা নাচগানের বিরাম নেই। প্রায় দুশো নিগ্রো হাজির। হাততালি, বেড়াল-
ডাক বা শিশ সমানতালে চলছে। দু একটি মেয়ে আবার ছুটে নাচতে আসছে। চিৎকার উঠছে ---
আবে তাড়াতাড়ি পোশাক খোল। হোটেলের স্টাফেরা আবার ওদের পাকড়াও করে ফেরত
দিচ্ছে।

বন্ড বুঝল --- এইসব নারী মাংসের কাদামাটি নিয়েই মি. বিগের ব্যবসা।

লিটার বলল --- বাইরে যাবার তিনটে রাস্তা আছে।

হঠাৎ ঘোষণা --- এবার আমাদের প্রেজেন্টেশন মি. জাঙ্গল জাপেট অ্যান্ড হিজ ড্রাম।

উল্লাসধ্বনির মধ্যে ড্রামের উচ্চনাদ শুরু এবং শেষ।

পরবর্তী ঘোষণা --- এইবার আসছে আপনাদের হার্ট থ্রব্..... জি. জি. সুমাত্রা।

হাততালির দাপটে কান ফেটে যাবার অবস্থা। প্রথমে টুকল দুটি বিশাল চেহারার নিগ্রো।
তাদের কোমরে শুধু একফালি কাপড়। তাদের কাঁধের ওপর একটি মেয়ে, সে দু হাতে ওদের গলা
জড়িয়ে আছে। পালকে ঢাকা পোশাক, মুখে কালো মুখোশ। মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াতেই পালকের
পোশাক যেন পেখম মেলল। পরনে শুধু তিন কোনা কালো লেসের জাঞ্জিয়া, দুই স্তনবৃন্তের ওপর
জ্বলজ্বলে চুমকি বসানো দুটি তারা। সারা দেহে তৈলাক্ত কিছু মাখা, যার জন্য তার সুন্দর ফিগার
চকচক করছে।

নাচ শুরু। প্রথমে পেটের পেশি, পরে সারা শরীর বাজনার তালে দুলছে, ময়ূর পেখম উড়ছে।
বাজনার তালে তালে সে সারা অঙ্গের সামান্যতম আবরণগুলো টেনে ছুঁড়ে ফেলতে থাকল।
পালকের সাজ উড়ে গেল। ডান ও বাম বুক থেকে সে একে একে চুমকি বসানো তারাগুলো টেনে
খুলে দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দিল। সারা দেহে ঘাম, কোমরের লেসের টুকরোটাও খুলে ফেলা হল।
এবার তার যৌনাস্তব ওপর শুধু জি-স্ট্রিং!

দর্শকদল উন্মত্ত --- খোলো খোলো, ওটাও খুলে ফেল।

ড্রাম উত্তাল। চিৎকার চলছে — আমরা দেখব, আমরা দেখব। ও জি. জি.। কুইক কুইক!

হঠাৎ ঘোষণা হল — হবে শেষটুকুও হবে, কিন্তু অন্ধকারে!

বন্দ বুঝল, এবার একটা কিছু ঘটতে চলেছে। বিপদের গন্ধ! কে যেন বলল — এ্যাই কী হচ্ছে, শীগগির আলো জ্বাল।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দ অনুভব করল, তার দু হাত চেয়ারের সঙ্গে চেপে ধরা। সামনে বসা লিটারের পিছনে এক নিগ্রো তাকে জাপটে ধরে আছে। দুপাশে দু'জন বন্দুক হাতে।

একজন বলল — ঐ ইংরেজটা কোথায়?

বন্ডের বুকের কাছে একজন পিস্তল ধরে আছে। সে বলল — এই তো এটাই, এই তো দাগ রয়েছে।

পিস্তলের নলটা এবার বন্ডের পেটের মধ্যে। বন্ডের পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে একজন বলল — হ্যালো টিহি, এটা বস্কে দিও। আমি ইংরেজটাকে নিয়ে যাচ্ছি।

বলতে বলতে বন্ডকে টেনে দাঁড় করানো হল। সেইমুহূর্তে টেবিলটা পায়ের আঘাতে উলটে দিল বন্দ। একই সময় লিটার লাথি ছুঁড়েছে। বেঁটে লোকটা ছিটকে পড়ল। তবে বিশেষ সুবিধে হল না। বাকি দুই গার্ড খুবই সক্রিয়। বন্দ দেখতে পেল, লিটারের মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে।

একজন বলল — বৃথা ব্যামেলা কোরো না। মি. বিগ অপেক্ষা করছেন, ইংরেজটার জন্য।.. তোমরা পরস্পরকে বিদায় জানাও। দুজনের মধ্যে আর দেখা হবে না।

বন্দ বলল — পুলিশ এখানে দুটোর সময় আসবে।

লিটার হেসে বলল — পুরো দলটাকেই ধরা যাবে। কমিশনার মোনাহেন বাকি কাজটুকু করবেন।

কথা শেষ হওয়ার আগেই নিগ্রোটোর ধাক্কায় একটা সুড়ঙ্গের মতো গলিতে ঢুকে গেল লিটার। টিহি বলল — চূপচাপ আমার পিছু পিছু এস।

॥ সাত ॥

এটা একটা সফ্র গলি, পাথুরে পথ। দু'পাশে বড়ো বড়ো বাস্ক, মনে হচ্ছে মালগুদামের জায়গা। কাছেই একটা ছোটো ফ্রেন দেখা গেল।

সামনের দরজা দিয়ে পিস্তল হাতে আরেক নিগ্রোর আগমন। বেশ সুসজ্জিত পোশাক।

— গুড মর্নিং। জেমস বন্দ। বসুনটিহি তুমি ভেতরে যাও।

বন্ডের হাতের ওপর এখন আর চাপ নেই। কিন্তু অবশ লাগছে। মনে হয় রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

এইবার বুঝতে পারলাম, কার সামনে উপস্থিত — স্বয়ং মি. বিগ। বিরাট মাথা — ফুটবলের মতো। গায়ের রং কালোর মধ্যে কিছুটা বাদামি মেশানো। তীক্ষ্ণ তিরের মতো দৃষ্টি, চোখের মণি দুটো হিংস্র পশুর মতো ঘোলাটে সোনালি। বিশাল চেহারা — সাড়ে ছ ফুট লম্বা, ওজন দু'শো আশি পাউন্ড। পেশিবহুল শরীরে ডিনার জ্যাকেট শার্টে হিরের বোতাম। টেবিলে ইন্টারকাম যার কুড়িটা সুইচ। আরেকটি বিচিত্র জিনিস, একটি ছোটো চাবুক, হাতির দাঁতের তৈরি।

ঘরটিকে কিন্তু মনে হবে, কোনো কোটিপতি শিক্ষিত ব্যক্তির লাইব্রেরি, রাশি রাশি বই, র্যাক জুড়ে সুন্দরভাবে সাজানো, একটু পরেই বন্দ বুঝল — এ বইয়ের শোভা আসলে একটা আড়াল মাত্র। সবই নকল বই। সাদা মঞ্চের ওপর একটা কাঠের ক্রস।

মি. বিগ বলল — টিহি তুই থাক। মায়ামি তুমি যাও।.....মি. বন্দ ইচ্ছে হলে সিগারেট খেতে পারেন।

সিগারেট ধরিয়ে বন্ড লক্ষ করল — টেবিলে এমন যন্ত্র আছে, যেটা পা দিয়ে চালালে, সোজা পাতালে যেতে হবে। এক মুহূর্তের জন্য লিটারের কথা মনে এল। ওর কী দশা কে জানে!

মি. বিগ কথা শুরু করল — যুদ্ধে আপনাদের সার্ভিস ভালোই হয়েছে অবশ্য। তবে আমি বহুদিন সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন দেখিনি। আপনার নামের আগে দুটো শূন্য, তার মানে কর্তৃপক্ষ আপনাকে কাজের প্রয়োজনে খুন করার অধিকার দিয়েছে... যাই হোক, আপনি কাকে খুন করতে এসেছেন? আমাকে কি?

বন্ড চুপ। কোনো সন্দেহ নেই, এগুলো মস্কো জানিয়েছে।

— জবাব দিন মি. বন্ড। আপনি এসেছেন ইংল্যান্ড থেকে। আপনার সঙ্গে আমেরিকার ট্রেজারির এক প্রতিনিধি আছে। সে অবশ্য সি. আই. এ.-র লোক, এখন তার অবস্থা খুবই কাহিল।

এবার মি. বিগ আদেশ দিল — টিহি মি. বন্ডকে চেয়ারটার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধ। না, না, একটুও নড়বেন না মি. বন্ড। তাহলে যেটুকু বাঁচার আশা আছে... টিহি, এবার মিস সলিটেয়ারকে পাঠিয়ে দাও।

নকল বইয়ের আড়াল থেকে একজন অসামান্য সুন্দরীর আগমন। বন্ড মুগ্ধ হয়ে তাকাল।

— মি. বন্ড, এই মেয়েটি একটি বিশ্বয়। আমি ওকে বিয়ে করব ভেবেছি। অবশ্য ওর মনটা এখনও বুঝিনি। হাইতিতে ওর জন্ম, এক ক্যাবারে ক্লাবে ওকে পেয়েছিলাম।

একটু থেমে বিগ অদ্ভুত কথা বলল — আমার পক্ষ থেকে এই মেয়েটি যা করবার করবে। মানে আপনাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আমি জানি, শুধু অত্যাচার করলেই ফল হয় না। এই মেয়েটির অদ্ভুত প্রতিভা আছে। লোকের মনের কথা যেন টেনে বার করতে পারে। সুতরাং মূল্যবান জিনিস। কী বলেন। হাঃ হাঃ—

মেয়েটি শ্বেতকায়। কিন্তু চামড়ায় একটু বিবর্ণভাব। নীল চোখ, উদ্ধত দৃষ্টি, বাবা ছিলেন খুব সম্ভবত ফরাসি। বুকের অর্ধাংশ অনাবৃত। কানে হিরের দুলা। স্বভাবতই বন্ডের দৃষ্টি মেয়েটির বুকের দিকে।

মেয়েটির হাতে সপাং করে চাবুক মারল মি. বিগ — ভদ্রভাবে বোস। তাস রেডি হয়েছে? সলিটেয়ার বলল — হ্যাঁ।

— কীরকম লাগছে লোকটাকে? সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে?

— সত্যি বলছে।

॥ আট ॥

ইন্টারকামের সুইচ টিপে মি. বিগ জিজ্ঞেস করল — লিটার নামে ওই আমেরিকানটার খবর কী?

— ভালোরকম ধোলাই চলছে স্যার।

— আরও ভালো কবে ধোলাই দাও, তারপর বেলভিউ হাসপাতালের সামনে ফেলে রেখে এস।

বন্ড চিৎকার করল — এর ফল তোমরা পাবে। সি. আই. এ. পাই-টু পাই শিক্ষা দেবে।

মি. বিগ হাসল — আপনি সর্বজ্ঞানী নন মি. বন্ড। সি. আই. এ. দেশের মধ্যে বেশি কাজ করে না। সবই বাইরে। তাছাড়া এফ. বি. আই.-এর সঙ্গে ওদের সম্পর্ক ভালো নয়। যাই হোক, টিহি

— ইয়েস স্যার —

— মি. বন্ডের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা ভেঙে দাও।

বন্ডের কপালে ঠান্ডা ঘাম। লোকটা আঙুল মচকাতে শুরু করেছে। হঠাৎ মট করে শব্দ হল। আর্থনাদ করে অজ্ঞান হয়ে গেল বন্ড।

বন্ডের নিজস্ব রিভলবারটা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করল মি. বিগ। বলল — ওকে তুলে ধরো।

আবার চিৎকার করে কিছু অশ্লীল গালাগাল দিল বন্ড।

— কোনো লাভ নেই। বেঁচে আছ, এটাই তোমার ভাগ্য।.... যাই হোক, নেক্সট স্টেপটা শুনে রাখ। না না, তার আগের কথা একটু বলা দরকার। কেন তোমাকে সিমেন্টের ওভারকোট পরিয়ে হার্লেম নদীতে চোবানো হয়নি!.... আসলে আমি বোরিং ফিল করছি। তাই নতুন কায়দা ভাবতে হচ্ছে। আমি শিল্পীর মতো কাজ করতে চাই। আমার কান্ডগুলো যাতে বেনভেনুটো সেলিনির মতো বিখ্যাত হয়। ইতিহাসে লেখা থাকে।.... মিশরের যেসব আর্টিস্টরা পিরামিডের ভিতরে ছবি এঁকেছিল তারা তো জানত, ওই ছবি কেউ দেখতে পাবে না। আমিও ওদের মতো প্রকৃত শিল্পীর মতো আমার কাজের আড়ালে ব্যক্তি মানুষটাকে গোপন রাখতে চাই।

বন্ড চুপচাপ শুনে যাচ্ছে বিগের কথা। সলিটেয়ারের দিকে তাকিয়ে তার মুখের ভাবটা এক পলকের জন্য দেখে নিল।

বিগ বলে চলে — দেখ মি. বন্ড ভালো জাতের শিল্পীরা ভালো যন্ত্র নিয়েই কাজ করে। অনুমান করতে পারছ, তোমাকে মারবার জন্য যে যন্ত্রটা আছে সেটা বেশ ভালো এবং দামি যন্ত্র। যেহেতু আমি অন্য কাজে ব্যস্ত আছি, তাই তোমার ওই লোকজন এলে তাদের সাথে মোকাবিলা করবার মতো সময় আমার নেই। যাকগে, আমি এই মুহূর্তে চাইছি, তুমি লিটারকে নিয়ে এ স্থান যত শীঘ্র সম্ভব ত্যাগ করবে। হ্যাঁ, একটা কথা মনে রেখো, আমাদের পুনর্বীর দেশা মানে তোমার মৃত্যু।

বন্ড বেশ শান্তভাবে বলে — ধরো, যদি দেখা হয়—

-- আমি সময় নষ্ট করতে ভালোবাসি না। টিহি, মি. বন্ডকে নিয়ে লেকেব জলে এমনভাবে ফেলবে যাতে শুধু চোট লাগে।

আদেশ পাওয়ামাত্র টিহি বন্ডের পায়ের বাঁধন খুলে চোট পাওয়া হাতটা ধরে এক হ্যাঁচকায় বন্ডকে টেনে দাঁড় করাল।

বন্ড নিজেই দুর্বল দেখাতে চাইছিল। এবং মনে মনে একটা রাস্তা ভাববারও চেষ্টা করছিল।

টিহি বন্ডকে এক ধাক্কা মেরে বলল -- অ্যাঁই, চল চল। আর এদিক ওদিক দেখে কোনো লাভ নেই। — বলে বইয়ের তাকের কাছে নিয়ে গিয়ে বন্ডের হাতের তলা দিয়ে একটা বইতে চাপ দিতেই একটা দরজা ফাঁক হয়ে গেল। ঘরটা মনে হল যেন সাউন্ড প্রফ। ঘবটা পেরিয়ে আব কিছুটা এগিয়ে যেতেই বন্ড দেখল একটা সরু রাস্তা। থেমেছে গিয়ে নীচের দিকে নেমে যাওয়া একটা সিঁড়ির মুখে।

এক বলক দেখে নিয়ে বন্ড বলল — আমার ভাঙা হাতে বেশি চাপ দিলে আমি বাঁচব না। — বলে বন্ড ইচ্ছে করে হেঁচট খেতেই টিহির সঙ্গে ধাক্কা লাগল তার। এটাই সে চাইছিল। এবং এখন লোকটাকে কীভাবে মারা যেতে পারে। সেটা সে বুঝতে পারল।

চিটাঁই বলল -- হুঁ, এই শক্তি নিয়ে আমাদের সাথে মোকাবিলা করতে এসেছ। ওঠ ওঠ—

দড়াম করে শরীরের মোক্ষম জায়গায় আঘাত ঝাড়ে বন্ড। আচমকা আঘাতে লোকটা ছিটকে পড়ে কাতরাতে লাগল। উঠতে গিয়েও আবার পড়ে গেল সে। দেরি না করে বন্ড নিজের রিভলবারটা চট করে বার করে নিয়ে মাথার পিছনে রিভলবারের বাট দিয়ে আঘাত করল। টিহি

প্রচন্ড যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে দাড়াবার চেষ্টা করতেই বন্ড তার জুতোর তলায় স্টিলের অংশটা দিয়ে সপাটে লাথি চালাল।

শব্দ হতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়বার। একসময় সব চূপ। বন্ড তবুও নিশ্চিত হবাব জন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল।

কপালের ঘাম মুছে নিয়ে ডান হাতে রিভলবারটা ধরে সতর্ক হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল বন্ড। সিঁড়ির যেখানে শুরু তার শেষ ধাপের কাছে হাত পা ছড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে লোকটা। লোকটাকে টপকাতাই রেডিও ট্রান্সমিশনের শব্দ পেল। বুঝল - বিগের মোসেজ অপারেটিং রুম। হামলা করবার বাসনাকে দমন করে সে টিহির পকেট হাতড়ে রিভলবারটা বার করে নিল। ৩৮ বোরের কোম্পট লোডেড। অপারেটিং রুমে লোকগুলির কানে ইয়ার ফোন লাগানো থাকায় ওরা টিহির পতনের শব্দ শুনতে পায়নি। আবার একটা শব্দ কানে আসে বন্ডের।

মনে হচ্ছে, এইবার দরজা খুলে টিহি ঢুকবে। কী করবে ওরা? বাঁ হাতটা তো একদম অক্ষম। ডান হাতেই চেষ্টা করতে হবে। এক হাতেই হাতলটা টানল বন্ড।

গাড়িটা কোথায়? দেখা যাচ্ছে একটা কালো গাড়ি কয়েক ফুট দূরে। একজন নিগ্রো ড্রাইভাব, আরেকজন গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। না, আর কেউ নেই।

বন্ড বাইরে এসেছে। ওরা চমকে ওঠার আগেই বন্ডের গুলি ঐ দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার পেটে ঢুকে গেল। হাত থেকে ছিটকে গেল পিস্তল। ড্রাইভার চিৎকার করতে যাচ্ছিল। সেটাও সম্ভব হল না। বন্ডের দ্বিতীয় গুলি তার হাঁ-মুখে ঢুকে গেল। ড্রাইভারের সিট থেকে তাকে বাইরে ঠেলে ফেলে দিল বন্ড। ইঞ্জিন চালু ছিল। অতি কষ্টে এক হাতেই ড্রাইভার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হল বন্ড।

গাড়িটায় হ্যান্ড ব্রেক দেওয়া আছে। সেটা খুলতে দেরি হবেই। একটা গুলি এসে লাগল গাড়ির গায়ে এক হাতে গাড়িটাকে একপাশে ঘুরিয়ে নিল বন্ড, তাই দ্বিতীয় গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট, কিন্তু জানলার কাচ ভেঙে গেছে।

গাড়ির আয়নায় দেখা গেল, রাস্তাটা নির্জন।

হাতের যন্ত্রণাটা বাড়ছে। ইতিমধ্যে রাস্তার হিটিং পাইপ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সেই ধোঁয়ার মধ্য দিয়েই পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ি ছোটাল সে।

ট্রাফিক আলোয় থামতেই হল। এরপর ভাগ্য ংালো। পরপর অনেকগুলো গ্রিন সিগন্যাল। ফলে শত্রুপক্ষকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে সে। এটা পার্ক অ্যাভিনিউ এবং ১১৬ নং রাস্তার মোড়। পরেরটা ১১৫ নং। ধীরে ধীরে ৬০ নং-এ চলে এল সে, গাড়ি থামাল একটা ফায়ার হাইড্রান্টের পাশে।

গাড়ি থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। একটু পরেই সেন্ট রেগিস হোটেল। গার্ড বলল - আপনার একটা চিঠি আছে।

ফেলিক্সের চিঠি — ‘আমাকে এখনি ফোন কর।’ চিঠিতে দেওয়া সময় ৪ টে।

আঃ, আমরা দুজনেই তাহলে বেঁচে আছি! বন্ড ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল।

॥ নয় ॥

ঘরে ঢুকে এক হাতেই জামাকাপড় ছাড়তে হল। বাঁ হাতটা বেশ ফুলেছে। কড়ে আঙুলটা নাড়া যাচ্ছে না। অগত্যা এক হাতেই ডায়াল করতে হল।

ওপারে লিটারের গলা - যাক বেঁচে আছি তাহলে! কোনো জখম হয়েছে?

— একটা আঙুল। কিন্তু তোমার কী অবস্থা?

— মারধর খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলাম, তবে বিশেষ কিছু করতে পারেনি। পরে নানা কথাবার্তা বলে ওদের ভজালাম। জ্যাজ মিউজিক, আমাদের ব্যান্ড লিডার, এমনকি ডিউক অব ওয়েলিংটন নিয়েও কথাবার্তা হল। বকু নামের লোকটা ভালোই। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললাম। এমনই পটালাম যে, এক সময় ছেড়ে দিল। আমি মুক্তি পেয়েই সামান্য নড়াচড়া করছিলাম। হঠাৎ মাথার পিছনে রডের বাড়ি। জ্ঞান ফিরে দেখি বেলভিউ হাসপাতালে। বকু মাফ চাইল, সে নাকি খুব আন্তে মেরেছিল। ফানি ব্যাপার, কিন্তু ইতিমধ্যে মি. বিগ ওদের জানিয়েছে, একটা ইংরেজ মাতাল ওর ড্রাইভার আর ওয়েটারকে গুলি করে পালিয়েছে, গাড়িটা সমেত।

এবার বন্দ তার কাহিনি শোনাল।

লিটার বলল — তবে তো বলতে হবে, ওই মেয়েটা তোমার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করেনি, যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ওকে আমাদের দলে টানতে পারলে ভালো হয়।

— আরে ওকে পাবে কী করে? বিগ ওকে কড়া নজরে রাখে।

— সে দেখা যাবে। আপাতত বেরোচ্ছি। পরে ফোন করব। পারলে লন্ডনে একবার চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করো।

এবার স্নান সারল বন্দ। বহু কষ্টে শেভ করে ড্রেস করল।

হঠাৎ টেলিফোন — কথা বলল, নিউইয়র্ক কলিং লন্ডন।

বন্দ বলল — ০০৭ বলছি। এখানে নানা সমস্যা।

— কীসের সমস্যা?

— চারদিকে ফু হুচ্ছে। তাই দিনকতক বাইরে গেলে ভালো হয়। আমি ফেলিসিয়াকে নিয়ে কয়েকদিন বাইরে ঘুরে আসি।

— ফেলিসিয়া আবার কে?

— আমার নতুন সেক্রেটারি। যে ওয়াশিংটন থেকে এসেছে।

— রিপোর্ট কই?

— আজকে টাইপ হবে।

— ঠিক আছে, ভালো থেকো। গুড বাই।

মনে মনে কল্পনা করল — এম এখন চিফ অব স্টাফকে ডাকবেন, বলবেন — ০০৭ মি. বিগের তিনটে লোককে খতম করেছে। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নিজেও জখম হয়েছে.... ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার লিটারের ফোন — শোন, তুমি যাদের মেরেছ, পুলিশ তাদের খুঁজছিল। ওরা কুখ্যাত ব্যক্তি — টিহি জনসন, স্যাম মায়ামি আর ম্যাকথিং। আমি এখন যা বলছি লিখে নাও।

বন্দ প্যাড পেনসিল নিয়ে বলল — বলো।

পেনসিলভেনিয়া স্টেশনের ট্রেনের নাম, রিজার্ভ কামরার নম্বর থেকে শুরু করে বিশদ তথ্য জানাল লিটার। বন্দকে বলা হল, শেষে ট্যান্সি নিয়ে সেন্ট পিটসবার্গ থেকে সানসেট বীচে যেতে হবে। সেখানেই লিটারের সঙ্গে তার দেখা হবে। তবে খুব সাবধান। মি. বিগ কড়া নজর রাখছে। সামলে চলবে।

একটু পরে পুলিশ সার্জন এলেন। আঙুল নিয়ে যন্ত্রণাদায়ক পরীক্ষা চলল।

— ওঃ, হাড় ভেঙেছে। কী করে ভাঙল?

— দরজায় ধাক্কা লেগে।

— ওঃ, সাংঘাতিক ব্যাপার। দবজা থেকে দূরে থাকবেন। যদি ঘাড়ে লাগত —

সার্জন জানিয়েছিলেন, আঙুল সারতে দু চারদিন লাগবে।

বন্দ সুটকেস গুছিয়ে ফেলল।

টেলিফোনে একটি মেয়ের গলা -- আমি সলিটেরার।... আমায় বিশ্বাস করতে পার।... তোমাকে আমাকে দুজনকেই পালাতে হবে। দেরি কোর না, তুমি আমায় নিয়ে চল। আমি লোকটার সব খবর তোমায় দেব। কিন্তু দেরি হলে আমার প্রাণসংশয়... তুমি আমায় বিশ্বাস করো।

বন্দ তবুও চুপ করে রইল।

মেয়েটি বলছে — তুমি আমায় না নিয়ে গেলে, আত্মহত্যা ছাড়া উপায় নেই।

কী করবে বন্দ ? এটা যদি মেয়েটির অভিনয় হয়, তাহলে সে পাকা অভিনেত্রী।

বন্দ বলল — শোন, আমি বিশ্বাস করছি। তবে পুরোপুরি নয়। আমায় ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য... যাকগে, লিখে নাও—

পিটসবার্গে যাবার ট্রেনের নাম, সময় ইত্যাদি জানিয়ে বন্দ বলল — কামরার নং — এইচ ২৪৫। তোমার নাম বোল মিসেস ব্রাইস। সোজা কামরায় গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কোর।

ঘড়িতে এখন সাড়ে সাতটা। ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল বন্দ। মাথার ওপর মৃত্যুদণ্ড, তাই শেষবারের মতো ভালো ভালো খাবার খাওয়া যাক — আনারসের রস, কর্নফ্লেক অ্যান্ড ক্রিম, ডিমভাজা আর বেকন, এসপ্রোসা কফি, টোস্ট, মারমালাড।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের ছবি দেখার চেষ্টা করল বন্দ।

ওদিকে হার্লোমে সুইচ বোর্ডে বসে মি. বিগ আদেশ দিচ্ছে — ইয়েস ইয়েস। হাইওয়েতে একটা চান্স নাও। তাছাড়া সব স্টেশন আর এয়ারপোর্টে —

॥ দশ ॥

ফিফটি ফিফথ স্ট্রিট। এখানকার ড্রাগ স্টোরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেল বন্দ। সবাই জানে না, এই দোকান এবং হোটেলের মধ্যে একটা প্যাসেজ আছে। ফলে বন্ডের বেরিয়ে যাওয়াটা শত্রুপক্ষের নজরে এল না।

পেনসিলভেনিয়া স্টেশন। বন্দ ট্যাক্সি থেকে নামতেই এক নিগ্রো ছুটল ফোন করতে। সে বেতের ঝড়ির ফেরিওয়ালা সেজে খোরাফেরা করছিল।

১০-১৫। তার মানে ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট পনেরো বাকি। ১৪নং গেট পেরিয়ে গেল বন্দ। বিরাট ঝকঝকে ট্রেন। লাল-হলুদ-সবুজ-ডোরা। খুব বেশি যাত্রী নেই। তবে নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বান্টিমোর এবং ওয়াশিংটন থেকে বহু যাত্রী উঠবে।

পোর্টার জিজ্ঞেস করল— আপনি কি মি. ব্রাইস ?

বন্দ বলল-- ও ইয়েস।

মিসেস ব্রাইস এই মাত্র এসেছেন।

হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে কম্পার্টমেন্ট এইচ -এ ঢুকতেই ভয়ার্ত স্বর—কে ?

তারপরে উৎসাহী নারী কণ্ঠ—ওঃ তুমি! যাক বাবা, বাঁচলাম।

বন্দ জিজ্ঞেস করল -- কোন সিটে বসবে তুমি ?

তুমি যা বলবে।

ইতিমধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ক্রমশ গতি বাড়ছে। সুদীর্ঘ পথ।

মেয়েটি টুপি খুলতেই তার চুল কাঁধ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়ল। তারপরই হঠাৎ বন্ডের হাত টেনে নিয়ে চুমু দিল মেয়েটি।

তোমায় অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমায় বিশ্বাস করেছ, অনেক ঝুঁকি নিয়েছ।

আশা করি ঠিকই করেছি। — বলে বন্দ ভাবল। — এখনও এই রহস্যময়ী নারীকে সে চেনে না।

এরপর কিছু হালকা কথাবার্তা। তারপরেই মেয়েটি বলল — মি.বিগের ধারণা, তুমি ফ্লোরিডা যাচ্ছ। কয়েকটা স্টেশন আর এয়ারপোর্টে নজর রাখছে তোমায় ধরবার জন্য। তার আগেই কোনো ছোট্টো সাধারণ স্টেশনে আমাদের নেমে পড়তে হবে। ..আচ্ছা ওরা কি তোমায় ট্রেনে উঠতে দেখেছে?

— বোধহয় না। কিন্তু তোমাকে?

- আমার ব্যাপারটা ওদের সন্দেহের মধ্যে নেই। ওদের লোক আমাকে গানের টিচারের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। দুপুরে আবার নিতে আসবে। আর তখনই বুঝবে —

বন্দ লক্ষ করল, মেয়েটির হাতে ডায়মন্ড আব প্ল্যাটিনামের ঘড়ি। সে হঠাৎ বলে বসল — জানতাম, কোনো একদিন হঠাৎ আমার মুক্তির সুযোগ আসবে। তুমিই আমায় সে সুযোগ দিয়েছ।

ট্রেন ছুটছে খোলা মাঠের ওপর দিয়ে। এটা নিউইয়র্ক এবং নিউআর্কের মধ্যবর্তী জায়গা।

বন্দ বলল— তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, কাল রাতে। ওরা তোমাকে দিয়ে আমাকে তুকতাক করতে পাঠিয়েছিল। তাই না?

— হ্যাঁ, ওরা আমাকে ডাইনি বলেই ভাবত। কিন্তু তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম, আমার মুক্তির সময় এসেছে।

রাত বাড়ছে। পোর্টার এল, সঙ্গে কন্ডাক্টর। কন্ডাক্টর আর একটি টিকিটের দাম চাইল। অর্থাৎ, মিস্টার এবং মিসেস ব্রাইসের মধ্যে একজনের টিকিট বয়োগে। আবেকজনের নেই।

টিকিটের দাম মিটিয়ে দেওয়া হল। সলিটের টয়লেটে গেল। হেসে বলল — একটু ভদ্র হয়ে আসি।

বন্দ ভাবল, কেমন সময় কাটবে এই মেয়েটির সাথে।

বন্ধুত্ব হতে দেরি হল না। মি. বিগ বলেছিল, এই মেয়ে নাকি পুরুষদের কাছে ঘেঁষতেই দেয় না। কথাটা সত্যি নয়। মেয়েটির মন ভালোবাসার জন্য উন্মুক্ত। সলিটের নামটাও বেশ মিস্তি। তবে সব মিলে মেয়েটার পরিচয় রহস্যের মধ্যে। সে নাকি ছিল বিশাল ধনী কন্যা। এখনো তাব অটুট সৌন্দর্য! নাইট ক্লাবের মেয়ে, অথচ মগ্ন জানা ডাইনি! এরকম হল কেন?

টয়লেটের দরজা খুলে সলিটের সোজাসুজি তাব নির্দিষ্ট জায়গায় এসে বসে পড়ল।

— আমি জানি, তুমি আমার কথাই ভাবছিলে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। লঙ্জার ব্যাপাবও নয়। আমার পরিচয় পরে বলব। কারণ, অতীতটা আমি ভুলতে চাই। এবাব আমার আসল নামটা বলছি সিমোন লট্বেল। আমার বয়স ২৫। খুব খিদে পেয়েছে, ঘুম পাচ্ছে। তোমার বিছানা কোনটা?

বন্দ বলল নীচের বাথটা হল আমার পক্ষে নিবাপদ।

- ঠিক আছে। তাছাড়া তোমার হাত ভাঙা। ওপরে ওঠা মুশকিল।

এরপরে বন্ডের ইশারায় সলিটের পাশের কামরায় গেল। বন্ডের সামনে এখন শুধু ট্রেনের নিগ্রো পোর্টার। সে বলল — মি ব্রাইস, আপনি বিপদে পড়তে পারেন। এই ট্রেনেই আপনার শত্রুপক্ষ লুকিয়ে আছে। আমিও বিপদে আছি। আর বেশি কিছু বলতে পারব না। তবে আমার গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের দায়িত্ব আমার হাতে। নিন, এগুলি রাখুন।

বন্দ ওর কাছ থেকে কতগুলো কাঠের গোঁজা হাতে নিল। যাবার সময় লোকটা বলল — আমার যথাসাধ্য কবব স্যার। কিন্তু ওবা সবকিছু লক্ষ করছে।

পাশের কামরায় সলিটের বই পড়ছে।

- স্লিপ টাইট -- বলে বন্ড নিজের কামরায় এল। দরজার নীচে গৌজাগুলো লাগাল।

॥ এগারো ॥

এখন সূর্যকরোজ্জ্বল দুপুর। বাতে ওয়াশিংটনে ট্রেন অনেকক্ষণ থেমেছিল। এখন ভার্জিনিয়া' পৌঁছেছে। হালকা বাতাসে বোঝা যাচ্ছে -- বসন্ত এসে গেছে।

এর আগে বাতে অ্যালামের্ভ শব্দে ঘুম ভেঙেছিল! ট্রেন তখন র্যালিতে। বন্ড পোর্টারকে জিজ্ঞেস করেছিল -- জ্যাকসনভিল পৌঁছোতে কটা বাজবে?

-- সাড়ে পাঁচটা স্যার।

এর মধ্যে পথে কোনো টানেল পড়বে?

-- ইয়েস স্যার। টানেলের সামনেই গাড়ি দাঁড়াবে।

পোর্টারের হাতে একটা দশ ডলারের নোট দিয়ে বন্ড বলল -- একটা কাজ কবতে হবে। ওই টানেলের কাছে দাঁড়াবার সময় ঝটপট দবজা খুলে সিঁড়িটা নামিয়ে দিও।

-- ঠিক আছে স্যার।

এরপর সলিটেরের সঙ্গে কিছু কথা হয়। সে বলে -- জানতাম। ওরা অবশ্যই তোমার স্টেশনে ঢুকতে দেখেছিল। কোন গুপ্তচর ট্রেনে উঠেছে কে জানে? বোধহয় কোনো নিগ্রো।

বাইরে অন্ধকার সুড়ঙ্গ। উজ্জ্বল আগো! ফেলে হাই স্পিডে এগোচ্ছে ট্রেন। সলিটের ভাবছে -- বন্ডকে সে কীভাবে বোঝাবে? - হঠাৎ সেই মাদুলিটার কথা মনে পড়ল। ছোটবেলায় নিগ্রো নার্স ওকে এটা দিয়ে বলেছিল -- সব বিষ কেটে যাবে। এক বৃদ্ধ ওকে বিশ্বাস তরল পদার্থ খাইয়েছিল। ওটা নাকি ভুড়ু তান্ত্রিকদের পানীয় -- এটা তৈরি হয়েছে রাম, বারুদ, কবরের মাটি আর মানুষের বন্ড দিয়ে। ভাবতেই বমি পেল তার।

বন্ড বলল -- ভুড়ুদের সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু জানি, এমনকি ওদের ভাষাও। ওদের কিছু কিছু কথার গুরুত্ব নিশ্চই আছে। তবে আমাব ভয় নেই। আমাকে কেউ হিপনোটাইজ করতে পারে না।

-- তাহলে তোমাকে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মি. বিগকে বলা যায় ব্যারন সেমার্ডির চলমান লাশ। চলন্ত মৃতদেহকে বলা হয় জোমবি। এরা ঐশ্বের সাহায্যে নানা অমঙ্গল ঘটায়। নিগ্রোরা বিশ্বাস করে মি. বিগ এক জোমবি।

-- কিন্তু, মস্কো কী চাইছে? বিগ কি স্মার্সদের এজেন্ট?

-- স্মার্স সম্বন্ধে আমি জানি না। তবে বিগ রাশিয়ার হয়ে কাজ করে। ও নিজে রাশিয়ান ভাষা জানে। আমাব সঙ্গে মাত্র এক বছরের পরিচয়। তাছাড়া বিগ খুব এক্সপার্ট। অপছন্দের লোককে ও সহজেই খুন করতে পারে।

-- ওকে কেউ খুন করে না কেন?

-- ও কি করে খুন হবে? ও তো এমনিতেই মৃত, জোমবি!

-- খুব ভালো। তুমি একবার এই কাজটা চেষ্টা করে দেখনা।

-- যে সময় কোনো উপায় থাকবে না তখন হয়তো চেষ্টা করতে পারি। আমিও হাইতির মেয়ে... তুমি অবশ্য বোকা ভেবেছ।

বন্ড বলল -- না, তা নয়। তবে আমি বুলেটের মধ্যে ক্রশ চিহ্ন দিতে পারি। তাতে ও সব তন্ত্র-মন্ত্র কেটে যাবে।

বন্ডের হাত ধরে মেয়েটি বলে — এখন আমি কী করব?

-- কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। জ্যাকসনভিল এলে আমরা পালাব।

ট্রেনের স্পিড আরও বেড়েছে। বন্ড এবার দু হাতে গলা জড়িয়ে ধরল মেয়েটির। দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন। ভাঙা হাতের জন্য ভালোভাবে আদর করতে পারছিল না বন্ড। তবু ডান হাত দিয়েই সলিটেরের সারা অঙ্গে আদর ছড়িয়ে গেল। স্তনে, স্তনবৃন্তে, পিঠে, শিরদাঁড়ার নীচে। আবার দীর্ঘ চুম্বন।

— একজন প্রকৃত পুরুষকে এইভাবে চুমু খাওয়ার ইচ্ছে আমার বহুদিনের। প্রথম সাক্ষাতেই বুঝেছিলাম, তুমিই সেই পুরুষ।

— ভাঙা হাতটা আমাকে ঠিকমতো ভালোবাসতে দিচ্ছে না।

ফ্রমাল দিয়ে বন্ডের ঠোঁট থেকে লিপস্টিকের দাগ মুছে দিল মেয়েটি। এবার আলতো ক্ষণস্থায়ী চুম্বন।

বন্ড বলল — আমরা ভবিষ্যতে আরও ঘনিষ্ঠ হব। এখন রাত বাড়ছে, সময় নেই! তুমি শুয়ে পড়ো।

পাশের ঘরে গিয়ে পোশাক ছাড়ল সলিটের। সারা গায়ে দামি সেন্ট স্প্রে করল। গায়ে সাদা চাদর, তার নীচে বোধহয় আর কোনো পোশাক নেই।

গুড নাইট জানাতে এসেছিল বন্ড। আবার চুম্বন। আবার কিছুক্ষণ মেতে ওঠা।

সলিটের বলল — এবার ঘুমোও, নিজের ঘরে যাও।

রাত এগারোটা। ট্রেন এখন ছুটছে কলম্বিয়া এবং জর্জিয়ার প্রান্তদেশ ধরে। জ্যাকসনভিল পৌঁছোতে ঘন্টা দুই দেরি আছে। বন্ডের মনে পড়ল মি. বিগ তার লোকদের কী নির্দেশ দিয়েছে — মাঝরাতে যখন সব যাত্রী ঘুমিয়ে থাকবে, তখন যেন তারা কাজটা সেরে ফেলে।

সামান্য তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ ক্যাচ ক্যাচ! মনে হয় কেউ দরজা খুলতে চাইছে। রিভলবার হাতে উঠে পড়ল বন্ড। হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে দরজা খুলেই দেখতে পেল, একজন ছুটে যাচ্ছে। এক হাত ভাঙা। আরেক হাতে দরজা ধরা। তাই গুলি করা গেল না।

বিছানায় ফিরে এসে আলো জ্বালল। দরজার নীচে এক টুকরো কাগজ। তাতে পদ্য ছন্দে লেখা রয়েছে :

আমাকে বার বার ডাইনি বলে

এত অত্যাচার কোর না।

এই শরীরটার মধ্যে আমি নেই

কান পেতে ঢাকের আওয়াজ শোন —

ভোর রাতে তিনি জাগবেন, তোমাকে ডাকবেন

মনে রেখ, ভোরের আগেই, ভোরের আগেই, ভোরের আগেই।

ও ডাইনি তুমিই খোকা খুকুদের মারবে।

তুমিই তাদের মৃত্যু।

কান পেতে ঢাকের আওয়াজ শোন, তিনি জাগবেন

ভোরের আগেই, ভোরের আগেই, ভোরের আগেই।

আমি জানি, তুমি সবই বুঝতে পারবে।

কাগজটা ভাঁজ করে মানিব্যাগে রাখল বন্ড। নানা উদ্ভট চিন্তা মাথায় কিলবিল করছে। কখন ভোর হবে? জ্যাকসনভিল কতদূর?

কাক-ভোর। প্রায় পাঁচটা বাজে। জ্যাকসনভিল।

ট্রেন থেকে বেরিয়ে এল ওবা। প্যাটফর্মের অন্ধকারে একটা দুটো আলো টিমটিম করে জ্বলছে। ট্রেনে সবাই ঘুমন্ত। মনে হয় না, কেউ টের পেয়েছে। পোর্টার তার কাজ ঠিকমতো পালন করেছে, ভালো বকশিস পেয়েছে।

এখানে পরের ট্রেন আসবে বেলা ন'টায়, ট্রেনের নাম সিলভার মিটিওর।

বন্ড দুটো সিট বুক করে সলিটেয়ারের হাত ধরে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল। বাজে রেস্টুরেন্ট। ছোটো ছোটো খুপরি। নোংবা মেনু কার্ড।

বন্ড অর্ডার দিল — অরেঞ্জ জুস, কফি, ডিম।

আমেরিকার লোকেরা নাকি সেক্ষেত্রে ডিম খেতে জানে না। ঠিকমতো খোঁসা ছাড়াতে পারে না।

সলিটেয়ার বলল — আমেরিকায় কিন্তু টাকা রোজগান খুব সহজ। সেক্ষেত্রে ফ্লোরিডাও ভালো জায়গা।

বন্ড জিজ্ঞেস করল — কোথায় যাচ্ছি আমরা?

— ধরে নাও, পিটসবার্গে সবাই মৃত। মনে কর, ওটা আমেরিকার কবরস্থান। এখানে বেশিরভাগ বুড়োরা বিশ্রাম করতে আসে।

-- এই জায়গাটা মি. বিগের ফেবারিট কেন?

— এখানে একমাত্র তাসেব জোচ্চুরি ছাড়া অন্য কোনো চুরি জোচ্চুরি নেই। পুলিশেরও বলাই নেই বলা যায়। তবে রবার নামে একটা লোক আছে, কিউবার খবর পাঠায়। অবশ্য পিটসবার্গ খারাপ জায়গা ছিল না। কিন্তু তুমি এ জায়গাটা দেখে রাখ। বুড়ো বয়সে শান্তিতে কাটাবে।

— আশা করি, রবারের সঙ্গে গুলির লড়াই করতে হবে না আমাদের। তাহলে বহু বুড়ো হার্টফেল করবে।... কিন্তু তুমি কী চাইছ বল তো?

মুদুস্বরে সলিটেয়ার বলল -- জেমস এস আমরা এখানে শান্ত জীবন কাটাতে কাটাতে ক্রমশ বুড়ো হয়ে যাই।

বন্ড স্তম্ভিত! বলল — অবশ্য এখন কিছুদিন আমি তোমার সঙ্গে উদ্দাম অভদ্র জীবন কাটাতে তাতে আমি অভ্যস্ত। এখানে সবাই ন'টার মধ্যে ঘুমাতে পড়ে।

অত্যন্ত খারাপ ব্রেকফাস্ট। ওবা যখন বাইরে এল, তখন সূর্য উঠেছে। মি. বিগ সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য জেনে নিল বন্ড। হার্লেমে এক বছর প্রায় বন্দীজীবন কাটিয়েছিল সলিটেয়ার। দুটো দৈত্য মার্কা নিগ্রো মেয়ে ওকে পাহারা দিত। মাঝে মাঝে বিগের ঘরে বিপজ্জনক লোকদের সঙ্গে মিটিং এ ওকে ডাকা হত। সকলেই নিগ্রো, এক্সপার্ট খুনি। বলা মুশকিল, সারা দেশে মি. বিগের অধীনে কত লোক কাজ করে।

ছোটো ট্রেনটা এসে গেল। সিলভার মিটিওর। ফ্লোরিডার বনভূমির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এই ট্রেন। মাইলের পর মাইল লেবুর বাগান — কিছু নীরস, আবার কিছু সতেজ, সরস। শুকনো ঝোপে বাদুড়, বিচ্ছে, ব্যাং থাকতে পারে।

ঠিক জায়গায় ওবা ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। সামনে মেক্সিকো উপসাগর। এখানে ফ্লোরিডা সুন্দর — তালগাছের বাগান, ছোটো ছোটো হোটেল। কারাভান রাখার জায়গা। ওরা নেমেছিল পিটসবার্গের আগের স্টেশনে। নাম — ক্লিয়ার ওয়াটার। তারপর ট্যান্সিতে ট্রেজার অ্যািল্যান্ড যেতে আধঘন্টা লাগবে।

গ্রীষ্মের দুপুর। পার্ক স্ট্রিট আর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে নামল ওরা। দেখতে পেল — দূরের একটা টাঙ্কির ড্রাইভার নিগ্রো, মুখে বসন্তের দাগ। ওকে দেখে চমকে উঠল সলিটের। দৌড়ে ড্রাগ স্টোরে ঢুকে পিটিসবার্গে ডায়াল করল — রবার? শোন, আমি পল্লি বলছি। মি. বিগ শহরে এসেছে। না না, নিউইয়র্কে সে থাকতেই পারে না। ওর সঙ্গিনী মেয়েটাকেও দেখলাম। টাঙ্কিতে ট্রেজার অ্যাইল্যান্ডের দিকে যাচ্ছে। ওদের ফলো করতে বলছ? খবরটা নাও।

রবার নিউইয়র্কে বিগের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করল। বন্ডের ওপর নজর রাখা হয়েছে। কিন্তু সলিটের কথা থেকে উড়ে এল! মি. বিগ কিছু নির্দেশ দিল। কাজগুলো করতে পারলে দশ হাজার পাউন্ড পাওয়া যাবে।

এই জায়গাটার নাম এভারগ্রেডস। অপূর্ব! দিগন্তব্যাপী সমুদ্র, যেন ছুঁয়ে ফেলেছে আকাশকে। টাঙ্কি থেকে নামল ওরা। এখানে অফিস ঘরে ওদের রিসিভ করল এক মহিলা, গুকনো চেহারা, নাম — মিসেস স্টুভেসান্ট।

-- ইয়েস?

-- মি. লিটার এখানে আছেন?

-- ও ইয়েস! আপনি কি মি. ব্রাইস? এক নম্বর কটেজটা আপনার জন্য বুক করা আছে। মি. লিটার আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। ইনি?

-- মিসেস ব্রাইস।

-- রেজিস্টারে পুরো নাম ঠিকানা লিখে সই করুন।

লিটারের বসন্ত দেখা হতেই বলল — আমার স্ত্রীকে আগে দেখনি, তাই না?

লিটার সব বুঝেও বলল — না, মানে, এই প্রথম.... কেমন আছেন?

বন্ডকে হতভম্ব করে দিয়ে লিটার তার হাত ধরে এক টানে পাশের একটা ঘরে ঢুকে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পারল বন্ড। লিটারের দিকে তাকিয়ে সে মিটিমিটি হাসছে।

কয়েক মিনিট পর সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল বন্ড ও লিটার। লিটার সলিটেরকে বলল — আসুন।

স্টুভেসান্ট হেসে বলে — আপনাদের ছুটি আনন্দে কাটুক।

ওদের বুক করা ঘরে গিয়ে ঢুকে সলিটের সূটকেসটা রাখল। বন্ড ঘরের জানলা খুলে দিল। কুশন লাগানো বাঁশের চেয়ার। ড্রামের কায়দায় কাচ দেওয়া টেবিল। ঘরের নীল রঙের দেওয়ালে বাঁশের ফুলদানিতে ফুল শোভা পাচ্ছে। ঘরের অন্য দরজাটা খুললে রাস্তা চলে গেছে সমুদ্রের দিকে।

চেয়ারে বসে বন্ড সিগারেট ধরতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

লিটার সলিটেরকে দেখছিল এতক্ষণ। টেলিফোনের শব্দ শুনেই রিসিভার ওঠায় — লিটার ইজ হিয়ার। হ্যাঁ, এসে গেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ। নো নো... আপনি দয়া করে হোমিসাইড আর নিউইয়র্ককে ইনফরমেশন দিয়ে দিন মি. লিউটেনেন্ট। পরে আরও জানাচ্ছি। অরল্যান্ডো ৯০০০, ধন্যবাদ।

ফোন রেখে লিটার বলে — মিসেসের সাথে আলাপ জমানো যেতে পারে।

বন্ড চোঁচিয়ে বলে — সিওর, সিওর। সী ইজ উইথ আজ্।

-- শোনো — লিটার বলে — জ্যাকসনভিল ছাড়বার কিছুক্ষণ বাদেই ওয়ালডো আর ওকালার মাঝামাঝি জায়গায় ট্রেন থামিয়ে তোমাদের কামরা লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়, গুলি চালানো হয়। হই হই কাভ। যদিও সবাই অক্ষত আছে। অরল্যান্ডো পুলিশ তদন্ত করছে। মি.

অ্যান্ড মিসেস ব্রাইস নিখোঁজ। আমবা তো ভেবেছিলাম তোমরা বন্দি হয়েছ। সিট দুটো নাকি এফ বি আই-এর নামে রিজার্ভ। আর ওয়াশিংটনের ঐ কর্তব্যাক্তিরা যখন মুখ খারাপ করে চলেছেন তখন বন্দ অক্ষত দেহে এক লাসাময়ী নারীসহ প্রবেশ।

ওরা তিনজনেই হেসে উঠল।

লিটার বন্ডের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বলে — যাক, এবার তোমার সমাচাব আউড়ে যাও দেখি।

সেন্ট রেগিস থেকে ট্রেন, ট্রেন থেকে এই এখন পর্যন্ত সব ঘটনা সব শুনে গেল লিটার।

বন্ডের হাত থেকে ট্রেনে পাওয়া কাগজটা নিয়ে বলল — উঁ, বিগ তোমার মৃতদেহের ওপর এই কাগজটা গেথে দিতে চেয়েছিল। বেশ ভালো বুদ্ধি।

কাগজটা দেখে সলিটের কিস্টটা বিস্মিত হয়। বলে — এটা ওয়াধা — ঢাকের ডাইনি হাগাবার মন্ত্র। আফ্রিকার অশান্ত উপজাতিরা কাউকে মেরে ফেলবার আগে এই কাগজটা তার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

সলিটের বলে — যদি ট্রেনেই দেখতাম, তবে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

— তুমি বরাত্জোর বেঁচে গেছ — লিটার বলে। সে বলে — ট্রেন থেকে নামবার সময় কেউ দেখেনি তো তোমাদের?

— মনে হয় না। তবে সলিটেরকে ওর নিরাপত্তার জন্য জ্যামাইকাতে পাঠিয়ে দিতে হবে। সব বন্দোবস্ত কিন্তু তোমার লিটার -

লিটার বলে — নো প্রবলেম। ট্যামপা থেকে এয়ারে মায়ামি। তারপর সেখান থেকে প্যান অ্যাম কিংবা কে. এল. এম-এ একদম গন্তব্যস্থল। আজ আর সেটা সম্ভব নয়।

বন্দ সলিটেরকে বলে — তুমি কী বল?

— তোমরা যা ভালো বুঝবে। আমাব কোনো আপত্তি নেই।

॥ তেরো ॥

বন্ডের কেন যেন মনে হল সলিটের ঠিক খুশি নয় এই সিদ্ধান্তে। সলিটের উঠে দাঁড়াতেই সে বলে — কী হল? কোথায় যাচ্ছ?

— একটু হাতমুখ ধুয়ে আসি।

লিটার বলল — আপনি জেমসের ঘরটা ব্যবহার করুন; আরেকটা ঘর আমরা দুজন শেয়ার করব।

এরপর কিছুক্ষণ ড্রিংকস পর্ব। লিটার শুনতে চাইল ট্রেন থেকে ওদের পালাবার কাহিনি।

যা ঘটেছে আনুপূর্বিক বর্ণনা দিল বন্দ — ওকালার রেল লাইন, জলা জঙ্গল, স্টেট হাইওয়ে। ট্রেনের গতি কমালো ড্রাইভার। দুজন বন্দুকধারী জানলায় গুলি করেছিল। মারা পড়ল বেচারী বন্ডউইন, সেই পোর্টার। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বন্দ জানালো, শত্রুপক্ষের কাজ খুব নিখুঁত। অনেক কষ্টে তিন তিনবার ওদের হাত থেকে বেঁচেছে সে। কিন্তু অবস্থা ক্রমশই খারাপ হচ্ছে।

ফেলিক্স লিটারও কিছুখবর দিল। বিশেষ করে রবার নামে বিগের সেই অনুচর সম্বন্ধে। ওকে ধরা দরকার।

ওরা এবার বাইরে এল। অন-দ্য-স্পট দেখা দরকার। শত্রুপক্ষের জাহাজ এখন হাভানায়। তবে বিগের ভাড়াটে গুন্ডারা শিগগির পিছু নেবে।

সলিটের যেন কিছুটা ভয় পেয়েছে। বলে — আমি এখানে থাকতে চাইছি না। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

— এক ঘন্টার মধ্যে ফিরছি। — বন্দ বলল — তোমাকে ভোরের প্লেনে তুলে দেব।

— আমার মনে হয় বিপদ আসছে।

যাই হোক, ওকে ঘরে রেখেই বেরিয়ে গেল বন্দ আর লিটার। বন্দ অবশ্য চিন্তিত নয়, কিন্তু লিটার ভাবল, এত ভয় পেল কেন সলিটের।

পুরোনো মডেলের গাড়ি। এখন ওরা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে। পোর্টের দিকে বড়ো বড়ো হোটেল। সেখানে অবশ্য বুড়োবুড়িদের ভিড়। বুড়ো বয়সের জীবনে যেটুকু গল্পগুজব হাসি ঠাট্টা সম্ভব তাই চলছে। ছেলে মেয়ে আর নাতি নাতনিদের চিঠি পড়তে পড়তে মাতামাতি হচ্ছে। ছেলেমানুষের মতো খুশি ওরা এই বৃদ্ধ বয়সে।

বন্দ বলল — ওঃ, কী ভয়ংকর দৃশ্য!

লিটার একটা হাসির গল্প শোনাল: এক ব্যাংকের কেরানি দুপুরে বাড়ি ফিরে দেখে, ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট সেই কেরানির স্ত্রীকে নিয়ে এক বিছানায় শুয়ে আছে। কেরানি নিঃশব্দে তাড়াতাড়ি তার অফিসে ফিরে আসে। ডিপার্টমেন্টের সহকর্মীদের বলে — ওরে বাবা! খুব বেঁচে গেছি। আরেকটু হলেই মালিক আমায় ধরে ফেলছিল।

বন্দ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল — এখানে জলপুলিশের স্টেশন। একটা গাড়ির ওয়ার্কশপ, পুরোনো গাড়ি পাওয়া যায়।

ওরা এবার হাঁটছে। সামনে লোহা লকড়ের গুদাম। তাছাড়া অন্য দোকানও আছে। এরা জ্যান্ত পোকা ও মাছের চারের ব্যবসায়ী। প্রবাল ও ঝিনুক এবং নানারকম মাছ বিক্রি হয়। দরজায় লেখা ‘প্রবেশ নিষেধ’।

একজন চেয়ারে বসে বন্দুক সাফ করছে। রেমিংটন ৩০। বন্দ বুঝল, লোকটা বন্দুকের দিকে তাকালেও ওদের গতিবিধি ফলো করছে।

লিটার বলল — ঐ লোকটাই রবার অথবা তার কোনো আত্মীয়।

ওরা লোকটার কাছে গেল।

লিটার বলল -- এই যে ভাই, তুমি কি এই জেটিঘাটার ম্যানেজার?

— হ্যাঁ।

— আমার নৌকোটা নোঙর করা যাবে?

— না।

কুড়ি ডলার দেওয়াতেও রাজি নয় লোকটা। সে রাইফেল নিয়ে ব্যস্ত। ওদের পাস্তা দিল না।

বন্দ জিজ্ঞেস করল — এটা নিয়ে কী করছ?

— প্র্যাকটিস করছি। — বলতে বলতে বন্দুকে একটা বুলেট ভরল ঐ লোকটা।

বোঝা গেল এই লোকটাই রবার। উঠে দাঁড়িয়ে বলল — এটা প্রাইভেট এলাকা। আন্ডারস্ট্যান্ড। গেট আউট।

একটু আগেই জেটির দিকে গুলি ছুঁড়ে একটা পেলিকানকে মেরেছে লোকটা। বলল — যদি এখানে ঘুরঘুর কর, তোমাদের ওই পেলিকানের দশা হবে। আর শোন, তোমাদের কাছে যে যন্ত্র আছে। সেটা কিন্তু আমি জানি। বার করবার একদম চেষ্টা কোর না। — বলে লোকটা চলে যায়।

লোকটার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে বন্দ। তারপর বলে — লোকটা মনে হচ্ছে, গুদামঘরের দিকে গেল। আমার মনে হয়, গুদামঘরের দরজা একটা হতে পারে না।

— তাহলে কি আমবা এখন সামনের দিকে এগোব ?

— অন্তত এখন নয়। পরবর্তী ঘটনা বলবে। কী করতে হবে। চল যাওয়া যাক।

গাড়িতে উঠে ও বা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়েব পথ ধরল।

যেতে যেতে লিটার বলল — আমাব মনে হয় মিসেস ব্রাইসের ঘর নিয়ে কোনো অভিযোগ থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, আমার কান কিন্তু ভীষণ পাতলা। দেওয়াল ভেদ করে শব্দ কানে আসে।

বন্ড একটা ঘুসি লিটারের দিকে তুলে নিজেই হেসে ওঠে। সেই হাসিতে লিটারও যোগ দেয়। এভারগ্লোডে এসে ওরা গাড়ি থেকে নেমে দেখে মিসেস স্টুভেসান্ট বেশ বিষণ্ণবদনে দাঁড়িয়ে। লিটার বলে — কী ব্যাপাব মিসেস স্টুভেসান্ট ? এনিথিং রং ?

মিসেস স্টুভেসান্ট বলে — আমাব এই হাউসে লাউডলি মিউজিক চালানোতে অসুবিধে আছে। অন্য গেস্টদের অসুবিধে হতে পারে।

বন্ড বলে — আপনি সব খুলে বলবেন ?

— যে বিশাল রেডিও সেটটা আনিযেছেন, ঘরে ঢোকাবার জন্য বাধ্য হয়ে লোকটাকে প্যাকিং ভাঙতে হয়েছিল।

লিটার বন্ডের দিকে তাকিয়ে বলে — স্ট্রেঞ্জ!

বন্ডের ব্যাপারটা বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরি হল না।

॥ চোদ্দো ॥

ঘরের মধ্যে লিটার আর বন্ড মুখোমুখি বসে। বন্ড ভীষণ গম্ভীর।

লিটার বলে — ঘবেব জিনিসপত্র তো সব ঠিকঠাকই আছে। ঐ মেয়েটিকে তো —

বন্ড বলে — বিগের লোকজন এসে তুলে নিয়ে গেছে। যে বিশাল কনসোল রেডিওটা ওরা নিয়ে এসেছিল, সেই প্যাকিং বাকসের মধ্যেই ওকে ঢুকিয়ে নিয়ে গেছে। আমার সামান্য ভুলের জন্যই—

অস্থিরভাবে বন্ড ঘরে পায়চারি করতে থাকে।

বন্ড এবার লিটারকে বলে — লিটার, কুইক। হেড কোয়ার্টারে ফোন করে বল যে—

লিটার এফ. বি আই-এর ট্যামপা হেড বে'য়ার্টারে ফোন করে বলে, এয়ারপোর্ট, হাইওয়ে, স্টেশন সর্বত্র কড়া নজর রাখতে। সে আবণ্ড জানায় যে, ওয়াশিংটনের সাথেও সে যোগাযোগ রাখছে। .. ও কে., ও. কে.।...হ্যাঁ হ্যাঁ, বন্ড এখানেই আছে।...

লিটার বন্ডকে জানায় -- এফ. বি. আই লোক পাঠাচ্ছে। আর হ্যাঁ, তুমি ওই মিসেস স্টুভেসান্টকে বল যে, এটা নিছকই একটা পরিকল্পিত ডাকাতি। পুলিশ এনকোয়ারিতে আসছে। তার ঘাবড়াবার কিছু নেই। কী ভাবছ ?

ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বন্ড তখন ভাবছে, এই মেয়েটিকে বিশ্বাস করে সে খুব একটা ভুল করেনি। বলতে গেলে বিগ ওকে জোর করেই তুলে নিয়ে গেছে। বন্ড চট করে উঠে গিয়ে সলিটেরের জিনিসপত্রগুলো দেখতে থাকে। সেন্টের গন্ধ এখনও পাওয়া যাচ্ছে। আরে, ওটা কি খাটের তলায়! একটা ব্যাগের হ্যান্ডেল। ব্যাগটা তুলে নিয়ে খুব সাবধানে খুলল। কয়েকটা মেয়েলি জিনিস। ব্যাগের একপাশটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলতেই পাঁচ হাজার ডলার বেরিয়ে এল। টাকাটা নিজের পকেটস্থ করে ব্যাগটাকে ঠিক করে আবার যথাস্থানে রেখে দিল।

অফিসে গিয়ে বন্ডের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সারতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। যখন ডাইনিং টেবিলে বসে ড্রিংক কবছিল বন্ড আর লিটার, তখন বেশ সন্দেহের দৃষ্টিতে সবাই ওদের দিকে তাকাচ্ছিল।

বন্ডের কানে একটা কথা ভেসে এল — মেয়েটা কি লোকটার বউ ছিল সত্যিই?

অন্য আরেকজন বলল — চুপ, ওরা সরকারি লোক।

মিসেস স্টুভেসান্ট এসে একবার ঘুরে গেল। ওর তাকানোটা পছন্দ হল না বন্ডের। অর্থাৎ, ওদের জন্য স্টুভেসান্ট তার এই লজ নিয়ে বেশ অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে। ডাইনিং রুমের ভিড় ক্রমশ হালকা হতে লাগল।

বন্ডের গম্ভীরতাকে কাটাবার চেষ্টা করছিল লিটার। লিটার বলে — চল আমরা একবাব সেই বুড়োবুড়িদের আসরে যাই।

কোনো উত্তর না দিয়ে বন্ড মদ্যপান কবে যাচ্ছিল। লিটার আর কোনো কথা বলেনি।

কিছুক্ষণ মেস্সিকো উপসাগরের বীচে কাটিয়ে কটেজে ফিরে এল।

বিছানায় বসে বন্ড যেন মেয়েটার শরীরের স্পর্শ অনুভব করছিল। আজ রাতে মেয়েটাকে নিয়ে সে—

হঠাৎ মনে পড়ে যায় তার জেটিঘাটার বন্দুক হাতে লোকটার কথা। সে যদি রবাব হয়, তাহলে সলিটেরকে গুম করবার ব্যাপারে তার ভূমিকাও একেবাবে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। বন্ডের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। না, সারাদিন যা গেছে... বরং, এখন ঘুমিয়ে পড়া যাক।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন ঠিক আটটা। বাথরুমে গিয়ে শাওয়ার খুলে বেশ ভালোভাবে স্নান করে নিল সে। বেরিয়ে এসে লিটারকে ডাকল। কিন্তু কোনো উত্তর নেই। টাওয়ার জড়ানো অবস্থাতেই পাশের ঘরে গিয়ে দেখতে পেল না। তবে কি অত্যধিক মদ্যপান করে ড্রয়িং রুমেই ঘুমিয়ে পড়েছে?

না, এখানেও নেই। তবে গেল কোথায়? আবার ঘরে ফিরে এল বন্ড।

আরে, ওটা কী! একটা চিঠি মনে হচ্ছে। চিঠিটা তুলে নিল সে। লিটারের চিঠি :

‘ঠিকমতো ঘুম হয়নি রাতে। যখন ঘড়িতে পাঁচটা বেরিয়ে পড়লাম। মাছের চারার দোকানে যাচ্ছি। ওই বন্দুক হাতে লোকটা বেশ রহস্যজনক। দশটার মধ্যে না ফিরলে পুলিশে খবর দিও। ট্যাম্পা-৮৮।

— লিটার।’

দশ মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি ধবল বন্ড। কিন্তু ট্যাক্সিতে ওঠার পূর্বমুহূর্তে ঘরে ফোন বাজায় দৌড়ে এসে রিসিভার তুলল। ওপার থেকে একজন বলছে — আমি ডা. রবার্টস। মাউন্ট পার্ক হসপিটাল থেকে বলছি। এখানে এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে লিটার নামে একজনকে আনা হয়েছে। তিনি মি. ব্রাইসকে চাইছেন।

— সে কি, কী হয়েছে ওর!

— ছোটো একটা অ্যাকসিডেন্ট, একটা গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়েছে।

— আমি এখন আসছি।

মাউন্ট পার্ক হসপিটাল। ট্যাক্সি থেকে ওপরে ছুটল বন্ড। ওর প্রশ্নের উত্তরে রিসেপশন ডেস্কের নার্স বলল — না, এখানে ডা. রবার্টস বলে কেউ নেই। তাছাড়া লিটার নামে কাউকে আনা হয়নি। আপনার নাম?

— ব্রাইস, জন ব্রাইস।

নার্সটি এমারজেঙ্গী ওয়ার্ডে ফোন শেষ করে বন্ডকে বলল সারি, আপনি ভুল কবেছেন। আপনি যে দুটো নাম করলেন, সেই নামে একজনও এখানে নেই।

নিজের উত্তেজনা সংযত কবছে। বন্ড। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আবার ট্যাঙ্ক ধরে এভারপ্লড ছুটল। এবার সন্দেহ হচ্ছে, শত্রুপক্ষ লিটারকে ধরেছে এবং বন্ডকে কটেজ থেকে সরাতে চেয়েছে।

বন্ডের হোটেলের মালিকিন মিসেস স্টুভেসান্ট দৌড়ে এসে বলল —

আপনার বন্ধু গুরুতর আহত। আপনি চলে যাবার পরই একটা অ্যান্থলেস ওকে নিয়ে এল। সমস্ত মুখ ব্যাভেজে বাঁধা। সঙ্গে একজন ভালো চেহারার নিগ্রো ভদ্রলোক ছিলেন। আমরা ডাক্তারকে খবর দিয়েছি।

লিটারের ঘরে গিয়ে ওর মুখে ওপর থেকে চাদরটা সরাল বন্ড। শুধু মুখ নয়, সারা দেহ ব্যাভেজে মোড়া, রক্তে ভেজা।

হঠাৎ নজর গেল, ব্যাভেজের ওপব দিয়েই মুখের ফাঁকে একটা কাগজ ঢোকানো হয়েছে। কাগজটায় লেখা আছে : ‘কেউ একজন ওকে খেতে চাইছিল। সেইজন্য এই অবস্থা।’

পুনশ্চ : আরো রসিকতার কি দবকার আছে?’

খুবই গুরুতর আহত লিটার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বন্ধুকে দেখাও যাচ্ছে না ব্যাভেজে ঢাকা অবস্থায়। শুধু হলুদ চুল গোছা দেখা যাচ্ছে। ও কি বাঁচবে? ওব শরীরের কতটুকু রয়েছে?

পুলিশ সার্জেন এল। সঙ্গে দুজন ডিটেকটিভ। যতটুকু জানা আছে ঘটনাটা ওদের বলল বন্ড। সার্জেন লিটারকে দেখতে থাকল। ওরা অন্য ঘবে চলে গেল।

একটু পরেই সার্জেন ওদেব ঘরে এল।

— গুরুতর অবস্থা। বাঁ পায়ের আধখানা নেই। মুখে অবস্থা ভয়াবহ। মনে হবে, কোনো জন্তু ঠুকরে ঠুকবে খেয়েছে। হাসপাতালে যেতে হবে।

— বন্ড বলল — ও কি বাঁচবে না?

— ফিফটি ফিফটি চাম্প।

সবাই মর্মান্ত, নানা জায়গা থেকে ফোন আসছে, বিশেষ করে পুলিশের কাছ থেকে। তাদের বলা হচ্ছে, ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে।

ওদিকে ববারের গুদামঘব সার্চ করেছে পুলিশ। বড়ো বড়ো ট্যাঙ্কে শুধু মাছ, মাছের চারা আব বিন্যুক। ববার সমেত আরও দুজনকে ধবা হয়েছে। অনেক জেরা করেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়েব করা যাচ্ছে না। উলটে ববার তার নিজের উকিল দেবে বলেছে।

একজন ডিটেকটিভেব নাম ক্যাপ্টেন ব্রাক্স। তিনি টেলিফোনে বললেন — ওয়াশিংটনের অর্ডার অপরাধীদের ধবতেই হবে। তাই পুলিশেব সাহাযা লাগবে। আমি আসছি।

অ্যান্থলেস, সার্জেন আর লিটারেব দেহ নিশে চলে গেল। এখনও বোধহয় মৃতদেহ বলা যায় না। কিন্তু কতক্ষণ প্রাণ থাকবে কে জানে!

সি আই. এ. ব ফোন এল। লিটারেব সেকশন থেকে একজন ভদ্রভাবে বলল যে, বন্ড যাতে জ্যামাইকা চলে যায়, সেই অনুরোধ করা হচ্ছে। লন্ডন রাজি আছে। সময়টা জানতে চাইছে।

বন্ড জানাল, পরেব দিন ট্রান্স কারিবিয়ন প্লেন ধববে সে। সি. আই. এ. জানাল, হার্লেমেব সেই ভদ্রলোক আজ রাতেই তার বাসবীক নিয়ে হাভানা যাচ্ছে। জায়গাটার নাম ভেরো বিচ। ওবা চাটাব প্লেন ধববে।

চিন্তিত বন্ড। হঠাৎ কী মনে করে মাযার্মতে একটা অ্যাকোরিয়ামের দোকানে ফোন কবল।

— আচ্ছা আপনাদের ওখানে কি জ্যান্ত শার্ক কেনা যেতে পারে? বেশ, আর আরোবরোস পোকা এবং চারের দোকান কোথায় পাব? আচ্ছা, ওরা বড়ো হাঙর রাখে? বেশ ঠিক আছে। আমার জানা রইল।

ফোন রেখে রিভলবার সাফ করতে বসল বন্ড।

॥ পনেরো ॥

লিটার তার গাড়িটা বন্ডকে দিয়েছিল। সঙ্গে ছ'টায় সেটা চালিয়ে কিছু কেনাকাটা করল বন্ড। আজ রাতেই জানি। রবারের জাহাজঘাটার কাছাকাছি গেল।

গাড়ি থেকে নেমে যতটা সম্ভব নিজেকে আড়াল করে হাঁটতে থাকল বন্ড। এমনিতে নির্জন, কিন্তু চাঁদের আলো স্পষ্ট। একটানা ডেউয়ের শব্দ। পাঁচিলের আড়ালে একশো গজ দূরে অরোবরোসের গুদামঘর। পাঁচিল টপকে গুদাম ঘরের দিকে এগোল বন্ড। একটা শব্দ কানে আসছে। খুব সম্ভব পাম্পের শব্দ। মাছগুলোকে ঠান্ডা থেকে বাঁচাবার জন্য গরম হাওয়া দরকার।

বাড়িটার বিশাল ছাদ, প্রায় আধ একর। নীচে একটা দরজা, কিন্তু তালাবন্ধ। এদিক ওদিক নানারকম তার। মানে ঘন্টা বেজে উঠতে পারে। জুতো খুলে টায়ারের দু'পাশে ইট সাজালো বন্ড। সেই ইটের ওপর পা দিয়ে উঠে পড়ল। ভাগ্যক্রমে একটা কাচ কাটার যন্ত্র পেয়ে গেল। তাই দিয়ে কাচ কাটা শুরু হল। দেখা যাচ্ছে, লম্বা লম্বা ট্রে, চওড়া তাকে ঝিনুকের পাহাড়। চৌবাচ্চার জলে বুদবুদ। হাজার হাজার মাছ খেলা করছে।

পনেরো মিনিট কেটে গেল। মাথার ওপর একটা ফ্রেম। পাম্পের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখনও। এই জায়গায় রঙিন মাছের চৌবাচ্চা। নামের লেবেলগুলো পড়তে থাকল সে — সোর্ড টেল, গান্ধি, টেরা, নিয়ন, প্যারাডাইস ফিস, গোল্ড ফিস ইত্যাদি। কিছু কিছু বিষাক্ত মাছও আছে। ওই বিষাক্ত মাছগুলিই বন্ডের দরকার। অনেকগুলো চৌবাচ্চা, একেকটায় একটা করে মাছ। লেবেলে লেখা আছে — 'ডেনজার ডোন্ট কাম ক্লোজ।' মোট একশোটা চৌবাচ্চায় সবই বিষাক্ত মাছ। কতগুলোর শিরদাঁড়ায় এমন বিষ থাকে, যেগুলো র্যাটল সাপের বিষের মতো।

অনেক ভেবে একটি মাছের মাথায় ছুরি বসিয়ে দিল বন্ড। মাছটা ল্যাজ আছড়াচ্ছে। একহাতে ওটাকে তুলে ধরে মেঝেতে সজোরে আছাড় মারল বন্ড। মাথাটা খেঁতলে গেল বটে, কিন্তু লেজটা ছটফট করতে থাকল। এইবার এই খালি চৌবাচ্চার জলে হাত ঢুকিয়ে বালি আর কাদা কিছুটা খুঁড়ে দেখল বন্ড। হ্যাঁ, তার সন্দেহ সঠিক। কাদার নীচে গাদা গাদা মোহর। একটা মোহর রগড়ে ধুয়ে দেখল পাঁচ শিলিং সাইজ। খাঁটি সোনা, স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের মুখ। আন্দাজ করা যায়, একেকটা চৌবাচ্চায় অন্তত এক হাজার মোহর আছে। তার মানে, দশ থেকে কুড়ি হাজার ডলার পাহারা দিচ্ছে বিষাক্ত মাছের দল। যদি একশোটা ট্যাক্স ধরা হয়, তবে সবসময়ে এখানে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ ডলারের সোনা থাকতে পারে।

মি. বিগের নিখুঁত ব্যবস্থার প্রতি আবার শ্রদ্ধা জাগল বন্ডের। আহত বিষাক্ত মাছটাকে আবার সেই চৌবাচ্চায় ফেলে দিল। শত্রুপক্ষকে কিছু জানতে দেওয়া উচিত হবে না।

ঠিক এইসময় পিছন থেকে শোনা গেল — হ্যান্ডস আপ। ডোন্ট মুভ।

কুড়ি গজ দূরে রাইফেল হাতে রবার। পরমুহূর্তেই সে গুলি চালাল। বন্ড ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই চৌবাচ্চার মাঝখানের গলিতে। লক্ষ্য ভ্রষ্ট গুলি এসে লাগল একটা বিষাক্ত মাছের ট্যাঙ্কে। সেখান থেকে ঝরঝর করে জল বেরোতে থাকল।

চৌবাচ্চার দেওয়ালের আড়ালে আড়ালে দৌড়োচ্ছে বন্ড। আবার গুলি চালাল রবার। এটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট। একটা অ্যাঞ্জেল মাছের ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেল। কিন্তু রবার মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরত্বে।

চৌবাচ্চাগুলোর দেওয়ালে বন্ডের পুরো শবীব ঢাকা পড়বে না। এদিকে পরপর গুলি চালাচ্ছে রবার — একঝাঁক শামুক গুঁড়ো হয়ে গেল, একটা গুলি মেঝেতে বিঁধল, প্রায় একশো বিনুক ফেটে শেল ফিসগুলো ছড়িয়ে গেল।

এবার নিজের পিস্তল থেকে গুলি চালান বন্ড। রবার লাফ দিয়ে লুকোতে চাইল বটে, কিন্তু একটা চৌবাচ্চা তার মাথার ওপর ধসে পড়ল। ঝনঝন — কাচ ভাঙার শব্দ। এবার রবারের পায়ের দিকে দুটো গুলি ছুঁড়ল বন্ড। একটা চৌবাচ্চা ফুটো হল। আরেকটা লোহার গেটে লাগল।

আবার গুলিবৃষ্টি করছে রবার। ছুটোছুটি কবে কতক্ষণ বাঁচবে বন্ড! সে বুঝল — চরম বিপদ আসন্ন।

এদিকে সারা জায়গাটা এখন চুরমাঝ। মাছগুলো মেঝের ওপর খাবি খাচ্ছে। ফাটা শামুক ছড়িয়ে পড়েছে। বন্ডের চোখে পড়ল — এক জায়গায় কিছু বাস্তু জমা করা আছে। ওপরে উঠে গেল বন্ড।

রবার চিৎকার করল — অ্যাই ইংরেজ ডেভিল, শিগগির বেরিয়ে আয়। না হলে এবার বোমা ছুঁড়ব।

বন্ড চোঁচিয়ে বলল — আমার হাঁটু ভেঙে গেছে। আমি ধরা দিচ্ছি।

— আমি গুলি চালাচ্ছি না। পিস্তল ফেলে দাও তোমার। এস, কয়েকটা কথা বলি।

পিস্তল ছুঁড়ে দিল বন্ড। রবার বলল — হাত দুটো আরো ওপরে তোল।

— পারছি না। পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে। একটু বসার দরকার।

রবার বলল — না, দাঁড়িয়ে থাক।

হঠাৎ মোহরগুলো মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল বন্ড। ঝনঝন শব্দে রবার অন্যমনস্ক। এবার ডান পায়ের জুতোয় ইস্পাতের ডগা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে লাথি চালান বন্ড। রবারের হাত থেকে রাইফেল ছিটকে গেল বটে, কিন্তু ট্রিগার টেপায় একটা গুলি ছাদ ফুটো করে বেরিয়ে গেল। বন্ড এক লাফে ওব পেটের ওপর এসে পড়ল। সেই মুহূর্তে বাঁ হাতটা নরম কী যেন একটা স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে অসাড় হয়ে গেল হাতটা। কিন্তু বন্ডকে লড়াই চালাতে হবে। স্টিলের জুতো দিয়ে বেশ কয়েক লাথি চালান বন্ড, পরপর, এবার রবার ধরাশায়ী।

কয়েক মুহূর্ত পরে বন্ডের যন্ত্রণা আর অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে অন্ধকার গর্ত দিয়ে পালাতে চাইছিল রবার। বন্ড দেখল হঠাৎ বিস্ফারিত চোখ রবারের সারা মুখে মৃত্যুভয় সুস্পষ্ট। ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দ। ধরা যেতে পারে, এই গুহার জল সমুদ্রের দিকে গেছে।

রবার চিৎকার করল — বাঁচাও, বাঁচাও। তুমি যা চাও সব দেব।

খুব সম্ভব শার্কার আক্রমণের মুখোমুখি রবার।

বন্ড বলল — আগে আমার কথার উত্তর দাও। সলিটেয়ারের কী হয়েছে?

— ভালো আছে। মি. বিগ দুটো লোক দিয়ে ওকে ওয়েসিসের পিছনে পুল রুমে আটকে রেখেছে।

— কোথায়? লোক দুটোর নাম কী?

— ট্যামপানে। লোক দুটোর নাম গুচ আর লাইফার। এবার আমাকে জল থেকে তোল।

— দাঁড়াও। আগে বল লিটারের ওরকম অবস্থা কী জন্য?

— আমার দোষ নেই। ও গুদাম সার্চ করতে এসেছিল। তারপব ফাঁদের গর্ত দিয়ে পড়ে গেল। আমরা ওকে টেনে তুললাম! তারপর অবশ্য যাকগে, ও কিছু না.. ও বেঁচে যাবে।

বন্ড বুঝল, লিটারের অর্ধেক দেহটা টাইগার শার্ক বা কোনো সামুদ্রিক প্রাণী খেয়ে ফেলেছে। আর ওই লিখিত চিরকুটটা ওরাই লিটারের মুখে দিয়েছিল গুঁজে।

এবার ফ্রোথাক্ক বন্ড পরপর দুটো লাখি কয়াল। গভীর জলে ছিটকে পড়ল রবার। সঙ্গে সঙ্গে জল তোলপাড়। টাইগার শার্কের আগমন। রবারের আর্তনাদ। শার্কের আহারের ভয়াল শব্দ। ধারালো দাঁত দিয়ে কিছু চিবোচ্ছে সে। গর্তের ওপরের তক্তাটার খিল এঁটে দিল বন্ড।

আসল কাজ এখনও হয়নি। যারা রবারের দেহখণ্ড আবিষ্কার করবে, তারা মি. বিগকে রিপোর্ট পাঠাবে — গুলি বিনিময়ে কয়েক হাজার ডলারের ক্ষতি হয়েছে। যা ভাঙচুর হয়েছে সেগুলো সারাই করতে হবে। হ্যাঁ, বুলেটগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে, এটা কমান্ডার বন্ডের কাজ।

যাকগে, অন্য লাভ না হলেও সলিটের আর লিটারের ব্যাপারে খানিকটা প্রতিশোধ তো নেওয়া গেল।

॥ ষোলো ॥

বন্ডের হাত এখন গাড়ির স্টিয়ারিং-এ। বন্ড ফোর্থ স্টিট ধরে ট্যামপার দিকে। রাস্তার দু ধারে নানা দোকানের পসরা সাজানো। বিনুক, খেলনার দোকানও আছে।

রাত দুটো।

খেলনার দোকানের ছেলেটা বেশ আড্ডাবাজ। কিন্তু ওর সঙ্গে গল্প করবার মতো অবস্থা এখন বন্ডের নেই। একটা মোটোলে ঢুকল সে।

এখানে কিউবা রেডিওতে 'রামবা' বাজছিল। এক মাঝবয়সি হোটেল চালায়। বন্ড জানাল — সারাটোগা থেকে সিলভার স্প্রিং আসতে ওর গাড়ির টায়ার ফেটে গেছে। অতএব, রাতের মতো আশ্রয় চাই।

এটা অবশ্য ডাবল বেডরুম, কিন্তু বেশ পরিষ্কার। স্নান সেরে বিছানায় শুয়ে পড়ল বন্ড। বহুদিন বাদে একটা রাত হয়তো আরামে ঘুমোতে পারবে।

ভাগ্য ভালো — সুদীর্ঘ নিদ্রা। প্রায় দুপুরে ঘুম ভাঙল বন্ডের। এখন ওর ডরুরি কাজ হল, মোহরের উৎস সন্ধান, গোটা দলটাকে ধরা এবং পারলে মি. বিগকে খতম করা।

এয়ারপোর্টে এল বন্ড। কয়েক মিনিট বাদেই প্লেন ছাড়বে। রেনকোট পরা একটা লোক দোকানের সামনে ঘোরাফেরা করছে। এদের হাবভাব বন্ডের চেনা। এফ. বি. আই.-এর লোক। ওরা খবর নিতে এসেছে, বন্ড সত্যিই প্লেন ধরল কিনা।

ফোন করে পিটসবার্গের হাসপাতালে খোঁজ নিল বন্ড — লিটার কেমন আছে। জানল, এখনো জ্ঞান ফেরেনি।

ট্যামাপা উপসাগরের ওপর চক্কর মেরে পূর্বদিকে উড়ল প্লেন।

বিকাল পাঁচটা--সূর্য অস্ত্রাচলে। পাশ দিয়ে একটা জেট প্লেন উড়ে গেল। বন্ডের প্লেনে বেশ কিছু বুড়োবুড়ি। ওরাও উপসাগরে বিশ্রাম নিতে চলেছে।

প্লেন এবার ফ্লোরিডার আকাশে। নীচে জলাভঙ্গল। লোকালয় নেই। অন্ধকার হয়ে আসছে। এরপর মায়ামি। সেখানকার রাস্তা চলে গেছে পাম বীচ ডেটোনা পেরিয়ে তিনশো মাইল দূবে - জ্যাকসনভিল।

ইস, কত তাড়াতাড়ি দিনগুলো কেটে গেল। প্লেন নাসোতে থামল। তারপর কিউবা যাত্রা করবে। মি. বিগ আটকে রেখেছে মেয়োটাকে। সে কি প্লেনের শব্দ শুনে বুঝবে, জেমস বন্ড উড়ে আসছে তাকে উদ্ধার করতে?

কিউবা পেরোবার একটু পরে হঠাৎ আকাশব্যাপী ঝড়। প্লেন তখন পনেরো হাজার ফুট ওপরে। ঝড়ের দাপটে কাচের বাসন ভাঙছে। জানলার কাছে যেন তিরের মতো আঘাত করছে বৃষ্টির জল। টলমল করছে প্লেন।

চেয়ারের হাতলটা মিস করে বেজায় চোট পেলে বন্দ। তবে এখন যা বিপদ - চক্কিশ জন যাত্রীর সম্মুখে পতন ও মৃত্যু হবে কিনা - - সেই পরিপ্রেক্ষিতে হাতের চোটকে পাশা দিল না বন্দ। প্রকৃতির খেলায়, ধার্মিকেরা সবসময় বলেছেন - কখনো বিশ্বাস হারাবে না। রবারের সঙ্গে সংঘর্ষতেও তো তুমি মৃত্যুর সামনে পড়েছিলে। ঝড় কেটে যাবে।

জ্যামাইকা এয়ারপোর্টে থামল প্লেন। সাধারণ নিয়মকানুন চুকিয়ে এয়ারপোর্টেব বাইরে এল বন্দ। মিলিটারি পিকআপ ভ্যান ওকে তুলে নিল। এখানকার সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের নাম স্ট্রেঞ্জওয়েজ। সেই বন্দকে রিসিভ করেছিল।

ভানে যেতে যেতে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল ওদের। তারই জের টেনে বাংলা-ঘরে ওরা হুইস্টী সোডা নিয়ে বসল।

স্ট্রেঞ্জওয়েজ জানাল --- এই দ্বীপে নার্কি গুপ্তধন আছে। অবশ্য এটা সাধারণ লোকের ধারণা। ব্লাডি মরগ্যান নামে একটা ঐতিহাসিক চরিত্র এই গুপ্তধনের গুজবটাকে উস্কে দিয়েছে। যে সারপ্রাইজ দ্বীপে গুপ্তধন আছে সেটা ছোটো, শার্ক উপসাগরের মাঝখানে। জ্যামাইকা রোড সেখানে কিংসটন থেকে ওই শেষ বন্দর পর্যন্ত গেছে। একসময় কুখ্যাত জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি ছিল এই শার্ক উপসাগর। গভর্নর থাকতেন পোর্ট রয়ালে। সূত্রাং দূরত্বটা যথেষ্ট বেশি। ঠিক সময়েই ওরা জ্যামাইকা থেকে পালাতে পারত। গভর্নরও ছিল উদাসীন, কারণ রাজার কোনো আগ্রহ ছিল না। বরং তিনি চাইতেন, এদের ভয়ে ক্যারিবিয়ান সাগর থেকে স্প্যানিশরা যেন পালায়। মরগ্যান একবার জ্যামাইকার গভর্নর পর্যন্ত হয়েছিল এবং এই শার্ক বে ছিল তার প্রধান আস্তানা। এখানে তার তিনটে বাড়ি। সেগুলোর ধংসস্থল থেকে এখনও মাঝে মাঝে মোহর পাওয়া যায়।

তবে দুশো বছর ধরে জলে বহু ডুবুরি নামিয়ে আর অনেকবার মাটি খুঁড়েও গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু ছ'মাস আগে মাত্র দু সপ্তাহের মধ্যে পরপর দুটো চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে। এক, শার্ক বে গ্রাম থেকে একটি যুবক জেলে উধাও হয়ে যায়। দুই, নিউইয়র্কের এক অজানা সিভিকিট এক হাজার পাউন্ড দিয়ে দ্বীপটি কিনে নেয়। এরপরেই 'সিকিটর' নামে একটি পালওয়ালা জাহাজ এখানে নোঙর করে। মাঝিমাঝারা সবাই নিগ্রো। তারা কুঁড়েঘর বানিয়ে নেয়। খাদ্য এবং মদ নিজেরাই নিয়ে এসেছিল। এখান থেকে তার নিত শুধু ফল আব জল।

এরপর শুরু হল পাথর ফাটানো। তারপর মাছ রাখার জন্য চৌবাচ্চা খোঁড়া হল।

দিনের বেলা ওই দ্বীপে যাওয়া অসম্ভব। যারা রাতে চেষ্টা করেছিল, তাদের ভাগ্যে মারাত্মক ফল দেখা দিয়েছিল। তাই নিশি অভিবানও বন্ধ হয়ে যায়। যেমন --- যে জেলেটি রাতে সাঁতার কেটে ওখানে যাবার চেষ্টা করেছিল, পরদিন তার খণ্ড বিচ্ছিন্ন দেহ ভেসে আসে। শার্ক আর ব্যারাকুডার কাণ্ড।

এরপর একদিন কান ফাটানো ঢাকের শব্দ। ভুড়ু ঢাকের আওয়াজ। এরপর থেকে ওই অভিশপ্ত দ্বীপে যাবার সব চেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য ১৯৫০ সালের পর জ্যামাইকার গুরুত্ব বেড়েছে। তার কারণ, এখানে বক্সাইটের খনি আবিষ্কার।

আসল কথা, ওই অভিশপ্ত দ্বীপের মালিক এখন ঐ মি. বিগ।

স্ট্রেঞ্জওয়েজ দায়িত্বে রয়েছেন ঠিকই, তার যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছে, এমনকি শার্ক উপসাগরের পশ্চিমে বো ডেজার্ট অঞ্চলে একটা বাড়ি ভাড়াও নিয়েছে। সেখানেই 'সিকিটর' নোঙর ফেলেছে। বারমুড়া নেভির দুজন এক্সপার্ট সাতারু পালা করে দ্বীপটার দিকে নজর রাখে, দূরবিনের সাহায্যে, মাঝে মাঝে জলের তলাতেও নামে।

বন্দ বলে - আমার ধারণা শার্ক আর ব্যারাকুডারা সাধারণভাবে হিংস্র নয়। এই সমুদ্রে

ওদের সংখ্যাও বেশি নয়। এরা রাতে খায় না। তাই কাউকে আক্রমণের ইচ্ছে এদের জাগে না। এখনে কি তোমরা ওই জেলের মতো ব্যাপার আগে দেখেছ?

— অনেক আগে। ১৯৪২ সালে। কিংসটন হারবারে একটা মেয়ের পা কামড়ে খেয়ে ফেলেছিল শার্করা। তবে হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, এদের আক্রমণ খুব একটা মাথাব্যথার ব্যাপার নয়। আসলে দ্বীপটার মালিক এক আমেরিকান। তাই আমরা —

— এই মুহূর্তে ‘সিক্রেটার’ জাহাজটা কোথায়?

— কিউবাতে। তবে সি. আই-এ জানিয়েছে, এক সপ্তাহের মধ্যে বেরিয়ে পড়বে। প্রায় কুড়িবার আসা-যাওয়া করেছে।

বন্ড হিসেব করল — তাহলে ইতিমধ্যে মি. বিগ প্রায় দশ লক্ষ পাউন্ডের সোনা ওই দ্বীপ থেকে নিয়ে গেছে।

স্ট্রেঞ্জওয়েজ জানাল — বন্ডের পক্ষে বো ডেজার্টের বাড়িতে থাকাই ভালো। একটা সানবিম গাড়ি দেওয়া হচ্ছে। হাই স্পিডে চলে। তাছাড়া থাকবে এক দক্ষ হেল্লার। নাম - কোয়ার্ল। স্ট্রেঞ্জওয়েজের সঙ্গে যোগাযোগ নিয়মিত থাকবে।

বন্ড বলল — ঠিক আছে। তবে আরও কয়েকটা জিনিস চাই। ইংল্যান্ডের নেভি থেকে কয়েকটা ডুবুরির পোশাক পাওয়া দরকার। যাতে গভীর জলে যাওয়া যায়। গোটা দুই হারপুন বন্দুক। ‘শ্যাম ড্যাগার’ নামে ফরাসি বন্দুক পেলে ভালো। তাছাড়া টর্চ, কুড়ুল তো লাগবেই।.... ও হ্যাঁ, আরেকটা জিনিসের যুদ্ধের সময় যা দিয়ে জাহাজ উড়িয়ে দেওয়া হত। মানে, লিমপেট মাইন উইথ ফিউজ।

স্ট্রেঞ্জওয়েজ হাসল— তুমিও তো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আশা করি, সবই পাবে।

॥ সতেরো ॥

খালি গায়ে, খাটো শর্টস পরে বারান্দায় বসে কিংসটন আর পোর্ট রয়্যালের সী-বীচ দেখছিল বন্ড। রোদে ভেসে যাচ্ছে। উজ্জ্বল দৃশ্য! কে বুঝবে এরকম আরামপ্রদ বিশ্রাম মুহূর্তে ও অন্ধকারে মৃত্যু তার সঙ্গী, শত্রুপক্ষ। ওঁৎ পেতে রয়েছে, সুযোগ বুঝেই ঝাঁপ দেবে। যুদ্ধের ঠিক পরে বন্ড একবার জ্যামাইকায় এসেছিল, অন্য কাজে। তখন থেকেই এই দ্বীপটি ছিল তার প্রিয়।

ব্রেক-ফাস্টের শেষে স্ট্রেঞ্জওয়েজ এল। সঙ্গে একটা লম্বা লোক। কোয়ার্ল।

— ওড মনিং ক্যাপ্টেন। কোয়ার্ল হ্যান্ডশেক করে বলল।

বন্ডও প্রত্যুত্তর দিল। এক বলক সর্বাঙ্গ দেখে নিয়ে বন্ড বুঝতে পারল, এই লোকটি তার সহযোগী হতে পারবে। গায়ের রং বাদামি। কঠিন চোয়াল এবং হাতের পাঞ্জা তার। কোয়ার্লের মধ্যে ক্রমওয়েলের সৈন্য ও জলদস্যুদের রক্তের ধারা প্রবাহিত। পৃথিবীখ্যাত নাবিক বংশজাত সে। কথার মধ্যে কোনোরকম ভণিতা নেই। নিজের দস্ত সস্বন্ধে বেশ সচেতন সে।

বন্ড ও কোয়ার্ল গাড়ি করে বেরিয়ে গেল।

এখন নটা পাঁচ। সেরকম রৌদ্রের তেজ নেই। ওরা এখন জ্যামাইকার এক পাহাড়ি রাস্তা ছাড়িয়ে ঢালের দিকে নামছে। রাস্তার দুধারে এবনি, মেহগনির সারি। যে উপত্যকায় গাড়ির চাকা থামল, তার চতুর্দিকে আখ, কলাবাগান।

গাড়ি করে যাবার সময় রাস্তায় অনেক পরিচিত জনকে দেখে হাত নাড়ল সে। কোয়ার্ল বর্ণনা করছিল তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা — বাচ্চাদের নিয়ে কুমির কীভাবে থাকে, হামিং বাডের জিভ কতটা লম্বা হয়, বিষাক্ত কাঁকড়া বিছে ইত্যাদি।

কোয়ার্ল বলে — ক্যাপ্টেন, আমাকে এত লোক চেনে দেখে, আপনি অবাক হচ্ছেন। অবশ্য আপনি যাওয়া-আসা করলেও আপনাকেও চিনে নেবে সবাই। সত্যি বলতে কি, সারপ্রাইজের ওপর নজর রাখবার জন্য আমাকে যাওয়া-আসা করতে হয়।

আবার গাড়ি চালিয়ে বন্ড শার্ক বে-র রাস্তা ধরল।

ওরা এখন পাঁচশো মাইল দূরে মেক্সিকো উপসাগরের একটা অংশ এই শার্ক উপসাগরের কাছে।

বীচে দাঁড়িয়ে বন্ড দেখল ধনরত্নের সম্ভারস্থল। যেখানে জাহাজ নোঙর করে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি এই উপসাগরের প্রায় মাঝামাঝি একশো ফিটের মতো উঁচু দ্বীপ — সারপ্রাইজ। দূর থেকে একটা কাঁচের প্লেটের মতো লাগে।

দূর থেকে বন্ড দেখল তালবনের মধ্যে জেলেদের কুঁড়েঘর। এরাও বোধহয় এই দ্বীপের সমান্তরালে অবস্থান করছে। দূরবিন লাগিয়ে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না সে।

কোয়ার্ল তথ্য দিল — সিক্রেটরের নোঙর ফেলার জায়গাটা তিরিশ ফুট গভীর। দ্বীপ থেকে একশো গজ দূরে জলের তলায় আছে প্রবালসম্ভার।

বন্ডদের অপারেশন ডেরাটা হবে বো ডেসার্ট-এ। ঘন জঙ্গলের পিছনে হল ওদের মুখ্য কার্যালয়। বো ডেসার্ট থেকে সিক্রেটরের দূরত্বের ব্যবধান তিনশো গজের মতো। বন্ড চুপচাপ চারিদিক দেখে নিয়ে বড়ো রাস্তার দিকে গাড়ি চালাল।

ওয়াকাবেসা ছোটো বন্দর, ওকো বিয়োগ পার হয়ে দু ঘন্টা বাদে বন্ডরা পৌঁছেল মস্টেগো রে-তে। এখন এখানে টুরিস্টদের অসম্ভব ভিড়। আরো দু ঘন্টা বাদে ওরা পৌঁছেল সারপ্রাইজ দ্বীপের পশ্চিম দিকে।

কোয়ার্ল বলল — কলস্বাস একদা এখানে ভিড়লেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। শুধু রেড ইন্ডিয়ানদের বদলে জ্যামাইকাবাসীদের বাস এখানে এখন, বেশির ভাগই জেলে।

সুন্দর সমুদ্র পার। একদিকে তালগাছের সারি। আরেকপাশে শঙ্খ, বিনুক জড়ো করে রাখা হয়েছে। তালপাতার কুটির, পাশে জেলেদের নৌকো।

প্রায় একঘন্টা জলে সাঁতার কাটল বন্ড। সবসময় একই চিন্তা — ওই সারপ্রাইজ দ্বীপে কি আছে।

এখানে একটা নতুন উপদ্রব — স্যান্ট-ফ্রাইয়ের কামড়। বন্ডের পিঠে চাক চাক দাগ হয়ে গেছে। কোয়ার্ল অবশ্য কী একটা ওষুধ লাগিয়ে দিল। কার্বলিকের গন্ধ!

সূর্য ডুবে গেছে। এখানকাব অন্ধকারে মনটা আপনা থেকেই বিষন্ন হয়ে যায়। আকাশে অনেক তারা মিটমিট করছে। বাতাসে তালগাছের পাতা নড়ায় একধরনের ফিসফিস আওয়াজ হচ্ছে।

কোয়ার্ল বলল — এটা কবরখানার বাতাস।

— তার মানে?

— মাঝিরা বলে, কুলের হাওয়া। কবরখানার খারাপ বাতাস নিয়ে যায়। আবার নতুন বাতাস নিয়ে আসে। জ্যামাইকাবাসীরাই এই নাম দিয়েছে।

বাইরে ঝি ঝি পোকাকর ডাক, মাঝে মাঝে ব্যাঙের। জেলে যুবক-যুবতিদের আসা যাওয়া, হাসতে হাসতে চলে পড়ছে। ছোটো একটা মদের দোকানে রাম পাওয়া যায়।

কোয়ার্ল রান্না করছে — মাছ, ডিম, সবজি। স্ট্রেঞ্জওয়েজ কতগুলো বই দিয়েছিল, তারই একটার পাতা ওলটায় বন্ড। বিষয় — সমুদ্র ও জল জীবজন্তু, জলের তলায় শিকারের টেকনিক সম্পর্কেও কিছু বলা আছে। ইতিমধ্যে বন্ডের ট্রেনিং শুরু হয়েছে। এখন কোয়ার্ল তার শুরু।

সাতাব, দৌড়, পালতোলা ডিঙি বেয়ে চলা, শার্ক উপসাগরে ডুব ইত্যাদি রিহাসার্শাল চলতে থাকে। প্রথম দিন প্রবালের আঘাতে আহত হয়েছিল বন্দ। এছাড়া নানা মাছের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে হয়েছে।

কোয়ার্ল অবশ্য বলে -- মাছগুলো এমনিতে আক্রমণ করে না। আত্মরক্ষার জন্য করে থাকে। তাছাড়া জলে রক্তের গন্ধ পেলে উত্তেজিত হয়। তবে ব্যারাকুডারা খুব হিংস্র। ধারালো দাঁতের পাটি, ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল স্পিডে সাঁতার দেয়।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে বন্দের। ওরা একটা দশ পাউন্ড ওজনের ব্যারাকুডা মেবেছে। মাছটার চোখ দুটো বাঘের মতো হিংস্র। এমনিতে মাছটাকে মারা সহজ হয়নি। কোয়ার্লের বর্শা, গুলি দুই-ই ব্যবহার করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হারপুনটাও। আশ্চর্য, মুখটা খুলে দেখা গেল, সাপের মতো দুটো লম্বা জিভ আছে।

সর্বক্ষণ এই বিপদের মধ্যে প্র্যাকটিস চলছে। সিগারেটের সংখ্যাও কমাতে হয়েছে। এক সপ্তাহব্যাপী মদ্যপান একেবারে বন্ধ। এইভাবেই অনুশীলন শেষ হল।

কোয়ার্ল বলল -- আপনি এবার ফিট। সারপ্রাইজ দ্বীপে যেতে পারেন। মাছের সঙ্গে লড়াই কবতে পারবেন।

সন্ধ্যাবেলা গেস্টহাউসে স্ট্রেঞ্জওয়েজ এল -- একটা ভালো খবর। ফেলিক্স লিটার মৃত্যুর ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছে। অবশ্য একটা হাত এবং পা বাদ দেওয়া হয়েছে। মুখে প্লাস্টিক সার্জারি চলছে। কথাবার্তা বলতে পারছে। প্রথম থেকেই তোমার খবর নিচ্ছে। বলছে -- তুমি যেন কখনও ওর মতো মাথা গরম কোব না।

বন্দ বলল -- ও তাড়াতাড়ি সুস্থ হোক। ওকে বোল, আমি ওকে খুবই মিস করছি।... আমার জিনিষপত্র সব কী হল?

-- পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, আর একটা খবর, মি. বিগ সারপ্রাইজ দ্বীপে আসছে। সঙ্গে সলিটের নামে একটি মেয়ে আছে। খুব সুন্দরী। তোমার চেনা নাকি?

- বিশেষ নয়। তবে মেয়েটাকে বিগের হাত থেকে মুক্ত করলে ভালো হয়।

বারান্দায় এল বন্দ। বিগ আসছে। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা বাড়ল।

॥ আঠারো ॥

ভোরবেলা বন্দের চলে যাবার কথা। রাতে আরও কিছু বইপত্র পড়ে নিল। বেশিরভাগ খবর প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল সম্বন্ধে।

ইতিমধ্যে শার্ক তাড়াবার একটা ভালো ওষুধ তৈরি করেছে আমেবিকার নেভালো রিসার্চ সেন্টার। কপাব অ্যাসিটের সঙ্গে ঘন নিগোসিন মিশিয়ে তৈরি। এই সম্পর্কে একটা বইয়ে বিশদ বলা আছে। শার্কদের সঙ্গে মোকাবিলায় নানা ফটো রয়েছে। এই ওষুধটা জলের মধ্যে এমন একটা বিষ সৃষ্টি করে যে, শার্ক আসতে পারে না কাছে।

কোয়ার্ল পরামর্শ দিল - ওই ওষুধটা আনিবে নিন।

কিন্তু ওয়াশিংটন থেকে এই ওষুধ আসতে আরও দু তিনদিন লেগে যাবে। তার জন্য অপেক্ষা সম্ভব নয়।

সকাল ছাঁটায় রওনা হয়ে বো ডেসার্ট পৌছোতে ওদের সাড়ে দশটা লেগে গেল। এখানে এক হাজার একর চাষের জমি। একটা তাঙা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে। বলা যায়, ক্রমওয়েলের সময় থেকে এর ইতিহাস শুরু। এর আগে নানাবকম নাম ছিল দ্বীপটার।

নানা রং এর ফুল ফোটে। চারদিক রঙিন, প্রচুর তালগাছ। অনেকটা পাথুরে ভূমি।

অন্ধ বলতে ওদের সঙ্গে রয়েছে, আধুনিক হারপুন গান, কম্যান্ডো কুঠার আর কিছু বিস্ফোরক পদার্থ।

পাঁচটায় স্ট্রেঞ্জওয়েজ এল। জানাল - সিকেটর প্রায় পৌঁছে গেছে। দশ মিনিটের মধ্যে এখানে এসে যাবে।

পাসপোর্টে মি. বিগের নাম গালিয়া। মেয়েটির নাম সিমোনো লট্বেল। মেয়েটা নাকি সী-সিকনেসে ভুগছে। জাহাজ ভর্তি অনেকগুলো খালি ট্যাক্স।

বন্দ বলল -- আজ রাতেই আমার অ্যাকশন শুরু হবে।

কোয়ার্ল জানাল -- ওরা প্রবাল পাহাড়ের ভিতর দিয়ে আসছে।

দূরবিনে দেখা গেল, চমৎকার জাহাজ। সগুর ফুট লম্বা, দ্রুতবেগে আসছে। আমেরিকান পতাকা উড়ছে পতপত করে। এইবার ডেকের ওপর মি. বিগকে দেখা গেল। জেটি পেরিয়ে খাড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বারবার থামছে। বন্দ জানে মি. বিগ হার্টের পেশেন্ট।

হঠাৎ দূরবিনে দেখা গেল মি. বিগেব পিছনে একটা স্ট্রেচার। কাউকে বেঁধে রাখা হয়েছে। আবার চমক! মাথার দিকে চুল দেখে বোঝা গেল সলিটের। কী হয়েছে ওর। এই অবস্থা কেন?

মি. বিগ অবশ্য কাজ শুরু করে দিল। জাহাজে মাল উঠছে। এত ভাড়াতাড়ি? ওরা কি এবার চিরদিনের মতো দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে?

বন্দ কোয়ার্লকে বলল -- তুমি দূরবিনে ওয়াচ করো।

বাতাস বইছে। সেই কবরখানার বাতাস। আজকেই কি যেতে হবে? এই রহস্যের শেষ কোথায়? এবার যে জীবন শুরু হচ্ছে, সেটা আরও মর্মদাহী -- অন্ধকার জলের তলায় একক বিচরণ।

কোয়ার্ল বলল -- ক্যাপ্টেন ওরা জোরালো আলো জ্বলে কাজ করছে। ট্যাক্স তোলা শেষ হতে অস্বস্ত দশ ঘণ্টা লাগবে। তার মানে ভোর চারটে। তবে ছটার আগে জাহাজ ছাড়বে না। কারণ, দিনের আলো স্পষ্ট না হলে বিপদ থাকে।

বন্দ বলল -- আমি দশটায় বেবোব। সব তৈরি রাখ।

-- ইয়েস ক্যাপ্টেন।

হুইস্কীতে চুমুক দিল বন্দ। এক সপ্তাহ বাদে এঁর প্রথম।

ঠিক দশটায় ডুবুরির পোশাক পরে জলে নামল বন্দ।

॥ উনিশ ॥

প্রস্তুত হয়েই শুরু হল এই জলতলদেশযাত্রা।

প্রথমে দেড়শো ফুট বালি, একটানা কিছুক্ষণ হেঁটে প্রবালেব ওপর বসে সামান্য বিশ্রাম নিল বন্দ। রবারের পোশাকে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। এখানে পোর্সেল টচটা জ্বালল বন্দ।

সামনে জেগে উঠল এক ম্যাজিক জগৎ। বাদামি প্রবাল, গাছের মতো। বেগুনি অ্যান্টিমনি, ফুলের মতো কালো সী এগ। এছাড়া প্রচুর সামুদ্রিক বিছে, বৃহদাকৃতি ব্যাং, এক ঝাঁক প্রজাপতি -- যেন গয়না পরে ঝকমক করছে।

এই মুহুর্তে আশেপাশে কোনো বড়ো মাছ নেই। কয়েকটা গলদা চিংড়ি গর্ত থেকে উঁকি মারছে। গায়ে গায়ে সাদা সাদা কাঁটাওয়ালা একটা বিষাক্ত মাছ। বন্দ বন্দুক তুলেছিল। কিন্তু গুলি চালাবার দরকার হল না।

একটু অনামনস্ক হয়েছিল বন্দ। তার মথোই হাঁটু আঁকড়ে ধরেছে এক অস্ত্রোপাশ। বন্ধ চেষ্টা করেও তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হওয়া গেল না। প্রচণ্ড শক্তি ওটার গায়ে। কুঠারের কোপ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

এবার ছমড়ি খেয়ে বালির ওপর পড়ে গেল বন্ড। বাধ্য হয়ে হারপুন বন্ডকটা চালাল বন্ড। এবার লক্ষ্যবিন্দু হয়েছে। দুটো পা মুক্ত হল অবশ্য। মুখের ওপর ছিটকে এল কালো কালির মতো কী এক পদার্থ।

সমুদ্রতলে সাঁতার, সামনে বিরাট এক স্টিন গ্রে, লম্বা লেজ। জেলেরা এদের ডিমগুলোর নাম দিয়েছে। ‘মৎস্যকন্যার থলি।’

এরপর এক ঝাঁক স্কুইড। লাইন করে যাচ্ছে সরু চকচকে মাছ। ওই তো দুটো ব্যারাকুডা! বন্ডের ধারণা, অন্তত কুড়িটা ব্যারাকুডা জমা হয়েছে।

মাথার ওপর একটা শক্ত ধাতুর জিনিস। হ্যাঁ, এটাই সিক্কেটরের তলদেশ।

এখন ঘড়িতে এগারোটা তিন। ফিউজ বের করে মাইনের মধ্যে গুঁজে দিল বন্ড। অন্য ফিউজগুলো বালিতে পোঁতা। এই মাইন পাতার খবর শত্রুপক্ষ টের পাবে না।

একটা ব্যারাকুডার ধাক্কা এড়িয়ে জল ঠেলে উঠল বন্ড। দু হাতে মাইন ধরা আছে।

ইতিমধ্যে নতুন বিপদ বাড়ছে। এক ঝাঁক ব্যারাকুডা আর কয়েকটা শার্ক বন্ডকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। হায়, শার্ক তাড়াবার সেই ওমুখটাতো সঙ্গে নেই। এই বিপদে হারপুন বন্ডকটা একটা খেলনা মাত্র।

ভাগ্য ভালো, সবচেয়ে কাছে আসা ব্যারাকুডাটা একটা মাছ গিলে পালিয়ে গেল।

ও কী, ওপরে কী হচ্ছে! কে যেন জলের ওপর নাড়িভুঁড়ি রক্তমাংস ছড়াচ্ছে!

॥ কুড়ি ॥

বন্ড বুঝল, ওইসব রক্তমাংস ছড়িয়ে দ্বীপের চারপাশের শার্কদের হিংস্র আর উত্তেজিত করে রাখা হয়। মি. বিগের বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না।

জলের মধ্যে হিংস্র প্রাণীদের উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। একটা বিরাট মাছ এবার তেড়ে আসছে, মাত্র তিন ফুট দূরে। হারপুনটা দিয়ে ওটাকে গের্গে ফেলল বন্ড। হারপুন মুখেই ছুট দিল মাছটা। বন্ডের হাত থেকে দড়িটা ফস্কে গেল।

একটা ফাঁড়া গেল। হঠাৎ সামনে সেই গুহাটা — যাকে দ্বীপের প্রবেশপথ বলা যায়। গুহার জলে ডাইভ মারল বন্ড। এটাই তাহলে জলদস্যু ব্লাডি মরগ্যানের গুহা! নিগ্রো ক্রীতদাসদের দিয়ে কাটানো হয়েছিল এই গুহা। তাই এই গুপ্তধন অবশ্যই নিগ্রো ক্রীতদাসদের প্রাপ্য।

যদিও এসব ভেবে এখন কোনো লাভ নেই। ঢাকের বাজনা কানে আসছে। জোরালো শব্দ, তাই জল কাঁপছে। ভুড়ু তন্ত্রে বিশ্বাসী লোকেরা তীরে দাঁড়িয়ে মৃতদেহের জন্য অপেক্ষা করে, প্রেতাশ্বার শাস্তি দানে মরেছে যারা।

স্ট্রেঞ্জওয়েজকে বন্ড আগেই জানিয়েছিল, মোহরগুলো কোনখানে থাকে। অবশ্য শত্রুরা এখন খুব সতর্ক। কিন্তু ওরা জানে না এখানে কেউ এসেছে কিনা, অথবা বন্ড জীবিত কিনা।

যাই হোক, সলিটেরকে বাঁচাতে হবে। ওর কী অবস্থা কে জানে।

সুতরাং স্ফাস্তি নেই।

হঠাৎ কারা যেন জলে ঝাঁপ দিল। বর্ষা হাতে দুই নিগ্রো, মুখোশ পরা। পরনে আর কিছু নেই। ওরা ধরে ফেলল বন্ডকে। বালির ওপর তুলে আনল। ছিঁড়ে ফেলল রবারের পোশাক। বন্ডের খালি গা, শুধু সাঁতারের জাঙিয়া পরা। বাঁ কাঁধের বর্ষার জখম থেকে রক্ত পড়ছে। ঢাকের তালুব আরো বাড়ল। বন্ডকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাল ওরা।

একি! সামনে এ কে?

একটা বড়ো চেয়ারে বসে আছে মি. বিগ। ছোটো টেবিলে একগাদা কাগজপত্র কলম রেখে বিরক্ত ভাবে বন্ডের দিকে তাকাল।

- গুড মর্নিং মি. বন্ড। একে বলা যায় তিমিব মুখেই মাছ চলে এল। জলের ওপর বৃদবৃদ দেখেই বুঝেছিলাম নীচে কেউ রয়েছে।

দূরে আর্ক ল্যাম্প। গোটা বারো হবে। একদল বুনো নিগ্রো হাসছে। চারপাশের কাঠের বাস্ক আর ক্যানভাসের ব্যাগের মধ্যে রয়েছে জ্বলন্ত সোনার মতো গাদা গাদা মোহব। বড়ো বড়ো কাঠের ট্রে-তে থাকে থাকে মোহর সাজানো। ট্রে হাতে একেক জন নিগ্রো উঠে আসছে। ওদিকে একটা লোহার কড়াইয়ের মধ্যে একজন খুস্তি নাড়ছে। তার পাশে সোনার পানপাত্র। কাপ প্লেট, ক্রশ, গির্জার জিনিস ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে লাল নীল সবুজ কিছু মণিমুক্তো। সবই ব্লাডি মরগ্যানের রত্নগুহা থেকে পাওয়া।

মি. বিগের আদেশে বাজনা থামল।

— এবাব সবাই কাজে যাও।

বন্ড দাঁড়িয়ে ঘামছে। ঘামের সঙ্গে মিশছে রক্ত। মি. বিগ আবার হিসেব কষতে শুরু করল। বন্ড একবার একটু নড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে পেটে ছুবির খোঁচা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাবার আগে বিগ বলল — ওকে নিয়ে এস।

॥ একুশ ॥

ছাদের দরজা ছাড়িয়ে একটা বিরাট চাতাল এখানেই চৌবাচ্চাগুলো রয়েছে। একটা নিগ্রো ট্রে-র ওপর মোহর সাজাচ্ছে।

বন্ড বুঝল — ট্যাঙ্কগুলোর মধ্যে সোনার বাট, রত্নরাজির ওপরে বালি আর জলজ উদ্ভিদ ভরে দেওয়া হবে। তাবপর ট্যাঙ্কগুলো জাহাজে উঠবে। একেকটার দাম হবে প্রায় চল্লিশ লক্ষ স্টার্লিং।

পালাবার কোনো সুযোগ নেই। পালাবাব কথা ভাবছেও না বন্ড। তাকে বেঁচে থাকতে হবে, সলিটেরবকে বাঁচাতে হবে।

একটা ঘরের তালা খুলল বিগ। সফ লম্বা ঘর, ভ্যাপসা গন্ধ। বিগ ডাকল — সলিটের।

তারপর পিস্তল হাতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল — বন্ডকে ছেড়ে দাও। আমার পিস্তলে ছটা গুলি আছে।

অসুস্থ সলিটেরয়ার দৌড়ে আসতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। বন্ড ওকে ধরে ফেলল।

মুদু স্বরে বলল — কিছু ভেব না। আমি এসে গছি।

সলিটেরব জিজ্ঞেস করল — তোমার গায়ে রক্ত কেন ?

বন্ড বলল — শয়তানটা কী করেছে তোমায় ?

বিগ আদেশ দিল, ওদের বেঁধে ফেলতে।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। দুজনকেই দড়ি বেঁধে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বন্ড আর সলিটেরব এখন মুখোমুখি। তিন ফুট গ্যাপ।

মি. বিগ বলল — এর আগে অনেক লোক পাঠানো হয়েছে আমার বিরুদ্ধে কাজ করতে, অথবা আমায় খতম করতে। স্বীকার করছি, তুমিই সবচেয়ে বড়ো ধূর্ত। ইতিমধ্যেই আমার চারজন সহকারীকে মেরেছ। সবাই অবাক হয়ে গেছে। আমার প্রেস্টিজ ডাউন হয়ে গেছে। এবার আমি একটু হিসেব নেব।

একটু থেমে মি. বিগ আবার বলল — দেখ, আমেরিকানটাকে মারা হয়নি। সে বেঁচেই আছে। এই মেয়েটাও বেইমান! বস্তি থেকে তুলে এনেছিলাম, নিজের প্রধান সহকারী করব ভেবেছিলাম। সে ও দেখলাম —...। কীভাবে ওকে মারা যায় সেটাই ভাবছি, হঠাৎ আবার তুমি হাজির। যাই

হোক, ভালোই হয়েছে। দুজনেই একসঙ্গে মরবে। তবে এখনি নয়, আড়াই ঘণ্টা পরে, মোটামুটি ছ'টা নাগাদ।

বন্দ বল --- আড়াই ঘণ্টা পরে কেন? আরেকটু দেরি করলে হয় না? আমি বাঁচতে ভালোবাসি, যতক্ষণ বেশি সম্ভব।

মি. বিগ সে কথায় কান না দিয়ে নিগ্রো জাতির মহান ইতিহাস ও সভ্যতার বর্ণনা দিতে থাকল। নিগ্রোদের মধ্যে কত লেখক ডাক্তার, খোলোয়াড়, সংগীতজ্ঞ এবং বিজ্ঞানীরা জন্ম নিয়েছে। জীবনের অন্যক্ষেত্রেও একসময় নিগ্রোরা উন্নতির শীর্ষে উঠবে। তুমি নিজে পুলিশে কাজ কর, তাই এক 'মহান নিগ্রো অপরাধী' র দেখা পেলে। অবশ্য আমার জগতে আমিই সঙ্গীট। অন্যের আইন নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি শিল্পী, নিখুঁত কাজ করে আনন্দ পাই। হ্যাঁ, বলতে পার, ভেড়াবাদের সংখ্যা বেশি। কিন্তু আমি একটি নেকড়ে।

নিজের সম্বন্ধে আরও কিছু লম্বা চওড়া কথা বলে গেল বিগ। বাধা দিয়ে বন্দ বলল --- তোমার জন্য একটা কঠিন মৃত্যু অপেক্ষা করছে। আমাদের মারলে তোমার সেই মৃত্যু অতি দ্রুত এগিয়ে আসবে। তুমি আসলে পাগল। তাই বুঝতে পারছ না।

সলিটের বন্দ --- সত্যি বুঝতে পারছি না। মৃত্যু আমার এত কাছে, অথচ আমরাও---

এবার মি. বিগ বলল --- না মি. বন্দ। তুমি বললেই তো আমি পাগল হয়ে যাব না। তোমাদের মৃত্যুর সঙ্গে আমার কেউ জড়তে পারবে না। শার্ক আর মাছেরা যদি তোমাদের খায়, ভুড়ু তত্ত্বে পূজো হয়, তাতে আমার কী দোষ। কুসংস্কারে বিশ্বাসটাও তো জাগিয়ে রাখতে হবে। তাতে দুটো মৃত্যু কাজে দেবে।... কীরকম প্ল্যানটা বল, নিখুঁত শিল্পীর মতো নয় কি? গুড নাইট। জানি না, কথাটা বলা ঠিক হল কিনা। তোমাদের রাত্রি খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে।

১১ বাইশ ১১

শেষ রাতে ওদের পায়ের বাঁধন কাটা হল। হাত বাঁধাই থাকল।

আকাশে তারারা মিলিয়ে গেছে। ঝি ঝি-রাও চুপ। একটা মকিং বার্ড ডাক দিল। খুব সম্ভব সাড়ে পাঁচটা বাজে। সলিটের আর বন্দ পাশাপাশি হাঁটছে। বলা যায়, মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। তবে এরই মধ্যে দুজনের কিছু কথা হয়েছে। তাই সলিটেরও জানে, জাহাজের গায়ে মাইন লাগানো আছে। সেটা ফাটেবে ছ'টা বাজার কয়েক মিনিট পরেই। তাতে কে বাঁচবে আর কে মরবে, সেটাও বন্ডের হিসেব করা হয়ে গেছে। যদিও মি. বিগ ঘড়ি ধরে চলে, তবুও কুয়াশার জন্য জাহাজ ছাড়তে একটু দেরি হবে। সেইসময় যদি ওরা জেটির ওপর থাকে, তাহলে মি. বিগ ও তার দলবলের সঙ্গে ওদেরও মরতে হবে। কারণ, বিরাট বিস্ফোরণ ঘটবে।

আর যদি কাঁটায় কাঁটায় সময় ধরে জাহাজ ছাড়ে, মানে ঠিক ছ'টায়, সেইসময় বন্দ আর সলিটের কতদূরে বাঁধা থাকবে? কুড়ি কি তিরিশ গজ দূরে? তার আগে প্রবাল ও পাথরের ঘসা লেগে ওদের শরীরের অবস্থা কী হবে? রক্তের গন্ধ পেলে শার্ক আর ব্যারকুডারা কি চুপ করে থাকবে? এ দৃশ্যটা দূরবিনে খুবই উপভোগ্য হবে মি. বিগের কাছে।

কিন্তু জলে যদি মাইন ফাটে? তাহলে ওরা থাকবে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে। বেঁচে যেতেও পারে। যদি প্রবালস্তূপের আড়ালে যাওয়া যায়।

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। মৃত্যু যদি আসেই, মানে, মরতেই যদি হয়, তাহলে নিজের হাতে আগে সলিটেরকে ডুবিয়ে মারবে বন্দ। তারপর নিজেকে সঁপে দেবে শার্কের হাতে।

মাইনটা বিস্ফোরণ না ঘটালে অবশ্য শত্রুপক্ষ বেঁচে যাবে।

একটা ঘন্টা কেটে গেছে। একঘন্টার মধ্যে জীবন মরণ সম্ভাবনা নিয়ে কয়েক হাজার চিন্তা পাক খেয়েছে বন্ডের মনে। সলিটেয়ারের চোখ এখন অশ্রু সজল। কিন্তু তার মধ্যে একটা ভূষ্টি, ভালোবাসার লোককে সঙ্গে নিয়েই মবছে সে। জীবনের অস্তিত্বে সে সারা জীবন যা চেয়েছে, পেয়েছে।

সে বন্ডকে আগেই বলেছিল - আমাকে নিয়ে এত উৎকর্ষা রেখো না। মৃত্যুর আগে তোমার সঙ্গে দেখা হল, এটাই আমাব বড়ো পাওয়া।

বন্ডও জীবনের অস্তিত্বে আবেগমথিত।

-- সলিটেয়ার, জীবনের পরেও--

-- হয়তো। শুধু একটা কথা শোনা হয়নি। সেটা পরিষ্কার বল।

- কী কথা?

আমাকে ভালোবাসো তুমি।

— হ্যাঁ, বাসি, সাবা জীবন, এমনকী মরণের পরেও।

-- বারবার মরণ বলছ কেন? যদি আমবা বেঁচে যাই---

সত্যিই তো। মেয়েটাই যখন এত আশাবাদী, তখন দুরন্ত সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট এত হতাশ হচ্ছে কেন? কত সময় কত কিছু ধটে।

বন্ডের নিজের জীবনেই কত 'মিথাকেল' ঘটেছে। লজ্জা পেল বন্ড।

হাত পা বাঁধা।

তাই চুম্বন আলিঙ্গনের অবকাশ নেই। কিন্তু মৃত্যুর সময় দুটো মৃতদেহ যেন পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে মরতে পারে। জীবনের ওপাবের জগতে যেন একত্রে যেতে পারে। এই নিষ্ঠুর, বিরামহীন সংঘর্ষে ওরা পৃথিবী ছেড়ে ওরা যেন সেই জগতের বাতাসে প্রেমঘন সুবন্ধিতে নিজেরা মিশে থাকতে পারে। গোলা বারুদ, রক্তপাত আর খুন থেকে, সিক্রেট সার্ভিসের এই ছেলেমানুষি বীরত্ব ছেড়ে, ওরা যেন প্রকৃত জীবন পায়।

— তাহলে ঐ কথাই মনে রাখ বন্ড!

-- কী?

— আমরা বাঁচতেও পারি। আর মরলেও--

— ভালোবাসব।

— ঠিক এই সময়েই প্রহরীবা এসেছিল।

-- চলো।

হ্যাঁ, যেতে হবেই। শেষবারের মতো ভোবের বাতাসে নিশ্বাস নাও।

এই মুহূর্তে ব্রিফকেস তাতে বিগ এসেছিল। যেন প্রার্থনার সুরে বলল - মেনি মেনি থ্যাংকস্, স্যার হেনরি মরণ্যান। আপনার গুণ্ডন এত বছর পরে মর্তের মানুষের হাতে এল। পাতালপুরীতে যা এতদিন বন্দি ছিল। একসময় হয়তো জলের তলায় ধ্বংস হয়ে যেত সব কিছু!

সূর্য উঠেছিল তখন।

প্রার্থনা করছে মি. বিগ -- স্যার হেনরি মরণ্যান, আপনি আমাদের এখন পরিষ্কার বাতাস দিন। আমরা যাত্রা করব। আপনার আত্মা শান্তিতে থাকুক।

বন্ড না বলে পারলো না - ওটা কবরখানার বাতাস!

মি. বিগদের দিকে তাকিয়ে শুধু একবার ভুরু কঁচকাল।

-- সবাই নেমে গেছে?

— ইয়েস স্যার।

পাহাড়ের ধার। সিঁড়ি দিয়ে একে একে নামছে ও বা। দুই বন্দির আগে এক গার্ড, পেছনেও একজন। সবশেষে মি. বিগ।

জাহাজের ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে। ভস্ ভস্ করে ভড়ছে নীল সরু ধোঁয়া। একজন্স্টের শব্দ মুখর হয়ে উঠেছে।

নিখুঁত প্লান অনুযায়ী বরাবর চলে মি. বিগ। সেই অনুযায়ী প্রথম জেটিতে পাহারা দিচ্ছে দুজন। ডেকে ক্যাপ্টেন আর প্রধান নাবিক। তা ছাড়া, আরও তিনজন আছে।

পুরো ডেক জুড়ে আছে মাছের ট্যাঙ্ক। একটা চেয়ার, মাছ ধরার জন্য। লাল ফ্ল্যাগ আকাশে উড়ছে। আমেরিকার জাতীয় পতাকা এখন নীচে ঝুলে পড়েছে।

টার্পেডো ডিভিটা জাহাজ থেকে কয়েকগজ দূরে। ছ-ফুট দীর্ঘ।

ভোর হচ্ছে। রাতের অন্ধকার কাটছে। কিন্তু বন্দিদের জীবনে অন্ধকার ঘন হচ্ছে আরও। এক গোছা দড়ি গুটিয়ে পড়ে আছে ডেকের ওপর। দেড়শো ফুট লম্বা দড়ি, পরিষ্কার স্বচ্ছ জল, বন্দিদের জীবনের জল যখন ঘোলাটে। এই মুহূর্তে কোনো মাছ দেখা যাচ্ছে না জলে।

‘কবরখানার বাতাস’ হঠাৎ স্তব্ধ। বোধহয় জাহাজের ভিন্নগতির জন্য। আরেকটু পরে সমুদ্রের দিক থেকে অন্য ধরনের হাওয়া আসবে। তাকে ওরা বলে — ডাক্তারি হাওয়া।

তার মানে কি সমস্যার সমাধান? রোগ মুক্তকারী হাওয়া? সেটা কি শুভ সূচনা করে?

জাহাজ চলছে।

সকলে একবার তাকায় বো ডেসার্টের দিকে। বিদায়!

গাছের আড়ালে বাড়িটাও যেন হারিয়ে যাচ্ছে। তবে জেটির উপর ছায়া পড়েছে। বিরাট ছায়ার একটা অংশ জাহাজের আকাশে এসে জাহাজকেও পরিব্যাপ্ত করছে। ওদের দুজনকে কেউ দেখতে পেল না।

স্ট্রেঞ্জয়েজ কী করছে এখন? সে নিশ্চয়ই টের পেয়েছে।

মনের জগৎ মনে, বাস্তব জগৎ সামনে।

— মেয়েটার জামা খুলে ফেলো।

মি. বিগের আদেশ। আবার নতুন ধরনের কোনো অশ্লীল অত্যাচারের পরিকল্পনার আগে! মৃত্যুর আগে আরও কিছু—

বস্ত্র মর্মান্বিত।

হাতঘড়িটা এক পলকে দেখে নিল। ছ’টা বাজতে দশ।

ইস, দশমিনিট যেন দশ যুগ। কাটতেই চায় না। এখন চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

— ওর জামাকাপড়গুলো জাহাজে রাখো। কাপড়ের পট্টি ছিঁড়ে লোকটার কাঁধে বাঁধো। সাবধান জলে যেন এক বিন্দু রক্ত না পড়ে।

হাতবাঁধা সলিটেয়ারের জামা ছুরি দিয়ে কাটা হল। পেছন থেকে চিরে ফেলা হল। ফালি ফালি করে।

তার স্কাটের একটা ফালি টুকরো দিয়ে বস্ত্রের কাঁধের ক্ষতের ব্যান্ডেজ ভালো করে বাঁধা হল।

এখন দিবালোকে ডেকের ওপর সম্পূর্ণ উলঙ্গ সলিটেয়ার। মুখের ছাপ কেমন বোঝার উপায় নেই। কালো চুলে মুখ ঢাকা।

মৃত্যুর আগে উলঙ্গ সলিটেয়ারকে অবশ্য কোনো লালসার দৃষ্টিতে দেখছে না বিগ। সময় নেই। তাছাড়া, তার মাথায় আরও বড়ো চিন্তা ঘুরছে।

বস্ত্র ও সলিটেয়ার এখন কাছাকাছি। বস্ত্রের কাঁধে অতিকষ্টে মাথা রাখল সলিটেয়ার — সব অপমান সইতে রাজি আছি যদি —

বস্ত্র এখন ঘড়ির কাঁটা দেখছে। ওদের দুজনের হাত বুক শক্ত করে বাঁধা হয়েছে।

ছ-টা বাজতে পাঁচ।

বিগের হুকুমে ওদের দু-পা খোলা থাকল অবশ্য। খোলা পা দেখলে মানুষ খেকো মাছের দল ধেয়ে আসবে।

জেটি ছেড়ে চলে গেল মি. বিগ।

জাহাজের বড়ো দড়ি খুলে ফেলা হল। সিকিটার এবার জলে চলতে শুরু করল। বিগ ওই মাছ ধরার চেয়ারটায় বসে আছে। অবশ্য সেখান থেকেই বন্দীদের ওপর নজর রাখছে।

সামনে প্রবালস্তুপ। জাহাজের পাশাপাশি ডিঙি-ও চলছে। ডেকের উপর পড়ে থাকা দড়িটায় হঠাৎ টান লাগল। বন্দ বলল — হুঁশিয়ার!

কীসের হুঁশিয়ার! প্রচণ্ড হাঁচকা টান। ওরা দুজনে এবার ছিটকে জেটি থেকে জলে পড়ে গেল। মনে হল, হাত-পা ছিঁড়ে-আলগা হয়ে গেছে। ওরা বোধহয় সমুদ্রের অতলে।

হ্যাঁ, অনেকটা তাই। কিন্তু জল কেটে ওপরে উঠল ওরা। বন্দ দু পায়ে সলিটেয়ারের পা জড়িয়ে ধরল। দমবন্ধ হয়ে কাশির বেগ আসছে তার। কিন্তু বাতাসে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রক্রিয়া ফিরে পেল।

জল থেকে একবার মাথা তুলে অবস্থাটা দেখা দরকার। সলিটেয়ার-কে এক পাক ঘুরিয়ে নিল বন্দ। ওই তো দেখা যাচ্ছে, সিকিটার আশি গজ দূরে একটা চ্যানেলের মধ্যে ঢুকছে। টর্পেডো ডিঙিটাও পাশাপাশি ভাসছে।

প্রবাল পাহাড় আর ষাট গজ দূরে।

সলিটেয়ার আবার হাঁফাচ্ছে।

ছ-টা তো বেজে গেছে! কী হল? মাইনটা ফাটছে না কেন? এতক্ষণে তো বিস্ফোরণ হওয়ার কথা।

হায়, সিকিটার তার অমোঘ গতিতে প্রবাল স্তুপের দিকে এগোচ্ছে। দূরত্ব এখন আর মাত্র চল্লিশ গজ!

ক্রমশ প্রবাল স্তুপ পেরিয়ে গেল জাহাজ।

বন্দ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল। মাইন না ফাটলে বাঁচার সব সম্ভাবনা উধাও!

দড়ি বাঁধা হাতে টান পড়ছে।

— সলিটেয়ার, জোরে দম নাও।

মাথার ওপর জলের স্রোত। ওরা দুজনে প্রবালের ওপর প্রায় এসে গেছে। আরো দশ গজ। হঠাৎ—

হঠাৎ দড়িতে সজোরে টান এবং সঙ্গে সঙ্গে —

মারাত্মক বিস্ফোরণ! দুম্ দুম্!!

চারদিকে বিদ্যুতের ঝিলিক! দড়ির বাঁধন কেটে গেল বোধ হয়। ওরা জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। বন্ডের হুঁশ আছে। কিন্তু সলিটেয়ার জ্ঞানহারা। তার দেহটা বয়ে চলতে এবার কষ্ট হচ্ছে বন্ডের।

প্রবাল স্তুপের কাছে জলে যেন ঘূর্ণিপাক। এই প্রবাল স্তুপই ওদের বিস্ফোরণের থেকে বাঁচিয়েছে। না হলে এতক্ষণে ওদের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

ওদিকে কী হল?

সে দেখার অবকাশ কই? নিজেদের অস্তিম দশা সমাগত। কঠিন প্রবালে ক্রমাগত ধাক্কাই সারা দেহ রক্তাক্ত। ছাল-চামড়া উঠে যাচ্ছে। সলিটেয়ারের জ্ঞানহীন দেহ আঁকড়ে ধরে থাকতে হচ্ছে।

এদিকে ভয় হচ্ছে রক্তের গন্ধে যদি শার্ক আসে!

কিছুক্ষণ পরে একটু সামলে নিল বন্ড। সিকেটার কই? কোনো চিহ্ন নেই তার। সমুদ্রে ব উপব ছোটো ছোটো ধোঁয়ার কুন্ডলী শুধু। হাওয়ায় বারুদের গন্ধ। জলে লক্ষ লক্ষ বৃদবৃদ ছড়িয়ে পড়েছে।

মরা মাছ ভাসছে। কিছু মানুষ জলে ডুবে যাচ্ছে। তাদের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে ক্ষুধার্ত শার্ক, লেজের ঝাপটা মারছে জলে। বহু লোক ডুবে যাচ্ছে। শেষবারের মতো তাদের কালো কালো হাতগুলো জলের ওপর ভেসে উঠছে, তারপরেই তলিয়ে যাচ্ছে।

কে যেন সাঁতার কেটে এদিকে আসছে। বিরাট মাথাটা দেখে চিনতে পারা গেল মি. বিগ। মাথার মাঝখানে টাক, সেখান দিয়ে রক্ত বরছে। ব্যারাকুডারা বেশি দূবে নয়।

মি. বিগও আশ্রাণ সাঁতরে প্রবাল স্তূপে ওঠার চেষ্টা করছে। ছাত-পা ছুঁড়ছে কিন্তু তেমন এগোতে পারছে না। বীভৎস তার মুখ। হাঁ-মুখ দিয়ে বড়ো বড়ো দাঁত বেরিয়ে গেছে, রক্তে ঢেকে গেছে, দু চোখ। তবে, এখনও বৃকের কালো চামড়ার নীচে হাটটা ধুকধুক করছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কতক্ষণ?

বিস্ফোরণের বিশদ ফলাফল এবার বোঝা যাচ্ছে। মি. বিগের সব জামাকাপড় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। প্রায় উলঙ্গ! হাস্যকর ভাবে গলায় টাইটা বাঁধা রয়ে গেছে। টিকির মতো লাগছে।

একটা ডেউ এসে বিগের চোখের রক্ত খানিকটা ধুয়ে দিল। তাই প্রায় অন্ধ চোখেও দেখার চেষ্টা করল মি. বিগ। বিস্ফারিত চোখ, উন্মাদের মতো সে বন্ডকে দেখতে পেল।

হ্যাঁ, তার পরম শত্রু জেমস বন্ড জীবিত।

বিকৃতমুখ বিগের। কিন্তু সে কোনো সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে না।

হঠাৎ বিগের বিকট আর্তনাদ। হাত দুটো স্থির হয়ে গেল। মাথাটা একবার ডুবে আবার ভেসে উঠল। তার চারপাশ ঘিরে সমুদ্রের জল রক্তে লাল।

এক দল ব্যারাকুডা একসঙ্গে আক্রমণ করেছে তাকে। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিবোতে ছিঁড়তে শুরু করেছে। বাঁ হাতটা একটু ভেসে উঠল। দেখা গেল, কনুই এর কাছ থেকে নীচের অংশটা নেই, ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে।

একজনের চিৎকার শোনা গেল পেছন থেকে।

কিন্তু বন্ড তখন মি. বিগের শোচনীয় মৃত্যুদৃশ্য উপভোগে ব্যস্ত। একটা তীক্ষ্ণ শার্ক এসে টুমারল মি. বিগের বৃকে। এবার তার বিশাল মাথাটা যেন টুপ করে জলে ডুবে গেল, একটা বড়ো নারকোলের মতো, কয়েকটা লাল বৃদবৃদ ভুস্ ভুস্ করে ভেসে উঠল।

একটা লেপার্ড শার্ক, বন্ড এদের চেনে। বই পড়ে অনেক কিছু জেনেছে বন্ড ওই ট্রেনিং-এর সময়। শার্কটার হলদে চোখ এবার বন্ডের দিকে।

মি. বিগের শোচনীয় পরিণতি মন ভরে দেখছিল বন্ড।

হঠাৎ — আঃ!

সলিটেয়ারের অশ্রুট আর্তনাদে তার সংবিত ফেরে। তারপরেই পেছন থেকে আবার সেই চিৎকার গুনতে পেল, কে যেন তাকে ডাকছে। আগেও একবার গুনেছিল। কিন্তু তখন মি. বিগ মরণমুখে। সেই লোভনীয় দৃশ্য ছেড়ে পেছনে তাকায়নি বন্ড।

কোয়ার্লের গলা। একটা ছোটো নৌকা নিয়ে সে কাছে এসে গেছে। পেছনে আরও দু-চারটে নৌকা।

সূর্য বেশ উঁচুতে। তার মানে, বেলা বেড়েছে। উত্তর পূর্ব বায়ু বইছে। ওর নীল জলে, দূরে জ্যামাইকার উপকূল। দুই-ই রোদে ঝলমল করছে।

কেন জানি বন্ডের চোখ অশ্রুসজল।

সাধারণত এমন ঘটে না। বন্ড কখনও কাঁদেনা।

আজ এই মুহূর্তে তার চোখের জলের বিন্দু ঝরে পড়ল সমুদ্রের নোনা জলে।
মৃত্যু ফিরে গেল। এবাবেও।

॥ তেইশ ॥

মকিংবার্ড শুধু ডাকছে না। গান গাইছে।

উড়ন্ত শিকারি পাখির ছায়া। কিন্তু এই আবহাওয়ায় সে বেমানান। তাই বোধহয় বহুদূরে উড়ে গেল।

জলে ঢেউ নেই। ঠান্ডা হাওয়ায় সুগন্ধ।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল সলিটেরার। হাতে ট্রে, ট্রে র উপব ড্রিংকস্।

— ভদকা আব মাটিনি মিশিয়েছি। ঠিক হল কিনা জানিনা।

বন্ডের পরণে পাজামা-কুর্তা। এই মুহূর্তে উপযুক্ত পোশাক নেই বলা যায়। দুর্দান্ত সিক্রেট সার্ভিস-এর লোককে এখন অনেকটা শিশুর মতো দেখাচ্ছে।

— খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়। বন্ড বলল।

ভীষণ চুমু খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আহত হাত-পা আমায় পসু করে দিয়েছে।

একহাতে বন্ডের গলা জড়ালো সলিটেরার। গভীর চুম্বন।

সমুদ্র থেকে নবজীবন লাভের পব এই দ্বিতীয় চুম্বন। ঘাসের ওপর বসে বন্ডের হাঁটুতে মাথা রাখল সলিটেরার। তার কালো চুলে বিলি কাটছে বন্ড।

এব আগে সংজ্ঞাহীন সলিটেরার শরীরটাকে বাথরুমে নিয়ে ভালো করে চান করিয়েছিল বন্ড, তার আহত হাত পা নিয়েই। উলঙ্গ সলিটেরার বহুক্ষণ জলে ভিজেছে, মৃতপ্রায়। প্রবালের আঁচড় আর অন্যান্য ক্ষতে ওষুধ লাগিয়ে তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল। অবশ্য জ্ঞান আসার পর।

তখনই ঘুমন্ত সলিটেরারকে প্রথম চুম্বন করেছিল বন্ড।

দুজনেই বাথটবে একসঙ্গে স্নান করেছিল। আহত শরীর দুজনেরই, তবু তার মধ্যে মজার সান্নিধ্য উপভোগ করতে অসুবিধে হয়নি।

হাসপাতাল থেকে সলিটেরারকে কোয়ার্ট নিয়ে এসেছিল।

স্ট্রেঞ্জওয়েজ জলপুলিশকে খবর দিয়েছিল। ওরা সিক্রেটারের ধ্বংসাবশেষ জলের তলা থেকে তুলেছে। প্রায় বিশ ফাদম গভীরে তলিয়ে গিয়েছিল সিক্রেটার।

স্থানীয় প্রেসকে আসল খবরটা এখনও জানানো হয়নি। বিপুল অকস্মাৎ বন্যাব কথা বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিগের পুবো দলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সোনা স্মাগলিং-এব অভিযোগে।

বলা বাস্তব্য, ডুবে যাওয়া সিক্রেটার-এ যাবা ছিল, তাদের কেউই বাঁচেনি। জেলেরা নাকি সেই খানকার জল থেকে একটন মবা মাছ উঠিয়েছিল। এদিকে জোব গুজব রটেছে, জ্যামাইকায় গুপ্তধনের ভাণ্ডারের শোঁজ পাওয়া গেছে। সেই ব্লাডি মরগ্যান-এর রক্তভাণ্ডার। অনেকেই লোভ হয়েছে সেখানে যেতে, কিন্তু সাহস হয়নি।

স্ট্রেঞ্জওয়েজ কিংসটন থেকে ফিরেছে। তার আগে বন্ড ও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে।

M টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, ‘অভিনন্দন গ্রহণ করো। পনেবো দিনেব ছুটি দেওয়া হয়েছে। বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হও। তুমি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে গুপ্তধনের রক্তবাজিব ওপব তোমার দাবি এবং অধিকার নিয়ে দবখাস্ত করেছ। আমরা এখানে তোমার জন্য এবং আমাদের জন্য উর্কিল ঠিক করেছি। যা পেয়েছ তাই নিয়ে চলে এসো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।’

বন্দ বলল --- ওঃ, হতভাগা বুড়োটা একটা চশমখোর। টাকার লোভে সারাজীবন ট্রেজারির সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে কাটিয়ে দিল।

স্ট্রেঞ্জওয়েজ বলল — হাজার হলেও লোকটা আমেরিকান নাগরিক। ইংল্যান্ডের যেমন রাজা আছে, তেমনি আমেরিকান কর্তৃপক্ষ তাদের শেয়ার চাইবে। সুতরাং বহু ঝামেলা বাকি আছে।

স্ট্রেঞ্জওয়েজ চলে গেল।

বন্দ ধীরে ধীরে গিয়ে বাগানে একটা বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। ওঃ গুপ্তধনের পেছনে ছোট্টাছুটির পরিণতি কী হল... এবং কী হতে পারতো। মি. বিগ মৃত, অর্থাৎ পরিণতি যা হয়েছে। বন্দ আহত কিন্তু বেঁচে আছে। তারও মৃত্যু হতে পারত।

এখন বাগানে ফুল ফুটছে, কোলের ওপর সলিটের-এর মাথা, কোঁকড়া কালো চুল, এ-ও একটা ফুল, যেন নতুন করে ফুটছে।

রান্নাঘরে খাবার তৈরি হচ্ছে। নতুন কুক এসেছে। স্ট্রেঞ্জওয়েজ এক বাস্ক স্যাম্পন রেখে গেছে।

বন্দ বুঝল, জীবনে কত আনন্দ আছে, এই আনন্দগুলো হয়তো হাতছাড়া হত।

সলিটেরের নগ্ন দেহ জড়িয়ে ধরে যখন জলের ওপর ভেসেছে ওরা, তখন তার সুন্দর দেহের আকর্ষণ খেয়াল করা যায়নি। কারণ দশদিক থেকে মৃত্যুর হাত এগিয়ে আসছিল। যে কোনো মুহূর্তে ওরা দুজনেই শার্কে'র পেটে চলে যেতে পারত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আহত ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে ওরা বেঁচে গেছে।

তাই এখন মনে হচ্ছে, জীবন কত সুন্দর। এই সূর্যকিরণে ছেয়ে যাওয়া দিনের আলোর মতোই উজ্জ্বল।

চোখ বুজে কল্পনা করতে লাগল বন্দ — হাতে আরও চোদ্দোটা দিন আছে। একটু পরে ওরা দুজনে একত্র লাঞ্চ সারবে। শরীর যতই আহত হোক, শেষ দুপুরটা কাটবে বিছানায়। বেশ সুন্দর এই কটেজটা আরও সুন্দর স্নিগ্ধ ঠান্ডা শয়নকক্ষ! আরও আরামের সাদা চাদর পাতা শয্যা যেখানে ভালোবাসার অতল জলের আহ্বান। সেইখানেই বসনমুক্ত নগ্ন সলিটেরের রূপ সৌন্দর্যকে মুগ্ধ হয়ে দেখার সময় পাবে বন্দ। তার ঠোঁটে যতখুশি চুম্বন করতে পারবে। আহত হাতেই তার দুই স্তন আদরে আদরে মথিত করতে পারবে। সেই হাত নিয়ে যাবে আরও নীচে তলপেটের গভীরে। নিম্নাঙ্গের আমন্ত্রণে সাড়া দেবে তার হাত এবং বলা বাহুল্য বলিষ্ঠ উপযুক্ত অঙ্গ।

আদরে মথিত সলিটেরকে উপড় করতে গিয়েই চমকে ওঠে বন্দ। অজস্র আঘাতে বহু ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে ওর ফর্সা পিঠে। এখানে হাত বুলানোও বিপদজনক! যন্ত্রণার সৃষ্টি হতে পারে। তবু নিরাপদ জয়গায় ঠোঁট ছোঁয়াল বন্দ।

সলিটের বলল — ভালো লাগছে। কিন্তু সাবধান।

চমকে উঠল বন্দ — কীসের সাবধান!

-- আরে আমার পিঠটা তো আগে সারাতে হবে মশাই! তারপর যত খুশি আদর করো।

ক্যাসিনো রয়্যাল

॥ এক ॥

সারারাত ধরে জুয়া খেলা চলেছে। এই ক্যাসিনোতে। এখন ভোর তিনটে।

জেমস বন্ড এখন নিদারুণ ক্লান্ত। ক্লান্তি তার দেহে ও মনে, তাই পৃথিবীর সেরা ডিটেকটিভ হয়েও যার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, তার পক্ষেও এখন ভুলভালি হবার উপক্রম। এই খেলাটার মধ্যেই এমনকিছু আছে, যা নেশা ধরিয়ে দেয়।

বন্ড, জেমস বন্ড, আধুনিক পৃথিবীতে এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, সবচেয়ে নামজাদা সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। দেশে দেশে তার কারবার। এর সাথে সাধারণ ডিটেকটিভদের তুলনা হয় না।

রুলেত—এর টেবিল ছেড়ে সে চুপিচুপি উঠে গেল। ঘরের বাইরে গিয়ে পিতলের রেলিং—এর কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। ল্য শিফ একটানা জিতেছে তার টেবিলের সামনে একগাদা পিতলের চাকতি— এক একটা এক লাখের। বাঁ দিকে হলুদ চাকতিগুলোর প্রত্যেকটার মানে পাঁচ লাখ ফ্রাঁ।

ক্যাশ কাউন্টার উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা। টুলে বসা ক্যাশিয়ার যেন এক সতর্ক ব্যাংক কেরানি। তার সামনে এবং দুপাশে সাজিয়ে রাখা থাকে গোল চাকতি আর করকরে নোটের বান্ডিল। কারুর সাধ্য নেই ক্যাশ কাউন্টারের রেলিং উপক্কে ঢোকে অথবা বেরিয়ে আসে। দুজন ক্যাশিয়ার। ক্যাসিনো থেকে টাকা হতাবার ব্যাপারটা অসম্ভব।

বন্ড কিছু নোটের বান্ডিল নিচ্ছিল— দশ হাজার এবং এক লাখ ফ্রাঁ-র নোটের বান্ডিল। তার মনে তখন আর একটা চিন্তা— কাল সকালে ক্যাসিনো কমিটির মিটিং। অবশ্য এটা প্রাত্যহিক ব্যাপার।

আজকের ফলাফল ঘোষণা হচ্ছে। মঁসিয়ে ল্য শিফ পেয়েছেন দু লাখ, একইভাবে নিজস্ব স্টাইলে খেলেন তিনি। মিস ফেয়ারচাইল্ড একঘন্টার মধ্যে দশ লাখ জিতে চলে গেছেন। ভাইকাউন্ট দ্য ভিলোরাঁ জিতেছেন দশ লাখ। বহু ঝুঁকি নিয়ে খেলেছেন তিনি। কিন্তু ভাগ্য সহায়। তাই শেষ পর্যন্ত ভালোই লাভ করেছেন। এরপর ওই ইংলিশ জেন্টলম্যানকে লক্ষ করতে হয়— মিস্টার বন্ড। আশ্চর্য এই, তিনি জিতেছেন তিরিশ লাখ। দু'দিনের মধ্যে এতখানি জয় সোজা কথা নয়। শেফ দ্য পার্টি বিশদ বিবরণ নোট করেছে। লোকটার স্বভাব এবং চালচলন লক্ষণীয়— বরাবর চড়া দরে বাজি ধরে। সুদৃঢ় নার্ভ এবং ভাগ্যও আশ্চর্য রকমের ভালো।

ঘোষণা শেষ। সভাও শেষ। সৌজন্য বিনিময় চলছে।

বন্ড সুইং ডোর ঠেলে বাইরে এল। সামনেই একজন সুটেড-বুটেড লোক, সে মাথা নোয়াল বটে, যেন বিরক্ত চেপে। এর কাজটা খুব দায়িত্বপূর্ণ— গোলমাল দেখলেই পা দিয়ে ইলেকট্রিক সুইচ টিপে দেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ভিতরের কেউ বেরোতে পারে না, উটকো লোক ঢুকতে পারে না।

এরপর ক্যাসিনো কমিটি খেতে যাবে— কেউ বাড়িতে, কেউ কাফেতে।

বন্ডের ভাবভঙ্গি অবশ্য রহস্যজনক কিন্তু ক্যাশ লুঠ করবার কোনো ইচ্ছে ছিল না তার। বরং ব্যাপারটা কল্পনা করে তার মজা লাগছিল। হ্যাঁ, যদি ক্যাশ লুঠ করতেই হয়, তাহলে এক ডজন

শক্তিমানের দরকাব, যাবা সহজেই দু'চারটেকে খতম করে দিতে পারবে। অবশ্য এতেও ঝুঁকি আছে-- এরাই আবার পরস্পরকে ধরিয়ে দেবে।

ফ্রান্সের অপরাধ জগতের চরিত্র মোটামুটি ভালোই বুঝেছে বন্দ।

ক্লোক রুম। এখানে এক হাজার ফ্রাঁ দিতে হল। নীচে নেমে গেল বন্দ। একটা 'জির্নিস' বোঝা যাচ্ছে, কাশ লুঠেব চিন্তাটা ত্যাগ করাই উচিত।

অতঃপর কী! বন্দ ভাবতে গিয়ে একছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তার চোখ জ্বলছে, দম নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। অবশ্য এখন বাইরে এসে রাতের হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়াটা সহজ হল। সাধারণ অনুভূতিগুলো সাথে সাথে মস্তিষ্ক আবার কাজ শুরু করল।

হোটেল স্প্রেন্ডিড! ঘরে ঢুকে আগে দেখতে হবে, অনুপস্থিতিতে কেউ ঢুকেছিল কিনা।

কেয়ারটেকার চাবি ও টেলিগ্রাম দিল।

বন্ডের রুম নং ৪৫। টেলিগ্রাম এসেছে জ্যামাইকা থেকে।

'.....কিংস্টোন, জ্যামাইকা.... বন্দ স্প্রেন্ডিড রয়্যাল লেজো। খারাপ মাল তৈরি হয়েছে, সব হাভানা সিগারের ফ্যাক্টরিতে, ১৯১৫....এক কোটি রিপিট এক কোটি স্টপ.... আশা করি এই টাকায় কাজ হবে... শুভেচ্ছা.... দাসিলভা....'

বন্দ বুঝল, এক কোটি ফ্রাঁ তাকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু লন্ডনে হেড কোয়ার্টারের কাছে তার দাবি ছিল আরও বেশি। কাল বিকেলে প্যারিস থেকে লন্ডনে ক্রিমেন্টসের কাছে যে বার্তা পাঠানো হয়, তাব উত্তরেই এই টেলিগ্রাম এসেছে। ক্রিমেন্টস বন্ডের ডিপার্টমেন্টের চিফ। তিনি যার সাহায্য চাইছেন তাব সাংকেতিক নাম 'এম'। 'এম' এব সাহায্যে ট্রেজারিকে প্রভাবিত কক্ষা গেছে।

জ্যামাইকা বন্ডের কাছে নতুন নয়। কিন্তু এখন তাকে নতুন ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। তাব ছদ্মভূমিকা অনুযায়ী সে এখন মেসার্স কাফারি নামে জ্যামাইকার সবচেয়ে বড়ো কোম্পানির এক জাঁদরেল ক্লায়েন্ট। মেসার্স কাফারির আঙ্গদানি-রপ্তানির ব্যবসা। সমস্ত নির্দেশ আসছে জ্যামাইকা থেকে। নির্দেশদাতা খবরের কাগজের লোক, সংবাদপত্রটির নাম 'ডেইলি প্লিনার', তার নির্দেশদাতাব নাম ফসেট।

কে এই ফসেট? একসময় কেমন আইল্যান্ডে একটি কোম্পানির অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজ করত। কোম্পানির কাজ ছিল কচ্ছপ ধরা। পরে যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে নাম লেখায় সে। এবং শেষ পর্যন্ত মাস্টায় নেভির গোয়েন্দা দপ্তরে কেরানির কাজ পায়। যুদ্ধশেষে সিক্রেট সার্ভিসের নজর পড়ে তার দিকে। ক্যারিবিয়ান শাখায় ফসেট ফটোগ্রাফির কাজ শেখে। এবপর এক বড়ো ব্যক্তির সাহায্যে ডেইলি প্লিনারে চাকরি পায়। প্রধানত ফটোগ্রাফ বাছাইয়ের কাজ।

মাঝে মাঝে অজানা লোকের কাছ থেকে টেলিফোনে আদেশ পেত সে। এবং সেই আদেশ ঠিকমতো সমর্থমাফিক পালন করতে হত। পুরো ব্যাপারটাই ছিল টপ সিক্রেট। এব জন্য সে মাসে অতিবিক্ত কুড়ি পাউন্ড পেত। ব্যাংকে জমা পড়ত টাকা; সবাই জানত তার এক 'আত্মীয়' ইংল্যান্ড থেকে টাকা পাঠাচ্ছে।

ফসেটের বর্তমানে ব কাজ এই অজানা ব্যক্তিব নির্দেশগুলো ঠিকমতো বন্ডকে জানিয়ে দেওয়া। কেন, ফসেটের মাধ্যমে কেন? কারণ, ফসেটকে জ্যামাইকায় পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট কোনো সন্দেহ করবে না। তাছাড়া সে এখন ম্যারিটাইম বেস এন্ড ফোতো এজেন্সিব সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করে। ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে কিছু বিশেষ সুযোগ পায়। ফলে উপরি টাকা মাসিক আরও দশ পাউন্ড।

উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে করতে একটা গাড়ি বুক করে বসল সে। অফিসেও একটা সবুজ

রঙের আই-শেড চোখে লাগিয়ে ডেক্সে বসে কাজ করত। এমন একটা ব্যক্তি হইতেন কবল যে, সবাই তাকে মান্য করতে বাধ্য।

বন্দ ভাবছে-- এটাই ভালো, মানে এই ঘুরপথে নির্দেশ আসা। হয়তো এই শহরে সিংক্রেন্ট সার্ভিসের আরও লোক আছে। রিজেন্ট পার্কের হেড কোয়ার্টার থেকে ফন্দিফিকিব হাটতে-- অর্থাৎ মাত্র ১৫০ মাইল দূর থেকে। তাছাড়া কিংস্টোনে বসে একবারে গাড়ি কেনা সহজ হবে না লন্ডন থেকে প্রশ্ন উঠবে।

বন্দ টেলিগ্রামের উত্তর দিল - 'খন্যবাদ.. এই দিয়েই কাজ হবে... বন্দ'।

টেলিগ্রামটা আব কে করে ফেলেছে কে জানে! কেউ হয়তো কপি করে নিয়েছে। কেয়ারটেকারকে ঘুস দেওয়া সোজা ব্যাপাব।

ওড নাইট!

বন্দ লিফটে উঠতে গিয়ে থেমে গেল। না, লিফটে সে উঠবে না। লিফটে সবসময় সিগন্যাল ফিচ করা থাকে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠাই ভালো। ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বন্দ 'এম'-কে পাঠানো খবরটার কথাই চিন্তা করছিল। এটা বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। জুরা খেলতে গিয়ে সে শিখেছে, অল্প মূলধন নিয়ে কাজে নামা ঠিক নয়। যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। তাছাড়া 'এম'-এর বেশি টাকা দিতও না।

হঠাৎ কী ভেবে এক নিমেষে আলো জ্বলে দবজা খুলল। বলাবাহুল্য তাব হাতে এখন উদ্যত রিভলবার। ঘর অবশ্য খালি... কিন্তু একী! বাথরুমের দরজাটা অর্ধেক খোলা! কিন্তু সেটাও বড়ো ব্যাপাব নয়। রুমের দবজা ভিতর থেকে লক করে দিল বন্দ। টেলিলের কাছে এসে মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখল! আসলে দু এক গাছি চুল টেলিলের ড্রয়ারে আটকে রেখেছিল সে। দেখল, সেগুলো ঠিকই আছে। আলমারির কাচের হাতলেব ওপর পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছিল। না, কারো হাতের ছাপ নেই সেখানে। বাথরুমের রিজার্ভারে জলের লেভেলে একটা আঁচড় দিয়ে মার্কা কবে রাখা হয়েছিল। জল ঠিক লেভেলেই আছে।

সিংক্রেন্ট সার্ভিসের লোকেরা জানে-- এরকম ছোটোখাটো কাজগুলো করতে হয়। আত্মরক্ষার জন্য, সাবধানতাব জন্য। প্রতি পদে বিপদ। হাঁ করে ওৎ পেতে বয়েছে। সবসময় মৃত্যুর পাশে পাশে তাদের জীবন কাটে। এদের সঙ্গে তুলনা করা যায় গভীর জলের ডুবুবি বা টেস্ট পাইলটের জীবনের। সবসময় মৃত্যু নিয়ে খেলা-- এটাই কাজ। এটাই জীবিকা।

যাই হোক, এখন বোঝা যাচ্ছে, এই ঘরে কেউ ঢোকে নি। আপাতত নিশ্চিত মনে মান সারল বন্দ। তারপর টাকার হিসেব শেষ হল। নোটবুকে কয়েকটা সংখ্যা টুকতে হল। হ্যাঁ ঠিকই-- দু দিনেব জিত তিবিশ লাখ। লন্ডনে সে পায এক কোটি, চাওয়া হয়েছিল আরও এক কোটি। টেলিগ্রাম বলছে সেটা আসছে। সুতরাং, আপাতত সংখ্যাটা দাঁড়াচ্ছে -- দু'কোটি তিরিশ লাখ ফ্রাঁ-- মানে তেইশ হাজার পাউন্ড।

সিগারেট ধরাল বন্দ। এই নিয়ে আজ সাবাদিনে সম্ভরটা সিগারেট খরচ হল। আলো নিভিয়ে জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর বালিশের তলায় নোটের বান্ডিল এবং ৩৮ কোন্ট পুলিশ পর্জিটিভ রিভলভারটা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ দুই ॥

দু'সপ্তাহ কেটে গেল।

হঠাৎ, 'এম' এর কাছে পৌঁছে গেল ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা দপ্তরের চিঠি। বিভাগীয় প্রধান লিখেছেন (বার্তার স্টাইলে) .

.... টু 'এম'

ফ্রম দা চিফ অব দা ডিফেন্স মিনিষ্ট্রি,

ইংল্যান্ড,

বিষয় : মিসিয় ল্য শিফকে ধ্বংসের পরিকল্পনা। (ল্য শিফ দা নামবার, হের নামবার, হির জিফার....)। ল্য শিফ শত্রুদলের চিফ এজেন্ট, ফ্রান্সে। আলসেস-এর শিল্পাঞ্চলে কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে গোপনে অর্থ দেয়। এই ট্রেড ইউনিয়ন যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের হয়ে স্পাইং করতে পারে— এটা আমরা জানি। বার্তায় আরও জানানো হয়েছে, আমাদের অনুমান ল্য শিফ আগুন নিয়ে খেলছে। স্মার্স এবং গুগুচর সংস্থা তবে সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। এদের সোভিয়েট রাশিয়ার উপযুক্ত এজেন্ট বলা যায়। কিন্তু তাদের কতগুলো নীতিগত দুর্বলতা রয়ে গেছে, সেটা আমরা জেনেছি। ল্য শিফের একজন বান্ধবী আছে (নং ১৮৬০), সে আমাদেরই লোক। স্টেশন 'এফ' থেকে নির্দেশ পেয়ে সে ল্য শিফ সম্পর্কে অনেক ব্যক্তিগত ঘটনা আমাদের জানিয়েছে।

.... এখন ল্য শিফের চরম আর্থিক সংকট চলছে। নং ১৮৬০ জানিয়েছে, ল্য শিফ গয়না বিক্রি করেছে, অ্যান্টিবেসের বাড়িটাও বিক্রি করেছে। আগে সে যথেষ্ট খরচ করত, কিন্তু এখন ব্যয়বাহুল্য সংযত করেছে। এই কেস-এ আমাদের সাহায্য করছেন দোয়াজিয়েম ব্যুরো।

তাছাড়া ১৯৪৬-এর জানুয়ারিতে ল্য শিফ কতগুলি খারাপ ব্যবসার মালিক হয়ে ওঠে। কর্ডন জুন নামে পরিচিত এই সংস্থার অনেকগুলো ব্রাঞ্চ আছে নর্মান ডি এবং ব্রিটানিতে। এই আপত্তিকর সংস্থাটি কেনার জন্য সে পাঁচকোটি ফ্রাঁ ব্যয় করে। লেনিনগ্রাড থেকে ফ্রান্সের ট্রেড ইউনিয়নকে যে টাকা দেওয়া হত ল্য শিফের মাধ্যমে, সেই টাকা এই খারাপ ব্যবসায় লাগিয়ে সে বিরাট বোকামি করেছে। যদি টাকা খাটিয়ে ইউনিয়নের সম্পত্তি বাড়ানো তার উদ্দেশ্য হত, সেদিক থেকে অবশ্য এই খারাপ ব্যবসাই ভালো ছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি, এবং সেইসঙ্গে নিন্দনীয় আত্মতৃপ্তি। ফলে যা হবার তাই হল।

তিন মাসের মধ্যে, ১৩ই এপ্রিল ফ্রান্সে একটি নতুন আইন পাস হল....

'এম'-কে এই বার্তাটা ফরাসিতে লেখা হয়েছে।

— হুম....

ইনটারকমের সুইচ টিপে বললেন— হেড অফ এস্?

— ইয়েস!

— একটা শব্দের মানে জিজ্ঞেস করছি।

শব্দটা বলার পর উত্তর এল— এর মানে হচ্ছে দালালি।

— তাহলে, ইংরেজিতে লেখাই ঠিক হতো। অহেতুক ভাষাজ্ঞান....

— সরি স্যার।

'এম' আবার লেখাটা পড়তে শুরু করলেন।

লেখাটা এই : সুতরাং সমস্ত আপত্তিকর সংস্থাগুলো, খারাপ ভাষায় লেখা বই, নারীর মর্ষাদা নিয়ে ব্যবসাগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হল 'ল্য শিফ'-এর অবস্থা সঙ্গীন। তবু সে তার অসৎ, অসাধু পথে চলতে থাকল। কিছু খারাপ ছবির ব্যবসাও চালাবার চেষ্টা করল। চলল না। এবার সব কিছু বেচে দিয়ে সে একটা মোটা টাকা জোগাড়ের ধান্দা করল। কিন্তু পুলিশ সতর্ক ছিল, তার সমস্ত আপত্তিকর ব্যবসা কেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে গেল।

.... পুলিশ তাকে চিনত অসাধু, অস্বীল বিষয়ের ব্যবসায়ী বলে। দোয়াজিয়েম ব্যুরোতে রচিত তার ফাইলটি বের করে আরো 'বিশদ খবর পাওয়া গেল। সুতরাং আমরা এবং ফরাসি বন্ধুরা

জোর কদমে এগোতে থাকি। এতে কাজ দেয়। জানা যায়, ল্য শিফেব অবস্থা এখন কাহিল। সবই বন্ধ হয়ে গেছে। এমন কি তার কাছে জমা থাকা ইউনিয়নের ফান্ডেও পাঁচ কোটি ফ্রাঁ কম দেনা যাচ্ছে।

.... কিন্তু এখনও লেনিনগ্রাড যথেষ্ট সতর্ক হয়নি। হয়তো স্মার্স কিছুটা সন্দেহ করছে। 'পি' স্টেশন থেকে জানা গেছে, এক সোভিয়েট সংস্থা থেকে একজনকে পাঠানো হয়েছে। সে ওয়ারশ, পূর্ব বার্লিন হয়ে স্ট্রাসবার্গ যাবে। একজন ডাবল এজেন্টও আছে।

.... সুতরাং ল্য শিফ-এর পালানো বা আত্মহত্যা ছাড়া পথ নেই। সে টাকা উদ্ধারে মরিয়ান, কিন্তু তার প্রাণহানির সম্ভাবনা সে বোধহয় টের পায়নি। আমরা উলটো চল চলছি।

ল্য শিফ জুয়ার আড্ডা বসাচ্ছে। অন্য বে-আইনি ব্যবসায়ের এত টাকা তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে না। রেস খেলেও হবেনা।

.... ইউনিয়নের ফান্ড থেকে সে লুকিয়ে বাকি দু'কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঁ নিয়ে নিয়েছে, কিন্তু তহবিল নিঃশেষিত। দু'গুণ পরে সে উত্তরে রয়্যাল লিজোর বাংলাতে যাবে।

... তাই রয়্যাল ক্যাসিনোতো টাকার খেলা জমবে। গ্রীষ্মের সিজনে এখানে বহু ধনীরা আসবে। ল্য শিফের আশা তখন প্রায় পাঁচ কোটি ফ্রাঁ লাভ হতে পারে। ১৫ জুনের মধ্যে।

... এবং সংক্ষেপে আমাদের পবিকল্পনা এই . শুধু সোভিয়েট নয়, উত্তর আটল্যান্টিক চুক্তিভুক্ত সব দেশকেই পর্যুদস্ত কবতে হবে। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের সম্মান তো যাবেই। এদের গুপ্তচর ও অন্যান্য সদস্য মিলে সংখ্যাটা কম নয়— প্রায় ৫০,০০০। ল্য শিফকে খুন করে লাভ নেই, ববং জুয়ার টেবিলে তাকে পথের ভিখারি বানানোই কাজ দেবে। সিক্রেট সার্ভিসের দক্ষ জুয়াড়িদের নিয়োগ কবছি। যদি কাউকে না পাঠানো হয়, তবে সব কাগজপত্র সি আই.এ-র বা দোয়াজিয়েম ব্যুরো-ব হাতে তুলে দেওয়া হবে। স্বা. এস। অ্যাপেন্ডিক্স 'এ' নাম . ল্য শিফ। ছদ্মনাম..... ইত্যাদি, যেমন 'হের জিফাব'। কেস হিষ্টি— অতীতের . জানা নেই। তবু গুজব আছে যে, ১৯৪৫-এ সে ছিল মার্কিনীদের দখলে উদ্বাস্তু শিবিরে। স্মৃতিভ্রংশ ও পক্ষাঘাতে আক্রান্ত রোগীর ভান করত। জাল পাসপোর্টের নম্বর ছিল ৩০৪ ৫৯৬। সে থেকে সে নিজের নাম ল্য শিফ বলে চালু করে।

বার্তা শেষে তার চেহারার বিবরণ আছে। দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, ওজন ১৮ স্টোন.... ইত্যাদি। অভ্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে— বেশ কিছু বদ-অভ্যাস, নারীঘটিত দুর্বলতা, হাইস্পিডে গাড়ি চালানো, দ্রুত অস্ত্র চালানো ইত্যাদি। জরুরি বিষয় : হ্যাট ব্যান্ড, বাঁ দিকে জুতোর সেলে এবং সিগারেট কেসে তিনটে ধারালো ব্লেড থাকে। ভালো জুয়াড়ি, বডিগার্ড দুজন— একজন ফরাসি, একজন জার্মান। এককথায় বিপজ্জনক রাশিয়ান এজেন্ট। প্যাবিসে পোস্টেড। স্বা. আর্কাইভিস্ট।

অ্যাপেন্ডিক্স 'বি': বিষয় স্মার্স। সংবাদ সূত্র . সি. আই. এ. ইত্যাদি।

'স্মার্স' শব্দটি দুটি রুশ শব্দের মিশ্রণ তৈরি, যার মানে — স্পাইদের হত্যা করো।

সর্বময়কর্তা, বেরিয়ান। হেড কোয়ার্টার : লেনিনগ্রাড। মস্কোতেও শাখা আছে।

এদের পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ : ১৯৪০-এ ট্রেটস্কি হত্যাকাণ্ড এদেরই ছক। এই SMARS হিটলারের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নেয় রাশিয়ার গুপ্তশত্রুদের খতম করার। নানা শাখা নানা কাজ করে— দেশ বিদেশে গুপ্তশত্রুদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ। সক্রিয়কাজ বলতে হত্যাও বোঝায়। আর্থিক পরিচালনা, আইন, বিচার ও দণ্ডদান এদের শাখার নির্দিষ্ট কাজ।

রিপোর্ট বলছে : এ পর্যন্ত আমাদের হাতে মাত্র একজন স্মার্স ধরা পড়েছে। গয়েৎশভ ওরফে গ্যারাড জোন্স ১৯৪৮ সালে ৭ আগস্ট হাইডপার্ক যুগোল্লাভ দূতাবাসের মেডিক্যাল অফিসারকে

গুলি করে হত্যা করে। তদন্ত চলার সময় সে পটাসিয়াম সাইনাইড দিয়ে তৈরি কোটেব বোতাম খেয়ে আত্মহত্যা করে। বহু ব্রিটিশ ডাবল এজেন্ট স্মার্শের হাতে মরেছে।.... সুতরাং আমাদের দিক থেকে এদের মোকাবিলার মধ্যে যে কোনো গলতি না থাকে।..’

রিপোর্ট শেষ।

॥ তিন ॥

‘এস’-বিভাগ মূলত কাজ করে রুশ বিরোধী বিষয়গুলো নিয়ে।

এর প্রধান-এর অফিস বাড়ি রিজেন্ট পার্কে। এখন প্রধান কাজ ল্যা শিফ খতম!

ফাইল হাতে সে এগিয়ে গেল হেড অফ ‘এস’ এর কাছে। ১৯৪৪ সাল থেকে সে এই কাজ করছে। এখনও বেশি বয়েস হয়নি।

‘এম’-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি মিস মানিপেনি সুন্দরী মহিলা। কিন্তু তার চোখ দুটি বরফ দেওয়া মাছের মতো। ভাষাহীন। এস-এর চিফ মিস মানিপেনিকে একটা ফাইল দিয়ে বললেন— তোমার কর্তাকে দিয়ে আমরা এই কাজটা পাশ করে দাও।

— ও. কে. স্যার!

আদেশ এল। এস-এর চিফ এম-এর হেড অব অফিসের চেম্বারে গেলেন। নীল আলো জ্বলে উঠল। অর্থাৎ জরুরি কথা হচ্ছে। এখন যেন কেউ এই ঘরে না ঢোকে।

একটু পবে কথাবার্তায় বোঝা গেল হেড অব এস বেশ খুশি। ল্যা শিফকে শায়েষ্ট্রা করার জন্য আমাদের হাতে একজন যথেষ্ট যোগ্য লোক আছে।

— কে?

— ০০-দের কেউ হবে মনে হয়। খুব সম্ভব ০০৭। মন্টিকার্লোতে জুয়ার আড্ডায় ভালো কাজের রেকর্ড আছে। ০০৭ আর দোরাজিয়েন বুরো মিলে ওদের ‘ফিনিশ’ করে দিয়েছিল। লাভ হয়েছিল দশলক্ষ ফ্রাঁ! মন্দ নয়!

বন্ডকে হেড অফ এস-এর রিপোর্টটা পড়তে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জানলা দিয়ে গাছের মাথাগুলো দেখল বন্ড। তারপর এম-এর ঘরে ঢুকে গেল।

— কাম ইন!

-- থ্যাংক ইউ স্যার ফর দ্য জব! তবে জেতা নিশ্চিত কিনা বলা মুশকিল। চড়া বাজি, প্রথমেই পাঁচলাখ ফ্রাঁ লাগবে।

— টাকার অভাব হবে না। তাছাড়া, ওরাও হারতে পারে। আড়াই কোটি পাবে তুমি, প্রথমে এককোটি নাও। আশাকরি, পঞ্চাশ লাখ নিজেই খেলে রোজগার করতে পারবে। ... আমরা ইচ্ছে, কয়েকদিন আগে থাকতেই যাও। দোরাজিয়েম বুরোকে বলব - ম্যাথুসকে পাঠাতে। তোমার সঙ্গে ওর বোঝাপড়া ভালো; NATO-র স্বার্থজড়িত। ফনটেন ব্লোতে সি. আই.এ-কে পাবে। আর কী চাই?

— ও. কে. স্যার। থ্যাংক ইউ।

-- গুড লাক। . আচ্ছা, আরও দুজন লোক দেব। ক্যাসিনো রয়্যালো ওরা তোমাকে কনট্রাক্ট করবে। দক্ষ লোক।

বন্ড একাই কাজ করতে ভালোবাসে। তবু যখন দিচ্ছে, দিক।

ঘুমের মধ্যে হোটেল স্প্লেনডিডের বিছানায় গুয়ে এসব কথা ভাবছিল বন্ড।

রয়্যাল লেজোতে সে দুদিন আগে এসেছে।

এখন লাঞ্চ টাইম। রেজিস্টারের সই করেছিল— ‘জেমস বন্ড, পোর্ট মারিয়া, জ্যামাইকা’ অর্থাৎ পরিচয় গোপন করে নি। এম-ও পরিচয় গোপন রাখতে বলে নি। শুধু বলেছিল— যখন তুমি খেলার টেবিলে ল্যা শিফকে চ্যালেঞ্জ করবে তখন অনেকেই বুঝে যাবে।

কথাটা সত্যি।

তবু জ্যামাইকা সম্পর্কে একটু স্টাডি দরকার, দু-একজনদের সঙ্গে আলাপ থাকলে ভালো। নিজের পরিচয় হিসাবে সে অপরাধের কাছে জ্যামাইকাবাসী এক ধনী বাগান মালিকের পুত্র, তামাক ও চিনির ব্যবসায় প্রভূত আয় হয়েছে তার।

ইতিমধ্যে দুটি রাত ক্যাসিনোতে কেটেছে। তিরিশ লাখ ফ্রাঁ লাভ হয়েছে। ল্যা শিফকে ভালো করে দেখেছে। লোকটা দক্ষ এবং খুবই সৌভাগ্যবান।

আজকের দিনটা উজ্জ্বল। ন্নান সেরে অরেঞ্জ জুস খেতে খেতে লেখার টেবিলে বসল বন্ড। ডিম, বেকন এবং একটু পরে কড়া কফি খেয়ে সিগারেট ধরাল। বলকান ও টার্কিশ তামাকের মিশ্রণ এই সিগারেটে।

নীচ থেকে টেলিফোন। ওর অর্ডার দেওয়া বেডিং সেটটা এসেছে।

-- পাঠিয়ে দিন।

বন্ড ভাবল— এখনি ম্যাথুস এলে ভালো হয়। ঠিক কথা, ম্যাথুসই।

ম্যাথুস বলল-- মঁসিয়ে, এই আপনার সুপারহিট রেডিও। ইউরোপের সবকটা রাজধানী ধরতে পারবেন।

— ফাইন!

— সাড়ে এগারোটা বাজে। রেডিও সেটটা একটু টেস্ট করা ভালো।

পুরো ভল্যুমে রেডিও ছাড়া হল, কিন্তু কোনো শব্দ নেই। অথচ লং ওয়েভের লাল ব্যান্ডে আলো জ্বলছে। একটু পরেই অবশ্য সাউন্ড এল। ম্যাথুস বন্ডের পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল--- টিউন ঠিক ছিলনা, সরি।

চাপড় মেরে আঙুল ঝাঁকাতো লাগল ম্যাথুস। বন্ডের মনে হল যেন ওর আঙুল ভেঙে গেছে। বিছানায় বসে সিগারেট ধরাল ম্যাথুস। বন্ড বলল— এবার খবর বলো।

ম্যাথুস বলতে থাকল— সত্যি এটা আশ্চর্যের ব্যাপার। ওরা কী করে টের পেল! মোটকথা, শত্রু সদলবলে হাজির। তোমার ঘরের উপরে আছেন মুনর্জ্ দম্পতি। লোকটা জার্মান। ওদের ইলেকট্রিক ওভেন আছে। চিমনির মধ্যে দিয়ে তার গেছে ওই ওভেন পর্যন্ত। স্ত্রী অসুস্থ, শয্যাশায়ী। মুনর্জ্ স্ত্রীর সেবায় রত। এখানে ঢুকে আমাদের ধারণা আরো বদ্ধমূল হল।

এবার রেডিও বন্ধ করল ম্যাথুস।

বন্ড বলল— এইরকম একটা সেট আমি জ্যামাইকা নিয়ে যেতে চাইছি।

— আরে দূর! জ্যামাইকার কথা বাদ দাও।

রেডিওতে রোমের মিউজিক বাজছে। বন্ড জিজ্ঞেস করল— আচ্ছা, জ্যামাইকার ব্যাপারটা কি রাশিয়ানরা ধরে ফেলেছে?

-- আরেকটু হলেই ধরে ফেলত। লন্ডন এখন সংকেত বদলেছে। আচ্ছা, এবার কাজের

কথাই বলি। প্রথম পয়েন্ট, মেয়েটা খুব সুন্দরী, রেডিও-র কাজে পাকা। সেলস্-এ আমাকে সাহায্য করে। তবে মেয়েটা মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। বেশ মেজাজি!

— তাহলে এমন মেয়েকে পাঠানো হল কেন? পাগল মেয়েকে—

— আরে, সেই অর্থে তুমিও পাগল! মেয়েটা ভালো কাজ জানে, তোমার কোনো অসুবিধা হবেনা।

— আর কী খবর?

— ল্য শিফ ভিলাতে সবাই উঠেছে। এখান থেকে দশ মাইল দূরে। তিনটে মনুষ্য-জন্তু এসেছে ওখানে। দুটো গার্ড আগে থেকেই ছিল। রাশিয়ান ওদের নানা কাজে লাগায়। বিশেষ করে খুন-খারাপির কাজে। ধরা পড়লে ওদেরই বলির পাঁঠা করে।

— হুঁ, আমার কেসটাও তাই। যাইহোক, তারপর— ?

— আর বিশেষ কোনো খবর নেই।..... তুমি লাঞ্চ সেরে বারে এসো, মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করে নাও। ওকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিও। পারলে ক্যাসিনোতে নিয়ে যেও। আমি আর আমার এক সঙ্গী ফেলিস লিটার একটু আড়ালে থাকব।

ম্যাথুস চলে গেল।

ওর কথা থেকেই বন্দ বুঝে গেল, ম্যাথুস ধরা পড়ে গেছে। ল্য শিফের বিরুদ্ধে নামার আগেই ওকে সরিয়ে দেবে ওরা। রাশিয়ানদের খুন করতে হাত কাঁপেনা। মেয়েটা একটা ঝামেলা। কাজের ক্ষতি হবে বেশি।

॥ পাঁচ ॥

বেলা বারোটা।

বন্দ হোটেল থেকে বেরোল। মিষ্টি বাতাসে যেন ব্যালের মিউজিক। দিনের বেলা সূর্যের উজ্জ্বল আলো।

রয়্যাল-লেজোর প্রথমে ছিল রয়্যাল— জেলেদের গ্রাম। আর লেজো মানে জল। সেকথাটা পরে যুক্ত হয়েছে। এই গ্রামের পিছনে পাহাড়ের জলে হঠাৎ সালফার পাওয়া গিয়েছিল। ফলে লিভারের রোগীদের পক্ষে ভালো — এবং ফ্রান্সে বহুলোক লিভারের রোগে ভোগে। সুতরাং জায়গাটা স্বাস্থ্যকর স্থান বলে পরিচিত হয়ে গেল। কিন্তু জল-বিক্রির ব্যবসা অন্যান্য কোম্পানিব তীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বন্ধ হয়ে গেল। তবে মাছ-ধরা ব্যবসাটা অটুট রইল। তাই মোটামুটিভাবে ট্যুরিস্টের ভিড় রইল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নতুন সাজে সাজল রয়্যাল ক্যাসিনো বিল্ডিংটা। সাদা-সোনালি রং, ভেতরে বৃহৎ ঝাড়লগ্নন সাজানো বাগান। ফোয়ারাগুলোতে আলোর বাহার। ব্যবসা জমানোর জন্য প্রথমে আনা হল মহম্মদ আলি সিডিকেটকে। জুয়া থেকে সান-বাথ সবই আধুনিক! ভালোই কাস্টমার জুটল।

বন্দ এই ইতিহাস-চিন্তা মন থেকে দূর করল।

ল্য শিফের ভিলাটা একবার দেখা ভালো!

বন্ডের গাড়িটা নতুন মডেল। হাইস্পিডে ড্রাইভ করল বন্দ।

কয়েক ঘন্টা পরেই হার্মিটেজ বার। একটা বড়ো জানলার পাশের টেবিলটায় বসল সে। ঐশ্বর্যমণ্ডিত গৃহসজ্জা। মেহগনি, চামড়া আর পেতলের নানা আসবাব, নানা কাজ। পানীয়ের অর্ডার দিয়ে লক্ষ করল, ছেলেরা খাচ্ছে শ্যাম্পেন, মেয়েরা মাটিনি।

ওই তো ম্যাথুস! তাব পাশে একটি মেয়ে। বন্ড ইচ্ছে করে জানলা দিয়ে বাইবে তাকিয়ে বইল।

আবে, মঁসিয়ে বন্ড! আপনি এখানে, একা! কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন নাকি? আসুন, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন মাদমোয়াজেল লিভ। আমার সহকর্মী। আর ইনি মি বন্ড, জ্যামাইকার বড়ো ব্যবসায়ী।

বন্ড বলল— আসুন, আমি একাই রয়েছি।

পানীয়ের অর্ডার দেওয়া হল ওদের জন্য। মেয়েটি বেশ স্মার্ট, কিন্তু বেশি কথা বলছে না। নীল চোখ, চুলে বব্-ছাঁট। চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা ভাব, যেন সব কিছুকে ঠাট্টা করছে। মেয়েটির গলায় সোনার চেন, আঙুলে পোখরাজের আংটি। ঠোঁটে লিপস্টিক। নেলপালিশে রাঙানো নখ। সুন্দব শরীর গঠন। ধূসর রঙের স্কাট ব্লাউজ। কোমরে বেন্ট, স্ট্র হ্যাট পাশের চেয়ারে রেখেছে।

মেয়েটার চেহারা আকর্ষণীয়, কিন্তু ওপর-ওপর একটা শাস্ত ভাব। তাই বন্ডের কৌতূহল বাড়ছিল। এর সঙ্গেই কাজ করতে হবে। সেটা ভেবে মনে একটা অস্বস্তি মেশানো আনন্দ হচ্ছে! হঠাৎ ম্যাথুস উঠে পড়ল।

— দাঁড়াও আমি ডিনারের ব্যবস্থাটা পাকা করে ফেলি। কিন্তু লিভ, সন্কেটা আমি তোমার সঙ্গে থাকছি না।

মেয়েটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

বন্ড বলল— আপনি আজ যদি একা আমার সঙ্গে ডিনারে যোগ দেন তো —

— আপত্তি নেই। তারপর কি আমবা ক্যাসিনোতে যাব? মঁসিয়ে ম্যাথুস বলছিলেন, আপনি প্রায়ই—

— যদি আপনার অসুবিধে না হয়—

— না, না, অসুবিধে কীসের। হয় তো আমি যাওয়াতে আপনার সৌভাগ্য বেড়ে যেতে পারে।

মেয়েটাকে কিছুটা বুঝল বন্ড। কাজের ব্যাপারে সিরিয়াস। কাজের পর গল্প-গুজব করা যায়, বন্ধুত্ব হতে পারে।

ম্যাথুস ফিরে এল। বন্ড একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ছুতো করে উঠে পড়ল। হ্যান্ডশেক করল মেয়েটির সাথে। সেই হাতের স্পর্শে বুঝিয়ে দিল, স্করির কথা আছে। বন্ডের চলে যাবার ভঙ্গিটা লক্ষ করল মেয়েটি।

ম্যাথুস বলল— ও আমার বন্ধু।

মেয়েটি বলল — হঁ্যা। চেহারাটা খুব ভালো। কিন্তু কোথায় যেন একটা নিষ্ঠুরতার ভাব আছে।

হঠাৎ, বানবান, বানবান...

জানলার কাচ গুঁড়ো করে কী যেন এসে পড়ল খবে। অতি আকস্মিক আঘাত। টেবিল, র্যাক, বোতল— সব চুরমার! চাবদিকে আর্তনাদ, চিৎকার, আতঙ্ক, হুলা।

জানলা দিয়ে বাঁপ দেওয়ার আগে ম্যাথুস লিভকে বলল— তুমি এখানেই বসে থাকো, কোথাও যেও না।..

॥ ছয় ॥

তার কিছু আগে বাইরে ফুটপাত ধবে হাঁটছিল বন্ড। দুপাশে গাছের সারি। সূর্যের তাপ, তাই গাছের ছায়া ভালো লাগছিল।

গাছ তলায় দাঁড়ানো লোক দুটোর ভাব দেখলেই সন্দেহ জাগে! ওরা হোটেল স্প্লেনডিড এর মেইন গেট থেকে একশো গজ দূরে, ফিসফিস করে কথা বলছে। পরনে স্যুট, স্ট্র-হ্যাটে কালো ফিফে। দুজনের কাঁধে ক্যামেরা বন্ধ বলছে-- লাল, নীল।

বন্ড যখন ওদের থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, তখন লাল ক্যামেরার কেস যার কাঁধে, সে নীলকে কী যেন বলল। সঙ্গে সঙ্গে লিকট বিস্ফোরণের শব্দ। চারদিকে কম্পন। বন্ড নিজেও ছিটকে পড়ল একটা গাছের তলায়। চিৎ হয়ে পড়ে শুনতে পেল মাটিতে গুমগুম ধ্বনি। আধা-অজ্ঞান অবস্থায় সে টের পেল শূন্যে উড়ছে, গাছের ডাল, চুন-সুরকি, পাথরের টুকরো এবং মানুষের খণ্ড-বিচ্ছিন্ন দেহ। বারুদের গন্ধ, পোড়া কাঠ, পোড়া মাংসের গন্ধ। রাস্তায় গর্ত, দুটো গাছ উপড়ে পড়েছে।

লোকদুটোর পাস্তা নেই। তবে লালরঙের কী একটা রাস্তায় পড়ে আছে।

বন্ড বমি করতে শুরু করল।

সামনে নিয়ে কোনোও মতে গাছটা ধরে উঠে দাঁড়াল। এই গাছটাই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

সামনে ম্যাথুস।

হোটেলের রুমে ঢুকে গুনল চৎ চৎ দমকলের গাড়ির শব্দ। পুলিশ ও অ্যান্ডুলেসের গাড়িও এসে গেছে।

বন্ড রক্তমাখা পোশাক ছাড়ছে। ম্যাথুসের প্রশ্নের উত্তরে সে লোক দুটির চেহারার বর্ণনা দিচ্ছিল।

হঠাৎ টেলিফোনে ম্যাথুস বলল— শোনো, পুলিশকে বলো, যে ইংরেজ ভদ্রলোক, জ্যামাইকা থেকে এসেছে, তাকে নিয়ে বেশি না ভাবলেও চলবে। ওরা বলবে— দুই বুলগেরিয়ানের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব! প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপার। আমি পরে বুঝিয়ে বলব। একজন অন্যজনকে বোমা মেরেছে। তৃতীয় জন এখন ঘুরঘুর করছে। গাই হোক, অপরাধী পালাতে চাইছে। ওকে ধরতে হবে।.... হ্যাঁ, অপরাধী প্যারিসে যাবার চেষ্টা করবে, খেয়াল রেখো।

টেলিফোন রাখল ম্যাথুস। বন্ডকে বলল— ওঃ, ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছ। তোমাকে লক্ষ্য করে বোমা ছুড়ে গাছের আড়ালে লুকাতে চাইছিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অন্যরকম হয়ে গেছে ব্যাপারটা। বুঝতে পারছি— ওরা তোমাকে এখনই খুব গুরুত্ব দিচ্ছে!

এ আবার কেমন কথা!

অপমানিত মুখে ম্যাথুস বলছে— শয়তান বুলগেরিয়ান দুটো পালাল কোথায়? লাল বাস্তের টুকরোটায় কী আছে দেখা দরকার।

বলল— আমি যাই, পুলিশকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হবে।

একা ঘরে বন্ড। চুপচাপ শুয়ে রইল।

খাবার এল। হ্যাঁ, দারুণ খিদে পেয়েছে।

খাবারের প্লেটে হাত দিতে রিং রিং টেলিফোন। রিসিভার তুলতেই ওপারে নারীকণ্ঠ— আমি লিভ বলছি। আপনার কিছু হয়নি তো?

- না, না, আমি ঠিক আছি।

-- যাক। কিন্তু সাবধানে থাকবেন।

বন্ড কিছু বলার আগেই ফোন রেখে দিল সে।

মনে হয়, জুয়া শেষ হতে ভোর হয়ে যাবে।

বন্ড একজনকে ডেকে পাঠিয়েছিল। তার আসার কথা তিনটের সময়। খাবার পর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নিজের কাজের চিন্তায় ডুবেছিল বন্ড।

দরজায় টোকা। লোকটি এসেছে, সুইডিশ।

কিছুক্ষণ ম্যাসেজ করল সে, পা থেকে ঘাড় পর্যন্ত। ম্যাসেজের আরামে ঘুমিয়ে পড়ল বন্ড।

এবার ক্যাসিনো। জুয়াড়ির পেশাগত গুণগুলো চিন্তা করে নিল সে— ধৈর্য, আশা এবং অঙ্কজ্ঞান। বন্ডকে অবশ্য বলা যায়— জন্ম জুয়াড়ি।

তাসের খসখস আওয়াজের মধ্যে একটা মনোমুগ্ধকর ব্যাপার আছে। খেলা চলবে, দামি পানীয় পাওয়া যাবে। শ্যাম্পেন তো থাকবেই। নিজের চেয়ারে বসে সে একাধারে অভিনেতা এবং দর্শক। বেশ ইনটারেস্টিং লাগে ব্যাপারটা। ভাগ্যকে মানুষ চালায়। ভাগ্য মানুষকে নয়। ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন, সংযমী-নিষ্পৃহ থাকতে হবে। বন্ডের সৌভাগ্য, এখনও পর্যন্ত জুয়া তার কোনো ক্ষতি করেনি। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে—

আজকেও বন্ডের মনে আত্মবিশ্বাস অটুট। প্রথমে খেলার ধারাটা লক্ষ করল সে। একটা বল, সেটাকে মার্কামারা জায়গায় ফেলতে হবে।

রিপোর্টে এতক্ষণের খেলার বিবরণ যা লেখা আছে, তাতে তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নজরে এল না। সুতরাং ভেবেচিন্তে খেলা শুরু করল সে। দফায় দফায় এক লাখ ফ্রাঁ জিততে থাকল।

দেখতে দেখতে সংখ্যাটা পৌঁছে গেল দশ লাখ ফ্রাঁতে। অবশ্য যোগ বিয়োগ মিলিয়ে, কারণ ইতিমধ্যে বন্ড একবার চার লাখ ফ্রাঁ হেরেছে। সুতরাং বন্ড এবার আক্রমণাত্মক খেলা শুরু কবল। এবং পরপর জিততে থাকল।

উলটো দিকে বসেছিল এক আমেরিকান। মনে হল, সে বন্ডের হয়ে খুব উৎফুল্ল। বন্ড যে খেলা ছেড়ে উঠল, সে-ও উঠে দাঁড়াল, নিজেই যেচে বন্ডের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল— দারুণ খেলেছেন। চলুন, দু-এক পেগ খাওয়া যাক।

বন্ড অবশ্য নিশ্চিত, এ সি. আই.এ-র লোক। লোকটির নাম ফেলিক্স লিটার।

নানারকম কায়দা করে একটা পানীয়ের অর্ডার দিল লোকটি।

বারম্যানকে ঠিকমতো বোঝাতে তার সময় লাগল।

বন্ড বলল— আমি এখন বেশ ব্যস্ত। সবসময় কাজের চিন্তা রয়েছে। তাই ডিনারের আগে এসব পান করিনা।

এবার পানীয় নিয়ে বন্ড তার নিজের বিদ্যার কিছু নমুনা পেশ করল। বারম্যানকে বলল— পানীয়টা আলুর বদলে অন্য শস্য থেকে নিলে আরও ভালো হত। যাইহোক, খুব ভালো হয়েছে।

লিটার মন্তব্য করল — এটা ককটেল! এবং আজ দুপুরে যা ঘটে গেল, তাকে বলা যায় মলোটভ ককটেল।

বন্ড জিজ্ঞেস করল -- ব্যাপারটা কী হয়েছিল বলে আপনার মনে হয় ?

— কেউ বলছে, কম্যুনিস্টদের অন্তর্কলহ। কেউ বলছে। গ্যাসের শেল ফেটেছে। সৌভাগ্যের কথা, আপনি বেঁচে গেছেন।

— তা বলতে পারেন।

— দেখুন। আমরা এই কেসটাতে ইনটারেস্টেড। ওয়াশিংটন চাইছে, আমরা টেক্-আপ করি, কিন্তু আপনি তো লন্ডনের নির্দেশে কাজে নেমে পড়েছেন। তাইনা?

— তাতো বটেই।

— তবু বলছি। আমরা আপনার পাশে আছি। যখন যা প্রয়োজন হবে বিনা দ্বিধায় বলতে পারেন।

— হুঁ! ল্য শিফ এখন বেপরোয়া। স্বাভাবিক। তবে এই মুহূর্তে আমরা তেমন কিছু বলতে পারছি না। তবে আজ রাতে ক্যাসিনোতে আমার কাছাকাছি থাকবেন। আমার সহকারী মিস লিন্ডকে একটু দেখবেন। তাছাড়া, ল্য শিফের বডিগার্ড দুটোর ওপর নজর রাখলে ভালো হয়।

— মেরিন কোর কাকে বলে জানেন?

— জানি।

— আমি আগে ওখানে কাজ করেছি। সুতরাং আমাকে আপনার কাজে লাগবে মনে হয়।

জানা গেল, লিটার টেক্সাসে থাকে। ন্যাটোর জয়েন্ট ইনটেলিজেন্স-এ কাজ করত একসময়ে। বয়েস পঁয়ত্রিশ, লম্বা-পাতলা চেহারা। আস্তে কথা বলে, কিন্তু যথেষ্ট দৈহিক শক্তি আছে বোঝা যায়। ওর সঙ্গে মুনজদের সম্পর্কে কিছু কথা হল। তাছাড়া ল্য শিফের ভিলার কথাও উঠল।

সাড়ে সাতটা। ওরা হেঁটে হোটেল পর্যন্ত যাবে।

বেরোবার আগে বন্ড সব টাকা— দুকোটি চার লক্ষ ফ্রাঁ— ক্যাশিয়ারের কাছে রেখে দিল। কয়েকটা দশ হাজারের নোট সঙ্গে রইল।

রাস্তায় বোমাবিধ্বস্ত জায়গাটায় মেরামতের কাজ চলেছে। উপড়ে-যাওয়া গাছ দুটো সবানো হয়েছে। হার্মিটেজের সামনের দিকটাও সারানো হয়ে গেছে।

রয়্যাল লিজো আবার স্বাভাবিক চেহারা ফিরে পেয়েছে।

লিটার জিঞ্জেরস করল কেয়ারটেকারট্যাকে— আপনার কেমন মনে হয়?

বন্ডকে ম্যাথুস বলেছিল, সব কেয়ারটেকার টাকা খায়। সমাদরটা ওদের কৃত্রিম ব্যবহার। তবু এই নিয়ে বিশেষ কথা হল না। আবার আসল রূপ প্রকাশ পাবে খেলার সময়।

ক্যাসিনোতে পরের রাউন্ড খেলা এগারোটায়।

॥ আট ॥

নিজের ঘরে এসে আবার সাবধানী পর্যবেক্ষণ সারল বন্ড। তারপরে যথারীতি শাওয়ারবাথ, এবং শয্যায় টান হয়ে শোওয়া! চিত্তার পর্দায় ছবি উঠছে— ম্যাথুস, লিটার আর মিস লিন্ড। কার কী ভূমিকা, সেটা বোঝা যাবে ঠিক সময়েই।

এখন ন'টা কুড়ি। ল্য শিফের সঙ্গে লড়াই তো আরম্ভ হয়ে গেছে।

পোশাক পরতে পরতে আয়নায় নিজের চেহারাটাও ভালো করে দেখল বন্ড। ডানগালের কাটা দাগটার জন্য মুখটা একটু ভিলেন টাইপের হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সব মিলিয়ে চেহারাটা বেশ আকর্ষণীয় আছে।

হিপ পকেটে সিগারেট কেস নিয়ে সে আবার পরীক্ষা করল লাইটারে গ্যাস আছে কিনা! পকেটে এক বাউন্ড দশ হাজার ফ্রাঁর নোট, তারপর সেফটি ক্যাচ লাগিয়ে লোডেড ২৫ অটোমেটিক রিভলবারটাও নিল। গায়ে চড়াল একটা প্রিন্টেড জ্যাকেট।

হঠাৎ লিফট খোলার শব্দ।

— গুড ইভিনিং!

মিস লিন্ড! বন্দ সামান্য উদ্বেজিত। মিস লিন্ড লিফটের কাছেই দাঁড়িয়ে। কালো ভেলভেটের ড্রেস, গলায় সফ্র হিরের নেকলেস। বুকের কাছটা 'V' শেপে-কাটা, সেখানেই লকেটটা।

— বাঃ, ইউ আর লুকিং ফাইন।

সোজাসুজি বন্ডের হাত ধরে মিস লিন্ড বলল— চলুন আগে খেয়ে নিই। আপত্তি নেই তো? সামান্য হাসি-ঠাট্টা! ততক্ষণের খাদ্যের সঙ্গে সামান্য পানীয়ও এসে গেছে। এই রেস্টুরেন্টের একটা অংশ জাহাজের মতো বাগানের দিকে ঢুকে গেছে। এই জায়গাটা বেশ জাঁকজমকপূর্ণ।

মিস লিন্ড অবশ্য তার পছন্দমতো পানীয়ের অর্ডার দিল।

বন্দ বলল— আজকে আপনার পোশাক মুগ্ধ করার মতো। এবার আপনার নামটা বলুন।

— ভেসপার। ভেসপার লিন্ড! আমার জন্ম এক বড়ের সন্ধ্যায়। তাই নিজের নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কবতে হয় অনেক সময়। নামটা কারুর ভালো লাগে, কারুর লাগে না।

— আমার ভালো লেগেছে।

কিছু হালকা সুন্দর কথাবার্তা।

বন্দ বলল— এবার খাবারের অর্ডার দিই?

— হ্যাঁ, লাখোপতির উপযুক্ত আইটেম চাই।

— বুঝিয়ে দিন।

— যেমন, ক্যাভিয়ার দিয়ে গুরু হোক। তারপর গ্রিলড রোভোন দ্য ভো। সঙ্গে পোন্স সুফল। তারপর ফেজ দ্য বোয়া ক্রিম! ... ইস, খুব নির্লঙ্ঘের মতো কথা বলছি। তাইনা?

— নট অ্যাট অল! তবে প্রচুর টোস্ট চাই। নইলে খাবারটা জুতসই হবে না।

এরপর আরও কিছুক্ষণ পানীয় বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করল বন্দ। টর্নেডো, সঙ্গে বার্নিস সস্। স্ট্রবেরি, আভাকাভো পেয়ার সঙ্গে ফ্রেশ ড্রেসিং।

এরপরেই শেষ নেই। শেষরাতে দুজনেই শ্যাম্পেন খাওয়াব পরিকল্পনা করল।

বাটলারও কমতি নয়। সে সুপারিশ করল— ব্লা দ্য ব্লা ব্র্যাট ১৯৪৩। বলল— এটাকেই বলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শ্যাম্পেন।

বন্দ বলল— অবিবাহিতদের দোষ সব কিছু খুঁচিয়ে দেখা।

— আমারও সেই অভ্যাস। তবে আমাকে বোধহয় মানায় না।

গেলাস তুলে বলল— আজ রাতে কথাবার্তা ঠিক হবে মনে হয়।

বন্দ চুপ করে শুনছে।

ভেসপার বলল— হ্যাঁ, ভালো কথা। ম্যাথুস খবর পাঠিয়েছে ওই বোমাবিস্ফোরণ সম্বন্ধে। খবরটা অদ্ভুত, গল্পের মতো।

॥ নয় ॥

খাওয়া শেষ হয়নি। কথাবার্তা জমে উঠেছে।

বন্দ বলল— আপনিই বলুন না গল্পটা।

— বেশ। গুনুন, তৃতীয় বুলগেরিয়ানটা অ্যারেস্টেড হয়েছে। প্যারিসে পালাতে চাইছিল। পথে দুজন ইংরেজকে গাড়িতে তুলেছিল। সে একজন পুলিশকে মাথায় গুলি করে মেরেছে। অপরজন ওকে পাকড়াও করেছে। সে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। পরে রুয়েনে নিয়ে গিয়ে ওর সব কথা পেট থেকে বের করা হল।

— কী কথা?

- ওদের দল ফ্রান্সে নানারকম স্যানিটেশনের কাজ করে। আরও দল আছে ওদের। আপনাকে খুন করার জন্য ওদের কুড়ি লাখ ফাঁ দেওয়া হবে ঠিক হয়েছিল।

- তারপর?

- হ্যাঁ, তারপরেই আসল কথা। এজেন্ট ওদের দুটো ক্যামেরা কেস দেয়— লাল-নীল রং— আপনি দেখেছেন সেগুলো। নীল কেসে স্মোক্ বোম, লাল কেসে আসল বোমা। ওদের প্র্যান ছিল, বিস্ফোরণের পর ধোঁয়া সৃষ্টি করে পালাবে। কিন্তু আসলে ওরা জানত না— দুটি কেসেই বিস্ফোরক বোমা আছে। লাল-নীলে তফাত নেই।

বন্ড চমৎকৃত - তারপর?

- আসলে বুলগেরিয়ানরা কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি। আগে ধোঁয়া বোমা এবং পরে আসল বোমাটা ছুড়বে ভেবেছিল। কিন্তু ধোঁয়া বোমা বলে কিছু ছিল না। দুটোই ছিল বিস্ফোরক বোমা। সুতরাং দুজনেই খতম।

- - তিন নম্বর লোকটা কী করল?

- সে যখন দেখল ধরা পড়ে গেছে, পুলিশ ওকে না-ফাটা লালরঙা বোমাটা দেখাল, তখন ও সবই বলে দেয়। তবে এখনও জেরা চলছে, তবে সের্ ল্যা শিফের নাম শোনেনি।

বন্ড বলল— তাহলে আমাকে খুন করতে এসে খুনিরাই মারা গেল। মজা এই যে, নিজেরাই নিজেদের মারল। ম্যাথুস খুশি হবে, পাঁচজন শত্রু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খতম!.... বা হোক, এবার বলো, এই লাইনে তুমি কী করে এলে? কোনো বিভাগে কাজ করছ?

— আমি হেড অব এস-এর পি. এ.। যোগাযোগ রাখার কাজ।.... আচ্ছা, আপনি নাকি এসব কাজে কোনো মেয়েকে দেখালে রেগে যান?

বন্ড চুপ করে রইল।

লিভ জানাল, সে ম্যাথুসের সঙ্গে প্যারিসে কাজ করেছে। বলল— আপনাকে কিন্তু সবাই হিংসে করে।

— কারণ?

— কারণ, আপনি আমাদের হিরো।

বন্ড ভাবল, এই হচ্ছে ডবল জিরোর ইমেজ! খুন করার বাহাদুরি। আমি দুটো খুন করে এই পজিশন পেয়েছি— নিউইয়র্কে এক জাপানি জ্যোতিষী, আর স্টকহোমে এক নরোয়েজিয়ান ডবল এজেন্টকে।

বন্ড বলল— আমি এখানে এসেছি সম্পূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যে। কাজের নানাদিক আছে, নানারকম সম্ভাব্য ফলাফল আছে।

সেসব বোঝাবার সময় দ্বিতীয় দফায় খাবার এল। বন্ডকে একটু কঠোর লোক বলেই মনে হচ্ছে তার। বস বলেছিল — 'বন্ড কাজ-পাগলা লোক'। কাজেই প্রধান ওর কাছে, অন্য দিকে বেশি মন নেই। তবে সুন্দর চেহারা, ওকে দেখে অনেকেই ভালোবেসে ফেলবে। মনে রেখো, ওর হৃদয় বলে কিছু নেই।

লিভ তাই এই বন্ড-এর সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জের মতো নিয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে বন্ডের গলার সুরে সে কিছুটা আহত।

বন্ড বলল— আসল কথা লোক। পক্ষে বা বিপক্ষে— দু'দিকেই ভাগ্য থাকা চাই। সংক্ষেপে প্র্যানটা এই :

.... আজ রাতে ল্যা শিফ ইর্জানিয়ান সিডিকিটের কাছ থেকে ব্যাংক কিনে নিয়েছে। দাম

দিয়েছে দশ লক্ষ ফ্রাঁ। ওর ক্যাপিটাল এখন কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র দুকোটি চল্লিশ লক্ষ। আমারও মূলধন প্রায় তাই। খুব সম্ভব দশজন খেলবে আজ।

.. টেবিলটাকে দু'ভাগে ভাগ করা হবে। ব্যাংকালে বাকীরা প্রেমারদের সংখ্যা কম। ওদের জেতার সম্ভাবনা কম, কিন্তু একটা সুবিধে আছে। মাঝখানে ব্যাংকার বসে। একজন পার্টনার ডাক দেয়

বন্ড তাসখেলার বিশদ তাৎপর্য ও কায়দাগুলো বোঝাল। সঙ্গে ব্যাংকারের ভূমিকাও বুঝিয়ে দিল। কীভাবে ব্যাংকার দান ও টাকার পরিমাণ ঘোষণা করবে, এক নম্বর টাকা ফেলবে, দু-নম্বর পাশ্ দেবে, সারা টেবিল ঘুরবে। দর্শকরাও অংশ নিতে পারে। অল্প পরিমাণ দিয়ে শুরু হয়, ক্রমশ টাকার অঙ্ক বাড়তে থাকে। দশ বা কুড়ি লাখের মাথায় বন্ড যোগ দেবে। সমান সমান টাকা দিয়ে খেলা শুরু হতে পারে।

এবার কফি এল।

কথাবার্তায় বন্ড এখন পুরো পেশাদার। পয়েন্ট পাওয়া, ব্যাংকারের তাস পাওয়া, নয় সংখ্যাটার গুরুত্ব, টেকা এক, কিন্তু ছবিওয়াল তাসগুলোর দাম নেই— ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিস লিভ সুবোধ্য ছাত্রীর মতো বোঝার চেষ্টা করছিল।

— যে নয়ের কাছে আসবে সেই জিতবে। ড্র হলে আবার খেলতে হবে।

বন্ড বলল— মনে রেখো, একদিক থেকে ব্যাংকার সুবিধেজনক অবস্থায় থাকবে। তবে, প্রথমবারের আট আর নয় থেকে জিত। তাই দেখতে হবে আট আর নয় গুলো আমি যেন ওর থেকে বেশি পাই।

এত মারপ্যাচ মাথায় নিতে কিছুটা নার্ভাস লিভ। কিন্তু বুদ্ধিমতী সে, তাই অনেকটাই বুঝে ফেলেছে।

বন্ড অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে দিল।

॥ দশ ॥

খেলা শুরু। বন্ড উত্তেজিত। এই তো ল্য শিফের সঙ্গে বোঝাপড়া হতে চলেছে। এখন সে শুধু জুয়াড়ি— আর কিছু নয়।

এর আগে হোটেল থেকে বেরিয়ে ওরা যখন ক্যাসিনোতে এল, তখন ভালো সম্বর্ধনা পেল বন্ড।

ভেসপার লিভের সঙ্গে ফেলিক্স-লিটার এর আলাপ হল। লিটার চাইল ভেসপার লিভকে রুলেতের আসরে নিয়ে যেতে। ভেসপার রাজি। লাকি নাম্বারের কথা উঠল।

— আমার কোনোও লাকি নুম্বর নেই।— বন্ড বলল।

রেলিং এর ওপার যাবার পথটা ভেলভেট মোড়া চেন দিয়ে ঘেরা। শেফ দ্য পার্টি চেন সরিয়ে ঢুকল।

— মঁসিয়ে বন্ড। ছ-নম্বরটা আপনার জন্য, যেমন আপনি চেয়েছিলেন।

— থ্যাংক ইউ।

টেবিলে তখন তিনটে জায়গা খালি যখন বন্ড ঢুকল। জুয়াড়িদের একনজরে দেখে নিল বন্ড বেলজিয়ান, গ্রিক— নানা জাতের লোক। এখনও অনেকে এসে পৌঁছায় নি। বন্ড হিসাব কষল—

এক নম্বর - ..

দু-নম্বর-- কারমেল ভিলানি, আমেরিকান ফিল্মের নায়িকা।

তিন নম্বর লেডি ভ্যানডার্স।

চার ও পাঁচ নম্বর — মি. অ্যান্ড মিসেস ডু পন্ট।

ছয় নম্বর — জেমস বন্ড।

সাত নম্বর — মঁসিয়ে সিন্সটে।

আট নম্বর — এক ভারতীয় মহারাজা।

নয় নম্বর — লর্ড ভ্যানডার্স।

দশ নম্বর— সিনর ডোমেলি, ইতালীয়ান ব্যবসায়ী।

খেলার শুরুতে জমা পড়েছে— পাঁচ লক্ষ ফ্রাঁ। খেলা শুরুতেই ল্য শিফ ঝুঁকে পড়েছে। চৌকা, পাঞ্জা, ছক্কা, সান্তা— এলোমেলো ভাবে ঘুরছে।

ক্রুপিয়ার ঘোষণা করল— জমা দশ লক্ষ।

গ্রিক বলল— লেট গেম গো অন।

বন্ড টান হয়ে বসল— এইবার আসল খেলা আসছে।

একটু পরে ক্রুপিয়ারের ঘোষণা— কুড়ি লক্ষ।

সবাই চুপ। বন্ড বলল— আছি।

॥ এগারো ॥

ল্য শিফের চোখের দৃষ্টি সাদা।

বন্ড তাকে সর্বক্ষণ লক্ষ করছিল। খোঁচা খোঁচা লালচে চুল। চওড়া ডিনার জ্যাকেট। এবাব খেলায় বেশ রেযারিষি। সংখ্যাটা একটি, উত্তেজক ফিগার। কেউ আপশোশ করছে কেউ উল্লসিত, নানা কথাবার্তা চলছে। ডুপন্ট দম্পতি উৎসাহী। ল্য শিফের ডানপাশে লম্বা চেহারার লোকটার কাঠের মতো চেহারা, জুলজুলে চোখ। রেলিং-এর ওর হাতের মুভমেন্ট দেখে বন্ড বুঝল— লোকটা গলাটিপে খুন করতে অভ্যস্ত। মুদক খায়। অন্য লোকটির চেহারা লোমশ জস্তুর মতো, হাতে লাঠি— আসলে গুপ্তি-জাতীয় কিছু আছে।

খেলা চলছে। ব্যাংকার হারছে।

ল্য শিফও সারাদিন হেরেছে। বাত একটার সময় বন্ড জিতেছে চল্লিশ লক্ষ। ফলে তার মোট মূলধন দু'কোটি আশি লক্ষ। অতি সতর্ক হয়ে খেলছে সে। টেবিল ঘিরে সবাই চুপচাপ। ক্রুপিয়ের থেকে তার সংখ্যা ঘোষণা করে যাচ্ছে।

— এখন জমা হয়েছে চল্লিশ লক্ষ।

— আছি— বন্ড বলল।

এরপর আশি লক্ষ। বন্ড বলল— লেট আস গো অন।

এবার ল্য শিফ জিতেছে। বন্ডের হাতের তালু ঘর্মান্ত। ল্য শিফের চোখে কৌতুক— আরও দম আছে? বন্ড বলছে— চলুক!

শেষবার্জি! ক্লাইমেস্স!

সাবধানে দান দিল ল্য শিফ। শেষ তাস চার তুলে সে পৌছলো নয়।

বন্ড পরাস্ত! সর্বস্বান্ত। ফতুর!!

॥ বারো ॥

এখন কী করণীয়?

রুটিন কাজ— হোটেলের ফেরা, শয্যাগ্রহণ, লন্ডনে ফোন, পরের দিন প্লেন ধরা। ট্যাক্সিতে রিজেন্ট পার্ক। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এম-এর সামনে। কর্তাদের কৃত্রিম সাঙ্ঘনা বাক্য।

অলরাইট! নেক্সট টাইম—

নেক্সট টাইম আব আসবে না— সেটা ভালোই জানে বন্দ।

উঠে দাঁড়িয়ে সে আশ্চর্য হয়ে দেখল ভেসপার লিভের হাসিমুখ। হাসি! আশ্চর্য! একটা মোটা খাম সে নীচু হয়ে এগিয়ে দিল। বেশ মোটা খাম— ডিকশনারির মতো। মুখটা আঠা দিয়ে আঁটা। টাকা!।

কে পাঠাল? টুকরো কাগজে লেখা — ‘মার্শাল এন্ড। তিন কোটি কুড়ি লক্ষ ফ্রাঁ! শুভেচ্ছা, আমেরিকার পক্ষ থেকে!’

বন্দ নিজের চোখ-কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

ভেসপারের পাশে ফেলিক্স দাঁড়িয়ে। তার মুখেও হাসি।

আবার দান শুরু হচ্ছে। পরের রাউন্ড। ক্যাসিনোর প্রাপ্য টাকা কেটে নিচ্ছে ত্রুপিয়র।

ল্য শিফ টেবিলে রয়েছে।

এখন এসপার-ওসপার। হয় জয়, নয় মৃত্যু।

পুরো তিনকোটি কুড়ি লক্ষ ফ্রাঁ টেবিলে। সব টাকার উপর বাজি ধরা। ত্রুপিয়র সংখ্যাটা ঘোষণা করতেই সকলে চমকে উঠল।

বাকারার ইতিহাসে এতটাকার বাজি রেকর্ড কবল। শোনা যায়, একবার ১৯৫০ সালে দোভিলে এমন কাণ্ড নাকি হয়েছিল।

সংখ্যাটা সত্যি কেন, সেটা শেফ দ্য পার্টি একবার বাজিয়ে নিল। তাবপর টাকাটা গুনে দেখা হল। গোনা শেষ হতে বন্দ টের পেল তার মেরুদণ্ডের নীচে শক্ত কী যেন স্পর্শ করল। তার ডান দিক থেকে চাপা গলায় কেউ বলল— মঁসিয়ে, এটা রিভলবার। সাইলেঙ্গার দেওয়া আছে, তাই কোনো শব্দ হবে না। আপনার শিরদাড়া উড়ে যাবে। লোক মনে কববে, আপনি উত্তেজনায় জ্ঞান হাবিয়েছেন। লোক ডাকলেই গুলি চালাব। আমাব কথা, আমি দশ গোনা শেষ করার আগেই বাজি ফিরিয়ে নিব।

আসলে সেই মোটা ছড়ি ব ভেতর এই মন্ত্র ছিল। বন্দ এও জানে— এরা যা বলে তাই করে।

লোকটা গোনা শুরু করেছে— এক, দুই, তিন. ...

ল্য শিফ বন্ডের দিকে তাকিয়ে।

— চার, পাঁচ, ছয়—

আঃ, ভেসপার এবং ফেলিক্স দূরে নিশ্চিত মনে কথা বলছে। কিছু বুঝতে পারেনি ওরা।

— সাত, আট, নয়—

সমস্ত শক্তি দিয়ে এবার পেছনে ধাক্কা মারল বন্দ। বেতের ছড়িধারী রিভলবারওয়ার্লা ছিটকে পড়ল। একটা ভন্ট খেয়ে পেছনে দাঁড়ালো ভন্ট। চেয়ারটা মট করে ভেঙে গেল। মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল সে। সকলের সাহায্যে উঠে দাঁড়াল। এমন কি শেফ দ পার্টিও সাহায্য করল। অভিনয় অবশ্য!

কপালের ঘাম মুছে বন্দ বলল — হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল, উঃ কী গরম!

— ডাক্তার ডাকা হোক।

— না, না, দরকার নেই। প্রিজ, আই অ্যাম সো সরি!

পরিচারক ছড়িটা তুলে পরীক্ষা করছে।

বন্দ বলল — ওটা মি. ফেলিক্সের এক বন্ধুর। ওর হাতে দিন।

ছড়ির মালিক উধাও। একজন বডিগার্ডকেও এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না।

কী ঘটল আসলে— কেউ-ই সেটা বুঝল না। অবশ্য যে বা যারা পোকাবার তার বুঝেছে।
আঙুল দিয়ে টেবিলে জোরে টোকা মারল বন্ড।
অথাৎ, খেলা আবার শুরু হোক। সে প্রস্তুত।

॥ তেরো ॥

ঘোষণা হল আবার— জমা পড়েছে তিন কোটি কুড়ি লক্ষ।
ল্য শিফ টেবিলে চাপড় মারল।
বন্ড এখন আবার সতেজ। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। অবশ্য শরীর এখনও
ঘামে ভিজ্ঞে আছে।

দশ মিনিট বিরতি দেওয়া হয়েছিল।

এখন রাত দুটো।

একজন বলল— লালের ন'নস্বর জ্বিতেছে।

রোমহর্ষক স্তব্ধতা। তাস টানাটানি, উলটে দেখা চলছে।

এখন টেবিলে বন্ডের তাস : দুটির গোলাপি পিঠ — আরেকটা হরতনের নয়। দুই বিবি
সবুজ কাপড়ে ঢাকা। ব্যাংকারের নাক বেয়ে ঘাম ঝরছে। ল্য শিফের মুখে ধূর্ত হাসি। সবাই ধরে
নিয়েছে বন্ডের অবশ্য পরাজয়।

ক্রুপিনের কাঠের হাতা এগিয়ে দিল।

তাস উলটে দিল বন্ড — আঃ, দুই লালবিবি হাসছে!

ল্য শিফ চেয়ারে এলিয়ে পড়েছে। মনে হবে কেউ যেন ওর বুকো ছুরি মেরেছে।

ক্রুপিয়ের হাঁক দিল — এক কোটি জমা পড়েছে।

বন্ড সিগারেট ধরিয়ে দেখল — পাশে একটা গোলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। চোঁ
চোঁ করে এক গেলাস উড়িয়ে দিল সে।

ডাকাতির পাহাড় জমে উঠেছে।

পরের দান 'নয়' উঠতেই ল্য শিফ উঠে পড়ল। বন্ডও উঠে দাড়াল। অজস্র 'ধন্যবাদ' বর্ষিত
হচ্ছে। ক্যাসিনোর ডাইরেক্টরদের পক্ষ থেকে তার নিমন্ত্রণ এল। টেবিলে এবার নোটের পাহাড়!
মোট সাতকোটি ফাঁ!!

ফেলিস্কের টাকা বন্ড ক্যাশে নিল, বাকি প্রায় চার কোটি চেকে। ডাইরেক্টররা বললেন —
কাল সন্ধ্যাবেলা আসছেন তো!

বন্ড হ্যাঁ বা না, কিছুই পরিষ্কার বলল না।

নিভুতে আসার পর লিটার বলল — তোমার কান্ড দেখে আমরা তাজ্জব। পরে অবশ্য
বুঝেছি। রিভলবারধারী ছড়ি ফেলে পালিয়েছে। এই দেখ ওর বুলেট! যাক সব ভালো শর শেষ
ভালো। ল্য শিফকে মারাত্মক শিক্ষা দিয়েছ তুমি!

বন্ড হেসে বলল — আসলে তোমার দেওয়া খামের জয়। দুঃসময়ে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছ।
এর প্রতিদান দেব নিশ্চয়ই!

ভেসপার লিডকে বন্ড বলল — চলো, নাইট ক্লাবে। একটু শ্যাম্পেন খেলে ভালো লাগবে।

— চলুন, টাকাটা রেখে আসুন। আমি একটু ফ্রেশ হয়ে নিই।

ওরা দু'জন এরপর বেরিয়ে পড়ল। বাইরে জ্যোৎস্না।

বন্ডের ঘর ঠিকঠাক আছে।

বাথরুমে গিয়ে মুখে জলের কাপটা দিয়ে কুলকুচো কবল বন্দ। হ্যা, ভন্ট খেতে গিয়ে মাথার পেছনে একটু চোট লেগেছে। ডান কাঁধেও।

একদিনে দুবার মরণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সোজা কথা নয়।

রাতেও এক আক্রমণ অপেক্ষা করছে।

নাকি ল্যা শিফ পালিয়েছে, জাহাজে পাড়ি দিয়েছে অন্যকোথা। স্মার্শ তো ওকে ছাড়বে না।

দরজায় তালা লাগিয়ে এবার বাইরে এল সে।

॥ চোন্দো ॥

রোগা গোলাস্তের ছোটো নইট ক্লাব।

ভেসপারকে ঢুকল বন্দ। শ্যাম্পেন খেতে খেতে গল্প চলল। নানা বিষয় — ম্যাথুস, লিটার, ল্যা শিফের ভবিষ্যৎ — ইত্যাদি। জানা গেল, ওরা বডিগার্ড দুটোর ওপর নজর রাখছিল বটে। কিন্তু বন্ডের পেছনে চলে-আসা ছড়ি রিভলবারধারীকে লক্ষ করেনি আগেই। সে অবশ্য প্যারিসে ফোন করেছে। এম-এর লোককে খেলার ফলাফল জানিয়ে দিয়েছে।

ভেসপার লিন্ড যেন একটু নিস্পৃহভাবে কথা বলছিল। বন্ড একটু বিরক্ত হল। রেগে মেগে একটু বেশি শ্যাম্পেন খেয়ে আবার ডিমের অর্ডার দিল।

স্টুয়ার্ট ভেসপারকে একটা চিঠি দিয়ে গেল। সে চিঠিতে ম্যাথুস লিখেছে — তুমি সামনের হলে এস। বন্ডের জন্য খবর আছে। আমার ইভিনিং ড্রেস পরা হয়নি, তাই এখন আসতে পারছি না, বাড়ি যাচ্ছি।

বন্ড সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়াল। মেজাজটা আরও বিগড়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ক্লান্ত। শ্যাম্পেনের শেষ চুমুকটা তেতো লাগল। ভাবল— হঠাৎ এমন চিঠি কেন? এটা ম্যাথুসের কাজ বলে তো মনে হচ্ছে না। ইভিনিং-ড্রেসের ব্যাপারটা ছুতো বলে মনে হচ্ছে। সত্যি কি চিঠিটা ম্যাথুসের থেকে এসেছে? ঘর থেকে বেরিয়ে এল বন্ড।

তার আগে সামনের হলেতে গিয়ে দেখেছে — ভেসপার বা ম্যাথুসেব কোনো পাস্তা নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে এল বন্ড। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল একটা অস্ফুট চিংকার। গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। দু'সেকেন্ড পবেই ওর সামনে দিয়ে হাই স্পিডে বেরিয়ে গেল একটা সিট্রোঁ। গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার। তাই বিশেষ কিছু দেখা না গেলেও বোঝা গেল, ভেতরে একটা লড়াই চলছে। কারণ পিছনের দিকের স্প্রিংটা ওঠানামা করছে। তীব্রবেগে টপ গিয়ারে গাড়িটা রাস্তায় পৌঁছেই উধাও হয়ে গেল।

একটা কালো ব্যাগ কুড়িয়ে পেল বন্ড। এটা যে ভেসপারের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সিঁড়ির আলোর কাছে দৌড়ে এসে ব্যাগটা খুলল বন্ড। এক টুকবো কাগজে লেখা আছে যা ভেসপার লিন্ড বন্ডকে আগেই জানিয়েছিল — সামনের হলে একবার এস। খবর আছে, তোমার সঙ্গীর জন্য। রেনে ম্যাথুস।

॥ পনেরো ॥

বন্ডের কোনো সন্দেহ নেই যে, চিঠিটা জাল।

আর দেরি না করে একলাফে নিজের গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল বন্ড। গেটের বাইরে এসে বাঁ দিকে যেতেই লাফিয়ে উঠল গাড়ি। হ্যাঁ, আন্দাজেই শত্রুর পিছু নিতে হবে। সি বিচের দিকে রাস্তাটা ধরা যাক। হেডলাইট জ্বলে যেন এক বিরাট গুহার মধ্যে আধমাইল লম্বা আলো ফেলে গাড়ি ছুটে চলেছে।

বন্ডের ধারণা, সিট্রোটা ওই পথ দিয়েই গেছে। কারণ, ধোঁয়া আব ধুলো উড়ছে। সমুদ্রের কুয়াশার মধ্য থেকেই যেন ফগ হর্নের আওয়াজ আসছে। গাড়ির স্পিড বাড়তে বাড়তে বন্ড ভাবছিল, ভেসপার মেয়েটা একেবারে বোকা। পাঠাবার আর লোক পেল না 'এম'! তাছাড়া মেয়ে সহকারী নিয়ে কাজ করতে গেলে এরকম উটকো ঝামেলায় পড়তেই হয়।

শত্রুপক্ষ ভেসপারকে কেন কিডন্যাপ করেছে, সেটাও বোঝা সহজ — চার কোটি টাকার চেকটা দাও, নয়তো মেয়েটার জান যাবে। অবশ্য বন্ড এসব ভাঁওতায় ভুলছে না। আগে ওদের গাড়িটাকে ধরতেই হবে, গুলির উত্তরে গুলি ছুঁড়তে হবে। তাতে মেয়েটার ভাগ্যে যা আছে হবে। বন্ডের গাড়ির স্পিড এখন ঘন্টায় একশো দশ-কুড়ির মধ্যে।

ড্যাশ বোর্ডের নীচ থেকে ৪৫ লং ব্যারেল কোন্ট আর্মি স্পেশালটা বের কবল বন্ড। অন্তত একশো গজ দূর থেকে শত্রুপক্ষের গাড়ির টায়ার বা পেট্রোল ট্যাঙ্ক ফুটো করতে পারবে।

এবার সামনে সিট্রো গাড়িটা চোখে পড়ল হেডলাইটের আলোয় গাড়ির ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। তিনজন পুরুষ এবং একটি মেয়ে দেখা যাচ্ছে। ল্য শিফ নিজে ড্রাইভ করছে। এইবার সেই ছড়ি হাতে লোকটাকেও দেখা গেল। পিছনের সিটে রিভলবার হাতে একটি রোগা লোক, তার পাশেই ভেসপার। ওর স্কার্টটা ওপরে টেনে দুই উরু বস্তুর মতো বেঁধে রাখা হয়েছে। মাথাও কাপড় দিয়ে মোড়া, খালি পা।

সামনে কাঁচা রাস্তা। গাড়ি'ব স্পিড কমাল বন্ড।

সামনের গাড়ির ভিতর সাসপেন্স! ল্য শিফ অর্ডার দিল — জাস্ট নাউ।

তৎক্ষণাৎ বানবান শব্দ! ল্য শিফ বলল — হিট হিম।

গাড়ি থেমে গেল। রিভলবার হাতে তিনজন একটা ঝোপের কাছে এগিয়ে গেল। একজনের হাতে একটা বিশাল কালো গোলা। সেটা ছুটে আসছে।

॥ ষোলো ॥

বন্ড গাড়ি থামায়নি। হঠাৎ সামনের গাড়িটা কাছে এসে যাওয়ায় সে সজোরে ব্রেক কবল। কোনো লাভ হল না। ধাক্কাটা লাগলই। বন্ড ড্রাইভিং সিট থেকে ছিটকে পড়ে গেল। ওর গাড়ি এখন শূন্যে, হেডলাইট যেন আকাশের দিকে, এইবার আস্তে আস্তে উলটে গেল গাড়িটা।

ঝোপের আড়াল থেকে দুই সঙ্গী সমেত ল্য শিফ বেরিয়ে এল। হুকুম দিল — আগে ইংরেজটাকে বের করে আন। সাবধান যেন মরে না যায়। লোকটার বেঁচে থাকা আমাদের পক্ষে খুব জরুরি। কুইক, ভোর হয়ে আসছে!

ক্যানভাসের ছাদটা ছুরি দিয়ে কেটে বন্ডের সংজ্ঞাহীন দেহটা বের করল ওরা। বন্ড এখন রাস্তায় শোয়া। রোগা লোকটা ওর বুক হাত রেখে দেখল, হৃদযন্ত্র কতটা সচল। তারপর বন্ডের দুই গালে টেনে চড় লাগাল। বন্ডের গলায় সামান্য আওয়াজ। একটা হাত একটু নড়ল। লোকটা আবার সজোরে চাপড় দিল।

ল্য শিফ বলল — ঠিক আছে ঠিক আছে। বাড়াবাড়ির দরকার নেই। ওর পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে আমায় দাও। আর এই তারগুলো দিয়ে ওর হাত ভালো করে বাঁধ, এবার আমার গাড়িতে তোল ওকে।

লোকটা বন্ডের অটোমেটিক রিভলবারটা ল্য শিফকে দিল। এবার টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলা হল বন্ডের দেহটা।

ইতিমধ্যে কিছুটা গ্লান ফিরেছে বন্ডের। পরিস্থিতিটা বুঝতেও পেরেছে সে। সাবা গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। কিন্তু হাড়গোড় ভাঙেনি বলেই মনে হচ্ছে। অপারিসীম ক্লান্তি! তাই আপাতত আত্মসমর্পণ ছাড়া গতি নেই।

গাড়িতে উঠেই প্রথম মনে এল, ভেসপারের কথা। কোথায় সে? তারপরেই চোখে পড়ল মেয়েটার অসহায় দুটি পা। লক্ষ করল, ওর স্কাট দিয়েই ওর মাথাটা পুটলির মতো করে বাঁধা হয়েছে। চুপি চুপি ডাকল — ভেসপার।

-- শাট আপ! সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড চাপড় বুকের ওপর।

বন্ড বুঝল, লোকটা পেশাদার খুনি। দুটি লোকই খুব গুস্তাদ। আপশোশ হল যে, সে বুঝতে পারেনি — যখন খুশি মনে সে শ্যাম্পেন খাচ্ছিল, তখন শত্রুপক্ষ ওদের যথেষ্ট বেগ দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। ভেসপার বোকা কিন্তু বন্ড নিজেও কম বোকামি করেনি।

যাকগে, এখন আর ভেবে কী হবে। ল্যা শিফের গাড়ি এখন সন্তর মাইল স্পিডে চলছে। বন্ড ঘাপটি মেরে শুয়ে রইল। জানলা দিয়ে দেখছে, ভোর হয়ে এল। এখন গাড়ি বোধহয় যাচ্ছে ল্যা শিফের ভিলার দিকে, অর্থাৎ ভিলার মোড়টা আর এক দু'মাইল দূরে। বোঝা গেল, ভেসপারকে এখন টোপ বানিয়ে এগোবে ওরা।

ল্যা শিফের ভিলায় পৌঁছে গেছে ওর গাড়ি। ভিলার দশা এখন জীর্ণ কোনো স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য নেই। অবশ্য ল্যা শিফের কায়দা-কানুনের পক্ষে এমন বাড়িই উপযুক্ত। গুঁতো মাঝে মাঝে বন্ডকে নামানো হল গাড়ি থেকে। বন্ড বুঝল, এইবার তাব ভেসপারের ওপর অকথা অত্যাচার শুরু হবে। ভাবতেই সাহসী বন্ডের বুক কম্পন শুরু হল।

কর্সিকান লোকটি অশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে ভেসপারকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। বন্ড শাস্ত মনে রোগা লোকটার পাশে পাশে চলল। ডানদিকের দরজার সামনে ল্যা শিফ দাঁড়িয়ে আছে। ভেসপারকে ভিতরের ঘরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আরেকজন। এই মুহূর্তে নিজেকে প্রস্তুত করল বন্ড।

মুহূর্তে মধ্যে বন্ডের প্রচণ্ড লাথি লোকটার হাঁটুর নীচে আঘাত করল। লোকটা চিৎকার করে ছিটকে পড়ল। হাত বাঁধা অবস্থাতেই বন্ড ছুটল ভেসপারের দিকে। তার এখন এই পা দুটোই শুধু সম্বল। কিন্তু কর্সিকানের উদ্দেশ্যে মারা লাথিট' লক্ষ্যভ্রষ্ট। বরং লোকটাই বন্ডের পা-টা ঘুরিয়ে দিতেই মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল বন্ড। এইবার রোগা লোকটা এগিয়ে এল। কলার ধরে টেনে তুলল বন্ডকে। পিস্তলটা দিয়ে বন্ডের পায়ে সজোরে আঘাত করল। আর্তনাদ করে কঁকড়ে গেল বন্ড। লোকটা বলল — ফের এমন করলে সবকটা দাঁত ভেঙে দেব।

মুহূর্তে বন্ড দেখতে পেল, ল্যা শিফ কয়েক পা এগিয়ে এসেছে। ভেসপার নেই। ল্যা শিফের মুখে ব্যঙ্গ হাসি। বলল — ওয়েলকাম ফ্রেন্ড। সময় নষ্ট করে লাভ কী?

সত্যিই লাভ নেই। বন্ড এবার ওদের কবজায়।

॥ সতেরো ॥

এই ঘরটা বিরাট। ড্রয়িংরুম না ডাইনিং রুম কে জানে। সারা দেয়াল জুড়ে আয়না। রং ওঠা সোফা ঘরের মাঝখানে কোনো টেবিল নেই। শুধু একটা চৌকো কাপেট। জানলার কাছে অদ্ভুত শেফের একটি চেয়ার। ভেলভেটের গদি। নীচু টেবিলে জলের বোতল আর দুটো গ্লাস। আর একটা গদিহীন বেতের চেয়ার আছে।

ল্যা শিফ বলল — ওকে রেডি করে নিয়ে এস। গণ্ডগোল করলে উচিতমতো কিছুটা জখম করে দেবে।

এবার বন্ডের দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চুহভাবে বলল — জামাকাপড় ছেড়ে ফেল। নইলে বেসিল একটা একটা করে তোমার আঙুল ভেঙে দেবে। তোমার শরীর নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নেই। তবে তোমার মরণ বাঁচন নির্ভর করছে তোমার কথাবার্তার ওপর।

ল্যা শিফের ইস্তিতে বন্ডের হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। ছুরি দিয়ে বন্ডের কোটের পিছনদিকটা চিরে দিতেই হাত দুটো আলগা হয়ে গেল। ডিনার জ্যাকেটও দুটুকরো। এটা একধরনের পুলিশি কায়দা। লোকটা বলল — কুইক।

গায়ের শার্টটা খুলে ফেলল বন্ড। ল্যা শিফ বড়ো চেয়ারটায় সিংহাসনের মতো বসে ইশারা করল। কফি এল। আয়েস করে গেলাসে কফি ঢেলে নগ্ন বন্ডের দণ্ডায়মান শরীরটাকে ভালো করে লক্ষ করল মে। হ্যাঁ, আঘাতগুলো গায়ে চাপ চাপ দাগের সৃষ্টি করেছে। বন্ডের মুখে ক্লান্তি এবং আতঙ্ক।

— সিট ডাউন। বলে বেতের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল ল্যা শিফ। বন্ডের দু'হাত চেয়ারের দুই হাতলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। বুকের ওপর দিয়েও একটা দড়ি চেয়ারের পিঠের সঙ্গে গিট দিয়ে বাঁধা হল। চেয়ারের পায়্যা দুটোর সঙ্গে দুই হাঁটু শক্ত করে বাঁধতে ভুল হল না।

এরপর স্নেহভরে বন্ডকে দেখতে দেখতে হাত উঠিয়ে এমন একটা টেকনিক্যাল অত্যাচারের চমক দিল ল্যা শিফ, যে মুহূর্তের মধ্যে বন্ডের ঘাড় পিছনে হেলে পড়ল। সারা দেহ যেন রক্তশূন্য, যেন প্রচণ্ড ঘাম ঝরছে।

আর্তনাদ করল বন্ড।

ল্যা শিফ বলল — আরো অনেক কায়দা আছে, বুঝেছ বন্ধু। সেগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে... যাই হোক, কাজের কথা শুরু করি। নিশ্চয়ই এও বুঝেছ, তোমার খেল খতম। আমাদের কাছে তুমি নেহাতই শিশু। তোমার কর্তারা তোমাকে পাঠিয়ে ভুল করেছে... এবার বল, টাকটা কোথায়?

এবার গর্জন করল ল্যা শিফ। সঙ্গে সঙ্গে বেতের ঘা মেরে সেই টেকনিক্যাল যন্ত্রণা দান। বন্ড কাঁপতে থাকল।

ল্যা শিফ বলল — শোন খোকা, আমার কথাবার্তাগুলোকে রূপকথার গল্প ভেব না। আমার অভিধানে দয়া-মায়্যা বলে কোনো শব্দ নেই। তাছাড়া গল্পে যা থাকে, বাস্তবে তা হয় না — ভিলেনের নিপাত, নায়কের পুরস্কার, নায়ক-নায়িকার মিলন — এসব হয় না। কথা যদি না শোন, তাহলে তোমার সামনে মেয়েটিকে এনে এমন অত্যাচার করা হবে, তা দেখলে তুমিও পাগল হয়ে যাবে। তবুও যদি গোঁয়ারতুমি করো, তাহলে দুজনকেই বীভৎসভাবে আমরা খুন করতে বাধ্য। তোমার মৃতদেহ এখানেই পড়ে থাকবে। কবর দেবার লোকজনও পাওয়া যাবে না। আর আমি? হাঃ হাঃ — আমি চলে যাব বিদেশে। সেখানে চমৎকার একটি বাড়িতে বিয়ে করে সংসার পাতব। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে আনন্দে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। তুমি টাকা দিলে ভালো কথা, না দিলেও আমার কিছু আসে যায় না।

আবার সেই অত্যাচার। এখন পর্যন্ত বন্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যতটা পারা যায় অত্যাচার সহ্য করতে হবে।

ল্যা শিফ বলল — তুমি এবার ঠিক করো কী করবে। নাহলে বেশকিছু যন্ত্রণা — অবশেষে মৃত্যু। এই তোমার ভাগ্যে আছে।

বন্ডের কিছু সহকর্মী জার্মান ও জাপানিদের হাতে অত্যাচার সয়েছিল তাদের মুখে বন্ড শুনেছিল যে, অত্যাচার সহ্যে প্রথমদিকে কষ্ট হয় কিন্তু যদি কোনোমতে প্রথমদিকে সহ্য করা যায়। তবে আপনা থেকেই সহ্যশক্তি চলে আসে।

ল্যা শিফ বলল — চার কোটি ফ্রাঁর চেকটা নিশ্চয়ই তোমার ঘরেই আছে। কিন্তু তোমার ঘব তন্ন তন্ন করে খুঁজে আমরা সেটা পাইনি। পেলে তোমার আর এই অবস্থা হত না। তাহলে তুমি এখন গার্লফ্রেন্ডবে নিয়ে আরামেই থাকতে ... আর একটা কথা শোন, অত্যাচারীর পক্ষে নিগ্রহ চালানো খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক কাজ। বিশেষ করে বন্দি যদি পুরুষ হয়। এই যন্ত্রণাই যথেষ্ট। তবে যুদ্ধের ব্যাপারে তো শুনেছ। . . যদি তোমার পুরুষত্ব কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে বেঁচে থাকলেও তুমি কিন্তু আর পুরুষ থাকবে না। এমন মানসিক কষ্ট হবে যে আত্মহত্যার চেষ্টা কববে। সারা পৃথিবী তোমার কাছে তখন অন্ধকার।.. টাকাটা কোথায়?

বন্ড কোনোমতে বলল — জল।

— রাইট। জিভ শুকোলে তো আর কথা বলা যায় না।

উঠে এসে বন্ডের চুলের মুঠি ধরে মাথাটা ঠেলে কয়েক ফোঁটা কফি ওর মুখে ঢেলে দিল ল্যা শিফ। তারপর মুঠো ছেড়ে দিতেই বন্ডের মাথা আবার ঝুঁকে পড়ল।

ল্যা শিফ বলল -- অবশ্য আমার কোনো তাড়া নেই। এখন যে খেলাটা চলছে সেটাই চলুক। অপরের সহায়কিত্তি পরীক্ষা করতে আমার বেশ ভালোই লাগে।

আবার সেই অত্যাচার। তার মধ্যেই বন্ডের চিন্তাশক্তি কাজ করে চলেছে। এখন হয়তো বেলা সাতটা। হয়তো লিটার বা ম্যাথুস এখন এখানে এসে পড়বে। হয়তো বন্ডের গাড়িটা চোখে পড়েছে। এই যেকোনো একটা 'হয়তো' সত্যি হলে ল্যা শিফ ধরা পড়বেই।

দাঁতে দাঁত কামড়ে অত্যাচার সহ্যেতে লাগল বন্ড। এবাব অত্যাচারের মাত্রা বাড়ছে। হঠাৎ একসময় সাবা জগৎ অন্ধকাব হয়ে গেল তার চোখে।

ল্যা শিফ পরীক্ষা করল, বন্ড মরে গেছে কিনা। নিশ্চিত হল, না মরেনি। সে বলল — আপাতত তোমার ব্যাপারে থামছি। প্রাণে মারছি না অবশ্য। তবে যা বলেছি, ওই প্রাণে মারার চেয়েও ভয়ংকর কাণ্ডটা ঘটবে। তারপব মেয়েটাকে আনব এখানে। দেখি, ওকে নিয়ে কী করা যাব।

গম্ভীর গলা এবাব ল্যা শিফের — জেমস বন্ড, নিজেকে চিরকালের মতো হারানোর জন্য প্রস্তুত হও।

॥ আঠারো ॥

ক্রমাগত মারের ফলে চেতনাহীন হয়ে পড়েছিল প্রায় বন্ড। ল্যা শিফের সব কথা তার কানে ঢুকছিল না। আচমকা এক বজ্রকঠিন স্বরে বন্ডের হুঁশ ফিরে এল।

নুয়ে পড়া মাথা সোজা হল বন্ডের। সামনের দিকে তাকাল সে। কয়েক সেকেন্ড লাগল অস্পষ্ট দৃষ্টি কাটতে। বন্ড এবাব পরিষ্কার দেখতে পেল ল্যা শিফের মুখের হিংস্র চেহারার বদলে এক ভয়ান্তভাব।

বন্ড শুনতে পেল আবার সেই শব্দ — হাত থেকে ওটা ফেলে দাও ল্যা শিফ।

ল্যা শিফের হাত কাঁপছে, মুখ ভয়ান্ত। বন্ড দেখল, ল্যা শিফ যেই পকেটে হাত ঢোকাতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে পিছনের কণ্ঠস্বরটি বলে উঠল। — নো নো, কোনোরকম বাজে চেষ্টা কোর না। ট্রিগারে আঙুলটা শুধু ছোঁয়ানো আছে। আঙুলে চাপ দেওয়াবার চেষ্টা করিও না।

কয়েকমুহূর্ত চুপচাপ। পিছনের লোকটি কি আছে? তবে চুপচাপ কেন? কে ও?

সেই লোকটির গলা আবার শোনা যায় — কী হল? আমি সময় নষ্ট করা একদম পছন্দ করি না। ফেলে দাও ওটা।

ল্যা শিফের মুখের কথা আটকে যাচ্ছে — আঁসলে আমি মি. বন্ডকে একটু ভয়... মানে—

— চোপ। শয়তান, বিশ্বাসঘাতক, ঠগবাজ। শোন হে, আমাকে যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পাঠিয়েছে, তার বলেছে, তোমার মৃত্যুটা যেন পরিপূর্ণ যন্ত্রণাময় হয়। যেরকম যন্ত্রণা তুমি একে দিচ্ছিলে। হাতে আমার সময় কম। তাই একটা মাত্র গুলিই আমাকে খরচ করতে হবে।

ল্য শিফ কাঁপা কাঁপা গলায় বলে — আমি মুক্তি চাইছি। আমি চলে যাব এখান থেকে। আমি যা করেছি—

আর কোনো কথা বলতে দিল না বন্ডের পিছনে দাঁড়ানো আগস্টকের রিভলবার। ল্য শিফের নাকের ওপরে শুধু একটা ছিদ্র তৈরি হল। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এল। হুমড়ি খেয়ে ঘুরে গিয়ে একটা চেয়ারের হাতলের ওপর পড়ল ল্য শিফ।

ল্য শিফের দেহটার ওপর একটা পা রেখে, মাথায় টুপি, মুখে মুখোশ পরা সেই লোকটা এবার বন্ডের থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বলে — তোমার কপাল ভালো মিস্টার। বেঁচে গেলে। এই নিয়ে দু'বার। প্রথমবার বরাতজেরে, দ্বিতীয়বার আমরাই ভুল করেছি। অবশ্য যদি তোমার প্রাণ নেওয়ার হুকুম থাকত। শোন হে, তোমার দলকে বোল যে, এইসব গন্দার লোকেদের সাথে যদি তোমার মতো বিদেশি গুপ্তচরগুলোকে মারা যেত। হ্যাঁ, আর একটা কথা — স্মার্স কাউকে ছেড়ে কথা বলে না, খাতির করতে জানে না।

লোকটা বলে চলে — তোমার মতো জুয়াড়ির সাথে আবার দেখা হবে কোথাও। কিন্তু তোমাকে এমনি ছেড়ে দেব না। গুপ্তচর বলে তোমার শরীরে বেশ ভালোরকম চিহ্ন বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

বলে বুটের চেন খুলে একটা ছুরি বার করে অতি দ্রুত এবং যন্ত্রণাদায়কভাবে সঁ বন্ডের ডান হাতে খুব দ্রুত 'এম' কথাটা লিখে দিল। বন্ডের সারা দেহ যন্ত্রণায় কেঁপে উঠল। চোখ বুজে যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল বন্ড।

লোকটার বুটের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। বন্ডের হাত দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

বন্ড জ্ঞান হারাল।

বেলা বাড়ছে। বন্ডের হাত থেকে পড়া রক্ত এখন জমাট বেঁধেছে, তার ওপর রৌদ্রের আলো এসে পড়েছে।

টাটকা রক্ত জমাট বাঁধতে বাঁধতে এক গোলাকার বৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে। আর ওই বৃত্তের ওপর রোদ্দুর এসে এক আতঙ্কের দৃশ্য তৈরি করেছে।

॥ উনিশ ॥

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের প্রকৃতি মানুষকে কখনো ঘুম পাড়িয়ে রাখে, আবার কখনো বা নিদ্রাভঙ্গ ঘটায়। আধোজাগরিত তন্দ্রার মধ্যেও ছন্দহীন স্বপ্ন একে একে চলে যায়।

বন্ড এখন একটা শয়্যায় শায়িত। কখনো গভীর ঘুমে, কখনো আচ্ছন্নের মতো। বুঝতে পারছে বন্ড, তার পাশে মাঝে মধ্যে কেউ এসে তাকে দেখে যাচ্ছে। কিন্তু সে নিজের মুখ খুলতে চায়নি। এর মধ্যেই তার স্বপ্নে ঘটে গেল এমনই ঘটনা, যা বন্ডকে বিছানা থেকে উঠতে বাধ্য করল।

বন্ড বুঝতে পারল দুটো কোমল হাত তাকে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিল। এই ঘরটাও প্রায় অন্ধকার। কে এই মেয়েটি? শত্রুদেরার কোনো মেয়ে কি? মেয়েই এবার সুগন্ধীমাখা একটা টাওয়েল দিয়ে তার মুখ, হাত, চাদর সরিয়ে বক্ষদেশ, একটু পাশ ফিরিয়ে দিয়ে পিঠ সব স্নেহভরে মুছিয়ে দিল।

ধীরে ধীরে বন্ড আবার ঘুমের দেশে চলে গেল।

যখন ঘুম ভাঙল তখন তাব নিজেকে যেন বেশ তরতাজা বলে মনে হচ্ছিল। কানে এল পক্ষীকুলের কলতান, আর সমুদ্রের গর্জন। তাব মানে এখন সে অন্যত্র। বন্ড আস্তে আস্তে উঠে বসল এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন নার্স ঘরে ঢুকে বন্ডের মাথায হাত বুলাতে বুলাতে বলল আশা করি, এখন বেশ সুস্থ বোধ কবছেন।

— অনেকটা। আপনি কে? আর আমি এখন কোথায়?

— আমি নার্স। গিবসন। আব আপনি এখন রয়্যালের নার্সিংহোমে। আপনার পবিচর্যার ভার আমার হাতে। আচ্ছা, আমি ডক্টরকে খবর দিয়ে আসি।

নার্স বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ হাঁটুতে আর কবজিতে টান ধরল। ডান হাতের কবজিতে ঐ রাশিয়ানটা ছুরি দিয়ে ‘এম’ লিখে দিয়েছিল।

— ওড মর্নিং মি. বন্ড। — ঘরে ঢুকে ডাক্তার বলে। সঙ্গে নার্স আর ম্যাথুস। ম্যাথুসের মুখে হাসি। বন্ড অনেকটা স্বস্তি পেল।

দোয়াজিয়েম বুরোর এই ফরাসি ডাক্তার বন্ডকে পরীক্ষা করতে করতে বলে মি. বন্ড, আপনি এখন অনেকটাই সুস্থ। মঁসিয় ম্যাথুসের সাথে ঠিক পাঁচ মিনিট কথা বলবেন।

— আচ্ছা, আমি এখানে কী করে এলাম?

— বয়্যালো যাবার সময় রাস্তায় এক চাষি আপনার গাড়ি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে আপনাকে, ল্য শিফ আর মিস লিভকে উদ্ধার করে। মিস লিভ অক্ষত আছেন। অবশ্য খুব শকড়। আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া অবধি উনি এখানেই থাকবেন। সেরকমই নির্দেশ আছে। আচ্ছা মি. বন্ড, ল্য শিফের হত্যাকারীদের আপনি কি দেখেছেন? — ডাক্তার বলে।

— ইয়েস।

ডাক্তার বলে — আচ্ছা, আপনি কতক্ষণ ধরে ওদেব অত্যাচারের শিকার?

— ধরে নিন, এক ঘন্টারও বেশি সময়।

— হুঁ। যাই হোক, আপনার চিন্তার কিছু নেই। ওযুধের সঙ্গে চাই এখন ঠিকমতো খাওয়া আর ঘুম। হ্যাঁ, আপনি ঘুমিয়ে পড়লে আপনার হাত-পা বেঁধে দেওয়া হবে। যাতে ঘুমের মধ্যে কোনোরকম ক্ষতি না হয়। সত্যি বলতে কী, আপনার মতো বেদম মার খাওয়া অনেক লোকেরই চিকিৎসা কবতে হয়েছে আমাকে। সেটা মঁসিয় ম্যাথুস ভালোই জানেন। সেই তুলনায় আপনি যথেষ্ট শক্তিশালী। দেন ও. কে. টেক রেস্ট। এবার মঁসিয়ে ম্যাথুস কথা বলুন। ঠিক পাঁচ মিনিট। — ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ম্যাথুস একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে। এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল সে। দরজার পাশ থেকে এসে এবার সে ডাক্তারের চেয়ারে বসে।

বন্ড নার্সিংহোমের বেডে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায়। ডান দিকের হাতটা মাথার ওপরে তুলতে যায়। অসহ্য যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে। নার্স ছুটে আসে। ব্যথার জয়গাটায় কী যেন একটা স্প্রে করে দেয়।

নার্স বলে — বেশি নড়াচড়া করার চেষ্টা না করাই ভালো।

নার্স বেরিয়ে যায়।

হাসতে থাকে মঁসিয়।

— কী হল, হঠাৎ পাগলের মতো হাসতে শুরু করলে যে?

ম্যাথুস বলে — না এমনিই। আসলে মহাশক্তিমান জেমস বন্ডের এরকম দুরবস্থা, এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ভেতরে ভেতরে রেগে গেলেও শাস্তভাবেই বন্ড বলে — কোনো খবর যদি না থাকে, তাহলে আমি এখন একা থাকতে চাই।

— সরি সরি ফ্রেন্ড। হ্যাঁ, প্যারিস, লন্ডন সব জায়গা থেকে খবরের জন্য ওরা অপেক্ষা করে আছে। লিটারকে ওরা যোগাযোগ করছে। ‘এম’ আমাকে ফোনে তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন যে, ট্রেজারি বিভাগ দৃষ্টিস্তামুণ্ড আছে।

— যেদিন তোমাকে উদ্ধার করা হল সেদিন একটা হাতকাটা লোক — রোগাটে, লম্বা এসে তোমার সব ব্যবস্থা করে গেল। মনে হল সে ভেসপারের ওপরওয়লা হবে। ভেসপারকে সব দায়িত্ব দিয়ে গেছে।

— সে কিগে! আমি যে একেবারে ভি ভি আই পি — যাকগে, এবার বলি, ল্য শিফের মার্ভারার হল স্মার্শ।

এরপর বন্ড ল্য শিফের খুনের ঘটনা সব বলল। এবং—

ম্যাথুস বুঝল, বন্ড আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ম্যাথুস বলে — যাকগে যাকগে, তুমি এসব নিয়ে আর কোনোরকম দৃষ্টিস্তা করবে না।

বন্ডের মুখ ঘামে ভরে ওঠে।

ম্যাথুস ভয় পেয়ে যায়। নার্সকে ডাকতে গিয়েও ডাকে না। নার্স এলে তাকে প্রচণ্ড ঝাড়া দেয়। খাটের পাশে স্ট্যান্ডে রাখা টাওয়েলটা নিয়ে বন্ডের মুখ মুছিয়ে দেয়।

বন্ড আরাম অনুভব করে।

ম্যাথুস বলে — আমরা রটিয়ে দিয়েছি, শিফ তার দুই সহকর্মীকে খুন করে নিজেই শেষ করে দিয়েছে। কেননা, ইউনিয়নের টাকা নষ্ট করার কোনো উত্তর ছিল না ওর কাছে।

ম্যাথুস এবার লক্ষ করল, বন্ড এসব খবরে বেশ উৎসাহিত বোধ করছে। ওকে আগের থেকে ফ্রেশ লাগছে। ম্যাথুস বলতে লাগল আবার।

— উত্তর অঞ্চল আর স্ট্রাসবর্গে এখন খুব অশান্তি। কম্যুনিষ্ট পার্টির এক বিরাট নেতা হিসেবে ও আর ওর দলের ক্যাসিনো ও অন্যান্য অ-সামাজিক কাজকর্ম প্রকাশ হয়ে পড়াতে অসম্মানিত হতে হয়েছে চতুর্দিকে, এমনকি ওদের পার্টির কাছেও। বন্ড, নার্স হয়তো এখনি এসে পড়বে। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। এখন বল, ওই টাকাটা কোথায়? কোথাও পাইনি আমি।

বন্ড এবার হো হো করে হেসে উঠল। যেন কিছুই হয়নি তার।

বন্ড বলে — সেদিন লিটার চলে যাওয়ার পর দরজার বাইরে কালো প্লাস্টিকের নাম্বারপ্লেটটা খুলে চেকটা ভাঁজ করে আমি নাম্বারপ্লেটটা আগের মতোই করে রেখেছি। এতে কী প্রমাণিত হয় জান?

— কী?

— বোকা ইংরেজরাও চালাক ফরাসিদের একটু আধটু শেখাতে পারে।

ম্যাথুস হেসে উঠল। বলল — তোমার জবাব নেই। শোন, মুনজদের খবরটা আমিই দিয়েছিলাম। ওরা ধরা পড়ে গেছে। সব ভাড়াটে ওরা। তাহলে এখন আসি। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ।

ডাক্তার ইতিমধ্যে এসে গেল।

বন্ডের ঘুম পাচ্ছে। সে ভাবতে থাকে — এখনও অনেক সমাধান বাকি রয়ে গেল।

এই ভাবনার মধ্যে ভেসপারের চেহারাটাও ভেসে উঠল। তাকেও ভোলেনি বন্ড।

ক্রমশ সুস্থ হচ্ছে বন্ড। এখন উঠে বসতে পারছে। কোমরের নীচটা ঢাকা। দেহের নীচের অংশে বেশ ব্যথা আছে।

ম্যাথুস এসে বলল — এই তোমার চেক! বেশ কিছুদিন চারকোটি ফ্রাঁ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, কতখানি ঝুঁকি, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ! চেকটা সই করে দাও, অ্যাকাউন্টে জমা করে দিই।

— স্মার্শের বন্ধুটির খবর কী?

— তার পাস্তা নেই, একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে।

— সেকী!

— হ্যাঁ। ওয়াশিংটন নাকি কিছু কিছু খবর জানে। তবে সেগুলো তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। রিফুইজিদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে যতটুকু জানা গেছে আর কী!

বন্ড চিন্তিত। সে যতদূর জানে, লোকটা ওয়ারশ হয়ে লেনিনগ্রাড এসেছিল। কিন্তু বন্ডকে খুন করার অর্ডার ছিল না বলে হয়তো ফিরে গেছে। বার্লিন থেকে ইউরোপের নানা অংশে যাওয়া যায়।

— শোন ম্যাথুস, আমার সম্বন্ধে ওদের কাছে একটা ফাইল আছে। তারা মধ্যে একটা ওরা কেটে দিয়েছে।

— তার মানে?

— মানে ওটা রাশিয়ান অক্ষর। স্মার্শ (SMARSH) কথাটার প্রথম অক্ষর। কাটা হলে মানেটা দাঁড়ায় — ‘ডাউন উইথ ট্রেটরস্’। মোট কথা, আমি দাগী হলাম ‘বিশ্বাসঘাতক’ হিসেবে।

একটু ভেবে বন্ড বলল — যাক গে, সেটা বড়ো কথা নয়। আমি ঠিক করেছি বেজিগনেশন দেব।

— সেকি, কেন?

— আমার অন্যরকম একটা ফিলিং হচ্ছে। মার খাওয়ার সময় ভাবছিলাম, বেঁচে থাকার মধ্যে অনেক সুখ আছে। এইরকম চাকরি করে, নিত্য মৃত্যুর মোকাবিলা করে হঠাৎ একদিন টেসে গিয়ে লাভ কী? কম বয়েসে কত অ্যাডভেঞ্চারাস চিন্তা থাকে, কিন্তু পরিণত বয়েসে—

ম্যাথুস বলল — কিন্তু দুম্ করে পদত্যাগ করা উচিত নয়।

বন্ড বলল — দুটো খারাপ লোককে শেষ করেছি আমি। মানে গত দু-বছরের মধ্যে। নিউ ইয়র্কে সেই জাপানিটাকে যে আর. সি. এ. বিল্ডিং-এ বসে আমাদের সংকেতগুলো ধরত। ওটা কে কী ভাবে মেরেছি, তা কখনও ভুলব না।

ম্যাথুস কোনো প্রশ্ন না করলেও বন্ড সেই ঘটনাটার বর্ণনা দেয়।

— ওই বাড়ির পাশে একটা উঁচু বাড়ির চল্লিশতলায় ঘর নিলাম। নিউইয়র্ক অফিস থেকে দুটো রেমিংটন থার্ট-থার্ট রিভলভার আনলাম, টেলিফোনিক সাইট আর সাইলেন্সার ফিট করা। অপেক্ষা করছি। আমার ধারণা, ও আগে একদিন গুলি চালাবে। তাতে জানলায় একটা ফুটো হবে। পরে আমি সেই গর্তটা দিয়ে গুলি চালাব। তাই হল। হাঃ হাঃ। আমার গুলিটা সোজা ওর হাঁ করা মুখের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল।

ম্যাথুস চুপচাপ শুনেছে। বন্ড এখন বেশ খোশমেজাজে। নিজের কীর্তিকাহিনি শুনিয়া যাচ্ছে।

— দ্বিতীয়টা স্টকহোমে। সে ব্যাটা একটা নরোয়েজিয়ান। সে জার্মানদের হয়ে স্পাইং করত। ওকে ছুরি মেরে, স্ট্যাবিং করে খুন করতে হল। ওর বেডরুমেরই... হ্যাঁ, এই দুটো সাহসিকতার জন্য ডবল জিরো — ০০ টাইটেল পেলাম।

...কিন্তু এখন অন্য চিন্তা হচ্ছে। প্রথমে নিজেকে খুব হিরো মনে হচ্ছিল। কিন্তু নিজে যখন ল্য শিফের হাতে মার খেলাম। তখন বুঝলাম, বন্ড যদি দুটি শয়তানকে খুন করে থাকে, তাহলে বন্ডের মতো শয়তানকেও খুন করার লোক থাকবে না কেন? কিন্তু আমি তো শয়তান নই! হয়তো ল্য শিফের চোখে আমি — সে যাইহোক, বিচারটা কে করবে? কে হিরো, কে ভিলেন?

ম্যাথুস কিছু বলার আগেই বন্ড বলল — আরে জানি, জানি, তুমি কী বলবে। দেশপ্রেম, দেশের কাজ, দেশের নিরাপত্তা — এই সব কথা তো? এসব পুরোনো কথা। এখন কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই, বেশ! কিন্তু এটাই বা এমন কী! এটাও পুরোনো হয়ে যাবে একদিন। দিন বড়ো জোরে ছুটছে, ম্যাথুস, বুঝেছ?

ম্যাথুস বলল — ল্য শিফ তোমাকে চিরকালের মতো পঙ্গু করে দিচ্ছিল, সেটা চরম শয়তানি নয়? তোমার মনে এসব চিন্তা কে ঢোকাল? ল্য শিফকে খতম করাই তোমার ডিউটি। দেখবে কর্তারা তাই বলবে। স্মার্সদের কথা এত সহজে ভুলতে পারছ? তোমার কোনো কর্তব্য নেই?

— হাঁ। কিন্তু ল্য শিফকে যদি আমি খুন করতাম, সেটা নিজের স্বার্থেই করতাম! দেশের সাংরক্ষণ নয় — টু বি ফ্রাঙ্ক!

ম্যাথুস বলল — মনে হচ্ছে, তোমার পুনর্জন্ম হয়েছে। নতুন জেমস বন্ড কথা বলছে। তবে, তোমার যুক্তিগুলো আমি শিখে নিচ্ছি।

বন্ড বলল — দুটো মূর্তি আছে আমার মনে। একটা সাদা, আরেকটা ঘন কালো। ভগবান পরিষ্কার, শয়তান অন্ধকার। কিন্তু শয়তানকে দেখতে কেমন?

— শয়তানকে অনেকটা মেয়েদের মতো দেখতে।

ম্যাথুসের কথায় বোঝা যায়, নারীজাতির উপর তার রাগ এবং সন্দেহ হচ্ছে। অবশ্য, এই লাইনে মেয়েদের দিয়ে অনেক হিংস্র হৃদয়হীন কাজ করানো হয়, ডিউটির নাম করে।

বন্ড বলল — আমার কিন্তু শয়তানের জন্য মায়া হয়। কী করে ভালো হবে, পুণ্যবান হবে, বইয়ে লেখা থাকে। কিন্তু কী করে শয়তান পাপী হবে, তেমন লিখিত নির্দেশ কোথায় আছে? হাঃ হাঃ, শয়তানের টেন কম্যান্ডমেন্টস কেউ লিখে যায় নি! ছোটবেলা থেকে গল্প পড়েছি, হিতোপদেশ পড়েছি — দুষ্টির দমন, শিষ্টির পালন। কিন্তু দুষ্টির পক্ষ নিয়ে কেউ একবার ভাবেনি!

বন্ড তার ভাষণ শেষ করল।

— আসলে কি জানো? ল্য শিফ আমাদের উপকারই করেছে। শয়তান না থাকলে আমরা ভালোকে বুঝব কেমন করে?

— ফাইন! — ম্যাথুস হাততালি দিল — তোমার কথায়, এক্ষণে আমি পাপের রাস্তায় যাবার প্রেরণা পাচ্ছি। খুন, রাহাজানি, নারী-নির্যাতন কোন দিক দিয়ে শুরু করি বলো তো!.. কিন্তু, বন্ড, বিবেক বলে একটা জিনিস আছে। বাঁদর জাতির মধ্যেও ‘বিবেক’ জন্ম নিয়েছিল, মানুষের আগে। তবে তুমি যদি পদত্যাগ করো আমার মতে সেটা হবে একই সঙ্গে হত্যা এবং আত্মহত্যা।

হঠাৎ ঘড়ি দেখে চমকে উঠল ম্যাথুস।

— আর আধঘন্টা দেরি হয় গেল। চিফ অব পুলিশের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।

দরজার কাছে গিয়ে ম্যাথুস বলল — জেমস, তোমার আবার ইউনিভার্সিটির ছাত্র হওয়া উচিত। নীতিশাস্ত্র পড়ো — কে ভালো, কে মন্দ — ইত্যাদি। তবে একটা কথা শুনে নাও। আমার ধারণা, লন্ডন থেকে ফিরে শুনব, আরও বেশ কয়েকটা ল্য শিফ তৈরি রয়েছে তোমায় খুন করতে। এম-এর কাছেই জানতে পারবে। তাছাড়া বন্ড, তুমি এখন একটা ‘মেশিন’ হঠাৎ ‘মানুষ’ হতে চাইলে গোলমাল হবে।... চলি।

ভেসপার রোজই নার্সিংহোমে আসত ফুল নিয়ে, বন্ডকে দেখতে।

আশ্চর্য, বন্ড খুব একটা ফুল ভালোবাসে না। তাব কাছে ফুল কেমন এক মেয়েলি জিনিস! তাছাড়া, ফুল মনকে নরম করে দেয়। বন্ড নরম মন চায় না।

তাছাড়া, কাজের দিক থেকে ভেসপার লিভ বেশ কয়েকটা ভুল করেছে। এম-এর কাছে রিপোর্টে এখুনি সে সব লেখার খুব প্রয়োজন নেই।

ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছেন — শরীরে বড়ো কোনো ক্ষতি হবে না। ধীবে পুরো ফিট হয়ে যাবে। তবে দুর্দান্ত ধকল গেছে, সময় লাগবে।

তবে মনটা বেশি ধাক্কা দিয়েছে। ইস্, তার পৌরুষ কেড়ে নেওয়া — ভাবা যায় না!

ভেসপারকে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। তাকে কাছে পাওয়ার অনেক সুযোগ এসেছিল — গাড়িতে, ভিলাতে। অবশ্য এখনও সে জানেনা, কেমন মেয়ে ভেসপার, কেমন তার মন!

রিপোর্টটা পাঠাতে হবে। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আটদিন কেটে গেছে। এখন সকাল। রাতে ভালো ঘুম হওয়াতে শরীর-মন দুই-ই সতেজ।

ভেসপার লিভ এল। ক্রিম রঙের ফ্রক, কালো বেস্ট।

— বাঃ, ভেসপার, বিপদে পড়ে তুমি দেখছি আরও সুন্দর হয়ে উঠেছ। কী করছ তুমি এখন? ভেসপার একটু মনমরা।

— কী আর করব! এখন আমি একা। সমুদ্রের ধারে যাই, বই পড়ি। বেশ কিছু দিন রোদে পুড়েছি, চান করেছি। এখন শুধু বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে বেড়াতে ভালো লাগে।

বন্ড চুপ করে শুনছে।

ভেসপার বলল — ডাক্তার বলেছেন, তুমি শিগগিরই হাঁটা-চলা করতে পারবে। তখন তোমাকে সমুদ্র পারে নিয়ে যাব। সমুদ্রে স্নান করা তোমার পক্ষে ভালো।

— আমার গা এখন ক্ষতবিক্ষত। সমুদ্রস্নানের সময় যে কেউ আমার চেহারার দশা দেখলে আঁতকে উঠবে।

বন্ড ইঙ্গিত দেখাল। তার নিম্নাসের অবস্থা, যা চাদরে ঢাকা আছে, আরও ভয়াবহ।

ভেসপার অনুতপ্ত। সে নিজেকে দোষী মনে করছে। দু-হাতে মুখ ঢাকল সে।

বন্ড পরিস্থিতিটা হালকা করার চেষ্টা করল।

— ঠিক আছে। সেরে উঠে আমরা সমুদ্রপারে বেড়াব, স্নান করব। বেশি দেরি নেই।

এরপর অন্য কথা। ল্য শিফ খতমে লন্ডনের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি।

বন্ড জিজ্ঞেস করল — আচ্ছা ভেসপার, তোমাকে নাইট ক্লাব থেকে ওরা কীভাবে ছিনতাই করল?

— মাথাটা ঠিক ছিল না। অনামনস্ক অবস্থায় বাইরে আসতেই পাশের গাড়ি থেকে দুটো লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি ভাবছি, পত্রবাহক ওই গাড়ির মধ্যে আছে, তাই গাড়ির দিকে এগোচ্ছিলাম। আমার স্কার্টেই আমাকে মুড়ি দিয়ে বেঁধে তুলে নিয়ে গেল। ছিঃ, গাড়িতে সিটের ওপর ফেলে আমাকে আবার বাঁধতে চাইল। আমি ব্যাগটা জানলা দিয়ে ফেলে দিলাম .. যদি কারুর চোখে পড়ে! মাথা কাজ করছিল না, যা মনে এল, তাই করলাম।

— হ্যাঁ, ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে তুমি বুদ্ধিমতীর কাজই করেছিলে! ল্য শিফের ভিলাটায় পৌছে দেখেছিলাম তুমি আমার কাছে আসার চেষ্টা করছ।

— তোমায় ওরা কী করল?

— আর্ম চেয়ারে ফেলে ওরা নিজেরা মদ আর তাস নিয়ে বসে গেল। স্বার্শের লোকটা একবার ঢুকেছিল। বাইরে থেকে নানা শব্দ কানে আসছিল। কেমন একটা ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম, কিন্তু তোমার চিৎকার শুনেছিলাম একবার। স্বপ্ন কিনা জানি না।

— স্বপ্ন নয়, সত্যি।

— ইস্, সবই আমার জন্য!

ভেসপারকে সান্ত্বনা দিল বন্ড — থাক, ওসব কথা থাক।

— কাল আসছ তো?

— আসব।

চোখ মুছে চলে যায় ভেসপার।

॥ বাইশ ॥

বন্ড এখন প্রায় পুরো সুস্থ।

লন্ডনে রিপোর্ট পাঠানো হয়ে গেছে। ভেসপারের কিডন্যাপিংটা বিশদভাবে লিখল।

ভেসপার রোজই আসে বন্ডকে দেখতে। দুজনে অনেক গল্প করে। সে জানাল, চিফ অব পুলিশ এবং ক্যাসিনোর এক কর্তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তার।

বন্ড মেয়েদের খুব একটা পছন্দ করত না। কিন্তু ভেসপারের আন্তরিকতা ওকে অনেকটা মুগ্ধ করেছিল। ভেসপার এক ঝলক পরিষ্কার হাওয়া, যা প্রাণবন্ত, শান্তি দেয়, জীবন জুড়ায়।

বন্ড সুস্থ হয়ে প্রথম দিন বাগানে বসার অনুমতি পেল। তারপর অল্প হাঁটাচলা শুরু করল। প্যারিস থেকে যে ডাক্তার এসেছিলেন তার চিকিৎসার জন্য, তিনি ঘোষণা করলেন — এবার বন্ড একেবারে সুস্থ!

তিন সপ্তাহ আগেই মৃত্যু এসেছিল, সেটা অবশ্য ভোলার নয়।

ভেসপার বলেছিল — আজ আমার সঙ্গে চলো।

— চলো।

কিন্তু কোন দিকে যাচ্ছে, বন্ড জানত না। বন্ড চেয়েছিল শহর থেকে কিছু দূরে যেতে।

— তাই হবে। — ভেসপার বলেছিল, কিন্তু জায়গাটা বলে নি।

ওরা যাচ্ছে সমুদ্রতীর দিয়ে। ল্য শিফের ভিলার দিকে। সেদিনের কথাগুলো মনে পড়ছিল বন্ডের।

— কী ভাবছ?

— না, কিছু না। ... মনে হচ্ছিল কেউ ‘ফলো’ করছে। বোধহয় তা নয়।

হঠাৎ পেছন দিকে তাকিয়ে বন্ড বলল — ওই দেখ!

চারশো গজ দূরে একটা কালো গাড়ি! ভেসপার বেশ ভয় পেয়েছে। বন্ড বলল — রাস্তাটা তো আমাদের একার নয়, যে কেউ গাড়ি চালাতে পারে। তাছাড়া, এখন আমাদের ‘ফলো’ করে কার লাভ?

হঠাৎ বন্ড ড্রাইভারকে বলল — গাড়িটা রাস্তা পেরিয়ে দাঁড় করাও।

আয়না দিয়ে পেছন দিকটা দেখল বন্ড।

সাঁ করে গাড়িটা পাশ কাটিয়ে চলে গেল। শুধু সিতে বসা লোকটার মুখের একটা পাশ দেখা গেল। লোকটি অবশ্য একটি সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে ছিল। রেস্টুরেন্টের সাইনবোর্ড।

ভেসপার বলল — লোকটা কিন্তু আমাদেরই ‘ফলো’ করছিল। আমাদের দেখে নিশ্চিত হল।

— না, না, সে সব কিছু নয়।

— তাই! সত্যি আমার মনে যা ভয় ঢুকে গেছে!

ওরা এবার নির্দিষ্ট জায়গায় এসে গেল। মানে, যেখানে ভেসপার বন্ডকে আনতে চেয়েছে।
পাইনগাছের মধ্যে একটা সাদামাটা ছোটো হোটেল। দূরে সমুদ্র।

— তেমন কিছু নয়। তবে বেশ নির্জন। খাবারটা চমৎকার।

বেশ আয়েস করে খেতে খেতে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল বন্ড। অর্থাৎ, বন্ড জায়গাটাকে বেশ ভালোভাবে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে চায়।

বন্ডের এই মাথা ঘোরানো, আইবল মুভিং ভেসপারের দৃষ্টি এড়াল না। সে চিন্তিত হল — বন্ড কি জায়গাটাকে নিরাপদ মনে করছে না!

খাবারে একটা কামড় দিয়ে বন্ড একটা শ্বাস ছাড়ল। দেখা দিল মুখে এক হালকা প্রসন্নতা। অর্থাৎ, জায়গাটা নিরিবিলা বলেই মালুম হচ্ছে। চিন্তার সেরকম কোনো কারণ নেই।

হোটেল থেকে সমুদ্রের দূরত্ব বোধহয় হাতে গোনা। ছন্দে ছন্দে সমুদ্রলহরী সোনালি বালুকাভূমিকে সিক্ত করে রাস্তায় ওঠবার সিঁড়িকে এসেও কখনো কখনো ছুঁয়ে যাচ্ছে। আবার ফিরে যাচ্ছে আপন ছন্দে। আঃ, কী মনোরম, শান্ত স্থান। এরকম নিভৃত এক স্থানে যদি জীবনটা কেটে যেত। তাহলে পৃথিবীর নানা উপদ্রবকে কাঁধে নিয়ে তার সমাধানের বোঝা বইতে হত না।

ভাবতে ভাবতে বন্ডের মনটা যখন অন্য জগতে বিচরণশীল, তখন একটা গাড়ির শব্দে তার চমক ভাঙে।

বাড়ির মালিক মঁসিয় ভারসোয়া ও তার স্ত্রী।

মাদাগাস্কার যুদ্ধে একটা হাত বাদ গেছে মধ্যবয়সি এই মঁসিয় ভারসোয়ার। সমুদ্রের ধারে এই স্বর্গীয় নিবাসটি তারই। রয়্যালের পুলিশের চিফের বন্ধু তিনি। এবং চিফের অনুরোধেই মঁসিয় ভারসোয়া বন্ডের সব ব্যবস্থা করে দেন। অবশ্য তার আগে ভেসপারকেও চিফ সব বলে রেখেছেন। দিন সাতেক এখানে থাকবে বন্ড। সাত দিন কেন, বন্ড ভাবে — যদি সাত সাত করে বহুদিন সে এখানে থাকতে পারত —

বন্ড হোটেলের আশেপাশে কিছুক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে অ্যাগ্রন-পরিহিতা মাদাম ভারসোয়াকে দেখলেন। বোঝাই যাচ্ছিল — যুবতি, সুন্দরী এই মহিলা এখন রান্নায় ব্যস্ত। ভারসোয়া দম্পতি নিঃসন্তান। তাই বোধ হয় হোটেলের অতিথিদের সেবাতেই এঁরা বিশেষত মাদাম ভারসোয়া নিজেই এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

মাদাম ভারসোয়া বলেন — কেমন লাগছে জায়গাটা মিস্টার?

— দারুণ! এইরকম একটা জায়গায় যদি সারাটা জীবন কেটে যেত—

— তাই! তাহলে থেকে যান এখানেই।

দুজনেই হেসে ওঠে।

একটা গাছের আড়াল থেকে ভেসপার ওদের দেখে।

মাদাম ভারসোয়া এবার বন্ডদের থাকবার ঘর দেখাতে নিয়ে যায়।

বন্ড ও ভেসপারের দুটো ঘর, পাশাপাশি। মাঝখানে টয়লেট। সবকিছুই একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার।

মাদাম ভারসোয়া বলল — আজকে শুধু আপনারা দুজনেই হোটেলের গেস্ট। মঙ্গলবার আজকে। সাধারণত শুক্রবার বিকেল থেকে ভিড় জমে ওঠে। ইংরেজরা তাদের অবকাশ কাটাতে এই সময়টাতে ভিড় করে এখানে। কিন্তু কেন জানি না, এ বছর সেরকম ভিড় হচ্ছে না। তবে

রয়ালে যারা ঢোকে, বেশরভাগই হেরে ফিরে যায়। সেটাও একটা কারণ। নইলে কিছুদিন আগে পর্যন্তও বেশ ভালোই ভিড় হত।

বন্ড বলে --- ঠিক আছে, দেখি আমি আপনার হোটেলের ভিড় বাড়াতে পারি কিনা।

আবার দুজনে হেসে ওঠে।

ওরা বাইরে বেরিয়ে আসে।

ভেসপার বাইরে চেয়ারে বসে আছে।

বন্ড বলে --- এই যে ভেসপার, তুমি এখনও এখানে বসে। আমাদের থাকবার ঘর দুটো দেখেছ?

॥ তেইশ ॥

বন্ড ও ভেসপারের ঘরের মাঝখানে বাথরুম। ভেসপারের ঘর ডবল বেড রুম। ভেসপারের ঘরের বাইরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বন্ড, ভেসপার এবং প্রোপ্রাইটর। প্রোপ্রাইটর পরে আসবে জানিয়ে চলে যায়।

প্রোপ্রাইটর চোখের বাইরে চলে গেলে দরজায় গায়ে হেলান দেওয়া বন্ড এবার ভেসপারের দিকে তাকায়।

ভেসপারও তার দৃষ্টি বন্ডের দৃষ্টির সাথে আটকে নেয়।

বন্ড ভেসপারের সারা শরীরটার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। ভেসপারের উদ্ধত বুকের দিকে বন্ডের দৃষ্টি কয়েক সেকেন্ডের জন্য আটকে যায়। তাবপর সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভেসপারকে কাছে টেনে নিয়ে প্রথমে দুই গালে চুমু দেয়। এরপর—

বন্ড একহাতে দরজাটা বন্ধ করে অন্য হাতে ভেসপারকে টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

চুম্বন-প্রদান নতুন করে শুরু হল। বন্ড ভেসপারের নিম্ন ওষ্ঠটি এবার নিজের দুই ওষ্ঠের মধ্যে রাখে। ভেসপারও বন্ডকে প্রবল কামনায় জড়িয়ে ধবে।

ওরা দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ। বন্ড বলে --- আজকে আমাদের সুখ, আনন্দে ডুবে যাবার এক স্বর্গীয় স্থান পেয়েছি। ডারলিং, মাই সুইট ডারলিং ---

কামনাতাড়িত ভেসপারের চোখ জ্বলছে।

বন্ড এবার আরও জোরে ভেসপারের দেহটা দুই বাহু দিয়ে নিজের শরীরের সাথে চেপে ধরে। আবার চুম্বন দিতে দিতে বন্ড এবার তার মুখ ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামাতে থাকে। বুকের স্তনযুগলের মাঝে এখন বন্ডের মুখ। বন্ড বাঁ হাত দিয়ে ভেসপারের জামার চেনটা টেনে দেয়।

ভেসপার এখন স্মার্ট, সপ্রতিভ। বন্ডের ভালোবাসার উত্তর দিতে তার এখন কোনো জড়তা নেই। সে-ও এবার বন্ডকে দাঁড় করিয়ে তার টাই, জামার বোতাম খুলে দিচ্ছে। এবং—

ভেসপার নিজের জামাটা খুলে ফেলে। বন্ডকে নিয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে যায়। বন্ডের মাথাটা ধরে তার দস্তভরা দুই স্তনের মধ্যে চেপে ধরে। ভেসপারের পরনে শুধু রঙিন ব্রেসিয়ার।

আস্তে আস্তে সে বন্ডকে নিয়ে বিছানায় চলে আসে। কিন্তু —

বুকে মুখ ঘর্ষণরত বন্ড আচমকাই ভেসপারকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর ভেসপারের দিকে তাকিয়ে বলে --- সরি ডারলিং। এখনই না —

ভেসপারের মুখটা শুকিয়ে যায়। কেন? বুঝতে পারে না সে।

ওরা উভয়ই উভয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে বয়ে চলেছে দেহজ কামনার নীরব ঝড়।

বন্দ বুকে পড়ে ভেসপারের ঠোটে, বুকে ঘনঘন চুম্বন একে দিল। তাবপর একটা লম্বা শ্বাস ফেলে কী যেন খুঁজতে লাগল।

-- কী খুঁজছ?

-- আমার ব্যাগটা। এর মধ্যে আমাব সিগারেট আছে।

ভেসপার উঠে বন্দকে নিজের ব্যাগ থেকে একটা সিগারেট দিল। তারপর নিজেও নিল। লাইটাব জেলে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল।

ঘরের জানলাটা খুলে ভেসপার বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা হাত তুলে জানলার বিটের ওপর বাখে, অন্য হাতে সিগারেট টেনে চলেছে সে।

ভেসপারের পরনে এখন শুধু ব্রা আর প্যান্টি। কোমরের খাঁজ পিছন থেকে আরও চিত্তাকর্ষক মনকে মাতাল করে তোলে।

সিগারেট টানতে টানতে বন্দ বিছানায় গিয়ে বসে। এক দৃষ্টিতে ভেসপারকে সে লক্ষ করতে থাকে। ভেসপারও সেটা বুঝতে পারে। না বোঝার কিছু নেই।

বন্ডের মুখে জ্বলন্ত সিগারেট, প্রায় শেষ হয়ে আসছে। উত্তেজনায় ঘন ঘন টান দিচ্ছে সে। বন্দ টাই, জামা সব খুলে ফেলে। উঠে দাঁড়ায়। দু'পা এগিয়ে আসে। সিগারেটটা ঘরে রাখা অ্যাশ ট্রেতে গোঁজে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ভেসপারের দিকে।

পিঠের ওপর ব্রেসিয়ামের স্ট্রিপে হাত রাখে। এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ভেসপারকে। সবল হাতেব আলিঙ্গনে ভেসপারের যৌবনপুষ্ট দেহটা সামান্য কেঁপে ওঠে। ঠোঁট থেকে সিগারেটটা পড়ে যায়। বন্দ তার ঠোঁট রাখে ভেসপারের নগ্ন কোমল কাঁধে। ব্রেসিয়ামের হুক খুলে দেয়। তারপব —

না। এবার নিজেকে পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দিল ভেসপার। বন্দকে অবাক করে দিয়ে সে এক ঝটকায় ব্রেসিয়ামটা খুলে ফেলে দিল। পাগলের মতো বলে উঠল — কাম অন, কাম অন ডারলিং!

মুগ্ধ বিষ্ময়ে বন্দ তাকিয়ে রইল ভেসপারের দিকে। ভেসপারের চোখ নয়, যেন তার গর্বোদ্ধত স্তনদ্বয় তাকে সুখক্রীড়ায় নীরব আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ভেসপার বন্ডের একটা হাত তুলে তার নিজের বুকের ওপর রাখে।

একী! বন্দ কাঁপছে। দুর্দম, কঠিন জেমস বন্ডের হাত কাঁপছে কেন? কপালে ঘাম ফুটে উঠছে। চরম আবেগে ভেসপার জড়িয়ে ধরে বন্দকে। বন্ডের নগ্ন বক্ষে এখন ভেসপারের শরীরের এক পরম সুখসম্পদ গভীরভাবে ঘসে চলেছে। বন্দও এখন পাগল হয়ে গেছে।

ভেসপার বলে — বিছানায় চল। এখানে নয়।

বন্দ ওর দুই স্তনের মাঝে মুখ বেখে বলে — এখন নয় ডারলিং। আমি তো তোমাব সঙ্গেই আছি।

বন্ডের দুই হাত ভেসপারের কাঁধে। ভেসপার ওর এক হাত বন্ডের এক হাতের ওপর রেখে অন্য হাতের আঙুল দিয়ে বন্ডের বুক আলপনা আঁকতে আঁকতে বলে — বেশ, তুমি যা বলবে। এক কাজ করো। তুমি তোমার ঘরে যাও। আমি ততক্ষণ ন্নান সেরে আসি। তারপর তুমি।

ভেসপারের ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও দরজার কাছে এসে বন্দ আবার ঘুরে দাঁড়াল। ভেসপার ততক্ষণে গায়ে তার জামাটা দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছে। বন্দ ডাকল -- ভেসপার, ডারলিং --

ভেসপার ঘাড়টা সামান্য ঘোরাল। বন্ড দেখল, ভেসপারের চোখ দুটো ভিজে উঠেছে। বন্ড এগিয়ে গিয়ে ওকে আবার গভীরভাবে চুমু খেল। কোনো কথা বলল না কেউ। তারপর দরজা খুলে চলে এল নিজের ঘরে।

বন্ড এখন নিজের ঘরের বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে আছে। সে ভাবছে, এখন কি সে সমুদ্রনানে যাবে, নাকি ভেসপারের কাছে? ভেসপার যে তাকে এখনই সব দিতে চেয়েছিল। ভেসপারের সারা দেহ কামনার আঙুনে ভীষণভাবে জ্বলছিল। কিন্তু বন্ড কেন জানিনা ভীষণ টায়ার্ড ফিল করছে। তার কাছে তো ভেসপার সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল। তবে?

— চল। ঘরে যাওয়া যাক। — বন্ড ভেসপারকে বলে :

ভেসপার বন্ডের দিকে এক বলক দেখে নিয়ে মুখটা ফিরিয়ে নেয়।

বন্ড তা বুঝতে পারে। বলে — ভেসপার, এখন অভিমান করে থেকে না। চল, ঘরে গিয়ে আমরা বসে কফি খাব। — বন্ড ওর একটা হাত ধরে।

কফি খেতে খেতে ঘরে বসে জানলা দিয়ে ওরা রহস্যময়ী সমুদ্রের ক্রীড়াশৈলী দেখছিল।

কফিতে চুমুক দিয়ে বন্ড বলে — একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ ভেসপার?

— কী?

— ওই যে সমুদ্র; এত গর্জন, এত আশ্ফালন — দেখো, শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় এসে তাকে মাটির সাথে মিশে যেতে হচ্ছে। সত্যি, ভাবতেও বেশ লাগে।

ভেসপার হেসে ওঠে। তারপর চেয়ারের পিছনে এসে বন্ডের দুই কাঁধে হাত রেখে সে বলে — রিয়েলি! তুমি যেন কবি হয়ে উঠছ।

বন্ড সিগারেট ধরায়। তারপর চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ায়।

সমুদ্রের দৃশ্য। সমুদ্রের ওপর মুক্ত নীল আকাশের নীচে সামুদ্রিক পাখির দল তাদের ডানা মেলে আনন্দে মাতোয়ারা যেন। সমুদ্রের ধ্বনির সাথে পাখিদের কলতান মিশে অন্য এক সংগীতের সৃষ্টি করেছে।

ভেসপার বলে — আমি চললাম নিজের ঘরে। যাই, স্নানটা সেরে নিই।

বন্ডের দৃষ্টি ধরে রেখেছে সমুদ্র ও নীলাকাশ। হাতে সিগারেটটা পুড়ে চলেছে।

— কী হল? কী ভাবছ?

চমকে ওঠে যেন বন্ড। ঘাড় ঘুরিয়ে ভেসপারের দিকে তাকাতেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় — ভাবছি, সমুদ্রের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করে আসি।

— হোয়াট? খেলা করবে মানে?

— মানে... ঘুরে দাঁড়িয়ে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বন্ড হেসে বলে — বুঝতে পারলে না। চল, আমরা দুজনে স্নান করে আসি।

ভেসপার বলে — না তুমি যাও। আমার এখন সমুদ্রনানের মুড নেই। আমি বাথরুমের স্নান করে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে রেস্ট নেব কিছুক্ষণ।

— ও. কে.। অ্যাজ ইউ লাইক।

ভেসপার নিজের ঘরে চলে যায়।

বন্ড অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে স্যুটকেসটা খুলে সুইমিং কস্ট্যুমটা পরে তার ওপর একটা গাউনমতো চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে।

সি-বিচের ওপর দিয়ে বন্ড হেঁটে চলেছে। চারদিক তাকিয়ে দেখল ভালোভাবে - না, ওর দৃষ্টিতে কোনো সমুদ্র দর্শনার্থী বা স্নানার্থীকে চোখে পড়ছে না। কোমরে হাত দেয় বন্ড বেখেয়ালে। না, মনে হয়, ছোটো যন্ত্রটির কোনো প্রয়োজন নেই এখানে।

আবার হাঁটতে শুরু করে বন্ড। সমুদ্রের ডেউ এসে তার হাঁটু পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়ে চলে যায়। জল পিছন দিকে সরে যাবার সময় মনে হচ্ছে যেন, পা বোধহয় বালির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। মন্দ লাগছে না।

বন্ড এখন সি-বিচের ওপর শুয়ে। পাশে গাউনটা রাখা আছে।

ভেসপারের কথা হঠাৎ মনে আসে তার আরও নানা চিন্তার মধ্যে। বন্ড ভাবে — ভেসপার আসলে কী চায়? ওব ইচ্ছেটা কী? যদিও এসব প্রোফেশনে ভেসপাররা কোনোদিনই পার্মানেন্ট নয়। যদিও সে যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে, অন্যের সুখ-দুঃখের প্রতিও তার দৃষ্টি আছে। সে যাই হোক না, বন্ড তার কাছে প্রয়োজন ছাড়া খোলামেলা হবে না। তাতে বন্ডেরই অনেক সময় সুবিধে হবে।

প্রায় মিনিট দশেক পর বন্ড চোখ মেলল। সূর্যের তেজ কমতে শুরু করেছে। কিন্তু সমুদ্রের গর্জন অব্যাহত। দাঁড়িয়ে এক সুব, আর সমুদ্রের কোলে শুয়ে অন্য এক রিদম্ কানে বাজে।

উঠে বসে বন্ড। নাঃ, আর স্নান করবে না সে এখানে। বরং, হোটোলে ফিরে গিয়েই স্নানটা করা যাবে। ভেসপার নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হোটেলের দিকে হাঁটা শুরু করে বন্ড। গাউনটা হাতে নিয়ে নেয়।

॥ চক্ৰিশ ॥

— হ্যালো, জেন্টলম্যান, সমুদ্রে স্নান করলেন? — মাদাম ভারসোয়া গেটের মুখে দাঁড়িয়ে।

— না, তবে জাস্ট সান-বাথ।

আর কোনো কথা না বলে বন্ড তার ঘরের দিকে চলে যায়।

মাদাম ভারসোয়া উন্মুখ হয়ে বন্ডের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঘরে ঢুকে বন্ড বিস্মিত। একী! তার জিনিসপত্র টিপটপ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেখানে যেটা থাকা উচিত। এমনকি বেসিনে টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, শেভিং আইটেমস, সোপ, আফটার-বাথ-ফ্র্যাগারান্স — যেখানে যা থাকা দরকার। বাথটবে পর্যন্ত জল ভর্তি। শাওয়ার খুলে দেখল বন্ড। না, ঠিকই আছে।

ভেসপারের ঘরের দরজা খুলে উঁকি মারতেই টেবিলের ওপর চোখে পড়ল একটা স্লিপিং পিলের ছোটো শিশি। তার মানে ভেসপার এখন মানসিক অস্থিরতায় আক্রান্ত।

— ভেসপার। — বন্ড ডাকে।

ভেসপার ঘুমিয়ে পড়েছিল। দারুণ দেখাচ্ছে যেন ওকে।

বন্ড আবার ডাকে - - ভেসপার। ভেসপার।

ভেসপার উঠে বসে।

বন্ড বলে — আচ্ছা, তোমাকে এত কষ্ট করে আমার জিনিসপত্র কে গুছিয়ে দিতে বলেছে? একটা হাই তুলে, স্কাটটা ঠিক করে ভেসপার বলে — আমি তোমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। তোমার দেখাশোনার দায়িত্ব আমার। আর কিছু?

বন্ড মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ে।

ভেসপার বলে — যাও, তাড়াতাড়ি স্নান করে এসো। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। ঐ মেয়েটা মনে হয় আজ দারুণ সব রান্না করেছে। কিছুক্ষণ আগে আমি গন্ধ পাচ্ছিলাম।

এখন ওরা ডাইনিং টেবিলে। যদিও লাঞ্চার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। এবং ওদের ডাইনিং টেবিল বাইরের লনে। ডাইনিং টেবিলের ওপর শ্যাম্পেনের দুটো বোতল। মেটে দিয়ে বানানো হয়েছে একটা কারি, মাখনে ভাজা রুটি, মাখনের কিউব, বরফের কিউব। আর রয়েছে সস, কিছু কাটা ফ্রুটস। মিনারেল ওয়াটার।

প্রথম মিনিট দুই ওরা যেভাবে খাবার গলাধঃকরণ করল; দেখে বোধ হবে, ওরা বোধহয় কয়েকদিন খায়নি।

বন্দ একবার দুটো গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল। চুমুক দিয়ে বলল — কেমন লাগছে?

— ভালোই। তবে মনে হয় ভেসপার মি. জেমস বন্ডের ঠিক যোগ্য নয়।

— হঠাৎ এরকম মনে হওয়ার মানে?

শ্যাম্পেনের গ্লাসটা খালি করে ভেসপার বলে — না মানে, এই যে কাজের জন্য আমি সর্বক্ষণের সঙ্গী তোমার, সে কাজ ফুরিয়ে গেলে আমাদের রাস্তা আবার দু'দিকে চলে যাবে। এই দেখনা। দীর্ঘকাল কেউ একসঙ্গে থেকেও একসময় তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।

— তুমি কি আমার সঙ্গে...।

বন্দ খেমে যায়। না, মনের সব কথা কোনো সুন্দরী মহিলাকে সবসময় উচিত নয় বলা।

বন্দ শুধু বলে — ও. কে., ও. কে.। রিল্যাক্স। আগে তো পেটভরে খেয়ে নাও। পরে আমরা আমাদের কাজের বিষয় ও অন্যান্য সবকিছু নিয়ে ফ্রিলি আলোচনা করব।

বলে বন্দ ভেসপারের গ্লাসে আবার শ্যাম্পেন ঢেলে দেয়।

ওদের খাওয়া শেষ হয়। বয় এসে খাবারের প্লেট, বোতল সব তুলে নিয়ে যায়।

বন্দ বলে — চল. সমুদ্রের ধার থেকে ঘুরে আসি।

সমুদ্রের ধারে বসে, কিছুক্ষণ শুয়ে ওরা অনেকক্ষণ গল্প করল।

বন্দ শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছিল। ভেসপার বলে — কী ভাবছ?

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বন্দ বলে — ভাবছি বিগত কয়েকটা দিনের কথা। কীভাবে যে আমি বেঁচে ফিরলাম। সত্যি আশ্চর্য! এখনও কাজ বাকি আছে।

বন্ডের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে ভেসপার বলে — কী কাজ? কোনটা?

— যথাসময়ে জানতে পারবে। — বলে বন্দ হাতঘড়ির দিকে তাকায়।

রাত আটটা।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল বন্ডের। সিগারেট ধরিয়ে জানলার সামনে দাঁড়াল। ভোরের সূর্যের রঙে সমুদ্রের এ এক অন্য রূপ। প্রকৃতির এ রূপকে বন্দ অগ্রাহ্য করতে পারল না।

ভেসপার এখনও ঘুমোচ্ছে। ওর সম্বন্ধে আজকেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে। থাক, ঘুমোক ভেসপার। ওর ওপর দিয়েও তো কম অত্যাচার হয়নি।

না, আর দেরি নয়। এরপর দেরি করলে প্রকৃতির এই রূপদর্শন থেকে সে বঞ্চিত হবে।

সুইমিং কস্ট্যুমটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বন্দ সমুদ্রের উদ্দেশে।

বন্ডের পা এখন সমুদ্রের জলে।

॥ পঁচিশ ॥

এখন হোটেল অঙ্ককার, কেন?

একটা টেলিফোন বুথ থেকে ভেসপার বেরিয়ে আসছে। বন্ডের চিৎকার শুনে সে ফিরে দাঁড়াল। মুখে হাত চেপে দিয়ে চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বন্দ বলল — কী ব্যাপার? কী হয়েছে তোমার?

— তেমন কিছু না। পরার মতো ড্রেস নেই। জামাকাপড়ের দোকানে এক বাঙ্কবীর খোঁজ করছিলাম। ম্যাথুসকেও জানাচ্ছিলাম, যদি কিছু পোশাক জোগাড় করে দিতে পারে।

— কিন্তু তুমি তো সি বিচে এলে না?

— যেতাম। তুমি অপেক্ষা করলে না কেন?

— যাকগে! চলো, আমরা বাইরে ব্রেকফাস্ট সারি।

ভেসপারকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আজ। বস্তুর মনটাও নরম হয়ে যাচ্ছে। বন্দ বলল — তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।

সুন্দর কাটল কয়েকটা দিন। বেশ অন্তরঙ্গভাবেই।

কিন্তু ক্রমশ একঘেয়ে লাগছে। নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব দেখা দিল। সেদিন ওই টেলিফোনটা আসলে কাকে করেছিল ভেসপার। জামাকাপড়ের এতই অভাব দেখা দিল? ড্রেস নেই— ব্যাপারটা শ্রেফ ছুতো! আজও বন্দ জানতে পারেনি। টেলিফোন বুথ থেকে কাকে ফোন করেছিল ভেসপার লিভ!

সম্পর্কটায় আর জোড়াতালি দেওয়া গেল না।

ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনারে দেখা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কথাবার্তার সুর পালটে গেছে। ভেসপারই উদাসীন। হাঁ-হাঁ করে দায়সারা উত্তর সারছে।

হঠাৎ অন্যান্য ভেসপার যেন চমকে উঠল। হাতে খাবারের কাঁটাটা ঝনঝন করে মেঝেতে পড়ে গেল।

উলটোদিকের টেবিলে একটা লোক এসে বসেছে। ভেসপার তাকে দেখেই চমকে উঠেছে, ফ্যাকাসে মুখ!

— কী ব্যাপার, ডার্লিং?

— সেই লোকটা।

— কোন লোক?

— সেই গাড়ির লোক, যে গাড়িটা আমাদের ‘ফ্লো’ করেছিল।

লোকটি এখন মেনুকার্ড দেখছে। খাবার পছন্দ করছে। খাবারের সঙ্গে ওয়াইনের অর্ডার দিল সে। বোধহয় বুঝতে পারল সে এখন কারুর লক্ষ্যবস্তু। তাই খবরের কাগজের পাতায় মন দেওয়ার ভান করল।

লোকটার একটা চোখ ঢাকা। কালো কাপড়ের ব্যান্ডেজ করা! একচক্ষু দানবের মতো দেখায় মুখটা। চোখের কভারটা স্কু দিয়ে আটকানো!

বন্দ বোঝাল — বাদ দাও! হোক না কেউ, কী করা যাবে?

কিন্তু ভেসপার উত্তেজিত। চাপা উত্তেজনা। সামলাতে গিয়ে খরখর করে কাঁপছে সে। গেলাস তুলতে গিয়েও তার হাতে কম্পন! ভেসপার বিড়বিড় করল — সেই লোক! আমি নিশ্চিত, এ সেই লোক!

মাথা ধরার অজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়ল ভেসপার।

— একী!

— ভীষণ মাথা ধরেছে। দুপুরে ঘরেই থাকব।

দ্রুত বেরিয়ে গেল ভেসপার।

বন্দ কফির অর্ডার দিল। একটু দেরি আছে। সে বাইরে এসে একটা গাড়ি লক্ষ করল। খুব সম্ভব এই লোকটার গাড়ি! এটাই কি ওদের 'ফলো' করেছিল? নম্বর প্লেটটা দেখল। লাগেজ ক্যারিয়ারে তানা-আঁটা।

রেস্টুরেন্টে ফিরে এল বন্দ।

লোকটি আহররত।

বন্দের কফি এল। প্রোপ্রাইটারকে ডাকল বন্দ। সে লোকটির সঙ্গে খাবার বাছাই-এর সময় হেসে হেসে কথা বলছিল।

— আচ্ছা, ওই লোকটা কে বলুন তো? আপনার পরিচিত?

— মোটেই না। কেন বলুন তো?

— না, আমার এক বন্ধুও ওইরকম চোখে কালো কভার বাঁধে। অনেকদিন দেখা হয় না। ভাবলাম, ও নাকি! হয়তো আপনার জানাশোনা, তাই —

প্রোপ্রাইটার-এর কাছ থেকে অন্য একটা বিষয় জানতে পারল বন্দ। এক্সচেঞ্জ জানিয়েছে, এখানকার একজন গেস্ট প্যারিসে ফোন করেছিল, কিন্তু 'নো রিপ্লাই' হয়েছে। তারা নাকি মাদাম, অর্থাৎ ভেসপারের খোঁজ করছিল! একটা নম্বর দিয়েছে, মাদামের কি সেটা দরকার?

॥ ছাব্বিশ ॥

আরও তিনটে দিন পার হয়ে গেল।

ভেসপার একবার রয়্যাল গিয়েছিল। ফিরে এসে জানাল, ওর কতগুলো ওষুধের খুব প্রয়োজন ছিল। হঠাৎ সে খুব উল্লসিত। আসল, না নকল, কে জানে। কিন্তু বহুদিন বাদে বন্দের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা-আদর-আহ্লাদের মধ্যে রাতটা কাটিয়ে দিল সে।

আশ্চর্য, ভোরবেলা কান্না। গমকে গমকে কান্নায় ভেঙে পড়ছে। বন্দ ব্যাপারটা ধরতে পারল না।

ভোরবেলায় চুপি চুপি নীচে গেল ভেসপার।

ফোন করতে কি? রবিবার আবার সেই চোখে পট্টি-আঁটা লোকটির আগমন।

'ইতিমধ্যে কালো গাড়ি এবং লোকটার খবর জেনেছে ম্যাথুস। লোকটার নাম অ্যাডলফ গেটলার। ভাগ্য ভালো হিটলার নয়। তবে সে জার্মান নয়, সুইস। ঠিকানা, জুরিখের একটা ব্যাংক। এখানে কী মতলবে এসেছে লোকটা। একটা ঘরও ভাড়া নিয়েছে।

ভেসপার আরও অদ্ভুত ব্যবহার করছে। যেন পাথর হয়ে গেছে। যেন বন্ধকেও চিনতে পারছে না।

বন্দ এবার বলল — ভেসপার, এভাবে চলতে পারে না। তোমার কী হয়েছে পরিষ্কার বলো।

ভেসপার চুপ।

বন্দ বলে — আমি তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু—

ভেসপারের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

— কীসের কষ্ট তোমার?

— আমায় একটু সময় দাও।

রাতের ডিনারে শ্যাম্পেন চাইল ভেসপার। আবার রুমাল দিয়ে চোখ মুছল।

রাতটাও সুন্দর কাটল বটে, কিন্তু ভেসপার আসল কথা বিন্দুমাত্র বলল না।

पवदिन सकाले या घटल, ताव जन्य एकटुं प्रसुत छिल ना वडु । अवशा घटना घटछे सकाले नय, आगेव बातेइ ।

प्रोप्राईटाव छुटे एसे जानाल — दाकण अ्याक्लिडेन्ट, मादाम —

ताव हाते एकटा खाम । पविचाविकाव चिंकाव शोना याछे ।

वडु लाफिये उठे भेसपावेल घवे छुटल ।

भेसपावेल घवेव दवजा खोला ।

भेसपाव इहजगते नेइ ।

टेविले खालि गेलास । चावपाशे सदा सदा गुडे । स्निपिं पिलेव बोतलटा सम्पूर्ण खालि । सेटा माटिते गडाछे ।

प्रोप्राईटावेल हातेव खाम समेत चिठिटा नये निजेव घवे एल वडु । चिठिटा खुले पडते शुक कवल ।

— डार्लिंग जेमस ।

आमि तोमाय तीषण भालोबेसेछि । सेइ भालोवासा नयेइ विदाय निलाम । कावण आमाव जन्य तोमाव भालोवासाओ निःशेषे मुछे यावे, यखन तुमि आसल सत्य जानते पाववे । आमि एम डब्लु डि व एजेन्ट । ह्या, डबल एजेन्ट आमि । आव ए एफ एव एक पोल्यान्डवासीव सङ्गे आमाव भालोवासा छिल । सेइ थेके ओदेव हयेइ काज कवछि । आमाव सेइ लोकइ आमाके चिठि लिखत, वा फोन कवत । कावण, आमाव सङ्गे ताव मेला मेशा कर्तवा बावण कवे दियेछिल । ह्या, एम ताके ट्रेनिंग दिये पोल्यान्डे पाठियेछिल । आमि वाशियानदेव हये काज कवछिलाम एखन । आमाव डिउटि छिल वयाले तोमाव काजकर्म देखे ओदेव खवव देओया । सुतवां, आसले आमि तोमाव शत्रु ।

किन्तु तोमाय केन आमि भालोबेसे फेललाम । आमाव सब पविकङ्गना गोलमाल हये गेल । तोमाव सङ्गे आमाव एइ भालोवासव सम्पर्क ओवा वुक्ते पेवे गेल । एवाव ओवा पोल्यान्डे आमाव प्रेमिकके माववे, आमाकेओ माववे ।

किन्तु आमाव किछु कवाव नेइ । आमि तोमाव केनो शक्ति कवते पावव ना । आमाव सब किछु तोमाय उजाड कवे दिये वसे आछि । आमाव आव ए दले यिंवे यावाव पथ नेइ ।

भेवेछिलाम, तोमाय नये पालिये याव । कोथाय ?

आमेविकाय येते पावताम । विये कवताम । नतुन एकटा संसाव पातताम ।

किन्तु ओवा आमाव पिछु छाडेनि । ठिक एखाने एसे गेल ।

एवाव आमाव काछे तिनटे पथ । अपेक्षा कवा, कवे स्पर्श आमाय खून कववे । कवे, तोमाके आमाव जन्य मृत्युव मुखे पडते हवे आवाव । अथवा —

अथवा — आत्माहत्या ।

विदाय निछि ताइ ।

प्याविसेव ओइ फोन नम्बर, आँभालिद ५५२०० ।

तोमाके वलिनि । ताहले तुमि तोमाव जीवन् विपन्न कवे आमाय प्राण वक्काव चेष्टा कववे । याइ, विदाय, प्रिय ।’

निजेके सामले निल वडु ।

কে এই ভেসপার ?

সে শুধু বন্ডের শত্রুপক্ষের গুপ্তচর মাত্র। ভালোবাসা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।

ভেসপার এক বিশ্বাসঘাতক!

এখন যেটা চিন্তার ব্যাপার, সেটা হল স্মার্স আবার কখন আঘাত হানবে।

ভেসপারের আত্মহত্যায় বন্ডের বিপদ কিছুমাত্র কমেনি। এমন আত্মহত্যা কতই ঘটে! কাজের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা ঢুকলে মরতেই হবে।

বন্ড-ও মরত।

এখন লড়াই চলবে : স্মার্স বনাম জেমস্ বন্ড।

লন্ডন অফিস থেকে ফোন এল।

বন্ড বলল : আর্মি ০০৭ বলছি। একটাই খবর। ওই ৩০৩০ মেয়েটা ডাবল এজেন্ট ছিল।

কাল রাতে সুইসাইড করেছে। ও. কে.!.....

অন হার-ম্যাজেস্টিজ সিক্রেট-সার্ভিস

॥ এক ॥

সেপ্টেম্বর মাসটা প্রায় শেষ হতে চলেছে। তবুও বাতাসে গরম ভাব এখনো আছে। হোটেলের লনটা খুবই সুন্দর। কত রকম ফুলের ঝাড় শোভা পাচ্ছে সেখানে। স্যালভিয়া, অ্যালিসাম ও লোবেলিয়া তাদের রঙে রাঙিয়ে রেখেছে লনটাকে। আর এই জায়গাটাই হল বিখ্যাত সেই উত্তর ফ্রান্সের বিশাল সমুদ্রতট। স্নানার্থীদের অঙ্গর তাঁবু দেখা যাচ্ছে। বাজনা বাজছে। লাউডম্পিকারে শোনা গেল ঘোষকের গলা। তিনি জানাচ্ছেন যে সাত বছরের শ্রীমান ফিলিপ বানার্ড তার মাকে খুঁজছে। মাদাম ভুকুর্সকে ফোনে কেউ ডাকছেন। ব্যায়ামশিক্ষকের হুইসিলের আওয়াজও আসছে থেকে থেকে।

অত্যন্ত মনোরম সমুদ্রতটের দৃশ্য। কীর্তিমান শিল্পীরা যেমন বোঁদা, টিসো ও মনেট বোধ হয় এই রকম মনোরম দৃশ্য দেখেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

জেমস বন্ড বসেছিল এক কোনায়, একটা কংক্রিটের দেওয়ালের আড়ালে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল বন্ডের ছেলেবেলার কথা। সাঁতার কেটেই কত সময় কাটিয়েছে সে। সেই সব দিনকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। চকোলেট আর লেমোনেড খেয়ে, ছোটো একজোড়া কোদাল আর বালতি নিয়ে এইখানে খেলা করেছে সে।

কিন্তু এই স্মৃতি রোমন্থনের আর শেষ তো নেই। হঠাৎ যেন মনটা অশৈর্ষ্য হয়ে গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবল এখন ওইসব স্মৃতির কোনো দাম নেই। সে এখন একজন যুবা পুরুষ। অনেক বীভৎস ও ভয়ংকর ঘটনার সন্মুখীন সে আগে অনেকবার হয়েছে। কাজেই কতগুলো পুঁচকে বাচ্ছা সাঁতার কাটছে দেখে বন্ডের এতটা ভাবপ্রবণ হবার দরকার নেই। সে একজন গুপ্তচর। একটা মেয়ের ওপর গোপন নজর রাখার জন্যই তার এখানে আসা।

এবার স্নানার্থীদের ঘরে ফেরার পালা। অনেকেই ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে। অঙ্ককার হয়ে আসছে একটু একটু করে। কফিহাউসগুলোতে আলো জ্বলছে। সুইমিং পুলের ঘোষক অনুরোধ কবছেন পুলটি খালি করার জন্য। একটু পরেই জমাট অঙ্ককার নামবে। যারা এই বেলাভূমিতে পিকনিক করতে এসেছিল তাদের অনেকেই চলে গেছে। এখন ঝাঁকে ঝাঁকে গাংচিল এসে উচ্ছিন্নগুলো টানাটানি করতে পারে। অবশ্য স্নানার্থীদের কুটিরগুলোর পেছনে প্রেমিক-প্রেমিকার দল বসবে আর প্রেম নিবেদনের পালা শুরু হবে।

হঠাৎ দুজন বিকিনি পরা দুই যুবতি দৌড়ে এসে বন্ডের পাশ দিয়ে সিঁড়িতে পা রাখল। এরা ফরাসি যুবতি — এদের নাভির কাছটা, বন্ডের মনে হল, পুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি। বন্ডের কাছে এসে এরা শরীরগুলোকে একটু নাচাতে নাচাতে যেন চলে গেল। এবার নুলিয়ারাও চলে গেল। সৈকতভূমি নির্জন হয়ে গেল।

কিন্তু এ কী? দূরে একটা রঙিন চাদরের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে এক যুবতি। অনেকক্ষণ কেটে গেছে। বন্ড অবশ্য একটু আগেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে শুরু করেছে। মেয়েটা কি তাহলে কোনো বিপদে পড়েছে? যদি পড়ে থাকে তাহলে একে একা ফেলে চলে যাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

তবে একটু ভুল হয়েছে বন্ডের। সবাই চলে যায় নি। অপর প্রান্তে কাফে দ্য প্লাগ-এ দুজন তখনো ছিল। বর্ষাতি আর টুপি পরা। লোকদুটোর সামনে কিছু কফির পেয়ালা, এদের দৃষ্টি যেন দূরের কাঁচের পার্টিশনটার দিকে যেখানে জেমসের মাথাটা আড়ালে রয়েছে। মেয়েটাকে এরা লক্ষ করছিল। বন্ড ভেবেছিল এই লোকদুটোও বিদায় নেবে।

মেয়েটি এবার উঠে পড়েই হাঁটতে লাগল। কোথায় যাচ্ছে সে? বোধ হয় ফেনা-ভরা জলরেখার উদ্দেশ্যে। বন্ড কী ভেবে উঠে পড়ল, জোরে পা চালান মেয়েটার দিকে। এবার ওই লোক দুটোও উঠে পড়ল। তারা বন্ডের পিছু নিল। মনে হল একটা ভয়ংকর কিছু ঘটতে চলেছে।

মেয়েটা জলের দিকে এগিয়ে চলেছে। কী ব্যাপার? আত্মহত্যা করবে নাকি? বন্ড অবশ্য সেটা হতে দেবে না। তার আগেই জাপটে ধরে বলবে “আরে ট্রেসি! তুমি এখানে কী করছ?”

সাদা সাঁতারের পোশাকে মেয়েটাকে দরুণ লাগছিল। ঘাড়ের ওপর সুন্দর চুলের গোছাটা যেন এলিয়ে রয়েছে। বন্ড দ্রুত পা বাড়িয়ে কাছে এসে গেল, বলল, “ট্রেসি তুমি?” মেয়েটা কোনো উত্তর দিল না, ঘুরেও দাঁড়াল না। বেশ কিছুক্ষণ পরে বন্ড যখন ওর মুখের সামনে তখন অশ্রুসিক্ত চোখে বন্ডকে দেখল, খুব আন্তে জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে? কী চাও তুমি?”

বন্ড একটু ধৈর্য হারিয়েছে। আবার সে একই প্রশ্ন করল। কিন্তু তখন যে উত্তরটা এল সেটা হল, “নড়াচড়া করো না। রিভলবারে হাত দিয়ে লাভ নেই। কথা না শুনলে পায়ে গুলি মারব।”

বন্ড চুপ করে গেল। তবে ভয় পেল না। ভাবলেশহীন দুটো রুপোলি চোখ যেন বন্ডকে গিলতে চাইছে। বন্ড অবশ্য ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে। আসলে এই লোক দুটো পেশাদারি খুনে। আর এই রকম অবস্থায় বন্ড কী করতে হয় সেটাও ভালোই জানে। বন্ডকে এবার বলা হল হাত দুটো মাথার পেছনে রাখতে। বন্ড অবাধ্য হল না। এ লোক দুটোকে দেখে মনে হচ্ছে ইটালিয়ান মافیয়া দলের কেউ হবে, গুপ্তচরও হতে পারে। মোটা চামড়ার লোক, বাদামি গায়ের রং। এরা ব্রোফেন্ডের দলের কেউ? তাহলে শিকার শিকারির উপর লাফাতে চাইছে না কি?

বন্ডের সামনে কোনো উপায় নেই। লোকটা এসে ওর পিস্তলটা খুলে নিল। সর্বাস্থে চাপড়ে দেখে নিল অন্য কোনো অস্ত্র আছে কিনা।

বন্ড একবার চট করে পিছনটা দেখে নিল। মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে পেছন ফিরে। তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। তাহলে কি মেয়েটাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে? আর কাজ হয়ে গেলে ওরা ওকে খুন করে ফেলে দেবে টেউয়ের ওপরে?

হঠাৎ শোনা গেল একটা মোটরবোটের ইঞ্জিনের গুঞ্জন। বোধ হয় উপকূলরক্ষীদের একটা দল এসে গেছে। আর এদের হাতে পড়লে ওই গুণ্ডা দুটো একদম সেন্দ্র হয়ে যাবে। কিন্তু মেয়েটার কী হবে?

কিন্তু বন্ড এবার দ্রুত একটা চালুকি করে ফেলল। মোজার ভেতর থেকে ছোটো ছোরাটা বার করে ডান দিকের পকেটে ভরে নিল। তবুও এখন আর কোনো আশা নেই। কারণ মোটরবোট এগিয়ে আসতে এই লোকদুটো পায়ের মোজা গুটিয়ে আর জুতো খুলে নিয়ে তৈরি হল বোট উঠবার জন্য। এবার মেয়েটা উঠে গেল সেই বোটে। তারপর বন্ড আর তারপর ওই লোক দুটো। বোট চলতে শুরু করল। মেয়েটার সোনালি চুলের খানিকটা বন্ডের গায়ে এসে কয়েকবার আলতো করে খসে গেল।

“ট্রেসি তোমার ঠান্ডা লাগবে। নাও আমার কোটটা পরে নাও।” মেয়েটা কোটটা গায়ে দিল আর বন্ডের হাতে একটা ইঙ্গিত করার মতন করে চাপ দিল। বন্ডের শরীরটা যেন হঠাৎ রোমাঞ্চিত হল। কিন্তু বন্ডের পকেটে লুকানো ছোরাটার কথা মনে পড়ে গেল। খুবই ধারাল গুটা। এই অস্ত্রটা ব্যবহার করার সুযোগ আদৌ পাওয়া যাবে কি না ভাবতেই গত চব্বিশ ঘন্টার ঘটনাবলি সে মনে মনে বিশ্লেষণ করে চলছিল।

চব্বিশ ঘন্টা আগে বন্ড তার পুরোনো “কন্টিনেন্টাল বেন্টলি” গাড়ি করে মন্ট্রিল শহরের চওড়া রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল আর গুপ্তচর বিভাগ থেকে তার পদত্যাগপত্র তৈরির খসড়াটা ঠিক করে নেওয়ার কথা ভাবছিল।

চিঠির বয়ানটা হল এইরকম। আর এটা মি. এম-এর উদ্দেশে লেখা।

“মহাশয়, সম্মানের সহিত জানাইতেছি যে আমার গুপ্তচর বিভাগ হইতে পদত্যাগ অনুমোদন করা হউক। আমি দুঃখের সহিত আমার সিদ্ধান্তের কারণ জানাইতেছি। আমি কিছুকাল আগেও “ডাবল জিরো” বিভাগের সহিত যুক্ত ছিলাম, এবং আপনিও আমার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল যে ‘অপারেশন থান্ডারবলের’ সফল সমাপ্তির পর আমাকে যে ভাবে অনিষ্ট স্বাভাৱ-রোফেন্ড এবং প্রেতাঙ্গা সংঘের অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তারের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা অত্যন্ত দুঃখজনক। সন্ত্রাসবাদ, প্রতি গুপ্তচরবৃত্তির অনুসন্ধানের জন্য ইন্টারপোলের সাহায্য ছাড়া ভালো হয় না। কিন্তু আমার কথায় আপনি কর্ণপাত করেন নাই। ফলে সারা পৃথিবী জুড়িয়া শুধুমাত্র গুজবের ওপব গোয়েন্দাগিরি করিয়া আমাকে ব্যর্থতার অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে। আমি কোনো প্রেত-আঙ্গা সংঘের অস্তিত্ব কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। তাছাড়া রোফেন্ড নামক ব্যক্তিটি মৃত ইহা বার বার জানাইয়াও আমি ব্যর্থ হইয়াছি। “ব্লাউয়েনফেল্ডার একজন ভদ্র-জার্মান নাগরিক যিনি আঙুর চাষ ও তার গবেষণায় নিয়োজিত আছেন তাহার পিছনেও গোয়েন্দাগিরি করিতে গিয়া আমাকে সিসিলি ত্যাগ করিতে হয়। আমার মনে হয় ‘ডাবল জিরো’ বিভাগের দুঃসাধ্য কর্ম করিতে গিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছি। এই সব কারণেই আমি পদত্যাগ পত্র দাখিল করিতেছি।”

ইতি—

আপনার অনুগত কর্মচারী ০০৭

যেতে যেতে বন্ড অবশ্য ভাবছিল যদি এই চিঠির বয়ানটি একটু পালটে ফেলা যায় তবে তো ভালোই হয়। আর তারপর দেরি না করে ওটা সেক্রেটারিকে লিখে নিতে বলতে হবে। অবশ্য ভদ্রমহিলা এতে ঘাবড়ে গিয়ে কেঁদে ফেলতে পারে।

কিন্তু উপায় নেই। বন্ড তিত্তিবিরক্ত হয়ে গেছে। রোফেন্ড আর কী একটা প্রেতাঙ্গা সংঘ নাকি এখনো আছে। কিন্তু বন্ডের দফা-রফা হয়ে গেছে এদের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে।

কিন্তু হঠাৎ কী একটা যেন ঘটে গেল।

বন্ড এগোচ্ছিল জঙ্গলের একটা রাস্তা ধরে। একটা সাদা গাড়ি বোধ হয় টু-সীটার হবে, দ্রুত তার পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। এর হর্নের আওয়াজ অতীব সৰু এবং বেসুরো বাঁশির মতো। গাড়িটার একজস্ট পাইপের গর্জন তখনো শোনা যাচ্ছিল। ড্রাইভারটি একটি মেয়ে। মাথায় গোলাপি রঙের স্কার্ফ বাঁধা।

মুশকিল হল বন্ডের একটা সাহস বা দুর্বলতা হল যে কোনো মেয়ে ড্রাইভার তার গাড়ির আগে চলে যায় তাহলে এটা হল একটা লজ্জার ব্যাপার অর্থাৎ পরাজয়। আর সেই মেয়ে যদি চটকদার চেহারার হয় তাহলে তো কথাই নেই। ব্যস এক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। দাঁত চেপে দু’হাতে স্টিয়ারিং চেপে বন্ড তাব অ্যাকসিলারেট-এ দিল সজোরে পা চেপে। মেয়েটার পিছু নিল সে।

কিন্তু যা শুরু হল তা এক লোমহর্ষক ব্যাপার। গাড়ির গতি ১০০ মাইলে নিয়েও মেয়েটির গাড়িকে আটকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে গেল। অবশ্য একবার সে মেয়েটার গাড়ির প্রায় ৩০ গজ

দূরত্বে চলে এসেছিল। কিন্তু বাদ সাধল রাস্তা। ভালো রাস্তা শেষ হয়ে গেছে। শুরু হল নুড়ি বিছানো রাস্তা। শহর ছাড়িয়ে ওরা প্রায় যেন দূর গ্রামের রাস্তা ধরে গাড়ির রেবারেঘিতে ব্যস্ত। অনেকক্ষণ কেটে গেল। বন্দ স্বীকার করল মেয়েটা গাড়ি স্পিডে চালাতে ওস্তাদ। রাস্তার ধারে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা— ‘মন্ট্রিল ৫ মাইল, রয়েল-লে-উকস ১০ মাইল। কিন্তু মেয়েটা যাচ্ছে কোথায়? ব্যাপার কেমন যেন গোলকধাঁধার মতো।

আরো কিছুক্ষণ কাটল এইভাবে। একটু পরেই একটা লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে যেতেই যেন সেই মেয়েটার গাড়ি এবার অদৃশ্য হল। মেয়েটা নিশ্চয় চালাচ্ছে সেই ল্যানসিয়া ফ্ল্যামিনিয়া গাড়ি যা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তাতেও ভীষণ জোরে চলতে পারে।

আরে দূর ওই শয়তানীকে তাড়া করে কী হবে? একটা নিশ্বাস ছেড়ে গাড়ির লাল সুইচটা বন্ধ করে দিল সে। ব্রোয়ারের গোঙানি থামল। গাড়ির ইঞ্জিনটা একটু জখম হল কিনা কে জানে। যাই হোক মেয়েটাকে ধরতে না পারলেও একটা মজা তো হল।

একটু দূরেই হোটেল রয়াল। সুদৃশ্য পাইন গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। বন্দ গাড়ির গতি আনতে করেছে। সঙ্কেবেলার মেজাজটা চাঙ্গা রাখতে হবে। বিখ্যাত ক্যাসিনোয় জুয়া খেলার আনন্দের কথা ভোলা যায় না। তবে মনে পড়ে জুয়ার টেবিলে দ্য শিফার নামে সেই লোকটার সঙ্গে খেলার লড়াই। এর নাটকীয়তা বা মাদকতা তার জীবনের অ্যাডভেনচারগুলোর চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়।

দেখা যাক আজ সন্ধ্যায় ক্যাসিনোতে কোনো রূপসি বন্ডের জন্যে বসে আছে? নাকি কোনো যন্ত্রণাময় ঘটনার সূচনা হবে সেখানে? একবার দেখাই যাক না। আজকের দিনটা একটা বিশেষ দিন। ক্যাসিনো রয়ালে জুয়াখেলার আসর জমে উঠবে। প্যারিস, হল্যান্ড ও বেলজিয়াম থেকে ধনী খন্দেররা আসবেন। এক বিশাল নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে। জুয়ার টেবিল সব প্রায় বুক্ট হয়ে গেছে। বিনামূল্যে শ্যাম্পেন বিতরণ করা হবে।

বন্ডের পকেটেও কম টাকা নেই — প্রায় দশলক্ষ ফ্রাঁ। মানে লক্ষপতি সে। তবে কাল কি তাই থাকবে না অন্য কিছু হবে সেটা এখনি বলা যাবে না।

হঠাৎ বন্ডের চোখে পড়ল একটা গাড়ি, আরে ওই তো সেই ল্যানসিয়া গাড়িটা, দাঁড়িয়ে আছে হোটেলের সিঁড়ির ঠিক নীচের জায়গাটায়। একজন অ্যাপ্রনপরা কর্মচারী গাড়ি থেকে একটা সুটকেস বয়ে নিয়ে চলেছে প্রবেশদ্বারের দিকে।

বন্দ অবশ্য গাড়ি পার্ক করল অন্য জায়গায় যেখানে মূল্যবান অন্যান্য গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে। তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল রিসেপশনের দিকে। ম্যানেজার মশাই এগিয়ে এসে বন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। স্থির বন্ডের আগমনের দামি খবরটা পুলিশের বড়োকর্তাকে জানিয়ে বাহাদুরি নেবেন।

বন্দ— আচ্ছা ম্যানেজার মশাই। ওই ল্যানসিয়া গাড়ি কার? এই মাত্র যিনি এলেন তিনি কে? তিনি কি এখানেই থাকছেন?

ম্যানেজার মবিশ— আরে ওকে চেনেন না; উনি দক্ষিণ ফ্রান্সের একজন বিশাল ধনীর কন্যা। ইনি হলেন মাদাম ল্য কম্ভেস। ইনি একজন জবরদস্ত সাহসী মহিলা। ইনি জীবনকে চুটিয়ে ভোগ করতে চান।

বন্দ— ওঃ তাই খুব ভালো কথা। তা এ বছরটা আপনাদের হোটেল কেমন চলল?

এই সব কথা বিনিময়ের পর বন্দ চলে এল ধূসর রঙের ঘরে। বিছানার চাদর গোলাপি মেঝেটা চক্চক করছে। ম্যানেজার চলে গেলেন একটু পরে। বন্দ এখন একা হয়ে গেল। এই মেয়েটা কী ধরনের? সমাজের উঁচু স্তরের মেয়ে। চিত্রতারকাদের মতন আকর্ষণীয়। মোটকথা

বিখ্যাত মেয়ে। এদের কাছে টেনে একেবারে আপন করতে বন্ডের মন উন্মুখ হয়ে আছে। বন্ড অবশ্য মনে করে এই সব মেয়েদের পাওয়াটা শক্ত ব্যাপার।

যাই হোক ইতিমধ্যে বন্ডের সুটকেস এসে গেছে। বন্ড এবার একবোতল মদের অর্ডার দিল। মদেব অদ্ভুত নাম— “টাইটিনজাব ব্লাঁ দ্য ব্লাঁজ।” আখ বোতলের মতো তরল পানীয় তার পেটে পড়েছে। মনটা বোধ হয় চাপা আছে। একটা শিস দিয়ে বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার চালিয়ে ভালো করে মান করে নিল। তারপর সুতির শার্ট, মোজা, আর একজোড়া কালো ক্যাজুয়াল জুতো পরে জানালার কাছে খোলা জায়গায় বসে তাকাল বাইরের সমুদ্রের দিকে।

খিদে পেয়েছে বন্ডের। ইংল্যান্ডে সাধারণ খাবারই তার জুটত। গোয়েন্দাদের যেমন হয় আর কী। সারাদিন তীব্র বেগে গাড়ি ছোটানো। পথের ছোটোখাটো বিপদকে শান্তভাবে এড়িয়ে যাওয়া। গাড়ির যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে কিনা এ সব ভাবতেই খাবারের কথা মনে আশা মুশকিল।

কিন্তু একটু বিশ্রাম করতে হবে। ঠিক করল তার প্রিয় একটা রেস্তোরাঁয় যাবে। সাধারণ একটা জায়গা এতেবালস স্টেশনের পিছনে। বন্ডের বন্ধু মঁসিয়ে রেকো এটা পরিচালনা করেন। বন্ড আগে থেকেই একটা টেবিল বিজার্ভ করে দিল।

ভালোই খাওয়া হল। টারবট মাছের পোচ মুসলিন সস্ আর আধখানা প্যাট্রিজ পাখির রোস্ট। এরপব কফির সঙ্গে ক্যালভাভোস মদের খানিকটা পেটে গিয়ে মনটাকে বেশ শক্ত করে দিল।

এবার ফিবে এসে শিস দিতে দিতে ক্যাসিনোর সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল সে।

॥ তিন ॥

বন্ডের মন এখন কল্পনার স্রোতে ভাসছে। হঠাৎ যেন বন্ডার্ড নৌকাটা ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। দূরে যেন দেখা গেল সেই জায়গাটা যেখানে ইয়টের আরোহীরা আড্ডা মারে। একবার ভাবল ম্যবিনার কাছে গিয়ে ওই বোটটার বায়ুপূর্ণ রাবারে তৈরি তলদেশে ছোরার কোপ বসিয়ে চলে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই কল্পনায় দেখল পিস্তলের বুলেট গর্জন করে তার কপালে যেন আঘাত করতে উদ্যত। আর মেয়েটারই বা কী হবে? মেয়েটা এই তীব্র স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে পারবে কি? বন্ড যেন মেয়েটার গায়ে হেলান দিয়ে আবার ভাবতে শুরু করল।

ক্যাসিনোর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে আছে বন্ড। চারিদিকে অনেক লোকের সমাগম। এবার বন্ডের চোখ পড়েছে জুয়া খেলার একটা টেবিলের ওপর। পরিচালক মঁসিয়ে পল একজন কর্মচারীকে বললেন বন্ডের টেবিলটার কাছে বন্ডকে নিয়ে যেতে। সাত নম্বর টেবিলটা বন্ডের জন্য রিজার্ভ করা আছে। বন্ড বসল। শুরু হল জুয়াখেলা। এ এক বিচিত্র খেলা। বন্ড একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। হ্যাঁ অনেকেই এসেছেন। ডিনার জ্যাকেট পরা তিন বন্দু ব্যবসায়ী, একজন ছোটোখাটো ইংরেজ মহিলা দু'জন ভারী চেহারার হিরের গয়না পরা বেলজিয়ান মহিলা এবং আরো দু'একজন। এছাড়া আছেন দুজন আমেরিকান। কিছু জুয়াড়ি যারা নিরপেক্ষ আর আছেন দু-সারি দর্শক।

বন্ডের মনটা অবশ্য খানিকটা পড়ে রয়েছে ওই মেয়েটিকে ঘিরে। সেই মেয়েটা যে ল্যানসিয়া গাড়ি চালিয়ে বন্ডকে রীতিমতো নাচিয়ে ছেড়েছে। তবে এই মুহূর্তে মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে না।

খেলা চলছে। বাজির পরিমাণ এখন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ দশ হাজার ফ্রাঁ এবার বন্ডের আওতায় এসে গেছে। বেশ কয়েকবার জিতে গেল বন্ড। এবার তার ব্যাংকে আরো আট লক্ষ ফ্রাঁ যোগ হয়েছে। একটু পরেই আবার জিতল সে। এবার পুরো ষোলো লাখ ফ্রাঁ। কিন্তু এভাবে খেলায় হেরে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। হঠাৎ বন্ড লক্ষ করল তার সামনে ইংরাজ জুয়াড়িটার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি। এই লোকটাও অনেকবার জিতেছে। বন্ডও তিনবার ব্যাংকার হয়ে খেলেছে।

এবার ওই ইংরাজ মহিলাটি নতুন উদ্যমে খেলতে শুরু করেছেন। বন্ড বুঝল এবার ইনি জিতবেন। এনার পয়েন্ট ছিল এক আর বন্ডের হাতে তিনটে সাহেব অর্থাৎ শূন্য। বন্ডের দখলে এখন হেচলিশ লক্ষ ফ্রাঁ, বন্ড পরিচালক মশায়ের দিকে এক হাজার ফ্রাঁর একটা চাকতি ছুড়ে দিল। এটা ক্যাসিনোর প্রাপ্য ফি। খেলা এগিয়ে চলল। বন্ড একটা সিগারেট ধরাল।

কিন্তু একটা জিনিস বন্ডের দৃষ্টিকটু লাগছে। ওই বন্ড ব্যবসায়ীদের একজন পাঁচ নম্বর টেবিলে বসে। ভদ্রলোক তাসগুলোকে বিশ্রীভাবে ঘসছেন আর হেঁড়ে-গলায় বকে যাচ্ছেন। ইনিও ছয়বার জিতেছেন এবং প্রায় কুড়িলক্ষ ফ্রাঁ জিতেছেন। টেবিলের খেলোয়াড়রা সবাই সতর্ক। কেউ আর টাকা ছাড়তে চাইছে না।

এই সময়েই হঠাৎ তাকে দেখা গেল। অসাধারণ সুন্দরী সেই মেয়েটি। নীল চোখ, উজ্জ্বল মুখ আর গোলাপি ঠোঁট। সাদা পোশাক পবা। সে দাঁড়িয়েছিল পরিচালক মশাইয়ের পাশে। মেয়েটা এবার খেলতে চাইল, বলল, “তাস দিন আমাকে” বলে ঝুঁকে দাঁড়াল টেবিলের কাছে।

কিন্তু অল্প সময়েই মেয়েটা হেরে ভূত। বন্ডের বুকটা যেন মুচড়ে গেল। কিন্তু অবাক ব্যাপার হল মেয়েটা দমে গেল না। পরিচালক মশাইকে বার বার চাপ দিতে লাগল টাকা ধার পাবার জন্য। সারা টেবিল ঘিরে একটা থমথমে ভাব। পরিচালক মশাই ঘাড় নেড়ে জানালেন যে এইভাবে জুয়ার আড্ডায় টাকা ধার পাওয়া অসম্ভব।

বন্ডও মেয়েটার জন্য চিন্তিত হল, ভাবল ওকি জানে না ক্যাসিনোতে টাকা ধার পাওয়ার চেষ্টা করা একটা রীতিমতো অপমানজনক ব্যাপার। দ্রুত দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে। ‘মাদাম লা কমতেস’ নামটা কালো খাতায় উঠে যাবে। ইউরোপের উচ্চ সমাজে মেলামেশা এবং ফ্রান্সের সব ক্যাসিনোর দরজাই ওর জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। এমনকি এই অপরাধে সমাজ থেকে নির্বাসনও হতে পারে।

হঠাৎ বন্ড বলে উঠল, “মাফ করবেন মাদাম বোধ হয় ভুলে গেছেন যে আজ রাতে আমরা পার্টনার হিসাবে খেলব ঠিক ছিল।” এই বলে দুটো রক্তাভ চাকতি টেবিলের মাঝে ছুড়ে দিল। সুতরাং খেলা চলুক।

এই কথা শুনে সবাই একটু চমকে গেল। এখন সবার দৃষ্টি বন্ডের ওপর। একটা মেয়ের জন্য কুড়ি লক্ষ ফ্রাঁ খরচ করা সাধারণ কোনো ব্যাপার নয়। অথচ এদের দুজনের মধ্যে আলাপ আছে মনে হয় না। সেরকম কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি।

কিন্তু বন্ড আজ খেলবে। হেরে গেলেও কিছু টাকা বাঁচবে। আর রাতে হোটেল রয়ালে থাকার ভাড়াও দিতে পারবে। কিন্তু রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে হবে।

বন্ড এবার কুড়ি হাজার নতুন ফ্রাঁ টেবিলে রেখে দিল। আর সেই অগাথা ক্রিস্টির মতো দেখতে ইংরাজ মহিলাও ঠেলে দিলেন এক হাজার নতুন ফ্রাঁ। এবার ব্যাংকার হয়েছেন ওই ভদ্রলোক যিনি ঘন ঘন সিগারেট টান দেন। অনেক জোড়া চোখ এখন টেবিলের চারপাশে উৎসুক হয়ে খেলা দেখছে।

কিন্তু বন্ডের কপাল খারাপ। হাতে মাত্র পাঁচ পয়েন্ট। এবার সিগার মুখে লাগানো ভদ্রলোকের মুখে অদ্ভুত হাসি। “এই নিন”— বলে জুতোর ভেতর থেকে দুটো তাস বের করল। বন্ডের বুক কেঁপে উঠল। বন্ড এবার চট করে উঠে দাঁড়াল। বুঝল তার কপালে হার ছিল তাই হয়েছে। তবুও মনটা শাস্ত করে এগিয়ে গেল পরের দিকে।

মেয়েটা এক বোতল বেলিজ্জার নিয়ে বসে আছে সেখানে। বন্ড এসে ওর পাশে বসল, বলল, “আমি হেরে গেছি। অথচ হাতে পাঁচ পয়েন্ট ছিল আর ওই লোকটার ছিল শূন্য। তবে আমার দুঃখ নেই।” মেয়েটা একটু ম্লান হাসি হাসল, জানাল বন্ডের এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। চেষ্টা করলে বাজিটা জেতা যেত। বন্ড একটু নতুন উৎসাহ অনুভব করল, বলল “গুলি মারো। তোমার

খোঁজে উঠে এলাম। মেয়েটা জিজ্ঞাসা করল” আমাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিজের ক্ষতি করলে কেন?”

বন্ড এবার কাঁধ ঝাঁকাল। নরম গলায় বলল, “আরে সুন্দরী মেয়েদের দেখলে ও সব কিছু মনে থাকে না। তাছাড়া আবেডিল আব মন্ট্রিলের বাস্তায় তোমার সঙ্গে আমার একটা পরিচয় তো হয়েই গেছে, কী বলো? আমার চাইতে অনেক বেশি ওস্তাদ তুমি।”

মেয়েটা উত্তরে বলল, “ঠিকই বলেছ তুমি, গাড়ির রেসে তুমি হেরে যাবে। জান তো প্রাণের জন্য আমার কোনো মায়া নেই।”

বন্ড বুঝল এ-হল সেই জাতের মেয়ে যাদেরকে বন্ড কাছে পেতে চায়। মেয়েটার কাছ ঘেঁসে বসে বলল, “আমার নাম জেমস বন্ড।” মেয়েটাও বলল, “আমার নাম ট্রেসি”। বলে মদের গেলাসে ঠোট ঠেকাল। উঠে দাঁড়িয়ে কোমরটা দুলিয়ে বলল, “আমি সন্ন্যাসিনী নই। সন্ন্যাসিনী ছিলেন টেরেসা। আমি এবার ঘরে যাই। নম্বর পঁয়তাল্লিশ। ভালো লাগলে চলে এস। সহবাসের স্বাদ ভালো ভাবে পাবে আমার বিছানায় এলে। আশা করি যে টাকা আমার জন্য নষ্ট করলে তার বদলে দেহের আনন্দ দিয়ে তোমায় চমকে দেবো।”

॥ চার ॥

জেমসের শরীরে নতুন আনন্দের ধারা বইছে যেন। আরো একটু মদ গলায় ঢেলে দিয়ে ধীরে ধীরে পঁয়তাল্লিশ নম্বর ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে এল। স্বল্প পোশাকে টাকা ট্রেসি তার সুন্দর দেহটা যেন বিছানায় মেলে ধরেছে। বন্ড এসে পাশে বসল। স্তবকের মতো উঁচু বাঁদিকের স্তনে হাতটা রেখে আলতো ওর ঠোঁটে একটা চুম্বন করল। বন্ড জানতে চাইল উন্মাদের মতো গাড়ি চালানো, জুয়ার আসরে টাকা ধার করতে চাওয়া, এসবের মানে কী? ট্রেসির জীবনটা কী একটা নিরাশার অন্ধকারে ঢাকা।

কিন্তু ট্রেসির যেন এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় নেই। দেহের প্রতিটি অঙ্গে কাজের জোয়ার বইছে। বলল, “না! অন্য কোনো কথা নয়। তুমি পুরুষ এবং বলবান। আমার পোশাকটা খুলে মন ভরে দেখ আমাকে। এই দেহটাকে নিয়ে যা ভালো লাগে করে যাও। প্লিজ দেরি করো না। আর সইতে পারছি না। এসো, আমাকে তোমার কোলে বসো।”

ঘন্টাখানেক পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বন্ড। ট্রেসি ঘুমিয়ে পড়েছে। বন্ড চটপট স্নান সেরে নিল। বন্ডের মনে পড়ছে ট্রেসির কথা। “বন্ড তুমি যে আনন্দ আমায় দিয়েছ সেটা আমি বারে বারে চাই।” বন্ড অবশ্য একবার ট্রেসির গলায় যেন কান্নার শব্দ পেয়েছে। সকালবেলায় আবার এসে ট্রেসিকে জাগাল। ট্রেসি যেন একটা ঘোবের মধ্যে আছে। হঠাৎ বন্ডকে জাপটে চুম্বন করে গেল অনেকবার। বন্ড বলল, “এবার স্নান সেরে নাও। লাঞ্চ খেতে হবে বাইরে। বেড়াতেও যাব।”

ট্রেসি, “আরে দূর, তুমি একটা অপদার্থ প্রেমিক। বেরিয়ে যাও এখন থেকে। যা চেয়েছ পেয়ে তো গেছ।”

চাদরের তলায় ট্রেসির নগ্ন শরীরটা কি কেঁপে উঠছে? ভাবল বন্ড। বলল, “আমার হাত ধরে উঠে পড়। তোমাকে এভাবে দেখতে আমার কষ্ট হচ্ছে।”

ট্রেসি— “বেরিয়ে যাও এখন থেকে”। বন্ড আর কিছু না বলে দরজাটা আঁপটে বন্ধ করে করিডোর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। নিজেই যেন একটা অক্ষম লোক বলে মনে হল।

(নৌকাটা দ্রুত ছুটে চলেছে। গুণ্ডা দুটোর চোখ বন্ডকে লক্ষ্য রেখেছে। মেয়েটা যেন একটা পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। বন্ডের একটা হাত দুই হাঁটুর মাঝখানে, হাতের মুঠোয় একটু শানিত ছুরি।)

মেয়েটার সঙ্গে যেন একটা গভীর সম্পর্কের স্বাদ অনুভব করল বন্ড। মনে হল তার মতো সেও এক বন্দি। দূরে বন্দরের আলোটা দেখা যাচ্ছে। আগাছার পচা গন্ধ আবার মেয়েটির গায়ের এসেন্সের গন্ধ দুটোই তার নাকে আসছে। শরীরে যেন একটা কাঁপুনি ভাব। কিন্তু মনটা যেন স্মৃতির মন্থনে ডুবে যেতে চাইছে।

বন্ড আজ রোজকারের মতো ব্রেকফাস্টে মন দিতে পারল না। মেয়েটার কথা বারে বারে মনে এল। অনেকগুলো সিগারেটও খাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েটা কোন দেশের? ইতালির? হতে পারে। ইংরেজি বলে নির্ভুল। পোশাকে রীতিমতো সুরুচির ছাপ আছে।

মেয়েটি যেন কোনো আঘাতের ব্যথা সহ্য করে চলেছে। বয়স পঁচিশের বেশি নয়। নেশা খুব একটা নেই। তবে দেহের প্রেম নিবেদনে যেন সিদ্ধহস্ত। এই স্নব ভাবতে গিয়ে অনেকটা সময় পেরিয়ে প্রায় বিকেল হল। হ্যাঁ এবার মেয়েটা এসেছে। কালো-সাদা একটা কস্টুম পরে। বন্ড এবার দৌড়ল করিডরের লিফটের দিকে। মেয়েটি গাড়ি ড্রাইভ করে এগিয়ে যাচ্ছে। বন্ড তার পিছু পিছু। আর বন্ডকে লক্ষ করে এগিয়ে চলেছে একটা গাড়ি যার নাম সিট্রোয়া। বন্ড এবার একটু মুশকিলে পড়েছে। দূরে হযেল নদীর ঢেউ ভেঙে কী একটা এগিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা কি কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত? ব্লাকমেল করতে চাইছে? কোনো প্রতিশোধ নিতে চাইছে। নাকি অন্য কেউ বন্ড আর ট্রেসিকে হত্যা করবে? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। জলের ঢেউ ভেঙে সেই বন্বার্ডটা ঘুরে গেল একটা জেটির দিকে। অঙ্ককারের বুক চিরে একটা ফ্লাশলাইট এসে পড়ল। দড়ি দিয়ে বাঁধা হল নৌকা, কাদামাখা কয়েকটা সিঁড়ি।

একজন গুণ্ডা এবার তীরে উঠল। তারপর মেয়েটা, এবার বন্ড এবং তারপর আরো দুজন গুণ্ডা, বন্বার্ড আবার ছুটতে শুরু করল।

অপর তীরে পৌঁছবার পর চারজন লোক বন্ডদের ঘিরে ফেলল। হঠাৎ একটা জোরালো আলো বন্ডের মুখে। আলোটা আসছে একটা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি মালগাড়ি থেকে। এই ধরনের গাড়িফ্রাণের শহরে মাঝে মাঝে দেখা যায়। এবার যে লোকটার হাতে ফ্লাশলাইট ছিল সে একটা ইশারা করল।

কিন্তু এই গাড়িটার ভেতরে বেশ গরম। কয়েকটা চেয়ার আছে। তারপর কেবিনের সারি। মাঝে একটা প্যাসেজের মতন জায়গা। ট্রেসির হাতে বন্ডের কোঁটাটা ছিল। এবার কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে ওঠা ও বন্ডকে ফেরত দিয়ে বলল, “ধন্যবাদ” বলেই সে একটা কেবিনে ঢুকে গেল। বন্ডের পিছনে দাঁড়ানো কয়েকজন লোক, তাদের একজন বলল, “এগিয়ে যাও”। বন্ড ভাবল ওদের আক্রমণ করবে কিনা, কিন্তু ওরা সংখ্যায় ভারী।

শেষ কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে বন্ড। এখানে ওকে ঢুকে যেতে হবে। কোনো উপায় নেই। তবে এখানে হয়তো রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। ছুরিটা বাঁ হাতে পকেটে চেপে এক লাফে কেবিনে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। কেবিনের ভেতরে বন্ড। দাঁড়িয়েছিল দরজায় পিঠ দিয়ে। হঠাৎ দরজার ওপর জোর ধাক্কার শব্দ। দরজার খোলার জন্য বোধ হয় লোকগুলো খেপে গেছে। বন্ড ছুরিটা হাতের মধ্যে চেপে রেখেছে। দরজা ধাক্কা থেমে গেল। একটা লোক বলল, “এখনই ছুরি মেরো না। আগে আমাদের হুঁস্কিতে গলা ভেজাতে দাও। তারপরে সুযোগ পাবে।”

বন্ড এবার একটু শান্ত হয়ে গেল। লোকটার পেছনে একটা ক্যালেন্ডার রয়েছে। ষোলোই সেপ্টেম্বর। ছুরিটা ছুড়ে দিল বন্ড। ওটা ছুটে গিয়ে ক্যালেন্ডারে আটকে ঝুলতে লাগল। এবার লোকটা টেবিলের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে বন্ডের সঙ্গে করমর্দন করল, বলল, “আমার নাম মার্ক-অ্যান্জে ড্রাকো।” বন্ড তবুও গম্ভীরভাবেই তাকিয়ে রইল। লোকটা বলল “দেখো তোমার নাম জেমস্ বন্ড, তাই না? তুমি ইংল্যান্ডের সম্রাজ্ঞীর একজন গুপ্তচর। তোমাকে আপাতত অন্য

একটা কাজে পাঠানো হয়েছে। কি ঠিক বলছি তো? বন্দ বলল, “যা মনে হয় বলে যাও।” লোকটা এবার একটু ভদ্রতা করলে, টেবিলটা দেখিয়ে বলল, “এসো এখানে বসা যাক। নানারকম সিগারেটে ভরা একটা রুপোর কৌটা ঠেলে দিল বন্ডের দিকে। তারপর ক্যাবিনেটের ডালা সরিয়ে বার করে আনল হেইগ এনং হেইগ আর বুরবৌ মদের দুটো পাইট আর গেলাস। নিজের গেলাসে বরফের সঙ্গে মদটা মিশিয়ে এক টোক মুখে দিয়ে লোকটা বলল, “বন্দ তোমার কাছে আবার নিজেকে সঁপে দিলাম। অনেক কথা আছে। জানো তো আমিই হলাম ইউনিয়ন কোর্স-এর কর্তা।”

॥ পাঁচ ॥

ইউনিয়ন কোর্স' কথাটা কেমন যেন বন্ডের বিশেষ ভাবে জানা। তাহলে এই তামাটে লোকটা একটা ভয়ংকর কিছু। এই সংঘ ইউনিয়ন মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক একটা দল। সিসিলির মাফিয়ারাও এদের কাছে কিছু নয়। এদের পাপকর্মের জাল ফ্রান্সের উপনিবেশগুলিতেও ছড়িয়ে আছে। এরাই না জীন গিউদিচেল্লিকে-ও শেষমেশ খতম করে দিয়েছে। এই দলটির সঙ্গে যুক্ত আছে আরেকটা জিনিস। রোমেলের রহস্যময় ধনভাণ্ডার যেটা আছে বাসটিয়ার কাছে সমুদ্রগর্ভে লুকানো। সম্প্রতি আঁদ্রে ম্যাট্রি নামে এক সাহসী যুবক বড়াই করে প্রচার করেছিল যে সে শিগগিরই সমুদ্রের নীচ থেকে ওই রত্নভাণ্ডার তুলে আনবে।

বন্দ এসব জানে। তবে এখনই মুখ খুলতে রাজি নয় সে। তবে এই বিশাল ট্রাকটা একটা ভ্রাম্যমাণ হেডকোয়ার্টার্স, এটা তার জানা ছিল না। তাকে আর ওই মেয়েটিকে ধরে এনে কী করতে চায় ওরা। এই সব ভাবতে ভাবতে জেমস এবার নিজের গেলাসে আন্তে করে চুমুক দিল। মাফঅ্যানজে হঠাৎ মুখ খুলল, “শোন মাই ডিয়ার, চমৎকাব ইংরাজি জানত ও। তবে কেউ ওটা ওকে শিখিয়ে দিয়েছিল। আরে আমি বলছি আমার কন্যা টেরেসার সম্পর্কে। এটাকে টপ সিক্রেট হিসাবে গণ্য করতে পার। শোন আমি বিয়ে করেছিলাম এক ইংরেজ গভর্নেসকে। কর্সিকা থেকে সে এসেছিল। অদ্ভুত মেয়ে, আমাকে বলেছিল যে তাকে কেউ ধর্ষণ করুক। তা এই ধর্ষণের কাজটা আমিই করলাম ওর ওপরে। আর এই হল আমার জীবন সঙ্গিনী। তবে বিয়ে হয়েছিল অনেক পরে, মার্সিহিতে। তার আগে সে দ্বীপে দ্বীপে আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। মুশকিল হল পুলিশ আমার পিছনে লেগেছিল। তা যাইহোক ও সব কাজই জানত। আমাকে ভেড়ার মাংস রান্না করেও খাওয়াত, এবার স্যামজ্ থামল, বন্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমাদের সন্তান জন্ম নিল। নাম হল টেরেসা। প্রায় দশ বছর আগে স্ত্রী মারা গেছেন। টেরেসা লেখাপড়া শিখেছে সুইজারল্যান্ডে। আমি অবশ্য ততক্ষণে ইউনিয়নের কর্তা হয়েছি। বিপুল অর্থ আমার দখলে। টেরেসা ছিল আমার খুব প্রিয়। কিন্তু স্বভাবটা সেই বনাই রয়ে গেল। নানারকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে। কখনো আমেরিকার কোনো লক্ষপতির সঙ্গে দিন কাটায়, কখনো কোনো ভারতীয় রাজপুত্রের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। ওকে নিয়ে নানানরকম রসাল গল্প তৈরি হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ভাবি খরচা পাঠাব না। কিন্তু ভয় হয় যদি কোনো ভয়ংকর কিছু একটা করে বশে রাগের চোটে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ও আসলে নিজেকে শেষ করতে চাইছে। মায়েগ থেকে পাওয়া এই দুরন্ত স্বভাব ওকে বাঁচতে দেবে না। একটা আত্মখুনা বোধহয় ওকে তাড়া করে চলেছে। বন্দ তুমি তো জান এইভাবে চললে নারী বা পুরুষ উভয়েই জীবনে বিপর্যস্ত ডেকে আনে। আসলে মনে হয় লোভীর মতন জীবনকে ভোগ করে যাওয়া এক ধরনের বোকামি। একদিন হঠাৎ আমাকে না জানিয়ে একটা লোককে বিয়ে করল।

লোকটা ছিল একটা ইটালিয়ান কাউন্ট। যত পেরেছে নিয়েছে টেরেসার কাছ থেকে। একদিন চট করে সরে গেল। আমিও বিবাহ বিচ্ছেদের বন্দোবস্ত করে দিলাম। একটা বাড়ি কিনে দিলাম

মেয়েকে। অবশ্য ইতিমধ্যে আমার মেয়ের একটা বাচ্চা হল। কিন্তু রইল না। কয়েকমাস আগে মেনিনজাইটিসে মারা গেল বাচ্চাটা।”

মার্ক এবার একটা নিশ্বাস ছাড়ল, আশ্তে করে উঠে দাঁড়াল, আবার গেলাসে হুইফ্‌কি চেলে দিল।

বন্ড বলল, “তোমার মেয়েটি খুবই ভালো। তা ওর সামনে তো গোটা জীবনটাই পড়ে আছে। মার্ক এবার একটা চেয়ারে বসে পড়ল। মুখটা গম্ভীর করে বলল, “জানো বন্ড বাচ্চাটা মারা যাওয়ার পর মেয়েটা বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, সঙ্গে নিল তার ছোটো গাড়িটা আর নিজের সব গয়নাগুলো। খবর পেতাম সে নাকি সারা ইউরোপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেবেলা থেকেই সাঁতার আর সমুদ্র তার খুব পছন্দ। আমি আর ওর মা ওকে অনেক সংযত করার চেষ্টা করেছি। মাঝে মাঝে ঘরে আটকে রাখলে বলত, “আমি সাঁতার দিয়ে সমুদ্রে যাব তারপর তলায় মিলিয়ে যাব।” যাইহোক সবই যেন কপাল। বন্ড তুমি ক্যাসিনোতে আমার মেয়েকে যেভাবে সৌজন্য দেখিয়ে আগলে রেখেছো তাতে আমি খুশি। একজন পুরুষ হয়ে যা করার সবই তুমি করেছ। এতে লজ্জার কিছু নেই বরং এটা আমার মেয়ের মনে ঔষধের মতো কাজ করেছে।” বন্ডের হঠাৎ মনে পড়ে গেল নৌকায় কী ভাবে ও ট্রেসির গা ঘেঁসে বসেছিল। বন্ডের শরীরটা যেন এবার একটু কেঁপে উঠল। মার্ক বলল, “রেডিও মারফত তোমার সম্বন্ধে সব খবরই আমার জানা। এই গাড়িতেই একটা নিউজ স্টেশন আছে যা সবসময় কাজ করে চলেছে। তুমি একজন যোগ্য লোক। তোমাকে অনেক গোপনীয় কথা বললাম। আমার হুকুমেরই তোমাদের দুজনকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। আশা করি কোনো কষ্ট দিইনি।”

বন্ড হেসে বলল, “আমারও ভালো লেগেছে।” মার্ক এবার বন্ডকে একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে বলল, “পড়ে দেখো। হাতের লেখাটা পরিষ্কারই আছে।”

চিঠিতে লেখা।

“বাবা আমি দুঃখিত। অনেক হয়েছে। দুঃখের ব্যাপার হল আজ রাতে যার সঙ্গে আলাপ হল সে আমায় ইচ্ছে করলে নতুন জীবন দিতে পারত। লোকটা ইংরেজ। নাম জেমস বন্ড। ওকে খুঁজে পেলে ২০,০০০ নতুন ফ্রাঁ দিয়ে দেবে। এই টাকাটা আমি ধার করেছিলাম ওর থেকে। আমাব হয়ে ওকে ধন্যবাদ দিও। আসলে সব দোষ আমার। বিদায়, আমাকে ক্ষমা করো।”

ট্রেসি

মার্ক আরো বলে গেল, “এই চিঠিটা তুমি হোটেলের লোককে দিয়েছিলে ডাকে ফেলতে। এরপর ও হোটেল থেকে বেরিয়ে যায় আর তুমিও ওর পিছু নিয়েছিল। তোমার মনে বোধ হয়—কোনো একটা শঙ্কা ছিল। কমন্ডার বন্ড তুমি সবই শুনলে। এখন বল তুমি মেয়েটার প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করবে কি না। যদি করো তাহলে মেয়েটা একটা বাঁচবার আশা করতে পারে।”

মার্ক এবার থামল। বন্ড ভাবল এখন কি তার ভালোমানুষি করার সময়? ট্রেসির প্রতি ওর একটা হঠাৎ আকর্ষণ হয়েছে ঠিকই কিন্তু সাহায্যের নামে কোনো ব্ল্যাকমেল এর শিকার হতে পারে বন্ড। পরে হয়তো বলা হবে ট্রেসি সারা জীবনের ভার ওকেই নিতে হবে। বন্ড একটু শান্ত স্বরে বলল, “কিন্তু আমি ওকে কী ভাবে সাহায্য করতে পারি?” মার্ক— “তুমি ওকে বিয়ে করো আর দশ লক্ষ পাউন্ড উপহার নাও আমার কাছ থেকে।”

জেমস এবার যেন খেপে গেল। বলল, “এটা অবাস্তুর কথা বলছ। তোমার মেয়ে অসুস্থ। ওর প্রয়োজন একজন মনোবিজ্ঞানীর, আমাকে নয়। তাছাড়া অত টাকা আমার দরকার নেই। আর কাউকেই বিয়ে করার ইচ্ছা আমার নেই। আমার নিজের পেশার দিকটাও দেখতে হয় আমাকে।”

মার্ককে দেখে মনে হল রীতিমতো যেন আহত হয়েছে সে। বন্দ গলাব স্বব নরম করে বলল। “আরে দূর, আগে তো মেয়েটাকে সুস্থ করতে হবে। বেচারা খুবই ভালো মেয়ে। সুইজারল্যান্ডে ভালো ক্লিনিক আছে। ওখানে চিকিৎসা করিয়ে ওব মনেব স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়ে আনতে হবে। তবেই ভবিষ্যতে ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার একটা অর্থ থাকবে। তবে একটা কথা। আমি একজন কঠোর শ্রুতির লোক। পুরুষ বা নারী কাউকেই সেবা করার মন নেই আমার। কাজেই হঠাৎ কবে কারো দায়িত্ব নেওয়ার মতন অবস্থা কোথায় আমার?”

মার্ক বলল, “বুঝতে পারছি তোমার কথা। তোমার প্রস্তাব ঠিকই। তবে আজ রাতে ওর সঙ্গে যদি ডিনার খাও তাহলে ও তোমাকে বুঝতে ভুল করবেনা। বন্দ একটু যেন বিরক্ত হয়ে রাজি হল, বলল, “সে হবেখন। কিন্তু কালকেই আমি প্লেন ধরছি। কাজেই কাল থেকে দায়িত্ব তোমার।” মার্ক— “তাই হবে। তবে আমার বিবাট সংস্থান আছে। আছে অভিজ্ঞতা আর ক্ষমতা। যদি মনে করো আমাকে কোনো কাজে লাগবে, তো বলতে পার।”

এটা বোধ হয় বন্ডের বড়ো সুযোগ। বন্দ বলল, “তাহলে বলে দাও রোফেশন্ড আনিস্ট ড্রাভো রোফেশন্ড কোথায় আছে? একি বেঁচে আছে? কোথায় আছে?”

এবার মার্ক অ্যান্ডের মুখে একটা যেন পরিবর্তন দেখা গেল। নিষ্ঠুর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। বলল, “হ্যাঁ লোকটা জীবিত আছে। কয়েকদিন আগে আমার দুজন কর্মচারীকে ঘুষ দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। ঝট করে মার্ক টেলিফোন তুলল, কয়েক মিনিটের মধ্যে জেনে নিল ওই লোকটা কোথায় আছে। হ্যাঁ ওই লোকটা আছে সুইজারল্যান্ডে। তবে এর বেশি মার্ক কিছু জানতে বা জানাতে পারলনা। একটু যেন কড়া সুরে মার্ক বলল, দেখ বন্দ এইসব লোক কিন্তু খুব গৌয়ার আর যারা ধনী তাদের ব্যাপারে এরা মুখ কখনই খোলে না।

বন্ডের মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল, মনে মনে ভাবল, এবার বেজন্মা তোমার নাগাল পেয়ে গেছি। বন্দ মার্ককে জানাল সুইজারল্যান্ডে ওদের বিশেষ লোক আছে। কাজেই বিশেষ অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

তবুও মার্ক একটা ড্রয়ার থেকে কাগজ বের করে বলল, “এই নাও এর মধ্যে আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর আছে। প্রয়োজন হলে আমার লোক তোমার কাছে ঠিক পৌঁছে যাবে। যাইহোক, এবার ট্রেসিকে ডেকে পাঠাই। কাজের কথা তো হয়েই গেল।” বলে দরজা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়াল মার্ক।

॥ ছয় ॥

দু’মাস পরে লন্ডনে হাজির বন্দ। চেলসির ফ্ল্যাট থেকে গাড়ি চালিয়ে হেডকোয়ার্টার্সে যাচ্ছিল সে কিন্তু যতক্ষণ না স্টেশন জেড্-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে সুইস সিকিওরিটি থেকে ব্রোফেশন্ড এর হদিস পাচ্ছে ততক্ষণ মনে স্বস্তি নেই।

অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও সুইজারল্যান্ডে ব্রোফেশন্ড নামে কাউকে পাওয়া যায় নি। যে অপরাধীদের তালিকা বন্ডের কাছে আছে তাতেও ওই লোকটার নাম নেই। এই ব্রোফেশন্ড নাকি আণবিক অস্ত্র হাতে নিয়ে ব্রিটেন আর আমেরিকাকে বিপদে ফেলতে পেরেছিল।

হেডকোয়ার্টার্সের রিপোর্ট অনুযায়ী ব্রোফেশন্ডের সুইজারল্যান্ড-বাসের খবর আছে। মার্ক বা ট্রেসিকে নিয়ে কোনো বিশেষ সংবাদ এখনো আসে নি। যাইহোক বন্ডের সেদিন সন্কেটা ভালোই লেগেছে। মনে হয়েছে ওরা যেন প্রেমিক-প্রেমিকা। বন্দ বলেছে ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট ওকে বাইরে পাঠাচ্ছে। ট্রেসিও বাইরে যাওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে। হঠাৎ বন্ডের পকেটে রাখা সিংক্রাফোন বাজল। এই বড়ো অফিসার কেউ ব্যবহার করতে পারে না। রিসিভার তুলে বন্দ বলল— ‘০০৭

বলছি’। ওপার থেকে অর্ডার এল এখুনি বন্ডকে কলেজ অফ আর্মস-এ যেতে হবে। সেখানে গ্রিফন বা আর একজনের খোঁজ করতে হবে। আর ব্রোফেন্ড যার সাংকেতিক নাম বেডলাম, তারও খোঁজ নাকি পাওয়া গেছে।

বন্ড— “আমি এখুনি আসছি। গুডবাই।”

বন্ড গাড়ি স্টার্ট দিল। কিন্তু কলেজ অফ আর্মস-এর কী ভূমিকা থাকতে পারে। এরা তো পূর্বপুরুষদের নাড়ি-নক্ষত্র খুঁজে বেড়ায়।

বন্ড এবার গাড়ি থামাল। এবার ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটের এই অফিসের দরজা ঠেলে ঢুকল। একটা বেয়ারা দরজা খুলে অফিসকে জানাল জেমস বন্ড দেখা করতে এসেছে।

বন্ড টেবিলে বসল, ওপাশে একজন বসে আছে মাথায় বিশাল টাক। টেবিলের ওপর অনেক কাগজপত্র। লোকটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে একটা বই পড়ছিল। বন্ডের গলার আওয়াজ শুনে বলল, “তুমি তো জেমস বন্ড। কিন্তু বন্ড হচ্ছে ব্যারনদের একটা উপাধি। টমাস বন্ডের নাম জান ? তিনি ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কোনো সম্ভ্রান্ত ছিল না। মানে কোনো বৈধ সম্ভ্রান্ত ছিল না।”

এই লোকটার নাম গ্রিফন, বক বক করেই চলেছে। শব্দ গলায় বলল, “তোমার বাবা-মা কোথায় বাস করত ? তুমি তো একজন বিশিষ্ট ইংরেজ। তোমার পক্ষে এ সব খবর জোগাড় করা কঠিন নয়।”

বন্ড— “আমার বাবা ছিলেন স্কচ, মা সুইস।”

লোকটা আবার একটা কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইল কিন্তু বন্ড তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, “আমি ব্রোফেন্ডের খোঁজ করতে এসেছি।”

গ্রিফন এবার যেন চমকে উঠল। হ্যাঁ লোকটার পুরো নাম আর্নস্ট স্ত্রোত্রো ব্রোফেন্ড। বন্ড এবার ঠান্ডা গলায় জানাল, “আমি আসছি দেশরক্ষা মন্ত্রীর দপ্তর থেকে। আমার বংশ-পরিচয় নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি।” গ্রিফন এবার দমে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “দাঁড়াও কমান্ডার নামটা যেন চেনা মনে হচ্ছে” বলে টেলিফোনের রিসিভার তুলে বলল, “মেবল ব্যাসিলিস্ককে দাও।”

॥ সাত ॥

করিডোরটা সাঁাতসেঁতে। বন্ডের ভেতর একটা চঞ্চল ভাব জেগেছে। কে জানে এই ব্যাসিলিস্ক আবার কীরকম লোক!

ঘরটা অবশ্য সুন্দর সাজান। দেয়ালে সুন্দর কয়েকটা ছবি ঝুলছে। এক কোনায় অনেক বই আছে। টার্কিশ তামাকের গন্ধ ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একজন যুবকের আগমন। ছেলেটা বলল, “কমান্ডার বন্ড না?” বন্ড উঠে দাঁড়াল। সেরলের সঙ্গে করমর্দন করল। যেন একটু তামাসা করে সেবল বলল, “গ্রিফনের পাল্লায় পড়লে কী করে? লোকটা দারুণ, কাজে একেবারে ওস্তাদ।”

বন্ড— “গ্রিফন আমাকে বন্ড স্ট্রিটের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে চেষ্টা করছিলেন।”

ব্যাসিলিস্ক এবার হেসে ফেলল। বন্ডকেও একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। তারপর বলল, “এখানে আমাদের অনেক কাজ করতে হয়। অনার্স লিস্টে যাদের নাম তাদের উপাধি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। অনেক ভুঁইফোড় আবার উপাধি পাওয়ার জন্য আবেদন পাঠান। যাই হোক এবার তোমার কথা শোনা যাক।”

বন্ড— “আমার ব্রোফেন্ডকে চাই। বছরখানেক আগের সেই খান্ডারবলের পেছনে ব্রোফেন্ডের হাত আছে।” সেবল পকেট থেকে চট করে একটা চিঠি বার করে বন্ডকে শোনাতে লাগল।

“মাননীয় মহাশয়,

আর্নস্ট স্ত্রোফেন্ড একজন সম্ভ্রান্ত মক্কেল। এর অবশ্য পরিচিত একটা নাম আছে। সেটা হল মার্সিয়ে লি কমটে বালখাজার দ্য ব্লিউভিলি। ইনিই উপাধি পাওয়ার ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী। যদিও মনে হয় এই উপাধি লুপ্ত হয়ে গেছে।

ফরাসি বিপ্লবের সময় এনার পিতামাতা প্রথম জার্মানিতে, পরে পোলাণ্ডে চলে যান। সেটা ১৮৫০ সাল।

আমাদের মক্কেল এই ঘটনার সত্যতা বের করার দায়িত্ব আমাদের ওপর দিয়েছেন। কারণ তিনি প্রায় লুপ্ত উপাধি দ্য ব্লিউভিলি ফিরে পেতে চান। রিপোর্ট পেলে সময়মতো দলিল কবে পাঠিয়ে দেব প্যারিসের বিচার দপ্তরে।

ব্যাপার হল আমাদের মক্কেল নথিপত্র ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এই উপাধি ব্যবহার করতে চান। আপনারা একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা এই দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা রাখেন আমাদের অনুরোধ বিষয়টার গোপনীয়তা বজায় রাখবেন, এবং সঠিক অনুসন্ধান চালাবেন।

আমাদের মক্কেলের সার্বিক অবস্থা খুবই ভালো। আপনাদের পারিশ্রমিক হিসাবে নির্বাচিত ব্যাংকে এক হাজার পাউন্ড স্টার্লিং পাঠিয়ে দেব।’ উত্তরের অপেক্ষায় আপনাদের একান্ত বিশ্বস্ত গেব্যুংগর গামপোল্ড মুসবুগার আডভোকেটস্।

চিঠি পড়া বন্ধ হল। জেমসের চোখে যেন জ্বালা ধরে গেছে। সেবল জানাল তাদের আগ্রহ বন্ডের চেয়ে কম নয়। আর ওই কাজের দায়িত্ব ওরাই নিয়েছে। তবে বন্ড নাকি চালাকি করে গোপন কথা বার করে নিয়েছে আর সেটাও সেবল বুঝে ফেলেছে।

সেবল গলার স্বর গভীর করে বলল, “লোকটার জন্মপত্র চেয়েছিলাম, কিন্তু ওটা নাকি হারিয়ে গেছে। তবে ব্রোফেন্ডের জন্ম জিগইনিয়ায়, বাবা পোলিস, মা গ্রিক। তাছাড়া লাইব্রেরি নথি যেঁটে দেখেছি সতেরো শতাব্দীতে একটা শহরে এই ব্লিউভিলি পরিবার বাস করত। উত্তর ফ্রান্সে থাকাকালীন আমি এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়েছি। আবার ওয়ারশতে আমাদের অ্যামবাসাডরকে লিখেছি এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে, গির্জায় খোঁজ নিতে। কারণ ব্রোফেন্ড হয়তো খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে যেতে পারে। অগস্বারী রেজিস্টার অফিসেও খোঁজ করেছি। ব্রোফেন্ড নামে অনেকেই আছে এখানে। কিন্তু ক্যালভাডোস-এর ব্রিউভিলিদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ পাওয়া যায় নি। কাজেই অনুসন্ধান এখনো চলছে।”

ব্রোফেন্ডের ঠিকানা সেবল পেয়ে গেছে। তবে ওর সঙ্গে সরাসরি একটা সাক্ষাৎ-এর ব্যবস্থা হলে ভালো হত। কিন্তু এ ব্যাপারে গার্টার কিং অফ আর্মস্ এর অনুমতি দরকার। তবে ব্রোফেন্ডকে ইন্টারভিউ করতে গেলে বন্ডের কী পরিচয় দিতে হবে? ব্যাসিলিস্ক বলল, “সে সব পরে ঠিক করে নেব। তোমায় এমন তালিম দেব যে ব্লিউভিলিডের সম্পর্কে কোনো অসুবিধা হবে না তোমার।”

বন্ড— “ব্রোফেন্ড লোকটা খুবই সেয়ানা কী বল? ব্যাসিলিস্ক—” ওর মতো সেয়ানা লোক আমি অনেক দেখেছি। উপাধি কেনবার জন্য সেও উঠে পড়ে লেগেছে। লোকটা একটা গুণ্ডা, নিষ্ঠুর প্রকৃতির, বয়স চুয়ান্ন। এ আবার হতে চায় কাউন্ট। অনেক অর্থ উপার্জন করেছে। এখন যেন জীবনের খোলসটা বদলাতে চায়। যৌন রোগাক্রান্ত রোগী যেমন ডাক্তারের কাছে আসতে চায়, সেই রকম। যাই হোক এ ব্যাটা এবার ফাঁদে পা দেবেই।” সেবল একটু পরে সিগারেট ধরিয়ে হেলান দিয়ে বসল চেয়ারে।

॥ আট ॥

মি. এম এর সাথে কথা বলছে বন্ড। বন্ড জানাল তাকে হতে হবে কলেজ অফ আর্মস্-এর দূত। ব্যাসিলিস্কও বলেছে আমাকে একটা উপাধি দিয়ে দেবে। এম যে এবার একটু চটে গেলেন,

বললেন, “গোটা ব্যাপারটাই একটা ধাম্বা মনে হয়। বন্ড বলল, “শুনুন, স্যার হিলারি ব্রে নামে এক ভদ্রলোক আছেন। ইনি হাইল্যান্ডের নির্জন উপত্যকায় থাকেন, পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান। সুইজারল্যান্ডে কেউ তার নাম জানে না, আমিই সাজব হিলারির বেশে। প্রথমে একটা পাসপোর্ট লাগবে। তারপরে যাব সুইজারল্যান্ড যেখানে ব্রোফেল্ডকে বাগে আনতে হবে। এরপর গুই জায়গা ছেড়ে অন্যত্র যাব অনুসন্ধান করার নাম করে। আর ব্রোফেল্ড একবার বাগে এলে সীমান্ত পেরিয়ে ওকে ধরে আনব। মি. এম এবার একটু ভালো করে হাসলেন, জানালেন “তোমার প্ল্যানটা বেশ যোরালো। যাই হোক আমার সম্মতি আছে। তবে ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রীকে জানানো দরকার। ০০৭ এবার কাজে নেমে পড়, বন্ডও ‘শুভরাত্রি’ বলে বেরিয়ে গেল। আর মি. এম সবুজ টেলিফোনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন।’

অনেকদিন কেটে গেছে। ডিসেম্বর মাস প্রায় আসন্ন। বন্ড যেন এখন পড়ুয়া ছাত্রের মতন হয়ে গেছে। ইংরাজদের ইতিহাস, গল্প, পৌরাণিক কাহিনি পড়ে ফেলেছে সে। আর বন্ডের সেক্রেটারি মেয়েটি বন্ডকে একদিন স্যার হিলারি নামে সম্বোধন করে ফিরেছিল। মেয়েটা প্রায় একটা ধমক খাওয়ার মতো কাণ্ড করেছিল।

কলেজ অফ আরম্ভ দূত স্যার হিলারি যাচ্ছেন সুইজারল্যান্ডে এ খবর আগেই সেবল পাঠিয়ে দিয়েছে। ব্রোফেল্ডও জেনে গেছে কথাটা তার উকিলের মারফত।

হিলারি-ব্রে সাজা কঠিন ব্যাপার। ঠিক হিলারির মতন করে করে একটা ফটোও পাঠানো হয়ে গেছে। বন্ড প্রয়োজনীয় যা জানবার তা প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছে।

ব্যাসিলিস্ক অনেক টাকা পেয়েছে আর গবেষণা করে নতুন সব তথ্য বন্ডকে জ্ঞানিয়েছে। বন্ড অর্থাৎ স্যার হিলারি সুইজারল্যান্ড যাচ্ছেন ২২ তারিখ এ খবর আগেই পাঠানো হয়েছে। ব্রোফেল্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর সময়ে বন্ডকে কোনো অস্ত্র দেওয়া হবে না, কোনো প্রহরী থাকবে না। ব্রোফেল্ড একজন নির্ভুর গুণ্ডা। এটা হেডকোয়ার্টার্সও স্বীকার করে। বন্ডের আসল পরিচয় বেরিয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ ভবলীলা সাজ হয়ে যাবে, অতএব খুবই সাবধান হতে হবে। বন্ড তার সেক্রেটারিকে বলল, “আরে দূর একটা পিস্তলও সঙ্গে রাখা যাবে না, এ কেমন ব্যাপার। যাই হোক দরকারি কাগজপত্র আর ফাইল ব্যাগে পুরে দাও, আর একটা রেডিও ট্যান্সি ডাকো যেটা ইউনিভার্সাল এক্সপোর্টের সামনে আসবে। সুইজারল্যান্ডে ট্রেসির সঙ্গে দেখা হতে পারে। ভাবল বন্ড। কিন্তু এই দেখায় কী হবে? বন্ডের দায়িত্ব এখন অনেক বেড়ে গেছে। ট্যান্সি এল, ইউনিভার্সাল এক্সপোর্টের দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। বন্ড উঠে বসল। ট্যান্সি দেরিতে যাত্রা করল। এবার সে যাবে তার ফ্লাটে। সেখানে একটু ভদকা গলায় ঢেলে বিছানায় শুয়ে পড়বে।

॥ নয় ॥

লন্ডন এয়ারপোর্ট, বোলার হ্যাট আর ছাতা হাতে বন্ডকে কীরকম দেখাচ্ছে। ভি. আই. পি. লাউঞ্জের কাছে কে যেন হিলারি বলে ডেকে উঠল। নাঃ ব্যাপারটা তামাসার নয়। বন্ডকে স্যার হিলারি হতেই হবে। একটু ব্র্যান্ডি জিঞ্জারের সঙ্গে মিশিয়ে গলায় ঢেলে দিল। এবার মনে হচ্ছে নিজেকে ব্যারনেট ভাবা যাচ্ছে। কতদিন যে এই হিলারির অভিনয় করতে হবে কে জানে? হাতের কাগজটা ফেলে দিয়ে একটা ডেইলি এক্সপ্রেসের কপি হাতে তুলে নিল।

এবপর সুইশ ক্যারাভেল আকাশে ডানা মেলল। কন্টে দ্য ব্লিউভিলির একজন সেক্রেটারি এয়ারপোর্টে থাকবে হিলারিকে অভ্যর্থনা করার জন্য।

বন্দ ভাবছে ব্লোফেন্ডকে দেখতে কেমন? চেহারাটা পালটে গেছে? প্লেনটা একটু পরেই ফ্রান্সের সীমানা পেরিয়ে গেল। নীচে রাইন নদীতে বরফের শ্রোত। ইতিমধ্যে সুন্দরী স্টুয়ার্ডেস লানচ্ দিয়ে গেছে। জুরিখের এয়ারপোর্ট এবার এসে গেছে। প্লেন নামল ধীরে ধীরে।

রিসেপশনের কাছে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। বন্দকে দেখে বলল, “স্যার হিলারি ব্রে?” বন্দ - ‘হ্যাঁ’। শক্তপোক্ত চেহারা মেয়েটার। ধূসর তামাটে চুল। হলদে চোখ। নাম ফ্রলাইন ইবমা বস্টে। বন্দকে জিজ্ঞেস করল, কোনো কষ্ট হয়েছে কিনা। বন্দ জানাল, “আরামেই এসেছি।”

এরপর পাসপোর্ট কন্ট্রোল অফিস, তারপর কাস্টম্‌স্ হল।

বন্দ লক্ষ করল একটা লোক ব্রিফকেস হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে গেল। ইরমা জানতে চাইল বন্দ জার্মান বা ফ্রেঞ্চ ভাষা জানে কি না? বন্দ উত্তরে বলল সে ফ্রেঞ্চ অল্প জানে। ইরমা “ও তাতেই হয়ে যাবে।”

বাইনে একটা মার্সিডিস দাঁড়িয়ে। ড্রাইভারের পাশে ওই ব্রিফকেস হাতে রাখা লোকটা বসে গেছে। ইরমা আর এবার গাড়িতে ঢুকল। এবার গাড়ি চলল জুরিখের দিকে। এবার গাড়ি এসে থামল একটা হেলিকপ্টারের পাশে। গায়ে বড়ো লাল অক্ষরে লেখা জি। তার মানে মোটরে করে আর যাওয়া যাবে না। এখন হেলিকপ্টার। এবার, কপ্টারের পাখাটা ঘুরতে লাগল, কিছু বরফের কুচি উড়ে গেল। ইবমা আব বন্দ পাশাপাশি বসে পিছনে আর কয়েকজন বসে।

বন্ডের প্রশ্ন, “আমবা কোথায় যাচ্ছি?” ইরমা, “আমরা যাব আলপ্‌স-এর চূড়ার দিকে। আপনি তো পাহাড় ভালোবাসেন।” বন্দ -- “হ্যাঁ নিশ্চয় বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালায় বাইরে তাকাল বন্দ। ওর কোলে ডেইলি এক্সপ্রেসের একটা কপি। এবার ২০০০ ফুট উঁচুতে উঠেছে হেলিকপ্টার, ডাভোস উপত্যকা পেরিয়ে ট্রেসির ক্লিনিকের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। বরফে ঢাকা চারদিক।”

একটু পরেই হেলিকপ্টার নীচের দিকে নামতে শুরু করল। অস্ত্র যাওয়া সূর্যের সোনালি আলো পড়ছে উপত্যকায় নীচে। কপ্টার থামল। কিন্তু এটা কোনো জায়গায় ভাবল বন্দ। ল্যাগার্ড পর্বত তো ১০০০০ ফুট উঁচুতে। বাতাসে অক্সিজেন কম বুঝতে পারল বন্দ। কয়েকজন লোক স্কি-গাইডের পোশাক কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে। বন্ডের সুটকেস নিয়ে পিছনে একজন আসছে।

দূবে বেশ কয়েকটা বাড়িতে আলো জ্বলছে। ইরমা বান্ট একটা বাড়িতে ঢুকল। একটা বড়ো সাইনবোর্ড, লেখা আছে জি, নীচে লেখা “প্রেরিয়া ক্লাব ৩৬০৫ মিটার, প্রাইভেট।”

বন্ডরা ভেতরে ঢুকল। সামনেই রিসেপশন ঘর, আরামদায়ক উষ্ণ পরিবেশ। একজন লোক এসে বলল, “স্যার হিলারির দু’নম্বর ঘর”।

ইরমা বলল, “আসুন আমার সঙ্গে।” বন্দ হেঁটে চলল গালিচা মোড়া করিডর দিয়ে। দু’পাশে সুন্দর ফটোগ্রাফ ঝোলানো। বন্ডের দু’নম্বর ঘরটা অতীব মনোরম। পাহাড়টা দেখা যায় এখান থেকে। বন্ডের জিনিসপত্র ঘরে আনা হল। ইরমার প্রশ্ন, “আপনার পছন্দ হয়েছে তো?” বন্দ — “হ্যাঁ”। ইরমা, “এই জায়গার বিশেষ কোনো নাম নেই। আমরা এখন আলপ্‌স্ চূড়ার চেয়েও উপরে এসেছি। এটাকে বলা হয় পিজ গ্লোরিয়া। “এখানে কয়েকটা স্কী রান আছে। অনেক লোক আসে এই জন্যে। আর কাউন্ট এই সুন্দর সিলভ্যানটা তৈরি করেছেন।”

এ কথা বন্দ একটু হেসে বলল, “এসব স্কী করাব সময় আর পেলাম কোথায়। সারাজীবন বই নিয়েই কেটে গেল।”

ইরমা-কাউন্ট এখানে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কাজ করছেন। স্কী করার জায়গা ছাড়াও মনস্তাত্ত্বিক একটা প্রতিষ্ঠান করেছেন। এখানে গবেষণা করে দেখা হয় মানুষের শরীরে খাদ্যের ক্রিয়া কী রকম

হয়। কাউন্টের একটা ল্যাবরেটরি আছে, ওখানে উনি অনেক সময় কাটান। এই বাড়িতে রোগীরা থাকে। কাউন্ট বলেছেন রোগীদের চিকিৎসার ব্যাঘাত যেন না হয়।

বন্দ বলল, “আমাকেও নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় লন্ডনে। মুদ্রা স্ট্যাম্প মেডাল এ সব নিয়ে অনেক মাথা ঘামাতে হয়।”

ইরমা— স্যার হিলারি। কাউন্ট বলেছেন কাল সকালে ১১টার সময় দেখা করবেন। আপনার কোনো অসুবিধা নেই তো?

বন্দ — না অসুবিধা কিছু নেই। শুধু আর একটা টেবিল লাগবে বই রাখার জন্য। একটু পরে একটা লোক এসে একটা টেবিল দিয়ে গেল। ইরমা বস্টে এবার ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিল। এবার বন্দ ঘরে একা। মনটা একটু ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। হঠাৎ চোখে পড়ল ওপরে দেয়ালে চারটি বাতির জায়গায় তিনটে আছে। আর আছে একটা গর্তের মতো। হতে পারে ক্লোস্‌ড সারকিট টিভি অথবা মাইক্রোফোন রয়েছে সেখানে। অর্থাৎ বন্দ ফিরে ভালো পাহারার ব্যবস্থার সঙ্গে ঘরে কী করছে সেটাও লক্ষ করা হচ্ছে। যাইহোক এবার ও স্নান সেরে ভালো পোশাক পরে নেবে। অনেক মেয়েরা স্যার হিলারির সঙ্গে দেখা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

॥ দশ ॥

বারটা যেন নতুন। একটা মৃদু বাজনার আওয়াজ আসছে। এবার দেখা গেল অনেক সুন্দরীদের উজ্জ্বল চোখগুলো। ইরমা বলল, “স্যার হিলারি, চলুন মেয়েদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।” এবার করমর্দন শুরু হল। রুবি, ভায়োলেট, পার্ল বেরিল নামের মেয়েরা যেন ঘিরে ফেলেছে বন্দকে। প্রত্যেকের শরীরের দুরন্ত যৌবনের ঢেউ বইছে যেন। হুইস্কি আর কোকাকোলার ককটেল তৈরি করে মেয়েরা খেতে শুরু করল। রুবি নামে মেয়েটা বলল, “আমরা সবাই মেয়ে আর আপনি একজনই পুরুষ এখানে, বোধহয় আপনার অসুবিধা হচ্ছে।” বন্দ — “তা নয়, আসলে তোমাদের সবার নাম মনে রাখতে একটু অসুবিধা হতে পারে।”

বন্দ এবার একটু চুপ করল, মেয়েরা নিজেদের বক্বক করে চলল, কেউ বলল স্কী করার মজাই আলাদা, কেউ বলল কাউন্টের মতন মানুষ আজকাল দেখা যায় না।

বন্দের মেজাজটা একটু ক্ষিপ্ত থাকলেও সে ধৈর্য হারাতে রাজি নয়। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল, “একটা খেলা দেখাব তোমাদের। একটা জলভর্তি গেলাসের ওপরে একটা পেপার ন্যাপকিন রাখা হল। একটা মুদ্রা রাখা হল তার ওপর। এবার সিগারেটের ছাঁকা দেবে মেয়েরা কাগজের গায়ে। তাতে ফুটো হবে। যার সিগারেটের ছাঁকায় ফুটো হয়ে মুদ্রা জলে পড়বে সেই ড্রিক্সের দাম দেবে। খেলা হল। সবাই হুইহুই করে উঠল। এবার বন্দ হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়ে — “আবার কাল খেলা হবে। আজ এই পর্যন্ত। একটু পরে মেয়েরা চলে গেল। ইরমা বন্টের সঙ্গে বন্দ খাবার ঘরে এসে বসল। এখন সাড়ে সাতটা। বন্দ একটু বিরক্ত হয়ে আছে। কারণ বড়ো শক্ত ধরনের অভিনয় করতে হয়েছে তাকে। যাই হোক ইরমার পাশে বসল বন্দ। তার পাশে রুবি ও ভায়োলেট। বিরাট ঘর। তিনটে টেবিল আছে। শিলিং থেকে ঝুলছে বিশাল ঝাড় লণ্ঠন। দেওয়ালে সুদৃশ্য তেল-রং ছবি। ব্লোফেন্ড নাকি এই ঘরটার জন্য দশ লক্ষ স্টার্লিং খরচ করেছে।

এত টাকা কোথায় পেল লোকটা? সুইস ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ হিসাবে পাওয়া টাকা হবে হয়তো। স্কীইং আজকাল জনপ্রিয় এবং বিলাসবহুল খেলা। পোশাক বুট স্কি শেখাবার লোক এসব নিয়ে বিরাট ব্যবসা চালাচ্ছে এই ব্লোফেন্ড। আলপ্‌স্‌ পাহাড়ের ওপরে এইরকম আরামদায়ক রেস্টোরাঁ এত জাঁকজমক তো চারটিখানি ব্যাপার নয়।

বন্দ হঠাৎ বলল, “আচ্ছা বস্টে, তুমি বলতো আল্প আর বার্গের মধ্যে তফাত কী?”

প্রশ্নটা শুনে হলদে চোখওয়ালা মেয়েটা যেন নিজের বিদ্যা জাহির করবার সুযোগ পেয়ে খুশি হল. বলল — “আরে ব্যাপার হল আলপ্ বাগের চেয়ে আকারে ছোটো যেমন পাহাড় আর পর্বত। অস্টিয়া আর জার্মানিতেও এরকম আছে। আর ধরুন ব্যাভেরিয়া যেখানে আমার বাড়ি সেটাও এই রকম। সেখানে সবাই হল বাগ। তবে হঠাৎ এই প্রশ্ন ?

বন্দ — আমার পেশাটাই তো এইরকম। আসল অর্থ অর্থাৎ সত্যটা আমার দরকার। যেমন ধর জার্মান ভাষায় বান্টের অর্থ হল “খুশি”। আবার ইংল্যান্ডে এটা পালটে হয়েছে “বদান্যতা”। অনেকের মতে “ব্রন্টি” থেকে বান্ট শব্দটা এসেছে। আবার ব্রন্টি হল একজন নামকরা সাহিত্যিকের নাম। তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ইংল্যান্ডের কোনো সম্পর্ক ছিল কী? ইরমা এসব শুনে খুব যেন উল্লসিত। সে যতটা পারল বলে গেল। বাবা আর মায়ের নাম থেকে শুরু করে বেশ খানিকটা বকে গেল সে। সেবল্ ব্যাসিলিস্কের কথাই ঠিক। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা ভণ্ড প্রকৃতি যেন আত্মগোপন করে আছে।

এবার ওয়েটার এসেছে। বিরাট মেনু নিয়ে। বন্দ তার প্রিয় ডিশ চিকেন অর্ডার দিল। রুচি বলল, “স্যার এই চিকেন আমারও খুব পছন্দ। রুচির চিকেন পছন্দ শুনে ইরমা বান্টের মুখে ছেন একটা ভাবান্তর দেখা গেল। ভায়োলেট বন্দকে বলল সে খুব আলু খেতে ভালোবাসে। বন্ডের উত্তর, “হ্যাঁ ওটা আমারও খুব ভালো লাগে। তবে বেশি যদি খাও তবে ব্যায়াম করতে হবে। আচ্ছা মিস বান্টকে যদি একটা ইংলিশ পদবি দেওয়া যায় কেমন হয় তাহলে তোমরা বলতে পার কি? বান্ট — “স্যার হিলারি, নামের সঙ্গে পদবি এখানে খুব একটা ব্যবহার হয় না। এ সব ব্যাপারে কাউন্ট খুবই অভিজ্ঞ লোক। দরকার হলে কাল আপনাকে উনিই বুঝিয়ে দেবেন।”

বন্দ — “তাই বুঝি, খুব ভালো, এ ব্যাপারে সত্যিই আমার জ্ঞান খুব নগণ্য। তবুও তোমাদের সাথে আলোচনা করে যদি একটা ধারণার জন্ম হয় সেটাই কম কী?”

এবার খাবার এসেছে। ওয়েটারের সংখ্যা দশেরও বেশি। কেউ জার্মান কেউ কর্সিকান। কেউ বা বলকান আবার কেউ বা টার্কিস অথবা যুগোস্লাভের লোক। আর রাঁধুনিরা সব নিশ্চয় ফ্রান্সের লোক হবে।

এদের দেখে বন্ডের হঠাৎ “প্রতাত্মা” সংঘের নামটা মনে পড়ে গেল। প্রত্যেককেই কেমন যেন পেশাদার গুণ্ডা বলে মনে হল। এমন কি রিসেপশনে যাদের দেখেছে কিংবা টেবিল আনবার জন্য যে লোকটা এসেছিল, সব যেন গুন্ডাবাজিতে ওস্তাদ মনে হল। এমনকি ওই স্কি করার জন্য আসা গাইডগুলোও গুণ্ডাগিরিতে হাত পাকানো লোক বলে মনে হল। আর নয়। অনেক হয়েছে। বন্দকে এবার বিদায় নিতে হবে কারণ অনেক কাজ আছে। ওরাও ওকে বিদায় দিল। নিজের ঘরে এসে বই কাগজ ইত্যাদি গুছিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর একটা বই খুলে পড়বার জন্য তৈরি হল। কিন্তু মনে পড়ল সারাদিনের ঘটনাগুলো। রাত এখন দশটা। মেয়েদের গলার স্বর শোনা গেল। একে অপরকে “গুড নাইট” করছে।

বন্দ এবার পোশাক বদলে থার্মোস্টাট পঁচাশি থেকে ষাটে নামিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্ধকার ঘরে শব্দ করে একটা হাই তুলল। যদি মাইক্রোফোন ঘবে লুকান থাকে তাহলে এই হাইপার কাজে আসবে।

ঘুমটা এসেছিল। তবে সেটা ছিল হালকা। কারণ বন্দ শুনতে পেল এক অদ্ভুত শব্দ। একটা আওয়াজ খুবই সরু তবে অবিশ্রাম এবং অস্বহীন যেন বহুদূর থেকে আসছে।

এবার একটা চিৎকার বন্ডের তন্ত্রাভাবকে ভেঙে দিল। বেশ কিছুক্ষণ চিৎকারটা শোনা গেল। তারপর যেন গভীর নীচের দিকে মিলিয়ে গেল ওটা।

বন্ড উঠে জানালার পর্দা সরাল। বিশেষ কোনো ব্যস্ততা দেখা গেল না। জনশূন্য কাঠের বারান্দায় ব্রেকফাস্ট টেবিলটা রয়েছে। আকাশে সূর্য ঝলমল করছে। উঠোনে কিছু আরামকেন্দ্রারাও রয়েছে সূর্য স্নানার্থীদের জন্য। তাহলে ওই ভয়ংকর চিৎকারটা কী? কেউ কি ইহলোক ত্যাগ করল অমানুষিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে?

একটু পরেই একটা লোক বন্ডের ঘরে ঢুকল। নাম পিটার। চোখ দুটো যেন কেমন সাদাটে। বন্ড বলল, “চিৎকারটা কীসের?” পিটার, “বোধ হয় কোনো দুর্ঘটনা হবে, মনে হচ্ছে কোনো গাইড চাপা পড়েছে। আপনার ব্রেকফাস্ট আনব কি? বন্ড— “লোকটা বোধ হয় বেঁচে যাবে কী বল?” পিটার — সেরকম খবর পেলে আপনাকে জানানো হবে। বলে ব্রেকফাস্টের অর্ডার নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

*বন্ডের মনে হল এখানে অনেক কিছুই ঘটতে পারে যা তার মনকে নাড়িয়ে দেবে। আসলে বন্ডকে শরীরটা শক্ত রাখতে হবে। দেরি না করে বন্ড ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে নিল।

বন্ডের স্নান আর ব্রেকফাস্ট শেষ হয়েছে।

ধন্যবাদ দিয়ে সেই সাদা চোখওয়ালা লোকটা খাবারের প্লেট নিয়ে চলে গেল। বন্ড এবার কষ্ট করে এঁটে থাকা জানালাটা খুলে দিল। ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগল ওর মুখে। ঠান্ডা কমাবার জন্য থারমোস্টাটের কাঁটা ঘুরিয়ে দিল। হঠাৎ কানের কাছে কাদের গলার শব্দ আসছে হ্যাঁ মেয়েরা কিছু একটা জোরে জোরে বলছে। কে যেন বলল, “আরে লোকটা কি পশু নাকি?” বারটিল না কী যেন নাম। বদমাসটার দাঁতগুলো দেখেছ? মরে গেছে তাই না? আর একজন বলল, “মরবেই তো, বব-রান করতে গিয়ে পা পিছলে একেবারে খাদে। এই সব কথাবার্তা ফ্রিৎজ আর এলিজাবেথের মধ্যে হচ্ছিল। ওদের একজন বলল, “ঢালু শক্ত বরফ। একবার গড়িয়ে গেলে ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে দেহটা চলতে চলতে একেবারে মৃত্যুপুরী পৌঁছে যাবে। নিশ্চয় কোনো অন্যায়-এর শাস্তি এটা।” তবে এটা শাস্তি না অন্য কিছু?

বন্ড চেয়ারে বসে আছে। খানিকটা ওকে ভাবিয়ে তুলেছে। লোকটাকে শাস্তি কে দিল? ওই ব্লোফেন্ড? কোনো বিচার হয়েছে কি? কী ছিল ওর অপরাধ?

একটা ছোট্ট ধাক্কা, ব্যাস জীবন শেষ, ঈশ্বর এভাবে মারেন না। এটা কাপুকুয়ের কাজ। ওই প্রত্যাশা সংঘের প্রথার অবাধ্যতা করার শাস্তি। লোকটাকে হঠাৎ করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

তাহলে এটা পরিষ্কার যে ওই সংঘটা আবার নারকীয় কাজে লিপ্ত হতে শুরু করেছে।

প্রায় এগারোটা বাজে। ইরমা বান্ট এসেছে। বন্ড কিছু বই আর কাগজ বগল দাবা করে বেরিয়ে এল। সামনে একটা বাড়ি। সাইনবোর্ডে লেখা আছে “প্রবেশ নিষেধ”। বাড়িটা মালভূমির কিনারে। দূরে পিজ্জ প্রোরিয়র চূড়া দেখা যাচ্ছে। রেলওয়ে লাইনটাও খুব এক অস্পষ্ট নয়।

নিওম্যাটিক দরজা খুলে গেল। এরপর নির্জন লম্বা করিডোর।

করিডোরের প্রান্ত এসে একটা বন্ধ দরজায় করাঘাত করল ইরমা। দরজা খুলে গেল, বন্ডের বুকুর মধ্য একটা উত্তেজনার ভাব। এবার ব্লোফেন্ডকে দেখা গেল। না তার চিন্তার সঙ্গে এই কাউন্টের কোনো মিল নেই।

দীর্ঘ শক্তপোক্ত দেহ নয়, বরং দেহটা হালকা ধরনের। কেয়ারি-করা এক মাথা চুল। নাকটা মোটা নয় বরং টিকালো। তবে লোকটা যে সিফিলিসে ভুগেছে সেটা চেহারায় প্রকাশ পেয়েছে।

বন্দ এবার বইগুলো টেবিলে রেখে ওর সঙ্গে করমর্দন করল। মসিয়ে লে কমুটে দা ব্লিউভিলি বললেন, “স্যার হিলারি খুব প্রীত হলাম।” বন্দও হেসে অভিনন্দন জানাল। কিছু সাধারণ কথা-বার্তার পর কাউন্ট বললেন — “চলুন স্যার হিলারি বারান্দায় বসা যাক। ওরা বারান্দায় বসলেন। ব্রোফেল্ড বলল, “স্যার হিলারি এত কষ্ট করে এখানে এলেন। আমি খুব খুশি। বলুন কী বলবেন।”

বন্দ — “ডায়ার কাউন্ট, অনেক সময় বই ঘেঁটে সব কিছু জানা যায় না। দেখুন ফরাসি যুদ্ধের সময় ব্লিউভিলি বংশের ইতিহাসটা কেমন যেন চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু অগস্‌বার্গে একটা নতুন বংশের আবির্ভাব ঘটেছে। এর নাম ব্রোফেল্ড বংশ। ডায়ার কাউন্ট আপনি এই কাজে অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন। তবে আমাদের প্রচেষ্টা পুরো সফল এখনো না হলেও একটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে বলে মনে হয়। দেখুন আজ পর্যন্ত যতগুলো ব্লিউভিলি মূর্তি অথবা প্রতিকৃতি খুঁজে বের করেছি তাতে একটা জিনিস লক্ষ করার মতো। সেটা হল এদের কারো কানের লতি নেই।” এটা শুনে কাউন্ট হঠাৎ নিজের কানে হাত দিলেন। বন্দ বলে চলল, “কাউন্ট আপনি যদি আমার সঙ্গে অগস্‌বার্গে যেতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয়। সরকারি ঐতিহাসিক দপ্তরে ব্লিউভিলিদের হাতে লেখা দলিল দেখতে পাবেন।” বন্দ ভাবছে এই ঘটটিকে একবার বাগে পেতে হবে। আর এই লোকটা যে ব্রোফেল্ড তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। মুখটাকে বাছাধনু যতই প্লাস্টিক সার্জারি করুক চোখটাই তার সব কথা বলে দিচ্ছে।

এবার একটা অদ্ভুত হাসি হেসে কাউন্ট বললেন, “স্যার তাহলে তো খুবই ভালো। আমি চাই — সরকারিভাবে আমার উপাধিটা মেনে নেওয়া হোক।” বন্দ — “ধন্যবাদ কাউন্ট। আমিও আমার কাজ করতে চলে যাই।”

॥ বারো ॥

বন্দ ঘরে এল। তবে একা নয়। একটা লোক বন্দকে এগিয়ে দিয়ে গেল। বন্দকে এবার পাঁচশো বছরের বংশ-পরিচয় লিখে নিতে হবে বই বা খাতা থেকে। ব্রোফেল্ড পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ব্রুফিল্ড আর ব্লাসফিল্ড পরিবারও। অর্থাৎ একটা জগাখিচুড়ি বানাতে হবে আর এই শয়তান ব্রোফেল্ড আর প্রেতাঙ্ঘ্রা সংঘের কার্যকলাপ জেনে নিতে হবে।

একটা ব্যাপার অবশ্য ঘটে গেছে। কারা যেন বন্ডের জিনিসপত্র এবং পোশাক ঘেঁটে এলোমেলো করে দিয়েছে। যাইহোক বন্দ নিজে একটা ছদ্মবেশে আছে। এই বেশকে আরো বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। ১৩৫০ সাল পর্যন্ত অনুসন্ধান করল বন্দ। অনেক সন-তারিখ লেখা হয়ে গেছে। এবার নাইরে বেরিয়ে স্কি ঘরে ঢুকল। কয়েকটা প্লাস্টিকের টুকরো তুলে নিল। সেখানে একটা লোকও কাজ করছিল। তার সঙ্গে জার্মান ভাষায় একটু কথা বলে বেরিয়ে এল বন্দ।

প্লাস্টিকের টুকরো পকেটে ভরে বন্দ এগিয়ে চলল কেবল স্টেশনের দিকে। একটু পরে উঠে এল পাহাড়ের চূড়ায়। কিছু লোক স্কিইং করছে। একটা নোটিশ-বোর্ড বুলছে। জার্মান ভাষায় লেখা হিমবাহের জন্য সতর্কতা। লাল আর হলদে পথ খোলা। কালো পথ বন্ধ।

দূরে দেখা যাচ্ছে কিছু লোক স্কিইং করছে। বন্দ নিজেও স্কিইং করতে জানে। স্কুলে একবার মেডাল পেয়েছিল। একটু পরে বন্দ গ্লোরিয়া এক্সপ্রেস বব-রানের দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ ইরমার আবির্ভাব, বলল “স্যার হিলারি লান্‌চের সময় হয়েছে।” বন্দ বলল “ঠিক আছে আসছি।” এবার বন্ডের পেছন পেছন এগিয়ে গেল বন্দ। পকেট থেকে প্লাস্টিকের টুকরোটা

বার করে বলল, এটা নিয়ে এসেছি স্কি কম থেকে। কাগজে লাইন টানতে সুবিধা হবে। আশা করি কিছু মনে করনি।” ইরমা বলল, “না না ওটা কিছু নয়। আপনার যা দবকার স্যার কাউন্ট সবই দিতে পারবেন, আপনি টেরাসে যান, খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। আমি আসব একটু পরেই।

টেবিলে বসেই বস্তু দেখতে পেল রুবি আর ভায়োলেটকে। তারাও সেখানে আছে। ডবল ভদকা মাটিনির অর্ডার দিল। প্লাস্টিক পকেটে রাখার ব্যাপারটা বস্তুকে একটু ভাবাল। কেউ কোনো সন্দেহ করল কি না কে জানে? একটু পরে বান্ট এল। ইরমা স্যার হিলারি এখানে আপনার কেমন লাগছে? কাউন্টকে কেমন লাগল? বস্তু — “হ্যাঁ দারুণ লোক উনি। তবে এখনো ভালোভাবে কথা হয়নি।” ইরমা — “কাউন্ট-ও তার কাজের ব্যাপারে খুবই সজাগ। পাহাড়ের নির্জন জায়গায় আমরা গবেষণা করে থাকি। এমনকি পুলিশও কাউন্টকে সাহায্য করে। রুবি আর ভায়োলেট চিকেন খেতে খেতে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করল। ইরমা ওদের খামিয়ে দিয়ে বলল, “না চিকিৎসা নিয়ে কোনো আলোচনা নয়। স্যার হিলারি, এখানে নানারকম লোক দেখতে পাবেন। সব গণ্যমান্য লোক। দেখুন ঐ সুন্দরী মেয়েটাকে। ওর নাম উরসুলা আন্ড্রেস। ফিল্ম-স্টার। খুব ভালো হয় যদি আগা খাঁ আর ডিউক অফ কেন্টের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়।”

লান্চ শুরু হয়ে গেছে। ইরমার রান্নার সুখ্যাতি করল সবাই। হঠাৎ একজন লোক এল, মেয়েদের দিকে মাথা নুইয়ে বস্তুকে বলল, “স্যার আপনার নামটা ভিজিটরস বইতে দেখলাম, হিলারি ব্রে তো আপনি। তাই না?”

বস্তুর বুকটা ধক করে উঠল। ইরমাও বস্তুর দিকে তাকিয়ে আছে। বস্তু পকেটের রুমাল দিয়ে নাক ঝেড়ে বলল, “কেন বলুন তো”? লোকটা বস্তুকে কিছু যেন গোপন প্রশ্ন করল। বস্তু কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। যাওয়ার আগে লোকটা বলল, “যাই হোক স্যার হিলারিকে মানে আপনাকে এখানে দেখতে পাব ভাবাই যায় না” — বলে এগিয়ে গেল।

বস্তু একটা খবরের কাগজে মন দিল। কপালে আর বুকে ঘাম জমেছে। বলল — “ইরমা আমার খুড়তুতো ভাইয়ের বন্ধু মারা গেছে। আহা বেচারি, ইরমা “আচ্ছা আপনারা দুজনেই একই রকম দেখতে ছিলেন?”

বস্তু — “একেবারে একরকম। লোকে গোলমাল করে ফেলত।”

॥ তেরো ॥

প্রিয় সেবল ব্যাসিলিস্ক

আমি নিরাপদে পৌঁছেছি। ১০,০০০ ফুট উঁচু একটা জায়গায় আছি। নাম পিজ গ্রোরিয়া। মি. কাউন্টের বিশেষ সেক্রেটারি ইরমা বান্ট এখানে থাকে। এছাড়া আছে অনেক লোক।

কাউন্টের সঙ্গে আলোচনায় কাজ হয়েছে। তিনি বিশেষ এক অ্যালার্জির গবেষণায় ব্যস্ত।

তবে ব্রিউভিলি পরিবার ফ্রান্স থেকে অগ্‌স্বার্গে আসার মাঝের সময়টা সম্বন্ধে জানতে হবে আমাকে। এই পরিবারটিই ব্লোফেস্ট উপাধি ধারণ করেছিল। এখনো মনে হয় এখানে আমাকে সবাই হিলারি বলেই ভেবে নিয়েছে।

এখানে স্কিইং করার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। অনেক সুন্দরী মেয়েরা এখানে আছে। রাত দশটা বাজলেই শুয়ে পড়ে।

একটা কথা, কাউন্টের কানের লতি নেই। সম্ভ্রান্ত চেহারা, ভালো ইংরাজি বলেন। মনোরম

হাসি, মাথায় ঠাসা চুল। কৃশ গড়ন। সবুজ রঙের চশমা পরেন। আমাব সঙ্গে হৃদয়টা ভালোই জমে উঠেছে। আজ এখানেই শেষ করছি।

বিশ্বস্ত
হিলারি ব্রে

পুনশ্চ .

মাকে আমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলনা। এখানে অন্তহীন বরফের মধ্যে আছি। আজই এখানকার এক কর্মচারী পা পিছলে খাদে পড়ে মারা গেছে।

বন্ড জানে এই চিঠি ডাকে পড়লে, খুলে ফেলা হবে। ফটোস্টাট নেওয়া হবে। কিন্তু উপায় কী? বেয়ারাকে ডেকে চিঠি পাঠিয়ে বন্ড স্নান সেরে নিল। এবার আবার সেই ব্লিউভলি বংশ নিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে তাকে।

পাঁচটা বাজল। হঠাৎ দরজায় কে টোকা মারল।

বন্ড বলল, “এস”। ঢুকল রুবি। সে বলল — চলুন বাথরুমে। এখানে কথা বলা মানে বিপদ। ঘরের কোথায় মাইক্রোফোন লাগানো আছে কে জানে? আর ওই ইরমা বান্ট সব সময় আমাদের মেয়েদের কথা শুনবার জন্য তৈরি হয়ে আছেন। আমাদের কথা ওব কাছে পৌঁছেও গেছে। শুনুন আমার নাম রুবি উইন্ডসর।”

বন্ড — “তাই নাকি? তাহলে তো দারুণ ব্যাপাব।”

রুবি “শুনুন আমার বাবার নাম জর্জ, মার নাম মেরি পটস, আমাদের ছিল বিশাল মুরগির চাষের ব্যবসা, কিন্তু মুরগি খেলে আমার গায়ে চাকা চাকা দাগ হোত। হঠাৎ কাগজে বিজ্ঞাপন পড়ে এই জায়গার ঠিকানা পেলাম। আসবার জন্য কোনো খরচ হয়নি। মি. ব্রোফেন্ড আমার চিকিৎসা করলেন। ভালো হয়ে গেলাম। এখন চিকেনই আমার প্রিয়।” এ সব শুনে বন্ড খুব খুশি। বলল, “রুবি তোমার সম্বন্ধে আরো জানতে চাই।”

রুবি — “তাহলে রাত্রিবেলা ছাড়া সম্ভব নয়।”

বন্ডের শরীর এখন একটু বেসামাল। হঠাৎ রুবিকে জাপটে ধরে চুমু খেয়ে ফেলল সে। রুবিও যেন বেসামাল হল, বলল — “আমার ঘরে কী করে আসবেন? পাহারাদার আছে সব জায়গায়। বন্ড প্লাসটিকের একটা টুকরো রুবিকে দিয়ে বলল, “এটা দিয়ে তালা খোলা যায়। এই নাও। আমারও একটা আছে। তবে কথা দাও, কাউকে কিছু বলবে না।” রুবি বন্ডের গলা জড়িয়ে বলল, “কথা দিলাম তবে উইন্ডসর সম্বন্ধে কিছু জানা যাবে কি?”

বন্ড — “বইগুলো একটু ঘাঁটতে হবে। তবে আর এখন প্রেম নয়। এবার তোমার যাওয়া দরকার।”

ছটা বাজল। বন্ড স্নান সেরে বারের কাছে বসল। তার প্রিয় মদেব গেলাসে চুমুক দিয়ে তাকাল ভায়োলোটের দিকে, একটু হেসে বলল, “তোমরা বেশ স্কিইং নিয়েই মেতে আছে।” ভায়োলোট কী যে বলেন, সকাল বেলা দুটো লেকচার শুনতে হয়েছে। কত বই পড়তে হয় জানান?” বন্ড — তোমার বাড়ি কোথায়? রুবি — দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডের কাছে, আলু চাষের জন্য জায়গাটা বিখ্যাত, এখানে স্যার ভালো লাগছেন, বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে।”

হঠাৎ ইরমা বান্ট হাজির। বলল “এই যে স্যার হিলাবি আপনার মুখের রংটা অন্যরকম দেখাচ্ছে। চলুন সবাই একই টেবিলে বসা যাক। রুবি তুমি এখানে কেন?” এবার সবার জন্য পানীয় এল। বন্ড বসল রুবির পাশে।

বুরবোঁ মদের খানিকটা গলায় যেতেই বন্ড বলল সব মেয়েরাই এখানে আছে মনে হচ্ছে। সেই খেলাটা হবে নাকি?

শুরু হল সেই খেলা। যেটাতে কাগজের ন্যাপকিন আর জলভর্তি গেলাস লাগে। বন্ড বলল ইরমাকে, “আচ্ছা সময় থাকলে ওই কেবল দোলনার উপত্যকাটা দেখলে কেমন হয়?” ইরমা, “কিন্তু স্যার হিলারি সিলভান যাওয়ার নিয়ম নেই এখানে। ট্যুরিস্টরা অবশ্য যায়। বন্ড তাহলে যাক। কিন্তু আমি তো রুগি নই। আমার ক্ষেত্রেও কি এটা চলে?”

ইরমা— “ব্যাপার হল এটা কাউন্টের আদেশ। তাছাড়া কাউন্টের সঙ্গে আপনার অনেক কাজ। কাজেই ওখানে যাবার সময় কোথায় পাচ্ছেন আপনি?”

মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল বন্ড, “মেয়েরা চল, খেলো বন্ধ করো। খাবার সময় হল।”

বন্ডের মেজাজটা একটু খিঁচড়ে গেছে। ভাবল ইরমা বাণ্টের বিশাল পাছাটায় এক লাথি কষাতে পারলে বৃকের জ্বালার খানিকটা নিশ্চয় ঠান্ডা হয়ে যেত।

॥ চোদ্দো ॥

রাত এগারোটা। রুবিবির চটকদার চেহারাটা বন্ডকে সুস্থির থাকতে দিচ্ছে না। উঠে দাঁড়িয়েই প্লাসটিকের টুকরোটা দরজার ফাঁকে রেখে চাপ মারতেই খুলে গেল।

জনশূন্য করিডোর। জোরে পা ফেলে চলে এর রুবিবির ঘরের কাছে। দরজার হাতল ধরে ঠেলা মারতেই খুলে গেল।

অন্ধকার ঘর। রুবি বলল — “কে?” বন্ডের উত্তর, “আমি — স্যার হিলারি।” অন্ধকার ঘরের বিছানায় শুয়ে রুবি। ওর দেহে হাত রাখতেই বোঝা গেল ও নগ্ন হয়ে আছে। বন্ডও পোশাক খুলে রুবিকে জাপটে ধরে বলল “তোমার মতন সুন্দরীকে না পেলে জীবনটাই মিথ্যে।” রুবিও বন্ডকে সজোরে চেপে চুম্বন করল। বেশ কিছুক্ষণ যৌনলীলা চলল। অবশেষে দুজনেই যেন ক্লান্ত। বন্ড তৈরি হয়ে বলল, “ডারলিং এবার আমি যাই। রুবি, “হ্যাঁ যাও”। বলে যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

বন্ড হঠাৎ চমকে গেল। কার গলার স্বর যেন একটা যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসছে। হ্যাঁ ওটা কাউন্টের স্বর। উনি বলছেন, “রুবি তুমি এখন ক্লান্ত, তোমার দেহ ভারী হয়েছে, তুমি অবসাদগ্রস্ত, তবে তোমার নিশ্বাস শান্ত। তোমার প্রিয় পাখিদের ফিরে পাবে। ওদের লালন পালন করবে। তোমার বিছানা পালক দিয়ে তৈরি। ঘুমাও, ঘুম ঘুম, মুরগিদের তোমার আবার ভালো লাগবে। আনন্দ পাবে। এখন শুধু ঘুমাও। লক্ষ লক্ষ মুরগির ভবিষ্যৎ তোমার উপর নির্ভর করছে।” আস্তে আস্তে গলার স্বরটা যেন মিলিয়ে গেল। বন্ড একটু অবাক হল। ঘরে এসে বুঝল এটা মুরগি সংক্রান্ত কোনো এলার্জির চিকিৎসা হচ্ছে। কাউন্ট কি তাহলে শুধু জনহিতকর কাজই করেন? তাহলে খাদের নীচে খুন হওয়া লোকটা কী করে ছিল। নানান দেশের লোক এসে এখানে কী করছে? কোথায় যেন প্রেতাছা সংঘের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। একটা যড়যন্ত্রের আভাস পাওয়াও যাচ্ছে।

পরের দিন নটায় উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ব্লিউভিলি পরিবার সংক্রান্ত গবেষণার কাগজ নিয়ে বন্ড কাউন্টের কাছে হাজির। কাউন্ট জানালেন এখানে সব চাষির ঘরের মেয়েরা এসেছে আর উনি ওদের অ্যালার্জির চিকিৎসা করেন।

বন্ড টেবিলে কাগজের বাস্তিল রাখল। বলল, “ব্লিউভিলি মনোগ্রামে ভাঙা তলোয়ারের চিহ্ন পাওয়া গেছে। মি. কাউন্ট আপনার জন্ম কোন সালে?” কাউন্ট— ১৯০৮, ২৮শে মে। বাবার নাম আর্নস্ট জর্জ ব্লোফেল্ড, মা মারিয়াস্তাভো মাইকেলোপুলোয়া। এদের জন্ম জিভাইনায়। পিতামহের

নাম আর্নস্ট স্টিফান ব্রোফেন্ড আর পিতামহীর নাম এলিজাবেথ।” বন্দ --
অগ্‌স্‌বার্গেও দুজন ব্রোফেন্ড পাওয়া যাচ্ছে।” হঠাৎ কাউন্টের গলার স্বরটা আতঁনাদেশ ...
শোনাল। উনি বললেন “মি. হিলারি কী দরকার এ সব জেনে? গির্জার খাতা রেজিস্ট্রিতে আসল
নাম নাও থাকতে পারে।”

বন্দ এবার মনে মনে যেন নেচে উঠল। “বুড়ো শেয়াল, এবার বাগে এস।”

কাউন্ট — শুনুন স্যার হিলারি আপনি ভয়ংকর পাহাড়ে জীবনযাপন করেন। অনেক কষ্টও
করেন। মোটর গাড়ি, পেনসন, ইয়ট ইত্যাদির সুখ থেকে বঞ্চিত। চেষ্টা করলে সব পাবেন। শুধু
একটু সহযোগিতা চাই। পোলাভে জার্মানিতে একটু যেতে হবে। সব খরচ আমি দেব। দলিল বা
কাগজপত্র যা লাগবে আমিই দেব। প্যারিসের বিচার মন্ত্র দপ্তর কলেজ অফ্‌ আরমস-এর কথাকে
ভগবানের নির্দেশ বলে মেনে নেবে।” বন্দ — “আচ্ছা তাই হবে। তবে দলিলটা একটু আইন
মেনে লেখা হলেই ভালো। অতএব মি. কাউন্ট আপনার প্রস্তাব একটু গ্রহণযোগ্য করতে হবে।”

কাউন্ট — “ও সব আপনাকে ভাবতে হবে না।” হঠাৎ একটা রক্তাক্ত লোককে কাউন্টের
লোকেরা ঘরের মধ্যে ঠেলে ঢোকাল। বন্দও চমকে উঠল কারণ লোকটা তার চেনা। কাউন্ট—
“কী ব্যাপার, লোকটা কে?” বন্দ জানে লোকটা কে? লালচে চুলওয়ালা লোকটা নৌবহরের নাম
করা মুষ্টিযোদ্ধা। জুরিখে ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের জেড্‌ স্টেশনের দু’নম্বর পজিশন তার।

॥ পনেরো ॥

হ্যাঁ এই লোকটার নাম ক্যাম্পবেল। এক সময় বন্ডের সঙ্গে কাজ করেছে। এরা ওকে প্রচুর
মেরেছে। বিশেষ করে মুখে। ওর পকেটে পাওয়া গেছে পাঁচশো সুইস ফ্রাঁ। কোনো পরিচয়পত্র
নেই সঙ্গে। বন্ডের দিকে কক্ষণভাবে তাকিয়ে যেন বলতে চাইল, “আমায় বাঁচাও বন্দ।”

বন্দকে জিপ্সেস করা হল সে লোকটাকে চেনে কিনা। বন্দ মাথা নেড়ে জানাল — না ওকে
ঠিক চেনা মনে হচ্ছে না। তবে লোকটার মস্তিষ্কে বিকৃতি আছে মনে হয়। কাজেই ভালো করে
চিকিৎসার দরকার।

এরপর ক্যাম্পবেলকে হেঁচড়ে এন্টা খরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বন্দ বুঝল এবার
অমানুষিক অত্যাচার শুরু হবে।

হঠাৎ কাউন্ট বললেন, “স্যার হিলারি আমাদের : কাজের ব্যাঘাত হয়ে গেল। আচ্ছা আপনার
সঙ্গে ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের যোগাযোগ আছে নাকি?”

বন্ডের বুকটা কেঁপে উঠল, বলল “গুপ্তচর বিভাগ যুদ্ধের পরে আর আছে বলে মনে হয় না।
যাই হোক মি. কাউন্ট এখনো কাজ বাকি। কাল আশা করি কিছু কাজ করে আপনাকে দেখাতে
পারব।”

বেরিয়ে গেল বন্দ। যাওয়ার পথে একটা ঘরের দরজা ঠেলে দেখতে পেল এক বিশাল
ল্যাবরেটরি। সাদা পোশাক পরা তিনটে লোক কাজ করছে। নাক ঢাকা, মাথায় সার্জিকাল টুপি।

মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছে বন্ডের। ক্যাম্পবেলকে তার পক্ষে এখন বাঁচানো সম্ভব কি?
ক্যাম্পবেল অবশ্য হয়তো বুঝবে বন্দও কোনো কাজে এখানে এসেছে। অতএব পরিচয় গোপন
রাখা দরকার আছে।

বন্দ ভাবছে অন্য কথা। তার কাছে কোনো অস্ত্র নেই। জিলেট সেফটি রেজার থেকে ব্লডটা
বার করে পকেটে রাখল। এবার তাকে মেয়েদের নামগুলো জোগাড় করতে হবে। দরকার পড়লে
ঠিকানাগুলোও। ব্রোফেন্ড এদের নিয়ে নিশ্চয় কোনো রহস্যের কারবার ফেঁদেছে।

একটু পরেই রুবি এল বন্ডের ঘরে। সে ভেবেছে বন্ড বিপদে পড়েছে। তাই বলল, “জান তো তোমার সঙ্গে কথা বলা আমার চলবে না। নিষেধ করা হয়েছে।” বন্ড — “আচ্ছা রুবি তোমাদের মেয়েদের পদবিগুলো দিতে পারবে। বংশবৃত্তান্তও দরকার। এই তো কাল ভায়োলেটের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এখানে আমার ভালো লাগছেন। হল্যান্ডে ফিরে গবেষণা করে তোমাদের মেয়েদের সব খবর জানিয়ে দেব।”

রুবি— “কিন্তু স্যার হিলারি তোমাকে তো এখানে কাজ শেষ করে যেতে হবে।” বন্ড — “সেটা আমি বুঝে নেব।” বন্ড একটা কাগজে রুবি যা বলল লিখে নিল। অনেকের আসল নাম ও ঠিকানা লিখে নিল বন্ড। হঠাৎ রুবি বন্ডের গলা জড়িয়ে বলল, “হিলারি তোমার সঙ্গে আবার ইংল্যান্ডে দেখা হবে তো?” বন্ড ওকে চুমু খেয়ে বলল, “অবশ্যই, কুইন ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটে, কলেজ অফ আরম্স-এ যে কোনো সময়েই আমাকে পাবে তুমি। রুবি স্পিকার্টি নট। কাউকে কিছু বলবে না। এবার এস।”

রুবি চলে গেল। ঠান্ডা পড়েছে। মুখটা একটু সাবান দিয়ে ধুয়ে বেরিয়ে গেল। রেস্তোরাঁর দিকে গেল। অনেকের চোখ তাকে লক্ষ্য করছে বুঝতে পারল বন্ড।

রেস্তোরাঁয় ইরমা বান্ট আর রুবির মাঝে বন্ড।

বন্ড — দেখ ইরমা আমার চোখের অবস্থা এই কড়া সূর্যের আলো আর সারাদিন কাগজ পড়ার ফল। দেখ চোখ লাল হয়ে গেছে। কাজেই একজোড়া নোগগল্‌স যদি এনে দাও ভালো হয়।”

আসলে বন্ড চোখে সাবান ঘসে চোখ লাল করেছে। ইরমা — হ্যাঁ ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওয়েটারকে বলা হল স্যার হিলারির ঘরে এখন এক জোড়া গগল্‌স পাঠিয়ে দাও। বন্ড — “আরেকটা কথা হুইস্কি ঠিক ভালো লাগছে না। একটু শ্লাপস্ পেলে ঘুমটা ভালো হত।”

ইরমা বান্টের দৃষ্টিটা এখন কেমন যেন কঠোর মনে হচ্ছে। ভায়োলেট বলল, “ঝড়টা বিকালেই থেমে যাবে। বন্ড— আচ্ছা এখানে কোনো খবরের বুলেটিন অথবা রেডিওর সংবাদ পাওয়া যাবে কি? আর হ্যাঁ ওই লোকটা কেমন আছে?” ইরমা চুপ করে ছিল, বলল, “ভালো আছে।” ইরমা যেন বেশি কথা বলতে চাইছে না।

লোকজন যে যার খাবার খেয়ে বেরিয়ে গেল। এখন বন্ড শুধু একা। বন্ড উঠে এগিয়ে চলল করিডোর দিয়ে। হঠাৎ দেখল চামড়ার দস্তানা আলনায় বুলছে। চট করে ওটাকে সোয়েটারের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। এবার স্কি রুমে ঢুকে দেখল গাইডের স্কি রয়েছে একজোড়া। লাল মার্কা স্কিটার কথা ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকল বন্ড।

॥ ষোলো ॥

ক্যাম্পবেলের কথা ভাবছে বন্ড। হয়তো অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে। অবশ্য ক্যাম্পবেলও সোজা লোক নয়। দু'চারটে ধোঁয়াটে কথা বলে চমকে দিতে পারে অত্যাচারীদের। কিন্তু এই অত্যাচারীদেরও লোক আছে জুরিখে। ওর কথার সত্যতা যাচাই করে নেবে চট করে। তবে বিদ্যুতের শক্ ছুঁচের খোঁচা সহ্য করা কঠিন ব্যাপার। ক্যাম্পবেলের সঙ্গে বিষের বড়ি আছে নাকি? এরপর হয়তো হিলারি অর্থাৎ বন্ডকে নিয়ে আর এক কাণ্ড ঘটাবে ওরা। রটিয়ে দেওয়া হবে স্যার হিলারি কেবল গাড়িতে চলে গেছেন। আসলে হিলারিকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বরফের নীচে খাদের মধ্যে।

বন্ড এবার বাথরুমে গিয়ে দস্তানা জোড়া চৌবাচ্চার পিছনে রেখে দিল। যা পোশাক আছে তাই কাজে লাগাতে হবে, দরকার হলে মুখে রুমালটা বেঁধে নিতে হবে। বাকিটা ভাগ্যের হাতে থাকবে।

ডিনারে গিয়ে বন্ড আজ ভরপেট খেয়েছে। মাংস আর হুইস্কি। দেবি না করে ঘরে এসে কাগজে লিখল — ‘সাইমন-দ্য ব্লিউভিলি, ১৫১০-১৫৬৭, অ্যালফোর্সে দ্য ব্লিউভিলি। ১৫৪৬-১৫৮০, ম্যারিয়ট ডি এসকর্ট এর সঙ্গে বিয়ে, ১৫৭১। সন্তান : জাঁ ফ্রাঁসোয়া পিয়ের। এসব আজগুবি বিষয় থেকে বন্ডকে মুক্তি পেতে হবে। এবার শরীরে একটা ভয়ংকর উত্তেজনা, হাতের তালুও এই ঠান্ডায় যেমে জল। চট করে স্কি পোশাকটা পরে নিল। নাকে রুমাল বাঁধা হল, দস্তানা পরে নিল, গগলস্ কপালে আটকে দিল। আঙুলের ফাঁকে জিলেট ব্রড ব্যস এবার আস্তে করে দরজা খুলে সোজা রিসেপশন রুমে এসে গেল। একজন গার্ড কাগজ পড়ছে মন দিয়ে। ব্যস অ্যাকশন শুরু।

লোকটার পেছনে গিয়ে ডান হাতটা মুঠো করে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ততার সঙ্গে ঘাড় আর মাথার মাঝে আক্রমণ হানল। লোকটা সোজা টেবিলে গিয়ে যেন আটকে গেল। দ্বিতীয় ঘুঘিটা চোয়ালের তলায়। ব্যস বাছাধন পগারপার। নিঃস্পন্দ দেহটাকে গালিচায় শুইয়ে দিল। হঠাৎ টেলিফোন বাজল। কে যেন বলছে, “আলেস সব ঠিক আছে তো”। রুমালটা মুখে চেপে বন্ড উত্তর দিল, ‘হ্যাঁ’। টেলিফোনে এবার বলা “শোন আলেস আমরা কয়েকটা মিনিটের মধ্যে ওই শালা ইংরাজটার দফারফা করতে আসছি। ঠিক আছে?”

বন্ড— “সব ঠিক আছে।”

আর দেরি নয়। চটপট স্কি রুমে ঢুকে নির্দিষ্ট স্কি জোড়া তুলে নিয়েই দৌড়। তার আগে অবশ্য দরজাটা বন্ধ করতে ভোলে নি সে। চাবিটা ছুড়ে ফেলে দিল বরফের স্তূপের উপর।

এবার বন্ড ভেসে চলেছে ঢালু বরফের সমুদ্রে। সামনে কেবল হেড়। তারপর শ্বেরিয়া রান। আত্মবিশ্বাসে বুকটা ভরা। ছেলেবেলায় শেখা অসামান্য স্কিং-এর কৌশল এখন মনে পড়ে গেল। রুপোলি পাহাড়টা যেন অনেক নীচে গাছগাছালির মধ্যে মিশে গেছে।

ক্রমাগত তার স্পিড বাড়ল। কিন্তু হঠাৎ একটা আলোর দূতি ওর দিকে তেড়ে আসছে।

আবার তীব্র আওয়াজের সঙ্গে আরো আলো ছড়িয়ে গেল চারিদিকে।

হ্যাঁ বন্ড বুঝেছে ওকে ধরার জন্য “গনডোলা পাঠাচ্ছে ওরা। কিন্তু গনডোলা কত জোরে ছোটো। বড়ো জোর ঘন্টায় তিরিশ মাইল।”

সামনে দুটো বাঁক। বন্ডকে পেরোতে হবে হঠাৎ দুটো বিস্ফোরণ। ওরা এবার বোমা মারতে শুরু করেছে। এবার ভয়ংকর শব্দে আরেকটা বোমা প্রায় ওর সামনে এসে পড়ল। বন্ড গতি দ্রুততর করে কী অদ্ভুত কৌশলে সোজা খাদের মধ্যে যেন লাফ দিল।

॥ সত্তেরো ॥

এবার যেন “গনডোলা” থেমে গেল। কেন? একবার গুলি মারা শুরু হল। কয়েকটা এসে বরফের টুকরো গুড়িয়ে যেন মিলিয়ে গেল। হিমবাহের জন্য একটা দিক বন্ধ। বন্ড ভেসে চলল আগের মতো। কিন্তু কী সর্বনাশ। একটা অ্যাভালানশ্ ওকে তাড়া করছে। পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। বন্ড গাছের সারি লক্ষ করে স্কি চালিয়ে দিল। ধস না গোটা পাহাড়টাই ওকে শেষ করতে চাইছে কে জানে?

যেমন করেই হোক গাছ আর জঙ্গলের ওপারে ওকে যেতেই হবে। তুষারপ্রবাহ আর একটা মানুষ, নাম — জেমস বন্ড। আর কেউ নেই এখন। কিন্তু তুষারপ্রবাহ ওকে তাড়া করতে করতে আর এখানে ওখানে ধাক্কা খেয়ে এবার খুব ছোটো হয়ে গেছে। তবুও বিপদ যায়নি।

বনভূমি এসে গেছে, একটা ঝড়ের চেয়েও দ্রুতগতির মানুষ যেন ওটা ভেদ করে ভেতরে এসে গেছে। তুষারপ্রবাহ এসে পড়ল গাছগুলোর ওপর। বহু গাছ ভেঙে চেপ্টা হয়ে গেল। বরফের বিশাল টুকরোগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে গেল।

বিশাল যেন একটা ভূমিকম্পের মতো কিছু একটা ঘটে গেল। বন্ডও ছিটকে গিয়ে গাছে ধাক্কা খেয়েছে। শরীরটা যেন আলগা হয়ে গেছে। গগলস্ গেল হারিয়ে।

বন্ড আবার এগিয়ে চলল। “গনডোলা” গেল কোথায়? পিজ্জ গ্লোরিয়ার দিকে? ওরা হয়তো ধরে নিয়েছে তুষারপ্রবাহে বন্ডের মৃত্যু হয়েছে। একটা গাইড বন্ডের পিছু নিয়েছিল। তারপর ২টা বুলেট ছুড়ে বোধহয় বাছাধন খালি হাতে ছুটে আসছে। কিন্তু না। বন্ডের হাতাহাতি করার সময় নেই। হঠাৎ ট্রেনের শব্দ। হ্যাঁ স্টেশনটা কাছেই। বন্ডকে সেখানেই পৌছতে হবে। একটা লোক কেবিন থেকে দ্রুত ছুটে এসে পড়ল বন্ডের গায়ের ওপর। পিস্তলের গুলি মেরে বন্ডকে শেষ করার আগেই বন্ডের স্কি-লাঠিটা সবগে লোকটির বুকে ফুটো করে দিল। লোকটার ভয়ংকর আর্তনাদ মুহূর্তেই থেমে গেল। এবার একটা লাফ — বন্ড পড়ল রেল লাইনের ওপারে। আবার আর্তনাদ। সেই বদমাস গাইডটা এবার ট্রেনের চাকায় খেঁতলে গেছে।

এদিকে ট্রেনটি হঠাৎ যেন থেমে গেল। কামরার জানালা তুলে বিস্মিত কিছু যাত্রী তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বন্ড কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেল। একটু দূরেই একটা গির্জা। সেখানে একটা বসতি আছে। বলনাচের সঙ্গে বাজনার আওয়াজ আসছে।

কিন্তু এখনো রেহাই নেই। প্রেতাঙ্খা সংঘের পুলিশ লাগবে ওর পেছনে। আজ ক্রিসমাস সন্ধ্যা। অনেক গাড়ি আর লোকের সমাগম। অবশ্য এখানে প্রবেশ করতে হলে পয়সা দিতে হয়। বন্ড একটা টেবিলের সামনে এল। টেবিলে বসা, ঘোলাটে চোখওয়ালা লোকটাকে বন্ড বলল, “টিকিট দুই ফাঁ। এখানে ঢুকতে গেলে নিয়ম অনুযায়ী ফ্যান্সি ড্রেস পরতে হয়। অর্থাৎ ডাকু কিংবা গোয়েন্দা সাজতে হয়।

মুখোশ পরে ড্রেস বদলে বন্ড ভেতরে এল। দুটো মুখোশপরা মেয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

এবার চারিদিকে নারী-পুরুষদের হর্ষধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ওয়াল্যাঙ্ক নাচের শেষটা এবার শুরু হচ্ছে। বন্ড দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ স্কাট পরা একটা মেয়ে বন্ডের হাত ধরল। বলল, জেমস ও জেমস দেখো আমি ট্রেসি। ট্রেসি — “ডার্লিং তোমাকে এরকম কেন দেখাচ্ছে? কী হয়েছে তোমার? বন্ড আর ট্রেসি। কী আশ্চর্য। বন্ডের চোখে একটা আনন্দের চমক। বলল, “আমার কথা পরে বলব।”

॥ আঠারো ॥

বাজনা আর নাচ থামল। ট্রেসি যেন ঘুম ঘুম চোখে বন্ডের হাতে বুকটা চেপে রেখেছে। বন্ড কিন্তু সতর্ক। ক্লাস্তির কষ্ট তারও চোখে। তবু বলল, “ট্রেসি এখানে যে কোনো ভাবে ঢুকে যাও ভিড়ে। আমার পেছনে লোক লেগেছে। দেখো তো ট্রেসি বাইরে কোনো কালো মার্সিডিস গাড়ি আছে কি না। হয়তো হঠাৎ গুলির আক্রমণ হতে পারে। তোমার গাড়িটা বাইরে আছে জেনে খানিকটা নিশ্চিত হলাম। ট্রেসি হঠাৎ তার গায়ের জ্যাকেটটা খুলে বন্ডকে পরিয়ে দিল। একটু আঁটো হল ওটা। তবুও যেন বন্ডকে মানিয়ে গেল। ট্রেসি বলল, “ভেবোনা, দেখ আমি দুটো মোটা সোয়েটার ও আরো অনেক কিছু ভেতরে পরেছি।

বন্ড যে সামাদেন পৌছেচে এ খবর এখন নিশ্চয় ব্রোফেন্স জেনে ফেলেছে। কাজেই বন্ডের পেছনে লোক লাগবেই।

খুব সাবধানে বন্ড গেটের কাছে এল। তার কথাই ঠিক। বন্ড দেখতে পেল কালো মার্সিডিস দাঁড়িয়ে, টিকেট কাউন্টারের পাশে অনেক অচেনা চোখ যেন কাউকে খুঁজছে। বন্ডের কথামতো

ট্রেসি হঠাৎ বন্ডকে জাপটে চুমু খেতে লাগল। এসব দৃশ্য এখানে সাধারণ ব্যাপার। কাজেই মার্সিডিস নিয়ে যারা বন্ডকে মারবার চেষ্টা করছে তারা হয়তো খেয়াল করবে না।

কিন্তু বন্ড আর ট্রেসি বাইরে আসতেই এটা যে ভুল সেটা বন্ড বুঝেছে।

হঠাৎ মার্সিডিসের হর্ন বেজেছে। অর্থাৎ বিপদ কাছে শেষ করে দাও।

ট্রেসির গাড়িতে ওরা দুজন প্রায় লাফ দিয়ে ঢুকে গেল। ট্রেসি স্টার্ট দিল, প্রচণ্ড বেগে ভিড়ের পথকে চমকে দিয়ে গাড়ি ছুটল হরিণের মতো। ট্রেসি গাড়ি চালাতে খুবই ওস্তাদ।

বন্ড বলল, “দেখ ট্রেসি জ্বারে চালাও ক্ষতি নেই তবে যেন হাত-পা ভেঙে রাস্তায় পড়ে না থাকি।”

কিন্তু ট্রেসির চোখে অন্য উন্মাদনা।

তার প্রিয়তমের প্রাণ নিতে কিছু লোক তাড়া করেছে। কাজেই গাড়ি চালানোর সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল উজাড় করে বাঁচাতে হবে বন্ডকে। এই যেন প্রতিজ্ঞা। দুরন্তবেগে গাড়ি চলছে। এরই মধ্যে ট্রেসি বলল, “বন্ড তোমার জন্য মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। উপায় না দেখে বাবাকে ফোন করেছিলাম। বাবার ধারণা তোমাকে পিজপ্লেরিয়াতে পাওয়া যাবে। আর তোমাকে সতর্ক থাকতে বলেছেন বাবা। আমি পরশু সামাডেন এসেছি। তোমার খোঁজে পিজ প্লোরিয়া যাব ভেবেছিলাম। বন্ড এবার তার পালাবার কাহিনি সংক্ষেপে ট্রেসিকে শোনাল। শুনে মেয়েটা প্রায় ভয়ে জড়সড়। বন্ড বলল, “কিন্তু ট্রেসি তোমাকে পেয়ে আমি যেন দেবতার আশীর্বাদ পেলাম।”

ট্রেসি— “এবার বলতো ওদের কটা খুন তুমি করেছে?” বন্ড — “বলছি, তবে এ নিয়ে গল্প কোরনা কারো সঙ্গে। ব্যাপার হল ওই ক্লাবের গার্ডকে খতম না করলে আমাকেই মরতে হত। আর এক জন মারা গেছে তুষারধসে। আরেকজন আমাকে মারতে এসে মরেছে। আর একটা ট্রেনে কটা পড়েছে। এসব জেনে তোমার লাভ?” ট্রেসি “আমাকে বিশ্বাস করতে পার। কিন্তু ওরা তো আরও অনেকে আছে। আমাদের ধরলে তো মেরে ফেলবে।” বন্ড “হ্যাঁ ওরা সবকটা ভয়ংকর।”

ট্রেসি. “গাড়িতে তেল কম। তেল নিতে গেলে দশ মিনিট থামতে হবে। আর আমাদের ধরে শেষ করে দেবে ওরা। একটা মতলব বার করো।”

ট্রেসি একটা বাঁক নিয়েছে। সাইন বোর্ড বলছে সামনে বিশাল ধস নেমেছে। ধসের পেছনেই বিশাল নদী। রাস্তা দিয়ে সোজা গেলে একদম নদীতে। ব্যস, বন্ড বলল — “গাড়ি থামাও। ট্রেসিকে বলল বাঁকের পেছনে লুকোতে। ছুটে গিয়ে সাইনবোর্ডের বিপদ সংকেতের দিকটা উলটে দিল সে। দৌড়ে গিয়ে এবার একটা পাথরের তলায় শুয়ে পড়ল। গাড়িটা রইল একটা আড়ালে।”

কয়েকটা মিনিটের রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। এরপরই সেই কালো মার্সিডিস দৈত্যের বেগে ছুটে গেল। যাত্রীদের দু-তিনজনকে বন্ড উঁকি দিয়ে চিনে নিল। হঠাৎ বিস্ফোরণের কানফাটা শব্দ আর অনেক লোকের আর্তনাদ। আরো কয়েক মিনিট শুয়ে রইল সে। হঠাৎ আবার দৌড়। দ্রুত সংকেত চিহ্নটা আগের অবস্থায় এনে রাখল।

শয়তানদের কালো মার্সিডিস পাহাড়ের ধসে ধাক্কা খেয়ে, রক্তাক্ত দেহগুলো নিয়ে সোজা অনেক নীচে বরফের খাদে পড়ে ভবলীলা সাজ করেছে।

একটা শিশু দিল বন্ড। ট্রেসি এসে গাড়ি স্টার্ট দিল। বন্ডের হাতটা চেপে ট্রেসি বলল, “আর কোনো কথা নয়, ঘুমাও। এবার আমরা জুরিখ পৌঁছে যাব।”

॥ উনিশ ॥

জুরিখ এয়ারপোর্ট। কুয়াশায় ঢাকা আকাশ। একটা সুইস এয়ার ক্যারাভেল দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই আকাশে উড়বে এটা।

বন্দ টিকিট কিনল। পাসপোর্ট স্ট্যাম্প মারা হল। এরপর একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। ডায়াল করল। ওপার থেকে গলার শব্দ — “আমি মুইর কথা বলছি।” বন্দ — “৪১০ তোমাকে একটু বিরক্ত করছি। আমি ০০৭। হাতের কাছে পেনসিল থাকলে লিখে নাও যা বলব। শোন তোমাদের দু’নম্বর ধরা পড়েছে। এতক্ষণে বোধহয় খতম হয়ে গেছে। ঘন্টাখানেক পরে লন্ডন পৌঁছোব। সুইস এয়ার ফ্লাইট ১১০। কিছুক্ষণ পর দশটা মেয়ে হেলিকপ্টারে এখানে আসবে। আমি লন্ডন থেকে ওদের নাম-ঠিকানা তোমায় বলে দেব। আর ওই অপারেশন “বেডল্যামের” ব্যাপারটা মনে আছে তো? জানালা খুলে দেখ কেউ দেখছে কিনা।”

উত্তর এল — “হ্যাঁ একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে। ভেতরে দুজন লোক।”

বন্দ। যাক্গে। সাবধানে থেকো। মি. এমকে সব বলো। আমার সঙ্গে এখন তুমি দেখা করতে চেয়ো না। পিস্তলের বারুদের মতন মনের অবস্থা। পাহাড়ের নীচে দুমড়ে যাওয়া রক্তে ভেসে যাওয়া কালো গাড়ির সন্ধান পেলে শত্রুপক্ষ বেপরোয়া আক্রমণ হানবে। গুড বাই।”

বন্দ বেরিয়ে আসতেই ট্রেসি এসে দাঁড়াল। বন্দ — “শোনো ট্রেসি, ওরা আসবে। আবার বিপদ হতে পারে। তোমার গাড়িটা ওরা চেনে। তুমি এখন সীমান্ত পেরিয়ে চলে যাও।”

ট্রেসির চোখে জল, বলল “জেমস্ আবার কবে দেখা হবে।” হঠাৎ বুকটা মোচড় দিল, মনে হল আরে দূর এসব গোয়েন্দাগিরিতে কী হবে। ট্রেসির মতন সুন্দরী সহৃদয়, শিক্ষিতা ও সুগঠিত দেহের মেয়ে কোথায় পাব।

“ট্রেসি তোমাকে বিয়ে করব আমি।” বলে ফেলল বন্দ। আনন্দাশ্রু সংবরণ করে বলল — “সেতো আমার স্বপ্ন। আমাকে একটু চুমু খেয়ে সেই স্বপ্নের সত্য বুঝতে দাও। মিউনিখে আমায় সেই প্রিয় হোটেলে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। বাবাকে খবরটা দিলে কত খুশি হবেন উনি তাই না।”

বন্দ — “আমাদের বিয়েটা হতে পারে কোনো গির্জায়। একটা দিন ঠিক করতে হবে ডারলিং।” ট্রেসি “তাই হবে, সাবধানে থাকবে। তোমার গলার রুমালটা আমায় দাও। বন্দ ওটা সেলাই করে দেবে।”

বন্দ দ্রুত ব্রেকফাস্ট সেরে নিল।

আর দেরি নেই।

ঘোষণা করা হচ্ছে ১১০ সুইস এয়ার ফ্লাইট একটু পরেই ছাড়বে লন্ডনের উদ্দেশ্যে। অতএব যাত্রীরা দু’নম্বর গেটে জমায়েত হোন।

বন্দ রেডি হয়ে গেল। ট্রেসিকে বিদায় জানাল। বুকের ভেতরটা কেমন যেন লাগছে বন্ডের। ওরা তাহলে এখন জেমস আর ট্রেসি বন্দ। কমান্ডার আর মিসেস বন্দ। কী অদ্ভুত মনে হল বন্ডের।

॥ কুড়ি ॥

কোমরে বেস্ট বাঁধা বন্দ। ঘুমিয়ে পড়েছিল। ক্যারাভেল রানওয়ে স্পর্শ করেছে। স্কি-পোশাকে বন্ডকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। পোশাকটা ছাড়তে হবে। ওটা নোংরা হয়ে গেছে।

বন্দ এয়ারপোর্টে নেমে দেখল গাড়ি অপেক্ষা করছে। ড্রাইভারের পাশে সেক্রেটারি মিস গুডনাইট বসে আছে। বন্ডকে দেখে মেরি হাসল। দু’জনে পিছনের সিটে বসল। মেরি — “বন্দ তোমার এ কী চেহারা। দাড়ি কামাওনি। একজোড়া নোংরা জুতো পরে আছে। কী ব্যাপার?” বন্দ — “ও সব কথা পরে হবে।”

মেরি — হ্যাঁ পরে শুনব। তবে মি. এম. এর নির্দেশ এখনি হেড কোয়ার্টার্সে যেতে হবে। এরপর লানচ্। তারপর কনফারেন্স। আরো দু’তিন জন লোক থাকবে যাদের সঙ্গে তুমি দেখা

কবতে চাও। গোটা ব্যাপারটাই খুবই জরুরি। আচ্ছা বন্দ তোমার কি কোনো বিপদ হয়েছে।” বন্দ — যখন রিপোর্ট লিখব তখন সেটা থেকে একটা ধারণা করতে পারবে।

এবার ফ্ল্যাটে পৌঁছেই সোজা মানের ঘরে যাওয়ার আগে বলে দিল — “কফি চাই তার সঙ্গে একটু ব্রান্ডি আর পুডিং। মি. এম.-এর কথামতো কাজ হবে। ডিউটি অফিসারকে জানিয়ে দাও।”

দশটার পরে টেবিলে বসল বন্দ। মেরি ঢুকল নোট বই নিয়ে। হেডিং দিল “টপ সিক্রেট”। এবার বন্দ বলে গেল আগের ঘটনাগুলো। ঘটনার বিবরণে এসে ব্রোফেল্ডের সবুজ চশমার কথা। বরফের ওপর দৌড়। যারা তাড়া করেছিল তাদের সম্বন্ধে খানিকটা বলা হল। এরপর ক্রিসমাস সন্ধ্যা, তারপর ট্রেসির কথা। তবে পুরোটা নয়। বিবরণ শেষ হল। বন্দের মনে পড়ল ট্রেসিকে একটা ফোন করতে হবে। আর জেড্ স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

উইন্ডসর ফরেস্টের কাছে এম-এর বাড়ি, ভদ্রলোক নৌ বিভাগে অ্যাডমিরাল ছিলেন। পেনশন পান ১৫০০ পাউন্ড। এ ছাড়াও আরো বোজগার আছে নিশ্চয়। বন্দ যখন এল তখন এম ছবি আঁকছিলেন। ফুল আর গাছের ছবি আঁকা ওর সখ।

বন্দ ঘরে বসতেই — এম বললেন, “হ্যাপি ক্রিসমাস। আচ্ছা বন্দ — ওই মোটা আমেরিকান ডিটেকটিভের নাম কী যেন? বন্দ — “নিরো উল্ফ”। এম — “হ্যাঁ মনে পড়েছে। লোকটা খুবই ওস্তাদ খুনের কিনারা করতে।”

বন্দ এবার জরুরি কাগজ টেবিলে রাখল। বলল, “রহস্য রক্ষা করতে গিয়ে এদের কয়েকজন মাঝে গেছে।” এম — “তবে এখনো ব্রোফেল্ডের উদ্দেশ্য জানা গেল না।” বন্দ — “হ্যাঁ ওটা জানা যায় নি।” এম — “বন্দ ভাগ্যিস তুমি স্কিইং জানতে, নইলে ফিরে আসতে পারতে কিনা সন্দেহ আছে।” বন্দ — “হ্যাঁ স্যার, শরীরটা ফিট ছিল বরাবর।”

এম — “কিছু বিচক্ষণ লোককে ডেকে পাঠিয়েছি। তবে এদের সঙ্গে প্রেতাশ্রা সংঘের যোগ থাকতে পারে। আর যে মেয়েটার কথা উল্লেখ করেছ তুমি তাকে চেনো তো?”

বন্দ — “হ্যাঁ ও হল ইউনিয়ন কোর্সের সর্দার। ড্রাকোর মেয়ে। ওর মা ছিলেন ইংরেজ।”

এবার হ্যামড নামে একজন এসে বলল, “লাঞ্চ রেডি।” টেবিলে কতগুলো বাজি পড়ে ছিল। এম. বললেন, “ওগুলো নিয়ে যাও। বাচ্চাদের দিয়ে দিও।”

হ্যামড চলে গেল। দুটো গেলাস ২ গ রয়েছে অ্যালজিরিয়ান মদে।

এম বললেন, “বন্দ গলাটা ভিজিয়ে নাও।”

॥ একুশ ॥

লান্চ শেষ করে কফিতে চুমুক দিল বন্দ বসল একের সঙ্গে ওনার স্টাডিতে। এম তার জীবনে নৌবহরের অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে সমুদ্র, ঝড়, ঘূর্ণি নিয়ে অনেক কাহিনি শোনালেন বন্দকে। জীবন মরণের লড়াই কী করে তিনি লড়েছেন তারই কথা।

একটু থেমে বললেন। “ওরা বোধ হয় এলেন” বাড়ি। একটা গাড়ি থামার শব্দ হল। ঘরে ঢুকলেন ৫০১ যিনি সায়েন্টিফিক রিসার্চ সেকশনে কর্তা, আর একজন হলেন ফ্রাঙ্কলিন যিনি পেস্ট কন্ট্রোলের একজন বিশেষজ্ঞ।

ফ্রাঙ্কলিন বললেন, “মি. এম শুনেছি এক ভদ্রলোক আলপ্স পর্বতের ওপরে দেশের কৃষি ও পশুপাখি নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি নাকি পারমাণবিক তথ্য চুরি করেছেন।”

এম বললেন, “হতে পারে। তার আগে এই রিপোর্টটা পড়ুন। রিপোর্ট পড়ে চমকে গেছেন ফ্রাঙ্কলিন। বন্দকে বললেন, “আপনার কপাল ভালো, ফিরে আসতে পেরেছেন। এবার ৫০১ ও রিপোর্ট দেখলেন, ওদের মতো হল ওই ব্রোফেল্ড সন্মোহন বিদ্যার প্রয়োগ করেছেন। এসবে

অনেক সময় হাঁপানি, তোতলামি এবং আরো অনেক রোগের চিকিৎসা হয়। কিন্তু ব্রোফেন্ড এত টাকা পাচ্ছে কোথা থেকে? মনে হয় রাশিয়ানদের কাছ থেকে, গ্লোরিয়াতে কোনো রাশিয়ান আছে কিনা জানা দরকার।”

বন্ড — “ক্যাপ্টেন বোরিস নামে একজন লোক আছে। এই লোকটা প্রেতাত্মা সংঘের সঙ্গে যুক্ত। এর হাত দিয়েই টাকা আসে মনে হয়।”

ফ্রাঙ্কলিন কী যেন ভাবছেন আর ৫০১ যার নাম লেদার্স চূপ করে আছেন। একটা মানচিত্র টেবিলে রাখা হল। এর ওপরে লাল বৃত্তের চিহ্ন দেওয়া হল। পকেট থেকে একটা পেপার কাটিং বের করলেন ফ্রাঙ্কলিন।

কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন, “প্রচুর মুরগি। অ্যাবারভিন, অ্যাস্‌স্‌ ভেভন, রেড পোল, ল্যাংকাশায়ার। প্রচুর মুরগি এখানে জন্মায়। কিন্তু মড়কে প্রায় তিন লাখ খতম হয়ে গেছে।”

এবার একটা ছোটো বই খুলে দেখালেন জীবাণু যুদ্ধ চলছে, তলে তলে, ১৯৪৪ সালেও এই রকম একটা সম্ভাবনা ছিল যুদ্ধের সময়ে। লেদার্স বললেন, “হ্যাঁ আমিও সেটা জানি।” ফ্রাঙ্কলিন “দেখুন মি. এম এই জীবাণু আক্রমণ দিয়ে উন্নতিশীল এবং উন্নত দেশগুলোর প্রাণী সম্পদ থেকে শুরু করে শস্যক্ষেত্রেও নষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে মনে হচ্ছে। এই রকম চললে আমাদের ভিক্ষা করতে নামতে হবে রাস্তায়।” এম — “তাই বলছি। পুস্তকটা ভালো করে আমাদের পড়ে শোনানো হোক।”

॥ বাইশ ॥

বইপড়া শুরু হল। লেখা আছে কী ভয়ংকরভাবে জীবাণু যুদ্ধ চালু করে শত্রুরা একের পর এক দেশের ক্ষতিসাধন করতে মরিয়া।

জীবাণুর সঙ্গে রসায়ন যুদ্ধে লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে যদিও দুটোর প্রয়োগ একইভাবে করা হয় না।

যাই হোক জীবাণু যুদ্ধের উদ্দেশ্য ধ্বংস। শুধু মানুষ নয়, পশু পাখি সব। এ ছাড়া পরিবেশকে সম্পূর্ণ দূষিত করাও একটা উদ্দেশ্য। মুশকিল জীবাণুর প্রয়োগ হঠাৎ বোঝা যায় না। যখন বোঝা যায় তখন প্রতিকার প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। এই জীবাণু যুদ্ধ সর্বগ্রাসী। অফিস, বাড়ি, কারখানা, জল, দুধ প্রায় সব জায়গাতেই কম বেশি এর দাপট চলতে থাকে। জার্মানরা বিযাক্ত গ্যাস আবিষ্কার করেছিল। পরে তাকে টেকা দিল অ্যাটম বোমা। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জীবাণু আয়ারল্যান্ডে এবং ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়লে কী হবে? ফ্রাঙ্কলিন এবার খামলেন।

মানচিত্রে ইস্ট অ্যাস্‌স্‌লিয়ার চারপাশে লাল বৃত্ত এঁকেছেন তিনি। পলী টসকার নামে একটা মেয়ে মুরগি অ্যালার্জি আছে বলে পিজ গ্লোরিয়া গিয়েছিল। ফিরে এসে কাজে নেমে পড়েছিল। ধরা যাক অলিম্পিয়া পাখির “শো”-তে তার যাবার নির্দেশ ছিল। সেখানে একবার গোপনে স্প্রে করলেই কাজ হাসিল। কারণ মড়ক শুরু হতে বেশিদিন লাগে না।

ফ্রাঙ্কলিনের দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী তিরিশ লাখ মুরগি মারা গেছে, এবং মরছেও। বন্ড “আমারও স্যার ওটাই মনে হচ্ছে। দেশের সামনে বিরাট বিপদ।” এম এবার একটু যেন উত্তেজিত। বললেন, “মি. ফ্রাঙ্কলিন আপনি যা বুঝলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং তার দপ্তরের অন্য মন্ত্রীদের জানান। আমি পলি নামে ওই মেয়েটিকে আটকাবার ব্যবস্থা করছি। তবে অন্য মেয়েদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। ওদের দোষ বিশেষ কিছু নেই। আর এরপর ভাবতে হবে ব্রোফেন্ডকে নিয়ে কী করা যায়।”

ফ্রাঙ্কলিন আর লেদার্স চলে গেলেন। এম বললেন, “বন্ড একটু বোসো।” এম এবার জানালার বাইরে তাকালেন। বন্ড ম্যাপটা দেখতে শুরু করল। মনে মনে ভাবল এবার ব্রোফেন্ডকে চরম

শিক্ষা দিতে হবে। হঠাৎ হাসি পেল। কয়েকদিন আগেই না তাকে প্রায় ইন্তুফা দেবাব জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। এম এবার সোজা এসে টেবিলে রাখা লাল টেলিফোন তুলে বললেন, “হোয়াইটহেলের সঙ্গে কথা বলতে চাই।”

“কে বোনাল্ড নাকি? আমি এম বলছি। একটু রিবক্ট করছি। আরে এত জোরে হাসছ কেন? ও বুঝেছি অল্পবয়স্কাদের গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে রিপোর্ট পড়ছ নিশ্চয়। শোন জর্জের কাজ আছে। ব্লোফেন্ড আর থান্ডারবলের কেস মনে আছে তো? এই বদমাসগুলোকে উচিত শিক্ষা দেবার সময় এসেছে। মি. ফ্রাঙ্কলিনকে চেনো? আর হ্যাঁ ০০৭ ব্যাপারটা জানে। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। পলি টমকার নামে একটা মেয়েকে আটকাতে হবে। বয়স পঁচিশ, ইস্ট অ্যাঙ্গোলিয়ায় বাড়ি। মুরগির চাষ করে। সুইজারল্যান্ডে কিছুদিন ছিল। টেলিফোনের বইটা একবার দেখে নিও। এই মেয়েটির বিরুদ্ধে অভিযোগ হল মুরগি মারার জীবাণু আমদানি করা নিয়ে। ইংল্যান্ডে মুরগিরা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তবে দেখো ওর ওপর কোনো অত্যাচার যেন না হয়। জুরিখ থেকে আরো দশটা মেয়ে আসবে। ০০৭ এই লিস্ট নিয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পৌঁছে যাবে। ব্যস্ আপাতত এই পর্যন্ত। ফোনটা রেখে দিলাম। বন্ধকে এবার এম জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার মতলবটা কী? বল কী কবে ব্লোফেন্ডকে ঠান্ডা কবা যায়। লোকটা হবতো পিকিং বা অন্য কোনো দেশে মতলব আঁটছে।”

বন্ড হুইস্কির গেলাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, “স্যার আমাদের দু’সপ্তাহের ছুটি দিন। বলেন তো পদত্যাগও কবতে পাবি।” এম কী যেন ভাবলেন, ধীবে ধীবে বললেন, “ঠিক আছে এগিয়ে যাও।”

॥ তেইশ ॥

কোমরে পিস্তল। বন্ড বসে আছে প্লেনে। এই কারাভেলটা ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে যাচ্ছে। মিউনিখে ট্রেসিকে ফোন করে কি বলেছিল মনে পড়ছে। বলেছিল, “ট্রেসি ডার্লিং কেমন আছ ট্রেসি?”— তোমার কথাই ভাবছি বন্ড। সঙ্গে টুথব্রাশ আর কয়েকটা বই আছে। বন্ড— “আমার প্রেমের নিশ্চাস পাচ্ছ? শোন তোমাব জন্মপত্র কনসাল অফিসে জমা দাও। কাল তোমার বাবাব সঙ্গে দেখা করতে হবে। একটা মতি দরকার, তাই না? ব্যস্ এবার শুয়ে পড়।” বলে বন্ড মাউথ পিসটাকে একটা জোরে চুমো দিল।

এবার বন্ড ফোন করল মার্ক অ্যানজেকে। মার্ক একটু চমকে গিয়েছিল। বন্ড — আমার বিয়েতে উপহার দেবে তো? মার্ক — “যা চাইবে তাই পাবে।” বন্ড — “শোনো মার্ক কালকে আমি মার্সাই থাকব। কাউকে পাঠাতে পারো আমার সঙ্গে দেখা করতে। আর শোনো, সুইজারল্যান্ডে বিশেষ কিছু করা যাচ্ছে না। কেমন যেন লোকসান হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। মার্ক — ও তুমি কিছু ভেবোনা জেমস্। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। গুড নাইট।”

মার্সাইতে পৌঁছাল বন্ড। একটা দস্যুর মতন দেখতে গাড়ির ড্রাইভার ভাঙা ইংরাজিতে বলল, “আপনাকে নির্বিঘ্ন করে আসা আমার দায়িত্ব।” এম নাম মারিয়াস। গাড়ি চালিয়ে একটু দূরে থামল সে। রাস্তা থেকেই শোরুম দেখা যাচ্ছে। টি.ভি. সেট, রেডিয়ো, গ্রামোফোন বয়েছে সেখানে। বন্ড ভেতরে ঢুকল। বন্ডের সুটকেসটা একটা লোক এসে মারিয়াসের হাত থেকে নিয়ে এগিয়ে গেল। মারিয়াস এবার চোখ টিপে একটা যেন সেলাম হুঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যে লোকটা বন্ডের সুটকেস বহন করল তার ডান দিকে বগলের কাছটা উঁচু হয়ে আছে। বন্ড বুঝল ওখানে ওর পিস্তলটা আছে। লফটে করে ওপরে এসে গেল বন্ড। এবার আরেকটা লোক এসে বন্ডের সুটকেসটা নিয়ে বলল, “মঁসিয়ে ড্র্যাকোর সঙ্গে এখনুনি দেখা করতে হবে আপনাকে।”

টেবিলের একদিকে বসে মার্ক অ্যানজে। বন্ডকে দেখে এক গাল হেসে বলল, “বোসো কমান্ডার গলাটা হইস্কিতে ভিজিয়ে নাও। টেরেসাকে বিয়ে করছ তো? আমি কিম্ব বিয়েতে উপহার দেব।”

বন্ড— “হ্যাঁ সব ঠিক আছে। ছুটি নিয়েছি। কয়েকদিনের মধ্যে বিয়েটা হবে, দু’এক সপ্তাহ বাদে।” বন্ড এবার আসল কথায় এল। অনেকক্ষণ শোনার পর মার্ক চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, “হ্যাঁ সত্যিই নোংরা ব্যাপার। ওই লোকটাকে এবারে বংশসুদ্ধ উড়িয়ে দিতে হবে। দেখো বন্ড আমি একটা বাজে লোক। মস্তানদের ঠান্ডা করা আমার কাজ। গণিকালয়গুলিতে আমার দাপট সব চেয়ে। কিছু ধনী বদমায়েস লোকের তহবিলও লোপাট করে দিয়েছি। প্রয়োজন হলে দু-চারটে খুন করেই থাকি। কিম্ব ওই ব্লোফেন্ড একেবারেই একটা শয়তান। দাঁড়াও ওর ব্যবস্থা করছি দায়িত্ব আমার কমান্ডার।”

এবারে টেবিলে সুইচ বাজিয়ে দিতেই দুটো যণ্ডা মার্ক লোক এসে দাঁড়াল মার্কের কাছে। মার্ক আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, “এ হল চেচে আর ওর নার টুস্যা। একে আবার অনেকে ‘লে পুফ’ বলে ডাকে।” আর বন্ডকে দেখিয়ে “ইনি আমার প্রকৃত বন্ধু। এবার আসল কথা শোন। এই দেখো মানচিত্রটা। এখানে পিজ প্রোরিয়া বলে একটি জায়গা আছে।”

হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এল। জানা গেল কিছু মেয়ে জুরিখে পৌঁছেছে। বন্ড মার্ককে বলল, “এটা ভালো খবর। তোমাকে আগেই জানাব ভেবেছিলাম যে মেয়েরা আসছে। আমাদের লড়াইয়ের শরিক করে নেব এদের। মার্ক ব্যাপারটা বুঝল। একটু হেসে ওই যণ্ডা দুটোকে বুঝিয়ে দিল পিজ প্রোরিয়ায় কী করতে হবে।

লোকদুটোর চোখে একটা যেন আলোর বলকানি। বন্ডের লেখা কাগজটা নিয়ে এরা একটু পরেই চলে গেল। মার্ক— ভালো টাকা পাবে পারিশ্রমিক হিসাবে এই লোক দুটো কী বল কমান্ডার। আর শোন পিস্তল আর হাত দুটোই কাজে লাগাতে হবে। আমি ওদের পাঁচজনকে ঘায়েল করব আর তুমি? পাহাড়ে কজন আছে বললে? জনা আটেক শয়তানের মাইনে পাওয়া লোক? আরে দূর সব বাছাধনই টের পাবে এবার। তবে বঁড়ো কর্তাকে ঘায়েল ঠিক এখনি নয়।” বন্ড খুশি হল। হেলান দিয়ে হইস্কির বাকিটা শেষ করল।

॥ চব্বিশ ॥

পরদিন প্লেনে বন্ড স্ট্রাসবার্গে এল। খাওয়া হয়ে গেছে। স্কি পোশাক পরে দস্তানা হাতে নিয়ে, কোমরে পিস্তল আটকে হোটেলের বিল পে করে দিল। টেলিফোন বেজেছে। নীচে তার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে। বন্ড উঠে পড়ল আর ট্রেসির ঠিকানায় সুটকেসটা পাঠিয়ে দিল। গাড়ি ছুটল কাদাভরা রাস্তা দিয়ে। এবার এটা লোহার ভাঙা একটা গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চারিদিকে জঙ্গল দিয়ে যেন ঘেরা।

গাড়িটা তিনবার হর্ন বাজাল। ইউনিয়নের কিছু লোক এসে গেছে। মুখগুলো চেনা, মার্কও আছে। সকলেই স্কি পোশাক পরেছে। একটু দূরে ফাঁকা মাঠে হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে। মার্ক পাইলটের সঙ্গে বন্ডের আলাপ করলে। “ইনি হলেন জর্জস, এই কপ্টারের পাইলট। তবে পিজ প্রোরিয়ায় যায় নি কখনো।” ওকে একটু দেখিয়ে দিতে হবে।”

দুটো পঞ্চাশ। কপ্টার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ডানা মেলল।

রাইন নদীর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে কপ্টার, প্রায় দু’হাজার ফুট উঁচুতে।

এবার সুইস এয়ার কন্ট্রোলের সঙ্গে কথার লড়াই শুরু হল।

সুইস কন্ট্রোল— আরে আপনারা কারা? আকাশে উড়ে চলেছেন। পারমিশন আছে?

পাইলট— আমরা ইটালিতে ব্লাড প্রাজমা নিয়ে যাচ্ছি। বিরক্ত করবেন না।

সুইস কন্ট্রোল— কোথায় গম্ভ্যস্থল আপনাদের?

পাইলট— বললাম তো, ওসপিডেল স্যানটা মনিকা, বেলিন জোনা।”

প্লেন উড়ে চলেছে। মার্ক বলল, “ঠিক, বলেছিলাম ব্যাটা সুইস এয়ার কন্ট্রোল আমাদের বিরক্ত করবে।”

আবার মেসেজ এল, “আপনারা অনধিকার প্রবেশ করছেন। শিগগির নেমে পড়ুন।

পাইলট— কী অদ্ভুত ব্যাপার। জীবনদায়ী রক্তের ভাণ্ডার নিয়ে যাচ্ছি। একজন জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের জীবন-সংশয় হয়েছে। আর আপনারা কী সব বলছেন।

সুইস কন্ট্রোল— আপনাদের কে ছাড়পত্র দিল? পাইলট — “কে আবার দেবে, যাঁরা দেন তারাই দিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে বিশ্বের নামকরা সাংবাদিকরাও আছেন এটা জামবেন।” এবার অনেকক্ষণ আর কথার লড়াই হল না। কপ্টার এবার আলপ্‌সের চূড়ার কাছে এসে গেছে। বন্ড ঘড়ি দেখল। আর কয়েক মিনিট। নামবার সময় হয়ে এল। মার্ক সূর্যের পড়ন্ত আলোর দিকে একনাব তাকাল।

॥ পঁচিশ ॥

প্লেনটা প্রায় নামবে। এমন সময় প্রথমে জার্মান ও পরে ফরাসি ভাষায় কর্কশ স্বরে বলতে শোনা গেল — “এখানে নামা নিষেধ। কী কথাটা কানে যাচ্ছে না?”

তবুও প্লেন নামল। নামবার পরেই দেখা গেল জনা আটেক লোক দাঁড়িয়ে। মার্ক— আমরা ফেডারেল পুলিশ, ক্রিসমাস সন্ধ্যায় গোলমালের অনুসন্ধান করতে এসেছি।

এবার ব্রোফেন্ডের একনম্বর লোক ফ্রিৎজ বলল, “ফেডারেল পুলিশ কেন এখানে? স্থানীয় পুলিশ অনুসন্ধান করছে।”

হঠাৎ বন্ড দেখল কাউন্টের বাড়ির দিক থেকে একটা লোক এলোমেলো তির বেগে ছুটে কোথায় যাচ্ছে। হ্যাঁ লোকটা যাচ্ছে কেবল স্টেশনের দিকে।

বন্ডকে দেখিয়ে একজন বলল, “এই সেই ইংরেজ গোয়েন্দাটা!” বন্ডও বলল, “আরে পালের গোদা পালাচ্ছে।” কপ্টার থেকে নীচে লাফ দিয়েই দৌড়তে শুরু করল সে। পালের গোদাকে ধরতেই।

হঠাৎ নরক গুলজার। বুলেটের শব্দ শোনা গেল। মার্ক-এর দল এবার পজিশন নিয়ে স্টেনগান থেকে ফায়ারিং শুরু করেছে। পলায়মান লোকটা এশর প্রায় একশো গজ নীচের একটা ঘর থেকে নৌকার মতন দেখতে একটা কাঠ নিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকবার গুলিও ছুঁড়ল। কিন্তু বন্ডকে গুলি ছুঁতে পারল না। আবার দৌড় শুরু হল। এবার বন্ড চিনে ফেলেছে — হ্যাঁ এই বদমায়েসটাই হল ব্রোফেন্ড।

বন্ডও পায়ে বব-স্কি এঁটে নিয়ে ওর পিছু নিল। গুলির লড়াই শুরু হয়ে গেছে। বরফেব কুচিগুলো আঘাত লেগে ছিটকে যাচ্ছে।

হঠাৎ বীভৎস বিস্ফোরণের শব্দ। পর পর কয়েকবার। বন্ড দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে চলেছে। ব্রোফেন্ডকে প্রায় নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল মনে হচ্ছে। কিন্তু পিস্তল কোথায়। এই রে ওটা বোধ হয় কোথাও পড়ে গেছে। এবার আরো বিস্ফোরণ। পাহাড়টা যেন কাঁপছে। বন্ড-যেন শূন্যে উঠে দুম করে পড়ে গেল বরফের ওপর। কিছুক্ষণ জ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান ফিরল দেখল পাহাড়টা তখনো কাঁপছে। বুঝল বন্ড মার্ক তার পরিকল্পনা মতোই কাজ করেছে।

কাউন্টের অতি মূল্যবান আধুনিক ল্যাবরেটরি ধ্বংস হয়ে গেল। ব্রোফেন্ডের বিখ্যাত শৈলাবাস গুড়ে হয়ে গেছে। কেবল স্টেশনের পুরোটাই এখন ধ্বংসস্থাপে পরিণত হয়েছে। কত লোক মরল কে জানে?

বন্দ একা। এগিয়ে চলল, চাঁদের আলো এসে পড়েছে। স্কিটাকে বেঁধে নিয়ে একটু স্পিডে এগিয়ে চলল বন্দ। ব্রোফেন্ড কোথাও লুকিয়ে আছে। পিস্তল ছাড়া ওর খোঁজে এখুনি গেলে কাজ হবে না, অতএব আরো ধৈর্য চাই।

কপাল ভালো। কাছেই রেল স্টেশন দেখা গেল। উঠে পড়ল একটাতে। জেড স্টেশনের কর্তার ফ্লাটের কাছে বন্দ যখন ট্যাঙ্কি থেকে নামল তখন রাত দুটো। দরজায় বেল বাজাতেই একটা পাজামা-পরা লোক এসে দরজা খুলল।

বন্দ বলল “আমি ০০৭”।

আসলে পাজামা-পরা ভদ্রলোকই হলেন সেই মি. মুইর। বললেন, “ওরে বাবা কী অবস্থা তোমার এখুনি একটু মদ গিলে নাও নইলে দাঁড়াতে পারবে না” বন্দ একটা জোরে শ্বাস ছেড়ে বলল, “নাঃ আর বরফের এলাকায় কাজ করব না।”

মুইর— “দেখো ০০৭ তোমার শোবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে ফিলিস। আর একটু মদ ঢেলে দাও গলায়। আর এবার কিছু বলো।”

বন্দ — “সব কথা পরে হবে। এখন মি. এম কে একটা সিগন্যাল পাঠাতে হবে।”

মুইর — “যা ভালো করো” বলে একটা বই সরিয়ে তার ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে কী যেন পরীক্ষা করলেন।

ক্রিক করে একটা শব্দ হল। একটা পোট্টেবল টাইপরাইটার বার হয়ে এল। টেলিপ্রিন্টারের পাশে এটাকে রাখা হল।

বন্দ চুপ করেছিল। মুইর বললেন, “নাও এবার তোমার মেসেজ পাঠাও।” বন্দকে একটু ঝুঁকে বসতে হল। কারণ মেসেজ যেটা পাঠাবে সেটা যেন মি. এম বুঝতে পারেন কিম্বা মুইর যেন না বোঝে। মেসেজ হল “লোকটাকে আটকানো যায়নি। পুরো রিপোর্ট পরে যাবে। আর দশদিনের ছুটির জন্য কৃতজ্ঞ — ০০৭।”

॥ ছাব্বিশ ॥

মিউনিখ এয়ারপোর্টের পাসপোর্ট কন্ট্রোল অফিসের বাইরে ওদের দেখা হল। ছোটো ল্যানসিয়া গাড়িতে বন্দ আর ট্রেসি বসল। বন্দকে দেখে প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, “একি চেহারা হয়েছে তোমার?”

বন্দ আলতো করে একটা হাত ট্রেসির গায়ে দিয়ে বলল, “কেন ওরকম করছে। কিছুই হয়নি আমার। লড়াই করতে গেলে তো একটু কাহিল হতেই হবে।” ট্রেসি — “আমি জানি তুমি পিজ গ্লোরিয়াতে হাসামায় জড়িয়ে গিয়েছিলে। এবারে মার্কও আমাকে বলেছে। তা ছাড়া খবরের কাগজেও পড়েছি। সেখানেও এই ঘটনার বিবরণ দেখেছি। একবার আমার কথা ভাবলে না।”

গাড়ি চলছে। ট্রেসির হাতে স্টিয়ারিং। মনের দুঃখের কথা বলে চলল সে। বন্ডের চোখ হঠাৎ খবরের কাগজে পড়ল। হ্যাঁ লেখা আছে — শৈলাবাস আর ল্যাভরেটরি ধ্বংস হয়ে গেছে। বিভিন্ন ব্রিটিশ এয়ারপোর্টে অনেক মেয়েকে আটকে রাখা হয়েছে।

বন্দ একটা জোরে নিশ্বাস নিল। তবে পালের গোদা এখনও ঘাপটি মেরে আছে।

তিনটের সময় বন্ডরা হোটেলে পৌঁছাল। পৌঁছেই মার্ককে ফোন করল বন্দ। মার্ক জানাল ট্রেসির বাবা স্ট্র্যাসবার্গে আছেন। ভালো আছেন। বন্দ জানাল আসল লোক এখনও ফেরার। “লড়াইয়ে চেচে মারা গেছে আমাদের। আর ওদের প্রায় সবাই খতম। এমনকি সেই মেয়েটাও, ইরমা বান্ট — যার নাম।”

বন্দ — “ধন্যবাদ অ্যানজে কাল আবার কথা হবে।”

ট্রেসি এখন স্নানের ঘরে। বন্ড ও স্নান সেবে নিল। স্নান সেরে রাস্তায় এসে পড়ল। এবার মি. এম কে টেলিগ্রাফটারে খবর পাঠাতে হবে। রাস্তার উলটো দিকে বেঁটে চেহারার সবুজ গাউন পবা এক মহিলা বন্ডকে ফলো করছে। বন্ড একটা বাড়িতে ঢুকল। বেরিয়ে এসে দেখল সেই মহিলা। বন্ড এবার হোটেলের ফাওয়ার জন্য ট্যাক্সি নিল। এবার সেও বন্ডের পেছনে গাড়ি নিয়ে এগোতে লাগল। বন্ড — যখন হোটেলের ঘরে ঢুকছে তখন মহিলাটি ফোন করল দূরের একটা জায়গায়, বোধহয় লেক কামো, মেট্রোপাল হোটেল।

বন্ড এসে ট্রেসির ঘরেই ঢুকল, ট্রেসি তার জন্য অনেক ফুল সাজিয়ে রেখেছে। ট্রেসি এখন প্রেম নিবেদন করার জন্য পাগল হয়ে আছে, বলল “ফুলগুলো তোমার মতোই সুন্দর বন্ড তাই না।” বন্ড “একবার বিয়েটা হতে দাও তারপর তোমার কুমারী মনটার কথা শুনব। অবশ্য বিয়ে হয়ে গেলে কুমারী তুমি থাকবে না। এবাব চল একটু ড্রিংক কবে ডিনার খাওয়ার জন্য তৈরি হই।” এবার দুজনেই একটু চুম্বন করল একে অপরকে।

বন্ড — “শোন ডারলিং বিয়ের আংটি, বিহানা-বালিশ সব লাগবে কিন্তু।” বন্ডের মনটা এই সব কথাবার্তার সময় কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। নতুন একটা জীবনে প্রবেশ করবে ওরা। হয়তো এই কথা ভেবেই ওরা সবকিছু ভুলে দু’জনে এক হয়ে যেতে চাইছে।

হঠাৎ বন্ডের ঘরে ফোন বাজছে। মার্কের ফোন। সে বন্ডকে নীচে লাউঞ্জে আসতে বলছে। বন্ড নীচে আসতেই মার্ক বলল, “শোন বন্ড, আমি তোমার শ্বশুর হতে চলেছি। “তোমার ব্যাংকের নাম বল।” বন্ড — “কেন? টাকা দেবে? আমি জানি বেশি টাকা মানুষকে নষ্ট করে দেয়। ওটা অভিশাপ।” মার্ক — “আরে কী সব বলছো? তোমাব চাকুরির টাকা সীমিত। আমি যা দেব সে তো বিয়ের উপহার হিসাবে ভাবতে হবে। আব যদি সেটাও না নাও তাহলে ভবিষ্যতের জন্য তোমার সন্তানদের জন্য একটা ট্রাস্ট ফান্ড কবে দিই।”

বন্ড যেন কেমন হয়ে গেছে। বলল — “এতে কি কোনো মঙ্গল হবে?” মার্ক এবার হতাশ হয়ে তাকিয়ে রইল বন্ডের দিকে।

বন্ড -- “শোন মার্ক এখনি টাকা নিয়ে লাভ নেই। যদি কোনো বিপদ হয় বা বাচ্চা-কাচ্চা হয় তখন না হয় কিছু দিও। তোমার মনটা যে অনেক বড়ো সেটা আমি আগেই জানতাম। কী বল ভুল বললাম?”

মার্ক— “না না তোমার কথাই ঠিক। এসো এবার একটু ড্রিংক করে নেওয়া যাক। ওই বোধ হয় ট্রেসি আসছে। হয়তো ও ভাববে আমরা মারপিট শুরু করে দিয়েছি।” বলে হেসে উঠল মার্ক আনজে।

॥ সাতাশ ॥

ব্রিটিশ কনসাল জেনারেলের ডুইং রুম। আগের দিন নববর্ষের সন্ধ্যায় খুব ছল্লাড় হয়েছে। তাই ট্রেসি আর বন্ডকে ক্লাস্ত দেখাচ্ছিল। কনসাল ভদ্রলোক বললেন — “কাগজপত্র সব তৈরি। পয়লা তারিখটাই শুভ দিন।” মার্ক এসে বন্ডকে আনন্দে জাপটে ধরেছে।

ট্রেসির ল্যানসিয়া গাড়িটা সাজানো হয়েছে সাদা ফিতে দিয়ে। কনসাল বললেন — “খবরটা চেপে রাখা গেল না। তাই একটু দুঃখিত। তোমাদের মঙ্গল হোক! আবার এসো। গুডবাই।”

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। আবার স্টিয়ারিং ট্রেসির হাতে।

বন্ড — ওহে রাজকন্যা বল কেমন লাগছে? তোমাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছে। আইনত আমরা স্বামী-স্ত্রী। শুধু একটা সামাজিক অনুষ্ঠান বাকি।

ট্রেসি — “আমি ভীষণ খুশি তোমাকে পেয়ে। এবার আমাকে সবাই মিসেস বন্ড বলবে।”

বন্দ তার ডান হাতটা ট্রেসির পিঠে রাখল। হঠাৎ বন্ডের চোখে পড়ল দূরে পেট্রোল স্টেশনে একটা লাল রঙের মাসেরাটি গাড়ি তেল নিচ্ছে। ভেতরের সিটে একজন নারী ও পুরুষ। লোকটার গায়ে সাদা কোট গলা পর্যন্ত ঢাকা। চোখে সবুজ গগলস্।

বন্ডের ঘড়িতে প্রায় বারোটো বাজে। ওরা একটার সময় কুকস্টাইন যাবে।

সামনেই একটা দুর্গ। সেখানে কয়েকটা কাফে আর রেস্তোরাঁ, বাজনার আওয়াজ আসছে। অস্ট্রিয়া আর জার্মান ট্যুরিস্টরা এখানে বিশ্রাম নেয়।

বন্দ বলল “এটাই অস্ট্রিয়ার সীমান্ত। ১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময় তৈরি একটা স্মরণ স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে।”

এই মুহূর্তে রাস্তায় খুব বেশি গাড়ি নেই। বরফে ঢাকা। পাছাড়ের চেহারাটা দারুণ দেখাচ্ছে।

ট্রেসি চুপ করে গাড়ি চালাচ্ছিল, হঠাৎ বলল, “দেখ ওই লাল মাসের গাড়িটা আসছে। ওটাকে মেরে বেরিয়ে যাই কি বল? বন্দ — “না ওটাকে যেতে দাও।”

হঠাৎ গুলির শব্দ। ট্রেসির ল্যানসিয়া গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন চুরমার। বন্দ হঠাৎ দেখতে পেল একটা হিংস্র মুখ, আর একটা অটোমেটিক রিভলবার।

ট্রেসির গাড়ি এবার ধাক্কা খেয়েছে গাছে। ধাক্কার চোটে বন্দ ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ঘাসের উপর পড়ল। ব্যস সব অন্ধকার।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখল একজন পুলিশ ওর উপর বাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করছে। স্টিয়ারিং এ মুখ গুজে পড়ে আছে। ট্রেসির চুলে জমাট রক্ত।

জার্মান পুলিশ অফিসারটি ব্যাকুল হয়ে সব জানতে চাইছে।

কিন্তু বন্দ যেন শাস্ত হয়ে গেছে, বলল, “সময় অনেক আছে। ব্যস্ত হবার কিছু নেই।” ট্রেসির চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, “ও একটু বিশ্রাম করছে। আমরা আবার এগিয়ে যাব। কোনো তাড়া নেই অফিসার।”

1, 50,000
25,000
15,000
15,000
40,000
3,45,000

থাডারবল

॥ এক ॥

মাঝে মাঝে এমন একটা দিন বা সময় আসে জেমস বন্ডের জীবনে, যখন কোনো কিছুর দাম থাকে না। সেই রকমের একটা খারাপ দিন হচ্ছে আজ।

প্রথমটা হচ্ছে — যে নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত এটা তার বড়ো একটা হয় না। শরীরটা সুবিধের মনে হচ্ছে না, গাঁটে গাঁটে ব্যথা। বেশি মদ আর সিগারেট খাওয়ার দরুন কাশি বেড়ে গেছে — আর মনে হচ্ছে চোখের সামনে যেন মজাপুকুরের পোকাকার মতো, ধোঁয়ার মতো রাশি রাশি কালো ফুটকি।

পার্ক লেনের সেই প্রাসাদোপম বাড়িতে বসে দশ গেলাস মদ আর সোডা খাওয়ার পর যখন শেষ গেলাসটা একচুমুকে গলায় ঢালল, মুখটা তেতো হয়ে গেল আর হঠাৎ যেন পেটটা খুব ভর্তি মনে হল।

শেষ গেলাস, অর্থাৎ এগারো নম্বর শেষ করে বুঝতে পারল তার মাথার অবস্থা কী? তবুও সে আর এক বাজি (Rubber) খেলতে রাজি হয়ে গেল। তারপরে আবার মদের নেশায় বুদ্ধির মতো চাল দিল 'রিডবল'।... বেশ মনে পড়ছে ইন্সাবনের বিবিটা কেমন হাসতে হাসতে মদের গেলাসের ওপর চেপে বসল। একশো পয়েন্টে পাউন্ড হিসাবে দাঁড়াল পুরো চারশো পয়েন্ট হেরে গেল। যার মূল্য একশো পাউন্ড। ফেলে দেওয়ার কথা নয়।

নিজের ফ্ল্যাটে গালে যেখানটায় কেটে গিয়েছিল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বন্দ ওমুখ লাগাচ্ছিল। আর নিজের মুখের ভোঁদা ভোঁদা চেহারাটা দেখে নিজেকেই তার বিস্মী লাগছিল। কী করবে — তাকে যে গত একমাস ধরে শুধু অফিসে টেবিলে বসে বসে কতকগুলো কাগজে কেবল দাগ মেরে যেতে হচ্ছে। তার অধস্তনরা যখন টেলিফোনে জোরে কথা বলছে, তখনই তাদের ধমক দিতে হচ্ছে। আর সবচেয়ে বাজে লেগেছে — তার সেক্রেটারি মেয়েটা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায়, তার জায়গায় একটা কেলে বিদঘুটে মাগিকে দিয়েছে। য সব সময় ন্যাকা ন্যাকা সুরে 'স্যার, স্যার' করে মরে আর কেবল সাজানোগুছোনো কথা বোলে।

আজ সোমবার এখনও সামনে বিরাট বড়ো সপ্তাহ পড়ে রয়েছে — বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বন্দ দুটো ওষুধের বড়ি খেল। তারপর ফ্রুট সন্টের শিশিটা নিতে যাবে শোবার ঘরে টেলিফোন বাজল — তার ডাক এসেছে খোদ সদর দপ্তর থেকে।

* * *

লন্ডনের রাস্তা ধরে ঝড়ের বেগে বন্দ গাড়ি চলিয়ে সদর দপ্তরে হাজির। লিফটে ন-তলায় উঠে সোজা গুপ্তচর বিভাগের যিনি চিফ, সবাই যাঁকে M বলে জানে, তার সামনে কম্পিত হৃদয়ে চেয়ার টেনে বসল। সেই অতিপরিচিত ধূসর ঠান্ডা চোখ দুটোর দিকে।

— শুভ বর্নিং জেমস। সাত সকালে তোমায় ডাকার জন্যে কিছু মনে করো না। আসল কথা হচ্ছে — অফিসের সকলের সামনে আমি কথা বলতে চাই না।

বন্দ যতটা উত্তেজনা নিয়ে এসেছিল তাতে জল ঢেলে দিলেন M তাকে নাম ধরে ডেকে। নম্বর ধরে না ডেকে। নিশ্চয়ই কোনো মিইয়ে যাওয়া কথাই তিনি বলবেন। M যেভাবে কথা বলতে শুরু করল তাতে যে, কোনো বিশেষ উত্তেজক খবর শোনাবেন তা মোটেই মনে হল না।

— ‘হ্যাঁ, তোমাকে তো আজকাল দেখতে পাওয়াই যায় না জেমস। তোমার শরীর নিশ্চয়ই ভালো আছে।’ M তাঁর ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে পড়তে শুরু করলেন।

— আমি বেশ ভালোই আছি স্যার। বন্ড খুব নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করতে লাগল ওই কাগজটা।

— ‘আমাদের মেডিকেল অফিসারের রিপোর্ট কিন্তু অন্য কথা বলে। সেটা তোমার জন্য উচিত।’ — M খুব আন্তরিক ভাবেই কথাগুলো বললেন।

বন্ডের মেজাজ চড়ে গেল — যন্ত্র সব বোগাস ব্যাপার — নিজেকে সামলে নিয়ে বললে —
— বেশ, আপনি যেমন বলেন স্যার।

ভালো করে বন্ডকে M দেখে নিয়ে সেই কাগজটা পড়তে লাগলেন — এই ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই। তবে বেশিদিন থাকবে না কারণ, তিনি যেভাবে তাঁর জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কড়া ব্র্যান্ডের সিগারেট দিনে ষাটটা করে খান — আব কাছ বেশি পড়লে তিনি মদের মাত্রা বাড়িয়ে আধ বোতল করেন যার মধ্যে ষাট থেকে সত্তর ভাগ অ্যালকোহল থাকে।

এর মধ্যেই সামান্য অসুস্থতার লক্ষণ ধরা পড়েছে। উনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, মাঝে মাঝে তাঁর মাথা ধরে। ওঁর রক্তচাপ উর্ধ্বমুখী, জিভ সাদা — এইসব দেখে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বেশ উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করেন। এনার এখন তিনসপ্তাহ সম্পূর্ণ নিরাসক্ত জীবন যাপন করে বিশ্রাম নিলে আবার পূর্বকার উন্নত কর্মক্ষমতা ফিরে পাবেন।

কাগজটা পাশের ট্রেতে ফেলে দিলেন M। তারপর সোজা বন্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন —
ব্যাপারটার তেমন গুরুত্ব নেই। তাই না জেমস?

নিজের অস্থিরতাকে চাপা দিয়ে বললে — স্যার দেখুন, মাথাব্যথা তো একটা কমুন জিনিস। সকলেরই হয়। দুটো অ্যাসপিরিন খেলেই সুস্থ। আমি এখন একেবারে সুস্থ স্যার, এসব কিছুই নয়।

বেশ খানিকটা রেগেই M বললেন — বেশি বাজে কথা বলো না জেমস্। ওষুধ দিয়ে রোগের লক্ষণগুলো চাপা দেওয়া গেলেও তাকে সারাতে পারে না। এই ওষুধই শরীরের ভালো তো কবেই না উপরন্তু ক্ষতিই করে। আমরা যা খাই সেসবও তাই — যেমন ধরো — সাদা চিনি, সাদা রুটি। পাস্তুরাইজড দুধ ইত্যাদি নানারকমের জিনিস। আর খাবার দাবার বেশি রিচ করে রান্না করলে তার গুণ নষ্ট করে দেওয়া হয়। পরে M তাঁর পকেট থেকে একটা ডাইরি বার করে পড়তে লাগলেন — ভাবতে পারো — সাদা রুটির আটা ছাড়াও আরও কত কী থাকে — বেশ কিছুটা চক, বেন্জল প্যারঅক্সাইড, ক্লোরিন গ্যাস, ম্যাল আমোনিয়াক আর ফটকিরি। ডাইরিটা পকেটে পুরে ফেললেন, বেশ রাগতভাবেই বন্ডের দিকে তাকালেন।

বন্ড চুপচাপ এইসব অদ্ভুত কথাবার্তা শুনছিল। নিজেকে বাঁচাবার জন্য বললে — স্যার আমি তো সাদা আটার রুটি খুব একটা খাই না।

— হতে পারে। কিন্তু ভালো কিছু খাও? যেমন ধরো — কাঁচা সবজি, বাদাম, দই বা টাটকা ফল তুমি কতটা করে খাও?

বন্ড হেসে ফেললে — মোটেই নয় স্যার।

M টেবিল চাপড়ে উঠলেন — ‘তুমি হাসছ, মোটেই তা নয়। এটা জেনে রাখ প্রকৃতির সাহায্য ছাড়া শরীর সুস্থ রাখা যায় না।’ বন্ড কিছু বলতে গেলে তাকে M থামিয়ে দিয়ে বললেন — ‘প্রকৃতি ছাড়া জীবন-যাত্রা। সুখের কথা যে, ইংল্যান্ডে কয়েকটি চিকিৎসালয় আছে, যারা প্রকৃতির সাহায্য নিয়ে চিকিৎসা করে। যেটা আমাদের আয়ত্তের মধ্যেই আছে।

খুব মনোযোগ দিয়ে বন্ড M কে লক্ষ্য করছে — বুড়োর এই পাগলামির অর্থ কী? দেখে মনে হচ্ছে শরীর বেশ ভালোই আছে। ধূসর চোখ দুটোর দৃষ্টি তো হিরের মতো সাদা। তবে এ ভিন্নরতির কারণ কী?

M একটা ট্রে টেনে নিলেন অর্থাৎ আর কিছু বলার নেই। 'মিস মানিপেনি তোমার রিজার্ভেশন করে রেখেছে। তোমায় দু-সপ্তাহ থাকতে হবে। পরে যখন ফিরবে তখন আর নিজেকে নিজেই চিনতে পারবে না।

M-এর কথায় বন্দ চমকে তাঁর দিকে তাকাল — স্যার কোথায় যেতে হবে?

'তোমার গন্তব্যস্থল হচ্ছে -- শ্রাবল্যান্ডম বলে একটা জায়গায়। সেখানের প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়ের পরিচালক জোশুয়া ওয়েন্। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়ষাট্টি। কিন্তু দেখলে মোটেই বোঝা যায় না, খুবই ভদ্রলোক, তোমার দেখাশোনা করবেন। দু'সপ্তাহ তোমার ছুটি কাজ থেকে। সে সব দেখাশোনার ভার দেব ০০৯-কে।

বন্দ ভাবছে সে কি স্বপ্ন দেখছে? বললে — স্যার, আমি কোনোরকম অসুস্থতা বোধ করছি না, ওখানে যাওয়ার খুব বেশি প্রয়োজন আছে কি?

M হাসলেন, যেন একটুকরো বরফ। গম্ভীর গলায় বললেন — 'প্রয়োজন নয়, নিশ্চিত। অবশ্য যদি তোমার (০০) ডবল ওতে থাকতে ইচ্ছে থাকে। কোনো অসুস্থ লোককে গোয়েন্দা বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে আমি রাখতে পারি না।' তাঁর সামনের ট্রে থেকে একটা ফাইল তুলে বললেন — 'বাস্ এই পর্যন্তই ০০৭'। অন্যদিকে মুখ যোরালেন — অর্থাৎ তাঁর কথা বলা শেষ।

বন্দও উঠে কিছু না বলে ঘরের বাইরে এসে দরজাটা খুব ধীরে বন্ধ করল।

দরজার পাশেই একটা ডেস্কে M-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি মিস মানিপেনি বসে বেশ মিষ্টি করে বন্দের দিকে তাকাল।

বন্দ প্রচণ্ড রেগে গিয়ে স্থানকাল পাত্র ভুলে গিয়ে তার টেবিলে জোরে চড় মারল। বললে— আচ্ছা পেনি, বুড়োটা কি খেপে গিয়েছে। এসবের মানোটা কী? আমি ওখানে যাচ্ছি না।

বন্দের অবস্থা দেখে মিস মানিপেনি হেসে ফেলল, বললে — দেখ, ঐ চিকিৎসালয়ে তোমার জন্যে খুব সুন্দর একটা ঘর দেখা হয়েছে তরিতরকারি খেতের ঠিক ওপরে। ওদের ম্যানেজার ভদ্রলোক খুব ভালো। ওদের নিজেদের বাগানও আছে।

বাগানের গুপ্তির তুষ্টি করেছে। এবার সে বেশ করুণভাবে বলল — লক্ষ্মীসোনা মেয়ে, আসল ব্যাপারটা কী বল দেখি। বুড়োর মাথায় কি পোকা ঢুকেছে?

বন্দের ওপর মিস মানিপেনির যথেষ্ট দুর্বলতা আছে। এমনকি তাকে রাতে স্বপ্নেও দেখে। বন্দের এই অবস্থা দেখে তার মনটা ভিজে গেল চুপিচুপি বললে — চিন্তার কিছু নেই, এটা কর্তার মাথায় নতুন পোকা ঢোকার ফল। শীঘ্রই পোকা বেরিয়ে যাবে। মনে নেই সেবার আমাদের সকলের জন্যে ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা হল। আর একবার, তুমি বেঁচে গিয়েছিলে সেবার বাইরে ছিলে, একজন মনস্তাত্ত্বিকের খপ্পরে পড়ে তাঁর আদেশ হল প্রত্যেক বিভাগের চিফকে পরের দিন তাঁকে বলতে হবে — তিনি গত রাত্রে কী স্বপ্ন দেখেছেন। তাবপর স্বপ্নের বহরের কথা শুনে তাঁর মাথার পোকা বেরিয়ে গেল।

'এবারে হয়েছে কি? গত মাসে কর্তা বাতে আক্রান্ত হন। তাঁর এক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলেন — মানুষের শরীরের মধ্যে মোটর গাড়ির কলকজার মতো সম কলকজা আছে। তাদের নিয়মিত দেখভাল করতে হবে। তিনি একটা প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়ে বছরে একবার করে যান আর নতুন স্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে আসেন। খরচ বেশি নয়। সপ্তাহে মাত্র কুড়ি পাউন্ড।

নতুন কিছু জানার আগ্রহ আমাদের কর্তার তো চিরদিনের অভ্যাস। তিনি সেখানে চলে গেলেন আর দশদিন পরে ফিরে এলেন — সত্যিই একটা নতুন স্বাস্থ্য নিয়ে। আমায় তো প্রাকৃতিক চিকিৎসা সম্বন্ধে এক বুড়ি জ্ঞান দিলেন। শুধু তাই নয়, আজ সকালের ডাকে আমার কাছে এল

— একগাদা গুড়, বিদ্যুটে ময়দা এবং আরও কী সব। কী আর করি, আমার পুডল কুকুরটাকে সেসব খেতে দিয়েছি। দেখি সে আবার ঠিক আছে কি না।

— তাঁর স্বাস্থ্য ফিরেছে খুব সত্যি কথা। কিন্তু আমার অপরাধটা কী যে, ঐ পাগলা গারদে আমায় বলি হতে হবে?

তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো যে, তোমার সম্বন্ধে উনি খুবই চিন্তিত। তার ওপর ঐ মেডিকেল রিপোর্ট — ওটাই তোমায় ওখানে পাঠাতে বাধ্য করল। আমায় সবকিছু ব্যবস্থা করার জন্য বললেন।

মিস মানিপেনি বেশ সহানুভূতির সঙ্গে বললে — ‘আচ্ছা বন্দ তুমি ওইসব সিগারেট আর মদ খাও কেন? এটা যে তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এটা কি তুমি জানো না?’

বন্দ সামলে নিয়ে বললে — দেখো পেনি, তৃষ্ণায় ধোঁকার চেয়ে মদ খেয়ে মরা অনেক ভালো আর আমার হাতটাকে কিছু করতে দেবার জন্য সিগারেট খাওয়া।

তার সুন্দর পাতলা ঠোঁট দুটো একটু অন্য রকম ভঙ্গি করে বললে — আমার কাছে খবর আছে। তোমার হাত দুটোর অন্য রকমের কাজ করার।

ব্যস, ব্যস, অনেক হয়েছে জ্ঞানদা দেবী, জ্ঞান দেওয়া বন্ধ করো। দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে বললে — ‘আর বেশি জ্ঞানদা হলে, ফিরে এসে তোমায় এমন পিট্টি দেবো না—।’

বেশ মধু মাখিয়ে হেসে মিস মানিপেনি বললে — ঠিক আছে, ঠিক আছে, আগে তো দু সপ্তাহ ধরে লেবুর রস আর বাদাম খেয়ে ফিরে এসো, তখন দেখা যাবে। পিট্টি দেওয়ার কতটা ক্ষমতা তোমার থাকে।

বন্দ ওর দিকে বিরক্তি সহকারে চেয়ে নাক দিয়ে একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ কব্বে চলে গেল।

॥ দুই ॥

বন্দের মেজাজ ঠিক নেই। একটা পুঝোনো চকলেট রঙের অস্টিন ট্যাক্সির পেছনে তার সুটকেস রেখে ড্রাইভারের পাশে এসে বসল। তরুণ ড্রাইভারটি বেশ চালাক-চতুর। পকেট থেকে একটা চিক্রনি বের করে তার বাহারি চুলের ওপর চালিয়ে আবার পকেটে রেখে গাড়ি স্টার্ট দিল।

বন্দের ধারণা হল যে এই ছেলেটির চুল আঁচড়ানোর অর্থ আর কিছুই নয় তার একটা আশ্চর্যকর বহিঃপ্রকাশ। সে বোঝাতে চায় যে, সে যেন কৃপা করে বন্দকে নিয়ে যাচ্ছে এবং তার কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছে। তার রোজগার সপ্তাহে বড়ো জোর কুড়ি পাউন্ড। তার মনের অদম্য ইচ্ছে সে রুপালি পর্দার নায়ক হবে। বাপ-মায়ের তোয়াক্কা করে না। করবে কেন? ওদের আবির্ভাব তো এটম বোমা আর মহাকাশের যুগে। জীবনটা এর কাছে ছেলে খেলা এবং অর্থহীন।

বন্দ তাকে জিজ্ঞেস করলে — ‘শ্রাবল্যান্ড এখান থেকে কত দূর?’

সামনে একটা ট্রাফিক আইল্যান্ড ঘুরে বাঁক নিয়ে আবাব বাঁকের পর জোরে গিয়ার বদলাল — বন্দকে যেন কায়দা দেখাচ্ছে। তারপর বললে — ‘মাত্র আধ ঘণ্টাটুক লাগবে।’ বলে আবার অ্যান্সিলেটরে জোরে চাপ দিয়ে বিপজ্জনকভাবে একটা লরিকে ওভারটেক করল।

তুমি তোমার এই ব্লু-বার্ড-কে সহজে ছেড়ে দিতে চাও না। ভালোভাবে খাটিয়ে নিতে চাও। (ব্লু-বার্ড হচ্ছে একটা জগৎবিখ্যাত রেসিং কারের নাম)।

বন্দ আড়চোখে তরুণটিকে দেখে বুঝতে চাইল যে, তাকে নিয়ে মজা করছে কি না। সেরকম কোনো মতলব নেই বুঝে ছেলেটি বললে — ‘আমার বাবার এই গাড়িটা তাঁকে কুড়ি বছর খুব ভালোভাবে সার্ভিস দিয়েছে এবং এটা আমাকেও আরও কুড়ি বছর সার্ভিস দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এই হচ্ছে তাঁর বক্তব্য। তিনি আমায় নতুন গাড়ি কিনে দেবেন না। অতএব আমাকেই তার ব্যবস্থা করার জন্য টাকা জমাতে হচ্ছে। অর্ধেক টাকা জমে গেছে অবশ্য।’

বন্ডের ধারণা পালটানো যে, যে ছেলেটিকে চিরুনি নিয়ে চুলের কায়দা কবতে দেখে 'যে বিকপ ধারণা করেছিল সেটা অনুচিত হয়েছে। তাই জিজ্ঞেস করল — কি গাড়ি কেনার ইচ্ছে আছে?

ব্রাইটনে রেসের দিন অনেক লোক নিয়ে যেতে গেলে পোকস্‌ওয়াগান মিনিবাস কেনাই ভালো।

ব্রাইটনে যেতে পারলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। সিদ্ধান্তটা ঠিক।

সেইরকম ইচ্ছেই আছে।' কথাবার্তায় বেশ ভালো লাগল বন্ডের। একবার মাত্র সুযোগ হয়েছিল সেখানে যাওয়ার। দুটো মাগি আর দুজন বুকীকে (Bookie) নিয়ে লন্ডনে যেতে হয়েছিল। আমায় দশ পাউন্ড ভাড়া দিয়েছিল আর পাঁচ শিলিং বকশিশও দিয়েছিল। বেশ ভালো ব্যাপার।

তবে তুমি খুব সাবধানে থাকবে, ওখানে এক ধরনের বদমাশ লোক আছে, যারা লোককে সহজেই ঠকিয়ে কাজ হাসিল করে। ব্রাইটনে কয়েকটা পাক্কা বদমাইশের দল আছে। আচ্ছা ওখানে 'বাকেট অব্ ব্লাড' দলের খবর কিছু জানো?

এখন ওরা ঠান্ডা হয়ে গেছে, মামলায় জড়িয়ে পড়েছে তো। অবশ্য এ খবর সব কাগজেই বেরিয়েছে। — ছেলেটি এবার বুঝল যে বন্ড তার সঙ্গে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলছে, তাই সে একবার বন্ডের আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিয়ে বললে — তা ওই রকম একটা বাজে জায়গায় আপনি থাকতে যাচ্ছেন, না, কার্কর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন?

বাজে জায়গা? মানে?

হ্যাঁ, তাই তো ছোট্ট উত্তর। ওখানে সাধারণত মোটা মোটা ভদ্রমহিলা বা বুড়ো হাবড়ারা যায়। তারা আবার জোরে গাড়ি চালাতে নিষেধ করে। কারণ তাদের সাইটিকার ব্যথা নাকি বেড়ে যাবে। এই প্রথম আপনার মতো একজনকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।'

বন্ড হেসে ফেললে — 'আমার ডাক্তারের নির্দেশ যে, আমায় ওখানে চোদ্দো দিন থাকতে হবে চিকিৎসার জন্যে। মন খারাপ করে আর কী হবে? আচ্ছা এখানকার লোকেদের শ্রাবল্যান্ডস সম্বন্ধে ধারণা কী?

ব্রাইটন রোডের রাস্তা ছেড়ে পশ্চিমদিকে গাড়ি চলল। বেশ শান্ত গাঁয়ের পরিবেশ। ছেলেটি বললে — এখানের লোকেদের ধারণা ওটা একটা পাগলা গারদ। ওখানে সাধারণত বহুলোকেরাই যায় বটে। কিন্তু পয়সা খরচের বেলায় খুব টাইট। তবে চায়ের দোকানগুলোর বিক্রি বাটা বেড়েছে।

আপনি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, এখানেও বেশ কিছু শহরের নামিদামি লোক সবাই একসঙ্গে কিছু না খেয়ে গাড়িতে কবে ঘুরে বেড়ায়। আর চায়ের দোকান দেখলে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে চা খেতে শুরু করে। আবার মজার কথা হচ্ছে যে, যদি দেখে যে, পাশের টেবিলে কেউ রুটি-মাখন খাচ্ছে। তাহলে একগাদা সেই রুটি-মাখনের অর্ডার দেয়। তারপর যখন খেতে শুরু করে দেখলে মনে হবে কতদিন যেন অভুক্ত ছিল এবং এমনভাবে অশপাশ দেখতে থাকে যেন, তাদের খাওয়া কেউ দেখে ফেললে — বিরাট কিছু শাস্তি হয়ে যাবে। সত্যি এদের জন্যে কষ্টও হয় আবার লজ্জাও হয়....।

এগুলো করে কী লাভ? যখন চিকিৎসার জন্যে অটেল পয়সা খরচ করছে।

ছেলেটা বেশ রেগেই বললে — 'দেখুন এরা সপ্তাহে কুড়ি পাউন্ড নেয়। তার পরিবর্তে এদের কী খেতে দেয় জানেন? শুধু গবম জল। তিনবেলা পেট ভর্তি খেতে দিলে কিছু বলার ছিল না। তাহলে এত টাকা নেওয়া কি ঠিক?

আমার বিশ্বাস এটা নানারকমের চিকিৎসার খরচ — খাওয়ার খরচ নয়। আর রোগীরা যদি সত্যিই সুস্থ হয়ে যায় তা হলে এ রকম খরচ তো লাগবেই।

হবে হয়তো। - ছেলেটার মনে বোধহয় সন্দেহ দেখা দিল, বলল — দেখুন যখন সেই বুড়ো গুলোকে ফেরত নিয়ে আনতাম তখন তাদের চেহারা পরিবর্তন দেখতাম। আবার ব্যঙ্গ করে বলল — আবার সাতদিন বাদাম খেয়ে কেউ কেউ বুড়ো বজ্জাত হয়ে যেত। আমার ইচ্ছে, আমি একবার ভর্তি হয়ে পরখ করে দেখব।

অর্থাৎ ?

বন্দকে একবার দেখে নিয়ে ভরসা পেয়ে তার মনে বোধহয় ব্রাইটন সম্বন্ধে বন্ডের মন্তব্যগুলো তার মনে পড়ল — তাই সে শুরু করল — আমাদের ওয়াশিংটন গ্রামে একটা মেয়ে থাকে খুব বুদ্ধিমতী ধুরন্ধর। সে হচ্ছে আমাদের ওখানকার 'ইয়ে' অর্থাৎ 'মক্ষিকা' আর কী। 'হানি বী' নামে একটা চায়ের দোকানে কাজ করত। সকলের মাথায় চক্কর লাগিয়ে দিয়েছিল। সে এক এক রাউন্ডের পারিশ্রমিক নিত এক পাউন্ড করে। অবশ্য নানারকমের ফ্রেঞ্চ কায়দা তার আয়ত্তে ছিল। আমাদের মধুচক্র বেশ ভালোই চলছিল।

এদিকে শ্রাবল্যান্ডেও 'পলিগ্রেস' মানে ওই মেয়েটার নাম ছড়িয়ে পড়ল। আর দেখে কে? ওই বুড়ো শয়তানগুলো পলির পেছন পেছন ঘুরতে লাগল। আমাদের কাজ কারবার করার জন্য কাছেই একটা পুরোনো পরিত্যক্ত খনি, আমরা ব্যবহার করতাম। এবার ঐ বুড়োগুলো তাদের গাড়ি করে পলিকে সেখানে নিয়ে যেত আর প্রতিবারের জন্য পাঁচ পাউন্ড করে দিত। ব্যস, পলির দর বেড়ে গেল। আর আমাদের পাস্তাই দিত না। মাসখানেক আগে ওই চায়ের দোকানের চাকরিটা ছেড়ে দিল।

সে এত রেগে গেছে যে বেশ গলা চড়িয়েই বলতে লাগল — 'আরও আছে। জানেন, প্রায় শ'দুয়েক পাউন্ড দিয়ে এক লজঝড়ে গাড়ি কিনে তাতে করে ঘুরে বেড়ায়। ওই যে কাগজে লন্ডনের কার্জন স্ট্রিটের ওই গাড়িওয়ালা বেশ্যা মাগিগুলো যেমন ঘোরে খন্ডের ধরাব জন্য। ব্রাইটন, লিউইস বা অন্যসব জায়গায় যেখানে যেখানে খন্ডের পাওয়া যায়। আবার শ্রাবল্যান্ডের বুড়োদের নিয়েও ওই খনিতে তার কারবার চালায়। সে এত রেগে গেছে যে, সামনে একটা ছেলে সাইকেলে যাচ্ছে তার উদ্দেশে দু'বার হর্ন বাজিয়ে দিল।

ওর সঙ্গে বেশ সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলতে লাগল বন্ড — শুনেছি ওখানে তো শুধু বাদামের কাটলেট খেতে দেয় — তা ওই সব খেয়ে বুড়োগুলোর শয়তানী করার ইচ্ছে হয় ?

একটা অবজ্ঞার মতো আওয়াজ করল মুখ দিয়ে। বলল — আপনি তো অ— নে—ক জানেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাবল বন্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, তাই সামলে নিয়ে বললে, 'অর্থাৎ আমরাও তাই ভাবতাম। ওখানকার স্থানীয় এক ডাক্তারের ছেলে আমার বন্ধু, সে একদিন কায়দা করে অন্যভাবে তার বাবার কানে কথাটা তুলতে তিনি বললেন — না, না, মোটেই তা নয়। আসলে শ্রাবল্যান্ডে খাবার হয়তো কমই দেয়, কিন্তু যেটা দেয় সেটা হচ্ছে অফুরন্ত বিশ্রাম, শরীরের ওপর ম্যাসেজ আর ঠান্ডা গরম হলে সিট্জ (sitz) বাথ। মদ নৈব নৈব চ। এতে করে রোগীদের রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক হয় আর শরীরের সমস্ত কল-কবজাগুলো পরিষ্কার হয়ে বুড়ো হাবড়াগুলো বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে।'

একটু মৃদু হেসে বন্ড বললে — তাহলে এখানে ভালো আছে কিছু।

রাস্তার ডানদিকে একটা সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে — 'শ্রাবল্যান্ডস্। সুস্বাস্থ্যের প্রবেশদ্বার। ডাইনে যাবেন। কোনো রকম আওয়াজ করবেন না।' ডানদিকে ঘুরে একটা গাড়ি বারান্দার তলায় গাড়ি দাঁড়াল। একপাশে বহু পালিশকরা চাকতি লাগানো দরজার পাশে কারুকার্যকর একটা লম্বা মাটির পাত্র। তার উপরে নোটিশ লেখা — 'ভেতরে ধূমপান নিষিদ্ধ। আপনার সঙ্গে সিগারেট থাকলে এখানে জমা দিয়ে যান।'

ট্যাক্সি থেকে নেমে বন্ড পেছন থেকে তার স্টকেস নিয়ে সেই ছেলেটিকে ভাড়া চুকিয়ে দশ

সিলিং বর্কাশ দিল। সে এমনভাবে এটা নিল যেন এটা তার প্রাপ্য। তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে বলল — ‘এখান থেকে পালাবার মন যদি হয় তো আমায় খবর দেবেন। পলি ছাড়াও অন্য ভালো জিনিস আমার সন্ধানে আছে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, ব্রাইটন রোডের রাস্তাব ওপর একটা চায়ের দোকানে মাখন লাগানো গরম কেক পাওয়া যায়।’ সে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে যে পথে এসেছিল সেই পথেই চলে গেল। বন্ড তার সুটকেস নিয়ে ভারী দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

ভেতরটা বেশ গরম এবং শান্ত। রিসেপশনে বসে রয়েছে সাদা পোশাক পরা একটা সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। বন্ডকে সাদব অভ্যর্থনা জানাল। রেজিস্টারে সই করার পর তাকে অনেকগুলো হালকা আসবাবপত্র ভর্তি একটা ঘরে মেয়েটা নিয়ে গেল। একটা সাদা, গন্ধহীন লম্বা করিডোর দিয়ে বাড়ির পেছনে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বসিয়ে বললে, — ‘আর একঘন্টা বাদে অর্থাৎ ছটার সময় বড়োসাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।’ মেয়েটি চলে গেল।

বেশ সুন্দর করে ঘরটা সাজানো। জানলায় সুন্দর সুন্দর পর্দা লাগানো। বিছানায় আবার বৈদ্যুতিক চাদর পাতা রয়েছে। বিছানার পাশে একটা ফুলদানিতে ‘মেরিগোল্ড’ ফুল। টেবিলে একটা বই — ‘প্রাকৃতিক চিকিৎসার ব্যাখ্যা’ রচয়িতা — অ্যালান ময়েল। ঘরের সেন্ট্রাল হিটিং বন্ধ করে দিয়ে জানলাগুলো সব খুলে দিল। বাইরে নানা জানা-অজানা ফল-ফুলের বাগান। তার মাঝে শোভা পাচ্ছে একটি সুন্দর সূর্যঘড়ি। বন্ড তার নিজের জিনিসপত্র সব সাজিয়ে ফেলল। শেষে ঘরের ইজিচেয়ারে বসে বইটা পড়তে লাগল শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কীভাবে বের করে দিতে হয়। অজানা অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত সব খাবারের নাম জেনে ফেলল। সবে মাত্র দলাই-মলাই-এর চ্যাপ্টার পড়তে শুরু করেছে এমন সময় টেলিফোনে সেই মেয়েটি বলে উঠল মি. ওয়েন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান পরামর্শকক্ষ - - ‘A’তে।

বন্ড পরামর্শ করে ঢুকলে ‘শ্রাবল্যান্ডেস্’-এর বড়ো সাহেব মি. জোশুয়া ওয়েন তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে করমর্দন করলেন। তাঁর মাথা ভর্তি সাদা চুল, স্বচ্ছ ও নরম দুটি চোখ। তাঁর হাসি দেখে মনে হল বন্ডের চিকিৎসা করতে পেরে তিনি খুব খুশি। তিনি বন্ডকে প্যান্ট বাদে ওপরের পোশাক খুলে ফেলতে বললেন। বন্ডের সারা শরীরে ক্ষতের চিহ্ন দেখে বললেন — ‘কী ব্যাপার, আপনি কি যুদ্ধে গিয়েছিলেন?’

বন্ড কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন — হ্যাঁ। ওগুলো হচ্ছে যুদ্ধের সময় বুলেটের ভালোবাসার দাগ।

হ্যাঁ, মানুষে মানুষে এই যে হিংসা-যুদ্ধ বড়োই ভয়ানক... এবার একটু জোরে নিশ্বাস নিন তো। বন্ডের বুক পিঠে মি. ওয়েন কান পেতে কী সব শুনতে লাগলেন। তারপর রক্তচাপ, ওজন, উচ্চতা নেবার পর উপড় করে বন্ডের পিঠের হাড় ও মেরুদণ্ডের সংযোগগুলো তাঁর নরম আঙুল দিয়ে টিপে টিপে দেখতে লাগলেন।

পরীক্ষা শেষ হল। বন্ড তার জামা পরতে লাগল। মি. ওয়েন তাঁব টেবিলে বসে অনেক কিছু লিখে ফেললেন। তারপর একটু আরাম করে বসে বন্ডের মনে — ‘মি. বন্ড, আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে রক্তের চাপ উর্ধ্বগামী, মেরুদণ্ডের ওপর দিকের হাড়গুলোর মধ্যে একটু চোট দেখা যাচ্ছে। কোমরের তলার দিকের একটা হাড় একটু সরে গেছে, বোধহয় আপনি কখনও হঠাৎ আছাড় খেয়েছিলেন। তাই তো?’ বন্ডের মুখেব দিকে উত্তরের আশায় তাকিয়ে রইলেন।

বন্ড মনে মনে চিন্তা করছে — ঐ হঠাৎ আছাড় খাওয়াটা ঘটেছিল মনে হয় ১৯৫৬ সালে হান্সেরির অভ্যুত্থানের সময় হাইংকেন তার দলবল নিয়ে বন্ডকে প্রায় ধরে ফেলোছিল, তাই চলন্ত আলবার্গ এক্সপ্রেস থেকে তাকে লাফ দিয়ে পড়তে হয়েছিল।

একটা ছাপানো ফর্মে মি. ওয়েন গভীরভাবে কয়েকটা লেখার ওপর টিকদাগ দিয়ে বললেন — “এক সপ্তাহ নিয়ম মার্কিন অল্প খাওয়া, রক্তশোত শুদ্ধ করার জন্য, শরীরটাকে ঠিক করার জন্য সামান্য দলাই-মলাই, ঠান্ডা-গরম জলে স্নান হচ্ছে হাড়ের চিকিৎসা এবং শিরদাঁড়ার জখমভাব সারাবার জন্য সামান্য ট্রাকশন। আপাতত আপনাকে সুস্থ করার জন্য এটাই যথেষ্ট। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ বিশ্রাম তো আছেই। আপনি একজন সরকারি চাকুরে। গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে বিশ্রাম নিলে আপনার উপকারই হবে। মি. ওয়েন উঠে কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বললেন — ‘আর আধঘন্টার মধ্যেই আপনার চিকিৎসা শুরু হয়ে যাবে।’

বন্দ কাগজটা লক্ষ করে বলল — ধন্যবাদ, ট্রাকশন জিনিসটা কী ?

‘ওটা শিরদাঁড়া ঠিকঠাক করার যন্ত্র। উপকার দেয়। অনেকে একে বলে মরণের বিছানা। এতে আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। কিছু কিছু লোক কত ভিত্ত হতে পারে।’

‘হ্যাঁ—’

সাদা রঙের করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসবার সময় বন্দ দেখতে পেল পাশের ঘর-গুলোর মধ্যে বেশ কিছু লোক কিছু পড়ছে, নীচু গলায় কথা বলছে — তাদের মধ্যে বেশির ভাগই বেচপ চেহারার গাউন পরা মহিলা। গরম হাওয়া ধুমসো মেয়েদের দেখে বন্দ হাঁপিয়ে উঠল। তাই তাড়াতাড়ি মেন গেটের কাছে এসে মুক্তবায়ু পেয়ে প্রাণ বাঁচল।

গাছপালার একটা মিষ্টি সোঁদা গন্ধ বন্দ প্রাণভরে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করছে যে, নিজের চাকরিটা বজায় রেখে এই বিদ্যুটে পাগলা গারদ থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। এই সময় একটা সাদা পোশাক পরা মেয়ে প্রায় ধাক্কা মেরে দিচ্ছিল বন্দকে। কোনো রকমে পাশ কাটিয়ে মিষ্টি হেসে চলে গেল। আর ঠিক তখনই ওই বাঁকের মুখে একটা মড্রঙের বেন্টলি গাড়ি এমন ভাবে এসে পড়ল যে বন্দ যদি নাচের ভঙ্গিতে মেয়েটা কে ধরে গাড়ির বনেটের ওপর তুলে না দিত তবে মেয়েটা নিশ্চয়ই গাড়ির তলায় যেত। মেয়েটিকে নামাতে নামাতে গাড়িটা পাশে এসে দাঁড়াল। তখনও কিন্তু বন্দের একটা হাতে মেয়েটার সুপুষ্ট নরম স্তনের ছোঁয়া লেগে রয়েছে।

খুব ভাবাচাকা খেয়ে গেছে মেয়েটা। বন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দমবন্ধ গলায় বন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিল। তারপর গাড়িটার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আর সেই সময় সেই গাড়ির ডাইভার নেমে এসে বললে — ‘খুবই দুঃখিত আমি। আশা করি আপনার সেরকম কোনো ক্ষতি হয়নি। বলাব পরই ভদ্রলোক মেয়েটিকে চিনতে পেরে বলল — ‘ও মাই ডিয়ার প্যাট্রেশিয়া। প্যাট কেমন আছ? আমার জন্য সব ঠিকঠাক আছে তো?’

গাড়ির ডাইভার অপূর্ব সুপুরুষ। এককথায় বলা যায় রমণী মনোরঞ্জক, সুন্দর একজোড়া গোলফের নীচে এমনই দুটো ঠোঁট, যেটা মেয়েরা স্বপ্নের মধ্যে চুমু খায়। চেহারা দেখে মনে হয়, হয় স্প্যানিশ বা আমেরিকান বন্দু দেহে বইছে। পুরো ছ’ফুট লম্বা। এক সুন্দর স্পোর্টসম্যানের মতো দেখতে। বন্দ তার দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারল এ একটি সুন্দর লম্পট। যখনই যে মেয়েকে সে কামনা করেছে, তাকেই পেয়েছে, এতে তাঁর রোজগারও মন্দ নয়।

নিজেকে সামলে নিয়ে মেয়েটি বেশ রাগান্বিতভাবেই বলল — ‘আপনার একটু সাবধানে গাড়ি চালানো উচিত কাউন্ট লিপ। আপনার জানা আছে এই রাস্তা দিয়ে রোগী আর কর্মীরা সবসময় যাতায়াত করছে।’ বন্দের দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে বললে — ‘এই ভদ্রলোক না থাকলে আজ তো আমি মরেই যেতাম। আর সামনের ওই সাইনবোর্ডের সতর্কবাণী কি আপনি দেখেননি?’

‘সত্যিই আমি খুবই দুঃখিত। প্যারিসে দু সপ্তাহ কাটাবার পর আমার মনে হল আমার চিকিৎসার দরকার, তাই মি. ওয়েনের কাছে তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে এই অঘটন। আমার বেশ দেরি হয়ে গেছে। যেন দয়া করে বন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন — ‘আমার ধন্যবাদ নেবেন। দেখলাম,

বিপদের সময় আপনার হাত পা অন্য সকলের চেয়ে একটু বেশি দ্রুত কাজ করে। আমি যাই। বলে সকলের দিকে হাত নেড়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন।

মেয়েটি বলল — আমার খুব দেরি হয়ে গেছে, আমি যাই। গাড়িটা যেরদিকে গেল, এরা দুজনে সেই দিকে হাঁটতে লাগল।

মেয়েটিকে ভালোভাবে দেখে বন্দ বললে — ‘তুমি কি এখানে কর্মচারী?’ মেয়েটি বললে সে এখানে গত তিন বছর কাছ করছে, বেশ ভালোই লাগছে। এখানে কতদিন থাকবে জেনে নিল। তারপর তারা এগোতে লাগল।

মেয়েটি যে খেলাধুলো করে তা তার চেহারা দেখে বন্দ সহজেই অনুমান করে নিল। মেয়েটি হয় টেনিস খেলে অথবা স্কেটিং করে। এর মুখশ্রী খুব যে একটা সুন্দর তা নয়। কিন্তু তার ঠোঁট জোড়া তার মুখকে খুব আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অন্য সকলের মতো এরও পরনে ধবধবে সাদা পোশাক। সেই পোশাক তাঁর সুউচ্চ বুক এবং পাছার খানা-খন্দ এতটাই প্রকট করে তুলেছে যে, এটা কষ্ট যে এর ভেতরেও এগুলোকে সযত্নে রক্ষা করছে অন্য পোশাক। এই রকম চেহারা বন্দের চিরকালের কাম্য।

বন্দ জানতে চাইল এখানে তার বোর করে কিনা বা অন্যসময় কী করে?

বন্দ যে আরও একটু এগোতে চাইছে মেয়েটি বুঝে বলল — ‘কাজকর্ম না থাকলে, আমার একটা ছোট্ট গাড়ি করে গ্রামের রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, আর হাঁটবার মতো বেশ কয়েকটা সুন্দর রাস্তা আছে।’ বন্দের প্রশ্নটা যে সে পছন্দ করেছে সেটা বোঝাতে খুব মিষ্টি একটা হাসি উপহার দিল আর তার মুখের দিকে একটু কটাফ্ফ করল। এরপর আবার শুরু করল — এখানে তো প্রায়ই নতুন নতুন গোগী আসে। বেশ মজার মজার লোকও তারা। ওই যে বাড়িওয়ালার কাউন্ট লিপকে দেখলেন, প্রতিবছরে এখানে আসেন। হংকং-এর কাছে বোধহয় ম্যাকাও-এ কীসের যেন একটা ব্যবসা আছে।

— হ্যাঁ হংকং-এর কাছেই হবে। বন্দ ভাবতে লাগল তাহলে ওই ভদ্রলোকের গায়ে চৈনিক রক্ত আছে, তাই ঐ রকম চোখ — আর যদি তার জন্মস্থান ম্যাকাও হয় তবে পর্তুগিজ রক্তও থাকতে পারে।

বাড়ির মেন গেটে এসে গরম হলঘরটায় ঢুকে মেয়েটি বললে — ‘আমি এবার দৌড়ই। আবার আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মনে হয়, এখানে আপনার ভালোই লাগবে।’ বলে মেয়েটা দৌড়ল। মেয়েটি হাসল বটে কিছু রিসেপশনিষ্ট মেয়েটা এদের এই ব্যাপারে নিরুত্তাপ দেখে সে তার হাসি বন্ধ করল। যতক্ষণ মেয়েটিকে দেখা গেল বন্দ ততক্ষণ একদৃষ্টে তার ভারী পাছার নাচন দেখতে লাগল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তে সে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

একতলার নীচেও আরও একটা তলা আছে যেখানে অনেক রকমের চিকিৎসা হয়। চারদিক সাদা রং-এ ঢাকা আর জীবাণুনাশক হালকা ওষুধের গন্ধ। ‘পুরুষদের চিকিৎসা ঘর’ দেখে বন্দ ঢুকতে একজন মালিশওয়ালার তাকে অভ্যর্থনা জনাল। বন্দ তার সব জামাকাপড় খুলে কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে মালিশওয়ালার সঙ্গে পাশের ঘরে চলে গেল।

লম্বা ঘরটা বহু ঘরে বিভক্ত হয়ে আছে প্লাস্টিকের ছোটো ছোটো পর্দায়। প্রথমটায় দেখা গেল বয়স্ক দুজন লোককে একটা বৈদ্যুতিক চাদর দিকে ঢেকে ঘামানো হচ্ছে। তাদের টাক তো ঘেমেইছে। মুখ দিয়ে পর্যন্ত গলগল করে ঘাম বের হচ্ছে। পরের ঘরে একটা অল্পবয়স্ক ভীষণ মোটা ছেলেকে এমনভাবে মালিশ করছে যে, ত্রাণ থলথলে দেহটা দেখে বন্দের মাথা ঘুরতে লাগল। তাড়াতাড়ি সে তার তোয়ালে খুলে পাশের টেবিলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। মালিশওয়ালার এত সুন্দর মালিশ করতে লাগল যে, এত সুন্দর মালিশ বন্দের জ্ঞানে নেই।

এমনভাবে মালিশ চলতে লাগল যে, বন্ডের স্নায়ু কনকন করছে। তন্তুগুলো ব্যথায় টনটন করছে। এর মাঝেই সে বেশ বুঝতে পাবল পাশের ঘরের সেই মোটা ছেলোটী হাঁ-হাঁ করে উঠে পড়ল। এরপর অন্য আর একজন এলে তাকে মালিশওয়ালা বললে — ‘স্যার আপনার হাতের ঘড়িটা যে খুলতে হবে।’

পাশের ঘরে যে কাউন্ট লিপ রয়েছে তার গলার স্বরে বন্ডের তা বুঝতে বাকি রইল না। সে বলছে — প্রতিবছরেই আমি এখানে আসি, প্রত্যেকবারই আমার হাতে ঘড়ি থাকে এবং এখনও থাকবে। অতএব তুমি কিছু মনে করো না।

মালিশওয়ালা বেশ ভদ্র অথচ বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলল — আমায় মাফ করবেন স্যার। আগেরবার নিশ্চয়ই অন্য মালিশওয়ালা ছিল। ঘড়ি থাকলে হাতের মালিশ হওয়ার সময় রক্তচলাচল ঠিকমতো হবে না। যদি কিছু মনে না করেন তো.....

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর বেশ বোঝা গেল কাউন্ট তার রাগ খুব জোর সামলে নিয়েছে। চিবিয়ে চিবিয়ে তাকে ঘড়িটা খুলে নিতে বললে — আর যেটা বলল না, সেটা বুঝে নেওয়া যায়। সেটা হচ্ছে, তুমি একটি শুরোর।

‘ধন্যবাদ স্যার’ — তারপর সেখানে মালিশ শুরু হল।

বন্ডের কাছে এই অতি সামান্য ঘটনাটা খুবই অদ্ভুত লাগল। মালিশের সময় তো হাতঘড়ি খুলে রাখাই উচিত। যন্ত্রো সব...।

‘একটু চিৎ হোন স্যার।’

চিৎ হল। এবার সে তার ডানদিকে চেয়ে দেখে কাউন্টের মুখটা উলটো দিকে ঘোরানো। তার বাঁ হাতটা টেবিল থেকে ঝোলানো। রোদে পোড়া হাতটার তামাটে রং যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে ঘড়ি পরার জায়গাটার চামড়া সাদা। অর্থাৎ কাউন্ট সর্বক্ষণ ঘড়ি পরে থাকে। আরো লক্ষ করল যে, যেখানটা ঘড়িটা থাকে — সেখানে উষ্ণি দিয়ে দুটো দাগ কাটা।

আ-চ্ছা-! তবে এই কাউন্ট চাইছিল না যে এই চিহ্নটা কেউ দেখুক। বন্ডের মাথায় খেলে গেল — তাকে গুপ্তচর বিভাগে গিয়ে কাগজপত্র খুঁজে দেখতে হবে যে, যারা এই হাতঘড়ির নীচে যে গুপ্ত-চিহ্ন বহন করছে তারা কে?

॥ তিন ॥

ঘন্টাখানেক ধরে বন্ডের শরীরটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলল মালিশওয়ালা চিকিৎসা করার নামে। তাকে মনে মনে গালাগাল দিয়ে বস্তু কোনোরকমে নিজের পোশাক পরে ওপরে উঠে এল। খুব দুর্বল লাগছে তার। বড়ো ঘরটায় ঢোকান মুখে টেলিফোনে দুটো খুপরি রয়েছে। তার একটাতে ঢুকে, সে বাইরে থেকে যে নম্বরে ফোন করা যায়, সেই নম্বরে তার সরকারি অফিসে চাইল। তার জানা আছে যে, এই রকমের বাইরের ডাক সদর দপ্তর থেকে আড়ি পেতে শোনা হয়। রেকর্ড-এর সেকশন চাওয়াতে টেলিফোনের আওয়াজে মালুম হল তার টেলিফোনে আড়ি পাতা হয়েছে। সে তার পরিচয় (০০৭) দিয়ে জিজ্ঞেস করল সে এমন এক ব্যক্তির বিষয় জানতে চায় যে খুব সুন্দর, প্রাচ্যের লোক, পর্তুগিজ রক্ত থাকলেও থাকতে পারে। মিনিট দেশেক পরে রেকর্ড সেকশনের চিফ তাকে ফোনে ডেকে বললে — এই চিহ্নটা একটা Tong চিহ্ন। এর নাম লাল বজ্রের 'Tong' চিনদেশীয় লোক ছাড়া এর সভ্য নেই। ধর্মীয় দল নয়। সম্পূর্ণ অপরাধীর দল। হংকং-এ যদিও এদের পাওয়া যায়, তবে ম্যাকাও-এ এদের আসল ঘাঁটি। আমাদের, সেকশন H প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলে পিকিং পর্যন্ত গুপ্তচর লাগিয়ে। এদের সঙ্গে এমনকি লড়াইতেও হয়েছিল তাদের। সেকশন H-এর ওপর মহলের দুজন এদেব হাতে মারা পর্যন্ত যায়। অবশ্য সমস্ত ঘটনাটাই

ঘাটেছে লুকোছাপার মধ্যে। পরে জানা গেল এদের যোগ রয়েছে Red land-এর সঙ্গে। শোনা গেছে, এরা বেআইনি মাদক দ্রব্য চালান করে। সোনার চোরাকারবারী আছে ভারতের সঙ্গে এমনকি দাস ব্যবসা পর্যন্ত এরা চালাচ্ছে। কোনো খবর পেলে জানাবে কাজে আসবে।

ধন্যবাদ দিয়ে বন্দ খললে -- 'আমি তো এই প্রথম 'লাল বজ্রের 'Tong'র নাম শুনলাম। কিছু খবর পেলে আপনাকে দেব। নমস্কার।'

চিন্তিত মনে ফোন নামিয়ে বেখে বাইরে বেবিয়ে এল। কিন্তু এ লোকটা শ্রাবল্যাণ্ডে কী করতে এসেছে? বেরিয়েই দেখে তার পাশের খুপরিতে তার দিকে পেছন করে কাউন্ট লিপ্ ফোন তুলেছে। তবে কি সে বন্ডের কথাবার্তা বা মস্তব্য শুনেছে। হঠাৎ বন্ডের পেটে বাথা অনুভব করল। যা সে সব সময়ই করে যখনই সে কোনো কাজ বোকামির মতো করে বসে।

বন্দ ঘড়িতে দেখল সাড়ে সাতটা বেজেছে। খাবার ঘরে গিয়ে দেখল খাবার দেওয়া হয়েছে। একটা বয়স্ক মহিলাকে নিজের নাম বললে সে কাগজ দেখে এক মগ শাকসবজির ঝোল দিল। বন্দ জিজ্ঞেস করে — 'এই কি সব খাবার?'

মহিলা রুক্ষকণ্ঠে বললে — 'কপাল ভালো তাই এটুকু পেয়েছেন। চিকিৎসাপদ্ধতি যখন পালটাতে তখন রোজ দুপুবে সামান্য শাক সবজির ঝোল আর বিকেল চারটের সময় দু কাপ চা, বাস।'

বন্ডের মুখটা তেতো হয়ে গেল। ওই মগটা নিয়ে এক কোণে বসে ষ্টিটা কোনো রকমে খেল এমন কি গাজারের শেষ টুকরোটা পর্যন্ত পান দিল না। তারপর আপন মনে নিজের ঘরে চলে এল। তার এখন একটাই চিন্তা -- খালি পেটের চিন্তা। সেখানে কাউন্ট লিপও নেই, আব তার ঘুমও নেই। সে দেখেছে তার চারপাশে এই রকম সব রোগীদের ভিড়। এখন সে তো তাদের দলেরই একজন।

এইভাবে দুদিন কাটার পব বন্দ আর কিছু সহ্য করতে পারছে না। তার চোখ হলদে হলদে লাগছে। জিব তেতো ঠেকছে, মাথা ধরছে। মালিশওয়ালো তাকে ভরসা দিয়ে বললে — 'কোনো ভয়ের কারণ নেই। শরীরের সমস্ত বিষাক্ত জিনিস বের হয়ে যাচ্ছে।' সে এতই দুর্বল বোধ করছে যে, তর্ক কবতে প্রবৃত্তি হল না। এখন তাব মাথায় কেবল একটাই চিন্তা। সেটা খাবার।

তার পরের দিন অর্থাৎ তৃতীয় দিনে বন্ডের মালিশ হয়ে যাবার পর তাকে হাড় মালিশ করার ঘরে পাঠানো হল। সে সেখানে গিয়ে একজন বিরাট যন্ডামার্কী লোককে আশা করেছিল। কিন্তু একী— বললে — 'মরেছে! এই সব কাজ তুমি করো নাকি?'

এই ধবনের কথা শোনা প্যাট্রেশিয়ার কাছে নতুন নয়, অতএব সে বেশ রাগতভাবেই বলল — 'শতকরা কুড়ি ভাগ মেয়ে এই ধবনের কাজ করে থাকে। যাক, আপনার প্যান্ট বাদে জামা ছেড়ে ফেলুন।'

মেয়েটির আদেশমতো বন্দ কাজ করল। বেশ মজা লাগছে। প্যাট্রেশিয়া তাকে দাঁড়াতে বলে তার চারপাশে ভালোভাবে ঘুরে বন্ডকে মুখ নীচু করে শুয়ে পড়তে বলল। সে তার পিঠের কাটার দাগ সম্পর্কে কিছু না বলে তার শক্ত আঙুল দিয়ে বন্ডের গ্রন্থিগুলো মুচড়ে মুচড়ে দিতে লাগল।

এটা পরিষ্কার হল বন্ডের কাছে যে মেয়েটা বেশ শক্তি ধরে। বন্ডের সূঠাম দেহের কাছে প্যাট্রেশিয়া কিছুই নয়। একটা সুন্দর মেয়ে আর একটা অর্ধ উলঙ্গ পুরুষ এভাবে থাকে কী করে? কাজের শেষে প্যাট্রেশিয়া বন্ডের হাত দুটো তার কাঁধে রেখে গলার পেছন দিকে মুঠি করতে বলল। হঠাৎ সে এমন একটা ঝাঁকুনি দিল যে বন্ডের শিরদাঁড়াগুলো নড়ে চড়ে ঠিক হল বোধহয়। তারপর তার হাত ছাড়তে বললে, বন্দ ছাড়ার বদলে তাকে বেশ জোরে সামনে বুকের ওপর টেনে এনে বেশ ভালো করে চুমু খেল। প্যাট্রেশিয়ার চোখদুটো জুলে উঠল।

বন্দ হেসে বলল -- 'ডাক্তার যদি হতে চাও, তবে তোমার এরকমের ঠোট থাকা উচিত নয়। আর এটা আমার না করে উপায়ও ছিল না।

বেশ রাগতভাবে প্যাট্রেশিয়া বললে — এরকম কাজ করার জন্য গতবার এক ভদ্রলোককে পরের ট্রেনেই চলে যেতে হয়েছিল।

'তা যদি হয়, তবে এসো, তোমায় আর একবার বেশ ভালো করে চুমু খেয়ে নিই।'

'থাক, আর না এগোনোই ভালো। চটপট নিজের জামা তুলে নিন। আপনাকে ট্রাকশন নিতে হবে মনে হয়। এতে আপনি খানিকটা চুপ থাকবেন।

বন্দ তাকে বললে — তবে তোমার ছুটির দিনে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে হবে।'

প্যাট্রেশিয়া বললে — যদি পরের চিকিৎসার দিন আপনি সিকমতো ব্যবহার করেন, তবেই দেখা যাবে।

দরজা খুলে দিল প্যাট্রেশিয়া। বন্দ বেরোতে গিয়ে ধাক্কা খেল কাউন্ট লিপ-এর সঙ্গে। সে সেটাকে কোনো আমল না দিয়ে সোজা প্যাট্রেশিয়ার কাছে গিয়ে বলল — এসে গেছে, তোমার মার গুরু করবে তো? আজ বোধ হয় তোমার জোর কমে গেছে।'

বেশ গম্ভীর ভাবে প্যাট্রেশিয়া বললে — 'নিজেকে তৈরি করে ফেলুন, আমি মিঃ বন্দকে তাঁর অন্য পরীক্ষার ঘরে দিয়ে এখনই আসছি।

বন্দকে নিয়ে বারান্দা দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

ঘরের চেহারা দেখে বন্দ ঘাবড়ে গেল। ছোট্ট ঘর নানারকমের যন্ত্রপাতিতে ভর্তি। একটা ডাক্তারি বিছানা রয়েছে। বিছানার তলায় একটা ইলেকট্রিক মোটর লাগানো রয়েছে। কতকগুলো ডান্ডা রয়েছে আর তার সঙ্গে বাঁধবার জিনিসও রয়েছে। আবার সামনে রক্তচাপ মাপার একটা যন্ত্রও রয়েছে।

প্যাট্রেশিয়া চামড়ার বাঁধার জিনিসগুলো খুলে বন্দকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বললে।

বন্দ রেগে গিয়ে বললে — এটা কি জিনিস না বোঝা পর্যন্ত আমি শোব না।

প্যাট্রেশিয়া বন্দকে শাস্ত করার জন্য বললে — 'ভয় পাবাব কিছু নয়। আপনার শিরদাঁড়'র কিছু গণ্ডগোল আছে সেগুলোকে এটার দ্বারা ঠিক করা হবে। আপনি বেশ ঠান্ডা অনুভব করবেন। অন্য রোগীরা তো ঘুমিয়েই পড়ে।

বন্দ কঠোরভাবে বললে — এ রোগীটি কিন্তু ঘুমোবে না। কতটা জোরে আমায় মারবে, কতটা ছিঁড়বে আমায়, সেটা বলতে হবে। আর ওই লাল লাল লেখাগুলো কী?

প্যাট্রেশিয়া বললে — দেখুন সেরকম জোরে দিলে আপনি সতিাই ছিঁড়ে যাবেন। তবে আমি আপনাকে খুব কমই দেব।

খুবই অনিচ্ছা নিয়ে বন্দ শুয়ে পড়ে বলল — 'আমি মরে গেলে তোমার নামে কেস করব।'

প্যাট্রেশিয়া বন্ধনীগুলো বন্ডের হাতে, বুক, পায়ে বেঁধে দিয়ে একটা সুইচ টিপে দিলে মোটরটা আওয়াজ করে চলতে শুরু করল। আর সেই চামড়ার বন্ধনীগুলো কখনও বন্দকে চেপে ধরছে আবার ছেড়েও দিচ্ছে। মন্দ লাগছে না।

প্যাট্রেশিয়া বললে — কী খারাপ লাগছে?

বন্দ --- না সে রকম কিছু নয়।

বন্দ বুঝল প্যাট্রেশিয়া দরজা খুলে চলে গেল এবং দরজা বন্ধও করে দিল। সেই বন্ধনীগুলো বন্দকে আন্তে আন্তে চাপ দিচ্ছে আবার আলগা দিচ্ছে। বন্ডের বেশ ভালোই লাগছে। মিছিমিছি মেয়েটার ওপর রাগ করল ভয় পেয়ে।

প্যাট্রেশিয়া মিনিট পনেরো পরে ঘরে ঢুকে বললে — কেমন লাগছে?

বন্দ আনন্দ সহকারে বলল — সুন্দর।

যন্ত্রগুলোতে আরও কি সব করাত যন্ত্রের আওয়াজ বেড়ে গেল। সে তার মুখ নামিয়ে এনে বললে -- আর মাত্র পনেরো মিনিট।

ঠিক আছে।

আবার দরজা বন্ধ হল। যন্ত্রের টানা-ছাড়ার ছন্দে বন্দ শান্ত হয়ে শুয়ে গেল।

মাত্র পাঁচ মিনিট হয়েছে, সামান্য হাওয়ায় বন্দ চোখ খুলে দেখল একটা হাত যন্ত্রের সুইচের ওপর পড়ল। যন্ত্রের গতি বেড়ে গেল। চিৎকার করতে গিয়েও পারল না। প্রচণ্ড ব্যথায় তার শরীর মুড়ে গেল। তার মাথাটা নুয়ে পড়ল। হাতটা সরে গেল। হাতের কজ্জিতে সেই উল্কি-আঁকা সংকেত রয়েছে।

পবক্ষণেই একটা গলার আওয়াজ সে পেল ওহে বীর আর আমার সঙ্গে লাগার চেষ্টা করো না। মনে থাকে যেন।

লোকটা চলে গেল। বন্দ যন্ত্রণায় চিৎকার করতে গিয়েও পারল না। ছটফট করতে করতে চারধার অন্ধকার হয়ে গেল।

॥ চার ॥

আঘাত মানুষের শরীরে চিরস্থায়ী হয় না। আঘাত এলে সে যেমন মস্তিষ্কে তাড়াতাড়ি যায় তেমনি চলেও যায় তাড়াতাড়ি। কোনো সুখকর জিনিস চিন্তা করতে আমাদের ভালো লাগে। কিন্তু আঘাতটা কতটা, কী বকম, তা মনে থাকে না। বন্দ শুয়ে শুয়ে তাই চিন্তা করছিল। এখন তার সেই অমানুষিক যন্ত্রণার কিছুই নেই। কিন্তু তার শিরদাঁড়া অসহ্য যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হয়ে আছে।

কতকগুলো গলার আশ্বে আশ্বে আওয়াজ শোনা গেল। বন্দ বুঝতে পারল যে, মিঃ ওয়েন আর প্যাট্রিশিয়া কথা বলছে- -

- একটা কিছু যে গণ্ডগোল হয়েছে তা তুমি কি করে বুঝলে প্যাট্রিশিয়া?

- বুঝলাম ঐ ট্রাকশন মেশিনটার অত জোর আওয়াজ শুনে যা আজ পর্যন্ত কোনোদিন শুনিনি। আমি অন্য কাজ করছিলাম। মনে হল বোধহয় দরজা খোলা। তবু সন্দেহ হওয়াতে দেখতে গিয়ে দেখি সাংঘাতিক ব্যাপার। ইন্ডিকেটর-এ ২০০র দাগ পড়েছে। কোনো Lever-টা টেনে নামিয়ে ভদ্রলোকের গায়ের বাঁধনগুলো খুলে দিয়ে ভদ্রলোকের শিরায় একটা কোরামিন ইনজেকশন দিয়ে দিই। দেখি নাড়ি প্রচণ্ড দুর্বল। তারপর আপনাকে ফোনে খবর দিই।

'তুমি খুব ঠিক ঠিক কাজ করেছ। আর এই অর্ধটনটার জন্য তোমার কোনো দোষ নেই।'

'দেখো, এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। আর আমার মনে হয়, ভদ্রলোক বোধহয় যন্ত্রের lever-টার ওপর নিজের কেরামতি দেখাতে গিয়েছিলেন। যাই হোক, এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আমাদের আরও সাবধান হতে হবে। ভদ্রলোকের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারত।'

M বন্ডের নাড়ি পরীক্ষা করল। তার মাথাটা কেমন তালগোল পাকাচ্ছিল। সে এখান থেকে বেরোবার পর সোজা প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে বলবে M একটা বন্ধপাগল, তাকে এখনই সংযত করতে না পারলে দেশের প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। এরপর বন্ডের চিন্তা খেই হারিয়ে ফেলল। তার চোখের সামনে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে কাউন্ট লিপ-এর কজ্জিতে উল্কি-আঁকা, প্যাট্রিশিয়ার সুন্দর ঠোঁট আর পাছ। সব শেষে সেই শাকের ঝোল। বন্ডের মনে হচ্ছে সে বোধহয় তার জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে চলেছে। শেষ মুহূর্তে M-এর কয়েকটা আবছা কথা তার কানে গেল যেমন ভদ্রলোকের হাড়গোড় ভাঙেনি। কিছু জায়গায় ছড়ে গেছে। এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমায় দেওয়া হল। তুমিই এঁর সেবা-শুশ্রূষা এবং দেখভাল করবে। এঁর এখন প্রয়োজন সম্পূর্ণ বিশ্রাম। উদ্ভাপ বার এফুরেজ। বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই?'

আস্তে আস্তে বন্ডের জ্ঞান ফিরছে। সে বুঝতে পারছে যে, সে উপড় হয়ে বিছানায় শুয়ে। শরীরের নীচে গরম বৈদ্যুতিক চাদর আর ওপরে Sun Lamp-এর জোরালো আলো দিয়ে তার শরীর গরম করার চেষ্টা চলছে। আর আরও বুঝল যে, দুটি নরম হাত তার ঘাড় থেকে হাঁটু পর্যন্ত বেশ সুন্দর ভাবে অদ্ভুত কায়দায় মালিশ করে যাচ্ছে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। এত ভালো লাগছে যে বলার নয়।

তদ্রাচ্ছন্ন গলায় বললে — এরই নাম বোধ হয় এফুরেজ?

প্যাট্রেশিয়া বেশ মিষ্টি করে বললে — আমার ধারণা ঠিকই হয়েছে যে, এইবার আপনার জ্ঞান ফিরবে। হঠাৎ আপনার শরীরের রংটা কীরকম বদলে গেল যেন। কী রকম বোধ হচ্ছে?

অপূর্ব, তবে আরও অপূর্ব হত যদি এখন একটা বরফ দেওয়া ডবল হুইস্কি পাওয়া যেত।

হাসি হাসি মুখে প্যাট্রেশিয়া বললে — মি. ওয়েনের প্রেসক্রিপশন হচ্ছে এখন আপনার জন্য এক কাপ হালকা চা। তবে আমি বুঝছি যে আপনার আর একটু গরম কিছু খাওয়া দরকার, তাই খানিকটা ব্রান্ডি এনেছি। আর বরফ আছে প্রচুর। খেতে পারেন। আপনার পাশে আপনার ড্রেসিং গাউনটা নিয়ে উঠে পরে নিন। আমি অন্যদিকে ফিরছি।'

বন্ড সাবধানে উঠে ড্রেসিং গাউনটা পরে নিল। তার শরীরে এখনও আড়ষ্টভাব যথেষ্ট রয়েছে, তবে ব্যথা কম। তারপর পা ঝুলিয়ে বসল।

তার সামনে এসে দাঁড়াল শুভ্র, সুন্দর এবং লোভনীয় একটা মূর্তি — প্যাট্রেশিয়া। ব্রান্ডির ভর্তি গেলাসটা এগিয়ে দিয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গ্লাসে বরফের টুংটাং আওয়াজ বন্ডের মনেও আর একটা আওয়াজ তুলল — মেয়েটা সত্যিই সুন্দর। একে যদি বিয়ে করি তবে এ আমায় সারাদিন ধরে এফুরেজ করার পর এরকম গেলাস আমার দিকে বাড়িয়ে দেবে। দিনগুলো মন্দ কাটবে না। বন্ড তার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল এবং খালি গেলাসটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে — আর একটা হবে?

বন্ড ভালো হয়ে ওঠায় প্যাট্রেশিয়া বেশ স্বস্তি বোধ করল। হেসে বলল — 'মনে থাকে যেন আর একটা।' বলে গ্লাসটা হাত থেকে নিয়ে যেতে গিয়েও ফিরে তার সামনে এসে বলল -- 'আব মনে রাখবেন যে আপনি এটা খালি পেটে খাচ্ছেন। হ্যাঁ, আর একটা কথা, এবার বলুন তো আপনি কি Lever-টা ধরে টেনেছিলেন? এরকম তো এর আগে কখনও দেখিনি। আমরা খুব ভয় পেয়ে গেছি।'

আসল ব্যাপারটা বন্ড চেপে গেল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললে — তোমার আন্দাজ ঠিকই। আমি একটু নড়েচড়ে ভালোভাবে গুতে গিয়ে হাতটা যেই সরিয়েছি, অমনি কী একটা শক্ত জিনিসের সঙ্গে হাতটার ধাক্কা লাগল। বোধহয় Lever-টা। ব্যাস, তারপর আর কিছু মনে নেই। ভগবান রক্ষে করেছেন, তোমায় পাঠিয়ে দিয়ে।

আবার একটা গেলাস ভর্তি করে প্যাট্রেশিয়া ওর দিকে এগিয়ে দিল -- দেখুন, যা হবার হয়েছে, ভগবানের কৃপায় আপনার তেমন কিছু হয়নি। দু-একদিনের মধ্যে আপনার ছুটি হয়ে যাবে।

একটু থেমে তারপর বেশ কাঁচুমাচু মুখে বললে — দেখুন এ ব্যাপারটা যেন বাইরে প্রকাশ করবেন না। তাহলে অন্য রুগিরা খুব ভয় পেয়ে যাবে।

সত্যি খবরটা বাইরে যদি একবার প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে বন্ড যেন চোখের সামনে দেখল যে, খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো হবফে ছাপা হয়েছে — 'প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়ে ভয়াবহ কাণ্ড -- যান্ত্রিক গোলযোগে রোগীর ছিন্ন ভিন্ন দেহ।'

- না, না, ভয়ের সেরকম কোনো কারণ নেই। আমি কথাটা আমার মধ্যেই রাখব। কারণ আমিই তো আসল দোষী।' গেলাসটা শেষ করে বন্ড আস্তে আস্তে বিছানায় গুয়ে পড়ে বললে — 'বড়ো ভালো লাগল। তবে আর একবার এ্যাঙ্কুরেজ হলে আরও ভালো হত। হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমায় তুমি কি বিয়ে করবে? আমি আজ পর্যন্ত যত মেয়ে দেখেছি তাতে তোমাকেই দেখলাম যে, তুমি একটা পুরুষকে ঠিকমতো চালনা করতে পার।

প্যাট্রিশিয়া হেসে ফেলে বলল -- বড়ো ফাজিল হয়েছেন, পরে ফাজলামো হবে। এখন উপড় হোন তো, আপনার পিঠে মালিশের প্রয়োজন।

কী করে বুঝলে?

* * *

এই ভাবে দুদিন কাটলো। প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়ের সেই বিমধবা পরিবেশে বন্ড রয়েছে। সেই কটিন মাফিক গেলাস ভর্তি গরম জল, শাকের ঝোল। আর এক ফালি কমলালেবু (কমলালেবুও ফালি করে কাটা হয় এখানে)। তারপর মালিশ তো আছে। তবে বন্ড রোজ পায়ে হেঁটে অবশ্য যতটা তার পক্ষে সম্ভব তা না হলে বাসে করে রোজ চায়ের দোকানে গিয়ে বাসে বেশ বেশি করে চিনি দিয়ে আরাম করে খাওয়া। আব আজ তিন কাপ চা তার কাছে আধ বোতল শ্যাম্পেনের সমতুল শক্তিশালী আর আরামদায়ক।

এই অখাদ্য চিকিৎসা যদিও তাকে আরও দুর্বল কবে তুলেছিল -- তুবুও বন্ডেব মনে তিনটি জিনিসের আশা ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। এক নম্বর একটা বেশ বড়ো প্লেটে সুন্দর করে রান্না করা স্প্যাগেটি (Spaghetti)-এব সঙ্গে এক বোতল কিয়াস্তী (Chianti)। দু নম্বর অবশ্যই প্যাট্রিশিয়ার দুর্দান্ত শরীর। আব তিন নম্বর হচ্ছে কাউন্ট লিপকে তার যোগ্য প্রতিদান দেওয়া।

মনের মতো খাওয়া আর প্যাট্রিশিয়া — এ দুটো পরে হলেও কাউন্ট লিপ-এর হিসেবটা তাকে আগে নিতে বা করতে হবে। বন্ড একটু সুস্থ হওয়া থেকেই সে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেছে।

বন্ড, প্যাট্রিশিয়া ও মালিশওয়ালাদের সঙ্গে গুপ্তচরসুলভ ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলে কাউন্ট লিপ-এর সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি খবর জোগাড় করল। কাউন্ট একদিকে এই চিকিৎসালয়ের বাইবে থাকার সুযোগে বন্ড তার ঘরের তালা খুলে ঘরটা ভালো করে পরীক্ষা করে কিছুই পেল না। তবে কাউন্টের মোজা, টাই, ব্লেড প্রভৃতি কিছু নিত্যব্যবহার্য জিনিস থেকে এটাই বুঝতে পারল যে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তার আনাগোনা আছে।

বন্ড তার সদর দপ্তরকে, কাউন্ট লিপের তার ওপর কার্যকলাপের বিষয় কিছুই জানায়নি। শ্রাবল্যান্ডের সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে একটা হাসিবি ব্যাপার। ইংল্যান্ডের গুপ্তচর বিভাগের একটি অমূল্য রত্ন হচ্ছে জেমস বন্ড। আর সে কিনা এখানে গরম জল আর সবজির ঝোল খেয়ে চলেছে। তাকে একটা তক্তায় হাত-পা বেঁধে রাখা হল — আর একটা লোক কোথা থেকে এসে Leverটার গতি বাড়িয়ে তাকে মেরে ফেলাব চেষ্টা করা হয়। নেহাত ভাগ্যের জোরে সে বেঁচে যায়।

নো, নো। কাউন্ট লিপ-এর বিষয় কিছুই সে তার সদর দপ্তরকে জানাবে না, যা করার সে নিজেই করবে। বন্ড কাউন্ট সম্পর্কে একটা খবর জোগাড় করল যে কাউন্ট তার কোমর সর রাখার ওপব বিশেষ নজর দেয়। তার জন্যে সে শ্রাবল্যান্ডে রোজ একই সময়ে একটা টার্কিশ-বাথ নেয়। এইটাকে বন্ড নির্দিষ্ট করে তার সবকিছু প্লান ঠিক করল আর তার সময় হল এই শ্রাবল্যান্ডে বন্ডের থাকার শেষ দিন।

বন্ড সেদিন শেষবারের মতো মি ওয়েনের সঙ্গে দেখা করল। বন্ডের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তিনি

খুব খুশি হয়েছেন। বন্ডের রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়েছে। ওজন প্রায় দশ পাউন্ড কমেছে। আব অন্য টুকটাকি যা ত্রুটি ছিল সব সেরে গেছে।

বন্ড একতলায় নেমে এল, যখন তখন সকাল দশটা, তার শেষ মালিশ নেওয়ার জন্য। সে সেই ঘরে ঢুকে দেখল অন্য দিনের মতো ঘর ভর্তি। নিজেরা টেবিলে উপুড় হয়ে গুয়ে পড়ে অপেক্ষা করতে লাগল তার কাঙ্ক্ষিত লোকটির আগমনের জন্য। সেই সময়টা এল যখন দরজা খোলা, বন্ধ আর ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল কাউন্ট লিপ প্রবেশ করলেন। বেশ ভরাট গলায় প্রধান পরিচারক বেরেস ফোর্ডকে উদ্দেশ্য করে বললেন — ‘ওড মর্নিং বেরেস ফোর্ড। আজ আমায় আবও তিন পাউন্ড ওজন কমাতে হবে। অতএব সব ঠিকঠাক আছে তো? আর আজকের চান করাটা যেন বেশ ভালো রকমের গরমা-গরম হয়। ঠিক হয়।’

সে উত্তর দিল — ‘সব বেডি স্যার।’

বন্ড খেয়াল করল যে বেরেস ফোর্ডের পায়ে জুতো পরে এবং লিপ-এর খালি পায়ে হেঁটে চানঘরের দিকে যাওয়া। দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়া। বেরেস ফোর্ড লিপকে ঘরে ঢুকিয়ে বেরিয়ে এল।

বন্ডের হিসেব চলতে লাগল। কুড়ি মিনিট কাটল। আরও পাঁচ মিনিট পর বন্ড টেবিল থেকে উঠে তার মালিশওয়ালাকে বলল — স্যার খুব সুন্দর মালিশ হয়েছে। আজই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। প্রয়োজন হলে আবার আসব। তুমি এখন তোমার লাঞ্চে যেতে পার। আমি ধীরে সুস্থে প্রস্তুত হয়ে তারপর যাব।

এই এক সপ্তাহে বন্ড মালিশওয়ালাদের কাজের তালিকা খেয়াল করেছে যে, তাদের লাঞ্চার সময়ের কয়েক মিনিট আগেই তারা কাজ শেষ করে পালায়। তাই স্যাম বন্ডের কথায় আর দ্বিধা না করে ক্যান্টিনের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। একে একে অন্য মালিশওয়ালারাও চলে গেল। মালিশঘর ক্রমে খালি হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে বেরেস ফোর্ডের চিৎকার শোনা গেল — টেড, টেড, কোথায়? টার্কিশ-বাথ কাউন্টের কাছে থাকতে হবে। ধুৎ, সাড়া নেই। স্যাম, স্যাম আছো নাকি?

বন্ড এই সুযোগ নিল। স্যামের মোটা গলা নকল করে বললে — ‘ঠিক আছে স্যার।’ ব্যস তারপর বেরেস ফোর্ডের চলে যাওয়ার আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ড ঘুরে দাঁড়াল। এখন শুধু কাউন্ট লিপ আর জেমস বন্ড।

এই টার্কিশ বাথ ঘরটাকে জানার জন্য বন্ডকে একদিন টার্কিশ বাথ নিতে হয়। ঘরটা চারদিক বন্ধ করে দেওয়া একটা বাক্স। কেবল ওপর দিকে একটা বড়ো গর্ত। বাক্সের ডালা খুলে রোগীকে তার মধ্যে বসিয়ে ওই গর্ত দিয়ে মাথাটা বাইরে রেখে ডালাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওই বাক্সের মধ্যে অজস্র ইলেকট্রিক বাস্ক আছে। সেগুলি দিয়ে রোগীর গায়ের ঘাম বারানো হয়। যাব যেমন দরকার সে রকম উত্তাপ দেওয়া হয়। প্রয়োজনমতো কমবেশি করা হয়, একটা মিটারের সাহায্যে।

বন্ড খুব ধীরে সুইচটা ওপর দিকে বেশ খানিকটা ঘুরিয়ে দিল।

বন্ডকে কাউন্ট লিপ দেখতে পাচ্ছে না। সুইচ ঘোরানোর ফলে গরম অত্যধিক বেড়ে গেছে। কাউন্ট লিপ চিৎকার করছে — এ্যাই বেরেস ফোর্ড! ব্যাপার কী? আমার অবস্থা যে খারাপ হয়ে গেল। শুয়োরের মতো ঘামতে শুরু করেছি। আমায় বেরোতে সাহায্য করো।

এবারে বন্ড বেরেস ফোর্ডের গলা নকল করে শান্তভাবে বলল — আপনি যে স্যার একটু বেশি গরম চাইছিলেন?

বেশি বকর-বকর না করে আমায় বেরোতে সাহায্য করো।

‘আমার মনে হয় আপনি এই উত্তাপ চিকিৎসার উপকারিতা জানেন না। এই উত্তাপের ফলে

আপনার রক্তস্রোত এবং পেশির শিরা উপশিরার সমস্ত বিয়কে নষ্ট করে দেবে। আপনার বস্তুর যেরকম নোংরা তাতে এই উদ্ভাপ খুবই প্রয়োজনীয়।

এই সমস্ত কথাগুলো বন্ডের মুখ দিয়ে পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে এল। সে জানে এতে বেরেস ফোর্ডের কোনো ক্ষতি হবে না কারণ, সে যে ক্যান্টিনে গেছে। তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

‘তোমার লেকচার থামাবে না কি? আমায় শীঘ্র বেরোতে দাও।’

যন্ত্রের ডায়ালে ২০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত আছে। এতটা গরম লোকটা সহ্য করতে পারবে না। বর্তমানে ১২০ ডিগ্রি রয়েছে। ২০০-তে তুললে জীবন্ত সেক্স হয়ে যাবে। বন্ড ওকে একটু বেশি রকম শাস্তি দেওয়ার জন্য ডায়ালটা ঘুরিয়ে ১৮০ ডিগ্রি করে দিল। তারপর বলল ‘এই রকম গরমে আর মাত্র আধ ঘন্টা থাকলে আপনার খুব উপকার হবে স্যার।’ পরমুহূর্তেই তার নিজস্ব গলার স্বরে কঠোরভাবে বললে — এরপর যদি গায়ে আপনার আগুন লেগেও যায়। আপনি আমার নামে মামলা করতে পারবেন।

বন্ডের গলার স্বর শুনে কাউন্ট তার ভেজা মাথাটা ঘোরাবার চেষ্টা করেও পারল না। বিকট চিৎকার করার চেষ্টা করেও পারল না। সে পুরো ঘটনাটা বুঝতে পেরে তার রাগ ও ঘৃণা চেপে রেখে বলল — ‘তুমি ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও। পরিবর্তে তোমায় হাজার পাউন্ড দেব। কাউন্ট শুনতে পেল দরজা খোলার আওয়াজ — চিৎকার করল — ‘দশ হাজার — না-হয় পঞ্চাশ দেব..।’

বাইরে বেরিয়ে এসে ভালো করে দরজা বন্ধ করে দিল বন্ড। তাড়াতাড়ি নিজের জামা-কাপড় পরে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। কাউন্টের প্রথম দম আটকানোর আওয়াজ বন্ডের কানে গেল। বন্ড এই ভেবে স্বস্তি পেল যে, সে খুব একটা অনায়ে কাজ করেনি। দিন সাতেক হাসপাতালে মলম লাগিয়ে পড়ে থাকলে সব সেরে যাবে। বন্ড বুঝল যে, যে লোক এক কথায় পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ঘুষ দিতে পারে তাব নিশ্চয় খুব পয়সা আছে। খুব ধনী। তার সুস্থ হয়ে থাকার আকাঙ্ক্ষা বা দরকার খুব বেশি। না হলে শুধু যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পঞ্চাশ হাজার খরচ করে.... ?

* * *

আন্দাজ জেমস বন্ডের ডুল ছিল না। শ্রাবলাবন্ডের এই অদ্ভুত পরিবেশে তার দুর্দান্ত ছেলেখেলার বিবাদ বন্ডের অজান্তেই ধাক্কা মারল একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের সাজানো সময়-ব্যবস্থাকে। যেটা কয়েকদিন পরেই পাশ্চাত্য জগতের গোড়ায় গিয়ে হানা দিল।

॥ পাঁচ ॥

প্যারিসের লম্বা একটা রাস্তার নাম বুলেভার্দ হাউসম্যান। এই রাস্তাটা প্যারিসের সব চেয়ে সুগঠিত পথ। এই পথের দুধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে অতীতের ঐতিহ্য বহন করে সেকলে বাড়ি। এইসব বাড়িগুলো হচ্ছে হয়তো কোনো বড়ো কোম্পানির হেড অফিস, গোটা কয়েক গির্জা, ছোট্ট একটা মিউজিয়াম — এই রকম আরও অনেক কিছু। বেশ কিছুটা এগোলে একটা বাড়ির সদর দরজার গায়ে পেতলের ফলকে লেখা রয়েছে ‘FIRCO’। কয়েকটা ফরাসি শব্দের প্রথম অক্ষর নিয়ে এটা লেখা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানতে যদি কেউ আগ্রহী হয় তবে ঐ পেতলের ফলকের পাশে কলিং টিপলেই একজন লোক এসে সাদরে সম্ভাষণ জানিয়ে ভেতরে নিয়ে যাবে। ভেতর থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেরিয়ে আসার পর প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান আহরণ না হলেও এটা বুঝতে পারবেন যে, এঁদের সব হাই-ফাই ব্যাপার।

* * *

বন্ড প্রাকৃতিক চিকিৎসালয় থেকে ছাড়া পাওয়ার দুদিন পরে যেদিন প্যাট্রিশিয়াকে নিয়ে

মনের সাধ মিটিয়ে স্প্যাঘেটি আর কিয়ান্তী খেল একটি সুন্দর মধুর সন্ধ্যায়। তার ঠিক আগের দিন রাত সাতটার সময় 'FIRCO'-তে হেড অফিসে কয়েকজন ট্রাস্টিকে খুব জরুরি একটা মিটিং-এ ডেকে পাঠানো হল। তাঁরা এলেন কেউ গাড়ি, ট্রেন বা প্লেনে। প্রত্যেককে এক একটা সময় ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল সঠিক দরজা দিয়ে ভেতরে আসার জন্য। নিশ্চিত নিরাপত্তা ছিল দরজায়। যেমন — এমার্জেন্সি বেল, টেলিভিশন। যার দ্বারা আগন্তুককে তার অজান্তে নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া।

দেখা গেল ঘড়িতে সাতটা বাজল আর প্রতিষ্ঠানের কুড়িজন লোক ওই বাড়িটার চারতলার একটা সুসজ্জিত ঘরে নিজের নিজের আসনে উপবিষ্ট। এঁদের পরিচয় এখানে সংখ্যাভিত্তিক। সভাপতি সকলের আগেই উপস্থিত। অতএব মোট একশ জন। তাঁদের পরিচয় ১ থেকে ২১ সংখ্যায়। নিরাপত্তার কারণে প্রতি মাসের প্রথম দিনে এদের প্রত্যেকের সংখ্যা দু-সংখ্যা এগিয়ে যায়। অতএব সভাপতির সংখ্যা এখন দুই। নিজেদের মধ্যে কোনো রকম অভিবাদন বা ধন্যবাদ জানানোর মতো অপ্রয়োজনীয় কাজ সভাপতি বাতিল করে দিয়েছেন। সেগুলো তাঁর পছন্দের বাইরে। এখানে ধূমপান বা মদের ব্যবহারও নিষিদ্ধ। প্রত্যেকের সামনে মিটিং-এর কর্ম-তালিকা যদিও রয়েছে, কেউ সে দিকে নজর দিচ্ছে না। কারণ সবাই জানেন, আজকের মিটিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ যার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সবাই উৎসুক হয়ে চেয়ে রয়েছেন সভাপতির মুখের দিকে তাঁর বক্তব্যের জন্য।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অসামান্য আকর্ষণী শক্তি, অদ্ভুত নির্লিপ্ততা এবং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আছে এমন লোক পৃথিবীতে আছেন, যাঁদের কোনো লোক তার জীবনে হয়তো একজনকেই দেখেছে। তাঁরা বছর মধ্যে থেকেও সকলের দৃষ্টি সম্মোহিতের মতো তাঁর দিকেই টেনে রাখবেন। ইতিহাসেব পাতায় যাঁরা নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন সেই চেস্টিস খাঁ, আলেকজান্ডার বা নেপোলিয়ন এই বিশেষত্বের জোরেই সকলের থেকে নিজেদের আলাদা কবতে পেরেছেন। মহামান্য ফার, হিটলার ইউরোপের শ্রেষ্ঠ আট কোটি মানুষকে যে বশ করেছিলেন, তা তো এই গুণের বলেই।

আজকের সভাপতি হচ্ছেন সেই শ্রেণিব, সেই বিশিষ্ট শ্রেণির মানুষ। হঠাৎ যদি কেউ রাস্তায় অন্য পাঁচজনের মধ্যে একে দেখেন, তখন স্বাভাবিক কারণেই তার মাথা সন্ত্রমে নুয়ে আসবে। কিন্তু আজকের মিটিং-এর উপস্থিত লোকের চোখে শুধু সন্ত্রমই নেই আছে অবিচল বিশ্বাস। এর একমাত্র কারণ ইনিই যে এঁদের সকলের প্রধান সেনাপতি — যাঁর ক্ষমতার কোনো শেষ নেই।

ইনি হচ্ছেন আর্নস্ট হ্লাভো ব্রোফেন্ড। জন্ম পোলান্ডের এক গ্রামে ১৯০৮ সালে। পিতা পোলিশ আর মা গ্রিক। ম্যাট্রিক পাস করে ওয়ারশ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করলেন। পরে পোলান্ডের ডাক ও তার বিভাগে চাকরি নিলেন। এইরকম লোকের মধ্যে এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। ব্রোফেন্ড এইটুকুই সার বঝেছিলেন যে পৃথিবীতে যে যত বড়ো শক্তিশালী, তার আদান-প্রদান, অর্থাৎ সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত ধরনের। দুজন লোকের মধ্যে যে জন আগে খবর নিয়ে আসতে পারবে তারই সুবিধে অনেক। পৃথিবীর সমস্ত বিকট ঘটনার মূলে এই কাজ।

ব্রোফেন্ড তাঁর এই পরিকল্পনটাকে কাজে লাগাবার সুযোগ খুঁজছিলেন। সেটা পেয়েও গেলেন যখন জার্মানি, পোলান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছিল। তাঁর হাত দিয়ে প্রয়োজনীয় জরুরি টেলিগ্রাম যেত আসত। সেগুলোর মূল্য তাঁর কাছে কিছু না থাকলেও শত্রুপক্ষের কাছে তা অতীব মূল্যবান। তাই তিনি সেইগুলির কপি জোগাড় করতে লাগলেন। বিশেষ যেগুলির ওপর 'অত্যন্ত জরুরি' অথবা 'অত্যন্ত গোপনীয়' লেখা থাকত, সেগুলির ওপর তাঁর নজর বেশি থাকত। এই ভাবে তিনি একটি জাল-গুপ্তচর দলের সৃষ্টি করলেন।

এই সব চিঠি বা টেলিগ্রাম আনত বিভিন্ন দূতাবাস বা অম্বাগারের বড়োকর্তাদের নামে। আর সেগুলো খোলার বা দেখার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল তাদের সেক্রেটারি বা অ্যাসিস্ট্যান্টদের। ব্রোফেল্ড তাঁর বুদ্ধির কৌশলে সেই সব সেক্রেটারি এবং অ্যাসিস্ট্যান্টদের নামধাম জোগাড় করল। এগুলো পরে কাজে লাগাবে।

এইসব ব্রোফেল্ড একটু ঘোরা পথে কয়েকটা গুপ্ত সংবাদ জার্মান রাষ্ট্রদূতের কাজে পাঠাল। সেই সংবাদের গুরুত্ব তিনি বুঝে এই ধরনের সংবাদ পাঠাবার পাকা বন্দোবস্ত করলেন ব্রোফেল্ড-এর সঙ্গে। এতে তাঁর কাজ করা সুবিধে হয়ে গেল।

তাঁর হাতে এবার মোটা অঙ্কের টাকা আসতে লাগল এইসব গুপ্ত সংবাদ পাচার করার জন্য। এরপর শুরু হল টাকার অঙ্ক বাড়াবার পালা। তিনি তাদের জানালেন যে অঙ্কে তার নামে একটা গুপ্তচর সংস্থা চালাতে হয়। তখন তিনি আগের সেই নামের তালিকা তাঁদের দেখিয়ে বলেন এইসব লোকদের আমার পারিশ্রমিক দিতে হয়।

এইসব টাকা তিনি নিতেন আমেরিকার ডলারে। টাকা আমদানি ভালো দেখে তিনি এটাকে বড়ো করার দিকে মন দিলেন। রাশিয়ানরা তাঁর লিস্ট থেকে প্রথমেই বাদ। চেকোস্লোভাকিয়ারা টাকা দিতে কিপটেমো করে ভীষণ, অতএব বাদ। তবে শীর্ষে রইল আমেরিকা। আর সুইডিশ। নতুন ব্যবসা তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে গেল। আর অর্থও আসতে লাগল বেশ ভালোভাবেই।

নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাঁর মন আলাদাভাবে কাজ করত। তিনি চিন্তা করলেন যে এভাবে তাঁর ব্যবসা বেশিদিন চলবে না। তাঁর গুপ্ত ব্যবসা চলত প্রতিটি দেশের সঙ্গে অন্য দুটি দেশকে বাদ দিয়ে। তিনি তাঁর পরিচিত গুপ্তচরদের কাছ থেকে কানাঘুষায় জানতে পারেন যে জার্মান আর সুইডিশ গুপ্তচররা একসঙ্গে কাজ করে। অতএব তাঁর গুপ্ত তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না, আর একই কাজ এক সাথে করলে বিপদ যেনো-কোনো পথ দিয়েই আসতে পারে। আর তার ওপর যুদ্ধের ব্যাপারটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসবে। তিনি ঠিক করলেন তাঁর হাতে এখন দু'লক্ষ ডলার। সেগুলোর একটা বন্দোবস্ত করে পৃথিবীর কোনো নিভৃত কোনো কেটে পড়া ভালো।

ব্রোফেল্ড তাঁর গুপ্তসংবাদের ব্যবসা ছোটো করে ফেললেন। যাদের দিয়ে তিনি কাজ করাতেন তাদের বোঝালেন যে ব্রিটিশরা তাঁকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করছে সেই সঙ্গে ফরাসিও যোগ দিয়েছে। সেই গুপ্তচরদের এতে ভালোই হল কারণ ব্রোফেল্ড-এর চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকে। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে হাজার ডলার ঘুষ দিয়ে তাঁর সব টাকা দিয়ে কোম্পানির কাগজ অর্থাৎ Bond কিনে জুরিখের একটা ভালো ব্যাংকের সেক্স ডিপোজিট ভেন্ট রেখে দিলেন।

এর পরের কাজ হল তাঁর জন্মস্থানের কাছাকাছি একটা চার্চে গিয়ে তাঁর এক সাজানো বন্ধুর জন্মতারিখ খোঁজার অছিলায় সেই রেজিস্টার খাতার উপর তাঁর নিজের নাম ও জন্মতারিখের পাতাটা অতি সুকৌশলে ছিঁড়ে নিয়ে চলে এলেন।

এবার তাঁর ওপর সন্দেহের দৃষ্টি পড়ল পোলিশ দপ্তরের। সেখান থেকে তিনি পার পেয়ে গেলেন দু'হাজার ডলার ঘুষের পরিবর্তে এক নাবিকের জাল-পাসপোর্ট জোগাড় করে সুইডেন পাড়ি দিলেন জলপথে।

কিছুদিন সুইডেনে বিশ্রাম নিলেন আর নজর রাখছেন চারদিকের হালচাল এবং মহাযুদ্ধের গতিব প্রতি। এইবার তাঁর আসল পাসপোর্ট নিয়ে তিনি তুরস্কে গেলেন তার পর তাঁর সমস্ত টাকা জুরিখ থেকে এনে ইস্তাম্বুলের অটোম্যান ব্যাংকে জমা করে দিলেন আর অপেক্ষায় রইলেন পোল্যান্ডের পতনের জন্য। কিছুদিনের মধ্যে সেই দিন এল। পোল্যান্ড জার্মানির কাছে আত্মসমর্পণ করল আর তিনি পোলিশ উদ্বাস্তু সেজে তুরস্কের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। কিছু টাকা এধার ওধার হল আর তিনিও অনুমতি পেলেন।

এইবার ব্রোফেন্ড তাঁর ব্যবসা ভালোভাবে শুরু করলেন। তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি 'Rahir' নামে একটা গুপ্তচর সংস্থা তৈরি করলেন যার ভিত স্বাভাবিকভাবেই বেশ শক্ত হল। তবে তিনি মাথা ঘামিয়ে ঠিক করলেন যে, যুদ্ধের যে রাজ্যের জয় সুনিশ্চিত, তাঁকেই কেবল সংবাদ বিক্রি করতেন।

ব্রোফেন্ড মিত্রপক্ষকে এবার প্রকাশ্যে সরাসরি সাহায্য করতে লাগলেন, উত্তর আফ্রিকায়। রোমেলের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর। এতে মহাযুদ্ধের পর তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি তো খুবই বেড়ে গেল উপরন্তু, ব্রিটিশ, আমেরিকা আর ফরাসিদের কাছ থেকে পেলেন অত্যধিক সম্মান ও পুরস্কার। এরপর একটা জাল সুইডিশ পাসপোর্টের সাহায্যে ব্যাংকে জমানো পাঁচ লক্ষ ডলার সঙ্গে নিয়ে তিনি পাড়ি দিলেন আমেরিকায়। এখানে এসে বিশ্রাম এবং স্ট্রেল খাবারের সঙ্গে তাঁর মনে একটা চিন্তা এল যে, এই যুদ্ধবিহীন পৃথিবীতে নতুন কিছু করার।

এই সংকট সংঘাতপূর্ণ জীবনে যে কখনও পরাজয় স্বীকার করেনি। সেই আর্নস্ট ড্রাভো ব্রোফেন্ড আজ প্যারিসের একটি প্রাসাদোপম নিস্তরু কক্ষে তাঁর কুড়িজন অতি বিশ্বস্ত সহকর্মীর সামনে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর সেই দৃষ্টিতে কোনো উদ্ভ্রাণ নেই। আছে শুধু গভীরতা, আছে কেবল কাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি তাঁর আগ্রহ। এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে দাঁড়ালে পরিষ্কার বোঝা যায় এই দৃষ্টির পেছনে একটা পাকা মাথা কাজ করছে। গত ত্রিশ বছর ধরে তিনি বিপদকে কলা দেখিয়ে সকলের চেয়ে আগে এগিয়ে চলেছেন। সেই দৃষ্টি এখন একবার ওই বসে থাকা কুড়ি জনের ওপর নির্লিপ্তভাবে চলে গেল। এই দৃষ্টিতে রয়েছে তাঁর আত্মবিশ্বাস। যে আত্মবিশ্বাস সব সময় তাঁকে জয়ের শিখরে তুলে রেখেছে।

বর্তমানে তাঁর দেহের ওজন ২৮৩ পাউন্ডের মতো। পূর্বে তিনি ছিলেন একজন শৌখিন ব্যায়ামবীর। সমস্ত শরীর ছিল পেটা লোহার মতো। বিগত দশ বছর সে সব কোথায় চলে গিয়ে এখন তাঁকে দামি স্যুট দিয়ে ঢাকা রাখতে হয় বিশ্রী ফুলে ওঠা উদর। নিয়ম মেপে খাওয়া দাওয়া। তামাক বা মদের স্বাদ কী রকমের সেটা তাঁর অজ্ঞাত। কোনো নারীর শয্যাসঙ্গী হওয়া কল্পনার বাইরে। সেই মনে তাঁর জানাশোনা সকলের কাছে ব্রোফেন্ডের এসব ব্যাপার একটা হেঁয়ালির মতো।

ব্রোফেন্ডের কথা শোনার জন্য চরম আগ্রহ নিয়ে যে কুড়ি জন চারপাশে বসে রয়েছেন, তাঁরা পৃথিবীর নানা দেশ এবং নানা জাতের। এই কুড়ি জনের মধ্যে মাত্র দুজন হচ্ছেন বৈজ্ঞানিক। তাই তাঁদের দৃষ্টিতে রয়েছে ভবিষ্যতের চিন্তা, স্বপ্ন। বাকি আঠারো জনের দৃষ্টিয়েন ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতন শিকারি-সুলভ। সতর্ক এবং সদা আক্রমণ করার প্রচেষ্টা। তবে এদের সকলের একটা জায়গায় মিল রয়েছে। সেটা হচ্ছে এরা প্রত্যেকেই সুদেহী, সুপুরুষ এবং বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।

দুজন বৈজ্ঞানিকের একজন কোৎসে, পূর্ব জার্মানির পদার্থবিদ। পাঁচ বছর আগে পশ্চিম জার্মানিতে এসে কয়েকটা গোপন তথ্য বাইরে পাচার করে বহু টাকার মালিক হয়ে চলে গেলেন সুইজারল্যান্ডে, অবসর জীবনযাপন করার উদ্দেশ্যে। এই অবসর জীবন যাপন করা থেকেই তাঁর প্রবেশ ঘটল অপরাধ জগতে। অন্যজন একজন ইলেকট্রনিকস বিশেষজ্ঞ পোলিশ — মাসলঙ। প্রথমে একটা নামি রেডিও রিসার্চ বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। হঠাৎ কোনো অজ্ঞাত কারণে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

তিনজন করে ছটি দলে ভাগ করা হয়েছে এই আঠারো জনকে। এই দলগুলির প্রত্যেকটি পৃথিবীর দুটি দেশের ছটি নামকরা গুপ্তঅপরাধী বা সন্ত্রাসবাদী দলে সংযুক্ত — তাদের প্রতিনিধিরা আজ এই মিটিং-এ উপস্থিত। এদের মধ্যে রয়েছে ইটালির ভয়াবহ 'Mafia' দল থেকে তিনজন, Mafia-র মতনই কার্সিকান সংস্থা 'Union Corse' থেকে তিনজন ফরাসি। সোভিয়েত রাশিয়ায়

'SMERSH' নামে যে গুপ্তসংস্থা ছিল, সেটাকে ১৯৫৮ সালে ক্রুশ্চেভ তুলে দেন। এদের কাজ ছিল বিদ্রোহী এবং শত্রুদের শেষ করা। এই মিটিং এ সেই সংস্থার তিনজন উপস্থিত।

এই গেল ন'জনের হিসেব। বাকি ন'জন হচ্ছে কুখ্যাত গেস্টাপোর জীবিত তিনজন। তিনজন যুগোশ্লাভ, যারা মার্শাল টিটোর গুপ্ত পুলিশ-চক্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। আর বাকি তিনজন হচ্ছে তুরস্কের দুর্ভেদ্য পাহাড়ি অঞ্চলের তুর্কি। এরাই আবার আগে ব্রোফেল্ডের চর-চক্র 'RAHIR'-এ ছিল এবং তার পরে মধ্য এশিয়ার 'KRYSTAL' নামে বিরাট এক Heroin (কোকেন)-এর চোরা কারবারের পাভা হিসাবে কাজ করেছে।

এই আঠারো জনের প্রত্যেকের নিজস্ব পাসপোর্ট এবং পৃথিবীর প্রতিটি দেশের ভিসা আছে। যদিও এরা প্রত্যেকেই ষড়যন্ত্র এবং জটিল গুপ্ত খবর দেওয়া-নেওয়ায় খুবই অভিজ্ঞ এবং এক একজন একটি করে দাগী অপবোধী, তবুও এদের কারুর নাম পুলিশের বা ইন্টারপোলের খাতায় নেই। এরা প্রত্যেকেই এক একজন নামকরা বিশিষ্ট ব্যক্তি।

এইসব বিশিষ্ট গুণ থাকার সুবাদে, অর্থাৎ ঘোরতর অপবোধী হয়েও নির্দোষ, তারা আজ এই 'SPECTRE' সংস্থার সদস্য হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এর পুরো নাম হচ্ছে 'The special Executive for counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion' অর্থাৎ — প্রতি গুপ্তচরবৃত্তি, সন্ত্রাসবাদ প্রতিহিংসা ও অত্যাচারের বিশেষ কার্যনির্বাহক সংস্থা।

এরা আবার একটা নকল প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করে যার নাম 'FIRCO'। আর্নস্ট ভ্লাভো ব্রোফেল্ড হচ্ছেন এই 'SPECTRE'-র প্রতিষ্ঠাতা, প্রাণ-পুরুষ এবং সভাপতি।

॥ ছয় ॥

টেবিলের চারধারে যাঁরা বসে রয়েছেন, তাঁদের সকলের ওপর দিয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরে যাওয়ার সময় তিনি যা মনে কবেছিলেন তা-ই তাঁর নজরে এল। তিনি লক্ষ করলেন এক জোড়া চোখ তাঁকে এড়িয়ে অন্যদিকে ঘুরে গেল। এই দৃষ্টির মালিকের প্রতি রিপোর্ট দু-দুবার পরীক্ষার পর তাঁর কাছে জমা পড়েছে। যদিও সেই রিপোর্ট ঘাঁটি, তবুও তিনি নিজের চোখ, কান এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে তা যাচাই করে নিতে পেরেন।

ব্রোফেল্ড-এর একটা অদ্ভুত বাতিক আছে। তিনি যখন কাউকে কোনো তারা মনোমতো নয় এমন কথা বলতে যান। তখন তিনি নিজের নিশ্বাসটিকে সুগন্ধযুক্ত করে রাখতে চান। তাই তাঁর দুটো হাত টেবিলের নীচে নামিয়ে একটা হাত নিজের উরুর ওপর রেখে অন্য হাতে পকেট থেকে একটা সোনার পাতলা কৌটো বার করে তার ভেতর থেকে একটা সুগন্ধী ট্যাবলেট বার করে মুখের পুরে দিলেন।

ব্রোফেল্ড তাঁর ভরাট গলায় বলতে শুরু করলেন কোনো জড়তা নেই। স্পষ্ট উক্তি —

তিনি বললেন — 'আমাদের সামনে যে বড়ো কাজটা রয়েছে অর্থাৎ Plan Omega-র রিপোর্ট দিতে হবে। তার আগে একটা বিশেষ বিষয়ে কিছু বলতে চাই।' আবার টেবিলের চারধারে তাঁর দৃষ্টি ঘোরালে আবার সেই চোখ জোড়া তাঁকে যে উপেক্ষা করে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। এটা তাঁর দৃষ্টিতে দ্রিক ধরা পড়েছে।

'আমার সহকর্মীবৃন্দ। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, আমাদের এই প্রতিষ্ঠান গত তিনবছরে যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছে। হিটলারের গুপ্তরত্নগুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে আমাদেরই জার্মান বিভাগের কর্মীদের সুপরিচালনায়। আর সেগুলি গোপনে বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছে আমাদের তুর্কি কর্মীবৃন্দ। এই থেকে আমাদের উপার্জন হয়েছে সাড়ে সা ত লক্ষ পাউন্ড।

‘আমাদের কর্মীদের সুপারিকল্পনায়, আমরা পূর্ব বার্লিনে রাশিয়ার গুপ্ত সংস্থা M.W.D. থেকে একটা খুবই গোপনীয় কাগজ সমেত বাস্তব চুরি করে তা বিক্রি করি C.I.A-এর কাছে এবং এতে আমাদের উপার্জন পাঁচ লক্ষ ডলার। আর একটা হচ্ছে নেপলস-এর এক চোরাকারবারির চোখে ধুলো দিয়ে আমরা এক হাজার আউন্স কোকেন হাতিয়ে নিই। যা থেকে আমরা আট লক্ষ ডলার পাই এঞ্জেলস্-এ বিক্রি করে।

‘আমরা জীবাণুযুদ্ধের উপকরণ সমেত ভর্তি কয়েকটা শিশি চেকোস্লোভাকিয়ার একটা সরকার পরিচালিত রাসায়নিক কারখানা থেকে হাতিয়ে বিক্রি করি ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগকে — ‘প্রতিদানে পাই আট লক্ষ ডলার। হাভানাতে গোপনে ও ছদ্মনাম নিয়ে বাস করতেন একজন কুখ্যাত নাৎসি-প্রধান। ব্লাকমেলের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় কিছু কম টাকা, মাত্র এক লক্ষ ডলার।

‘আরও আছে — ভারী জল (Heavy Water) সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ একজন নামকরা বৈজ্ঞানিক, তিনি গোপনে বার্লিনের সহযোগিতায় কমিউনিস্টদের আশ্রয়ে গিয়ে তাঁর গোপন তথ্যগুলি সেখানে প্রকাশ করার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি আমাদের কর্মীদের সুদক্ষতায়। তাঁকে হত্যা করে আমরা পেয়েছি দশ কোটি ফ্রাঁ।

‘অতএব হিসাব আমাদের জানাচ্ছে যে, আজ পর্যন্ত আমাদের এই প্রতিষ্ঠান আয় করেছে প্রায় পনেরো লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং। এই উপার্জনের শতকরা দশভাগ প্রতিষ্ঠানের মূলধনে যোগ হয়েছে, নানারকম খরচপত্রের জন্য বাকি অংশ। শতকরা দশভাগ আমার প্রাপ্য হিসেবে নিয়েছি আর বাকিটা আপনাদের কুড়ি জনকে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকের ভাগে পড়েছে ষাট হাজার পাউন্ড।

‘এটা নিশ্চয়ই সব সদস্যরা স্বীকার করবেন যে, বছরে মাত্র কুড়ি হাজার পাউন্ড আপনাদের যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয় তার তুলনায় যথেষ্ট নয়! তবে আমার স্থির বিশ্বাস এবং আপনারাও স্বীকার করবেন যে, Plan Omega আমাদের সে অভাব পূর্ণ করবে। তারপর যদি আপনাদের মত থাকে তার এই কাজ হয়ে যাবার পর আমরা আমাদের এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে যে যার নিজের ব্যক্তিগত কাজে মন দিতে পারব।’

সদস্যদের দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে ব্রোফেল্ড বললেন — ‘কারুর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?’

সভাপতির বক্তব্যে সবাই খুশি। কারণ এসব তো সকলের জানা। সকলে সভাপতির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এবার সভাপতি তাঁর আসল কথা বলবেন — তবে কি যে সেটা সকলেরই তা অজ্ঞাত।

আবার একটা সুগন্ধী ট্যাবলেট মুখে দিলেন ব্রোফেল্ড। এবার শুরু হল তার কথা— ‘হঁ। আমাদের আগের বড়ো কাজটা মাসখানেক আগে শেষ হয়েছে এবং তা থেকে আমাদের আয় হয়েছে পনেরো লক্ষ ডলার। এটা তো সকলের জানাই আছে। আর এ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

ব্রোফেল্ড তাঁর দৃষ্টি তাঁর বাঁদিকের সারির শেষপ্রান্তে থামাল। তিনি বেশ মিষ্টি করে বললেন ‘৭ নম্বর একটু দাঁড়াবেন?’

‘৭ নম্বর কর্সিকার গুপ্ত-সংস্থা Union Corse-এর এক সদস্য — তার বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, দৃষ্টি খুব শান্ত, ভদ্রলোক এবং তার মধ্যে একটা গর্বিত ভাব। সে উঠে ব্রোফেল্ড-এর দিকে সিধে তাকাল। ৭ নম্বর মনে করছে ব্রোফেল্ডের দৃষ্টি তার দিকে কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আসলে ৭ নম্বরের পাশে বসা ১২ নম্বরের দিকে। সে বসেছে ব্রোফেল্ডের উলটোদিকে টেবিলের শেষ প্রান্তে। এই ১২ নম্বরের দৃষ্টিই এতক্ষণ ব্রোফেল্ডকে উপেক্ষা করে আসছিল। ৭ নম্বরের সঙ্গে কথা বলতে ১২ নম্বর অর্থাৎ বোরদ ভাবল। তার ওপর থেকে বিপদে কেটে গেল।

ব্রোফেন্ড আবার বলতে শুরু করলেন — ‘আপনাদের নিশ্চয়ই খোয়াল আছে যে, লাস ভেগাস এর এক হোটেলের মালিকের সপ্তদশী কন্যাকে মন্টি কার্লোর একটা হোটেল থেকে তার বাবার হেফাজত থেকে সুনিপুণভাবে আমাদের কর্সিকান বিভাগের কর্মীরা ফুসলিয়ে নিয়ে জলপথে কর্সিকায় নিয়ে আসে। এর জন্য আমরা দশ লক্ষ ডলার দাবি করি এবং তার বাবা তাতে রাজিও হলেন। SPECTRE-এর নির্দেশ মতো সেই টাকা ইতালির উপকূলে Sam Remo-র কাছে একটা রবারের ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মিসিলি বিভাগের আমাদের কর্মীরা খুবই নিপুণতার সঙ্গে একটা ছোটো জাহাজে করে গিয়ে সেই টাকা উদ্ধার করে। আবার ওই ভেলার মধ্যে একটা ট্রান্সমিটার লোকানো ছিল যাতে ফরাসি নৌবাহিনী ওই জাহাজ ধরতে পারে। কিন্তু আমাদের কর্মীরা খুবই দক্ষতার সঙ্গে সেই ট্রান্সমিটার অকেজো করে দেয়।

আমাদের মুক্তিপণের শর্ত অনুযায়ী মেয়েকে তার বাবা-মায়ের কাছে অক্ষতদেহে ফেরত দেওয়া হয়। অবশ্য তার চুলের রঙ আমরা পালটে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। কারণ কর্সিকা থেকে তাকে সরানোর সময় এটা প্রয়োজন হয়েছিল। আমি Nice পুলিশের কাছ থেকে গোপন সূত্রে জানতে পেরেছি যে, কর্সিকায় থাকাকালীন মেয়েটি ধর্ষিতা হয়েছিল।

উপস্থিত সকলে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল এই খবরে। তাই ব্রোফেন্ড তাদের এটা হৃদয়ঙ্গম করার সময় দিয়ে বললেন —

মেয়েটিকে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ফেরত দেবার ভার ছিল প্রেত সমাজ (SPECTRE)-র ওপর। কিন্তু আমরা মেয়েটিকে অক্ষত বা অব্যবহৃত অবস্থায় তার বাবা-মায়ের কাছে ফেরত দিতে পারিনি। এখন এই ব্যাপারে মেয়েটির ওপর জোর করে এ-কাজ করা হয়েছিল, কিংবা তাতে মেয়েটির কিঞ্চিৎ সম্মতি ছিল সে প্রশ্ন এখানে আলোচ্য বিষয় নয়।’

তিনি আবার একই সুরে বলতে লাগলেন — ‘নীতিধর্ম বা অধর্মের স্থান আমাদের কাছে নেই। কারণ, আমাদের প্রতিষ্ঠান বিরাট এবং শক্তিদ্র। এই শক্তির উৎস হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটি সদস্যের সমবেত প্রচেষ্টায়। যদিও আমাদের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই, তবুও আমি বলব প্রত্যেক সদস্যের উচিত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। যদি কোনো সদস্য সেই আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ থেকে সরে আসে তবে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি আলগা হয়ে যাবে।

আপনাদের কাছে এইসব ঘটনা, যন্ত্রে আমার মনোভাব কী তা নিশ্চয়ই অজানা নয়। আর আমি কী ব্যবস্থা নেব তা-ও আপনারা জানেন। সেই জন্যে আমি মেয়েটির বাবাকে একটা চিঠি লিখে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি এবং এর ক্ষতিপূরণ রূপে তাঁকে পাঁচ লক্ষ ডলার ফেরত দিয়েছি। যদিও তিনিও শর্ত ভঙ্গ করেছেন ঐ ট্রান্সফরমারটি রেখে। তবে জানি এটা পুলিশি চালাকি। মনে হয় মেয়েটির বাবা এসব কিছু জানেন না।

অতএব এর জন্য আমাদের কিছু ক্ষতি হয়েছে। কে যে দোষী তা আমি জেনেছি এবং তার উপযুক্ত শাস্তিও আমি ঠিক করেছি।

৭ নম্বর টেবিলের কোণে দাঁড়িয়ে আর ব্রোফেন্ডের দৃষ্টি তার ওপরই নিবদ্ধ। সে কিন্তু তাতে এতটুকু বিচলিত নয়। কাবণ সে নিশ্চয় যে, সে নিরপরাধী আর ব্রোফেন্ড সেটা জানেনও। তবুও তিনি কেন যে সকলের সামনে তাঁকে এভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন? অন্য সদস্যেরাও নিশ্চিত যে ৭ নম্বর নির্দোষী। আর এ-ও জানে যে, ব্রোফেন্ড-এর বিচার নির্ভুল। আর তিনি যা করার তা ঠিক করে রেখেছেন।

৭ নম্বরের নিভীকতা ব্রোফেন্ড লক্ষ করে এর কারণটা বুঝতে পারলেন। আর তিনি এটাও দেখলেন ১২ নম্বরের মুখটা ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে আর সে ঘামতে শুরু করেছে। ভালো জিনিস, ঘামলে কাজের সুবিধে হয়।

আগুস্তে আগুস্তে ব্রোফেল্ডের হাত টেবিলের তলায় চলে গেল এবং বোতাম খুঁজে সুইচ টেনে

দিলেন।

সকলের অজান্তে পিয়ের বোরদ-এর মৃত্যু নেমে এল — ৩০০ ভোল্টের ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে। তার দেহটা ধনুকের মতো বেঁকে গেল। চুলগুলো সব খাড়া হয়ে গেল। চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠে নিস্ক্রিয় হয়ে গেল। দাঁত খিঁচনো বন্ধ হয়ে তার ফাঁক দিয়ে গলে জিব বেরিয়ে এল। হাত, পা, এবং পিঠের তলা থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বের হতে লাগল।

এবার ব্রোফেল্ড সুইচ টেনে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে দিলেন। পিয়ের বোরদ-এর দেহটা কুকড়ে টেবিলে মুখ খুবড়ে পড়ে গেল। চামড়া ও কাপড়-পোড়া গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। এতক্ষণ ঘরের আলোগুলো কীরকম ম্লান হয়েছিল এবার সেগুলো সতেজ হয়ে উঠল।

৭ নম্বরের নিভীকতা দেখে ব্রোফেল্ড খুবই সন্তুষ্ট। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে ৭ নম্বর সত্যিই সৎ এবং তার মনোবল অটুট আছে। তাকে বসতে বলে বললেন — “এইভাবে ১২ নম্বরের মনটা ঘুরিয়ে না দিলে একটা অপ্রত্যাশিত গণ্ডগোল ঘটতো।”

ব্রোফেল্ড-এর যুক্তি যে অকাটা তা উপস্থিত সকলে সম্মতি জানিয়ে দিলে তাদের মাথা নেড়ে। এই ভয়ংকর দৃশ্য কেউই ভীত বা বিচলিত নয়। তারা জানে ব্রোফেল্ড-এর বিচারে কোনো ভুল বা ত্রুটি নেই। তাই তারা নড়ে চড়ে বসল। কারণ তারা এরকম ঘটনা এর আগে দুবার দেখেছে। প্রথমবারটি তিনি অপরাধীকে তাঁর কমপ্রেসড রিভলবার দিয়ে একটি সুঁচ দিয়ে বিদ্ধ করেন তার হৃৎপিণ্ডে। আর দ্বিতীয়টি তাঁর পাশেই ছিল। অতি ক্ষিপ্ততার সঙ্গে একটা তাব গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে। অতএব এসব কিছুই নয়। এবার কাজের কথা —

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে ব্রোফেল্ড বেশ চোস্ত গলায় বললেন — ‘১২ নম্বরের স্থলাভিষিক্ত করার দায়িত্ব রইল আমাদের কর্সিকান বিভাগের ওপর। সেটা অবশ্য প্ল্যান ও মেগা শেষ হয়ে যাবার পরে হলেও ক্ষতি নেই। এবার ঐ প্ল্যান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

‘আমাদের প্ল্যানের মজায় দিনক্ষণ পাল্লুটে ফেলতে আমি বাধ্য হয়েছি কারণ আমাদের জার্মান বিভাগের কর্মী সাব-অপারেটর-এর ভয়ানক ভুলই এর জন্য দায়ী। তার ওপর ভার ছিল সে দক্ষিণ ইংল্যান্ডের একটা প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়ে থেকে। তার কাছাকাছি বস্কম্ব বিমান বন্দরের বোম্বার্ড পাইলট-পেটাশীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে তার সম্বন্ধে খবরাখবর জোগাড় করে আমাদের জানানো। এইসব ষড়যন্ত্রের কাজ করার দক্ষতা তার বেশ ভালোই আছে কারণ, সে ম্যাকাওয়ের ‘রক্ত-বজ্র’ দলের সঙ্গে জড়িত। তার ওপর আরও দায়িত্ব ছিল যে, অ্যাটম বোমা দুটি চুরি করার পরই আমাদের জানানো তার মানে আজ থেকে তিনদিন পরে চিঠি পোস্ট করবে।

‘কিন্তু আমাদের এমনই পোড়া কপাল যে, সেই লোকটি ঐ চিকিৎসালয়ের অন্য আর একটি রোগীর সঙ্গে পায়ের ওপর পা-দিয়ে ঝামেলা পাকায়। তার প্রতিদানে সে এখন ব্রাইটনের একটা হাসপাতালে চিকিৎসাস্থান রয়েছে। তার সর্বাঙ্গ ঝলসে গেছে। এখন তার সেরে উঠতে অন্তত সাতদিন সময় লাগবে।

কেন সাতদিন প্ল্যান-ওমেগা-কে পেছানো হল, আশা করি আপনারা বুঝতে পারলেন। এতে আমাদের বিপদ কিছু হবে না। এদিকে যাতে পাইলট পেটাশীকেও সাতদিন পরে উড়তে হয় তার ব্যবস্থার জন্য তাকে এক শিশি ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু পাঠানো হয়েছে, যেটা খেলে তার ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে এবং সাতদিন বিছানায় গুয়ে থাকবে। তারপর ‘G’ সুস্থ হয়ে পেটাশীর ওড়ার সময় জানালে আপনারাও সেই মতো আপনাদের কাজের সিডিউল ঠিক করবেন।

ব্রোফেল্ড যে তিনজন প্রাক্তন গেস্টাপো বসেছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন — ‘এর পর আর ‘G’ ওপর ভরসা না রেখে তাকে সরিয়ে ফেলা দরকার। আমাদের জার্মান বিভাগ সেই

চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এই কাজটি সমাধা হবে। আশা করি....' বলে আবার তাদের দিকে তাকালেন।

জার্মান তিনজন একসঙ্গেই সম্মতি জানালেন।

'আর সব কাজ ঠিকমতো চলেছে। 'গর্ভগৃহ' এলাকায় ১ নম্বর গুপ্তধনের নাম করে সেই জমিখে বসেছে। কাবণ অনেকেই তাই কবছে। অতএব সে সন্দেহের বাইরে। তাঁর জাহাজের প্রত্যেকটি নাবিকই হচ্ছে বাছাই করা সাব-অপারেটর। তারা খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

'আপনাবা ঠিক ঠিক সময়ে গর্ভগৃহে গিয়ে ১ নম্বরের কাছাকাছি থাকবেন। আপনাদের পরিচয় হবে যেন, আপনারা গুপ্তধন খোঁজার ব্যাপারে ১ নম্বরকে টাকা দিয়ে সাহায্য করছেন এবং সেই টাকার যে সন্দেহভার ঠিকমতো হচ্ছে সেটা তদাবক করার জন্যই আপনাদের আসা। আশাকরি আপনাবা ছদ্মনাম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং নিজের নিজের কাজ সম্বন্ধে সবিশেষ চিন্তা ও বিবেচনা কববেন।

সকলের মত পাওয়া গেল। তিনি আবার বলতে শুরু করলেন - - আপনারা যে জলের তলায় সাঁতার কাটার শিক্ষা নিয়েছেন সেটা ঠিক আছে তো!

একে একে সবাই সম্মতি জানাল।

তারপর ব্রোফেল্ড বলতে শুরু করলেন — 'জলের তলার নিরাপত্তার জন্য গ্যাসচালিত জলবন্দুক চালনার শিক্ষা তো আপনাদের দেওয়াই হয়েছে। এবার শিপিং বিভাগের মি. সিয়াক্সা কিছু বলবেন।

একটা কালো, বোগা, ফ্যাকাসে মতো দেখতে একটি লোক সিসিলীয় বিভাগের ফিডে লিও সিয়াক্সা বেশ চোখ কান খুলে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল - - 'আমরা যে বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে টাকা দাবি করেছি, সেই টাকা আসবে সমপরিমাণ সোনার বারের মাধ্যমে এবং সেটা একটা অগ্নেয়গিরির পাশে প্লেন থেকে প্যারাসুট মারফত ফেলা হবে। কারণ জায়গাটা কালো লাভায় ঢাকা এবং ফসল ও খেতের পক্ষে অনুপযোগী।

এখানকার প্রায় দুই বর্গ কিলোমিটার জায়গা টর্চের আলো দিয়ে জানান দেওয়া হবে যাতে রাতে প্যারাসুট ফেলতে অসুবিধে হবে না। আর ওই প্যারাসুটের গায়ে ফসফরাস লাগানো থাকবে যাতে অন্ধকারেও উদ্ধার করার সুবিধে হবে।

ব্রোফেল্ড জিজ্ঞেস করে — কারা উদ্ধার কববে?

সিয়াক্সা বললে — 'আমার কাকা ঐ এলাকার Mafia-চক্রের চাঁই। তাঁকে দশ লক্ষ পাউন্ড দিয়ে রাজি করানো হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে এটা একটা ব্যাংক লুটের ব্যাপার। তিনি আর বিশেষ কিছু জানতেও চান না। কারণ দশ লক্ষ পাউন্ড। তার ওপর আরও ভার দেওয়া হয়েছে — ওইগুলো একত্র হয়ে জড়ো করে একটা বিশেষ জায়গায় সেটা ডেলিভারি দেওয়া। কাকার খুব নিকট আত্মীয় একজন আছেন ওই এলাকায়। যিনি হচ্ছেন আমাদের সাব-অপারেটর-৫২। তিনি সেখানকার সব কাজকর্ম দেখাশোনা করেন এবং আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ব্রোফেল্ড বললেন - - আমাদের পরের কাজ সোনা পাচার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সাব-অপারেটর ২০১-এর ওপর। ক্যাটোনিয়া থেকে মারকিউরিয়াল জাহাজে এই সোনা বোঝাই হয়ে গোয়া অভিমুখে যাবে। পথে কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একটা বাণিজ্যতরী সেই জাহাজের পাশে ভিড়বে এবং সমস্ত সোনা সেই বাণিজ্যতরীতে চলে যাবে। সমস্ত সোনা বর্তমান বাজার দরে সুইস ফ্রাঁ, ডলার আর বকিভার। এই তিন মুদ্রায় স্থির হয়ে আমাদের অংশ ভাগ হয়ে যাবে। গোয়া থেকে চার্টার্ড প্লেনে সেই টাকা জুরিখে এনে বাইশটি ব্যাংকের ভেন্টে জমা

রাখা হবে। সেই টাকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সদস্যদের এবং এই মিটিং এরপর তার চাবি আপনাদের দিয়ে দেওয়া হবে।

সকলের সমর্থনের পর পোলিশ ইলেকট্রনিক্স বিশেষজ্ঞ ক্যানভিন্স্কি প্রশ্ন রাখলেন — পাশ্চাত্য শক্তিগুলি নিশ্চয়ই খবর রাখে সে সোনা পাচার হচ্ছে, অতএব আকাশ বা জলপথে সেই জাহাজের হদিশ পাওয়া খুবই সহজ এবং ডাকাতি হওয়াও সম্ভবপর।

ব্রোফেন্ড খুব ধৈর্যের সঙ্গে বললেন — আপনার কথাটা খুবই সত্যি। কিন্তু জেনে রাখুন যতক্ষণ না সমস্ত টাকা সুইস ব্যাংকে ঢুকছে ততক্ষণ পর্যন্ত চুরি করা প্রথম অ্যাটম বোম বা দ্বিতীয় বোম কোনোটাই ফেরত দিচ্ছি না। আর এটা প্রকাশ হয়ে পড়লে জনসাধারণের মধ্যে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হবে সেটা কে সামলাবে?

জার্মান বিভাগের ক্রনো বেয়ারের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন — আপনাদের সকলের সম্মতিক্রমেই ১ নম্বরকে আমাব উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। বর্তমানে প্ল্যান-ওমেগার পরিচালনায় তিনিই হচ্ছেন Spectre-র সহ-সর্বাধিনায়ক।

শেষে তিনি আজকের মিটিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা করে বললেন — ১৮ নম্বর আপনি আমায় একবার ১ নম্বরকে ২০-মেগাসাহকলস্-এ ধরে দিন। আটটার পর ফরাসি পোস্টঅফিস এই ব্যান্ড ব্যবহার করে না।

॥ সাত ॥

জেমস বন্ড কার্ডবোর্ডের বাক্সের গা থেকে Energen রুটি দিয়ে ভালো করে চেঁচে চেঁচে দইটা আরাম করে খেল।

তার মন-মেজাজ শ্রাবল্যাণ্ডে দিন দশেক থাকায় এত ভালো হয়ে গেছে যে রোজ সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠে এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত অফিসে থেকে যে কাজ করতে তার ভালো লাগত না। সেগুলো এখন খুব ভালো লাগছে এবং খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলছে। এতে তার সেক্রেটারি লোলিয়া পন্সবি-র খুবই অসুবিধে হচ্ছে। তার ব্যক্তিগত দেখাসাক্ষাৎ এবং ঘোরাঘুরির।

কোনো উপায়ান্তর না দেখে লোলিয়া M-এর সেক্রেটারি মিস মানিপেনির শরণাপন্ন হলে মিস মানিপেনি ক্যান্টিনে কফি খেতে খেতে তাকে আশ্বাস দিল। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। M-ও ওই চিকিৎসালয় থেকে আসার পর কিছুদিন ঐরকম হয়েছিলেন। শেষে এমন একটা প্যাঁচালো কেস হাতে এসে হাজির হল তখন সঙ্কের সময় বারে গিয়ে মাথাটাকে একটু ফাঁকা করতে গেলেন। বহুদিন অনভ্যাসের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে সব ঠিক আগের মতো। এতএব বন্ড-এর অবস্থাও তাই-ই হবে।

বন্ডের রাঁধুনি-কাম-পবিচারিকা ঘরে এসে দেখে বন্ড একটা ‘ডিউক অব ডারহাম’ সিগারেট খাচ্ছে। সে বন্ডের ঐটো প্লেটগুলো নাড়তে-নাড়তে বলছে — ‘আপনি একজন পুরুষ মানুষ হয়ে এসব জঞ্জাল খাচ্ছেন কেন। আপনি হাসপাতাল থেকে এলেন। দেখলাম আপনার শরীরে গোল গোল গর্ত। ওগুলো যে বুলেটের সেটুকু বোঝার বয়স আমাব হয়েছে। ওগুলো মোটর দুর্ঘটনার নয়। এর পরে যদি আপনি আবার লড়াই করার চেষ্টা করেন তবে আর বেঁচে ফিরে আসতে হবে না।’

‘আগে হলে জেমস, মানিপেনিকে রেগে মেগে যা-তা বলে দিত। কিন্তু এখন তার মেজাজ সত্যি বেশ ভালোই, তাই মজা করে তাকে বলল, আমি এখন এইসব জিনিস খেয়ে খুব ভালো আছি। শক্তিও পাই। আগে দুটো আর্সপবিন নিশ্চয়ই খেতাম। কিন্তু এখন এসব নেই। মদ খাওয়া নেই। তবে?’

মানিপেনি রেগে কেঁদে ফেলে বললে — ‘হয়তো আপনিই ঠিক। আমার সব ভুল।’ বলে চলে গেল।

বন্ড কাগজ পড়ছে, হঠাৎ লাল ফোন বেজে উঠতে অভ্যাসমতো স্বাভাবিকভাবে তুলে নিতে ওপাশ থেকে বড়ো সাহেবের গলা পেল। তাকে এখনই চলে আসতে হবে। M ডাকছেন। তাকে আজ রাতেই পালাতে হবে। হাতে অন্য কাজ থাকলে বাতিল করে।’ লাইন কেটে গেল।

সকাল নটা। রাস্তায় ভিড় না থাকায় দশ মিনিটের মধ্যে বন্ড সদর দপ্তরের নতলায় এসে হাজির।

বন্ড অফিসে ঢুকে বুঝতে পারল সর্বত্র থমথমে ভাব। আর এটাও বুঝল যে সাইফার মেশিনগুলো মারফত পৃথিবীর সর্বত্র খুব জরুরি কিছু সংবাদ পাঠানো হচ্ছে।

বড়ো সাহেব মিস মানিপেনিকে কিছু কাগজ দিয়ে কাজ বোঝাচ্ছেন। বন্ডকে দেখে ইন্টারকমে M-কে জানাল ০০৭ এসেছে। তারপর তাকে ঘরে ঢুকতে বললে। ঘরে ঢুকলে M বললেন — ‘গেট রেডি!’ ঘরের লালবাতি জ্বলে উঠল।

M বন্ডকে কয়েকটা ফটোস্ট্যাট করা কাগজ দিয়ে ভালো করে পড়তে বলে নিজে আরাম করে পাইপে তামাক ঠাসতে লাগলেন।

প্রথমেই একটা খামের ছবি, তাতে ঠিকানা লেখা। তার ওপর পাউডার লাগানো হয়েছে হাতের ছাপ ধরার জন্য। তাকে সিগারেট খেতে বললে বন্ড বলল — ‘বাজে অভ্যাসটা ছাড়ার চেষ্টা করছি।’

খামের ওপর গোটা গোটা করে লেখা ‘ব্যক্তিগত এবং অত্যন্ত জরুরি’। চিঠি পাঠাবার ঠিকানা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন - ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট, হোয়াইট হল, লন্ডন, এস. ডব্লু-১। বোঝা যায়, এটা ৩রা জুন সকাল চারটায় ব্রাইটন ডাকঘরের। শেষরাতে পোস্ট করা হয়েছে যাতে দুপুরের মধ্যে চিঠিটা পৌঁছে যায়। খুবই নিখুঁত সব কাজ।

খামের ভেতরের চিঠির ফটোস্ট্যাট বের করে পড়তে শুরু করল --

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়,

আপনি জানেন অথবা জানতে পারবেন যে, ২রা জুন একটি অ্যাটম বোমা বহনকারী বিমানে ২টি অ্যাটম বোমার ওপর রাষ্ট্রীয় সরবরাহ দপ্তরের পরিচয় চিহ্ন MOS/bd/654/MKV এবং MOS/bd/655/MKV রয়েছে। বিমানটি NATO ট্রেনিং ফ্লাইট-এ ছিল। তার পাঁচজন কর্মী এবং একজন পর্যবেক্ষক কেউই আর জীবিত নেই এবং সেই বিমানটি এখন এই সংস্থার দখলে রয়েছে। অতএব বিমানটি যে দুর্ঘটনায় পড়েছে এটা আপনারা সহজেই বলতে পারবেন এবং আসল খবরটা গোপন রাখবেন।

বিমান এবং বোমা দুটি আপনারা উদ্ধার করবেন ১০ কোটি পাউন্ডের বিনিময়ে। আর তা দিতে হবে সমমূল্যের সোনার বাট মারফত -- সংখ্যায় হবে হাজারটি। আর আমাদের দুটো শর্ত প্রথমটি হচ্ছে — সোনা যেখানে দিতে বলা হয়েছে সেখানে ঠিকমতো পৌঁছবে এবং আমরা যখন তা নেব তাতে কোনোরকম বাধা দেবেন না। দ্বিতীয়টি আপনি এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতির যুগ্ম ঘোষণাপত্রে লিখবেন যে SPECTRE-র সব সদস্য কোনো রকম দায়ি নয়।

এই শর্তের শেষ সময় হচ্ছে ১০ই জুন বিকাল পাঁচটা। ওই সময়ের মধ্যে শর্ত মানা না হলে তার পরদিনই পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ১০ কোটি পাউন্ডের সম্পত্তি নষ্ট হবে। এর পরেও যদি আমরা আপনাদের সম্মতি না পাই তবে সারা বিশ্ব এই খবর জানবে আর একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হবে। এতেও যদি না মানেন তবে যেকোনো একটা বড়ো পাশ্চাত্য শহরে অ্যাটম বোমা ফেলা হবে এবং এর সম্পূর্ণ দায় আপনাদের ওপর বর্তাবে।

জেনে রাখুন এটাই আমাদের প্রথম ও শেষ চিঠি। আমরা গ্রিনউইচ সময়ের প্রতি ঘণ্টার শেষে ১৬ মেগাসাইকল্‌স্ ওয়েভব্যান্ডে আপনাদের উত্তরের অপেক্ষায় থাকব।

SPECTRE

(The Special Executive for Counterintelligence Terrorism, Revenge and Extorsion)

ভালোভাবে চিঠিটা পড়ে সঙ্গে কাগজটা নিয়ে পড়ে বুঝল — এতে সোনা পাঠাবার খুঁটিনাটি নির্দেশ, স্থান, সময় সব কিছু দেওয়া আছে এবং শর্ত ভঙ্গ করলে অ্যাটম বোমা ফাটানো হবে। সেই সোনার বিমান আকাশে ওঠার এক ঘণ্টা আগে তাদের জানাতে হবে।’

চিঠি এবং এই কাগজের নকল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছে।

সব কিছু দেখে শুনে বন্ড টেবিলের ওপর রাখল। তারপর একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে বললে — ‘যদি সত্যিই এই রকম একটা প্লেন হারিয়ে থাকে তবে ওরা যা লিখেছে তা সবই সত্যি।

উত্তরে M বললেন, ‘যুদ্ধ মন্ত্রণালয়েরও সেই রকম ধারণা।’ তারপর থেমে আবার বললেন

- ‘বোমা সমেত প্লেনটি যে হারিয়েছে এটা সত্যি। এবং বোমা দুটোর নম্বরও সঠিক।’

॥ আট ॥

বন্ড জিজ্ঞেস করে — কোনো ক্লু পাওয়া গেছে কি?

— সেটা তেমন কিছুই নয়। ওনেছি ইউরোপে একটা স্বাধীন গুপ্তচক্র বেশ ভালো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গোলরৎস নামে একজন ‘ভারি জল’ (Heavy Water) বিশেষজ্ঞ কমিউনিস্টদের কাছে পালায়। কিন্তু ফরাসিদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকার বিনিময়ে এই SPECTRE তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়।

‘যদিও আমরা এবং আমেরিকানরা ওদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনেছি, তখন ওরা ঠিক নিজেদের আড়ালে রেখেছে। আমরা মাল চেয়েছি। পেয়েছি। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে।

‘এসব কিছুই নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে প্লেন আর বোমা দুটো’ — M আর একটা কাগজ বার করে বললে — ‘ডিভিকেরটার বিমানটি বোমা দুটো নিয়ে বসকম্ব থেকে ওড়ে। ওর পাইলট ছিল জোসেফ পেটাসী নামে একজন ইটালীয় স্কোয়ার্ডন লিডার।

আর একটা কাগজ বার করে বললেন — প্লেনটা আয়ারল্যান্ডের পশ্চিম উপকূল থেকে ৪০,০০০ ফুট ওপর দিয়ে যায় এবং হঠাৎ ৩০,০০০ ফুট নীচে নেমে এলে আটলান্টিকের ওপর অন্য বিমানের মধ্যে হারিয়ে যায়। আর তার কোনো হৃদিশ নেই। প্লেনটা হয়তো অন্য কোনো প্লেনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ধ্বংস হয়েছে ভেবে বম্বার কমান্ডার ভয় পেয়ে যায়। অথচ কেউ সেই প্লেনটা দেখেনি। দিস্ মাচ।

বন্ডের প্রশ্ন — আমেরিকার DEW (Defence Early Warning System) কিছু বলতে পারছে না?

‘খবর পাওয়া গেছে একটা প্লেন বোস্টনের প্রায় পাঁচশো মাইল পূর্বে স্বাভাবিক বিমান-পথ ছেড়ে হঠাৎ দক্ষিণ দিকে ঘুরে যায়। সেটাকে BOAC বা ট্রান্স-কানাডা প্লেন ভেবে গুরুত্ব দেয়নি।’

— খুব পাকা হাতের কাজ। অন্য প্লেনের রাস্তার ভিড়ে ঢুকে পড়ে রাশিয়া বা ইউরোপের যেকোনো জায়গায় ঢুকে পড়তে পারে। আর সেটাই ঝামেলা।

--- কিন্তু অত বড়ো প্লেনকে নামাতেই হবে। কোথায় লুকোবে?

--- ঠিক। ব্রিটিশ বিমান বাহিনী থেকে সর্বত্র খোঁজ নেওয়া হয়েছে।

-- প্লেনটা সাহারা, অন্য মরুভূমিতে অথবা অগভীর সমুদ্রে নেমেছে।

বোমা দুটো ফাটাতে গেলে প্লুটোনিয়াম ফাটাতে হবে।

M বললেন — বোমার দু'প্রান্তে রয়েছে TNT বিস্ফোরক আর প্লুটোনিয়াম। বোমা ফেললে TNT বিস্ফোরক ফেটে ডিটোনেটেবে আশ্রয় ধরালে প্লুটোনিয়ামে বিস্ফোরণ হয়।

বোমা ফাটানোর নিয়ম সব শুনে বড় চিন্তা করছে যদিও ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য তবুও ঘটতে চলেছে এবং পৃথিবীর প্রায় প্রতি গুপ্তচর বিভাগ খুবই চিন্তিত।

— এখন যা অবস্থা তাতে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি ছোটো দেশ অ্যাটম বোমা তৈরি করতে শুরু করবে। এখন এটা একটা তির ধনুক তৈরির মতো অবস্থা। আর এই তির ধনুকই সারা বিশ্বে এখন আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। SPECTRE-কে থামাতে না পারলে আরও বিপদ।

এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যেমন কবে হোক প্লেনটাকে খুঁজে বার করে ওদের থামাতে হবে। যা করার সব করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ও মার্কিন রাষ্ট্রপতির সম্পূর্ণ মত আছে।

সমস্ত পৃথিবীর যত গুপ্তচর বিভাগ আছে, তারা সবাই একসঙ্গে নেমে পড়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন থান্ডারবল'। এর জন্য যা প্রয়োজন সব কিছুই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আর প্রতিটি খবর সেখানে পৌঁছবে। আমেরিকানরাও আমাদের সঙ্গে আছে।

— কিছু টুকরো খবর বাইরে লিক হয়ে গেলে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু চিঠির ব্যাপার গোপন থাকবে। তার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। এই তদন্তে FBI, NATO এমনকি CIA-এও হাত লাগিয়েছে।

আবার সিগারেট ধরিয়ে বড় তাব কাজ কী তাই জানতে চাইলে -- 'M' তার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন নতুন কথা শুনলেন। ০০৭ যদিও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ যে, কাউকে কিছু বলবে না তবুও তোমায় আমি খুলে বললাম।

— 'একটা সূত্র পাওয়া গেছে, যা হচ্ছে ঐ DEW-র অপারেটর রিপোর্ট। এই যে প্লেন আটলান্টিক থেকে দক্ষিণ বাহামা বা বার্মুডার দিকে গেছে এটাতে SPECTRE-র যিনি পরিচালক তিনি খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরেন।

-- আমি যে সিদ্ধান্তে এসেছি, তা হচ্ছে অ্যাটম বোমা সম্পর্কে আমেরিকা খুবই ভীত। আর ওই যে দশ কোটি পাউন্ডের সম্পত্তি নষ্ট... কথা বলা হয়েছে, তা ইউরোপের চেয়ে আমেরিকাতেই আছে এবং আমার নিশ্চিত ধারণা যে M ওই বোমা সুদূর প্লেন আমেরিকার কাছে পিঠেই পাঠাবার চেষ্টা করবে SPECTRE। আর এরা হচ্ছে এক ইউরোপীয় দল।

— আর একটু ভাবলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে ওই প্লেনটা এমন জায়গায় নামবে যে আমেরিকা থেকে বেশি দূরে নয়। এবং রাডারের আওতার মধ্যে আসবে না। আর সেটা হচ্ছে আমেরিকার উত্তরে দ্বীপপুঞ্জগুলো যেগুলোর দূরত্ব মাত্র শ'দুয়েক মাইল। এর বেশিগুলিই জনমানবশূন্য এবং বালি আর অগভীর জলে ভর্তি।

বন্ডের প্রশ্ন — তবে এই চিঠি আমাদের না পাঠিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে পাঠান না কেন?

— আর কিছুই নয়। আমাদের দৃষ্টিটা ওদের ওপর নামিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লে ওদের সুবিধে। আর আমরা ভয়ে ভয়ে টাকাটা ওদের দিয়ে দেব। আর বোমা ফাটালে ওদের হৃদয়ও আমরা কিছুটা পেয়ে যাব। তাই ওরা চাইবে ভয় দেখিয়ে টাকাটা নিয়ে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া। এটাই আমাদের ভরসা।

আমাদের হাতে সময়সীমা মাত্র পৌনে সাতদিন। আমি তোমার ওপরও খুব ভরসা রাখি। নিউইয়র্কগামী যেকোনো প্লেনেই তুমি যেতে পারবে। সেরকম ব্যবস্থা করা আছে। তোমার পরিচয়

তুমি একজন ধনী যুবক। বাহামা দ্বীপপুঞ্জ তোমার মনের মতো সম্পত্তি কিনতে তুমি আগ্রহী।
অতএব খোঁজ-খবর নিতে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। তুমি সন্দেহের বাইরে থাকবে। এনি
কোশেচন?’

বন্দ এই কাজে খুবই একটা সম্ভ্রষ্ট নয়। সে চাইছিল লৌহ যবনিকার আড়ালে কোনো গরম
কাজ। তাই উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন -- বাহাম দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী নাসাউ-তে কার সঙ্গে
যোগাযোগ করব?

ওখানের রাজ্যপালকে তোমার সম্বন্ধে সব বলা আছে। তাদের এবং CIA-এর সাহায্য তুমি
পাবে। ওদের কাছে খুব আধুনিক বেতার-যন্ত্র আছে। তুমি একটা সাইফার (Cipher) মেশিন
সঙ্গে নাও। আমায় সমস্ত খবর জানাবে।

বন্দ বেরিয়ে গেল। M-এর অনুমানের ওপর ওর নিজেরই ভরসা নেই। তবুও তাকে ঠেলে
দেওয়া হল। যাক, আরামে এই খেলা উপভোগ করা যাবে।

* * *

বন্দ অফিস থেকে বেরোবার সময় তার কাঁধে বুলছে একটা সুন্দর চামড়ার বাক্স অনেকটা
ক্যামেরার মতো। অথচ সেটা একটা সাইফার যন্ত্র। উলটে দিকে একটা ভকসওয়াগন গাড়িতে
কাউন্ট লিপ তার পকেট থেকে একটা ০.৪৫ পিস্তল বের করে তাক করতে লাগল। শ্রাবল্যান্ড
থেকে মে বন্ডের ঠিকানা জোগাড় করে একটা ভূয়ো নাম নিয়ে গাড়িটা ভাড়া কবেছে। সে তার
প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করে ইউরোপগামী একটা প্লেনে উঠবে। এরকম কাজ সে পূর্বে অনেক করেছে।
তবে সে জানত না, বন্দ যে বাড়িটা থেকে বেরোচ্ছে সেটা কীসের বাড়ি।

কাউন্ট লিপ প্রথম দিনই বন্ডের পরিচয় পেয়ে গেছে। আর এও জেনেছে যে বন্দ জানতে
পেরেছে যে কাউন্ট রক্তবজ্রের সদস্য। আর তার সঙ্গে প্রেতসঙ্ঘের কোনো যোগাযোগ নেই।
অতএব বন্ডের প্রাপ্য জিনিস তাকে মিটিয়ে দিতেই হবে।

বন্দ তার বেন্টলিতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাব-অপারেটর ‘G’ তাকে অনুসরণ
করতে শুরু করল তার ভকসওয়াগন নিয়ে। আর তাকে পিছু নিতে শুরু করল SPECTRE ব
ছ’নম্বর চোখে গগলস পরে মোটরবাইক নিয়ে। সে আবার একজন পেশাদার মোটরবাইক চালক।
অতএব রাস্তার ভিড় কাটিয়ে ভকসওয়াগনের কাছাকাছি আসতে খুব একটা দেরি হল না। তার
ওপর দায়িত্ব আছে সাব-অপারেটর G-কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া। তাই তার কাঁধের
ঝোলা থেকে একটা ভারী হাত বোমা বার করে অপেক্ষা করতে লাগল। রাস্তায় ভিড় একটু কমের
দিকে। তারপর তার কাজ শেষ করে চম্পট।

সাব-অপারেটর G-ও অপেক্ষা করছে রাস্তার গাড়ির কম হওয়ার দিকে। ক্রমশ সেই সুযোগ
আসতেই সে বেন্টলির কাছ বরাবর এসে পড়েছে। তার গাড়ির কর্কশ আওয়াজ শুনে মুখ ঘোরাতে
একটা বুলেট তার চোয়ালের পাশ দিয়ে চলে গেল। তার পরেরটাও বন্ডের মাথার পাশ দিয়ে চলে
গেল। কারণ বন্দ তার স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসে গাড়িতে জোরে ব্রেক করায় স্টিয়ারিং-এর ওপর ঝুঁকে
পড়ে। এর পর তৃতীয় বুলেটের পরিবর্তে কান-ফাটানো একটা শব্দ হল। বন্ডের উইন্ড স্ক্রিন টুকরো
টুকরো। চার ধারে অজস্র গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল এবং হর্নের বিকট চিৎকার।

বন্ডের গাড়ির পাশে ভকসওয়াগনটা জ্বলছে। গাড়িটা উলটে গেছে। বন্দ তাড়াতাড়ি নিজের
গাড়ি থেকে বের হয়ে সবাইকে সরে যেতে বলার সঙ্গে সঙ্গে ভকসওয়াগনের পেট্রল ট্যাংক ফেটে
গিয়ে বিকট আওয়াজে চারধার কাঁপিয়ে তুলল। কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেল। দূরে পুলিশের
গাড়ির সাইরেন শোনা গেল। বন্দ তার সদর দপ্তরে শীঘ্র চলে এল মাথায় হাজার রকমের চিন্তা
নিয়ে।

পুলিশের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বন্ডের দুটো প্লেন ছাড়তে হল। গাড়িটার ধ্বংসাবশেষ থেকে সামান্য টুকরো সুতো, জামার টুকরো মর্গে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হল। গাড়ির নম্বর নিয়ে জানা গেল যাদের কাছ থেকে গাড়িভাড়া করা হয়েছে একজন কালো চশমা পরা লোক। প্রচুর টাকার বিনিময়ে সাত দিনের জন্য। তার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম ছিল ‘জনস্টন’।

উপস্থিত দর্শকেরা মোটর সাইকেল আরোহীর সম্পর্কে বলল — গাড়িটার সামনে কোনো নম্বর প্লেট ছিল না। লোকটা মাঝারি আকারের, চোখে গগলস। বোমা মেরে বেকার স্ট্রিটের দিকে চলে যায়।

বন্ড কিছুই বলতে পারল না। ভকসওয়াগনের ছাদটা নীচু থাকায় আরোহীর মুখ দেখতে পায়নি। কেবল হাত আর একটা পিস্তল দেখেছে।

M পুলিশি রিপোর্টের কপি চেয়ে পাঠিয়ে সেটাকে ‘অপারেশন থান্ডারবল’-এ পাঠাবার নির্দেশ দেন। তিনি বুঝলেন এটা সম্পূর্ণ বন্ডের ভুলের জন্য এবং ওর পূর্ব-পরিচিত কোনো শত্রুর কাজ।

আবার যখন বন্ড সদর দপ্তর থেকে বের হল, তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে সদর দপ্তরের এক মিস্ত্রি গাড়ির বাকি কাঁচের অংশ সরিয়ে গাড়িটাকে পরিষ্কার করে দিয়েছে। বাড়ি ফিরল ডাহা ভিজে অবস্থায়। এসে ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে ফোন করে জানাল একটা লোহার রডের লরি অতর্কিতে হঠাৎ তার গাড়ির ওপর এসে পড়ায় এই অঘটন। না, লরির নম্বর নেওয়া সম্ভব হয়নি। এই রকমের মিথ্যে খবর দিল।

বাড়ি এসে স্নান করে পোশাক পবে নিল। বড়ো সুটকেসে অন্য জামাকাপড় আর একটা হোল্ডঅলে জলের তলায় সাঁতার কাটার সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে নিল। পরে রান্নাঘরে গিয়ে মে-কে বললে এক ঘন্টার মধ্যে আমায় বেব হতে হবে। কিছু ভালো খাবার তৈরি করে দাও, তার সঙ্গে এক বাটি ডবল কফি এবং মদের ট্রে।

মে আশ্চর্য — ‘কী ঘটল মি. জেমস’?

মে-র মুখের অবস্থা দেখে বন্ড হেসে ফেলে বললে — বুঝলাম। মানুষের জীবনটা পদ্মপত্রে জল।

মে গজগজ করতে করতে চলে গেল। বন্ড তার অস্ত্রশস্ত্র সব পরীক্ষা করতে গেল।

॥ নয় ॥

ব্রোফেল্ড-এর ‘প্ল্যান ওমেগা’ ঠিকমতোই চলছে।

স্বর্গত জোসেফ পেটাশীকে খুবই ভেবেচিন্তে এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আঠারো বছর বয়সে সে টহলদারী জার্মান বিমান বাহিনী ফোর্-উলফ-২০০ বিমানের সহকারী পাইলট হয়। এইসব বিমানে থাকত — ‘হেন্সোজেন’ বিস্ফোরক সমন্বিত ‘প্রেশার মাইন’।

নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করার জন্য সে বিমানে টহল দেবার সময় তার সঙ্গী পাইলট এবং নেভিগেটরকে পেছন থেকে একটি করে গুলি উপহার দিয়ে সে পাইলটের আসনে বসল। তারপর সেই বিমানকে অতি নিপুণতার সঙ্গে ‘বারি’ বন্দরে এসে নামাল। এবং আত্মসমর্পণের চিহ্নস্বরূপ নিজের গায়ের জামাটা ককপিটের বাইরে বুলিয়ে দিল ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর লক্ষ্য আসার জন্য।

এরপর সে মিত্রপক্ষকে একটা আন্ত ‘প্রেশার মাইন’ উপহার দেওয়ায় আমেরিকান ও ব্রিটিশ উভয় পক্ষ থেকে সম্মান এবং উপহার স্বরূপ ১০,০০০ হাজার পাউন্ড পেল। ইটালিয়ান বিমান বাহিনীতে ঢোকার উপযুক্ততা যখন সে পেল তখন নিঃসঙ্গ বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণের এক অদ্ভুত গল্প শোনাল গোয়েন্দাবিভাগকে। ফলে যুদ্ধ শেষে তার পরিচয় সর্বশ্রেষ্ঠ দুঃসাহসী বীরদের অন্যতম। পরে পাইলট, ক্যাপ্টেন, শেষে ইটালিয়ান বিমান বাহিনীতে কর্নেল হয়ে এল। সেখান থেকে NATO বিমান বাহিনীতে। প্রথম ছ’জনের মধ্যে তার স্থান হল পেটাশীর।

এখন তার বয়স হয়েছে চৌত্রিশ। আর উড়তে ভালো লাগে না। বিশেষ NATO-র প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রথম সারিতে যখন এসে পড়েছে। এখন উড়বে অল্পবয়সিরা।

পেটাশীর শখ দামি আর শৌখিন জিনিসের ওপর। আর সে যা নেবে মনে করে সেটা সে সংগ্রহও করে। এমনকি যে কটা মেয়ের ওপর তার দৃষ্টি পড়েছিল, তাদের সে তার শয্যাসজিনী করেওছিল। এখন তার নজর পড়েছে মিলানের মোটর প্রদর্শনীতে রাখা অপরূপ সুন্দর একটা মাসেরাটি গাড়ির ওপর।

সে চাইছিল NATO থেকে সরে গিয়ে অন্য দেশে অন্য নামে থাকতে। রিও-ডি-জেনেরো জায়গাটা বেশ ভালো। তার জন্যে চাই নতুন পাসপোর্ট আর অনেক টাকা।

হঠাৎ পেটাশীর মনোবাসনা পূরণও হল। ফন্ডা নামে একজন ইটালিয়ান ঠিক পেটাশীর চরিত্রের একজন লোক খুঁজাছিল। পেটাশীকে পেয়ে গেল SPECTRE র ৪-নম্বর ফন্ডা। সে তাকে ভালো করে বাজিয়ে নিল।

পেটাশীকে জানানো হল সে কিউবার এক বিপ্লবী দলের হয়ে কাজ করবে। তাকে একটা বিমান ছিনতাই করে নির্দিষ্ট জায়গায় নামাতে হবে। এবং এতে তাদের দলের নাম বাইরে ছড়িয়ে পড়বে।

এসবে পেটাশীর কোনো ভ্রূক্ষপ নেই। তার কাজের বিনিময়ে টাকা দরকার। আর অন্য নামে একটা পাসপোর্ট জোগাড় করে রিও ডি জেনেরো পৌঁছবে। তার হাতে আসবে দশ লাখ ডলার। ২রা জুন রাত আটটার সময় 'ভিন্ডিকেটার' প্লেনটা গর্জন করে আকাশে উঠল। পেটাশী মনে মনে উত্তেজিত এবং স্থির।

ট্রেনিং ফ্লাইটের জন্য বিশাল ককপিটের পেছনে গোটা দুয়েক বেসরকারি বসার জায়গায় পেটাশী একঘন্টা ধরে বসে লক্ষ করল অন্য পাঁচজনের যন্ত্রপাতির কাজ করা। বুঝল এদের শেষ করা সহজ। 'ভিন্ডিকেটার' প্লেনটির স্বয়ংক্রিয় পরিচালক যন্ত্রের নাম জর্জ— তাকে ঠিকমতো পথ ধরিয়ে দিলে সে ঠিকই চলে যাবে — কেবল নজর রাখতে হবে ৩২,০০০ ফুট উচ্চতায় আটলান্টিকের ওপর আছে কিনা। কেবল নামাবার সময় তাকে খুব শক্ত হতে হবে মানসিক দিক দিয়ে। অবশ্য দশ লাখ ডলার তাকে শঙ হতে সাহায্য করবে।

এখানে পেটাশীর নাম 'মেল্লি'। একজন ইটালিয়ান। সে তার ঘড়ি দেখে বুঝল তার কাজ করার সময় হয়ে গেছে। অক্সিজেন মুখোশ ঠিক করে নিল। তার পকেটে রাখা সায়ানাইডের টিউবটা হাত দিয়ে দেখে নিয়ে মনে মনে সব ঠিক করে নিয়ে ককপিটে প্রবেশ করল।

পাইলট ওর সঙ্গে রসিকতা করল। সে হাসতে হাসতে পকেটে রাখা টিউবটার রিলিজ ভালবটা (Release Valve) তিনটে প্যাঁচে ঘুরিয়ে দিতে তার সরু মুখ খুলে গেল। তারপর কৌশলে পাশে তাদের ওপর রাখা অজস্র লগ আর চার্টের আড়ালে রেখে দিল। তার কাজ শুরু হল।

এবার সে বললে, 'এবার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক', বলে সে বাইরে এসে নিজের জায়গায় বসল। এবার অক্সিজেন মুখোশ পরে রেগুলেটর ঘুরিয়ে ১০০ পার্সেন্ট অক্সিজেন তুলে নিল রক্তের বিষ ধুয়ে নেবার জন্য। তারপর বসে বসে দেখতে লাগল।

দেখা গেল দু'মিনিটের মধ্যে নেভিগেটর নিজের দু'হাত দিয়ে গলা চেপে ধরে পড়ে গেল। গৌ গৌ আওয়াজ হল। রেডিও অপারেটর এবার ফোন ফেলে এগোতে গিয়ে বসে পড়ে। তার দেহ স্থির হয়ে গেল।

আর যে বাকি তিনজন তাদেরও বাঁচবার সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। সহ পাইলট আর ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারকে দেখা গেল তারা একে অপরকে ধরবার আশ্রয় চেষ্টা করে টুল থেকে পড়ে গেল।

পাইলট তার মাথার ওপর মাইক্রোফোনটা ধরার ব্যর্থ চেষ্টা কবে পড়ে গেল। ধীরে ধীরে সে-ও অন্য চারজনের মতো চোখ বিস্ফারিত করে গুয়ে রইল।

পেটার্শী ঘড়ি দেখল। চার মিনিট সময় লেগেছে। আরও এক মিনিট অপেক্ষা করে পকেট থেকে রবারের গ্লাভস বের কবে পরে নিয়ে অক্সিজেন গ্যাসটা নিজেব মুখের ওপর চেপে ধবে এগিয়ে গেল। তাক থেকে সায়ানাইডের টিউবটার মুখ বন্ধ করল। 'জর্জ' এর গতিপথ দেখে নিল। কেবিনের বিষাক্ত গ্যাস পরিষ্কার করার জন্য বায়ুর চাপ বদলে নিজের সিটে বসল। পরিষ্কার হতে পনেরো মিনিট সময় লাগবে।

পনেরো মিনিট পরও আরও দশ মিনিট সময় নিল পেটার্শী। মুখোশ পরেই সে মৃতদেহগুলো ককপিটের বাইরে আনল। পকেট থেকে এক শিশি ক্রিস্টাল বার করে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে লক্ষ করল তার কোনো রং পালটালো না-- সাদাই রয়েছে। অর্থাৎ বিষাক্ত গ্যাস পরিষ্কার হয়ে গেছে। মুখোশ খুলে গন্ধ শুঁকে দেখল — কোনো রকম অন্য গন্ধ নেই। তবুও সাবধানের মার নেই। মুখোশ পরেই কন্ট্রোল রুমে ঢুকে প্লেনের গতিপথ দেখে নিয়ে ৩২,০০০ ফুটের মধ্যে এনে অন্য বিমানপথের ভিডেব মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আকাশের ওপর একটা বিরাট প্লেন উড়ে চলেছে। ককপিটের মধ্যে ছোটোখাটো মেশিনের আওয়াজও বিরাট ভাবে কানে শোনাচ্ছে।

পেটার্শী জাইরো (Gyro) -তে প্লেনের গতিপথ দেখে নিল। ফুয়েল ট্যাংকগুলো পরীক্ষা কবে দেখে নিল।

নিশ্চিত পেটার্শী পাইলটের আসনে বসে একটা বেনজিড্রিন ট্যাবলেট খেয়ে নিয়ে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা শুরু করে দিল। মাটিতে পড়ে থাকা হেডফোনের আওয়াজ গুনে বুঝল বসকম্ব-এর বিমান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের খেয়াল পাড়েছে। উদ্ধার বাহিনী ইত্যাদিদের খবরাখবর দিতে আরও আধঘন্টা লাগবে তার মধ্যে সে আটলান্টিকের ওপর অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

হেডফোনের আওয়াজ থেমে গেলে পেটার্শী রাদার স্ক্রিনের সামনে গিয়ে দেখল একটার পর একটা প্লেন তার নীচে দিয়ে চলে যাচ্ছে। DEW (ডিফেন্স আর্লি ওয়ার্নিং) লাইন পার হওয়ার আগে ধরা পড়া সম্ভব নয়। আর তারা ভাববে এটা একটা কমার্শিয়াল প্লেন একটু উঁচু দিয়ে যাচ্ছে।

পাইলটের সিটের ওপর গিয়ে পেটার্শী বসে ডায়ালগুলো পরীক্ষা করল। তারপর আকাশে প্লেনটাকে একটু হেলিয়ে নিল — তাতে মৃতদেহগুলো গড়াগড়ি করতে লাগল। সে চিন্তা করতে লাগল তার 'মাসেরাটা' গাড়িটাকে। গাড়িটাকে পেটার্শী চালালেই মেয়েরা তার দিকে দৃষ্টি দেবে। ঘন্টায় দেড়শো মাইল চালানোর পর গাড়িটাকে একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢোকালে তার হাত-পা নরম হয়ে গেল তখন তাকে বার কবে ঘাসের ওপর ফেলল।

দিবাস্পন্ন ছেড়ে দিয়ে খেয়াল করল। ভিডিকিটরটা ৬০০ মাইল বেগে ছুটছে। একটু একটু করে আমেরিকার উপকূল দেখা গেল। নিজের অবস্থান দেখে বুঝল এবার তার পূর্ব-পশ্চিম বিমানপথ ছেড়ে মোড় নেওয়ার সময় হয়েছে।

পেটার্শী আর একটা বেনজিড্রিন ট্যাবলেট খেয়ে চিন্তা করল এবার প্লেনটাকে নাবাবার সময় হয়েছে। চিন্তা করতে শুরু করল।

পেটার্শী তার পকেট থেকে ছোটো ডায়রি বার করে প্লেন নামাবার নির্দেশ দেখে নিল। তেল ফেলে দিয়ে প্লেন হালকা করে ১০০০ ফুট নীচে নামাতে হবে পনেরো মিনিট আগে। সমুদ্রের ওপর নামাবার জায়গায় লাল আলো দেখা যাবে। ৪০ ফুট জলের ওপর প্লেন নামিয়ে পাশ দিয়ে বের হওয়ার সময় পাবে।

১ নম্বরের ইয়াট-এ তুলে নেওয়া হবে। পরের দিন সকাল সাড়ে আটটার সময় বাহামা

এয়ারওয়েজে মিয়ামি পর্যন্ত যাবে। ১ নম্বর তোমার প্রাপ্য টাকা ১০০ ডলারের নোটে এবং ট্রাভেলার্স চেকে তোমার কাছে নিয়ে যাবে। যা খুশি তুমি নিতে পারবে। নতুন পাসপোর্ট তোমায দেওয়া হবে — নাম এনরিকো জলি - কোনো কোম্পানির ডিরেক্টর।

পেটাশী বুঝল আর ১ ঘণ্টা বাদে সে নামবে। ১০,০০০ হাজার ফুট নীচে বরফের জমি। প্লেনের আশপাশের সব আলো নিভিয়ে দিল। ট্যাংকের তেল খালি করতে প্লেন ওপরে উঠতে গেলে সে নামিয়ে আনল ৩২,০০০ ফুটে। আর মাত্র কুড়ি মিনিট।

নীচে শান্ত সমুদ্র, সুন্দর আবহাওয়া। পেটাশী পাইলটের বেতার যন্ত্রে ১ নম্বরকে ধরতে গেলে প্রথম বার না পেয়ে ভয় পেল। তারপর মুহূর্তে সংকেত এল তাকে নামতে বলছে।

চারটে জেট থামিয়ে ব্রেক করে প্লেনের গতিবেগ কমিয়ে দিতে বিরাট ভিভিকিটোর নীচে নামতে লাগল। হু হু করে নামছে। চাঁদের আলোয় নীচে সমুদ্রের জল। পরে অন্ধকারে একটা ছোট্ট দ্বীপ। অন্টিমিটারে দু'হাজার ফুট।

১ নম্বরের সংকেত পাওয়া গেল। দূরে লাল আলোও দেখা যাচ্ছে। প্লেনের ভেতরের যন্ত্রপাতির ওপর ও এমন অনায়াসে হাত চালাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে কোনো নারীদেহের পরিচিত অংশে সে হাত বোলাচ্ছে। নামছে — পাঁচ, চার, তিন, দু'শ ফুট। প্লেন নামছে। সুইচ অফ করল। প্লেনের পেটে জোর ধাক্কা লাগল। নিজেকে সামলে নিল। প্লেনের নাকটা একটু উঁচু কবল, আবার ধাক্কা।

যাক শেষ পর্যন্ত পেটাশী প্লেনটাকে নামাতে পেরেছে। এইবার তার অভিনন্দন আর পুরস্কার। প্লেনটা জলের তলায় ধীবে ধীবে তলিয়ে যাচ্ছে। পেছনে লেজের দিকটা ভেঙে গেছে। তার পায়ের চারপাশে। মৃতদেহগুলো পড়ে রয়েছে। তার ওপর চাঁদের আলো পড়ছে। সে বাঁদিকে এমার্জেন্সি গেট ভেঙে বেরিয়ে এসে প্লেনের ডানার ওপর হেঁটে এগিয়ে এল। দেখা গেল একটা জালি বোট আসছে। তাতে ছ'জন লোক। চাঁদের আলোয় দেখা গেল তারা খুব কাজের লোক কিন্তু গম্ভীর। পেটাশী হাত তুলে তার উপস্থিতি জানাল। তাদের একজন হাত তুলে জানান দিল। পেটাশী তাদের দেখে নিজের উচ্ছ্বাস চেপে গম্ভীর হয়ে গেল।

জালি বোটটা প্লেনের ডানার পাশে এসে দাঁড়াল। একটা বেঁটে মতন লোক খুব ধীরে সাবধানে তার দিকে এগিয়ে আসছে। পেটাশী আনন্দে উচ্ছ্বাসে বলে উঠল — 'নিম আপনাদের একটা উপহার 'সুন্দর বাকঝাকে প্লেন'। বলে করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালে, সেই বেঁটে লোকটাও তার হাত বাড়াল কিন্তু এমন জোরে একটা হ্যাঁচকা টান মারল যে পেটাশী লোকটার পেছন দিকে চলে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছোরা সোজা ঢুকে গেল পেটাশীর গলার ভেতর দিয়ে মাথার দিকে। সে কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু বিস্ময়, সাংঘাতিক যন্ত্রণা, আব চোখে রামধনু রঙের আলোর বিচ্ছুরণ। তার দেহটা প্লেনের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

তার পুরস্কার সে পেল।

লোকটা ছোরাটা কিছুক্ষণ রেখে তারপর বার কবে সমুদ্রের জলে ধুয়ে পেটাশীর পিঠের জামায় মুছে খাপে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর তার দেহটাকে সমুদ্রের জলের তলায় তলিয়ে দিল।

বেঁটে লোকটা প্লেনের ডানার ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে জালি বোটের কাছে গিয়ে সংকেত জানাল তার কাজ শেষ। ইতিমধ্যে বারোজন ডুবুবি বোটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল জলের তলায় যাবার পোশাক পরে এবং জলে ডুব দিল। শেষজন ডুব দেবার পর মেকানিক জলের তলার সার্চ লাইট জ্বলে দিল। ডুবুরিদের জন্যে দড়ি নামিয়ে দিল। মেকানিক বোটের গিয়ার বদলে দড়ি ছেড়ে ডুবন্ত প্লেনটার টানের বাইরে চলে গেল।

ইঞ্জিন বন্ধ করে বোট থামালে বেঁটে লোকটা একটা ক্যামেল সিগারেট বার করে তাকে দিতে সে আধখানা রেখে বাকিটা ধরাল।

ইয়াট-এর ওপরে প্রেত সংঘের ১নম্বর রুমাল দিয়ে তার কপালের ঘাম মুছল। ঘাড়ি দেখে বুঝল রাত শেষ হতে আর মাত্র আধঘন্টা বাকি। এর মধ্যেই কাজ শেষ করতে হবে। পাইলটটাকে খুব সহজেই শেষ করা গেছে।

১ নম্বর বেতার যন্ত্রের ঘরে ঢুকে অপারেটরকে ডেকে জেনে নিলে যে, প্লেনটা নাসাউ-এর রাডার যন্ত্রে ধরা পড়েনি। এবার ২ নম্বরকে ডেকে দিতে বলল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে দেখছে — ইয়াট-এর বিরাট বেতার যন্ত্রটা পৃথিবীর বহু তরঙ্গের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার নিজের জিনিসটাকে। তারে পেয়ে গেলে ১ নম্বরকে ইঙ্গিত করার ১ নম্বর বেতার যন্ত্রে মুখ রাখলে খুব অস্পষ্ট হলেও চিনতে পারল ব্রোফেল্ডের গলা। বললে ২ নম্বর বললি।

১ নম্বর বললে — খুব সুষ্ঠুভাবে কাজ সফল হয়েছে। এখন সওয়া দশটা-পৌনে এগারোটার মধ্যে শেষ হবে। কাজ চলছে।

‘ধন্যবাদ’। আর কথা শোনা গেল না।

১ নম্বর কেবিনের মধ্যে দিয়ে ইয়াটের দিকে হেঁটে গিয়ে ডুবুরিদের কাজের তদারকি করতে লাগল। ‘সব ঠিকঠাক আছে তো?’

ডুবুরিদের একজন বললে — সব ঠিক আছে।

‘খুব ধীরে সুস্থে কাজ করো। রাতের বেশি অংশটা এখনও বাকি।’ ১ নম্বর ইয়াটের খোল থেকে উঠে বাইবে ডেকের ওপর এলেন। চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সমুদ্রের অন্য রূপ। সেই সুন্দর রূপের ওপর জালি বোটাটা দাঁড়িয়ে আছে। একটা ছোটো জেনারেটরের সাহায্যে সার্চ লাইট জ্বলছে সমুদ্রের ভেতরের খানিকটা আলোকিত করছে। আর তার আওয়াজের ঝুঁকি কিছুটা নিতে তো হবেই।

সবচেয়ে কাছের দ্বীপ এখন থেকে পাঁচ মাইল দূরে। নির্জন— কেবল মাঝেমাঝে বনভোজন করতে কিছু কপোত-কপোতী এখানে আসে। দ্বীপটা ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া হয়েছে! ‘প্ল্যান ওমেগা’ সুন্দর গতিতে এগিয়ে চলেছে। ১ নম্বর একটা ঘরে ঢুকে টেবিলে রাখা একটা চার্টের ওপর চোখ রাখলেন পরবর্তী গজের জন্য।

১নম্বর — তাঁর পরিচয় — নাম এমিলিও লাগো। রোমান বংশোদ্ভূত। চেহারা পুরাকালের রোমান বীরেদের মতো। বয়স — প্রায় চল্লিশ ছুই হুই। তাঁর লম্বা মুখখানা পরিষ্কারভাবে কামানো — রোদে তার রং পালটে গেছে মেহগিনি কাঠের মতো। লম্বা টিষা ঠোঁটি নাক। পুরু ঠোঁট, বাদামি শাস্ত্র চোখ। তাঁকে দেখলে এক লহমায় যে কোনো মেয়ের মনে অন্য একটা আকর্ষণ জাগবে।

সুঠাম শরীরে বাড়তি কোনো মেদ নেই। ইটালির হয়ে অলিম্পিকে তরোয়াল খেলেছেন। ভালো সাঁতারু। নাসাউ ওয়াটার স্কি প্রতিযোগিতায় বিজয় সম্মান পেয়েছেন। এক কথায় সর্বগুণে গুণময়। যখন তার রোমশ হাত দুটো সেই চার্টের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে হয় যেন দুটো জাস্তব জস্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অ্যাডভেঞ্চার তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। তাঁর রক্তে যদিও লুষ্ঠনের অদম্য আশা রয়েছে তবুও তিনি ‘কালো দেড়ের (Black beard) মতো নিষ্ঠুর পিশাচ নন। তিনি অন্য মানুষ। প্রতিটি কাজ তিনি সুস্থতার সঙ্গে নিয়ম মেনে ঠান্ডা মাথায় করেন।

তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগেনি। তখন তিনি কালো বাজারের একজন হোমরা চোমরা। তারপর তাঞ্জিয়াস-এ অর্থকরী চোরাকারবারে জড়িত। পরে রিভেয়েরাতে গহনা ডাকাতির নায়ক

ও পরিচালক। শেষ পাঁচ বছর প্রেতসংঘের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি সুকৌশলে তাঁর সমস্ত মাল সমেত সসম্মানে পালাতে পেরেছেন।

এককথায় তিনি একজন ভদ্র, মার্জিত, রমণীমনোরঞ্জন, আদর্শবান ডাকাত। জীবনকে তিনি পুরোপুরি উপভোগ করেন। পৃথিবীর চারটি মহাদেশের প্রতিটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের দরজা তাঁর কাছে সবসময় খোলা। কারণ, তাঁর পরিচয় তিনি একজন প্রাচীন ও বিস্তবান রোমান পরিবারের শেষ বংশধর। প্রচুর সম্পত্তির মালিক। তার ওপর আবার অবিবাহিত। পুলিশের খাতায় তিনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক।

এদিকে প্রেত সংঘে এবং ‘প্ল্যান ওমেগা’-র সর্বাধিনায়ক হওয়ার পক্ষে যা যা গুণ থাকার প্রয়োজন তার সব কটিই তাঁর মধ্যে রয়েছে।

একজন নাবিক এসে খবর দিলে যে রথ (chariot) এবং স্লেজ আসার খবর এসেছে।

শুধু তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাগোঁ মুখে বা ব্যবহারে কোনো রকম উত্তেজনা না ফুটিয়ে চূপচাপ অন্য কাজে ব্যস্ত, এমন একটা ভাব দেখালেন। নাবিকটি চলে যাওয়ার পর কেবিনের বাইরে এসে দেখলেন — দূরে সমুদ্রের তলায় যেন জোনাকির আলোর মতো একটা বিন্দু জলি-বোটের দিকে উঠে আসছে। গত মহাযুদ্ধে ইটালিয়ানরা সর্বপ্রথম দু-জন আরোহী সমেত জলের তলায় চলমান এইরকমের যান ব্যবহার করেছিল। সেই জিনিসেরই উন্নততর সংস্করণ এটি, প্রথম একক আরোহী সাবমেরিন কেনা হয়েছে ‘আনসালডো’ থেকে।

এই জলযানটি সুচলোমুখো একটা স্লেজ টেনে আনছিল — যা জলের তলা থেকে ভারী জিনিস তুলতে সক্ষম। জলযানের জোনাকী আলো অল্পসময়ের মধ্যে সার্চলাইটের সঙ্গে মিশে গেল। সেটা ইয়াটোর দিকে এগিয়ে আসছে। লাগোঁ এখানেও স্থির অঞ্চল সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

জলযানের হেডলাইট যথাসময়ে জলি বোটের দিকে ফিরে গেল। তার ওপর সুন্দরভাবে চাপানো আছে সেই ত্রিপলটি। আর সেটি সমুদ্রপৃষ্ঠে বিছিয়ে দিলে খুব কাছ থেকেও এটাকে চেনা যাবেনা। ডুবুরিরা ডুবে যাওয়া প্লেনটিকে ঢেকে দিয়ে চারপাশ লোহার গজাল দিয়ে এমনভাবে আটকে রাখবে যে, যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘোঁষ এটাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। বাকি আটজন ডুবুরি সমুদ্রের নীচে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করে চলেছে। এর জন্যে যে কী ধরনের প্রশিক্ষণ দরকার এবং এই ‘প্ল্যান ওমেগা’র পেছনে যে কী সাংঘাতিক পাকা মাথা কাজ করছে লাগোঁ সেটা ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেল।

কিছু পরে আটজন ডুবুরি তলা থেকে উঠে এল। সাঁতার কেটে জলি-বোটের কাছে এসে মই বেয়ে ডেকে উঠে এল। বোটের মেকানিক এবং সেই হত্যাকারী জার্মানটা তাদের পোশাক সাজ-সরঞ্জাম খুলতে সাহায্য করল। সার্চলাইট নেভানো হল। জেনারেটর স্তব্ধ। বোটটা ইয়াটোর গায়ে লাগা মাত্র যাত্রী সমেত সেটাকে তুলে আনল।

ইয়াটোর ক্যাপ্টেন — একটা লম্বা, হাড়সর্বস্ব লোক লাগোঁর কাছে এল। একে কানাডিয়ান নেভি থেকে মাতলামি আর অভব্যতার জন্য তাড়িয়ে দিলে সে লাগোঁর দলে আসে। একবার সে লাগোঁ কথার প্রশ্ন তোলায় পুরস্কারস্বরূপ একটা পুরো চেয়ার তার মাথায় ভাঙেন লাগোঁ। তারপর থেকে সে লাগোঁর একজন অতি আঞ্জাবহ চাকর। সে বললে — ‘খোল পরিষ্কার। এখন রওনা হওয়া যেতে পারে।’

লাগোঁ বললে — ‘আশা করি ডুবুরিরা খুশি। কোনো রকম গণ্ডগোল করেনি। ওদের এক গ্লাস করে ছইস্কি দিয়ে বিশ্রাম করতে বল। এক ঘন্টা পর আবার নামতে হবে। কোৎসেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইয়াট ছাড়বার ব্যবস্থা করো।’

পদার্থবিদ কোৎসের চোখে আনন্দের অশ্রু এসে পড়েছে। আনন্দে উত্তেজনায় সে কাঁদছে। তাকে স্থির করার জন্য লাগো বললে — ‘আশা করি খেলনার দোকান থেকে তোমার মনোমতো খেলনা পেয়ে খুশি হয়েছ।

কোৎসে আনন্দে প্রায় চৌচিয়ে উঠল — আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না এরকম একটা অস্ত্রের কথা। কী নিরাপদ। বাস্তবগুলো বেশ বড়ো নির্বিঘ্নে কাজ করা যায়। ফিউজ সারিয়ে টাইম ফিউজ অতি সহজে লাগানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে।

‘আর ইগনাইটের দুটোকে ডুবুরিরা পাইলটের সিটের নীচে সীসের বাস্ত্রে ছিল। যেখানে নোমা দুটো লুকোনো থাকবে তারই আশেপাশে থাকবে ওয়াটার টাইট রবারের বাস্ত্রের মধ্যে।

লাগোঁর প্রশ্নের জবাবে কোৎসে বললে — তেজস্ক্রিয়তার আপাতত কোনো ভয় নেই। কারণ সব সীসের বাস্ত্রে ভরা। আর তাছাড়া আমার গায়ে তেজস্ক্রিয় প্রতিষেধক স্যুট আছে। আমি খুব সাবধানী।

তোমার সাহসে প্রশংসা করতে হয়। আমি ওর ধারেকাছে গিয়ে আমার যৌন-জীবনের ক্ষতি করতে পারব না। আশা করি তুমি খুশি এবং প্লেন থেকে সবকিছু নিরাপদে বার করা হয়েছে।

বোমা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান পরিকল্পনার বিষয় প্রাণ খুলে বলে এখন যেন তিনি নিঃশ্ব হয়ে গেলেন। ক্লান্ত বোধ করছেন। তার ভয় ছিল যদি ইংরেজরা এর কোনো বিকল্প কিছু বানিয়ে ফেলে যা তিনি জানেন না। এটা তাঁর বিরাট জয়, বিরাট গর্ব।

কোৎসে এখন নিশ্চিত। সব কিছু তার হাতের মধ্যে। কেবল কিছু রুটিনকাজ বাকি।

লাগোঁ কোৎসের কাজকর্ম লক্ষ্য করছেন। এখন আর এর প্রয়োজন নেই। সরিয়ে দিলেই হয়। বিজ্ঞানীরা কোনো বিপদের কথা চিন্তা করে না। কেবল নিজেদের কাজেই ব্যস্ত। ওকে এখন জিইয়ে রাখতে হবে শুধু বোমা দুটো ফাটানোর জন্যে।

লাগোঁ ইয়াটোর ককপিটে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিলে ইয়াটো প্রথমে আস্তে পরে তির বেগে ছুটতে শুরু করল। ইয়াটোর গতি এখন কুড়ি নট (knot)। হাইড্রোফয়ালের চাকা এখন মিনিটে ৫০০০ বার ঘুরছে। পরে গিয়ারের কাঁটা উঠল ৪০ নট-এ।

এই ‘ডিস্কো ভোলান্ডে’ ইয়াটে লাগোঁর জন্যে ইটালি থেকে তৈরি করিয়েছে প্রেত সংঘ। যার খরচ পড়েছে প্রায় দু’লক্ষ পাউন্ড। ওলন্দ একশো টন। এর আরোহী এবং অন্যথা কিছু আছে সে সব পৃথিবীর আর অন্য কোনো জল-যানে আছে কিনা সন্দেহ। বাহামা দ্বীপের আশেপাশে অল্প জলে খুব সহজেই ঘুরতে পারবে।

ডিস্কোকে ফ্লোরিডার কাছে নামানো হয়। এখানে লক্ষ্যপতিদের ছড়াছড়ি। লাগোঁ ডিনার, ককটেল এবং শেখানো নাবিকদের সাহায্যে মদের দোকানে প্রচার করা হয় যে লাগোঁ একজন বিরাট কোটিপতি। একটা স্পেনদেশীয় ডুবোজাহাজের খোঁজও তিনি পেয়েছেন। সেই গুপ্তধনের একটা মানচিত্র ও দস্যুদের কাছ থেকে পেয়েছে। অপেক্ষা কেবল ইউরোপীয় শেয়ারহোল্ডারদের আসার জন্য। তারা এলেই কাজ শুরু হবে।

দেখা গেল পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে উনিশ জন ধনী শেয়ারহোল্ডার নাসাউ এসে উপস্থিত। ইয়াটো সমুদ্রের বুকে বিরাট গর্জন তুলে পাড়ি দিল গুপ্তধনের উদ্দেশ্যে। শেয়ারহোল্ডাররা ভাবলেন যদি গুপ্তধন নাও পাওয়া যায় তবু দিন সাতেক এই নাসাউ-এর সুন্দর রৌদ্রভরা দ্বীপে ছুটি কাটানো যাবে।

এই দক্ষিণ দিকটাই গুপ্তধনের জায়গা। সাধারণত জলদস্যুদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সব ধনরত্নবাহী জাহাজ এই পথ ধরত। শোনা যায় ১৬৬৬ সালে ‘পোর্তো পেদ্রো’ দশ লক্ষ পাউন্ড

সোনা, ১৬৯৪ সালে হারানো সান্টাক্রুজ। কুড়ি লক্ষ পাউন্ড সোনা সমেত এবং ১৭১৯ সালে 'এল কপিতান' ও 'স্যান পেদ্রো' দশ ও পাঁচ লক্ষ পাউন্ডের ধনরত্ন নিয়ে ঐখানেই ডোবে।

প্রতিবছর এরকম ডোবা জাহাজ খোঁজা চলে। আর ১৯৫০ সালে নাসাউ-এর দু'জন ব্যবসায়ী ৭২ পাউন্ডের রূপোর বাট পাওয়া সবাই জানে। সেটা নাসাউ ডেভালাপমেন্ট বোর্ডকে উপহার দেওয়া হয়েছে। তাই যখন ইয়েটো দক্ষিণের দিকে গেল সকলের ধারণা ধনরত্ন-এর খোঁজেই গেছে।

তখনও পরিপূর্ণভাবে চাঁদের আভাস মেলেনি। ডিস্কো বেশ কিছুটা পথ যাবার পর একটা চক্র মেরে দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে তার যাত্রাপথ করল। নাসাউ এখান থেকে ১০০ মাইল, দু ঘন্টার পথ। আর একটা কাজ বাকি।

চার্টের ওপর ঝুঁকে পড়ে লাগে দেখলেন তাঁর যাত্রাপথ ঠিকই আছে। আর মাত্র ৫০ মাইল অর্থাৎ এক ঘন্টার পথ। এখন এগারোটা বেজে গেছে। ব্রোফেন্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আগের কাজগুলো সব ঠিকমতো হয়েছে, শেষেরটায় বেশ ভালো রকম সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

একটা ছোট্ট প্রবাল দ্বীপ। 'ডগ আইল্যান্ড'। দিনের বেলায় একে দেখা গেলেও রাত্রে এর অস্তিত্ব বোঝা যায় না। তাই নাবিকদের কাছে এটা খুবই ভয়াবহ। এর থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। ডিস্কোর গতি কমে গিয়ে 'ডগ আইল্যান্ডে'র কাছে গিয়ে নোঙর ফেলল। ডিস্কোর খোলার ভেতর লাগে আর চারজন ডুবুরি অ্যাকোয়ালাংস পরে প্রস্তুত কখন জলের তলার দরজাটা (Hatch) খোলে। লাগের হাতে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক টর্চ। ডুবুরিরা দু'জন করে ভাগ হয়ে আছে, তাদের দু'জনের মধ্যে তারের দড়ি দিয়ে একে অপরের সঙ্গে বাঁধা। তার মাঝে ছাই রঙের রবারের থলেতে রয়েছে ছ'ফুট লম্বা একটা করে মোচার মতো জিনিস।

আপ্তে আপ্তে ভেতরে জল ঢুকলে পাঁচজনে নীচে নেমে সাঁতার কাটতে শুরু করল নীচের দিকে। লাগে প্রথমেই আলো জ্বালল না, অন্য মাছ বা হাঙর বা ব্যারাকুডারাও আসতে পারে তাতে অন্য ডুবুরিরা একটু ভয় পেতেও পারে।

সমুদ্রের ভেতর দিয়ে চাঁদের আলোয় কুয়াশায় ভরা রাস্তায় ওরা সাঁতার কেটে চলল প্রবাল দ্বীপের দিকে। প্রবালের চাঙড় আর গাছগুলোকে দেখে বেশ রহস্যময় লাগছিল।

প্লেনটা ডুবেছিল একটা খোলা জায়গায়। সমুদ্রের তলার এইসব রহস্য দেখলে যেকোনো লোকের নার্ভ ফেল করবে। যারা বহুবার এসব জায়গায় যাতায়াত করেছে একমাত্র তাদের পক্ষেই যাওয়া আসা করা সম্ভব। তাই লাগে এই দলের নেতৃত্বে এসেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা বোমা দুটো কীভাবে লুকোনো আছে সেটা জানা দরকার। কোনো রকম গুণ্ডগোল হলে হয়তো তাকেই ঐ বোমা দুটো উদ্ধার করতে আসতে হবে।

সমুদ্রের তলা থেকে দ্বীপটাকে অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মতো দেখা যাচ্ছে। তলাটা সমুদ্রের জলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে এরকম হয়েছে। লাগে টর্চ জ্বাললেন। সামুদ্রিক জীবদের মধ্যে ছড়োছড়ি পড়ে গেল। ফ্যাকাশে রঙের সী-আর্চিন, সী-এগ, চলন্ত সামুদ্রিক গুল্ম, সামুদ্রিক চিংড়ি মাছ, প্রজাপতি মাছ আর চাঁদা মাছ — এ রকমের বহু জীব।

জলের নীচে দ্বীপের তলায় একটা দশগজ লম্বা গুহার সামনে লাগে এসে টর্চ জ্বলে তার সঙ্গীদের আসতে নির্দেশ দিলেন। তারা এলে সেই গুহার ভেতর প্রবেশ করে তার দেওয়ালে তার লোকেরা হাতুড়ি মেরে দুটো দোলনা তৈরি করে ফেলল। অ্যাটম বোমা দুটো রাখার জন্য।

ওই দোলনার ওপর বোমা দুটো রেখে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে দিলে বোমা দুটো ঠিক থাকবে। তাই ডুবুরিরা বোমাদুটোকে ওই দোলনার ওপর রেখে বেঁধে রেখে দিল রবারের থলে শুদ্ধ। এবারে তাঁর ইয়াটো সম্পূর্ণ নিরাপদ।

তারা ইয়াটে ফিরে এলে, ইয়াটে তার যাত্রাপথে পাড়ি দিল।

লার্গো তার ডুবুরির সাজ খুলে বেতারকক্ষে গেল ব্রোফেল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য।
এখানে যদিও রাত সওয়া একটা ব্রোফেল্ডের কাছে এখন সকাল সোয়া সাতটা।

অনেকক্ষণ ধরে বেতার যন্ত্রে ব্রোফেল্ডকে ধরার চেষ্টা চলছে।

‘১ নম্বর বলছি।’

‘২ নম্বর শুনছি।’

‘আপাতত সব কাজ শেষ। সফল হয়েছি।’

‘আমি খুব খুশি।’

লার্গো মনে মনে বললেন — ‘আমিও। কাজের বারো আনা হয়ে গেছে। এখন শয়তান ছাড়া আর কেউ এর খবর পাবে না।’

লার্গো নিজের ঘরে ঢুকে একটা মনের মতো পানীয় তৈরি করে তার ওপর দুটো চেরিফল দিয়ে দিল। পরে সেটা শেষ করে চেরি ফলটা মুখে পুরে বাইরে বেরিয়ে এলেন ব্রিজের ওপর।

॥ এগারো ॥

নীল রঙের MG টু-সিটারের আরোহিনী বেশ তির বেগে পার্লিয়ামেন্ট স্ট্রিটের থেকে বেরিয়ে বে-স্ট্রিটের মোড়ে এসে গাড়ির গতি হঠাৎ করে কমিয়ে ডানদিকে দেখল যে, একটা ঘোড়ার গাড়ি দুলাকিচালে এগিয়ে আসছে। তাই দেখে সে আবার গাড়ির গতি বাড়িয়ে ঘোড়ার গাড়ির সামনে যেতেই ঘোড়াটা খতমত খেয়ে জোরে মাথা নাড়তে থাকলে কোচম্যান জোরে পায়ের ঘন্টা বাজাতে লাগল। বাজনটা জোরে হলেও বেশ মিষ্টি মিষ্টি টুংটাং আওয়াজ হল মেয়েটা গাড়ির ভেতর থেকে তার হাত বার করে সিধে গাড়ি থামাল নাসাউ-এর বিখ্যাত দোকান ‘দি পাইপ অব গ্রীম’-এর সামনে।

সেই মেয়েটি দরজা না খুলেই কোমর পর্যন্ত উন্মুক্ত পা দুটো দিয়ে টপকে ফুটপাতে নামল। আর ততক্ষণে ঘোড়ার গাড়িটা তার সামনে এসে পড়েছে। মেয়েটার রূপ দেখে কোচোয়ান আর রাগ না করে বললে — মিস তোমার গাড়িটা আমার বুড়ো ঘোড়ার নাকের ডগা দিয়ে চলে গেছে। একটু সাবধান হও।

এই কথা শুনে মেয়েটি বেশ অপ্রসন্নমুখে তার দিকে তাকালে কোচোয়ান ঘোড়ার গাড়িটা নিয়ে চলে গেল। আর মেয়েটি দোকানে ঢুকে গেল।

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে জেমস বন্ড সব জিনিসটা লক্ষ করল। সে মেয়েটাকে চেনে। বেশ দেখতে। সে আশ্চর্যে আশ্চর্যে দোকানে ঢুকে দেখল মেয়েটা কাউন্টারের লোকের সঙ্গে ঝগড়া জুড়ে দিয়েছে। সে জোর দিয়ে বলছে যে, সে এমন সিগারেট চায় যা খেলে সিগারেট খাওয়ার নেশা ছুটে যায়।

কাউন্টারের লোকটি অভিজ্ঞ এইরকমের খরিদারদের সম্বন্ধে। সে যেন কিছু খুঁজছে এইভাবে তাদের দিকে তাকাল। সে জানে নাসাউ-এর অধিবাসীরা এত সহজে চটে না।

বন্ড মেয়েটির পাশে গিয়ে শাস্তকণ্ঠে বললে — তাহলে দু’রকমের সিগারেট আপনি পছন্দ করতে পারেন।

মেয়েটি তার দিকে তাকাল এমনভাবে যে — আপনি কে মশাই হরিদাস?

নিজের পরিচয় দিল — ‘আমার নাম জেমস বন্ড। আমিই একমাত্র বিশেষজ্ঞ পৃথিবীর মধ্যে যে সিগারেট ছাড়ানোর কাজে পোক্ত। আপনি ভাগ্যবতী অতি সহজে আমায় পেয়ে গেছেন।

বন্ডকে তো নাসাউ-এ এঃ আগে কখনও মেয়েটি দেখিনি। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। প্রায় ছ’ফুট লম্বা। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। কালো রং, দেখতে নিষ্ঠুর হলে কী হবে তবে ভদ্র। আর সবচেয়ে বড়ো কথা এই প্রচণ্ড গরমেও বেশ ঠান্ডা।

ভদ্রলোকের চেহারা বেশ উত্তেজক এবং আকর্ষণীয়। মেয়েটি বুঝল লোকটি আলাপ জমাতে চায় আর তারও তাকে বেশ মনে ধরেছে — ধরা দেবে তবে সহজে নয়। তাই বললে — তারপর ?

বন্দ বলে চলল — সিগারেট ছাড়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে না খাওয়া। ধরুন আপনি এক ঘন্টা অন্তর একটা করে সিগারেট খাবেন। যেই সময়টা পার হয়ে যাবে অমনি সেটা পাবার জন্য লাফিয়ে উঠবেন। সেটা খুব খারাপ। ‘তার চেয়ে বরং’ বলে কাউন্টারের ভদ্রলোককে এক কার্টুন ফিল্টারওয়ালা কিং-সাইজ ডিউক-সিগারেট আর এক প্যাকেট চেস্টার ফিল্ড সিগারেট নিয়ে দাম চুকিয়ে দিয়ে কার্টুনটা মেয়েটাকে দিয়ে মেয়েটার পেছন পেছন বাইরে এল। বাইরে প্রচণ্ড গরম। তার তেজ পাশের বাড়ি গুলোর ওপর পড়ে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। বন্দ বলল — সিগারেটের পর পানীয় ছাড়ার কথা ভাবছেন নাকি ?

মেয়েটি অদ্ভুতভাবে বন্ডের দিকে তাকিয়ে বললে — আপনি বড্ড তাড়াতাড়ি করছেন — মিঃ ও মিঃ বন্দ। এখানে প্রচণ্ড গরম। শহরের বাইরে ফোর্ট মন্টাগ-এর একটা জেটি আছে সেখানে যাওয়া যেতে পারে। আমার গাড়িতেই যেতে পারেন। তবে গাড়িটা তেতে আছে, সাবধান !

সত্যি গাড়ির সিট বেশ তেতে গেছে, তাতে তার কিছু যায় আসে না। মেয়েটাকে প্রথম চেষ্টাতেই কবজা করেছে। তাকে ভালোভাবে লক্ষ করেছে। — মাথায় খড়ের টুপি নাক পর্যন্ত নামানো। তার একপাশে লেখা রয়েছে ‘M/y ডিস্কো ভোলাস্তে’। গায়ে আকাশি ও সাদা ডোরাকাটা সিল্কের সার্ট। গায়ে কোনো রকম গয়না নেই। তার বদলে একটা কালো রঙের পুরুষালি ঘড়ি। পাশে হরিণের চামড়ার চটির সঙ্গে সঙ্গে মিল রেখে কোমরে মৃগচর্মের চওড়া বেণ্ট।

এই মেয়েটির নাড়ি-নক্ষত্র বন্দ জেনে নিয়েছে আজ সকালে — যে শ’খানেক ইমিগ্রেশন ফর্ম সে দেখেছে তাতে তার নাম ছিল — ডোমিনেটা ভিতালি। ইটালিয়ান টাইরলের বোলমানোতে জন্ম অতএব ইটালিয়ান আর অস্ট্রিয়ান রক্ত সমান সমান। পেশায় শুধু অভিনেত্রীই নয়, সে হচ্ছে সেই ইয়ার্টের ইটালিয়ান মালিক এমিলিও লাগের রক্ষিতা। বয়স উনত্রিশ হলেও দেখে বোঝা যায় না।

পুলিশ কমিশনার হার্লিং এবং ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস্-এর বড়োকর্তারা তো ওকে ইটালিয়ান বেশ্যা বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু বন্দ অতি সহজে কোনো মেয়েকে বেশ্যা বা বাজারের মেয়ে বলতে রাজি নয়, যদি সে বেশ্যা বাড়ির বাসিন্দা বা রাস্তার মেয়ে না হয়। তবে হ্যাঁ, এই মেয়েটি খুব প্রাচুর্যভরা উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে তবে নিজের মর্জিমতো পুরুষের নয়। হয়তো অনেকের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে বা হবে।

ড্রাইভার হিসেবে মেয়েরা খুব নিরাপদ কিন্তু একটা গাড়িতে ২ জন বা ৪জন মেয়ে থাকলে আর দেখতে হবে না। বিপদ অনিবার্য। তারা গাড়ি চালাতে গেলে যে সামনে রাস্তা দেখতে হয় তা ভুলে গিয়ে একে অপরের সঙ্গে শুধু কথাই বলে না তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখের ভাবভঙ্গি লক্ষ করতে ব্যস্ত। এটা অবশ্য ওদের জাতের স্বভাব।

এই মেয়েটি কিন্তু সে রকমের নয়। সে পুরুষদের মতো সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালায়। মেয়েরা সাধারণত মিরর ভিউকে তাদের মেক আপ দেখার জন্য ব্যবহার করে। এ কিন্তু তা করছে না।

মেয়েটির গাড়ি চালনা যে পুরুষদের মতো — তার কারণ দেখা গেল — সারা পথ সে বন্ডের সঙ্গে একটা কথা বলেনি। ফলে তাকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করার সুযোগ পেল বন্দ। তার সুন্দর উজ্জ্বল ও উদ্বৃত মুখটি। কামনায় ভরপুর। বিছানায় শোবার প্রথম পর্যায় সে দাপাদপি করবে, কামড়াবে, আঁচড়াবে কিন্তু পরবর্তীকালে তীব্র উষ্ণতায় তার আত্মসমর্পণ। তখন ঐ সুন্দর দুটো ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক হয়ে সাদা দাঁত বের হয়ে পড়বে।

মেয়েটিকে পাশ থেকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। তার চোখের কালো তারা দেখা যাচ্ছে। সব কিছুর মধ্যে যেন একটা রাজকীয় উগ্রতা। তার দেহটা রূপকথার রাজকন্যার মতো। তার স্বাস্থ্য সুপুষ্ট। উদ্ভূত স্তনদুটির মাঝে গভীর খাদ।

বন্দ সব দেখে শুনে বুঝল মেয়েটি একটি স্বৈচ্ছাচারী উত্তেজক রমণী — আরবি ঘোটকী — যে চায় তার সওয়ার হবে যে বীর তার উরু হবে ইস্পাতের মতো কঠিন আর স্পর্শ হবে কোমল। বন্দ ঠিক করল মেয়েটিকে বশে আনতে হবে, তবে এখনই নয়। পরে। এখন অনেক জরুরি কাজ আছে। তবে ওর এখন একজন সওয়ার আছে। আগে তাকে হটাতে হবে।

MG গাড়িটা শার্লি স্ট্রিট থেকে ইস্টার্ন রোডে পড়ে চলতে লাগল উপকূলের পাশ দিয়ে। দেখা গেল একটা স্পিড বোট-এর পেছনে একটা মেয়ে ওয়াটার স্কি করে চলেছে টেউয়ের তালে-তালে বন্ডের মন কিছুক্ষণের জন্য কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

ফ্লোরিডার পূর্ব উপকূল ধরে প্রায় হাজার খানেক দ্বীপের সমন্বয় ঘটেছে বাহামা দ্বীপপুঞ্জ। গত তিনশো বছর এই দ্বীপপুঞ্জই ছিল কুখ্যাত সব জলদস্যুদের করায়ত্ত। সেই সুমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনকার টুরিস্ট বিভাগ বেশ সুন্দর একটা বেড়াবার জায়গা বানিয়েছে। আর মাঝে মাঝে সাইনবোর্ড চোখে পড়বে যাতে লেখা আছে কালো দেড়ের (Black Beard) মিনার, বারুদ জেটি, সামুদ্রিক খাবার। দিশি পানীয় এরকম হরেক রকমের।

মেয়েটা একটা বেলে রাস্তা দেখে সে দিকে গাড়ি নিয়ে গিয়ে এমন একটা জায়গায় দাঁড় করাল যেটা একটা পুরোনো গুদাম ঘরের ধ্বংসস্তুপ। আসলে সেটা একটা রেস্টোরান্ট। সেই রেস্টোরান্ট দবজায় আঁব-বয়েছে একটা কঙ্কালের মাথা আর দুটো হাড় আড়াআড়ি ভাবে রাখা।

একটা ছায়ায় গাড়ি রেখে তারা রেস্টোরান্ট ভেতর দিয়ে ঢুকে অপর দিকে বেরিয়ে একটা জেটিতে গিয়ে উঠল। সেখানে বাদামগাছকে ছেঁটে ছাতার মতো করেছে। তারা সেইরকম একটা ছাতার তলায় জলের ধার ঘেঁসে বসল।

বন্দ ঘড়ি দেখে বলল, ঠিক মধ্যাহ্ন, আপনি কী ধরনের পানীয় নেবেন?

মেয়েটি বন্ডের দিকে চেয়ে বলল — হালকা। অনেকটা উরস্টার সস দেওয়া একটা ডাবল ব্লাডি মেরি।

বন্দ হেসে ফেলল — ‘সত্যিই খুব হালকা। তবে কড়া কাকে বলে?’ ওয়েটারকে বলল — ‘আমায় ভদকা আর টনিক, সঙ্গে একটু বিয়ার। ওয়েটার চলে গেল।

মেয়েটি একটা পা বাড়িয়ে বললে, ‘ভদকা-অন-দা-রকমকে আমি কড়া পানীয়ই বলি। এটা ডাবল ব্লাডি মেরিকে হালকা করে দেয়।’ মেয়েটির বোধহয় বসতে অসুবিধে হচ্ছে, তাই তার জুতোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল। তারপর বললে — এই গরমে এখানে যে কজন লোক এসেছে তাদের প্রায় সকলকেই আমি চিনি — কিন্তু আপনাকে তো নতুন বলে মনে হচ্ছে। কদিন এসেছেন?

বন্দ বললে — নিউইয়র্ক থেকে আজ সকালে আমি এসেছি কিছু সম্পত্তির খোঁজে। গরমের মাঝে আসাই পছন্দ করলাম, কারণ এসময় সব লক্ষপতিদের আগমন হয়। জমির দর হু হু করে বাড়ে। আবার চলে গেলে কমে যায়। তা আপনি কতদিন?

তা প্রায় ছ’মাস হবে। আপনি বোধ হয় দেখে থাকবেন একটা ইয়াটে রয়েছে কূলের কাছে নাঙর করা। ওটা করে আমি এসেছি। ডিস্কো ভোলাস্তু।

বাঃ চমৎকার দেখতে তো, আপনার নাকি?

‘না, না, ওটা আমার এক আত্মীয়ের। আমি অবশ্য ওটাতে থাকি না। ইয়েটার ঠিক উলটো

দিকে একটা সম্পত্তি আছে। জায়গাটার নাম প্যাল্‌মারা — ওটা এক ইংরেজের সম্পত্তি। বিক্রি করার মতলবে আছে। জায়গাটা ভালো, বেশ নির্জন।

আমারও ইচ্ছে ঐ জায়গাটা নেবার।

মেয়েটা সাতদিনের মধ্যেই চলে যাবে ওনে বন্ড বললে — বড়ো দুঃখ পেলাম।

-- 'আপনি কি ফ্লাট করতে চাইছেন?' মেয়েটা হেসে ফেলে বললে — 'দেখুন ঠিক সেরকম ভাবে বলিনি। আসলে এখানে আপনার মতো যুবকের দেখাই পাওয়া যায় না। তাই সেই যাট বছরের বুড়োরা মেয়েদের দেখলেই তাদের লাল গড়িয়ে পড়ে। শেষে ধমক দিয়ে থামাতে হয়। আর আপনি যদি এক পাঁশনে আর নীল সার্ট পরে ঘুরে বেড়ান তবে বুড়ি ভদ্রমহিলাদের লাইন লেগে যাবে।' বলে মেয়েটি কুলকুল করে হেসে উঠল।

— আচ্ছা তাঁরা কি লাঞ্চে সেক্স তরকারি খায়?

— নিশ্চয়ই।

তাহলে আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বড়োজোর কংক মাছের তরকারি খাওয়াতে পারি।

আপনি তো নাসাউ-এর অনেক কিছু জানেন দেখছি?

না, না, কংক মাছ যে খুব উত্তেজক খাবার এটা পৃথিবীর সব দেশই জানে। সাধারণত বিয়ের রাতে এই মাছ খায়। তবে আমার কোনো উপকারে আসেনি।

'আচ্ছা!' মেয়েটা দুট্টুমি হাসি হাসল। 'আমারও না।'

বন্ড এবার বলল, 'তাহলে এক কাজ করা যাক। দুজনেই কংক মাছের সুপ খেয়ে দেখি কী হয়।

পানীয় এলে মেয়েটি আধ গেলাস খেয়ে একটা সিগারেট বের করে বন্ডের লাটুটারে ধরাল। তারপর বললে, 'এতক্ষণে মনে হচ্ছে সিগারেট খাচ্ছি। তবে যে বললেন আপনি এব্যাপারে বিশেষজ্ঞ?'

'কারণ আমি প্রায়ই ছেড়ে থাকি কিনা।' এবার কথার প্রসঙ্গ পালটে বললে, 'আপনার কথায় ইটালিয়ান টান থাকলেও এত সুন্দর ইংবাজি কী করে বলেন?'

'আমার নাম ডোমিনেটা ভিতালী। আমায় পড়াশুনার জন্যে ইংল্যান্ডে পাঠায় আমার বাবা মা। তারপর আমায় পাঠানো হল RADA (Royal Academy of Dramatic Art)-এ অভিনয় শিখে ভালো অভিনেত্রী হওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার বাবা-মা একসঙ্গে মারা যায় ট্রেন অ্যান্ডিডেন্টে। হল না অভিনেত্রী হওয়া। ফিরে এলাম ইটালিতে নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য। সেই থেকে ইংরেজিটা আমার সঙ্গী হয়ে রইল। বাকিসব ভুলে গেলাম। ইংল্যান্ডের মাথা অভিনয়ের সঙ্গে ইতালি খাপ খায় না।

— আচ্ছা, ঐ ইয়াট-এর মালিক যে আপনার আত্মীয়। তিনি তখন আপনাকে দেখতেন না।

ছোট্ট উত্তর — 'না। তবে উনি আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়। অনেকটা অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং অভিভাবক। তাঁর নাম লাগোঁ। এমিলিও লাগোঁ। এখানে এসেছেন কিছু গুণ্ডনের জন্যে। আশা করি আপনি ওঁনার নাম শুনে থাকবেন।

বন্ড এবার আগ্রহ দেখাল — আচ্ছা! তাহলে তো দেখা করতেই হবে। সত্যি কিছু আছে নাকি?

— সেটা একমাত্র ভগবানই জানেন। কাউকে কিছু বলেন না। একটা ম্যাপ আছে ওনার কাছে। যখনই উনি যাত্রা করেন আমায় এই তীরেই থাকতে হয়। তিনি অনেক টাকা চেলেছেন। শেষারের লোকেরাও এসে গেছে। যোহেতু আমরা আর সাতদিনের মধ্যে চলে যাব। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।

আচ্ছা এই শেয়ারহোল্ডাররা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান। যে আগে সম্ভান পাবে সে-ই নিয়ে পালাবে। ডোবা জাহাজটা প্রবালের পাহাড়ের খাঁজে এমনভাবে আটকে আছে। যেখানে যাওয়া খুবই শক্ত। 'লোকগুলো ভালোই মনে হয়। তবে তারা বাবসা ছাড়া আর কিছুই জানে না। আবার তারা বাজে না-ও হতে পারেন। লাগে আজ ক্যাসিনোতে ওদের একটা পার্টি দেবেন।

আচ্ছা, আপনি তাহলে সারাদিন কী করেন?

— কী আর করি। এখার ওখার ঘুরে বেড়াই গাড়ি করে। ইয়াটের জন্য কেনাকাটা করি। আর আমার একটা অ্যাকোয়ালাং আছে। আমার জলের তলায় সাঁতার কাটতে খুব ইচ্ছে করে। তাই সঙ্গে একজন জেলেকে নিই।

-- আমারও তাই খুব ইচ্ছে। তাই সঙ্গে করে সব সাজসরঞ্জাম নিয়ে এসেছি। আপনি আমায় একটা ভালো জায়গা দেখিয়ে দেবেন তো।

মেয়েটা ঘড়ি দেখে বলল — এবার আমায় যেতে হবে। আপনাকে সঙ্গ দিতে পারবনা। অন্য দিকে যাব। এখানকার লোকেরা আপনাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবে। মেয়েটা চটি পরে এগিয়ে গেল।

বন্ড মেয়েটাকে গাড়ি অবধি এগিয়ে দিতে এল। তারপর বলল — আজ রাতে আশা করি ক্যাসিনোতে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

মেয়েটা খুব অন্তরঙ্গের হাসি হেসে বললে — 'বোধ হয়। তারপর গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে চলল। বন্ড লক্ষ করল মেয়েটা ডানদিকে নাসাউ-এর দিকে গেল।

বন্ড ফিরল রেস্টোবার বিলের টাকা মেটাবার জন্য, তারপর একটা ট্যাক্সি।

॥ বারো ॥

বন্ড ইস্টারফিল্ড বিমান বন্দরের দিকে চলল। একটা বেজে পনেরোতে CIA-এর লোকটি আসার কথা। তারা এমন একটা যন্ত্র আনবে যার সাহায্যে টেলিগ্রাফ অফিসের সাহায্য ছাড়াই লন্ডন এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

নিউ প্রিভিডেন্স নামে দ্বীপটি নাসাউ শহরে অবস্থিত। একটা বালিয়াড়ি বিশেষ। এর সমুদ্র তটের ওপর লক্ষপতিদের দামি সাজানো বাগান নজরে পড়ে।

এখানকার রাজ্যপালের ADC তার সঙ্গে দেখা করতে এল সাতটার সময়। এতে বোঝা যায় তার আসার যে গোপনীয়তা রক্ষা করার কথা ছিল তা হয়নি। তাকে নিয়ে যাওয়া হল রয়াল বাহামিয়ান হোটেলে। সেখানে স্থান করে সমুদ্রতটের দিকের জানলায় বসে প্রাতরাশ শেষ করল।

তারপর নটার সময় গেল গভর্নমেন্ট হাউসে, সেখানে পুলিশ কমিশনার আর অন্য পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা।

এখানকার আবহাওয়া মোটেই সুবিধের নয়। লন্ডন থেকে জরুরি সর্বাপেক্ষা গোপনীয় আদেশ খবরের জোয়ারে সবাই ভেসে যায়। তারা বন্ডকে পুরোপুরি সাহায্য করবে বলেছে।

রোডিক, সহকারী রাজ্যপাল বন্ডকে সব কিছুই বোঝাবার চেষ্টা করছেন — মিঃ বন্ড চার ইঞ্জিন সহ অতবড়ো প্লেন নামাবার একটা বিমানবন্দর — আর সেটা হচ্ছে নাসাউ। সেখানে কিছু নেই। আর আশপাশের সমস্ত বড়ো বড়ো দ্বীপেও আমি খোঁজ নিয়েছি — তাদেরও আশেপাশে মায় সমুদ্রে কোনোরকম প্লেনেব হুদিস নেই। আবহাওয়া স্টেশনের রাডারেও সেরকম কিছু নেই।

বন্ডের প্রশ্ন — রাডারে দিনেব বেলায় দৃষ্টি রাখা হয়, কারণ, তখনই প্লেনের যাতায়াত বেশি। কিন্তু রাএ? খুবই কম, অতএব নজরও কম থাকে।

সৌম্যদর্শন চল্লিশোর্ধ্ব পুলিশ কমিশনারটির কাজ মনে হয় তার পোশাকের ওপর রূপোর

বোতাম আর পদকগুলো পরিষ্কার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বললেন —বিমান বন্দরের বড়ো কর্তা বলেছেন তাঁদের একে লোক কম। তার রাডারও ছোটো। আর এদের দক্ষতা লন্ডনের বিমানকর্মীদের মতো নয়, সেই জন্য রাতের দিকটা একটু শিথিলই থাকে।

— নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই — আর কমান্ডার বন্ড তো নিজেই সব তদন্ত করবেন। মিঃ পিটম্যান, সম্প্রতি এই দ্বীপে কোনো সন্দেহজনক লোক এসেছে কিনা — তার পুরো রিপোর্ট চেয়েছে।

ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস-এর বড়োকর্তা মি. পিটম্যান বললেননা স্যার সে রকম কোনো খবর গত দু'সপ্তাহের মধ্যে নেই। সমস্ত ইমিগ্রেশন ফর্ম এখানে আছে — যাঁরা আছেন তাঁরা সাধারণত খুবই পাঁচমিশেলী টুরিস্ট এবং ব্যবসাদার। মি. বন্ড ইচ্ছে করলে সেগুলো দেখতে পারেন।

— আর আমাদের এখানের বহু বহু হোটেলে ঘরোয়া ডিটেকটিভ আছে। সন্দেহভাজন কিছু দেখলে এখনই খবর পাওয়া যেতে পারে।

বন্ড বলল -- একটা প্রশ্ন--

সহকারী বাজ্যপাল ব্যস্ত হয়ে পড়লেন — বলুন, বলুন, আপনাকে সাহায্য করার জন্যই তো আমরা এখানে রয়েছি।

দেখুন, আমি খুঁজছি যাদের — তারা সবসময় দলবদ্ধ হয়ে থাকে। কখনও দশ কখনও বিশও হতে পারে। তারা কয়েক মাস বা কয়েক সপ্তাহ আগে এসে থাকতে পারে। এখানে নানারকমের লোক আসে যেমন, কোন ধর্মীয় সংস্থা, কোনো টুরিস্ট সংস্থা বা বিক্রেতার। তারা ইচ্ছে করলে কোনো বড়ো হোটেলে একটা ব্লক নিয়ে থাকতে পারে এবং তাদের মিটিং বা ওই জাতীয় সব কিছুই করতে পারে। এখন বলুন তো এরকমের কোনো খবর আছে কি ?

মি. পিটম্যান বললেন, 'সেরকম লোকের ভিড়ই তো বেশি। তবে গত দু'সপ্তাহে এখানে এসেছিলেন — 'নৈতিক জীবন পুনরুদ্ধার সমিতি' এমারেল্ড ওয়েভ হোটেলে, আর টিপটপ বিস্কটের কর্তাব্যক্তির — তা তারা তো চলেও গেছেন।' একটা গর্বের হাসি। যেন বিরাট কোনো গুপ্ত খবর দিয়েছেন।

— ইয়েস মি. পিটম্যান, আমি যাদের খুঁজছি। তাদের ওপরের আচরণ হচ্ছে, সম্ভ্রান্ত, ভদ্র। তাদের এই আচরণের আড়ালে রয়েছে সেই প্লেন চোররা। এই রকম কি কোনো দল আছে ?

— এখন তো আমাদের এইখানে বাৎসরিক গুপ্তধন খোঁজার হিড়িক পড়েছে। আর তাদের মধ্যে থেকে এদের খুঁজে বার করা অসম্ভব।

— এবার পুলিশ কমিশনার বেশ সংশয়ের সঙ্গে বললেন — এই দলে একটা ইয়াট এবং একটা ছোটো প্লেনও আছে। তাদের শেয়ার হোল্ডাররাও এসে পড়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে, ওই ইয়াটের নাবিকেরা এর মধ্যে একদিনও মাতলামি করেনি। এদের মধ্যে মি. লাগো হচ্ছেন সেই রকমের একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক।

এই সংবাদটা ধরে বন্ড সেখানে প্রায় আরও দু'ঘন্টা কাটিয়ে তারপর বেড়াবার জন্যে শহরে বের হলেন এই উদ্দেশ্যে যে, যদি লাগোর দলের কোনো লোকের সম্বন্ধে কোনোরকম গল্পগুজব শোনা যায়। আর তার ফল হল ডোমিনোভিতালির সঙ্গে আলাপ।

এবার— ?

বিমানবন্দরে ট্যান্ড্রি এসে দাঁড়ালে শোনা গেল লার্কিনের প্লেন আসার খবর। বন্ড বুঝল যে কাস্টমস-এর ব্যামেলা চুকিয়ে বাইরে আসতে সময় লাগবে। তাই একটা দোকানে গিয়ে একটা খবরের কাগজ কিনে দেখল বড়ো বড়ো অক্ষরে সেই প্লেন চুরির খবর প্রকাশ এবং NATO

গোষ্ঠীর বিষয়ে গভীর আলোচনা। কিছুটা পড়েছে এমন সময় পেছন থেকে একটা শান্ত স্বর '০০৭ নিশ্চয়ই? নম্বর ০০০-এর সঙ্গে আলাপ করুন।'

০০৭ বলে ডাক শুনে সে একটু চমকে পেছন ফিরে দেখে যে, সেই CIA-এর আদিতীয় ফেলিক্স লিটার, যে বন্ডের সঙ্গে আগে কয়েকটা অ্যাডভেঞ্চারে সঙ্গী হয়েছিল। তার ডান হাতে তালুর পরিবর্তে ইস্পাতের হুক লাগানো। সে হেসে সেই হুক দিয়ে ডাকে অভিবাদন করে বললে বন্ধু চল, যেতে যেতে সব বলব। মালপত্রের আগে এগিয়ে গেছে।

-- 'শা-লা ' আবার তুই। আমি এখানে তুই জানতিস?'

— অবশ্যই।

বাইরে এসে লিটার তার মালপত্র বন্ডের ট্যাঙ্কিতে তুলে ড্রাইভারকে বললে — এই মালগুলো সব রয়াল বাহামিয়ামে পৌঁছে দিতে। কাছে একটা সাদামাটা গোছের ফোর্ড কনসাল গাড়ির পাশে এক ভদ্রলোক ছিল। সে এগিয়ে এসে বললে — সে হার্ভজ কোম্পানির থেকে এসেছে যেরকম গাড়ি চেয়েছিলেন সেই বকমই আশাকরি এটা হবে।

লিটার গাড়িটা দেখে বললে — ঠিকই আছে। আমি চাই যে গাড়ি ছুটবে। কাজ দেবে। আমি সম্পত্তির দেখাশোনা করার জন্যে এখানে এসেছি, ডব্বকা মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করতে নয়।

সেই লোকটা লিটারের নিউইয়র্কের লাইসেন্স দেখে তাকে একটা কাগজে সই করতে বললে এবং তার ডাইনাস ক্লাবের নম্বরটা টুকে নিল। তারপর বললে -- 'আপনার মিটে গেলে আপনি যেখানে খুশি গাড়িটা রেখে শুধু আমাদের একটু জানিয়ে দেবেন — আমরাই গাড়ি নিয়ে আসব। আমি যাই স্যাব। আপনার ছুটি খুব সুখের হোক।'

দুজনে গাড়িতে বসল। বন্ড স্টিয়ারিং-এ। গাড়ি চলতে শুরু করলে বন্ড লিটারকে জিজ্ঞেস করে - এখানে কী ভাবে এল।

উত্তরে লিটার বললে — আমাকে শ্রেফ ধরে এনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তুমি যদি একবার CIA-এর হয়ে কোনো কাজ করেছ তো ব্যাস তোমার নাম রিজার্ভ লিস্টে ঢুকে গেল। আর 'খান্ডারবল'-এর কেস যখন হাতে এল তখন মনে হয় লোক কম থাকায় মি. বুড়ো অ্যালেন ডালেস আমার মতো আরও জনা কুড়িকে তলব করলেন যে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট করতে হবে।

— আরে আমার ধারণা ছিল রাশিয়ানরা এই কাজে নেমে পড়েছে। তারপর ওরা আমার সব খবর দিয়ে নাসাউ-তে পাঠিয়ে দিলে আর বললে তোর সঙ্গে কাজ করতে হবে। তাই আর দ্বিধা না করে তুই যা যা চেয়েছিলি সব নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে এখানে চলে এলুম।

এই হল আমার ইতিহাস। তবে খুব ভালো লাগছে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে আর কাজ করতে।

বন্ড লিটারকে M-এর অফিসে ঢোকানোর পথ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সব ঘটনা বলল। এমন কী হেডকোয়ার্টারের বাইরে গুলিগোলায় কথায় বলল।

তাকে থামিয়ে দিয়ে লিটার বললে — আমার কাছে এটা একটা অদ্ভুত যোগাযোগ মনে হচ্ছে। আচ্ছা এ সম্পর্কে তোর ধারণা কী? হ্যাঁরে কার -ওর বউকে নিয়ে কী লটঘট করেছিলি নাকি? এসব বোমাবাজি তো শিকাগোতে সম্ভব কিন্তু লন্ডনে—?

বন্ড বেশ গভীর হল। 'এসব তো কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। একজন লোক দিয়ে আমার মেরে ফেলা খুবই সহজ। কিন্তু একটা ক্রিনিকে এইসব অখাদ্য খাবার কী করে দেয়? আর সেখানেই তো সেই হারামিটার সঙ্গে দেখা হয়।' বন্ড শ্রাবল্যান্ডের সব ঘটনা লিটারকে বললে আর সে বেশ মজা করে সব শুনছে।

বন্ড বলে চলেছে — আমি জানতে পারি যে ওই শালা চিনাদের 'রক্তবজ্র' র সঙ্গে যুক্ত। তাই আমি যখন টেলিফোনে এদের সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছি, শালা নিশ্চয়ই আড়াল থেকে শুনে থাকবে,

তাই আমায় মেবে ফেলতে চেয়েছিল। আর আমিও তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলাম তাকে জ্যান্ত রোস্ট করার ব্যবস্থা করে। বন্ড তাকে সব ঘটনা বলল।

পাগলাদের জায়গাটা কোথায়?

জায়গাটা হচ্ছে তোদের ওয়াশিংটনের অনেক ঠান্ডা আর ছোটো। ব্রাইটনের কাছে। সেটারও নাম ওয়াশিংটন।

— আর সেই বিশেষ চিঠিটা এই ব্রাইটন থেকেই পোস্ট করা হয়।

— বুঝলাম। এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে নাকি?

আচ্ছা আর একটা দিক হচ্ছে -- প্লেনটা রাত্রে চুরি করে রাত্রেই পাচার করা হয়েছে, আর সেটা হয়েছে পূর্ণিমার পাঁচদিন পরে। তোর ওই বলসানো হারামিটার ওপর চিঠি পোস্ট করার ভার ছিল। কিন্তু বলসে যাওয়ার জন্য দিন সাতেক দেরি হয় তাতে ওর কর্তারা বেশ চটে যায়।

-- আচ্ছা -

— যদি ধরা যায় যে, এই ঠিকমতো কাজ না করার জন্য ওকে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হল। আবার এটাও ধরা যেতে পারে যে, ওই লোকটা তোর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য সে তৈরি ছিল। এটাও হতে পারে। নয় কি?

বন্ড ওর প্রশংসা করে হেসে বললে — মনে হয় তুই মেশা করছিস আজকাল। বাচ্চাদের পক্ষে বেশ ভালো গল্প। তবে আসলে তা হয় না।

আসলে কিন্তু বোমাসুদ্ধ প্লেন হারাল। জেমস মনে কর তোতে আর আমাতে যে সব কেস করেছি তা কি কেউ বিশ্বাস করবে? কি তা ঘটেছে?

বন্ড বললে - 'ফেলিক্স, তোর কথায় যুক্তি আছে। তুই যে যন্ত্র এনেছিস, তার সাহায্যে আজ রাত্রেই M-কে ব্যাপারটা জানাব। দেখি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কিছু সূত্র বাব করতে পারে কিনা। ওই ক্লিনিক আর ব্রাইটনের হাসপাতাল — এদুটো জায়গায় খোঁজ করলে অনেক কিছু খবর পাওয়া যাবে। তবে সেই মোটরবাইক আরোহী, যে বেশ পেশাদারীর মতো কাজ করেছে, তাকে ধরা বেশ শক্ত।

— আমার প্ল্যানটা M কে জানাস। ঝঁজা করিস না যেন।

তাদের গাড়ি রয়াল বাহামিয়ান হোটেলে গিয়ে থামলে বন্ড পার্কিং অ্যাটেন্ড্যান্টকে চাবি দিল আর লিটার হোটেলের খাতায় সই করে ওপরে তাদের ঘরে গিয়ে দুটো ডাবল ড্রাইমার্টিনি, অন দ্য রকস এবং মেনু আনতে বলল।

মেনু কার্ড দেখে বন্ড অর্ডার দিল বিশেষ দ্রষ্টব্য লেখা খাদ্যের মধ্যে থেকে স্থানীয় সামুদ্রিক মাছ, মুরগি, সোতে ও ফ্রেসো — তার পাশে লেখা পরম পালিত মুরগির বাচ্চা দিয়ে তৈরি। আব আপনার সুবিধের জন্য তার সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদা করা। দাম ৫.৩৫ ডলার।

ফেলিক্স লিটার মনমতো খাবার নিল দাম ৫.৬৫ ডলার।

ওরা জানে যে এইসব রান্না করা হয়েছে ৯ মাস আগে আর ঠান্ডা ঘরে রাখা। এইসব হোটেলে এই রকমই হয়। তাই তাদের গালাগাল দিয়ে বালকনিতে বসে দু'জনে আলোচনা করতে শুরু করল।

আধঘন্টা পরে আবার দুটো ডাবল ড্রাই মার্টিনির পর তাদের খাবার এল। খাবার দেখে লিটার প্রচণ্ড খেপে যায়। তার কাঁটা চামচ ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর বললে, (চুলোয় যাক) খাওয়া এখন বলো আমাদের কী করণীয়?’

বন্ড বললে — এই সিদ্ধান্ত হল এরপর থেকে বাইরে যেতে হবে। আর ওই ইয়াটেটাকে ভালোভাবে ঘুরে দেখতে হবে। তবেই আমরা বুঝতে পারব ওদের অনুসন্ধানটা ঠিক কী? স্প্যানিশ গুপ্তধন না দশ কোটি পাউন্ড। তারপর হেডকোয়ার্টারে সব খবর দেওয়া।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার আমাদের ওপর তলার দুটো ঘর দিয়েছে। তার মধ্যে একটাতে তোর আনা বেতারযন্ত্র বসাতে হবে আর সন্ধ্যাবেলায় অফিসে যোগাযোগ করতে হবে। আজ ক্যাসিনোতে যে পার্টি হচ্ছে তাতে লাগের দলের কাউকে চিনতে পারি কি না দেখতে হবে। তোর বাস থেকে একটা গাইগার কাউন্টার বার কর দিকিনি।

লিটার তার প্যাকিং বক্স খুলে ক্যামেরা বার করল। তার হাতঘড়ি খুলে অন্য একটা পরল। ক্যামেরাটা স্থাপন দিয়ে বাঁ কাঁধে বুলিয়ে রাখল। লিটার বললে – ঘড়ি থেকে বেরোনো তারগুলো আমার হাতার ভেতর দিয়ে কোটের তলায় নিয়ে আয়। এবার এই ছোটো দুটো প্লাগ আমার কোটের পকেটের ফুটোর ভেতর দিয়ে ক্যামেরার গর্ত দুটোয় লাগাবে। বাস, আমরা তৈরি।

এই ক্যামেরাটা হচ্ছে ভুয়ো। এর ভেতর রয়েছে যতসব যন্ত্রপাতি, খাতব বাল্ব, সার্কিট আছে। কিছু ব্যাটারি আছে। গাইগাব কাউন্টাটো চমৎকার।

এবার ঘড়িটা কিন্তু আসল। এর পেটের ভেতর কলকবজা। খুবই অল্প জায়গা নিয়েছে। এর সেকেন্ডের কাঁটা হচ্ছে তের্জাক্রিয় মাপবার যন্ত্র। এই তারগুলো মূল যন্ত্রের সঙ্গে জোড়া।

ফসফরাসে লেখা সংখ্যাগুলো লক্ষ করো। ঘড়িটা ক্যামেরার গায়ে লাগালে সেকেন্ডের কাঁটা দৌড়তে থাকে। সরিয়ে নিয়ে ধীরে চলে। শুধুমাত্র তোর ঘড়িতে কয়েক ফোঁটা ফসফরাস থাকার জন্যে।

ক্যামেবায় টোকা মেবে লিটার বললে — আমাদের ব্যাপার আলাদা। আমাদের কাউন্টার মাটির তলায়। যদি আমরা কোনোরকমে বোমা দুটোর কাছে যেতে পারি তবে সেকেন্ডের কাঁটাটা বন্বন করে ঘুরতে লাগবে। অতএব এবার চলো সেই সামুদ্রিক ডালকুত্তাটাকে দেখে আসি।

॥ তেরো ॥

তাবা হোটেলেরই একটা লঞ্চ ভাড়া করল ঘন্টায় কুড়ি ডলার। তারা পশ্চিম দিকে ছুটেতে শুরু করল সিলভার বে, লংবে ও ব্যাল্মোরল — এই কত দ্বীপ পেছনে ফেলে। তারপর ডেলাপোর্ট পয়েন্টে একটা চক্র মেবে উপকূলের ধার ঘেঁসে আরও পাঁচ মাইল গেল। সেখানে সব সুন্দর সুন্দর বাড়ি শোভা যাচ্ছে। বোটম্যান বললে এখানে প্রতি ফুটের দাম ৪০০ পাউন্ড। শেষে তারা এল সেইখানে যেখানে ঘন জঙ্গলের মধ্যে সেই ইয়াটটা প্রবাল প্রাচীরের পাশে লুকোনো রয়েছে লিটার আনন্দে নেচে উঠল।

বন্ড এই ইয়াট সম্বন্ধে বললে -- ‘এটা ইটালির মেসিনার রড্রিগস নামে এক জাহাজ কোম্পানি তৈরি করেছে। একে ‘অ্যালিকাফোস’ বলে। এব পাটাতনের নীচে একটা হাইড্রোফয়েল আছে। জোরে চলার সময় একরকম স্কিড (skid) জলে নামিয়ে দিলে এটা একেবারে উড়ে চলে। মাত্র লোজেব দিকে কয়েক ফুট জল ছুঁয়ে থাকে। সমুদ্রের জল শাস্ত থাকলে এর গতি ঘন্টায় ৫০ নট। আমার মনে হয় এই ইয়াটটাতে জনা চল্লিশ লোক ধরে। আর তার পাশে রয়েছে মালিকের নিজস্ব কয়েকটা ঘর আর মালপত্র রাখার জায়গা। এর দাম প্রায় হাড়াই লাখের মতো হবে।

বোটম্যান কয়েকটা খবর দিল - এঁরা খুব অল্পদিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়বে গুপ্তধনের উদ্দেশ্যে। এর শেয়ারহোল্ডাররা সব এসে গেছেন। জায়গাটা সঠিকভাবে বলা যায় না কোনো দিকে। হয় এধারে একজুমার দিকে নয়তো ওপারে ওয়াটকিন্স দ্বীপের পাশে। আপনাতা নিশ্চয়ই জানেন যে চোদ্দোশো নব্বই সাল নাগাদ কলম্বাস প্রথম মাটিতে পা রাখেন। গুপ্তধন রত্নের গল্পগুজব অনেক রকমের শোনা যাচ্ছে। তবে আমি এই জাহাজটাকে দক্ষিণ দিকে যেতে দেখছি। ঠিক বলতে গেলে দক্ষিণ পূর্ব আর পূর্ব দিকের দিকে।

— আমার মনে হয় এই জাহাজটার যা দাম আর যে পরিমাণ টাকা ঢালছে তাতে ধনরত্ন নিশ্চয়ই বেশ কিছু পাওয়া যাবে। আর মেরামতে বিল ওঠে পাঁচশো পাউন্ড।

বন্ডের প্রশ্নের উত্তরে বললে — ওদের শেষ পরিদর্শনটা হয়েছিল মেরামতে পরের রাতে। অর্থাৎ দুদিন আগে। ছটার সময় যাত্রা করে।

ইয়াটের কাছাকাছি এলে বন্ড লক্ষ করল একজন লোক পোর্টহোল থেকে তাদের ওপর নজর রাখছে। একজন সাদা প্যান্ট আর চওড়া ডোরাকাটা জামা পরে ডেকের ওপর উঠে মাউথ-পিসে মুখ রেখে কিছু যেন বলছে। সে আবার আর একজন নাবিককে কিছু বলে ইয়াটের ডেকের কাছে এসে মুখে হাত রেখে চোঁচিয়ে বললে — আপনাদের কী প্রয়োজন দয়া করে জানাবেন? কারোর সঙ্গে দেখা করবেন?

বন্ড উত্তর দিল -- আমি জেমস বন্ড আর আমার সঙ্গে রয়েছে আমার অ্যাটর্নি। আমরা মিঃ লাগোর সম্পত্তি প্যালমিরা সম্বন্ধে কিছু জানতে আগ্রহী।

বন্ডের কথা শুনে নাবিক ভেতরে গিয়ে আবার সেই সাদাপ্যান্ট আর ডোরাকাটা জামাপরা লোকটাকে নিয়ে ডেকে ফিরে এল। বন্ড তাকে দেখে পুলিশের বিবরণ থেকে মনে করতে পারল যে এ সেই লাগো। ভদ্রলোক তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানালেন আর সঙ্গে নাবিককে লঞ্চটা ধরতে বললেন। বন্ড আর লিটার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল।

লাগো হাত বাড়িয়ে নিজের পরিচয় দিল — আমি এমিলিও লাগো। মিঃ বন্ড আর উনি?

— আমার অ্যাটর্নি মিঃ লার্কিন। নিউইয়র্ক থেকে এসেছেন। আমি আসলে ইংরেজ। তবে আমেরিকায় আমার সম্পত্তি আছে। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য সত্যিই খুবই দুঃখিত। প্যালমি সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই যেটা আপনি মি. ব্রাইসের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছেন। পরস্পরে করমর্দন করল।

‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই’ উষ্ণ অভ্যর্থনা। পরে বললেন — ‘মাপ করবেন। আমি ঠিক আমাদের অতিথিদের অভ্যর্থনা করার পোশাকে নেই, তার জন্য মাপ করবেন। আমার অতিথিরা সাধারণত আসার আগে আমায় টেলিফোনে জানিয়ে দেয়। এই বলে তাদের একটু নীচু-হ্যাচ আর কয়েকটা অ্যালুমিনিয়ামের খাপ পেবিয়ে প্রধান কেবিন ঘরে নিয়ে গেল। রবারের হ্যাচটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

তারা যে ঘরটায় ঢুকল ঘরটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। মেহগিনি কাঠের প্যানেল দিয়ে সুসজ্জিত। ঘরের ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ডস দিয়ে সূর্যের আলো পড়ে ঝলমলিয়ে দিচ্ছে। টেবিলের ওপর অনেক কাগজ আর চার্টে ভরা। ক্যাবিনেটগুলোতে মাছ ধরার জিনিসপত্র। দেওয়ালে বন্দুক আর নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্র। এক কোণে রয়েছে জলের নীচে সাঁতার কাটার স্যুট এবং অ্যাকোয়ালাং ঝুলছে।

লাগো তাদের বসতে বলে বললেন — আপনাদের কী ধরনের পানীয় দেব? ঠান্ডা এবং কড়া মিঠের কিছু? একটা প্ল্যানটাস পাঞ্চ? জিন এন্ড টনিক। অথবা নানারকমের বিয়াব আছে আমরা এই ক্যাবিনেটগুলোতে। এইভাবে আপনাদের কষ্ট করে আসতে হত না যদি আমরা খবর পাঠাতেন, তবে আমার বোট আপনাকে আনার জন্য পাঠিয়ে দিতাম।’

বন্ড খুব বিনয়ব সঙ্গে বললে - ‘এভাবে হঠাৎ এসে পড়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য খুবই দুঃখিত। জানতাম না আপনাকে টেলিফোনে পাওয়া যাবে। আর আমরা আজ সকালেই এখানে এসে পৌঁছেছি আর কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যাব। আসলে আমরা এখানে একটা সম্পত্তির খোঁজ করছি।’ ওরা দুজনেই শুধু টনিক নিল।

‘আচ্ছা বেশ’ - - লাগো টনিকের বোতল আর গেলাসগুলো টেবিলের ওপর রেখে সবাই মিলে জমিয়ে বসে পড়ল। তারপর বলতে লাগল — এই জায়গাটা সত্যিই এত সুন্দর যে। আমি

ছ'মাস এখানে এসেছি মনে হচ্ছে বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দিই। কিন্তু এতো দাম চাইছে তা আর বলার নয়। ওই বে-স্ট্রিটের হার্মাদগুলো আর ওই লক্ষপতিরা খুব শয়তান। আকাশছোঁয়া দাম চাইছে। তবে আপনারা ঋতুর শেষে এসে খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকজন জমিদার ভালো দাম না পেয়ে চলে গেছে।

বন্দ আরাম করে একটা সিগারেট ধবিয়ে বললে — আমারও তাই ধারণা ছিল। মানে আমার অ্যাটর্নি মি. লার্কিন আমায় এরকমই পরামর্শ দিয়েছিলেন। বন্দ লিটারকে কথার মধ্যে আনার জন্য বললে — তাই তো?

লিটার তার মুখ খুলল — মি. লার্গো, এসব পাগলামির মধ্যে আমি আমার কোনো মক্কেলকে টাকা ঢালতে উপদেশ দেব না।

লার্গো এবার আলোচনা অন্য দিকে ঘুবিয়ে বললে — আপনারা প্যালমীরা সম্বন্ধে কী যেন জানতে চাইছেন?

বন্দ বললে — আমি জানি আপনার একটা সম্পত্তি লিজ নেওয়া আছে। আর গুজব রটেছে যে আপনি খুব শীঘ্রই বাড়িটা ছেড়ে দেবেন। আমি এ রকম সম্পত্তিই খুঁজছিলাম। আর এই ইংরেজ মি. ব্রাইস ঠিকমতো দাম পেলে ছেড়ে দেবেন, তাই আপনার অনুমতি চাইছি। যদি আমরা নৌকোয় চড়ে সেই জায়গাটা একবার দেখে আসি। অবশ্য যখন আপনি থাকবেন না।

লার্গো উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে বললে — নিশ্চয়ই বন্ধুবর। আপনারা যখন খুশি তখন যাবেন। সেখানে আমার এক ভাগ্নি আর কয়েকজন কাজের লোক থাকে। আর আমার ভাগ্নি তো বেশি সময় বাইরেই থাকে। আমি বরং তাকে ফোনে জানিয়ে দেব আপনার একটা ফোন যাবে।

বন্ডেব সঙ্গে লিটারও দাঁড়ায়। 'সত্যি আপনার মহানুভবতায় আমরা মুগ্ধ। আশাকরি আবার আমাদের শহবে দেখা হবে। আর আমরা আশা করব আপনি আমাদের সঙ্গে লাঞ্ছ খাবেন।' পরে একটু তোষামোদের মতন করে বললে — অবশ্য এরকম ইয়াটে ছেড়ে কেউ আর শহরে পা দিতে চায় না। আসলে আমি কোথায় যেন পড়েছিলাম যে, এটা ভেনিস আর ব্রিয়েস্তের মধ্যে চলাচল করত?

লার্গো গর্বের সঙ্গে হেসে বললে — ঠিক তাই, ইটালির লোক এরকম দেখা যায় লোক চলাচলের জন্য। এখন আমেরিকাতেও কেনা হচ্ছে। অল্প জলে এরকম যান অতি সুন্দর। হাইড্রোফয়েল চলার সময় এর মাত্র চারফুট জলের তলায় থাকে।

— লোকজন থাকার অভাব বোধ হয়?

একটু আহত সুরে লার্গো বললে — আপনারা যদি ভালো করে একবার দেখেন বুঝতে পারবেন আমাদের সেরকম অসুবিধা নেই। আমরা নাবিক নিয়ে চল্লিশজন আছি এই ইয়াটে। অথচ ঘেঁষাঘেঁষি মোটেই নেই। আপনারা যদি দেখেন? বলে স্টেটরুমের পেছনের দরজার দিকে হাত বাড়ালেন।

লিটার এতে একটু বাধা দেবার জন্য বললে -- মিঃ বন্দ আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে আজ বিকেল পাঁচটায় মি. হ্যারল্ড ফ্রিস্টার সঙ্গে একটা মিটিং আছে।

আরে মি. হ্যারল্ড খুবই ভদ্রলোক। একটু দেরি হলে কিছু মনে করবেন না। মি. লার্গো যদি আপনার হাতে সময় থাকে তো—

লার্গো তাদের নিয়ে যাবার জন্য দরজায় পাল্লা তুলে ধরল। বন্দ এতটা ভদ্রতা আশা করেনি।

লার্গো পেছনে থাকলে লিটারের যন্ত্রের ব্যবহারে অসুবিধে হবে তাই বন্দ বললে -- মিঃ লার্গো আপনি সামনে চলুন। যেখানে মাথা নীচু করার প্রয়োজন হবে আপনি আগে থেকে আমাদের বলে দিতে পারবেন।

এই ইয়াটে ঠিক অন্য আর পাঁচটা জাহাজের মতোই। সেই পোর্ট এবং ইঞ্জিন ঘরের স্টার বোর্ডের দিকে লম্বা করিডোর। সার সার সব কেবিনের দরজা, বাথরুম, রান্নাঘর। সেখানে দুজন সাদা উর্দি পরা ইটালিয়ান খাবার তৈরি করতে করতে লাগেঁর ঠাট্টা শুনে হেসে উঠল। ইঞ্জিনিয়ার ও তার দুজন অতিথি তাদের ইয়াট দেখতে আসায় ডিজেল ইঞ্জিন ও হাইড্রোফয়েল ডিপ্রেসারের হাইড্রলিকস সম্বন্ধে ছোট্টখাটো একটা বক্তৃতা দিয়ে দিল, অবশ্যই সেটা তার মালিককে কিছুটা খুশি করার জন্য।

ইয়াটের ডেকের পাশে সেই সি প্লেনটা রয়েছে। তাতে রং করা হয়েছে ইয়াটের সঙ্গে মানিয়ে। পাশে রয়েছে সেই জলিবাট -- তাতে কুড়িজনের বসার জায়গা। একটা ইলেকট্রিক ফ্রেন বোটটাকে ওঠা নামানোর জন্য। খালি জায়গার পরিমাণ আন্দাজ করে বন্ড জিজ্ঞেস করল -- আচ্ছা এর খালের ভেতর কী আছে? আরো কেবিন কি?

ওখানে শুধু গুদাম ঘর। সেখানে তেলের লম্বা লম্বা ট্যাংক আছে। এই জাহাজটা খুব বেশি তেল খায়। বিশেষ যখন জোরে চলে তখন সামনের দিকটা ওপরে উঠে গেলে সব তেল নীচের দিকে চলে যায়। তাই বেশি তেল রাখার জন্য এই ট্যাংক রাখতে হয়।

লাগেঁ এক্সপার্টের মতো বোঝাতে বোঝাতে তাদের ডানদিকে নিয়ে গেলেন। বেতার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বন্ড হঠাৎ বললে -- আচ্ছা আপনার তো এখন থেকে তিরে টেলিযোগাযোগ আছে। কোনো বেতার-যন্ত্র। সেই চিরাচরিত মার্কিনীস্পট লং এন্ড ওয়েভ কি? দেখুন, বেতার-যন্ত্র সম্বন্ধে আমার জানার খুব আগ্রহ। একবার দেখতে পারি কি?'

লাগেঁও বেশ বুদ্ধি করে কথা এড়িয়ে গেল -- পরে একদিন দেখবেন। এখন আমি অপারেটরকে আবহাওয়ার দিকে কড়া নজর রাখতে বলেছি। তাই সে-ও খুব ব্যস্ত।

— তা তো বটেই।

কথা বলতে বলতে তারা ব্রিজের ঢাকা জায়গায় এসে উপস্থিত। এই হল আমার ইয়াট। এটাকে বলা যায় উড়ন্ত চাকি। সত্যিই এটা উড়ে চলে। আশা করি পরে একদিন এসে আপনি আর মি. লার্কিন এটায় চড়ে বেড়াতে যাবেন। আর জানেনই তো আমরা এখন একটু বেশ ব্যস্ত আছি।

— হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আর গুপ্তধনের ব্যাপারে বেশ থ্রিল আছে, তাই না? আপনার কি মনে হয় কিছু পাওয়া যাবে?

— সেই রকম আশা করি, আর আর আমি কিছু বলতে পারছি না, মাফ করবেন।-- বলে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন। বেশ বোঝা গেল লাগেঁ আর কিছু বলতে চাইছেন না।

-- না, না, সে তো ঠিক কথাই, শেষার হোল্ডারদেব কথাও তো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। আমার বড়ো ইচ্ছে করছে যদি আমি আপনাদের সঙ্গী হতে পারতাম এই অভিযানে। বোধহয় আর জায়গা হবে না। না?

— সত্যিই তাই। আর একদম জায়গা নেই। আপনাকে আমাদের সঙ্গে পেলে তো ভালোই হত। “আচ্ছা আমি লক্ষ করছি আমাদের এই ঘোরার মধ্যে মি. লার্কিন বারে বারে ঘড়ি দেখছেন। সত্যি আর মি. ক্রিস্টিকে এসিয়ে রাখা ঠিক হবে না। আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই ভালো লাগল।

এরপরে তারা সিঁড়ি দিয়ে নেমে লঞ্চে এল। লাগেঁ শেষবারের মতো হাত নেড়ে হ্যাচের ভেতর দিয়ে ব্রিজের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তারা বোটম্যানের থেকে একটু দূরে পেছন দিকে বসল। লিটার বললে -- ‘না, তেমন কিছু নেই। যা তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়েছে তা খুবই সামান্য। আর সব কিছুই স্বাভাবিক। কিন্তু এই লোকটার চাল-চলন, হাব-ভাব দেখে তোর কী মনে হয়?’

— আমারও তাই মনে হচ্ছে, সবই স্বাভাবিক। তবে খোলের ভেতর জায়গা প্রচুর আছে। আর সেখানে নামবার রাস্তাও দেখলাম না। তবে কাপেটের তলায় ম্যানহোল থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু গুদামঘরে মাল ঢোকায় কী করে? আমায় কাস্টমস্‌দেব সাহায্যে তেল কোম্পানির কাছ থেকে জানতে হবে মি. লাগোঁ কতটা তেল নেয়।

— তার ওপর শেয়ারহোল্ডাবদের কারুর দেখা নেই। তারা উনিশজনই কি দিবানিদ্রা দিচ্ছে? এটা আমার একটা খটকা লাগছে।

আরও একটা জিনিস লক্ষ করেছিস যে, লাগোঁ ধূমপান করলেন না। আর সমস্ত ইয়াটের মধ্যে কোথাও তামাকের গন্ধ নেই। তা হলে সবাই কি ধূমপানে বিরত? যোগাযোগ ছাড়া এর আর ব্যাখ্যা হয় কড়া নিয়ম। অবশ্য যারা এক নম্বরের অপরাধী তারা সাধারণত মদ বা ধূমপান করে না।

আরও একটা জিনিস লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে ওই ডেকা (Decca) নেভিগেটার আর প্রতিধ্বনি নিয়ে জলের গভীরতা মাপবার যে যন্ত্রটা রয়েছে সেটা খুবই দামি। ভেবেছিলাম ও দুটো আমাদের দেখাবেন নিজেই গর্ব জাহির করার জন্য।

আমি সমস্ত ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারতাম। যদি ওই ফাঁকা জায়গাটার ঠিকমতো ব্যাখ্যা দিতে পারত। পেট্রল বা লম্বা ট্যাংকের গন্ধ হচ্ছে খড়খুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা।

লিটার সব শুনে বলল — তা অবশ্য ঠিক বলেছিস। জাহাজের অর্ধেক তো আমরা দেখলামই না। হয়তো সেখানে গুপ্তধন উদ্ধারের সব যন্ত্রপাতি আছে, যা আমাদের দেখাতে চায় না। যুদ্ধের সময় জিভ্রালটারের সেই বাণিজ্য তরী। যার খোলের তলায় ডুবুরী সৈন্যরা (frogman) ব্যবহার করত। সেখানে একটা দরজা আছে। এখানে বোধহয় এ সব কিছু নেই।

বন্দ বলল — ‘ওলটেরা জাহাজ সমস্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমাদের বিভাগের একটা কলঙ্ক।’ আবার থেমে কী ভেবে বলল — ডিস্কো প্রায় চল্লিশ ফুট নীচে নোঙর করা ছিল, আর তার তলায় বালির মধ্যে যদি কেস দুটো পুঁতে রাখা হয় তাহলে তোর গাইগার কাউন্টারে ধরা পড়ত।

জলের তলায় কাজ করার জন্য আমার একটা কাউন্টার আছে। রাত্রি হলে আমরা একবার নীচে নিয়ে দেখে আসতে পারি। আচ্ছা জেমস এভাবে উদ্দেশ্যহীনভাবে কোনো ডাকাত খোঁজার কোনো মানে হয়? লাগোঁ একটা শক্তিশালী জলদস্যুর মতো — তার এবং নাবিকদের সম্বন্ধে কোনো খবর নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল কি?

সকলের খবর জানার জন্য জরুরি তার করেছে গভর্নমেন্ট হাউসে। তার উত্তর আজ রাতেই আসবে। আচ্ছা ফেলিক্স — তুই একটা জিনিস ভেবে দেখ — এতবড়ো একটা জাহাজ, সঙ্গে এরোপ্লেন এবং চল্লিশজন নাবিক রয়েছে তাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু জানবে না। বলতে পারো ওদের সম্বন্ধে সন্দেহ করার মতো লোক এ তল্লাটে নেই। বেশ তা না হয় হল। কিন্তু ওই অংশীদাররা তেসরা জুনের আগে এসে পৌঁছেছে — আর সেই রাতেই ডিস্কো জলে ভেসেছে। আর সারারাত বাইরে ছিল। ধরা যাক অ্যাটম বোমা দুটো তুলে নিয়ে জাহাজের নীচের বালিতে লুকিয়ে রেখেছে অথবা অন্য কোনো সুবিধেজনক জায়গায় রেখেছে।

লিটার বললে — মোটামুটি একটা ছবি আঁকা যেতে পারে। তবে তা নিয়ে এগোলে ঠিক হবে না। এসব কথা বড়োকর্তাদের কানে তোলার আগে আমার যেন মরণ হয়। এতটা বোকা বনতে আমি রাজি নই।

-- ঠিক আছে। প্রথমে তুই তোর বেতারযন্ত্র চালু কর। তারপর আমি তেলের জেটির খোঁজ নিয়ে আসি। ডেমিনো মেয়েটার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে লাগোঁর তীরবতী প্যালরামটা একবার

দেখে আসতে চাই। পরে পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে একজন ভালো লোক নিয়ে অ্যাকোয়ালাং চার্পিয়ে তোর গাইগার কাউন্টার নিয়ে ডিস্কোর চারপাশ ভালো করে একবার দেখে আসতে চাই।

লিটার বন্ডের কথার উত্তরে বিদ্রুপের সঙ্গে বললে — বেশ আমিও তোর সঙ্গে সেখানে যাব আগের দিনের মতো। তবে তুই যেন লা-অর্চিনে হোঁচট খাসনি। মনে আছে তো যে আগামী কাল রয়াল বোহেমিয়াতে বিনি পয়সায় চা-চা নাচ দেখাবে। তার জন্য শরীর সুস্থ রাখতে হবে। এটাই হবে আমাদের এই ভ্রমণের স্মরণীয় জিনিস।

যখন তারা হোটেলের পৌঁছল, দেখল গভর্নমেন্ট হাউস থেকে একজন লোক একটা OHMS(On Her Majesty's Secret Service) ছাপ মারা খাম নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বন্ড সই করে সেই চিঠিটা নিল। রাজ্যপালের ব্যক্তিগত তার কলোনিয়াল অফিস থেকে আসছে। তারের প্রথমে লেখা রয়েছে Probond — তোমার ১১-০৭ মি. এর রিপোর্টে যেসব লোকের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে তাদের সম্বন্ধে কিছুই খবরাখবর নেই। সব স্টেশন থেকেই খান্ডারবল সম্বন্ধে ভালো রিপোর্টই আসছে। তলায় প্রেরক — PRISM। তার মানে M-চিঠিটা দেখে অনুমোদন করেছেন।

এবার লিটার তারটা পড়ল। তারপর বললে — কি হল আমার কথা মিলল কি না? এবার তাহলে পাইন-অ্যাপল বার-এ আসার একটা ড্রাই ম্যাটিনি খাওয়া হবে। এবার আমি ওয়াশিংটনে একটা পোস্টকার্ড ছেড়ে দিই। এরপর গোটা দুয়েক WAVES পাঠিয়ে দেবার যথেষ্ট সময় থাকবে।

॥ চোদ্দো ॥

টেলিফোনে ডেমিনোকে ধরলে সে জানাল যে, সন্ধ্যাবেলায় তার অভিভাবক এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু তার বাড়িতে আসবে, অতএব প্যালামীর বাড়িটা দেখতে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বন্ডের সঙ্গে বেলায় প্রোগ্রাম খতম। পরে বললে, তবে হ্যাঁ রাতে ক্যাসিনোতে দেখা হতে পারে। ডোমিনো জাহাজে ডিনার খেয়ে 'ডিস্কো' ভেসে এসে ক্যাসিনোর পাশে নোঙর করবে কিন্তু বন্ডকে চিনবে কী করে। তার আবার সকলের মুখ খুব একটা মনে থাকে না। বন্ড যদি তার শেষের বটম হোলে কোনো ফুল বা কিছু গুঁজে রাখে—?

বন্ড হেসে বলেছে — ঠিক আছে, কোনো চিন্তা নেই। ঐ মেয়ের ঐ চোখ কখনও ভোলা যায়? বন্ডের হঠাৎ তাকে এখনই দেখতে খুব ইচ্ছে করল।

'ডিস্কো' তার জায়গা বদল করায় বন্ডের পক্ষে প্ল্যানটা বদলাতে সুবিধেই হল। এখান থেকে জাহাজটাকে ভালোভাবে দেখতে সুবিধে হবে। আর পুলিশের নজর এড়িয়ে অল্প সাঁতার কেটে জাহাজের কাছে যাওয়া যাবে। জাহাজ যখন সেখানে নেই তখন সে জায়গাটাও পরখ করে দেখা যাবে। আর একটা সন্দেহ মনে খটকা জাগাচ্ছে যে, লাগোঁ যখন এখানে ওখানে জাহাজ সরাচ্ছেন তখন তার তলায় কি বোমা লুকোনো থাকতে পারে? তাহলে জাহাজের খোলের পুরো বিবরণ তার জানতে হবে। নচেৎ চুপচাপ থাকতে হবে।

বন্ড যে কিছুই এগোতে পারেনি সেই রিপোর্ট M-কে পাঠাতে হবে। তাতে তিনি খুবই দমে যাবেন। কিন্তু আগে হাতে কিছু সঠিক প্রমাণ আসুক। বাজে খবর না দেওয়াই ভালো।

বন্ড কল্পনা করল M-আমার রিপোর্ট নিয়ে হোয়াইট-হাউসে দেওয়ার পর যেখানে খান্ডারবল-এর যুদ্ধ মন্ত্রণালয় বসেছে। সেখানে খুব উত্তেজনা দেখা দিয়েছে — সবাই গুনগুন করে আলোচনা শুরু করেছে। তখন M — বলছে যে, আমি যাকে পাঠিয়েছি অনেক বিবেচনা এবং পরীক্ষা করেই পাঠিয়েছি। সে নিশ্চয়ই একটা ছোট্ট সূত্র পেয়েছে — অতএব একথা প্রধানমন্ত্রীকে জানানো উচিত।

এরপরই বন্ডের মনে ভয় জাগল - তারপরে 'অত্যন্ত জরুরি' ছাপমারা সব খাম আসতে থাকবে - 'তোমার' ১৮০৬ (ডটা বেজে ৬ম, সন্ধ্যার খবর) এর পুরো ব্যাখ্যা পাঠাও। সেটা প্রধানমন্ত্রী জানতে চান। এক তুলকালাম কাণ্ড। লিটারও ছাড় পাবে না। তারা মনে আশুন জ্বালানো সব গালাগাল দিতে শুরু করবে। তখন বলবে এরপব যা বার্তা পাঠাবে তাতে CIA-এর প্রতিনিধির সম্মতি ও সেই থাকবে। নিশ্চয়ই থাকবে।

বন্ড বেশ ঘেমে গেছে। তার বাস্ক খুলে সংকেত যন্ত্রটা (Cipher Machine)-টা বের করে তাতে সংকেতে তার রিপোর্ট লিখে একবার পরীক্ষা করে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে গেল যেখানে লিটার বসে রয়েছে তার বেতারযন্ত্রের সামনে। তার দশমিনিট পরে লিটার তার হেডফোন কান থেকে নামিয়ে রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বললে - 'সৌর কলঙ্কগুলো যোগাযোগে বড়ো বিরক্ত করছে।' হেডফোনটা তার হাতে দিয়ে আবার বললে, 'অতএব জরুরি ওয়েভলেংথটাকেই ধরতে হল - ওরে বাবা - ওধারে গোটাকতক জানোয়ারকে বসিয়েছে তারা সব উলটো পালটা একতাড়া সাংকেতিক অক্ষরভর্তি কাগজ পাঠিয়েছে - তুমি দেখো যেন বাজারের হিসেব পাঠিয়েছে।'

বন্ড খুব তাড়াতাড়ি করে তার একটা ছোট্ট রিপোর্ট লন্ডনে পাঠাল। বন্ড চিন্তা করতে লাগল যে, তার সেই রিপোর্ট পেয়ে সেখানের ন'তলার একটা বাতি ঘরে লম্বা টেপের সাহায্যে পাঞ্চ হয়ে সুপারভাইজারের ঘরে গেল সেখানে M-এর ছাপ, তারপর তার কপি ০০ বিভাগে এবং রেকর্ডসে যাবে।

বন্ডের জন্যে কোনো খবর নেই শুনে সে বেতারসংযোগ কেটে দিয়ে নীচে কমিশনারের ঘরে চলে এল। লিটার ওখানেই রয়ে গেল।

হার্লিং তাঁর ডেস্কে বসে একজন সার্জেন্টকে কিছু নির্দেশ দেওয়ার পর সে চলে গেলে বন্ডের দিকে সিগারেটের কেসটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে - কাজ কতদূর এগোল?

বন্ড বললে - রেকর্ডে তো লাগেঁব দলেব কোনো খবরই নেই। কিন্তু আমি লাগেঁব সঙ্গে দেখা করে গাইগাব কাউন্টার নিয়ে ডিস্কোর ওপর চলাফেরা করেও কিছু পায়নি। তাতে করে আমার মন ভরছে না। আসল কথা ডিস্কোতে কতটা তেল লাগে, আর সেই ট্যাংক কোথায়। সেটা আমি জানতে চাই।' শুনে কমিশনার কোনে সার্জেন্ট মোলোনিকে ডেকে পাঠালেন।

রিসিভার নামিয়ে বললে - এই ছোট্ট বন্দরে অজস্র ছোটো ছোটো নৌকো - তার কোথায়, কত তেল রাখে, তেল নেয়। এসব খবর বাখতে হয় কারণ, কখন কোথায় আশুন লাগে, তখন নেভাতে সাহায্য করবে।

তিনি আবার টেলিফোনে মোলোনিকে ডেকে বন্ডের প্রশ্নগুলো আবার করলে সে যা উত্তর দিলে সেগুলো বন্ডকে বললেন - ৩ই জাহাজে ৫০০ গ্যালন ডিজেল থাকে। এবং ওই তেল গত ২রা জুন বিকেলে নিয়েছে। তাছাড়া ৪০ গ্যালন লুব্রিকেটিং অয়েল। ১০০ গ্যালন খাবার জল-এ সবই থাকে জাহাজের ইঞ্জিন ঘরের সামনে জাহাজের মাঝামাঝি।

তাহলে লাগেঁব ওই লম্বা ট্যাংক। ব্যালাস্ট এসব গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যে। তবে এটাও হতে পারে অতিথীদের কাছে তার গুপ্তধন খোঁজার সাজসরঞ্জাম না-ও দেখাতে পারে। আর এটাও ঠিক যে, তিনি যতই সাদামাটা সাজতে চান না কেন আসলে তিনি একজন ধনী গুপ্তধন শিকারি। তবে ওনাকে বিশ্বাস করার কোনো যুক্তি নেই। বন্ড তার মনস্থির করে ফেলল যে, সে যে-কোনো প্রকারেই হোক ওই জাহাজের খোলটা এবার দেখবেই। লিটারের 'ওলটেরা' জাহাজের ব্যাপারটা চিন্তার বিষয়।

বন্দু তার প্ল্যানটা কমিশনারকে খুলে বললে। আর তার কাছে এমন একজন বিশ্বাসযোগ্য লোক পাওয়া যাবে যে রাতে আমার সঙ্গে জলের তলায় সঙ্গী হবে। আর একটা তৈরি ভালো অ্যাকোয়ালাং পাওয়া যাবে কি না?

হার্লিং বন্দুকে জিজ্ঞেস করলে -- আচ্ছা, এই অনধিকার প্রবেশ কি ঠিক হবে? তার ওপর লাগে এই অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট লোক। ওই জাহাজে যাঁরা থাকেন তাঁরা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট নাগরিক এবং পয়সাওয়ালা লোক। এদের বিরুদ্ধে যদি কোনো পুলিশি আইন আসে, তাহলে সেটা একটা বিশী ব্যাপার হবে।

কথাগুলো শুনে বন্দু বেশ ধীরগলায় বললে — আমাদের এটুকু রিস্ক নিতেই হবে। আর আপনি যদি চান, তবে প্রয়োজনবোধে আমি সেক্রেটারি ও স্টেটস বা এমনকি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ আপনাকে এক ঘণ্টার মধ্যে এনে দিতে পারি।

কমিশনার আঁ আঁ করে উঠলেন — বললেন — মশা মারতে আর কামান দাগার দরকার নেই কমন্ডার। আপনি যা যা চাইবেন তার সবই পাবেন। রাজ্যপালের কাছে গেলে উনিও আপনাকে একই উপদেশ দিতেন। এটা একটা ছোটো উপনিবেশ। লন্ডনের হোয়াইট হল থেকে ধমক আসতে আরম্ভ করলে তার আর শেষ হবে না।

আমাদের এই বন্দরে যখন কোনো বড়ো জাহাজ ঢোকে তখন কত যে ছোটো নৌকো ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তার ঠিকঠিকানা নেই। আর তখন সমুদ্রের তলায় কত ছোটো ছোটো জিনিস পড়ে যায়, সেই সমস্ত উদ্ধার করার জন্য আমাদের একটা বাহিনী আছে। তাদের মধ্যে একটা ছেলে আছে তার নাম স্যাস্টোম, জন্ম ইলিউথেরা বা তে। সাঁতারে সে সেখানে অনেক পুরস্কার পেয়েছে। এখন আপনারা পুরো প্ল্যানটা বলুন।

বন্দু হোটলে ফিরে ভালোভাবে স্নান করে একটা ডবল বুরবোঁ ওল্ড ফ্যাশন খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ার পর তার নিজেকে খুব ক্লান্ত লাগছিল। প্লেনে আসা, গরম, কমিশনার, লিটার এতসব ঝামেলা শেষ করার পর একটা ভালোভাবে শ্বন্দর ঘুম না দিলে আর নয়। তাতে আর সব উত্তেজনার বিস্মৃতি ঘটবে মনে হয়।

ভাবতে ভাবতেই তার ঘুম এসে গেল। স্বপ্নে দেখছিল ডোমিনো — তাকে তাড়া করেছে একটা সাদা দাঁতওয়ালা হাঙর। হঠাৎ সেই হাঙরটা লাগে হয়ে তার সামনের দুটো থাবা দিয়ে বন্ডের দিকে এগিয়ে আসছে। তার কাধদুটো চেপে ধরল। আর ঠিক সেই সময়েই তার টেলিফোনটা বেজে উঠল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে রিসিভারটা কানে দিতে শুনতে পেল লাগেঁর গলা। সে বলছে সেই জলপাই দেওয়া ম্যাটিনিটা খেতে চায়। এখন রাত নটা বাজে। এখনই যেন সে জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়ে।

ওদের দুজনের দেখা হল পাইন-অ্যাপল-বুম বারে একটা কোণের টেবিলে। ওদের দুজনের পোশাক বেশ রুচিসম্মত। বন্দু যে একজন রুচিবান ধনী সম্পত্তি ত্রেতা, সেটা বোঝাবার জন্যে এইরকমের বেশ। আর লিটার বললে, “আমি তো কোমরে একটা গোল্ড প্লেটেড চেন পরেই ফেলেছিলাম — পরে মনে হল আমি তো একজন শান্তিপ্রিয় আইনজ্ঞ। আর তোর কোমরে তো একটা বেশ চওড়া লাল বেস্ট শোভা পাচ্ছে। এখন তো মনে হয় সমস্ত মেয়েরা তোর দিকেই ঝুঁকবে আর আমার তোর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে আর তার কিছুদিন পরে ডিভোর্সের ব্যবস্থাও সেই আমাকেই করতে হবে।” এইভাবে দুজনে ঠাট্টা ইয়াকি করছে। এমন সময় ওয়েটারকে ডাকল।

ওয়েটার এলে তাকে দুটো ড্রাই মার্টিনার অর্ডার দিয়ে লিটার বললে — শুধু দেখে যা।

ম্যাটিনা দুটো এলে লিটার ওয়েটারকে ডেকে বারম্যানকে ডেকে পাঠাল। সে এল বেশ ব্যাজার মুখ নিয়ে। তাকে দেখে লিটার বললে — ওহে বন্ধু, আমি ম্যাটিনি চেয়েছিলাম, জলপাই নয়। বলে সে ককটেল স্টিক দিয়ে জলপাইটা তুলতে গ্লাসটা অর্ধেক খালি হয়ে গেল।

লিটার বেশ মিস্টিংলায় হেসে হেসে বললে - দেখ, তোমাব যখন দুধে দাঁত ভার্ভেন তখন থেকেই আমি এসব কায়দা করায়ত্ত করেছি। আর তোমরা যখন সবেমাত্র কোকাকোলা খেতে শুরু করেছ তখন আমি এই ব্যবসার নাড়িনক্ষত্র জেনে ফেলেছি। শুনে রাখ, এক বোতল গার্ডনস জিন এ পুরো ষোলো মাত্রা মদ থাকে অর্থাৎ ডবল মাত্রা — যা আমি খেয়ে থাকি। জিনের সঙ্গে তিন আউন্স জল মেশাতেই তা হল বাইশ মাত্রায়। তার ওপর এইরকম বাহারি ধোঁকা দেওয়া গেলাস খার তলাটা এত সরু যে একটা জলপাই ফেলে দিলে তাতে সামান্য মদ ঢাললে সেটা আঠাশ মাত্রায় দাঁড়ায়।

লিটার তাকে বোঝাতে লাগল যে এখানে এক বোতল জিনের দাম দু-ডলার- - তারপর তাকে হিসেব করে বুঝিয়ে দিল যে, তাদের লাভ হয় বিশ ডলার।

— বন্ধু, তোমাব লাভটা একটু বেশি পরিমাণে হয়ে যাচ্ছে না। আমি যদি কষ্ট করে এই ম্যাটিনিটা তোমার কর্তৃপক্ষ বা টুরিস্ট বোর্ডের কাছে নিয়ে যাই, তবে কি খুব ভালো হবে? তাই বন্ধু, লক্ষ্মী সোনার মতো দুটো বডো ড্রাই ম্যাটিনি নিয়ে এস, সঙ্গে দুটো লেবু। বাস, আমরা আবার পশু হয়ে যাব।

লিটারের কথায় বারম্যানের মুখের ওপর কয়েকটা রেখা খেলে গেল - যা হচ্ছে প্রথমে রাগ, তারপর সন্ত্রম এবং সব শেষে অপবোধবোধ এবং ভয়। তাই থেকে সে মুক্তি পেতে ওয়েটারকে ইস্তিতে ডেকে এনে নিজের গাষ্ঠীর্য বজায় রেখে চলে যেতে বলে বললে — আপনি যা বললেন তাই হবে। তবে অন্য খদ্দেররা কোনো রকম আপত্তি করত না।

লিটার বললে — অত ভয় পাবার কিছু নেই, দেখ, পাক্সা বারম্যান সে ই যে লোক দেখলে বুঝতে পাবে কে সত্যি পান করতে আসে আর কে স্রেফ কায়দা দেখাতে আসে।

-- ইয়েস স্যার। - বলে কোনো রকমে এখান থেকে পালিয়ে গেল।

বারম্যান চলে গেলে বন্ড বললে -- ‘আচ্ছা ফেলিস্কা, তুই এসব হিসেব জানলি কী করে? আমি জানি এরা চুরি করে বডো চে ১ একশোভাগ, কিন্তু চাবশো, পাচশো — ভাবতেই পারছি না।

- ওরে চাঁদু, সরকারি চাকরি ছেড়ে যেদিন আমি গোয়েন্দা সংস্থায় ঢুকেছি, সেদিনই আমার চোখ খুলে গেছে। এই হোটেল রেস্টোরাঁয় যে ধরনের অপরাধ হয়, সারা বিশ্বের সব অপরাধ একসঙ্গে জড়ো করলেও তার পারেকাছে পৌঁছতে পারবে না। আর দেখনা, এইসব অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়ার পর যখন ছয়-সাত ডলার নিল। বাড়ি পৌঁছানোর জন্য পনেরো পার্সেন্ট আর ওয়েটারের কিছু পাওয়াব জন্য ছুকছুক করা দেখলে ওদের আচ্ছা করে পিটতে ইচ্ছে করে। যাক্গে এসব না বলাই ভালো।

এরপর দুটো ড্রিংক এল। স্বাদে, গন্ধে, পরিমাণে লিটারের মনমতো। সে আরও এক রাউন্ডের অর্ডার দিল। তারপর মজা করে বলতে লাগল — ‘এবার আর কারুর পেছনে লাগা যাক। সত্যি বলতে কী জানিস, যখনই আমি দেখি যে আমেরিকানদের হকের টাকা এইভাবে জলে গলে নষ্ট করছে, তখনই আর আমার মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না।’ তারপরই সামলে নিয়ে বললে না, আমি এটা বলছি না যে, আমাদের এই অপারেশনটা সবই বাজে। তবে আমরা এই দুই অভাগা এমন এক বালির দেশে পড়ে রইলাম, যেখানে কিছুই নেই। আর যেখানে কিছু আছে সেখানে আর সবাই রয়েছে। আর দেখ, যেখানে চারদিকে শান্তি বিরাজ করছে সেখানে এসব করার কী মানে আছে।

বন্দ তার মনে সংশয় নিয়েই বললে, ফেলিস্ক্স, তোর কথা আমি ফেলাছি না। কিন্তু কী জানিস, আমরা মানে ইংরেজরা, আমেরিকানদের মতো নিশ্চিত হতে পারছি না। আমাদের যুদ্ধ এখনও বার্লিন, সাইপ্রাস, কেনিয়া আর সুয়েজে চলছে। রাশিয়ায় যেমন SMERSH হচ্ছে। আমার সব সময়ই মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আর ওই তেলের ঘটনাটা পরীক্ষা করতে গিয়ে বুঝলাম লাগোঁ পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলেছে।

তারপর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের সব কথা খুলে বলল। ‘আমার স্থির বিশ্বাস আজ রাতে আমি লাগোঁ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারব। আমাদের হাতে আর মাত্র সত্তর ঘন্টা সময় আছে। আচ্ছা তোর পাইলটের লাইসেন্সটা এখনও বহাল আছে তো? কারণ আমি একটা ছোট্ট প্লেনে করে সমস্ত সমুদ্র এলাকাটা খুঁজে আসব। জলের তলায় লুকিয়ে রাখার পক্ষে এই ডিভিকের জাহাজটা বেশ বড়ো।

— আরে লাইসেন্স ঠিকই আছে। তোর সঙ্গী হব এর চেয়ে বড়ো কথা কী আছে? যদি সত্যিই কিছু পাওয়া যায় তবে সন্ধেয় আমাদের সংকেত পাঠানো খুব একটা ভুল হয়নি।

— তাহলে সংকেতটা কী?

লিটার মদের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে বলল — আমার সংকেত হচ্ছে এই ‘অপারেশন থান্ডারবল’-এর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের জন্য একটা বিজ্ঞপ্তি। আর আমাদের পেন্টাগনের কর্তাদের সবচেয়েই বড় বেশি বাড়াবাড়ি। বলা হয়েছে আমেরিকার জল-স্থল-বিমান বাহিনী পরিপূর্ণভাবে CIA-কে সাহায্য করবে। চিন্তা করে দেখ এই সব ইউনিটকে প্রস্তুত করতে কী পরিমাণ তেল আর পরিশ্রম নষ্ট হচ্ছে। ভাবতে পারিস আমায় সাহায্য করার জন্য কী দিয়েছে?’ লিটার ক্রমশ বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছে — ‘পেন্সাকোলা থেকে আধ স্কোয়াড্রন সুপার ম্যাবাবু ফাইটার বম্বার এবং বন্ধুবর মান্টা, মান্টা আমাদের সবচেয়ে আধুনিক — অ্যাটমিক সারমেরিন।’

বন্দ তার কথা বলার ধরনে হেসে উঠতে লিটার সামলে নিয়ে বললে — ‘তবে সবটা বোকামি নয়। স্যাটার প্লেন সাবমেরিনে ধ্বংসের মহড়া দেবার জন্যে এদিকে আসছে। সঙ্গে ডেপথ চার্জ নিয়ে। ওদের সবসময় তৈরি থাকতে হয়। আর ‘মান্টা’-সে-ও কী একটা ট্রেনিং-এর জন্যে এদিকে আসছে। মনে হয়, হাওয়া বদলের জন্যে দক্ষিণ মেরুতে তলা দিয়ে ঘুরে যাওয়ার জন্য। একবার চিন্তা করে দেখ — রয়াল বোহেমিয়ান হোটেলের ২০১ নম্বর ঘরের বাসিন্দা শ্রীমান লিটারের একটি অঙ্গুলি হেলনে এই কোটি কোটি ডলারের জিনিসপত্র অপেক্ষা করছে।’

বন্দ বললে — আমার মনে হচ্ছে, নাসাউতে যিনি রয়েছেন, তাঁর চেয়ে তোদের রাষ্ট্রপতির মাথাব্যথা অনেক বেশি। আমার তো মনে হচ্ছে আমাদের দুদেশের সেনাপতিরা সমুদ্রের দুকূলে সৈন্য সাজিয়ে ফেলেছেন। আর যদি ‘নাসাউ ক্যাসিনো’ প্রেতসংঘের লক্ষ্যস্থল হয়, তবে সেটা ঠিক কাজই হবে। প্রেত সংঘের চিঠি অনুযায়ী এখানে কি সে বকম কিছু আছে? নর্থ-ওয়েস্টের পূর্ব কোণে একটা জায়গা আছে, রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র আছে, যেটা এখান থেকে প্রায় ১৫০ মাইল দূরে। সেই কেন্দ্রটা আমেরিকার সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে। আর আমাদের আর তোদের যে সব যন্ত্রপাতি আছে তার দাম তো দশ লক্ষ পাউন্ড হবে।’

লিটার বলতে লাগল — আমায় যে-কটা টার্গেটের কথা বলা হয়েছে — তাহল কেপ ক্যানাভেরাল, স্পেন্সাশেলার নৌ-ঘাঁটি, আর যদি দ্বিতীয় বোমাটা এদেশেই ফাটায় তবে তাদের লক্ষ্য মিয়ামী, টাম্পা হতে পারে। আচ্ছা, প্রেত সংঘ কি একটা পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সম্পত্তির কথা বলেছিল। ওরা কোনো একটা বড়ো কারখানার কথা বলছে — কিন্তু একটা রকেট ছোঁড়ার ঘাঁটিও হতে পারে। মন দিয়ে বিবেচনা করতে হলে আমি বলব, হয় কেপ ক্যানাভেরাল, না হয় গ্রান্ড বাহামার রকেট ঘাঁটি। আর যদি ওরা বোমাদুটো পেয়েই থাকে, তবে কোথায় ফাটাবে?’

‘সাবমেরিন দিয়ে সাহায্য করা যায়। একটা টর্পেডো টিউবের ভেতর দিয়ে বোমা দুটো চালান করে সমুদ্রতটের কাছাকাছি ফেলে দেওয়া যায়। অথবা একটা ডিঙিতে ভাসিয়ে দেওয়া। ডিঙিকটের প্লেন থেকে সব অংশগুলো বার করে নেওয়া যায় তবে বোমা ফটানো মোটেই শক্ত নয়। কেবল TNT আর প্লুটোনিয়ামের মধ্যে একটা ফিউজ লাগাতে হবে। আর বোমার মাথায় যে ফিউজটা থাকে সেটাতে জ্বারে থাকা লাগলে বোমা ফেটে যাবে। তবে একজন বিশেষজ্ঞ দরকার। সেই ফিউজ সরিয়ে, টাইম ফিউজ লাগিয়ে একশো মাইল দূরে চলে যাওয়া যাবে। মাঝরাতে গ্রান্ডবোহামার কাছে বোমাটা রেখে ব্রেকফাস্টের আগেই প্যালামীরায় ফিরে নোঙর করে থাকতে পারে।’

‘লিটার তাচ্ছিল্যভরে বললে — ‘দ্যখ আমাকে তাভাতে হলে আরও জ্বালানি তোকে দিতে হবে। তার চেয়ে চল আমরা বে-স্টিটের একটা ভালো জায়গায় গিয়ে কয়েকটা ডিম আর রেকন খেয়ে আসি। দাম পড়বে কুড়ি ডলার। যেটা আমার মান্টা প্রতি মিনিটে তেল পোড়ায়। শেষে আমরা ক্যাসিনোতে গিয়ে সেই শয়তানকে দেখতে চাই যে জুয়ার টেবিলে লাগের পাশে রয়েছে।’

॥ পনেরো ॥

পৃথিবীতে ব্রিটিশদের এলাকায় একমাত্র আইনসংগত জুয়ার আড্ডা, যেটা কমনওয়েলথের আইনে কী করে সহ্য করা হয় তা সকলেরই অজ্ঞাত। এটাকে প্রতি বছর ক্যানাডিয়ান এক জুয়ার সংস্থাকে লিজ দেওয়া হয়। শীতকালে তাদের লাভ এক লক্ষ ডলারের কাছাকাছি। এখানে খেলা হয় খেলা বুলেট, ব্ল্যাকজ্যাক, এবং শীম্যা দ্য ফেরার। এটা আবার পরিচালনা হয় বে-স্টিটেরই এক সুদৃশ্য বাড়ি থেকে। এখানে সুন্দব নাচঘর, খাবার ঘর, অর্কেস্ট্রা, লাউঞ্জবার সব আছে। এর থেকে যা লাভ হবে তা পরিচালকবর্গই পাবে।

ওরা এই ক্যাসিনোতে ঢুকল রাজ্যপালের দেহরক্ষীর দেওয়া দুটো কার্ড মারফত। ওরা ঢুকে প্রথমে কফি ও পরে মদ খেয়ে দুজনে আলাদাভাবে জুয়ার টেবিলে চলে গেল।

লাগের শীম্যা দ্য ফেরার Chemin deffer খেলছিলেন। তাঁর সামনে স্থপাকার করা একশো ডলারের চাকতি, আর আখ ডজন হাজার ডলারের হলদে চাকতি। ডোমিনো ভিতালি লাগের পেছনে বসে কেবল সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে আর খেলা দেখছে। লাগের বেশ মুডেই আছে। বন্ড দূর থেকে সেই খেলা দেখছে। লাগের বেশ মেজাজে ব্যাংকো বলে সব চাকতি তার দিকে টেনে নিচ্ছেন। তার ডানদিকে এক ভদ্রমহিলা বেশ হেরে যেতে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। সেই সুযোগে বন্ড সেই চেয়ারে গিয়ে বসল। তাকে এখন লাগের আটশো ডলারের ব্যাংকের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। লাগের যখন জিতছে তখন তার সঙ্গে সঙ্গীরাও খুব চিৎকার করছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে তার জনপ্রিয়তা।

পরপর তিনটে যুদ্ধে জিত হওয়া ব্যাংকোর পক্ষে শুভলক্ষণ। এই সংস্কারটা বন্ডের জানা। সে জানে তার পকেটে মাত্র হাজার ডলার রয়েছে। এবার লাগের ভাগ্য সম্বন্ধে সন্দেহান হল সবাই। তাতে বন্ডের সাহস বাড়ল। সে হাঁকল — ‘ব্যাংকো’।

লাগের হাত বাড়িয়ে বললে — হ্যাঙ্গো মি. বন্ড, যদি হারতেই হয় তো আপনার কাছে হারাই ভালো। এখন টেবিলে প্রচুর টাকা। আমার এখন অন্য কাউকে ব্যাংকো দিয়ে দেওয়া উচিত। ইংরেজরা রেলগাড়ি সম্বন্ধে ভালো বোঝে।

বিশাল বাদামি থাবাটা তাসের ‘জুতো’কে একটু আঁস্তে থাবড়া মারল। জিভের মতো একটা তাস বের হতে লাগের টেবিলের সব টাকা বন্ডের দিকে এগিয়ে দিল। তারপর দুজনের দুটো তাস বেরোল। বন্ড তার তাস ফেলল টেবিলের মাঝখানে, কুইতনের নয়। বন্ড লাগের দিকে চেয়ে

একটু হাসল তারপর তার পরের তাসটা ফেলল ইচ্ছাবনের দশ। বন্ডের মোট পয়েন্ট যা সব থেকে বেশি হতে পারে। লাগের যদি দুটো তাসের সমষ্টিও নয় বা উনিশ হয় তবুও বন্ডের জিত।

লাগের হার্টা একটু কঠিন শোনাল। 'এরপর দেখে নেব'। বন্ড তার তাস দেখিয়ে দেওয়াতে তাঁর আর তাস তোলার পথ রইল না। তাঁর হাতের তাস হরতনের আট আর চিড়িতনের রাজা — মাত্র এক পয়েন্টের জন্য হেরে গেলেন লাগের। এইভাবে হারাটা ভীষণ কষ্টকর। লাগের বিরাট জোরে হেসে উঠে টেবিলের সকলের উদ্দেশ্যে বললেন — বলেছিলাম না যে, ইংরেজরা কখন কী করে বসে বলা যায় না। আরে বন্ধুবর, একজনকে না একজনকে তো হারতেই হবে।

সুতরাং এবার বন্ডই জিতে ব্যাংকার হল। ক্রুপিয়র (craupier) মশাই আটশো ডলারের চাকতি বন্ডের দিকে এগিয়ে দিলেন। সেগুলো রেখে বন্ড লাগের দিকে হাত দেখিয়ে বললে — ইটালিয়ানরাও খুব একটা কম যায় না। আজই দুপুরে আমি আপনাকে বলেছিলাম না আমাদের উভয়ের পার্টনার হওয়া উচিত।

বেশ খুশির সঙ্গে লাগের বললে — 'বেশ আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। আমি এবার মিঃ স্নোকে আমার পার্টনার করে বাজি ধরছি। কি মি. স্নো?

তিনি রাজি হতেই বন্ড আটশো ডলারের বাজি ধরতে তাঁরা দুজনে চারশো করে বাজি ধরলেন। এবারও বন্ড জিতল। তার পয়েন্ট ছয়, বিপক্ষের পাঁচ। এবারেও এক পয়েন্টে জিত।

[শ্যামঁ দ্য ফেয়ার (এর ফরাসি অর্থ রেলগাড়ি) জুয়োখেলায় দুটো পক্ষ থাকে। একজন ব্যাংকার আর অন্যজন যিনি খেলতে চান (Banco বলে)। দুজনে দুটো করে তাস নেয় (টেক্সা থেকে নয় পর্যন্ত। প্রত্যেক তাসের যত নম্বর তত পয়েন্ট। টেক্সার এক, আটের আট, এই রকমের দশ, গোলাম, সাহেব, বিবি সব শূন্য পয়েন্ট)। ওই দুটো তাসের যার যোগফল বেশি সেই জিতবে। তবে দেশের বেশি হলে ডানদিকের সংখ্যাটা ধরা হবে — যেমন — দশে শূন্য, সেকেন্দোতে চার এই রকমের আর কী। দুজনেই আর একটা করে তাস টানতে পারবে। তাস রাখা হয় জুতোর মতো দেখতে একটা বাস্কের মধ্যে। আর টাকার জন্য বিভিন্ন রং-এর বিভিন্ন অঙ্কের প্লাস্টিকের চাকতি আছে।]

এবার লাগের বেশ দুঃখের সঙ্গেই বললেন -- না, এবার আমি বুঝতে পারছি, আমার ভাগ্যে কী আছে। মিঃ স্নো এবার আপনাকে একলাই খেলতে হবে। মি. বন্ড, আমার ভাগ্য খেয়ে নিয়েছেন। আমি সারেভার করছি।

মি. স্নো বন্ডের দিকে ১৬০০ ডলারের চাকতি ছুঁড়ে দিলেন। দুবারের জেতা সব টাকা। বন্ড ভাবলে এবার ব্যাংকটা পরের ভদ্রলোককে দিয়ে দিলে বেশ মজা করা যাবে। তাই সে চাকতিগুলো টেনে নিয়ে বলল — লা মঁ পাস (La Main passe)। অর্থাৎ ব্যাংক পরের হাতে থাক। চারধারে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। বেশ নাটকীয়ভাবে লাগের বলে উঠলেন — আমি চাই না ব্যাংকটা পরের হাতে চলে যায়, তাহলে আমার মরা ছাড়া আন উপায় থাকবে না। বেশ আমিই মি. বন্ডের ব্যাংক দিচ্ছি।' তিনি টেবিলে ১৬০০ ডলারের চাকতি ছুঁড়ে দিলেন।

বন্ড নিজেকে ব্যাংকো বলতে শুনল। লাগের এবার বন্ডের মুখোমুখি বসে বেশ কৌতুকের সঙ্গে বললেন - কী ব্যাপার মশাই, আপনি আমার পেছনে এভাবে তাড়া করেছেন কেন? আমার সঙ্গে কি শত্রুতা করবেন?

বন্ড এবার টেস্ট করার জন্য বললে — দেখুন এখানে আসার সময় আমি একটা প্রেত দেখলাম।' পরের কথাটা বলল না।

হঠাৎ যেন এক থাপ্পড়ে লাগের মুখে হাসি মিলিয়ে গেল। আবার পরক্ষণেই সেটা ফিরিয়ে আনল। কিন্তু তিনি বেশ উত্তেজিত, চোয়াল শক্ত, চোখের দৃষ্টি কঠিন। বললেন — হুঁ কী ব্যাপার বলুন তো।

বন্দ বেশ সহজভাবেই বললে এটা হচ্ছে হেরে যাওয়ার প্রেত। বুঝলাম আপনার ভাগা এবার ঘুরতে বসেছে। আবার আমার ভুলও হতে পারে।” জুতোটাকে দেখিয়ে বললে ‘দেখা যাক কী হয়?’

টেবিলের সকলে বুঝতে পাবলেন যে এদের মধ্যে এতক্ষণ বেশ ঠান্ডা চলছিল এখন সেটা শক্রতায় কপাস্তরিত হয়ে গেল। কোনো নারীঘটিত ব্যাপার নাকি? সবাই নিজেদের ঠোট চাটতে লাগলেন।

নার্গো হঠাৎ বেশ জোরে হেসে উঠে অবস্থা সামাল দিলেন। বললেন -- বন্ধু আমার তাসের ওপর কু দৃষ্টি দিতে চাইছেন। তবে আমাদের দেশে এটাকে ঘায়েল করার অন্য কায়দা আছে।’ বলে তাঁর নিজের তর্জনী এবং কড়ে আঙুল তুলে বন্ডের মুখের দিকে ছোবল মারাব ইঙ্গিত দিলেন। টেবিলের সবাই এটাকে একটা নাটকের মজার দৃশ্য ভেবে উপভোগ করলেন। কিন্তু বন্ড এর পেছনে এই মাফিয়ার তাঁর হিংস্রভাব ফুটে উঠতে দেখল।

বন্দ খুব সরলভাবে হেসে বললে - হ্যাঁ, এটা আমার কু-দৃষ্টিকে ঘায়েল করেছে ঠিকই। কিন্তু তাসের কী হবে? আসুন। আসুন আমার আর আপনার প্রেতের লড়াই হোক।

নার্গোর মুখে সংশয় ফুটে উঠল। আবার প্রেতের নাম কেন? তিনি জুতোটাকে একটা থাপ্পড় মেঝে বললেন -- এবার তিন নম্বরের খেলা, দেখা যাক কে জেতে!

নার্গো খুব তাড়াতাড়ি চারটে তাস বেঁটে দিলেন। বন্দ আস্তে আস্তে তার তাসদুটো দেখে নিল তার হাতে চিড়িতনের দশ, অর ইস্কাবনের পাঁচ। অর্থাৎ পাঁচ পয়েন্ট। সে সেটা বুঝতে দিলে না, বেশ হাসিমুখেই তার তাস দুটো টেবিলের ওপর উলটে রেখে দিল। নার্গো ঠিক বুঝতে না পেয়ে তার হাতের তাস টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেললেন -- তারও পাঁচ। খুব একটা ভালো পয়েন্ট নয়। তাই নার্গো আর একটা তাস তুললেন -- ইস্কাবনের নয়। অর্থাৎ তাঁর পয়েন্ট চার। যেখানে বন্ডের কোনো তাস না তুলেই পাঁচ।

খুব সহজভাবে বন্দ তার তাস ফেলে দিয়ে বললে -- আমার ওপর কু দৃষ্টি না দিয়ে আমার তাসের ওপর দিলেই ভালো করতেন।

টেবিলের চারদিক থেকে নানাবকমের গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল - ‘না। ভদ্রলোকের ভাগাই খারাপ’ -- ‘আমি তো পাঁচ ফেলে আর একটা তাস টেনে নিই.. “না না-খেলা খারাপ”

নার্গোর বেশ বেগ পেতে হল নিজের মুখের বিকৃত রূপটাকে সহজ করে আনতে। শেষ পর্যন্ত কার একটা বাঁকা হাসি হেসে মুঠো হাত খুলে দিলেন। জোরে নিশ্বাস টেনে বন্ডের দিকে হাত বাড়ালেন করমর্দনের জন্য। বন্দ নিজেকে সাবধান করাব জন্য বড়ো আঙুল ভেতরে গুটিয়ে নিল যাতে নার্গো তার হাত গুঁড়িয়ে না দেয়। কিন্তু কিছুই হল না, একটা শাপ্ত করমর্দন ছাড়া। নার্গো বলল -- আমি এবার চাইব ব্যাংকটা টেবিলের চারপাশে ঘুরে বেড়াক। আমার জেতা সব টাকা আপনি কেড়ে নিলেন। আজ রাতে আমার অনেক কাজ। ভাগনিকে একটা ড্রিংক আর নাচের আসরে নিয়ে যেতে হবে।’ ডোমিনোকে বললেন -- মাই ডিয়ার, তুমি নিশ্চয়ই মি. বন্ডকে চেন না, অবশ্য টেলিফোনে আলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইনি আমার সব প্ল্যান ভেঙে দিলেন। তোমার অন্য সঙ্গী খুঁজতে হবে।

বন্দ বলল - কেমন আছেন? আজ সকালে তামাকের দোকানে আমাদের দেখা হয়েছিল।’ ডোমিনো চোখ দুটো কুঁচকে বললে - ‘হয়তো হবে। তাছাড়া লোকের মুখ আমার বড়ো একটা মনে থাকে না।’

-- আচ্ছা, আপনাকে একটা ড্রিংক অফার করতে পারি কি? মি. নার্গোর বদন্যতায় আমি নাসাউ

এর একটা ড্রিংক কেনাব পয়সা রোজগার করতে পেরেছি। তবে আর আমি খেলব না। কারণ এরকম ভাগ্য বেশিক্ষণ থাকে না।

উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। লাগোঁকে বললে — আমার মনে হয় মি. বন্ডকে এখান থেকে যদি আমি সরিয়ে নিয়ে যাই। এমিলিও। তবে তোমার ভাগ্য নিশ্চয়ই ফিরতে পারে। আমি খাবার ঘরে ক্যাভিয়ার আর শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তুমি যতটা পার শুছিয়ে নাও।

লাগোঁ হেসে বললেন — মিঃ বন্ড, আপনি ফুটব্ব কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনানে পড়লেন। আমার কাছে যতটা ভালো থেকেছেন, ডোমিনোর কাছে অতটা না-ও থাকতে পারেন। ও-কে বন্ধু আবার দেখা হবে। আপনার ফেলে দেওয়া পাঁকে আমি আবার যাচ্ছি।’ লাগোঁকে বেশ মেজাজে লাগছে।

বন্ড খেলার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বললে — ‘তিনজনের জন্যে ক্যাভিয়ার আর শ্যাম্পেনের অর্ডার দিচ্ছি। আর তার জন্যে আমার ভূতটাও পুরস্কার আশা করতে পারে।’ এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লাগোঁর মুখের চেহারা পালটে গেল। এটা ইটালিয়ান কুসংস্কার না অন্য কিছু। সেই কথা ভাবতে ভাবতে বন্ড মেয়েটার পেছন পেছন খাবার ঘরের দিকে চলে গেল।

খাবার ঘরের মধ্যে দূরের কোণের দিকে টেবিলের কাছে গেল। আর বন্ড লক্ষ করল যে মেয়েটা সামান্য খুঁড়িয়ে চলছে। বন্ড ওই যৌন আবেদনে ভরা মেয়েটার মধ্যে একটা শিশুসুলভ মজা দেখতে পেল। ওকে একটা সবচেয়ে বড়ো এবং মারাত্মক ফরাসি উপাধি ‘কুর্তিসাঁ দ্য মার্চ’ দিতে ইচ্ছে করছিল।

শ্যাম্পেন আর পঞ্চাশ ডলারের বেলুগা ক্যাভিয়ার আনার পর বন্ড জিজ্ঞেস কবে — আচ্ছা, সাঁতার কাটতে গিয়ে কি তোমার পায়ে চোট লেগেছে?

মেয়েটি গম্ভীরভাবে বলল — না, আমার একটা পা অন্যটার চেয়ে ইঞ্চিটুক ছোটো। আপনার নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না।

— না, না, বেশ ভালোই লাগছে। ঠিক একটা বাচ্ছা মেয়ের মতো মনে হচ্ছে।’

মেয়েটা এক অদ্ভুত ভাবে বন্ডের দিকে তাকিয়ে যেন একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বললে — একটা পোড়াখাওয়া রক্ষিতা মনে হচ্ছে না তো?

— তোমার নিজের সম্বন্ধে সেই রকমের ধারণা আছে নাকি?

— নাসাউ-এর সকলের যখন এরকম ধারণা, তখন মনে হতেই পারে। সে বন্ডের মুখের দিকে সোজা তাকাল। কিন্তু সেই তাকানোর মধ্যে রয়েছে যেন একটা কীসের প্রার্থনা।

— না, সেরকম কোনো কথা আমার কানে আসেনি। আর তাছাড়া লোকের মতামতের কোনো দাম আমার কাছে নেই। কারুর সম্বন্ধে আমাব মনোভাব আমিই ঠিক করব। মনে করো, কোনো পশু অন্য পশুকে বোঝে তার অনুভূতি দিয়েই বিচার করে। কিন্তু মানুষ কখনো নিজের অনুভূতি দিয়ে বিচার করে সুখী হতে পারেনা। সে পরচর্চা শুনতে ভালোবাসে, তাই অপরের কাছ থেকে অপরের বিচার শুনতে চায়। তবে তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা জানতে চাও?

— সব মেয়েই তাই চায়। আশাকরি সত্যিটাই বলবেন। নইলে আর শুনব না।

— আমার যা ধারণা তাই বলছি। তুমি একটি তরুণী মেয়ে। তবে যত না তুমি সাজো বা তোমার ব্যবহার যা তার চেয়েও তুমি ছোটো। তুমি খুব সুখের মধ্যে মানুষ হয়েছ। গায়ে দুঃখের আঁচ লাগতে দেওয়া হয়নি। হঠাৎ একদিন তোমায় এক অজানা অচেনা পরিবেশের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। তুমি উঠে দাঁড়ালে। লড়াই শুরু করলে উজ্জ্বল জীবনে ফিরে আসবার জন্যে। এর জন্যে তোমায় খুব নির্মম হতে হয়েছে। তোমার হাতে রয়েছে তোমার মোক্ষম অস্ত্র। যা সব নারীরই থাকে। তুমি খুব ধীরেসুস্থে তার ব্যবহার করেছ। এমনকি নিজের দেহকেও তুমি কাজে

লাগিয়েছ। যাতে কাজ খুব সহজ হয়। তাতে পরে তোমার কোমল প্রকৃতিগুলোকে একপাশে সরিয়ে রাখতে হয়েছে। তারা কিন্তু শুকিয়ে যায়নি, জোর বাড়িয়ে ফেলেছে। বিবেকের দংশন তোমায় বিচলিত করতে পারেনি। যা চেয়েছো, তা পেয়েছ।’ বন্ড টেবিলের ওপর ডোমিনোর হাত স্পর্শ করল। সাক্ আমি একটু গম্ভীর হয়ে গেছি। অন্য কথা বলা যাক। তুমি জানো তবুও বলি — তুমি খুবই অপরূপ সুন্দরী, যৌন আবেদনে ভরপুর। স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী, মেজাজী এবং নিষ্ঠুর।

মেয়েটি বেশ চিন্তিতভাবে বন্ডের দিকে তাকাল — এসব বলা খুবই সহজ। আর এর অনেক কথাই আমি আপনাকে বলেছি। আব ইটালিয়ন মেয়েদের সম্পর্কে আপনার জানা আছে। কিন্তু নিষ্ঠুর!

‘মনে করো আমি জুয়া খেলতে বসে খুব খারাপভাবে হারছি। আমার পাশে আমার প্রেমাস্পদ রয়েছে। তখন তার কাছ থেকে যদি সাঙ্ঘনা না পাই তবে তাকে নিষ্ঠুরই বলব। কোনো পুরুষ চায় না তারা প্রেমাস্পদের সামনে সে কোনো ব্যাপারেই ব্যর্থ হয়।

মেয়েটি আর ধৈর্য ধরতে পারল না। বললে — ‘আমার সব সময়ই ওর পাশে বসে ওর কায়দা দেখতে হয়। আমি মনেপ্রাণে চাইছিলাম যে, আপনি জিতুন। ভান করা আমার পোষায় না। কিন্তু আপনি আমার আসল গুনের কথাই বললেন না — সেটা হচ্ছে সততা।’ আমি হয় খুব ভালোবাসব নয়তো খুব ঘৃণা করব। এমিলিওর সঙ্গে আমার এখন মাখামাখি সম্পর্ক। প্রথমে আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা ছিলাম — এখন বন্ধু, দুজনে দুজনকে বুঝি। আমি আপনাকে বলেছিলাম না যে, ও আমার অভিভাবক সেটা একেবারে মিথ্যে। আমি ওর রক্ষিতা। আমায় একটা গিণ্টি করা খাঁচায় বন্দি করে রেখেছে যেখানে আর আমি থাকতে চাই না। বন্ডের দিকে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিমায় বললে — ‘এমিলিওর ওপর নিষ্ঠুরতা করা হবে কিন্তু এতে ওর ভালোই হবে। পয়সা দিয়ে দেহটা কেনা যায় কিন্তু মনটা যায় না। এমিলিও তা জানে। ও মেয়েদের নিজের দরকার মতো ব্যবহার করে। এবকম বন্ড মেয়ে ওর আছে। আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সে খুবই ওয়াকিবহাল। কিন্তু আমার আর ভালো লাগছে না।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে — আর একটু শ্যাম্পেন দিন আমায়। বাজে বক বক করতে করতে গলা শুকিয়ে গেছে। আর এক প্যাকেট ‘প্লেয়ার্স সিগারেট’ হেসে ফেললে — ‘অনুগ্রহ করে’ মানে যেমন বিজ্ঞাপনে বলে আর কি। শুধু ধোঁয়া টানতে আর ভালো লাগছে না। আমার হিরোকে চাই।’

সিগারেটওয়ালীর কাছ থেকে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে বললে — কী হিরো না কী যেন বলছিলে?

মেয়েটার মুখের চেহারা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। কঠিন মুখ নরম হয়েছে। যেন একটা সুন্দরী তরুণী সন্ধেবেলায় বেড়াতে বেরিয়েছে। বললে আপনি জানেন না। সে সিগারেট প্যাকেটের ওপর যে নাবিকটির ছবি রয়েছে সেটা দেখিয়ে বললে — ‘আমার প্রথম প্রেম। আমার স্বপ্নের মানুষ। আপনি জানেন না এর মধ্যে কতটা রোম্যান্স লুকিয়ে রয়েছে। এই লোকটার সঙ্গেই আমি প্রথম পাপ করি। এর সঙ্গে জঙ্গলে যাই, একে নিয়ে শোবার ঘরেও যাই। আমার হাতখরচের সব টাকাই ওর জন্যে খরচ করেছি। ও-ই আমায় চেলটেনহ্যাম লেডিজ কলেজের বাইরের জগৎ চিনিয়েছে। এরই সাহায্যে সমবয়সি ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পেরেছি। যখনই নিঃসঙ্গ বোধ করেছি ওই আমার সঙ্গ দিয়েছে।

সে বন্ডের হাতটা আবেগে চেপে ধরল — বললে — ‘দেখুন, আমার হিরোর গল্প। ছবির নাবিকের টুপিতে যে নাম লেখা রয়েছে। প্রথমে সে এক পালতোলা নৌকোর তরুণ নাবিক তখন

তাব বহু গোর্গা ছিল। এমনিতে তার সুন্দর চুল ছিল। দেখতে সুন্দর ছিল। এই দেখে মনে করা যেত সে একজন ভদ্রলোক।

আর একটু শ্যাাম্পেন খেয়ে বললে - আমার হিরোর কথা শুনে আপনাব বাজে লাগছে না তো?

- আমার হিংসে হচ্ছে। তুমি বলে যাও।

সে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াল। ভারত, চিন, জাপান, আমেরিকা। তার জীবনে অনেক মেয়ে এসেছিল। সে নিয়মিত তার মাকে আব ডোভারে তার এক বিবাহিতা বোনকে চিঠি লিখত। তারা চাইত সে বাড়ি ফিরে দেখেওনে একটা মেয়েকে বিয়ে ককক। কিন্তু কেন তা করেনি। সে তার মনের মেয়েকে স্বপ্নে খুঁজছিল। সেই মেয়েটিকে অনেকটা আমার মতো দেখতে।

এরপর বাম্পীয় জাহাজ চালু হল। তাকে ওই বকম একটা জাহাজে বদলি কবা হল। ছবিটার ডানদিকে যাব ছবি দেখছেন। সেই সময় থেকে সে মাইনের টাকা জমাতে শুরু করল। মেয়েদের জন্য মারপিট করা বন্ধ করে দাড়ি রাখতে লাগল। যাতে তাকে গম্ভীর আর বয়স্ক দেখায়। তারপর সে ছুঁচ আর রঙিন সুতো দিয়ে নিজের ছবি আঁকতে শুরু করে। আসলে তার বাম্পীয় জাহাজ ভালো লাগে না -- জীবনের মধ্যাহ্নে... তাই না?

শেষে তাব নাবিকজীবন শেষ হল। এক সুন্দর মনোহর সন্ধ্যায় সে বাড়ি ফিরল বটে, কিন্তু সেটা ছিল খুব বিষণ্ণ, সুন্দর আবার রোমান্টিক, সেই সন্ধ্যাকে ধরে রাখতে হবে তাব ছবিতে। সে তার জমানো টাকা দিয়ে ব্রিস্টলে একটা মদেব বাব খুলল। বাব খোলার আগে পর্যন্ত, রোজ সকালে সে ছবিটার জন্যে সময় দিত। এই আগেরটার ওপরের ছবি -- ওই পালতোলা জাহাজটা তাকে সুয়েড থেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এই দেখুন, নিউলস, লাইট হাউস, তাকে ডাকছে সেই সুন্দর সঙ্কেবেলায়। কলেজ প্লেয়ার্স খাওয়ার সময় আমি সব ছবিগুলো ঞ্কেটে রাখতাম। তারপর সব উলটোপালটা হয়ে গেল। আমায় ইটালিতে ফিরে আসতে হল যেখানে এর দাম খুব বেশি। তাই আমায় 'ন্যাশানেলস' সিগারেট ধরতে হল।

বড় চাইছিল মেয়েটা এইরকম মেজাজই থাকুক। তাই বললে -- কিন্তু হিরোর আঁকা সব ছবি কোথায়? সিগারেটের লোকেরা ও দুটো কীভাবে পেল?

-- হ্যাঁ একদিন সকালে ফ্রক কোট আব লম্বা সিন্কেট টুপি-পর্য এক ভদ্রলোক তার বাব এ এসে উপস্থিত, সঙ্গে দুটো ছোটো ছেলে।

মেয়েটা প্যাকেটের পাশের ছবিতে দেখাল লেখা রয়েছে - 'জন প্লেয়ার্স এন্ড সন্স'। সেই ভদ্রলোকই জন প্লেয়ার আর তাঁর দুটো ছেলে। তাঁদের একটা রোলসরয়েস হিরোর দোকানের সামনে খারাপ হয়ে যাওয়ায় সোফার সেটাকে সারাতে নিয়ে যায় আর তিনি বাবে টুকে জিজ্ঞার বিয়ার, কুটি আর পনির আনতে বললেন। কারণ ব্রিস্টলে এইসব সম্ভ্রান্ত বণিকেরা মদ স্পর্শ করেন না। তিনি আর তাঁর দুই ছেলে ওই কাপড়ের ওপর আঁকা ছবি দুটোর খুব প্রশংসা কবলেন। তখন সবে সিগারেট আবিষ্কার হয়েছে। তাঁর ইচ্ছে সিগারেট তৈরির ব্যবসা শুরু কববেন। কিন্তু সিগারেটের কী নাম বা প্যাকেটের ওপর কী ছবি থাকবে তা ভেবে পাচ্ছিলেন না।

শেষে মি প্লেয়ার তার ফ্যাক্টরিতে ফিরে তাঁব ম্যানেজারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে হিরোর কাছে পাঠালেন। ম্যানেজার এসে বললে তাদের সিগারেটের প্যাকেটের ওপর ওই ছবি দুটো ছাপার যদি অনুমতি দেয় তো তারা তাকে একশো পাউন্ড দেবে। সে রাজি হয়ে গেল। কারণ তখন তার একশো পাউন্ডই দরকার বিয়ের জন্য। -- ডোমিনো থামল। তার দৃষ্টি কোন দূরে চলে গেল। সে যেন কিছু নিজেব চোখে দেখতে পাচ্ছে। 'তার বউ ছিল খুব ভালো। ভালো রান্না করতে পারত। তার বয়েস মাত্র তিরিশ বছর। আর তার সুন্দর নরম শরীরটা দিয়ে বিছানায় হিরোকে খুব উষ্ণ রেখেছিল। তার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত। তার একটা ছেলে আর একটা মেয়ে

হয়েছিল। ছেলোটো তার বাবাব মতো নেভিতে যোগ দেয়। সাই হোক, মি প্লেয়ার চাইছিলেন লাইফবয়ের সামনে হিরোর মুখেব ছবিটা প্যাকেটের একদিকে আর অন্যদিকে চমৎকার সন্ধ্যার ছবিটা থাকবে। ম্যানেজার বোঝালেন এসব কবতে গেলে 'এই কড়া ঠাণ্ডা, নেভি কটি তামাক' আর কোম্পানির ট্রেডমার্ক রাখার জায়গা থাকবে না। সেইজন্যে একটার ওপর আর একটা ছবি ছাপানো হল। তাই হল কিন্তু জলপরিটা মুছে দেওয়া হল।

- জলপরি মানে?

ওই লাইফবয়টার ওপর একটা জলপরি ঝাঁকা আছে যার বুকটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেটা ঠিক যুক্তিসংগত হবে না বলে বাদ দেওয়া হল। অবশ্য তার জন্য ওকে পুঁষিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কী রকম?

ওই সিগারেটের খুব কাটতি হল। লোকে ভাবল ভালো ছবিওয়ালো সিগারেট ভালোই হবে। অতএব মি প্লেয়াব প্রচুর পয়সা পেলেন। সেইজন্যে হিরো যখন বড়ো হল এবং বোঝা গেল যে তাঁর দিন ফুরিয়ে আসছে তখন মি প্লেয়ার একজন ভালো শিল্পীকে দিয়ে হিরোর একটা ছবি আঁকালেন। কিন্তু সেখানে হিরোকে বেশ বয়স্ক দেখাচ্ছে। তিনি হিরোকে কথা দিলেন ছবিটা থাকবে প্লেয়ার সিগারেটের প্যাকেটের ভেতরের দিকে। বন্ডকে প্যাকেটটা দেখাল। আর বলল -- দেখুন, একটু লক্ষ কবলেই বুঝতে পারবেন যে জাহাজের পতাকা দুটো অর্ধনমিত। এটা বেশ ভালো করেছেন মি প্লেয়ার তাই না? এর অর্থ হিরোর প্রথম এবং শেষ জাহাজ দুটোকে মনে করা হচ্ছে। খুব আনন্দের তাই না?

- নিশ্চয়ই, মি প্লেয়াবের সব দিকেই নজর ছিল, তাই না?

মেয়েটা যেন তাব স্বপ্নের দেশ থেকে ফিরে এল। স্বাভাবিকভাবে বলল -- 'গল্পটা একটা রূপকথা — এটা শোনার জন্য ধন্যবাদ। বাচ্চাবা বড্ড বোকা। তারা শোবাব সময় বালিশের নীচে কিছু না কিছু একটা রাখবেই। সে পুতুলই হোক বা ন্যাকডাই হোক। আমার ভাই তার বালিশের নাচে আমার দিদিমার দেওয়া একটা মাদুলি রাখত। তখন তার বয়স উনিশ বছর। বিমান বাহিনীতে কাজ করে। মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি। একদিন তার মাদুলিটা হারিয়ে যায়। ওরে বাবা — সে কি তুলকালাম কাণ্ড। ওই মাদুলিটা তার সৌভাগ্যের প্রতীক। সে অনেক টাকা রোজগার করেছে। আমায় সাহায্য করতে পারত। কিং করেনি। বলে নিজেকে স্বাবলম্বী হতে হবে। তাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। সে বদমাইস ছিল বলেই। মেয়েরা সাধারণত তাই করে। সে বলত আমার দাদু চোরাইচালানদার হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। তাই 'বালান্জোর কবরখানায় তাঁর কবরই হবে শ্রেষ্ঠ ওই রকম উপায়ে টাকা রোজগার কবেই।

বন্ড মেয়েটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে খুব জোরে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললে - 'তাহলে তোমাদের পরিবারের পদবি হচ্ছে 'পেটানী'?'

- হ্যাঁ, যখন অভিনয় করতাম, তখন স্টেজে 'ভিতালী' নামটাই ব্যবহার করতাম। শুনতে বেশ ভালো লাগে। অন্যটা কেউ মানেই না। আমিই ভুলে গেছি। ইটালিতেও সেই নাম ব্যবহার করছি। আমার ইচ্ছে করছিল সব কিছু বদলে দিই

-- আচ্ছা ভাইয়ের নামের প্রথমটা কী?

-- 'জোসেফ। তার চরিত্রের অনেক দোষ। কিন্তু বলল সে খুব ভালো পাইলট। শেষ যা খবর পেয়েছি তাতে জেনেছি। প্যারিসে সে একটা বেশ বড়ো পদ পেয়েছে। এবার সে ঘর বাঁধবে। আমি রোজ রাতে তার জন্য প্রার্থনা করি। দেখুন, পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে তাকে আমি ভালোবাসি। সে ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই।' বলতে বলতে তার গলাটা মনে হল ধরে এল।

বন্ড ওয়েটারকে বিল আনতে বলে আশট্রেতে সিগারেটটা খুঁজে দিয়ে বললে - হ্যাঁ, বুঝলাম।

জেটির কাছে বন্ড আর কনস্টেবল স্যান্টোস তারা জলের তলায় নামাবাব সব সরঞ্জাম এনেছে। সেগুলো পরীক্ষা করছে। অ্যাকোয়ালাং-এর সিলিন্ডারটা বন্ডের পিঠে বেঁধে দিল। লিটারের দেওয়া গাইগার কাউন্টারটা ঠিক আছে কিনা দেখল। রবারের তৈরি নিশ্বাস নেবার মাউথপিসটা দাঁতে চেপে ভালভ ঠিক করে নিল। অনেক দূর থেকে শোনা যাচ্ছে জাংকানু নাইট ক্লাবের স্টিল ব্যান্ডের সংগীত যা খুব উঁচু পর্দায় বাঁধা। মনে হচ্ছে যেন একটা বীভৎস মাকড়সা চড়া পর্দায় বাঁধা জাইলোফোনের তারের ওপর নাচছে।

স্যান্টোসের পরনে শুধু সাঁতারের প্যান্ট। বিশালদেহী চেহারা, মিশ্রবর্ণের মানুষ। তার চওড়া বুকটা যেন দুটো বড়ো থালা। বন্ড বলল — রাতে এদিকে জলের তলায় বড়ো সড়ো কোনো মাছ-টাছ আছে কি না?

স্যান্টোস হেসে বলল — বন্দরের ধারেকাছে যারা থাকে সাধারণত তারা ই আছে। বড়ো জোর দু-একটা ব্যারাকুডা বা হাঙর দেখতে পারেন। তবে তারা নর্দমার নোংরা খেয়ে খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেলেছে। আপনাকে বিরক্ত করবে না। যদি না আপনার গা থেকে রক্ত বেরোয়। জানেন তো রক্তের আত্মদ পেলে ওরা খেপে যায়। আর দেখতে পাবেন রাতের অতিথি চিংড়ি, কাঁকড়া এইসব। সমুদ্রের তলাটা ভরে আছে ঘাস, আর ভাঙা অজস্র নৌকার লোহা-লকড় আর বোতলে। আপনার পক্ষে মিনিট পনেরোর বেশি সময় লাগবে না। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আমি প্রায় একঘন্টা ধরে ওই ইয়াটার ওপর নজর রেখে ওব ডেকের ওপর একটাও পাহারাদারকে দেখতে পাইনি বা পরিচালক-কক্ষে একজন লোকও দেখতে পাইনি। চাঁদ আর 'ডিস্কোর' আলো জলের ওপরে পড়ায় আপনি জলের তলায় সব কিছুই ভালোভাবে দেখতে পারেন। কারণ জলটা খুব স্বচ্ছ। অল্প অল্প হাওয়া দেওয়ায় আপনার অ্যাকোয়ালাং-থেকে বের হওয়া বুদ্ধবুদ্ধ দেখা যাবে না। আমার একটা অক্সিজেন পরিশুদ্ধ করা যন্ত্র আছে কিন্তু দিলাম না, কারণ ওগুলো খুবই বিপজ্জনক।

— বেশ তবে চললাম। আধ ঘন্টার মধ্যে আবার দেখা হচ্ছে। বন্ড তার কোমরের ছোরাটা ঠিক করে দেখে নিয়ে অক্সিজেন মাউথপিসটা মুখে চেপে ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। জেটিব শেষ প্রান্তে যাবার আগেই তার কান পর্যন্ত জলে ডুবে গেল। এবার বন্ড চট করে ডুব মেরে তলায় নেমে গেল।

সমুদ্রের নীচে কাদার স্তর ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছে। বন্ডও নামল। শেষ দেখে সে সমুদ্রের একেবারের তলায় গিয়েছে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে রয়েছে। হাতের ঘড়িতে দেখল রাত বারোটা বেজে দশমিনিট। এবং সে বেশ সহজভাবেই সাঁতার কেটে এগিয়ে চলল।

সমুদ্রের তলায় জলের স্তর ভেদ করে চাঁদের আলো আসছে। তলায় পড়ে থাকা ভাঙা টিন, মোটারের টায়ার আর বোতলের ওপর। একটা অক্টোপাস বন্ডের সাঁতারের ডেউ খেয়ে তার রং পালটে ঘন খয়েরি থেকে ছাই হয়ে গেল। আর ভয়ে তার বাড়ি একটা খালি ড্রামের মধ্যে ঢুকে গেল। সমুদ্রের তলায় জেলির মতো সব নানা রকম ফুল ফোটে — তার ওপর বন্ডের ছায়া পড়লে তারা তাদের গর্তে ঢুকে পড়ল। অন্যসব জলচর শ্রাণীরা বন্ডের ওপর রেগে গিয়ে তাদের গর্ত থেকে পিচকিরির মতো জল ছেঁটাতে লাগল। সমুদ্রের তলায় মাথা খুব ঠান্ডা রাখতে হয়। কেবল নীচের সুদৃশ্য দেখতে হলে, কোনো কাল্পনিক দানবের চিন্তা না করা ভালো।

বন্ডের সাঁতার কাটা ক্রমশ স্বাভাবিক হল। তার মনে এবার কিছু প্রশ্ন এল — ডোমিনো তাহলে ওই প্লেন-চোরটার ভগ্নি। লাগে যদি এর সঙ্গে সত্যিই জড়িত থাকে। তবে ডোমিনোর সঙ্গে আত্মীয়তা কি উঁচু যোগাযোগ রাখার জন্য। মেয়েটার ব্যবহার এখন পরিষ্কার বোঝা গেল

খুব সরল। লাগোঁকে সন্দেহ করা আরও প্রতিষ্ঠিত হল — ‘প্রেত’ কথাটা শোনার পর তার মুখের অবস্থা দেখে। এটাকে ইটালিয়ান কুসংস্কার বলাও যায়, আবার না-ও। লাগোঁর বিরুদ্ধের প্রমাণগুলো হচ্ছে সমুদ্রের ওপর ভেসে যাওয়া বরফের পাহাড়, যার মাত্র সামান্য ওপরে দেখা যায় অথচ তলায় বিরাট বিশাল বরফ রয়েছে। আচ্ছা আমার কল্পনা বা চিন্তাধারা কি হেডকোয়ার্টারে জানানো ঠিক হবে? সবটা না কিছু চেপে রেখে?

মানুষের সৃষ্টি থেকেই তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তার অজান্তেই কাজ করে যায়। আর প্রকাশ পায় যখনই কোনো বিপদ আসন্ন প্রায়। বন্ডেরও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এখন হঠাৎ জাগ্রত হল — এবং যেন সিপদের গন্ধ পেল। সে তার কোমরে গোঁজা ছোঁরায় হাত রাখল।

বন্ড সজাগ হয়ে উঠল। সে ডানদিকেই ঘুরল — বাঁ বা পেছনে নয়। কে যেন তাকে তাই করতে বলল। সে ঘুরে দেখল তার থেকে মাত্র দশ গজ দূরে সমুদ্রের ভীষণতম প্রাণীর অন্যতম একটা বারকুন্ডা মাছ তার সমান্তরালে চলছে। তার মুখ সামান্য হাঁ করে রয়েছে এবং তার ফাঁক দিয়ে তার ধারালো সাদা দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। এই দাঁতগুলো এত ধারালো যে, সে মাংস গামড়ায় না, বড়ো বড়ো মাংসের টুকরো কেটে নিয়ে খাওয়ার পর পরেবটার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বন্ড বেশ ভয় পেয়ে গেছে। তার গায়ের চামড়া টানটান হয়ে উঠল। তার ঘড়িতে দেখে বুঝল ডিস্কোর নীচে যেতে এখনও মিনিট তিনেক বাকি। সে হঠাৎ ঘুরে সেই বারকুন্ডাটাকে আক্রমণ করল। বারকুন্ডাটা অলস ভাবে তার ল্যাজ নেড়ে পাশে সরে গেল। আর যেই বন্ড তার নিজের রাস্তা ধরেছে অমনি বারকুন্ডাটা বন্ডকে অনুসরণ করল — সে ভাবছে প্রথমে কোথায় তার কামড় বসাবে — হাতে, পায়ে না পাছায়।

বন্ড মনে করার চেষ্টা করল শিকারি মাছ সম্বন্ধে কী কী করা উচিত। প্রথম, ভয় না পাওয়া সাহসী থাকা। চলাফেরার ছন্দ ঠিকমতো বজায় রাখা। একটুখানি ছন্দপতন হলেই সে শত্রুর কাছে তার দুর্বলতা প্রমাণ করে দেবে। অতএব সে মনস্থির করে সামনের দিকে চলতে শুরু করল।

সমুদ্রের তলার অবস্থা হঠাৎ পালটে গেল। গভীর জলের চেউতে ঘাসগুলো নেচে উঠল। সেই ঘাসের মাঝে দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে মরা স্পঞ্জ। নাসাউতে একদিন এই স্পঞ্জই ছিল একমাত্র রপ্তানি দ্রব্য। কিন্তু একরকমের ফাংগাস এদের মেরে ফেলছে। বন্ডের কালোছায়া এদের ওপর দিয়ে বাদুড়ের মতো চলে গেল। আর বারকুন্ডাটাও তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

হঠাৎ তার সামনে এক ঝাঁক রুপালি মাছ দেখা দিল। মনে হচ্ছে যেন একটা কাচের অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখা রয়েছে। তাদের মাঝে দুটো সমান্তরাল দেহ আসতেই তার দু ভাগ হয়ে গিয়ে তাদের যাবার রাস্তা করে দিল। আর তারা আবার মিলে গেল। কিন্তু বারকুন্ডাটা রাজার চালে সামনে নজর রেখে বন্ডকে অনুসরণ করে যাচ্ছে। যেমন শেয়াল মুরগি ব পেছনে ছোট্টার সময় পাশ দিয়ে খরগোশ গেলে তারা লক্ষ করে না।

খানিকপরে সেই নোঙরটা বন্ডের চোখে পড়ল। তার ওপর শেকলটাকে দেখে সে সেটা ধরে উঠতে লাগল। তার আর আনন্দ ধরে না। সে তার অভীষ্টে এসে গেছে। তাকে যে বারকুন্ডা য তাড়া করেছে, সে ভুলেই গেছে।

বন্ড ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল। একবার নীচের দিকে তাকাল। বারকুন্ডার কোনো দেখা নেই। বোধহয় নোঙর আর শেকল দেখে সরে পড়েছে।

ক্রমশ জাহাজটার অবস্থান চোখে পড়ল। জাহাজটার খোলটা একবার ঘুরে দেখে নিল।

বাঁ দিকে অনেকটা দূরে দুটো স্কু চকচক করতে দেখে বন্ড এগোতে লাগল ওপরদিকে নজর রেখে। হঠাৎ সজোরে নিশ্বাস নিয়ে বুঝতে পারল যে, হ্যাঁ এখানে একটা দরজা আছে। বন্ড কাছে

গিয়ে মেপে দেখল বারো বর্গফুটের মতো আয়তন। দু-ভাগে ভাগ করা। এবার গাইগার কাউন্টারের সুইচ অন করে ওই ইস্পাতের ওপর চেপে ধরে বাঁ হাতের কজির মিটারে নজর দিয়ে দেখল — না — বোমা থাকলে কাঁটা যতটা বিচলিত হওয়ার কথা ততটা করল না। ঠিক আছে এই পর্যন্তই। এবার ফেরা যাক।

ফিরতে যাবে তার কানের কাছ ঠং করে আওয়াজ আর তার কাঁধেব ওপর ধাক্কা লাগল সজোরে। খোলের কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। দেখল একটা তীক্ষ্ণ বর্শা কাঁপতে কাঁপতে নীচে তলিয়ে যাচ্ছে। বন্ড ঘুরে চাঁদের আলোয় দেখল একটা রবারের কালো পোশাকে একটা লোক। একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য জলে জোরে পা নাড়িয়ে সে তার গ্যাস (CO₂) বন্দুকের নলে যার একটা বর্শা মারার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে বন্ড তার পাখনার ঝাপটা মেরে তীব্রবেগে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। লোকটা লোডিং লিভার টেনে বন্দুক উচিয়ে ধরল। শত্রু তাব থেকে এখনও ছ' স্টোকা দূরে। অতএব বন্ড নীচের দিকে ডুব দিল। গ্যাস বন্দুকের নিঃশব্দ বিস্ফোরণ যে হয়েছে। জলের চেউতে তা বোঝা গেল। এবার তার পায়ে কাঁ একটা লাগল। বন্ড নীচের থেকে তার ছোরা দিয়ে লোকটাকে আক্রমণ করল, তার ছোরাটা আমূল বিধে গেল। বন্ড হাতে রবারের স্পর্শ পেল। কানের পাশে বন্দুকের কুঁদোটা আঘাত করল। আর একটা সাদা হাত নেমে এসে তার মুখ থেকে মাউথপিসটা খুলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। বন্ড জোরে ছোরা চালাল। রবারের স্পর্শ পেল। মাউথপিস থেকে হাতটা সরে গেল। আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ সজোরে তার মাথায় বন্দুকের কুঁদোটা আঘাত করল।

কালো পোঁয়ায় সমস্ত জলটা ভরে গেছে। বন্ডেব কাচের মুখোশের ওপর থকথকে কাদাব মতো লেপটে গেছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। হাত দিয়ে সেটা পরিষ্কার করে দেখল পোঁয়াটা বেব হচ্ছে লোকটার দেহ থেকে। তবুও বন্দুকের কুঁদোটা আবার নেমে আছে অবশ্যই খুব আস্তে আস্তে। লোকটার পায়ের পাখনা স্থির হয়ে গেছে। বন্ডের দিকে নেমে আসছে। বন্ডেরও হাতপা ক্রমশ শিথিল হলে গেছে। সিসের মতো ভারী লাগছে। সে নিজেকে ঠিক করার জন্য তার মাথাটা সজোরে ঝাঁকিয়ে নিল। তবুও হাত-পায়ের জোর পাচ্ছেনা। অন্য লোকটার মাউথপিসের ভেতর থেকে তার দাঁত খিচোনো দেখা যাচ্ছে। বন্দুকটা বন্ডের দিকে উচিয়ে উঠল। বন্ড কোনো রকমে হাত দুটো বুকের কাছে তুলে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে লোকটা পেছন থেকে একটা জোর ধাক্কা খেয়ে বন্ডের দিকে দুহাত তুলে আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। বন্দুকটা তার হাত থেকে খসে জলের তলায় তলিয়ে গেল। লোকটার পিঠ থেকে একঝলক রক্ত সমুদ্রের জলে ছিটকে পড়ল। সে তার মুখ পেছন দিকে ঘুবিয়ে তার আততায়ীকে দেখতে চেষ্টা করল।

এবার বন্ড দেখল তাকে কে বাঁচাল। সেই বারকুন্ডাটা লোকটাব কয়েক গজ পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখে রবারের কিছুটা ঝুলছে। সেটাকে কোনো রকমে ছাড়িয়ে সে লোকটা ডান দিকের কাঁধটা ধরে সজোবে একটা কামড় দিল। তার ভাঁটারমতো চোখ দুটো একবার বন্ডের দিকে তাকিয়ে লোকটার দেহটাকে টানতে টানতে নীচের দিকে চলে গেল। বন্ডের যেন বমি উঠে আসছে। কোনো রকমে সামলে নিয়ে তীরের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল।

খানিকদূর আসার পর তার বাঁদিকে একটা ডিমের মতো জিনিস পড়ল। বন্ড সেটাকে খেয়াল না করে ডিগবাজি খেতে খেতে ডুবে গেল। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই সে তার পেটে প্রচণ্ড ধাক্কা পেল। পাশের দিকে ছিটকে পড়ল। সে তার স্নায়ুগুলোকে সজাগ করল। বুঝতে পারল জলের ওপর রক্তের রং নিশানা করে জাহাজের চারপাশ থেকে জল বোমা ফেলা হচ্ছে। বন্ড দ্রুত সরে গেলে সেই চেউ এর ধাক্কা ক্রমশ কমে এল।

এবার জলের নীচে সেই ঘাসের নাচন দেখা গেল। আর বিস্ফোরণের জন্য মাছের ঝাঁক পালাতে লাগল। বন্ড শরীবের সমস্ত শক্তি একত্র করে সাতরাতে লাগল। এখুনি হয়তো লাগেঁটা একটা বোট নামাবে। কয়েকজন ডুবুরী ডুব দেবে। তারা সম্ভবত বন্ডের আগমনের কোনো খোঁজই পাবে না। ভাববে নিখোঁজ লোকটাকে কোন বারকুন্ডা ধরে নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু লাগেঁটা বন্ডের পুলিশের কাছে কী রিপোর্ট দেবে এই নিরীহ লোকটা সম্পর্কে। আর একটা ইয়াট পাহারা দেবার জন্যে জলের তলায় লোক নিয়োগের কী-ই বা প্রয়োজন?

বন্ডের ভীষণ মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। সে সামুদ্রিক ঘাসের ওপর দিয়ে চলেছে। তার শরীরে বন্ডকের কুঁদোতে আঘাত লেগে যে ক্ষত হয়েছে তাতে হাত বুলিয়ে দেখল ছড়ে যায়নি। নেহাত জলের তলায়, আঘাতটা নইলে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। হঠাৎ সামনের দিকে জলের তোলপাড় হতে দেখে তার খেয়াল হল এবং দেখতে পেল একটা বিরাটকায় ব্যারাকুন্ডা পাগলের মতো তার শরীরটা ধনুকের মতো বেঁকিয়ে নিজের লেজটা বারে বারে কামড়াতে কামড়াতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

এত বড়ো বিরাট এক সমুদ্রের রাজাকে এতটা অসহায় দেখে বন্ডের খুব দুঃখ হল। মনে হয় একটা বোমা ওই ব্যারাকুন্ডার কোনো এক স্নায়ুকে খুব জোরে আঘাত করে তাকে অকেজো করে দিয়েছে, তাই সে পাগলের মতো ছুটছে। সমুদ্রের মধ্যে যদি কেউ, সে মানুষই হোক আর কোনো সামুদ্রিক জীবই হোক, নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। তাহলে সেটা আত্মহত্যার সামিলই হবে। একটা বিরাট হাঙর তার পিছু নেবে। তার খিঁচুনি কমে এলে প্রথমে তার মাথায় কামড় বসাবে, তারপর দেহে!

সমুদ্রের তলায় পড়ে থাকা গাড়ির টায়ার বোতল টিন পার হয়ে জেটির দিকে এগিয়ে গেল। জেটির কাছে এসে বালির সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল। মাথাটা ঝুঁকে পড়ল। ভারী অ্যাকোয়ালাংটা খুলে ফেলল — আর পারছে না। খুব পরিশ্রান্ত। যেন ভেঙে পড়া এক জন্তু।

॥ সতেরো ॥

কনস্টেবল স্যান্টোসের মস্তব্যঙলো জামাকাপড় পরতে পরতে বন্ড এড়িয়ে গেল। সে বলে চলেছে - সে দেখল। কিছুক্ষণ আগে জলের তলায় কিছু বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। ইয়াটের ডেকে অনেক লোক হই হই করছিল — একটা ছোটো বোট নামানো হয়েছে জাহাজের বাঁদিকে। যাতে তীর থেকে কিছু দেখা যায় না। বন্ড সব শুনে বলেছিল সে কিছুই জানে না। তবে বোকার মতো জাহাজের গায়ে তার মাথা ঠুকে গেছে। সে যা দেখতে গিছিল তার সন্ধান সে পেয়েছে। তার কাজ সফল। কনস্টেবলের সাহায্য তার খুব কাজে লেগেছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। শুভরাত্রি। কাল সকালে সে কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবে।

খুব সাবধানে চারধার ভালোভাবে দেখে বন্ড রাস্তার ধারে পার্ক করা লিটারের ফোর্ড গাড়িতে উঠল। হোটোলে পৌঁছে লিটারকে ফোনে ডেকে। দুজনে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে গেল। বন্ড সব কিছু লিটারকে খুলে বলল — তার অভিজ্ঞতার কথা তার আবিষ্কারের কথা। বন্ড বললে — 'লন্ডনে এখন রাত আটটা। সে আর কিছু পরোয়া করবে না। সব কিছু সম্বন্ধে অল্পবিস্তর মিলিয়ে যা প্রমাণ পাওয়া গেছে তা যথেষ্ট।' বন্ডের সন্দেহ এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, আর চূপচাপ থাকা চলে না।

লিটার পরিপূর্ণভাবে বন্ড সমর্থন করে বললে — ঠিক আছে। তুই এগিয়ে যা। আর তোর রিপোর্টের একটা কপি আমায় দে। আমি CIA-কে পাঠিয়ে দেব।

বন্ডের মনে হল সে জেগে স্বপ্ন দেখছে লিটারের এই পরিবর্তনে। বললে — আমি কি জেগে আছি না ঘুমিয়ে রয়েছে। তোর এই পরিবর্তন ?

লিটার বলতে শুরু করল — আরে হয়েছে কী? আরও আছে। দেখ গুপ্তচর আর গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করে করে চোখ তৈরি হয়ে গেছে। আজ ক্যাসিনোতে গিয়ে চারধার ভালোভাবে লক্ষ করে দেখেছি যে ওখানে যারা এসেছে তারা একটা একটা ছোটো ছোটো দলে সবাই রয়েছে। তারা বোঝাতে চাইছে যে, তারা খুব আনন্দ করছে — ছুটি উপভোগ করছে, কিন্তু নিজেদের খুব সজাগ রেখেছে। লাগেই কেবল যা একটু হই চই করছে। আর সবাই সিগার আর শ্যাম্পেন টানছে তবে খুবই সীমিত। মনে হয় তাদের ওপর সেরকমই নির্দেশ আছে। তবে আমার ভাগ্য ভালো যে একসঙ্গে এতগুলো বদমাস ডাকাত দেখতে পেলাম। এটা নিশ্চয়ই জানিস যে পেশাদার অপরাধীরা জিলিপির মতো পাঁচ দেওয়া।

সবই অচেনা খুব। হঠাৎ একজনের ওপর আমার চোখ আটকে গেল। একজন বেঁটে মতো টাকওয়ালা লোক। গোবেচারি গোছের মুখ। ঘন ভুরু। মোটা কাঁচের চশমা পরা। এধার ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলছে — ‘কী সুন্দর জায়গা এমন তো কখনও দেখিনি হঠাৎ দেখলে মনে হয় একজন ধার্মিক লোক পথ ভুলে কোনো বেশ্যা বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। একটুতেই লজ্জায় লাল হয়ে সেখান থেকে সরে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি, কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

শেষে রিসেপশনিস্টের কাছে গিয়ে বললাম — ‘আচ্ছা আপনি কি আমায় একটু সাহায্য করতে পারবেন? দেখুন আমার বহুদিনের মানে বাল্যকালের এক বন্ধু ইউরোপপ্রবাসী তাকে এখানে দেখতে পেয়েছি। সে ও আমায় চিনতে পেরেছে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমি কিছুতেই তার নামটা মনে করতে পারছি না। আপনি যদি দয়া করে — বলে তাকে দেখিয়ে দিলাম।

সেই রিসেপশনিস্ট আমার কথায় তার খাতা খুলে মেম্বার কার্ড বার করে বললে — ওটার নাম ট্রাউট, এমিলি ট্রাউট। সুইস পাসপোর্ট — মি. লাগের্গার দলের একজন। — একটু থেমে আবার বললে — ‘তোর কোৎসেকে মনে পড়ে। পূর্ব-জার্মানির সেই পদার্থবিদ — যে পশ্চিম জার্মানিতে এসে পূর্বজার্মানির অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করে সুইজারল্যান্ডে গা ঢাকা দিয়েছিল। CIA-তে কাজ করার সময় তার ফাইলটা ওয়াশিংটনে একবার আমার কাছে আসে। সেই সময় সে একটা খবর ছিল। আমি তোকে হলফ করে বলতে পারি এ সেই কোৎসে ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু একজন পদার্থবিদ বৈজ্ঞানিক এই ডাকাতদলে কী করছে? এটাই বিরাট সন্দেহ।

তারা পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে এসে গেছে। নীচের তলায় কেবল আলো জ্বলছে। ডিউটি অফিসারকে জানিয়ে তারা বন্ডের ঘরে ঢুকল। এতক্ষণ বন্ড চুপচাপ লিটারের কথা শুনে যাচ্ছিল। কোনোরকম উত্তর দেয়নি। এবার বললে — ‘এটাই হচ্ছে মোক্ষম প্রমাণ। তুই কী বলিস?’

লিটার খুবই উত্তেজিত — ‘আরে বাবা, তুই যা দেখেছিস, যা প্রমাণ পেয়েছিস তার ভিত্তিতে আমরা ওই পুরো দলটাকে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করতে পারি।’

‘সন্দেহ? কীসের? লাগের্গা পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার উকিল ডেকে ছাড়া পেয়ে যাবে। এসব আইনের ব্যাপার। আমাদের হাতে কোন প্রমাণ আছে যা লাগের্গা অস্বীকার করতে পারবে না। কী বলবে জানিস? দেখুন ধরে নিলাম ওঁনার নাম ট্রাউট। উনি নিজের নাম লুকিয়ে রেখেছেন। ওঁনার আসল নাম কোৎসে। বুঝলাম — তিনি এখনও রাশিয়ানদের ভয়েতেই নিজের আসল নাম লুকিয়েছেন। বন্ধুগণ, আমরা ব্যবসাদার। গোপন রত্নভাণ্ডারের খোঁজে এসেছি। অতএব একজন পদার্থবিদ আমাদের চাই-ই। উনি সেই কাজ করতে চাইলেন। ওঁনার আসল নাম কী তা আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের গোপনীয় তথ্য গোপনই রাখতে চাই। আমার ডিস্কোর খেলের মধ্যে

একটা ঘর থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাতে সব গোপন জিনিস থাকতেই পারে। কিন্তু বন্ধুগণ, আমার একটা প্রশ্ন — এই মি. বন্ড যিনি খুব বিরল একজন খনী ব্যবসাদার, তিনি সমুদ্রের নীচে আমার জাহাজের তলায় কী রাজকার্য করছিলেন পেট্রোলী? কখনও এ নাম শুনেছি বলে মনে হয় না। ওকে আমি ভিতালা বলেই জেনে এসেছি। ওর পারিবারিক নামে আমার কিছু যায় আসে না।

বন্ড হাতের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলল — কী বুঝলি? বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে যাবে। গুপ্তধন শিকারের অনেকরকম ব্যাখ্যা হয়। বলবে একঘন্টার মধ্যে আমি আমার কাজকর্ম চালাবার জন্যে একটা ঘাঁটি ঠিক করে ফেলব। আর শীঘ্রই আপনারা আমার উকিলের একটা চিঠি পাবেন — আমায় বেআইনিভাবে আটক আর অনধিকার প্রবেশের জন্যে। আপনাদের টুরিস্ট ব্যবসাকে ধন্যবাদ। বুঝলি তো।’ বন্ড গম্ভীর হয়ে গেল।

লিটার অধৈর্য হয়ে বলে ফেলল -- তা হলে শালা করবটা কী? ববং একটা লিম্পেন মাইন দিয়ে ইয়েটাকে ডুবিয়ে দিই। বলব ভুল হয়ে গেছে।

— ধীরে বন্ধ, ধীরে। আমরা অপেক্ষা করব। খুব সাবধানে সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের রিপোর্ট পাঠাতে হবে। নচেৎ বড়োকর্তারা হই হই ফেলে দেবেন। আমরা বলব উপস্থিত আমাদের ‘মানটা ছাড়া আর কিছুই দরকার নেই। আমরা ওই ‘মানটা’ দিয়েই ‘ডিস্কোর পিছু নিতে পারি। আড়াল থেকে ইয়াটের ওপর কড়া নজর রাখতে পারি। লাগের যা প্ল্যান আছে তা ঠিকই আছে। আগামী ত্রিশ ঘন্টার মধ্যে সে এক নম্বর বোমাটা তার গুপ্তস্থান থেকে তুলে নিয়ে যাত্রা করবে লক্ষ্যস্থলের দিকে। যতক্ষণ না বা মালসমেত আমরা ধরতে পারছি আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। মনে হয় সেই গুপ্তস্থান এখন থেকে মোটেই খুব দূরে নয়। আর ডিভিকের বিমানটাও নয়। যদি অবশ্য সেটাকে এখানে নামানো হয়ে থাকে।

— আমরা আগামীকাল আমাদের সি-প্লেনটা নিয়ে একশো মাইলের ভেতর সব কিছু খুঁটিয়ে দেখব — জমি নয়। ওটাকে নিশ্চয়ই কোথায় অল্প জলে নামিয়ে রাখা হয়েছে। এখন আর রিপোর্টটা লিখে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিই। আর ওদের বলে দেব — আগামী ত্রিশ ঘন্টা যেন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করে। লক্ষ্য করে ঘুম দিতে হবে। এই সংকেত দেখবি পটোম্যাক আর টেমস নদীতে আগুন ধরিয়ে দেবে।

ছ’ঘন্টা পরে তারা দুজনে ভোরবেলায় উইল্ডসের ফিল্ড বিমানঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে। একটা জিপের সাহায্যে ছোটো গ্রফ্যান অ্যামফিবিয়ান বিমানটা গানওয়াতে দাঁড় করানো হল। তারা ওটাতে উঠে পড়ল। এমন সময় দেখা গেল একটা মোটরবাইক তাদের দিকে জোরে ছুটে আসছে। লিটার বললে — ‘বন্ড দেখতে হবে না ডেসপ্যাচ রাইডার। কাগজপত্রের ঝামেলা।’ বন্ড বললে — উঠে পড়।

লিটার ব্রেক ছেড়ে দিয়ে রানওয়ার ওপর প্লেন চালিয়ে দিল। তাবপর জয়স্টিক ঠেলে নামিয়ে দিল। ওপর দিকে চেয়ে দেখল আকাশ পরিষ্কার। প্লেনটা ঘাসেব জঙ্গলের ওপর দিয়ে সটান আকাশে উঠে পড়ল। বেতারযন্ত্রটা বড়বড় করি— লিটার সেটা বন্ধ করে দিল।

তারা সমুদ্র থেকে হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ছিল। বন্ডের কোলের ওপর রয়েছে একটা অ্যাডমিরালটি চার্ট। তারা উত্তর দিকে চলছিল। তারা প্রথমে বাহামার দ্বীপগুলোর ওপর চক্রর দেয়। নীচের বেরী দ্বীপগুলোকে যেন একটা নেকলেসের মতন দেখাচ্ছিল। অল্প জলে পড়ে থাকা বিচিত্র বর্ণের পাথরের মধ্যে কয়েকটা খয়েরি পাথর।

বন্ড বলল — এবার বুঝছি, ওপর থেকে সমুদ্রের স্বচ্ছ জলের পঞ্চাশফুট তলা পর্যন্ত খুব ভালো ভাবে দেখা যাবে। সুতরাং ডিভিকের মতো বিশাল বিমান জলের তলায় পড়ে থাকলে

নিশ্চয়ই দেখা যেত। শোন আমবা যেখানে বিমান চলাচল করে সে রাস্তায় যাব না। তিন তাবিখে রাতে ডিস্কোর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যাওয়া একটা ভাঁওতা। আসলে তারা ওইদিকে না গিয়ে উত্তর বা পশ্চিমদিকেই গেছে। জাহাজটা আট ঘন্টা সমুদ্রে ছিল। দুঘন্টা গেছে নোঙর করে বোমা দুটো উদ্ধার করতে। বাকি থাকে ত্রিবিংশ নট্ বেগে ছ ঘন্টার পাড়ি। উষ্ণতা দিতে এক ঘন্টা সময় নষ্ট করেছে। গ্র্যান্ড বাহামা থেকে বিমিনি দ্বীপমালা পর্যন্ত আমি ম্যাপে দাগ দিয়ে রেখেছি। প্লেনটা থাকলে ওখানেই থাকবে।’

আচ্ছা কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছিলি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছি। ভদ্রলোক, লোক হিসেবে খুবই ভালো। ওপর মহলের সম্মতি ছাড়া নিজের কাঁধে বেশি দায়িত্ব রাখতে চান না। তিনি দুজন বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ করেছেন ডিস্কোর ওপর নজর রাখার জন্য। জাহাজটার প্যালমীবার কাছে আজ মধ্যাহ্নে নোঙর কবাব কথা। সে যদি সেখান থেকে আবার রওনা হয় আর আমরা যদি তার মধ্যে ফিরে না আসি তবে বাহামা এয়ারওয়েজের একটা চার্টার্ড প্লেন তার পিছু নেবে। দু-একটা খবর দিতেই তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে রাজ্যপালকে চাইছিলেন। আমি নিবেদন করেছি। যাই হোক এখন ‘মান্টা’ কখন আসবে?’

লিটার অস্থিতির সঙ্গে বললে — সঙ্গে নাগাদ আসবে। কেন যে ওটাকে আসতে বললাম — বুঝতে পারছি না। মনে হয় কাল রাতে মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম। গ্র্যান্ড বাহামা এগিয়ে আসছে। রকেট ঘাঁটির কাছেপিঠে যাওয়া যদিও নিষিদ্ধ তবে দূর থেকে নজর রাখা যেতে পারে। মানে একবার চক্র মারতে বলছিঁস? তবে দু-এক মিনিটের মধ্যে চিৎকার টেঁচামেঁচি শুরু হয়ে যাবে।’ লিটার বেতার যন্ত্রটা খুলে দিল।

তারা পূর্বদিকে এগোতে লাগল সমুদ্রতটের প্রায় পঞ্চাশ মাইল ধরে। সামনে ছোটো ছোটো অ্যালুমিনিয়ামের কুটিরেরে ভর্তি একটা শহর। লিটার বললে — ওই যে দেখা যাচ্ছে ঘাঁটির চারকোণে চারটে হলদে বেলুন, উড়ছে প্লেন এবং জেলেদের সতর্ক করছে যে আজ এখান থেকে একটা মিসাইল ছুঁড়ে পরীক্ষা করা যাবে। তাই সমুদ্রের দক্ষিণ দিকে সরে থাকা ভালো। এটা বড়ো পরীক্ষা হলে অ্যাসেনশন দ্বীপের দিকে রকেট ছুঁড়বে। পাঁচ হাজার মাইল পূর্ব দিকে আফ্রিকার কাছ বরাবর। আব বাঁদিকে ঐ যে সাদা লাল ডোরাকাটা পেন্সিলের মতো রয়েছে ওটা মিসাইল্ডও হতে পারে। আর নল দুটো নিশ্চয়ই ‘মাডাসোব’। ওটা হচ্ছে আন্তর্দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (ICBM)। ঐ কামানের মতো জিনিষটা হল ক্যামেরা স্ট্রাস্কার। আর ঐ চাকতিটা হচ্ছে বেড়াব।

— এই মরেছে। একটা র্যাডার আমাদের দিকে ঘুরছে। কীরকম ধমক দেব দেখ না। মাঝখানে যে কংক্রিটের রাস্তা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সব ক্ষেপণাস্ত্র ফিরিয়ে আনা হয় তাদের জন্যে। একটা সেন্দ্রাল কন্ট্রোল রুম আছে, মিসাইল পরিচালনা করার জন্য আর কোনো মিসাইল বিপথে চলে গেলে তাকে ধ্বংস করার জন্যে। সেটা যখন দেখা যাচ্ছে না, সেটা নিশ্চয় মাটির নীচে আছে। বড়োকর্তা মিসাইল ছোড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আর তাঁর চেলা-চামুন্ডারা গালাগালি দিচ্ছে একটা খুদে প্লেন ঘোরাঘুরি করে জ্বালাতন করছে।

মাথার ওপর রেডিও যন্ত্রটাতে শোনা গেল না "N/AKOI, N/AKOI", আপনার নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়েছেন। শীঘ্র দক্ষিণ দিকে সরে যান। শুনতে পাচ্ছেন?

লিটার বললে — আর ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। একেই তো উইন্ডসর বিমান ঘাঁটি থেকে আমাদের নামে বাজে রিপোর্ট যাবে। যা দেখার তা তো হয়ে গেছে।’ প্লেন দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে লিটার বললে — দেখেছিঁস এই জায়গাটার দাম যদি পঁচিশ হাজার পাউন্ডের কম হয় তো আমরা নাম পালটে দিস। নাসাউ থেকে এর দূরত্ব মাত্র একশো মাইল। অতএব ডিস্কো করে বোমাটা এখানে এনে রেখে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।

রেডিওতে আবার চিৎকার শোনা গেল — N/AKOI, N/AKOI আপনাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট হবে নিষিদ্ধ এলাকায় ঢোকার জন্য এবং নির্দেশ উপেক্ষা করার জন্য। এখনই বাতাসে আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে। সাবখান রেডিও থেকে গেল।

এইবার মিসাইল ছোঁড়া হবে পরীক্ষার জন্যে। — লিটার বললে — ‘প্রপেলারের গতি কমিয়ে ওটার ওড়া দেখতে হবে। দেখতে হবে আমেরিকানদের ট্যাবলোর কোটা থেকে কেমন এক কোটি ডলার ফুস করে উড়ে গেল। দাখ, র্যাডারটা পূব দিকে ঘুরে গেল। এইবার প্রস্তুত।’

বন্দ চোখে দূরবিন লাগিয়ে লিটারকে সমস্ত ব্যাপারটা রিলে করে চলল — ‘এই মুহূর্তে কিছু দেখা যাচ্ছে না। রকেটের তলার খোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে। মেঘের মতো বাষ্প, খোঁয়া এবার তীব্র একঝলক সাদা আলো এবার লাল হয়ে গেল। লক্ষিৎ প্যাড থেকে ধীরে ধীরে রকেটটা ওপরে উঠছে। তার লেজ থেকে আগুনের শিখা বের হচ্ছে। এবার সোজা ওপর দিকে উঠছে উঠছে, সোজা উড়ে চলে গেল। ওরে বাব্বা কী জোরে উড়ে গেল, কেবল একটা আগুনের ফুলকি বেরিয়ে গেল। আর দেখা যাচ্ছে না।’ বন্দের কপালে ঘাম দেখা দিল। সেটা মুছে বললে — আমার মনে পড়ে যাচ্ছে কয়েক বছর আগে ‘মুনরেকারের ওপর তদন্তটার কথা। তোর মনে আছে?’

লিটার বললে — হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব মনে আছে। মরতে মরতে বেঁচে গেছি। ওসব কথা ছাড়। এখন আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি কী তাই বল — নিশ্চয়ই বিমিনির উত্তরের কটা ছোটো ছোটো দ্বীপ দেখা আর গোটা বিমিনির দ্বীপমালার ওপর বেশ ভালো করে চক্কর মারা। দক্ষিণ পশ্চিমে সম্ভব মাইল খুব ছোটো ছোটো দ্বীপ আমার চোখে না পড়লে সোজা মিয়ামির ফাউন্টেন ব্লুর মাঠে পৌঁছে যাব।’’

একছড়া মালার মতো এক দ্বীপমালাকে দেখা গেল মিনিট পনেরো পরে। জলের পিঠ থেকে সামান্য উঁচুতে ভাসছিল দ্বীপগুলো। এখানে জল খুবই অগভীর। প্লেন লুকিয়ে রাখার আদর্শ জায়গা। জল এত স্বচ্ছ যে ওপর থেকে বড়ো বড়ো মাছগুলো যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খেলা করছে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। প্লেনটা একশো ফুট নীচে নেমে আসাতে এসব দেখা যাচ্ছে। প্লেন থেকে দেখা যাচ্ছে সেখানে মাছ ধরার জন্য বেশ দামি সব নৌকো রয়েছে। প্লেনটা আরও দক্ষিণে চলে গেলে দেখা গেল কয়েকটা বাড়ি আর জেলেদের হোটেল। আমাদের ছোটো প্লেনটা দেখে কয়েকটা ফুর্তিবাজ ছেলে হাত নাড়ল। আরে ৩টা কী? একটা সুগঠিত কেবিন ক্রজারের ছাদে একটা মেয়ে সম্পূর্ণ সূর্যস্নান করছে। তার গায়ে কোনো সূতো নেই। প্লেনটা দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি তোয়ালে তার গায়ের ওপর টেনে নিল।

লিটার তার ঠোঁট চেটে বলল — ওঃ মাইরি কী দেখলুম! খাঁটি স্বর্ণকেশী মাইরি।

দক্ষিণের ক্যাট বে দ্বীপমালার ওপর দিয়ে প্লেনটা চলে গেল। এখানে কয়েকটা মাছধরার জেলে নৌকো ছাড়া আর কিছুই নেই। লিটার বললে — দ্যাখ, এখানে জল এত স্বচ্ছ যে, যদি প্লেনটা লুকোনোও থাকত তবে ছেলেরা নিশ্চয়ই খুঁজে পেত। তিরিশ মাইল দক্ষিণে আরও কয়েকটা দ্বীপ দেখা গেল। সব দেখে লিটার বললে — এখানে আর কিছু দেখবার নেই। আর মাত্র দুঘন্টা ওড়ার মতো তেল আছে আমার কাছে। দেখা গেল তিনটে হাঙর একটা জায়গায় হরদম চক্কর মারছে।

বন্দের মনে সন্দেহ জাগল ওই তিনটে হাঙরের এক জায়গায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে চক্কর মারা। কিছু নিশ্চয়ই আছে ওখানে ওই প্রবালে আর বালির নীচে। নিশ্চয়ই কিছু মরেছে। বন্দ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল — ফেলিক্স আর একবার ওই অগভীর জলের দিকে চল তো। ওখানে মনে হয় কিছু আছে।

বন্ডের কথামতো ফেলিক্স প্লেন ঘোরাল। স্পিড কমিয়ে পঞ্চাশ ফুট নীচে নামাল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে হাঙর দুটো। দুটো ভাসছে আর একটা দাঁতে করে কী একটা টানছে যেন। বন্ড চিৎকার করে বলে উঠলে, 'আবার ঘোরা। প্লেনটা সেখানে আসতে বন্ড চোখের দূরবিন দিয়ে সমুদ্রের নীচে আর একটা সরলরেখা দেখতে পেল আগের দেখা রেখাটার সমকোণে। নিজের সিটে বসে দরজাটা বন্ধ করে বললে — লিটার ওই হাঙরগুলোর ওপরই প্লেনটা নামা।

বন্ডের কথায় লিটার আশ্চর্য হয়ে বললে — হায় ভগবান! এ কার পাল্লায় পড়লুম। ঠিক আছে দেখি পারি কিনা। প্লেনটা পেছিয়ে নিয়ে গতি কমিয়ে প্লেনের মুখ নীচের দিকে নামাল। একটা ঝাঁকুনি, স্কিড দুটোর তলায় জল পাওয়া গেল। লিটার ইঞ্জিন বন্ধ করতেই প্লেনটা থেমে গেল। বন্ডের চাওয়া জায়গা থেকে গজ দশেক দুরে।

বন্ড নিশ্চিত হয়ে নিজের জায়গায় হেলান দিয়ে বসে লিটারকে বললে — 'চেয়ে দ্যাখ, এই যে আমরা প্লেন নামালাম। হাঙরগুলো কিন্তু কোনো ভূক্ষেপ করছে না। তারা যেমন ঘোরার তেমনই ঘুরছে। ওই দেখ, একটা হাঙর একটা কী যেন দাঁত দিয়ে টানছে। ওটা আসলে একটা ছোপ দেওয়া তেরপল। ওগুলো প্রবালের পাথর নয়। ভাঁওতা দেওয়া হয়েছে। ওই হাঙরটা তেরপলের একটা কোণ ধরে টেনে তার মাথাটা ভেতরে ঢোকাবার চেষ্টা করছে।'

লিটার যতক্ষণ বন্ডের পাশ দিয়ে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করছে, বন্ড তত তাড়াতাড়ি চিন্তা করছে। পুলিশের ওয়েৎলেনথে কমিশনারকে সব রিপোর্ট করতে হবে। লন্ডনে এখন জানানো যাবে না। ডিস্কোর অপারেটর যদি এখন কাজে থাকে তবে, নিশ্চয়ই ওই ওয়েৎলেনথের ওপর কড়া নজর রাখবে। তার চেয়ে একবার নীচে নেমে পড়া যাক। বোমাগুলো এখানেই লুকিয়ে রেখেছে কি না। আর হাঙর! ওর একটাকে মেরে ফেললে অন্যদুটো ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

লিটার উত্তেজনায় বন্ডের পিঠে একটা সজোরে চাপড় মেরে বললে — ওরে আমরা পেয়ে গেছি। শালার হারিয়ে-যাওয়া প্লেনটাকে পেয়ে গেছি। কেয়া বাত, কেয়া বাত।

বন্ড তার ওয়ালমার PPK পিস্তল বন্ধ করে দেখল তার মধ্যে গুলি আছে কিনা, আর অপেক্ষা করতে লাগল ঐ হাঙরটা আবার ফিরে আসে কিনা! এল বড়োটাই — লম্বায় প্রায় বারো ফুট হাতুড়ি মুখে হাঙর। জল কেটে তার ভয়ানক মাথাটা এধার ওধার ঘোরাচ্ছে। খুঁজছে মাংস বের হয় কি না। তার পিঠের কালো পালের মতো পাখনার নীচে বন্ড তার লক্ষ স্থির করল। পাখনার ঠিক নীচে হাঙরের মেরুদণ্ড। একমাত্র নিকেল প্লেটেড বুলেটই সেটা ভেদ করতে পারে। বন্ড ট্রিগারে চাপ দিল। পাখনার নীচে বুলেটটা জল ভেদ করতে একটা ফট করে আওয়াজ হল। ভারী পিস্তলের আওয়াজ সমুদ্রের অনেক দূর পর্যন্ত গেল। হাঙরের ভূক্ষেপ নেই।

বন্ড আবার গুলি চালাল। এবার হাঙরটা শূন্য লাফিয়ে জলের নীচে ঝাঁপ দিল। মেরুদণ্ড ভেঙেছে। ছটফট করতে করতে উঠে এল। এবার তার বাদামি শরীরটা জলের ওপর চক্কর মারতে লাগল। তার ব্যাস ক্রমশ বাড়তে বাড়তে স্থির হয়ে এল। তার বীভৎস মুখটা ওপর দিকে তুলতে দেখা গেল সে হাঁপাচ্ছে। একবার পিঠের ওপর চক্কর মারল। তারপর অর্ধমৃতদেহটা আপনা হতেই ভেসে চলল।

সম্ভব হাঙরটা সবকিছু লক্ষ করে সাবধানে এগিয়ে এল। যখন দেখল মুমূর্ষু হাঙরটির কোনো সাড়াশব্দ নেই। তখন সে সজোরে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শরীরের পাশে দাঁত বসাল। কিন্তু খুব শক্ত মাংস। তাই ছেড়ে দিল। চারধারে রক্তের বন্যা বয়ে গেল। এবার তৃতীয় হাঙরটা নীচে থেকে উঠে এসে দুজনে মিলে পাগলের মতো হাঙরটার গা থেকে মাংস খাবলাতে লাগল। নমূর্ষু হাঙরটা যেন মরতে চাইছে না।

এই ভয়াবহ ভোজনপর্ব শ্রোতের টানে দূরে সরে গেল। কেবল সমুদ্রের বুকে জলের আলোড়ন ছাড়া কিছুই দেখা গেল না।

লিটারের হাতে বন্ড তার পিস্তল দিয়ে বলল - - আমি নীচে নামছি। আপাতত আধ ঘন্টা আটকে থাকার মতো মাংস হাঙরটা পাবে। যদি ফিরে আসে এটাকে খতম করে দিবি। আব যদি আমার ডাকার প্রয়োজন বোধ করিস তবে নীচের দিকে পরপর গুলি করবি। শক ওয়েভটা আমি ঠিকই শুনতে পাব।

প্লেনের ওইটুকু জায়গার মধ্যে লিটারের সাহায্যে বন্ড তার জামাকাপড় ছেড়ে অ্যাকোয়ালাংটা পরল বেশ কসরত করে। আবার ফিরে এসে এটা ছেড়ে জামাকাপড় পরতে আরও অসুবিধা হবে — তাই সে ঠিক করল আসবার সময় অ্যাকোয়ালাংটা সমুদ্রে বিসর্জন দিয়েই আসবে।

লিটার দুঃখ করে বললে ওঃ আমি যদি তোর সঙ্গে নীচে নামতে পারতাম। আমার কাটা হাতের বদলে এই হুক দিয়ে অনেক কিছু করা যায় কিন্তু সাঁতার কাটা যায় না। ভাবছি একটা রবারের পাখনা লাগাব।

বন্ড বললে — তবুও হত না, কারণ দেখ, আমরা জলের শ্রোতে প্রায় শ' খানেক গজ দূরে সরে গেছি। আমাদের প্লেনটাকে শ্রোতের বিরুদ্ধে ঠিক তেরপলের ওপর স্থির রাখতে হবে। পাঁচ দিন গত হয়েছে। ডিভিকেরের ভেতর নিশ্চয়ই কোনো নতুন অতিথির দর্শন পেতে হতে পারে।

স্টার্টারের বোতাম টিপে লিটার প্লেনটাকে আগের জায়গায় নিয়ে এল। তারপর বললে — ডিভিকেরের ডিজাইন তোর মনে আছে তো? আর কোনো জায়গায় বোমা ও ডিটোনেটর খুঁজতে হবে?

হাঁরে বাবা, লভনে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে - বলে ককপিটে এসে জলে ঝাঁপ দিল বন্ড।

মাথা নীচু করে বন্ড জলের তলার দিকে সাঁতার কাটতে লাগল। সে দেখলো সেখানে সমস্ত জায়গা জুড়ে রয়েছে অসংখ্য সব মাছ, ছোটো ব্যারাকুডা। অনেক রকমের জ্যাকফিশ, সব মাংসান্ধী প্রাণী, বন্ডের বিরল চেহারা দেখে তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাস্তা ছেড়ে দিল। নীচে নেমে বন্ড হাঙরটা তেরপলের যে অংশটা টেনে ছিঁড়েছে সেটাকে টান মারল। তারপর তেরপলের সঙ্গে যে হুক বালির সঙ্গে পোঁতা ছিল সেগুলো কর্ক-স্কু দিয়ে খুলে ফেলে ওয়াটারপ্রুফ টর্চ আর ছুরি নিয়ে তেরপলের ভেতর ঢুকে পড়ল।

বন্ডের অনুমান সত্যিই হল। ভেতরে পাচা দুর্গন্ধে তার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসতে চাইছে। ঠোট দিয়ে মাউথপিসটাকে আরও জোরে চেপ ধরে এগিয়ে চলল সেই দিকে যেখানে প্লেনের পিঠটা গম্বুজের মতো উঁচু। উঠে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বলে এক বীভৎস জিনিস দেখল। অবশ্য এটার জন্যও সে প্রস্তুতই ছিল। রয়েছে একটা কঙ্কালের অবশিষ্টাংশ। তার পাশে রয়েছে অজস্র কাঁকড়া, চিংড়ি, সামুদ্রিক শোয়া পোকা আর তারা মাছ। তারাই এর সদ্ব্যবহার করছিল।

বন্ড হাঁটু গেড়ে বসে সেই কংকালের দেহ থেকে তার পরিচয়-চাকতিটা আর সোনার হাতঘড়িটা খুলে নিল। টর্চ জ্বলে পড়ল --- 'জোসেফ পেটাসী'। নং ১৫৯৩২।' এই প্রমাণ দুটো সে তার হাতে পরে নিয়ে প্লেনটার দিকে এগিয়ে চলল। জলের ধাক্কায় প্লেনের যে জায়গাটা ভেঙে গেছে সেখানে গিয়ে খোলা সেফটি হ্যাচ বেয়ে প্লেনের ভেতরে ঢুকল।

বন্ড ভেতরে ঢুকে টর্চের আলো ফেলে দেখলে পদ্মরাগমণির মতো অজস্র লাল চোখ চারদিকে জ্বলে উঠল। প্লেনের সর্বত্র আলো ঘুরিয়ে দেখতে পেল প্রায় শ'খানেক ছোটো অক্টোপাস চলে বেড়াচ্ছে। তারা সবাই ভয়ে এদিক ওদিক ছিটকে ছিটকে সরে দাঁড়াচ্ছে। সমস্ত প্লেনের মধ্যেই এই বীভৎসতা, ওপরের দিকে দেখা গেল প্লেনের এক কম্বী বুলস্তু দেহ। তার দেহ ধরে আবার ঝলে

রয়েছে বহু অষ্টোপাস। এই আলো দেখে তারা তাদের শূঁড়ের ওপর ভর দিয়ে চারদিকে ছিটকে ছিটকে সরে যাচ্ছে অন্ধকারের দিকে। যেন এক একটা বুলেট।

বন্দ তার অনুসন্ধান চালাচ্ছে। সেই ডোরাকাটা সায়ানাইডের টিউবটা। সেটা নিয়ে তার বেশেট শূঁজে রাখল। মৃতদেহগুলো গুনল। বোমা রাখার জায়গাটা খোলা দেখে বুঝল এখানে বোমা নেই। পাইলটের সিটের তলায় এবং অন্য সম্ভাব্য জায়গায় খুঁজে দেখল সেই অতি প্রয়োজনীয় ফিউজ কটা পাওয়া গেল না।

বন্দকে অনেকবার ছোঁরা চালাতে হয়েছে ঐ অষ্টোপাসগুলোর শূঁড় কাটার জন্যে। সে বুঝতে পারছে তার নার্ভ ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছে। তার অনেক কিছুই নেবার ছিল। কর্মীদের পরিচয় চাকতি, একটা বইয়ের শেষাংশ। ইনসট্রুমেন্টাল রিডিং এরকম অনেক কিছুই। সে আর এক মুহূর্ত ও এই কিলবিলে রক্ত চক্ষু অষ্টোপাসের মধ্যে থাকতে পারছে না।

বন্দ সেফটি শ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে পাগলের মতো সাঁতার কাটতে কাটতে তেরপলের যে ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছিল সেই দিকে চলল। তাড়াতাড়ি বের হতে গিয়ে তার পিঠের সিলিভারটা তেরপলের ভাঁজে আটকে গেল। তাই তাকে আবার পিছু হঠে নিজেকে মুক্ত করল। তারপর সে বেরিয়ে এল স্বচ্ছ জলে ভরা সমুদ্রে। আর মাত্র কুড়ি ফুটের মতো বাকি। তার কানে একটা ব্যথা অনুভব করল সে। মনে পড়ল একটু থেকে ডিকম্প্রেস করা দরকার। মাথার ওপর সী-প্লেনটার দিকে তাকিয়ে অর্ধৈর্ষ্যভাবে বন্দ অপেক্ষা করতে লাগল যতক্ষণ না যন্ত্রণাটা কমে যাবে। তারপর সে ওপরে উঠে এল। প্লেনের একটা পা চেপে ধরে তার পোশাকটা খুলে ফেলল। সেগুলো কাঁপতে কাঁপতে নীচে তলিয়ে গেল। সমুদ্রের মিষ্টি জলে কুলকুচি করে লিটারের হাতের নাগালেব মধ্যে বন্দ সাঁতার কেটে এগিয়ে এল।

॥ আঠারো ॥

ফেব্রার মুখে নাসাউ-এর কাছে এসে বৃন্দ লিটারকে বললে যে প্যালমীরার পাশে ডিস্কোকে একবার দেখা যাক। জাহাজটা ঠিক জায়গাতেই রয়েছে। তফাত শুধু নোঙরটা নীচে নামানো। বন্দ ভাবছিল — ওই ইয়ামিকে কেমন নিরীহ দেখাচ্ছে। সমুদ্রের জলের আয়নায় তার গায়ের সুদৃশ্য দাগগুলো দেখা যাচ্ছে। এমন সময় লিটার উত্তেজিত গলায় বলল — জেমস, নীচের তীরটা একবার দ্যাখ। ঐ খাঁড়ির পাশে নৌকো রাখার একটা চালাঘর। আর দ্যাখ, জল থেকে একজোড়া ঘসড়ানো দাগ ঘর পর্যন্ত চলে গেছে। অদ্ভুত লাগছে বেশ গভীর দাগ — কীসের?

বন্দ তার দূরবিন ফোকাস করে দেখল দাগদুটো সমান্তরাল। মনে হয় কোনো একটা ভারী জিনিস টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। না, না, এ হতে পারে না। সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'চল শিগগির পালাই ফেলিস্ক।' প্লেনটা তির বেগে এগিয়ে চলেছে, সে বললে — 'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কীসের দাগ। যদি তাই হয় তবে যা ভাবছি, তাহলে ওরা অনেক আগেই তা মুছে দিও।

লিটার বললে — সবাই ভুল করে। আমাদের আগেই উচিত ছিল ঐ জায়গাটা দেখে আসা। একটা সন্দেহজনক আড্ডা। আমি ভাবছি মি. লাগের আমন্ত্রণে আমার শ্রদ্ধেয় মক্কেল রকফেলার মি. বন্ডের হয়ে জায়গাটা দেখে আসব।'

গত আধঘন্টা ঘরে উইন্ডসর বিমান ক্ষেত্রে তাদের খুব খোঁজাখুঁজি হচ্ছিল। তাদের ফিরতে একটা বেজে গেছে। অতএব প্লেন থেকে নেমে এয়ারপোর্টের কমান্ড্যান্ট-এর রক্তচক্ষুর সামনে পড়তেই হল। তবে ভাগ্য ভালো তাই রাজ্যপালের ADC এসে তাদের উদ্ধার করল আর একটা মোটা খাম দিল — যার মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য সংকেতবার্তা।

তাদের যা আশা তাই তারা দেখতে পেল। বার্তার যোগাযোগ কেটে যাওয়ার জন্য তাদের জন্য গালাগালি। নতুন খবর পাঠাতে বলা হয়েছে (লিটারের মস্তব্য — ‘পাবে খুব শিগর্গিরই পাবে’) , ম্যান্টা বিকেল পাঁচটায় পৌঁছবে। ইন্টারপোল আর ইটালিয়ান পুলিশ মারফৎ জানা গেছে যে জোসেফ পেটাশী সতিই ডোমিনেটা ভিতালীর ভাই। আর ভিতালীর বাকি আত্মকাহিনি সব সত্য।

আরও জানা গেছে যে, এমিলিও লাগো একজন পুরোদস্তুর অ্যাডভেঞ্চার। তার নামে কোনো কলঙ্ক খাতায় কলমে পুলিশের কাছে নেই। তার টাকার উৎস অজানা। তবে ইটালির সম্পত্তি থেকে নয়। ডিস্কোর প্রস্তুতকারী বলেছে যে তাদের দাম দেওয়া হয়েছে সুইস ফ্রাঁ-তে। তারা জানিয়েছে ডিস্কোর খোলার একটা ঘরের মতন আছে যার মধ্যে একটা ইলেকট্রিক ফ্রেন, ছোটো জলযান নামাবার ব্যবস্থা আর ডুবুরিদের বেরবার পথ আছে। লাগো বলেছে জলের তলার গবেষণা করার জন্য এগুলো অপরিহার্য।

অংশীদারদের বিষয়ে আর কিছু খবরাখবর নেই। তবে আর একটা মিল পাওয়া গেছে যে এফের প্রত্যেকেরই নিজস্ব এবং পেশাগত ইতিহাস মাত্র ছ’বছরের বেশি নয়। এতএব এদের সকলের পারিচয়ও বেশি দিনের নয়। আরও মিল পাওয়া যাচ্ছে ‘প্রত সংঘে’ (অবশ্য যদি এ নামে কিছু থাকে) এদের সদস্য হওয়ার সম্ভাবনা। কোৎসে প্রায় চার সপ্তাহ আগে সুইজারল্যান্ড থেকে কোনো এক অজ্ঞাত জয়গায় অজ্ঞাত কারণে রওনা দিয়েছেন। তাঁর শেষ ফটো তোলা হয় একটা প্যান আমেরিকান বিমানে মধ্যাহ্নভোজের সময়ে। এখন পৃথিবীর সর্বত্র খোঁজ চলছে। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে গুপ্ত বাহ্যামাকে। ‘খান্ডারবল’ মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে আর প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত লাগোকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। হাতে খুব অল্প সময়ের জন্য ব্রিগেডিয়ার ফেরার চাইল্ড CB, DSO (ওয়াশিংটনে ব্রিটিশ মিলিটারি অ্যাটাশে)। রিয়ার অ্যাডমিরাল কার্লসনকে (যিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতির কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন) সঙ্গে নিয়ে ইস্টার্ন স্ট্যাভার্ড টাইম সঙ্কে) সাতটার সময় রাষ্ট্রপতির ‘বোয়িং ৭০৭ কলাম্বিয়াইন’ বিমানে নাসাউ পৌঁছচ্ছেন। মি. বন্ড আর মি. লিটার যেন তাঁদের সাহায্য করেন পরবর্তী কাজ করার জন্য। আর ওই অফিসারদের ওখানে না পৌঁছনো পর্যন্ত তারা ঘন্টায় ঘন্টায় রিপোর্ট পাঠাবে এবং তার একটা করে কপি লন্ডনে পাঠাবে। অবশ্যই তাতে দুজনের সই থাকবে।

সমস্ত বার্তাটা পড়া শেষ হলে দুজনে দুজনকে একবার দেখে নিল। লিটার বললে — শোন, বার্তার শেষ অংশ অর্থাৎ খবর পাঠানোতে গুলি মার। এর মধ্যে চার ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। দিনের বাকি সময় বেতারঘরে বসে থাকার কোনো যুক্তি নেই। আমি বলি কী — খুব সংক্ষেপে সর্বশেষ সংবাদ পাঠিয়ে ওদের নির্দেশ দেব বর্তমান জরুরি অবস্থার জন্য আমরা কোনো যোগাযোগ করব না। আর তোর হয়ে আমি প্যালামী ঘুরে দেখে আসতে চাই ওই দাগগুলো আসলে কীসের? তারপর বিকেল পাঁচটায় ম্যান্টায় উঠে তৈরি থাকব। ডিস্কো কোথায় রওনা হলেই আমরা পিছু নেব। আব ঐ বিশেষ বড়ো কর্তারা যদি এর মধ্যে এসে পড়েন তবে রাজ্যপালের কাছে বসে ‘বায় বন্দি’ খেলা খেলুন। আজকের রাতটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে বাজে নষ্ট করার কোনো মানে নেই। ও. কে. ?’

বন্ড ভেবে চলেছে। তারা নাসাউ-এর সমুদ্রতীরে লক্ষপতিদের বিরাট অট্টালিকার পাশে বস্তু কুঁড়েঘরগুলোর মধ্যে এসে পড়েছে। বন্ড অতীতে অনেক নির্দেশ অমান্য করেছে, এখন এটাকে করলে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে অবমাননা করা হয়। কিন্তু তাদের কাজ এত দ্রুতগতিতে চলেছে যে, এখন আর থেমে থাকা চলবে না। বন্ড জানে যে M তাকে সর্বদাই সমর্থন করে যাবে যখন বন্ডকে তার এলাকা ঠিক করে দিয়েছেন সে বন্ড ঠিকই করুক বা ভুলই করুক, দরকার হলে সব দায়িত্ব M-নিজের কাঁধে নেবেন।

লিটারের কথায় বন্ড রাজি হল। বললে — ‘ফেলিক্স, আমি রাজি। মাস্টার সাহায্যে আমাদের দেখতে হবে ডিস্কোতে বোমাদুটো কখন তোলে। আমার মাথায় একটা ফন্দি এসেছে। ভিতালী মেয়েটার পক্ষে কাজটা সম্ভবপর নয়। তবে তাকে আমি রাজি করাবই। আমায় এখন হোটেলে নামিয়ে দে। বিকেল সাড়ে চারটের সময় এখানে আমায় পাবি। আর পেটাশীর পরিচয় চাকতিটাকে আমার কাছেই আপাতত আনুক।

হোটেলে নেমে রিসেপশনে তার ঘরের চাবি নেওয়ার সঙ্গে পেল একটা টেলিফোন-বার্তা ডোমিনো বলেছে এখনই তাকে ফোন করতে।

বন্ড ঘরে এসে প্রথমে একটা ক্লাব স্যান্ডউইচ আর একটা ডাবল বুরবোঁ অন দ্য রকস্-এর অর্ডার দিয়ে পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে জানল — ভোরবেলায় ডিস্কো তার সবকটি ট্যাংকে তেল ভরে নিয়েছে তেল ভরবার জেটিতে এসে। তারপর প্যালামীতে নোঙর করে আছে। আর আধঘন্টা আগে লাগে একজন সঙ্গী নিয়ে সি প্লেনটা করে পূর্বদিকে গেছে। ওয়াকিটকিতে এখন পর পেয়ে কমিশনার উইন্ডসর ফিল্ডের কন্ট্রোলে প্লেনটার ওপর খবর রাখতে বলেন। কিন্তু প্লেনটা মাত্র তিনশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উড়ে পঞ্চাশ মাইল যাওয়ার পর দ্বীপের জটলার মধ্যে হারিয়ে যায়। যার কোনো খবর নেই। কেবল বন্দর কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে যে, পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন সাবমেরিন ‘মাস্টা’ বিকেল পাঁচটায় এসে পৌঁছবে। বন্ড কি কিছু জেনেছে?

বন্ড খুব সংযত ভাবে বলল — এত আগে বলা সম্ভব নয়। অবস্থা খুব গরমে উঠেছে। পর্যবেক্ষকদের কি বলা হবে যে সি- প্লেনটা ডিস্কোর দিকে এলেই তাদের যেন খবর দেওয়া হয়। ফেলিক্স লিটার এতক্ষণে তার বেতার ঘরে চলে গেছে। কমিশনার দয়া করে তাকে যেন খবরটা দিয়ে দেয়। আর সে একটা গাড়ি পেতে পারে কি? নিজে চালাবে। একটা চারচাকার ল্যান্ড রেনাভার পেলেই হবে।

একটু সময় নিয়ে বন্ড প্যালামীর ডোমিনোকে ফোন করতেই তার গলা পেল। বোঝা গেল তার জনেই মেয়েটা অপেক্ষা করছিল। সে এই প্রথম বন্ডের নাম ধরে তাকে ডাকল — ‘জেমস্, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমার ইচ্ছে আজ দুপুরে তোমার সঙ্গে সাঁতার কাটব। আজ সন্দের সময় আমায় সমস্ত মালপত্র প্যাক করে জাহাজে উঠে পড়তে বলা হয়েছে। ও এত ভালো যে আমায় ওর সঙ্গে নিচ্ছে। আজ রাতেই গুপ্তধনের জন্য বের হবে ওরা। কবে কখন ফেরা হবে জানি না।’ তারপর খুব আস্তে বলল — ‘এটা খুব গোপনীয় কথা। কাউকে বলো না যেন। আমার যে কী ভালো লাগছে। আর মিয়ামী সম্বন্ধে কী যেন বলছিল। আমি ভাবলাম, আমরা আসতে আসতে তুমি নিউইয়র্ক চলে যাবে। তোমার সঙ্গে ভালোভাবে আলাপ হওয়ার আগেই কাল তুমি কী রকম হঠাৎ চলে গেলে। কী হয়েছিল তোমার?’

বন্ড নিজেকে সংযত করে বলল — ভীষণ মাথা ধরেছিল। বোধহয় রোদের ঝাঁঝ লেগে থাকবে। তোমার সঙ্গে বেশ সুন্দর কাটছিল। আমার চলে আসার একদম ইচ্ছে ছিল না। যাক — তোমার সঙ্গে সাঁতার কাটা সে ভাগ্যের কথা। কোথায়?

প্যালামীরা থেকে সমুদ্রের তীর বেয়ে আর মাইলখানেক হবে। মেয়েটি তাকে খুব নিখুঁত ভাবে জায়গাটা কোথায় জানিয়ে দিল। সেখানে একটা সরু রাস্তা আর খড়ের ঘর আছে। না চেনার কোনো কারণ নেই। এই জায়গাটা এক সুইডিশ লক্ষপতির ভাড়া নেওয়া। তিনি এখন নেই। আর জায়গাটা প্যালামী থেকে অনেক ভালো নির্জন লোকজনের ভিড় নেই। এখানে সমুদ্রের তলায় সাঁতার কাটতে খুব আরাম। তুমি যদি আধ ঘন্টার মধ্যে আসতে পারো তো খুব ভালো হয় — তাহলে দুজনের হাতে সময়ও থাকবে বেশি।’

ইতিমধ্যে বন্ডের খাবার আর মদ এল। সে দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে খেয়ে ফেলল। মেয়েটি সম্বন্ধে ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছিল সে। একটা তোয়ালেতে তার সঁতার কাটার শট প্যান্ট নিয়ে নিল। তারপর মনে হল আজ বিকেলে মেয়েটা কী ভীষণ একটা বিপদের মধ্যে যাচ্ছে, অথচ বিকেলটা কত মধুর হতে পারত। তাব মনে পড়ল যখন মেয়েটাকে সে প্রথম দেখেছিল। বে স্ট্রিটে মাথার খড়ের টুপিটা সামনের দিকে ঝুলিয়ে জোরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। তার টুপির রু রিবনটা হাওয়ায় উড়ছিল। যাক -

তার পরনের স্ল্যাকস-এর ওপর ঘন নীল সি আইল্যান্ড কটন সার্ট পরে নিল। লিটারের গাইগার কাউন্টারটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। নিজেকে আয়নায় একবার দেখল। যেকোন টুরিস্ট ক্যামেরাম্যানের মতোই দেখাচ্ছে তাকে। পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল পেটামাশীর চাকতিটা ঠিক আছে কিনা। তারপর আর দেরি না করে লিফটে করে নীচে নেমে এল।

বাইরে বেরিয়ে দেখল ল্যান্ডরোভার দাঁড়িয়ে। তার ডানলোপিলোর সিটগুলো বেশ নরম। কিছু রোদের এত তেজ, এখন কোন রকমে জলে নেমে পড়তে পারলে হয়। সে ক্যাসুয়ারিনার ফাঁক দিয়ে বালির রাস্তাটা খুঁজে পেয়ে সমুদ্রতটের কাছে গাড়ি পার্ক করল। চালাঘরটা রবিনসন ক্রুসোর ধাঁচের তালপাতার ঘন বাঁশ আর স্কু দিয়ে আঁটা। সে ধরে ঢুকে দেখল দুটো ঘর। সামনে লেখা : পুরুষ ও মহিলা — জামাকাপড় ছাড়ার ঘর। মেয়েদের ঘরে স্তৃপাকৃতি জামাকাপড় জড়ো করে পড়ে রয়েছে আর রয়েছে একজোড়া হরিণের চামড়ার চটি। বন্ড জামাকাপড় ছেড়ে বাইরে রোদ্দুরে চলে এল।

ছোট সমুদ্রতটটা অর্ধচন্দ্রের মতো দেখাচ্ছে। সেখানে মেয়েটার কোনো চিহ্ন নেই। বন্ড আর অপেক্ষা না করে জলে ঝাঁপ দিয়ে জলের তলায় ডুব দিল। ঠান্ডা জলে তার শরীর শীতল হল। ভেবেছিল মেয়েটাকে কিছুদূরে দেখতে পাবে। তাই বন্ড বেশ খানিকটা গিয়ে তাকে না দেখতে পেয়ে তীরে ফিরে এসে জায়গা বেছে তার ওপর উপুড় হয়ে গুয়ে পড়ল তার দুহাতের ওপর মাথা রেখে।

কিছুক্ষণ পরে বন্ড চোখ খুললে দেখল সমুদ্রের ওপর ছোটো বুদ্ধবুদ্ধ এগিয়ে আসছে। সেটা কাছে আসতে বন্ড দেখল সঁতারুর অ্যাকোয়ালাং ট্যাংকের একটা হলুদ সিলিভার। কাঁচের মুখোশ, তার পেছনে একরাশ কালো চুল জাপানি পাখার মতো ছড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটা কম জলে এসে তার মুখোশটা তুলে কর্কশকণ্ঠে বলল — ওখানে গুয়ে থাকলে হবে? আমায় বাঁচাও।

বন্ড উঠে মেয়েটির কাছে এসে বললে — একলা একলা অ্যাকোয়ালাং চড়িয়ে সঁতার কাটা মোটেই তোমার উচিত হয়নি। নিশ্চয়ই একটা হাঙর তোমার সঙ্গে প্রেম করতে এসেছিল।

আর ইয়ার্কি নয়। আমার পায়ে শী-এগের একটা কাঁটা ফুটে আছে। শীঘ্র সেটাকে বার করো। আর এই অ্যাকোয়ালাংটা আগে খোল। এটা নিয়ে দাঁড়াতে পারছি না।' মেয়েটি কোমরের বাকল খুলে সরিয়ে দিয়ে বলল — এবার এটা খুলে নাও।

বন্ড সেটাকে নিয়ে গাছের ছায়ায় রেখে এল 'মেয়েটি হলুদ জলে বসে পায়ের তলায় দেখছে সেখানে মাত্র দুটো কাঁটা ফুটে রয়েছে। বের করা শক্ত হবে।

বন্ড তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পাটা পরীক্ষা করে বলল — গাছের তলায় ছায়ায় গিয়ে বসতে হবে। হেঁটে গেলে আরও ঢুকে যাবে। আমি না হয় তোমায় নিয়ে যাই।

মেয়েটা আনন্দের সঙ্গে বলল - আমার হিরো এসেছে। দেখা যেন ফেলে দিও না।' বন্ড তার একটা হাত হাঁটুর তলায় আর অন্যটা বগলের তলায় দিয়ে অনায়াসে তাকে তুলে নিল। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। তার উজ্জ্বল চোখ দুটো তাকে কী যেন বলতে চাইছে। বন্ড তার মুখটা নামিয়ে এনে মেয়েটার আধখোলা ঠোঁটের ওপর বেশ আরাম করে জোরে একটা চুমু খেল।

মেয়েটির নরম ঠোঁট দুটো চেপে ধরল, তারপর ছাড়িয়ে নিয়ে বললে — পুরস্কারটা আগে না নিলে চলছিল না ?

জমা রইল— বলে বন্দ মেয়েটির ডান বুকের ওপর তার হাতটা চেপে রেখে মেয়েটাকে গাছের ছায়ায় নিয়ে গিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিল। মেয়েটি তার হাত দুটো মাথায় রাখল তার এলো চুলগুলোকে বালি থেকে বাঁচাবার জন্য। মেয়েটি চিৎ হয়ে অপেক্ষা করছে—তার চোখ দুটো তার ঘন পাতার আড়ালে লুকোনা।

বিকিনির উদ্ধত অর্ধচন্দ্রাকৃতি অধোবাস যেন বন্দকে কিছু বলতে চাইছে। আঁটোসাঁটো কাঁচুলীর ভেতর উদ্ধত স্তনদুটোও যেন তার আর দুটো চোখ। বন্দ বৃষ্ণতে পারছে তার সংযমের বাঁধ ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। সে তাই বলল— উপুড় হয়ে শোও।

বন্ডের কথামতো উপুড় হয়ে গুল। বন্দ তার ডান পাটা ভাঁজ করে কোলের ওপর তুলে নিল। যেন একটা ছোট্ট বন্দি পাখি। কয়েক কুচি বালি মুছে দিল। তার পায়ের তলাটা যেন ফুলের পাপড়ি। বন্দ সেখানে তার মুখ দিয়ে জোরে চুষতে লাগল। একটা কাঁটা তার মুখে চলে আসতে সেটা ফেলে দিয়ে বললে— তোমায় একটু কষ্ট না দিলে সারাদিন এভাবে নষ্ট করতে পারব না। কি ঠিক তো ?

বন্দ দেখল মেয়েটার পিঠের পেশিগুলো যন্ত্রণার জন্যে শক্ত হয়ে উঠেছে—সে কোনো রকমে বলল — ঠিক আছে।

বন্দ কাঁটার চারপাশের মাংসে তার দাঁত ফুটিয়ে দিয়ে চাপ দিল জোরে। মেয়েটা পাটা ছাড়াবার জন্য নাড়াচাড়া করতে লাগল। চামড়ার ওপর দুটো দাঁতের দাগ দেখা গেল দুটো রক্ত বিন্দু। সেটা চেটে নিয়ে বন্দ বললে — জীবনে প্রথম একটা মেয়েকে খাচ্ছি। বেশ খেতে।

কিছু না বলে মেয়েটা অর্ধৈর্ষ্য ভাবে নড়েচড়ে গুল।

বন্দ বৃষ্ণতে পারল মেয়েটার বেশ লাগছে। তাই বললে—ডোমিনো হয়ে এসেছে। এই শেষ কামড়। মেয়েটাকে কিছু সান্ত্বনা দেবার জন্য পায়ের তলায় একটা চুমু খেয়ে আবার তার দাঁত আর ঠোঁট দিয়ে তার কাজ করতে লাগল।

দু-এক মিনিটের মধ্যে শেষ কাঁটাটা বেরিয়ে এলে বন্দ সেটাকে থু থু করে ফেলে দিয়ে বললে— এখন আর এর মধ্যে বালি ঢুকিও না। তোমায় বরং আমি চালাধর পর্যন্ত দিয়ে আসি। তুমি তোমার চটি পরে নাও।

মেয়েটা চিৎ হয়ে গুলে বন্দ দেখল যন্ত্রণায় মেয়েটার চোখের পাতা ভেজা। হাত দিয়ে চোখ মুছে বলে—“তুমিই আমার জীবনে প্রথম পুরুষ যে আমায় কাঁদালে।” বলে সে তার দু’হাত সামনে বাড়িয়ে দিল সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভঙ্গিমায়।

বন্দ নীচু হয়ে তাকে তুলে নিল, কিন্তু তার ঠোঁট দুটোকে বিরক্ত করল না। নিয়ে চলল সেই কুঁড়েঘরের সামনে। কোন ঘরে ঢুকবে পুরুষ না মহিলা। বন্দ পুরুষ-ঘরে ঢুকে তার সার্টটা মাটিতে ফেলে তার ওপর মেয়েটাকে আস্তে করে দাঁড় করল। আর মেয়েটি বন্ডের গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না বন্দ মেয়েটির উদ্ধত স্তনদুটোকে মুক্তি দিল। তার কাঁচুলীর শেষ বোতাম সে খুলে দিয়ে আর তার বিকিনির দড়িটা খুলে তলায় নামিয়ে দিল। শেষে তার ছোট্টো প্যান্টটা খুলে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিল।

॥ উনিশ ॥

বন্দ আস্তে আস্তে তার একটা কনুই-এর ভর দিয়ে নিজের শরীরটাকে কাৎ করে সেই ঘুমন্ত অপক্লম মুখের দিয়ে চেয়ে রইল। কপালের দুপাশে আর চোখের নীচে কয়েক ফোঁটা ঘাম জমে

রয়েছে। গলার তলার নাড়িটা খুব দ্রুত ধুকপুক করছে। মুখের দিকে তাকালে যে ব্যক্তিত্ব চোখে পড়ত বন্দের প্রেমের স্পর্শে সেই রেখাগুলো কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। পরিবর্তে মুখটা খুব কোমল, মিষ্টি, সুন্দর আর বিক্ষত দেখাচ্ছে। আস্তে আস্তে সেই ভেজা পাতাগুলো খুলে পিঙ্গল চোখ দুটো বন্দের মুখের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন তাকে এই প্রথম দেখছে।

বন্দ বললে — এটা আমার সত্যিই করা উচিত হয়নি। আমি দুঃখিত।

মেয়েটা এত মজা পেয়েছে যে, তার গালের টোলদুটো আরও গম্ভীর হল। আরও মজা করে বললে— তোমায় দেখে মনে হচ্ছে যে, তুমি একটা বাচ্চা মেয়ে। জীবনে প্রথম এই কাজ করলে— তোমার মনে ভয় ঢুকেছে যে, তোমার বোধহয় বাচ্চা হবে মাকে সব বলতে হবে।

বন্দ আবার ঝুঁকে পড়ে তাকে প্রথমে ঠোঁটের দু-পাশে তারপর খোলা দু-ঠোঁটের ওপর গভীর ভাবে চুমু খেল। তারপর বললে — এবাব ওঠো, সঁতার কাটি। তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে। বন্দ দাঁড়িয়ে উঠে তার হাত দুটো বাডাল — মেয়েটাও অনিচ্ছা মতো তার হাতদুটো বাডালে বন্দ তাকে টেনে তুলল। আর কোনো ভয় নেই ভেবে তার দুরন্ত শরীরটা এবার একটু বদমাইশি করতে শুরু করলে বন্দ তাকে সজোরে বুকে চেপে ধরল তার সেই বদমাইশিটাকে থামাবার জন্যে। বন্দ জানে আর মাত্র কয়েক মিনিটই তাদের আনন্দ করায় সময় আছে। বললে— ডোমিনো এবার এস, আর নয়। আর জামা কাপড় না পরলেও চলবে। আর বালি লাগলে কিছুই হবে না। তখন আমি মজা করেছিলাম।

মেয়েটাও এবার হেসে উঠে বলল — সমুদ্র থেকে ওঠাব সময় আমিও তাই করেছিলাম। কাঁটা দুটো আমায় তেমন কষ্ট দেয়নি। আমি জেলেদেব মতো নিজেই বার করে ফেলতে পারতাম। কী রকম জানো?

বন্দ বললে— খুব জানি। চলো এবার নামা যাক। এই বলে ডোমিনোকে আবার একটা বেশ ভালো করে চুমু খেয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুব দিল।

বন্দ তীরে ফিরে এসে দেখল মেয়েটা ইতিমধ্যে বাইরে এসে জামাকাপড় পরতে শুরু করেছে। মহিলাদের ঘর থেকে তার নরম কিছু কথার উত্তর এধার থেকে বন্দ দিচ্ছিল। মেয়েটা কিছু বুঝতে পেরে বললে— জেমস্ তোমার কী হল? কিছু খারাপ হয়েছে কি?

তাকে ডাকল— ডার্লিং, তুমি বাহরে একবার এস, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। সে প্যান্ট পরার সময় সোনার চেনের আওয়াজ পাচ্ছিল।

বন্দ চালাঘরটার অন্যদিকে বালির একটা গায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটাও তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বন্দের মুখের দিকে চেয়ে কিছু পড়তে চেষ্টা করল, বন্দ সমুদ্রের দিকে মুখ করে মাটিতে বসে পড়ল। মেয়েটাও বসল কিন্তু কিছুটা দূরত্ব রেখে। বলল— আমি জানি তুমি আমায় কষ্ট দেবে। তুমি কি চলে যাবে? ভয় নেই আমি কাঁদব না।”

বন্দ বেশ গম্ভীর হয়ে বলল— আমার সম্বন্ধে কোনো খবর নেই। তার চেয়েও খারাপ খবর তোমার ভাইয়ের।

মেয়েটা নিজেকে শক্ত করে সামলে নিয়ে বলল — বলে যাও।

বন্দ খুব ধীরে তার পকেট থেকে পেঁটাশীর পরিচয় চাকতিটা বের করে ডোমিনোর হাতে দিল।

সে সেই চাকতিটা একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বললে— তাহলে সে মারা গেছে। কী হয়েছিল?

বন্দ বলল — কী আর বলব? সে এক বিরাট গল্প। তোমার বন্ধু লাগোঁ এর সঙ্গে জড়িত। আমি তোমার কিছু কথা বলল অবশ্য সেগুলো শপথ ভঙ্গ করেই বলব। আমার বিশ্বাস তুমি তা

আর কাউকে বলবে না। আমি সরকারের তরফ থেকে কাজ করতে এসেছি এই ষড়যন্ত্র ভেদ করার জন্য। আমি একরকমের পুলিশম্যান। আমি তোমার সাহায্য চাই। তুমি না করলে জানবে কয়েক হাজার নিরীহ লোক প্রাণ হারাবে।

কথাগুলো শুনে ডোমিনো দাঁতে দাঁত চেপে বললে — ও, তাই তুমি এতক্ষণ নিজের কাজ গোছাবার জন্য আমার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা করলে। আর এখন আমার ভাইয়ের চাকতি আমায় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছ। তোমায় আমি ঘেন্না করি। তুমি চলে যাও।

বন্দ খুব শান্ত ভাবে বলল— শোন আমার কৈফিয়ত। তোমার ভাইকে লাগে নিজে বা লোক দিয়ে মেরেছে। সেই কথাই তোমায় বলতে এসে তোমায় দেখলাম, ভালোবেসে ফেললাম। তোমায় তখন কষ্ট দিতে আমার একদম ভালো লাগছিল না। তোমায় বঁড়ো সুন্দর দেখাচ্ছিল।

বন্দ থেমে আবার বলতে শুরু করল — তুমি যে আমায় ঘেন্না করো বলছ। সেটা এখন একটু তুলে রাখো। তুমি এখনই বুঝবে এ ব্যাপারে তোমার এবং আমার ভূমিকা কিছুই নয়। এ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র।

ডোমিনোকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বন্দ আবার বলতে শুরু করল সমস্ত ঘটনাটা আদ্যোপান্ত। কেবল ‘মাস্টার’র খবর বলল না। তাহলে লাগের সুবিধে হবে এবং সে তার প্ল্যান পালটে ফেলবে। কেবল বলল— অতএব তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, যতক্ষণ না বোমা দুটো ডিস্কোয় তোলা হচ্ছে আমরা কিছু করতে পারব না। লাগের ভূয়ো গুপ্তধন খোঁজা চলবেই। তাকে ওই ভাঙা প্লেন এবং প্রেতসংঘের সঙ্গে জড়াবার কোনো প্রমাণই আমাদের হাতে নেই। এখনই যদি তাঁর কাজে বাধা দিই, বা, জাহাজটার ওপর পাহারা বসাই বা জাহাজটাকে আটক করি—তবে তার প্রেত সংঘের কাজ একটু দেরি হবে। লাগে আর লোকজন ছাড়া কেউই জানে না বোমা দুটো কোথায় আছে?

— ওরা হয়তো প্লেনে চেপে বোমা দুটো আনতে গেছে। তাই ডিস্কোর সংঘে নিশ্চয়ই রেডিও মারফত যোগাযোগ রাখছে। ওরা যদি কিছু জানতে পারে তবে প্লেন থেকে বোমা দুটো অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলবে। তারপর সব গুণ্ডাগোল মিটে গেলে ওরা প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দেবে যে, তারা প্ল্যান পালটেছে বা কিছু নাও জানাতে পারে। পরে আর একটা চিঠি দেবে তাতে শর্ত থাকবে হয়তো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে টাকা দিতে হবে। তখন সেটা না মেনে আর কোন উপায় থাকবে না। কিছু বুঝতে পারছো?

বুঝেছি। তবে কী করতে হবে এখন? — মেয়েটার দৃষ্টি কঠিন হয়ে গেল। মুখের চেহারা পালটে গেল। তার দৃষ্টি দূরে কোথাও নিবদ্ধ হয়েছে, তা লাগের ওপর নয়। তার ভাইয়ের হত্যাকারী লাগের ওপর।

এখন আমাদের জানতে হবে বোমা দুটো ডিস্কোতে কখন উঠবে, এটাই এখন সবচেয়ে জরুরি। এর পরেই আমাদের কাজ শুরু হবে। সবচেয়ে সুবিধের ব্যাপার হচ্ছে—যে, লাগে এখন খুব নিশ্চিত আছেন। তিনি জানেন তাঁর প্ল্যান খুবই চমৎকার এবং তিনি সঠিক পথে চলেছেন। এটাই আমাদের জোর।

— বোমাগুলো যে ইয়াটে উঠল, তুমি জানবে কী করে?

— সেটা তুমি জানাবে।

মেয়েটা আরও কঠিন হয়ে উঠল—সে বেশ ঘৃণার সঙ্গে বললে—লাগে লোকটা বোকা নয় কিন্তু মস্ত ভুল করেছে তার ‘রক্ষিতা’কে তার সঙ্গে এনে। প্রেতসংঘের জানা উচিত ছিল যে লাগে তার সঙ্গে সবসময় একটা মেয়েকে রাখবে। তারপর থেমে বললে—আমিই বা কী করে জানব? আর তোমাদের জানাব কী করে?

তোমায় জাহাজে কখন যেতে বলেছে?

পাঁচটার সময়। প্যালমীরায় একটা বোট আমায় নিতে আসবে।

বন্দ ঘড়িতে দেখল চারটে বাজে। বললে - দ্যাখ, আমার কাছে একটা গাইগার কাউন্টার আছে। এটা ব্যবহার করারও খুব সহজ। তুমি যদি জানতে পারো যে জাহাজে বোমা আছে— তবে তুমি জাহাজের পোর্ট হোল থেকে একটা আলোর নিশানা দেখাবে বা তোমার কেবিনের আলো কয়েকবার জ্বলাবে-নিভাবে। তোমার এই সংকেত আমাদের রিপোর্ট করতে বলে দেবো। ওই জাহাজের ওপর আমাদের লোকেরা কড়া নজর রাখবে।

তোমার কথাগুলো নাটকে নভেলে মানায়—কিন্তু কার্যত কোনো কাজ দেয় না। লোকে এত বোকা নয় যে, দিনের বেলায় কেবিনের আলো জ্বলাবে-নিভাবে। তার চেয়ে বরং যদি জাহাজে বোমা আছে জানতে পারি তবে আমি কেবিন থেকে বেরিয়ে ডেকের ওপর আনব আর না থাকলে কেবিনেই থাকব।

— বেশ তাই—তুমি যা ভালো বোঝ তাই করো। তুমি কি কাজটা করবে?

মেয়েটা খুব সিরিয়াসলি বললে— নিশ্চয়ই করব। তবে যদি লাগ্যোকে দেখামাত্র খুন করা স্পৃহা দমন করতে পারি। তবে আমার একটা শর্ত হচ্ছে যে, লাগ্যোকে তোমরা কন্ডায় পেলে খুন করবে। এমন ভাবে বলছে যেন বন্দ একটা ট্রাভলিং এজেন্ট আর সে একটা কনফার্মড টিকিট চাইছে।

— দেখ, সে রকম কিছু ঘটবে কিনা জানি না। তবে জাহাজের সবকিছু লোকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিশ্চয়ই হবে।

কিছু একটা ভেবে মেয়েটা বললে— ঠিক আছে। সেটা খুন করার চেয়ে আরও কষ্টকর।” তারপর কী যেন মনে পড়ে যাওয়ায় সে সমুদ্রের ধারে চলে গিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বললে, শোনা গেল না—তারপর তার হাতের সোনার চেনসম্মত চাকতিটা সমুদ্রের ওপর বহুদূরে ছুঁড়ে দিল যেন সেটা গভীর জলে পড়ে। চাকতিটা একবার রোদে চকচক করে উঠে সমুদ্রে তলিয়ে গেল। মেয়েটা তারপর ফিরে এল। এবার যন্ত্রটার ব্যবহার আমায় দেখিয়ে দাও।

বন্দ যন্ত্রটার ব্যবহার দেখিয়ে দিল। ইন্ডিকেটর ছাড়া যন্ত্রটা ডোমিনোকে দিল। তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়লে একটা ক্লিক করে আওয়াজ হবে। এটা অনেকটা রোলিফ্লেস্তা ক্যামেরার ধাঁচে তৈরি সবরকম আছে কিন্তু নেই কেবল ফিল্ম। লেন্স, লিভার সব আছে। তুমি যদি খোলার কাছাকাছি যেতে পারো তো খুব ভালো হয়। তুমি ইয়াট আর নাসাউ-এর যেন একটা শেষ ছবি তুলছ এই ছুতোয় খোলার কাছাকাছি যাবে। আর তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে গাইগার কাউন্টারটাকে জলে ফেলে দিও।

ঠিক আছে। — মেয়েটা বন্ডের সব কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। তারপর হঠাৎ যেন একটু অনামনস্ক হয়ে বন্ডের হাতটা স্পর্শ করে ছেড়ে দিল। বেশ লজ্জালজ্জা ভাব করে বললে— দ্যাখ। তখন যে তোমায় বলেছিলাম তোমায় যোগা করি, সেটা কিন্তু আমার মনের কথা নয়। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, এর ভেতর এতবড়ো একটা বিরাট ব্যাপার রয়েছে। আর লাগ্যোকে সকলেরই ভালো লাগত। ওই রকম পুরুষকে সব মেয়েই পেতে চায়। তাদের সবাইকে ছাপিয়ে লাগ্যোকে পাওয়া আমার একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। আমি তার সঙ্গী হতে রাজি হলাম। ও আমায় গুপ্তধন রহস্যের কথা বললে আমার কী রকম যেন বেশ উত্তেজনা এল। আমি রাজি হলাম। বদলে ও আমায় যে শর্ত দেখাল তাতে রাজি না হয়ে উপায় ছিল না।

মেয়েটা একবার বন্ডের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল, বলল— আমি সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু ঘটনাটা এরকমই। ইতিমধ্যে আমরা একে অপরের সম্বন্ধে ক্লাস্ত হয়ে পড়েছি। এমনকি আমি

একলাই প্লেনে বাড়ি চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তারপর তোমায় দেখলাম। পেলাম আর আজ দুপুরে যা ঘটল তাতে আমি মনহির করে ফেলেছি যে, লাগেঁকে আমি বলে দেব আমি তার সঙ্গে যাচ্ছি না। তোমার কাছে চলে আসব। তুমি যেখানে যাবে সেখানেই আমি তোমার সঙ্গে থাকব। তুমি কি তাতে রাজি হতে?

— নিশ্চয়ই, বন্দ তার গালে আলতো করে হাত বোলাল।

— তাহলে এখন কী হবে? কখন আবার আমাদের দেখা হবে?

বন্দ ভাবছিল কখন এই প্রশ্নটা তার কাছে আসবে। গাইগার কাউন্টার সুদূর মেয়েটাকে জাহাজে পাঠানো মানে ডবল বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া। সে যদি লাগেঁর হাতে ধরা পড়ে তবে তার মৃত্যু অবধারিত। আবার মান্টা তার পিছু নিলে। যদিও প্রায় অবশ্যম্ভাবী, তবে ডিস্কোকে গুলি বা টর্নেডো দিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে ওদের জানান না দিয়ে। তাই বন্দ এসব ভাবনা বন্ধ করে দিয়েছিল। সব কিছু মনের মধ্যে গোপন করে বললে— সব মিটেমাটে গেলেই। আর জেনে রাখ তুমি যেখানেই থাকো, আমি তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করব করবই। তুমি কিন্তু এখন বিপদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তুমি কি রাজি আছো?

হাতঘড়ি দেখে মেয়েটা বলল— এখন সাড়ে চারটে বাজে। আমায় যেতে হবে। তুমি আমায় একটা চুমু দাও। জেনে রাখো— আমি হয় তোমার কাজ করব নয়তো পেছন থেকে ঐ লোকটাকে ছুরি মারবো। মেয়েটা দু হাত বাড়িয়ে বলল— এসো।

কিছুক্ষণ পরে বন্দ MG-এর ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল। আর সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল যতক্ষণ না সেটা মিলিয়ে যায়।

তারপর বন্দ তার ল্যান্ডরোভারে চেপে সেদিকেই চলল।

আরও মাইলখানেক যাবার পর বন্দ প্যালামীর প্রবেশপথে গাড়ির ধোঁয়া দেখতে পেল। সে মনে করছে এখনই ছুটে গিয়ে মেয়েটাকে নিবৃত্ত করে। পর মুহূর্তে সে নিজেকে শাসন করল— এ সে কী করছে। সে এগিয়ে চলল ওন্ড ফোর্ট পয়েন্টের দিকে। সেখানে দু-জন কনস্টেবল রয়েছে। একজন বসে বই পড়ছে আর একজন একটা পরিত্যক্ত গ্যারেজের জানালার খড়খড়ির ভেতর দিয়ে দূরবিনের লেন্স রেখে ডিস্কোর ওপর তার দৃষ্টি রেখেছে। সে তাদের নতুন নির্দেশ দিয়ে কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে লিটারের দুটো বার্তা তাকে দিলেন— প্রথমটা হচ্ছে লিটারের প্যালামির অভিযান ব্যর্থ। মেয়েটা তার জিনিসপত্র নিয়ে দুপুরে ডিস্কোতে উঠেছে। চালাঘরে একটা বোট আর পেডালো ছাড়া আপত্তিকর কিছুই নেই। আকাশ থেকে যে দাগ দেখা গেছে সেগুলো ওই পেডালেরই হবে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আর কুড়ি মিনিটের মধ্যে মান্টা এসে পৌঁছেছে। বন্দ যেন প্রিন্স জর্জ জেটিতে লিটারের সঙ্গে দেখা করে।

মান্টাকে দেখতে সাধারণ সাবমেরিনের মতো ছিপছিপে লম্বা দেখতে তো নয়ই উপরন্তু একটা মোটা ভোঁতা কিন্তু তকিমাকারের মতো দেখতে। যেন কোন ধাতু দিয়ে একটা শশা তৈরি করেছে। এর সামনেটা একটা তেরপল দিয়ে ঢাকা যাতে নাসাউ-এর লোকেরা এর র্যাডার স্ক্যানারের গোপনীয় তথ্য জানতে না পারে। আর এই নৌবাহিনীর লোকেরা এত চাপা যে, যদি এদের টেকুর ওঠে তো ভাবে কোন গোপনীয় জিনিস ফাঁস হয়ে গেল।

— এই সাবমেরিন সম্পর্কে তুমি আর কী জানিস!'

-- দেখ, ওয়াশিংটনে CIA থেকে আমাদের এরকম সাবমেরিন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মান্টার ক্যাপ্টেনকে সেটা জানানো উচিত হবে না। এটা জর্জ ওয়াশিংটন শ্রেণির ডুবোজাহাজ। ওজন ৪০০০ টন, নাবিক আছে থ্রয় একশো জন, দাম দশ কোটি ডলার। জলের নীচে এর গতিবেগ ৪০ নটের মতন। যতক্ষণ এর জ্বালানি থাকবে ততক্ষণ এর রেঞ্জ। অথবা নিউক্লিয়ার

রি-অ্যাকটর মেরামত করতে না হয়। তার মানে এক লক্ষ মাইলের কাছাকাছি হবে। আর যদি জর্জ ওয়াশিংটনের মতো অস্ত্র থাকে তবে এতে আছে দু-সারিতে ষোলোটা ভার্টিকাল লক্ষিং টিউব (মিসাইল ছোঁড়ার টিউব)। জলের নীচে পোলারিস মিসাইল ছোঁড়ার সময় এই সাবমেরিনটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

— অটোমেটিকভাবে মিসাইলের গতি লক্ষ্যস্থল সব ঠিক করা থাকে। কেবল প্রধান খানার একটা বোতাম টিপে দিলেই হল। কমপ্রেসড এয়ার মিসাইলটাকে ধাক্কা মেরে জলের ওপর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। জল ছেড়ে ওঠামাত্র মিসাইলের জ্বালানি জ্বলে উঠে বাকি পথটা উড়িয়ে নিয়ে যায়। কী সাংঘাতিক জিনিস বল। প্রত্যেকটা মিসাইলের আওতা হচ্ছে ১২০০ মাইল। কী আশ্চর্য বল। এক একটা মিসাইল এক একবার জল থেকে উঠবে আর এক একটা শহর ধ্বংস করে দেবে। এরকম আমাদের ছ'টা সাবমেরিন আছে। আরও তৈরি হচ্ছে। কেউ বুঝতেই পারবে না কোথায় এগুলো আছে—অতএব শত্রুপক্ষ এটাকে ধ্বংস করতে পারবে না।

বন্দ বললে—এটাকেও ধ্বংস করার উপায় বের হবে। একটা অ্যাটমিক ডেপথ্ চার্জ জলের তলায় যে শক ওয়েভ সৃষ্টি করবে তাতে কয়েকশো মাইলের মধ্যে জলের তলার সব শেষ করে দেবে। আচ্ছা, “ডিস্কো”কে ডোবাবার মতো ছোটো মিসাইল কি মান্টায় আছে?”

— ছটা টর্পেডো টিউব আছে মান্টার সামনে। আর কিছু ছোটোখাট অস্ত্রও আছে। এর কমান্ডার যেহেতু একজন ইংরেজ সে শুধু শুধু একটা নিরীহ নাগরিক পেটের ওপর আঘাত হানবে না। আর তারা আমাদের মতো সাদা পোশাকের লোকের আদেশ মানবে কেন? মনে হয়, নৌ-বাহিনীর দপ্তর থেকে কড়া নির্দেশ দেওয়া আছে।

বিশাল সাবমেরিনটা জেটিতে এসে আস্তে ধাক্কা মারল। দড়ি ছুঁড়ে দেওয়া হল অ্যালুমিনিয়ামের একটা পাটাতন পেতে দেওয়া হল। পুলিশ কর্ডন দিয়ে চারদিকের হই হই বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। লিটার বললে—চল, এবার যাওয়া যাক। নাঃ, প্রবেশটা তেমন জমাটি হল না। আমাদের মাথায় টুপিও নেই যে কোয়ার্টার-ডেক কে একটা স্যালুট দেব। তুই বরং কার্লসি কর আর আমি বো করি।

॥ কুড়ি ॥

সাবমেরিনের ভেতরে ওরা দুজনে ঢুকতেই আটাশ বছরের একজন রক্ষী অফিসার তাদের নিয়ে নীচে নেমে গেল। সাবমেরিনের ভেতর প্রচুর জায়গা। সুন্দর সবুজ রং করা। ইলেকট্রিকের লাইনগুলোর ওপর দেওয়ালের সঙ্গে মিলিয়ে রং করা। ভেতরে কোনো রকম ভিড় নেই। কোনো মই নেই, পরিবর্তে সিঁড়ি। ভেতরের আবহাওয়া চমৎকার। অফিসারটি জানাল ৭০° ফারেনহাইট উত্তাপ এবং ৪৬ পার্সেন্ট আর্দ্রতায় নিয়ন্ত্রিত। আমাদের একটা ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা মারল। ওপরে লেখা রয়েছে কমান্ডার পি. পেডারসেন, যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনী।

ক্যাপ্টেন ভদ্রলোকের বয়স প্রায় বছর চল্লিশের মতো হবে। মাথার চুলে সবে পাক ধরতে শুরু করেছে। মুখটা স্ক্যানডেনভিান ধাঁচের। চোয়াল শক্ত, চোখের দৃষ্টিতে ধূর্ততা প্রকাশ পাচ্ছে কিন্তু সেটা বেশ সরল। তিনি একটা টেবিলের উলটোদিকে বসে রয়েছেন—সবে এককাপ কফি শেষ করেছেন। টেবিলের ওপর একটা সিগন্যাল প্যাড — তাতে কিছু লেখা। ভদ্রলোক এদের বসতে ইঙ্গিত করে সেই অফিসারটিকে বললেন— স্ট্যান্টন এদের জন্যে কফি পাঠাও আর এই বার্তাটা এখনি পাঠাবার ব্যবস্থা করো—অত্যন্ত জরুরি।

ওরা বসার পর ভদ্রলোক বললেন— কমান্ডার বন্দ এবং আপনার সঙ্গীকে এই সাবমেরিনে অভ্যর্থনা জানাই। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর একজন সদস্য এখানে আসায় আমরা গর্বিত। আচ্ছা, আপনি এর আগে কখনও সাবমেরিনে চড়েছেন?

আমি গোয়েন্দা বিভাগে থাকার সুবাদে সুপার কার্গোর (মালপত্র তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী) কাজে। কারণ RNVR বিভাগেব কাজ সাধারণ নাবিকেরা করতে পারে না।

হেসে ক্যাপ্টেন লিটারকে জিজ্ঞেস করেন-- আপনি ?

না ক্যাপ্টেন চর্ডর্ডিন -- তবে আমার একটা সাবমেরিন ছিল সেটাকে রবারের বাস্‌ আর টিউব দিয়ে চালাতে হত। ব্যাপার হচ্ছে আমার বাথটবে বেশি জল না থাকায়, তার ভেতরটা আর দেখে ওঠা হয়নি।

ক্যাপ্টেন বললেন— আমাদের নৌবাহিনীও সেই রকম। এই জাহাজের পুরো কেলামতি আমাদের দেখা নিষেধ। আচ্ছা মি. লিটার কী ব্যাপার বলুন তো? কোরিয়ার যুদ্ধের পর এরকম ‘টপ সিক্রেট’ ‘অত্যন্ত জরুরি’ এত আসতে আর কখনও দেখিনি। তাতে বলা হয়েছে আমি যেন কমান্ডার বন্ডের এবং আপনার অধীনস্থ হয়ে থাকি মরার আগে পর্যন্ত যতক্ষণ না আজ সক্ষম্য অ্যাডমিরাল না আসেন। আর সবকটার ওপরে ‘থাডারবল অপারেশন’ ছাপ মারা। কী ব্যাপার বলুন তো?

লিটার ক্যাপ্টেনকে সব কিছু সবিস্তারে বলে গেল—এমনকি আজ দেড়টায় লাগের প্লেন নিয়ে পালানোর এবং ভিতালিকে বন্ডের নির্দেশ সব কিছু। লিটার যখন এত সব বলে যাচ্ছে তখন বন্ড ক্যাপ্টেনের শাস্তমুখের দিকে চেয়ে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। এই লোকটিকে বন্ডের খুব ভালো লেগেছে।

মিনিট দশেক পরে কমান্ডার পেডারসেন একটু হেলান দিয়ে বসে তাঁর পাইপে তামাক ভরতে ভরতে অন্যান্যভাবে বলতে লাগলেন--“সত্যি এটা একটা গল্পই বটে!! ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন— নৌবাহিনী থেকে এতসব সিগনাল না পেলেও আমার কিন্তু কিছুদিন ধরে কেবল মনে হচ্ছে—একটা কিছু ঘটবে। দেখুন, এতগুলো মিসাইল নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন আমার হাতে। তাতে কি আমি ভয় পাই—তা নয়। দেখুন, আমি পিটারডেন, আটত্রিশ বছর বয়স। আমার স্ত্রী আছে, দুটো সন্তান আছে। এইসব ভয়ংকর পারমাণবিক অস্ত্রের মধ্যে যদি একটাকে মিয়ামির দিকে ঘুরিয়ে দিই আর যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পণ আদায় করতে পারি। আর আমি কিনা ঘুরে বেড়াচ্ছি ওই রকমের ষোলোটা অস্ত্র নিয়ে প্রায় গোটা ইংল্যান্ডকে ধুলিসাৎ করে দিতে পারি। আমি সত্যিই ভাবতে পারছি না।

তিনি টেবিলের ওপর হাত রেখে বললেন— ওসব কথা এখন থাক। আপাতত আমাদের সামনে একটা খুব ছোট্ট অথচ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেয়েও বিরাট সমস্যা। আপনারা অনুমান করছেন যে, লাগের গুপ্তস্থান থেকে প্লেনে করে বোমা দুটো নিয়ে আসতে গেছে। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে সেখানে বোমা আছে। তাহলে আমরা জাহাজ আটক করব। কিন্তু মনে করুন, যদি ও বোমা দুটো জাহাজে না আনে বা মেয়েটা কোনো কারণে খবর দিতে পারল না— তখন আমরা কী করব?”

ধীর কণ্ঠে বন্ড বললে— আমরা তখন ওদের পেছনের প্রেত সংঘের দেওয়া সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত—তাও আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা বাকি। যদি আইনভঙ্গ না করতে হয় তবে এর বেশি কিছু করা যাবে না। তখন সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। হয়তো ইতিমধ্যে ওরা একটা ছোট্টো বোটে করে একটা বোমা নিয়ে ইংল্যান্ডের উপকূলে রেখে এসেছে সম্পূর্ণ আমাদের অজান্তে। হয়তো শুনতে পাব মিয়ামির অস্তিত্ব মুছে গেছে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে অথবা পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গায় একটা বিরাট পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে।

এখন আমরা একজন গোয়েন্দার মতো পিছু নেব। যেমন সে অনুমান করছে যে লোকটা খুন করতে যাচ্ছে। জানে না যে, তার পকেটে পিস্তল আছে কি না। কিন্তু যখন দেখবে যে সে তার

পকেট থেকে পিস্তল বার করে মারবাব চেষ্টা করছে তখনই তাকে গুলি বা গ্রেপ্তার করতে পারবে। বন্ড লিটারকে বলছে— কী রে ফেলিক্স।

— দেখুন, ঘটনাটা প্রায় সেইবকমই দাঁড়াচ্ছে। ক্যাপ্টেন আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, লাগেই আসল শয়তান এবং বোমা দুটো সরাবাব সবচেয়ে সুবিধের সময় হচ্ছে রাত্রি আর সেইটা হচ্ছে আজকের রাত্রিই— শেষ রাত্রি। সেই জনোই তো আপনাদের তাড়াতাড়ি করে ডেকে আনা হয়েছে। আচ্ছা, আপনি কি যাত্রার জন্য প্রস্তুত?

তৈরি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পারি। কিন্তু মশাই আপনাদের জন্য একটা বাজে খবর আছে। আমার মাথায় ঢুকছে না — কী করে ডিস্কোব পিছু নেব!

কথাটা শুনে লিটার হঠাৎ রেগে গিয়ে তার হুক হাতটা ক্যাপ্টেনের দিকে বাড়িয়েই আবার নিজের কোলের ওপর বেখে বলল— কেন? মাস্টা তো খুব জোরেই চলতে পারে।

লিটারের ব্যবহার দেখে ক্যাপ্টেন হেসে দেওয়ালে টাঙানো একটা অ্যাডমিরালটি চার্টের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে— আপনারা কি কোনো চার্টের ওপর এত সংখ্যা দেখেছেন? এগুলো হচ্ছে ঐ সব অঞ্চলে জলের গভীরতার মাপ। তার মানে সমুদ্র অত্যন্ত উঁচুনীচুতে ভরা। এসব অঞ্চলে সাবমেরিন বোম্ব হয় আপনারা আগে কখনও চালাননি। আর ডিস্কো যদি গভীর জলের প্রণালি অর্থাৎ টাং অব দ্যা ওশন, নর্থ ওয়েস্ট প্রভিডেনস চ্যানেল বা উত্তর-পূর্ব দিক এই সব পথ এড়িয়ে যায় তাহলে আমাদের পক্ষে পিছু নেওয়ার বারোটা বেজে গেল।

— আর একটা কথা এই চার্টটা হচ্ছে সেই পাল তোলা আমলের— তারপর পঞ্চাশ বছরে সমুদ্রের কত কী পরিবর্তন হয়েছে তা কিন্তু এর মধ্যে নেই। অতএব এখানে এই অগভীর জলে সাবমেরিন চালানো খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার।

— দেখুন, এরা অনেক বুদ্ধি করে বেছে নিয়েছে— এই ইটালিয়ান ইটালটা। এটা মাত্র এক ফ্যাদম জলের গভীরতা হলেই চলতে পারবে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন কমপক্ষে দশ ফ্যাদম। — ক্যাপ্টেন দুজনের দিকে চেয়ে বললেন— আমি কি নৌবাহিনীকে জানিয়ে ফোর্ট লডারডেল-এ আপনাদের বন্দরগুলোকে ডিস্কোর পিছু নেবার জন্য যাত্রা করতে বলব?

বন্ড নিজেদের মধ্যে একবার চোখাচোখি করে বললে— ডিস্কো তো রাত্র আলো জ্বালবে না। প্লেন তাদের হৃদিশ পাবে কী করে? ববং আমরা নর্থ-ওয়েস্ট চ্যানেল দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি যদি ওদের নিশানা থাকে ওই বাহামার রফেট স্টেশন।

লিটার বেশ রেগে গিয়ে তার মাথার চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে বললে— ধ্যাং তৈরি, তাহলে আমরা আর করবটাই বা কী। মাঝখান থেকে মাস্টাকে ডেকে এনেই আমরা রামরোকা বনে গেছি। এটা যে লাগেই আর ডিস্কোর ব্যাপার। এই অনুমান নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বন্ডকে বললে— চল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরামর্শ করে CIA-কে আর তোর বড়োকর্তাকে একটা সংকেত পাঠানো যাক। তবে কীভাবে পাঠাবি?

বন্ড একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে— এখন এখানে ছটা—লন্ডনে মধ্যরাত্রি। যেই বলা হবে অ্যাডমিরালটি ফর M খান্ডারবল—বাস ওয়েব মধ্যে ছড়োছড়ি পড়ে যাবে। আর এখনই হচ্ছে সিগন্যাল পাঠাবার প্রশস্ত সময়।

হঠাৎ কড়িকাঠের PM সিস্টেমের থেকে আওয়াজ হল— ক্যাপ্টেনকে বলছি আমি রক্ষী অফিসার। একজন পুলিশ কমান্ডার বন্ডের জন্য জরুরি বার্তা নিয়ে এসেছে। ক্যাপ্টেন সুইচ টিপে নিজের টেবিলে মাইক্রোফোনে এনে বললেন— তাকে নীচে পাঠিয়ে দাও। বন্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন— মেয়েটার নাম হচ্ছে— ডোমিনো— হ্যাঁ ডোমিনো সে দেখা যাক কী খবর পাঠিয়েছে।” তাকে আবার বললেন— তোমরা জাহাজ ছাড়ার নির্দেশের জন্য তৈরি হও।

দরজা খুলে গেল। একজন করপোরাল পুলিশ ঢুকে OHMS ছাপমারা একটা খাম বন্ডের হাতে তুলে দিল। বন্ড তাড়াতাড়ি সেটা খুলে পড়তে লাগল—কমিশনারের সই-করা পেনসিলে লেখা। সবাই পড়ে শোনা।

— ৫-৩০ প্লেন ফিরে এসেছে। তাকে জাহাজে তোলা হয়েছে। ৫-৫৫ মি. ডিস্কো ছেড়েছে। মেয়েটা জাহাজে ওঠার পর আর ডেকে বেরিয়ে আসেনি। আবার বলছি আসেনি।

— বন্ড ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে একটা কাগজ নিয়ে উত্তর লিখল—

— নর্থ-ওয়েস্ট প্রভিডেন্স চ্যানেল দিয়ে মান্টা পিছু নেওয়ার চেষ্টা করবে। ফোর্ট লডারফেলের ফাইটার বন্ডার স্কোয়াড্রনকে ফ্লোরিডার উপকূল থেকে দুশো মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে সাহায্যের জন্য তৈরি থাকতে হবে। মান্টা এক উইন্ডার ফিল্ড এয়ার কন্ট্রোলার সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করবে। নৌবাহিনী আর অ্যাডমিরালটিকে জানানো হয়েছে। রাজ্যপাল, আর অ্যাডমিরাল কার্কেসন এবং ব্রিগেডিয়ার ফেয়ার চাইল্ড পৌঁছনো মাত্রই তাঁদের যেন জানানো হয়।

বার্তাটাতে বন্ড, ক্যাপ্টেন আর লিটার সই করে খামের মধ্যে পুরে কর্পোরালের হাতে দিলে সে ভারী বুটের আওয়াজ তুলে চলে গেল।

কর্পোরাল চলে যেতেই ক্যাপ্টেন ইন্টারকমের সুইচ টিপে আদেশ দিলেন, জলের ওপর ভেসে উঠে দশ নট বেগে উত্তর দিকে রওনা হতে। পরক্ষণেই শোনা গেল পেছনে হুইশলের শব্দ। চাপা যান্ত্রিক গর্জন, সাবমেরিন সামান্য কেঁপে উঠল। ক্যাপ্টেন বললে — বন্ধুগণ, আমাদের যাত্রা হল শুরু। আমাদের শিকার এবং তার সম্বন্ধে আর একটু জানতে পারলে আমি একটু খুশি হতাম। যাই হোক আপনাদের কথাতেই আমি তার পিছু নেব। এবার আর কী বার্তা পাঠাবেন?

বন্ড একটু অনামনস্বভাবে বার্তা লিখছিল। আর ভাবছিল কমিশনার চিঠিতে কী বলতে চাইছেন আর ডোমিনোর সম্বন্ধে। হতে পারে প্লেনে বোমা আনা হয়নি—সেক্ষেত্রে মাস্টা আর বোম্বাব বাড়াবাড়ি হয়েছে। এর পেছনে কোনো যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে এমনও হতে পারে তো। এই ভাঙা ডিভিকের আর বোমা চুরি অন্য কোনো সংস্থার কাজ। আমরা যখন ডিস্কো-কে তাড়া করে বেড়াব — প্রেত সংঘ ততক্ষণে তাদের কাজ করে যাবে। বন্ড কিছু তার মনের দিক থেকে এটাকে মেনে নিতে পাচ্ছে না। ডিস্কো-লার্গো একটা ছদ্মবেশ নিয়েছে। তাইতেই বন্ডের সন্দেহ বেড়ে গেছে। এতবড়ো একটা কাজ করতে গেলে ছদ্মবেশ ছাড়া সম্ভব নয়।

লার্গো হয়তো গুপ্তধন অভিযানেই চলেছেন বা বোমা বসাবার জন্য, টাইম ফিউজ ঠিকমতো লাগবার জন্য, যাতে প্রেত সংঘের দেওয়া সময়সীমা পার হয়ে গেলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিস্ফোরণ হবে। ইংল্যান্ড আর আমেরিকা শেষ মুহূর্তে টাকা দিতে রাজি হলে বোমা উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু বোমাগুলো কোথায়? তাহলে কি সে দুটো জাহাজেই আছে। আর ডোমিনো কোন কারণে তার সংকেত পাঠাতে পারেনি। অথবা লক্ষ্যস্থলে যাবার পরে একটা বোমা তুলে নেবে?

বন্ডের মনের মধ্যে একটা বিরাট দ্বন্দ্ব খেলা করছে। সেই সঙ্গে একটা ভয় তাকে পেয়ে বসেছে যে সে, লিটার আর মান্টা একটা জুয়াখেলায় জড়িয়ে পড়েছে। যদি বোমা দুটো জাহাজে থাকে আর ডিস্কো যদি সত্যিই গ্র্যান্ড বাহামার মিসাইলের স্টেশনের দিকে যায়, তবে মান্টা তাকে নর্থ-ওয়েস্ট চ্যানেল দিয়ে গিয়ে ধরে ফেলবে।

এই জুয়াখেলা সম্বন্ধে যদি তারা জেতে তাহলে ডোমিনো সংকেত পাঠাল না কেন? কী হয়েছে তার?

॥ একুশ ॥

সমুদ্রের ঘন নীল জলের বুকে ঢেউ তুলে ডিস্কো ছুটে চলছে টর্পেডোর মতো। ইঞ্জিনের গভীর শব্দ আর সাইডবোর্ডের গেলাসের টুংটাং আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। সমস্ত

কেবিন সাটার নামানো রয়েছে, সমস্ত আলো নেভানো। কেবল ছাদ থেকে ঝোলানো একটা জাহাজী লণ্ঠন। সেটা দুলছে। আব তার ফ্যাকাসে আলোয় লম্বা টেবিলে বসা কুড়িজন লোকের মুখগুলোয় আলো পড়ছে আর তাদের ছায়াগুলো বিকৃত হচ্ছে যেন তারা নরকের কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

লার্গো মাথার দিকে বসেছিলেন। যদিও কেবিন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত তবুও তিনি ঘামছিলেন। তিনি বেশ উত্তেজিতভাবেই বলতে লাগলেন যে, আপনারা শুনুন, আমরা একটা জরুরি অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছি। আধঘন্টা আগে মিস ভিতালিকে একটা ক্যামেরা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখে ১৭ নম্বর। তার সন্দেহ জাগে। সে তার কাছে আসতেই সে ক্যামেরায় ছবি তোলার ভান করে কিন্তু লেন্সের মুখ ঢাকা ছিল। তাতে তার সন্দেহ আরও বেড়ে যাওয়ায় আমায় সে খবরটা দেয়। আমি মিস ভিতালিতে তার কেবিনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ক্যামেরাটা দেখতে চাইলে সে আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে থাকে। আসলে ওটা ক্যামেরা নয়।

একটু হেসে লার্গো এবার বেশ শাস্ত কণ্ঠে বলতে লাগল— ক্যামেরাটা আসলে একটা গাইগার কাউন্টার। কাউন্টারের কাঁটা স্বাভাবিকভাবেই ৫০০ মিলি রন্টজেন-এ উঠে গেছে! মেয়েটির জ্ঞান ফিরিয়ে এনে তার কাছ থেকে কথা বার করার চেষ্টা করলেও সে কোনো কথা বলেনি। কিন্তু ঠিক সময়ে আমি তার কাছ থেকে কথা বার করব। তাই তাকে আবার অজ্ঞান করে তার খাটের সঙ্গে ভালোভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে এসেছি। যথাসময়ে তার কাছ থেকে কথা বার করে তাকে খতম করে দেওয়া হবে। আপনাদের সমস্ত ঘটনাটা আমি জানালাম। অবশ্য এটা ২ নম্বরকেও জানানো হয়েছে।

লার্গো চুপ করলেন। চারধারে ক্রুদ্ধ বিরক্ত ভাব প্রকাশ পেতে লাগল। জার্মানদের একজন ১৪ নম্বর দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বললে— তারপর ২ নম্বর কী বললেন?

— তিনি আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন। বলেছেন পৃথিবীর প্রায় সব কটি দেশের গোয়েন্দা বিভাগ তাদের গাইগার কাউন্টার নিয়ে আমাদের খুঁজতে লেগে পড়েছে। নাসাউ-এর ভারপ্রাপ্ত বিভাগ নিশ্চয়ই বন্দরের পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে সমস্ত জাহাজে তেজস্ক্রিয়তা মাপতে। মনে হয় মিস ভিতালিতে ওই গাইগার কাউন্টার আনার জন্য ঘুষ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ২ নম্বর বললেন, একবার কোনো রকমে বোনাটাকে লক্ষ্যস্থলের কাছে বসিয়ে দিতে পারলেই আর ভয় পাবার কিছু নেই। রেডিও অপারেশনকে খুব সতর্ক থাকতে বলেছি কোনো অস্বাভাবিক বেতার-বার্তা বিনিময় হচ্ছে কিনা তার দিকে নজর রাখতে। আমাদের ওপর সন্দেহ পড়লে লন্ডন এবং ওয়াশিংটনে নিশ্চয়ই খবর যত। কিন্তু না, সব স্বাভাবিক। অতএব অপারেশন ঠিকমতো চলবে। লক্ষ্যস্থলের কিছুটা দূরে এসে আমরা বোমার সীসের বাস্ক দুটো জলে ফেলে দেব। তার একটার মধ্যে থাকবে মিস ভিতালির দেহ।”

২৪ নম্বর বললে— তবুও সবার আগে আপনি মেয়েটার কাছ থেকে সব কিছু জেনে নিতে হবে। আমাদের ওপর সন্দেহ পড়েছে এটা জেনে আমরা খুব খুশি হব না।”

— এই মিটিং-এর শেষে আমি মেয়েটার পেট থেকে কথা বার করার চেষ্টা করব। আপনারা যদি আমার মত চান তো বলতে পারি ঐ মি. বন্ড আর লিটার দুজনে গুপ্তচর। ওদের ওপর আমাদের নজর রাখা উচিত ছিল। ওই লিটার-এর কাঁধে একটা ক্যামেরা ছিল যেটা অনেকটা এই ক্যামেরার মতো। তবে বন্ডের কথাগুলো সত্যি বলেই মনে হয়েছে। কাল সকালে নাসাউ এ ফেরার সময় আমরা আরও সতর্ক হব। আমরা বলব ভিতালি জলে পড়ে গেছে। গল্পটা ঠিকমতো সাজিয়ে দেব। সাক্ষীর আামাদের সবাই ঠিকই আছে। আজ রাতে আমাদের গুপ্তধন অনুসন্ধানের

গল্পটা বেশ ভালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যার জন্যে সব পুরোনো মুদ্রাগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতে হবে। মুদ্রাগুলো ঠিকমতো ক্ষয়াতে পেরেছেন তো ৫ নম্বর?

৫ নম্বর হলেন আসলে পদার্থবিদ কোৎসে—তিনি বিজ্ঞভাবে বললেন— যতটা দরকার ঠিক ততটাই করা হয়েছে। এগুলো ক্ষয়্যাবার জন্যে আমি কিছু অ্যাসিড ব্যবহার করেছি। এই মুদ্রাগুলো ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের খাঁটি স্প্যানিশ স্বর্ণ এবং সাধারণ মুদ্রা। জলে সোনা আর রূপোর বিশেষ ক্ষতি হবে না। করোনারের হাতে দিয়ে বলতে হবে এগুলোই গুপ্তধন। আর কোথায় পাওয়া গেছে জিঙ্কস করলে আন্দাজে যা হোক একটা নাম বলে দিলেই হবে।

সবাই জানে প্রবাল প্রাচীরের পরেই গভীর জল থাকে। ভিতালির অ্যাকোয়ালাভে নিশ্চয়ই কিছু গলদ ছিল। আমরা অনুসন্ধান চালাতে গেলে সে-ও তাতে জোর করে যোগ দেয়। সে-তো বেশ ভালো সাঁতার কাটে। তাকে জলে নামতে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে নামে আর তলিয়ে যায়। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে তার খোঁজে নেমে পড়ি। কিন্তু হাঙরদের জ্বালায় তা আর সম্ভব হয়নি। আমরা আমাদের অভিযান স্থগিত রেখে নাসাউ ফিরে এসেছি এই দুঃসংবাদ জানাবার জন্যে।

৫ নম্বর স্থির বিশ্বাসে মাথা নেড়ে বললে— এই ব্যাপারে চিন্তার কোনো কারণ নেই, কিন্তু মেয়েটির কাছ থেকে সব কথা বার করতেই হবে। তবে বিদ্যুতের কিছু বিলের ব্যবহার আমার জানা আছে যা মানবদেহে কোনো মতেই সহ্য করতে পারবে না। যদি আমায় প্রয়োজনে লাগে তো বলবেন।

লার্গোও বেশ ভদ্রভাবে বললে— যেন তারা কোনো সামুদ্রিক পীড়ায় আক্রান্ত তাদের সহযাত্রীর চিকিৎসার বিষয় আলোচনা করছে। বললেন— কথা আদায়ের বিশেষ কিছু পদ্ধতি আমার জানা আছে। তাতেও যদি কাজ না হয় তো আপনি তো আছেন।

লার্গো ওই ছায়ামূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন— আপনাদের এবার আমাদের শেষ কাজটার কথা বলে নিই। এখন মধ্যরাত্রি, রাত তিনটের সময় চাঁদের আলো ফুটবে। থাকবে পাঁচটা পর্যন্ত। অতএব আমাদের কাজ রূরার জন্যে হাতে সময় থাকবে দুঘন্টা। আমরা যে রাস্তা দিয়ে চলেছি তাতে দক্ষিণ দিক দিয়ে আমরা ওয়েস্ট-এন্ডএ পৌঁছব। যদি আমরা লক্ষ্যস্থলের র্যাডারে ধরাও পড়ি, তারা ভাববে ইয়াটটা ভুল করে ঢুকে পড়েছে। রাত ঠিক তিনটের সময় আমরা নোঙর করব। তারপর আমাদের পনেরো জনের দলটা লক্ষ্যস্থলের আধ মাইল দূরে বোমা দুটো বসাবে। এরা তীরের মতো ছড়িয়ে সাঁতার কাটবে। মাঝে থাকবে বোমা বহনকারী রথ এবং স্নেড্। পথপ্রদর্শক কেবল দেখবেন হাঙর এবং ব্যারাকুডাদের থেকে সাবধান করবেন। গ্যাস বন্দুক চালাবার সময় পাশের লোককে সতর্ক করে দেবেন সাহায্যের জন্যে। গ্যাস বন্দুকের পাল্লা হচ্ছে কুড়ি ফুট আর কোনো বড় মাছকে মারতে হলে হয় তার মাথায় অথবা ঠিক পিছনে মারতে হবে।

লার্গো বলতে লাগল— যদিও এসব কথা আপনারা কতবার শুনেছেন তবুও আর একবার বললাম বলে কেউ কিছু মনে করবেন না। আমরা জানি জলের নীচে আমরা অনেক প্রশিক্ষণ নিয়েছি। কিন্তু একটা ট্যাবলেট আপনাদের দেওয়া হবে যার নাম—ডেন্সিট্রিন ট্যাবলেট—এর কাজ হচ্ছে ডুবুরিদের স্নায়ুতন্ত্র বেশ সজীব রাখে এবং স্ট্যামিনা ও উৎসাহ বাড়িয়ে দেয়। এই মিটিং শেষ হলে প্রত্যেক ডুবুরিকে এই ট্যাবলেট দেওয়া হবে। আর কারোর কিছু জানার আছে?

ষড়যন্ত্র শুরুর ছমাস আগে ব্রোফেন্ড প্যারিসে লার্গোকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, দলের মধ্যে যদি কোনোরকম অবিশ্বাস ষড়যন্ত্র দেখা দেয় তবে তা আসবে ওই দুই রাশিয়ান ১০ এবং ১১ নম্বরের কাছ থেকে। ওরা মনে সবসময় একটা অবিশ্বাস ঘুরে বেড়াচ্ছে—ওদের ধারণা, ওদের সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজ দেওয়া হচ্ছে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেবার জন্যে। তাদের লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বা তাদের মেরে ফেলে লভ্যাংশ অন্যরা হাতিয়ে নেবে। তাদের বোঝাতে

খুব বেগ পেতে হয়। তবে তারা যদি কোনো কাজের দায়িত্ব নিয়ে ফেলে তবে কোনো বাধা বিপত্তি তাদের সে কাজ থেকে টলাতে পারবে না। তাই তারা কোনো বিষয়ে তাদের মত দিতে খুব দেরি করে। যদি কখনও ধরা পড়ে যে ওরাই সে কাজ করছে তবে তা শক্ত হাতেই দমন করতে হবে। এই রাশিয়ানরা হচ্ছে SMERSH-এর প্রাক্তন সদস্য। এদের থেকে সাবধান।

১০ নম্বর, একদা SMERSH দলের সন্ত্রাসবাদী স্ট্যালিনিক বলতে শুরু করলেন।—তিনি লাগেরো বাদিকে দুটো চেয়ারের পর বসেছিলেন। তিনি কিন্তু লাগেরোকে সম্বোধন করলেন না। করলেন সমস্ত অধিবেশনকে। বললেন—“কমরেডস, ১ নম্বরের বর্ণনা শুনে আমি ভাবছিলাম যে সবকিছু সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে, আর ভালো ভাবে শেষও হবে। বোমা ফাটাবার দরকারই হবে না।” হঠাৎ তার গলার স্বর কীরকম প্যাঁচালো হয়ে উঠল—“আমাদের সব পরিশ্রম শেষ হতে আর মাত্র চব্বিশ ঘন্টা বাকি, আর তার পুরস্কার? সে তো হাতের মধোই এসে গেছে। কিন্তু কমরেডস এত টাকা হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেলেও আমার মাথায় আর একটা দুশ্চিন্তা দেখা দিল।’ লাগেরো তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ২৫ রিভলবারটির সৈফটি ক্যাচ সরিয়ে নিজের উরুর ওপর রাখলেন। “আমি যদি আমার মনের কথা আপনাদের এবং আমার বন্ধু ১১ নম্বরকে না বলি তা হলে নিজের ওপর খুবই অন্যায় করা হবে।

উপস্থিত সকলে নিস্তব্ধ। সকলেই হয় গুপ্তচর অথবা যড়যন্ত্রকারী। তারা সবাই বুঝতে পারলেন অস্থিরতার ঘন ছায়া এগিয়ে আসছে, বিদ্রোহের গন্ধ পেলেন। প্রত্যেকে উন্মুখ হয়ে রয়েছেন আসল কথাটা শোনবার জন্য।

সকলের মুখের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করে বললেন— দেখুন, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পনেরো জন আধ ঘন্টা রাস্তা সাঁতার কেটে এগোব। আর পাঁচজন সদস্য আর ছ’জন সাব এজেন্ট থাকবেন এই জাহাজের ভেতর। তখন তারা যদি আমাদের এই ভয়ংকর জায়গায় ফেলে রেখে চলে যান, তাহলে জিনিসটা দাঁড়াবে কী রকম।

টেবিলের চারধারে গুঞ্জন শুরু হল। ১০ নম্বর সবাইকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বললেন— “কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য। আর এটাও সত্য যে মানুষের মধ্যে এক এক সময় একটা প্রলোভন খুব অন্যায় ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমাদের পনেরো জনকে সরিয়ে দিতে পারলে বাকি এই কজনের ভাগ্যে লভ্যাংশের পরিমাণটা একবার চিন্তা করে দেখুন। ফিরে গিয়ে বললেই হল যে, এরা হাঙরদের সঙ্গে কী সাংঘাতিক যুদ্ধ করেছে। তবেই তারা মরেছে।

লাগেরো নিজেকে সংযত রেখে খুব ঠান্ডা গলায় বললেন— আচ্ছা ১০ নম্বর এই ব্যাপার সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাবটা কী জানতে পারি কি?

১০ নম্বর এই প্রথম ডানদিকে মুখ তুলে তাকালেন—কিন্তু লাগেরোর মুখের চেহারা দেখতে পেল না। আমার মতে প্রত্যেক জাতীয় দলের একজন করে জাহাজের ওপর থাকবে তাহলে জলের তলায় সাঁতারুর সংখ্যা এসে দাঁড়াবে দশ-এ। তাতে করে যারা জলের তলায় অংশগ্রহণ করবেন তাঁরা খুব উৎসাহ পাবেন। ভাববেন পূর্বে উল্লেখিত বিপদের আর সম্ভাবনা নেই।

খুব শান্ত অথচ ভদ্রকণ্ঠে লাগেরো বললেন— আপনার প্রস্তাবের একটা খুব ছোটো, অথচ সহজ উত্তর আছে ১০ নম্বর। সেই মুহূর্তে তার বিশাল থাবা থেকে তার হাতে ধরা রিভলবার থেকে তিনটে গুলির আলো ঝলকে পড়ল খুবই দ্রুতভাবে ১০ নম্বরের মুখে। তিনি কেবল দুটো হাত সামনের দিকে তুলে বৃথাই গুলিগুলো ধরার চেষ্টা করে একটা ঝাঁকানি দিয়ে চেয়ারসুদ্ধ পেছন দিকে ছড়মুড় করে পড়ে গেলেন।

লাগেরো রিভলবারের নলটা নাকের কাছে নিয়ে যেন সেন্টের শিশির সুন্দর গন্ধ শুকছেন এইভাবে ধরলেন। তারপর সকলের মুখের দিকে একবার তাঁর চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে শেষে বললেন—

আজকের অধিবেশন এখানেই শেষ। আপনারা যে যার কেবিনে গিয়ে নিজের নিজের সরঞ্জাম দেখে শুনে নিন। এখন থেকে গ্যালিতে খাবার তৈরি রয়েছে। যাঁর ইচ্ছে হবে এক গেলাস মদও খেয়ে নিতে পারেন। আর আমি দু-জন নাবিকের সাহায্যে আমাদের বন্ধু-বব ১০ নম্বরের ব্যবস্থা করছি। ধন্যবাদ।

ঘর খালি হয়ে গেল। লার্গো উঠে দাঁড়িয়ে একটা খুব আরাম করে আড়মোড়া ভেঙে বিকট একটা হাই তুললেন। তারপর সাইনবোর্ডের কাছে গিয়ে ড্রয়ার থেকে এক বাস্ক 'করোনা' সিগার বার করে তেতো মুখে একটা ধরালেন। বরফের টুকরো ভর্তি একটা লাল রঙের থলি নিয়ে দরজা খুলে সোজা ঢুকলেন ডেমিনো ভিতলির কেবিনে।

ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজায় খিল দিয়ে দিলেন। এ ধরনের ওপর থেকেও ঝুলছে একটা লাল রঙের বাতি। তার তলায় একটা লোহা খাটের সঙ্গে চারটে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে মেয়েটা যেন একটা তারা মাছ। লার্গো বরফের থলিটা চেস্ট অব ড্রয়ারের ওপর খুব সাবধানে রাখলেন। আর তার পাশে সিগারটা রাখলেন এমন ভাবে যেন তার আঁচে পালিশটা না নষ্ট হয়ে যায়।

মেয়েটা তার অঙ্গারের মতো চোখদুটো দিয়ে লোকটাকে দেখছিল।

লার্গো মেয়েটার কাছে গিয়ে বেশ মিষ্টি করে বললে — আমার প্রিয়তম, তোমার এই সুন্দর দেহটা আমি বহুবীর উপভোগ করেছি এবং আনন্দও পেয়েছি। তার প্রতিদানে, তুমি যদি না বল তবে আমি এই দুটো যন্ত্র দিয়ে তোমায় খুব যন্ত্রণা দেব। বলে সিগারের মুখে ফুঁ দিতে লাগল যতক্ষণ না আঙুনটা খুব জ্বলে উঠল। বললে — এটা উত্তাপ দেবার জন্য। আর এই বরফের টুকরো হচ্ছে তাকে ঠান্ডা করার জন্য। এতে তোমার চিৎকার করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। তারপর চিৎকার থামলে তুমি সব বলবে। তা তুমি কোনটা চাও?

মেয়েটার মুখে ঘৃণা উছলিয়ে উঠল। বললে — তুমি আমার ভাই-কে খুন করেছ আর এখন আমায় খুন করতে এসেছো। তোমার যা প্রার্থনা কবি যে তখন তুমি যেন আমার চেয়েও শতগুণ বেশি কষ্ট পাও। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা কবি যে তখন তুমি যেন আমার চেয়েও শতগুণ বেশি কষ্ট পাও।

লার্গোর হাসিটা হল একটা পৈশাচিক। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে বললে — প্রিয়তম, খুব ভালো কথা। দেখা যাক তোমায় নিয়ে আমি কী করতে পারি — খুব মোলায়েমভাবে আব খুব খুব আস্তে—

তিনি মেয়েটির ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তারপর তার কাঁধের কাছে সার্চ আর ব্রেসিয়ারটার ফিতে একসঙ্গে চেপে ধরলেন। তারপর খুব আস্তে অথচ ভীষণ জোরের সঙ্গে হাত নীচের দিকে টেনে আনতে লাগলেন। শেষে দুহাতের দুটুকরো ছেঁড়া কাপড় দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর মেয়েটাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে তার কাছে গিয়ে কী যেন বেশ মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলেন। শেষে চেস্ট অব ড্রয়ারের ওপর থেকে সিগার আর বরফের পাত্রটা নিয়ে ফিরে এসে আরাম করে খাটের ওপর চেপে বসলেন।

লার্গো সিগারটাতে একটা লম্বা টান দিলেন তারপর ছাইটা ঝেড়ে ফেললেন, ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে।

॥ বাইশ ॥

মান্টার আক্রমণ কেন্দ্রে একটা নীরবতা বিরাজ করছিল। কমান্ডার পেডারসেন একো-সাইডার পরিচালকের পেছনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে পেছনে বসে থাকা বন্দ আর লিটারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তারা দুজন যন্ত্রপাতি থেকে বেশ দূরে দুটো ক্যানভাসের চেয়ারে বসেছিল। তাদের

কাছে এসে বললেন — খুব ভালো যাচ্ছি আমরা। ত্রিশ ফ্যাদম জলের গভীরতা। আর আমরা বেশ জোরেই যাচ্ছি। এভাবে যেতে পাবলে ভোরের আলো ফোটার একঘন্টা আগে আমরা গ্র্যান্ড বাহামার কাছে পৌঁছে যাব।

এবার খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আগামী একঘন্টার আগে র্যাডারের পর্দায় কিছুই দেখা যাবে না। যতক্ষণ না আমরা বেরী দ্বীপপুঞ্জের এলাকা ছেড়ে বের হতে না পারি। সমস্ত পর্দা জুড়ে সেই দ্বীপগুলো থাকবে। যদি পর্দায় দেখতে পাই যে, ছোট্ট একটা দ্বীপ দলছুট হয়ে উত্তর দিকে ছুটছে আমাদের সমান্তরাল পথে। তবেই বুঝব যে, সেটিই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত 'ডিস্কো'। আর সেটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ডুব দেব। অ্যালার্ম বেল শুনতে পাবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আপনি একটু গাড়িয়ে বা ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। জাহাজটা লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি এলেই তবে তো আমাদের ভাবতে হবে।

ক্যাপ্টেন সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে ওদের ডাকলেন — মাথা নীচু করুন নইলে পাইপে মাথা ঢুকবেন। জাহাজের এই জায়গাটাই সুরু।

ক্যাপ্টেনের পেছন পেছন তারা একটা প্যাসেজ দিয়ে মেন রুমে ঢুকল। ক্রিম রঙের দেওয়াল, তাতে গোলাপি আর সবুজ প্যানেল। তারা একটা ফর্সিকা-ঢাকা টেবিলে গিয়ে একধারে বসল অন্য অফিসার ও লোকজনদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে। তারা সবাই এই দুজন আগন্তকের দিকে কৌতূহল নিয়ে দেখছে। ক্যাপ্টেন বললেন — এই ব্যাটলশিপ গ্রে বং থেকে একটু আলাদা। কারণ আমাদের সময় সময় মাসখানেক বা তারও বেশি সময় জলের তলায় থাকতে হয়। তখন নাবিকদের মনে স্মৃতি আনার জন্য এই রঙের ঘরটা ব্যবহার করা হয়। এখানে সিনেমা, টেলিভিশন, নানা বকম খেলা সবই হয়।

খাবার নিয়ে এল একজন স্টুয়ার্ড। ক্যাপ্টেন বললেন — এবার খাওয়া যাক। আমার জন্য ব্রেড আই গ্রেভি দেওয়া ভার্জিনিয়া হ্যাম, অ্যাপল পাই, সঙ্গে আইসক্রিম আর বরফ দেওয়া কফি। আর স্টুয়ার্ড ব্রেড-আইটা যেন পানসে না হয়। — পরে বন্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন — 'বন্ডর ছাড়লেই আমরা পেটে আগুন ধবে যায়। আমার কিন্তু জলে কোনো বিতৃষ্ণ নেই, আছে ডাঙায়।'

বন্ডের খাবারের অর্ডার হল ডিমের পোচ, কড়া টোস্ট আর কফি। ক্যাপ্টেনের খোশমেজাজ বন্ডের খুব পছন্দ তাই তার প্রতি সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু যতক্ষণ না র্যাডারে ডিস্কো ধরা পড়ছে তার মনের উত্তেজনা কমবে না। সে আরও ভাবছে মোয়েটার কথা। সে কি বিশ্বাস ভঙ্গ করল? সে কি বেঁচে আছে? তাকে এত কথা বলা কী উচিত হয়েছে। বন্ড ঢক ঢক করে এক গেলাস বরফ-জল খেয়ে ক্যাপ্টেনের কথা শুনতে লাগল। কেমন করে সমুদ্রের বরফ নিয়ে ফিল্টার করা হয়।

ক্যাপ্টেনের মেজাজি কথা শুনতে শুনতে বন্ড অর্ধৈর্ষ হয়ে বলে উঠল — ক্যাপ্টেন আমায় মাফ করুন। আমায় পরিষ্কার করে বলে দিন বাহামার কাছে ডিস্কোকে ধরতে পারলে আমরা কী করব? তাকে অ্যাটাক করব না টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দেব। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। তার আগে আপনি কী করবেন বলুন।

ক্যাপ্টেনের ধূসর চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠল। বললে — দেখুন আমার কোনো প্ল্যান নেই। আমার ওপর আদেশ বলুন নির্দেশ বলুন — আমি আপনাদের আঞ্জাবহ। সোফার মাত্র। যা বলবেন তাই করব। আপনার প্ল্যান নিশ্চিত্তে বলুন। সেইমতো কাজ করব। অবশ্য যদি বেশি রকম ঘায়েল হবার সম্ভাবনা না থাকে। যদি নৌবাহিনী কথা সত্যি আর আপনারা যা বলবেন — তাতে প্রয়োজন হলে শেষ পর্যন্ত এই জাহাজের নিরাপত্তাও উপেক্ষা করা হবে। আমায় সুবিধামতো যে-কোনো পছন্দ নেবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। নিন এবার বলুন।

খাবার এলে বন্দ তার খাবারে একটু কামড় দিয়ে সরিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরাল। লিটারকে বললে — তুই এ ব্যাপারে কী ভেবেছিস? তবে চাটের ওপর চোখ বুলিয়ে মনে হচ্ছে যে, ডিস্কো গ্র্যান্ড বাহামার উপকূলের এক মাইলের মধ্যে নোঙর করবে। আর আধমাইল গিয়ে গভীর জলে বোমা রেখে টাইম ফিউজের সুইচ অন করে চটপট পালিয়ে আসবে।

আমার ধারণা এইরকমই হবে জাহাজটা ভোর হবার আগেই ওখান থেকে সরে পড়বে। যেহেতু ওয়েস্ট-এন্ড-এর ধারে কাছে ওরকম অনেক ইয়াট চলাচল করে যেহেতু এদের ইয়াট মিসাইল স্টেশনের কাছে এলেও, ওদের ধারণা হবে যে, এটা একটা সাধারণ ইয়াট। আর যদি বারো ঘণ্টার ফিউজও লাগানো থাকে তবে তার মধ্যে লার্গো দুবার নাসাউ ঘুরে আসতে পারবে এবং তার মধ্যে প্রেতসংঘের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিবর্তিত নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করবে। তারপর লিটার যাতে শুনতে না পায় সেইভাবে বললে — “মেয়েটা যদি সব কিছু বলে না দেয়।”

কিন্তু লিটার শুনল, বললে — দূর! আমার ধারণা, মেয়েটা যেরকমের শাস্ত, তাতে কিছুই বলবে না। আর যদি বলেই দেয়, তো ওর গলায় একটা কিছু ভারী বেঁধে জলে ফেলে দেবে। বলবে ওর অ্যাকোয়াল্যাং খরাপ হয়ে যাওয়ায় এই বিপত্তি ঘটছে। ওদের নাসাউ ফিরতেই হবে।

ক্যাপ্টেন কথার মাঝে বলে ফেললেন — আপনার মনের কী ধারণা যে, তারা বোমাটা কী ভাবে নিয়ে যাবে। চাট দেখে তো মনে হয় ওরা তীরের খুব কাছে যেতে পারবে না। তাহলে স্টেশনের উপকূলরক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে যাবে। জানি ওই রক্ষীদের কাছে মোটরবোটও আছে। আর তীরের কাছে এসে পড়লে জেলেরা বা অন্যেরা তাড়া করবে।

বন্দ বেশ চিন্তিত মুখে বললে — আমার স্থির ধারণা যে, ডিস্কোর কামরার তলায় যে খোলটা আছে সেখান থেকে ডুবুরি সঁতারুরা বেরিয়ে অন্য কিছুতে বোমাদুটোকে রেখে ট্রেনে নিয়ে যাবে। তারপর ঠিক জায়গায় রেখে জাহাজে ফিরে আসবে। তা না হলে জাহাজে অত ডুবুরির পোশাক রাখার প্রয়োজনীয়তা কী?

ক্যাপ্টেন ধীরভাবে বললেন — তা হলেও হতে পারে — কিন্তু আমাদের এতে কী করার আছে?

বন্দ ক্যাপ্টেনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে বলে — এদের ঘায়েল করার উপযুক্ত সময় হচ্ছে যখন ওদের ডুবুরিরা বোমাটোকে নিয়ে যাবে তখন আমাদের ডুবুরিদের দিয়ে ওদের ঘায়েল করতে হবে। আর দ্বিতীয় বোমাটা যদি জাহাজের মধ্যে থেকেও থাকে — তাতে কিছু যাবে আসবে না। সেটা শুধু আমরা ডিস্কোকে ডুবিয়ে দিতে পারি। তাড়াছড়া করলে ওরা কয়েক গজ সরে গিয়ে গভীর জলে বোমাদুটো ফেলে দিতে পারে।

ক্যাপ্টেন কিছু চিন্তা করে বললে — আপনার কথার পেছনে যুক্তি আছে কমান্ডার। আমার কাছে প্রচুর অক্সিজেন রি-ব্রিডার (Rebreather) আছে। আর দশজন খুব ভালো সঁতারু আছে। তবে তাদের মধ্যে কারা যেতে প্রস্তুত জিজ্ঞেস করে দেখি। তবে আমাদের কাছে ছোরা ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই। কিন্তু তাদের নেতৃত্ব কে দেবে?

সঙ্গে সঙ্গে বন্দ বলে উঠল — আমি। আমি দেব। ডুবসঁতার কাটা আমার নেশা। আর আমাদের শিকার সম্বন্ধে আমার খুব ভালো ধারণা আছে। আমি আপনার লোকেদের ঠিকমতো বুঝিয়ে দেব।

ফেলিক্স লিটার ওকে বাধা দিয়ে বেশ কড়া করে বললে — আর আমি এখানে বসে কি আমার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল চুষব। তারপর তার ডান হাতের হুকটা দেখিয়ে বললে “দ্যাখ, একটা পায়ের পাখনা লাগিয়ে আমি তোকে যেকোনো সঁতারে হারিয়ে দিতে পারি তা জানিস?”

ক্যাপ্টেন বেশ মজা করে হেসে উঠে বললেন — আপনারা দুই যোদ্ধাতে যুদ্ধ করুন, আমি ততক্ষণ মাইক্রোফোনে আমার লোকেদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। আর আপনাদের দুটো ব্যাটল পিল পাঠিয়ে দিই, আপনাদের কাজ দেবে। তিনি হাত নেড়ে মেন-রুমের বাইরে চলে গেলেন।

লিটার বন্ডের দিকে তাকিয়ে বললে — হতভাগা কোথাকার! তোরা ইংরেজরা এত বেইমান যে, পুরোনো বন্ধুকে এখানে একলা ফেলে রেখে চলে যাচ্ছিস।

লিটারকে থামিয়ে বন্ড হেসে উঠে বললে — আমি জানতাম না যে, তোর কাটা হাতের এত উন্নতি হয়েছে। তোর ওই বিদ্যুটে হকটা দিয়ে প্রেম করার একটা উপায়ও বার করেছিস যা হোক। তুই তোর জীবনকে এত উপভোগ করতে পারিস তা জানতাম না।

লিটার বেশ গম্ভীর হয়ে বললে — শুনলে তুই হাঁ হয়ে যাবি। এই হাতে একটা মেয়েকে জড়িয়ে ধরলে সে গলে জল হয়ে যাবে। বাজে কথা ছেড়ে এবার কাজের কথা বল। দেখ পেডারসেন লোকটা সত্যিই খুব ভালো। আমাদের কিছু ভুলের জন্যে যেন ওর কিছু লোকমারা না যায়। এখন কী ফরমেশনে আমরা সাঁতার কাটব। আর জলের আবহাওয়ার মধ্যে শত্রুদের কীভাবে চিনব?

হঠাৎ লাউডস্পিকারে ক্যাপ্টেনের গমগমে গলা শোনা গেল — তিনি তাঁর লোকদের বলছেন —

আমি তোমাদের ক্যাপ্টেন বলছি। বেশ মন দিয়ে শোন। নৌবাহিনী আমাদের ওপর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছে। এই কাজটা অপারেশনের সঙ্গে তুলনীয়। আমি তোমাদের সমস্ত ঘটনাটা বলছি। তবে মনে রেখো অন্য নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এটা একটা খুবই গোপনীয় তথ্য। শোন সবাই.....

একজন ডিউটি অফিসারের বাংকে বন্ড ঘুমোচ্ছিল। তার ঘুম ভেঙে গেল অ্যালার্ম বেলের বিকট গর্জনে। লাউডস্পিকারে শোনা গেল — ‘ডাইভিং স্টেশনস্, ডাইভিং স্টেশনস্।’ বলার সঙ্গে সঙ্গে তার বাংকটা হেলে গেল আর বন্ড নেমে পড়ল হাসতে হাসতে। সে আক্রমণ কেন্দ্রের দিকে চলল।

বন্ড দেখল লিটার সেখানে আগেই পৌঁছে গেছে। ক্যাপ্টেনকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে। বললেন — আপনাদের অনুমান ঠিকই। জাহাজটা চলেছে পাঁচ মাইল সামনে ডানদিক ঘেঁষে। ত্রিশ নট-এ চলছে যা কোনো জাহাজ চলে না। এই পেরিস্কোপে একবার দেখুন। দেখতে পাবেন জাহাজটা প্রচুর ঢেউ তুলে চলেছে। একটাও আলো নেই। চাঁদও ওঠেনি। কিন্তু অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে একটা সাদা রঙের ছোপ দেখতে পাবেন।”

বন্ড পেরিস্কোপে চোখ রেখে একমিনিট পরে দেখতে পেল একটা সাদা ছোপ মতো। আচ্ছা কোন দিকে ওটা চলেছে?

এটা গ্রান্ড বাহামার পশ্চিম দিকে আমাদের রাস্তা ধরেই চলেছে। আমরা এবার আরও গভীর জলে নেমে বেশ জোরে চলতে শুরু করব এবং ওদের সমান্তরাল হয়ে কাছ বরাবর চলে আসব। ও জাহাজটাকে সোনার (sonar) ধরে ফেলেছি। হারাবার আর সম্ভাবনা নেই। আর একটা কথা সেটা আমাদের সুবিধেই হবে। ভোরের দিকে পশ্চিমদিক থেকে বেশ মৃদুমন্দ হাওয়া বইবে তাতে ডুবুরি নামলে সে বুদ্ধবুদ্ধ উঠবে জলের ওপর, তা বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। কারণ জল তো তখন কিছুটা অশাস্ত থাকবে। “এইযে বলে সাদা প্যান্ট পরা একজন শক্তিশালী লোককে দেখিয়ে বললেন — ইনি পেটি অফিসার ফালোঁ। সাঁতারুর দল পরিচালনা করবেন অবশ্যই আপনার অধীনে। ইনি ন’জন ভালো সুপটু সাঁতারুকে তাঁর দলে বেছে নিয়েছেন। তাদের আমি সব কাজ থেকে ছুটি দিয়েছি।

ক্যাপ্টেন আবার হেসে বললেন — অস্ত্রশস্ত্র বিভাগের অফিসার জাহাজের সকলের কাছ থেকে ছোরা নিয়ে সেগুলোকে শান দিয়ে ঝাঁটার লাঠির সঙ্গে বেঁধে বর্শা মতন তৈরি করেছেন। এভাবে বারোটা বর্শা হয়েছে। আচ্ছা, আবার দেখা হবে। কিছু প্রয়োজন হলে বলবেন। বলে তিনি প্লটের দিকে চললেন।

বন্ড ও লিটার ওই পেটি অফিসারের পিছু পিছু নীচের ডেক বেয়ে ইঞ্জিনঘর সেখান থেকে ইঞ্জিন মেরামতের ঘরে এলো। পথে তাদের রিঅ্যাক্টর রুমের ভেতর দিয়ে আসতে হল যেন একটা নিয়ন্ত্রিত অ্যাটমিক বোমা। লিটার ফিসফিস করে বললে — “তরল সোডিয়াম সাবমেরিন ইন্টার মিডিয়েট রিঅ্যাক্টর। মার্ক ‘B’। সে ভয়ে বৃকে ক্রশ চিহ্ন আঁকল।”

বন্ড সেটাতে একটা লাথি মেরে বললে — সেকলে মাল। আমাদের নৌবাহিনীতে এটা মার্ক ‘C’।

মেরামতের ঘরে লোদ মেশিনে বর্শা তৈরির কাজ চলছে। বন্ড হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল বেশ সুচলো আর মুখটা বেঁকা। লম্বা লাঠির মাথায় তার দিয়ে বাঁধা। হাঙরের শক্ত চামড়াও এর কাছে ফালা ফালা হয়ে যাবে। কয়েকজন সাঁতারু ইতিমধ্যে বর্শা পেয়েও গেছে।

শত্রুপক্ষের কাছে নিশ্চয়ই গ্যাস বন্দুক থাকবে। ব্রোঞ্জরঙ্গের একসারি যুবকের দিকে চেয়ে বন্ড ভাবছে এরা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, হয়তো কেউ কেউ মরবে। এদের বন্ডে সোনালি আর লিটারের সাদাটে গা চাঁদের আলোয় বেশ দূর থেকে দেখা যাবে। আর তাদের হাতের গ্যাস বন্দুকের আওতার মধ্যে এবং বর্শা সেখানে পৌঁছতে পারবে না। তাই বন্ড পেটি অফিসারকে জিজ্ঞেস করল — আচ্ছা আমাদের কি রবারের সুট আছে?

অফিসারটি বললে — নিশ্চয়ই আছে। শীতের সময় ঠাণ্ডাজলে আমাদের পড়তে হয়।

— বেশ সেগুলো আমাদের লাগবে। আর প্রত্যেকটি পিঠে ১ থেকে ১২ পর্যন্ত লিখে দিন যাতে কে কোথায় আছে বুঝতে সুবিধে হবে।

“ঠিক আছে।” সঙ্গে সঙ্গে অফিসারটি দুজনকে ডেকে বললে — ফন্ডা আর জনসন তোমরা কোয়ার্টার মাস্টারের কাছ থেকে আমাদের পুরো দলটার জন্য রবারের সুট নিয়ে এসো। আর ব্র্যাকেন তুমি স্টোরস থেকে একটি রবার সলিউশন এনে প্রত্যেকটি পোশাকের পেছনে একফুট লম্বা সংখ্যা লেখো — ১ থেকে ১২ পর্যন্ত। হ্যারি আপ।

একটু পরেই দেওয়ালে বাদুড়ের মতো রবারের পোশাকগুলোকে ঝুলতে দেখা গেল। বন্ড সবাইকে ডেকে বলতে লাগল — বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে, আমরা জলের তলায় একটা ভয়ংকর যুদ্ধে যাচ্ছি। হয়তো অনেকে মরেও যেতে পারি। কেউ কি দল থেকে চলে আসতে চান? — সবাই শুধু বন্ডের দিকে চেয়ে থামল। ‘ঠিক আছে। এখন আমরা দশফুট নীচে সাঁতার কাটব সিকি কিংবা আধমাইলের মতো রাস্তা। পথে আলো যথেষ্ট থাকবে, আকাশে চাঁদ উঠবে। চারধারে শুধু বালি আর ঘাস ছাড়া আর কিছু নেই। আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আমরা চলব ত্রিভুজের আকারে। ত্রিভুজের শীর্ষে আমি থাকব — ১ নম্বর, আমার পরে লিটার ২ নম্বর আর তিন নম্বর থাকবেন পেটি অফিসার ফালোঁ।

প্রত্যেকের কাজ হবে তার সামনের জনকে অনুসরণ করা। তাহলে হারিয়ে যাবার ভয় থাকবে না। এই সময়টা হচ্ছে মাছেদের প্রাতঃকালীন খাবার সময়। কিন্তু মনে রেখো কাছে না এলে এদের বিরক্ত করবে না। আমরা যদি ঘেঁষাঘেঁষি করে সাঁতার কাটি তবে আমাদেরই এক একটা বড়ো মাছ মনে হবে। অতএব অন্য মাছেরা আমাদের ধারেকাছে আসবে না। সী-এগের কাঁটা সম্বন্ধে সাবধান। আর বর্শার ফলা যেন ভোঁতা না হয়ে যায়।

সবাইকে মনে রাখতে হবে যেন সবাই খুব শান্ত থাকে। হঠাৎ করে আমাদের আক্রমণ করতে হবে। ওদের কাছে গ্যাস বন্দুক আছে। তবে সুবিধের হচ্ছে যে, ওগুলোকে রি-লোড করতে সময় লাগে। কেউ যদি আহত হয়। সে নিজের ব্যবস্থা নিজে করবে। তার গায়ে যদি বর্শা লেগে যায়। খোলায় চেপ্টা না করে কোনো প্রবালের টিবিবির ওপর বসে পড়বে অপরজন তাকে সাহায্য করতে না আসা পর্যন্ত। তখন সে তীর কিংবা অগভীর জলের দিকে চলে যাবে।

যদি কেউ বন্দুক তোলে। খাড়া থাকবে না। উপুড় হয়ে ওর লক্ষ্যস্থলের আকার কমিয়ে এনে গুলি করবার সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে তাকে আঘাত করবে। এই বর্শা শরীরের যে-কোনো জায়গায় লাগলেই শত্রু ঘায়েল। পেটি অফিসার ফালোর কাছে একটা সিগনাল ফ্লেয়ার (Flare) থাকবে। আক্রমণ শুরু হয়ে গেলেই তিনি সেটা সমুদ্রের বুকে ফাটিয়ে দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন সাবমেরিন নিয়ে ভেসে উঠে একটা ডিঙি করে সশস্ত্র লোক ও সাবমেরিনের চিকিৎসককে নিয়ে আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন। আর কোনো প্রশ্ন?”

— সাবমেরিন থেকে বের হবার পর আমাদের কী কাজ স্যার?

— সবসময় চেষ্টা করবে যেন জলে বেশি চেউ না ওঠে। খুব তাড়াতাড়ি দশ ফুট নীচে নেমে গিয়ে যে যার জায়গা ঠিক করে নেবে।

— জলের তলায় ইঙ্গিত কী হবে স্যাব? যদি কারুর কাচের মুখোশ গড়বড় করে!

— বুড়ো আঙুল নীচের দিকে করলে “জরুরি ব্যাপার।” হাত ওপর দিকে তুললে “বড়ো মাছ”। বুড়ো আঙুল তোলা মানে “বুঝতে পেরেছি বা সাহায্য করতে এসেছি”। এবার হাসতে হাসতে ধললে — যদি কারুর পা দুটো ওপর দিকে উঠে গেছে তবে বুঝতে হবে সে শেষ হয়ে গেছে।

সবাই যে যার মতো করে হেসে উঠল।

লাউড স্পিকার জোরে বলে উঠল -- ডুবুরি বদল জলে বেরনোর দরজায় এসো। আবার বলছি ডুবুরি বদল বাইরে বের হবার দরজার সামনে এস। মি. বন্ড কি দয়া করে আক্রমণ কেন্দ্রে একবার আসবেন?

ইঞ্জিন থেমে গেল। অর্থাৎ ম্যান্টা সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপর বসে পড়ল। কেবল একটা ছোট্ট ঝাঁকুনি দিল।

॥ তেইশ ॥

একটা দমকা কম্প্রেশন্স এয়ার বন্ডকে এসকেপ হ্যাচ পেরিয়ে ওপরে তুলে দিল। এর অনেক ওপরে সমুদ্রের বুকে একটা রুপার থালার মতো দেখাচ্ছে। যে হাওয়াটা তাকে ওপরে ঠেলে দিয়েছিল, সেটা ওপরে উঠে বোমাব মতো ফাটল। তার কানে ব্যথা লাগল। ডিকম্প্রেশ করার জন্য সে দশফুট নীচে নেমে গিয়ে স্থির হল। নীচে ম্যান্টার কালো বীভৎস চেহারাটা দেখে তার বিপজ্জনক বলে মনে হল।

এবার এসকেপ হ্যাচ থেকে লিটারের দেহাণ ছিটকে বেরিয়ে এল। বন্ড সরে গিয়ে জলের ওপর ভেসে উঠল। দেখতে পেল নিশ্চরীপ ডিস্কো তার বাঁদিকে প্রায় মাইলখানেক দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাহাজটার কোনো কাজকর্মের লক্ষণ নেই। একমাইল দূরে ছোটো ছোটো চেউ-এর পাড় বসানো গ্র্যান্ড বাহামার দীর্ঘ উপকূল দেখা যাচ্ছে। দ্বীপের অনেক ওপরে রকেটের প্রাচীরের মাথাগুলো কঙ্কালের মতো দেখাচ্ছে। বিমানের জন্য ওয়ার্নিং ল্যাম্প দপদপ করে জ্বলছিল। দেখে বন্ড আবার দশফুট নীচে নেমে গিয়ে অন্য সবকিছুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

দশ মিনিট আগে পেডারসেনের যে উত্তেজনা ছিল তা কোথায় উবে গেল। বন্ড আক্রমণ কেন্দ্রে ঢুকতেই তিনি বলে উঠলেন — আপনি যা বলেছেন ঠিক তাই হয়েছে। ওরা দশ মিনিট আগে জাহাজ থামিয়েছে। আর Sonar-এ যে সব অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাচ্ছি তাতে আমার স্থির বিশ্বাস ওরা জলের তলার কামরাটা থেকে বের হচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা না গেলেও আন্দাজ ঠিক আছে। এবার আপনারা রওনা হয়ে পড়ুন। আর আপনারা বেরিয়ে গেলে আমি একটা সারফেস অ্যান্টেনা ভাসিয়ে

নৌবাহিনীকে একটা বার্তা পাঠিয়ে দেব। আর মিসাইল স্টেশনকেও জানাব যাতে ওরা লোক সরিয়ে নিতে পারে।

এরপর কুড়ি ফুট নীচে দাঁড়িয়ে দুটো টিউবে টর্পেডো ভরে তৈরি থাকব আর পেরিস্কোপে নজর রাখব। ফালৌ-কে আমি আর একটা ফ্ল্যাগ দিয়েছি। আমাদের দল বিপদে পড়লে সে সেটা ফাটাবে। অবশ্য তার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবুও কোনোরকম ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। দ্বিতীয় ফ্ল্যাগের আলো দেখতে পেলেই আমি সোজা ডিস্কোকে আক্রমণ করব। আমার চার ইঞ্চি কামান দেগে জাহাজটাকে জ্বলম্ব করে দেব আর দখল নেব। তারপর বোমাদুটো উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত কড়া হাতে কাজ করে যাব।” ক্যাপ্টেন উত্তেজনায় তার মাথার চুলের মধ্যে হাত চালাতে লাগলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে বললেন— আপনাদের যাত্রা শুভ হোক। আপনাদের বেরিয়ে পড়ুন। ভগবান আপনাদের সহায় হোন। আশা করি আমার লোকেরা এই জাহাজের সম্মান বজায় রাখবে।

বন্ডের কাছে লিটারের টোকা পড়ল। সে পেছন দিকে চেয়ে দেখল দলের লোকেরা ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের পায়ের পাখনা আর হাত আস্ত্রে আস্ত্রে নড়ছে। বন্ড মাথা নেড়ে সঁাতরাতে শুরু করল সামনের দিকে। একটা হাত পাশে আর একহাত দিয়ে বর্শাটা বুকের কাছে ধরা। তার পেছনের সকলে ত্রিভুজের মতো চলতে শুরু করলে মনে হতে লাগল একটা বিরাট মাছ শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে।

সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখার জন্য বন্ড পেছন দিকে তাকাল। নাঃ সব ঠিক আছে। এগারোটা মুখোশ চকচক করছে। পেছনে পাখনার ঝটপট আওয়াজ। চাঁদের আলো বর্শার ফলকের ওপর পড়ে বলসে উঠছে। বন্ড ভাবছে একবার যদি শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। পর মুহূর্তে তার বুক কেঁপে উঠল। যদি মেয়েটা শত্রুপক্ষের ডুবুরিদলে থাকে — তারা মুখোমুখি হয় তবে কি সে বর্শা চালাতে পারবে? না-না-মেয়েটা জাহাজে নিশ্চয়ই নিরাপদে রয়েছে। কাজ শেষে তার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

সামনে কয়েকটা প্রবালের চাঙড় দেখে বন্ড সাবধান হয়ে তার গতি কমিয়ে দিল যাতে লিটার আর ফালৌ তার পাখনায় ধাক্কা খায়। বন্ড হাত তুলে সবাইকে আস্ত্রে চলতে নির্দেশ দিল। ধীরে সে সামনের দিকে এগোচ্ছে। তার দিকচিহ্ন একটা পাথরের চূড়োর রূপোলি ঢেউ ভাঙার দিকে লক্ষ রেখে। ওই তো সে রাস্তা থেকে কুড়ি ফুট সরে এসেছে। বন্ড পাথরটার দিকে ঘুরে সবাইকে থামার নির্দেশ দিল। তারপর পাথরটার আড়াল থেকে আস্ত্রে আস্ত্রে ওপর দিকে উঠতে লাগল খুব সাবধানে। ঢেউগুলোর ওপরে মাথা তুলল। হ্যাঁ ডিস্কোটা সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বন্ড চারদিকে সাবধানে চোখ বুলিয়ে নিল।

বন্ড এবার চূড়োর অন্যদিকে ঘুরে তার দিকে ভালোভাবে দেখে নিল। কোথাও কিছু নেই। শুধু অগভীর জলের ঢেউ ভাঙা আর পাঁচ ছ’শ গজ দূরে তীরভূমি। কোনোরকম অস্বাভাবিক ঢেউ বা অন্য কিছু দেখা যায় কিনা বন্ড পাতিপাতি করে খুঁজে দেখছে। ও কি ওটা কি তার থেকে একশো গজ দূরে একটা কাচের মুখোশওলা সাদা মুখ উঠে চারদিক দেখে সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিল।

বন্ড উত্তেজিত। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বুকের মধ্যে হাতুড়ি ডি ঘা পড়ছে। তাড়াতাড়ি ডুব দিয়ে তার দলের কাছে গেল। তারা তার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। সে তার বুড়া আঙুল ওপর দিকে দু-তিনবার তুলল। তারপর লক্ষ করল কাচের মুখোশের মধ্যে সকলের হাসিমুখ। বন্ড তার বর্শাটাকে তুলে ধরে আক্রমণের ভঙ্গিমায় সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

উঁচু নীচু প্রবালের স্থূপের ভেতর দিয়ে ঠিকমতো পরিচালনা করতে হবে। মাছের ঝাঁক তাদের দেখে ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়েছে। বারোটা ছুটন্ত শরীর এগিয়ে চলেছে। পঞ্চাশগজ সরার পর বন্ড সবাইকে আক্রমণের সংকেত দিল সান্নি বাঁধতে। শুঁড়ি মেরে এগোতে লাগল। জলের ভেতর খুব কষ্ট করে সামনের দিকে দেখতে চেষ্টা করলে বন্ড। হঠাৎ সামনে একটা সাদা চামড়ার বলক দেখা

গেল। তারপর্ব মারো, মারো। বন্ড তার হাত দিতে আক্রমণ করার নির্দেশ দিল। সকলে বর্শা নিয়ে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বন্ডের দল শত্রুপক্ষের একপাশ থেকে আক্রমণ করল। পরক্ষণেই বুঝল ভুল হয়েছে। শ্রেত সঞ্জের ডুবুবি দল সামনের দিকে এগোচ্ছে। বন্ড আবিষ্কার করলে তাদের সাঁতারের গতিবেগ বাড়ার কারণ, তাদের প্রত্যেকের পিঠে জোড়া অক্সিজেন সিলিন্ডারের সঙ্গে বাঁধা ঘনীভূত হওয়ার স্পিড প্যাক। এর হাওয়ায় প্রত্যেকের পিঠে-বাঁধা প্রপেলার বনবন করে ঘুরছে। তাতে তাদের সাঁতারের গতি বাড়ছে। কিন্তু এখন তাদের বৈদ্যুতিক রথের সাহায্যে একটা স্লোডকে প্রবালের ফাঁক দিয়ে সাবধানে টেনে আনছে। তাতে তাদের গতি বন্ডের দলের গতির চেয়ে মাত্র এক গজ বেশি। প্রত্যেকের কাছে গ্যাসবন্দুক রয়েছে। বাড়তি হিসেবে পায়ের সঙ্গে বাঁধা বর্শা। ওরা সংখ্যায়ও তাদের চেয়ে বেশি। বন্ড বারো পর্যন্ত গুনে শেষ করল। সে ভাবল ওরা জানবার আগেই তাদের আমাদের বর্শার আওতার মধ্যে আনতে হবে।

আর মাত্র ত্রিশ গজ বাকি। তার এক হাতের মধ্যে দলের ছজন লোক রয়েছে। সবাই একেবেঁকে তার পেছনে পেছনে আসছে। লাগের লোকের দৃষ্টি এখনো সামনের দিকে। তারা জানতে পারেনি যে কতগুলো কালো দেহ তাদের অনুসরণ করছে। হঠাৎ চাঁদের আলোয় বন্ডের দেহের ছায়া বালির ওপর পড়তেই তারা সকলে পাশ ফিরে তাকে দেখতে লাগল। আর বন্ড সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবালের স্তুপে পা দিয়ে জোরে ধাক্কা মেরে তীব্রবেগে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সামনের লোককে আশ্চর্যকর কোনো সুযোগ না দিয়ে তার বর্শাটা লোকটার শরীরের একপাশে ঢুকে গেল। সে তার পাশের লোকের ওপর পড়ে গেল। বন্ড এলোপাথাড়ি বর্শা চালাতে লাগল। বন্দুক ফেলে সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। এবার শত্রুদের অর্ধনয় দেহগুলো জেট প্যাকের গতি বাড়িয়ে দিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। বন্ড তাদের ওপর আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। আরেকটা লোক হঠাৎ তার সামনে দুহাতে মুখ ঢেকে হুড়মুড় করে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। বন্ডের বর্শার আঘাতে তার কাচের মুখোশ ভেঙে গেছে। তার একটা লাথি বন্ডের মুখে লাগল।

কোথা থেকে একটা বন্ড বন্ডের পেটের ওপর রবারের স্যুট ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। বন্ড বুঝতে পারছে না সেটা রক্ত না সমুদ্রের জল। তার পরেই একটা বন্দুকের কুঁদোর আঘাত তার মাথায় লাগল। জলের ভেতর বলে আঘাতটা জোরে লাগল না। সে মাথায় ব্যথা অনুভব করায় একটা প্রবালের পাথরের চাঙড় ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল তার দলের লোকের কালো বন্যার জলের মতো ভেসে এগিয়ে গেল। যুদ্ধ লেগেছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ। কেবল চোখের সামনে জল লাল হয়ে যাচ্ছে। রক্ত আর রক্ত।

প্রবালঘেরা অনেকটা পরিষ্কার জলের মধ্যে লড়াই চলছে। বন্ড দেখতে পেল একপাশে স্লোডটা নামিয়ে রাখা হয়েছে। তার ওপর রয়েছে রবারে-ঢাকা একটা ভারী জিনিস। তার সামনে টর্পেডোর মতো রথটা আর আর একদল লোক। তাদের মধ্যে একজনের চেহারা দৈত্যাকার। নিশ্চয়ই লাগের। বন্ড প্রবাল স্তুপের আড়াল দিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওকি একটা কালো বেঁটে মতো লোক বন্দুক নিয়ে তাক করছে লিটারের দিকে। লিটার তখন একটা লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সেই লোকটা লিটারের গলা চেপে ধরেছে। লিটার তার হুক দিয়ে তার পিঠটা চিরে দিয়েছে।

বন্ড পাখনার সাহায্যে খানিকটা এগিয়ে ছুঁফুট দূর থেকে বর্শা ছুঁড়ল। বন্দুক ছোঁড়বার আগেই তার হাতে বর্শাটা বিঁধে গেল। বন্দুক থেকে বেরোনো বন্ডমটা লিটার -এর অনেক দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সে তড়িৎগতিতে ঘুরে বন্দুকের বাড়ি বন্ডকে মারল। বন্ড দেখল তার বর্শাটা ওপরের দিকে ভেসে যাচ্ছে। মাথায় বন্দুকের আঘাত লাগায় খেপে গিয়ে কোনো রকমে সেই লোকটার মুখের

কাচের মুখোশটা টেনে খুলে দিল। ব্যাস এতেই যথেষ্ট। সে লোনা জলে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরের দিকে উঠতে লাগল হাওয়ার জন্যে।

বন্ডের হাতে হঠাৎ খোঁচা খেয়ে দেখল লিটার। সে এক হাতে অক্সিজেনের টিউব ধরে তাকে ইস্তিত করছে। যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত। সঙ্গে সঙ্গে বন্ড তার কোমর ধরে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। পনেরো ফুট ওপরে উঠে লিটার চটপট মুখ থেকে ভাঙা টিউবটা খুলে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিল। তারপর খেপে বন্ডকে চলে যেতে বলল। বন্ড ডুব দিল।

এবারে বন্ড প্রবালের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নীচে নামতে লাগল। দেখল সর্বত্র যুদ্ধ চলছে। দুজনে দুজনে। সে লাগার্নোর খোঁজে চলেছে। সে দেখল তার দলের একটি যুবক মুখ নীচের দিকে করে পড়ে রয়েছে, তার মুখে অক্সিজেন মুখোশ নেই। সে মৃত। বীভৎসভাবে পড়ে রয়েছে। প্রবালে পাহাড়ের পাশে পড়ে রয়েছে সিলিভার। কালো রবারের টুকরো একটা গোটা অ্যাকোয়াল্যাং। আর গ্যাস বন্দুকের অনেকগুলো বল্লম। বন্ড তার থেকে দুটো তুলে নিল। সেই স্লেডটাকে পাহারা দিচ্ছে দুটো লোক। কিন্তু লাগার্নোর পাস্তা নেই।

বন্ড কুয়াশার মতো জলের ভেতর দিয়ে চারপাশ দেখার চেষ্টা করছে। চাঁদের আলো খুবই কম পড়ছে। যুদ্ধরত ডুবুরিদের পায়ের আঘাতে বালির ওপর গর্ত হয়ে যাচ্ছে। আবার পা উঠে গেলেই সেখানে মাছের বাঁক এসে হাজির হচ্ছে। বারোটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ হচ্ছে। বন্ড যুদ্ধের গতি ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। সমুদ্রের ওপরে কী হচ্ছে। লিটারকে ওপরে নিয়ে যাওয়ার সময় বন্ড দেখেছে ফালোর দ্বিতীয় ফ্লোরের আলোয় লাল হয়ে গেছে। মান্টা থেকে ডিভিটা কখন আসবে? সে কি এখন বোমাটার ওপর নজর রাখবে?

তাকে সঙ্গে সঙ্গে তার সিদ্ধান্ত পালটাতে হল। সে দেখল চকচকে টর্পেডোর ওপূর লাগার্নো বসে রয়েছে। তাঁর বাঁহাতে মান্টার তৈরি দুটো বর্শা। ডানহাতে জয়স্টিক ধরে রথ পরিচালনা করছে। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে দুজন প্রহরী স্লেডটাকে ধরে রথের সঙ্গে জুড়ে দিতে এগিয়ে এল তাদের হাতের বন্দুক ফেলে দিয়ে। লাগার্নো গতি কমিয়ে তাদের সামনে এসে থামলেন। একজন প্রহরী হাল ধরে স্লেডের কাছে আনতে লাগল।

এবার বুঝতে বাকি রইল না যে ওরা পালাবার চেষ্টা করছে। লাগার্নো রথের সাহায্যে বোমাটাকে টেনে প্রবালের গহুরে ফেলে দেবেন। 'ডিস্কো'র ওপরে রাখা বোমাটার গতিও তাই হবে। এই ভাবে তিনি সব প্রমাণ লোপাট করে দেবেন। তারপর নাসাউ ফিরে প্রচার করবেন একজন যুক্তরাষ্ট্রের সাবমেরিনের নাবিক দ্বারা তাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁরা গ্যাসবন্দুক দিয়ে লড়াই করেছিলেন। কারণ তাঁদেরই প্রথমে আক্রমণ করা হয়। এইভাবে তাঁর গুণ্ডধনের মুখোশ ঠিক বজায় থাকবে।

লাগার্নো ব্যস্তভাবে চারধার দেখছেন। দুজন প্রহরী স্লেডটা জুড়তে ব্যস্ত। বন্ড তাদের ব্যবধানটা আন্দাজ করে একটা প্রবালের প্রাচীর পায়ের ধাক্কা মেরে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লাগার্নোও শেষ মুহূর্তে ঘুরে ডান হাতের বর্শা দিয়ে বন্ডের বর্শার আঘাত ঠেকালেন। বন্ড তখন মরিয়া হয়ে লাগার্নোর মুখের মুখোশ খুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। লাগার্নো দু'হাত দিয়ে তাকে ঠেকাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। দু'হাতের বর্শা ফেলে রথের জয়স্টিক টেনে ধরতেই সেটা সামনে দিকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে এগিয়ে চলল। প্রহরী দুজন ছিটকে পড়ল। সে ওপরের দিকে ছুটে চলেছে আর পিঠের ওপর দু'জনকে যুদ্ধরত লোক। বন্ডের বাঁ হাতের বর্শাটা লাগার্নোর পিঠের অক্সিজেন সিলিভারে লেগে ছিটকে পড়ে গেছে।

এই সময় মাথা ঠান্ডা করে যুদ্ধ করা অসম্ভব। তারা অন্ধের মতো একে অপরকে আঁচড়াতে লাগল। দুজনেই প্রাণপণে মাউথপিসটা কামড়ে ধরে রয়েছে। এটাই তাদের বাঁচার ভরসা। লাগার্নো তাঁর হাঁটু দিয়ে রথের সিটটা চেপে ধরে রয়েছেন আর বন্ড তাঁর গায়ের সাঁতারের সরঞ্জামগুলো ধরে ঝুলছে।

লার্গো তাঁর কনুই দিয়ে বন্ডের কাচের মুখোশের ওপর আঘাত করতে চেষ্টা করছে, আর বারে বারে মুখটা ঘুরিয়ে মাথা বা অন্য জায়গায় তার মার গুঁতো নিচ্ছে। একই সঙ্গে বন্ড তার অন্য হাতটা দিয়ে লার্গোর কিডনিতে অনবরত আঘাত করে যাচ্ছে। লার্গোর শরীরের অন্য অংশ তার নাগালের বাইরে।

প্রণালিটা যেখানে খোলা সাগরের সঙ্গে মিশেছে সেখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে রথটা ভেসে উঠল আর একে বেকে খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বন্ডের শরীরটা যেহেতু লার্গোর জামা ধরে ঝুলছে পেছন দিকে, তাই রথের সামনেটা বেশ খানিক ওপরের দিকে উঠে রয়েছে। বন্ডের শরীরের অর্ধেকটা এখনও জলের তলায় রয়েছে। এবার লার্গো কী করবেন সেটা আঁচ করে বন্ড তার জামা ছেড়ে দিয়ে রথের পেছনের দিকটা দু'পায়ে ধরে এগোতে লাগল যতক্ষণ না রথের হালটা তার পিঠে লাগছে।

বন্ড এবার তার দু'পায়ের ভেতর দিয়ে তার হাতটা গলিয়ে রথের হালটা ধরে ফেলল আর নিজেই পেছনের দিকে ছুঁড়ে দিল। তার মুখটা প্রপেলার থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। ব্লেন্ডের জল তারা মুখে লাগছে। তবুও সে হালটাকে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে নীচের দিকে টানতে লাগল। এবার সেটা খুলে যাবে বোধহয়। রথটাও আস্তে আস্তে খাড়া হয়ে উঠছে। বন্ড শেষ শক্তি দিয়ে ব্লেন্ডটাকে এক হ্যাঁচকা টানলে ফেলল। ব্যস রথ অকেজো হয়ে হঠাৎ ডানদিকে মোড় নিল। লার্গো টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিল। তার চোখ দুটো তখন কেবল বন্ডকেই খুঁজছে। রথটা তখন জলের ওপর কেবল চক্রর মেরে মেরে ঘুরছে।

যুদ্ধ করতে করতে বন্ড ভীষণ পরিশ্রান্ত। তার সব শক্তি বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে। তাকে এখন বেঁচে থাকতে হবে তাছাড়া উপায় নেই। হাল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় রথ অকেজো আর বোমাটাকে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই। কেবল চক্রর মারছে। বন্ড সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিল। এখনই তাকে প্রবালের প্রাচীরের আড়ালে লুকোতে হবে। নচেৎ তার মৃত্যু অবধারিত।

বেশ ধীরেসুস্থে লার্গো বন্ডকে অনুসরণ করতে লাগল। তাঁর শক্তি বিশেষ ক্ষয় হয়নি। বন্ড প্রবালের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। সামনে সাদা বালির একটা গলি সেটা কিছুদূর গিয়ে দুধারে চলে গেছে। বন্ড সেই গলির ভেতর ঢুকে পড়েছে। লার্গো গলির মধ্যে না ঢুকে ওপর দিয়ে চলতে লাগলেন। সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন। মাউথপিসের চারধার দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছেন। তিনি বুঝলেন বন্ড তার হাতের মুঠোয়। বন্ড তাঁর আড়ষ্ট আঙুলগুলো নেড়ে চেড়ে সাড় আনার চেষ্টা করছে। কী করে লার্গোর নাগালের বাইরে যাবে এই ভাবছে।

সরু গলিটা ক্রমশ চওড়া হয়ে এল। সামনে তিনকটা বালিঢাকা জায়গা। বন্ডের পেছন দিকে তাকাবার উপায় নেই। যে এখন ইঁদুরকলে ইঁদুরের মতো আটকে পড়েছে। কিন্তু তাকে মারতে হলে লার্গোকে ভেতরে ঢুকে আসতে হবে। বন্ড ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল বিশাল চেহারার লোকটা ওই ফাঁকা জায়গার দিকে এগিয়ে চলেছে। এবার একটা শীলমাছের মতো ডুব দিয়ে একেবারে বন্ডের সামনে এসে দাঁড়াল।

লার্গো ধীরে ধীরে প্রবাল প্রাচীর দুটোর মাঝখানের সরু গলি দিয়ে এগিয়ে আসছেন। তার হাত দুটো সামনে বাড়ানো। মাত্র দশ-হাত দূরে। তিনি হঠাৎ ডানহাত দিয়ে প্রবাল স্তূপের ওপর থেকে একটা বাচ্চা অক্টোপাসকে তুলে নিয়ে এগোতে লাগলেন। আর বন্ডও মাটি থেকে একটা পাথরের টুকরো তুলে নিল। তার কাচের মুখোশের ওপর অক্টোপাস ছাড়ার থেকে অনেক কাজ দেবে যদি ওই পাথরের টুকরো দিয়ে লার্গোর কাচের মুখোশটা ভেঙে দিতে পারে। অক্টোপাসকে সে ভয় পায় না। ভয় পায় লার্গোর দুটো হাতকে।

লার্গো এক পা এক পা করে এগোচ্ছেন, আর বন্ডও ধীরে ধীরে পেছন হটছে। সে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। লার্গো কিন্তু ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। আর একটু পরেই তিনি আক্রমণ করবেন।

হঠাৎ দেখা গেল লাগের পেছনে একটা সাদা পোশাকে লোক লাগের লোক সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে।

লাগেরো বন্ডের দিকে লাফ দিল।

বন্ডও সঙ্গে সঙ্গে পাথরের টুকরোটো নিয়ে লাগের তলপেট লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। লাগেরোও প্রস্তুত ছিল। তিনি হাঁটু দিয়ে বন্ডের মাথায় আঘাত করল। ডান হাত দিয়ে অস্ট্রোপাসটা বন্ডের মুখের ওপর ছেড়ে দিল। তারপর তার হাতদুটো বন্ডের গলা চেপে ধরে বাচ্চা ছেলের মতো তাকে টেনে শূন্যে তুললেন। দু'হাত প্রসারিত করে বন্ডকে ঝুলিয়ে রেখে সজোরে চাপ দিতে লাগলেন তার গলায়।

বন্ডের চোখে অঙ্ককার। সে অনুভব করছে অস্ট্রোপাসের সরু দাঁড়াগুলো তার মুখের ওপর ঝুলিয়ে মাউথপিসটাকে খুলে ফেলার চেষ্টা করছে। সমস্ত রক্ত তার মাথায় উঠছে। তার বোধহয় শেষ হয়ে এল।

বন্ড আসতে আসতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। কী করবে বুঝতে পারছে না। যন্ত্রণায় তার চোখ দুটো বুজে এল। বন্ড চোখ খুলে আলোর স্পর্শ পেল। অস্ট্রোপাসটা তার বুকের ওপর নেমে এসেছে। পরে তাকে ছেড়ে প্রবালের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

লাগেরো মাটিতে পড়ে আছে অসহায়ভাবে। পা ছুঁড়ছে। দেখা গেল তাঁর পেছন থেকে একটা বন্ডের অংশ সামনে গলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আর তার পেছনে সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে হাতে গ্যাসবন্দুক নিয়ে ডোমিনো।

বন্ড কোনো রকমে উঠে এক পা এগোল। কিন্তু পায়ে আর জোর নেই। চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ঝাঁপসা হয়ে এসেছে। প্রবালের ওপর ভেঙে পড়ল বন্ড। তার মুখের অক্সিজেন-টিউব আলগা হয়ে এল। মুখে জল ঢুকতে শুরু হয়েছে। কোনো রকমে চিৎকার করে বলল — “ও রকম হতে দিও না।”

তার একটা হাত চেপে ধরল। ডোমিনোর চোখ দুটো অন্য কোথায় ভেসে যাচ্ছে। মেয়েটা অসুস্থ। তার রবারের পোশাকের ফাঁকে ফাঁকে রক্তের ছোপ। ক্রমশ বন্ডের পা দুটো সরব হয়ে উঠল। সে-দুটো নড়তে শুরু করল। মেয়েটাকে ধরে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। মেয়েটার পা দুটোও নড়তে শুরু করেছে।

দেহ দুটো একসঙ্গে ওপরে উঠে এল। তারপর তারা উপুড় হয়ে ঢেউ-এর সঙ্গে ভাসতে লাগল। ভোরের হালকা আলো ক্রমশ ফুটে উঠছে। নতুন দিনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

॥ চব্বিশ ॥

বন্ডকে একটা অ্যান্টিসেপটিকের গঞ্জে-ভরা ঘরে ওষুধ খাইয়ে খানিকটা আচ্ছন্নের মতো করে রাখা হয়েছে। ফেলিস্স লিটার আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা ভেঙিয়ে তার বিছানার পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করল — এখন কী রকম মনে হচ্ছে?

— খারাপ নয়। তবে কীরকম বিম মারা লাগছে।

— যদিও ডাক্তার তোর সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করেছেন। তবুও আমি ভাবলাম। কিছু খবর আছে যা, তোর শোনা উচিত। শুনবি নাকি?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনব। — বন্ড মনস্থির করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার ওই মেয়েটার কথা ছাড়া আর কিছুই শুনতে বা ভাবতে ইচ্ছে করছিল না।

তাড়াতাড়ি বলে নিই বাবা। ডাক্তার রাউন্ডে বেরিয়েছেন, আমায় এখানে দেখতে পেলে গালাগাল দিয়ে আমার চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে দেবেন। দুটো বোমাই উদ্ধার করা হয়েছে। সেই পদার্থবিদ কোৎসে তাকে ধরার পর সে তার পেটে যা জমা ছিল সব হড়হড় করে বলে দিচ্ছে। এই প্রেতসঙ্ঘ হচ্ছে আসলে একটা ডাকাতে দল। SMERSH, মাফিয়া, গেস্টাপো ইত্যাদি সমস্ত দলের লোক

এদের মধ্যে আছে। এদের হেড অফিস প্যারিসে। কোৎসে বলেছে পাঁচ-ছ বছর ধরে এরা ব্যাংকে লক্ষ লক্ষ ডলার জমিয়েছে। এদের নেতা ব্রোফেন্ড। রেডিওতে লাগার্নের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে গা ঢাকা দিয়েছে। এটাই তাদের শেষ কাজ ছিল। আমাদের ধারণা ঠিকই ছিল যে, মিয়ামি ওদের দু-নম্বর টার্গেট ছিল?

খুব কষ্ট করে বন্ড হেসে বলল — তাহলে সবাই খুশি হয়েছে তো।

— খুব খুশি হয়েছে কেবল আমি ছাড়া। কারণ, আমার বেতারযন্ত্রটা আমার পিছু ছাড়েনি। সব সময় আমায় তার সামনে বসে তার সঙ্গে প্রেম করতে হচ্ছে। যা আমার আর ভালো লাগছে না। M-তোর জন্যে অনেকগুলো প্রেম সংকেত পাঠিয়েছে। জমা পড়ে আছে। ভগবানের অশেষ কৃপা, আজ সঙ্কেবেলায় CIA-এর সব হোমরাচোমরা কর্তব্যাক্তিরা এসে কাজের দায়িত্ব নিয়ে নেবে। তারপর দুই সরকারে গুঁতোগুঁতি করে ঠিক করবে প্রেত সঞ্জের মহাপুরুষদের কীভাবে সম্বর্ধনা দেবে। তোকে বোধহয় লর্ড বা ডিউক উপাধি দেবে। আমার জন্যে ওরা চেষ্টা চালাচ্ছে প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হবার জন্য। আর এসব গুলি মেরে আমরা দুজনে ছুটিতে আরাম করতে যাব। হ্যাঁরে মেয়েটাকে সঙ্গে নিবি তো?

সত্যি সত্যি ওই মেয়েটার একটা ভালো পুরস্কার পাওয়া উচিত। কী সাংঘাতিক দুঃসাহস মেয়েটার। ওর গাইগার কাউন্টার সমেত মেয়েটা ধরে ফেলেছে। তারপর তার ওপর কী সব সাম্রাজ্যিক অত্যাচার করেছে তবুও সে একটা কথাও প্রকাশ করেনি।” তারপর লিটার নিজের কানদুটোয় হাত দিয়ে বললে — “এই কান মুলছি। আর কোনো মেয়েকে ‘মাগি’ বলব না। আর ইটালিয়ান মেয়েকে তো নয়ই। কী আশ্চর্য জানিস ডুবুরির দল চলে গেলে তার বন্দুক আর অ্যাকোয়ালাং নিয়ে সে যে কী করে পোর্টহোল দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে লাগোকে খতম করল। আর তোর প্রাণ বাঁচাল। ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়।” হঠাৎ লিটার ছুটে দরজার কাছে গিয়ে দরজায় কান পেতে কী সব শুনে বললে — এইরে, ডাক্তার করিডোরে চুকেছেন — আমায় এখানে দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই। এইবেলা কেটে পড়ি। বলে দরজা খুলে সে সটকে পড়ল।

খুব কষ্ট করে জোর করে বন্ড লিটারকে ডাকল — কিন্তু ততক্ষণে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ড ক্রমশ অর্ধৈহ হয়ে পড়েছে। রাগ আর ভয় তাকে গ্রাস করেছে। সবাই সব কথা বলছে কিন্তু মেয়েটার কোনো খবর তাকে দিচ্ছে না। সে কোণায়? তার কী হয়েছে? তবে কি সে?

দরজা খুলে যেতেই সাদা কোট পরা লোকটাকে দেখে বন্ড সোজা উঠে বসে পড়ল। তারপর বেশ উদ্বেজিত ভাবে বলতে শুরু করল — আমায় শিগগির বলুন, মেয়েটার খবর কী?

ডাক্তার স্ট্রেন্জাল নাসাউ-এর শুধু একজন বড়ো ডাক্তারই নয় লোক হিসেবেও খুব ভালো। আজ সকালে তাঁর কাছে একটা সরকারি আদেশ এসেছে এবং সেটার গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। ডাক্তার তাঁর হাতে আসা রোগীদের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলেননি। ওই ষোলোজনের মধ্যে দশজন ওই সুন্দর ইয়াটার নাবিক আর ছ’জন ওই বিশাল সাবমেরিনের লোক। ইয়াটার মালিকও তার মধ্যে ছিল। তাদের শরীর ময়না-তদন্ত করতে হয়েছে, সে সম্বন্ধেও সব গোপন রাখতে হবে।

তিনি বেশ সাবধানতা অবলম্বন করে বললেন — মিস ভিতালি খুব শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠবেন। ওনার এখন সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।

— আর কী? তার শরীরে কী হয়েছে?

— তিনি অনেকটা সাঁতার কেটেছিলেন। যেটা করার ক্ষমতা তাঁর শরীরে ছিল না।

— কেন?

ডাক্তার সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন — আপনার ওপর খুব চাপ পড়েছে। আপনারও এখনও পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। ছ’ঘণ্টা অন্তর একটা করে ঘুমের

ট্যাবলেট খাবেন। অল্পদিনেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু আপাতত আপনাকে খুব শান্ত হয়ে থাকতে হবে মি. বন্ড।

বন্ড হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন -- খাট থেকে নেমে সোজা ডাক্তারের কাছে গিয়ে ঘুঁষি পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তার চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন, রুগিদের এরকম উত্তেজনা দেখা খুবই অভ্যাস আছে। তিনি জানেন যে, ঘুমের ওষুধটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

বন্ড চিৎকার করে উঠল -- শান্ত হব! জাহান্নমে যান আপনি। শান্ত হবার কী জানেন আপনি?" বন্ড এরকম কথা জীবনে কখন শোনেনি। শান্ত হওয়া!" আমায় বলুন মেয়েটার কী হয়েছে। তার ঘরের নম্বর কত? সে কোথায় আছে? বন্ডের দু-হাত অবশ হয়ে দুধারে ঝুলে পড়ল। দুর্বল গলায় বলল -- ভগবানের দোহাই, মেয়েটার খবর আমায় বলুন। আমার -- আমার জানা দরকার।"

বন্ডের উত্তেজনা দেখে ডাক্তার বেশ ধৈর্যের সঙ্গে শাস্তকণ্ঠ বললেন -- ডাক্তার স্ট্রেন্জেল আপনি চিন্তিত হবেন না। ভদ্রমহিলার ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে। তাঁর সর্বাস্ত্রে পোড়ার দাগ রয়েছে। খুব যত্নশীল আছেন তিনি। কিন্তু ইশারায় বললেন তাঁর ভেতরটা খুব সুস্থ আছে। তিনি আপনার পাশের ঘরে অর্থাৎ ৪ নম্বর ঘরে রয়েছেন। আপনি তাঁকে দেখতে পারেন তবে মাত্র মিনিটখানেকের জন্য। কারণ, আপনাদের দুজনেরই এখন প্রচুর বিশ্রামের প্রয়োজন। বলে ডাক্তার দরজাটা খুলে ধরলেন।

-- ডাক্তার, আপনাকে আমার অন্তরের অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। -- বন্ড টলতে টলতে কোনো রকমে ৪ নম্বর ঘরের দিকে গেল। সে ভাবছে তার পা দুটো তার সঙ্গে এত শত্রুতা করছে কেন? সে কোনো রকমে আস্তে আস্তে ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে খুব সাবধানে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। ডাক্তার করিডোর দিয়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগলেন। মেয়েটার এখন এটাই দরকার। একটু স্নেহ। একটু ভালোবাসা।

ছোট্ট একটা ঘর। জানলার খড়খড়ি দিয়ে সূর্যের আলো পড়েছে বিছানার ওপর ডোরা ডোরা। বন্ড কোনো রকমে টলতে টলতে সেই বিছানার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে তারা পাশে বসে পড়ল। একটা হাত কোনো রকমে বেরিয়ে তার চুলটা ধরে কাছে টেনে এনে অতি কষ্টের সঙ্গে বললে মেয়েটা -- তুমি কিন্তু এখানেই থাকবে। বুঝেছ? তুমি আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না।

বন্ডের কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে মেয়েটি বললে -- কি তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না জেমস? আমার কথা বুঝতে পেরেছ? সে অনুভব করতে লাগল বন্ডের শরীরটা ক্রমশ খসে পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটা তার চুলটা ছেড়ে দিতেই বন্ড ধূপ করে তার বিছানার পাশে কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। তারপরেই সে তার হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

মেয়েটা সেই কালো নিষ্ঠুর মুখটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। তারপর নিজের বালিশটাকে বিছানার ধারে ঘুমন্ত মানুষটার ঠিক ওপরে টেনে আনল। মাথা বাখল তার ওপর। যাতে যখন ইচ্ছে চোখ খুললেই যেন বন্ডের মুখটা, সুন্দর ভালোবাসাব মুখটা দেখতে পায়। তারপর সে চোখ বুজল।

গোল্ডফিসার

প্রথম পর্ব

॥ এক ॥

জেমস বন্ড এখন মায়ামি এয়াবপোর্টে ভিজিটরদের লাউঞ্জে বসে। এইমাত্র সে দ্বিতীয় পেগটিব শেষ চুমুকটা দিল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে নাকের নীচ থেকে দুই ঠোঁটের ওপব হাত বুলিয়ে একবার চারদিকটা দেখে নিল। প্লাসটা টেবিলে রেখে সে ভাবতে শুরু করল, যে পেশায় সে নেমেছে, সেখানে কার্যসিদ্ধি এবং নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কোনো মানুষকে প্রাণে মেরে ফেলতেই হয়। এই মানুষ-খুন নিয়ে মনে কোনো অনুতাপ বা অনুশোচনা পুষে রাখলে চলবে না। সে ব্রিটিশ গুপ্তচর বাহিনীর এজেন্ট। তার সাংকেতিক পরিচয় ০০৭। সুতরাং তাকে এ-জাতীয় কাজে আবেগ বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

বন্ড এবার একটা সিগারেট ধরায়।

ধোঁয়া ছেড়ে সে ভাবতে থাকে, ‘কাপুস্কো’ দলভুক্ত একজনকে সে কিছতেই মন থেকে সরাতে পারছে না। মেক্সিকোয় যারা ঘণ্য, অবলীলাক্রমে মানুষ খুন করতে পারে, তাদেরকে বলা হল ‘কাপুস্কো’।

এইরকমই একজন ‘কাপুস্কো’ গোষ্ঠীভুক্ত মেক্সিকান -এর কথা তার মনে এল, যাকে সে খুন করতে বাধ্য হয়েছে এবং যে বহু মানুষের অভিষাপ কুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত বন্ডেরই হাতে খুন হল। বোধহয় হাইতি দ্বীপের আদিবাসীদের শ্রাবাদের মতো তার শেষ নিশ্বাসটুকু অনেক যত্নগা সহ্য করে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ আগেও যে ছিল জীবন্তদেহ, এখন সে শুধু একটা মৃতদেহ মাত্র। বেঁচে থাকতে গেলে যা যা পরিচয় প্রয়োজন -- নাম, ঠিকানা, বয়স, পেশা— সবই তার ছিল। এখন তার মৃতদেহটা এই চলমান পৃথিবীর অতিবিক্ত বোঝা। এক নোংরা, দুর্গন্ধময় বস্তু। কোনোকিছুর মূল্যেই সে আর মেক্সিকান হয়ে ফিরে আসবে না।

এই ডান হাত দিয়েই সে মেক্সিকান খুনেটাকে শেষ করে দিয়ে এসেছে। হাতটা ফুলে আছে এখনও। মাঝে মাঝে বেশ ব্যথাও করছে। মেক্সিকো থেকে প্লেনে করে পালিয়ে আসবার সময়ও প্লেনে বসে সমানে চোট পাওয়া জায়গাটায় মালিশ করে গেছে সে।

ষোষকের গলা শোনা গেল লাউডস্পিকারে -- ন্যাশনাল এয়ারলাইনস্ জানাচ্ছে যে, নিউ ইয়র্কের ‘লা গার্ডিয়া’ এয়ারপোর্টগামী প্লেন NA-১০৬ পনেরো মিনিট বাদেই ছাড়বে। যাত্রীদের সাত নম্বর গেটে চলে যাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বন্ড একজন ওয়েট্রেসকে ডেকে আরেক পেগ অর্ডার দিল।

মেক্সিকানটির মৃত্যুর ঘটনাটা এইবকম: মেক্সিকোর জনৈক ধনী ব্যক্তির ‘পপি’ ফুলের খেত ছিল। এই পপি ফুল থেকে তৈরি হত আফিং। ঘর সাজানোর কাজে এই ফুল বিক্রি কবা হত না। এই আফিং পাঠানো হত মেক্সিকো সিটির এক অনামি রেস্টোরাঁয়— ‘মাদ্রে দ্য ক্যাকাও’ রেস্টোরাঁয় ঢুকে যাবা মদেব সঙ্গে এই আফিং এর অর্ডার দিত, তাদেরকে আফিং বাবদ পয়সা দিতে হত বিলের পিছনে।

রাষ্ট্রসংঘ হঠাৎ মাদক দ্রব্যের চোরাচালানের বিরুদ্ধে ব্যাপক ব্যবস্থা নিলে মেক্সিকানদের চিন্তার ব্যাপার হয়ে গেল। সুদূর ইংল্যান্ডেও হেরোইন বিক্রি নিষিদ্ধ হল সরকারিভাবে। চিন, তুরস্ক, ইতালি থেকেও প্রচুর হেরোইন চোরাপথে এসে জমা হত ইংল্যান্ডে।

যন্ত্রণানাশক হিসেবে হেরোইনের প্রয়োজন হত ডাক্তারদের কাছে। অসুবিধায় পড়ে গেল ডাক্তাররা।

মেক্সিকো সিটিতে ব্ল্যাকওয়েল নামে জনৈক সজ্জন ভদ্রলোক আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করতেন। তিনি যখন শুনলেন যে, তার লন্ডনবাসী বোন হেরোইন না পেলে বাঁচবে না, তখন মি. ব্ল্যাকওয়েল তার বোনের কষ্টটা বুঝতে পেরেও হেরোইনের খবর সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। খবর সংগ্রহ করতে করতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন সেই রেস্টোরাঁয়— মাদ্রে দ্য ক্যাকাও। এখানে থেকে নিজ বুদ্ধিবলে পপি খেতের মালিকের কাছে।

সার ব্যবসায়ী ব্ল্যাকওয়েলের কাছে পকেট ভর্তি করবার এক নতুন রাস্তা খুলে গেল। নেশাখোররাও বাঁচবে, তারও দুহাতে পয়সা আসবে। ব্ল্যাকওয়েলের সারের গুদামে তিনজন কর্মচারী ছিল। তিনি মেক্সিকোর বড়ো কর্তাটিকে বললেন, সারের ব্যবসার পিছনে এই মাদকদ্রব্যের ব্যবসাটি বেশ জমিয়ে চলবে। ওই বড়ো কর্তাটিই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। মেক্সিকান সরকারের একজন কূটনৈতিক কর্মী প্রতিমাসে একবার করে লন্ডনে যাওয়ার সময় যে অতিরিক্ত ব্রিফকেসটা নিয়ে যাবে, তার দরুন সে পাবে এক হাজার পাউন্ড। যদিও মালের আসল মূল্য কুড়ি হাজার পাউন্ড। ব্রিফকেসটি গ্রহণ করত শোয়াব নামে এক ব্যক্তি।

চরিত্রের দিক দিয়ে শোয়াব ছিল আরও বদমাইশ। সে বুঝে গেছিল, আমেরিকার নেশাখোর ছেলেমেয়েদের পক্ষে মাত্রার অতিরিক্ত হেরোইন সেবন করা কোনোক্রমে ব্যয়সাধ্য ব্যাপার না। এর পিছনে তারা কোটি কোটি টাকা খরচা করতেও পিছপা নয়। তাই হেরোইনের সঙ্গে 'স্টমাক পাউন্ডার' মিশিয়ে তাদের চরম উন্মাদনা ও নেশার দিকে ঠেলে দিল।

এইসব 'আন্ডারগ্রাউন্ড' অপরাধীদের ধরবার জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চৌখস গোয়েন্দা দলটির নাম হল 'ঘোস্ট স্কোয়াড' বা প্রেত বাহিনী। বহু যুবক-যুবতির চরম সর্বনাশের শিরোমণি শোয়াবকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পেল ঠিকই, কিন্তু তাকে তার মূল ঘাঁটিসুদ্ধ ধরার জন্য হন্যে হয়ে রইল। একটি বিদেশি রাষ্ট্র এ ব্যাপারটায় বিশেষভাবে জড়িত দেখে তারা এগোতে দ্বিধাবোধ করছিল। অতএব ব্রিটিশ গুপ্তচর বাহিনী এবং তার সাথে অবশ্যই জেমস বন্ড। বন্ডকে শেষ করে দিতে হবে মূল ঘাঁটিসুদ্ধ সবাইকে।

সব জেনে নিয়ে বন্ড প্লেনে করে পাড়ি দিল মেক্সিকো সিটিতে। মাদ্রে দ্য ক্যাকাও, মেক্সিকান বডোকর্তা এবং অবশেষে ব্ল্যাকওয়েল। বন্ড হেরোইন কিনে ব্যবসা করতে চায়। ব্ল্যাকওয়েলের সাথে কথা বলে বুঝল, সে পেশাদার স্মাগলার নয়। তাকে ব্ল্যাকওয়েল বলেই ফেলল, ইংল্যান্ডে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ হওয়াতে সে খুশি। তার বোনের কথা চেপে গেল।

কয়েকদিন বাদে গভীর রাতে বন্ড একা ব্ল্যাকওয়েলের গুদামে 'থিমিটি' বোমা লাগিয়ে দিয়ে এক কিলোমিটার দূরে একটা পানশালায় গিয়ে শান্ত ছেলের মতো ড্রিংকস-এর অর্ডার দিল। ব্ল্যাকওয়েলের গুদামে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল।

বন্ড বেরিয়ে এসে দেখল আগুনের লেলিহান শিখা। ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স সেদিকে ছুটে যাচ্ছে।

পরের দিন সকালে ব্ল্যাকওয়েলের ফোন বেজে উঠল।

এ প্রান্তে রিসিভারে রুমাল চাপা দিয়ে বন্দ কথা বলছে।

— হ্যালো।

— হ্যালো। গত রাতে তোমার গুদামে আগুন লেগেছিল। যদি ইনশিওর করা না থাকে তবে আমি দুঃখিত।

— হু আর ইউ?

— ধরে নাও আমার বাড়ি ইংল্যান্ডে। শোন মি. ব্ল্যাকওয়েল, তোমার হেরোইনের কারবারের ফলে অনেক যুবক-যুবতি শেষ হয়ে গেছে। তোমার পরিচিত স্যান্টোস আর কুটনৈতিক বার্তা বহন করবে না। শোয়াব বোধহয় এতক্ষণে পুলিশের হাতে। তোমার কাছে বন্দ নামে যে লোকটা গিয়েছিল, তাকেও পুলিশ শিগগিরই ধরবে। শোনো, এবারকার মতো তুমি পার পেয়ে গেলে। কিন্তু ভবিষ্যতে হেরোইন নিয়ে আর এগিও না। তাহলে তুমি শেষ হয়ে যাবে চিরতরে।

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে বন্দ অনুমান করতে পারল ব্ল্যাকওয়েলের মুখটা নিশ্চই এতক্ষণে ব্ল্যাক হয়ে উঠেছে। তবে ব্ল্যাকওয়েল ততটা মারাত্মক নয়।

তবুও সাবধান হবার জন্য সে অন্য হোটেলে উঠল গিয়ে।

একটা রেস্তোরাঁ থেকে ড্রিংক করে বন্দ হোটেলে ফিরবার পথে একটি লোক তার সামনে এসে দাঁড়াল। গায়ে নোংরা জামা, মাথায় বিরাট টুপি, মুখে সিগারেট, চোখ বলছে গাঁজাখোর।

লোকটি বলে— মেয়ে লাগবে স্যার? খাসা মাল আছে। ফর্সা, শ্যামলা—

— না, আমার দরকার নেই। —বন্দ ব'লে এগিয়ে যেতে থাকে।

লোকটি এগিয়ে এসে বলে— তাহলে একবার ছবি দেখুন।

ব'লে মুহূর্তের মধ্যে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা চকচকে ছোরা বার করে সে বন্দের গলার কাছে নিয়ে আসবার আগেই বন্দ বিদ্যুৎগতিতে লোকটির চিবুকের নীচে বাঁ হাত দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। এবং পরবর্তী আঘাত— বন্দ তার ডান হাতের চেটোর পাশ দিয়ে মারণ আঘাত হানল— যা সেনাবাহিনীর কম্যান্ডেরা সরাসরি হাতাহাতি যুদ্ধে প্রয়োগ করে। দু'পাক খেয়ে আর সে সামলাতে পারে নি নিজে।

বন্দ হাঁফাতে হাঁফাতে লোকটি পাশে বসে নাড়ি দেখল। না, সে আর নেই ইহজগতে। এইমাত্র বন্দ তাকে এক বিশেষ কায়দায় অন্যত্র পাঠিয়ে দিল, যেখান থেকে সে আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না। নোংরা জামা পরা এই ভাড়াটে গুণ্ডা এখন রাস্তার ধারে আবর্জনার মতোই পড়ে থাকবে।

বন্দ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল। না, কেউ নেই। শুধু কয়েকটা গাড়ি চলে গেল তীব্র গতি তুলে। লোকটির প্রাণহীন দেহটাকে তুলে টেনে নিয়ে সামনেই একটা পাঁচিলের গায়ে বসিয়ে দিল। জায়গাটা আরও অন্ধকার। এরপর নিজের জামাকাপড় ঠিকঠাক করে নিল। গলার টাইটা পর্যন্ত।

পরদিন ভোরবেলা উঠে খুব দ্রুত রেডি হয়ে নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে প্রথম প্লেন ধরে মেক্সিকোর সীমানা ছাড়িয়ে ক্যারাকাস। তারপর ক্যারাকাস থেকে ট্রান্স আমেরিকান কমন্টেলেশন প্লেনে মায়ামি। এবং এই একই প্লেনে আজ রাতে সে পৌঁছাবে নিউইয়র্ক।

বন্দ ঘড়ির দিকে তাকায়।

দশ মিনিট পার হয়ে গেছে। প্লেগের শেষ চুমুকটুকু মেরে বন্দ যেই উঠতে যাবে, তখনি লাউডস্পিকারে ঘোষকের কণ্ঠস্বর জানাচ্ছে : যাত্রীসকল দয়া করে শুনবেন, দুঃখের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ট্রান্স আমেরিকান কোম্পানির ৬১৪ নম্বর ফ্লাইট আজকের

পরিবর্তে আগামীকাল সকাল ৮টায় ছাড়বে। যাত্রীরা দয়া করে সবাই টিকিট কাউন্টারে এসে যোগাযোগ করুন। আপনাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করেছেন। দয়া করে শুনবেন.....

তাহলে? বন্দ চিন্তা করতে থাকে, কী করবে সে? অন্য প্লেন ধরে যাবে নাকি— না। আজ রাতটা সে মায়ামিতেই থাকবে। অনেকেদিন সে প্রাণভরে মদ খায় নি। কিন্তু আজ সে থাকবে। চূড়ান্ত মাতাল হবে। যখন সুযোগ পাওয়া গেছে। সব চিন্তাকে দূরে সরিয়ে সে আজ মদ খেয়ে রাত্রিটা উপভোগ করবে। আঃ, যদি সঙ্গে—

বন্দ ইশারায় একজন ওয়েট্রেসকে ডেকে বরফ দেওয়া বুরবৌর একটা পেগ অর্ডার দেয়। একী! ওই মেক্সিকানটার কথা আবার মাথায় আসছে কেন? আরে, ওকে না মারলে তো সে নিজেই শেষ হয়ে যেত। যে লোকটা খনি থেকে ইউরেনিয়াম ঝুঁড়ে বার করছে, তার থেকে খনির মালিক, অংশীদার, এবং এই ইউরেনিয়াম দিয়ে যাদের দ্বারা হাইড্রোজেন বোম তৈরি হচ্ছে, সবাই কী আরেকটা মৃত্যুর সাথে জড়িত নয়? যে লোকটা গাড়ি চাপা দিচ্ছে? তবে, বন্দ তো এক্ষেত্রে কোনোমতেই দোষী হতে পারে না। সে তো শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য—

নাঃ! অতীতের নোংরা নিয়ে বেশি চিন্তা না করাই ভালো। তার চেয়ে এই মারপিট, খুনোখুনি থেকে দূরে সরে এক শান্ত, সুন্দর, সাধারণ জীবনযাপন করতে হবে। বেশ ঝলমলে উপভোগ্য—
গট মট গট মট.....

বন্দ মাথা নীচু করে ছিল। হাতে তার গ্লাস ধরা। পায়ের শব্দে ধীরে ধীরে সে মুখ তুলল। অবশ্যই সতর্ক।

এক অভিজাত্যপূর্ণ শ্রৌঢ় এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। মুখে বিষন্নতার ছাপ।

ভদ্রলোক বলেন— মাফ করবেন। আশা করি, আপনিই মি. মি. জেমস বন্দ।

বন্দ হালকাভাবে ঘাড় নাড়ল। মনে হল, ভদ্রলোক ঠিক খুশি নন।

॥ দুই ॥

মাথা নাড়ল বটে বন্দ কিন্তু নিজেকে সতর্ক করে নিয়ে সে শ্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোক হঠাৎ সামান্য হেসে তাঁর ডান হাতটা বন্ডের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন— হ্যালো, আই অ্যাম ডু পন্ট। আপনার সাথে কিন্তু আমার আগেও দেখা হয়েছে।

খলখলে নরম হাতটার সঙ্গে করমর্দন করে বন্দ বলে— বসুন। — কিন্তু কোথায় দেখা হয়েছে এই লোকটির সঙ্গে? তবে আমেরিকাতে নয়। বন্দ লক্ষ করল, ভদ্রলোক ঘামছেন। তবে এই ভদ্রলোকের চেহারা মধ্য পয়সার ছাপ প্রবল। ধনী আমেরিকাবাসী।

ভদ্রলোক পকেট থেকে সিগারেট বার করে বন্ডের দিকে এগিয়ে দিল — প্লিজ।

— থ্যাঙ্কস। — বলে বন্দ তার লাইটার জ্বালিয়েই সিগারেট ধরাল। যদিও ভদ্রলোক তাঁর 'জিপো' লাইটার বার করেছিলেন। কিন্তু অপরপক্ষের লাইটার জ্বলে দেওয়া একেবারে সহ্য করতে পারে না সে।

ডু পন্ট এবার সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন— ক্যাসিনো রয়্যাল?

বলে ডু পন্ট চুপ করলেন। বন্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন, বন্দ এখনো কিছু সঠিকভাবে মনে করতে পারছে না।

ডু পন্ট আবার সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন— তাহলে বলি। ১৯৫১ সালে হোটেল রয়েল লে উন্স, ফ্রান্স— সেখানে দেখা হয়েছিল আমাদের। আমি আর আমার স্ত্রী ইথেল সেই রাতে হোটেলে তাসের জুয়োর টেবিলে ছিলাম।

দমকা বাতাসের মতো অতীত নাড়া দেয় বন্ডকে। ইয়েস, বন্ড ছিল ৬ নম্বর চেয়ারে আর এই স্বামী স্ত্রী-রা ছিলেন ৪৩৫ নম্বরে। সেই রাতে সে ঝানু ফরাসি গুপ্তচর লে শিফরেকে একেবারে ভিখারি কবে ছেড়েছিল। জুয়ার আসরের একটা ভ্যাপসা বিশ্রী গন্ধ তাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল।

বন্ড বলে— এক্সট্রিমলি স্যরি! আসলে সেই রাতে তাস ছাড়া আমার আর অন্য কোনোদিকে মন ছিল না।

— আরে ঠিক আছে, ঠিক আছে। সে তো স্বাভাবিক। তবে আপনি সে রাতে যে খেল দেখালেন, তারপরে আপনার সাথে চট করে কেউ আর খেলতে—

‘—যাকগে’— ভদ্রলোক বলেন— তাহলে ওয়েস্টেসকে ডাকি। আমাব এই আচমকা আগমনে একটু সেলিব্রেট করা যাক।

— নিশ্চই। — বন্ড টেবিলে এক আনন্দের ঘুসি মেরে বলে — বুরবৌ অন দ্য রক্স।

— আর আমার জন্য ডিম্পল হেগ।

ডু পন্টের শরীর থেকে আফটার শেভ লোশন এবং সেন্টের মিশ্রিত গন্ধ বন্ডের নাককে ফাঁকি দিতে পারল না।

ডু পন্ট বলেন— নিশ্চিত হওয়াব জন্য সবাসরি আপনার কাছেই চলে এলাম। হ্যাঁ, আপনি রাগ করেন নি তো? প্লেনটা ক্যানসেল হতেই টিকিট কাউন্টারে দৌড়েই এবং প্যাসেঞ্জার লিস্টে আপনার নাম দেখি। তারপর এদিক ওদিক দেখতেই দেখি আপনি এখানে বসে।

বন্ড বলে— মি. পন্ট, আজকে আমার ভাগ্যটা ভালো। আপনার সাথে দেখা হল।

ড্রিংকস এসে গেল। ওরা চুমুক দিতে লাগল।

— আসলে কী জানেন মি. বন্ড — কথাটা বলে আশেপাশে দেখে নিয়ে পকেট থেকে রুমাল বাব কবে মুখটা মুছে পন্ট বলেন— ব্যাপারটা হল— এবারে পন্ট বন্ডের সামনে মুখটা নিয়ে এসে মৃদুস্বরে বলে আপনি শুধু একজন ডাকসাইটে তাসের জুয়াড়িই নন, আপনি .. মানে ... একজন বেশ দুঁদে গোয়েন্দাও। মানে আমি শুনেছি।

পন্টের এই কথায় বন্ড মনে মনে খুশি হলেও ব্যাপারটাকে সহজভাবে উড়িয়ে দিয়ে বলে— হ্যাঁ, মানে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুনিয়ার হালচালও বদলে গেছে। আর মানুষ চট করে কোনো ঝামেলা পাকাতে চায় না। তখন আমি তাস নিয়ে একটু আধটু নাড়াচাড়া করতাম, এই যা।

— আরে তাতে কী হয়েছে। আচ্ছা, এখন কীসেব সঙ্গে যুক্ত আছেন? মানে -- কোন ব্যবসা —

— ইউনিভার্সালের হয়ে আমদানি-রপ্তানির কাজ। — বন্ড উত্তর দেয়।

ডু পন্ট বন্ডকে বেশ ভালো করে বাজিয়ে দেখতে চায়। বন্ডও সেটা বুঝতে পারে।

পন্ট বলে — হ্যাঁ হ্যাঁ. নাম শুনেছি। তবে এখনও কোনো যোগাযোগ হয় নি। আমার অবশ্য কেমিক্যালসের ব্যবসা। আমার পরিবারের প্রায় সবাই এই ব্যবসা নিয়েই আছে। এবং বলতে পারেন, আমেরিকায় সর্বত্র। তবে মি. বন্ড, এ লাইনটা আমার ঠিক মনোমত নয়।

বন্ড মনে মনে ভাবে, তুমি তোমার ব্যবসা নিয়ে নিশ্চিত্তে থাক। তবে এ লোকের কথাবার্তা যতই সরল এবং ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন হোক না কেন, এর আড়ালে এই আমেরিকান ব্যবসায়ীর অন্য কোনো বুদ্ধি খেলছে। বন্ড হাতঘড়ির দিকে তাকায়।

পন্ট ঘড়ি দেখার কারণ বুঝতে পারেন। বলেন— একি, সাতটা বেজে গেছে। দেখেছেন, আমি আসল কথাটাই এখনো বলি নি। দেখুন মি. বন্ড, আপনি যদি স্থির করে থাকেন যে, আজ রাতটা এই মায়ামিতেই থাকবেন, তবে আপনি নিশ্চিত্তে আমার অতিথি হয়ে থাকতে পারেন।

আপনি এ-ও নিশ্চিত হতে পারেন, আপনার আরামের কোনো ক্রটি আমি রাখব না। গত খ্রিস্টমাস ডে-তে যে হোটেলটা আমি খুলেছি, তার সবচেয়ে দামি ঘরটাই আমি আপনাকে দেব।

— আশা করি, এর জন্য আমায় কিছু করতে হবে?— সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলে বন্দ।

বিগলিত হেসে জুনিয়াস ডু পন্ট বলেন— আপনি যথার্থই বুদ্ধিমান ব্যক্তি, এখন বলুন আপনি রাজি কিনা? অবশ্য আপনার—

বন্দ ভাবে— যে সমস্যাই হোক না কেন, বদলে যদি আজকের রাতটা সে তার হোটেলের রঙিনভাবে কাটাতে পারে—

বন্দ খানিক ইতস্তত ভাব দেখাল।

পন্ট বলেন— প্রিজ, অনেক সৌভাগ্য যে, আজ আমি আপনার দেখা পেয়েছি। চলুন।

বন্দ দেরি করে না। পন্ট ওয়েট্রেসকে ডেকে পিছন ফিরে মদের বিল মিটিয়ে দেয়। বন্দ বুঝতে পারে, ভদ্রলোকের শিষ্টাচার জ্ঞান আছে। টাকা নিয়ে গর্ব করা তিনি পছন্দ করেন না। ওরা দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে হলঘরে আসে।

পন্ট এবার বলেন— দাঁড়ান, আপনার রিজার্ভেশনের ব্যাপারটা পাকা করে আসি। দূর থেকে বন্দ দেখল, আমেরিকান ভদ্রলোকটির ক্ষমতা কতটা।

এয়ারপোর্ট এরিয়ার বাইরে এসে দাঁড়াতেই একটা ঝকঝকে ‘ক্রাইসলার ইম্পিরিয়াল’ সাঁ করে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। এক শক্তসমর্থ সোফার গাড়ি থেকে নেমে এসে দরজা খুলে দিল। বন্দ গাড়িতে উঠে বসে। ট্রান্স-আমেরিকার এক কুলি এসে বন্ডের স্যুটকেসটা দিয়ে সেলাম করে চলে গেল।

মি. পন্ট সোফারকে বললেন— ‘বিলস অন দ্য বিচ’।

গাড়ি ছুটতে শুরু করল। বন্দ গাড়ির নরম গদির মধ্যে আরামে ডুবে গেল।

মি. ডু পন্ট বন্ডকে পাথুরে কাঁকড়ার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। বন্দ জানায়, এটা তার খুবই ভালো লাগে খেতে।

গাড়ির মধ্যে পন্ট নানা বিষয়ে কথা বলে যেতে থাকেন। পাথুরে কাঁকড়া এবং মালাস্কার কাঁকড়ার স্বাদের পার্থক্য বুঝিয়ে দেন।

গাড়ি এসে থামল ‘বিলস অন দ্য বিচ’-এর সামনে। কয়েকজন লোক দৌড়ে এল। গাড়ি থেকে নামতে নামতে পন্ট কিছু নির্দেশ দিল। বন্ডের জন্য রিজার্ভ করতে বলা হল ‘আলোহা। সুইট’।

সিঁড়ি দিয়ে তারা ভেতরে এল। বন্দ দেখল— সমুদ্রনানে সূর্যরশ্মির ফলে বাদামি রঙের নানান বয়সি পুরুষ-মহিলা। তাদের অনেকের চোখে বাহারি কালো চশমা। মেয়েদের হাতে সোনার চুড়ি।

ইতিমধ্যেই ওদের সামনে এগিয়ে এল রেস্টোরার ইতালীয়ান মালিক বিল। বিল বলে— শুড ইভিনিং মি. পন্ট! আসুন আসুন।

ওরা বিলের সঙ্গে ভিড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। বিল ওদেরকে একটা টেবিল দেখিয়ে বসতে বলে। তারপর হেড বেয়ারা এবং ওয়াইন-ওয়েটারকে ডাক দেয়। একটা মেনু টেবিলের ওপর রাখে।

মি ডু পন্ট মেনু বুকলেটটা বেশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বন্ধ করে বন্ডের দিকে তাকিয়ে বলেন--
আপনি আমার মহামান্য গেস্ট। তাই মেনুর ব্যাপারটা আমিই ঠিক করব। -- এই কথা বলে পন্ট
বেয়ারাদের হেডকে ডেকে বলে, গরম স্ট্যানি কাঁকড়া আর সাথে মাখন।

হেড বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেলে মি. জুনিয়াস ডু পন্ট সিগারেট ধরিয়ে চারদিকে তীক্ষ্ণ
দৃষ্টি হেনে এবং এক চোখের তারা বাঁকিয়ে বন্ডের দিকে দেখে নেন। তাবপর বলেন — এই সুস্বাদু
এবং লোভনীয় পাথুরে কাঁকড়া খাওয়ার জন্যই কিন্তু এখানে আসা। ভালো কথা, আপনাব কোনো
চর্মরোগের ব্যাপার নেই তো? কেননা, একটি মেয়েকে এই কাঁকড়া খাওয়াবাব পবে তার সেক্সি
ঠোট কী বিশ্রীভাবে যে ফুলে উঠল!

সপ্রতিভ উত্তর বন্ডের— না। আমি আপনার অর্ডার দেওয়া মেনুই খাব।

বন্ড স্থির দৃষ্টিতে জুনিয়াস ডু পন্টের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল— এয়ারপোর্টে দেখা হওয়া
এবং এই মুহূর্তের পন্টের সাথে কত ফারাক। এখনকার পন্ট বেশ উচ্ছল, প্রাণবন্ত, মনে হয়
লোকটা এবার তার কাঁকড়া খাওয়াতে খাওয়াতে তার প্রয়োজনটা ঝেড়ে কাশবে।

পন্ট তার লাইটারটা এমনিই জ্বালাচ্ছিলেন। বুঝতে পারলেন, লাইটারের আওয়াজটা ঠিক
পছন্দ হচ্ছে না মি. জেমস বন্ডের। লাইটারটা পকেটে রেখে বললেন— আচ্ছা। মি. বন্ড, রামি
খেলা আপনার কেমন লাগে?

বন্ড উত্তর দেয়— বেশ ভালোই। তবে দুজন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন যদি স্মার্ট না হয়
তবে পয়েন্ট প্রায় সমান সমান হয়। তখন খেলাটা একঘেয়ে লাগে।

— রাইট ইউ আব। — জোরের সঙ্গে পন্ট বলেন। তারপব বলেন— তবে একশো হাত
খেললে সম মানের খেলোয়াড়রা প্রায় একই পয়েন্ট পায়। ওই জিন রামি বা ওকলাহোমার মতো
আকর্ষণীয় খেলা নয় বটে, কিন্তু সময় কেটে যায়।

ওয়ান ওয়েটার মার্টিনির পেগ সার্জিয়ে এনে বাখল। পন্ট বলেন— আমাদের পরে আরো
গ্লাস লাগবে।

ড্রিংকস-এর গ্লাসে চুমুক দিয়ে ডু পন্ট বলেন— আচ্ছা মি. বন্ড—

— ক্যারি অন, প্রিজ— গ্লাসে চুমুক দিয়ে বন্ড বলে।

— আমি যদি বলি, রামি খেলে আমি এক সপ্তাহের মধ্যে পঁচিশ হাজার ডলার হেরেছি,
আপনার কী মনে হয়? অবশ্য এটা জানবেন, আমি একজন দারুণ তাঁস খিলাড়ী। রিজেন্সি ক্লাবে
গেলে আমার সভ্যপদ দেখতে পাবেন। চার্লি গোরেন, জনি ব্রফোর্ডের মতো খানদানি সব
খেলোয়াড়দের সাথে আমার পাল্লা চলে। সুতরাং, আমি নিতান্তই ফেলনা নই তাসের ব্যাপারে!

ফের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে গ্লাসের বাইরে থাকা এক চোখ দিয়ে বন্ড ডু পন্টকে জরিপ
করতে থাকে।

বন্ড গ্লাস নামিয়ে বলে— আমি এটুকু জোরের সঙ্গে বলতে পারি, যদি বারবার একই লোকের
সঙ্গে খেলে থাকেন, তবে আপনি ঠকেছেন।

টেবিলে চাপড় দিয়ে পন্ট বলেন— আপনি ঠিক ধরেছেন। আমিও তাই আন্দাজ করেছি।
তাই আমি ঠিক করেছি, আমি এই ব্যাপারটা ধরব এবং ওই জোচ্ছোর শয়তানটাকে মায়ামি শহব
থেকে লাথি মেরে বার করে দেব।

জুনিয়াস ডু পন্ট আবার পেগের অর্ডার দিলেন। বন্ডকে বলেন— আপনার কোনো অস্বস্তি
লাগছে না তো মি. বন্ড?

- আমাকে তো আপনিই নিয়ে এলেন। আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করে যান।

ডু পন্টকে বেশ খুশি দেখায়। তিনি বলতে থাকেন — আমি হেরে যেতে থাকলে একদিন ডাবল বার্জি লাগলাম। তাস আমি নিজেই নিয়ে যেতাম। আমি ভদ্রলোকের মতিগতি সব লক্ষ করে নিজের ইচ্ছেমতো তাস পালটাতাম। আমি উলটোদিকে বসার ফলে আমার হাতে কী তাস রয়েছে, তা আমার প্রতিপক্ষের দেখার কোনো সুযোগই থাকত না। কিন্তু আমি হেরে চলেছি। হারের অঙ্কটা পঁচিশ থেকে বেড়ে চলেছে। আপনি বিশ্বাস করুন। - নিরুপায় হয়ে আমি মার খাওয়া কুকুরের মতো ভেউ ভেউ করতে করতে পালিয়ে যাচ্ছি। একসময় এয়ারপোর্টে গিয়ে নিউইয়র্কের যে প্লেন পেলাম, তারই টিকিট কেটে নিলাম। এবং শেষ পর্যন্ত আপনার সাথে দেখা হল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বসে বলল- ব্যাপারটা খুবই দুঃখের মি. পন্ট। যে কোনো তাস খেলার ব্যাপারে আমার আগ্রহ প্রবল। তা পরেন্ট পিছু কত বার্জি লাগিয়েছিলেন আপনারা?

পন্ট লজ্জা পেলেন। বললেন - সিকি ডলার থেকে এক ডলার। এক ডলার ধরা মানে বিশাল অগামাউন্ট এর ব্যাপার। তবে বার দুই জিতেছি আমি। কিন্তু যেই আমি ভালো হাত পেয়ে মোটা দাঁও এর দিকে এগোচ্ছি, তখনই ও ব্যাটা কী করে যেন সব বুঝে ফেলে। আমি ধরা পড়ে গিয়ে হেবে সর্বস্বান্ত হয়ে বসি।

- আচ্ছা, ওই ঘরে কি কোনো আয়না আছে?

- একেবারেই না। আমবা খোলা মাঠে বসে দিনের আলোতে খেলি। ওই শালা বলে, দিনের আলোতে সূর্যস্নানটাও হয়ে যায়। রাতে খেললে ওর ঘুম হয় না ঠিকমতো।

এবার বলুন আপনার প্রতিপক্ষের নাম কী?

- অরিক গোল্ডফিসার। মানে সোনাগি। ওর চুলগুলো পর্যন্ত আগুনের মতো।

-- কোথাকার লোক?

- আসলে ও ব্যাটা ইংরেজ। নাম শুনে মনে হবে ইহুদি। বর্তমানে আমেরিকার নাসোতে থাকে। বয়স ৪১, আনম্যারেড। পেশা দালালি। তাস খেলতে বসবার আগে হোটেলের গোয়েন্দাদের দিয়ে ওর পাসপোর্ট চেক করিয়ে নিয়েছিলাম। আমি অবশ্য ওকে দালালির ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতেও বলেছিল-- 'যখন হোটা পাই।' তবে ফালতু বিষয়ে বকবক করতে জুড়ি নেই ওর।

বসে এবার সিগারেট ধরিয়ে বলে - আচ্ছা, ওই গোল্ডফিসার ভদ্রলোকের টাকাপয়সা আছে নিশ্চয়ই?

- নাসাতে ব্যাংক-এর মাধ্যমে জানতে পেরেছি, ও শালাব অগাধ সম্পত্তি আছে। মানে যাকে বলে ধনী। ধনীদের জায়গা নাসা, সেখানে ওর স্থান এক কী দু নম্বর। ওই গোল্ডফিসার লোকটা টাকা নাকি সোনার বাটে পরিণত করে রাখে। কিন্তু আমার কাছে অবাক লাগছে, যে পৃথিবীর একজন ডাকসাইটে ধনী, সে তাসের টেবিলে ঠকিয়ে হাজার হাজার ডলার কামাতে চায় কেন?

উত্তর দেবার আগেই চলে এল খোলা এবং দাঁড় ফটানো এক বিরাট প্লেট-ভর্তি কাঁকড়া। সঙ্গে রুপোর বাটিতে গলানো মাখন, অন্য প্লেটে টোস্ট। আর এল গোলাপি রঙের লোভনীয় শ্যাম্পেন।

সোৎসাহে পন্ট বলে উঠলেন - নিন মি বস। প্রাণভরে সেবা লাগান।

সত্যি! এমন চমৎকার খাবার আগে খেয়েছে কিনা, ঠিক মনে করতে পারল না বস।

শ্যাম্পেন সহযোগে এরকম সুস্বাদু খাবার ওবা নীরবে খেয়ে গেল।

খাওয়া শেষ হলে একটা ঢেকুর তুলে পন্ট বলেন— যাই বলুন মি. বন্ড, এরকম নরম মাংস, এরকম লোভনীয় খাবার আর বোধহয় কারো ভাগ্যে জোটে নি।

লজ্জা পেলেও সেই ভাবটিকে নিজের মনের মধ্যে রেখে বন্ড বলে— হয়তো জুটেছে। যা আমাদের অজানা। তবে যা খেলাম, তার জন্য আপনাকে অনেকদিন মনে থাকবে আমার।

পন্ট এবার কফির অর্ডার দিলেন। সিগারেট ধরিয়ে বন্ড অপেক্ষা করতে থাকল, সে কখন কাজের কথাটা শুনবে। কেননা, এই লোভনীয় খাদ্য—

বন্ডের ভাবনা শেষ হবার আগেই পন্টের কণ্ঠ কথা বলে উঠল— মি. বন্ড, এবার তাহলে আমার কথাটা বলতে পারি?

— নির্দিধায়।

গলাটা ঝেড়ে গষ্ঠীর স্বরে পন্ট বলেন— হোটেল রয়্যাল বা এই এয়ারপোর্ট— আপনার সাথে দেখা হওয়াটাকে আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি। আপনি একজন দক্ষ এবং লড়াকু মনের মানুষ। আপনার তাস খেলা আমায় বিস্মিত করেছে। আপনাকে আমি দশ হাজার ডলার দেব। এই অরিক গোল্ডফিস্সার লোকটার আসল পরিচয় কী আমি জানতে চাই।

মি. পন্টের চোখে চোখ রেখে বন্ড বলে— আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আমাকে নিউইয়র্ক থেকে লন্ডনের প্লেন ধরতে হবে। আপনারা যদি কাল দিনের আলোতে তাসে বসেন, আমার মনে হয় রহস্যটা ধরা যাবে। কিন্তু মনে রাখবেন কাল রাতেই আমি নিউইয়র্কের প্লেন ধরছি।

— বেশ, আমি রাজি।

বন্ড বলে— এবার তবে ওঠা যাক।

॥ তিন ॥

একটা হালকা শব্দে বন্ডের ঘুম ভেঙে গেল। ধীরে ধীরে চোখ মেলে দেখল খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে। পর্দাটা উড়ছে, আব জানলার একটা পাল্লা নড়ছে।

ঘরের দেওয়াল দামি গালিচায় ঢাকা। বিছানা ছেড়ে নগ্ন বন্ড চাদর দিয়ে শরীরটা ঢেকে দরজার পর্দা সরিয়ে বারো তলার ব্যাল্কনিতে এসে দাঁড়াল।

বারো তলা থেকে দেখল, হোটেলের সামনে ফ্রন্টন, অন্যান্য ফুল এবং বিবিধ বাহারি গাছ দিয়ে সাজানো বাগান। হোটেলের সম্মুখস্থ লাগানে' জেটির ওপর বিভিন্ন দেশের পতাকা সমুদ্রের হাওয়ায় নিজেদেরকে সগৌরবে উড্ডীন করে রেখেছে। বন্ডের নিচে 'কাবানা ক্লাব'-এর দোতলা বাড়ি সর্পিলা ছন্দে প্রায় সমুদ্রতীর পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ওখানে সুইমিং পুল ছাড়াও রয়েছে পঞ্চাশ ডলারের বিনিময়ে কার্পেট আবরিত ইজিচেয়ারে বসে সূর্যস্নান।

বন্ড এ ঘরে (অ্যালোহা সুইট) একটা কার্ড পেয়েছিল। ওতে এ ঘরের দৈনিক ভাড়া দুশো ডলার লেখা ছিল। যা দিতে হলে বন্ড কয়েকদিনেই ফতুর হয়ে যেত। যাকগে, ইন্টারকাম-এ সে ব্রেকফাস্ট, সিগারেট আর খবরের কাগজ অর্ডার দিল।

স্নান করে পোশাক পরে আটটার সময় যখন ডেকোরোটিভ ঘরে গিয়ে বসতেই সোনালা উর্দি পরা বেয়ারা বন্ডের সামনে তার অর্ডারি জিনিসগুলো রাখল। 'মায়ামি হেরাল্ড'-কাগজে সামনের পাতায় মাত্র দুটো খবর : কেপ ক্যানাভেরালে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের ব্যর্থতা, হিয়ালীতে ঘোড়দৌড়ের মাঠে এক কীর্তি।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে বন্ড ভাবতে থাকে— ডু পন্ট যতটা ধূর্ত ভাবেন নিজেকে, ততটা নন, কিন্তু এই ধনী গোল্ডফিস্সার লোকটির তাসের টেরিলে জোচ্ছুরি করবার পিছনে নিঃসন্দেহে কোনো

সন্দেহজনক ব্যাপার আছে। এ জাতের অপরাধীদের সম্বন্ধে বন্ডের বেশ কৌতূহল আছে। ভালোই হবে, গোল্ডফিঙ্গারের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তার শয়তানিটাও ধরে ফেলা যাবে। যেটা মি পন্টের পকেট নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

বন্ডের আর অন্য কোনো জিনিসের প্রয়োজন আছে কিনা জানতে চাইলে বন্ড বলে, তার গোল্ডফিঙ্গারের ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি প্রয়োজন। বন্ড বলেছিল, গোল্ডফিঙ্গারের অন্যান্য জিনিসের সাথে নিশ্চই দাগ দেওয়া তাস, কোটের হাতার মধ্যে তাস গোপন রাখবার সবঞ্জাম এইসব নিশ্চই পাওয়া যাবে। অবশ্য যদি সে পেশাদার জুয়াড়ি হয়।

পন্ট জানিয়েছিল, এটা ম্যানেজাবকে বলে তিনি ম্যানেজ করে নেবেন। আর বন্ডকে বিশেষ তিনটি কথা মনে রাখতে হবে। বন্ড এখানে এসেছেন জনৈক ইংরেজ ব্যবসায়ীর হয়ে তাব কানাডার খনিজ গ্যাস কোম্পানির শেয়ার কিনবাব জন্য মি. ডু পন্টকে বোঝাতে। অর্থাৎ— কানাডা, খনিজ গ্যাস কোম্পানি এবং শেয়ার। সকাল দশটায় বাগানে তাসের টেবিলে বন্ড মি. ডু পন্টের সাথে দেখা করতে যাবে। গোল্ডফিঙ্গার আর পন্ট জুয়ো খেলবেন, বন্ড কাগজ পড়তে পড়তে সব লক্ষ করবে। শুধু লাঞ্ছ পন্টের সাথে বন্ড যাবে। ফিরে এসে আবার খেলায় বসবেন পন্ট।

ঘড়ি ধরে সাড়ে নটার সময় ঘর ছাড়ল বন্ড। হোটেলের রাস্তা চিনে নিতে সে ইচ্ছে করেই এদিক ওদিক ঢুকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে যাবার সময় এক পবিচারিকা তাকে কোথায় যাবে জানতে চাইলে বন্ড লিফট-এর রাস্তাটা জানতে চায়।

বন্ড এখন ‘কাবানা ক্লাব’-এর বাগানে বোকার মতো হাঁটছে। পন্ট এসে চারদিক দেখে নিয়ে বন্ডকে চাবি দেয়। তারপর তাবা সিঁড়ি দিয়ে ক্লাবের ছাদে চলে এল।

পন্ট বললেন— ওই যে। ইজিচেয়ারে সার্টিনের জাগিয়া পরে গলায় একটা পাখনার মতো আটকে ঠ্যাং তুলে বসে আছে। টিনের ওই পাখনায় সূর্যের আলো রিফ্লেক্ট করে কানের নীচে, যে সব জায়গায় আলো লাগে না, সেখানে সূর্যের আলোতে ভরিয়ে দেয়।

— বাঃ, বেশ বুদ্ধিমান লোক তো।

পন্ট বলে— লোকটা কানে খাটো। চলুন সামনে যাই।

গোল্ডফিঙ্গারের সামনে গিয়ে জোরে ডাকতেই সে তড়িঘড়ি করে উঠে বসে। সানগ্লাস খুলে বলেন— আরে আসুন আসুন। ইনি?

পন্ট বলেন সব কথা খুলে। যে কথা তার বন্ডের সাথে হয়েছিল।

হ্যান্ডশেক করে গোল্ডফিঙ্গার বলেন— আমি অত্যন্ত আনন্দিত মি বন্ড।

বন্ডের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত চেয়ে বইলেন গোল্ডফিঙ্গার। বন্ড বুঝল, লোকটা তার ছবি তুলে নিল। এবং গোল্ডফিঙ্গার যা ধরবার ধরে নিলেন।

গোল্ডফিঙ্গার বলেন— আজ মনে হচ্ছে খেলা হবে না।

প্রায় চাঁচিয়ে বলে উঠলেন পন্ট — তার মানে? স্যামকে টেবিল লাগাতে বলে দিয়েছি। না না, টাকা আমি নেবই এবং জিতে। অবশ্য বন্ড এ ব্যাপারে অঙ্গ। ও শুধু সূর্যম্নান করতে করতে কাগজ পড়বে? কী বন্ড?

— হ্যাঁ, তা ঠিকই। এখন তো সেরকম কোনো কাজ নেই।

গোল্ডফিঙ্গারের শকুনের দৃষ্টি বন্ডের ওপর। বলেন— ভেবেছিলাম, আজ বিকেলবেলা গলফের মাঠে যাব। কিন্তু এমন তাসের নেশা যে— তা মি. বন্ড আপনি কি গলফ খেলেন?

— ইংল্যান্ডে থাকলে মাঝেমাঝে খেলি। হান্টারকোষ ময়দানে।

— সুন্দর জায়গা। স্যান্ডউইচ শহরে আমার ব্যবসা আছে। ওখানে রয়্যাল সেন্ট মার্কস ক্লাবে আমি আছি। তা কত হ্যান্ডিক্যাপ আপনার?

— নয়।

— আশ্চর্য মিল তো! আপনার সঙ্গে তো একদিন খেলতে হয় তাহলে? ও. কে.। আমি আসছি দশ মিনিটের মধ্যে। — গোল্ডফিঙ্গার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান।

বন্দ ছাদের রেলিং-এর কাছে গিয়ে ভাবতে লাগল, এই মহান ধনী ব্যক্তিটির সাথে প্রাথমিকভাবে পাল্লা দিতে পেরেছে সে। অবশ্যই ভদ্রতা সৌজন্য বজায় রেখে।

পন্ট বেয়ারাদের বলে দিচ্ছিলেন, কোথায় কিভাবে টেবিল লাগাতে হবে।

গোল্ডফিঙ্গারের প্রতিটি কথাবার্তা মেপে বলা। কোথায় থামতে হয় উনি জানেন। কিন্তু উনি অসম্ভব রকমের ধূর্ত, সতর্ক। ভদ্রলোকের হাইট কমবেশি পাঁচ ফুট। মাথাটা বেশ বড়ো এবং গোল। পা খ্যাভানো মতন। রোদে পুড়ে গাত্রবর্ণ যদি লালচে খয়েরি না হত, তবে সাদা ফ্যাকাসে রঙে ভদ্রলোককে কিন্তুতকিমাকার দেখাবে। লাল চুলে কদম ছাঁট। তবে তার মুখের মধ্যে এক বিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। তার সাথে রয়েছে কঠোরতা এবং কামুকতায়।

এই শার্ট হাইটদের ওপর বস্তুর দীর্ঘকালের অবিশ্বাস। বাল্যকালে এরা নানাভাবে সমাজে অপদস্থ, অসম্মানিত হয়েছে। তাই এদের আশ্রয় চেষ্টা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়ানো। যেমন— নেপোলিয়ান, হিটলার। পৃথিবীর প্রায় সব অশান্তির কারণ এরাই বলা যায়। তাই বোধহয় গোল্ডফিঙ্গারকে তার এই প্রায় কুৎসিত এবং খর্বাকৃতি শরীরটাকে নিয়ে অনেকেই ব্যঙ্গ-তামাশা করে গেছে। অথচ ভদ্রলোকের মধ্যে রয়েছে এক প্রচণ্ড মনের জোর। এই মনের জোব তার আসে কী করে? অর্থ উপার্জন, জোচ্ছুরি নাকি কামুকতায়?

একটা সিগারেট ধরিয়ে বন্দ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে— আসলে ইনি কী? ইহুদির রক্ত থাকতে পারে। লাতিন আমেরিকা, সাউথ বা শ্লাভ দেশেরও লোক নন। হয়তো রাশিয়ার বাল্টিক প্রদেশের মানুষ। এমনও হতে পারে যে, তার বাবা মা কোনোরকম বিপদ বুঝতে পেরে রাশিয়া থেকে তাকে অন্যত্র সরিয়ে দিখেছিলেন। তবে এইমুহুর্তে তাস খেলার ব্যাপারটা দেখতে হবে। পরে সব জানলেই হবে।

— আসুন। আমি তৈরি। — পন্টের কথায় বন্দ গুরে দাঁড়ায়। গাঢ় নীল স্যুট আর গলা-খোলা সাদা শার্ট পরে গোল্ডফিঙ্গার মহাশয় আসছেন। কা'ন 'হিয়ারিং এইড' লাগানো। যাক, সামান্য হলেও ভদ্রলোককে মানানসই লাগছে।

চেয়ার টেনে মুখোমুখি দু'জনে বসলেন। বন্দ বসল পন্টের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে। হাতে তার নিউজপেপার। চোখ অবশ্যই গোল্ডফিঙ্গারের দিকে।

গোল্ডফিঙ্গার বেশ দক্ষতার সঙ্গে কুইক তাস বেটে চলেছেন। তাসের জুয়াড়িদের কুখ্যাত 'মেকানিকস গ্রিপ' পদ্ধতি অনুযায়ী বাঁ হাতের তিনটে আঙুল তাসের লম্বা দিকটায় একটু বাঁকিয়ে ধরে। তর্জনী তাসের মাথার এক পাশে। প্যাকেটের নীচের তাস কিংবা ওপরের তাসটা সহজেই বেটে দেওয়া যায়। কিন্তু তিনি তা করেন নি।

পন্ট বলেন— পনেরো তাসের খেলা। প্রত্যেক পক্ষই দুটো করে তাস টানবে আর একটা ফেলবে। বাকিটা রামি-র মতোই।

প্রতিপক্ষ যাতে ধরতে না পারে সেইজন্য পন্ট ভালো তাস মাঝখানে আর কমজোরি তাস তার দুপাশে। বন্দ এটাও লক্ষ করল, গোল্ডফিঙ্গারের হাতে ছুঁচলো আংটি বা আঙুলে স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো নেই।

ভাগ্য ভালো থাকলে বার দুয়েক ভালো তাস টানলেই পন্টের হিসাব উসুল হয়ে যাবে।

গোল্ডফিঙ্গার এত আস্তে আস্তে তাস টানবার পর ফেলছেন, যেন বিরক্তি ধরে যায়।

তৃতীয়বার তাস টেনে পন্ট জিতলেন বটে, তাও সামান্য পয়েন্টে।

গোল্ডফিঙ্গার বলেন— আমি আগেই বিপদ আঁচ করতে পেরেছিলাম। — তারপর তাস ভেজে দিয়ে বললেন— এখানে কদ্দিন থাকছেন মি. বন্ড ?

বন্ড হেসে বলে— ওটা বন্ড নয় মি. গোল্ডফিঙ্গার। হবে বন্ড — B-O-N-D। আমি আজ রাত্রেই নিউইয়র্ক ফিরে যাব।

— ও।

বন্ড লক্ষ করল, গোল্ডফিঙ্গারের মুখটা যেন বেশ প্রসন্ন দেখাল। তিনি আবার তাসের দিকে মন দিলেন।

— ধ্যুস। আবার আমি হারলাম। উনি এবার দেড় হাজার ডলার জিতলেন।

— মনে হচ্ছে উনি প্রায়ই জেতেন এবং ভালোরকম। — বন্ড বলতে থাকে— শুনেছি চেয়ার বদল করলে নাকি ভাগ্যও পালটে যেতে পারে।

গোল্ডফিঙ্গার খেলা বন্ধ করে বেশ হতাশ সুরে বলেন— ব্যাপারটা কী জানেন মি. বন্ড, আমি খোলা জায়গা সহ্য করতে পারি না। আমার ‘অ্যাগোরারফোবিয়া’— মানে খোলা জায়গার প্রতি ভয় আছে। তাই আমি হোটেলের দিকেই মুখ কবে খেলব।

— সে কি! আমি তো বন্ধ জায়গার প্রতি ভয়, মানে ‘ক্লস্ট্রোফোবিয়া’ র কথা শুনেছি। তা কী করে আপনার এইরকম ভীতি জন্মাল ?

গোল্ডফিঙ্গার সরল হাসির মৃদু তরঙ্গ খেলিয়ে বলেন— আমি নিজেই ঠিক জানি না।

বন্ড বুঝতে পেরে বলে— ঠিক আছে। আমি বরং একটু স্যুইমিং পুলের দিকটা ঘুরে আসি। এসে আবার কথা হবে।

বন্ড সূর্যনানরত অর্ধশায়িত দেহগুলির পাশ দিয়ে অন্য প্রান্তের রেলিং-এর দিকে গেল। যাব নীচেই স্যুইমিং পুল। সেখানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল— পন্টের সঙ্গে সে মিট করছে লাঞ্চার টেবিলে। কিন্তু গোল্ডফিঙ্গার হোটেলের দিকেই মুখ রেখে বসতে চান কেন ? ওর ঘরের নম্বর কত ? বন্ডের নম্বর ১২০০। বন্ডের ঘরটার নীচে গোল্ড-ফিঙ্গারের ঘর। এখান থেকে গোল্ডফিঙ্গারের ঘরের দূরত্ব কুড়ি গজের মতো। সে চলে এল ওর ঘরের কাছে। ঘরের সামনে একটা নির্জন বারান্দা। মনে মনে ভেবে নিল দূরত্বটা আবার। বারান্দার পিছনের দরজাটা খোলা, ঘর অন্ধকার। কেন ?

বন্ড ভাবে, গোল্ডফিঙ্গার বেশ সতর্ক হয়েই চলে। কিন্তু ওর প্ল্যানটা কী ?

॥ চার ॥

লাঞ্চার পর বিকেলের দিকে আবার খেলা। কিন্তু এরমধ্যে পন্ট হেরেছে দশ হাজার ডলার। পন্ট জানিয়েছেন, গোল্ডফিঙ্গারের সুন্দরী সেক্রেটারিটিকে নাকি ঘরের মধ্যেই থাকে। সেক্রেটারি-কাম-সঙ্গিনী কিনা কে জানে।

বন্ড বলে— আপনি গোল্ডফিঙ্গারকে জানিয়ে দেবেন, তাস খেলা দেখতে আমার ভালো লাগছে না। বিকেলে আমি যাব না। আমার মনে হচ্ছে, লোকটাকে আমি ধরতে পারব। তবে আপনি কিন্তু সহজভাবেই থাকবেন।

বন্ড ঘরে ফিরে এসে দ্রুত M3 ল্যাইকা ক্যামেরা, MC Exposer মিটার, K2 ফিল্টার আর ফ্ল্যাশ বালব হোল্ডার বার করে ক্যামেরাটা ফিট করে সব ঠিকঠাক মতো দেখে নিয়ে ক্যামেরাতে

ফিল্ম ভরে নিল। তারপর একটা মোটা বই, যার ভেতরটা ফাঁপা, তার মধ্য থেকে ওয়ালথার PPK পিস্তলটা খাপসুদ্ধি বার করে দেখে নিয়ে বাঁ দিকের কোমরে গুঁজে নিল। তারপর নিজের ঘর ও গোল্ডফিঙ্গারের ঘরের ম্যাপটা মনে মনে ছুকে নিল। ঘরের কয়েকটা তলায় ডুপ্লিকেট চাবি ঢুকিয়ে পরীক্ষাটাও সে সেরে রাখল।

বন্দ এখন নিজের ঘরের ব্যালকনিতে বসে।

বন্দ এবার তার হাতঘড়ি দেখল — তিনটে পনেরো। ব্যালকনি থেকে ওদের দেখতে পেল। ঘরে ফিরে নীল উরস্টেডের স্যুট, টাই পরে গলায় ক্যামেরাটা ঝুলিয়ে চারদিকে দেখে নিয়ে সে ঘর ছাড়ল।

বন্দ প্রথমে নীচে নেমে এসে খানিকক্ষণ ঘোরাফেরা করে চলে এল লিফটের কাছে। লিফট ওপরে যেতেই সে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত চলে এল গোল্ডফিঙ্গারের ঘরের সামনে। রুম নং ২০০। না, আশেপাশে কেউ নেই। নকল চাবি দিয়ে খুব সাবধানে সে ঘরের দরজা খুলে ফেলল। প্রথমে একটা লবি। সেখানে একটা দরজায় হ্যাচ আলতোভাবে ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। বন্দ যা অনুমান করেছিল, ঠিক তাই।

একটা নারীকণ্ঠ কানে আসে তার। তাহলে সুন্দরী নেপথ্যের নায়িকা তুমিই। মেয়েটি যেন ফুটবল খেলার মতো রিলে করে যাচ্ছে— চার আর পাঁচ টেনেছেন। আবার তার ফেলেছেন। হাতে সাহেব, গোলাম আর....

ঘরের সামনে ব্যালকনির কাছে একটা টেবিল টেনে তার ওপর দুটো গদি রেখে বসেছে মেয়েটি। সামনে রাখা বেশ শক্তিশালী লেঙ্গসম্পন্ন একটা দূরবিন। ব্রা ও প্যান্টি-পরা অবস্থায় সে নেলপালিশ করছিল।

দূরবিনের স্ট্যান্ডের নীচে একটা মাউথপিস। সেখান থেকে তার চলে গেছে একটা বাস্কের মধ্যে। সেই বাস্ক থেকে তার বেরিয়ে সংযুক্ত হয়েছে দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটা ইনডোর এরিয়ালে। তার গোল্ডফিঙ্গার শুনে যাচ্ছেন বধিরতার আড়ালে ‘হিয়ারিং এইড’ নামক যন্ত্রটির সাহায্যে।

মেয়েটি আবার যখন দূরবিনে চোখ রেখে ধারাভাষ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, ঠিক তখনই দ্রুত বন্দ তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। ওর পাশে একটা চেয়ার ছিল। তাতে উঠবার সময় ‘গড’-কে বলল যেন এটা ঝামেলা না করে। চেয়ারে উঠে বন্দ লো লেবেলে ক্রোজ থেকে লং শট— পুরোটাই ফ্রেমে পেয়ে গেল।

শাটার মারতেই সারাটা ঘর ফ্ল্যাশের আলোতে ভরে উঠল, মেয়েটি প্রচণ্ড ভয়ে চোঁচিয়ে উঠল— কে কে? কে আপনি? কী চান এখানে?

বন্দ তার নেস্ট শট রেডি করতে করতে বলে— আমার নাম জেমস বন্দ। — বলে ব্রা পরা সুন্দরীটির দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। উচ্চতা — ৫’ ১০’’-র মতো, সোনালি চুল। কালো ব্রেসিয়ারের মধ্যে তার স্তনদ্বয় যেন বন্দকে আহ্বান করছে।

বন্দ এবার বলে— এবার তুমি সর তো সুন্দরী। তুমি যা করছিলে, আমি এবার একটু দেখি। মেয়েটি বলে— কেন?

— এমনি। তোমার ওই গোল্ডফিঙ্গারকে নিয়ে একটু রগড় করবার ইচ্ছে হয়েছে। তা তোমার গলা না শুনলে তিনি আবার রাগ করবেন না তো?

— না। মাঝেমধ্যে লাইনে ডিসটার্ব হলে উনি অপেক্ষা করেন।

— বাঃ! তুমি বরং আমার একটা সিগারেট নিয়ে শুয়ে বা বসে একটু আরাম করো। আমি ততক্ষণে—

মেয়েটি এবার বেশ সহজভাবে বলে— তুমি আমার পিছনে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিলে? আমি ভীষণ চমকে গিয়েছিলাম।

— সে কি! তোমার গোল্ডফিঙ্গার সাহেব তো পন্টকে এক সপ্তাহ ধরে চমকে আসছেন।

— কিন্তু মি. পন্টের তো অটেল টাকা।

বন্দ এবার মেয়েটির দিকে ফিরে বলে— ওর-ও তো জানি টাকার শেষ নেই। ধনকুবের। তাহলে এই জোঙ্গুরির পথে উনি এলেন কেন?

মেয়েটি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে— আমি ওনাকে সাহস করে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আসলে টাকা কামানোটা ওর একটা রোগে দাঁড়িয়ে গেছে। ঝুঁকি নিতে ভীষণ ভালোবাসে ও। তাসটা হচ্ছে তার আরেক পদ্ধতি। উনি বলেন যে, তাসখেলায় নিজের প্রাপ্য বুঝে নিতে হয়। সুযোগ তৈরি না করলে বসে বসে পকেট খালি হবে। ওনার ক্ষমতাও কিন্তু প্রবল। উনি টাকার বদলে সোনার বাট ভর্তি বেণ্ট কোমরে বেঁধে নেন। তাছাড়া যদি কাস্টমসের ঝামেলা থাকে তবে কম সোনা নেন। সবসময় স্যুটকেসের নীচে আর দুই পাশে সোনার পাত থাকে।

— কাস্টমস ছাড়া অন্য চেকিং-ও তো বা কোনো বিপদ-ও তো আছে?

— বাই কার উনি যাতায়াত করেন। ওনার ড্রাইভার প্রচণ্ড শক্তিশালী। স্যুটকেস যে পরিমাণ ভারী হয়, তা ড্রাইভার ছাড়া অন্য কেউ হাত দেয় না।

বন্দ অবাক হয়ে বলে— তা এত সোনা নিয়ে উনি কী জন্য যোবেন?

— কখন কী কিনতে হয়। এমনকি, প্রয়োজনে মানুষও কিনতে হতে পারে। উনি যেমন টাকার জন্য পাগল, লোককেও তেমনি সোনা দিয়ে উনি পাগল বানান নিজের প্রয়োজনে। এই দেখ না, কেউ টাকার জন্য পাগল হয়, আশ্বার কেউ হয় ‘মেয়ের জন্য’! — বলে মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে থাকে।

— আচ্ছা, তোমার সঙ্গে গোল্ডফিঙ্গারের সম্পর্কটা কী? সেক্রেটারি নাকি শয্যা—

— সঙ্গিনী। শুধুই সঙ্গিনী। তবে শয্যায় নয়। তুমি যা খুশি ভেবে নিতে পার। এই যাঃ!

বন্দ বলে— কী হল?

— তোমাকে সব বলে দিলাম। জানতে পারলে গোল্ডফিঙ্গার কী শাস্তি যে দেবেন তা কেউই কল্পনা করতে পারে না। ও পারে সবকিছু। তুমি বলে দেবে না তো?— মেয়েটির চোখেমুখে পরিষ্কার ভয়ের চিহ্ন।

— তুমি একদম নিশ্চিত থাকতে পার। কিন্তু এই চাকরি, এই জীবন তোমার ভালো লাগছে না মনে হয়।

বিরস মুখে সে বলে— সপ্তাহে একশো পাউন্ড ছাড়াও আরো অনেককিছু পাচ্ছি। ভাবছি, কিছু পয়সা জমলেই এ চাকরি ছেড়ে দেব। — মেয়েটি এবার হেসে দেয়। বলে— আমি গায়ে একটা জামা পরে আসি। এই যা পরে আছি, তা বোধহয়—

বন্দ বলে — না না, ঠিকই আছে। সুইমিং পুলের ধারে যারা শুয়ে আছে, তারা তোমার থেকে ভদ্রভাবে নেই। — বলে বন্দ ভাবতে থাকে — এই সুন্দরী মেয়েটি চলে যেতে চাইলেও গোল্ডফিঙ্গার কি তাকে ছেড়ে দেবে? সুন্দরী যে তার অনেককিছু জেনে গেছে।

বন্দ এবার বলে— তুমি আমার কাছেই থাক। এবার আমি গোল্ডফিঙ্গারকে নিয়ে একটু খেলা করি।— দূরবিনে চোখ রেখে বুঝতে পারে বন্দ, পন্ট এখন বেশ উল্লসিত। গোল্ডফিঙ্গার কিন্তু শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছে।

— আচ্ছা, কোন ওয়েভলেংথ ট্রান্সমিট করা হচ্ছে?

— ওই ... একশো ... একশো সত্তর ... এরকমই কী যেন— আচ্ছা, মেগা দিয়ে কি কোনো শব্দ আছে?

— মেগাসাইক্লস। কিন্তু ওই মিটার ব্যান্ড তো পুলিশ আর ট্যান্ড্রি ব্যবহার করে। তার মানে, আমাদের কথাবার্তা হয়তো কানে গেছে তার। ঠিক আছে।

মেয়েটি এগিয়ে এসে বন্ডের একটা সবল বাহু টেনে নিয়ে নিজের স্তনের সাথে স্পর্শ করিয়ে বলে— দেখ, তুমি কি এটা করবেই? তাহলে আমার ভাগ্যে না জানি কী পাওনা আছে। শোন, তোমার মতো পুরুষ আমি জীবনে পাই নি। আমি কথা দিচ্ছি, আমি তোমার জন্য আছি। তুমি যা বলবে... দয়া করে, গোল্ডফিঙ্গারকে ছেড়ে দাও।

মেয়েটির বুকের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বন্দ বলল— আমি দুঃখিত সুন্দরী। তোমার প্রভুর জোচ্চুরি ধরবার জন্য আমাকে টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এইসব লোকদের একটা শিক্ষা পাওয়ার দরকার আছে। নইলে এদের হাতে অনেকেই শেষ হয়ে যাবে।

বন্দ আর দেরি না করে দূরবিনে চোখ রাখে। তাবপর সুইচ অন করে বলে— মি. গোল্ডফিঙ্গার, আমি তোমার ঘর মানে রুম নং ২০০ থেকে বলছি। আমার নাম জেমস বন্দ। মি. গোল্ডফিঙ্গার, ইওর গেম ইজ আপ। তুমি ধরা পড়ে গেছ। আমি আমার ক্যামেরাতে তোমার ওই সেক্রেটারির রিলে সহ পুরো ব্যাপারটা ব ছবি তুলে রেখেছি। শোন, আমার কথা যদি তোমার হিয়ারিং এইড-এর মাধ্যমে কানে ঢোকে, তাহলে মাথা নেড়ে আমাকে জানাও।

দূরবিনে বন্দ দেখতে পেল, গোল্ডফিঙ্গার তার মাথাটা সামান্য ঝাঁকাল।

— বেশ। শোন, তুমি তোমার চেকবই থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলারের একটা চেক কেটে মি. ডু পন্টকে দেবে। পঁয়ত্রিশ ডু পন্টকে ঠাকার জন্য। পাঁচ তার মূল্যবান সময় নষ্ট করবার আর বাকি দশ আমার পরিশ্রম বাবদ। কী বুৎ তে পেরেছ?

গোল্ডফিঙ্গার তার বিশাল মাথাটা টেবিলের সামনে নুইয়ে আবার তোলে। পকেট থেকে চেকবই বার করে সে চেক কাটে।

— বেশ। এবার শোন, আজ রাতে নিউইয়র্কগামী 'সিলভার সেটি ওর' ট্রেনে তুমি আমার জন্য একটা বড়ো কামরা বুক করবে। রাতে অবশ্যই দামি খাবার এবং শ্যাম্পেন থাকা চাই। আমি যাবার সময়—

বন্দ মেয়েটিকে প্রশ্ন করে— তোমার নাম?

— জিল মাস্টারটন।

— শোন— গোল্ডফিঙ্গারকে বলে— আমি যাবার সময় তোমার সঙ্গিনী জিলকে সঙ্গে নিয়ে যাব জামিন হিসেবে। অবশ্য ঠিক সময়ে আমি তাকে ফেরত পাঠাব।

গোল্ডফিঙ্গার উঠে পা বাড়াতে গেলে বন্দ কড়া সুরে বলে— স্টপ মি. গোল্ডফিঙ্গার। আর একটা কথা মন দিয়ে শোন, আমি যদি ট্রেনে উঠে কাল সকালে সুস্থভাবে নিউইয়র্ক পৌছাতে না পারি, তবে তোমার সব রিপোর্ট চলে যাবে পুলিশের হাতে। কি, যা বললাম, বুঝতে পেরেছ?

গোল্ডফিঙ্গার আবার মাথা নাড়েন।

বন্দ এবার বলে-- ফাইন। আর একটা কথা, কোনোরকম শয়তানি বা চালাকির চেষ্টা কোর না কিম্ব। তার জন্যও আমি অগ্রিম ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। তাহলে বিপদে পড়বে।

বন্দ জিল মাস্টারটনের দিকে ঘুরে বলে — তাহলে সুন্দরী, এবার তুমি পোশাক পরে আসতে পারো। আমি রেডি।

॥ পাঁচ ॥

এই ঘটনার সাতদিন পরে বন্দকে দেখা গেল লন্ডনের রিজেন্টস পার্কের আকাশছোঁয়া বাড়িটার ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের সদর দপ্তরের আটতলায় জানলার সামনে বন্দ দাঁড়িয়ে আছে। এখন রাত তিনটে। মাথার ওপর পূর্ণিমার চাঁদকে মাঝে মাঝে হালকা মেঘের দল যেন চাঁদের চরণতল ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে। শহরটা এখন ঘুমন্ত নগরী।

ফোন বেজে ওঠে। চারটে ফোনের মধ্যে ব্ল্যাক কালারের ফোনটা তুলে বন্দ বলে— ইয়েস।

— কল ফ্রম স্টেশন H।

এই স্টেশন H মানে হংকং-এর ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের সাথে বেতার যোগাযোগ হলে, লাইনে নানারকম ভুতুড়ে আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়।

একটা মিহি কণ্ঠস্বর বলে— ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট ?

— বলছি।

আবার ডিসটার্বিং সাউন্ড। মিহি গলাটা বলে— জোরে বলুন।

অন্য একটা কণ্ঠস্বর কিম্ব মোটা— হ্যালো হ্যালো, ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট ?

বন্দ বলে— বলছি।

— শুনুন, ডিকসন ইজ হিয়ার।

— বলে যান— বন্দ জবাব দেয়।

— জাহাজে আম যাচ্ছে। টেলিগ্রাম পেয়েছেন ?

— পেয়েছি।

— আর শুনুন, দশ তারিখের মধ্যে আমাদের পেমেন্ট ক্রিয়ার করে দেবেন।

— ঠিক আছে। বাই। — বন্দ ফোনটা রেখে দেয়।

বিষয়টা হল— স্টেশন H ইনফরমেশন দিয়েছে, তিনটে চিনের স্পাই জাহাজকে 'লিম্পেট মাইন' দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে। কেননা, এই জাহাজগুলি ম্যাকাও থেকে এসে ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজ থামিয়ে দেখে নিচ্ছে, চিনে থেকে পালানো কাউকে সব মালের জাহাজে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা। দশ তারিখের মধ্যে পেমেন্ট অর্থাৎ, দশ তারিখের মধ্যে ওই তিনটে জাহাজকে উড়িয়ে দিতে হবে। হয়তো জাহাজগুলি অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে বা অন্য কোনো বিপদ আছে।

সবুজ রিসিভার তুলে বন্দ Q বিভাগের ডিউটি অফিসারকে জানাল, সকালবেলা BOAC -র যে ফ্লাইটটা হংকং যাচ্ছে, তাতে যেন লিম্পেট মাইন থাকে।

বন্দ এবার ভাবছে, ডিকসন অর্থাৎ ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের স্পাই, নং ২৭৯, সে তার লোককে মেসেজ পাঠিয়েছে, O.K.। এই চিনাদের মেরে বড়োকর্তা 'M' শত্রুপক্ষকে সাবধান করে দিতে চান যে, ব্রিটিশ গুপ্তচর বাহিনী এখনো বেঁচে আছে।

তিনদিন আগে বন্দ 'M'-কে জানিয়েছিল সে ডাবল জিরো বিভাগের কাজ করে আসছে। নাইট ডিউটি করে এইসব ঝামেলা সে নিতে পারবে না। তাছাড়া অফিসিয়াল কাগজপত্রের ব্যাপাবও রয়েছে।

কোনোরকম পরিবর্তন দেখা যায় নি M-র কথায়। তিনি জানিয়েছিলেন— অর্থ দপ্তর আমায় বলেছে, ডাবল জিরো বিভাগের কাজকর্মের এখন সেরকম আর দর নেই। আমি উত্তর দেওয়া অনর্থক মনে করেছি। তাই আমার মতে, যখন তুমি লন্ডনেই আছ, তখন অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত হলে তোমার তেমন কোনো ক্ষতি নেই। প্রয়োজনে বিভাগের ডিউটি অফিসাররা তোমায় পরামর্শ দেবেন।

যাইহোক, খারাপ লাগছে না এই নাইট ডিউটি করতে করতে অনেক গুপ্ত তথ্য জেনে নেওয়া, যুমোনো আর সুন্দরী মেয়েদের সার্ভ করা খাবার খেতে।

প্রথম দিন এক সুন্দরী চা আনতেই বন্ড স্কিপ্ত হয়ে উঠেছিল। সে বলেছিল — এইসব ‘কাপভর্তি কাদা’ আমি খাই না। আমি কফি খাই। — বন্ডের এ কথায় তারপর থেকে সুন্দরীরা কফি নিয়ে আসত ক্যান্টিন থেকে।

এই নাইট ডিউটি বন্ডের বহু দিনের বাসনা পূর্ণ করেছে। একটা বই লেখা। বইটার নাম হবে— ‘বাঁচতে শেখো’। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুপ্তচরদের হাতাহাতি লড়াইয়ের যে প্রধান কায়দাগুলি আছে, সেগুলিকে নথিবদ্ধ করা। বইটা লিখে M-কে পাঠালে তিনি অবশ্যই এটাকে গুপ্তচর বিভাগের শিক্ষামূলক পুস্তক হিসেবে নির্বাচিত করবেন। মৌলিক রচনার বিষয়গুলি বন্ড সংগ্রহ করেছে তথ্য বিভাগ থেকে। কিছু পেয়েছে M-এর পাওয়া বন্ধু দেশের গুপ্তচর বিভাগের তথ্যের ভিত্তিতে।

বন্ডের হাতে এই মুহূর্তে একটা বই আছে, যা অনুবাদ করা। নাম — ‘ডিফেন্স’।

দ্বিতীয় অধ্যায়— ‘টেনে আনা এবং আত্মরক্ষার কৌশল’ পড়তে পড়তে বন্ড বইটা বন্ধ করে জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। রাশিয়ানদের মধ্যে এক জঘন্য কায়দা কাজ করে। একি তার আবার ওই মেক্সিকানটার কথা মনে পড়ছে কেন?

না, এই একঘেয়ে রুক্ষ ছন্দহীন জীবন তার আর ভালো লাগছে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে বন্ড।

বন্ড সেই বইটা আবার খোলে। সেই জায়গাটা— মাতাল মেয়েদের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে নিম্ন গুষ্ঠটি চেপে ধরলে তারা ফিরে আসতে বাধ্য।

লেখাটা পড়ে বন্ডের হাসি পায়। কী বিচিত্র নিয়ম। কিছুক্ষণ বই পড়ে সে বই বন্ধ করে ঘড়ির দিকে তাকাল। আর পাঁচ ঘন্টা বাদে M-কে তার ডিউটির রিপোর্ট দিলে তবে তার ছুটি। মানে সকাল নটা।

হঠাৎ বন্ডের মনে পড়ে গেল দুটো শব্দ ‘Fore finger’ এবং ‘Thumb’ অর্থাৎ, বুড়ো আঙুল এবং তর্জনী। তাহলে এর থেকে গোল্ডফিঙ্গার? ইন্টারেস্টিং! জানতেই হচ্ছে এই গোল্ডফিঙ্গারের সম্বন্ধে। যার গোল্ড-ফিঙ্গার আছে।

সব শুনে তথ্য দপ্তরের অফিসার জানাল, সব জেনে বলব।

গোল্ডফিঙ্গারের পয়সায় ট্রেনে করে মায়ামি থেকে নিউইয়র্ক যাবার পথে শুধু ভালো খাবার বা শ্যাম্পেনই নয়, ট্রেনের দুরন্ত গতির সাথে বন্ড এবং জিল মাস্টারটনের দেহ দুটো একসাথে মিশে গিয়ে এক দুর্বার স্বর্গসুখে মজে যাওয়ার ছন্দ সৃষ্টি করেছিল। এমনকি, পরদিন সকালেও জিলের আকৃতি একটা বাচ্চা মেয়ের মতো শোনাচ্ছিল।

প্রথম সঙ্গমের পর জিল তার নগ্ন দেহটাকে উন্মুক্তই রেখেছিল। বন্ডের বুকে সে আঙুল বোলাতে বোলাতে জানিয়েছিল, গোল্ডফিঙ্গার চুপচাপই আছেন। তবে তিনি স্যান্ডউইচ শহরে

গলাফের মাঠে জেমস বন্ডকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। গোল্ডফিঙ্গারের নির্দেশে পরদিনই জিলকে ফিরে যেতে হয়েছিল। কারণ, সে চাকরিটা চট করে হারাতে চায় না।

বন্ড গোল্ডফিঙ্গারের কাছ থেকে আদায় বাবদ অতিরিক্ত দশ হাজার ডলার দিয়ে দিয়েছিল জিলকে। বলোছিল - রেখে দাও। বিপদে লাগবে।

জিলকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে ফিরবার সময় একটা কোটেশন মনে এল সেন্ট অগাস্টিন এর: 'হে ঈশ্বর, আমায় দৈহিক পবিত্রতা দাও। কিন্তু তা এখনি নয়। যখন সময় আসবে।' এই প্রসঙ্গে আরও একটা উদ্ধৃতি: 'প্রথম আগুনের মতো জ্বলে উঠে লালসায় ডুবিয়ে দেয়। তাতে কী দৈহিক পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়?'

সবুজ টেলিফোন বেজে ওঠে। বন্ড রিসিভ করে বলে— হ্যালো।

- তথ্য দপ্তর থেকে বলাছ। আমরা তিনজন গোল্ডফিঙ্গারের নাম পেয়েছি। তার মধ্যে দুজন বেঁচে নেই। তৃতীয় ব্যক্তিটি সেলুনে চুল কাটার পর খদ্দেরের গা প্রশ্ন দিয়ে ঝেড়ে দেবার সময় গোপন তথ্য পাচার করে। জেনেভায় রাশিয়ান এই গুপ্তচরটির স্থালিনগ্রাদের যুদ্ধে একটা পা বাদ গেছে। আপনি কী স্যার একেই—

-- না না। আচ্ছা, আইডেন্টিফিকেশনের ঘরটা খালি পাওয়া যাবে?

-- হ্যাঁ। মেশিনটা কী অপারেট করতে হবে? আমি পারব।

- ও. কে.। আমি এখনি যাচ্ছি।

বন্ড অপারেটরকে জানিয়ে রাখল, সে এখন কোথায় আছে। তারপর ক্যামেরাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ফিল্মগুলি এখন পর্যাপ্ত আনডেভেলপড। লিফটে চড়ে দোতলায় তথ্য বিভাগে নামল।

ডিউটি অফিসাবের অনুরোধে বন্ড গোল্ডফিঙ্গারের বর্ণনা দিল।

ম্যাজিকের মতো 'আইডেন্টিফিকেশন' যন্ত্রটি যে কোনো জায়গায় যে কোনো ব্যক্তিকে দেখে রাখা-- তাকে ধরিয়ে দিতে অনেকটাই সাহায্য করে। অপারেটর প্রথমে মুখটা ফুটিয়ে তোলে। তারপর ধীরে ধীরে বর্ণনা অনুযায়ী সারা দেহটা। এমনকি গায়েব রং পর্যন্ত।

গোল্ডফিঙ্গারের যে ছবি আইডেন্টিফিকেশন দিল, তাতে বন্ডের দেখা গোল্ডফিঙ্গারের সাথে অনেকটা মিল আছে। ডিউটি অফিসার জানাল, দুপুরের মধ্যে বন্ড সব তথ্য পেয়ে যাবেন।

বন্ড এখন আটতলায় নিজের ঘরে ঢুকতেই ফোন বেজে উঠল। ফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই অপর প্রান্তে M-এর গলা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বন্ড অবাক হল। নটা বাজার এক ঘন্টা আগেই দপ্তরে M চলে এসেছেন।

M বলেন— তোমার ডিউটি শেষ হবার আগেই আমার অফিসে চলে এস।

কোটটা পরে, চুল আঁচড়িয়ে বন্ড টপ ফ্লোরে অর্থাৎ ন-তলায় M-এর অফিসে এল। দরজা খুলে দেখল, মিস মানিপেনি বা আর কেউ তখনো আসে নি।

বন্ড এখন M-এর চেম্বারে তার সামনে বসে।

M বলেন-- আশা করি, রাতটা তোমার ভালোই কেটেছে ০০৭?

— হ্যাঁ, তবে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। স্যার, স্টেশন H থেকে যে--

পাইপ ধরিয়ে M বলেন ওসব কথা পরে হবে। এখন সিক্রেট ফাইলটা দাও।

বন্ড ফাইলটা দেয়।

M বলেন-- ০০৭, অবস্থার পরিস্থিতি অনুযায়ী আমি তোমাকে নাইট ডিউটি থেকে ছুটি দিচ্ছি। কি, আশা করি খুশি হয়েছে?'

— কিন্তু স্যাব, কাজটা আমি অনেকটা রপ্ত করে নিয়েছিলাম। আর এ কাজটা কবতে আমাব খুব একটা খাবাপ লাগছিল না।

পাইপেব ধোঁয়া ছেড়ে বিতলভিং চেযারে হেলান দিয়ে M বলেন - সে আমি জানি। তোমাব ওপব আস্থা আছে। তবে এ কাজ পবেও তোমাকে দেওয়া যাবে। এই মুহূর্তে হাতে একটা নতুন কাজ এসেছে। আচ্ছা, সোনাৰ বিষয়ে তোমাব কোনো অভিজ্ঞতা আছে?

— না স্যাব।

— ও কে। শোন, ব্যাংক অব ইংল্যান্ডেব গভর্নবেব সাথে ডিনারে গিয়ে জানলাম সোনা নিয়ে স্মাগলিং, জালিয়াতিব কথা। যদিও এদেব কানলাব টাকা পয়সা নিয়ে। যাই হোক, আজ বিকেল চাবটেব সময় ব্যাংক অব ইংল্যান্ডেব কর্নেল স্মিদার্সেব সাথে তোমায় মিট কবতে হবে। তখনই সব জানতে পাববে। ইনি এই ব্যাংক অব 'বিসার্চ ডিপার্টমেন্ট' এৰ বড়োকর্তা। এদেব কাণ্ডকর্মেৰ সাথে গুপ্তচব বৃত্তিওব কোনো পার্থক্য নেই। আমিও বিস্মিত যে, ব্যাংকেও এবকম ডিপার্টমেন্ট থাকতে পাবে। এদেব কাজ হল ইংল্যান্ডেৰ সমস্ত ব্যাংক এৰ কাজেৰ মধ্যে অবৈধ কিছু ঘটছে কিনা। কয়েকদিন আগেই কাগজে বেরিয়েছে, নকল স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করার অভিযোগে কয়েকজন ইতালীয়ানকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। স্মিদার্সেৰ কাজ হল, মুদ্রা ও সোনা নিয়ে জাল কারবাবীদের ধরা।

বন্ডেৰ চোখে মুখে বিস্ময়েব ছাপ।

সেটা লক্ষ করে M বলেন - অবাক হবারই মতো কথা। যাই হোক, স্মিদার্সেব দৃঢ় সন্দেহ হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেৰ সময় থেকেই প্রচুর পৰিমাণ সোনা পাচার হয়ে যাচ্ছে ইংল্যান্ড থেকে চোরাপথে। অবশ্য এৰ সাথে আরও ঘটনা আছে। তাই গভর্নৰ নিজে প্রাইম মিনিস্টারেৰ সাথে কথা বলে তার অনুমতি নিয়ে আমাব কাছে এসে সব তথ্য দিয়ে আমায় বিভাগেৰ সাহায্য চেয়েছেন। বন্ড বলে— কীভাবে?

M বলেন— আচ্ছা, কোনোদিন কী ভেবে দেখেছ, ইংল্যান্ডেৰ সবথেকে ধনী ব্যক্তিটি কে?

— না স্যার। তবে---

— তবে কী?

বন্ডেৰ মন তখন ধনীদেব সঙ্কানে চলেছে। বন্ড বলে -- ভাবছি, কে হতে পারে? ধনী ব্যক্তিব মধ্যে আছেন নির্ঝঙ্কট জাহাজ ব্যবসায়ী এলাবম্যান কিংবা স্যাসুন বা লর্ড কাউড্রেও হতে পারে। ব্যাংকবদেব মধ্যে হ্যামরোজ, বেয়াবিং, বথসচাইন্ড। আব সেরকম তো কাউকে স্যার এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।

M হেসে বলেন— অবিক গোল্ডফিস্কাব। নামটা আমাকে গভর্নবই বলেছেন।

— সেকি! এই ভেবেব দিকেই তো আমি আই.ডি.স্টিকাস্টে ওই ভদ্রলোকের ছবি বার করেছি। আশা করছি, বিকেলেব মধ্যেই সব তথ্য পেয়ে যাব।

— তার মানে? ব্যাপারটা আমাব কাছে পরিষ্কার করো তো।

M কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন সিলিং-এর দিকে চেয়ে। তাবপব বন্ডেব দিকে তাকিয়ে বলেন-- ওই দশ হাজার ডলার তোমার জিল মাস্টারটনকে না দিয়ে 'হোয়াইট ক্রস'-এ দিলে না কেন? তুমি তো জান, গুপ্তচর বৃত্তি কবতে গিয়ে যাবা মাৰা যায়, তাদেব পরিবারকে সাহায্যেৰ জন্য 'হোয়াইট ক্রস' নামে এক আর্থিক তহবিল গড়া হয়েছে।

মাথা নীচু করে বন্ড বলে— আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি স্যার।

ভিক্টোরিয় যুগের মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ মেয়েদের নিয়ে খেলা করাটাকে পাপ বলে মনে করেন। M বলেন-- ঠিক আছে। ব্লেন্ডস ক্লাবে দেখেছি গোল্ডফিঙ্গারকে ব্রিজ খেলতে। ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের মতো তোমাকেও এর পিছু নিতে হবে। তাহলে ০০৭, সব বুঝতে পেরেছ?

— ইয়েস স্যার।

M বলেন— নাউ ইউ মে গো। অ্যান্ড টেক রেস্ট।

॥ ছয় ॥

বন্দ এখন সুসজ্জিত বেশে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে। বন্দ রাস্তার চারপাশটা ভালো করে দেখে নিয়ে এগিয়ে গেল।

সিঁড়ির প্রাথমিক ধাপ পার হয়ে ব্রোঞ্জের স্কেলে আটকানো রঙিন কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। মেঝের দিকে তাকাল। সর্বাস্থ নিখুঁতভাবে দেখা যায়, এমন বাকবাকি মোজাইক। হাঁটতে গিয়ে বুকুর শব্দ যেন রোমাঞ্চ না জাগায়।

একজন গার্ড এগিথে এসে বলে— ইয়েস প্লিজ!

— কর্নেল স্মিটার্স।

— আপনার পরিচয়?

— জেমস বন্দ।

-- ও আপনিই! দয়া করে আসুন আমার সাথে।

কর্নেল স্মিটার্স— নামের সঙ্গে চেহারাটাও কোনো উজ্জ্বল খাতুর মতো পালিশ করা, চকচকে। মনে হয় সেনা বিভাগে কর্নেলই ছিলেন।

বন্দ বলে — আমাদের বড়োকর্তার কথানুযায়ী সোনার ব্যাপারে আপনিই সব তথ্য দেবেন।

কর্নেল স্মিটার্স বলেন— হ্যাঁ, আমার গভর্নরও আমাকে সেরকম নির্দেশ দিয়েছেন। আপনাকে সবই খুলে বলব। কিন্তু ব্যাপারটা কমপ্লিটলি সিক্রেট। অবশ্য আমি শুনেছি এবং জানিও। আপনি একজন অভিজ্ঞ এবং আস্থাশীল ব্যক্তি।

বন্দকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে। সে এবার বলে — আমাদের কাজটাই তো তাই। গোপনীয়তা রক্ষা না করলে ক্ষতি সবারই। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।

— ধন্যবাদ। আপনি কথাটাকে বাঁকাভাবে নেন নি। আচ্ছা, সোনা নিয়ে আপনি বোধহয় সেরকম নাড়াচাড়া করেন নি?

বন্দ বলে— দেখলে চিনতে পারি।

কর্নেল স্মিটার্স সামান্য হেসে বলেন— ব্যাপারটা কী জানেন তো, সোনা এমনই এক জিনিস, যা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে নিয়ে গিয়ে লেনদেন করা যায়। কিন্তু গণ্ডগোলটা কোথায় জানেন তো, সোনার বাটের ওপর টাকশালের ছাপ উঠিয়ে দিয়ে তাতে গলিয়ে নতুন বাটে পরিণত করা যায়। আমাদের ভেন্টে স্টকের ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি ইংল্যান্ডে কত সোনা আছে আর স্যাকরাদের কাছে কত আছে।

আচ্ছা, দেশের সোনার জন্য আপনাদের এত সতর্কতা কেন?

— বিদেশের বাজারে আমাদের আর্থিক সংগতির ভিত্তি হল দেশের মজুত সোনা। বুঝতেই পারছেন, দেশের সোনা কমা মানে টাকার দামও কমে যাওয়া। আমাদের দেশে সোনা যাতে পাচার হয়ে বিদেশি রাষ্ট্রের হাতে ৭৭ পড়ে সেইদিকে লক্ষ রাখতে হয় আমাকে। চোরা পথে পাচারের খবর এলেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা ‘স্বর্ণসন্ধানী বাহিনী’কে খবর দিই। অন্তত যাতে সোনাটা

ফিরে পাই। আর যারা জাঁদরেল, শক্তিশালী অপরাধী তারাও কিন্তু এই কাণ্ডবাদের সাথে জড়িত। এমনই লোভনীয় সোনা। অনেক সময় সোনা উদ্ধার হলেও, এইসব বুদ্ধিমান সোনার চোরাকারবাবীদের ধরা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

বন্ড বলে -- কিন্তু কর্নেল, উৎপাদন বেশি হলে চোরাকারবার ত্রো বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন শুরু হতেই চোরাকাবাবীদের মাথায় হাত।

একটু হেসে কর্নেল স্মিয়ার্স বলেন - আপনি যত সোজা ভাবছেন ব্যাপারটা, তা নয়। সোনা কেউ রাখে সোফার মধ্যে, কেউ ঘরের মোঝেতে আবার কেউবা এই সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধাচ্ছে, চশমার ফ্রেম করছে কিংবা অরনামেন্টস। তার ওপব প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে।

কর্নেল টেবিলে রাখা জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলতে থাকেন - অবশ্য নানা শিল্প প্রতিষ্ঠানেও নানা কাজে সোনা ব্যবহৃত হচ্ছে আজকাল। সোনাব তার, গোল্ড প্রেটিং কিংবা কোনো খেলায় স্বর্ণপদক দিতেও। তবে সোনা জিনিসটার দুটো দোষ আছে।

— কী রকম?

- এক, এই ধাতুটা যেভাবেই থাক না কেন, একটু তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়, যদি আপনি সিন্দুকেও রেখে দেন। দুই, 'মাদুর্লি'-ব জন্য। মি. বন্ড, পৃথিবীতে সোনাই রাতা বাতি যে কোনো দেশের অর্থনীতিকে এদিক-ওদিক করে দিতে পারে। মজার ব্যাপার হল, যে মাটি খুঁড়ে সোনা বার করা হচ্ছে, সেই সোনাই আবার পৃথিবীর কিছু লোকের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা হয়ে মাটির তলায় ঢাকা থাকছে। সোনা হচ্ছে পৃথিবীতে এমনই এক আশ্চর্য চিজ।

বন্ড ভাবে, কর্নেলের কথাগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই তো, হিরে স্মাগলাদের ধাওয়া করতে গিয়ে সে জেনেছিল, হিরে বা অন্যান্য দামি ধাতু সম্পর্কে মানুষের লোভ ও কুসংস্কারের কথা।

বন্ড বলে- আমার আর কিছু জানবার আছে?

কর্নেল বলেন— আপনাব বোরিং লাগছে না তো?

মুদু হেসে বন্ড বলে- না না। আমার বেশ ভালোই লাগছে।

কর্নেল বলেন মি. বন্ড, যতদিন বন্ড, পৃথিবীতে খনিজ সোনার ভাণ্ডার শেষ হয়ে আসছে। আপনার ধারণায় পৃথিবীর কোথাও না কোথাও মাটি খুঁড়লে হয়তো সোনা পাওয়া যাবে। যেভাবে পৃথিবীর মানুষের মনে 'গোল্ড-ফিভার' বেড়ে চলেছে, অদূর ভবিষ্যতে হয় সমুদ্রের তলায় নয়তো অন্য কোনো গহে গিয়ে সোনার জন্য পাগলামি শুরু হবে। আগে অটেল সোনা পাওয়া যেত প্রাচীন মিশর ও মাইসিনিতে। সোনাব অফুবন্ত ভারত নাকি ছিল অ্যাজটেকের রাজা মন্টেজুমার কাছে। এছাড়া সোনা ছিল রোমান সম্রাট ক্রোয়েসাস, ইউরোপের রাইন উপত্যকা, মালগা এবং গ্রানাডার সমতলভূমিতে। সমতলভূমি থেকে সোনা খুঁড়ে প্রায় শেষ করে দেওয়া হয়েছিল।

দুম কবে বন্ড বলে-- শুনেছি, ইন্ডিয়ায় সোনা নাকি খুব চাহিদা।

কর্নেল স্মিয়ার্স একটু অবাক হন। বলেন— আপনি ঠিকই শুনেছেন। ওরাও, মানে আবেগরত এবং সদা সুখ শান্তি কামনারত ভারতবাসীও এব লালসা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেনি। কথিত আছে, চকচকে কিছু মুখে নিয়ে পিঁপড়েবা মিন্টির বদলে যখন অন্য কিছু নিয়ে আসছিল মাটির তল থেকে তখনই নাকি ইন্ডিয়ানরা মানে ভারতবাসীবা সোনার খোঁজ পায়। যাইহোক, মধ্যযুগে বৃহত্তম স্বর্ণখনি ছিল মেক্সিকো আর পেরুতে। একদিন আফ্রিকার গোল্ড কোস্টেও সোনা পাওয়া গেল। আবার দেখুন, বহু মানুষের মৃত্যু হল ইউকন ও এলডোলাডোব দুর্ভেদ্য অঞ্চলে সোনা খুঁজতে গিয়ে। আর তারপরে আধুনিক 'স্বর্ণযুগ' শুরু হল, যাকে বলা যায় --

ইউৰোপীয় এক বিশাল সোনাৰ খনি আবিষ্কাৰ হওযাব পৰে— শাস্ত্ৰ স্বৰ্ণে বস্তু একথা বললে স্মিডাৰ্ছ আৰু চমকে যায়।

কৰ্নেল স্মিডাৰ্ছ বলেন — আপনি তেওঁ অনেক খবৰই বাখেন মি বস্তু।

মুদু সবল হেঙ্গে বস্তু বলে - ওই মানে, কৰ্মসূত্ৰে এদিক ওদিক মুভমেণ্ট করতে হয় তে। ঠিক আছে আপনি বলুন।

- হ্যাঁ, স্মিডাৰ্ছ বলতে শুক কৰেন— সোনাৰ সন্ধান পাওযা গেল অষ্ট্ৰেলিয়ায়। ঊনবিংশ শতাব্দীৰ মাঝামাঝি বাৰ্শিয়া ছিল লেনা এবং উবাল অঞ্চলেৰ খনিব দৌলতে সবচেয়ে বৃহৎ স্বৰ্ণ উৎপাদনকাৰী দেশ। উইটওয়াটাচব্যান্ড-এ সোনা আবিষ্কাৰ হল। শুক হল 'স্বৰ্ণযুগ'-এৰ দ্বিতীয় অধ্যায়। ওই সময় চালু হল পাথৰ থেকে সোনা বাসায়নিক পদ্ধতিতে বাব কৰা। যাকে বলা হয় 'সায়ানাইডিং'। আৰ 'স্বৰ্ণযুগ' এৰ তৃতীয় অধ্যায় শুক হল দক্ষিণ আফ্ৰিকায় সোনাৰ খনি পাওযাৰ সাখে সাখে। ক্ৰনডাইক হোমস্টেক এলডোবাডো— এইসব খনিগুলোকে আগে নাকি বলত পৃথিবীৰ অন্তৰ আশ্চয়। এখন ১৫০০ সাল থেকে সোনা বাব কৰতে কৰতে যেভাবে সোনাৰ ব্যবহাৰ বেড়েছে, তাতে আগামী পঞ্চাশ বছৰেৰ মধ্য পৃথিবীতে সোনাৰ ভাণ্ডাৰেৰ চিত্ৰটা খুব একটা স্বস্তিদায়ক হৰে না।

একটা দীৰ্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বস্তু চেযাবে পুবোপুৰি হেলান দিয়ে বলে - সতিহি এ এক আশ্চয় বিষয়। তৰে একদিন হয়তো সমুদ্রেৰ তলা থেকেও সোনা পাওযা যাবে। যাকগে, আপনি এখন স্মাগলিং এৰ ব্যাপাবটা বলুন।

ফোন বাজে। স্মিডাৰ্ছ ফোন ধৰে মিনিট চাবেক কথা বলেন। ফোন নামিয়ে বেখে চেযাবে হেলান দিয়ে বলেন- বুঝলেন মিঃ বস্তু ব্যাংকেৰ কৰ্মচাৰীবা খেলাধুলা নিয়ে মেতে উঠেছে। আমাকে জড়তে চাইছে এৰ মধ্য। আমি পৰিষ্কাৰ বলে দিয়েছি যে — যাকগে, আসল কথায আসা যাক। হ্যা, এই স্মাগলিং ইংল্যান্ড এবং স্টাৰলিং এলাকাতেই বেশ জমিয়ে হচ্ছে। ব্যাংক অৰ ইংল্যান্ডেৰ তিন হাজাৰ কৰ্মচাৰীৰ মধ্য প্রায় এক হাজাৰ জন আছে 'মুদ্রা নিয়ন্ত্ৰণ' বিভাগে। আৰ পাচশো জন আছে মিনি স্বৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ বাহিনীতে।

বস্তু হেঙ্গে বলে - আপনাৰ সৈন্যবাহিনী তো বেশ ভালোই আছে। আচ্ছা, এই স্মাগলিং এৰ পুবো ব্যাপাবটা আমাকে বুঝিয়ে বলবেন?

নিশ্চই। ধৰুন, আপনাৰ কাছে একটা সিগাবেটেৰ প্যাকেটেৰ মাপেৰ একজোড়া সোনাৰ পাট আছে। যেভাবেই হোক আপনি পেয়েছেন। কন্ট্ৰোলে আমাদেৰ ব্যাংক আপনাকে দেবে হাজাৰ পাউন্ড। কিন্তু আপনি এতে সন্তুষ্ট নন। আপনি কী কবলেন, বাট দুটোকে পাতলা পাতলা চাফ্ৰিৰ সাইজে কেটে নিয়ে ভাবতবেৰে বোম্বাইগামী কোনো প্লেনে আপনাৰ কোনো বন্ধুৰ কোমৰে কাপড়েৰ বেণ্টেৰ মধ্য সেট কৰে সেগুলিকে পাঠিয়ে দিলেন। বোম্বেৰ বাজাবে ওই সোনাৰ দাম পাবেন ১৭০০ পাউন্ড। বন্ধুকে ১০০ পাউন্ড দিলেও আপনি পাচ্ছেন অতিবিক্ৰ ৬০০ পাউন্ড। মিঃ বস্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেৰ পৰ থেকে আজ পর্যন্ত আপনি যদি বছৰে ছ'টা কী সাতটা অপাবেশন চালিয়ে যেতেন তাহলে বোধহয় আপনাকে আজ এ চাকৰি করতে হত না।

কিন্তু ভাবতবেৰ মাৰ্কেটে সোনাৰ এত দাম কেন? — বস্তু প্রশ্ন কৰে ভাবল, সব খবৰই জেনে বাখতে হৰে। M কখন কোন খবৰ জানতে চান, তা তো বলা যায় না।

কাৰণ, ভাৰতবৰ্ষে সোনাৰ গয়নাৰ প্রচলন অতিমাত্ৰায়। তাই বোধহয়, ওই দেশে চোৰাপখে প্রচুৰ সোনা চোকে। ১৯৫৫ সালে যে ৪২ হাজাৰ আউন্স চোৰাই সোনা ধৰা পড়েছিল, তা ওই

বছরে মোট চোরাই মালের একশো ভাগেব এক ভাগ মাত্র। স্বাগলাররা মাকাও থেকে ভারতেব ওপর দিয়ে উড়ে বাবার সময় প্যারাসুটে বাঁধা সোনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে দেয়।

— আচ্ছা, অন্য কোনো দেশে কী এই সোনা বেশি দামে বিক্রি হয়?

দুই হাতের আঙুল দিয়ে পিয়ানোর চঙে টেবিল বাজিয়ে কর্নেল স্মিয়ার্স বলেন যদিও সুইজারল্যান্ড-এ বিক্রি হয়। কিন্তু বিশ্বের প্রায় সবার নজর ওই বিশাল দেশ ইন্ডিয়া।

বন্ড লক্ষ করল স্মিয়ার্সের চোখ এখন উদ্দীপ্ত তাকে আসল সমস্যাটা নিয়ে জোর দিয়ে কিছু বলতে। সিগারেট ধরায় সে। তারপর সে বলে — হ্যাঁ, এরপর?

স্মিয়ার্স হাতে একটা পেন নিয়ে বলতে থাকেন— ১৯৩৭ সালে ২০ বছরের এক যুবক অরিক গোল্ডফিঙ্গার লন্ডনে আসে। বংশানুক্রমে স্বর্ণকাব এই যুবক বুঝতে পেরেছিল, রাশিয়ান সরকার তার দেশকে নিজের অধীনে আনবে। আমার ধারণা, যেরকম সোনার বাটের বা পাতেব কথা একটু আগেই আপনাকে বলেছিলাম, সেইরকম কোনো বাট গোল্ডফিঙ্গারের কাছে ছিল। যদূব গুর্নোঁছ, সে তার বাবার কাছ থেকে এই মালটি হস্তগত করেছিল।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বন্ড বলে— স্টেঞ্জ! খুব বাহাদুর তো!

স্মিয়ার্স বলেন— সত্যিই বাহাদুর! নইলে ঠিক লাইসেন্স বার করে শান্তভাবে বন্ধকী কারবার শুরু কবে দিল। তার নিজের সব প্রতিষ্ঠান এবং দোকানের নাম সে রাখল— ‘গোল্ডফিঙ্গার’। এই গোল্ডফিঙ্গার মহাশয় ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠতে লাগলেন। যেমন— পুরোনো, সস্তা গয়না কেনা এবং তা নায্য দামেই তার দোকানের বাইবে বিজ্ঞাপন ছিল— ‘ঠাকুমা দিদিমার সোনা দিয়ে নতুন বউ-এর নতুন ডিজাইন নাও।’ বেশ বৃদ্ধি রেখে তিনি জায়গামতো দোকান দিতেন। যাতে সব শ্রেণির মানুষ কেনাবেচা করতে পারে। গোল্ডফিঙ্গার নিজে লন্ডনে থাকবেন বটে, কিন্তু একমাসের কেনাবেচার হিসাবটা তিনি বুঝে নিতেন। পুরোনো গয়না নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তখন পর্যন্ত তিনি চোরাই কারবার করতেন না। ম্যানেজাররাই সব দেখভাল করত।

বন্ড সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে থাকে। কর্নেল স্মিয়ার্স বুঝতে পারেন, এই গোয়েন্দাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব তথ্য জেনে নিতে চায়।

স্মিয়ার্স বলেন— আপনাব মনে? ‘চ্ছ, এইভাবে যদি চলে, তাহলে তার মোট ইনকাম কী দাঁড়াচ্ছে? অথচ আমি বলছি, ভদ্রলোক বেশ নিরীহ!... তো যাই হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, সব স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মতো তাকেও জানাতে হল। তার কাছে বর্তমান মজুত সোনার পরিমাণ কত। তিনি তার পুরোনো অ্যাকাউন্টস দেখিয়ে বেগ চতুরভাবে পেশ করেছিলেন তার সোনার পরিমাণ মাত্র পঞ্চাশ আউন্স। তার এই ন্যূনতম হিসাব দেখে তাকে বলা হল, তার আর অতিরিক্ত কিছু সরকারকে দেবার নেই। যুদ্ধের সময় তিনি কায়দা করে তার কয়েকটা দোকান খুব কৌশলে চালু রাখলেন। কিন্তু নিজে এক যন্ত্রপাতির কারখানায় আত্মগোপন করে রইলেন।

বন্ড বলে— দারুণ ব্রেন তো!

স্মিয়ার্স বলেন— মানতেই হবে। এরপর যুদ্ধ শেষ হলে গোল্ডফিঙ্গার বেরিয়ে এসে টেমস নদীব মোহানার কাছে রেকুলভারে একটা গাড়ি, পুরোনো ‘সিলভার গোস্ট’ রোলস রয়েস গাড়ি আর একটা ট্রলিব কিনলেন। দক্ষিণ আমেরিকার কোনো এক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির জন্য কেনা মোটরটি আর্নারড কাব। তিনি মারা যেতেই ভাগ্যক্রমে গোল্ডফিঙ্গার মোটরটা পেয়ে যান। গোল্ডফিঙ্গার তার নিজের জন্মিতে চালু করলেন ‘থ্যানটে অ্যালয় রিসার্চ’। যুদ্ধের পর দেশে ফিরতে গরবাজি এক জার্মান ধাতু বিশেষজ্ঞকে দায়িত্ব দিলেন এই কারখানার। লিভারপুল বন্দর থেকে ছ’জন নীচু মানের ও অশিক্ষিত কোরিয়ানকে বহাল করলেন কারখানায়। ট্রলার নিয়ে বছরে একবার ভারতবর্ষে

এবং কয়েকবার গাড়ি নিয়ে যেতেন সুইজারল্যান্ডে। এর একটা শাখা খুলেছেন জেনিভায়। এখন তার বদলে এক কোরিয়ান গাড়ি চালিয়ে দোকান থেকে সোনা নিয়ে আসে। গোল্ডফিঙ্গার যে আচরণবিধি মেনে চলতেন, তার ফলে তার ওপর কোনোরকম দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে নি।

বন্ড সামান্য আড়মোড়া ভেঙে পায়ের ওপর পা তুলে বসে।

স্মিয়ার্স বলেন— মি বন্ড, আপনার যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে—

-- ও. কে., ও. কে.। আই অ্যাম ফাইন। প্লিজ—

স্মিয়ার্স বলতে থাকেন — যাই হোক, একটা ঘটনায় এই গোল্ডফিঙ্গার আমাদের নজরে আসেন। ১৯৫৪ সালে গ্রীষ্মকালে তার ট্রলারটা ভেঙে গেলে তিনি ট্রলারটা বিক্রি করে দেন ডোভার স্যালভেজ কোম্পানিকে। কোম্পানির লোকজন ট্রলারটা খুলতে গিয়ে দেখে কাঠের মধ্যে বেশ পরিকল্পিতভাবে বাদামি রঙের গুঁড়ো। কেমিস্ট কেমিক্যাল টেস্ট করে জানায়, ওই গুঁড়ো আসলে সোনা। এই গুঁড়োকে ১০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে গলিয়ে নিলেই সোনা পাওয়া যাবে। স্যালভেজ কোম্পানির কোনো কর্মী কাউকে ঘটনাটা গল্প করলে তা কোনোভাবে পুলিশের কানে আসে। সেই রিপোর্ট আমাদের হাতেও আসে। রিপোর্টে দেখা যায়, ভারতে মাল রপ্তানির জন্য তিনি সার তৈবির জন্য খনিজ পদার্থের গুঁড়ো নিয়ে যেতেন। গোল্ডফিঙ্গার পুরোনো সোনা কিনে গুঁড়ো করে ভারতবর্ষে চালান করতেন।

বন্ড বলে— খুব বুদ্ধি ধরেন তো ইনি।

— তাহলে আর বলছি কী। কিন্তু সেরকম উপযুক্ত প্রমাণ আমাদের হাতে তখন নেই। ওনাব মাত্র কুড়ি হাজার পাউন্ড জমা আছে বার্কলে ব্যাংকে। ট্যাক্সও উনি যথাসময়ে দিয়ে যান। খাতাপত্রও উনি ঠিকমতো রাখতেন।

কর্নেল স্মিয়ার্স এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পকেটে হাত দিয়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চেয়ারের পিছনদিকে গিয়ে জানলায় টাঙানো পাতলা পর্দার মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বন্ড স্মিয়ার্সকে লক্ষ্য করতে থাকেন। হাতঘড়ি দেখে— পাঁচটা।

কর্নেল স্মিয়ার্স এবার ঘুরে টেবিলের সামনে এসে বললেন— মি. জেমস বন্ড, দীর্ঘক্ষণ ধরে আপনাকে বসিয়ে এত কথা বলবার কারণ একটাই, আইনের ফাঁক খুঁজে অরিক গোল্ডফিঙ্গারকে ধরা। কেননা, তার বিশ্বের বিভিন্ন ব্যাংকে যে পরিমাণ সোনা আছে, তার মূল্য দু'কোটি পাউন্ড। নাসোর রয়্যাল ব্যাংক অব কানাডার ভেন্ট রয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ডের সোনা। তার এইসমস্ত সোনার প্রায় সবটাই ইংল্যান্ডের। আমাদের ইংল্যান্ডের মুদ্রাসংকটের কথা চিন্তা করে সব সোনা আপনি নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করুন। আর এটা আপনিই পারবেন।

বন্ডও আর দেরি না করে উঠে দাঁড়ায়। ওরা হ্যান্ডশেক করে। ঘর থেকে বন্ড বেরিয়ে আসে।

॥ সাত ॥

লিফটের জন্য অপেক্ষারত বন্ড-এর পাশে এসে স্মিয়ার্স দাঁড়াতেই লিফট এসে গেল। ওরা দুজন ঢুকে গেল।

কর্নেল স্মিয়ার্স বলেন— মি. বন্ড লিফটের দিকে আসবার সময় প্যাসেজের জানলা দিয়ে যে ভ্যানটা লক্ষ্য করছিলেন, তাতে করে নতুন পাঁচ টাকার নোট এল।

বন্ড বলে - আমার মতে পুরোনো নোট কিন্তু 'পৃথিবীর সুন্দর নোট' ছিল।

লিফট থামলে ওরা দুজন হলঘর দিয়ে হাঁটতে থাকে।

স্মিদার্স বলেন— যুদ্ধের সময় জার্মানির 'রাইখস ব্যাংক' নিখুঁতভাবে যে জাল নোট তৈরি করেছিল, তার ব্লক রাশিয়ানদের হাতে চলে যায়। আমরা ব্লকগুলি ফেরত চেয়েছিলাম কিন্তু তারা ফেরত দিতে অস্বীকার করায় জাতীয় অর্থনীতিকে বাঁচাতে বাধ্য হয়ে আমরা নতুন নোট বাজারে ছাড়ি। তবে এ নোট জাল করা ভীষণ কঠিন।

বাইরে বেরিয়ে স্মিদার্সকে বিদায় জানিয়ে মেট্রো রেলের দিকে পা বাড়াল বন্ড। M এর সাথে ছ'টার সময় দেখা করতে হবে। এখন রাত্রি।

ক্লাস্ত বন্ড M -এর ঘরে ঢোকে। M বলেন — বোসো।

বন্ড বসলে M বলেন— এবার বল।

যথাসম্ভব সংক্ষেপে সব কথাই বন্ড বলে M -কে।

ঢেয়ারে হেলান দিয়ে M বলেন— দেখ, এই ব্যাংকের কাজকর্ম এবং এদের কর্মনীতি সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আমার ধারণায়, টাকার মূল্য নির্ভর করে আমাদের কর্মদক্ষতার ওপর, সোনার ওপর নয়। আচ্ছা, এই গোল্ডফিঙ্গারের সাথে কোনো বেআইনি কাজ করবার প্রস্তাব আনলে কি কোনো রাস্তা পাওয়া যাবে?

বন্ড একটু চিন্তা করে বলে— স্যার, গোল্ডফিঙ্গার তাদেরকেই পছন্দ করে যারা ওর থেকে বেশি শক্তি ও বুদ্ধি রাখে। আমি একবার ওকে হারিয়েছি। ও আমাকে গল্ফ খেলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে। মনে হয়, এটাই সহজ রাস্তা হবে।

M একটু ব্যঙ্গ করে বলে — ০০৭ এক জোচ্ছোর-এর সাথে গল্ফ খেলে সারাদিন কাটাতে এটা — ঠিক আছে। কিন্তু কী পথ ধরবে তুমি গল্ফ খেলতে খেলতে?

বন্ড বলে — গোল্ডফিঙ্গার খুব ধূর্ত। তবে একটা কিছু বলতে হবে সুযোগমতো।

— বেশ। ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের কাজটা কিন্তু নেহাত ফেলনা নয়। — M বলেন। গাঙ্গীর্থ নিয়ে M বলেন— গোল্ডফিঙ্গারে 'Z' মনোগ্রাম করা একটা বাট আমাদের হাতে এসেছে। ওর বাড়ি থেকেই সার্চ করে পাওয়া গেছে। যুদ্ধের পর থেকে এরকম কুড়িটা সোনার বাট আমরা পেয়েছি।

বন্ড বলে— কিন্তু SMERSH এর গোপন সিন্দুক থেকেই তো তাঞ্জিয়াসের সোনার বাটটা পাওয়া গিয়েছিল।

— বলতে গেলে সবকটি বাটই পাওয়া গেছে SMERSH -এর গুপ্তচরদের কাছ থেকে। আমি একটুও অবাক হব না, যদি শুনি গোল্ডফিঙ্গার ওদের ব্যাংকার বা অন্যকিছু।

বন্ড এখন তার DB III গাড়িটা নিয়ে রোচেস্টা উপকণ্ঠের কাছে ট্রাফিক জ্যামে পড়েছে। সিগারেট ধরিয়ে সে ভাবতে থাকে, M-এর সন্দেহ সত্যি হতে পারে। বিদেশে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন রাশিয়ান গুপ্তচর সংস্থা ঠিকমতো টাকা পায় না বলে অভিযোগ করে প্রায়শই। যাই হোক, আর্থিক সংকটের দরুন এই গুপ্তচরদের নানা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই খুব সম্ভবত, SMERSH -কে টাকা দেবার জন্য এমন একজনকে হাত করা হয়েছে, যে SMERSH -কেও টাকা জোগান দেবে আবার ইংল্যান্ডের আর্থিক ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে পারবে। এবং সৌভাগ্যবশত গোল্ড-ফিঙ্গারের মতো এক ধূর্ত, সাহসী এবং চতুর প্রবঞ্চককে তারা পেয়ে গেছে।

জ্যাম কাটতে শুরু করেছে। চ্যাথাম শহরের দিকে গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে বন্ড ভাবছিল, তাসের টেবিলের মতো খুচরো জোচ্ছুরি করে দশ-বিশ হাজার ডলার কামানোতেও কোনো দ্বিধা নেই গোল্ডফিঙ্গারের। SMERSH কে খুশি করা, রাশিয়ানদের হাতে রাখা, হয়তো এইভাবেই

যদি তাব কপালে বাশিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান — ‘অর্ডার অব লেনিন’ জুটে যায়। এক সর্বোচ্চ খেতাব জয়ের বাসনায় সে কোনোরকম অপরাধ করতেই পিছপা নয়। অবশ্য যে অপরাধমূলক কাজে টাকা আসবে।

ভাবতে ভাবতে অনেক সূত্রই তার মাথায় খেলে যায়। বন্ড ভাবে, লেনিনগ্রাদের গুপ্তচর প্রশিক্ষণ স্কুলে তার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাকে কাজে লাগানো হয়েছিল। এবং তার ফলস্বরূপ গোল্ডফিসারের ইংল্যান্ডে ঘাঁটি গেড়ে বসা এবং তা অবশ্যই SMERSH-এর নির্দেশে। তাকে বলা হয়েছিল কোন কোন কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে। বিষয় থাকবে, কোন গুপ্তস্থানে গিয়ে সোনার বাট রেখে আসবে। গুপ্তস্থান হল কোনো গাছের কোটর।

যুদ্ধশেষে গোল্ডফিসারের রমরমা অবস্থা। তাকে এবার বলা হল এক নির্দিষ্ট তারিখে স্টেশনের মালপত্র রাখার লকারে সোনা রেখে আসতে। সোনা রেখে তিনি যেন ভুলেও পিছন দিকে না তাকান। সাবধানতা প্রয়োজন। শুধু বছরে SMERSH-এর কোনো প্রতিনিধি গোপনে তার সঙ্গে দেখা করে লিখিত নির্দেশ তার পকেটে ফেলে দিতেন। গোল্ডফিসারের তার নিজস্ব সোনার বাটে ‘Z’ খোদাই করার দস্তই তাকে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের কর্নেল স্মিয়ার্স নামক লোকটিকে ভাবিয়ে তোলে।

কী এক ঘাতক চক্রের সাথে গোল্ডফিসার নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছেন এক চরম সম্মানের লোভে। অপরিমিত টাকা জুগিয়ে গেছেন এই SMERSH-কে। লোকের চোখে স্বর্ণ-ব্যবসায়ী, ধাতু-বিশেষজ্ঞ বা কোনো খানদানি ক্লাবের ভদ্র নিরীহ সভ্য আদতে অন্তরালে থাকা কত বড়ো শয়তান, তা সত্যিই চট করে অবিশ্বাসযোগ্য। যে SMERSH, রাশিয়ান ভাষায় ‘Smiert Spionan’ অর্থাৎ ‘গুপ্তচরবৃন্দের শাস্তি মৃত্যু’, হাজার হাজার লোককে খুন করেছে, শেষ করে দিয়েছে অনেক বিদেশি গুপ্তচরদের, তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছে গোল্ডফিসার।

আবার এ চিন্তাও ঠিক, সারা বিশ্বে কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে জোরদার করতে টাকার প্রয়োজন। তাও জোগান দিয়ে চলেছে গোল্ডফিসার।

তবে M এবং বন্ড ছাড়া এই মুহূর্তে বোধহয় আর কেউ গোল্ডফিসার মহাশয়কে সন্দেহ করতে পারেনি। যদি মায়ামি এয়ারপোর্টে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ‘ট্রান্স-আমেরিকা কোম্পানি’-র ফ্লাইট দেরি না করত, তবে বোধহয় অগ্রিম দেখার সৌভাগ্য হত না তেনাকে দেখার। আবার ময়দানে নামতে হচ্ছে এক শয়তানকে ভূপতিত করার জন্য।

গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে একটা চৌমাথায় এসে বন্ড গাড়ির গতি কমাল। সে রাস্তার এদিক-এদিক দেখতেই বাঁ দিকে সাইনবোর্ডে একটা লেখা দেখতে পেল — ‘রেকুলভার’। গাড়ির স্পিডের কাঁটা কুড়ির নীচে রেখে এগিয়ে চলল সমুদ্রের দিকে। তট এত ছোটো যে, ট্রলার লাগানো অসম্ভব। রাস্তার দু’ধারে সারি সারি গাছ ও বাড়ি ছাড়িয়ে একটা কারখানার চিমনি দেখা গেল। কারখানার সামনে বন্ড এগিয়ে যায় — ‘থ্যান্ট অ্যালয়েজ’। গেটে লেখা — ‘আপনার প্রয়োজন এনকোয়ারিতে জানান।’

বন্ড দাঁড়াল না।

এখন বারোটা বাজে। বন্ড হোটেলে নিজের ঘরটা দেখে নিয়ে কিছু জিনিসপত্র রেখে নীচে স্ন্যাক বারে এসে মাস্টার্ড লাগানো স্যান্ডউইচ আর ভদকা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল স্যান্ডউইচের রয়্যাল সেন্ট মার্কস গলফ ক্লাবের উদ্দেশ্যে।

ক্লাবে এসে ক্লাবের দোকানঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মালিককে বন্ড বলে — হ্যালো আলফ্রেড ব্ল্যাকিং।

- কে? একটু দেখে নিয়ে আলফ্রেড বলেন- আবে কী সৌভাগ্য আমার! তু এতদিন বাদে? শুনলাম, আপনি কূটনৈতিক দপ্তরে আছেন। আপনার কী সেই নিয়মছাড়া গলফেব ক্লাব চালানোর অভ্যাসটা আছে তো?

বন্দ হেসে বলে - তা থাকবে না। তো মিসেস ব্র্যাকিং আর ছেলে মিসিল কেমন আছে?

হেসে আলফ্রেড বলেন- বাব্বাঃ, সবই মনে আছে দেখি। গত বছর সিসিল দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। এ বছর যদি গলফটা প্র্যাকটিশ করে যায়, হয়তো ফাস্টও হতে পারে। আপনি যদি প্র্যাকটিশ করতেন মি. বন্দ, তাহলে একজন পাকা গলফ খেলোয়াড় হতে পারতেন।

বন্দ মনে মনে ভাবে, তখন তার কুড়িও হয় নি। এই সেন্ট মার্কস এ কতদিন সে গলফ খেলেছে। তার খেলা দেখে আলফ্রেড তাকে সবসময় উৎসাহিত করে গেছেন। দীর্ঘ কুড়ি বছর বাদে আবার সে এখানে এল। সব পূর্ববৎই আছে। এসে বেশ ভালোও লাগছে। না, গলফ খেলে নাম করবে এমন চিন্তা কোনোদিন সে করে নি। 'মুনরেকার' বকেট নিয়ে কেলেঙ্কারিটা হল, তার জন্য 'খান থেকে দশ মাইল দূরে কিংসটাউনে এসেছিল। কিন্তু এখানে সে আসে নি। কী জানি, এলে হয়তো মনটা বেদনার্ত হয়ে যেত।

বেদনাময় স্মৃতির রেশ ধরে না থেকে বন্দ বলে -- তা হবে নাকি আলফ্রেড?

মনে হচ্ছে না। বছরের এই সময়ে খেলোয়াড় তেমন আসে নি। মানে ব্যাপারটা হল, এক মেস্বারের সাথে আমি খেলব ঠিক হবে আছে। তা আপনি কতক্ষণ থাকছেন?

- ঠিক আছে। অত উতলা হতে হবে না। তা মেস্বাটি কে?

-- আঞ্জে চিনবেন কী? নাম আরিক গোল্ডফিস্সাব।

বিলক্ষণ। তা উনি কেমন খেলেন?

- খারাপ না। তবে নয়ের হ্যাডিকাপ এ উনি বেশ অভ্যস্ত। সত্যি বলতে কী, ওই ভদ্রলোক আমাকে নিয়েই বেশি খেলেন।

আলফ্রেডেব শেষ কথাটিতে বন্দ বুঝল, আলফ্রেড তাব বেঙলাব কাস্টমারকে এনটারটেইনমেন্ট থেকে বিরত কবতে নাবাজ।

- তুমি সেই আগের মতোই আছ আলফ্রেড।

- আমার মনে হয়, আপনিই একই ক্রম আছেন। ব্যাপারটা কী জানেন, অনেকের ধারণা মি গোল্ডফিস্সার খেলার মধ্যে কোনো চালাকি কবেন। ধরুন, গ্রাউন্ডে পড়ে থাকা বলটাকে দেখে তিনি বলছেন যে, কী সুন্দর বলটা দাঁড়িয়ে আছে। এটা বলে তিনি এমন কায়দায় গলফ ক্লাব দিয়ে মাটিতে হিট করবেন, তখন সত্যিই বলটা লাফিয়ে গিয়ে--

আলফ্রেড চুপ করে যায়। আবার বলতে থাকে-- এটা নিন্দুকদের রটনা। রেকুলভারে নিজেই বাড়ি। ইদানিং লন্ডনে বেশি থাকছেন না। আর এলেই ফোন কবে জানতে চান, কেউ আছে কিনা। না থাকলে অগত্যা আমি কিংবা আমার ছেলে সিসিল। হ্যাঁ, আপনি যদি খেতে চান তো মিঃ বন্দ, তবে আমার কোনো আপত্তি নেই।

-- তাহলে তো তোমার আজকের ইনকাম বন্ধ হয়ে যাবে?

-- আপনি খেললে আজকে, আমি দোকানের অন্য কাজগুলো সেরে ফেলতে পারব। বরঞ্চ, আপনার জন্য একজন কাডি (যারা গলফের ব্যাগ বয়) দেখে দিই। হকারকে মনে আছে। আগেব মতোই আছে কিন্তু সে।

একটু চিন্তা করে বন্দ বলে - থ্যাংকস। তুমি বরং গোল্ডফিস্সারকে বল যে, আমি একটা গলফ ক্লাব কিনতে এসেছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে খেলার প্রস্তাবটা দেবে। হ্যাঁ, ওকে বলবে যে, আমি একজন এক্স মেস্বাব।

কিছু বলতে যাবার আগেই আলফ্রেড অন্য দিকে তাকিয়ে বলে— ওই যে, চকচকে হলুদ রঙের গাড়ি করে উনি আসছেন। এ আমরা বাল্যকালে দেখেছি।

বন্দ তাকিয়ে দেখল, পুরোনো মডেলের সিলভার গোস্ট রোলস রয়েস। আরও লক্ষ করল, ড্রাইভার ও তার পাশে বসা গোল্ডফিঙ্গারের মাথায় বোলার হ্যাট। ওরকম মড়ার মতো আসছে কেন?

প্রথমেই নিজেকে ধরা না দেবার জন্য আঁড়াল করল সে।

আলফ্রেড হেসে এগিয়ে গেল গাড়িটার কাছে।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ আট ॥

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে আলফ্রেড বলে— ওড আফটারনুন স্যার।

— চুকতে দেখলাম একটা অচেনা গাড়ি? — গোল্ডফিঙ্গারের কথাটা কানে এল বন্ডের।

আলফ্রেড বলে— এক পুরোনো মেম্বার এসেছেন। তার সঙ্গে খেলবেন কি?

— কে তিনি? কী নাম?

— আঞ্জে, মি. জেমস বন্দ!

বন্দ গোল্ডফিঙ্গারের থেকে বেশি দূরত্বে নেই। ঠোঁটে মৃদু হাসি ধরে রেখে কান খাড়া করে সে সব শুনছিল।

গোল্ডফিঙ্গার বলেন— ও! তা উনি কী জানতেন; যে আমি আজ এখানে আসব? একটু চুপ করে থেকে বলেন— কেমন খেলেন উনি? হ্যান্ডিকাপ কত?

— আঞ্জে স্যার, কুড়ি বছর বাদে উনি এখানে এলেন। তবে ভালোই।

ওদের কথা মতো বন্দ বেশ মনোযোগ সহকারে গলফ ক্লাব বার করে গালা ঘষে চলল।

দোকানঘরের দরজার সামনে এসে গোল্ডফিঙ্গার বলেন— আপনিই কি সেই মি. জেমস বন্দ, যার সাথে আমার—

— আরে, মি. গোল্ডফিঙ্গার যে! তা এখানে হঠাৎ?

— কেন, আমি তো বলেছিলাম, আমি এখানে খেলতে আসি। মনে নেই? মিস মাস্টারটনকে তো তোমার সাথে খেলব বলে দিয়েছিলাম।

— কাজের মধ্যে ভুলে গেছি আমি।

— নো প্রবলেম। আলফ্রেডের বদলে তোমার সাথেই খেলব। তোমার আমার দুজনের ইচ্ছাই মিটাব। তাছাড়া অনেকদিন আমি আসি নি এখানে।

বন্দ ভাবে, 'ওরে শালা ঢপবাজ!' সে বলে— একজন ক্যাডি পাওয়া গেলে ভালো হত।

— সেজন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না মি. বন্দ তোমাকে।

বন্দ যেন খুব নিশ্চিন্ত বোধ করল। বলে— তাহলে তো কোনো ভাবনাই নেই। কিন্তু একটা কথা, আমি কিন্তু বেট রেখে খেলি। রাজি তো?

বন্দ লক্ষ করল গোল্ডফিঙ্গারের চোখে মুখে স্রিয়মাণভাব। তবুও গোল্ডফিঙ্গার বলেন— বেশ। তোমার হ্যান্ডিকাপ এবং কোন মাঠ?

— নয় এবং হান্টারকোম্ব।

— ও কে । দেখ বোর্ডে লেখা আছে । আমাদের সব পছন্দই সমানে সমানে ।

বন্ড বলে -- তাহলে বাজির ব্যাপারটা ?

গোল্ডফিঙ্গার যেন এবার খুব উচ্ছ্বসিত । তিনি বলেন— মায়ামিতে তুমি যে দশ হাজার ডলার আমার থেকে নিয়েছিলে, সেটাই আমি—

থামিয়ে দিয়ে বন্ড বলে— ওটা একটা সুযোগ পেয়ে দাঁও মেরেছিলাম । ঠিক আছে, যদিও বেশি হয়ে যাচ্ছে, আমি খেলব ।

গোল্ডফিঙ্গার মিষ্টি হেসে বলেন— দেন মি. বন্ড, তোমার টাকাটা আমি দিয়ে দেব । কিন্তু দুঃখিত, আজকে খেলা হবে না ।

ক্রমে এসে আলফ্রেড বলে— স্যার, আপনি কিন্তু উলটো পালটা বা দুমদাম মারবেন না যেন ।

কথাটা শুনে বন্ড হেসে বলে— কথাটা মনে থাকবে আলফ্রেড । শোনো, চারটে হার্টস ছাপ মারা ‘পেনফোল্ড’ বল আর এক ডজন ‘টি’ নিয়ে এস । আমি একটু বাদেই আসছি ।

বন্ড দোকান ছেড়ে নিজের গাড়ির দিকে যাবার সময় পরিষ্কার বুঝতে পারল, গোল্ডফিঙ্গারের গাড়ির ড্রাইভার একটা মখমলি কাপড় দিয়ে গাড়ি মুছতে মুছতে তাকে বেশ ভালোভাবেই লক্ষ করছে । ড্রাইভারের মুখটা অনেকটা চৌকো, হলদেটে বর্ণের । গোল্ডফিঙ্গারের কোরিয়ান ভৃত্য কি ?

গলফ খেলবার পোশাক পরে বন্ড বেরিয়ে এল । সে ইচ্ছাকৃতভাবেই বাজির ব্যাপারটা তুলেছে । যাতে গোল্ড-ফিঙ্গার তাকে সমীহ করে । এবং তাই বন্ড দশ হাজার ডলারের বাজি ধরে । গলফ খেলার এই দ্বৈরথে এত বাজি বোধহয় কোনোদিন কেউ ধরেনি । আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল আর কলকাতার অপেশাদারি খেলা ছাড়া দর্শকরাই বাজি ধরে । মায়ামিতে বন্ডের পঞ্চাশ হাজার ডলাব নষ্ট হয়েছে । তাই সে এই বাজি থেকে কিছুটা তুলে নিতে চায় ।

আলফ্রেড বলে — আপনার গলফ বল আর টিগুলো হকারের কাছে আছে ।

বন্ড গ্রাউন্ডে এসে দেখল, গোল্ডফিঙ্গার প্র্যাকটিস করছেন । তবে তার মারার কায়দাটা বন্ডের ভালো লাগল না । তার ক্যাডি (যে গলফের ব্যাগ, ক্লাব, বল ইত্যাদি বহন করে) তার সামনে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা বল এগিয়ে দিচ্ছে ।

বন্ড দেখল হকার তার গলফ ক্লাব নিয়ে প্র্যাকটিসের ভঙ্গিমায়ে চালাচ্ছে । হকারের কাছে গিয়ে বন্ড বলল— গুড আফটারনুন হকার ।

প্রত্যুত্তরে হকার বলে — গুড আফটারনুন স্যার । প্রায় বিশ বছর বাদে । স্যার, আপনি কী এখনও স্টার্টারের ঘরের ছাদে বল ফেলতে পারবেন ?

— দেখি চেষ্টা করে । — বলে বন্ড গোল্ডফিঙ্গারের দিকে তাকাল । তিনি বন্ডের দিকে চেয়ে আছেন শান্ত মুখে ।

বন্ড তার একটা ক্লাব দিয়ে বল মারল । ঠিকমতো মারটা না হওয়ায় বলটা কিছুটা দূরে গড়িয়ে গিয়ে থেমে গেল । বন্ড তাকাল হকারের দিকে । বন্ড বুঝল তার এই ক্লাব চালানোটা সে মেনে নিতে পারছে না ।

বন্ড বলে— ও. কে. হকার । এইবার মার শুরু করব ।

বন্ডের পরের মার । দেড়শো ফুট ওপরে উঠে স্টার্টারের চালের ওপর গিয়ে পড়ল ।

হকারের মুখে হাসি । এবার তারা প্রথম টী-র (রবারের তৈরি) দিকে এগোতে লাগল । গোল্ড-ফিঙ্গারের ক্যাডি ফুকসকে ঠিক পছন্দ করত না বন্ড । বন্ড দেখল গোল্ডফিঙ্গারের ক্লাবগুলো বেশ বকঝক্কে । আমেরিকার বেন হোগান কোম্পানির তৈরি ।

টস হল। টসে জিতে গোল্ডফিস্সার একটা নতুন বল খুলে বললেন -- ডানলপ ৬৫। আমি এই বলেই খেলি। তোমার কী বল?

— পেনফোল্ড হার্টস।

- আশা কবি, আমরা নিয়ম মেনে উভয়েই খেলব?

অবশ্যই।

গোল্ডফিস্সার এবার মাটিতে পোঁতা টা-এর ওপর বল রাখলেন। তারপর যে কায়দায় ক্লাব চালালেন তা রীতিমতো অভ্যাস এবং দক্ষতা না থাকলে সম্ভব নয়। বন্ড বুঝল, এটা বপ্ত করতে ভদ্রলোককে পাঁচ হাজার ডলার খরচা করতে হয়েছে।

বন্ড এবাব নিজেব পজিশানে এল। বন্ডেব বল গোল্ডফিস্সারেব বল ছাড়িয়ে মাটিতে পড়ল, তাবপব আবও বেশ কিছুটা গড়িয়ে গিয়ে থামল।

প্রথম মাব উভয়েই দারুণ মাবল।

দ্বিতীয় বার গোল্ডফিস্সার যেন আরও নিপুণভাবে মারল। বন্ড বুঝল, তার তিনবারের বেশি লাগবে না বল গর্তে ফেলতে।

গলফের পেশাদারি সংলাপটা মনে পড়ল বন্ডের— ‘খেলায় জিততে হলে, প্রথম থেকেই জিততে হয়।’ কিন্তু এইবার তার আঘাতটা একটু ভুল হয়ে গেল। বলটা বালিভর্তি ‘স্কাফার’-এর মধ্যে পড়েছিল। গর্তটা তার থেকে প্রায় কুড়ি গজ দূরে। আবার ভুল। এবার বলটা গর্তের পাশে ‘গ্রিন’ (ঘাসে ভরা পরিষ্কার জায়গা) এ গিয়ে পড়ল।

প্রথম বাউন্ডটা বন্ড হেরে গেল।

বন্ড ধরেই নিল, ভাগ্যে হার থাকলে তা আটকানো যাবে না। তবে এবার আবও মনঃসংযোগ করতে হবে।

॥ নয় ॥

গোল্ডফিস্সার এবাব বলটা টি-এর ওপর বসাতে বন্ড তার কাছে গিয়ে তাকে বলে— আমাদের নিয়ম মেনে খেলবার কথা ছিল। যদিও তুমি এক গেম এগিয়ে গেছ।

আবার নিখুঁত মারলেন গোল্ডফিস্সার।

মনঃসংযোগ করে বন্ড ক্লাব হাঁকাল। বলটা গিয়ে পড়ল গ্রিনের ঠিক আগে। হয়তো সে দুবারের মধ্যে গর্তে বল ফেলতে পারবে।

বন্ড এবার বলে বসে— আচ্ছা তোমার সেই ‘অ্যাগোরাহেফবিয়া’ এখানে কোনোরকম অসুবিধার সৃষ্টি করছে না?

গোল্ডফিস্সার শাস্তভাবে বলেন— না।

পরের রাউন্ডে বন্ড জিতল। গেম এবার সমান সমান।

৩ নম্বরের দৈর্ঘ্য ২৪০ গজ। বন্ডের মারের আবার গোল্ডফিস্সারের মারটা জোরে না হওয়ায় একটা অসমতল মাটিতে গিয়ে বলটা পড়ল। গোল্ডফিস্সার তার ক্যাডির কাছ থেকে নতুন ক্লাব নিয়ে এগোতে গিয়ে ইচ্ছে করেই সেই অসমতল জায়গাটার ওপর পড়তেই ঘাসগুলি যেন মসৃণ হয়ে গেল। গোল্ডফিস্সার এবার বলটাকে ঠেলতেই গর্তের মাত্র তিন ফুট আগে এসে বলটা থেমে গেল।

বন্ড বুঝল, দারুণ কায়দায় জোড়ুবি। বন্ড ঠিক করল, সে গোল্ডফিস্সারের সঙ্গে খেলা চালিয়ে যাবে। যদিও তার খেলা উচিত নয়। বন্ড তাকে হাবিয়ে ছাড়বেই।

বন্দু এবার মন লাগিয়ে বল গর্তে ফেলল। এবারের মার ড্র হল। কারণ, দুজনেই তিনবার করে মেরেছে।

৪ নম্বরের দৈর্ঘ্য ৪৬০ গজ। এ দানটাও ড্র হল।

৫ নম্বরের তীতে বল বসিয়ে বন্দু একাগ্র হয়ে ক্লাব তুলে মারতে যেতেই ঠং করে একটা শব্দ হল। কিন্তু শব্দের দিকে অনুসন্ধানের মন না দিয়ে চোখ ঠিক রেখে ক্লাব চালান। বলটা ঠিক জায়গামতো পড়েছে কি?

গোল্ডফিঙ্গার মাটি থেকে একটা ক্লাব তুলছিলেন। বন্দু বলে— আমাব মনে হয় খেলার সময় সাবধান থাকাই ভালো। আর যেন হাত থেকে কিছু না পড়ে যায়।

সরি। হঠাৎই হাত থেকে পড়ে গেছে।— নির্বিকারভাবে গোল্ডফিঙ্গার বলেন।

ওরা এবার পরবর্তী গেমের জন্য তৈরি হতে থাকলে, গোল্ডফিঙ্গার বলেন তুমি যেন কোথাও আচ্ছ মি. বন্দু?

— ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট।

কী এক্সপোর্ট করে তোমাদের কোম্পানি?

বন্দু গোল্ডফিঙ্গারের শয়তানিটা বুঝতে পারল। তার মনঃসংযোগ নষ্ট করবার একটা চেষ্টা। সেটা বুঝতে না দিয়ে সে উত্তর দেয়— সেলাই কল থেকে যুদ্ধের ট্যাঙ্ক পর্যন্ত।

— তোমার কোন ডিপার্টমেন্ট?

— আর্মস। আরবদের শেখ ভারতের রাজা বাদশাদের কাছেই অস্ত্র বেচি আমি। তাছাড়া যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, তাদের কাছেও অস্ত্র বেচি। দিব্যি সময় কেটে যায়। তবে এতে কোনো ভবিষ্যৎ দেখছি না। এক সপ্তাহের ছুটিতে লন্ডনে এসেছি। ভাবছি কানাডা চলে যাব।

গোল্ডফিঙ্গারের এবারের মারে বলটা গিয়ে পড়ল পাথর-ভর্তি একটা বাস্কারের মধ্যে। কিন্তু গোল্ডফিঙ্গার এইবার তিনবার বল গর্তে ফেলতে পারেন। নিজের তোলা শ্রম্বে নিজের মনটাই মারে বিঘ্ন ঘটিয়েছে তার।

বন্দু তার মারের জন্য দৃষ্টি ঠিক করল। আবার ঠনঠন মতন শব্দ। গোল্ডফিঙ্গার তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুঁচরো পয়সা নাড়াচ্ছেন।

বন্দু বলে— তোমার ধনসম্পত্তির আওয়াজটা এখন বন্ধ রাখলে ভালো হয়। বন্ডের মারে বলটা এবার একটু ভালো জায়গাতেই এসে থামে। গোল্ডফিঙ্গার তার বলটা বাস্কার থেকে বার করে গর্তের মুখে নিয়ে গেলেন। বন্দু এবারও ঠিক মারতে পারল না। এ দানটাও ড্র।

৬নং গর্তটার নাম 'কুমারীকন্যা'। পৃথিবীর মধ্যে এটা নাকি খ্যাতনামা ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের কোর্স। টি থেকে অল্প দূরত্বের গর্তের পাশে উলটোপালটা বাস্কার। এবারের মারের পর তারা গ্রিনের দিকে হেঁটে চলল। গোল্ডফিঙ্গারের বলটা এক লম্বা গর্তের মধ্যে পড়েছে। বাস্কারে নেমে গোল্ডফিঙ্গার ক্লাব ঘুরিয়ে চালাতেই একরাশ বালি ছিটকে এল। বলটা গর্তের মুখে এসে থেমে গেল।

বন্দুকে এবার দু'বারের মধ্যে বল ফেলতেই হবে। নইলে তার পরাজয়। বন্দু আবার চেষ্টা করল। না, দু'বার মেরেও সে পারল না। এক গেম পিছিয়ে গেল সে।

নিজের ওপরই রাগ হতে থাকল। মাত্র কুড়ি গজ দূর থেকে দু'দু'বার সে ব্যর্থ। আরও একাগ্র হল সে।

পরপর দুটো গেম গোল্ডফিঙ্গার জিতে গেলেন। তিনি গেম পিছিয়ে পড়ল বন্দু।

নতুন একটা ক্লাব নেওয়ার সময় হকার বন্দুকে বলে — স্যার বাস্কারের মধ্যে লোকটার চোখে পড়ে নি আপনার?

— আমি দূরে ছিলাম অনেকটা। কেন, কী করেছে?

হকার বন্ডকে নিয়ে কোনো উত্তর না দিয়ে ৯নং-এর একটা বাস্কারের কাছে গিয়ে বলল— দেখুন স্যার, এই বালির মধ্যে একটা গর্ত তৈরি করে একটা বলকে অর্ধেক চুকিয়ে দিলাম। আচ্ছা, গর্তটা দেখবার জন্য গোল্ডফিস্কার একবার লাফ দিয়েছিল, মনে আছে? — বলে পা দিয়ে লাফ দিয়ে মেরে দেখিয়ে দেয় হকার।

বন্ড মাথা নাড়ে। বলে— আচ্ছা!

হকার ৯নং গর্তের দিকে দেখে নিয়ে ঠিক গোল্ডফিস্কারের মতো লাফ দিয়ে বন্ডকে পায়েব কাছে বলটাকে দেখতে ইশারা করল। ওর জোড়া পায়ের চাপে গর্তটা প্রায় সমান হয়ে গেছে।

সব দেখে বন্ডের মুখ লাল হয়ে ওঠে আরও। সে বলে— হঁ। তবে তুমিও জেনে রাখ মি. গোল্ডফিস্কার। আমি হারতে রাজি নই।

বন্ড-এর মনে এবার জেদ চেপে গেল। ১০ নং গর্তটা সবচেয়ে টাফ। বন্ড ঠিক করল, চারটে শটে সে খেলা শেষ করবে। এক নামি গলফ খেলোয়াড়, নাম ফিলিপ স্ক্রাটন— চোদ্দোটা শট নিয়েছিল গর্তে বল ঢোকাতে। বন্ডের কপাল যদি ফেবার করে। তাহলে এ দানটা ড্র হয়ে যেতে পারে।

পরের শটে বন্ডের বল গর্তে ঢুকছে। হকারের দিকে তাকিয়ে বন্ড চোখ টিপল। পরের টি-এর দিকে যাবার সময় বন্ডকে গোল্ডফিস্কার বলেন— বলটা কী করে যে তুমি গর্তে ঢোকালে!

বন্ড মৃদু হেসে বলে— সবই কপাল।

আবার একটা করে শটের পর দু'জনেই ক্লাব চেঞ্জ করে এগোল।

বন্ড এক ঝলক গোল্ডফিস্কারের মুখটা দেখে নেয়। যেন কত নিশ্চিত আছে সে। বন্ড বলে— আচ্ছা মিস জিলের খবর কী? ওর সঙ্গে একবার যদি দেখা হত।

গোল্ডফিস্কার একটু হেসেই সহজভাবেই বলেন— চাকরি ছেড়ে চলে গেছে।

বন্ডের হিটটা এবাব মনে হল বেশ জোবালো হয়েছে। গোল্ডফিস্কারের মুখের দিকে অনুমান করে ব্যবধান কমে আসাতে তার মনের অবস্থাটা কী। এবং এবার যদি শটটা জায়গামতো গিয়ে না পড়ে তাহলে.... বলটা উঁচু হয়ে পড়ল গ্রিনের বাঁদিকে বাস্কারের মধ্যে। এই গেমের বন্ড জিতে গেল। ব্যবধান কমে মি. অরিক গোল্ডফিস্কারের মাত্র এক গেমের এগিয়ে।

এরপর ১২ এবং ১৩ নম্বর ড্র।

১৪ নম্বর টি-র পাশে কল থেকে জল খেলেন গোল্ডফিস্কার। এটাও ড্র। আর চারটে গেম বাকি। বন্ড এখনও এক গেমের পিছিয়ে।

অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভাষ এখন অন্য মেজাজ। ১৪ নম্বরের কলের পাশে জল খেতে গিয়ে গ্লাসটা টিনের ওপর পড়ে আবার এক শব্দের সৃষ্টি। এবং নির্বিকার বন্ডের মুখ মুছে এগোতে থাকার সময় তার ছায়া বলের ওপর পড়ে বন্ডের শটে বাধার সৃষ্টি করল।

বন্ড বলে— মি. গোল্ডফিস্কার, তোমার কায়া যখন বর্তমান তখন আমাকে ছায়া দর্শন করাচ্ছ কেন? সরে দাঁড়াও।

যেন কিছু বুঝতে পারেন না তিনি। তারপর নীরবে সরে যান।

মনটাকে খেলার প্রতি নিবদ্ধ করে নিয়ে ক্লাব চালাল বন্ড। বলটা বাস্কারগুলোর বালির ওপর দিয়ে দারুণভাবে উড়ে গিয়ে একেবারে গর্তের মুখের কাছে এসে পড়েছে।

হকার এগিয়ে এলে বন্ড ক্লাবটা দেয়। হাটতে হাটতে হকার বলে — দুর্দান্ত শটটা মেরেছেন। ব্যাটা ছায়া ফেলে আপনাকে।

— ওই শটটা মেরেছে আলফ্রেড — বলে নিজে সিগারেট ধরায় এবং হকারকেও দেয়।
আবার বলে— নঙ্কর রাখবে। নইলে আবার কোন শয়তানি করবে কে জানে।

— আপনি নিশ্চিত থাকুন।

আবার দু'জনে গ্রিনে এসে দাঁড়াল। বন্ডের বলটা দ্বিতীয় শটে গর্তের ঠিক দুইইঞ্চি দূরে।
গোল্ডফিস্কার নীরবে গ্রীন থেকে বেবিয়ায় গেল। এটা বন্ড জিতল।

দুজনেই তিনটে শট হাঁকাল। কিন্তু ১৬ নম্বর ড্র হয়ে গেল। রইল বাকি দুই। গোল্ডফিস্কারের
প্রথম শটটা পড়ল এক ভাঙাচোরা জায়গায়। কামাল করল বন্ড। বন্ড প্রার্থনা করল, গোল্ডফিস্কারের
বল যেন একটা জঘন্য পয়েন্টে গড়িয়ে যায়। শেষ দুটোর যে কোনো একটা ড্র হলে অন্যটা যদি
সে জেতে, তাহলে গেম তার হাতের মুঠোয়।

ওদিকে বন্ডের ব্যাগ নামিয়ে রেখে হকারের গোল্ডফিস্কারের বল খোঁজাটা কেমন যেন লাগে।

যে উঁচু নীচু ঘাস মাটির মধ্যে গোল্ডফিস্কারের বলটা পড়েছে, বন্ড ঠিক মনে করতে পারল,
সে ওদিকটায় যায় নি। হঠাৎ একটা বলের ওপর তার পা পড়াতে ভাবল, এটা কী সে পায়ের
চাপে মাটির মধ্যে বসিয়ে দেবে? না, চাপ দিয়ে ঘাস না সরিয়ে বলে— পেয়েছি। ডানলপ ৬৫।
কিন্তু পরমুহূর্তেই বলে উঠল— না না, তুমি তো ডানলপের ১ নম্বর বল প্রেফার কর। এটা ৭
নম্বর বল। — বলে বলটা তুলে নিয়ে গোল্ডফিস্কারের দিকে হেঁটে গেল।

বলটা দেখে উড়িয়ে দিয়ে বলেন— এটা আমার নয়। — বলে তিনি হাতের ক্লাবটা দিয়ে
ঘাসের মধ্যে বল খুঁজতে থাকেন।

বন্ড ভাবতে থাকে, তবে এটা কি অন্য কারো। না, তা তো হবার নয়। কোনো দাগ নেই
বলটাতে। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, গোল্ডফিস্কার বলেছেন যে, তিনি খেলার নিয়ম মেনে
চলবেন। খেলার নিয়ম অনুযায়ী যদি কোনো খেলোয়াড়ের হারানো বল পাঁচ মিনিটের মধ্যে না
পাওয়া যায় তাহলে তার পরাজয়। বন্ডের কাছে সুযোগ এসে গেল।

গোল্ডফিস্কারের কাছে গিয়ে বলে— সময় শেষ। তাহলে আমি —

— পেয়েছি স্যার। এই যে ১ নম্বর। — ক্যাডি চিৎকার করে বলে।

বন্ড গিয়ে দেখল ওটা ১ নম্বর বলই। একবারে নতুন বল। সবথেকে বড়ো কথা, বলটা দারুণ
জায়গায় রয়েছে। মৃদু হেসে বন্ড বলে— এও একটা কপাল।

শান্তস্বরেই গোল্ডফিস্কার বলেন— হ্যাঁ, তা তো বটেই।

গোল্ডফিস্কারের এবারের শটটা দুর্দান্ত হল। তবে বলটা ডানদিকের বাঁকারে গিয়েও পড়তে
পারে।

বন্ড হকারের কাছে এগিয়ে আসে। বলে— আমার রাইভ্যালের বলটা কোথায় গিয়ে পড়ল?
বাঁকার না গ্রিনে।

— গ্রিনেই স্যার। — হকার বলে বন্ডকে।

বন্ড এবার তার বলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হকার তাকে ক্লাব দিল। ক্লাব হাতে নিয়ে বন্ড শট
মারতে উদ্যত। গ্রিনের নীচ থেকে বল মারা বেশ কঠিন ব্যাপার। বলটা গ্রিনের একদিকে পড়ে
একটু খেমে গড়িয়ে নীচে এসে থামল। যদি না তিরিশ ফুট দূর থেকে গোল্ডফিস্কার এক শটে
বলটা বরাতজ্ঞারে গর্তে ফেলে দেয়, তাহলে পরের শটটা বন্ডকে ড্র করতে হবে। বন্ড সিগারেট
বার করে।

হকার বন্ডের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে— স্যার, ক্যাডিকে পাঁচ পাউন্ড ঘুষ দিয়ে গোল্ডফিস্কার
ওখানে অন্য বল রেখেছে।

বিস্মিত হয়ে বন্দ বলে- - তুমি নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখেছ?

হকারের চোখে মুখে রাগের সাথে ধূর্ত হাসি দেখা দিল। হকার বলে— মাফ করবেন স্যার, গোল্ডফিস্কার যে হারে জোচ্চুরি করে চলেছে, তাতে বাধ্য হয়ে আমি ওর বলটা আপনার ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

বন্দ হকারের কাঁধে হাত রেখে হেসে বলে— তুমিও কম বড়ো চোর নও। — তারপর হকারকে সিগারেট দিয়ে নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে বলে— যাকগে, এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে লোকটার শয়তানি বন্ধ করতে হবে। ভাব দেখি, কী করা যায়?

আচমকা বন্দের মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেল। গোল্ডফিস্কার তার দিকে পিছন ফিরে ক্লাব নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। তাই দেখে হকারকে বন্দ বন্ধে— শোন, এই বলটা নাও। গেমের শেষে, যেই মারুক না কেন, বল কুড়োবার সময় লোকটার বলের বদলে এই বলটা রেখে দেবে।

হকার বলটা নিয়ে হেসে বলে— আর বলতে হবে না স্যার।

গোল্ডফিস্কার গ্রিনের ডানদিকে দাঁড়িয়ে। হকার গ্রিনের ওপরে উঠে গেল। বন্দের বলটা গর্তের সামনে লাঠিতে ধাক্কা খেয়ে তিন চার ইঞ্চি দূরে দাঁড়াল। আর গোল্ডফিস্কারের বল দু'ফুট দূরে।

বন্দ ভাবে হকার যদি বল না তোলে তাহলে তার প্ল্যান ভেঙে যাবে। ভার্গাস গোল্ডফিস্কারের বলটা গর্তে পড়ে নি। সে গোল্ডফিস্কারকে বেশ মিষ্টি করে বলে— ঠিক আছে। এখনও একটা গেম বাকি আছে।

গলফের নিয়মানুযায়ী, প্রথম থেকে শেষ গেম পর্যন্ত একরকম বলে খেলতে হবে। ফলাফল যাই হোক না কেন, কোনো গেমের অন্য বল নেওয়া মানে সে গেমের পয়েন্ট মাইনাস হওয়া। অর্থাৎ, সেই গেমের হার হবে।

সতেরোটা গেম হয়ে যাবে। পর শেষ গেমের বল ঠিক আছে কিনা তা নিয়ে তখন আর চিন্তা করলে চলে না।

বন্দ ভাবছে, গোল্ডফিস্কার যদি ৭ নম্বর দিয়ে এখন যদি শট মারে, যা ১ নম্বরের মতো দেখতে অবিকল, তাহলেই গেম তার হাতে মুঠোয়।

গোল্ডফিস্কার এবার মারবার জন্য প্রস্তুত। বন্দ ভাবছে, বল দেখতে গিয়ে যদিও ওর চোখ পড়ে যায় বলের দিকে। না, গোল্ডফিস্কার শুধু শটের দিকেই নিবদ্ধ ছিলেন। অসাধারণ স্টাইলে শটটা নিলেন তিনি।

না, কোনো দুঃখই হচ্ছিল না লোকটার জন্য। লোকটা এখন নিজের চালে নিজেই পা ফসকেছে। দু'দু'বার জোচ্চুরি করে উতরে গেছেন গোল্ডফিস্কার। সুতরাং, এরকম লোকের সাথে যদি জোচ্চুরি করেই জিততে হয়, তো কোই আপশোশ নেহি। তাছাড়া বন্দকে এ খেলায় জিততেই হবে। আর জিততে পারলে গোল্ডফিস্কার পর পর দু'বারই বন্দের কাছে অবনত হল। ধূর্ত, শয়তান, সর্বশক্তিমান গোল্ডফিস্কার বন্দের কাছে দু'বারই পরাজিত। তাহলে গোল্ডফিস্কার মনে মনে তার ক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য। ফলে তার কোনো কাজের জন্য বন্দকে সে মোটারকম অফার পর্যন্ত করতেও। কী জানি—বন্দ ভাবে—তার ধারণা ভুলও হতে পারে। সেক্ষেত্রে সে কী করে গোল্ডফিস্কারের সাথে নিজেকে যুক্ত করবে? মাথায় একরাশ চিন্তা বন্দের মনে ঘুরপাক খেতে থাকে।

পরের শটটা গোল্ডফিস্কার দারুণ মারল।

বন্দ এবার ক্লাব চালিয়ে আলাতো ধাক্কা মেরে গর্ত থেকে ছ'গজের ওপর তুলে দিল। যাক, তাহলে গোল্ড ফিস্কারকে এবার চিন্তা করতে হবে।

গোল্ডফিস্কার এগিয়ে গ্রিনের ওপর দিয়ে গিয়ে দেখে এলেন. বলের লাইন গর্ত বরাবর আছে কিনা। বল মারবার জন্য তৈরি হলেন। গোল্ডফিস্কার ঘামতে শুরু করেছেন। কপালের শিরা উত্তেজনায় ফুলে উঠছে।

গোল্ডফিস্কার বল মারলেন। গর্তের ছ'ইঞ্চি দূরে গিয়ে সেটা থামল। কিন্তু ছ'গজের সামান্য কিছু বেশি দূরত্বে থাকা বলটাকে যদি তার ফোর্থ হিটে ফেলতে না পারে, তাহলে গোল্ডফিস্কারেরই জিত।

বল হিট করবার আগে কিছু কায়দা শো করে বলে— ফ্ল্যাগটা সরিয়ে নাও। আমি স্ট্রাইট গর্তে বল ফেলব।

না, বল্ড পারল না।

মুখে একরাশ হাসি নিয়ে গোল্ডফিস্কার হাতে একটা ক্লাব নিয়ে বন্ডের কাছে এসে ক্লাবটাতে হালকা ভর দিয়ে একদিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলে -- ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে খেলার জন্য। এবার তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, আমি তোমার থেকে ভালোই খেলি।

বল্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোল্ডফিস্কারের মুখের দিকে চেয়ে বলে -- নয়র হ্যান্ডিকাপ হিসেবে ভালোই। কিন্তু—

-- কিন্তু কী মি বল্ড? -- মুখে এক অবজ্ঞার হাসি।

বল্ড বলে— তুমি তো ডানলপের ১ নম্বর বল খেল। তো— বলেই সে হাতের বল দুটোর দিকে তাকিয়ে আবার বলে — আমি দুঃখিত মি গোল্ডফিস্কার, তুমি ৭ নম্বর নিয়ে খেলেছিলে। আর এর মধ্যে একটা হচ্ছে আমার 'পেনফোল্ড হার্টস'!

মুহূর্তের মধ্যে গোল্ডফিস্কারের মুখের পবিবর্তন ঘটে বিষাদখন রূপ নিল। বন্ডের হাত থেকে বল দুটোকে ছিনিয়ে নিয়ে উলটেপালটে পাগলের মতো দেখতে থাকল।

বল্ড শান্তভাবে বলে-- আমার খারাপ লাগছে মি. গোল্ডফিস্কার পরপর দুটো গেমেই তুমি আমার কাছে হেরে গেলে। এমনকি এই গেমে তুমি সবটাই হেরে বসে আছ।

মাথা নীচু করে মি. গোল্ডফিস্কার বলেন— কিন্তু কী করে সম্ভব?

— সেটা আপনিই জানেন মি. অ'বিক গোল্ডফিস্কার।

অকস্মাৎ তুফান তোলেন মি. গোল্ডফিস্কার-- তোমার ক্যাডিই এই জোচ্ছুরিটা করেছে। শেষ গেমে আগে ও-ই আমায় ইচ্ছে করে অন্য বল দিয়েছে।

শান্তভাবে বল্ড বলে— হকার তুমি কি এই শব্দতানিটা করেছে। যদি--

হকার অবাক হওয়ার ভান করে বলে— বলছেন কী স্যার। আমার সম্বন্ধে শেষে— আপনিই ভুল করছেন মি গোল্ডফিস্কার। ভুল করে আপনিই—

চিৎকার করে গোল্ডফিস্কার বলেন-- শাট আপ। একদম বাজে কথা বলবে না।

বল্ড তার কণ্ঠে বিদ্রুপ এনে বলে— আপনি বা'জ কথা বলবেন না স্যার। তাহলে আমি কিন্তু মানহানির মামলা করব।

গোল্ডফিস্কার নিজের মনেই গজরাতে থাকেন। সেটা লক্ষ করে বল্ড তার উদ্দেশ্যে বলে— আমার সঙ্গে খেলার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আশা করি, আবার আমাদের দেখা হবে।

ক্ষুব্ধ গোল্ডফিস্কার বলেন-- জানতে পারি জায়গাটা কোথায়?

বল্ড হেসে বলে -- সেটা খেলার মাঠ বা অন্য কোথাও হতে পারে। আমাদের ভাগ্যই সেটা ঠিক করবে।

বন্ডের দিকে চেয়ে গোল্ডফিস্কার ভাবতে থাকে।

বন্দ এখন বাথটবের মধ্যে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে তার দেহটাকে আরাম সলিলে ঝুবিয়ে রেখেছে। একে একে অনেক কথাই ভেবে চলেছে সে। তার ভাবনার মধ্যে বাদ যায় নি গোল্ডফিঙ্গারও। বন্দ হাত বাড়িয়ে লোয়ার র্যাক থেকে সিগারেট নিয়ে ধরায়। লাইটারের শিখার মধ্যে সে যেন গোল্ডফিঙ্গারের ধূর্ত, জ্বলন্ত ও নির্বিকার শয়তানি চোখ দুটো দেখতে পায়।

বন্দ ভাবে, গোল্ডফিঙ্গারের মতো ধনী লোকেরা অর্থ নামক অস্ত্রের আঘাতে বন্দকে আঠারো গেমের মধ্যেই শেষ করে দেবে। কিন্তু যার বিরুদ্ধে খেলতে এসেছেন গোল্ডফিঙ্গার তার কর্মজীবন ঝুঁকি ও বিপদ সদা বয়ে নিয়ে চলে সঙ্গে।

বাথ টব থেকে উঠে শাওয়ারে আরেক প্রশ্ন শরীরটাকে ঠান্ডা করে নিয়ে গা মুছতে মুছতে বন্দ ভাবে, গোল্ড-ফিঙ্গার কি তাকে এত সহজে ছেড়ে দেবে? ও কী প্রতিশোধ নেবে তাকে টেক্সা দিয়ে তার সাম্রাজ্যকে ধাক্কা দেবার জন্য? অথবা যে কোনো একজনকে সরে যেতে হবে? M কী করবেন তাহলে? যদি বন্দ আসল সময়ে তাকে বামালসমেত ধরতে ব্যর্থ হয়?

বিপ-বিপ-বিপ— ঘরের কলিং বেল বেজে ওঠে।

টাওয়াল জড়িয়ে বন্দ দরজা খুললে একজন বেয়ারা তাকে বলে— মি. অরিক গোল্ডফিঙ্গার আজ রাতে মি. জেমস বন্দকে তার সঙ্গে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রেকুলভারে, ওর বাগান বাড়িতে।

বন্দ বলে— তুমি জানিয়ে দাও তাকে, আমি যাব।

দরজা বন্ধ করে বন্দ আপন মনে হাসে। ভাবে— মাছ স্বয়ং নিমন্ত্রণ জানিয়েছে তাঁকে।

ঘড়ি ধরে ছ'টার সময় নীচে বারে নেমে এল। লেবু দেওয়া ভদকা খেতে খেতে দেখল বারে এই মুহূর্তে আমেরিকান বিমান বাহিনীর একদল অফিসার ছইস্কি নিয়ে আমোদে মেতে আছে। তাহলে এরাই কী হইড্রোজেন বোমা নিয়ে কেন্টের আকাশে উড়ে তাদের গলফ লক্ষ করছিল?

ভদকা বন্ডের মনটাকে চনমন করে তুলেছিল। খোশমেজাজে সে রেকুলভারের দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবল, এইবার গোল্ডফিঙ্গারের কাছে সে তার কাজের ব্যাপারটা বলতে পারে। তারপরের কাজ আরও কঠিন। সতর্ক হয়ে চলতে হবে তাকে প্রতিমুহূর্তে। না, রিভলবার না নিয়েই সে শত্রুর ডেরায় যাচ্ছে। যাতে কোনোরকম সন্দেহ গোল্ডফিঙ্গার তাকে করতে না পারে।

হ্যাঁ, গলফের শেষে বুদ্ধিমান গোল্ডফিঙ্গার শিষ্টতা বজায় রেখে বন্দকে বলেছিল যে, টাকাটা কোথায় পাঠাবে? ইউনিভার্সাল এক্সপোর্টের ঠিকানা দিয়েছিল বন্দ। আর দিয়েছিল হোটেলের ঠিকানা। তবে গোল্ডফিঙ্গার কালকেই ফ্রান্সের জন্য ফ্লাইট ধরবেন। সুতরাং, গলফ খেলা আবার কবে হবে, সেটা অনিশ্চিত।

রেকুলভারের দিকে এগিয়ে চলেছে বন্দ। স্টিয়ারিং হাতে, পায়ে কন্ট্রোল করছে ব্রেক, স্পিড আর মাথায় নানা চিন্তা। গাড়ি এবার পিচের রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথ ধরল। পথের দু'পাশে সুদীর্ঘ গাছের সারির মধ্যে দিয়ে একসময় সে এসে দাঁড়াল গোল্ডফিঙ্গারের বাগানবাড়ির সামনে। ভেতর থেকে খুব সম্ভবত কারখানার মেশিনের আওয়াজ আসছে।

বন্দ বেল বাজাল। দরজা খুলে দিল সেই কোরিয়ান ভৃত্য। একে কেন জানি না, বন্দ ঠিক সহ্য করতে পারছে না। মাথায় রয়েছে সেই বোলার হ্যাট। সে সিগন্যালের ভঙ্গিতে বন্দকে কোনদিকে যেতে হবে দেখিয়ে দিল।

একটা আবছা আলোয় ভরা হলঘরে ঢুকল বন্ড কয়েক গজ হেঁটে। ঘরের মধ্যে যেন এক মর্গের স্তব্ধতা। ঘর জুড়ে পুরোনো কিছু ফার্নিচার। বিরাট এক চুল্লিতে আগুন জ্বলছে। সোফার সামনে টেবিলে ট্রে-তে পানীয়, গ্লাস রাখা আছে।

ইশারায় ওই চাকরটি বন্ডকে সোফা, পানীয় দেখিয়ে পাশের দরজা দিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। বোধহয় ওটা সারভেন্টস রুম। পেছায় দেওয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ আরেক রহস্যের জাল বুনে চলেছে।

বন্ড ভাবে, যে লোক সোনার পিছনে ছুটে বেড়ায়, সেই এইরকম একটা ভুতুড়ে, নোংরা পরিবেশে থাকে কী করে? বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এই নিঃশব্দ পরিবেশটার কত পার্থক্য। নাকি এখানে অন্য কোনো কাজ হয়?

আচমকা টেলিফোনের শব্দ— যা এই নীরবতাকে কাঁপিয়ে দেয়। থেমে গেল শব্দটা বার তিনকে বাজবার পর। আবার শব্দ— টক-টক-গট-মট! এটা পদধ্বনি। বন্ড ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দরজা খোলার শব্দ। তার মানে কেউ এসেছে।

যে মূর্তিটি খয়েরি রঙের ভেলাভেটেব ডিনার জ্যাকেট পরে প্রবেশ করল, তিনি স্বয়ং অরিক গোল্ডফিসার। ঘরে ঢুকে গোল্ডফিসার বলেন— গুড ইভিনিং মি. বন্ড। এত তাড়াতাড়ি আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমার মতো আমিও একলা। এবার দুজনে বসে একসঙ্গে সময় কাটানো যাবে। আশা করি ভালোই কাটবে।

বন্ড নির্লিপ্তভাবে বলে— ব্যামসগেটে সময় কাটাবার মতো সেরকম কোনো জায়গা আমার নেই।

গোল্ডফিসার বলেন— আমি দুঃখিত। অগ্রিম মাফ চাইছি। আশা করি তুমি টেলিফোনের শব্দ পেয়েছ। আমাকে আধঘন্টার জন্য যেতে হবে। আমার এক কোরিয়ান কর্মচারী কাছাকাছি কোনো এক মেলায় ঝামেলা করে পুলিশের হাতে পড়েছে। ওটা মিটিয়েই আমি চলে আসছি। ততক্ষণ তুমি মন খুলে ড্রিংক করো, ম্যাগাজিন দেখো। ও, দাঁড়াও সব আলোগুলি জেলে দিই।

মুহূর্তের মধ্যে ঘরটা আলোর প্লাবন ভরে গেল। গোল্ডফিসার সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে গাড়ির শব্দ হয়। তবে এটা অন্য গাড়ি, রোলস রয়েস নয়।

স্বভাব অনুযায়ী বন্ড বাইরে বেরিয়ে আসে দেখে সব গুনশান। কিন্তু ব্যাপারটা কী? গোল্ডফিসার তাকে কি তার সাম্রাজ্য দেখাব সুযোগ করে দিয়ে গেল? নাকি অন্য কোনো রহস্য দেখা দেবে? বন্ড ঘরে ঢোকে।

সোফায় বসে সে ঘবেব চারদিক ভালো করে দেখতে লাগল। এই মুহূর্তে দৈত্যাকৃতি দেওয়াল ঘড়ি ছাড়া আব কারো শব্দ নেই। বন্ড টেবিল থেকে ড্রিংকসেব বোতল তুলে নিয়ে গ্লাসে জিন ও টনিক ঢালল। হাতে গ্লাস নিয়ে বন্ড ভাবতে থাকে, ফোনের ব্যাপারটা সত্যি হলেও হতে পারে। কিন্তু এখানে ক'জন কোরিয়ান চাকর বা কর্মচারী আছে? তারা কী কোনোভাবে বন্ডের ওপর সতর্ক নজর রাখছে গোপনে? গোল্ডফিসার প্রমিস করে গেছেন, তিনি আধঘন্টার মধ্যে ফিরবেন।

হাতঘড়ির দিকে তাকায়— অলরেডি সাত মিনিট কেটে গেছে।

বন্ড এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে সেকেন্ড পেগ বানায়। দ্বিতীয় পেগটা হাতে নিয়ে সে সোফা ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে করতে ভাবে, এমন সুযোগ সে হাতছাড়া করতে পারবে না। কিন্তু কী বলবে সে? বলবে যে, রাস্তায় গাড়িটা ট্রাবল দেওয়াতে কারখানায় কোনো মেকানিক্স পাওয়া যায় কিনা, দেখতে গেছিল।

দ্বিতীয় পেগটায় একটু চুমুক দিয়ে সে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। একটা লাইটের সুইচ। বন্ড এগিয়ে গেল সুইচটার দিকে? আরে এটা কী? একটা দরজা। দরজাটা সাবধানে খুলতেই একটা প্যাসেজ সুইচ অন করতেই প্যাসেজটা আলোকিত হয়ে যায়।

বন্ড আর দেরি করে না। পেগটা শেষ করে গ্লাসটা টেবিলে রেখে সে প্যাসেজে পা রাখে।

প্যাসেজটার একদম শেষে গিয়ে একটা লম্বা পাঁচিলের বাঁ দিকের একটা দরজায় দাঁড়াতেই রান্নার গন্ধ পেল বন্ড। আর ডান দিকের দরজাটা আলতো ঠেলা মারতেই কারখানার শব্দ পেল সে। এবং যে বারান্দাটা দেখতে পেল, তার সামনে, একটা দেওয়াল এবং তার গায়ে দরজা আছে। সতর্ক হয়ে সেই দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই দেখে একটা ছোটো অফিসঘর। অফিসঘরে ঢুকবার জন্য অন্য প্রান্তে একটা দরজা আর একটামাত্র খোলা জানলা।

জানলার কাছে এগিয়ে গেল বন্ড। জানলা দিয়ে কারখানাটার একাংশ দেখা গেল। কারখানা একদিকের দেওয়ালে বিভিন্ন সাইজের লোহার পাত দাঁড় করানো আছে। আর কয়েকজন কর্মচারী— তাদের মধ্যে চারজন কোরিয়ান, গোল্ডফিস্কারের রোলস রয়েস গাড়ি নিয়ে কাজ করে চলেছে।

আলোতে গাড়িটা বেশ ঝকঝক করছে। একটা দরজা খুলে রাখা হয়েছে। দুজন মিস্ত্রি একটা নতুন প্যানেল এনে দরজার ফ্রেমের ওপর সেট করছে। কোনো কারণে প্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, গোল্ডফিস্কারের আগামীকালের যাত্রার জন্য নতুন প্যানেল ফিট করা হচ্ছে। যদি সে ধরা পড়ে, তাহলে বলবে যে, গোল্ডফিস্কারের গাড়ির কাজ করছিল বলে বন্ড তখন আর ওদের বলতে চায় নি।

ঘরে ফিরে এল বন্ড। মনে হয় কেউ তাকে দেখে নি। হাতঘড়ি'ব দিকে দেখল— - গোল্ডফিস্কার ফিরে আসতে এখনও মিনিট দশেক বাকি।

বন্ড ঠিক করল, এবার সে দোতলায় যাবে। কেননা, শোবার ঘর, বাথরুম, ড্রেসিংটেবিল— এই সমস্ত জায়গাতে গোপন তথ্য লুকিয়ে রাখে সাধারণত এই শ্রেণির লোকেরা। কিন্তু গোল্ডফিস্কার কী এইবকম নির্জন স্থানে তার কোনো গোপন তথ্য রাখবে? কিন্তু এখানে সে কী বলবে? বলবে যে, মাথাবাথার ওয়ুধের খোঁজে সে এসেছিল।

আর দেরি না করে বন্ড এক হাত মাথার চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দর্শনে দুর্বল কিন্তু মনে মনে সবল হয়ে দোতলার জন্য সিঁড়িতে পা রাখল। উঠেই গ্যালারি এবং সেটা ছাড়িয়ে কতগুলো ঘর। একটা ভ্যাপসা গন্ধ ছড়াচ্ছে। এবার সে থামল এসে শেষের একটা ঘরের সামনে।

দরজা ঝেং ফাঁক করে বুঝল, এটা গোল্ডফিস্কার মহাশয়ের কক্ষ।

গোল্ডফিস্কারের ঘরে ঢুকতে যেতেই 'মিউ মিউ' শব্দ তুলে কোথেকে এক হতভাগা বিড়াল এসে বন্ডের পায়ের কাছে নির্ভয়ে ঘুরতে লাগল। তবে কি এটা গোল্ডফিস্কারের পোষা বিড়াল? মরুক গে যাক। বন্ড বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে গোল্ডফিস্কারের ঘরে ঢোকে।

আশ্চর্য! এই ঘরের গন্ধটা বেশ প্রাণভরানো, মিষ্টি। ঘরের লাগোয়া বাথরুমে নানান ব্যায়ামের জিনিস। একটা ব্যাচেলর পুরুষের ঘর যা বা যেরকম হতে পারে, এই ঘরটা ততটাই। দেওয়ালে অনেক ছোটো ছোটো আলমারি, বিছানার পাশে বুক সেলফে ইংরেজিতে লেখা ইতিহাস এবং নানান জীবনীমূলক বই। তবে বিছানার পাশে টেবিলের ড্রয়ব থেকে প্যারিসের প্যালেডিয়াম পাবলিকেশনস-এর একটা 'পার্নো বুক' পাওয়া গেল।

আর মাত্র পাঁচ মিনিট। ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে বন্ডের সিন্ধুথ সেক্স তার পা আটকে দিল কেন? কোনো গন্ধ, শব্দ বা কোনো কিছু'র উপস্থিতি? মশার গুঞ্জনধ্বনির মতো বোঁ বোঁ আওয়াজ। বন্ড বুঝতে পারল তার জন্য কোনো বিপদ আসছে নীরবে।

হাতখাঁড়ি জানিয়ে দিল— আর মাত্র ২ মিনিট। কী মনে করে বন্ড দেওয়ালে লাগানো একটা আলমারির তাল খুলতেই দেখা দিল একসারি কোট, যার পিছন থেকে শব্দটা হচ্ছে। কোট সরতেই বন্ডের চোখ মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

আলমারির ওপরে তিনটে ফুটো দিয়ে পুঞ্জীভূত হচ্ছে সর্পিলা ছন্দে আসা ১৬ মি.মি ফিল্ম।

তার মানে মুভি ক্যামেরা চলছে। তিনটে ক্যামেরা। কিন্তু সেগুলো ফিট করা আছে কোথায়? তার মানে গুটিং এব মতো গোল্ডফিস্কার আলোর বন্যা বইয়ে ক্যামেরার সুইচ অন করে বেরিয়ে গেছিল। হয় বন্ড, এই সামান্য ব্যাপারটা তোমার কাছে ধরা দিল না!

তাহলে মি বন্ড, গোল্ডফিস্কারের কাছে তোমাব উদ্ভবটা কী হবে? পাওয়ার মতো তথ্য কিছুই তো পাওনি তুমি। লোকে বলবে, কেন তুমি ভদ্রলোকের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েছিলে? এখন গোল্ডফিস্কার তোমাব যদি কোনো ক্ষতি কবেন? পুলিশে তোমাব বিরুদ্ধে চুরি বা অন্য কিছুর জোবাল্লা অভিযোগ আনেন। প্রমাণস্বরূপ হাতে তেঁা ফিল্মই রয়েছে। তাও আবার ১৬ মি. মি.।

চিন্তায় ছেদ পড়ে দরজা খোলার শব্দে। কে? — বন্ডের মুখ দিয়ে আচমকই কথা বেরিয়ে যায়।

— ‘মিউ, মিয়াউ! — বন্ডের দুর্শ্চিন্তা দূর হয়। সে একলাফে গিয়ে বিড়ালটাকে তুলে নিয়ে এসে আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে, সে জেমস বন্ড। হারতে জানে না। তাহলে? চকিতে বৃদ্ধি তাকে রাস্তা বলে দেয়। সদ্য গুটি হতে থাকা নেগেটিভ নিয়ে এসে ঘরের উন্মুক্ত আলোর সামনে মেলে ধবে। তারপর আলমারির দরজাটা খুলে রেখে বিড়ালটাকে মাথায় হাত বুলিয়ে মাটিতে বেখে ঘর ছাড়ে সে। যথাসম্ভব নিঃশব্দে চবণ ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে নৌচের ঘরে চলে আসে বন্ড। মাথাটা যেন ভার হয়ে গেছে। একটা পেগ তৈরি করে সিগারেট ধরিয়ে ‘দ্য ফিল্ড’ পত্রিকায় বেন ডারউইনের লেখা গলফ সম্বন্ধে লেখাটা পড়তে শুরু করে।

বন্ড এখন নিশ্চিত — কোনো প্রমাণ নেই গোল্ডফিস্কারের হাতে। নিজেকে অনেকটা হালকা বোধ করে।

হায় গোল্ডফিস্কার, এবারও তুমি পরাজিত। তবে আমি নিশ্চিত, SMERSH-এর বেশ কিছু গোপন তথ্য এখানেই আছে। গোল্ডফিস্কার, নিঃশব্দেই হবেন, প্রমাণ নষ্ট করাটাও বন্ডেরই সুনিপুণ কীর্তি। কিন্তু চালে তিনি ভুল করে গেছেন। বারবার। তবে এবার তাকে কোথাও হানা মারতে হলে আগে পিছনে চিন্তা করে ঝাঁপ দিতে হবে।

বন্ড নিশ্চিত্তে গ্লাসে চুমুক দিতে থাকে।

বন্ডের পিছনদিকে ঘাড়ের কাছে একটা মৃদু হাওয়া এসে স্পর্শ করে। গোল্ডফিস্কার ঘরে ঢুকছেন। বাইবে থেকে কোনো গাড়ির আওয়াজ বন্ডের কানে প্রবেশ করেনি।

বন্ড ঘাড় ধুরিয়ে তাকায়। শেষ চুমুকটা দিয়ে বলে আধঘন্টা পেরিয়ে গেছে।

॥ এগারো ॥

গোল্ডফিস্কার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে বলেন— হ্যাঁ, পাঁচ মিনিট। তবে ঝামেলা আপনা থেকেই মিটে গেল। আমার চাকরটিকে মদের আসরে মার্কিন বিমান বাহিনীর কয়েকজন ‘শালা জাপানি’ বলায় ও খেপে যায়। পুলিশকে বুঝিয়ে বললাম যে, কোরিয়ানদের জাপানি বললে ওরা রেগে যায়। যাই হোক, পুলিশই ব্যাপারটা শাস্ত করে দেয়। আশা কবি, তুমি খুব একটা বোর ফিল করনি।

-- না না, তুমি চলে যাওয়ার পর ডারউইনের গলফ নিয়ে লেখা পড়ছিলাম। বেশ ভালোই লাগছিল।

গোল্ডফিস্কার বলেন- তোমার খেলার ধরনটা অন্য স্টাইলে। আমি নানান রকম গলফ ক্লাব ব্যবহার করি খেলার সুবিধার্থে। ঠিক আছে, তুমি একটু ওয়েট করো, আমি ওপর থেকে চেঞ্জ করে আসছি। তারপর খাওয়া, গল্প হবে।

বন্দ দেখল গোল্ডফিস্কার দরজা খুলে সিঁড়িতে পা রাখলেন। আরে একী! বইটা তো সে উলটো করে ধরে আছে। আরেকটা পেগ তৈরি করে বইটা সোজা করে ধরে বন্দ ব্রেনহাইম প্রাসাদের একটা ছবির দিকে দেখতে লাগল।

মিনিট সাতেক বাদে গোল্ডফিস্কার নেমে এলেন। হাতে তার সেই বাদামি রঙের বিড়ালটা। ফায়ার প্লেসের কাছে গিয়ে একটা বেল বাজাল।

বন্দের সামনে বসে বিড়ালটার সারা দেহ হাত বুলোতে বুলোতে বলেন— তোমার বিড়াল, কেমন লাগে।

— ভালোই। বেশ শান্ত প্রাণী।

দরজা খুলে যে লোকটি ঢুকল, সে গোল্ডফিস্কারের সেই কোরিয়ান ড্রাইভার কাম-ভৃত্য। গোল্ডফিস্কার বলেন — এ আমার যাবতীয় অড জবস করে বলে, একে আমি 'অড জব' নামে ডাকি। অড জব তোমার হাত দেখাও।

অবিশ্বাস্য! হাতের দস্তানা খুলতেই বন্দ দেখল, অড জব-এর আঙুলগুলি প্রায় সমান সমান, ডগাগুলো ভোঁতা। হাতটা উলটোতেই দেখল, নখের বদলে শক্ত হলুদ বর্ণের খোলে ঢাকা।

গোল্ডফিস্কার এবার বলেন— আরও বাকি আছে। অড জব—

অড জব এবার সিঁড়ির ধার দিয়ে যে পোস্ত এবং মোটা ওক গাছের রেলিং উঠে গেছে, সেখানে উঠে গিয়ে যেন কাটারি মারার মতো ডান হাতটা বসিয়ে দিল। দ্বিতীয়বার বাঁ হাতটা। রেলিং-এর কোনো চিহ্ন নেই আর।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে গোল্ডফিস্কারের সামনে শান্তভাবে অড জব দাঁড়িয়ে রইল, যদি আরও কিছু নির্দেশ দেন তার প্রভু।

গোল্ডফিস্কার বিড়ালটাকে আদর করতে করতে বলেন— ফায়ার প্লেস। হ্যাঁ, মি বন্দ এবার ওর পা দুটো লক্ষ করবে।

— গাট আ হাব।

বন্দ বলে— মানে?

গোল্ডফিস্কার বলেন — ওর টাগরায় গর্ত আছে একটা। তাই কথাগুলি দুর্বোধ্য হয়ে যায়।

তোমার কোট আর টুপিটা খুলে রাখ।

অড জব কোট আর টুপি খুলে মেঝের ওপর রেখে প্যান্টটা ওর হাঁটুর ওপর পর্যন্ত তুলে নিয়ে ক্যারাটে মারার পোজ নিয়ে দাঁড়াল।

গোল্ডফিস্কার বন্দকে বলেন— আমাদের এখান থেকে সরতে হবে। নইলে অড জব যে কী করে বসবে কে জানে। — বলে গোল্ডফিস্কার সোফা এবং ড্রিংকস সুদ্ধ টেবিলটা, সরিয়ে দিয়ে বলেন— ওর খেলা দেখাবার রাস্তাটা এবার কিছুটা পরিষ্কার হল।

বন্দ ভাবে, গোল্ডফিস্কার কী তাকে ভয় দেখাবার কোনো প্ল্যান এঁটেছেন? অড জব, যার কথা মালিক ছাড়া নাকি কেউ বুঝতে পারে না এবং যে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে সে তখনছ নামক কেরামতি দেখাবে, তাতে সাধারণ মানুষের মৃত্যুভয় ছাড়া আর কী ধারণা হতে পারে?

গোল্ডফিস্কারের ইশারা পাওয়ামাত্রই অড জব চোখের পলকে উলটে দাঁড়িয়ে গেল। দু'হাত এখন পায়ের কাজ করছে। অর্থাৎ, শীর্ষাসন। আর এরপরেই অড জব দু'হাতে ব্যালাস্প রেখে

লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে গিয়ে ডান পা দিয়ে ফ্রি কিক মারার গতি নিয়ে জিনিসটার ওপর আঘাত হানল। ঘটনা করে এক প্রচণ্ড শব্দ হল। অড জব আবার মুহূর্তের মধ্যেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিস্মিত বন্ড ভাবে, সে নাইট ডিউটিতে জেগে নিরস্ত্র যুদ্ধ সম্বন্ধে যা লিখতে চলেছিল, বিভিন্ন বই পড়ে, নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তার মধ্যে এ কাহিনি তো আরও ভয়ংকর। সাবাশ অড জব, সাবাশ! তোমার ক্ষমতা অসীম। বন্ড হ্যান্ডশেক করতে যাচ্ছিল অড জবের সাথে।

গোল্ডফিঙ্গার বলেন— একটু সামলে, ধীরে হাত বাড়াও অড জব।

বন্ডের মনে হল, সে হ্যান্ডশেক করল শক্ত কাঠের সাথে।

গোল্ডফিঙ্গার বলেন— মি. বন্ড, দুম করে কিছু করতে যেও না। আমি না বললে উদ্বেজিত অড জব হয়তো তোমার ওই সুন্দর হাতের পাঞ্জাটাকে পিষে দিত। — এরপর তিনি অড জবের দিক তাকিয়ে বলেন— আমি নিশ্চিত হলাম অড জব, তুমি তোমার প্র্যাকটিশ ঠিকমতো চালিয়ে যাচ্ছ। এই নাও ধর। — বলে বিড়ালটিকে তিনি ছুঁড়ে দেন। অড জব ধরে ফেলে।— আবার বলেন — তুমি ইচ্ছে করলে এটাকে খেয়ে ফেলতে পারো। হ্যাঁ, আমাদের ডিনারের ব্যবস্থা করতে বলে দাও ভিতরে।

আনন্দে অড জব চলে গেল।

মনে একরাশ অস্বস্তি ও যন্ত্রণা হতে থাকে বন্ডের। সে বুঝল, গোল্ডফিঙ্গার তাকে সামান্য উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিল, বেশি ক্ষমতা দেখাবার চেষ্টা কোর না মি. জেমস বন্ড। যেমনি অড জবকে আমি বিড়ালটা খেতে দিলাম, প্রয়োজনে তোমার ব্যবস্থাও ওর হাতেই সঁপে দেব।

বন্ড এবার প্রশ্ন করে — আচ্ছা, আপনার ওই অড জব সবসময় টুপি পরে থাকে কেন?

গোল্ডফিঙ্গার আবার বেল বাজালে অড জব প্রবেশ করে।

— অড জব, তোমার টুপিটা কী জন্য মাথায় থাকে যেন?

অড জব মাথা নীচু করে প্রথমে তার প্রভুকে সম্মান জানায়। তারপর মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিয়ে সামনের দিকে ছুঁড়ে মারে। আবার নতুন চমক! টুপিটা গিয়ে ঘরে রাখা একটা অ্যালুমিনিয়ামের প্যানেলের সঙ্গে লাগল। ‘ঠং’ করে একটা শব্দ হল। মাটিতে টুপিটা পড়ে গেল।

গোল্ডফিঙ্গারের নির্দেশে অড জব টুপি তুলে নিলে গোল্ডফিঙ্গার এবার বন্ডকে বলেন— ওপরটা ফেণ্ট দিয়ে মোড়া, কিন্তু এক কঠিন মিশ্র ধাতু দিয়ে তৈরি এই টুপি। বুঝতেই পারছ মি. বন্ড, যদি কোনো মানুষের মাথায় বা গর্দানে গিয়ে লাগে, তবে দেহটা হয়তো দুটুকরোও হয়ে যেতে পারে। এমন এর ধার।

বন্ড বলে — আমার বিস্ময়ের শেষ নেই।

একটা ঘন্টার আওয়াজ শোনা গেলে গোল্ডফিঙ্গার বলেন— এবার আমাদের ডাইনিং রুমে যেতে হবে। -- বলে গোল্ডফিঙ্গার এগিয়ে একটা প্যানেলের গায়ে লুকানো বোতাম টিপতেই অদৃশ্য এক দরজা খুলে গেল। গোল্ডফিঙ্গার তাকে সসম্মানে প্রবেশ করতে অনুরোধ করে।

মাথার ওপর দামি ঝাড়লগঠন, টেবিলের ওপর স্ট্যান্ডে মোমবাতির আলো প্রতিফলিত হয়ে ঠিকরে পড়ছে রূপো আর কাঁচের বাসন থেকে। সাদা মেস জ্যাকেট পরা দুজন বেয়ারা ভাতের মতো নরম কী যেন দিয়ে গেল। বন্ডের মুখ দেখে গোল্ডফিঙ্গার হেসে বলেন— চিংড়ি মাছের মেনু ও দামি জার্মান মদ তুমি নিজেই চেলে নাও গ্লাসে।

টেবিলের ওপর রাখা বরফের বাস্ত্রের মধ্য থেকে বোতল বার করে বন্ড গোল্ডফিঙ্গারের আতিথেয়তার তারিফ করে।

গোল্ডফিস্কার মাথা ঝুকিয়ে প্রত্যন্তর দেন। এরপব গোল্ডফিস্কার বলেন— আমি মদ্যপান করিনা। ধূমপানও না। পরুন, কোনো জানোয়ার মুখে সিগারেট দিয়ে নাক দিয়ে খোঁষা ছাড়েছে। ব্যাপারটা কেমন লাগবে? একেবারে 'যাচ্ছেতাই'।

ফর্ক দিয়ে খাবার তুলে মুখে দিয়ে গোল্ডফিস্কার বলেন— আমি একজন কেমিস্ট হিসেবে মদের মধ্যে বেশ কয়েকটা বিষ পেলাম না আলাদা করে। যে মদ মানুষ খেলে মাতলামি বা অশ্লীলতা শুরু করে, তাকে 'হ্যাংওভার' বলে চালানো হয়। তোমাকে একটা কথা বলি মি. বন্ড, 'নেপোলিয়ান ব্রান্ডি' কখনোই খেয়ো না। এতে সবচেয়ে বেশি পয়জন থাকে। — বলে মুখে চিংড়ির কারি ঢোকালেন।

পেগে চুমুক দিয়ে বন্ড বলে— আসলে মদটাকে জ্বলন্ত কাঠকয়লাব মধ্য দিয়ে ফিল্টার করে অনেক বিস্মাক্ত সাবট্যান্সকে বাদ দিয়ে 'ভদকা' তৈরি করা হয়। সত্যি বলতে গেলে, আমি এখন ভদকাই বেশি খাই।

ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছে গোল্ডফিস্কার বলে— মনে হচ্ছে, তুমি কেমিস্ট্রি নিয়ে ঘাঁট;ঘাঁটি করেছে?

- খুব বেশি না। অল্প অল্প। — বলেই বন্ড বলে— আচ্ছা মি. গোল্ডফিস্কার, তোমাব ওই অড জব এইসব কায়দা শিখল কী করে?

গোল্ডফিস্কার ডাইনিং টেবিলের তলায় বেল বাজাতেই দু'জন বেযাবা এসে দাঁড়ায়। তাব ইশারাতে ওবা খালি প্লেট সরিয়ে নিয়ে যায়। তারপর বলে— আশা করি, ক্যারাটে তুমি জান। এর সর্বোচ্চ সম্মান হল 'ব্ল্যাক বেল্ট'— যা পৃথিবীতে তিনজন অর্জন কবেছে। এই ক্যারাটে হল প্রাচীন জুজুৎসু-ব একটি শাখা বা পববর্তী অধ্যায়।

গোল্ডফিস্কার আবাব বেল বাজালে বেযাবা এসে হাঁসের রোস্ট আর ১৯৪৭ সালের 'মুঠো রথস্চাইল্ড' মদ এনে দিল। তিনি বন্ডকে বলেন — নাও। খেয়ে দেখো।

খেতে খেতে গোল্ডফিস্কার বলেন— অড জব যা দেখাল, তা একটা সাধারণ নমুনামাত্র। ও যদি তোমার শরীরের যে কোনো একটি অংশে আঘাত করত, তা হলে তুমি এখন আমাব সঙ্গে বসে দামি মদসহ ডিনার করতে পারতে না। অবশ্য পুলিশ এলে বলা হত, প্র্যাকটিশের সময় মি. জেমস বন্ড কাছে এসে পড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

বন্ড বিশ্বয় প্রকাশ করে বলে — সেকী! আমি তো ভেবেছি, আমি যা জানি, তার এক ঘায়েই ওকে শেষ করে দেওয়া যায়।

গোল্ডফিস্কারের কানে যেন কথাই ঢুকল না। ন্যাপকিন দিয়ে তিনি তার মুখটা মুছে জল খেয়ে বলেন— মানুষের শরীরের পাঁচটি জায়গা ছাড়াও আরও ৩৭টি স্পট আছে এই ক্যারাটে বিদ্যে দ্বারা শুধু অড জবই নয়, যারা ক্যারাটে শেখে, তাদের প্রত্যেককেই শক্ত জিনিস, বালি ইত্যাদির মধ্যে মেরে মেরে শরীরের নানা অংশকে লোহার মতো শক্ত করতে হয়।

দুম করে বন্ড প্রশ্ন করে বসে— আচ্ছা, এই টুপি নামক অস্ত্রটা?

গোল্ডফিস্কার অপ্রস্তুত হলেও হার মানতে রাজি নন। তিনি বলেন— অড জব সব রকমের আত্মবন্ধার কৌশলই অভ্যাস করে বলেই জানি। আর ক্যারাটে এসেছে চিনদেশ থেকে। বৌদ্ধদের ধর্ম অনুযায়ী কোনো অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ। তাই শক্র, চোর, ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তারা আত্মবন্ধার এই কৌশল আবিষ্কার করে। এক সময় জাপান অধিকৃত ওকিনাওয়া দ্বীপে অস্ত্র নিষিদ্ধ হলে ক্যারাটের প্রচলন বেড়ে যায়। শরীরের পাঁচটি অঙ্গকে আসল অস্ত্র হিসেবে তৈরি করা

হয়-- হাতের মুঠো, চোটার পাশ, আঙুলের ডগা, কনুই এবং পায়ের গোড়ালি। এন্মাগত অভ্যাস এই অঙ্গগুলিকে কঠিন করে তোলে। তার প্রমাণ অড জবকে তো দেখলে।

বন্ড হেসে বলে - তাহলে কি পবে নেব, তোমার এই করুণ আসবাবপত্র কি অড জবের জনাই?

আবার অনেকটা জল খেয়ে গোল্ডফিসার বলেন - আমি এখানে আর বেশিদিন থাকব না।

-- আচ্ছা, অড জব কি বিড়াল নিয়ে প্র্যাকটিশ করে নাকি?

-- ছোটবেলায় দেশে একবার দুর্ভিক্ষ হয়। তখন থেকেই বিড়াল প্রিয় খাদ্য অড জবের। মি. বন্ড, তুমি হয়তো ভাবছ আমার নানারকম কাজের জন্য অড জবকে আমি রেখেছি, ঠিক তা নয়। ব্যাপারটা হল, পৃথিবীতে যে যত ধনী হয়, তার নিরাপত্তার জন্য লোক-ও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। অবশরপ্রাপ্ত কোনো পুলিশকর্মী ঠিকমতো কাজে আসে না। জেনে রাখ, পৃথিবীতে এই কোরিয়ানরাই সবথেকে নিষ্ঠীক এবং বেপরোয়াও বলা যেতে পারে।

-- এদের কোনো চাহিদা নেই? — বন্ড বলে।

— নিশ্চই। দেখ, এই টাকা দিয়ে অনেক কিছু করা যায় এই পৃথিবীতে। ওদের চাহিদা বা মনের শখ যাই বল না কেন, আমি অপূর্ণ রাখি না। ওরা আমায় কাজ দেয়, ঠিক আমি যেটা চাই। তাই আমিও বিমুখ করি না ওদের। কোনোরকম দুঃখ ওদের দিই না আমি! এমনকি মেয়ে নিয়ে আনন্দ স্ফূর্তিতেও আমি টাকা জোগান দিই ওদেরকে।

বন্ড বলে— সত্যিই তো। যারা তোমাকে দেখবে, তাদেরকেও দেখা তো তোমার পরম কর্তব্য। আর আমার ভালো লাগল, তুমি তোমার নিরাপত্তার জন্য সবরকম ব্যবস্থাই রেখেছ।

গোল্ডফিসার বলেন— আচ্ছা, তুমি এখন কি কববে বলে ঠিক করেছে?

— আমি আগেও বলেছিলাম, আবার বলছি কানাডায় চলে যাব।

— কেন?

— টাকা, টাকা। টাকা ছাড়া কী পৃথিবীকে কেনা যায়?

— কারেক্ট! তবে ব্যাপারটা কী জান। যখন টাকা হাতে আসে, সবরকম আনন্দ, স্ফূর্তি করবার বয়স তখন থাকে না। তা কোনো ভাবনা মাথায় আছে নাকি? — বন্ডের দিকে মাথা ঝুকিয়ে গোল্ডফিসার বলেন।

বন্ড জার্মান মদের পেগে চুমুক দিয়ে বলে-- হেরাইনের ধান্দা করতে গিয়ে শেষে প্রাণের মায়াম পালিয়ে এসেছি। আর লাইনটা ভীষণ গোলকধাধার মতো। যাই হোক, আজ রাত্রিটা আমার মধুব কাটল মি. গোল্ডফিসার। আশা করি, আমাদের আবার দেখা হবে এবং সেটা খুব শীঘ্রই।

ন্যাপকিনে মুখ মুছে বন্ড উঠে দাঁড়াল। গোল্ডফিসারও।

এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছে?

॥ বারো ॥

চিফ অব স্টাফের ঘরে পরদিন অফিস আওয়ার্স-এ টেলিফোন বাজতে শুরু করল। দিনের প্রথম টেলিফোন, কিন্তু চিফ অব স্টাফের মনে টেলিফোনের শব্দটা কেমন যেন শুভ অশুভ-এর দ্বন্দ্ব দোলা দিতে লাগল। চিফ অব স্টাফ সন্নিহিত ফিরে পেয়ে ফোন রিসিভ করলেন — হ্যালো।

-- ০০৭। কোড ল্যাংগুয়েজ ফলোজ।... অর্থাৎ, বন্ড যা ফোনে বলল, সে সব দেখে এসেছে।

M ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন।

গোল্ডফিস্কারের পুরো সম্পত্তিটা রহস্যময়। উনি আগামীকাল ফেরিফিল্ড থেকে প্লেন ধরবেন বিদেশের উদ্দেশ্যে। ফ্লাইট টাইমটা জেনে নিতে হবে। ওর রোলস রয়েস গাড়িটা আমায় কৌতূহলী করেছে। ইচ্ছা আছে, ওনাকে একটা রেডিও গিফট করব। চিন্তা নেই, আমি টাচ রেখে চলব। হ্যাঁ, গলফটা আমার পকেটস্থ হয়েছে।

চিফ অব স্টাফ বলেন— শুনলাম বেশ মোটা বাজির খেলা হয়েছে?

— কে বলল?

— মি. স্কটল্যান্ড (স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড) -এর কাছে খবর আছে, তোমার নামের এক আগন্তুক-এর কাছে বেআইনি ডলার আছে। সেরকম কেউ নয়। তবে তোমার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিচ্ছিল। সোজা জানিয়ে দিলাম, ওদের কমিশনারের কাছ থেকে সব কিছু জেনে নিতে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, ঠিক একই সময়ে তোমার সেক্রেটারি ডাকে দশ হাজার ডলার পেয়েছে।

বন্দ হাসে। মহা প্যাঁচ জানে তো লোকটা। তাকে ফাঁসাবার চেষ্টা। তবে মনে হয়, ইউনিভার্সাল এক্সপোর্টের ব্যাপারটা গোল্ডফিস্কার বিশ্বাস করে গেছে। লোকে অবশ্য জানে না যে, ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট আসলে ব্রিটিশ গুপ্তচর বাহিনীর ছদ্মনাম।

বন্দ বলে— তুমি এক কাজ করো, ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বলে দাও যে, টাকাটা আমি হোয়াইট ক্রসকে দিয়ে দিচ্ছি। আর বাকি ব্যাপারগুলো সামাল দিতে পারবে তো?....

— পারব। শোন যদি তোমার কোনো 'জরুরি প্রয়োজন' (বিপদ ও দেহরক্ষী) হয় জানাতে পার।

— ও. কে.। ছাড়ছি। বাই।

ব্যাগ গোছগাছ করতে করতে ভাবতে লাগল, তার কথাবার্তা সব রেকর্ড হয়ে গেছে এবং রেকর্ডটা চিফ অব স্টাফের অফিস থেকে শুনে নিচ্ছে মিস মানিপেনি, M -এর সেক্রেটারি — গোল্ডফিস্কার তার রোলস রয়েস গাড়ি নিয়ে ফোরফিল্ড থেকে প্লেনে উঠবেন। কাস্টমস যেন গোল্ডফিস্কারের গাড়িতে বেতার যন্ত্র লাগাবার বন্দোবস্ত করে। গোল্ডফিস্কার রওনা হবার প্লেনে উঠবার ঘন্টা দুয়েক বাদে একই পথে যাত্রা করবে ০০৭। ওর মতলব ভালো নয়। কোনো দরকার হলেই ০০৭ স্টেশনের সঙ্গে কনটাক্ট করে নেবে।....

এর মধ্যে ফোন এল। লন্ডন জানিয়েছে -- গোল্ডফিস্কার বেলা বারোটায় প্লেনে করে বিদেশ যাচ্ছে।

বন্দ এগারোটায় ফোবফিল্ডে পৌঁছোল।

চিফ পাসপোর্ট কন্ট্রোল, কাস্টমস অফিসারদের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল বন্দ। ওরা ভাবল বন্দকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লোক। ওরা যা ভাবছে ভাবুক। বন্দ শুধু বলল-- গোল্ডফিস্কার সৎ। কিন্তু ওর একজন চাকর কিছু মাল বাইরে স্মাগল করে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা সিক্রেটে। তবে কাস্টমস অফিসাররা যদি ওনার রোলস রয়েস গাড়িটার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করে নেন, তবে ব্যাপারটা কিছু বোঝা যাবে। কাস্টমস অফিসাররা রাজি হলেন।

ঠিক পৌনে বারোটো নাগাদ একজন অফিসার গাড়ির দরজার ওপরের জানালার মধ্য দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে চোখ মেরে বন্দকে বলেন— ওরা এসে গেছে। ভদ্রলোককে বলে দিচ্ছি প্লেনে উঠে পড়তে। ড্রাইভার উঠে গেছে। আর বলছি, আমরা আপনার গাড়ির নাড়ি-নক্ষত্র জানি। লোহার পাতে মোড়া তিন টন ওজন। প্লেনে কীভাবে ওঠানো যায় সেটাই দেখে নিচ্ছি। — এরপর অফিসারটি বলেন - সব ঠিক আছে।

বন্দ এবার পকেট থেকে একটা ছোট্ট প্যাকেট বার করে তার থেকে রেডিও ট্রান্সমিটার বার করে তারগুলো দেখে নিয়ে আবার পকেটে রেখে দিল।

এগারোটা পঞ্চাশতে অফিসারটি বলেন— ও. কে.। ওনারা উঠে পড়েছেন প্লেনে।

সিলভার গোস্ট গাড়িটার পাশে একটা ছাই রঙের ট্রায়ামফ TR 3 কনভার্টিবল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বন্দ দেখল, এর মধ্যেই গাড়ির ‘স্পেয়ার টুলস’ রাখবার খোপটা কাস্টমসের লোকেরা খুলে ফেলেছে। সে-ও চারদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে যায় ওই গাড়িটার কাছে। বন্দ পরীক্ষা করবার নামে সেখানে হাত ঢোকাতে থাকে। একসময় সুযোগ বুঝে, রেডিও ট্রান্সমিটারটা ফিট করে দেয় সেখানে। সঠিকভাবে ফিট হয়ে যায় সেটা। কাজ সেরে হাত ঝেড়ে কাস্টমস অফিসারকে শুধু বলে— ও. কে.।

অফিসার খোপের ওপর প্লেটটা বসিয়ে স্ক্রু লাগিয়ে দিলেন। রোলস রয়েস স্টার্ট নিল। এবার প্লেনে তোলা হবে গাড়িটাকে।

অফিসারটি বলেন— মোটামুটি যতটা দেখা হল তাতে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নি। যদি নিখুঁতভাবে সার্চ করতে হয়, তাহলে গাড়ির সব পার্টসই খুলতে হবে।

বন্দ বলে— যে পর্যন্ত কাজ হয়েছে তার বাইরে গেলে বাড়াবাড়ি হবে। প্লেনটা এবার ধীরে ধীরে রানওয়ের দিকে চলেছে। কয়েকমুহূর্ত। বন্দ তার গাড়িতে বসে ড্যাশবোর্ডের নীচে লুকোন একটা সুইচ-এ চাপ দিল।

প্লেনটা এখন সমুদ্রতীরের দিকে চলেছে তার ডানা মেলে।

বন্ডের গাড়িতে লাগানো রিসিভার সেটে ধরা পড়বে গোল্ডফিঙ্গারের গাড়িতে লাগানো ‘হোমার’ বা যে রেডিও ট্রান্সমিটারটা লাগানো হয়েছে এবং এর পরিধি ১০০ মাইল।

বন্দ কাস্টমস অফিসে এসে জানাল যে, সে দেড়টার মধ্যে আসছে। তার ফ্লাইট দুটোয়। আচমকা বন্ডের সারা শরীরে এক রোমাঞ্চকর হিল্লোল খেলে যায়। সে ভাবে— এবার কোথায় পালাবে বাছাধন।

ফ্রান্সের বিশাল সুন্দর N 38 রাজপথ N 1 বাস্তার সাথে কাট করেছে। এই মোড়ে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে সে সাইকেলে চেপে আসা এক জনকে ডেকে জিজ্ঞেস করে রোলস রয়েস গাড়িটার কথা। উচ্ছ্বসিত হয়ে লোকটি বলে যে, অমন চোখ-জুড়োন গাড়ি সে আগে দেখেনি। গাড়িটা ডান দিকে ঘন্টাখানেক আগে আবেভিল-এর দিকে গেছে।

এয়ারপোর্টে নেমে সে সংকেত পেয়েছিল ‘হোমার’-এর। কিন্তু গোল্ডফিঙ্গার যে কোনদিকে চুকেছে, সেটা সে ধরতে পারছিল। তার ভাগ্য খুলে দিল এই সাইকেল আরোহী।

‘ধন্যবাদ’ জানিয়ে বন্দ এগিয়ে চলল স্পিড বাড়িয়ে। মনে হয়, ইনি প্যারিস কিংবা রুয়েন-এর দিকে চুকেছেন। ধারণাটা ভুল হলে সব মাটি হয়ে যাবে।

‘হোমার’-এর আওয়াজ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। আবেভিল পর্যন্ত ৪৩ কি. মি. পথ সে পৌঁছে গেল পনেরো মিনিটের মধ্যে। বন্দ কী চিন্তা করে স্টিয়ারিং যোরালো প্যারিসের দিকে। একী! ‘হোমার’ এত আস্তে হয়ে গেল কেন? তাহলে কী—

বন্দ গাড়ি ডানদিকে ঘুরিয়ে এগোতে লাগল। জ্যামে ফেঁসে গেল সে N 30 রাস্তায় এসে। স্কীণ সংকেত ধরে সে এসে পৌঁছোল রুয়েন-এ।

শহর ছাড়িয়ে এখন কিছুটা ফাঁকা জায়গা। ‘হোমার’ আবার জোর হয়েছে। যদি শব্দ আবার স্কীণ হয়, তবে বুঝতে হবে গোল্ডফিঙ্গার রুয়েন ছেড়েছে।

মিনিট পনেরো কুড়ি অপেক্ষা করবার পর 'হোমার'-এর সংকেত এবার বেশ উঁচু হল। কানে লাগছে সাউন্ডটা। একটু কমিয়ে দিল। সামনে একটা তিন মাথার মোড় ঘুরে বাঁ দিয়ে ঢুকল বন্ড। পাঁচটা থেকে সাতটা। সূর্য অনেকটা ডুবে গেছে। রাতে যদি গোল্ডফিঙ্গার অর্লিয়েঙ্গে থাকেন, তাহলে বন্ডকে এক চিন্তা করতে হবে।

বন্ড কিছুক্ষণ ফগ লাইটের আলোতে চলছিল।

সামনে একটা ছোটো গাড়ি দেখা যাচ্ছে। কী গাড়ি ওটা? এম. জি. ট্রায়াম্ফ না অন্য কিছু? ওটা ট্রায়াম্ফ টু-সিটার। হেডলাইট জ্বালিয়ে বন্ড পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। আবাব ফগ লাইট জ্বালাল।

আবার সামনে ওটা কী গাড়ি। ব্যবধান কমিয়ে এনে বন্ড দেখল, ওটা রোলস রয়েস। অর্লিয়েঙ্গ শহর থেকে কিছুটা দূরে এসে গাড়ি থামাল। বন্ড ঠিক করে নিল, গোল্ডফিঙ্গার নিশ্চয়ই এখানে কোনো খানদানি হোটেলে উঠবেন। সব আরামের কথা ভুলে বন্ড সিদ্ধান্ত নিল হোটেল দ্য লা গের-এ সে শোবে আর স্টেশন বুফেতে খাবে।

খুব সতর্কভাবে ফলো করতে করতে বন্ড তার শিকারকে দেখে নিল, সে নদীর ধার বরাবর এক নামি হোটেলে ঢুকল।

বন্ড হোটেল দ্য লা গের থেকে স্নান সেরে পোশাক পরে স্টেশনের ওই রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে চলল। যাওয়া এবং নৈশভোজ খেয়ে ফেরবার পথে রোলস রয়েসটা যথাস্থানেই আছে দেখতে পেল।

পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে তৈরি হয়ে হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে সে নিজের গাড়ি নিয়ে চলে গোল্ডফিঙ্গারের আপাতত আরাম কবা ডেরার সামনে। কোনো মূল্যেই শিকারকে চোখের বাইরে করলে চলবে না। কোন ফাঁক দিয়ে বা কোনো বাস্তা দিয়ে কোথায় চলে যায়, তখন হবে সময় নষ্ট।

নিজের গাড়িটাকে হোটেলের পাশে একটা গলির মধ্যে রেখে গাড়ি থেকে নেমে এসে বন্ড নদীর ধারে গোপন করে বসল, অথচ সে সবকিছু দেখতে পাবে। তখন প্রায় সাড়ে ছটা। এইভাবে দুঘন্টা কাটাবার পব বন্ড দেখল, দুজন খর্বাকৃতি ওই হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে রোলস রয়েসে উঠল। যতক্ষণ না ওরা নদীর ধার দিয়ে বন্ডের দৃষ্টিতে ছোটো হল, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর এক দৌড়ে গিয়ে সে তাব গাড়িতে উঠে ওদেব পিছু নিল।

বন্ডের ভাবিত মনে ধাক্কা মাবল ছোটো ট্রায়াম্ফ গাড়িটার তীব্র হর্ন। যার মধ্যে বসে আছে গগলস পরা এক অপরূপ সুন্দরী।

বন্ড ভাবে, আহা আমার ছুটিব দিনে তুমি কেন এলে না। প্রেম জমে উঠত ধীরে ধীরে। তারপর মুখোমুখি বসে কতরকম খাওয়া, দামি মদ পান করা এবং একসময় কোনো হোটেলের মিষ্টি গঞ্জে ভরা সুসজ্জিত কামরায় নরম বিছানায় দুজনের দেহ মিশে এক হয়ে যেত। কিন্তু আজ বন্ডের মনে গেথে আছে গোল্ডফিঙ্গার। আচ্ছা, মেয়েটি কী পারফিউম ইউজ করে?

আরে, এতো গতকালের দেখা গাড়িটাই? কিন্তু মেয়েটিকে বা গাড়ির নম্বর তো সে লক্ষ করে নি। কে মেয়েটি?

সামনেই নেভারস সিটি। এখন তাকে গোল্ডফিঙ্গারকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। কিন্তু মাঝপথে এর কী ভূমিকা?

N 7 রাজপথ দিয়ে কনভয়ের মতো তিনটে গাড়ি চলেছে। আর একটু হলোই সে তার শিকারকে হাতছাড়া করে ফেলছিল। এই মেয়েটির জন্য। আচমকা এসে বন্ডের মনে এমন ঝড় তুলে দিল।

গোল্ডফিঙ্গার চলেছেন N 73 রাস্তা ধরে। N7 থেকে সোজা ডানদিক ঘুরে ইতালি কিংবা জেনিভার দিকেও হতে পারে।

হঠাৎ 'হোমার' এর আওয়াজ চড়াই পৌছে গেল। রোলস রয়েস এবার তার স্পিড কমিয়ে একটা চড়াইয়ের মাথা ছাড়িয়ে তার থেকে মাইলখানেক দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল।

কোথায় নিজেকে লুকোবে দেখতে গিয়ে রাস্তার পাশে একটা মাটির রাস্তায় গাড়ি নামিয়ে নিজেকে আড়াল করল বন্ড। দূরবিন দিয়ে দেখল নদীর ধারে বসে গোল্ডফিঙ্গার খাচ্ছেন। তার কোরিয়ান ড্রাইভার গাড়িতে বসে। একি! তারও যে খিদে পেয়ে গেল গোল্ডফিঙ্গারের খাওয়া দেখে। খাওয়া শেষ করে গোল্ডফিঙ্গার কাগজের টুকরোগুলো ব্রিজের তলায় সাবধানে রেখে দিল। অন্য কোনো জায়গায় না ফেলে ওখানে ফেললেন কেন উনি? তবে কী ওতে সোনার বাট রাখা আছে? বা গোল্ডফিঙ্গারকে করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যান্ড--তিন দেশের হাতের কাছে এই ব্রিজ।

ব্রিজের ওপর লেখা আছে— 79/6 অর্থাৎ, N 79 রাজপথের ওপর নির্দিষ্ট কোনো শহর থেকে 6 নং ব্রিজ।

গোল্ডফিঙ্গার রাস্তায় উঠে এসে গাড়িতে উঠে বসলেন। তার গাড়িটা অদৃশ্য হলে বন্ড সেইদিকে ছুটে গেল। কোথায় কাগজের টুকরোগুলো? সে এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে লম্বা মোটা ঘাস দেখতে পেল ব্রিজের নীচে। দেখল, ঘাসের তলায় খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন। হাত ঢুকিয়ে দিল সেখানে বন্ড।

মাত্র একটা সোনার বাট। বেশ চকচকে, ভারী। মাটি ঝেড়ে সেটাকে রুমালে বেঁধে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে নিল। মনে মনে ভাবল, যারা এসে শূন্য হাতে ফিরে যাবে, তারা গোল্ডফিঙ্গারের প্রতি এবার কী মনোভাব নেবে। বাটটার দাম কমবেশি কুড়ি হাজার পাউন্ড।

বন্ড তার গাড়ির কাছে এসে গাড়িতে উঠতে যেতেই হঠাৎ মনে পড়ল তার-- আরে ওই সুন্দরীসহ ট্রাফাম্ব গাড়িটা কোথায় গেল?

॥ তেরো ॥

গাড়িতে উঠেই বন্ড গাড়ির "পিছনদিকে" এক স্মৃতি গোপন খাঁজের মধ্যে এই লোভী এবং বিপজ্জনক বস্তুটিকে চালান করে দিল। SMERSH-যদি এটা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে, প্রাথমিকভাবে হয়তো ধরে নেবে, কোনো ভিখারি বা কোনো উটকো পাগল এটা পেয়ে চকচকে জিনিস দেখে নিয়ে গেছে। আর যদি সোনার বাটটা কোনো সুস্থ লোকের হাতে পড়ে, তাহলে SMERSH-এর ক্ষতি। অবশ্য তারা এ নিয়ে কোনো হই চই করবে না। বরং আরও সাবধান হবে।

সে মরুক গে যাক। বন্ডকে এখন সামনের কোণে ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের স্টেশনে জমা দিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। আর এর ফলে M নির্দেশ দেবেন, ব্রিজের ওপর নজর রাখতে। কে আসে এবং কোথায় যায়। কিন্তু M যদি সব জায়গায় নির্দেশ জারি করেন, তবে বন্ডের তাতে সায় নেই। অবশ্য গোল্ডফিঙ্গার বুঝতে না পারলে বন্ডেরই লাভ।

এখন গোল্ডফিঙ্গার জেনিভা না অন্য কোনো দিকে গেলেন, সেটা দেখতে হবে বন্ডকে। আর ওই সুন্দরীকেও। সে নির্ঘাৎ কোনো ঝামেলা পাকাবার মতলবে আছে। প্রয়োজনে ওকেও থামাতে হবে। এদিকে খিদেও পেয়ে গেছে খুব জোর। কিছু খেতেও হবে। গাড়িতে তেলও ভরতে হবে।

বন্দ এখন মেকোঁ শহরের বাইরে এসে গেছে। রোলস রয়েসের কাছে কাছেই থাকতে হবে। সেটা কোনদিকে গেল আগে সেটা দেখতে হবে।

এই তো দেখা যাচ্ছে রোলস রয়েসটাকে। গাড়ি করে আরোহী এখন একটা ছোটো ফোর পয়েন্ট ক্রসিং পেরিয়ে ব্রিজের ওপর দিয়ে সুইজারল্যান্ডের দিকে নিশ্চিত্তে এগিয়ে চলেছেন।

বন্দও একই পথ ধরে সেন্ট লরেন্ট-এর উপকণ্ঠে এসে পৌঁছোল। এবার কিছু খাবার কেনা দরকার। কী কেনা যায়? এখন সব থেকে ভালো মাংস আর মদ। গাড়ি আস্তে করতে গিয়ে হঠাৎ লুকিং-গ্লাসে চোখ আটকে গেল বন্দের। আরে ওটা কী?

সেই ছোট্ট ট্রায়াম্ফ গাড়িটা তার পিছনে। ব্যাপারটা কী? বন্দ ভাবতে থাকে। তার মানে ওই সুন্দরী তার পিছু নিয়েছে। নাকি কোথাও সে লুকিয়েছিল, যেই গোল্ডফিঙ্গারকে যেতে দেখেছে, অমনি তার পিছু নিয়েছে। দেখতে হয় তো তাহলে। কিন্তু রাস্তা কী? ভাবনাটা মাথায় খেলে যায়। খাবার কেনা আপাতত বন্ধ থাক। আমার আসল শিকার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলে তোমাকে যে ভুলতেই বসেছিলাম। কিন্তু তুমি যখন দেখা দিয়েছ, তখন আমি এর রহস্যও ভেদ করে ছাড়ব। এস আমার পিছন পিছন.... এস, এস। ট্রায়াম্ফটা গিয়ে ধাক্কা মারল— বন্দের ব্রেক কবে ব্যাকগিয়ার মারতেই এই আঘাত। মনে মনে ভাবে বন্দ, কী হে সুন্দরী আমাকে টপকে কোথায় চললে। দাঁড়াও, প্রেমালাপটা সেরে নিই। তারপর দেখা যাবে কী করতে পারি আমরা দুজনে।

দুজনেই গাড়ি থেকে নেমে আঘাত লাগা অংশটার কাছে এসে দাঁড়ায়। মেয়েটির মুখ লাল, চোখে আশ্রু। সে বলে— কী হল এটা? অসভ্যতার জায়গা পাওনি?

বন্দ বলে— বাক্বাঃ, এইটুকুতেই এত। আরে আরে, দারুণ দেখাচ্ছে কিন্তু তোমাকে।

মেয়েটি বন্দের কথার প্রত্যুত্তরে একটি থাপ্পড় দিতে গেলে, বন্দ চকিতে তার মুখ সরিয়ে হাতটা ধরে নিয়ে রসিকতা করে বলে— বাঃ, তোমার হাতটা তো দারুণ। সবকিছুই দারুণ অবশ্য। আচ্ছা, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

ক্রোজ, মিড-ক্রোজ এবং মিড শটে জনগণ এই মজাটা বেশ উপভোগ করছিল। কেউ কেউ আওয়াজের সাথে সিটিও মারতে লাগল।

বন্দ সব দেখে বলে— আমার মনে হয় তোমার গাড়ির ব্রেক ঠিক নেই। কী তাই তো?

মেয়েটি আমতা আমতা করে। বলে— তার মানে, তুমিই তো আচমকা এসে—

— যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তোমার রিপেয়ারিং-এর সব খরচা দিয়ে দেব।

মেয়েটি রেগে গিয়ে গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিল। একটা বিশ্রী আওয়াজ হতে লাগল। সে বলে— আমার রেডিয়েটরের পাখা ভেঙে দিয়েছ তুমি।

ইতিমধ্যে পাবলিক পাতলা হয়ে গেল। কোথা থেকে এক মেকানিক এসে উদয় হল। তাকে দেখে বন্দ ব্রেক ডাউন ভ্যান ডাকতে বলে। পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে তার থেকে টাকা নিয়ে সে মেয়েটিকে বলে— আমার দোষ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। গাড়ি সারিয়ে আর যা যা খরচা লাগে, আশা করি এতেই তোমার হয়ে যাবে কাল সকাল পর্যন্ত। কিন্তু আজ রাতে আমরা মিট করতে চাই। ব্যাপারটা ধরে নাও জরুরি।

— সরি। আজ আমাকে জেনিভায় গিয়ে একজনের সাথে দেখা করতেই হবে। দয়া করে, তোমার ওই গাড়িটায় পৌঁছে দেবে?

আশ্চর্য! মেয়েটির গলার সুর একদম পালটে গেল।

কয়েক মুহূর্ত মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল বন্দ। কী সুন্দর চোখ! না, এই চোখে কোনো ছলনা নেই।

মেয়েটিও তাকিয়ে আছে বন্ডের দিকে। অধীর প্রত্যাশা নিয়ে।

বন্ড বুঝতে পারে, না, সব দিক দিয়েই সৌন্দর্যের পসরা ওর শরীরে রয়েছে। কিন্তু পুরুষকে ঘায়েল করবার মতো পোশাক ওর শরীরে নেই। সাদা রঙের একটা মোটা সিল্কের শার্ট পরে আছে সে। নখে কোনো পেইন্ট নেই, হাতে বা গলায় কোনো গয়না নেই। হাতের আংটিটা মনে হচ্ছে ওর বাগদান-এর। কোমরে বেন্ট। তার নীচে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত স্কাট। যদিও তার পা দুটো বেশ আকর্ষণীয়।

তার আঁখিদ্বয়-এর মণি নীল, অধর বলে, আমাকে জাগানো শুরু কর। সব মিলিয়ে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেন পুরুষসুলভ মেজাজ। মেয়েটা যেন বলছে তাকে, দেখ হে, আমার থেকে তুমি সুন্দর হতে পার, আমি বুঝেছি, মেয়েদের তুমি পাগল করে দিতে পার, কিন্তু যে বিপদে আমায় ফেলেছ, তার থেকে তোমাকেই উদ্ধার করে দিতে হবে।

মেয়েটির গাড়ি থেকে পা নামিয়ে বন্ড বলে— আমি রাজি। তোমার মালপত্র সব নিয়ে এসে আমার গাড়িতে রাখ। ততক্ষণে তুমি আমাদের জন্য কিছু খাবার কিনে নিয়ে এস। আমার জন্য এক বোতল মেকোঁ নিও। আর রুটি, মাখন, লিয়ঁ সসেজ। তুমি যা খাবে—

মেয়েটি বন্ডের হাত থেকে টাকা নিয়ে বলে— ধন্যবাদ, বাঁচলে আমায়। তুমি যা খাবে, আমিও তাই খাব।

বন্ড বলে— এক মিনিট। মেকানিস্ত্র এলে তোমার নাম, ঠিকানা—

— মিস টিলি সোমস। বার্গেস হোটেল, জেনিভা।

এদিকের সব কাজ মিটে যেতে মিনিট পনেরো কুড়ি সময় লাগল। এরপর ওরা রওনা দিল। ‘হোমার’-এর শব্দ এখন খুব আস্তে। গাড়ির গতি দুরন্ত করল বন্ড। এখন N 84। মেয়েটির দিকে তাকাল বন্ড, তার চোখে-মুখে বেশ প্রফুল্লতা দেখা দিয়েছে।

বন্ড বলে— কেমন লাগছে?

হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাওয়া চুল ঠিক করে টিলি বলে— সত্যি, এরকম জার্নি আগে উপভোগ করি নি। আচ্ছা, তোমার গাড়িতে এই শব্দটা কীসের?

— ম্যাগনেটার। জোরে চালালেই এই শব্দটা বেড়ে যায়। সারিয়ে ঠিক করে নিতে হবে।

বন্ড গাড়ির গতি কমায়।

বন্ড ‘হোমার’ নিয়ে সতর্ক থাকতে চায়। একফাঁকে সে টুক করে ড্যাশ বোর্ডের নীচে হাত দিয়ে ‘হোমার’-এর সাউন্ড লো করে দেয়। তাছাড়া আরও একটা কারণ, সামনে সুইজারল্যান্ড বর্ডার। ওখানে গোল্ডফিসারকে কিছুক্ষণ ওয়েট করতেই হবে।

রাস্তার এক ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওরা খাওয়া সেরে নিল। দুজন দুজনের দিকে মাঝেমাঝেই দেখে যাচ্ছে। কী ভাবছে ওরা পরস্পরকে? রাস্তার দু’ধারে পাইন গাছের সারি এক মধুর হাওয়ায় ওদের শরীরকে আরামে ডুবিয়ে দিল।

আবার যাত্রা শুরু। মিস টিলি সোমস গাড়ির জানলা দিয়ে প্রকৃতিকে দেখে যাচ্ছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে বন্ড সহজভাবে বলে— টিলি, আজ রাত্রের মিটিং-এর ওপর আমার জেনিভা থাকা নির্ভর করছে। তুমি?

— এখনই বলতে পারছি না। ডেভন-এ মহিলা সুইস ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হচ্ছে। বলতে পারো, আমিও খেলব। তবে তেমন ভালো খেলি না।

গলফ খেলা বলল কেন টিলি? সন্দেহ লাগছে। বন্ড বলে— কোন মাঠে গলফ খেল?

— টেম্পল ময়দানে।

— ওখানেই থাক নাকি ?

— মানে ওখানে আমার এক মাসি থাকেন, হেনলিতে। সুইজারল্যান্ডে তুমি কি ছুটি কাটাতে চলেছ ?

— নো। আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত ব্যবসার কাজে।

বন্ডের গাড়ি এখন কাস্টমস বিভাগের কর্মীদের সামনে দাঁড়িয়ে। বন্ডের কাগজপত্র পরীক্ষা করতে করতে মেয়েটি তার সুটকেস নিয়ে 'মহিলা' লেখা দরজায় পিছন থেকে বেরিয়ে এল। এমনকি সে সুইস কাস্টমস বিভাগের পরীক্ষার সময়ও একই ঘটনা ঘটাল। প্রতি মুহূর্তে মেয়েটি বন্ডকে কৌতূহলী করে তুলছে।

বন্ডের গাড়ি এখন জেনিভায়, হোটেল বার্গের প্রকাণ্ড প্রবেশদ্বারের সামনে। মিষ্টি হাসি তুলে অসংখ্য ধন্যবাদ.... বাই' বলে সে হোটেলে ঢুকে গেল।

বন্ড অবশ্য বলেছে— আশা করি, আবার আমাদের দেখা হবে।

গোল্ডফিঙ্গারের চিন্তাটা নাড়া দিয়ে উঠল। দৌড়ে গিয়ে সে গাড়িতে উঠে 'হোমার'-এর সাউন্ড-বাড়িয়ে দিল। শব্দটা কম লাগছে। কোনো দিকে গেল লোকটা। মনে হচ্ছে এক মাইল দূরে চলে গেছে। বন্ড চলতে চলতে বাঁ দিকে টার্ন নিয়েছিল। সেদিকেই যাওয়া মনস্থির করল। এবং কিছুদূর চলার পর বন্ড একটা গ্রামে ঢুকল। গ্রামের প্রবেশের মুখে ধুলো পড়া একটা বোর্ডে লেখা : ভিলেজ — কপেট।

ওই তো গোল্ডফিঙ্গারের চোখ-ধাঁধানো গাড়িটা। একটা লরি এসে গার্ড করে দিল বন্ডকে। ম্যাজিকের মতো গোল্ডফিঙ্গার ভ্যানিশ। সহসা বন্ডের চোখে পড়ল প্রায় অনেকটা অঞ্চল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। যার প্রকাণ্ড দুটো লোহার গেট। গেটটা বন্ধ হতে শুরু করেছে। গেটের একটা পাল্লার গায়ে লেখা : 'এন্টারপ্রাইজেস অরিক, A.G.'।

চরম বিশ্বাসে নির্বাক বন্ড। এ শ্যালের ঐক্যেবঁকে অনেক দূর পর্যন্ত গর্ত খোঁড়া আছে। তার মানে—

চাবদিক দেখে নিয়ে কপেট গ্রামের জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি লুকিয়ে রেখে হাতে দূরবিন নিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সে কাঁটাতারের বেড়ার এক দিকে চলে এল। বন্ড চারপাশটা চোখ ঘোরাতেই বাদাম গাছের সারি দেখতে পেল। একটা কাঁটাতারকে পায়ে চেপে ধরতেই ফাঁকটা বড়ো হয়ে গেল। বন্ড ভেতরে ঢুকে পড়ল।

একটু এগোতেই জঙ্গল কমে আসাতে বন্ড একটা মোটা ফার গাছের আড়ালে চলে এল। এঞ্জায়গাটা উচ্চভূমি। নীচে কারখানার কয়েকটা বাড়ির ঘেরাটোপের মধ্যে রোলস রয়েস বিরাজ করছে।

চোখে দূরবিন লাগাতেই সে দেখতে পেল, সবচেয়ে বড়ো বাড়িটা টোকো প্যাটার্নের। যে দুটো বাড়ি এসে উঠোনের শেষে মিলেছে, সেখানে এক দীর্ঘ চিমনির মাথায় র্যাডার স্ক্যানার-এর মতো কী যেন অনবরত ঘুরে চলেছে। এখানে এ যন্ত্রটির কী প্রয়োজন? SMERSH-এর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ-এর জন্য। নাকি অন্য কোনো গুপ্ত তথ্য পাচার ?

ঘুরন্ত যন্ত্রটি তাকে নিয়ে ভাবিত বন্ডের মনে সহসা ছেদ ঘটাল। কোথায় যেন দস্তভরে ঢং ঢং করে ঘন্টা বেজে উঠল।

বন্ড চোখে দূরবিন রাখতেই দেখল, লাল বাড়িটার পিছন দিক থেকে মোটরের ড্রেস পরা গোল্ডফিঙ্গার বেরোচ্ছেন। সঙ্গে চশমা চোখে, ঝাঁটা গৌফওয়লা একটা চামচে ধরনের লোক।

দুজনেই খুশিতে উপচে পড়ছে। ওই চামচেটা বাঁশি বাজাতেই ডানদিকের দরজা খুলে চারজন মিস্ত্রি বেরিয়ে এল।

ফোরম্যান গোছেব একজন কিছু বলতেই সবাই রোলস রয়েসটার পার্টস খুলতে শুরু করে দিল।

কোথা থেকে অড জব আবির্ভূত হয়ে গোল্ডফিঙ্গারকে কী যেন আওয়াজ করে বলল। ফোরম্যানকে কিছু বলে গোল্ডফিঙ্গার ঢুকে গেল বাড়িতে।

না, আর থাকাটা বোকামি হবে।

ঘরের দেওয়ালে রানি এলিজাবেথের ছবি টাঙানো আছে।

বড়ো টেবিলের ওপারে বসা লোকটি বলে বন্ধকে— বলুন? কাফে চাই?

— আমি ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট থেকে আসছি। ব্যবসার ব্যাপারে আমি কথা বলতে চাই। অত্যন্ত দরকারি ব্যবসা।

লোকটি বুঝতে পারে ব্যবসার ব্যাপারটা। লোকটি চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। বন্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে— ০০৭? শুনুন, কাজ হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি সরে পড়ুন। ডুমন্ট কেলেকারির পর লোকাল গুপ্তচর এবং কমিউনিস্টরাও আমাকে নজরে রেখেছে। তোমার ওপর চোখ পড়লে এখানে ঝামেলা বাড়বে ছাড়া কমবে না।

বন্ড চটপট জামার ভেতর থেকে সোনার বাট দিয়ে বলে— লিখে নাও, খবর পাঠাতে হবে আরও। শর্টহ্যান্ডে লোকটি সব লিখে নিয়ে বলে— আরে, এ খবর পেলে সবাই চমকে যাবে। ঠিক আছে, বার্ন থেকে কূটনৈতিক মেসেঞ্জারদের ব্যাগে এই বাটটা লন্ডন পৌছে যাবে।

এরপর গোল্ডফিঙ্গারের কারখানা সম্বন্ধে লোকাল স্টেশনের লোকটির কাছ থেকে বন্ড সব জেনে নেয়। 'A.G.'— ধাতব আসবাবপত্র তৈরিতে দক্ষ। সুইস রেলওয়ে লোহার চেয়ার কেনে ওদের কাছ থেকে। 'মক্সা এয়ারলাইন্স' বিমান সংস্থা বিভিন্ন আসবাবপত্র নিয়ে জেনিভা থেকে ভারতে যাতায়াত করে নিয়মিত। গোল্ড ফিঙ্গারের কিছু শেয়ারও আছে নাকি 'মক্সা এয়ারলাইন্স'— এ। সুতরাং, গোল্ডফিঙ্গার তো কনট্রাক্ট পেতে বাধ্য।

করমর্দন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে বন্ড বেরিয়ে পড়ল অফিস থেকে।

বন্ড এবার সোজা গাড়ি ছোটাল বার্গেস হোটেলের দিকে।

বন্ড গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবতে লাগল— গোল্ডফিঙ্গার—এর এই 'রুপোলি প্রেত' রোলস রয়েস রুপোলি নয়। লোহার বদলে খাঁটি সোনা। যে লোহার পাত দিয়ে তার সারা দেহ মোড়া আছে। লোহার বদলে খাঁটি আঠারো ক্যারেটের সোনা।

॥ চোদ্দো ॥

জেমসকে এখন পাওয়া যাবে "দ্য বার্গেস" হোটলে—এর একটা আরামপ্রদ সুইট—এর বাথরুমে। এইমাত্র স্নান শেষ করে সে টাওয়েল জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরোল। নিজেই যৌবনদীপ্ত দেহটাকে পোশাকে ঢেকে বেরোবার জন্য তৈরি হল সে। সঙ্গে 'ওয়ালথার পি. পি. কে.', রিভলবারটা নেবে কিনা খুব মন দিয়ে চিন্তা করল। 'এন্টাবপ্রাইজেস অরিক' কারখানায় আবার হানা দিতে চলেছে সে। যদি ধরা পড়ে, তখন পরিস্থিতি বুঝে যা হোক কিছু বলা যাবে। না, ঠিক করল বন্ড, আর্মসটা সে সঙ্গে নেবে না।

রিসেপশনে জানতে পারল, মিস টিলি সোমস নামে কোনো মেয়ে এই হোটেলে ওঠে নি। তাহলে নাম ভাঁড়িয়ে হয় আছে, নয় পালিয়েছে।

দ্য বার্গেস থেকে বেরিয়ে বন্ড বাকবাকে পঁদ্যু মঁন্লা বরাবর গাড়ি ছুটিয়ে ব্যাভেরিয়া রেস্টোরাঁতে এসে ঢুকল। ওখানে নিরিবিলা জায়গা বেছে খাবার খেতে বন্ড ভাবতে লাগল, গোল্ডফিস্কার খুব সম্ভবত SMERSH গুপ্তচর সংস্থাকে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। ভারতে মুনাফা বেশি বলে তিনি ওদেশেই বেশি সোনা স্মাগল করছেন। ট্রলার ভেঙে যাওয়ার পর নতুন রাস্তা ধরেছেন। তার গাড়ির ব্যাপারে সবাই জানল, তিনি আর্মারড গ্রেট লাগিয়েছেন। যা ভারতীয় ধনিকশ্রেণি বা রাজারা কিনতেন। এবং এই গ্রেট সম্প্রতি কিনছেন, আরবের শেখ এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্টগণ।

প্রত্যেক স্মাগল-এর আগে তার গাড়ির আর্মারড গ্রেট খুলে সেখানে লাগানো হত সোনার পাত।

তারপর সেই গাড়ি সুইজারল্যান্ডের এই কারখানায় ঢুকলে তার কোরিয়ান কর্মচারীদের মতো এখানকার দক্ষ কর্মচারীরা সেই গ্রেট খুলে ফেলত, ওই গ্রেট খুলে গলিয়ে ঢালাই করে 'মক্কা এয়ারলাইন্সের' চেয়ার তৈরি করা হত। চেয়ারের ফ্রেমের ওপর চামড়া দিয়ে র‍্যাপ করে দেওয়া হয়। এয়ারলাইন্সের মালিকের সাথে নিশ্চয়ই বখরার ব্যাপারটা রয়েছে।

বছরে তিন চারবার এই যাওয়া-আসা ঘটে। সোনার জন্য প্লেনের ওজন বেড়ে যাওয়ায়, যাত্রী এবং মালপত্রের ওজনও কম করতে হয়। বোম্বে অথবা কলকাতায় প্লেন নামিয়ে সারানো এবং পার্টস বদলানোর নামে সেখানে ফিট করা হয় অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ার। এবং সোনার চেয়ার চলে যায় বোম্বাই। আবার সেই পুরোনো ছক— ব্রিটেনের 'এখানে পুরোনো সোনা ক্রেনা হয়' যার খেলা গাড়িয়ে চলে রেকুলভার, জেনিভা এবং বোম্বে।

নিজের মনেই বিশ্বয়বোধ জেগে ওঠে বন্ডের। সত্যি, এটা মানতেই হবে যে, গোল্ডফিস্কার ভদ্রলোকের সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং দুর্জয় সাহস আছে। নইলে তিনি তিনটে দেশের পুলিশ, কাস্টমসকে ফাঁকি দিয়ে প্রত্যেকবারেই কত স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যান। তার এই আশ্চর্য ক্ষমতা এবং গভীর ষড়যন্ত্র দেখে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড পর্যন্ত বোকা বনে গেছে। গোল্ডফিস্কারকে উপযুক্ত প্রমাণসহ বামাল ধরে জেলে ঢোকাতে না পারলে 'স্বর্ণ-উন্মাদ' এই একটিমাত্র লোক পৃথিবীর বুকে ভয়াবহতা ডেকে আনবে। তাই এই শয়তানকে না ধরা পর্যন্ত তার শাস্তি নেই। যদিও প্রতি পদে বিপদ আছে।

কিন্তু মেয়েটি কে? মেয়েটির মধ্যে আকর্ষণ আছে। বন্ড উঠে চলে গেল একটা টেলিফোন বুথে। ফোনে জানতে পারল কোনো ওপেন মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে না। এছাড়া অন্য কোনো খেলা বা কম্পিটিশন নেই।

টেবিলে এসে বসে বন্ড একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে থাকে, তাহলে কি মেয়েটি SMERSH শ্রেণিত নজরদারি করবার কেউ। হ্যাঁ, গুপ্তচর হবার মতো সাহস ও আত্মনির্ভরতা রাখে মেয়েটি। আর যদি ও ট্রেনিও হয়, তাহলে এরকম ভুল তো করবে না সে। আরও সজাগ হতে হবে, যাতে ওর জন্ম না বন্ডের নিজের কাজ ভেঙে যায়।

তাই যেভাবেই হোক, কপেট গ্রামের 'এন্টারপ্রাইজেস অরিক, A.G.' কারখানা থেকে ওকে নমুনা সংগ্রহ করে বার্ন শহরের দূতাবাস থেকে মেসেজ পাঠিয়ে দেবে লন্ডনে হেড কোয়ার্টারে।

তারপর ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের সহযোগিতায় পৃথিবীর বিভিন্ন ব্যাংক-এ খুলে রাখা গোল্ডফিস্কারের সব অ্যাকাউন্ট সিল করে দেবে। কপেটে হানা দেবে সুইস পুলিশ। তার ঠিকানা হবে ইংল্যান্ডের জেল। বেআইনিভাবে পাচার করা সমস্ত সোনা বিদেশের ব্যাংক থেকে ইংল্যান্ডের ব্যাংক। SMERSH -এর খাতায় হিট লিস্টে বন্ডের নাম নীচে থেকে ওপরের দিকে উঠবে।

সুতরাং— আর দেরি নয়। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বন্দু। সময় রাত্রি। বন্দু রোন নদী পার হয়ে এগিয়ে চলল। কপেট-এর কারখানায় কর্মচারীরা এখন ওই রোলস রয়েস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে।

বন্ডের গাড়ি এখন কপেট গ্রামে। বিকেলে যেখানে গাড়ি সে লুকিয়ে রেখেছিল, সেখানেই গাড়ি রেখে যথাসম্ভব সাবধানে গাড়ির দরজা বন্ধ করে পা চেপে চেপে ফেলে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগোতে লাগল। না, চারদিক নিস্তব্ধই লাগছে। বন্দু জঙ্গলের পাতা স্তূর্ণপর্ণে সরিয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগল।

এখন কারখানার প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে বন্দু।

বন্ডের কানে বাজছে কারখানার জেনারেটরের তীব্র গর্জন। আরও কাছে গেলে যা হার্ট বিটকে প্রলয় তালে নাচাবে। আচমকই বন্ডের হার্টের চারটে প্রকোষ্ঠকেই ভয় স্বেদ সামান্য ধাক্কা মেরে বলে গেল— কোথায় তুমি এসেছ হে মানিক? তোমার মনে কি ভয় নেই?

চোখ বুজে মাথাটা নেড়ে উঠল বন্ডের। সেই নাড়ানোটা বৃষ্টি ইঙ্গিত দিল— ‘না, না, না, না।’

বন্ডের অজান্তেই হাসি আসে। কাঁটা তার পূর্ববৎই পা দিয়ে ফাঁক করে, শরীর গলিয়ে ভেতরে ঢোকে সে। ওঃ, শব্দে যেন মাথাটা একেবারে ফেটে চারদিক ছড়িয়ে পড়বে। জঙ্গলের ঘনত্ব কমে আসছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকে সে।

আরে সামনে গাছের নিচে কি যেন দেখা যাচ্ছে। চট করে পাশের একটা বোম্বোপে লুকিয়ে গেল বন্দু।.... এক, দুই, তিন, চার.....

না, সেখান থেকে কোনো সাড়া-শব্দ নেই। হামাগুড়ি দিয়েই এগিয়ে গেল বন্দু। একঝলক হাওয়া মারতেই পিছনের দিকের কিছু চুল উড়ে এলোমেলো হল। একটা হাত তার চুলগুলিকেই ঠিক করতেই ঘোরানো মুখ দেখেই বন্দু চিনতে পারল— মিস টিলি সোমস। — গায়ে কালো সোয়েটার, সফ্র কালো ব্র্যাক্স।

সর্বনাশ! এ এখানে কেন? ওর হাতে আবার রাইফেল। মরেছে, গশুগোল না বাঁধিয়ে বসে মেয়েটি। কিছু একটা করতেই হবে। তার মানে..... পেরেছে বন্দু ব্যাপারটা ধরতে। গলফ খেলাটা ছুতো। এবং ক্লাবগুলোর মধ্যে রাইফেলট’ সে লুকিয়ে এনেছে।

আর দেরি না করে বন্দু ক্ষিপ্তগতিতে টিলির পিঠের ওপর লাফ দিয়ে পড়ে তড়িৎগতিতে তাকে অজ্ঞান করল বাঁ হাত দিয়ে তার ‘ক্যারোটিড’ ধমনিকে। রাইফেলটা এখন বন্ডের হাতে।

বন্দুও যেন ক্লাস্ত হয়ে পড়েছে। মেয়েটির পিঠের ওপর তার অর্ধেক দেহটা। বন্দু শরীরে উত্তেজনা অনুভব করে। মেয়েটিকে চিৎ করে সে শুইয়ে দেয়। জ্ঞানহীন টিলির দুহাত পাশে ছড়ানো। কালো সোয়েটারে ভেতর থেকে তার উদ্ধত স্তনযুগল বন্দুকে খানিক অবশ করে দেয়। বন্ডের হাঁশ ফেরে টিলির জ্ঞান ফিরে আসায়। বন্দু তার বাঁ হাত দিয়ে টিলিকে তার বুকের মধ্যে চেপে ধরে। টিলি চোখ মেলে বন্দুকে দেখেই চিৎকার করতে যায়। রাইফেলটা ফেলে ডান হাত দিয়ে সে টিলির মুখ চেপে ধরে।

টিলি নিজেকে মুক্ত করবার জন্য প্রচণ্ড ছটফট করতে থাকে। মেয়েটার গায়ে হঠাৎ যেন অসূরের শক্তি জেগে উঠেছে। সে ‘উঁ উঁ’ করে চিৎকার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু মুখে হাত চাপা থাকায় তা গোঙানির মতো শোনায়। বন্দু চারদিক তাকাতে থাকে।

বন্দু টিলির মুখে হাত চেপে রেখেই ফিসফিস করে বলে— প্লিজ আমার কথাটা শোন। চূপ কর। আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি।

কিন্তু টিলি মাথা নাড়তে থাকে। নিরুপায় বন্দু মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে টিলির নিম্ন অধর নিয়ে তার দুই অধরের মাঝে চেপে ধরে। প্রায় মিনিটখানেক চুষবার পর বন্দু তাকে

মুক্ত করে। টিলি হাঁফাতে থাকে। বন্ড এবার তার গালে চুষন দিয়ে বলে— আমি তোমার শত্রু নই মিস টিলি। আচ্ছা, বল তো, তুমি গোল্ডফিঙ্গারকে মারতে এসেছ কেন?

টিলি এবার বন্ডের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে। এরপর যা বলে, শুনে রীতিমতো স্তম্ভিত বন্ড।

বন্ডের সঙ্গে মেলামেশা করার শাস্তি হিসেবে গোল্ডফিঙ্গার মিস জিল মাস্টারটনকে খুন করে। জিল টিলির বোন।

প্রতি মাসে গোল্ডফিঙ্গার একটা করে মেয়ে পালটায়। জিল টিলিকে বলেছিল যে, লোকটা সোনার জন্য চরম উন্মাদ। করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই। সোনা ওর কাছে মেয়েমানুষের মতো। মাসের শেষে এক কোরিয়ান চাকর শিরদাঁড়াটুকু বাদ দিয়ে জিলের সর্বাস্থে সোনার জল বা সোনালি রং মাখিয়ে দেয়। এর ফলে দেহের সমস্ত লোমকূপ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। একসময় সোনালি রং-মাখানো সেই শরীরের মৃত্যু ঘটে। গোল্ড-ফিঙ্গার মেয়েদের এই সোনার জল বা খাঁটি সোনালি রং-এ সোনার মূর্তিতে দেখতে খুব আনন্দ পেতেন। শিরদাঁড়াটা বাদ দেওয়া হত, যাতে খুব তাড়াতাড়ি না সেই মেয়েটির মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে আমি হাসপাতালে ছুটে যাই। তখন জিলের শেষ নিশ্বাসটুকু ফেলতে আর বেশি দেরি নেই। হাঁফাতে হাঁফাতে আমায় ও সব বলে গেছে। এমনকি তোমার কথা পর্যন্ত। আর এই আংটিটা আমায় দিয়ে গেছে তোমাকে দেবার জন্য।

টিলির চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

টিলির দুই চোখের নীচে আঙুল দিয়ে শুকিয়ে যাওয়া জলের ধারা বন্ড মুছে দেয়। তারপর তার বুক থেকে টিলির মাথাটা তুলে নিয়ে বলে মাই-ডিয়ার টিলি, তুমি আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পার। এখন বুঝতে পারছি তোমার মনের জ্বালা। বোনের যাতককে মেরে তুমি এদের হাত থেকে কতদূর যেতে পারবে?

— আমি সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে যেতাম।

— ওরা আন্তর্জাতিক চক্র। তোমাকে একদিন না একদিন ঠিক ধরে ফেলত। শোন, লন্ডন থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে। ওকে তুমি যদি মেরেই ফেল, তাতে কিন্তু সমস্যা মিটবে। তাব থেকে আরও বেশি ক্ষতি করব আমি ওর।

বন্ড এবার বলে— এবার বুঝতে পারছি, গলফ খেলার মাঠে আমায় গোল্ডফিঙ্গার বেশ আনন্দের সঙ্গে বলেছিল— ‘সে আমার চাকরি ছেড়ে চলে গেছে।’ বুঝতে পারছি এখন ব্যাপারটা। — বলতে বলতে বন্ডের মুখ চোখ কঠিন হয়ে ওঠে। — বন্ড এবার বলে— আরও একটা জোরালো দায়ে ওকে অভিযুক্ত করা যাবে। মানুষ খুন। এবং তা অতি পৈশাচিকভাবে।

বন্ড টিলিকে কাছে টানতে যেতেই দেখে সে তার আঙুল থেকে একটা আংটি খুলছে। টিলি বলে— এই নাও। এটা জিলের আঙুলে ছিল। তুমি ধর।

কিন্তু এই আংটি খোলাটাই ওদের কাছে বিপদ হয়ে দাঁড়াল।

চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় আংটিটা ঝিকমিক করে উঠল। আংটিটা নিয়ে বন্ড যখন দেখছিল, তখন অ্যালুমিনিয়ামের পালক লাগানো একটা ইম্পাতের সরু তির আংটিটাকে ছিনিয়ে নিয়ে কিছু দূরে একটা গাছে গিয়ে বিধে গেল।

বন্ড সামনে তাকাতেই একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল। উঠে দাঁড়ায় বন্ড। ধীরে ধীরে টিলিও। ছায়ামূর্তিটা এগিয়ে আসে।

অড জব।

বন্দ বলে— হ্যালো অড জব। বাঃ, তোমার দারুণ নিশানা তো। আমাদের গায়ে তির না লেগে একেবারে আংটিটাকে সঠিক টিপ করেছ তো। তোমার প্রভু কেমন আছেন? ঠিক আছে, একে বোল যে, আমরা কাল বরং ওনার সঙ্গে দেখা করব। — বলে টিলির কোমর জড়িয়ে বন্দ বলে— চল ডার্লিং, আজ রাত হয়ে গেছে। অনেক ঘোরা হল। এখন হোটেল ফেরা যাক।

কিন্তু অড জব দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলে।

বন্দ বলে— কী বললে, এখন দেখা করতে কোনো অসুবিধে নেই। ঠিক আছে চল। — বন্দ এবার টিলিকে বলে— শোন, তুমি আমার বান্ধবী! ইংল্যান্ড থেকে আমরা একসঙ্গে এসেছি। আমার ড্রাইভিং এ তুমি খুব আনন্দ পেয়েছ। কোনোরকম চালাকি করতে যেও না। এই অড জব লোকটা একটা পাকা খুনি।

হঠাৎ বন্দ দেখল, চিমনির মাথায় সেই ব্যাডারটা। তার মানে, এটাই তাদের ধরতে সাহায্য করেছে। অড জবের সাথে এই মুহুর্তে পাল্লা দেবার মানে চূড়ান্ত বোকামি। সঙ্গে বয়েছে একটি মেয়ে। অড জবের নির্দেশে ওরা নীচের দিকে অর্থাৎ কারখানার দিকে নামতে লাগল ঢালু ঘাসে ভরা রাস্তা দিয়ে।

লাল বাড়ির সামনে আসতেই দুজন লোক এসে তাদের তল্লাশি নিতে শুরু করল।

খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পাথরের মেঝের ওপব দিয়ে হেঁটে একটা প্যাসেজ পেরিয়ে একটা দবজায় টকটক করল অড জব।

— ভেতরে এস।

সবাই ভিতরে ঢুকল। ভেতরে ঢুকেই বন্দ দেখে গোল্ডফিস্কার বসে আছেন। বন্দ এটাই আশা কবেছিল। গোল্ড-ফিস্কার কিন্তু তার দিকেই চেয়ে আছেন নির্বিকারভাবে।

বন্দ গোল্ডফিস্কারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে— এই যে মি. অরিক গোল্ডফিস্কার, কী ব্যাপার বল তো। তুমি দশ হাজার ডলারের জন্য পুলিশ লেলিয়ে দিয়েও কি তোমার শাস্তি হয় নি। আজ আমার এই বান্ধবীকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে না হয় তোমার কাঁটাতার টপকে ঢুকে পড়েছি আমরা। তাই বলে তোমার অড জব একেবারে তির ছুড়ে বসবে। এমন না যে, ও আমায় চেনে না। তোমার লোকের কাছ থেকে আমি অন্তত সামান্য ভদ্রতা আশা করেছিলাম।

খুব শাস্তভাবেই গোল্ডফিস্কার বলেন— শিকাগোব অপরাধ জগতে একটা কণা প্রচলন আছে। সেটা কি জানো তুমি মি. বন্দ?

— কোনো কথাটা বল তো?

গোল্ডফিস্কার বলেন— ‘দুজনের মধ্যে প্রথম দর্শন হল সাক্ষাৎ, দ্বিতীয় দর্শন দৈবাৎ এবং তৃতীয়বার দেখা হলে বাঁধে সংঘাত।’ এখন আমরা সংঘাতের মুখোমুখি। এখন তোমার সব কথা তুমি আমাকে বলতে বাধ্য। অড জব, তুমি এদেরকে ‘দুঃস্বপ্না কক্ষ’ নিয়ে যাও।

চিৎকার করে বন্দ বলে— এসবের মানে কী?

— মায়ামি এবং স্যান্ডউইচের পব এটা আমাদের তৃতীয় মোলাকাত। আমার আর ইচ্ছে নেই, তুমি আমার পিছনে বেশি ঘুরঘুব করো।

॥ পনেরো ॥

—স্কাউন্ডেল, মার্ভারার— বলে বন্দ তার পেশার নিয়মানুযায়ী ক্ষিপ্ত আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল গোল্ড ফিস্কারের ওপর।

গোল্ডফিস্কার এই আচমকা আক্রমণ কল্পনা করতে পারেন নি। বন্ডের ভারী শরীরের আক্রমণ তিনি সামাল দিতে না পেরে হেলান দেওয়া চেয়ারসুদূর মাটিতে পড়ে গেলেন। বন্ড হাঁটু মুড়ে একটা পা গোল্ডফিস্কারের তলপেটের নীচে রেখে দুহাত দিয়ে তার কণ্ঠ চেপে ধরে। বলে— শয়তান, তুমি অনেক ক্ষতি করেছ। এবার আমি তোমাকে একেবারে —

ঠিক বন্ডের মাথার পিছনে তখনই একটা পাহাড় এসে যেন ভেঙে পড়ল। মাথায় হাত দিয়ে বন্ড গোল্ড-ফিস্কারের শরীরটার ওপর পড়ে গেল।

টিলিকে তখন গোল্ডফিস্কারের লোকেরা সামলাচ্ছে। সে মুখে হাত চাপা দিয়ে মৃদু চিৎকার করে উঠল।

অন্ধকার কাটিয়ে বন্ড এবার ধীরে ধীরে আলোর মুখোমুখি হতে লাগল। মাথাটা প্রচণ্ড ভার। চাঁদের আলোর মতো কী যেন তার চোখের সামনে অস্পষ্ট লাগছে। একটা লেখা ঝাপসা ঠেকছে— ‘মাজ্জদা’। কী সেটা? লেখাটা আরেকটু পরিষ্কার হয়। একটা বাস্ব। কিন্তু ‘মাজ্জদা’ নামে কোনো বাস্ব আছে কি? সে তো কোনোদিন এই নাম—

ঝপ! ... ঝপ! কোথা থেকে জলের বর্ষণ হতে লাগল মোটা হয়ে, থেমে থেমে। তার মাথা এবং চোখ পরিষ্কার হল। বন্ড আচমকা উঠতে চেষ্টা করল। পারল না। একটা টেবিলে তার হাত পা বেঁধে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। আঙুল দিয়ে বুঝল, টেবিলটা ধাতু-নির্মিত।

কিছুক্ষণের নীরবতা। বন্ড চোখ ঘুরিয়ে ঘরের চারদিকটা দেখবার চেষ্টা করল।

— এবার আমরা কথা বলা শুরু করতে পারি মি. বন্ড।— চোখ নামিয়ে দেখল গোল্ড-ফিস্কার।

গোল্ডফিস্কার ঘরের যে কোনাটায় গিয়ে বসল, সে দিকটা বন্ডের চোখ পড়েনি। গোল্ড-ফিস্কারের চেয়ারের সামনে যে টেবিলটা আছে, তাতে রাখা আছে নানাবিধ ধাতব যন্ত্র। আর তার থেকে কয়েক হাত দূরে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে টিলি সোমস, না, টিলি মাস্টারটনকে। টিলি যেভাবে তাকিয়ে আছে, তাহলে কি তাকে কিছু খাওয়ানো হয়েছে নাকি হিপনোটাইজ করা হয়েছে। যা টিলি তাকে বলেছিল।

কোরিয়ানটা টুপি মাথায় উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতের বাইসেপস যেন পায়ের থাইয়ের সমান।

যে টেবিলটায় বন্ডকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, তার ঠিক মধ্যস্থান দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা ইঞ্চি চারেকের ফাটল। এবং টেবিলের নীচে একটা গোলাকার দাঁতযুক্ত করাত। যার সুইচ গোল্ডফিস্কার যদি অন করে দেয়, তবে বন্ডের দেহ দু’ভাগে বিভক্ত হতে বেশি সময় নেবে না। দূরে কারখানার জেনারেটোরের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

গোল্ডফিস্কার এবার পায়ের ওপর পা তুলে কথা বলতে শুরু করলেন। বন্ড ঠাণ্ডা মাথায় তা শুনতে লাগল।

গোল্ডফিস্কার বলেন— মি. বন্ড, তোমার মতন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আশা করি, লাতিন শব্দ ‘পোয়েনা’ মানেটা জানে। যার ইংরেজি নাম—

— পেইন। এবং যা তুমি আমাকে এখন দিতে চাও।

গোল্ডফিস্কার যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বলেন— এই তো, তুমি জান দেখছি সবই। আসলে ব্যাপারটা কী জান, সীমার বাইরে কৌতূহল থাকাটা আমি একদম সহ্য করতে পারি না। তাছাড়া, তুমি আমার প্রতি যে আচরণ করলে, তা একেবারেই বন্ধুর মতো নয়। বরং শত্রুর মতন। সুতরাং,

এর ফল তো তোমাকে পেতেই হবে। কী বল? এবং এক্ষেত্রে আমি মনে করি, এই সুন্দরীও আমার শত্রু।

বন্দ বলে— আমার দুর্ভাগ্য। দেখা যাক, এই দুর্ভাগ্য কতক্ষণ থাকে।

গোল্ডফিস্কার বলেন— সত্যি বলতে কি, আমিও সেটাই দেখতে চাই। কার দুর্ভাগ্য আর কার সৌভাগ্য।

— মানে? — বন্দ খুঁচিয়ে দেয় গোল্ডফিস্কারকে।

গোল্ডফিস্কার এবার তার ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন— মেয়েটির কথা শুনে আমি ওই বাগের্স হোটেলে ফোন করতেই জানতে পারলাম মিথ্যে কথা বলেছে ও আমায়। অবশ্য, এমনও হতে পারে, পুলিশের ভয়ে সে অন্য নাম নিয়েছিল। যাকগে, আংটিটা পাওয়ার পর আমি ওকে হিপনোটাইজ করতেই সব কথা গলগল করে সে বমি করে দিল। মেয়েটির আমাকে হত্যা ও তোমার উদ্দেশ্যও আমার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে। শোন মি. বন্দ, আমার বুদ্ধির সাথে পাল্লা দিতে এসে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছে। আর ধনী ব্যক্তির বন্ধুর বদলে চামচার দল বৃদ্ধি করে, আর তার সাথে না পাওয়া। কিছু লোকের শত্রুর সৃষ্টি করে। এবং আমার মতো একজন ডাকসাইটে ধনকুবেরের?

— ও, তুমি তাহলে নিজের দোষ স্বীকার করছ? — সম্পূর্ণ উলটো উত্তর দিয়ে গোল্ডফিস্কারকে কাত করতে চাইল বন্দ।

কিন্তু ধূর্ত, বুদ্ধিমানরা নিজের স্বার্থ চরিতার্থের প্রয়োজন বিশেষে অনেক কিছু বুঝেও না বোঝবার ভান করে।

গোল্ডফিস্কার বলেন— মি. বন্দ, আজ যদি তুমি তোমার দক্ষতা দিয়ে সেইসব লোকদের নিষ্কাশন দেহ খুঁজবার চেষ্টা করতে, যারা আমার সর্বনাশ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা আজ পৃথিবীর বাইরে, মনে হয় তুমি দারুণ সফল হতে। এদের সংখ্যা যে কত তা আমারও ঠিক মনে নেই।

— সত্যি, তুমি এক বড়ো জাতের শিল্পী।

— আমার শিল্পকলা কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ কবি। দেখ, তুমি মায়ামিতে আমাকে ভুগিয়েছ, আমি বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিলাম ওই জিল মাস্টারটনকে। তখন আমার স্কেচ লাইন থেকে তুমি ছিটকে গেলে। এবং এখন—

গোল্ডফিস্কার তার পেছায় মাথাটা সামান্য ঝুকিয়ে অন করল একটা সুইচ। বৃত্তাকার করাতটা ঘুরতে শুরু করেছে।

বন্দকে একবার তার বন্ধু জানিয়েছিল, কীভাবে সে হিটলারের কুখ্যাত গেস্টাপো বাহিনীর হাতে তীব্র অত্যাচারিত হয়েছিল। অমানুষিক সেই অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে দম বন্ধ করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বেঁচে থাকার বাসনা জেগে উঠেছিল।

বন্দ যদি সব কথা বলেও দেয়, তবে গোল্ডফিস্কার যে তাকে ছেড়ে দেবেন এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। আর সব কথা বলা মানে বন্দের হার স্বীকার করা।

বন্দ ভাবে, সে যদি মরেও যায় তবে M কী করবেন? যদিও জেনিভা স্টেশনের ২৫৮ নং হেড কোয়ার্টারকে ইতিমধ্যেই বন্দের দেওয়া সব তথ্য জানিয়ে দিয়েছে। M সেক্ষেত্রে ০০৮-কে পাঠাবেন গোল্ডফিস্কারকে শেষ করে দিতে। ব্রিটিশ গুপ্তচর, বিভাগে ডাবল জিরো (০০) রয়েছে মাত্র তিনজন— যাদের ব্রিটিশের প্রয়োজনে মানুষ খুন করার লাইসেন্স দেওয়া আছে।

গোল্ডফিস্কার বলেন— দেখ, শিকাগো গুণ্ডামহলে বলা আছে— ‘জমিয়ে রেখ না, হালকা কর’। তাই আমি বলি কি, যন্ত্রণা পেয়ে মরবার চেয়ে তুমি সব হালকা কর। নাহলে তো বুঝতেই পারছ। আর মেয়েটি, ওকে অড জবের হাতে তুলে দেব। বিড়ালটাকে যেমন ছুঁড়ে দিয়েছিলাম।

বন্ড বলে— দেখ মি., আমি জানি যে, তুমি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি ধূর্ত। ইউনিভার্সালে আমি সব বলে এসেছি। আর মেয়েটির বাবা ও মা জানে যে, ও আমার সঙ্গেই এসেছে। তাই আমিও বলি কী, পুলিশের ঝামেলায় অযথা না জড়িয়ে বরঞ্চ আমরা একটা রফায় আসি। কথা দিচ্ছি, পৃথিবীর কেউ জানবে না তোমার আমার গোপন রফার ব্যাপারটা।

একটা হাই তুলে গোল্ডফিস্কার বলেন— তুমি আমার সঙ্কল্পে অতি সামান্যই জেনেছ। তাছাড়া আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি পছন্দ করি না। আমার এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। পুলিশ এলে আমি সানন্দে তল্লাশি করতে দেব। ওরা তোমাদেরকে খুঁজেও পাবে না। আমার ইলেকট্রিক ফার্নেসে তোমরা ২০০০° সেঃ -এ পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। যে কোরিয়ান দুজন ফার্নেস চালায়, তারা কথা বলতে পারে না। এখন ইলেকট্রিক করাটটা প্রতি মিনিটে এক ইঞ্চি করে এগোচ্ছে। আর অড জব খুব ভালো মালিশ করতে পারে। ও প্রথম থেকেই শুরু করবে। অড জব—

অড জবের গায়ের তীব্র গন্ধ এবং হাতের স্পর্শতেই যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে বন্ডের।

গোল্ডফিস্কার এবার খুব আকুলতা নিয়ে বলেন— মি. বন্ড, দেখো, আমি চাই না যে, একজন ইংরেজ ভদ্রলোককে এত জঘন্যভাবে শেষ করে দিতে। চটপট বলে দাও, তুমি কে, কে তোমায় পাঠিয়েছে? তোমার জন্য এই সুন্দর মেয়েটিও অকালে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। এটা কি তুমি চাও?

অড জবের কাজ আপাতত বন্ধ।

বন্ড বলে— গোল্ডফিস্কার, রফার ব্যাপারটা যদি না-পসন্দ হয়, তবে আমি আর মেয়েটি তোমার অধীনে কাজ করতে চাই।

— তার চেয়ে আমার বৃকের দু’দিকে দু’জন মিলে ছুরি মার। অড জব দু’নম্বরটা।

করাতের চাকাটা ক্রমশ কাছে আসছে।

বন্ড দম বন্ধ করল। তাব শরীর যেন কেঁপে উঠল। এখন মাথা থেকে অন্য সব চিন্তা দূর করে ফেলতে হবে। নইলে—

॥ ষোলো ॥

একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেল বন্ড— ক্যাপটেন বলছি। এখন আমরা ল্যান্ড করছি। আপনারা যে যার সিট বেণ্ট বেঁধে নিন। ধন্যবাদ।

তাহলে কী তারা স্বর্গে ল্যান্ড করছে? সেখানে কী জিল তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে? জিলের সঙ্গে কি গোল্ডফিস্কার প্রেরিত আরও সুন্দরীর দল আছে? তাহলে তো সমস্যা হল। বন্ড কাকে বেছে নেবে? ধূস!

আচমকা বন্ডের হাতে কীসের যেন ধাক্কা লাগল।

— কে? — চিৎকার করে উঠল বন্ড। — চোখ মেলে দেখে দরজা খোলাতে তার একটা পাল্লা লেগেছে তার হাতে। ঘরের মধ্যে সূর্যের আলোয় ভরে গেল। চোখ বুজল বন্ড।

কে যেন বলে— আরে, এই শালার জ্ঞান ফিরেছে। ডক্টরকে ডাকো স্যাম। আর ওর পাশে শালাকে গুইয়ে দাও।

বন্দ বুঝতে পারল তাকে স্ট্রেকার থেকে নামানো হচ্ছে। সামনে দাঁড়িয়ে বড়ো মাথাওয়ালা একটা লোক। এ ঘরটা বেশ ঠান্ডা।

বন্দ ওঠবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। সারা দেহ কাঁপছে, ঘাম ঝরছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলে— আমি এখন কোথায়?

সামনের লোকটি বন্দকে শুইয়ে দিয়ে বলে— আরে আরে উঠবেন না। ভালো আছেন আপনি। আপনি এখন নিউইয়র্কের আইডল ওয়াইন্ড এয়ারপোর্ট-এ।

— তার মানে, আমি বেঁচে আছি। — বলে বন্দ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সে একটা পরিষ্কার ঘরে শুয়ে আছে। পাশে স্ট্রেকারে জ্ঞানহীন টিলি। তার মানে, এটা স্বাস্থ্য বিভাগ।

লোকটি বলে— আপনি চিন্তা করবেন না। ডক্টর আসছেন, শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠবেন আপনি।

আবার দরজা খোলার শব্দ। বুটের আওয়াজ। একাধিক।

বন্দ দেখে, অ্যাগ্রন পরিহিত ডাক্তার ঢুকছেন। ও কী! সঙ্গে কে? এ তো গোল্ডফিসার! তার মানে... তাহলে এটা গোল্ডফিসারেরই চাল।

বন্ডের সামনে এসে গোল্ডফিসার বলেন— কেমন লাগছে এখন জেমস? ডক্টর, এদেরকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলবার দায়িত্ব আপনার। ডক্টর, একটা কথা বলি। কোনো প্রিয় বন্ধু বা কর্মচারীর অসুখ করলে তাকে দেখা উচিত। আমার টাকার কোনো অভাব নেই। আসলে আমিই চাপ দিয়ে এত বেশি কাজ এদের দিয়ে করাচ্ছিলাম, ফলে এরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এখন এদেরকে সুস্থ করে তোলবার দায়িত্ব তো আমারই। — এবার জেমসের কাছে এসে গোল্ডফিসার বলেন— জেমস, তুমি একদম চিন্তা করবে না। আর ওকেও চিন্তা করতে বারণ করে দেবে। ডক্টর ফোখ জেনিভার এক নামকরা চিকিৎসক।

ডক্টর ফোখ বলেন— ঠিক আছে। তবে মি গোল্ডফিসার, এদের দু'জনের টানা বিশ্রামের দবকার। আপাতত আমি এদেরকে নিউইয়র্কের 'হার্কনেস প্যাভিলিয়ন হাসপাতাল'-এ নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে এবার—

বন্দ নতুন নোটের গন্ধ এবং লেনদেনের শব্দ শুনতে পেল।

ডক্টর ফোখ বলেন— ধন্যবাদ। মি. গোল্ডফিসার আপনি এদেরকে যে অ্যান্ডুলেঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, সেই অ্যান্ডুলেঙ্গেই যদি—

বাধা দিয়ে বন্দ বলে— ডক্টর একটা কথা। প্লিজ ওয়েট। আপনাকে আমি সুস্থ দেহে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছি, আমি এই মি. অরিক গোল্ডফিসারের কোনো, কর্মচারী নই। আমাদেরকে অপহরণ কবে আনা হয়েছে। ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের বড়োকর্তাকে ডাকুন। নিউইয়র্কেও আমার অনেক বন্ধু আছে।

গোল্ডফিসার ঘুরে গিয়ে শান্ত গলায় বলেন— কিছু মনে করবেন না ডক্টর, এর মাথায় সম্প্রতি গন্ডগোল দেখা দিয়েছে। দোষটা আমারই। কাজের লোভ সহ্য করতে না পেরেই এই দুর্ঘটনা। আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন, এদের সুস্থ করে তুলুন। - বন্ডের মাথায় হাত বুলিয়ে গোল্ডফিসার বলেন— নো নো, জেমস বন্দ। আর কোনো দুশ্চিন্তা নয়। এখন কোনো কথা নয়। শুধু খাওয়া আর বিশ্রাম। দেখবে চটপট সেরে গেছ তুমি। ডক্টর —

স্পিরিটের গন্ধ নাকে ভেসে আসে। বন্দ ছটফট করতে থাকে। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়। বন্ডের দেহে ছুঁচ ফুটছে। বন্দ জ্ঞান হারায়।

বন্ডের আবার যখন জ্ঞান আসে তখন সে একটা বাস্ক ধরনের তৈরি একটা ঘরে নিজেকে আবিষ্কার করে। সিলিং-এর মাঝখানে একটা গোল আলো লাগানো। উঠে বসবার চেষ্টা করতেই আস্তে আস্তে সে উঠে বসে। তারপর দাঁড়াতেও পারে। ঘরের মধ্যে পায়চারি করে, হাত-পা ছুঁড়ে শরীরের আলস্য কাটায় সে। কিন্তু সে নশ্ব। তার ঘরে সে একা। টিলি নেই? মেয়েটিকে নিয়ে ওরা কী করেছে? অন্য ঘরে নাকি—

পেটের মধ্যে দুম করে এক খোঁচা মারল ভিতর থেকে। বুঝল, এটা খিদের লক্ষণ। জাহাজের বাস্কের মতো একটা খাটে সে শুয়েছিল। দেখল, খাটের নীচে তার যাবতীয় জিনিসপত্র রাখা আছে। সে চটপট তার জিনিসপত্রগুলো বার করল। একটা ভ্রূরী জুতোর সোল ধরে বিশেষ কায়দায় ঘোরাতেই বেরিয়ে এল একটা ছুরি। আর গোড়ালির মধ্যে ছুরির বাটটা। নেই শুধু তার হাতঘড়ি আর পিস্তলটা।

সব জিনিসপত্র ঠিকঠাক রেখে জামা পড়ে ঘরের হ্যান্ডেলওয়ালা দরজাটা খুলে কয়েক পা হাঁটতেই ডানদিকে বাথরুম। আর অন্যদিকে একটা ঘর। চট করে সে ওই ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুক দেখতে পায় টিলি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মুখটা কী অপূর্ব লাগছে! থাক, ঘুমোক, পরে দেখা যাবে।

বাথরুমে গিয়ে দাড়ি কেটে, স্নান করে ঘরে এসে বসতেই ঘরের হাতলবিহীন দরজাটা খুলে গেল। অড জব।

অড জবকে দেখেই বন্ড প্রচণ্ড চিৎকার করে বলে যে, তার ভীষণ খিদে পেয়েছে। ভালো ভালো খাবার আর এক বোতল বুরবোঁ চাই তার। তার ঘড়িটা। গোল্ডফিঙ্গার যেন তার খাওয়া শেষ হবার পর আসেন। আর চেস্টারফিঙ্গ সিগারেট।

বন্ড ঘরে পায়চারি করতে করতে ভাবে, প্ল্যাপারটা কী? গোল্ডফিঙ্গার তাকে আর টিলিকে বাঁচিয়ে রাখল। নিশ্চই কোনো গুট উদ্দেশ্য আছে লোকটার। অস্তুত এটুকু বুঝেছে সে বন্ডের মতো লোককে মেরে ফেললে তারই ক্ষতি। তবে জানা যাবে ঠিকই।

এর মধ্যে খাবারও চলে আসে। বন্ড ভাবে, খাবারও কি এদেব রেডি থাকে নাকি! মরুক গে যাক।

সে খেতে শুরু করে। বাঃ, প্রত্যেকটা খাবারই বেশ দারুণ। গোল্ডফিঙ্গারের এই খাবারের দিকেও নজর ভালো আছে। নইলে বন্ডকে এত তাড়াতাড়ি ভালো ভালো প্লেট পাঠায়!

খাওয়া শেষ করে বন্ড সিগারেট ধরায়। বুরবোঁ-র গ্লাস হাতে নিয়ে চুমুক দেয়। সে টিলির কথা ভাবছিল। গোল্ডফিঙ্গার এলে তাকে বলবে যে, মেয়েটির দিকেও যেন বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। নইলে ওর শরীর আবার খারাপ হলে তখন—

বন্ডের ভাবনার মাঝে গোল্ডফিঙ্গারের প্রবেশ।

— এস মি. গোল্ডফিঙ্গার। তোমার পাঠানো প্রত্যেকটা খাবারই দারুণ!

— যাক, শরীর তাহলে তোমার ফিট মি. বন্ড। — গোল্ডফিঙ্গারকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। গোল্ডফিঙ্গার বলেন— দেখ মি. বন্ড তোমার মনের বিস্ময় আমিই দূর করে দিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা, ওই বোতল, প্লেট বা ফর্ক দিয়ে আমাকে মারতে এস না। তার আগেই— বলে তার প্যান্টের পকেট থেকে তিনি একটা ছোটো পিস্তল বার করে বলেন— আমার মানুষ খুন করতে একটার বেশি গুলি খরচ হয় নি কখনো। আমার লক্ষ্যস্থল হল ডান চোখ।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে বন্ড বলে— যস্তুরটা ঢোকাও আব আসল কথা বলো।

— যাক শুনে নিশ্চিত হলাম। দেখ, সোনা ছাড়া অন্যান্য জিনিস সম্বন্ধেও আমি বেশ ভালোই জানি। খাঁটি সোনাও যেমন চট করে পাওয়া যায় না, তেমনি খাঁটি মানুষও। আমার এখানে যারা ভালো আনা নেয়, তাদের দিয়ে আমি নীচু কাজ করাই। যেমন, অড জব। তারপর—

গোল্ডফিঙ্গার বন্ডের সামনে ঝুঁকে বলেন— না থাক। বাজে কথা হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা হল, তোমাকে মারতে গিয়ে শেষমুহুর্তে মনে হল, না থাক। হাতে একটা বড়ো কাজ এসেছে। তোমাকে আর মেয়েটিকে লাগবে। তুমি আমার কথামতো কাজ করবে আর মেয়েটি তোমার সেক্রেটারি হবে। অবশ্য যদি তুমি ওকে নিয়ে বিছানায় শুতে চাও.... অবশ্য মেয়েটি শোবে না হয়তো। যাকগে, আমি তোমার ইউনিভার্সাল এক্সপোর্টে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। জানিয়েছি, কানাডায় একটা নতুন চাকরির ব্যাপারে সেখানে খোঁজখবব করতে গেছ। বাকি খবর জেমস নিজেই জানাবে।

বন্ড মনে মনে হাসল। তার টেলিগ্রামে সংকেত থাকে, যা এতে নেই। M নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, বন্ড শত্রুর কঙ্কায়। তিনি ব্যবস্থা নিতে অলরেডি শুরু করে দিয়েছেন।

— তারপর। — বন্ড বলে।

গোল্ডফিঙ্গার বলে— জেমস, আমার প্রেমিকা হল সোনা। সবসময়, প্রতি মুহুর্তে আমি সোনাকে ছাড়া চলতে পারি না। আমি চোখ বুজে ছুঁয়ে বলে দিতে পারি, এটা কত ক্যারিয়ারের সোনা। এই সোনাতে খাদ আছে কিনা।

গোল্ডফিঙ্গার বন্ডের সামনে উঠে আসেন। তার সামনে দু'তিনবার হাঁটাচলা করেন। দুম করে বন্ডের সামনে থেমে গিয়ে বলেন — আমি চাই আরও ক্ষমতা, আরও সোনা। সোনাকে ভালোবেসেছি, প্রতিদানে ভালোবেসেছে আমাকে সোনাও। আশা করি, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ?

— তোমার ভাঙারে কত সোনা আছে আমি জানি না। আচ্ছা, এত সোনা দিয়ে কী করবে তুমি?

— আমার ভাঙারে আছে এখন দু'কোটি পাউন্ড দামের সোনা। বলতে পারো, একটা ক্ষুদ্র দেশের সোনার সমান। একটা বড়ো কাজ কবতে চলেছি। সমস্ত সোনা নিউইয়র্কে আনা হয়েছে।

— কাজটা কী? টিলিই বা কী করবে?

গোল্ডফিঙ্গার বন্ডের সামনে আবার পায়চারি করেন।

বন্ডের এক হাতে মদের গ্লাস, অন্য হাতে সিগারেট। তাকিয়ে থাকে বন্ড 'কাজটা' শুনবার জন্য।

গোল্ডফিঙ্গার বলেন— দেখ মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। মানুষ চাঁদে গেছে। হিমালয় জয় করেছে, পরমাণু বোমা ফাটিয়েছে, রকেট পাঠিয়েছে মহাশূন্যে— আরও কত কী! কিন্তু মানুষের এত সব বিচিত্র কর্মকুশলতার মধ্যেও একটি কর্মক্ষমতা বিশেষভাবে অবহেলিত। যার নাম— ক্রাইম। আমার তো মনে হয় যারা এই পৃথিবীতে যত সূক্ষ্ম 'ক্রাইম' বা অপরাধ করে তারা অন্য সব বিষয়ের থেকে বেশি বুদ্ধিমান তথা ক্ষমতাবান। আমি ছোটোখাটো অপরাধ, যেমন— ব্যাংক ডাকাতি, জালিয়াতি এইসবের কথা বলছি না।

বন্ড বলে— তুমি তো বেশ বড়ো মাপের ক্রিমিনাল।

— হয়তো তাই। সে তুমি যাই বল না কেন, এই নতুন ভাবনার কাজে জরী হলে পৃথিবীতে সভ্য মানুষের দল স্তম্ভিত হয়ে যাবে। বিশ্বয়ে নিথর হয়ে যাবে প্রশাসন নামক যন্ত্রটি।

বন্ড ভাবে, না, এর বক্তব্যের মধ্যে কোনো পাগলামি পরিলক্ষিত হয় না। একজন শাস্ত মাথার বিভীষিকাময় ব্যক্তি।

বন্দ বলে — তা আসল ব্যাপারটাই তো তুমি বলছ না।

— এক বিশাল স্বর্ণভাণ্ডার লুঠ করতে হবে। পৃথিবীর যে অর্ধেক স্বর্ণ খনন করে মজুত রাখা আছে, তা লুঠ করব। তার পরিমাণ ১৫০০ কোটি ডলার।

— কোথায়? — বন্দ বেশ আগ্রহ দেখায়। গোল্ডফিঙ্গার বলেন— ‘ফোর্ট নক্স’ — আমেরিকার বৃহত্তম স্বর্ণভাণ্ডার। যা লুঠ করব বলে স্থির করেছি আমরা।

॥ সতেরো ॥

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বন্দ বলে— হুম্! ‘ফোর্ট নক্স’! আচ্ছা, আমি বলি কী দুজনের পক্ষে কি কাজটা বেশি ভারি হচ্ছে না?

— দেখ, আমেরিকার সবথেকে, শক্তিশালী ছটি গুণ্ডাবাহিনী থেকে এদের বেছে নেব আমি এই কাজের জন্য। এরকম শক্তিশালী দল সামরিক বাহিনীতেও পাবে না।

বন্দ বলে— কিন্তু তোমার এই ভাণ্ডার কত লোক পাহারা দিচ্ছে, সেটা কি তুমি জান?

দরজায় দেখা গেল অড জবকে। গোল্ডফিঙ্গার ইশারায় তাকে যেতে বলেন। গোল্ডফিঙ্গার বলেন— ও দেখতে এসেছিল, আমরা শাস্তিতে কথা বলছি কিনা। যাকগে, এখন বাজে বারোটা। দুপুর দুটোর সময় সব দস্যুদের আমি মিটিং-এ ডেকেছি। তারাও হয়তো তোমার মতো অনেক প্রশ্ন করবে। তুমি ও টিলি সময়মতো চলে এস। দেখ, কোনো খবর বাইরে পাঠাবার চেষ্টা কোর না। তাহলে এবার আর আমার মাথা ঠিক থাকবে না। কি, সব বুঝতে পেরেছ?

হেসে বলে বন্দ— ধনীদের সাথে এক আসনে বসবার সুযোগ পেয়েছি যখন, তখন পকেটে কিছু মাল তো পুরব।

— বাঃ, রসিকতা বোধও আছে দেখছি। ভালো ভালো। — বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান গোল্ডফিঙ্গার।

বন্দ বসে বসে ভাবছিল তার পরবর্তী কর্মসূচি। দরজায় টোকা পড়ল। বন্দ বলে — ভেতরে এস।

টিলি এসে ঘরে ঢোকে। বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে — তোমার জন্যই এই দুর্গতি। এখন পালাবার ফন্দি আঁটো।

বন্দ বলে— আমার মাথা ঠিক আছে। যেহেতু বেঁচে আছি আমি।

— কিন্তু তোমার জন্যই তো আমি—

— দেখ সময় নষ্ট না করে আগে খেয়ে নাও। ভরা পেটে অনেক কিছু ভাবা যাবে। একমাত্র যে দরজা আছে বেরোবার জন্য, সেটা পাহারা দিচ্ছে ওই কোরিয়ান জানোয়ারটা— অড জব। এখন বল কী খাবে?

— ক্র্যামবলড এগ আর কফি।

বন্দ উঠে গিয়ে দরজায় টোকা দিতেই অড জব দরজা ফাঁক করল।

বন্দ বলে তাকে মেয়েটির জন্য কী খাবার আনতে হবে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

অড জবকে বিদায় করে বন্দ গ্লাসে বুরবৌ আর সোডা ঢেলে খেতে লাগল। ভাবতে লাগল, মেয়েটি কেন তার প্রতি এমন উদাসীন? সেটা কি তার বোন জিল-এর মৃত্যুর জন্য, নাকি এখানে এসে বন্দি হয়ে পড়েছে বলে? তাহলে কি গোল্ডফিঙ্গার যা বলে গেল, সেটা কি গোল্ডফিঙ্গার নিজেও বুঝতে পেরেছে? সে যাই হোক না কেন, এখন তাকে ভাবতে হচ্ছে, এই বন্দিদশার মধ্যে যে করেই হোক টিলি মাস্টারটনকে কবজা করতেই হবে। নইলে সে পাগল হয়ে যাবে।

বন্ডের ভাবনার মধ্যে টিলি তার ঘরে ফিরে গেছে। এতক্ষণে হুঁশ হল বন্ডের। সে মেয়েটির ঘরে গেল। হাতে অবশ্যই মদের গ্লাস। টিলির খাটের কাছে এল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টিলি বন্ডের দিকে তাকাল।

বন্ড বলে— তোমার এবারের রাগটা প্রথম সাক্ষাৎকারের রাগের চেয়েও আরো সুন্দর লাগছে।
— বলে টিলির ঘাড়ের ওপর চুল সরিয়ে বন্ড আঙুল বুলিয়ে দেয়। টিলি অবশ্য কিছু বলে না।

বন্ড গ্লাসটা শেষ করে টিলির কানের কাছে মুখ এনে বলে— শোনো ডারলিং, তোমাকে জানিয়ে রাখা ভালো, আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের থেকে এসেছি। যদিও পুলিশ আসছে, কিন্তু গোল্ডফিস্টার নিশ্চিত যে, এক সপ্তাহের মধ্যে পুলিশ আমাদের কোনো খোঁজ পাবে না। তাছাড়া, একটি মহৎ উদ্দেশ্যে ও আমাদের আটকে রেখেছে। সেটা হল, একটা বড়ো মাপের ডাকাতির ব্যাপারে আমাদের দুজনকে ওকে সবরকম সহযোগিতা করে যেতে হবে।

— হোয়াট? কীসের ডাকাতি? তাও বেশ বড়ো মাপের?

— দেখ, বন্ড ওর পাশে প্রায় গা ঘেঁষে বসে। তারপর ডাকাতির ব্যাপারটা খুব সতর্কভাবে এবং নীচুস্বরে টিলিকে খুলে বলে; এরপর বন্ড বলে— গোল্ডফিস্টার কিন্তু পাগল নয়। একজন সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের অপরাধী। শুভা মিটিং-এ গোল্ডফিস্টারের কথা শুনে সবাই একটু চিন্তা করবে এই মারাত্মক কাজটা নিয়ে। কিন্তু গোল্ডফিস্টার সবার কথা শুনে তবেই কী করবে, সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে সেটার। আমাদের এখন ওর সাথে বাধ্য ছেলের মতো তাল মিলিয়ে চলতে হবে। কোনোরকম সন্দেহ যাতে না করতে পারে গোল্ডফিস্টার। এর মধ্যেই আমি আমার প্ল্যান ছকে ফেলব।

— তার মানে, তোমার কথামতো এখন আমায় চলতে হবে? — অভিমানের সুর টিলির কণ্ঠে। সে বলে— কিন্তু তোমার কথামতো আমি চলবই বা কেন?

বন্ড টিলির দিকে তাকিয়ে বলে— বললাম না, বাঁচতে গেলে ওর সাথে তাল মেলাতে হবে। তাছাড়া ফাটকা খেলে কিছু পয়সাও আসবে। তাই আমি বলি কী — বলে বন্ড টিলির দু-কাঁধে হাত রেখে বলে— অযথা রেগে যেও না। আমি যা বলি—

টিলি বন্ডের হাত ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলে— বেশ, তুমি যা বলছ তাই হবে। তবে সাবধান, আমাকে টাচ করতে এলে আমি কিন্তু গন্ডোগোল বাধিয়ে দেব।

দরজায় আঘাত। বন্ড বলে— খোলা আছে।

দুজন কোরিয়ান ঢুকল। একজনের হাতে টিলির খাবার আর অন্যজনের হাতে একটা টাইপরাইটার। পিছনে অড জব। সে এক বাড়িল সাদা কাগজ আর কার্বন পেপার এগিয়ে দিল। আর একটা হাতে লেখা কাগজ।

তার মানে হাতে লেখাটা টাইপ করতে হবে। আর ওই কাগজে কিছু ইলেক্ট্রিকশন দেওয়া আছে: 'দুটো কুড়িতে তুমি ও মিস টিলি রেডি থাকবে। লোক আনতে যাবে। সঙ্গে নেবে নোট নেবার খাতা ও পেন। অনুষ্ঠানের ড্রেস পরে আসতে হবে।'

বন্ড টিলির দিকে তাকিয়ে বলে— জব্বর ব্যাপার।

কোরিয়ানরা চলে যায়।

বন্ড টাইপ করতে বসে যায়।

আজকের মিটিং-এর বিষয়: 'অপারেশন গ্র্যান্ড প্ল্যান'।

সভাপতি: মি. অরিক গোল্ডফিস্টার

যুগ্ম সম্পাদক: মি. জেমস বন্ড, মিস টিলি মাস্টারটন

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ
হেলমুট এম. স্প্রিংগার
জেড মিডনাইট
বিলি রিঙ্গার
জ্যাক স্ক্যাপ
মি. সোলো
মিস পুসি গ্যালোর

সংঘের নাম
রক্তসংঘ (ডেট্রয়েট)
সিল্যুয়েট সংঘ (মায়ামি ও হাভানা)
যন্ত্ররাজ (শিকাগো)
উজ্জ্বল সংঘ লোস (ভেগাস)
মাফিয়া
দ্য সিমেন্ট মিক্সার্স
(হার্লেম, নিউইয়র্ক)

এখন দুটো দশ। ওরা যাবার জন্য প্রস্তুত।

অড জবের সাথে করিডোর দিয়ে যেতে যেতে বন্দ ও টিলি নদী থেকে ভেসে আসা ছোট্ট স্টিমারের সাইরেন শুনতে পাচ্ছিল। এবার ওরা একটা ঘরে এসে ঢুকল। ঘরটা সূর্যের আলো ছাড়া অন্য আলোতেও ভর্তি। সম্মেলন ঘর। ঘরের বড়ো জানলা দিয়ে নদী দেখা যাচ্ছে। সবুজ কাপড়ে ঢাকা টেবিল, চেয়ার পাতা বিশাল, টেবিলের সামনে জানলার দিকে পিছন ফিরে গোল্ডফিঙ্গার বসে আছেন। চেয়ারের সামনে প্যাড, পেনসিল। ঘরে আরেকটা টেবিলে মনে হল বেশ লোভনীয় খাবার প্যাকেটে রাখা আছে।

গোল্ডফিঙ্গার বন্ডের হাত থেকে টাইপ-করা পেপারস নিয়ে টিলিকে বললেন, সেগুলো প্রত্যেকটা চেয়ারে রেখে আসতে। বন্ডের কথা মনে পড়তেই টিলি ভাই করে।

একজন কোরিয়ান ঘরে ঢোকে। গোল্ডফিঙ্গার তাকে বলে— নির্দিষ্ট সদস্য ছাড়া অতিরিক্ত কেউ-ই মিটিং-এ ঢুকবেন না। সদস্যদের সঙ্গে কেউ এলে তাকে পাশের অভ্যর্থনা কক্ষে বসিয়ে যেন উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হয়। আর অড জব, ঠিক দুটো ঘন্টা বাজাবে। আর সবদিকে লক্ষ রাখবে। এবার তুমি যাও।

অড জব ও কোরিয়ান চাকরটা বেরিয়ে যায়।

গোল্ডফিঙ্গার বলেন— মিস মাস্টারটন, এই মিটিং-এ দরকারি পয়েন্টস তুমি নোট করবে। তবে তর্কাতর্কির ব্যাপারটা না টুকলেও হবে। আচ্ছা জেমস, আজকের মিটিং-এ যারা যোগ দিতে আসছে, তারা নিজের এলাকাতেই শের। আমি টাকা দিয়েছি, তাই ওরা আসছে। ওরা জানে না যে, আমি কে। আমার মনে হয়, এরা টাকার জন্য কাজটা করতে অবশ্যই রাজি হবে। আমি যে পাগলামি করতে ওদের একানে ডাকি নি, সেটা বোঝাতে হবে।

বন্দ যেন খুব মনযোগ দিয়ে কথা শুনে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে টিলিও। গোল্ডফিঙ্গার বলে চলেন— যারা আমার প্রস্তাবে এককথায় হাত তুলবে, তাদের পাশে বসাবে ‘+’ চিহ্ন আর যারা ‘না’ বলবে, তাদের পাশে ‘-’ চিহ্ন। তবে যেটা সবথেকে জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল, যদি কেউ লোভে পড়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। আমরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ব। এর জন্য তোমাকেও চোখ কান খোলা রাখতে হবে।

— বুঝলাম। আচ্ছা, এই পুসি গ্যালোর মেয়েটির পরিচয় কী?

— আমেরিকার দস্যু দলের পাভা। যেহেতু ওর দলের সবাই মেয়ে, তাই এই কাজে আমার কিছু মেয়েও লাগবে। ও আগে ট্র্যাপিজের দল চালাত। পয়সা সেরকম ইনকাম না হওয়াতে প্রথমে চুরি এবং তারপর ধীরে ধীরে এক ডাকাত দল তৈরি করল মেয়েদের নিয়ে। এখন এরা এক সমকামী নারী সংঘ। নাম— ‘দ্য সিমেন্ট মিক্সার্স’। অনেক আচ্ছা আচ্ছা দস্যুদলও এদের এড়িয়ে চলে। তাই তুমি—

ঢং ঢং, ঢং ঢং— মৃদু ঘন্টাধ্বনি শোনা গেল।

গোল্ডফিস্কার বলেন— প্রস্তুত হও। অতিথিরা এসে গেছেন।

ঘরের অন্য প্রান্তের দরজা দিয়ে কোরিয়ান ভৃত্যটা। পাঁচজনকে নিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল।
ওদের বেশবাশ বেশ চটকদার।

গোল্ডফিস্কার উঠে দাঁড়িয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন — আমার এখানে আপনাদের
স্বাগত জানাই। আমি মি. অরিক গোল্ডফিস্কার। আপনার বসুন দয়া করে। জেমস তুমিও বোসো।

সবাই আসন গ্রহণ করলে গোল্ডফিস্কার বলেন— লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আজকের এই
সভা অত্যন্ত জরুরি এবং সেই সাথে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণও বটে। সভার শেষে জলযোগ-এর ব্যবস্থাও
আছে। যাই হোক, সময় নষ্ট না করে শুরু করি, আমার দুই দক্ষ সেক্রেটারি মি. জে. বন্ড এবং মিস
টিলি মাস্টারটন। আমি দেখতে পাচ্ছি, মিস পুসি গ্যালোর এখনও এসে পৌঁছান নি। এবং মধ্যে
আমি বলে দিই, জেমস তোমার ডানদিকে সিল্যুয়েট সংঘের মি. মিডনাইট। তার পরে আছেন মি.
রিং।

বন্ড এদের চেহারা দেখে ছবি ঐঁকে নেয় মনে মনে।

মিডনাইট— বিশাল চেহারা। চোখ শাস্ত হলেও ধূর্ত, সতর্ক।

মি. বিল রিং— বীভৎস মুখ। অপরাধ করতে গিয়ে মনে হয় কেউ তার নীচের ঠোঁটে ছুরি বা
খুর বসিয়ে দিয়েছিল। বয়স — ৪০। দেখেই বোঝা যায় মানুষ খুন করতে তার বোধহয় ভালোই
লাগে।

মি. স্প্রিংগার — ঘোলাটে কাচের মতো দু'চোখের মণি। তার জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক এবং
হাবভাব যেন বলছে, আমি তোমাদের এখানে অতীব বেমানান।

এরপর 'মাফিয়া' সংঘের মি. সোলো— মনে হল, তার মুখ যেন বলছে, আমি আর পাপের
বোঝা বইতে পারছি না। আড়চোখে বন্ড দেখছে, তিনজন তাকে মাঝেমাঝেই মেপে যাচ্ছে।
আমেরিকার সবচেয়ে ভয়ানক মানুষ বলতে এই মাফিয়ারাই। তবে মি. সোলো কী ধরনের শক্তি
ধরেন, তা ঠিক এই মুহূর্তে বোধগম্য নয়। তবে ইনি যখন মাফিয়া দলের সর্বময় কর্তা, তখন
নিঃসন্দেহে এক ভয়ংকর জীব। ওপরে এতই শাস্ত থাকুন না কেন।

উজ্জ্বল সংঘের জ্যাক স্ট্র্যাপ— বয়স ৫০। জমকালো পোশাক। স্বাস্থ্য ভারী মানে মোটা। মুখে
চুরুট রাখতে হয় তাই রাখা।

রইল বাকি এক। মিস, মানে আবার মেয়ে। তিনি এবার কী রূপে দর্শন দেবেন, কুরূপা না
সুরূপা—

দরজা খুলে গেল। বন্ড বিস্মিত, নির্বাক। যেন পূর্ণচন্দ্র তাব সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার নয়ন
ভোলানো রূপের আলোর ডালি নিয়ে। স্বভাবতই বন্ড একটু নড়েচড়ে বসে। গোল্ডফিস্কারের দৃষ্টি
তা এড়ায় না।

ইনিই যে মিস পুসি গ্যালোর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরনে পুরুষদের সুট পরা।

গোল্ডফিস্কার বলেন— গুড আফটারনুন মিস গ্যালোর। এইমাত্র আমাদের পরিচয়-পর্ব শেষ
হল। আপনার পথ-খরচা বাবদ আপনার জন্য চেয়ারে রাখা আছে পনেরো হাজার ডলার মূল্যের
একটা সোনার বাট এবং আজকের অনুষ্ঠানসূচি। যা প্রত্যেককেই আমি দিয়ে সম্মানিত বোধ
করছি। হ্যাঁ ভালো কথা, আমার দুই সেক্রেটারি, মি. জে. বন্ড এবং মিস—

গ্যালোর সোনার বাটটা হাতে নিয়ে বলে— খাঁটি সোনা?

গোল্ডফিস্কার বলেন— আমি খাঁটি কারবারই করি।

— ধন্যবাদ। আসলে আমি সব কিছু যাচাই করে নিতে চাই।

বন্দ মনে মনে বলে, তোমাকেও আমি তাই করে নেব। কত আর বয়স হবে তোমার, ৩০। বন্দ দেখে, পুসি গ্যালোরের সৌন্দর্য— সুন্দর মুখ, বেগুনি চোখ, মাথায় কালো চুলের প্লাবন, অধরদ্বয় লাল রং-এ রাঙানোতে তার আকর্ষণ আরও প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে।

গোল্ডফিঙ্গার বলেন— এবার আমি আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে বলি। গত কুড়ি বছরে আমি যে পরিমাণ অর্থ করেছি, তার পরিমাণ ছ'কোটি ডলার। যদিও আমার কাজকর্ম ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু শুনে আপনারা অবাকই হবেন, মাদকদ্রব্য স্মাগলিং-এর জন্য হংকং-এ যে 'গোল্ডেন পনি ডিস্ট্রিবিউটরস' ছিল, আমি তারই মালিক ছিলাম।

এরপর গোল্ডফিঙ্গার তার কর্মকাণ্ডের যে যে বিবরণ দেন, তা শুনে সকলের সাথে বন্দ এবং টিলিও স্তম্ভিত।

গোল্ডফিঙ্গার বলেন— এবার আসল কথা বলি, আমি যে বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেছি, তার সময় মাত্র এক সপ্তাহ। এতে সফলতা প্রাপ্তি হলে, পার্টনার হিসেবে আপনারদের প্রত্যেকের ভাগে জুটবে এক বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, একশো কোটি ডলার। আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন।

সবাই স্তম্ভিত, বিস্মিত।

মিস পুসি গ্যালোর বলে— একটা কথা, আপনার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখেই বলছি, মাঝপথে যদি পুলিশ এসে পড়ে?

মুদু হেসে গোল্ডফিঙ্গার বলেন— আমি আজ পর্যন্ত কোনো কাজে ব্যর্থ হই নি এবং পুলিশের খাতায় কোথাও আমার নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মনে মনে বন্দ বলে, তবে এইবার ঠুঠবে।

॥ আঠারো ॥

মি. জেড মিডনাইট এবার বলেন— মি. গোল্ড, আপনি যে পরিমাণ অর্থের কথা বললেন, তা নিয়ে অস্তুত আমি চিন্তিত নই। ব্যাপারটা আপনি পরিষ্কার করুন।

নদীর দিক থেকে পরপর দুটো স্টিমারের ভেঁপু শোনা গেল। একটা এপার থেকে, অন্যটা অপর পার থেকে।

মি সোলো বলেন — তা আপনার ভাগে কত পড়ছে মিঃ গোল্ড? সেটা কি জানতে পারি?

— পাঁচ বিলিয়ন।

লাস ভেগাসের মি. জ্যাক স্ট্র্যাম্প সবাইয়ের উদ্দেশে বলেন— উপস্থিত বন্ধুগণ, সব কাজের ব্যবস্থা মি. গোল্ডের। আমার মনে হয়, আমাদের বরাদ্দ নিয়ে বিশেষ কারো আপত্তি নেই।

— ইয়ে.... মানে, মি. গোল্ড— খানিক গাভীর্ঘ নিয়ে মি. হেলমুট স্প্রিংগার বলেন— হিসাব বলছে, লুঠের অঙ্ক এগারোশো কোটি ডলার।

— না, — গোল্ডফিঙ্গার এবার যেন মেজাজী। তিনি বলেন — ওটা এগারোশো নয়, পনেরোশো কোটি ডলার। যে পরিমাণ সম্পদ আমাদের পক্ষে আনা সম্ভব, তাই আমরা বয়ে আনব এবং আমি তারই উল্লেখ করেছিলাম।

মি. স্প্রিংগার তার স্পেশাল চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বলেন— মানছি আপনার যুক্তি। কিন্তু যে পরিমাণ অর্থ আপনি বললেন, তা একমাএ আছে ওয়াশিংটনের সরকারি টাকশাল, নিউইয়র্কের

সেন্ট্রাল রিজার্ভ ব্যাংক এবং কেনটার্কির 'ফোর্ট নক্স'। আমার মনে হচ্ছে, আপনি এদের মধ্যেই একটাকে বেছেছেন।

— ইউ আর রাইট! ফোর্ট নক্স।

বন্ড লক্ষ করল, সবার মনে কেমন একটা হতাশা।

মি মিডনাইট বলেন— মি. গোল্ড, আপনার এই কাহিনি হলিউডে তৈরি হবে। আপনি মেন্টাল ট্রিটমেন্ট করান। এক বিলিয়ন ডলার শুনে ভীষণ আনন্দ পেয়েছিলাম।

মিস পুসি অনুষ্ঠান ছেড়ে প্রায় চলেই যাচ্ছিল। বন্ড বলে -- মিস পুসি, মি. গোল্ড-এর কথা এখনও শেষ হয়নি। আপনি বসুন দয়া করে।

গোল্ডফিঙ্গার বন্ডের এই কথায় সত্যিই চমকে যায়। মনে মনে বোধহয় খুশিই হয়। গোল্ডফিঙ্গার বলেন— আমি বুঝতে পারছি আপনাদের মনোভাব। স্বাভাবিক। আমি জানি 'ফোর্ট নক্স' যেমন ত্রেমন ব্যাংক নয়। সবদিক থেকে ব্যাংকটা আকারে বেশ বড়ো এবং এর সুরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত আধুনিক এবং অভিনব। এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে চাই সমপরিমাণ শক্তি। আমি জানি, যদি আপনারা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তবে এই দুর্ভেদ্য দুর্গও আমাদের পক্ষে ভেদ করা সম্ভব। একটা উদাহরণ দিই, ১৯৫০ সালে মাত্র ছ'জন লোক মিলে ব্রিস্ক কোম্পানির আর্মারড কার থেকে দশ লাখ ডলার লুঠ করে এই দুর্ভেদ্য গাড়ি থেকে। এই ফোর্ট নক্স সম্বন্ধে বাজারে যেসব ধারণা আছে, তাতে আমার সন্দেহ আছে। তাই আমি আমার মতো করে একটা প্ল্যান তৈরি করেছি।

মি. বিলি রিঙ্গার ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন— মি. গোল্ড আপনি অযথা আমাদের সময় নষ্ট করছেন। বন্ধুগণ শুনুন, মি. গোল্ড-এর ধারণা নেই, আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর থার্ড আর্মারড ডিভিশনের ঘাঁটি হচ্ছে 'ফোর্ট নক্স'।

একটা হই হট্টগোল চিৎকার দেখা যায়।

গোল্ডফিঙ্গার এবার উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন— শুনুন শুনুন, সবাই শাস্ত হোন।

বন্ড গালে হাত দিয়ে সিনেমাটা দেখতে থাকে।

গোল্ডফিঙ্গারের সঙ্গে তাল মেলায় বন্ড। ব.- সেইসময় টিলিকে চোখ মেরে দেয়।

মিস টিলির মুখ। সে যেন কিছুই বুঝতে পারে না প্রথমে। তারপর সামলে নিয়ে বলে— ও. কে., ও. কে.।

গোল্ডফিঙ্গার এবং বন্ডের সাথে তাল মেলায় টিলি।

টিলি বলে— শুনুন সবাই। একটু শাস্ত হোন। আমাদের বস যা বলছেন, তা দয়া করে মন দিয়ে শুনুন। অল্পেতেই আপনারা অর্ধৈর্ষ হবেন না। পুরো ব্যাপারটা ভালো করে মন দিয়ে শুনুন।

গোল্ডফিঙ্গার গুপ্তিত ওদের আচরণে। তার মনে বিশ্বাস জাগতে থাকে। তিনি এবার বেশ প্রফুল্ল মনে বলেন— মি. রিঙ্গার, আমি আপনার বক্তব্যকে সম্মান জানিয়েই কিছুটা শুধরে দিচ্ছি। ওই 'ফোর্ট নক্স' -এ থার্ড আর্মারড ছাড়াও রয়েছে সিক্সথ আর্মারড ক্যাভালরি রেজিমেন্ট -এ ফিফটিস্থ আর্মারড ট্রুপ, ১৬০ নং ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপ। এছাড়া আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেক ডিভিশন থেকে বাছাই করা হাফ ডিভিশন প্রহরী। তাছাড়া আরও নানান বাহিনী। — বলে গোল্ডফিঙ্গার থামলেন।

মিস পুসি বলেন— তা এদেরকে টপকানো আপনার কাছে মনে হয় কোনো ব্যাপারই না।

একটা কোরাস ব্যঙ্গভরা হাসি কয়েক মিনিট ধরে বেজে চলে।

এত হাসি শুনে কোরিয়ান চাকরটা এবং অড জব ঘরে ঢোকে। তাদেরকে গোল্ডফিঙ্গার ইশারায় চলে যেতে বলেন। তারপর টেবিলে ক্রমাগত চাপড় মেরে সবাইকে শাস্ত করেন। এবার বলেন— এবার মানচিত্রটা দেখুন।— সামনে রাখা একটা ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর ম্যাপটা টাঙিয়ে বলেন— ফোর্ট নক্স ঘিরে যে ছোটো শহরটা আছে, এটা সেটারই ম্যাপ।—এরপর গোল্ডফিঙ্গার একটা ভাঁজকরা ফুট তিনেক লম্বা প্লাস্টিকের স্টিক দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাগুলি সবাইকে দেখিয়ে দেন।

এবার বলেন— বন্ধুগণ, মানচিত্র দেখে আপনারা একটু মনে মনে ছবি দেখতে পাচ্ছেন। কোনোরকম বিপদ বুঝলেই হাইড্রলিকের সাহায্যে এই রাস্তা মাঝখান থেকে ভাগ হয়ে গিয়ে পরিণত হয় ইম্পাতের পাঁচিলে। এটা অজ্ঞাত, কোষাগারে যাবার একটা গোপন সুড়ঙ্গও আছে। এই কোষাগারের সামনে রিসেপশন ও অফিসঘর। মূল ভাণ্ডার বাড়ির পিছনে। এনি কোয়েশ্চেন মোর? সবাই নিশ্চুপ।

গোল্ডফিঙ্গার এবার আরেকটা ম্যাপ টাঙিয়ে বলেন— এবার আসল ছবি। এটা হচ্ছে কোষাগারটা যে বাড়িতে আছে। বাড়িটার উচ্চতা— ৪২ ফুট, লম্বা— ১০৫ ফুট এবং চওড়া— ১২১ ফুট। গোটা বাড়িটা ইম্পাতের লাইনিং দেওয়া গ্রানাইট দিয়ে তৈরি এবং চার কোণে ইম্পাতের পিল-বক্সের মধ্যে তার মেশিনারী চোখ খুলে রয়েছে। এই দোতলা বাড়ির মধ্যে ইম্পাত ও কংক্রিটের তৈরি একটি ঘরে আছে মূল কোষাগার যার দরজার ওজন কুড়ি টন। জেনে রাখুন, কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী যখন তাদের নম্বর একত্রিত করবে, তখনই দরজা খুলবে। প্রয়োজনে এক মাইল দূরের সামরিক ঘাঁটি যখন তখন ছুটে আসবে বিপদ শোনামাত্র।

গোল্ডফিঙ্গার প্রত্যেকের নীরব বিস্মিতমুখ লক্ষ করেন।

স্তম্ভিত জেমস বন্দ নিজে। গোল্ডফিঙ্গার তো হেলাফেলা করবার মস্তিষ্ক নয়।

গোল্ডফিঙ্গার বলেন— ওই স্বর্ণভাণ্ডারে রাখা সোনার বাটের আয়তন আমার আপনাদেরকে দেওয়া বাটের প্রায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ, সাড়ে সাতাশ পাউন্ড। উপস্থিত সম্মানীয় বন্ধুবর্গ, এবার আমি এই স্বর্ণভাণ্ডার লুঠ করবার রাস্তা বর্ণনা করব।

মি. জেড মিডনাইট কড়া সুরে বলেন— নিশ্চই। আমরা তো সেইজন্যই এসেছি। যদি এটা সফল হন, তাহলে জানব আপনি বিশেষ ক্ষমতাবান কোনো দেবতা। নইলে পাগলামি বা ধাপ্লাবাঙ্গি বুঝব।

নির্বিকার ভঙ্গিতে গোল্ডফিঙ্গার বলেন— আপনারা যা খুশি তাই ভাবতে পারেন। এবার শুনুন, আমাদেরও নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে। আচ্ছা, আপনারা কি প্রতিজ্ঞা করতে পারেন যে, একথা আপনারা ছাড়া আর কেউ জানবে না?

সবাই গভীর, নিশ্চুপ। মৌনং সম্মতি লক্ষণং।

— বুঝলাম। — গোল্ডফিঙ্গার বলেন— একশোটা দশ টন ক্ষমতায়ুক্ত ট্রাক বা সিঙ্গল হুইলার গাড়ি ছাড়া এক বিলিয়ন ডলার দামের সোনা পাচার সম্ভব নয়। যারা লরি ভাড়া দেয় তাদেরকে আমি চিনি। অবশ্য এই লুঠের পর ভাগের সোনা আপনারা আপনাদের সুবিধামতো জায়গা থেকে নিতে পারেন। লরিতে করে আপনারা ঠিক কীভাবে সোনা পাচার করবেন, সেটা আপনাদের ব্যাপার। তবে বেশিরভাগ সোনা আমি নিজে লুঠ করব। তার জন্য রেলপথটাকেই বেছে নিয়েছি আমি। শুর দিকে আপনাদের দৃষ্টি না দিলেও হবে।

এক গ্রাস জল খেয়ে গোল্ডফিস্কার বলেন— এবার বলুন দেখি, এই স্বর্ণভাঙারে পৌছোনো অতীত দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রতিমুহূর্তে বিপদ। তবু পৌছোব আমি সেখানে? কী করে?

সকলের সাথে বন্ডও নিশ্চূপ। সত্যিই তো, এটা তো সে নিজে কখনো ভেবে দেখে নি।

গোল্ডফিস্কার এবারও বলেন— বুঝলাম। তাহলে আমিই বলি, কী করব। মানুষ যদি বাড়িতে জেগে থাকে, তবে তো চুরি করা যায় না। তাই ‘ফোর্ট নক্স’-এ ঢুকবার আগে আমি চাই সবাই ঘুমিয়ে পড়ুক।

পুসি। গ্যালোর বলে— ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ানো হবে নাকি?

সবাই হেসে ওঠে। বন্ড কিন্তু গম্ভীর।

গোল্ডফিস্কার ধৈর্য ধরে বলে যান— টোকিওর পৌর বিভাগের জল সরবরাহ দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট ‘ফোর্ট নক্স’ এলাকার যাবতীয় জল সরবরাহ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারের সাথে দেখা করে জানতে চাইবেন এবং পরিদর্শন করবেন সেখানকার জল সরবরাহ ব্যবস্থা। উদ্দেশ্য টোকিওতে আধুনিক প্রযুক্তিতে দুটো ওয়াটার সাপ্লাই স্টেশন তৈরি করা। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মহানন্দে, তাদের এই কাজে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন। টোকিওর ওই দুই কর্মচারী আমার লোক।

বন্ড এতক্ষণে মুখ খোলে— দারুণ আইডিয়া।

পুসি বলে— আপনি ধরে ফেলেছেন নাকি ব্যাপারটা? মি. গোল্ড তো এখনো শেষ করেন নি।

বন্ড বলে — এ তো সোজা ব্যাপার। টোকিওর ওই ভদ্রলোক দুজন ‘ফোর্ট নক্স’-এ গিয়ে পরিদর্শনের ছুতোয় জলে কোনোকিছু মিশিয়ে দেবে। যা পান করলে বেশ কয়েক ঘন্টার আরামদায়ক ঘুম হবে। মি. গোল্ড, আমি কি সেই জল এখন পেতে পারি?

গোল্ডফিস্কার বন্ডের বুদ্ধি এবং রসিকতায় শুধু অবাকই হন না, হেসেও ওঠেন। তিনি বলেন— সাবাস বন্ড। আমি আমার সদস্য নির্বাচনে কোনো ভুল করিনি।

সভাব মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। কে এই লোকটা?

— তারপর? — মি. জ্যাক স্ট্র্যাপের প্রশ্ন?

— গত যুদ্ধে জার্মানদের আবিষ্কৃত এই মাদকদ্রব্যটিই আমার প্রথম অস্ত্র। লোকও মরল না, অথচ বিনা রক্তপাতে দুর্গে প্রবেশ করা গেল। — গোল্ডফিস্কার বলেন। এবাব শুনুন— নিউইয়র্ক থেকে আগের দিন রাতে একটা বিশেষ ট্রেনে আমরা এই শুভ কাজে রওনা হব। আমাদের দলের একশো জনের পরনে থাকবে রেড ক্রসের পোশাক। নার্সের পোশাকে মেয়ে সংগ্রহের দায়িত্ব মিস গ্যালোরের।

মিস গ্যালোর টিপ্পনী কাটে— নার্সের পোশাকে এমন সুন্দরীদের আনব আমি, যা দেখলে মিস্টারকে আর জলে মাদকদ্রব্য মিশিয়ে কাউকে সজ্ঞান করবার দরকার হবে না।

— আঃ মিস পুসি। — মৃদু ধমক দেন মি. মিডনাইট। — তিনি বলেন— আপনি বলে যান মি. গোল্ড।

গোল্ডফিস্কার শুরু করেন — ‘ফোর্ট নক্স’-এর পঁয়ত্রিশ মাইল আগে ইঞ্জিনের কামরায় উঠে বলব যে, আমরা ‘ফোর্ট নক্স’-এ ঢোকবার আগে কয়েকটি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে পরিস্থিতিটা বুঝে নিতে চাই। এর ফলে যদি কোনোভাবে খবর ছড়িয়ে পড়ে তাহলে প্রশাসনের প্লেন গডম্যান এয়ারফিল্ডে প্রথমেই ল্যান্ডিং করবে। কিন্তু আমরা সেখানে ওদের আগে পৌঁছেই ওই এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল কবজা করে নিয়ে সব প্লেনকে নামা বন্ধ করে দেব।

বন্দ ভাবে, প্ল্যানটা তো অকল্পনীয় তবে মহাশয়, তোমার কাজ ও কথার মধ্যে কি সমতা থাকবে?

গোল্ডফিস্কার বলতে থাকেন— ট্রেন লুইভিল ছাড়বার সময় থেকেই প্রয়োজন না হলে চূপচাপই থাকবে। হয়তো ড্রাইভার আর ফায়ারম্যানকে দেখতে হতে পারে। এরপর ট্রেন নিয়ে আমরা থামব গিয়ে স্বর্ণভাণ্ডারের সংলগ্ন সাইডিং এ। এরমধ্যে আপনাদের ট্রাকগুলোও সব এসে যাবে। এবং লোকভর্তি কয়েকটা ট্রাক চলে যাবে এয়ারপোর্ট দখলের উদ্দেশ্যে।

মি. সোলো বিবক্তিপূর্ণ সুরে বলেন— আচ্ছা, ওই কুড়ি টন দরজা কি ফুঁ দিলেই খুলে যাবে? ফুঁ-টা কে দেবে? আপনি না আপনার মহিলা সেক্রেটারি?

মেজাজ নিরুদ্ভাপ রেখেই গোল্ডফিস্কার বলেন— তা আপনারা বলতে পারেন। — বলে টেবিলের তলা থেকে একটা ভারী বাস্তু তুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর বললেন— আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি— সাধারণ অস্ত্রের বাইরে যদি আধুনিক অস্ত্র দরকার পড়ে, তাহলে তা কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন?

- কেন যারা সেসব মারাত্মক অস্ত্র তৈরি করে— মি. স্ট্রাপ বলেন।

- প্রায় ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে সরাসরি পেতে গেলে অনেক ঝামেলা। এর থেকে ঘুস বা নিজস্ব বুদ্ধি বলে নিকটস্থ কোনো সামরিক ঘাঁটি থেকে আপনি পেয়ে যাবেন।

বন্দ ভাবে, এ সে কোন পৃথিবীতে ঢুকছে। এরা তো যে কোনো গ্রহকেও বোধহয় দখল করে নেবে। সিগারেট ধরায় বন্দ। কিন্তু এতবড়ো ঠান্ডা মাথার ভয়ংকর শিকারকে সে কীভাবে জেলে পুরবে?

গোল্ডফিস্কার সহাস্যে বলেন— আমিও এই অস্ত্র সংগ্রহ করেছি দশ লক্ষ ডলার দিয়ে এক সামরিক ঘাঁটি থেকে। ‘কর্পোরাল’ নামক এক মাঝারি পাল্লার স্কেপশাস্ত্রের ডগায় এই অ্যাটম বোম লাগানো থাকে, যা দিয়ে আমি দরজা ভাঙব। না না, শঙ্কিত হবেন না। অভিযানে আসল কাজের আগে এটা কোনোমতেই ফাটবে না।

— মি. গোল্ড, বোমা ফাটার পর ডেডবন্ডির ছাই এবং গ্যাস কতদূর ছড়াবে? — মি. রিঙ্গারের ভয়ানক প্রশ্ন।

— যারা স্বর্ণভাণ্ডারে ঢুকবেন, তাদের প্রত্যেকেরই থাকবে তেজস্ক্রিয়তা প্রতিরোধক পোশাক। এটা ‘ভস্মহীন’ বোমা। ধোঁয়ার মধ্য থেকেই সোনা বার করে আনতে হবে আমাদের। যারা জল খেয়ে ওখানে অজ্ঞান হয়ে থাকবে, তাদের যতজনকে পারব আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমরা বাইরে সরিয়ে দেব। হ্যাঁ, বোমা ফাটার কিছুক্ষণ পর আমরা ঢুকব। কেননা, কিছু ইট, সিলিং তো ভাঙবেই।

ঘরের মধ্যে যেন এখনই বোমা ফেটেছে।

গোল্ডফিস্কার এবার বলেন— এই অভিযানটির নাম হিসেবে আমরা ব্যবহার করব এই নামটি— ‘অপারেশন গ্র্যান্ড ম্যাম’ এবং আমরা সবরকমভাবে সাহায্য করব— মিস্টার জেমস বন্দ এবং মিস টিলি মাস্টারটন। এবার বলুন— আর কোনো প্রশ্ন?

॥ উনিশ ॥

মি. বিলি রিঙ্গারের মুখের অঙিব্যক্তি এবং শারীরিক আকর্ষণ বন্দকে ওর নামের পাশে ‘০’ (শূন্য) বসাতে বাধ্য করেছে। এবং কতটা বিশ্বাসযোগ্য, তা নিয়েও বন্দ ভাবিত। স্প্রিঙ্গার

বিয়োগচিহ্ন। বন্ধকে অবাক করে দিয়ে মি বিলি রিং এবার উঠে দাঁড়ালেন। বলেন — মি গোল্ড, আজ বহুদিন হল অপরাধ জগতের সঙ্গে থাকতে থাকতে দেখলাম, অতীতের বিবিধ অপরাধের সাথে আপনার পরিকল্পিত ডাকাতিটি অত্যন্ত সর্বাধুনিক এবং দুঃসাহসিক। যারা এককালের অপরাধ সম্রাট ছিলেন— যোমন, জন টোরিও, ডিয়ন ওব্যানিয়ন, বিগ জিম কলোসিমো, আল ক্যাপোন তারাও আজকে যদি এখানে থাকতেন, তবে নিঃসন্দেহে তারা আপনাকে স্যালুট চুকে আপনাব সঙ্গী হতে চাইতেন। '৫০-এর দশকে গোলাগুলির সাথে এল অন্যান্য নানান আধুনিক মারণাস্ত্র। একটা বোমা, একটা আওয়াজ আব তাতেই সব শেষ। চমৎকার! দারুণ! আমি সানন্দে আপনার প্রস্তাবে রাজি।

ধন্যবাদ মি. রিং আমাকে সমর্থন জানাবার জন্য।

মি. সোলো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সের মতো তার চোখের লেন্সটা দিয়ে গোল্ডফিঙ্গারকে বলেন— - যাই বলুন মি, আপনার মতো এইরকমই একজন ঠান্ডা মেজাজের লোককে শেষ পর্যন্ত আমায় মেশিনগান দিয়ে ঠান্ডা করতে হয়েছিল। তো ঠিক আছে। আমি রাজি। কিন্তু অপারেশন ফির্নিশ হবার পর যদি ওই এক বিলিয়ন মাল না পাই তবে আমার যন্ত্র কিন্তু তখন কথা বলবে।

- আপনাকেও ধন্যবাদ। মি. রিং, আমি বাঁচতেও চাই, আরও বড়ো কাজ করতে চাই। এবার মি. স্প্রিঙ্গার?

গম্ভীর স্বরে স্প্রিঙ্গার বলেন— আমি পরে বলছি। বাকিরা কী বলেন ওনি।

মি. মিডনাইট ফোডন কেটে বলেন— - অত ঢামনামো করো কেন? কাজটা করবে তো তুমি। মনে হচ্ছে, গড যেন আকাশ থেকে আসছেন মন্ত্র দেবার জন্য তোমাকে।

বন্দ মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসে। যাড় ঘুরিয়ে দেখে, টিলিও মুখে ক্রমাল চাপা দিয়ে হাসছে। টিলি বন্ডের দিকে তাকায়।

মি. স্ট্যাপ বলেন— মি. গোল্ডের চিন্তাধারা সত্যিই প্রশংসনীয়। হ্যাঁ, আমরা যদি উপযুক্ত লোক এবং অস্ত্র জোগাড় করতে পারি, তবে এটা কোনো সমস্যা হবে না। আমি যোগ দেব। -- বলেই তিনি মিস গ্যালোরের দিকে তিনি বিক্রপভরা চোখে তাকালেন।

বন্ডের দৃষ্টি এড়াল না। সেভাবে, এবা বোধহয় প্রত্যেকেই নিজেদের বিশাল হনুমান ভাবে। দেখা যাক, কী হয়।

মিস্ পুসি গ্যালোর জানায় যে, তার ব্যবসা এখন আর সেরকম রমরমা নেই। তাই বলে সে ব্যাংক ব্যালান্সহীন হয়ে নেই। অন্তত তার মেসেদের চাক্ষা রাখতে তার টাকার প্রয়োজন। হ্যাঁ, সে রাজি আছে।

মনে মনে হাসে বন্ড, হে বিবিধ দস্যুগণ, গোল্ডফিঙ্গারের বুদ্ধির কাছে তোমরা তো ফাটা বেলুন। অপরাধ যদি করতেই হয়, তো এর কাছ থেকে কিছু শেখো, সাহস নাও।

গোল্ডফিঙ্গার বলেন— মি. স্প্রিঙ্গার, এবার আপনি?

মি. স্প্রিঙ্গার উঠে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘ হাই তুলে বলেন— দুঃখিত মি. গোল্ড। ডেট্রয়েটে আমার দলের কেউ এতে রাজি হবে না। এটা শুনে উলটে আমাকেই পাগল বলবে। শেষে আমার দল ডেঙে যাবে। আচ্ছা, আমি বিদায় নিচ্ছি। - বলে শান্তভাবে ঘর ছাড়লেন মি. স্প্রিঙ্গার।

মি. মিডনাইট বলেন— বাঁচা গেল। বরং ওব ভাগটা আমাদের মধ্যে ভাগভাগি হবে। কী বলেন মি. বন্ড?

বন্ড বলে -- আমি নই। উনি -- গোল্ডফিঙ্গারের দিকে আঙুল তোলে।

গোল্ডফিস্কার একদৃষ্টে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন।

মি. মিডনাইট বলেন বন্ডকে — এই যে সেক্রেটারি সাহেব। গলা তো শুকিয়ে গেল। দয়া করে যদি—

গোল্ডফিস্কারের অনুমতির অপেক্ষা না করে বন্ড সবাইকে বুফের দিকে যেতে অনুরোধ করে।

বন্ড এবার তার দু হাতে দুটো শ্যাম্পেনের গ্লাস নিয়ে বাক্যরত পুসি ও টিলির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। পুসি বলে— এই যে মি. হ্যান্ডসাম, সরে দাঁড়াও। এখানে নয়।

বন্ড টিলির দিকে তাকিয়ে এক বিরক্তির হাসি হেসে সরে গেল।

সেটা লক্ষ করে বন্ডের কাছে এসে মি. মিডনাইট বলেন — এই যে মি. বন্ড, যদি এটি আপনার বাঞ্ছনীয় হন, তাহলে পুসির থেকে সরিয়ে দিন। নইলে পুসি তার দল ভারী করবে।

বন্ড টিলিদের দিকে তাকিয়ে বলে— টিলি মেয়েটি এমনিতেই স্বাধীন প্রকৃতির।

মিডনাইট বলেন — আচ্ছা, তাহলে আমি একবার লাক ট্রাই করি। শরীরটা যেন— বলে গ্লাসে চুমুক দিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বন্ড নিরুপায় হয়ে একা একা মদ্যপান করে চলেছে। আচমকা কোরিয়ান চাকরটা ঘরে ঢুকে নীচু স্বরে বন্ডকে কিছু বললে তিনি গম্ভীর হয়ে যান। তারপর চামচ দিয়ে গ্লাস বাজিয়ে বলেন— বন্ধুগণ, একটা চরম দুঃসংবাদ আছে। আমাদের আমন্ত্রিত বন্ধু মিঃ হেলমুট স্প্রিঙ্গার সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যান। এবং তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়। এবং তার সঙ্গীও মারা গেছেন। সিঁড়ির ফণ্ট ধরা পড়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এর মেরামতের জন্য লোক এসে পড়বে।

মি. মিডনাইট বলেন — এ এমনিতেই আর বেশিদিন বাঁচত না।

মি. স্ট্যাপ বলেন— যথার্থ বলেছেন। ওফ্, কী দস্ত! ব্যাটা যদি না বেরোতিস তাহলে তো এক কোটি বিলিয়ন ডলার পেতিস। আর ওকে কড়কানো দরকার ছিল।

‘কড়কানো’ কথাটার এখানে মানে ঝুল খুন করা। গোল্ডফিস্কারের দু’বার ঘন্টা পেটাবার নির্দেশ ছিল অড জবের প্রতি। সে তার কর্ম সম্পাদন করেছে তাব প্রভুব আদেশে। এখন বন্ড কিছু করতে পারেনা। তবে সামনেই যে পঞ্চাশ হাজার সংখ্যা কড়কানো হবে, সে কাজে বন্ড ছাড়া আর বাধা দেবার কেউ নেই।

মিটিং-এর পরে ঘর ফাঁকা হওয়ার পর বন্ডকে শুধু থাকতে হয়েছিল টাকা নেবার জন্য। তখন বন্ড বলে— আচ্ছা, জলে যে ওষুধ মেশানো হবে, সেটার নাম কী?

— নাম তো আমি তোমায় বলব না। তবে এটুকু জান, এর আসল নাম, যা সংক্ষেপে— ‘GB’

বন্ড বলে— যদিও জানি, আমেরিকাতে গাড়ি চাপা পড়ে ওই পঞ্চাশ হাজারের ওপর লোক মরে, কিন্তু জলে ওষুধ মিশিয়ে তুমি— আচ্ছা, এই ‘GB’ ব্যাপারটা কী?

গোল্ডফিস্কার বলেন— এক মারাত্মক নার্ভ কিলার। ১৯৪৩ সালে জার্মান বৈজ্ঞানিকরা এর আবিষ্কারক। আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে হাইড্রোজেন বোমার থেকেও শক্তিশালী এই পয়জন পেয়েছি।

বন্ড মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে— দেখ আমি বলি কী, এই এত টন সোনা পাচার করা মুখের কথা নয়। একবার যদি এ আমেরিকান সৈন্যবাহিনী আমাদের কবজা করে ফেলে, তো নিজেদের মরণ ছাড়া আর কোনো রাস্তা থাকবে না। আর এর জন্য তুমি ৫০/৬০ হাজার লোককে মেরে ফেলবে।

আবার সেই ঠান্ডা মেজাজ। এই শীতল মন নিয়ে গোল্ডফিস্কার বলেন— গত পাঁচ বছরের প্ল্যান এটা আমার। শোনো, একটা রাশিয়ান ফ্রুজার জাহাজ ওই দিন ঠিক ওই সময়ে ঢুকছে ভার্জিনিয়া শহরের নরফোক বন্দরে। অপারেশনের দিন ট্রেনে আর তারপরে ট্রাকের সাহায্যে আমি সমস্ত সোনা অর্থাৎ আমেরিকার সোনার ভ্রমরকে নিয়ে উধাও হয়ে যাব। আর একটা কথা, মিটিং—এ যাদের ডেকেছি, তারা সবকটাই গর্দভ এবং আমার এই কাজের অনুপযুক্ত। লুঠের পর ভাগের মাল সরাতে গিয়ে দেখবে নিজেরাই মারা পড়ছে। যাকগে, রাত শেষ হবার আগে পুরো প্ল্যানটা আমি আর একবার ভালোভাবে ছকে দেব। তার প্রত্যেকটার সাতটা করে কপি তুমি রেডি করে রাখবে।

বন্ডকে মেজাজ ঠান্ডা রাখতে হচ্ছিল। SMERSH গোল্ডফিস্কারকে তাদের মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে আমেরিকার চূড়ান্ত সর্বনাশ করবার জন্য। আর গোল্ডফিস্কার এত কাঁচা লোক না যে, সব কাজ নিখুঁতভাবে শেষ করে পালাবার সময় বন্ড এবং টিলিকে বাঁচিয়ে রাখবে সাক্ষী হিসেবে! কিন্তু কী করে একমাত্র বন্ডই পারবে একে আটকাতে?

পরের দিন বিরামহীন কাজ করে গেল বন্ড। এবং তাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে গেল টিলি মাস্টারটন। কাজের মধ্যে টিলি জানাল যে, পুসি তাকে সবরকম সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

দিনের শেষে বন্ড যখন চেয়ারে হেলান দিয়ে কাজের ফাঁকে কফি খাচ্ছে, তখন একটা চিঠি পেল সে :

‘আগামীকাল বেলা ১১টায় আমি স্পট দেখতে যাচ্ছি। লা গার্ডিয়া এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে চেপে। তুমি আসবে। মিস টিলি থাকবে। মনে রেখ। — G’।

বন্ড এখন এই ঘরে একা। অনেক চিন্তা করে সে অপারেশন গ্র্যান্ড স্ল্যাম-এর ব্যাপারটা টাইপ করে ফেলল। কাগজটাতে সিগারেটের মতো রোল করে তার ওপর সে লিখে দিল : ‘জরুরি এবং গোপনীয়। এই রোলটা পিস্কারটন ডিটেকটিভ এজেন্সির; ১৫৪, ন্যাসো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক সিটি; মি. ফেলিক্স লিটারের হাতে পৌঁছে দিলেই নিশ্চিত ৫০০০ ডলার ক্যাশ পাওয়া যাবে। আর কাগজের ওপর বন্ড লিখে দিল — ‘৫০০০ ডলার’। এবং টেপ দিয়ে রোলটাকে থাইতে আটকে নিল।

॥ কুড়ি ॥

— মি. বন্ড, এয়ারক্রাফট কন্ট্রোল আমাদের জানাচ্ছে, বিনা অনুমতিতে এই সীমানায় আমরা কে ঢুকেছি? ঠিক আছে, জবাব দিচ্ছি। হ্যালো, হ্যালো.... কন্ট্রোল.... হ্যালো, আমি প্যারামাউন্ট পিকচার্স কর্পোরেশনের মি. গোল্ড বলছি। পেন্টাগনের চিফ অব স্পেশাল সার্ভিসেস-এর লিখিত অনুমতি নিয়ে ফিল্ম লোকেশন-এর স্পট বাছতে বেরিয়েছি। ১৮৬১ সালের এক বিখ্যাত যুদ্ধকে ভিত্তি করে একটা অ্যাডভান্ট ফিল্ম তৈরি করছি। মেইন রোলে আছেন ক্যারি গ্রান্ট এবং এলিজাবেথ টেলর।

.... হ্যাঁ,.... ও. কে., ও. কে. স্যার। অসংখ্য ধন্যবাদ। — গোল্ডফিস্কার আর কতরকম জালিয়াতি জানে— বন্ড বিস্মিত হতে থাকে।

এরপর আবার ‘ফোর্ট নক্স’-এর ওপর দিয়ে প্লেনটা পাক মারে।

অড জব প্লেনের পিছনদিকে যেতে গেলে বন্ডও ওর পিছু পিছু গিয়ে অড জব-এর কঠিন দৃষ্টির সামনে দিয়ে অন্য বাথরুমে ঢোকে।

প্লেনে ওঠবার আগে সেই কাগজের রোলটা কাউকে দেবার সুযোগ পায়নি বন্ড। বন্ডকে যারা সমর্থন করেছে তার সবাই আজকে এই ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছে। এসেছে পুসি গ্যালোরিও। সবাই

আজ বেশ গম্ভীর। আশ্চর্য, পুসি গ্যালোরি কী বন্ডকে সন্দেহ করছে? করলে কিছু করার নেই। প্লেন ব্যাক করছে। এয়ারপোর্টে নেমেই কাগজের রোলটা পাচাব করতেই হবে।

বাইরে অড জব বাথরুমের কড়া নাড়ছে। বন্ড চৈঁচিয়ে বলে— আসছি রে শালা। — বলে বন্ড, থাই থেকে প্যাকেটটা খুলে নিয়ে কমোডের সিটটা টেনে তুলে তাতে আটকে দিল। সিট না তুললে এটা পরিষ্কার করা যাবে না। ‘৫০০০ ডলার’— ঝাড়ুদার যেই হোক না কেন, সব কাজ ফেলে সে আগে দৌড়াবে।

শুধু অড জব নয়, একে একে সবাই সেই টয়লেটে ঢুকল। কিন্তু শুধুই হালকা হয়ে ফিরে এল। অড জব যত খুশি গজরাক। বন্ড ভাবে, আমি শুধুই হাসব।

পিস্কারটন এজেন্সির দুঁদে গোয়েন্দা যদি অফিসে না থাকে তাহলে প্রথমে সবাই ভাববে কে এই ০০৭? শেষ পর্যন্ত ঝাড়ুদারের কপালে ট্যান্ড্রি ফেয়ার ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। গালাগাল খেতে হবে বন্ডকে। কিংবা টয়লেটটা যদি পরিষ্কারই না হয়, তবে?

এদিকে এই ভয়ংকর ডাকাতির পূর্বের কাজকর্ম বন্ডের তোড়ের মতো এগিয়ে চলল। খবর এসে গেছে— বিষ ঢালা হয়ে গেছে জলে।

সন্ধ্যাবেলা গোল্ডফিসারের লিখিত নির্দেশ : ‘অভিযানের প্রস্তুতি-পর্ব শেষ। এবার মূল অভিযান। মাঝরাতে ট্রেনে উঠতে হবে। যাবতীয় পেপারস সঙ্গ্রে আনতে একটাও যেন ভুল না হয়। — ‘G’।

ঠিক সময়ে বন্ড টিলিকে মাঝখানেে পজিশন করে সার্জেনের ড্রেসে গোল্ডফিসার এবং নার্সবেশে টিলিকে নিয়ে সপারিসদ ঢুকলেন পেন্সিলভানিয়া স্টেশনে। গোল্ডফিসার-এর বাহিনীর গায়েও ডাক্তারের পোশাক।

স্টেশন মাস্টার গোল্ড-বাহিনীর ডাক্তারদের (নকল) সাথে কথা বলতে লাগলেন। সবাই দারুণ চিন্তিত, উদগ্রীব। নার্সদের মুখও বেশ চিন্তিত। হঠাৎ ঘনিয়ে আসা বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য ডক্টর গোল্ড এবং তার বাহিনী সদাই আকুল।

স্টেশন মাস্টার বলেন — ডক্টর গোল্ড, আপনাদের এই মন্যাত্ত্ব এবং সেবার মহানুভবতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ‘ফোর্ট নক্স’ থেকে এখনও কোনো খবর নেই। লুইভিলে ট্রেন আটকে দেওয়া হয়েছে। ওখানকার সব পাবলিক বলছে, রাশিয়ানরা বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়েছে প্লেন থেকে ... অবশ্য, এটা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু ডক্টর গোল্ড, আমি শুনছি কোনো খাবারে নাকি বিষক্রিয়া?

সেই পুরোনো রূপ। শাস্ত মেজাজ। গোল্ডফিসার বলেন — আমরা সেই জন্যই এত তড়িঘাড় করছি। আর যদি এর কারণ জানতে চান তার মেডিক্যাল সায়েন্সের পাতা থেকে আমি বলব, এর নাম হল -- ‘Tripanosomiasis’।

স্টেশন মাস্টার বলেন— আপনাদের এই দরদি মনোভাবের জন্য আমরা সবাই খুব আনন্দিত। যাক, দেরি করবেন না, ট্রেনে উঠে পড়ুন। আমি সিগন্যাল দিচ্ছি।

সবাই এখন ট্রেনের কামরায়।

বন্ড টিলিকে নিয়ে যে কামরায় উঠল, সেখানে ওদের পাশ দিয়ে পুসি যেতে গিয়ে বন্ডের সিটের পেছনে এবং তা অনেকটাই বন্ডের ঘাড় ছুঁয়ে হাত রেখে সে দাঁড়িয়ে বলে— এই যে হ্যান্ডস্যাম, কী খবর? তোমার এই বাঙ্কবীটি বুঝি তোমায় ছাড়ছে না?

টিলির দিকে তাকিয়ে বন্ড বলে- - এই যে কাটা সুন্দরী, আমি তোমার নার্সিং এরই অপেক্ষা করছিলাম। তা হলে নাকি?

টিলি যেন ঈর্ষান্বিত। সে শুধু বলে - এত ছুকছুকানি ভালো নয়।

পুসির মধ্যে যেন এবার চুম্বনের ইচ্ছা জাগে। সে বলে - - আচ্ছা, তুমি সারাদিন এখানে নীরসভাবে কাটাও কী করে বল তো?

বন্ড বলে- - কেন, আমি আর টিলি সমস্ত পেপার ওয়ার্কস করি।

ট্রেন তার চাকা এগোতে থাকে। তার চলার ছন্দে ছন্দে বন্ড ভাবতে থাকে, লোভের বশবর্তী হয়ে আমেরিকার সব বিভীষিকাময় ডাকাত বা দস্যুদল কীভাবে শাস্ত রয়েছে। তবে এটা মানতেই হবে সবাইকে, যেভাবেই হোক, গোল্ডফিঙ্গার সবাইকে তাব আয়ত্ত্বাধীন করেছেন। সেটা কী তিপনোটাইজ-এর জোরে? হয়তো তাই। কিন্তু একটামাত্র লোক সদা সতর্ক।

বন্ড ভাবে, সে যদি গোল্ডফিঙ্গারকে খুনও করে, তবে তার পরিবর্তে নেতা হবার যোগ্যতা রাখেন মি. সোলো। তাহলে লাভ বেশি। গোল্ডফিঙ্গারের আঞ্জাবহ দাসেরা প্রাণভয়ে পালাবে।

কিন্তু ওই পঞ্চাশ হাজারের বেশি লোক। সেক্ষেত্রে বন্ড যদি তার সময়েচিত কর্তব্য ঠিকমত পালন করতে না পারে, তবে সে তো— বন্ড যন্ত্রণায় জ্বলতে থাকে।

॥ একুশ ॥

কখনো সোজা, কখনো বেঁকে-- এইভাবে চলতে চলতে, দুপাশে ছোটো বড়ো অরণ্যের মধ্য দিয়ে ট্রেনটা ভোর ছটার সময় লুইভিল স্টেশনে এসে হীন করল।

স্টেশনে নেমে স্টেশন মাস্টারের সাথে গোল্ডফিঙ্গারের কিছু কথা হল। এবপর মি. সোলোকে বলেন ডক্টর, পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেছে। -- হাতের কালো ব্যাগটা সোলোকে দেখিয়ে বলেন -- আমরা ইঞ্জিন কম্পটিমেন্টের দিকে যাচ্ছি। সবাইকে গ্যাস মুখোশ পরতে বলে দিন। আমিও নিয়ে নিয়েছি।

-- ও. কে. স্যার।

এরপর ট্রেন ছাড়ল। লুইভিলে রয়ে গেল ট্রেনের চারজন কন্ডাক্টর সহ বাকি দলটা।

সবার মধ্যে এখন বেশ টানটান উত্তেজনা। নার্সরা কফি এবং কাহিলদের জন্য ট্যাবলেট দিয়ে গেল। কোনোরকম ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছে না কেউ।

আচমকা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনের স্পিড কমে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই আবার স্বাভাবিক গতিতে ফিরে এল। অর্থাৎ, ইঞ্জিনের ড্রাইভারকে সরিয়ে অন্য কেউ ট্রেন চালাচ্ছে।

স্ট্র্যাপ এসে বলে গেল - - দশ মিনিট বাকি আছে। A, B এবং C বাহিনীর সবাই আর্মস নিয়ে রেডি থাকে যেন।

বন্ড উঠে বাথরুমে গিয়ে জুতোর হিল সরিয়ে। সারটা গুঁজে নেয় কোমরের মধ্যে। ভীষণ অস্থির লাগছে যেন তার। আবার নিজের জায়গায় এসে বসে।

জানলা দিয়ে বন্ডের চোখে পড়ল, একসারি হ্যান্ডার (প্লেন রাখবার গ্যারেজ)। তার মানে গডম্যান এয়ারপোর্ট। কয়েকটা নতুন বাড়ি দেখা গেল। মনে হচ্ছে ওগুলো ফাঁকা।

দূরে ফোর্ট নক্স দেখা যাচ্ছে। ভোরবেলা এক মিস্তি আবহাওয়া। বাঁদিকে স্টেশন রোডে দুটো গাড়িতে খুব বিক্রীভাবে ধাক্কা লেগেছে। মনে হচ্ছে, একজন ডেড। বন্ডের হার্ট বিট বেড়ে গেল যেন।

ট্রেনের গতি কমে এসেছে। ধীর লয়ে ট্রেন এগিয়ে চলেছে। দেখা গেল মেন সিগন্যাল বন্ধ যে ঘরে আছে, তার খোলা জানলা দিয়ে একটা শরীর জানলার ওপর পড়ে আছে। তার মানে? একী! চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে কোথাও না কোথাও মৃতদেহের সারি। এক বিভীষিকাময় নীরবতা।

ট্রেন ব্র্যান্ডেনবুর্গ স্টেশনে ঢুকল। এখানেও শিশু, যুবক, বৃদ্ধের মৃতদেহ। আরে ওটা কী? টিকিট কাউন্টারের সামনে প্যারাম্বুলেটের বাচ্চাটা কি ঘুমোচ্ছে? ওর মা কিন্তু ওই বাচ্চাটার পাশেই মাটিতে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে।

বন্ড বলে— বাচ্চাটা দুধ খেয়েছে।

টিলি বলে— ভালো করে দেখ না আর একবার।

বন্ড বলে— আমার কাছে বেশি থেকো না। যে কোনো মুহূর্তে গুলি চলতে পারে।

ভেঁ বাজিয়ে ট্রেন থামতেই কোষাগারের সাইডিং-এর প্ল্যাটফর্মে একে একে সবাই নামতে লাগল।

এর পরের দৃশ্য মিলিটারির অপারেশনের মতো। সাব-মেশিনগান হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল একটা গ্রুপ, তারপর স্ট্রেচারে করে মৃতদেহ সরানো। কোষাগার-এর দরজা ভাঙার জন্য নিজস্ব লোক নিয়ে গোল্ডফিঙ্গার। লরি নিয়ন্ত্রণ করতে ট্রাফিক কন্ট্রোলার। আর যদি কেউ জেগে ওঠে তাদের দেখার জন্য পিস্তল হাতে নার্সের দল।

গোল্ডফিঙ্গারের বাহিনীর মধ্যে বন্ড ও টিলির কাছে থাকবে ম্যাপ, টাইম টেবিল আর ঘড়ি। কোনোরকম দেরি হলেই গোল্ডফিঙ্গারকে বন্ড জানাবে। সাইডিং-এর পাশে স্ত্রিজেল ইঞ্জিনের পাশে সবাই থাকবে। কারণ, ওখান থেকে সবকিছু লক্ষ রাখা যাবে আর বিস্ফোরণের সময় ওটাই নিরাপদ জায়গা।

বন্ড ও টিলি চলে গেল ইঞ্জিনের মাথায়। গোল্ডফিঙ্গারের মুখের সামনে মাইক্রোফোন, চোখে দূরবিন। অড জব নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে এক কঠোর দৃষ্টি নিয়ে বন্ড ও টিলিকে লক্ষ রাখছে।

বন্ড ভাবছিল, কিভাবে কোন পজিশন থেকে গোল্ডফিঙ্গারকে অ্যাটাক করা যায়। স্ট্র্যাপ উত্তেজিত হয়ে বলে— প্রথম গেট পেরিয়ে গেছে ওরা সবাই। বন্ড এবার মূল আক্রমণ লক্ষ্যের দিকে তাকাল।

এ এক কল্পনাভীত দৃশ্য। বন্ড অনেক চিত্র দেখেছে, কিন্তু এটা একেবারেই দলছুট ছবি।

মাঝখানে বিশাল ধনাগারের গ্র্যানাইটের কালো দেওয়ালে সূর্যের আলো পড়ে দ্যুতি বেরোচ্ছে। বাস্তবতা, কিন্তু সম্পূর্ণ নীরবতা নিয়ে গোল্ডফিঙ্গারের বাহিনী কাজ করে যাচ্ছে। বাইরে লরিগুলোও যেন মানুষের সাথে প্রতি পদক্ষেপে এই অপরাধযজ্ঞে সাহায্য করে যাচ্ছে। আর এই নিখুঁত এবং শৈল্পিক অপরাধ— যা গোল্ডফিঙ্গার বন্ডকে একদা বলেছিল— ‘আমি আমার শৈল্পিক কুশলতা প্রকাশ করি কর্মের মাধ্যমে’— একযোগে মনের স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখে যাচ্ছে সমগ্র দুনিয়া।

কোষাগারের ভিতরে বাইরে অজস্র সৈন্যের শ্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে দুটো সামরিক গাড়ির মধ্যে।

একটা বিড়াল পর্যন্ত বেঁচে নেই বোধহয়, যার সাহায্যে বন্ড কোনো ফাঁদ তৈরি করতে পারে।

গোল্ডফিঙ্গার ঘোষণা করেন— এবার বিস্ফোরণ হবে। সকলে নিজের প্রতি খেয়াল রাখুন।

বন্ড খেজুরে কথা বলে— এক মিনিট আগে আছে ওর।

— মিঃ বন্ড, হিসেবটা তুমি এখনও সঠিক শেখ নি। হ্যাঁ, আর দশ মিনিটের মধ্যে আমিই হব এই দুনিয়ার এক নম্বর ধনী।

বন্ড শুধু বলে— দশ মিনিট বাদে আমি কিছু বলব।

গোল্ডফিস্কার বলেন— দশ মিনিট বাদেই বোল। — বলে তিনি এক নিষ্ঠুর হাসি হেসে বোমারু বাহিনীকে এগোতে নির্দেশ দিলেন। তারপর বলেন — মি বন্ড, তুমি আর তোমার ওই সঙ্গীরা আমার সাথে যেরকম সহযোগিতা করেছ, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

বন্ড বলে— দশ মিনিট বাদে।

দু'জনেই হেসে ওঠে। গোল্ডফিস্কার বলেন — সত্যি তুমি রসিক।

বন্ড এবার দেখল কালো হাউইয়ের মতো কী যেন একটা উড়ে গেল। তারপর তীব্র আওয়াজ। আক্রমণের সামরিক সংকেতের আওয়াজ।

উঠে দাঁড়িয়েছে 'মৃত' সৈনিকদের দল। কোষাগারের সামনে সাঁজোয়া গাড়ি থেকে সুদীর্ঘ নল ঘুরে দাঁড়াল। লাউডস্পিকারে শোনা গেল ঘোষণা— 'যে যেখানে আছ সেভাবেই থাক। হাত থেকে চটপট আর্মস ফেলে দাও। নইলে আমরা গুলি চালাতে বাধ্য হব।'

মুহূর্তের মধ্যে বন্ড টিলির কোমর জড়িয়ে ইঞ্জিনের মাথা থেকে দশ ফুট নীচে লাফ দেয়। দৌড়োতে গিয়ে গোল্ডফিস্কারের গুলি বন্ডের বাঁদিকে এসে মাটিতে বিদ্ধ হতে থাকল। পেছনে শোনা গেল পায়ের শব্দ। অড জব মনে হচ্ছে।

টিলি বন্ডের হাত ছাড়াতে গিয়ে বলল— ছাড়ো আমাকে। পুসি আমাকে দেখবে বলেছে।

চাপা চিৎকার করে বন্ড টিলিকে বোঝাবার চেষ্টা করে। বন্ডের হাত ছাড়িয়ে সে ট্রেনের একটা কামবাব দিকে ছুটে গেল। বন্ড ছোবা বার করে অড জবের মুখোমুখি।

অড জব ভেবেছিল টিলি অন্যদিকে পালাচ্ছে। অড জবের হাঁড়া ধাতব টুপি টিলিকে একেবারে শেষ করে দিল। এবার ধরল সে বন্ডকে। ছুঁবি দিয়ে অড জবকে আঘাত করল সে। কিন্তু শরীরে ঠিকমতো লাগল না। বন্ড অড জবের রদ্দা থেকে নিজেকে বাঁচাল এক লাফ দিয়ে। অড জবের মাথায় এখন খুন চেপে গেছে।

স্টেশনের বাইরে গোলাগুলির শব্দ। ক্ষণিকের অন্যান্যনক্কতায় অড জব আঘাত হানল। কিন্তু বন্ডের ক্ষিপ্ততার জন্য ততটা মারাত্মক হল না ওন কাছে অন্তত। ঘোলাটে চোখে বন্ড দেখল, প্ল্যাটফর্মের দিকে অড জব দৌড়ে পালাচ্ছে। চলন্ত ডিজলে লাফ দিয়ে সে একটা কেবিনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

— 'স্যান্টিয়াগো'। — একটা চিৎকার শুনে বন্ড জেগে উঠল। যে শব্দটা তাকে শুনিয়েছিল ফেলিক্স লিটার। আরে এ তো লিটারই। যুদ্ধের পোশাকে। লিটারের কাটা ডান হাতে ইস্পাতের হুকের সাথে লাগানো বাজুকা (ছোটো কামান জাতীয় অস্ত্র) বন্ড দ্রুত কেড়ে নিয়ে বলে — প্লিজ লিটার, আমার শিকার আমায় মারতে দাও। সবাইকে সাবধান করে দিল বন্ড— সরে যাও, সরে যাও সবাই। — তারপর বাজুকা চালাল। কান ফাটিয়ে চলে গেল দশ পাউন্ড ওজনের আর্মার পিয়াসিং রকেট। পলায়মান ট্রেনটার পিছনদিকের কিছুটা উড়ে গেল, বাকিটা ব্রিজ পেরিয়ে চলে গেল।

— ওফ বন্ড, একসিলেন্ট মেরেছ।

বন্ড ক্ষিপ্ত স্বরে বলে— ট্রেনের লাইনটা বুদ্ধি করে আটকাতে পারো নি ?

লিটার এগিয়ে এসে বলে— এই ব্যাপারে সবকিছু নিখুঁতভাবে পরিচালনা করছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট স্বয়ং। আমাদের মাথার ওপর প্লেন চক্কর মারছে। তারাই সব খবরাখবর দেবে। আমার আর এই সৈন্যদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তোমাকে দেখবার।

বন্দ এই আমেরিকানটার দিকে তাকিয়ে বলে— লিটার অসংখ্য ধন্যবাদ। সত্যি, তুমি, আমায় কত ভালোবাস।

এরপর বন্দ টিলির মৃতদেহের কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে। তারপর বলে – হতভাগিনী, পুরুষদের বিশ্বাস করতে পারল না। পুরুষদের প্রতি ওর এই অবিশ্বাসই ওর মৃত্যু ডেকে আনল।

লিটার কী বুঝল সে ও-ই জানে। তারপর একজনের দিকে তাকিয়ে বলে — ও'ব্রায়েন্, কম্যান্ড পোস্টে খবর পাঠাও। বল, বন্দকে পাওয়া গেছে, আমরা একটু বাদেই রওনা হচ্ছি।

আবার শোনা গেল সাইরেন। যুদ্ধবিরতির বাঁশি।

॥ বাইশ ॥

লিটার তার ডানহাতের হুকটা দিয়ে তার স্টুডিল্যাক গাড়িটা নিয়ে এল সেকেন্ড গিয়ারে। তারপর একটা রেফ্রিজারেটর ট্রাক ও ওল্ডসমোবাইল গাড়ির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিল এয়ারপোর্টের দিকে। যদিও প্লেন ছাড়তে অনেক দেরি আছে। বন্দ চোখ বুজে বসে রইল।

আচমকা গতিবেগের বাঁকুনিটা বন্দ সামলে নিয়ে বলে— এই গতিবেগ হলে পুলিশের আদর থেকে পিঙ্কারটন গোয়েন্দা এজেন্সিও বাঁচাতে পারবে না। শুনেছি গোল্ডফিসারের গাড়ি নাকি নিলামে উঠবে? .. ভালো কথা, গোল্ডফিসার কি এখনও জেলে ঢোকে নি?

লিটার থম মেরে যায়। তারপর বলে— M যে কী করছে কে জানে। কাগজেও খুব লেখালেখি হচ্ছে। তবে একটা কথা বলি, এখন পর্যন্ত কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি।

— সেকী! তার মানে?

— মানে, যে ডিজেল গাড়ি করে ওরা পালাচ্ছিল, সেটার স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে মাঝপথে ওরা কোথাও নেমে পালিয়ে যায়। ট্রাকে একটা লোক পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। নরফোক সেই রাশিয়ান জাহাজ জানিয়েছে কোনো অচেনা লোককে না নিয়েই তারা জাহাজ ছেড়েছে। নদীর ধারে সেই গুদামঘর, নিউইয়র্কের এয়ারপোর্ট বা কানাডার সীমান্তেও ওদের দেখা যায় নি।

— আশ্চর্য! — বন্দ বলে।

লিটার একটা বাঁক ঘুরে বলে— সে কথা আর বলতে। মনে হচ্ছে, ওই মিডনাইট শয়তানটা ওদের কিউবা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তবে দিনেব বেলা গা ঢাকা দিয়ে থেকে বাতে অভিযান সম্ভব নয় কিউবার দিকে। যদিও আমাদের প্লেন চক্কর মেরে যাচ্ছে। সকলেই উদ্ভিগ্ন, প্রেসিডেন্ট বেপে লাল।

গত দিন দুটো বন্ডের বিভিন্ন মহলে অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে কেটেছে। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আধঘন্টা কাটাতে হয়েছে রুক্ষ মেজাজে। সাংবাদিকরাও বাদ যায়নি। ফোনে M -এর সঙ্গেও কথা হয়েছে।

বন্ডের ধারণা ঠিক মিলে গিয়েছিল। ইউনিভার্সাল-এ গোল্ডফিসারের টেলিগ্রামটাই বন্ডকে পেতে প্রথম সূত্র হয়েছিল ইউনিভার্সালের কাছে। রেকুলভার ও কপেটের কারখানা তল্লাসি করে সোনা স্মাগলিং-এর যথেষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু গোল্ড স্মাগলার গোল্ডফিসার কিন্তু এখনও বেপাগ্ন। এমনকি ব্যাংক অব ইংল্যান্ড জানিয়েছে অভিযানের আগের দিনই গোল্ডফিসার মহাশয় তার দু কোটি ডলারের সব সোনাটাই নিউইয়র্কের প্যারাগন সেফ ডিপোজিট কোম্পানিতে রাখান

থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে জমা করেছে। আমেরিকায় এ ব্যাপারটি নিয়ে তদন্ত করছে ওখানকার অর্থদপ্তর এবং পুলিশ। বন্ড যেন দেশে ফিরে এ ব্যাপারটায় M-কে বিশেষ সাহায্য করে।

M বন্ডকে আরও জানিয়েছিল, তাকে বীরত্বের পদক দিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল। গুপ্তচর বিভাগের নিয়ম মেনে বন্ড পদক গ্রহণ না করে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। কেননা, গুপ্তচর বিভাগের লোকদের এই ধরনের পদক নেওয়ার কোনো নিয়ম নেই।

এই মুহূর্তে বন্ডের মেজাজ ঠিক নেই। যদিও যে ‘অপারেশন গ্র্যান্ড স্ল্যাম’ পরিকল্পনা ভেঙে দিয়েছে, কিন্তু গোল্ডফিসার এবং তার প্রাণভোমরা সোনা সে আটক করতে পারে নি। ওই প্লেনের ঝাড়াব পিঙ্কারটনে যদি আধঘন্টা বাদে এসে পৌঁছোত, তাহলে লিটারকে সে পেত না।

কংগজটা পড়ামাত্রই বিভিন্ন দপ্তর হয়ে খবরটা সি আই এ-র মারফত M-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জরুরি বৈঠক ডেকে পুরো ঘটনাটির ভার প্রেসিডেন্টের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এমনকি গোল্ডফিসারের টেলিগ্রামের মেসেজকে কেন্দ্র করে মক্কা! এয়ারলাইনসের প্লেন সম্বন্ধে ভারত সরকারকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়। এবং ভারত সরকারও ঘটনাটির গুরুত্ব বুঝে এ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

তারপর ‘অপারেশন গ্র্যান্ড স্ল্যাম’-কে বানচাল করতে একে একে অনেককেই অভিনয় করতে হয়েছিল। সৈনিক থেকে সেই বাচ্চা এবং তার-মাকে পর্যন্ত। টোকিওর ওই দুই সুপারিস্টেভেন্ট এবং ডেপুটি সুপারিস্টেভেন্টকে গ্রেফতার করে শারীরিক বল প্রয়োগ করে সব জেনে নিয়ে ওদের সই করা টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল গোল্ড ফিসারকে। সামরিক বাহিনী শুধু ট্রেন এবং ট্রাকগুলোর ঢোকার রাস্তা খোলা রেখেছিল, যাতে কোনোরকম সন্দেহ না হয়।

আমেরিকানরা তাদের ফোর্ড নক্স বাঁচিয়েছে। আর এর বাইরে তারা যেতে বোধহয় রাজি নয়।

এয়ারপোর্টে গাড়ি থেকে নেমে বন্ড লিটারকে বলে — ধন্যবাদ লিটার।

লিটার বন্ডকে বলে, কাজ শেষ হবে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে। বন্ডকে একবার ও তার আদি বাড়িটা দেখিয়ে আনতে চায়।

লিটার চলে গেলে বন্ড বি ও এ. ১-র কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল।

বন্ড ঘড়ি দেখল। এখনো আধঘন্টা দেরি প্লেন ছাড়তে। সে রেস্টোরাঁয় বসে ড্রিংক করল। তার আগে সে একটা কাউন্টার থেকে দামি এবং লেটেস্ট ডট পেন কিনল। সিগারেটের দ্বিতীয় খোঁয়াটা সবেমাত্র ছেড়েছে, এমন সময় বি ও এ সি র ঘোষক নাম ডাকতে শুরু করল। বন্ডের নাম ঘোষণা করে বলা হয়, দয়া করে তিনি যেন কাউন্টারে এসে দেখা করেন।

বন্ড ভাবে, নিশ্চয়ই ব্যাটারা ট্যান্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দেখতে চাইবে।

কাউন্টারে যেতেই এক অফিসার বেশ নরম সুরে বললেন:- - আপনিই মি. জেমস বন্ড ?

— ইয়েস।

- দয়া করে আপনার হেলথ সার্টিফিকেটটা একবার দেখাবেন স্যার।

-- কেন ? কী ব্যাপার বলুন তো ?

- আমরা নিরুপায় মি বন্ড। সোজা পথে মনাক ফ্লাইট, নং- ৫১০ খারাপ আবহাওয়ার জন্য যেতে পারছে না। তাই আমাদের যেতে হচ্ছে গ্যান্ডার হয়ে। ওদিকে গ্যান্ডার শহরে টাইফয়েডের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। তাই আমাদের কাছে অর্ডার এসেছে, যারা ওই শহরে যাবেন, তাদের প্রত্যেককে বোগ প্রতিরোধক ইনজেকশন নিতে হবে।

বন্দ অবাধ হয়। বলে— গত বিশ বছর ধরে আমি নিয়মিত নিয়ে আসছি এই রোগ প্রতিরোধক ইনজেকশন। না নিলেও আমার কোনো ক্ষতি হবে না। তা অন্য যাত্রীদের বক্তব্য কী?

— তারা সবাই ইনজেকশনের জন্যই গেছে। আপনি এদিকটায় আসুন মি. বন্দ।

বন্দকে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হলে মাস্ক পরা এক ডাক্তার বললেন— এই শেষ, নাকি আরও আছে?

অফিসারটি বলে— আরও কয়েকজন আছেন।

ডাক্তার বন্দকে কোট খুলে হাতা গুটোতে বলেন। স্পিরিটের গন্ধ নাকে ভেসে এল। বন্দ বলে— টাইফয়েড নিয়ে এত ভয়ের কী আছে? এ তো দেখছি একরকম বাড়াবাড়ি।
বন্দের হাতে ছুঁচ ফেঁটে।

দৃশ্য : প্লেনের ভিতর। বি ও এ সি-র প্লেন।

চরিত্র : মি. জেমস বন্দ। চেয়ারে বসে আছে। ঠিক বসে বলা যাবে না। হাত বাঁধা অবস্থায় প্লেনের মধ্যে একটা চেয়ারে সে অঙ্গান হয়ে আছে।

একসময় বন্দের জ্ঞান ফেরে।

বন্দের অক্ষিলেঙ্গ এখন ফেড আউট। ধীরে ধীরে লেঙ্গ ফেড ইন হলে বন্দ দেখে প্লেনের ভেতরের সব আলো জ্বলছে। ঘাড় প্যান করে দেখে, সব সিট খালি, উঠতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার হাত বাঁধা পায়। মাথা টিপ্ট ডাউন করে দেখে, চেয়ারের হাতলের সঙ্গে তার হাত বাঁধা। স্পেশাল মেক-আপ— বন্দের সারা মুখে ঘাম। স্বভাবতই সে কমাল বার করতে পারে না। বন্দ বিস্মিত।

ফ্ল্যাশ— কয়েক হাত দূরে বি ও এ সি-র পোশাকে অড জব বসে আছে। দ্বিতীয় চরিত্র প্লেনের মধ্যে প্রকাশ পায়।

অড জব ঘণ্টা বাজায়। কিছু সময় কেটে যায়। অড জব তার চোখের দৃষ্টি নিবন্ধ রেখেছে বন্দের ওপর।

একী! কী আশ্চর্য ব্যাপার! বি ও এ সি-র ড্রেসে গোল্ডফিঙ্গার স্বয়ং উপস্থিত। এর মানে কী? খানিক চিন্তা করে বন্দ বুঝল যে, এই ক্লাইম্যাক্স পর্বটিও এই ভিলেনের সৃষ্টি।

গোল্ডফিঙ্গার কথা বলতে শুরু করলেন— বিধির বিধানে আমরা আবার দু'জনে একসাথে। ইস, তোমার কী কপাল বল তো?

গোল্ডফিঙ্গারের কথায় বন্দের শরীর জ্বলে ওঠে।

গোল্ডফিঙ্গার বলেন— তুমি আর ওই মেয়েটি আমার হয়ে এত কাজ করলে। অড জবের কড়া প্রহরা এড়িয়ে তুমি বাইরে কী করে সব খবর পাচার করলে, বলবে আমাকে? এই টেকনিকটা আমারও মনে হয় শেখার আছে। তোমাকে আমার আন্তরিক সম্মান জানাই।

আবার কথার জাদু। বন্দ বলে— বলব। আগে আমার জন্য বুরবোঁ, খাবার, চেস্টারফিল্ড সিগারেট আনতে বল, হাতের বাঁধন খোল তারপর—

— বেশ। অড জব। বাঁধন খুলে দাও।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সবকিছু এসে গেল। গ্লাস তুলে চুমুক দিতে গিয়ে বন্দ দেখে গ্লাসের তলায় কাগজ মারা। তাতে লেখা আছে— ‘আমি তোমার সঙ্গেই আছি। চিন্তা কোর না। — প’।

বন্দ ঘুরে কায়দা করে বসল।

গোল্ডফিঙ্গার পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসে বলে— একটা ট্রাকে আমার সোনা ও অন্য দুটো ট্রাক নিয়ে হ্যাটেরাস অন্তরীপের দিকে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। এর মধ্যে ট্রাকের

ড্রাইভার ও মিস গ্যালোরিকে বেখে আমার সঙ্গে থাকা দস্যু সর্দাবদের কটাকে টাকা দিয়ে বিদেয় করে দিলাম আর বাকিদের পিছনে একটা করে বুলেট খরচা করেছি।

বন্দ ভাবে সব শুনে আবার তাকে কাটবার ছক করতে হবে।

গোল্ডফিস্কার বলেন— এরপর আমরা প্লেন ভাড়া করে চলে এলাম নেওয়ার্ক। তারপর সেখান থেকে নিউইয়র্কে এসে একটি গোপন জায়গা থেকে আমার সংস্থা SMERSH-কে ব্যর্থতার কথা জানালাম। এমনকি তোমাব কথাও। তুমি তো SMERSH-এর ব্যাপার সবই জান।

— তারপর?

— তারপর SMERSH তোমার নাম শুনেই তোমার পরিচয় সব আমাকে বলে দিল। আমি তোমার বন্ধু সেজে তুমি কোনো প্লেনের টিকিট কেটেছ, তার খবর নিলাম। গত মহাযুদ্ধে জার্মান বিমান বাহিনীর তিনজন আমার প্লেন চালাবার দায়িত্ব নিল। আর আমার বুদ্ধির খেলা তো তুমি দেখেছই। ছদ্মবেশ, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ ও ছক কষে আমরা হলাম বি ও এ সি-র নতুন কর্মী। যাদের সাথে তুমি এখন প্লেনে।

একটু থেমে গোল্ডফিস্কার বলেন— শুনেছি, এই প্লেনেব জন্য ব্যাপক তল্লাশি শুরু হয়ে গেছে। তবে আমি সেটা চিন্তা করছি না। কারণ, প্রচুর তেল রয়েছে এই প্লেনে। আর এত দামি এয়ারক্র্যাফটকে কেউ চট করে গুলি করবে না। কোনোকিছু ঝামেলা বাধবার আগেই আমি নির্বিঘ্নে ল্যান্ড করব আমার নিজস্ব ডেরায়। তারপর ভ্যানিশ।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বন্দ ভাবে, পৃথিবীর অনেকের কাছে গোল্ডফিস্কারের নিত্যানতুন অপরাধ- পরিকল্পনা সত্যিই বিস্ময়কর। যা বন্ডের কাছে এখন চমকহীন। আর এই অপরাধ-শিল্প সৃষ্টিতে গোল্ডফিস্কার সত্যিই স্কালচারিস্ট সেলিনি বা বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের থেকেও কিছু কম যায় না।

গোল্ডফিস্কার বলেন— নাউ মি. বন্দ, সময় নষ্ট করা আমি পছন্দ করি না। এবার তুমি তোমার গল্প শুরু করো।

বন্দ বুরবোঁ-র গ্লাসটা শেষ করে একে একে সব ঘটনা তাকে বলে যায়। তবে চেপে গেল ‘হোমার’-এর ঘটনাটা। বন্দ বলে— তো মি. অরিক গোল্ডফিস্কার, তুমি সে যাত্রা বেঁচে গেলে মিস টিলি মাস্টারটনের জন্য। তাকে যদি আমি গুলি করা থেকে বিরত না করতাম। শোনো, ইংরেজদের যেমন-তেমন মনে করো না। আমবা কাজটা কিছুটা ধীরে করি ঠিকই, তবে কাজ শেষ করতে কোনোরকম ত্রুটি হয় না।

গোল্ডফিস্কার চেয়ে থাকেন বন্ডের দিকে। তিনি ভাবেন — সত্যিই, মনে দুর্জয় সাহস ধরে এই ইংরেজটা।

॥ তেইশ ॥

চাঁদের আলোয় গা ধুতে ধুতে প্লেনটা উড়ে চলেছে। পুসি খাবার নিয়ে এসেছিল। ন্যাপকিনের মধ্যে পেনসিল রেখে অড জবের সামনে মেজাজ দেখিয়ে চলে গেছে।

বন্দ কিছু একটা করতে চলেছে।

অনেক চেষ্টা কায়দার পর বন্দ অড জবকে তার লুকোন ছুরি দিয়ে আঘাত করতে যেতেই জানলার পাশে বসা অড জব সরে যায় এবং জানলার কাচ ভেঙে গেলে অড জব সেই ভাঙা জানলা দিয়ে কেঁচোর মতো বেরিয়ে একেবারে কয়েক হাজার ফিট নীচে।

দ্য মান উইথ দ্য গোল্ডেন গান

॥ এক ॥

—গুড মর্নিং। ডিফেন্স মিনিস্ট্রি কে বলছেন?

এক সুললিত কণ্ঠ। এ প্রাস্ত থেকে উত্তর গেল—মি জেমস বন্ড বলছি। M এর সঙ্গে কথা বলতে চাই। বা উর্নি যদি বলে দেন যে, করে আমি

মেয়েটি বিসেপশনে তার সঙ্গিনীকে বলে—পাগল-টাগল নাকি? বলছে M-এর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সঙ্গিনী বলে—এক কাজ করো। লিয়াজেঁ সেকশনে লাইনটা দিয়ে দে। ভদ্রলোক ওখানেই কথা বলে নিক।

—হ্যালো—বন্ড বলে।

—জাস্ট হোল্ড অন দ্য লাইন। - মেয়েটি বলে, মেয়েটির নাম প্যাট। প্যাট লিয়াজেঁ সেকশনে লাইন দিয়ে তার বান্ধবীকে বলে—কে যে কার সাথে কথা বলতে চায় বোঝা মুশকিল। ডিপার্টমেন্টটাই ভীষণ জটিল।

সতাই জটিল। জটিল এই প্রতিবন্ধ্য দপ্তর সংক্রান্ত বিবিধ কাজকর্ম। আবার জটিল প্রতিবন্ধ্য দপ্তরের সাথে জড়িত সিক্রেট সার্ভিস্ সংক্রান্ত নানা মুভমেন্ট। যার প্রতি মুহূর্তে আছে বিপদের ঝুঁকি। তাই এই সিক্রেট সার্ভিসের বহু বিষয়ই মুখে কলুপ এঁটে থাকতে হয়। বজায় রাখতে হয় চরম গোপনীয়তা। সব ঘটনা একমাত্র বিশদভাবে অবগত থাকেন এই সিক্রেট সার্ভিস বিভাগের বড়োকর্তা খোদ 'M' সাহেব। M-এর পর জানেন তার চিফ-অব-স্টাফ। কোনো কারণে যদি এই দু'জনের মৃত্যু হয় তাহলে সব গোপন তথ্য পাওয়া যাবে এক গোপন দলিলের মধ্যে, যার নাম হল—'ওয়ারবুক'। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু খবর দিয়ে রাখতে হয় বিভিন্ন সেকশনে তার আঞ্চলিকে। তাও আবার সব কর্মচারী এইসব গোপন খবর জানবেন না। যারা জানবেন, সেটাও আবার এক বিশেষ সংকেত-এর মাধ্যমে।

যাই হোক, বন্ড এখন ফোনটা ধরে আছে। বন্ড বুঝেই নিয়েছে, তার পরিচয় প্রকাশ হতে কিছুক্ষণ সময় লাগবে। ঘাড়ে রিসিভারটা চেপে রেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় বসে বন্ড। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে বন্ড।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত আবার কথা বলে—হ্যালো, কা স্টেন ওয়াকার বলছি। বলুন, কী চাইছেন।

বিছানায় শুয়ে পড়ে বন্ড বলে—দিস ইস কম্যান্ডার জেমস বন্ড। কোড নম্বর 007। আমি 'M' অথবা তার সেক্রেটারি মিস মানিপেনির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—একটু অপেক্ষা করতে হবে।

—ও কে। আমি ধরে আছি।

সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রাক্তন এই সতর্ক কর্মীটি দুটো প্রাগ ইন করলেন। একটা নিজস্ব দপ্তরের টেপরেকর্ডারের জন্য অন্যটা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের স্পেশাল ব্রাঞ্চার একজন ডিপার্টমেন্টে ডিউটি অফিসারের জন্য।

ক্যাপ্টেন ওয়াকার বলেন—মি. বন্ড আপনি বোধহয় রং নাশ্বারে ডায়াল করেছেন। মি. 'M' বলে তো মিনিষ্ট্রিতে তো কেউ নেই।

বন্ডের মনে পড়ে কর্নেল বরিস তার জাল ব্রিটিশ পাসপোর্ট এ খুব ছোট্ট করে লিখিয়ে দিয়েছিলেন—ফ্রাঙ্ক ওয়েস্টমাকট, কোম্পানি ডিরেক্টর। এবং হাঙ্কা করে এই নামটা বন্ড বলে।

মি. ওয়াকার বলেন—ঠিক আছে। ধরুন। অন্য লাইন বাজছে।—বলে তিনি বন্ডকে একটা রিং শুনিয়ে লাইনে অন্য কারোকে বন্ডের ব্যাপারটা বলেন।

অন্য একজন হলেন সিক্রেট সার্ভিসের চিফ সিকিউরিটি অফিসার। তিনি বলেন—কে বন্ড, ওয়েস্টমাকট! আপনি কথা বলুন আর একবার।

—হ্যালো বলুন।

বন্ড গলার স্বর নীচু করে বলে—আপনাদের মিনিষ্ট্রিতে বিভাগীয় প্রধান অ্যাডমিরাল স্যার মাইলস মেশর্ভি, ন'তলায় বারো নম্বর ঘর ছিল আগে। সেক্রেটারি মিস মানিপেনি। লাল চুল, সুন্দরী। আপনাদের ক্যান্টিনে আজ রান্না হয়েছে

—ধরুন ধরুন। আবার ফোন বাজছে। ...ইয়েস, বলুন।

—হ্যাঁ, এইমাত্র যা সব বলল, ন'তলা, তারপর আজকে ক্যান্টিনের মেনু...কীরকম। যেন সব...অথচ, জেমস বন্ডের মৃত্যুটা এখনও ধোঁয়াটে। জাপানের ওই দ্বীপটার লোকগুলো সব মুখ বন্ধ করে আছে। ঠিক আছে, ঘটনার বিবরণ যেন আমি পেয়ে যাই।

ওয়াকার বলেন—ও. কে. স্যার।—ফোনটা রেখে তিনি বন্ডের সাথে আবার কথা বলতে থাকেন—সরি স্যার। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, আপনি বরং মেজর টাউনসেন্ডের সাথে ফোনে KENSINGTON 5555-এ বা 44, Kensington Kloyterse-এ গিয়ে যোগাযোগ করে আপনার বিষয়টা নিয়ে কথা বলে নিতে পারেন। আর যদি চান তো, দশ মিনিট বাদে আপনি আমাকে ফোন করে নিতে পারেন। আমি মেজর টাউনসেন্ডের সাথে কথা বলে—

—ও. কে., অসংখ্য ধন্যবাদ।—বন্ড ফোনটা নামিয়ে রাখে।

বন্ড এবার ভেবে নিল, তাকে কী করতে হবে। সিক্রেট সার্ভিসের না জানা লোকদের নিয়ে এই এক ঝামেলা।

বন্ড এখন রিজ হোটেলে থেকে এক ধনী এবং অভিজাত ব্যক্তির ভূমিকায় রয়েছে। এটা কর্নেল বরিসের ইনস্ট্রাকশন, কে জি বি-র খাতায় বন্ডের পরিচয় এটাই।

আর্লিংটন স্ট্রিটের গেটটা যে দিকে, বন্ড সেই দিক দিয়েই লিফটে করে নীচে নেমে এসে দাঁড়াল গেটের মুখটায়।

ক্লিক! খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিনের স্টলের কর্নার থেকে বন্ডের একটা প্রোফাইল ছবি উঠে গেল।

দারোয়ানকে ট্যান্ড্রি ডাকতে বলল। এই অবসরে আরো কয়েকটা স্টিল শর্ট নিয়ে নেওয়া হল বন্ডের। এবং এটা উঠল টেলি-লেস লাগানো এক দামি ক্যামেরায়।

বন্ডের ট্যান্ড্রিকে ফলো করা ট্যান্ড্রির যাত্রী স্পেশাল অ্যাকশন রুমে মেসেজ পাঠাতে শুরু করল।

একসময়ে এক রমরমে সর্মিতির প্রায় নাম উঠে যাওয়া নেমপ্রেট লাগানো বিবর্ণ হয়ে আসা লাল ইটের তৈরি বাড়িটার সামনে এসে বন্ড থামল। যার ঠিকানা—44, Kensington Kloyterse। মাটির নীচে অনেক গুপ্তঘর সমেত বাড়িটার মালিক এখন আজকের সিক্রেট সার্ভিস। এর পিছনে আছে বেরোবার পথ।

বন্দ নেমে বাড়িতে ঢোকান সাথে সাথেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে গাড়ির মধ্যেই ফিলম ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়ে গেল।

বাড়ির মধ্যে দশাসই গার্ড। তার চোখের দৃষ্টি স্থির কিন্তু কঠিন।

— মেজর টাউনসেন্ডের সাথে আমি দেখা করতে এসেছি।

গার্ড বলে — রেইন কোর্টটা খুলতে হবে।

বন্দ জানে, এটা চলে যাবে দোতলার পরীক্ষাগারে। রেইন কোর্টটা সে খুলে দেয়।

বন্দ সোজা গার্ডের পিছন পিছন চলে একটা লম্বা সরু বারান্দা দিয়ে। কোথায় যান্ত্রিক চোখ সেট করা আছে, তা বন্দ চলার পথেই ধরে নেয়। বারান্দার শেষে মুখোমুখি দুটো দরজাতে A এবং B লেখা। সে ঢুকল B রুমে।

ঘরে ঢুকেই বন্দ তার পেয়ার লেঙ্গটাকে প্যান করে দেখে নিল। ছাই রঙের কাপেট, দেওয়ালে যুদ্ধের ছবি। এছাড়া ম্যান্টেলপিসের ওপর কয়েকটা রূপোর ট্রফি আর এক সুন্দরী মহিলা ও তিনটে বাচ্চার ছবি। ফুলদানিতে বাহারি ফুল।

বন্দ এবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ঘরে একটা নীচু লেবেলে আগুন জ্বলছে। তার পাশে দুটো চেয়ার, যার মাঝখানে ফাইল ক্যাবিনেট বসানো আছে।

প্রশান্তিতে ভরা বন্ডের চোখ আটকে যায় ওই ঘরেই আর একটি চেয়ারে বসা একটি হাসিখুশি মেজাজের একটি লোককে দেখে। সেই লোকটি খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে অমায়িকভাবে বন্ডের দিকে এগিয়ে এলেন।

বন্দ কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, টেলিফোনে নির্দেশ পাওয়া ইনিই সেই ‘নরম মনের’ মানুষটি। কর্তৃপক্ষ বোধহয় সব শুনে কঠিন মন’এর মানুষটিকে চট করে বন্ডের সামনে হাজির করাতে চান নি।

মেজর টাউনসেন্ডের ভালোই স্বরণে আছে, বন্ডের কোন ব্র্যান্ডটা প্রিয়। তিন রিংযুক্ত মরল্যান্ড স্পেশাল, তা সত্ত্বেও উনি সিগারেট খেতে খেতে বন্ডকে বললেন, তিনি দুঃখিত। বন্ডের প্রিয় ব্র্যান্ডটা তিনি দিতে পারছেন না। বন্দ ঠিক এর মানেটা বুঝতে পারল না।

মেজর টাউনসেন্ড বলেন—বলুন, আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি?

বন্দ এটুকু বুঝে নিল, A-রুমে ঢুকলে তার এরকম সমাদর জুটত না। ওই A-রুমে যিনি আছেন, তিনি এক পুলিশ সুপার। প্রচণ্ড বদ-মেজাজী লোক। হয়ত উলটোপালটা প্রশ্ন করে বন্ডকে কয়েদও করে দিতে পারত।

সিক্রেট সার্ভিসের বাইরের লোক এবং তাদের ভিতরের কাজের মধ্যে অনেক ফারাক থেকে থাকে। বাইরের লোক যদি তাদের কাছে অচেনা হয় তাহলে এই সার্ভিস তাদের কথাবার্তা বুঝে A বা B-রুমে পাঠাবে। চিঠিপত্র বা কোনো পার্সেল এলে সেগুলোর প্রতিও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা সবকিছুই সার্ভিসকে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে দেখতে হয়।

যে সর্বদা বাইরের কাজকর্ম নিয়ে আছে, তার পক্ষে ভিতরের অতি সূক্ষ্ম এবং গোপন বিষয় জানা সম্ভব নয়। শক্তিশালী দেশগুলি প্রত্যেকেই অন্য দেশের গোপন খবর জানবার জন্য যা কিছু সম্ভব, সেই চেষ্টা করে যায়। কর্নেল বরিস তাকে বলেই দিয়েছিল, বন্ডকে পুরোনো কর্তার সাথে দেখা করতে হলে, তাকে আবার পরীক্ষা দিতে হবে প্রশ্রমের জন্য। কর্নেল বরিসের বর্ণনামুযায়ী

মেজর টাউনসেন্ডের চেহারা এবং পোশাকের বর্ণনা প্রায় অনেকটাই মিলে যাচ্ছে। শুধু তার কঠিন চোখ এবং ঠোঁট ছাড়া।

বন্ড এবার বলে - মেজর, আমি আমার কাজ করতে এসেছি।

আমি কিন্তু আপনাকে সাহায্য করবার জন্যই বসে আছি।

ধন্যবাদ, তবে আমার কাজটা হল M কে রিপোর্ট করা।

মেজর সিগারেট টানতে টানতে পায়ের ওপর পা তুলে বলেন—তা আমি জানি। কিন্তু আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে, আপনি সত্যিই জীবিত। দেখুন, 'টাইমস'-এ আপনার মৃত্যু সংবাদ বেরিয়েছিল।

- মেরি গুডনাইট নামে আমার এক সেক্রেটারি ছাড়া হেড কোয়ার্টারের অনেকেই আমায় চিনতে ভুল কববে না।

মেজর বলেন— মেরি গুডনাইট তো ট্রান্সফার হয়েছেন। আপনি আমাকে হেড কোয়ার্টারের ডিটেলস এবং মেরি ফ্রাউডেনস্টাড সম্বন্ধে কী জানেন যদি দয়া করে—

বন্ড হেড কোয়ার্টারের যাবতীয় বর্ণনা এবং মেরি ফ্রাউডেনস্টাড যে আর বেঁচে নেই তাও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা দেয়। বন্ড বলে—ফ্রাউডেনস্টাড কে জি বি-র হয়ে ডাবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিল, সেকশন 100 র হয়ে সে কাজ করত।

—ফাইন।—মেজর এবার উল্লসিত হয়ে বলেন—এবার আমাকে শুধু এইটুকু জানতে হবে, আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন এবং এখন কোথা থেকে আসছেন?

বন্ড বলে—সরি। একমাত্র M ছাড়া কাউকে বলা সম্ভব নয়।

—ও কে., ও. কে.। আপনি বরং পেপারটা পড়ুন। আমি একটা ফোন স্ক্রল আসছি।— বলে মেজর বেরিয়ে গিয়ে রুম A-তে ঢুকে মি. রোবসনকে বলে—বন্ধু, একটা ফোন করতে এলাম। আরজেন্ট।

মি. রোবসন খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলে শুধু সম্মতি জানান।

মেজর ফোনে বলেন— মনে হচ্ছে, লোকটা 007-ই। ফটোর থেকে যদিও একটু রোগা। আমি খবরের কাগজ পড়তে দিয়ে এসেছি। ওতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে। হেড কোয়ার্টার, ফ্রাউডেনস্টাডের সব বাপার মিলে যাচ্ছে। পোশাক আগের মতোই। স্কোপের ছবি বলছে, কোর্টের ডান পকেটে পিস্তল আছে ঠিকই, তবে নল দেখা যাচ্ছে না। কেমন যেন দুর্বল মনে হচ্ছে ওকে। বলছে M ছাড়া কাউকে সে কিছুই বলবে না।...হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। আমি মি. রোবসনের এক্সটেনশনে আছি।

মেজর মি. রোবসনের ঘরে অপেক্ষা করতে থাকলেন। ঘরের মধ্যে নীরবতা।

দশ মিনিট বাদে ফোন বেজে উঠল, মেজর ফোন ধরলেন—হ্যালো।

নিজের ঘরে ঢুকে মেজর বলেন—আপনি লাকি। গাড়ি আসছে। আর M জানিয়েছেন, তিনি আধঘন্টা বাদে দেখা করবেন। চিফ অফ স্টাফ জানিয়েছেন, উনি আপনার সঙ্গে লাঞ্চ করতে চান।

বন্ডের মুখে মৃদু হাসি। কিন্তু সপ্রতিভ হয়ে সে বলে— দয়া করে ওকে জানিয়ে দেবেন যে, তখন আমার সময় হবে না।

মেজর কিছুটা অবাক হয়ে বন্ডের দিকে তাকিয়ে ভাবে, এ তো অদ্ভুত লোক। মেজাজ আছে যোলো আনা।

এখনকার দৃশ্যটা সিক্রেট সার্ভিসের বড়োকর্তা M-এর ঘর।

M তার ঘরে বসে আছেন। তার সামনের টেবিলের অপরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে চিফ অফ স্টাফ M কে বন্ডের ব্যাপারে কিছু বলতে যথেষ্ট মনোযোগী।

চিফ অফ স্টাফ—স্যার, বন্ড আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে না কেন? আমি বলছি, প্রথমেই আপনি ওর সঙ্গে দেখা করবেন না। তবে ও যে '007' তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। ও যদি চূপচাপ এদেশে ফিরে আসতে চায়, তাতে কোনো বাধা নেই। আবার দেখুন, রিজ হোটেল থেকে ওর জাল পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। ওর মধ্যে কে জি বি-র কিছু আন্দাজ করা যাচ্ছে। শেষ স্ট্যাম্প পড়েছে পশ্চিম জার্মানির। ও কেন স্টেশন W কিংবা B কে রিপোর্ট করল না। তারপর ফিরে নিজের ফ্লাটে পর্যন্ত যায় নি। এখানেই তো খটমট লাগছে।

M চেয়ারে হেলান দিয়ে দু হাতের পাঞ্জা এক করে একদৃষ্টে চিফ অফ স্টাফের কথা শুনে যেতে থাকেন।

চিফ অফ স্টাফ বলে যেতে থাকেন—ওকে এক স্কট লেডি নিজের খরচে তার কাছে রেখেছেন। বন্ড কেন এখন এত দামি দামী পোশাক পরছে? আমাকে ফোন করলেই আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে আসতাম। তারপর সব খবর আমাকে দিলেই পারত। তার বদলে ও যা করছে, তাতে সবার সন্দেহ বাড়ছে বই কমছে না। তাছাড়া--

M-কে দেখে মনে হল তিনি তার কথা শুনছেন না মন দিয়ে। চিফ অফ স্টাফ বাধা হলেন থামতে।

M এবার একটা লম্বা শ্বাস ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। বাইরের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকেন।

চিফ অফ স্টাফ M-এর মুড বুঝে বললেন—আমি বলি কী, ওর চিকিৎসার ব্যবস্থাটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আর আপনি এখন এখানে নেই। সিকিউরিটির বক্তব্য অনুযায়ী 007 একটু রোগা হয়েছে। সেইজন্য ওর ঠিকমতো চিকিৎসার প্রয়োজন। ওকে সুস্থ করে তোলবার দায়িত্ব তো আমাদেরই।

M এবার ঘুরে দাঁড়ান। পাইপটা নিভে গেছে। তাতে অগ্নিসংযোগ করে বলেন—তুমি যে ভাবছ, তার কারণ তো নিশ্চয়ই আছে। তুমি এটা নিশ্চয়ই জান যে, আমি বন্ডকে কাজের ক্রিটিক্যাল সময়ে পাঠাই এবং তাতে ও জীবন সংশয় ত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত ব্রোফেড-এর সাথে যে মারাত্মক অ্যাকশনে জড়িয়ে পড়বে, তা জানব কেমন করে? এখন আমাদের জানতে হবে যে, এই একবছর ও কোথায় এবং কীভাবে কাটল?

—সেইজন্যই তো স্যার আমি--

M হাত তুলে বলেন—ভাবনাটা আমারও কন নয়। 007 বেশ ঠ্যাটা প্রকৃতির লোক। যখন আমি ওকে পাঠিয়েছি, তখন ও আমার কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে রিপোর্ট করবে না। আর গিস্তলের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

ইন্টারকাম সিগন্যাল দিন। M বলেন—পাঠিয়ে দাও।

মিস মানিপেনির টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বিল ট্যানার বলে-- কী ব্যাপার? এ কে-বারে যে উধা-ও। -কথাগুলির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব। বন্ডের দুষ্টুমি হাসি ওদের চোখ এড়ায়।

মিস মানিপেনি বলে—007 এখন M-এর কাছে যাবে।

চিফ অফ স্টাফ বেরিয়ে আসেন—আরে বন্দ। আজকে লাঞ্চটা তোমার সাথে হলে বেশ জমত। ও. কে.। যাও, ঘরে যাও।

বন্দ কোটটাকে ঠিক করে নিয়ে দরজার হাতল ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকতেই M বলেন—ওয়েলকাম জেমস। তুমি ফিরে আসাতে আমি নিশ্চিত।

বন্দ তার অভ্যাসমতো যেভাবে বসে, সেভাবেই চেয়ার টেনে বসে।

M বলেন—বল এবার। তোমার শরীর—বন্দ তার বাঁ হাতটা তোলে শুধু।

বন্দ কিছু বলতে যেতেই হঠাৎই তার আচমকা কী যেন তার কণ্ঠ থামিয়ে দেয়। মনের মধ্যে স্মৃতিগুলি হাই-স্পিড রিলের মতো চলে যেতে থাকে। কেমন যেন এক অস্বস্তি অনুভব করে সে।

M বুঝতে পেরে বন্দকে মানসিকভাবে সুস্থ হতে সময় দেন।

বন্দ তার হাতের এক জায়গা দেখিয়ে বলতে শুরু করে—আমায় এই জায়গাটা গুলি লাগার পর, কেন জানি না, মাঝে মধ্যে অনেক কিছু ঠিক মনে রাখতে পারছিলাম না। আপনি আমাকে জাপানে পাঠিয়েছিলেন। ওখানেই ঘটনাটা ঘটে। ব্লাডিভস্টকে আমাকে পুলিশ জল থেকে উদ্ধার করে লোকাল কে জি বি-র দপ্তরে আমাকে তুলে দেয়। বন্দরে স্টেশনের কাছে ওদের ছাই রঙের বিরাট বাড়ি। আমার আঙুলের ছাপ নিয়ে মস্কোতে হই চই পড়ে যায়। প্লেনে করে মস্কো নিয়ে গিয়ে আমাকে কয়েক সপ্তাহ জেরা করল। ওরাই আমাকে কিছু সূত্র ধরিয়ে দিল। কিছুই মনে পড়ছিল না। তবে যেটুকু মনে পড়েছিল এবং যা বলেছিলাম, তা নেহাতই যৎসামান্য। তবে ওরা খুশি হয় নি।

—যেটুকুই বলেছিলে, তা তোমার ভালোমানুষী।—কিছুটা বিরক্তের সুরে বলেন M।

—ওরা আমাকে লেনিনগ্রাদের একটা প্রতিষ্ঠানে রেখে আমার যত্নের কোনো ক্রটি করে নি। নামকরা সব স্পেশালিস্ট দিয়ে আমার চিকিৎসা করিয়েছে। অনেকেই এসে আমার সাথে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রাচ্য ও পশ্চিমের নানা দেশের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য-এর কথা বলল। ওদের ক্ষতি করা সত্ত্বেও কিন্তু ওরা আমার সাথে যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করেছে।

বন্দ M-এর দিকে তাকিয়ে বেশ আবেগের সুরে বলে—স্যার, আপনি আমার কথাগুলি বুঝতে চেষ্টা করুন। আপনি সারাজীবন শুধু লড়াইয়ের কাজে আমাকে হাতিয়ার করে গেছেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নেই। সব পালটে গেছে।

ব্যঙ্গের সুরে M বলেন—তা তো বটেই, তা তো বটেই। আচ্ছা, ওরা কী তোমায় ভালোবেসে মিউনিখে হটার আর স্টাজকে হত্যার গল্পটা শুনিচ্ছে? বলেছে কি, আমাদের কোরিয়ান যুদ্ধবন্দিদের কীভাবে ব্রেন ওয়াশ করেছিল চিন? আচ্ছা, রাশিয়ানরা যদি বিশ্বশান্তির জন্য এতই পাগল, তবে কে জি বি কী করছে? ওদের ওই এক লক্ষ নারী-পুরুষ? তুমি তো বলেই খালাস, যুদ্ধ করাই শুধু আমার কাজ।

—হ্যাঁ স্যার, কিছু কিছু বলেছে আমাকে। আর এ-ও জানিয়েছে যে, আপনি সবকিছু বন্ধ করে দিলে, ওরাও অত্যন্ত খুশি মনে কে জি বি বন্ধ করে দেবে।

—আর সেইসাথে ওরা দুশো ডিভিশন, ইউবোট বাহিনী আর দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রও বন্ধ করে দেবে, এ কথাও তোমাকে বেশ মিষ্টি করেই বলেছে?

—ইউ আর রাইট স্যার।

--তা তোমার যখন ওদেরকে এত ভালো লেগেছে, তা অনেকের মতো তুমি থেকে গেলে না কেন ওদের সঙ্গে? তুমি ম্যাকলিনের পার্টনার হতে পারতে?

—অ্যাঞ্জে স্যার, ওদের মতে আপনি আর আপনার এজেন্টরা যে গোপন কায়দা শিখিয়েছিলেন, সেই কায়দা দিয়েই শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।—বলতে বলতে আপনমনেই ডান পকেটে হাত ঢুকে গেল বন্ডের।

যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে বুঝে নিয়ে M লোক দেখানো কায়দায় চেয়ারটা পিছনে ঠেলে নিয়ে চেয়ারের নীচের দিকে বোতামটা দেখতে লাগলেন।

M বলেন—তাই বুঝি? তা আমার কায়দার ওরা কী কী জানে?

বন্ড-এর মুখ এখন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। চোখ দুটো যেন জলে ভিজে যাবে। তার মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠল—‘পৃথিবীতে শাস্তি আনতে হলে প্রথমেই তোমার সামনে বসা এইরকম যুদ্ধবাজদের সরিয়ে ফেলতে হবে পৃথিবী থেকে।’—এবং তার আত্মা থেকে সেই বলে যাওয়া আত্মা বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ডও গলগল করে মন থেকে সব উগরে দিয়েই তার কোটের পকেট থেকে সেই যন্ত্রটা বের করবার আগেই M বোতাম টিপে দিয়েছেন।

একটা ধাতব দেওয়াল M-কে আড়াল করল। কিন্তু বন্ডের যন্ত্রটাও কথা বলে উঠল। কতগুলো টুকরো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। প্রাণে বেঁচে গেলেন M। ছুটে এলেন চিফ অফ স্টাফ, নিরাপত্তারক্ষী।

সিকিউরিটি এসে বন্ডের ওপর নিমেষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ততক্ষণে বন্ডের মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে। সিকিউরিটি চিফ সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে দেখে বলেন--সর্বনাশ! সায়ানাইড। কুইক, নিয়ে চল একে। মাটিতে পড়ে থাকা পিস্তলটা তিনি লাথি মেরে হাতের নাগালের বাইরে করে দিলেন।

ধাতব পর্দার ওপার থেকে M বেরিয়ে এলেন।

সিকিউরিটি চিফ M বেরোতেই তাকে বলেন—আপনি স্যার এখনি চিফ অফ স্টাফের ঘরে চলে যান। আমাদের লোক ঘর ক্লিয়ার করে দেবে। আর আমাদের সিগন্যাল পেলে তবেই স্যার আপনি ঘরে ঢুকবেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে M ঘর ছেড়ে চলে যান। বেরোবার আগে বন্ডের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে মানিপেনি ঘরে ঢুকে সব দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। বিস্ময়িত চোখে দেখতে থাকেন, বন্ডকে সিকিউরিটির লোকজন টানতে টানতে চিফ অফ স্টাফের ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

মিস মানিপেনিকে ঢুকতে দেখে M দাঁড়িয়ে যান। তারপর মিস মানিপেনির ভয়ানক মুখ দেখে বলেন—মিস মানিপেনি, আপনি কিন্তু কিছু দেখেন নি। আর বেরোবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দেবেন।

M-এর কথা যেন কানেই ঢোকে না মানিপেনির।

—কী হল? আপনি কী অসুস্থ বোধ করছেন মিস মানিপেনি?

ধমক খেয়ে চমকে ওঠেন মিস মানিপেনি। তিনি বলেন—হ্যাঁ স্যার, আমি এখনি যাচ্ছি।

চিফ অফ স্টাফের ঘরে বন্ডের সামনে ঝুঁকে তাকে পরীক্ষা করছেন সিকিউরিটি চিফ। M এই ঘরে ঢোকেন। M বলেন—আমার আগে যিনি ছিলেন, তিনি ওই চেয়ারেই পাগল অফিসারের গুলিতে। পাগলদের তো আবার গুলি করে মারলেও বিপদ। যাকগে, চিফ অফ স্টাফ তুমি শোনো,

আজকের এই ব্যাপারটা যেন এই অফিসের মধ্যেই থাকে। তুমি স্যার জেমস ম্যালোনিকে যোগাযোগ করে খুব গোপনে অ্যান্ডুলেঙ্গে করে বন্ডকে নিয়ে যাও। আমি বিকেলে ওনাকে যা বলবার বলে দেব। কে জি বি ওর মাথাটা একেবারে সুন্দর করে সাফ করে দিয়েছে। স্মৃতিভ্রংশ করে ছেড়ে দিয়েছে।

M চলে যেতে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ান। তারপর বলেন—হোটেল থেকে ওর সব জিনিসপত্র আনাবার ব্যবস্থা করো। বিল যা হয়েছে মিটিয়ে দাও। আর প্রেসকে জানিয়ে দাও যে, জেমস বন্ড বেঁচে আছেন। তিনি সুস্থ শরীরে এক বছর বাদে অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্য দিয়ে ফিরে এসেছেন। তবে তিনি এখন ডাক্তারের পরামর্শে পূর্ণ বিশ্রাম নিচ্ছেন। আর মি. বন্ডের কাছ থেকে যে মূল্যবান তথ্য আমরা পাব, এর ফলে কমরেড সেমিচ্যাসনি তার চালাচামুন্ডারা আনন্দে বেশ নড়েচড়ে বসবেন।—শেষের এই কথাগুলি বলে M হাসতে থাকেন।

চিফ অফ স্টাফ বলেন—বুঝতে পেরেছি স্যার।

M এবার বলেন—কিন্তু এটাও জানিয়ে দিতে হবে, নিরাপত্তার স্বার্থে বন্ডের সাথে আপাতত কাউকে দেখা করতে দেওয়া হবে না।

M-এর কথাগুলি দ্রুত নোট করে নিচ্ছিল বিল ট্যানার। সে এবার বলে—আচ্ছা স্যার। আপনি কি বন্ডের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতা এবং হত্যার অভিযোগ এনে ওকে কি কোর্ট মার্শাল করার কথা ভাবছেন।

গম্ভীরভাবে M বলেন—না। প্রথমত, 007 অসুস্থ। ওকে সুস্থ করে তুলতে হবে। বন্ডের একবার মগজ ধোলাই হয়ে গেছে। প্রয়োজনে আরেকবার করতে হবে। কে জি বি আমাদের লোক দিয়ে আমাদেরই মারতে চেয়েছিল। কিন্তু ওদের কোটেই আবার বল ফেরত পাঠাতে হবে। আমাদের লাঞ্ছের পর স্কারমাস্টার ফাইলটা দিও। আবার 007-ই হবে স্কারমাস্টার যম। হ্যাঁ, গত বছরের মাইনে আর অন্যান্য ভাতা বাবদ ওর যা পর্দা হয়, সেটাই যেন ওকে দিয়ে দেওয়া হয়।

চিফ অফ স্টাফ অনেকটা আপত্তির সুরে বলেন—কিন্তু আমার মনে হয় স্যার, 007-এর পক্ষে এখন এটা বড়ো বিপজ্জনক হয়ে যাবে।

M এক স্টেপ এগিয়ে এসে বলেন—কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটায় ওকে অন্তত কুড়ি বছর দেওয়া উচিত ছিল। ও যদি আবার ফিল্ডে নেমে জিতে আসে, তাহলে জানব বন্ড কে জি বি-র ব্রেনওয়াশ থেকে বেঁচে গেছে। এবং এ-ও বুঝব যে, ও পুরোপুরি কাজ করতে সক্ষম—

দরজায় টোকা পড়তেই M ঘাড় ঘোরান। বলেন—কাম ইন।

মেডিক্যাল অফিসারের প্রবেশ। M তাকে মিলিটারি কায়দায় সম্মান জানিয়ে একপাক ঘুরে চিফ অফ স্টাফকে বলেন—আশা করি তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছ।

—ইয়েস স্যার।

M বাইরে বেরিয়ে গেলে চিফ অফ স্টাফ মনে মনে M-এর মুণ্ডুপাত করতে থাকে।

॥ তিন ॥

M এখন ক্লাবের ডিনার টেবিলে বসে। এইমাত্র তাঁর খাওয়া শেষ করলেন। তারপর জল খেয়ে টেবিল থেকে উঠে গিয়ে অন্য একটা জায়গায় বসে খবরের কাগজ নিয়ে এমনভাবে পড়তে লাগলেন, যাতে তাকে চট করে কেউ দেখতে না পায়।

এই ক্লাবের হেড ওয়েটার পোটারফিল্ড ক্লাবের বহু মেম্বারের জীবনের নানা কাহিনি শুনতে শুনতে একজন পাকা মনস্তত্ত্ববিদ হয়ে উঠেছিল। সে তাই এই ক্লাবেরই সুন্দরী হেড ওয়েট্রেস লিলিকে বলে—লিলি, মনে হচ্ছে, বুড়োর মুড আজকে অফ। ভীষণ চিন্তিত। খুব জটিল কেস।

লিলি কিছু হান্দাজ করতে পারছ কি?

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় পোটারফিল্ড। সমস্ত টেবিলে যে সব খাবার সাজানো, তা বিশ্বের তাবড় তাবড় ক্লাব কী খাওয়ার জায়গার সাথে পাল্লা দিতে পারে।

পোটারফিল্ড বলে—লিলি, স্যার মাইলস মেসর্ভির প্রিয় ব্যান্ড হচ্ছে আলজিরিয়ান রেড ওয়াইন। এত কড়া যে, লিস্টে এটার নামই নেই। হাফ বোতল ওনার কোটা। কিন্তু আজ ওনার হুকুমমতো এক বোতল এনে দিলাম। তবে তুমি জেনে রাখ, আজ স্যার মাইলস-এব সিরিয়াস কিছু একটা হয়েছে।

লিলি—কী জানি, তুমিই তো সবাইকে ট্যাকল করো। সবার মতিগতি সবথেকে তুমিই ভালো বুঝতে পার।

পোটারফিল্ড এবং লিলি দু'জন দুদিকে বাস্তু হয়ে পড়ে।

M বসে বসে ড্রিঙ্ক করতে থাকেন। বোতল যত খালি হতে থাকে ততই তাব চোখমুখ লাল হতে থাকে। কপালের শিরা ফুলে উঠতে থাকে।

মদ্যপান শেষ হলে তিনি পাঁচ পাউন্ডের নোট দেন। পরিবর্তে যে খুচরো পাবেন, তা করকরে নতুন নোট আর তামার পেনি। যার দর্শন এবং ঘ্রাণ তাকে মেজাজ এনে দেয়।

M এবার উঠে দাঁড়ালেন। সোজা বাইরের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

ঘড়ি দেখলেন, দুপুর দুটো। গাড়ি বার্কেল স্কোয়ার, অক্সফোর্ড স্ট্রিট, উইগমোর স্ট্রিট পেরিয়ে রিজেন্ট পার্কের দিকে চলেছে। ড্রাইভারের পিছনে M চিন্তামগ্ন হয়ে বসে আছেন। ভাবতে থাকেন, তিনি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা সঠিক। কোনোরকম ভুলচুক তিনি করেন নি।

M চলন্ত গাড়ির মধ্য দিয়ে বাইবের দিকে তাকান। সবকিছু পিছনে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি পিছু হটবেন না। চিফ অফ স্টাফ এবং বিল ট্যানারের কথা তিনি উড়িয়ে দিয়ে বন্ডকে সুস্থ করে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবেনই তিনি। 'বন্ড কি আবার আগের মতো কাজ করতে পারবে? এই প্রশ্ন হয়তো অনেকেই তুলবে। কিন্তু তিনি নিজে বন্ডের চরিত্র ভালোভাবেই জানেন।

বন্ডের কথা ভাবতে ভাবতে M-এর হঠাৎ শ'সি পায়। বন্ড M-কে একবার বলেছিল, M নাবি বন্ডকে তার প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেন।

কিন্তু M জানে, বন্ড মুখে যাই বলুক, সে কাজপাগল লোক। ওকে যদি কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায়, তবে সে নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও সেটা শেষ করবে। তাছাড়া বন্ডের টিপ কিন্তু মারাত্মক।

অপরাধ দমন করতে গিয়ে যেসব বিপদ এবং জটিলতার সামনে পড়তে হয়, তার মধ্যে অনেক আন্তর্জাতিক ঘটনা এবং ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হয়। প্রয়োজনে সেখানে মানুষ খুন পর্যন্তও করতে হয়। জেমস বন্ডের ক্ষেত্রে সেইজন্য '00' কোড নাম্বারটি বসানো আছে। সুস্থ হয়ে উঠে সে যদি আবার শত্রুনিধন করতে পারে, তাহলেই সে পূর্বখ্যাতি অর্জন করবে। না হলে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে হেলান দিয়ে M ভাবতে থাকেন, তবে বন্ডের লক্ষ্য অব্যর্থ। বিফল হবার ছেলে সে কিছুতেই নয়। হ্যাঁ, তবে তার ওই ইয়ের দোষ আছে। মানে সুন্দরী দেখলেই—

অফিসের সামনে এসে গাড়িটা থামল। গাড়ি থেকে নেমে M লিফটে চড়ে ন'তলায় তার ঘরের দিকে যাওয়ার সময় একটা কিছুর গন্ধ পেলেন। M দাঁড়িয়ে যান।

গন্ধটা ভালো করে শুঁকে বুঝতে পারেন, কোন ওষুধের।

কী ভেবে M নিজের ঘরে ঢুকবার দরজা দিয়ে না ঢুকে মিস মানিপেনির ঘর দিয়ে ঢুকলেন। মানিপেনি টেবিলে বসে কাজ করছিলেন।

— কীসের গন্ধ মিস মানিপেনি ?

— সে তো বলতে পারব না স্যার। তবে ওয়ার অফিসের রাসায়নিক যুদ্ধবিভাগ থেকে লোক আনিয়েছিলেন। আমি হিটিং মেশিনটা চালিয়ে দিয়েছিলাম। চিফ অফ স্টাফ লাঞ্চে গেছেন। ওদিকে সব ব্যবস্থা চলছে। স্যার জেমস চারটে পর্যন্ত অপারেশন থিয়েটারে থাকবেন। চারটের পর থেকে উনি আপনার জন্য টেলিফোনের সামনে থাকবেন। আর, এই যে, আপনার ফাইল স্যার।

—বন্ডের কি জ্ঞান ফিরেছিল ?

—মনে হয় একবার এসেছিল। তবে সঙ্গে সঙ্গে যুন্ডের ওষুধ ইনজেক্ট করা হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত ওর খবর কেউ জানে না।

—ফাইন।—M বলেন।

ফাইলটা ওলটাতে ওলটাতে বলেন—ঠিক আছে, বাকি যে সব পেপারস আছে, অফিসে নিয়ে আসুন।

M-এর ঘরে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মানিপেনি ভাবতে থাকেন, অন্য লোকের মতো M-কে তিনি সেভাবে গত দশ বছর ধরে শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পারেন নি। কাগজপত্র দেখার ফাঁকে ফাঁকে M মিস মানিপেনিকে ছোটোখাটো প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন।

ফাইলটা ফেরত দিয়ে M বলেন—এখন থেকে ঠিক আধঘন্টা যেন আমাকে কেউ বিরক্ত না করে। চারটে বাজলে মনে করবেন, স্যার জেমসকে ফোন করতে হবে।

মানিপেনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

M এবার বাদামি ফোল্ডার করা ফাইলটা খুললেন। পাইপে তামাক ভরে, পাইপ ধরিয়ে রিপোর্ট পড়তে শুরু করলেন—

ব্লক ক্যাপিটালে লেখা প্রথমে 'ফ্রান্সিসকো (প্যাকো) পিস্তল স্কারমাস্টার।' তারপর নর্ম্যাল টাইপে লেখা—'পেশাদার খুনি। প্রধানত V.S.S.-এর মাধ্যমে K.G.B.-র অধীনে হাভানা থেকে এ অপারেশন চালায়। ক্যারিবিয়ান ও মধ্য আমেরিকার স্টেটগুলোতে বিভিন্ন সংগঠনের হয়েও কাজ করে থাকে। ১৯৫৯ সালে ফিদেল কাস্ত্রো ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সে কয়েকটি সংস্থার প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে। পুলিশের কড়া নজরদারি সত্ত্বেও তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা কিছুমাত্র কমে নি, বরঞ্চ যথেষ্ট বেড়েছে। লোকে তাকে ভয় পেলেও সম্মান দেয়। তার অস্ত্রের বিশেষত্ব হল, সোনার পাতে মোড়া লংব্যাৱেল সিঙ্গেল অ্যাকশন কোন্ট-45। তার পিস্তলের বুলেটও মারাত্মক। 24 ক্যারেট সোনার ওপর রূপো দিয়ে মোড়ানো দমদম বুলেট। সমাজে সে সোনার পিস্তলধারী নামেই অধিক পরিচিত। কেউ আবার তাকে ডাকে মি. পিস্তল বলে।

স্কারমাস্টার খুনের তালিকা—ব্রিটিশ গিনিতে 257, ব্রিনিদাদে 398, জ্যামাইকায় 940, হাভানায় 764 এবং 742। 098 কেএস এস কে থেকে আহত করে রিটায়ার করাতে বাধা করে সে। এছাড়া তার মানুষ খুনের আরও তালিকা পাওয়া যাবে—মার্টিনিক, হাইতি ও পানামায়—কেন্দ্রীয় রেকর্ড থেকে।

শারীরিক বর্ণনা—বয়স - ৩৫, উচ্চতা ৬' ৩"। রোগা, কঠিন মুখে সুরু বাদামি গৌফ। কান চ্যাপটা, মাথার সঙ্গে প্রায় সাঁটানো। হাতের চেটো শক্ত, তার দু'হাত সমানে চলে। নখ সুন্দর করে কাটে ও পালিশ করে থাকে। বুকের বাঁ দিকের দু'ইঞ্চি নীচে একটা নারীর স্তনের বোঁটার মতো মাংসপিণ্ড। (বিঃদ্রঃ ভুড়ু এবং স্থানীয় আদিম কুসংস্কার আছে, এইরকম মাংসল অংশ পুরুষের অপরাজেয় শক্তি এবং চূড়ান্ত কামুকতার চিহ্ন। যে কোনো মহিলাতে আসক্তি এবং কোনো মহিলাকে খুনের আগে তার সঙ্গে যে কোনোপ্রকারেই হোক যৌন সংসর্গ করে থাকবে। এটাই বিশ্বাস আছে, তাহলে লক্ষ্যবস্তুর ওপর টিপ কখনো ফসকাবে না। টেনিস ও গলফ খেলাতেও নাকি এইরকম বিশ্বাস প্রচলিত আছে।)

কীভাবে স্কারমাস্কার উত্থান হল—কাটালান সার্কাস দলের সঙ্গে বাল্যকাল কাটাবার পর যুক্তরাষ্ট্রে ১৬ বছর বয়সে অবৈধভাবে প্রবেশ করে নানারকম অপরাধ করে একজন নামি বন্দুকবাজ হিসেবে নেভাতার এক কুখ্যাত গুণ্ডাদলের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। লা ভেগাসে জুয়ার ঠেকে কাজ করতে করতে দলের বিশ্বাসঘাতকদের সে সাবাড় করে দেয়। লা ভেগাসের এক গলফের মাঠে ডেট্রয়েটের প্রতিপক্ষ দলের একজনকে সম্মুখ বন্দুক-যুদ্ধে ভালোরকম জখম করে পালিয়ে যায়। স্কারমাস্কার ট্রিগার আগে কথা বলে ওঠে। শত্রুর বুক দুটো গুলি সে ঢুকিয়ে দেয়। এই কাজের জন্য ছক কষে সে নিজের দলের কাছ থেকে এক লক্ষ ডলার নিয়ে ক্যারিবিয়ানের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকরকম শেয়ার কিনে নেয়। চাষের জমি নিয়ে সে ফাটকা খেলে ভালো উপার্জন করতে থাকে।

১৯৬৯ সাল থেকে হাভানায় ঘাঁটি গেড়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখে। বাতিস্তার লোক হয়েও কাস্ত্রোর দলের হয়ে কাজ করতে সে কোনোরকম দ্বিধাবোধ করে নি।

পাসপোর্ট : প্রয়োজনে অনেকরকম। কিউবাব কুটনৈতিক পাসপোর্টও সে তৈরি করে রেখেছে।

অন্যান্য বিবরণ : পুলিশি রেকর্ড না থাকায় ছদ্মবেশের কোনো প্রয়োজন হয় না। স্কারমাস্কার স্ত্রীকে কোনো অভাব নেই। আছে প্রয়োজনমতো লোক, কাজের রকম বুঝে। রাজনৈতিক দলগুলি একে সামনে রেখে কাজ করে যায়। অবশ্য প্রতিদানে স্কারমাস্কারও পকেট ভরে।

সম্পত্তি : নানারকম ক্রেডিট কার্ড আছে। সম্পত্তির পরিমাণ কত, তা সঠিক জানে না কেউ। প্রয়োজনমতো কিউবা থেকে বিদেশি মুদ্রা পায়। C.C. নামধারী ব্যক্তির মতামত—না, তেমন কিছু নয়।

এই C.C. নামের ইতিহাসের অধ্যাপককে কেনই যে হেড কোয়ার্টার ওকে একটা এ.সি.রুম দিয়েছে, কেন এত খাতির—এটা M নিতে পারেন না। লোকটির শারীরিক বর্ণনা যাই হোক না কেন, তার প্রবল মেধা আর জ্ঞানকে কিন্তু M শ্রদ্ধা না করে পারেন না।

'এই জাতীয় গুণ্ডাচরবৃত্তি যারা করে, তাদের কাউকেই শিক্ষাদান আবার অন্যদিকে ভাড়াটে খুনির পেশাতেও মানা যায় না। শুধুমাত্র বসের স্হানুসারেই সহকর্মীদের খুন করা, নিশ্চয়ই এর পূর্ব ইতিহাস আছে। এর বাবা এনরিকো স্কারমাস্কা সার্কাস দলে ফায়ারিং থেকে বাঘকে চাবুক মারা—সবরকম কাজই করত। এই সার্কাসে হাতির দলে যে মন্দা হাতিটা ছিল, তার নাম ম্যাস্স। যাকে চালাত এনরিকো স্কারমাস্কা। বিশেষজ্ঞদের মতে মন্দা হাতির যখন যৌন উত্তেজনা জাগে, তখন কানের পিছনে রস বেরিয়ে জমা হতে থাকে। একে বলে মস্তী। সেবার ত্রিয়েস্তে সার্কাস দলে ম্যাস্সের মস্তী কেউ লক্ষ্যই করে নি। এমনকি জমা রস চেঁছে ফেলে দিতে হয়, সেটাও করে নি। ফলে হাতিটা উত্তেজিত হয়ে স্কারমাস্কাকে ফেলে কিছু দর্শককে ওর পায়ের নীচে পিষে দিয়ে

এলোপাথাড়ি দৌড়োতে থাকে। চারদিকে হই হই শোরগোল পড়ে যায়। পুলিশ তাড়া করে। এমনকি গুলি চালিয়ে হাতিটাকে থামাতে পর্যন্ত চেষ্টা করে। কিন্তু হাতিটার যৌন উত্তেজনা কমে এলে সে শান্ত হয়ে নিজেই তাঁবুতে ফিরে আসে, ফিরে এসেই তার স্কারমাস্কার কথা মনে হয়। ম্যাক্সকে স্কারমাস্কা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। কিন্তু হাতিটা যদি আবার খেপে যায়, এই আশঙ্কায় পুলিশের ক্যাপ্টেন তাকে গুলি করলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং ম্যাক্স মারা যায়। ম্যাক্সের মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে স্কারমাস্কা তার পিস্তল বার করে সেই পুলিশের বুক লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয় পরপর। তারপর সে ভিড়ের মধ্যে পালিয়ে যায়।

বংশের রক্ত গরমের ধাত তার মনে সেই ঘটনার পর থেকেই প্রতিহিংসার আগুন দিয়েছিল জ্বলে।

এরপর আরো কিছু রিপোর্ট দেখে নিয়ে কিছুক্ষণ বাদে পেপার সহই করলেন M সবুজ কালিতে। ভাবতে থাকেন, তিনি কি বন্ডের মৃত্যু পরোয়ানায় সহই করলেন?

॥ চার ॥

বন্ড ঘন্টাখানেক হল ত্রিনিদাদ থেকে এসে নেমেছে জ্যামাইকার কিংস্টন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। এই গরমে লাউঞ্জটা সতাই বিচ্ছিরি। সেই অর্থে আরামদায়ক নয়। হাভানা যাবার কিউবান এয়ারওয়েজ আসতে দু ঘন্টা বাকি। প্লেনেই দুপুরের খাবার সে খেয়েছে। কোট টাই খুলে রিল্যাক্স মুডে বন্ড বসে রইল।

সুইপার ঢুকল পরিষ্কার করতে। ব্যাটার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন, এখানে ও শপিং করতে এসেছে। মাঝে মাঝে বাতাস এসে বন্ডকে চুমু দিয়ে যাচ্ছে। দুজন কিউবান—পুরুষ ও নারী—সামনের দিকের দেওয়ালে যেভাবে হেলান দিয়ে বসে আছে, মনে হচ্ছে যেন, ওরা বন্ডকেই দেখছে। বন্ড ভাবে, আমাকে দেখার মধ্যে তর্জমা কী পাচ্ছ বাছা?

সময় কাটাবার জন্য বন্ড উঠে গিয়ে দোকান থেকে ‘ডেইলি গ্লিমার’ নিউজপেপার কিনে নিয়ে এল, যার মধ্যে গাঁজা সংক্রান্ত খবরই বেশি। যার ফলে এখানকার আঞ্চলিক গাঁজার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে—এছাড়া দ্য গল যে কৌশলে লাল চিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তার খবর তুলনামূলক ছোটো করে ছাপা।

রাশিফলে লেখা আছে—‘দুঃখকে আমল দেবেন না, আপনার জীবনে দারুণ এক আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটতে চলেছে। তবে সতর্ক থাকুন। সুযোগ এলে তা লুফে নিন।...’—বন্ডের হাসি পায়।

রাশিফল পড়ে বন্ড ভাবে—হাভানা পৌঁছে সে স্কারমাস্কার দেখা নাও পেতে পারে। ব্যাটা ত্রিনিদাদে আর কারাকাসে কপালজোরে বন্ডের হাত থেকে বেঁচে গেছে। তাও অল্প সময়ের মধ্যে।

অনেকটা নিমরাজি হয়ে বন্ডকে এখানে পা রাখতে হয়েছে ওই স্কারমাস্কার সন্ধানে। মহারানির মহাশৈল্পিক আদেশনামা নিয়ে। তিনশো বছরের ব্রিটিশ পত্রবাহকদের চিহ্ন একটা রুপোলি গ্রেহাইন্ড পর্যন্ত সে জোগাড় করে নিয়েছে কায়দা করে। তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলতে পারলে ব্রিটিশ এমবাসিতে জায়গা পাবে। যদি লোকটাকে ধরে ফেলা যায় কোনো কায়দায়। বন্ড পিছনের পাতায় চলে আসে। তার চোখ আটকে গেল একটা বিজ্ঞাপনে— নিলাম নোটিশ। স্থান-৭৭, হারবার স্ট্রিট, সকাল-১০.৩০ মি., তাং. ২৮, বুধবার। কিংসটন, একটা বন্ধকী সম্পত্তি।

এই জ্যামাইকা ছিল একদা ব্রিটেনের সর্বপ্রথম উপনিবেশগুলির মধ্যে একটি। নিলামের বিজ্ঞাপনে বন্ধকী সম্পত্তিতে ব্রিটিশের গন্ধ পাওয়া গেল। তবে এই কিংসটনের প্রাণকেন্দ্র থেকে

নিশ্চয়ই এখনো রানি ভিক্টোরিয়ার মূর্তি সরিয়ে মিউজিয়াম বা অন্যত্র রাখা হয় নি। যতই ওরা স্বাধীন হোক।

এইভাবে বন্ডের এক ঘন্টার ওপর কেটে গেল। এবং এই গরমে তার মনে পড়ে গেল অতীতের কিছু চরিত্রকে—বো ডেসার্ট, হ্যানিচাইল বাইডার আর সেই পাগল মানুষ ডক্টর নো।

আনার ঘড়ি দেখে বন্ড। এখনো পঞ্চাশ মিনিট বাকি। সে কাগজটা ভাঁজ করতে করতে মনে পড়ে যায় সেই মেয়েটির কথা, যে এখন ফিলাডেলফিয়ায় এক ডাক্তারকে বিয়ে করে দুটি পুত্রসন্তানের জননী। সত্যি, নিঃসঙ্গ অবস্থায় অতীতই অদৃশ্য থেকে বন্ধুর কাজ করে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বন্ড হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দাঁড়ায় যাত্রীদের চিঠিপত্র সম্বলিত একটা বড়ো বস্তুর সামনে। লাউঞ্জের কাচের মধ্য দিয়ে বন্ড দেখে, ল্যান্ডিং এরিয়াতে কতগুলো বিভিন্ন রঙের ফ্লাগ উড়ছে।

বন্ড এগিয়ে যায় চিঠির বাক্সটার সামনে। ভাবে, যদি তার কোনো চিঠি থাকে। অ্যালফাবেটিক্যালি চিঠিগুলো সব রাখা আছে। না, সে পাবে না। এখন সে মার্ক হ্যাজার্ড। মানে 'M' অথবা 'H'।

এই মার্ক হ্যাজার্ড হলেন ট্রান্সওয়ার্ল্ড কনসটিয়মের লোক। বন্ডের আগের ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট এখন সিক্রেট সার্ভিস উপযুক্ত নয় বলে মনে করছে। তাই এই মার্ক হ্যাজার্ড।

ওকী! বাক্সে কী নাম দেখছে সে! কয়েক সেকেন্ড। লাউঞ্জের চারদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিল বন্ড। সেই কিউবান ছেলে ও মেয়েটিও তো নেই। না, ভাবলে চলবে না। চিঠিটা নিতেই হবে।

ক্রমালে হাত ঢেকে চিঠিটা তুলে নেয় বন্ড। ওই খামে লেখা আছে—বি ও এ সি প্যাসেঞ্জার, ফ্লোরিডা। লিমা থেকে কেউ পাঠিয়েছে। কিন্তু কে? বন্ড শাস্তভাবে টয়লেটে গিয়ে ঢোকে।

খামটা খোলে বন্ড—'১২.১৫ মি. এ কিংসটন থেকে জানিয়েছে, আগামীকাল ঠিক দুপুরের পর নমুনা পাওয়া যাবে...নম্বর S.L.M.-এ। না, কোনো সই বা নাম নেই।

বন্ডের মনপ্রাণ খুশিতে ভরে ওঠে। তবে কি রাশিফলের কথাই সত্যি? '...এক আনন্দদায়ক ঘটনা...সতর্ক থাকুন...সুযোগ এলে তা লুফে নিন।...'—চিঠিটা বেশ ভালো করে পড়ে নিয়ে, খামে ভরে নিয়ে বন্ড টয়লেটের কাজ সেরে আবার এসে চিঠির স্ট্যাম্পের সামনে দাঁড়াল।

চিঠিসুদ্ধ খামটা যদিও কিছুটা ভিজ়ে গেছে। তবে শুকোতে বেশিক্ষণ টাইম নেবে না এই গরমে। যথাস্থানে চিঠিটা রেখে দিল বন্ড। রাশিফল অনুযায়ী সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেই।

বন্ড বি ও এ সি-র কাউন্টারে গিয়ে জেনে নিল, লিমা থেকে পরের দিন ১.১৫তে এসে ফ্লাইট পৌঁছোচ্ছে লন্ডনে কিংসটন এবং নিউইয়র্ক হয়ে। তারপর বন্ড কী করবে? কোনো সুন্দরী কি তার হয়ে এগিয়ে আসবে? যাকে সে কাজের পর কোনো হোটেলের নরম এক বিছানায়—

'স্টেশন জে'—মনে পড়ে গেল যেখানে তার নাম কেউ জানে।

বন্ড ফোন করল হাই কমিশনারের দপ্তরে। আবার কোনো সুন্দরীর কণ্ঠস্বর—ইয়েস, পি. এ. টু কম্যান্ডার রস। বলুন—

কণ্ঠস্বরটা যেন চেনা মনে হল। বন্ড বলে—আমি কম্যান্ডার রসের সাথে ওনার বন্ধু কথা বলতে চাই।

—উনি তো আউট অফ স্টেশন। আপনি কে বলছেন?...আরে, গলা শুনে তো জেমস বন্ড মনে হচ্ছে। তা তুমি—

মেয়েটিকে থামিয়ে বন্ড বলে—ঠিক ধরেছি। তা গুডনাইট, তুমি এখানে, কী ব্যাপার?

গুডনাইট বলে—ওই আগের মতোই। আমি ভাসা-ভাসা শুনেছিলাম, তুমি ফিরে এসেছ। তা এখন কোথেকে কল করছ?

— কিংসটন এয়ারপোর্ট। আমি তোমার হেল্প চাই সুইটি।

— ও. কে.। বল।—গুডনাইট খাতা কলম নেয়।

— শোন— বন্ড উত্তেজিতভাবে বলে—প্রথমত, আমি একটা গাড়ি চাই। দুই, এস. এল. এম.— অর্থাৎ, সাভানা লা মারের অঞ্চলটার যে কজন খানদানি মক্কেল আছে, তাদের নাম। তিন, ওখানকার একটা বড়ো ম্যাপ, জ্যামাইকার মুদ্রায় ১০০ পাউন্ড। আসল কথাটা শোনো, তুমি ফোন করে নিলাম মার্চেন্ট-এর কাছে আজকে নিলামের বিজ্ঞাপনটার ব্যাপারে ডিটেইলস জেনে নাও। সাড়ে তিন নম্বর, লাভ লেন। বলবে যে, তুমি ওটা কিনবে। আমি মর্গান হারবারে আছি। তুমি ওখানে চলে এস। রাতে থাকছি। আমার সঙ্গে ডিনার করবে। কী বুঝতে পেরেছ সব?

মেয়েটি বলে—রিয়েলি তুমি বন্ড।

বন্ড বলে—শোনো, টাইট ড্রেস পরবে। তবে বেশি বোতাম যেন না থাকে।

টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বন্ড ভাবে, তাহলে মেরি গুডনাইট, তার পুরোন প্রিয় সেক্রেটারি এখন এখানে আছে। হ্যাঁ হেড কোয়ার্টার থেকে ওর বদলির খবর শুনেছিল যা। তাহলে বন্ডের সত্যিই ভালো সময় এখন। ধন্যবাদ ডেইলি গ্লিমার।

ট্যাক্সি নিয়ে মর্গান হারবারের দিকে চলল বন্ড। জানলার খোলা হাওয়ায় বন্ড বেশ আরাম বোধ করল।

পালিসাডোর কাছে এক মনোরম হোটেল। মালিক ইংরেজ। একদা গোয়েন্দা বিভাগে ছিলেন। বন্ডকে বলেন—তা স্যার, বলুন। মানে কিউবা না কোন স্মাগলড মাল—মানে আজকাল তো আবার—

—একটা বড়ো এ. সি. রুম। সাউথের জানলা। মাখনে ভাজা দুটো গলদা চিংড়ি, যা যা ভালো খাবার আছে আর দামি মদ। বরফ অবশ্যই যেন থাকে।—বন্ড ধীরে ধীরে বলে যায়।

—আপনি যে ইংরেজ, তা ঠিকই ধরেছিলাম।

—আচ্ছা, আমি স্নান করে ঘুমোব। সন্ধ্যা ছটার সময় আমায় যেন কেউ ডেকে দেয়।

ঘরে বেল বাজল। বন্ড চোখ মেলে দেখে ছটা বেজে দু'মিনিট হয়েছে। কোথায় আছে সেটার ঘোর কাটতেই মিনিটখানেক লেগে গেল। ধীরে ধীরে সে উঠে বসে। গুডনাইটের কথা মনে পড়ে যায়। আর দেরি করে না বন্ড। বিছানা ছেড়ে চলে যায় বাথরুমে। আরেকবার স্নান করে ফ্রেশ হয়ে সে বরফ দেওয়া এক গ্লাস ওয়াকারের বোরবন নিয়ে বাইরে এসে পেলকানদের শিকার দেখতে লাগল। বসে বসে ভাবতে লাগল বন্ড, পৃথিবীতে কুইক বন্ডকবাজ স্কারমাস্টার সঙ্গে সরাসরি লড়াই-এ নামতে যাওয়াটা মুর্খামিব সামিল হবে। তবে সে এখন 'মার্ক হ্যাজার্ড' নামে পরিচিত। তাঁর কূটনৈতিক পাসপোর্টটা গুডনাইটের কাছে সাবধানে রেখে যেতে হবে। ট্রান্সওয়ার্ল্ড কনসার্টিয়াম-এর হয়ে সে কীসের ব্যবসা করছে? বক্সাইট, নেগ্রিল প্ল্যানিং নাকি সি-বীচ ডেভেলোপমেন্ট। আবার জ্যামাইকার প্রায় জনমানবহীন অঞ্চলে চিনির ব্যবসাও হতে পারে। আবার এই ধনী ব্যবসাদার মার্ক হ্যাজার্ড তার মনের মতো জমি খুঁজে বেড়াচ্ছেন হোটেল বা গৃহ নির্মাণের জন্য।

বন্ড আরেক পেগ নিয়ে এসে ভাবতে থাকে, ডেইলি গ্লিমারের রাশিফল এবং তার অনুমান যদি পাকেচক্রে মিলে যায়, তবে স্কারমাস্টার সাথে সাড়ে তিন নম্বরে সাক্ষাতের সময় সতর্ক থাকলেই হবে।

সমুদ্রের ওপারে সূর্যের রূপ আগুনের রং ধারণ করেছে।

ধীরে ধীরে বন্ডের নাকে এক মিষ্টি গন্ধ ধরা দেয়। আর সেই সঙ্গে দুটো কোমল বাহু বন্ডের পিছনদিক থেকে এসে জড়িয়ে তার গালে চুম্বনের প্রগাঢ় প্রলেপ দেয়। বন্ডকে বলে—আজ অনেকদিন পর—

এক হাত তুলে গুডনাইটের মাথাটা টেনে নিয়ে বন্ড বলে—দু'জনের মিলন হবে। দীর্ঘ তিন বছর বাদে।—বলে ঘাড় ঘুরিয়ে তার ঠোঁটে নিজের অধর স্পর্শ করে অধরসুখাপানে মজে যায় বন্ড।

ঘাড়ের পাশ থেকে চুলের রাশি সরিয়ে বন্ডের সামনে এসে হাঁটু গেঁড়ে বসে মেরি গুডনাইট। দু'জনের দৃষ্টিই এখন স্থির। বন্ড ভাবে, অফিসে কাজ করতে করতে কতসময় এই চোখের ওপর সে আটকে গেছে।

গোলাপি রঙের টাইট জামা, বক্ষয়ুগলকে কবেছে উদ্ধত। গলায় সে পরেছে মুক্তোর মালা। গুডনাইট হেসে বলে—পিছনে বোতাম। গরমের দেশে এটাই আমাদের পোশাক।

বন্ড বলে—বুঝতে পারছি, মুক্তোগুলোর মধ্যে আছে সেকো বিষ।

—তবে সঠিক জানি না, কোনটাতে আছে। প্রয়োজনে গিলতে হবে হয় তো। আচ্ছা, তুমি কি একাই হাতে গ্লাস নিয়ে থাকবে নাকি?

--সরি সবি ডারলিং। তোমাকে দেখতে দেখতে এতদিন বাদে সবকিছুই ভুলতে বসেছিলাম।— বলে বন্ড বেয়ারাকে ডেকে নতুন করে ড্রিন্কার অর্ডার দিয়ে বলে—আচ্ছা, রস এখন কোথায়? আমি তোমায় যা যা বলেছিলাম, সেগুলোর কোনো খবর আছে?

ড্রিন্ক এসে গেল। বন্ড এখন সিগারেট খাওয়াও কমাতে চেষ্টা করছে।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে মেরি তার ব্যাগ থেকে নোট বার করে দিল। কিছুটা আছে পাঁচ পাউন্ডের নোট, বেশিটা আছে এক পাউন্ডের নোট।

বন্ড বলে—হ্যাঁ, এই নোট যাবে আমার নামে।

গুডনাইট এবার বলে—ও. কে.। শোনো, সেই স্ট্রেঞ্জয়েজকে মনে আছে? ওরই 'সানবিম আলপাইন'-এ করে আমি এসেছি। আর্ক, ছিল অফিসের, এখন আমার। দারুণ গাড়ি। এই চল না, একটু হাঁটি আমরা।

—এখন না, বরং এখানে বসেই কথা হোক।

—বেশ। ফ্রোমের সবথেকে ডাকসাইটে মক্কেলের নাম টোনি হিউগল। নৌবাহিনীর প্রাক্তন কর্মী টোনিব স্ত্রী এবং বাচ্চাবাও বেশ ভালো। ওদের আখের খেতে প্রায়ই আগুন দেওয়া হচ্ছে। কিউবার থার্মাইট বোমা দিয়ে। এবার ফলন তিরিশ লক্ষ টন। জ্যামাইকার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কিউবার আখ থেকেই চিনি তৈরি হয়। বাড়বৃষ্টিও বেশ ভালোই হয়েছে। এ সবই খবরের কাগজের তথ্য। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের আখ নষ্ট করাই কান্স্টোর প্রধান কার্য। এদিকে দেশে খাদ্যসংকট। কিন্তু দেশের সম্পদ চিনি। কিউবার চিনির বদলে আমেরিকার গম রাশিয়া থেকে তারা পাচ্ছে। ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য প্রচুর খরচ হচ্ছে রাশিয়ার। আবার কিউবার দিকেও নজর দিতে হচ্ছে। কান্স্টোর পক্ষেও এইভাবে বেশিদিন চালানো সম্ভব নয়। ওরা আবার ধর্মভীরু। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে দেশটাকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আগে যা কখনো হয় নি। ক্যাথলিক তো। এর প্রভাব সরকারের ওপর পড়বেই।

মুঞ্চ বিষ্ময়ে বন্ড শুনে যাচ্ছিল গুডনাইটের কথা।

মেরি বলতে থাকে—এখানে এইসব কাজই করতে হয়। আখের খেতে সতিাই আগুন লাগছে নাকি সতিাই ষড়যন্ত্র চলছে সেগুলো নিয়েও দেখা দরকার। সারা বিশ্বই এখন চিনি নিয়ে লুকোচুরি খেলছে। কিউবার অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে ওয়াশিংটন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু জ্যামাইকার ফসল নষ্ট করার পিছনে কিউবার স্বার্থ কাজ করছে। জেমস, জ্যামাইকার ফ্রেম অঞ্চলে এক-চতুর্থাংশ চিনি উৎপাদন হয়। মোটামুটি এইটুকু হল চিনি উৎপাদনের কাহিনি। তবে ওখানকার মাথা ওই হিউগিলকে আমি চিনি। যুদ্ধের সময় নেভির গোয়েন্দা বিভাগে ছিল, ও জানে সব। তোমার সাথে গুড বিহেভই করবে। হ্যাঁ, গ্লাভ কম্পার্টমেন্টের মধ্যে সার্ভে ম্যাপ রাখা আছে। কী হল, কী দেখছ?

বন্ড বলে—শুধু তোমাকেই। সত্যি গুডনাইট তুমি শুধু সুন্দরীই নও, জিনিয়াসও বটে? তা তোমার কর্তা রস কোথায়?

মেরি গুডনাইটের মুখে চিন্তার রেখা। সে বলে—যেটুকু শুনেছি উনি ত্রিনিদাদ না কোথায় যেন এক বন্দুকবাজ মারাত্মক খুনি স্কারমাস্কে ধরতে গেছেন। দু’দিন আগে ফেরার কথা। হেড অফিস জানিয়েছে, আরও এক সপ্তাহ দেখতে।

—বেশ। তবে দু নম্বর নিয়েই আমার ইন্টারেস্ট। আচ্ছা, এই সাড়ে তিন, লাভ লেনের কোনো খবর পেলে।

—কে বলল পাইনি? আলেকজান্ডারদের সুবিধে হল না বলে, স্পেশাল ব্রাঞ্চার দ্বারস্থ হতে হল আমাকে। ওই জায়গাটা হল—মানে সেই যে, সাভানা লা মার নামে একটা বিশ্রী জায়গা।

বন্ড মেরিকে রাগাবার জন্য হেসে বলে—ও, বুঝেছি। প্রস কোয়ার্টার। তাই বুলো।

—ধ্যাৎ! তুমি না ভীষণ অসভ্য।

বন্ড গুডনাইটকে কাছে টেনে চুমু দিয়ে বলে—এখনও তো হইনি। হব, গভীর রাতে। তখন...

‘ ॥ পাঁচ ॥

জ্যামাইকার উত্তর উপকূল অঞ্চলটা বেশ আকর্ষক। কিংসটন থেকে বন্ডের সাথে গুডনাইট সাভানা লা মার পর্যন্ত ১২০ মাইল রাস্তায় গাড়িতে ওর সঙ্গী হল। বন্ডের বেশ ভালো লাগছিল।

কড়া রোদের মধ্যে ওরা এসে থামল হোয়াইট হাউস ইন-এ। ওরা ওখানেই লাঞ্চ সেরে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার গাড়ি ছাড়ল। প্রায় চারটে নাগাদ ওরা ইন করল সাভানা লা মার-এ। বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো একটা ছোট্ট শহর। বাংলো ধাঁচের বাড়ি, বৃগনভিলার ঝাড় আর বাহারি গাছের সমাবেশ।

এই শহরটা মোটামুটি দর্শনীয়। ফ্রেমের আখ-ব্যবসায়ীদের বাড়িগুলি খুব একটা টিপটপ নয়।

একটা পেট্রল পাম্প থেকে গাড়ি ভাড়া করে, তাতে তেল ভর্তি করে, মেরিকে চুমু দিয়ে ওর গাড়িসহ ওকে বিদায় জানাল। শুধু বলল—কিউবার কাজ শেষ করেই ফিরব।

বিনা কৌতূহলে মেরি গাড়ি ঘোরাল। বন্ড-এর লাভ লেন খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হল না।

জেটি থেকে শহরের দিকে আঁকাবাঁকা গলি, দুপাশে পলেস্তারা খসা, ভাঙাচোরা বাড়ি ও দোকান। বন্ড ম্যাপটা মনে রাখবার জন্য গাড়ি নিয়ে বারকয়েক চক্কর মারল। গাড়ি জেলেদের ডিঙি রাখার জায়গাটার কাছে রেখে, লক করে বন্ড লাভ লেনে পা ফেলল।

কিছু ফিশারম্যান আসাযাওয়া করছে। একটা দোকানে সিগারেট কিনতে গিয়ে সাড়ে তিন নম্বর জিঞ্জাসা করতেই লোকটা ভুরু কঁচকাল। তারপর বলল— একটু এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে বড়ো বাড়িটা।

বন্দ-এর হাঁটা দেখে মনে হল, সে বুঝি বেড়াতে এসেছে। সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে সিগারেট ধরাতে সে সময় নিল। এই ফাঁকে বাড়িটাকে মেপে নিল সে।

বাড়ির বর্তমান চেহারা বলছে, অতীতে কোনো রইস ব্যবসাদারের বাড়ি ছিল এটা। বাড়ির কারুকার্য, নকশা সবই এখন ভগ্নদশা। বাড়ির সামনে ফাঁকা জায়গাটায় মুরগি ও হাড় বের করা কয়েকটা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বন্ডের চোখে পড়ল, একটা ফুলে-ভরা সৌন্দর্য ছড়ানো বিশাল গাছ। যার তলে চেয়ারে বসে একটি মেয়ে কিছু পড়ছে। আরেকটু এগিয়ে কোনাকুনি বাড়িটাকে দেখতে যেতেই বাড়ির আড়ালে মেয়েটি ঢাকা পড়ে গেল। বাড়িটা দোতলা, কাঠের টালি দিয়ে সুন্দরভাবে ছাওয়া।

সামনের দরজা পর্যন্ত কাঠের সিঁড়ি। কাঠের ওপর বড়ো বড়ো এনামেলে লেখা—সাড়ে তিন। ঘাড় ঘুরিয়ে বন্দ দেখে নিল অন্য কোনো বাড়িতে কিন্তু এবকমভাবে নম্বর লেখা নেই। দুটো জানলার মধ্যে একটার ধুলোভমা কাচের মধ্য দিয়ে চেয়ার টেবিল দেখা যাচ্ছে। চোখে লেখাটা অস্পষ্ট লাগছে—ড্রিমল্যান্ড কাফে। এছাড়া হাতে লেখা—টাতকা গরম সুপ পাওয়া যায়।

বন্দ সিগারেটটা ফেলে পুঁতির ঝোলানো ঘন পর্দা ঠেলে ওই কাউন্টারে গিয়ে দেখল কিছু ড্রাই কেক, কলাভাজা, কফির জার।

পায়ের শব্দ শোনো গেল। ওই মেয়েটি ঢুকল। গায়ের কালো রঙের মধ্যে তার ছোট্ট গোলাপি ফ্রকটা ভালোই মানিয়েছে। বাদামি চোখ। চুল তার ব্ল্যাক। মনে হয় ফ্রস বিট। মেয়েটি বন্ডকে বলে—বলুন।

—একটা রেড স্ট্রাইপ পাওয়া যাবে? দাম কত পড়বে?

—শিওর। এক শিলিং ছ'পেন্স।

বন্দ বলে—ঠিক আছে। নিয়ে এস।—বলে মদের দাম মিটিয়ে দিয়ে টুল টেনে বসল। মেয়েটি পয়সার বাক্সে টাকা রেখে ব্যালাল্টা ফেরত দিয়ে বোতল, জল ও গ্লাস এনে টেবিলের ওপর রাখল। বোতলের ছিপিটা সামান্য নীচু হয়ে খুলবার সময় মেয়েটির টাইট জামা উপচে আসা স্তনের উপরিভাগটা বন্ডের চোখে আটকে গেল। বন্দ ভাবে, দারুণ তুমি।

মেয়েটি বুঝতে পারে। বলে—তা তুমি কি এদিকে বেড়াতে এসেছ?

—বলতে পারো। কাগজে বিজ্ঞাপনটা দেখে ভাবলাম, বাড়িটা দেখে যাই একবার। বাড়িটা কার?

মেয়েটির হাসি বলে, আখ তোমার দাঁতের ষোলোটা ব্যাকিয়েছে।

—সত্যি, মালিকের চেহারা বুঝি আমার?

—কেন, হতেও তো পারে?

—না না, মোটেই না। এইসব খাবার ছাড়া অন্য ধাক্কাও আছে।

—সেটা কি স্মাগলিং?

—আরে ধুস। ওসব কিছু নয়। এই আমার মতো কয়েকজন রোগা, মোটা, ফর্সা—যাকে বলে—

—বুঝেছি।—বন্দ তামাশা করে বলে—তা একসঙ্গে কজন পাব?

—যে রকম চাইবে গো তুমি মিনসে।

বন্ড এবার মেয়েটির সামনে উঠে এসে বলে—যদি তোমায় চাই?

মেয়েটি বন্ডের কথা শুনে হাসতে শুরু করে—বলিহারি পছন্দ তোমার। শোনো, আমার যাকে ভালো লাগে, তাকেই পছন্দ করি আমি। পয়সাটা কোনো ব্যাপার না। আসলে আমি এখানকার সবকিছু দেখভাল করি। আমার নাম টিফি।

বাঃ, মিষ্টি নাম তো। আমি মার্ক। মার্ক হ্যাজার্ড।

টিফি বন্ডের কাছে চোখ দুটো নাচিয়ে বলে—দেখে তো মনে হচ্ছে লাইনের লোক।

—সে তুমি যা ভাবো। আসলে ফ্রোমে একটা কাজে এসেছি। তা এই দিকটা পছন্দ হয়েছিল। ভাবলাম, যদি কোনোকিছু ভাড়া পাওয়া যায়। তোমাদের কাছে কোনো ঘর হবে?

—হ্যাঁ, তা হবে। তবে একটু অসুবিধা আছে। মাঝেমাঝে রাতে এসে মাতালগুলি ঝামেলা করে। সত্যি বলতে, তোমাকে ভাড়া দিতে গেলে টালি সারাতে হবে। খরচা হবে প্রায় হাজারের মতো।

বন্ড টেবিলের ওপর উঠে বসে। বলে—কিন্তু এই বাড়িটা বিক্রি হচ্ছে কি পুলিশের ঝামেলার জন্য? নাকি অন্য কোনো—

—না। আসলে মালিকের স্ত্রী হঠাৎ ক্যাথলিক হয়েছেন। ক্যাথলিকদের চোখে এইসব কারবার ধর্মবিরুদ্ধ। তাই মালিকের স্ত্রী চাইছেন এই সাড়ে তিন নম্বর বেচে যা পাবেন, তাই দিয়ে চার্চের মেরামত করবেন।

—তুমি তাহলে কোথায় থাকবে? অন্য মেয়েরা?

—অন্য মেয়েদের ব্যাপার জানি না। তবে আমি কিংসটনে গিয়ে বোনদের কাছে থাকব। সাভানা লা মার-এ কোনো লাইফ নেই। তাহলেও আমার মন খারাপ লাগবে। এখানে আর কিছু না হোক, সন্ধ্যাবেলায় তো একটু আধটু শ্রানন্দ হত।

সহানুভূতির সুরে বন্ড বলে—সত্যিই তো, খারাপ তো লাগবেই।

টিফি বলে—মিস্টার মার্ক, আমি শুধু পয়সাটাই দেখি না। যেসব কাস্টমাররা অসুবিধেয় পড়ে, তাদের সেই দিকটাও আমাকে দেখতে হয়। ফলে এখানে লোকও আসে নেহাত খারাপ না। তাছাড়া—

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে—আরে, জো আর মে-কে খাবার দিতে হবে।—বলেই সে কাফের একটা জানলার খড়খড়িটা ওঠাতেই কালো রঙের দুটো পাখি ঘরের মধ্যে উড়ে এসে কাউন্টারের ওপর বসল। পাখি দুটোর আওয়াজ যেন কোনো চলমান মেশিনের মতো। বন্ড বিস্মিত হয়। তাদের বড়ো বড়ো সোনালি চোখে নির্ভয়ে তারা চেহারাটাকে ফলিয়ে ঘরের মধ্যে এ-টেবিল ও-টেবিল করে বেড়াতে লাগল।

টিফি মাছি ভন ভন করা কেকের বাস্ক থেকে কেক নিয়ে ওই পাখি দুটোকে খাওয়াতে লাগল। মহানন্দে ওরা গপগপ করে কেক খেতে লাগল।

টিফি বলে—ওদের নাম দিয়েছি ক্লিং ক্লিং। অবশ্য জ্যামাইকার শিক্ষিতরা বলে এদের জ্যামাইকার গ্র্যাকল। জ্যামাইকার জাতীয় পাখি হচ্ছে লম্বা লেজওয়ালা হার্মিং বার্ড। তবে আমার এই দুটোই বেশ প্রিয়। যদিও বেশ মজাদার এরা।

জেমস পকেট থেকে দু পেনি বার করে দিয়ে বলে—এই নে, আমার তরফ থেকে তোদের খাবার এটা।

টিফি পয়সা বাস্তবে রেখে বলে—জো মে শোনো। একদম দুষ্টুমি করবে না। তাহলে ইনি আর আসবেন না, তোমাদেরও ভালোবাসবেন না কিন্তু।

দোতালার কাঠের মেঝেতে পায়ের শব্দ শুনে টিফি গভীর হয়ে যায়। বলে—লিভির বাবু এসেছেন। বড়ো মেজাজী। আমাকে আর মে ও জো-কে সহাই করতে পারেন না। আমি শুইনি বলে অবশ্য। আর জো মে খুব চ্যাঁচায় বলে।

বাইরে পূঁতির পর্দা আওয়াজ করে নড়ে উঠল। বন্ড বাঁ হাতটা কোমরের কাপড়ের তলায় রাখা রিভলবারটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে বলে—যা গরম। ভাবছি আর একটা রেড স্ট্রাইপ নেব।

বন্ড দেখল, অঙ্ককাব ঘরে একটা ঢাঙামতো লোক ঢুকে মাটিতে সুটকেস রেখে এগিয়ে গেল। টিফি আচমকা ঘাবড়ে গিয়ে ঘরের একটা সুইচ টিপতেই ঘরটা আলোতে ভর্তি হয়ে গেল।

স্কারমাস্কা এসে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল।

বন্ড স্কারমাস্কার যা বর্ণনা পেয়েছে—বলিষ্ঠ কাঁধ, সরু কোমর, বাদামি সিঙ্গেল ব্রেস্টেড সুট, সাদা বাদামিতে মেশানো জুতো। টাই-এর পরিবর্তে বাঁধা সিল্কের স্কার্ফ—তাতে সোনার পিস্তল ঝুলছে এক বিশেষ কায়দায়, স্কারমাস্কার শয়তানি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বন্ডের নির্লিপ্ত মুখের ওপর নিবন্ধ।

স্কারমাস্কা বলে খাঁটি আমেরিকান উচ্চারণে—আগে বাঁদর নাচাই, তাবপর পা দুটো ভেঙে দিই গুলি কবে। এ্যাই, আমাকে যেন চেন না মনে হচ্ছে? এই মেয়েটা কিছু বলে নি?

গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলে—শুনে আমার তো কোনো লাভ নেই।

স্কার্ফে ঝোলানো সোনার পিস্তলটা বন্ডের সামনে ধরে বলে—কে হে তুমি? এই অঞ্চলে ঘুবঘুর করছ কেন? সাভানা লা মার-এ—বলি কোথেকে?

বন্ড হাত তুলে হেসে বলে—আরে ধরে নাও তোমার স্যাঙাৎ হতে আসা। আরে ও টিফি, মনে হয় এর ভীষণ খিদে পেয়েছে।

স্কারমাস্কা পিস্তলটা ধরে এক বিশী গর্জন করে উঠল। বুঝি এখনই ট্রিগারে চাপ দিল বুঝি সে। ভয়ে পাখি দুটো জানালা দিয়ে তাদের মতো শব্দ করে উড়ে পালিয়ে গেল।

অবস্থা থমথমে দেখে টিফি রেড স্ট্রাইপের হাতল ছুঁড়ে মারতেই ঘরের পিছনে কাচ ভাঙার শব্দ। টিফি যেন আরও ভয় পেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল।

বন্ড উঠে বেরোতে গিয়েই স্কারমাস্কার হাত তার বাহু ধরে বাধা দিল।

বন্ড ওকে রাগাবার জন্য বলে—এ্যাই হাত ছাড়। ভদ্রতা শেখায় নি তোমার বাবা-মা?—কাউন্টারের দিকে চলে গেল বন্ড। স্কারমাস্কা হতবাক। টিফির সেই ফোঁপানো কান্না বন্ধ হতে চায় না।

স্কারমাস্কার দিকে তাকিয়ে এবার বন্ড বলে—অনেক মস্তান দেখা আছে। ১৯৪৫-এ বার্লিনে ভিটেজে গেলে দম বোঝা যেত। অবশ্য তখন বোধহয় তুমি হামাঙড়ি দিচ্ছ। যাকগে, আমার সামনে কারো ভয়ে কোনো মেয়ে কাঁদুক এটা পছন্দ নয় আমার।—বলে স্কারমাস্কার পিস্তলটা সামান্য দুলিয়ে দেয়।

বন্ডের স্মার্টনেস স্কারমাস্কাকে বোকা বানিয়ে ছাড়ল।

বন্ড এবার টিফির কাছে এগিয়ে যায়।

টিফির কাছে গিয়ে বন্ড তার দু'গালে চড় কষাল। টিফির ভয়টা বুঝি কাটল। বন্ড তার গাল দুটো ভিজ়ে কাপড় দিয়ে মোলায়েম করে বুলিয়ে দিল। তারপর বলে—গেট আপ টিফি। এখুনি দোকানে খদ্দের আসবে। দেরি কোর না। আর একটু মেক-আপ করে নাও।

টিফি তার ব্যাগটা খুলে পাক দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে আস্তে করে বলল—শয়তান, তোমাকে আমি ঠান্ডা করে ছাড়ব। শয়তান, বদমাইশ স্কারমাস্স। অরেঞ্জ হিলের মাদার এডনাকে গিয়ে সব বলব।

বন্ড ওর পিঠে হাত রেখে বলে—যা হয়ে গেছে, তা মিয়ে আর চিন্তা কোর না। মনে স্ফূর্তি আন। আমি দেখছি, যদি কিছু করা যায়।

এরপর স্কারমাস্সর কাছে গিয়ে বলে—তুমি সার্কাসের একজন যোগ্য খেলোয়াড়। তা মেয়েটির কথা কিছু চিন্তা করে দেখো।

স্কারমাস্স রেগে গিয়ে বলে—সার্কাস কথাটা উচ্চারণ করলে কেন হে? কে বল তো তুমি? টিকটিকি বলে মনে হচ্ছে যেন।

—আগে তো বস। তারপর কথাবার্তা হবে।

স্কারমাস্স একটা হাত চেয়ারের ওপর রেখে চেয়ারটা উলটো করে ঘুরিয়ে নিয়ে বসল, মাথায় বুদ্ধি আছে। চেয়ারের পিঠটা ওকে কোনো শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবে।

বন্ড বলে—আমি ট্রান্সওয়াল্ড কনসটিয়ম কোম্পানির মার্ক হ্যাজার্ড। তবে এখন ফ্রোমের আখতে নিয়ে কাজ করছি। তা, আপনি?

—ফ্রান্সিসকো স্কারমাস্স। লেবার রিলেশনস। নাম শুনেছ নিশ্চয়ই?

—শুনে থাকব হয়তো।

বন্ড এরপর বলে—তা দেখে শুনে মনে হচ্ছে আপনি নিজেকে একজন বিরাট কিছু ভাবেন।

—ভাবতেই পারি। এখানে আমাকে সবাই চেনে সোনার পিস্তলটার জন্য।

—সেটাই তো ভাবছি। এই দেখুন না, যেতে কেবল আগুন লাগছে। আপনার মতো একজনকে পেলে বেশ ভালো হত। সত্যি বলতে, আমার কোম্পানি ইনশিওরেন্স-এর খবরাখবর নেয়।

—বুঝেছি। সিকিউরিটি। তা ভালো। কিন্তু পুলিশ বা টিকটিকি হলে কিন্তু বিশেষ সুবিধা হবে না।

বন্ড এবার স্কারমাস্সর সামনে টেবিলটা এগিয়ে নিয়ে এসে বলে—কয়েকজন রাসতকারীকে ধরা হয়েছে। ওরা ঝামেলা পাকাচ্ছে। ওদের বন্ডব্যা, আমরা নাকি ধর্মকে হাতিয়ার করেছি। মনে হচ্ছে, ছেড়ে দিতে হবে। তাই... মানে... এই তোমার মতো লোক, যারা গায়ের জোর খাটিয়ে—

—সঙ্গে কি পিস্তল থাকে তোমাদের?

—এসব না নিয়ে কি চলা যায়?

একেবারে ওয়ালটার পি.পি.কে.। ৭৬৫ মি. মি.।

টিফি কাজ করতে করতে ওদের দিকে বিশেষ করে স্কারমাস্সর দিকে এক বিদ্রোহের চোখে মাঝে মাঝে দেখছিল।

বন্ড সেটাকে লক্ষ করে বলে—এই যে সুইট গার্ল। টিফি, তা রেড স্ট্রাইপের দুটো টনিক দিয়ে যাও এদিকে। তুমি নিশ্চয়ই এ রস থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাও না।

স্কারমাস্স বলে—আমার তো গলা শুকিয়ে গেছে।

টিফি এসে গ্লাস, জল ও দুটো বোতল দিয়ে যায়।

বন্ড বলে—সত্যি বলতে কী, আমি তো সেই অর্থে পেইড স্টাফ নই কোম্পানির। তো তোমার হাতে আছে নাকি সেরকম কোনো কাজ?

গ্লাসে চুমুক দিয়ে ফ্রান্সিসকো স্কারমাঙ্গা বলে—মাসে হাজার ডলার হলে চলবে কি?

বন্ড মুখটা স্কারমাঙ্গার দিকে ঝুকিয়ে চোখ দুটো বুজে অনেকটা 'হাঁ' বোধক সম্মতি জানায়।

বাইরে গাড়ির শব্দ। কেউ গাড়ি থেকে নেমে পুঁতির পর্দা ঠেলে কাউন্টারের কাছে গিয়ে টিফির সঙ্গে নীচুস্বরে কথা বলে নোট দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরের দিকে গেল।

বন্ড ওদের দেখে বলে—জ্যামাইকার লেবার এরা।

স্কারমাঙ্গা বন্ডের কথায় বিস্মিত হয়। বলে—আচ্ছা, নেগ্রিল উন্নয়নের ব্যাপারে আমার দু-একজন পার্টনার বেশ উৎসাহী। তুমি ব্লাডি বে জায়গাটার নাম শুনেছ?

—ম্যাপে দেখেছি, গ্রিন আইল্যান্ড বন্দরের কাছাকাছি।

—আরে ওখানেই তো হোটেল খোলার পর জানি না কী কারণে আমেরিকানরা আসতে তয় পেল। এদিকে টাকাও সেরকম নেই, আবার ব্যাংকও নানা ফ্যাকড়া তুলছে। ব্যাপারটা হচ্ছে, আমার এই হোটেল, যার নাম থান্ডারবার্ড, ওখানে জনাকয়েক স্টকহোল্ডার আসছেন। একটা মিটিং আছে হোটেলটার ডেভেলপমেন্ট-এর জন্য। তাছাড়া ওদের সবরকম স্মুর্তির বন্দোবস্তও করতে হচ্ছে। মেয়েছেলে পর্যন্তও। আমার একটা ন্যারো গেজ রেল লাইন আছে। আগে তাতে করে আখ যেত বন্দর পর্যন্ত।

রসিকতা করে বন্ড বলে—স্মুর্তি, মেয়েমানুষ— এইসব পেলে ওরা শেয়ারগুলো সব কিনে নেবে।—দেখ, উলটোপুলটা কথা বোলো না। আগে শোন সবটা।

সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বন্ড বলে—বল তবে, শুনি।—বলে সে টিফির দিকে তাকায়। না টিফি নেই। বোধহয় খন্দের সামলাতে ব্যস্ত।

স্কারমাঙ্গা বলে—দেখ আমাদের এই ব্যবসায় শেয়ার আছে সেটা ঠিক। তবে আমি কয়েকজনের সাথে আলাদা কথা বলে প্রত্যেকের মনোভাব বুঝে নেব। ফলে বাকিরা খেপে যাবে। তোমার কাজ হবে, কেউ কোথাও কোনোরকম গোপন টেপে কিছু শুনেছে কিনা এবং আমার নিতান্ত প্রাইভেট টকিং-এর সময় আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে কেউ কোনোরকম চালাকির চেষ্টা করছে কিনা, সেটা ভালোভাবে লক্ষ রাখা।

বন্ড স্কারমাঙ্গার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলে—তার মানে, তোমার কমপ্লিট সিকিউরিটি?

—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন খুব বাজে কাজ করতে হবে তোমাকে। মাসে হাজার ডলার, তার সাথে থান্ডারবার্ডে বিনা পয়সায় রাজার হালে থাকা।—বিরক্তি প্রকাশ করে স্কারমাঙ্গা।

বন্ডের দুই অধরে, চোখে হাসির ঝিলিক। বন্ড ভাবে, সুযোগটা নিয়েই নেবে সে। আবার তার রাশিফল-এর কথা মনে পড়ে যায়।

স্কারমাঙ্গা বলে—কী হল, ঠোঁটের কোণে হাসির কারণটা কী শুনি?

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলে—না মানে, তোমার মতো সোনার পিস্তলধারী লোকের আবার সিকিউরিটি, তাই হাসি পাচ্ছিল। ঠিক হয়। তো, কখন রওনা হব। বাইরে অবশ্য আমার গাড়ি আছে।

সোনার রিস্টওয়াচ দেখে স্কারমাঙ্গা বলে—ছ'টা বত্রিশ। চল, এবাব যাওয়া যাক।

স্কারমাস্কা মদের দাম মিটিয়ে দিল। বেরোবার আগে বন্ড টিফির দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমির হাসি হেসে স্কারমাস্কার সাথে বেরোতে গিয়ে ঘুরে গিয়ে টিফিকে বলে—আমার খোঁজে কেউ এলে সোজা বলে দেবে থান্ডারবার্ড হোটেল, ব্লাডি বে।—ওরা বেরিয়ে আসে।

স্কারমাস্কা বলে—গাড়িতে ওঠ। তোমার গাড়ি পর্যন্ত তো পৌঁছে দিই।

বন্ড ভাবল, কে জি বি বা গেস্টাপোর মতো যদি ড্রাইভার আর স্কারমাস্কা, দুটোকেই মাথায় গুলি করা যায়। সে তো পিছনের সিটে। না, এখন মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।

॥ সাত ॥

যদিও জ্যামাইকার ম্যাপটা বন্ডের মনে খুব পরিষ্কার ঋ হলেও, প্রায় অনেকটাই বিধেছিল, তথাপি আচমকা একটা হোটেলে এসে বন্ড কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল।

বন্ড এইটুকু জানে, গোয়েন্দাদের নতুন জায়গায় ঢুকতে হলে, তার ঢুকবার এবং বেরোবার সব পথ যতটা সম্ভব দেখে নেওয়া। এবং বন্ড তার সতর্ক দৃষ্টি সে দিকেই রেখেছে।

বিশাল এক লোহার গেটের মধ্যে দিয়ে ঢোকবার সময় সমুদ্রের তটের ওপর তরঙ্গরাশির আছড়ে পড়বার মিউজিক তার কানে এসেছে। চতুর্দিকে ঘেরা পাঁচিলের ওপারের কোনো একদিকে নিশ্চয়ই আখের খেত। আর চাঁদের আলো তৈরি করেছে পাহাড়ের সিল্যুয়েট। তবে পরিপূর্ণ ধারণা হতে বন্ডের সময় লাগবে বোধহয়।

এই অঞ্চলে তার একমাত্র খবরাখবরের সূত্র ধরেই সেই মেয়েটি—টিফি।

যেভাবেই হোক স্কারমাস্কার হোটেলে খবর দিয়ে দিয়েছে। সে কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। হোটেলে পৌঁছোবার কিছু আগেই কয়েকটা গাছের ফাঁক দিয়ে আলো বন্ডের চোখে পড়ল। কিন্তু কোনো বাড়ি বা ঘর দেখা গেল না। বিরাট গাড়িবারান্দা। অফ হোয়াইট আর গোলাপি রঙের কারুকর্ম করা থাষা। ঝকঝক ইউনিফর্ম পরা জ্যামাইকান কর্মচারীরা বেরিয়ে এসে স্কারমাস্কা কে স্যালুট করে তার ও বন্ডের সুটকেস তুলে নিল। বেশ রাজসিক ব্যাপার। ভিতরে দামি ঝাড়লঠন।

এখন খুব সম্ভব স্কারমাস্কা ম্যানেজারের সাথে কথা বলছে। অল্প বয়স ওই ম্যানেজারের। স্কারমাস্কা বলে—তোমার ঘর পশ্চিম দিকে, ২৪ নম্বর। আমার ২০ নম্বর। যখন যা প্রয়োজন, ফোন করলেই পেয়ে যাবে। তোমার সাথে কাল সকাল ১০টায় মিট করছি। দুপুরের মধ্যেই সবাই এসে যাবে। বুঝতে পেরেছ?

বন্ড বলে—পেরেছি। ঠিক আছে। কালকে আমাদের দেখা হচ্ছে।

বন্ড এবার আয়নার মতো চকচকে মার্বেলের ওপর দিয়ে হেঁটে ২০ নম্বর ছাড়িয়ে একটা বাঁক নিয়ে ২৪ নম্বরে আসে। এ. সি. রুম। একদম আধুনিক বন্দোবস্ত। প্রথমেই এ. সি. অফ করে জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরেটা দেখে নিল। সমুদ্র এবং তার কলকল সংগীত। ঘরের মধ্যে জ্যামাইকার বাজারের যে বিরাট ছবিটা রয়েছে, সেটা সন্দেহ জাগায়। টেলিফোনটা দেখল, একটা ছোটো মাইক্রোফোন সেট করা আছে। বন্ড ভাবল, বেশ জোরে জোরে প্রার্থনা করলে কেমন হয় শোবার আগে।

স্নান করে এসে রুম সার্ভিসকে ডেকে ড্রিংকস-এর অর্ডার দিল, সঙ্গে খাবার। বন্ড সুতির আভারওয়ার পরে ড্রিংক করতে করতে তার সব জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে লাগল। সুটকেস খুলে জ্যাক কেনেডির 'প্রোফাইলস ইন কারেজ' বইটা নিয়ে জানলার সামনে এল। কিন্তু মনে তার স্কারমাস্কার চিন্তা।

আচ্ছা, কী করছে এখন স্কারমাস্কা? টেলিফোনে হাভানা বা আমেরিকায় কথা বলছে, নাকি কালকের বিষয়ে কোনো প্ল্যানিং করছে? কালকে যারা আসবে তারা কেমন কে জানে? যে লোকটা উড়ন্ত পাখি প্রায় না দেখেই মারতে পারে, তাকে বন্ড প্রমাণসহ কী করে ধরবে? ওর টাকা কোথায় খাটে? বইটা রেখে বন্ড তার পিস্তলটা নিয়ে সব গুলি বার করে পিস্তলটা একবার ভালো করে চেক করে নিল।

একটু বাদে রাতের খাবার চলে এল। খাবার খেয়ে বন্ড সুটকেসটা দরজার গায়ে রেখে তার ওপর গ্লাস রেখে দিল। সাবধান থাকা ভালো। স্কারমাস্কার কাছে নিশ্চয়ই প্রত্যেক ঘরের আরেকটা করে চাবি আছে। নগ্ন হয়ে বন্ড বিছানা নিল।

বন্ড যতবার ধনুকে তির লাগিয়ে মারতে যাচ্ছে, ততবারই হাত থেকে তিরটা পড়ে যাচ্ছে। বন্ডের চিংকার শুনেও কেউ তাকে সাহায্য করতে আসছে না। স্কারমাস্কা একটা উঁচু জায়গায় ঘোরানো চেয়ারে বসে চুরুট টানতে টানতে মাঝে মাঝে চুরুটটা দিয়ে সামনের সোনার কামানে খোঁচা মারতেই আগুনের গোলা বেরিয়ে দুর্গের মধ্যে এসে পড়ছে। ধীরে ধীরে দুর্গ ভেঙে যাচ্ছে। বন্ড মাটিতে পড়ে যাওয়া তিরটা যেই তুলতে যাবে, অমনি একটা গোলা তার সামনে এসে পড়তেই সে ছিটকে গিয়ে পড়ল। একটা শক্ত কাঠে তার হাতটা লেগেছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে উঠে বসে। এ. সি.-তেও সে যেমে উঠেছে। স্কারমাস্কা, যুদ্ধক্ষেত্র সব অদৃশ্য। দুঃস্বপ্ন। হাতটা লেগেছে তার খাটের কাঠে।

বাথরুমে গিয়ে ভালো করে গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ল। পরদিন বেলা সাতটা নাগাদ ঘুম ভাঙে বন্ডের।

দরজার সামনে থেকে সুটকেস আর গ্লাস সবিয়ে সুইমিং কস্টুম পরে বাইরে বেরোতে গিয়ে একটা শব্দ কানে এল। ঘুরে দেখে স্কারমাস্কা ট্রান্সপালিন টানিয়ে তাতে লাফিয়ে শরীরচর্চা করছে। একটা নিগ্রো তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে। বন্ড কিছু না বলে এগিয়ে গেল। স্কারমাস্কার কথা ভাবতে ভাবতে সে জলে ঝাঁপ দিল।

অনেকক্ষণ সাঁতার কাটার পরে রুমে ফিরে এসে স্নান করে ফ্রেশ হয়ে নিল। ব্রেকফাস্ট বেশি খেল না। পিস্তলটা লোড করে বাইরে বেরিয়ে এল। বন্ড দেখল, হোটেলটা এখনো পুরো তৈরি হয় নি। বাড়ি বসেপটা 'T'-এর মতো। নীচে রেস্টোরাঁ, নাইটক্লাব। ৪০-৫০ জন পুরুষ নারী মিলে বাড়িটার ডেকরেসনে ব্যস্ত। বাইরে দৈত্যাকৃতি 'ব' বাড়ি তৈরির যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। হয়তো আরো পঞ্চাশ লক্ষ ডলার লাগবে পুরো বাড়িটা শেষ করতে এবং জমকালো কবতে। এই অধনির্মিত হোটেলের জন্য অনেকে টাকা ঢালতে রাজি নাও হতে পারে। কিন্তু স্কারমাস্কা স্ফূর্তি এবং মেয়েমানুষ দিয়ে যে ছক কষছে, তাতে রাঘববোয়ালরা চট করে রাজি নাও হতে পারে। মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করবার পর এরা বোধহয় সব ভুলে যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে বন্ড নিজের গাড়িটা পেল নির্জন একটা পার্কিং-এ, বাড়ির পিছনে। পেট্রল দেখে নিয়ে চাবিটা পকেটে রাখল।

বন্ড আরেকটু এগিয়ে গেল। ভিজে ঘাসের গন্ধ। আরেকটু এগোতেই শুরু হল জলা জমি এবং তারপর সরু নদী। তার মানে এই পর্যন্তই জমির সীমানা। ডাক শোনা গেল পোকা, ব্যাঙের। চরছে বুনো হাঁসের দল, পাখি উড়ছে মাথার ওপর। ঝপ— একটা শব্দ শুনে বন্ড তাকায়। দেখে একটা কুমির হাঁ করে জলে ঝাঁপ দিল। তার মানে স্কারমাস্কা কী বন্ডকে ভয় দেখাচ্ছে? মনে মনে হাসে বন্ড। এ জায়গাটা হোটেলের সাথে যদি সাঁজিয়ে গুছিয়ে আকর্ষণীয় করা যায়, তবে একটা ট্যুরিস্ট স্পট জন্মে উঠবে।

আরেক শব্দে বন্ড বাঁ দিকে ফিরল। কিংসটন ব্যান্ডল রিহার্স করছে। ওদিকে ধোপা, চাকরদের ঘর। ঘড়ি দেখে বন্ড পিছু হাঁটতে শুরু করল। স্কারমাঙ্গ তার ম্যানেজারের সাথে কথা বলছিল। বন্ডকে দেখে এগিয়ে এসে সুপ্রভাত জানিয়ে, কনফারেন্স রুমের দিকে নিয়ে যায় তাকে।

রেস্তোরাঁ পেরিয়ে কয়েক গজ গিয়ে যে ঘরটা দেখা গেল, সেটা খাবার ঘর। গ্লাস, প্লেট, জল, ফর্ক—সব সাজানো। বন্ডের চোখে এবার যে ঘরটা পড়ল, সেখানে একটা বিরাট গোল টেবিল, সাতটা চেয়ার, টেবিলের ওপর প্যাড, পেনসিল। লাল কাপেট পাতা ঘরে। দরজার ঠিক উলটোদিকে যে চেয়ারটা আছে, সামনে সাদা রঙের ফোন, স্কারমাঙ্গ সেখানেই বসবে নিশ্চয়ই।

ঘর দেখতে দেখতে বন্ড বলে—আলোর ব্র্যাকেটের মধ্যে হয়তো গোপন ক্যাচার থাকতে পারে, একবার দেখে নিল—

—ওগুলো আমিই রেখেছি। দরকার আছে। শোনো মার্ক, আজ বিকেল চারটের সময় মিটিং আছে। কালকে আরো দুটো। তোমার কাজ হবে—

—সেটা আমি জানি। তবে আজকের মিটিংয়ে যারা আসছেন, তাদের নাম ধাম জেনে রাখা ভালো। বলা যায় না, কোনোরকম ঝামেলা যদি হয়।

কী চিন্তা করে স্কারমাঙ্গ বলে—ঠিক আছে। টুকে নাও।

স্কারমাঙ্গ নাম বলতে থাকে। বন্ড চেয়ারে বসে নাম নোট করতে থাকে—এক, মি. হেনড্রিক্স, ওলন্দাজ। দুই, মি. স্যাম বিনিয়ন, ডেট্রয়েট।

—তার মানে পার্পল গ্যাং-এর লোক।

স্কারমাঙ্গ তীব্র দৃষ্টি নিয়ে বলে—এরা সবাই প্রকৃত ভদ্রলোক। এরা ব্যবসা করিতে আসছেন। স্যাম আর তার বন্ধুরা কোটি কোটি অর্থের মালিক। লেখ। তিন, মায়ামির গ্যাংগেরেলা এন্টারপ্রাইজের মালিক লিবয় গ্যাংগেরেলা। চার, ভেগাসের হোটেল মালিক রুবি রটকফ। পাঁচ, হ্যাল গারকিংকেল, শিকাগো। ছয়, আরিজোনার ফিনিঞ্জ থেকে লুই প্যারাডাইজ। এই লুই যে ঠিক কী চাল চালবে, তা বোঝা মুশকিল।

বন্ড এবার বলে—তা তোমার স্বার্থ কী?

—ক্যারিবিয়ান টাকার?

—কাঁস্ট্রো না বাতিস্তা?

মুখ খিঁচিয়ে স্কারমাঙ্গ বলে—দেখ হে, আমার নিজের কোনো ব্যাপারে তোমার যেন উৎসাহ বেশি না দেখি।—বলে গটমট করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

লিস্টের দিকে চোখ বুলিয়ে বন্ড ভাবে—মিস্টার হেনড্রিক্স, যিনি ইউরোপীয় স্বার্থের জন্য আসছেন। তাছাড়া সব নামের মধ্যে কোনো না কোনো অপরাধের গন্ধ পাচ্ছে সে। বন্ড প্যাড থেকে লেখা পাতাগুলি সব ছিঁড়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

এই গরমে মোটা সুট পরে গলদর্শন হয়ে এক ব্যক্তির প্রবেশ। দেখে মনে হয় জার্মানির ডেস্টিস্ট কিংবা কোনো ব্যাংকের ম্যানেজার বা হিরের কারবারি। লোকটা বলে—আমি হেনড্রিক্স। আজ এখানে...

॥ আট ॥

নামের তালিকা দেখে বন্ড ঠিকই আন্দাজ করেছিল। যারা আজকের অতিথি, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই সাড়ে পাঁচ ফুট, কঠিন চোখ। গাত্রবর্ণ ময়লা। তার মানে চেহারার মধ্যে শয়তানি

আছে। স্কারমাঙ্গাকে কেউ পিস্তল, কেউ মি. এস বলে সম্বোধন করছিল। একটা ব্যাপাবঃ বেযারারা এলে অতিথিরা কেউ কিন্তু নিজেদের সুটকেস হাতছাড়া করল না। লিস্ট দেখে বন্ড প্রত্যেকের চেহারার বর্ণনা লিখে নিল।

বন্ড কী লিখছে সেটা স্কারমাঙ্গা দেখতে চাইল। লেখাটা দেখে নিয়ে বলে—ভালোই। তবে হেনড্রিক্স বাদে সবাইই আর্মস আছে। বিদেশে সবাই সাবধান হয়ে চলতে চায়।

—তাই বলে পিস্তল কেন? আমি যতদূর জানি, দেড়শো বছর আগে রেডকোটরা স্থানীয় লোকদের ভয় করে চলত। কিন্তু এখন তো সেবকম কোনো ব্যাপার নেই।

স্কারমাঙ্গা বন্ডের কথায় অবাক হয়। বলে—বাদ দাও। শোনো, ঠিক বারোটায় বারে আসবে। তোমার পরিচয় তুমি আমার পি.এ.। মানে।

--পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট।

দেঁতো হাসি হেসে স্কারমাঙ্গা বলে—বা বা, ঠিক ধরেছ।

বন্ড ওখান থেকে চলে এসে ভাবতে লাগল, স্কারমাঙ্গাকে সে যতই খোঁচা মারুক, চট করে সে নিজেকে প্রকাশ করবে না। অথচ ওকে দিয়েই ওর রূপটা খোলাতে হবে। যদি রেগে গিয়ে স্কারমাঙ্গা তার পিস্তল বার কবে বসে এবং তখন যদি সাক্ষী হিসেবে কেউ থাকে, তাতে বন্ডেবই সুবিধা। কেননা, বন্ড স্কারমাঙ্গাকে তার সম্মানে যা দিয়েছে।

ঘরে এসে বন্ড তার স্বভাবজনিত গন্ধ দিয়ে বুঝতে পারল, কেউ তার ঘরে ঢুকেছিল এবং বিশেষ করে তার সেফটি রেজার ঘুবিয়ে দেখেছে। যেটার মধ্যে বিশেষ কায়দায় গোপন কিছু রাখা যায়। এবং আগন্তুক বেশ পাকা মাল। মামুলি কয়েকটা জিনিস, যেমন, টুথপেস্ট, সুটকেস—এইসবে হাত দেয় নি সে। জামাইকান চাকরদের পাকাপোস্ত কাজ নয় এটা।

যাক, তাহলে তাকে যুদ্ধের জন্য এরাই তৈরি হতে বলল। যদি সে ২০ নম্বরে ঢুকতে পারে, তবে স্কারমাঙ্গার প্রেরিত গুপ্তচর-এর থেকেও সে ভালো কাজ করতে পারবে। অথচ, পরিষ্কার কাজ। ততক্ষণে হয় সে ঘুমোচ্ছে, নয় অন্য কোনো আনন্দে মশগুল।

সেই আমলের নিয়মানুযায়ী ক-ফার্মেপ ক্রম লন্ডনের বার-এর কায়দায় তৈরি। চেয়ার আর বেঞ্চে ফোম বা রবারের গদির ওপর লাল চামড়া দিয়ে আটকানো। ঘরের দেওয়ালে রাজকীয় নিদর্শন বিবিধ—তামা, পিতলের শিঙ্গা, বন্দুক প্রভৃতি। সেকালের লোকের বদলে একালের কয়েকটা পাকা শয়তান বিয়ারের বদলে শ্যাম্পেন খাচ্ছে সূক্ষ্ম নকশা করা পাত্রে। স্কারমাঙ্গা দাঁড়িয়ে থাকছে কিংবা হাঁটতে হাঁটতে এক হাতে শ্যাম্পেনের পাত্রটা নিয়ে অন্য হাতে সোনার পিস্তলটা মাঝেমাঝে নাচাচ্ছে।

বন্ড ঢুকতেই স্কারমাঙ্গা এক কৃত্রিম আবেগে বন্ডের কাঁধে হাত রেখে সবার কাছে বন্ডের পরিচয় দিল। উপস্থিত শয়তান অতিথিবৃন্দ বিবস হাসি হেসে বন্ডের সাথে হ্যান্ডশেক করল। বোধহয় ইংল্যান্ডের লোক বলেই হয়তো। বন্ডও সবার দেখভাল করতে লেগে গেল। একমাত্র হেনড্রিক্স শ্যাম্পেন পান করছিল না। বন্ড নিল 'পিস্ক জিন'। সকলের সাথে বিভিন্ন কথা বলে প্রত্যেকের গলার স্বর এবং আদব-কায়দা ভালোরকম দেখে নিচ্ছিল।

এবার হেনড্রিক্সের কাছে এসে বন্ড বলে—আমরা দুজনেই তাহলে ইউরোপীয়ান। আপনি হল্যান্ডের। ওখানে গেছি। কিন্তু এত সুন্দর জায়গাতে ঠিক থাকা হয় নি। তা হল্যান্ডে কোথায় থাকেন আপনি?

-- হেগ।

— দারুণ জায়গা। তা জ্যামাইকায় কী প্রথম আসা হল?

— না।

বন্দ বলে—আপনার সাথে মিলিত হয়ে খুব ভালো লাগছে।

হেনড্রিক্স বলে—থ্যাঙ্ক ইউ।—অনেকটা মধ্য ইউরোপীয় উচ্চারণ। হেনড্রিক্স এবার বলে—
আপনি কি ইংল্যান্ড থেকেই আসছেন?

— হ্যাঁ। আপনি কখনো গেছেন সেখানে?

— গেছি। গেলে বিভিন্ন বন্ধুদের কাছেই থাকি?

— হ্যাঁ, অনেক সুবিধা হয় তাতে। হোটেলে থাকা ঠিক পোষায় না।

— আমার তো সেরকম মনে হয় নি। তবে—বলেই হেনড্রিক্স আর কথা না বাড়িয়ে সরে
গেল স্কারমাস্কার কাছে। ওকে কী যেন বলতেই পিস্তল নাচানো বন্ধ করে স্কারমাস্কা হেনড্রিক্সকে
ঘরের একপাশে সরে গেল। বন্দ সব বুঝে অন্যদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে গেল। কিন্তু
আড়চোখে সে ওদেরকে লক্ষ করে যাচ্ছিল। বন্দ ভাবতে থাকে, স্কারমাস্কা কে? মাফিয়া না কে জি
বি-র প্রতিনিধি? আর হেনড্রিক্স?

নাম-আঁটা চেয়ারে বসে এবার খাবার পালা। খেতে খেতে রুলেত খেলার বাজি ধরা নিয়ে
প্রসঙ্গ তুলল বন্দ।

একসময় ভেগাসের হোটেল মালিক রুবি রটকফ বলেই ফেলে—তিনবছর হয়ে গেল, এখনো
হোটেল শেষ হল না। এইরকম একটা নীরস জায়গায় ইনভেস্টমেন্টের কোনো মানেই হয় না।
দ্বিতীয় বারেও মর্টগেজ শেষ। এবার যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করেন, কেন অপেক্ষা কী করা যায়
না, বা—

কখনো চিৎকাব, কখনো বা ধীরে ধীরে স্কারমাস্কার হোটেলের ওপব জোর আলোচনা চলতে
লাগল। স্কারমাস্কা কিন্তু চুপচাপ শুনেই যেতে লাগল। হেনড্রিক্স তার ব্যক্তিত্ব সামলাতেই ব্যস্ত। তাহলে
স্কারমাস্কার মতলবটা কী? অতিথিদের গরম করা কথাবার্তার তেমন কোনো উত্তর পর্যন্ত দিল না
সে।

দ্বিপ্রাহরিক ভোজন পর্ব শেষ হলে স্কারমাস্কার অতিথিরা একে একে যে যার ঘরে ঢুকে গেল।
ওরা থাকছে পূর্বদিক ঘেঁষা ঘরগুলোতে। যদিও বন্ডের ঘরে এ. সি., তবুও বন্দ হোটেলের পিছনদিকে
গেল। এখানে সমুদ্রের হাওয়াটা বেশ ভালোই লাগছে। ওখানে কয়েকটা কাঁকড়া চোখে পড়ল
তার।

বন্দ এখন ঘরে বিছানায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল মেরি গুডনাইটের কথা। কল্পনায় সে দেখতে
পেল, মেরির নগ্ন বুকে মুখ গুঁজে সে রয়েছে। মেরি তাকে দু'বাহু বন্ধনে আবেশে ডুবিয়ে রেখেছে।
আচমকা স্বপ্নভঙ্গ। দেওয়াল ঘড়ি জানাল—তিনটে কুড়ি। সে উঠে আরেক প্রস্থ স্নান করে
রেডি হয়ে বেরোবে মনস্থির করল। চারটের সময় কনফারেন্স। দরজায় মৃদু টোকা।

জেমস দরজা খুলল, মিষ্টি চেহারার ম্যানেজার।

বন্দ বলে—ইয়েস।

ম্যানেজার বলে—আমার সহকারী মি. ট্রেভিস আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। এফ্ফুনি,
আর্জেন্ট।

—কিন্তু আমাকে তো এফ্ফুনিই কনফারেন্সে চলে যেতে হবে।

—কিন্তু মি. ট্রেভিস আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

বন্দ কিছু বলতে যেতেই ম্যানেজারের চোখের দিকে তাকিয়ে তার চাহনির ভাষা বুঝে ফেলল। ইস, কী ভুলই না সে করে ফেলছিল। চিনতে অসুবিধা হল দুই গুপ্তচরদের নিজেকে।

—আসুন।—বন্দ ম্যানেজারের পিছন পিছন গেল একটা ঘরের ডেস্কের সামনে। সেখানে একটা দরজা খুলে গেল। চমকে গেল বন্দ।

বলে—তুমি এখানে লিটার?

মাথা নীচু করে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে,

—আমি মি. ট্রেভিস। দয়া করে আপনার আঙুল তুলে পরিচয়টা প্রকাশ করবেন কি? আপাতত এই থান্ডারবার্ড হোটেল মরগ্যান গ্যারান্টি ট্রাস্টের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। তা মি. মার্ক হাজার্ড?

॥ নয় ॥

আনন্দে ফেলিক্স লিটারকে জড়িয়ে ধরতে যেতেই একটা পায়ের শব্দ পেয়ে বন্দ মুহূর্তের মধ্যে সরে গিয়ে ডেস্ক থেকে একটা পত্রিকা তুলে দেখতে লাগল।

মি. লিবয় গ্যাংগেরেলা অফ মিয়ামি।

বন্দ বলে ওঠে—গুড আফটারনুন মি. গ্যাংগেরেলা। কোনো প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না। লিটারকে চোখ মেরে বন্দ কনফারেন্স রুমের দিকে হাঁটা দিল।

কনফারেন্স রুমের দরজার মুখে স্কারমাস্টা দাঁড়িয়ে। বন্দকে দেখে বলে — সাবধান মি. মার্ক। কেউ যেন না ঢোকে। এমনকি একটা পোকাও না।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বন্দ হলঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে বেরোবার দরজাটাও বন্ধ করে দেয়। তারপর দরজার সামনে একটা টেবিলে বসে খুব কায়দা করে সে দরজাটা সামান্য ফাঁক করে শ্যাম্পেন নিয়ে বসে। বক্স-এ গলা শোনা যাচ্ছে।

হেনড্রিক্স বলছে—আমি ইউরোপে আমার বসদের কাছে এই বিষয়টা—কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তার মধ্যেই বন্দ সরে গিয়ে বাইরে বেরোবার দরজার সামনে বসে শ্যাম্পেন খেতে লাগল। হাতে তার একটা ম্যাগাজিন। বন্দ জানত, স্কারমাস্টা দরজা খুলবেই।

বন্দ চট করে উঠে দাঁড়ায়। দরজা খুলে স্কারমাস্টা বলে—সব ঠিক আছে তো?

—তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। অন্তত এই মার্ক যতক্ষণ আছে!

দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বন্দ দরজার কাছে গিয়ে কান পাতে।

আবার হেনড্রিক্স বলছে—গোপনসূত্রে জানা গেছে, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস-এর জেমস বন্দ নামে একজন চেয়ারম্যানের খোঁজে এসেছে। মি. স্কারমাস্টা, আপনি কিছু শুনেছেন?

—ও ব্যাটার চেহারাটা আমি জানি না। তবে এসব নসিয়া নিয়ে আমার তেমন কোনো অসুবিধা নেই। তবে রস নামে একজনকে ত্রিনিদাদের লা ত্রিগাতে আলকাতরার সমুদ্রে ফেলে দিয়েছি। হ্যাঁ, তারপর মি. হেনড্রিক্স।

হেনড্রিক্স বলে—আমাদের আখ সাফোটাভের ব্যাপারে দল কী ঠিক করল? ছ'মাস আগে হাভানার মিটিং-এ ফিদেল কাস্ত্রোকে কিছু সুবিধা পেলে সাহায্য করব, এটা ঠিক হয়েছিল। আখ খেতের ক্ষতি হলে চিনির দর আমরা বাড়াব। জ্যামাইকা এবং ত্রিনিদাদে অনেকবার আগুন লাগার খবর আছে। আমি শুনেছি, মি. গ্যাংগেরেলা, মি. রটকফ, মি. বিনিয়ন আর আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব নাকি নিজেদের লাভের জন্য প্রচুর চিনি মজুত করেছেন?

মি. গ্যাংগেরেলা চিৎকার করে ওঠে—আমি তো এতে কোনোরকম অন্যায় কিছু দেখি না। লাভের জন্যই তো দল গড়া। এটা কী কেউ জানে, চিনির বদলে রাশিয়া কিউবাকে অন্য মালের সাথে ক্ষেপণাস্ত্রও বেচেছে এবং তা আমাদেরকে মারবার জন্য? আচ্ছা মি. হেনড্রিক্স, ওপরওয়ালাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই ক্রেমলিনের বাসিন্দা। তাই তো? আর কোনো বড়ো মাথা চিনির দাম কমাতে আগ্রহী?

—আস্তে আস্তে বন্ধুগণ। উত্তেজিত হবেন না কেউ।—স্কারমাস্টা সবাইকে অনুরোধ করে। সে বলে—আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, মিলিতভাবে দল তৈরি করে চিনির ব্যবসায়ে বেশি পরিমাণে অর্থ উপার্জন করা। এবং এই ব্যবসায় আমাদের টাকা ঢালতে হবে। শুনুন সবাই, ওয়াশিংটনের কৃষি বিভাগ এটা ভালো করেই জানে যে, যতক্ষণ না চিনির দাম শতকরা দশ ভাগ বাড়ছে, ততক্ষণ নিউইয়র্ক ও আমেরিকার বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজ থেকে এক দানা চিনিও খালাস হবে না। ফলে গুড়ের দামও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড়ো ব্যবসায়ীরা চাইছে, দাম বাড়বার আগেই চিনি নেমে যাক। আবার চিনি খালাস না হলে খরচাও বেড়ে যাবে। তাই চিনি ছেড়ে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে করি। আবার আমার এই হোটেলের ব্যবসাতেও কোনো লোকসানের আশঙ্কা নেই।

মি. বিনিয়ন বলে—তাহলে আমরা কী লোকসান দিয়ে চলব?

স্কারমাস্টা বলে—দেখুন, ব্যবসায় সবসময় চড়া লাভের আশা করাটা ভুল। তবে সেটা বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হবে। রাস্তাকারি বলে যে গাঁজাখোর, অসামাজিক দলটা আছে, ওরা খেতে আগুন লাগাবে। বরং ওপরওয়ালাদের এই খবরটা জানিয়ে দিন। সুযোগ তো হাতে রইলই দাম বাড়বার।

মি. হেনড্রিক্স বলে—বেশ জানিয়ে দেব। কিন্তু আপনার হোটেল সম্বন্ধে এবার খুলে বলুন দেখি।

স্কারমাস্টা তার হোটেল বৃত্তান্ত শুরু করল। বন্ড-এর এই বিষয়টা খুব একটা উৎসাহ লাগছিল না। লিটার যদিও সব রেকর্ড করছে। তবে এটা ধরা গেল, হেনড্রিক্স কে জি বি-র এজেন্ট। ওর বাস যদিও হেগ-এ, কিন্তু ওর কর্মক্ষেত্র হাভানা ও ক্যারিবিয়ান-এ। জ্যামাইকা সম্বন্ধে জানে বলে, সি আই এ লিটারকে দায়িত্ব দিয়েছে। এফ বি আই হয়তো নিজেই দায়িত্ব নিত, কিন্তু গ্যাংগেরেলা তো একজন মাফিয়া।

ভিতরে কখনো জোরে, কখনো চাপা স্বরে কথাবার্তা চলছে।

বন্ড কয়েক পা পিছিয়ে আসে। সে ভাবতে থাকে, এই প্রথম কে জি বি আর মাফিয়া যে একসঙ্গে কাজ করছে, তা সত্যিই ভয়ের ব্যাপার। প্রয়োজনে খুনও করা যেতে পারে। তবে ইলেকট্রনিক্স এক্সপার্ট নিকলসন কনফারেন্স রুমের তার খুঁজে বার করে নিজের টেপ রেকর্ডারের সাথে জয়েন করে নিয়েছে।

বন্ড, লিটার আর ঐ সহকারী ঠিক করে নিয়েছিল তারা প্রত্যেকে অপরিচিতভাবেই থাকবে এবং একটা ভাঙা বাথরুমকে চিঠি আদানপ্রদানের গোপন জায়গা হিসেবে ব্যবহার করবে। নিকলসনের কাছ থেকে প্রত্যেক ঘরের চাবি নিয়ে জলদি চলে এসেছিল, কেননা, তখন কনফারেন্স প্রায় শেষ হবার মুখে। লিটার তার ডান হাতটি খোয়ালেও বাঁ হাত কিন্তু কম যায় না। লিটারের ডান হাতের হুকটাও প্রয়োজনে মারাত্মক হয়ে ওঠে শত্রুর কাছে।

বন্ড আবার কান পাতে কনফারেন্স রুমের দরজায়।

স্কারমাঙ্গা বলছে—তাহলে এখন আমাদের দরকার এক কোটি টাকা। একটা হ্যান্ডনোট দিয়ে টাকাটা তোলা হবে। এই টাকাটা আপনারা ধার হিসেবে দিচ্ছেন। বছরে টেন পারসেন্ট সুদ। শোধ করা হবে দশ বছরে।

রুবি রটকফ টেঁচিয়ে ওঠে—ইয়ার্কি নাকি? এক বছর আগে আমি আর বন্ধুরা মিলে যে সেভেন পারসেন্ট দিলাম সেটার ত্রা কোনো গতি হল না। ভেগাসে ফিরে গিয়ে আমি তো মার খাব বন্ধুদের কাছে।

আবার চিৎকার চ্যাঁচামেচি এই টাকা এবং বিনিয়োগ নিয়ে।

কয়েক মিনিট বাদে শোনা গেল একটা শব্দ ও আর্তনাদ।

স্কারমাঙ্গা বলে—ঠিক আছে। তাহলে আপনারা আর দেরি করবেন না। যত তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ করা যায়, ততই মঙ্গল সবার পক্ষে। হ্যাঁ, রুবি রটকফ মহাশয় ভেগাসে ফিরে গেছেন। তাকে এখন পৌঁছে দেবে নদীর কুমির বন্ধুরা। আপনারা আমার সাথে যদি হাত লাগান—

প্যারাডাইজ ভীতস্বরে বলে—আমি ক্যাথলিক, আমাকে বাদ দিন। হেনড্রিকস বলে—নো প্রবলেম। আমি সাহায্য করছি। ভালো কথা, বাইরে যে ইংরেজ ব্যাটা রয়েছে, ওর কী হবে? ও তো গুলির শব্দ শুনেছে। ও যদি সব বানচাল করে দেয়। তবে তো—

—ওর চিন্তা আমার। যেখানে মেয়েমানুষ থাকে এবং স্মৃতি চলে, ওকে সেখান থেকে এনেছি। ও যদি জেমস বন্ড-ও হয়ে থাকে, আপনাদের তাতে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি না হয় ওকে কুমিরদের কাছেই দিয়ে দেব ওকে। ইংরেজদের আমি সহ্য করতে পারি না। ভীষণ নাক উঁচু ওদের। ধরে নিন, ওর ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

মনে মনে হেসে বন্ড বাইরে বেরোবার দরজাটার সামনে শ্যাম্পেন হাতে চোখ বুজে বসে থাকে।

দরজা খুলে স্কারমাঙ্গা তার সরু গৌঁফে হাত বুঁলিয়ে বলে—এই যে মি. মার্ক হাজার্ড, ঘুমোচ্ছ নাকি? শোনো, ম্যানেজারকে বল গিয়ে আমার এই কনফারেন্স রুমের একটা তার ছিঁড়ে গেছে। ঘরটা এখন বন্ধ থাকবে। কেউ যেন না ঢোকে। আর মি. রটকফ আজকেই ভেগাস চলে যাবেন। আর রাত্রে খানাপিনার বন্দোবস্ত করে রাখতে। মেয়েরা আসবে, নাচ গান হবে।

মাথা ঝুঁকিয়ে বন্ড বলে—তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। এ ঘরে কেউ ঢুকবে না।— বলে বন্ড চলে যায়।

স্কারমাঙ্গা মনে মনে হাসে। পিছন ফিরে কনফারেন্স রুমের দিকে একবার তাকায়।

চেয়ারে রুবি রটকফের মৃতদেহটা পড়ে আছে।

॥ দশ ॥

হোটেলের পিছনে নিকলসন, লিটার আর বন্ড মিলিত হয়েছিল। যা রেকর্ড করা গেছে তাতে স্কারমাঙ্গা, হেনড্রিক্স আর দলে আসা গারফিংকেল—এই তিনজনকেই ফাঁসি দেওয়ার মতো তথ্য আছে। তাছাড়া বন্ডও সাক্ষী আছে নিজে। রটকফের বডি পাচার করবার সময় হাতেনাতে ধরতে হবে। কিন্তু স্কারমাঙ্গার বক্তব্য শুনে লিটার বন্ডকে সবসময় পিস্তল নিয়ে থাকতে বলে। ঘরে ফিরে গিয়ে বন্ড বিছানায় শুয়ে পড়ল। রাত আটটায় ডিনার। জম্পেশ ডিনারের সাথে মদও ছিল বেশ জম্পেশ।

স্কারমাঙ্গার কথানুযায়ী বন্ডের সাথে সবাই দায়সারা গোছের কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

যে ঘরে ডিনারের ব্যবস্থা হয়েছিল, সে ঘরটা কমলালেবু, নারকেল, কলার ঝাড়, টব আর নানান আলো দিয়ে সাজিয়ে নাচের আসর তৈরি করা হচ্ছিল। নাচের জন্য স্টেজ এবং যারা ব্যান্ড বাজাবে, সেই জায়গা দুটোও। নাচ হবে দেখে বন্ড সবাইকে নিয়ে মেতে উঠল। কিন্তু যে ইংরেজটার ব্যবস্থা স্বয়ং স্কারমাঙ্গাই করবেন, তাই বন্ডকে তেমন বিশেষ পাত্তা দিতে চাইল না কেউ।

বন্ড দুম করে স্কারমাঙ্গাকে বলে—মাথা ধরেছে, শুতে যাচ্ছি।

—ধরবে না। অত মদ খেলে কী হয়। থাক থাক এখানে, এখুনি সব মেয়েগুলি নাচতে আসবে। ওদের নাচ দেখলে দেখবে, সব ব্যথা হাওয়া।

বোকার হাসি দেখিয়ে বন্ড বলে—তাই বুঝি। তবে থাকি।

বাজনা শুরু হল। বাজনার তালে তালে নকল আনারঙ্গের টুপি পরা একটা মেয়ে এসে কিছু অশ্লীল কথা আছে, এরকম গান ধরল।

বন্ডের মাতলামো দেখে স্কারমাঙ্গা বলে—এই জ্যামাইকা বিশেষজ্ঞ, ওইরকম মাতলামো না করে তোমার ইংরেজিয়ানা দেখিয়ে জমাও দেখি। দেখি তুমি কত বড়ো ওস্তাদ।

সবার মাঝে বন্ড বলে ওঠে—তাহলে ফেল একশো ডলার আর তোমার পিস্তলটা।

—মানে?—চমকে ওঠে স্কারমাঙ্গা।

কে যেন বলে—দিয়েই দিন না। দেখি ইংরেজ ব্যাটার দৌড় কতটা।

বন্ড স্কারমাঙ্গার সোনার পিস্তলটা নিয়ে একটা সার্চ লাইটের সামনে ধরে দেখবার নাম করে গুলি ভর্তি আছে কিনা দেখে নেয়। তারপর নকল আনারঙ্গের টুপিটার দিকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টেপে।

কিছুক্ষণের জন্য হই চই পড়ে যায়। মেয়েটা দৌড়ে পালাতে যায়। বন্ড তাকে ধরে ফেলে সবার সামনেই জামার দুটো বোতাম খুলে বুকের মধ্যে একশো ডলার গুঁজে দিয়ে বলে—ভয় পেয়ো না। এবারে আরেকটু অল্প পোশাক পরে এস। জমবে ভালো।—বলে মেয়েটির পাছায় বার দুই চাপড় দেয়।

বন্ড এবার ব্যান্ড মাস্টার কিং টাইগারের কাছে এসে বলে—শোন হে কিং, ওরকম ম্যাডমেডে মিউজিক বাজিও না। মেয়েদের সামান্য ঢেকে আসতে বল। আর বেশ গা গরম করা সুর বাজাও। মেয়েদের গানে যেন গালাগালি থাকে। ড্যান্স শেষে কোনো কাপড় থাকবে না কোনো মেয়ের গায়ে। কী বুঝেছ?

চোক গিলে ভয়ে ভয়ে বলে কিং টাইগার—বুঝেছি স্যার।

বন্ড বলে—আমি রাম দিতে বলছি। চাও তো গাঁজাও খেতে পার তোমরা।

স্কারমাঙ্গা এগিয়ে এসে বলে—হবে নাকি একদিন কুড়ি পা দূর থেকে? দেখব কত বড়ো বাহাদুর ইংরেজ তুমি।

বন্ড পিস্তলটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে—হলে মন্দ হয় না। তার আগে তোমার—

বাজনা শুরু হয়ে গেল। চারটে মোটা মতন মেয়ে এসে, গায়ে কিছু নেই বললেই চলে, অশ্লীল ভঙ্গিতে নাচ শুরু করে দিল। ওদের নাচ শেষ হতেই স্টেজ অন্ধকার। বাজনা চলছে।

এবার স্টেজের মাঝখানে আলো জ্বলতেই দেখা যায় নারকেল মাথা সর্বাঙ্গে, একটি মেয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নাচতে শুরু করল। সবাই উত্তেজিত।

নগ্ন মেয়েটিকে পাবার বাসনা কেউ ত্যাগ করতে পারছে না। বন্ডের মনে হল, মেয়েটির শরীরে চিনা রক্ত বইছে। আদিরসাত্মক এই নাচ দেখলে সাধুও নড়েচড়ে বসবেন। আর এখানে তো সব---

আলো নিভে গেল। মেয়েটি চলে গেল। আবার আলো। স্কাবমাস্কা ব্যান্ড মাস্টাবকে ডেকে ডলার গুঁজে দিল। বন্ড বুঝল, রাতে মেয়েটিকে সেবা করতে হবে।

এবারে স্টেজে সব মেয়েরা এসে নাচতে লাগল। সঙ্গীর অভাবে মেবেল আর পার্ল যখন উশখুশ করছিল, বন্ড এগিয়ে গেল। তাদের শ্যাম্পেন দিল। বাকিরা মেয়েদের যেভাবে জড়িয়ে ধরেছে, দেখে মনে হচ্ছে, ওরা বোধহয় এখনিই মেয়েদেরকে পেয়ে গেছে।

বন্ড বাথরুমে যাবার নাম করে পালালেও হেনড্রিক্স কিন্তু ওর চলে যাওয়াটা লক্ষ করল এবং বন্ড সেটা বুঝতেও পারল।

বন্ডের ঘুম ভেঙে গেল। রাত সাড়ে তিনটে। টক টক শব্দ। বন্ড পিস্তলটা নিয়ে নিল। পর্দার পিছনে জানলার কাছে গিয়ে সে পর্দাটা সরাতেই মেরি গুডনাইট বলে—আমাকে শিগগির টেনে তোল।

কোনোমতে জেমস ওকে টেনে তুলল। টেনে নিয়ে ওকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে শাওয়ারটা খুলে দিল। হঠাৎ খেয়াল হল, সে নিজে নগ্ন। চট করে টাওয়েল জড়িয়ে নিয়ে বন্ড বলে—ব্যাপারটা কী বল তো?

মেবি গুডনাইট বলে—তোমাকে পাগলের মতো খুঁজছি। শেষে ওই টিফি বলে মেয়েটার কাছে তোমার সব খবর পেলাম। এখানে এসে জানলা খোলা দেখে ঠিক আইডিয়াই করেছি। যাক শোন, গত সন্ধ্যায় খবর এসেছে, কে জি বি-র একজন বড়োকর্তা হেনড্রিক্স নাম ভাঁড়িয়ে এসে উঠেছে। হেড কোয়ার্টার মনে কবছে, তুমি এখন হাভানায়। হেনড্রিক্স তোমাকে শেষ করতে এসেছে।

বন্ড গুডনাইটকে কাছে টেনে ওর উদ্ধত বুকের স্পর্শ নিয়ে বলে—তুমি হেড কোয়ার্টারকে জানিয়ে দিতে পাব, হেনড্রিক্স এখানেই আছে। আর ওর সঙ্গে মদতদাতা হিসেবে আছে বন্দুকবাজ এক খুনি, স্কাবমাস্কা। তবে হেনড্রিক্স আমাকে এখনো চিনতে পারে নি।

গুডনাইট এবার আকুল হয়ে বলে—যে কোনো সময়ে হেনড্রিক্স তোমার চেহারার বর্ণনার খবর পেয়ে যেতে পারে। তাই তুমি একটু সাবধানে থাকবে।

বন্ড মেরিকে চুমু দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে ফেলিক্স লিটার আর নিকলসনের সহযোগিতার কথা সব খুলে বলে।

বন্ড এবার বলে—এবাব তুমি কেটে পড় মেরি। আমাদের ভাগাটা আজ খারাপ। নইলে আজকের রাতটা—

—সত্যিই ভাগ্যটা খারাপ। নইলে এমন নির্জন রাতে—যাকগে, দুজনে এখন হাত তুলে এগিয়ে এসো তো আমার বন্ধুরা।—খুব আদর মাখানো স্বরে কে যেন বলল।

—কে ওখানে?—বন্ড প্রশ্ন করে।

ঘরের আলো জ্বলে ওঠে।

॥ এগারো ॥

হাতে উদ্যত পিস্তল, বগলে খাপ, পবনে শুধু একটা শর্টস। চবিত্রটি হল স্কারমাস্কা। স্কারমাস্কার দৃষ্টি নিবন্ধ ওদের দিকে, ট্রিগাবে আঙুলটা যে কোনো মুহূর্তে চাপ দিলে কুমিরের আরও কপাল ফুলবে।

বন্ড ভাবে, ঢুকল কী করে এখানে ও? একটা আলমারির পিছন অংশটা বলে দিল পাশের ঘরে দবজা আব এই ঘব থেকে দেখলে মনে হবে একটা সাধারণ আলমারি।

অভিনয় শুরু করে বন্দ—তুমি তো আচ্ছ। বেরসিক হে। কিংসটনে এই মহিলা ব্রিটিশ হাইকমিশনের ক্লার্ক। আমার বাগদত্তা। আমার মা লন্ডনে ভীষণ অসুস্থ। তাই ইনি খবর দিতে এসেছেন। নাম মেবি গুডনাইট।

মেরি গুডনাইটের দিকে তাকিয়ে বলে—হাত নামিয়ে দাও। স্কারমাসা ভেবেছিল কোনো ডাকাতি বোধহয় আমাকে খুন করতে এসেছে। যাক, এখন কোনো ভয় নেই। তুমি বরং—

বন্দ থেকে যায়। স্কারমাসার হাতে তখনও পিস্তল। সেই দিকে তাকিয়ে বন্দ বলে—আচ্ছা, ও যদি আজ রান্দিরটা এখানেই থেকে যায়।

গুডনাইট ততক্ষণে হাত নামিয়ে ব্যাগ থেকে চিরুনি বার করে তার চুল আঁচড়াচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে ওঠে—না না, তা কোনোমতেই সম্ভব নয়। কাল প্রধানমন্ত্রী আসছেন লাঞ্চে। স্যার আলেকজান্ডার বসতামাটে। ফুল দিয়ে সবকিছু সাজানোর ভার আমাকে দিয়েছেন হাইকমিশনার।

এবার মিস্তি করে মনভোলানো হাসি হেসে মেরি বলে—পার্টিতে প্রথমে তেরো জন ছিল। আমি গেলে চোদ্দোজন হবে। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। বন্ডের দিকে তাকিয়ে, নাম না উচ্চারণ করে বন্ডকে দেখিয়ে গুডনাইট বলে—উনি আমাকে গাডিতে তুলে দিলেই হবে।—বলে হ্যান্ডশেক করবার জন্য এগিয়ে আসে।

স্কারমাসা গম্ভীরস্বরে বলে—একদম এগোবার চেষ্টা করবেন না। আপনি যেখান দিয়ে এসেছিলেন, সেখান দিয়েই নেমে যান। আর মার্ক উনি জানলা দিয়ে নেমে গেলে তারপর তোমাব সঙ্গে কথা আছে।

গুডনাইট কিছুটা ন্যাকাসুবে বলে—ঠিক আছে মিস্টার। আমি তাহলে আপনার কথা বড়োকর্তাকে জানিয়ে দেব। আর জ্যামাইকা সরকারকেও—

বের্ফাস কিছু বলে ফেলে, এই ভয়ে বন্দ বলে—তার দরকার নেই। তুমি শুধু মাকে জানিয়ে দাও যে, এদিককার কাজ শেষ হলেই আমি ফোন করে জানিয়ে দেব।

গুডনাইটকে জানলা দিয়ে নামিয়ে দিয়ে বিছানায় বসতেই বন্ডের পায়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া তার পিস্তলটা পায়ে ঠেকে। ওদিকে স্কারমাসা পিস্তল খাপে ভরে বলে—হাইকমিশনারের অফিস। গুপ্তচরদেব ডেবাও তো ওটাই। তা তুমি জেমস বন্দ নও তো? লোকটা নাকি এদিকেই এসেছে আমার খোঁজে।

বন্দ দারুণ জোরে হেসে ওঠে। বলে—যদি হতাম, তাহলে তোমাকে সাভানা লা মারেই বুঝে নিতাম। আচ্ছা, বন্ডের কী লাভ আছে তোমার পিছু নিয়ে?—হয়তো আমার কাছে গুলি চালানো শিখে পাকা খেলোয়াড় হতে চায়। আচ্ছা, মেয়েটাকে বাথরুমে নিয়ে শাওয়ার খুলে দিয়েছিলে কেন? এ তো পাকা বদমাইশদের কাজ। আর তোমরা তো সেইভাবে স্নান কর নি?

-- তা তুমি তার আগেই তো ঘরে ঢুকে রসভঙ্গ করে দিলে। তাহলে আমি বলি, তুমি ওই চিনে ছুরিটার সঙ্গে কী করছিলে? তাস খেলছিলে না নিশ্চয়ই? দেখ লেবার রিলেশনস-এর ফ্রান্সিসকো স্কারমাসা, তুমি যদি সবসময় পিস্তল উঁচিয়ে ভেবে থাক যে, তোমার ইচ্ছেমতো আমি চলব, তা হবে না। আমার কাজ যদি অপছন্দ হয়, তবে হাজার ডলার দিয়ে দাও, এই বেলা আমি কেটে পড়ি।

স্থির দৃষ্টি নিয়ে স্কারমাসা বলে --সময়মতো সবকিছু পাবে। কিন্তু যদি তোমার অন্য পরিচয় পাই, তাহলে তো বুঝতেই পারছ। কাল সকালে আমার সাথে দশটার সময় হেনড্রিক্সের সাথে মিটিং এর পর আমরা ট্রেনে করে সবাই বেড়াতে যাব। সব ব্যবস্থা ঠিকঠাকমতো তোমাকেই করতে হবে। এখন ঘুমিয়ে পড়ে।

সাড়ে ছটা নাগাদ আলার্মের শব্দে বন্ডের ঘুম ভাঙে।

সমুদ্রে স্নান করতে করতে বন্ড স্কাবমাস্ককে দেখল আগের দিনের মতো সে শরীরচর্চা করছে। স্কাবমাস্ককে লুকিয়ে ড্রিপ্সিকেট চাবি দিয়ে ঢুকে পড়ল ২০ নম্বর ঘরে।

২০ নম্বরে ঢুকে ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে সোনার পিস্তলটা নিয়ে তার থেকে প্রথম গুলিটা বার করে যেমন ছিল তেমনি রেখে খুব সতর্কভাবে নিজের ঘরে চলে এল।

কাজটা নেহাত-ই কাঁচা। কিন্তু বন্ড বুঝতে পারছিল, তার মার্ক হ্যাজার্ড রূপটা যে কোনো মুহূর্তে খসে পড়তে পারে। তাকে তাড়াতাড়ি যা করার করতে হবে, অবশ্যই নিজেকে বাঁচিয়ে।

করিডোরে ফেলিক্স লিটার বন্ডকে দেখে বলে—গুড মর্নিং মি. হ্যাজার্ড।—বলে বন্ডের ডান দিকে চেয়ে থাকে। ততক্ষণে হেনড্রিক্স উপস্থিত। বন্ড বলে—গুড মর্নিং।

লিটারকে দেখে হেনড্রিক্স বন্ডের কথায় মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—হাভানা থেকে একটা ফোন আছে। আমি একটু গোপন নির্বিবলি জায়গা চাই কথা বলবার জন্য।

—আপনার কম-টাই তো সেফ। অবশ্য আপনি এই সাউন্ডপ্রুফ ফোনটাও ব্যবহার করতে পারেন। ডেস্কের অন্য দিক থেকে একটা ফোন দেখিয়ে লিটার বলে।

লিটারের সঙ্গে হেনড্রিক্স সেই ঘরটার শেষ দিকে গিয়ে একটা চামড়া-আঁটা দরজা দেওয়া ঘরে ঢুকল।

লিটার বন্ডকে বলে— বলুন স্যার।

বন্ড বলে— বলছিলাম যে, আমার বাথরুমে একটা প্রবলেম হচ্ছে। অন্য কোনো বাথরুম কি—

—নিশ্চই। তা হলে তো স্যাব আপনাকে অন্য ঘর নিতে হয়। মানে যেটায় অ্যাটাচড বাথরুম আছে।—তাবপর কাছে এসে আস্তে করে লিটার বলে—ট্রান্সকল-এর খবরটা আমি শুনেছি। আমার অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য একটা দরজাও আছে। ও হতভাগা কী কথা বলছে, সেটা শুনতে হবে। মনে হচ্ছে, তোমাকে নিয়েই। হ্যাঁ, আপনি বসুন স্যার এই ঘরটায়। আমি ব্যবস্থা করে আসছি।

বুথ থেকে হেনড্রিক্সের ত্রুন্ধ চোখের মণির অর্থ বুঝতে পারে বন্ড। সে তাড়াতাড়ি একটা কাগজ তুলে নিয়ে তাতে একটা ফুটো করে নেয়।

ফোন রেখে ঘর্মান্ত মুখ মুছতে মুছতে বন্ডের সামনে দিয়ে খুব দ্রুত চলে গেল হেনড্রিক্স।

সেই দৃশ্যই প্রবেশ নিকলসনের। বন্ডকে দেখে সামান্য হেসে গুড মর্নিং জানায় সে। একটু বাদেই লিটারের উপস্থিতি। বন্ডকে সে ছল করে একটা বাথরুমে ঢুকিয়ে ভিতর থেকে বন্ধ করে বলে—চটপট পালাও। সব কিছু জেনে গেছে ওরা। যদিও বাশিয়ান ভাষায় কথা বলতে বলতে ০০৭ শব্দটা কয়েকবার শোনা গেছে।

করণ হেসে বন্ড বলে— কে জি বি হেড কোর্সারের আমার এক পুরোনো বন্ধু জানিয়েছে, হেনড্রিক্সের ওপর আমার শিরশ্ছেদের দায়িত্ব আছে। দেখ বেলা দশটার মিটিং-এর পর যে ট্রেনে করে বেড়াবার প্ল্যানটা আছে, সেটা তোমাকে এবং নিকলসনকে ভেস্তে দিতে হবে। মিটিং-এ ওদের মতলবটা পরিষ্কার জানা যাবে।

লিটারের পরামর্শমতো বন্ড চটপট চিঠি লিখে ফেলল উইসকো সুগার এস্টেটের ম্যানেজারকে।

বন্ড ঘুরে ফিরে ভাবতে থাকে একটা আসন্ন যুদ্ধের কথা। বাইরে সে শান্ত, ভিতরে সে ছটফট করছে। পিস্তলটা একবার হাতে নেয়।

ঘড়ির দিকে তাকায়। বাথরুমে ঢোকে। বেরিয়ে আসে। ড্রেস করে সে তার শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে পিস্তলটা গুঁজে কনফারেন্স রুমের দিকে পা বাড়ায়।

দশটা বাজতে এখন পাঁচ মিনিট বাকি।

বন্ডের শরীরটা এখন কনফারেন্স রুম-এর বেরোবার প্রধান দরজা থেকে ফুট দুই ভিতরে। বন্ড ধীর পদক্ষেপে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে ঢোকে কনফারেন্স রুমে।

॥ বারো ॥

কনফারেন্স রুমের যথাপূর্বম্ অবস্থা বলে দিতে হয় না, এ ঘরে রুটকফের মৃতদেহ থাকার জন্য কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হয় নি। অ্যাশট্রে, গ্লাস কোনোকিছুশেই হাত দেওয়া হয় নি। স্কারমাঙ্গার অতি ছুঁচলো বুলেট শরীরের ভিতর নিমেষে ঝাঁঝরা করে দেয়, কিন্তু চট করে শরীর থেকে রক্ত ঝারায় না। রুটকফের দেহ সরাবার পর সব সূত্রই নিখুঁতভাবে সাফ করে ফেলা হয়েছে। তবে একটা চেয়ারের পায় ভাঙা।

বন্ড বোকা ছেলের মতো ঘরটা পরীক্ষা করার সময় স্কারমাঙ্গা ও হেনড্রিক্স প্রবেশ করে।

স্কারমাঙ্গা বলে—এই যে মি. হ্যাজার্ড, কালকের মতোই সব ব্যবস্থা থাকে যেন। কেউ যেন ঢুকতে না পারে।

হেনড্রিক্সের দৃষ্টি বন্ডের দিকে। যেন এখনি গিলে খাবে।

বন্ড বলে—তা কালকের নাচগান কেমন লাগল মি. হেনড্রিক্স?

কোনো উত্তর না দিয়ে একটা চেয়ারে গিয়ে বসে হেনড্রিক্স। স্কারমাঙ্গা বলে—এবার বাইরে যাও।

বন্ড বাইরে আসে। কিন্তু কান তার দরজায়।

হেনড্রিক্স স্কারমাঙ্গাকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, এই মি. মার্ক হ্যাজার্ডই আসলে জেমস বন্ড ০০৭। বন্ডকে সে কোথায় কীভাবে পেল, এটা জেনে নিয়ে ওপরওয়ালাদের কাছে রিপোর্ট পাঠাবে হেনড্রিক্স। স্কারমাঙ্গা যেন একদম ভয় না পায়।

আগের দিনের মতো শ্যাম্পেনের গ্লাসটা ধরে কনফারেন্স রুমের দরজায় কান পেতে থাকে। এবার দেশলাই জ্বালাবার শব্দ। অর্থাৎ, স্কারমাঙ্গা চুরুট ধরাল। এক লাফে বন্ড প্রধান দরজার কাছে এসে বসে পড়ে। যদি স্কারমাঙ্গা আচমকা দরজা খুলে বেরোয়।

না, বেরোল না। আবার কথা শুরু হল। পা টিপে বন্ড এগোয়।

স্কারমাঙ্গা বলছে, সে কী করে কোথা থেকে বন্ডকে পেয়েছে। সে বলে—আমার সব কাজকর্ম আমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয় বলে ওকে আমি পি. এ.-র কাজে বহাল করি। যেমন, ব্যস্ততার মধ্যে নির্উইয়র্ক থেকে দুজন ম্যানেজার আনতে হয়েছে। আপনাকে আগে বলেছি, এখনও বলছি মি. হেনড্রিক্স, এইসব গুণ্ডচরেরা আমার কাছে নসিয়া। সেরকম বুঝলে, আজই পৃথিবীতে ওর শেষ দিন। এবার শুনুন—

স্কারমাঙ্গা যথাসম্ভব আন্তে বলতে থাকে তার প্ল্যান—ট্রেন...আখখেত...ইঁদুর...আখ ঝাওয়া...তাহলে আপনি...বাকি কাজটা...সবাই দেখবেন...একটা মজার ঘটনা।

আবার নীরবতা। স্কারমাঙ্গা এখন তাহলে চুরুটে টান মারছে।

হেনড্রিক্স বলে---তাহলে এখনই কী ওকে কিছু---

—না, এখনই কিছু করব না। পরপর দু'দিন তার ছিড়ে যাওয়া—লোকের মনে সন্দেহ জাগাবে। আমি যা বললাম, তাতে ভেগাস চলে যাওয়াব মতো ইংল্যান্ড চলে যাওয়াটা আপনারা উপভোগ করবেন না?

হেনড্রিকস বলে—বেশ। ইংল্যান্ড এ চলে যাওয়ার আনন্দটা আমরা উপভোগ করব। কিন্তু প্ল্যান অরেঞ্জ? সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক কিনা, সেটা তো আমার ওপর মহল জানতে চাইবেন।

স্কারমাস্কা বেশ হাসির রেশ টেনে বলে - আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। তবে প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর চেঞ্জ করতে হবে। আপনাদের ইংরেজির সাথে আফ্রিকার ভাষাটাও বেশ জব্বর বলতে হবে। কালা আদমিদের জন্য নিশ্চয়ই। যাকগে, আমাকে ডেট জানাবেন। কিছু স্টক থাকে আমার ওয়াল স্ট্রিটে।

হেনড্রিক্স বলে—তাবিখটা আমি জানতে পারব না। হয়তো এতে আপনার কিছু লোকসান হতে পারে। শুনুন, আমার ওপরের কর্তারা প্রচুর পরিমাণে নেশার মাল চাইছেন। আপনি যদি গাঁজা পাউন্ডের বদলে হন্দরে দিতে পারেন এবং জাহাজে করে গাঁজা পেড্রো কেস পর্যন্ত পাঠান, তাহলে আমার বন্ধুরা তা তুলে নেবে।

— দেখুন মি. হেনড্রিক্স, গাঁজা আইন যেভাবে কড়াকড়ি হয়েছে, তাতে এক হন্দর গিয়ে পৌঁছোবে হাজার স্টার্লিং। আমার নৌকো করে জেলেরা বড়োজোর এক হন্দর জাহাজে পৌঁছে দিতে পারে। তা মালটা কোথায় যাবে? যে হারে ধবপাকড় হচ্ছে।

—যদূর জানি আমেরিকা। জর্জিয়ার সমুদ্রতীরের কাছে যে নানা দ্বীপ আছে, সেখানকার কোনো একটাতে। চোরাই মাল নামাবার আদর্শ স্পট। আমি যেন দশ লক্ষ ডলাব ঢালি। তবে বাজারের বর্তমান দামে। আপনি দশ পার্সেন্টই পাবেন। যদি না আপত্তি থাকে।

—না না। তবে যারা গাঁজার কারবার করে তাদের সঙ্গে কথা বলে নিলে ভালো হয়। পনেরো দিনের মধ্যে আমি রেট জানিয়ে দেব।

—বেশি দেরি করবেন না যেন।

স্কারমাস্কা বলে—এবার অন্য কথা; ওই ক্যাসিনোর ব্যাপারে সরকারের বেশ আগ্রহ আছে। টুরিস্টও আসবে প্রচুর। একসময় আমাকে টাকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি রাজি হই নি। এখন অন্য দল ক্ষমতায় এসেছে। ওই দলের এক মন্ত্রী আমাকে জানিয়েছে, ওরা নাকি স্বাধীন হয়েছে ইংল্যান্ডের হাত থেকে। আমার ওই মন্ত্রীবন্ধু প্রস্তাব দিলেন যে, জুয়া শুরু করলে কেমন হয়। আমি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান ছকে ফেলেছি। রফা হয়েছে পাঁচ পার্সেন্ট সব খরচা বাদ দিয়ে। অবশ্য প্রত্যেককে এক লাখ ডলার বিনিয়োগ করতে হবে। তবে দেড় বছর বাদেই লাভ সহ মূল টাকাটা উঠে আসবে।

যেন খুব খুশি হয়েছে হেনড্রিক্স। সে বলে ওঠে—তবে আপনার এই বন্ধুরা পুঁজিবাদের পক্ষে নয়। আমাদের একজন গতকাল তো চলে গেলেন।

ওফ! এতসব ব্যাপার। এত জটিল ষড়যন্ত্রের ছক। এখন এদের প্রমাণসহ হাতেনাতে ধরতে পারলে হয়। মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে বন্ডের। এদিকে ড্রিঙ্কও ফুরিয়ে গেছে।

আবার নীরবতা। সুতরাং, আবার সতর্ক হয় বন্ড।

এবার হেনড্রিক্স বলে—দেখুন, লাভের ব্যাপারটা ছাড়া আমার কর্তারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটাতে চায়। আর সেই কারণেই আমি আপনার দলের হয়ে নেমেছি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, জুয়ার আড্ডার সাথে রাজনীতির কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

—এখানকার লোকগুলি সব জুয়াখোর। সামান্য ছুতো ধরে ক্যাসিনো থেকে ওরা কালো চামড়াকে বার করে দেবে। এতে বিরোধীপক্ষ হই চই শুরু করে দেবে। সস্তায় মুনাফা লোটোর সবথেকে ভালো উপায়। আর আপনার লোকেরাওতো চায়, এই দ্বীপ অঞ্চলে একটা গরমভাব থাকুক।

স্কারমাস্কার যুক্তিটা মনে হয় হেনড্রিক্সের ঠিক পছন্দ হল না। হেনড্রিক্স বলে—দেখবেন, ঝামেলাতে যেন আবার কোনোরকম আর্থিক লোকসান না হয়। আচ্ছা, এবার ছ'নম্বর সদস্যের ব্যাপারে কী চিন্তা করলেন?

একটু চুপ করে থেকে স্কারমাস্কা বলে-- গাঁজা নিয়ে যদি নামতেই হয়, তবে মেক্সিকো সিটির মি. আরোজিও। তার কীর্তির কোনোরকম প্রমাণ নেই। গাঁজা আর মেয়ের ব্যবসা। আপনার কর্তারা নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন।

এরপর উভয়ের মধ্যে ব্যবসা ও অপরাধ-সংক্রান্ত লেনদেন নিয়ে আরও কিছুক্ষণ কথা হল। চেয়ারের শব্দ। বন্ড সরে গেল। ঘরের দরজা খোলার শব্দ। স্কারমাস্কা এবং হেনড্রিক্স বেরিয়ে বন্ডের মুখের দিকে তাকাল।

বন্ড একটা হাই তুলল।

॥ তেরো ॥

এবারের পর্ব ট্রেনে করে ভ্রমণ। একটা সুন্দর সুট, মাথায় বড়ো মাপের টুপি, স্কারমাস্কা কে দেখাচ্ছে যেন কোনো জমিদার।

হেনড্রিক্স পরেছে শীতের পোশাক। হাতে দস্তানা পরলে বোধহয় আরও ভালো হত। বাকিরা চকমকি মার্কা লম্বা ঝুলের জামা।

বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা। স্কারমাস্কা নিকলসনকে আসতে দেখে ট্রেনিসের কথা জিজ্ঞেস করে। নিকলসন বলে যে, সে দাঁতের যন্ত্রণার জন্য সাভানা লা মারে যেতে বাধ্য হয়েছে।

স্কারমাস্কা বলে--ঠিক বেরোবার সময় আমার লোক কম। ওর হাফ-ডে পে বাদ যাবে।-- এরপর বন্ডকে জিজ্ঞেস করে, সব ঠিক ঠিক আয়োজন সে করে রেখেছে কিনা, যেমন স্কারমাস্কা বলেছিল।

স্কারমাস্কা এই সুন্দর ছোটো রেলগাড়িটা বানিয়েছে লুসিয়াস বের নামে এক ভদ্রলোক, স্কারমাস্কা জানায়, আখ খেতের মধ্য দিয়ে ট্রেনে করে পৌঁছোবে গ্রিন আইল্যান্ড বন্দরে। মাঝপথে যাত্রীরা ট্রেন থামিয়ে পাখি, কুমির, মেঠো ইঁদুর শিকার করতে পারে। গ্রিনে পৌঁছে খাওয়া, গল্প, মেয়েদের নাচ হবে। ওখান থেকে থান্ডারগার্ল নামে একটা বড়ো স্টিমারে চড়ে লুসিয়া যাওয়া হবে। সেখানে মাছ ধরা যেতে পারে! সবার পিস্তল যেন ঠিকঠাক থাকে।

ট্রেনের ভাঁ বাজিয়ে যাত্রা শুরু হল। বন্ডের হাত নিশাপিশ করে ওঠে। স্কারমাস্কা কে দুম করে মারলে, ওর পার্টনাররা বন্ডকে ঝাঁঝা করে দেবে। বন্ডের ওয়ালটার পি. পি. কে.-র থেকে ওর কন্ট.45 অনেক বেশি ক্ষিপ্র। অবশ্য স্কারমাস্কার প্রথম গুলিটা যে বন্ড খুলে নিয়েছে, সেটা যদি না জেনে থাকে স্কারমাস্কা, তবে বন্ডের পক্ষে সেরকম ভয়ের কিছু নেই। বন্ডকে গোবেচারী সেজেই ঠান্ডা মাথায় থাকতে হবে। মাথার ওপরে একটা শকুন উড়ছে। বন্ড তার ডান হাতটা পিস্তলের কাছে নিয়ে এল। উদ্বেজনায় তার ডান হাত এবং পা দুটো যেন কাঁপছে। বন্ড অনেক কষ্টে নিজেকে শাস্ত করল। একটা সিগারেট শরায় সে।

ট্রেন থামল খান্ডারবার্ড হস্ট-এ। কার্কার্য কবে লেখা এই স্টেশনের নাম। স্টেশনে লেখা আছে—‘চেক নেয়া হবে না’—এটা সিগারেটের বিজ্ঞাপন, তারপর—‘খাবার জন্য ট্রেন থামবে’ ইত্যাদি।

ট্রেনের হুইসেল, স্কারমাস্কা প্রবল উৎসাহে বলে ওঠে—ট্রেন ছাড়বে। সকলে উঠে পড়ুন।

স্কারমাস্কা হঠাৎ তার সোনার পিস্তল বার করে শূন্য গুলি ছুঁড়ল। পরপর দু’বার। স্টেশন মাস্টার একটু ঘাবড়ে গেলেন। সবুজ পতাকাটা নামানো আছে। স্কারমাস্কা খাপে পিস্তলটা পুরে বন্ডকে বলে—তুমি ড্রাইভারের সঙ্গে গিয়ে বস। আর হেনড্রিকস, আপনি কয়লার গাড়িটা ব পিছনে প্রথম সিটে। তারপরে স্যাম, লীরয়, হ্যাল আর লুই। আমি ব্রেকভ্যানে আছি। সবাই শিকারে ব দিকে লক্ষ রাখবেন।

স্টেশন মাস্টার পতাকা নাড়িয়ে ট্রেন ছাড়বার সংকেত দিল। ইঞ্জিন হর্ন বাজিয়ে তিন ফুটিয়া চওড়া লাইনের ওপর দিয়ে ভস্ ভস্ করে তার যাত্রা শুরু কবল।

ড্রাইভারের কপালে ফেট্রি, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মুখে সিগারেট। গা দিয়ে ঘামেব উৎকট গন্ধ। বন্ড বলে—এই যে ড্রাইভার সাহেব, আমি মার্ক হাজার্ড তোমার নাম?

-- চুপচাপ বসে থাক। সাদা চামড়ার সাথে কথা বলি না আমরা।

-- সেকী! তোমাদের ধর্মে তো সব মানুষকেই ভালোবাসতে বলেছে।

কোনো কথা না বলে ড্রাইভার হুইসেলের ডান্ডা ধবে টান মেরে ফোর্নেসে কয়লা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কোনো উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করল না সে।

বন্ড একটা হাই তুলে কেবিনের চারপাশটা বেশ ভালোভাবে দেখতে দেখতে চাবপাশের দৃশ্য দেখার ছলে তাকায় পিছনের দিকে। স্কারমাস্কা সহ সবার দৃষ্টি যেন কিছুক্ষণ আগে উড়তে দেখা শকুনটার মতো। এবং অবশ্যই বন্ডের ওপর তা। তার মানে, এরা নিশ্চিত হয়ে গেছে, অপরাধী বাহিনীর সাথে এক গুপ্তচর চলেছে মার্ক হাজার্ডরূপী মি. জেমস বন্ড।

বন্ড উঠে দাঁড়িয়ে দু’হাত ওপরে তুলে শরীরের আড়মোড়া ভেঙে হাত ঢোকাল পকেটে। ম্যাগাজিন তিনটে ঠিকই আছে। এবার কোমরে পিস্তলটা যথাস্থানেই আছে। সবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইঞ্জিন থেকে মাথা নিচু কবে ‘কী, কেমন লাগছে’ বলে সবার উদ্দেশে সে হাত নাড়ল। বিপরীতপক্ষ থেকে কোনো উত্তর নেই। বন্ড বুঝল, ওরা তাদের এই শিকারকে পাস্তা দিতে চায় না। মানে, আজকেই তাব শেষ দিন। মনে মনে গসে বন্ড। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, ড্রাইভার আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

মেরি বন্ডকে যে ম্যাপটা দিয়েছিল, তাতে দীর্ঘ পাঁচ মাইল শুধু আখ ক্ষেত। রাস্তাটা বন্ডের ভালোভাবে জানা হয়ে গেছে। যার মধ্য দিয়ে সবাই এখন চলেছে। গ্রিন আইল্যান্ড পোতাশ্রয়ে ব কাছে একটা ছোটো গ্রাম— গ্রিন আইল্যান্ড।

হঠাৎ গুলির শব্দে বন্ড ফিরে তাকায়। স্কারমাস্কার হাতে তার পিস্তল।

একটা শকুনের ডানার সামান্য অংশ ভেঙে পড়ল। শকুনটা চিৎকার করে ওপরের দিকে উড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু—

দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুলি খেয়ে সাঁ করে মাটির দিকে পড়তে লাগল।

বন্ড চোঁচিয়ে বলে ওঠে— রাস্তাফারীকে না জানিয়ে গুলি। পাঁচ পাউন্ড জরিমানা দিতে হবে যে।

উত্তর এল গুলিতে। বন্ডের কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

স্কারমাস্কা সহ সবাই এক বিক্রপাত্মক হাসি হেসে উঠল।

বোকা বনে যায় বন্দ। বলে—এ কী ধরনের রসিকতা।

সিটে বসে স্কারমাস্কা বলে—মি. মার্ক হ্যাজার্ড, সেই যে, বলেছিলাম না, সুযোগ পেলে খেল হয়ে যাবে।—বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে—মাঠে যে গোরুর দল যাচ্ছে, ট্রেন থেকে একটাকে—
—আমি যেটা খাই না, সেটা শিকার করি না। তা মহাশয় যদি খেতে চান, তাহলে আমি রাজি।

উত্তর—আবার গুলি। বন্দ বুঝতে পেরে আগেই মাথা নীচু করে নিয়েছিল।

স্কারমাস্কা বলে—দেখ হে ইংরেজ, বাজে রসিকতা ফের কন্ডলে এবার সত্যি সত্যিই তোমার কপাল ফুটো হয়ে যাবে।

হঠাৎ দুটো গুলির শব্দ। ড্রাইভার গাড়ির গতি কমাতে চেষ্টা করে। বন্দ দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে, লাইনের ওপর মনে হচ্ছে কোন নগ্ন শরীর দেহ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

বন্দ ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে। সে চেষ্টা না করে সে স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে শয়তানি হাসি হেসে বলে—মনে হয়, আপনার বাস্কবী।

ড্রাইভারের কথায় টনক নড়ে বন্ডের। তবে কী মেরি গুডনাইট।

স্কারমাস্কা এবার উঠে দাঁড়িয়ে চৈচিয়ে বলে—কী হল?

ড্রাইভার উত্তর দেয়—মনে হয়, এই সাহেবের কোনো বাস্কবী লাইনে শুয়ে আছে।

—সেকী!—চিৎকার করে বলে—তাই যদি হয়, তবে ইনি নিশ্চয়ই জেমস বন্দ। মেরি গুডনাইটের বন্ধুই তো আমাদের প্রিয় মি. জেমস বন্দ। তাহলে বন্দ নিশ্চয়ই তার বাস্কবীকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, সেটাই তো তার কর্তব্য।

চোখমুখ ক্ষিপ্ত হয় বন্ডের। ড্রাইভারের দিকে তাকায় সে। ড্রাইভার নির্বিকার। যা হয় হোক। বন্ডকে কিছু একটা করতেই হবে। বন্দ নিজেই তৈরি করে নেয়।

॥ চোদ্দো ॥

হিসেব কষে দেখল প্রায় একশো গজ দূরত্ব। দড়াম করে অ্যাকসিলেটরের রডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নীচের দিকে সেটা টানতেই অনেকটা স্টিম বেরিয়ে গেল ইঞ্জিন থেকে। তাকিয়ে দেখে ড্রাইভারের হাতে কাটারি। ওদিকে ব্রেক ভ্যানে স্বয়ং স্কারমাস্কা পিস্তল হাতে। আর দেরি না করে স্কারমাস্কার ধারণাকে ভ্রাস্ত্র করে সে বাঁ দিকে লাফ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পিস্তল বার করে গুলি চালান। হেনড্রিক্সের মাঝ কপালের মধ্য দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেল।

প্রত্যুত্তর স্কারমাস্কার। ড্রাইভার কেবিনের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। দরজায় দাঁড়িয়ে গুডনাইটের নগ্ন দেহটা দেখে সে কেঁপে উঠল। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওর দেহটা—

না, ভাবলেই মাথাটা ঘুরে যাচ্ছে। এবার এক পায়ে অ্যাকসিলেটরের রডে চাপ দিয়ে দাঁড়িয়ে গুলি চালান বন্দ। তিনটেব মধ্যে দুটো কাজ করেছে। তবে বন্দ এবার তার বাঁ কাঁধের নীচে আঘাত। তীব্র যন্ত্রণা। দাঁতে দাঁত চেপে সে কেবিনের মেঝেতে ছিটকে পড়ল। মাথাটা পাদানির কাছে গিয়ে ঠেকল। সেখান থেকেই দেখতে পেল প্লাস্টিকের গুডনাইটের দেহ এবং মাথা কীভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

বন্ডের শরীরটা গুলিয়ে উঠল। বাঁ কাঁধে হাত রেখে সে উঠে দাঁড়াতেই চারটে পিস্তল একে

একে কথা বলে উঠল। ডান দিক ঘেঁসে সে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করল। মাঝেমধ্যেই ওবা গুলি ছুঁড়েছে। বন্ড এবার গুলি চালাতে যেতেই দেখল স্কারমাস্কা মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছে।

আশ্চর্য! ওর গুলি লাগল কী করে?

আহত অবস্থাতেই ইঞ্জিনের ডান দিকের দবজা দিয়ে বেবিয়ে সে এগোতে যাবে, এমন সময় পরিচিত এক কণ্ঠ—সবাই পিস্তল ফেলে হাত ওপরে ওঠাও। নইলে গ্যাংগেরেলার মতো অবস্থা হবে সবাব।—কে একজন ঘুরে গিয়ে গুলি চালাতেই, সে-ও ধরাশায়ী হল গুলিব আঘাতে। সবাই পিস্তল ফেলে হাত তোলে মাথার ওপরে।

কয়েক সেকেন্ড কেটে যায়। নীরবতা ভঙ্গ করে আবার সেই কণ্ঠস্বর—মি. জেমস বন্ড, তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই।

আরে, এ যে লিটার! আনন্দে চিৎকাব করে ওঠে বন্ড—লিটার! ওফ্, আর একটু আগে এলে আমাকে গুলি খেতে হত না।

লিটার বলে—বন্ড শোনো, সামনে যে জলকাদা আছে, সেখানে লাফিয়ে পড়। বেশি লাগবে না। পরে স্নান করে গায়ে সেন্ট দিয়ে নেবে। আমি দেখছি এদিকটা।

বন্ড এবার এগিয়ে দেখে, দু'পা ফাঁক করে স্কারমাস্কার সামনে পিস্তল ঠেকিয়ে লিটার দাঁড়িয়ে আছে। লিটার বন্ডকে দেখে চোখ মেরে বলে—গ্রিন হারবারে এদের জন্য পুলিশ অপেক্ষা করছে। তুমি যাও।

যে কটা মরেছে, তাদের দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলে, কাবো মনে চট করে দয়ামায়া বোধহয় জাগবে না।

জলা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে বন্ডের বমি আসতে থাকে। এর মধ্যেই প্যারাডাইজ বলে—দশ লক্ষ ডলার দেব, আমাদের ছেড়ে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে যে কটা বেঁচে আছে, তারাও একই সুর তুলল।

লিটারের ধমক খেয়ে বন্ড লাফ দিল। ট্রেন কোনদিকে যে যাবে, সেটা এখন অনিশ্চিত। প্রায় দুশো গজ দূরে লিটারও লাফ দিল। এর পরে যে লাফ দিল, সে স্কারমাস্কা ছাড়া আর কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। ইস্, লিটার যে কেন ওকে শেষ করে দিল না। তার মানে, খেলা আবার নতুন করে শুরু হবে। এবারও ফসকে গেল শয়তান স্কারমাস্কা।

বন্ড অনেক কষ্টে জলাজমি ছেড়ে মাঠে উঠে আসে। ব্যাটা এবার বাড়ছে।

ট্রেনটা এগিয়ে চলেছে চালকহীন অবস্থায়। সামনে অরেঞ্জ নদীর ব্রিজ। ট্রেনটা ওদিকেই এগিয়ে চলেছে। এবার—

ব্রিজের মাঝখান পর্যন্ত গিয়ে ট্রেনটা আচমকা একটা শব্দ করে গৌস্তা মেরে একদিকে ঘুরে গেল। তাবপর আবার শব্দ। এবং তা ভয়াবহ।

বন্ড দেখল একটা বিশ্ফারণ। ট্রেনের টুকরোগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। স্কারমাস্কা তাহলে অপরাজিতই থেকে গেল। আর শিকার মেরে আনন্দ উপভোগ করবে বলে ঠিক করেছিল, তারা নিজেরাই শিকার হয়ে গেল।

শকুনের দল তাদের খাদ্যের সন্ধান পেয়েছে। একটা লম্বা কালো লাইন নেমে আসতে লাগল বিশ্ফারণের জায়গাটাতে। বন্ড উড়ন্ত এক ঝাঁক প্রজাপতির মধ্য দিয়ে হেঁটে লাইন ধরে লিটারের কাছে পৌঁছোল।

লিটারকে উদ্ধার করল বন্ড দুর্গন্ধময় জলাজমি থেকে। লিটার জানায়, স্কারমাস্কাব নির্দেশে সে

ওডনাইটেব নকল মূর্তিটা লাইনে রাখতে গিয়ে সেইসঙ্গে ব্রিজে বিস্ফোরণের বাবস্থাটাও করে রাখে। কিন্তু বন্ড যে সোনালি চুল দেখে পাগল হয়ে যাবে, এতটা লিটার আশা করে নি।

লিটার যন্ত্রণায় জ্ঞান হাবায়। বন্ড লিটারের পিস্তলটা খুলে নিয়ে ওর পাশে রাখে। বলা যায় না, যদি স্কাবমাস্টা শেষ আঘাত হানতে চায়।

বন্ড এবার হাঁটতে শুরু করে। মাথার ওপর সূর্য তার তেজ ছড়াচ্ছে। খিদেতে পেট লাফাচ্ছে, ওদিকে তো শকুন আর কুমিরের দল বন্ড আর লিটারের দৌলতে মহা আনন্দে লাঞ্চ সারছে। এর নাম হল কপাল।

বন্ড ভাবে, কোথায় এখন সে সুন্দরীদের দ্বাৰা পরিবেষ্টিত হয়ে কত ভালো ভালো খাবার খাবে, ড্রিংক করবে, তার বদলে ক্ষুধার্ত শরীরে সে হেঁটে চলেছে এক অনিশ্চিতের দিকে। দিবাস্বপ্ন দেখতে গিয়ে হেঁচট খায় বন্ড। ব্যাথাটা চাগিয়ে ওঠে।

নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে আবার সে এগোতে থাকে।

হঠাৎ বন্ড একটা কাশির শব্দ শুনতে পায়। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়।

॥ পনেরো ॥

ঝোপটা যেখানটা হালকামতন, সেইদিকে শুকনো মাটিব ওপর ভিজে বুটের ছাপ দেখতে পেল বন্ড। এবং ওই দিকটা দিয়েই আবার কাশির শব্দ।

মুখে পিস্তলটা নিয়ে বাঁ কাঁধটা চেপে বসে বসে শব্দ লক্ষ্য করে সে এগোতে লাগল। কিছু শুকনো ডালপালা ও ঘাসের মধ্যে কে বেন শুয়ে আছে। অনেক কষ্টে বন্ড দাঁড়াল একটা গাছের আড়ালে। তারপর শুয়ে থাকা লোকটার মুখের দিকে তাকাতেই ভীষণ চমকে গেল। তাহলে তার ধারণাই ঠিক। স্কারমাস্টাই একমাত্র ওদের দলেব মধ্যে আহত অবস্থায় ট্রেন থেকে লাফ দিয়েছিল।

স্কারমাস্টার রক্তাক্ত কোটটার ওপর দির্ঘে পোকা মাকড় এসে উড়ে চলে যাচ্ছে। মনে হল, ওর এখন উঠবার ক্ষমতা নেই। শুধু চোখ দুটো চাবদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছে।

কী করবে ভাবতে গিয়ে খসখস শব্দ শুনে দেখে লম্বায় প্রায় ছ'ফুটের মতো একটা অজগর এগিয়ে আসছে। বন্ড মুখ থেকে পিস্তলটা হাতে নিয়ে নেয়।

স্কারমাস্টা সত্যিই জাত শিকাবি। শিকারের গন্ধ সে বোধহয় চোখ বুজেও পায়। খসখস শব্দ শুনেই চোখের মণি ঘুরিয়ে সাপটাকে দেখামাত্রই সে হাতড়ে তার পা-টা গুটিয়ে প্যান্টটা টেনে বুটের পাশ থেকে ধারালো ছুরিটা বার করে পেটের ওপর ছুরির ফলাটা ধরে রাখে।

সাপটা এবার আচমকা ফণা তুলে জিভ বাব করে ফোঁস ফোঁস করে বোধহয় চারদিক দেখে নিল। সিনেমাটা বন্ড নিস্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল।

সাপটা এবার তার রাজকীয় ফণা নামিয়ে স্কারমাস্টার পেটের কাছে উঠে মুখ তুলতেই ছুরির ধারালো ফলাটা সাপের মাথা ফুটো করে সোজা মাটিতে বিধে গেল।

সাপটা শেষ চেষ্টা করল ল্যাঙ্গ দিয়ে শেষ আঘাত হানতে।

একসময় স্থির হয়ে গেল সাপটা। সাপটাকে দেখে নিয়ে স্কারমাস্টা এবার ছুরি দিয়ে মাথাটা কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মাথাটা গিয়ে যেখানে পড়ল, সেটা একটা কাঁকড়ার গর্ত। কেননা, সাপের মাথাটা পড়ার পরই গর্ত থেকে কয়েকটা বিষাক্ত কাঁকড়া বেরিয়ে এল।

এ ঘটনা প্রমাণ করে দিল, স্কারমাস্টা যে আঘাতই পাক, তার শরীর এবং মন এখনও ভয়ানক হয়ে আছে।

স্কারমাস্সা এদিক ওদিক দেখতে লাগল। কিন্তু বন্ডের ওপর জঙ্গলের ছায়া এবং তার কালো স্যুট স্কারমাস্সার দৃষ্টি থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিল।

স্কারমাস্সা এবার ভালো কবে বসে। বন্ড দেখে বঝল, অস্ত্রের জন্য গুলি স্কারমাস্সার হৃৎপিণ্ডকে বাঁচিয়ে ডানদিকে লেগেছে। তবে তাব বস্ত্রের জোরে সে এখনও নেতিয়ে পড়ে নি। স্কারমাস্সা এবার সাপের ছাল ছাড়িয়ে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লালাটে মাংসটা নিয়ে খেতে লাগল। বোঝা গেল, প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত সে।

উদাত পিস্তল হাতে বন্ড স্কারমাস্সার দিকে এগিয়ে গেল। ওকে দেখে স্কারমাস্সা খ্যাপা বা হিংস্র জানোয়ারের মতো ব্যবহার তো কবলই না, বরং সাধাবণভাবে কথা বলল-- খাবে নাকি? অনেক মাংস আছে।

অবাক হয় বন্ড। সে বলে--সাপের মাংস আমি ফ্রাই খাই। আর সঙ্গে চাটনি অবশ্যই। বরঞ্চ তুমি খেয়ে যাও।

স্কারমাস্সা হেসে বলে--তোমরা ইংবেজরা চট করে এত ভয় পাও কেন গুনি? আবে আমি তো মৃত্যুর দিকে চলেছি।

বন্ড বলে --সাপটাকে মেরে যেভাবে ওটার মাংস খাচ্ছ, তাতে তো তোমার মরার কোনো লক্ষণ দেখছি না। এক কাজ কব, ওই ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দাও। বেস্ট আর হাত তুলে বগল দুটো দেখাও। আর নিজের দুই খাইতে ভালো কবে চাপড় মার দেখি। নইলে কিন্তু আমার আঙুল আবার কথা বলে বসবে।

আচমকা কাশতে কাশতে সাঁ কবে ছুঁবিটা ছুঁড়ে মারল। বন্ড সময়মতো সরে গিয়েছিল নির্ঘাত। তবে কাশির সঙ্গে যে বস্তু বেরোল, তাতে মনে হয় পাজরাব গোটা দুয়েক হাড় ভেঙে থাকবে। কাশি থামলে আবার মাংস খেতে শুরু করে স্কারমাস্সা।

বন্ড ভাবে, অন্য কেউ এ দৃশ্য দেখলে নির্ঘাৎ হার্টফেল।

বন্ড এবার বলে -- তুমি খাও। আমি আপাতত বলে যাই। আমার কিছু বন্ধুকে তুমি শেষ করেছ। মার্গেসনকে তুমি হাঁটু ও কনুই-এর মধ্যে গুলি করে শেষ পর্যন্ত তুমি তাকে তোমার জুতো চাটতে বাধ্য করেছিলে। তবে তুমি আমার হাতে মার্গেসনের মতো মরছ না। আচ্ছা, সারা জীবনে তোমার হত্যাব সংখ্যা কটি?

— তোমাকে নিয়ে হাফ সেঞ্চুরি। শোন হে, অনেক দুঁদে খুনি আমাকে খুন করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর তুমি ব্যাটা ইংরেজ এসেছ এক আহত বাঘকে মেরে ওস্তাদি দেখাতে। এক কাজ করো-- বলে একটা হাড় বন্ডের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে স্কারমাস্সা বলতে থাকে--তুমি হাড়টা খেতে থাক। তোমার লোকজন মনে হয় ততক্ষণে এসে যাবে। তো, তারা এসে কী করবে আমায়?

—তোমার হোটেলের পিছনে নদীতে রটকফের শরীরে তোমার সেই বিখ্যাত রূপোর গুলি এখনও পাওয়া যাবে।

স্কারমাস্সা মুখ ভেঙিয়ে-- রূপোর গুলি পাওয়া যাবে। আর আমার বন্ধু হেনড্রিক্সের শরীরে তোমার ওয়ালটারের বুলেট গেঁথে আছে। মন্দ হবে না। আমরা দুজনেই জেলে যাব। শুনেছি স্প্যানিশ টাউনের কয়েদখানাটা নাকি দারুণ? ভালো কথা, রটকফের কথা তুমি জানলে কী করে হে?

বন্ড এবার আড়ি পাতা এবং টেপের ব্যাপারটা খুলে বলে। বন্ড তার দুই ম্যানেজারের কথা জানিয়ে বলে যে, তারা আসলে সি আই এ-র চর।

—আরে ধুস! ব্যঙ্গভরে স্কারমাস্তা বলতে থাকে—ওই আমেরিকান আদালতে টেপের সাক্ষ্য অচল। হাঁ, আমি কিছু বোকামি করে ফেলেছি। ঠিক আছে, দশ লাখ ডলার নিয়ে ঝামেলা হটাও দেখি।

—ট্রেনে অফার ছিল তিরিশ লাখ।

—ঠিক আছে। আমি ডাবল দিচ্ছি। এ সুযোগ কিন্তু পাবে না।

বন্ডের মুখের ভাব এখন স্কারমাস্তার মতোই নির্বিকার। সে ভাবে, এ ব্যাটা যদি ছাড়া পায়, তাহলে পৃথিবীতে আরো কত যে সর্বনাশ ঘটবে, তাব ইয়ত্তা নেই। তার মানুষ খুন করবার লাইসেন্স আছে। অর্ডার আছে, স্কারমাস্তাকে প্রয়োজন হলে খুন করতে।

বন্ড শক্ত হয়। বলে—দেখ, তোমার যদি কিছু বলার কিংবা কোনো সাথে দেখার ব্যাপার থাকে বলতে পার। কথা দিচ্ছি, জানতে পারবে না কেউ।

স্কারমাস্তা হেসে বলে—বারে ইংরেজ বাঃ! আহতকে খুঁচিয়ে মারতে তোমরা বেশ মজা পাও। অতই যদি বীরত্বের শখ, তাহলে তোমার পিস্তলটা আমায় দাও। আমি ট্রিগার একবার টিপব। ব্যাস, তুমি শেষ। এখন তোমার বিবেক কী বলে দেখি।

বন্ড বুঝল লোকটা অতিশয় ধূর্ত। ভাঙবে তবু মচকাবে না শালা। কয়েক মিনিটের মধ্যে যার মৃত্যু নিশ্চিত, তার চোখেমুখে কোনো ভীতির ছায়া নেই। বন্ড বলে—আমার হাতে সময় নেই স্কারমাস্তা।

স্কারমাস্তা হাত তুলে বলে—একটু ওয়েট করো অস্ত্রত। মরতেই হবে যখন, তখন শেষবারের মতো কিছুক্ষণ ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে নিই।

হাতের পিস্তলটা নামিয়ে বলে—ঠিক আছে। মাত্র এক মিনিট। এর বেশি সময় দিতে পারব না।

—অসংখ্য ধন্যবাদ।—বলে স্কারমাস্তা বিজ্ঞবিড় করে কী সব মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে তার ডান হাতটা পিঁপড়ের মতো এগিয়ে নিয়ে এল কানের কাছে।

মন্ত্রপাঠ চলছে। বন্ড অস্থির হয়ে উঠল। সে কিছু বলতে যাবার আগেই স্কারমাস্তার মাথার পিছন থেকে সোনালি ডেরিস্কার সজোরে ছুটে গেল বন্ডের দিকে।

স্কারমাস্তা বিদ্যুৎ গতিতে দৌড় মারল। বন্ড মাটি থেকে ছোরাটা তুলে নিল। তার হাতের যন্ত্রটা পরপর পাঁচবার গর্জন করে উঠল। শিকার ততক্ষণে নাগালের বাইরে। অসহ্য যন্ত্রণায় পেট চেপে মাটিতে শুয়ে পড়ল বন্ড।

॥ ষোলো ॥

হাসপাতালের বেডে শুইয়ে আচ্ছন্নাবস্থায় ফেলিক্স লিটার জায়গাটার বর্ণনা দিয়ে গুধু বলেছিল, জলা জায়গাটায় একটা শয়তান খুনি একটা ভালো লোককে মারতে পিছু নিয়েছে। পিস্তল ছাড়াও অন্য অস্ত্রও আছে ওই শয়তানটার কাছে। ফেলিক্স এখন মরফিয়া নিয়ে ঘুমোচ্ছে।

জ্যামাইকার রেল পুলিশদের বেশি জোরে হাঁটা বারণ আছে। তাই হাসপাতালে বেল পুলিশটি যখন রেলের অন্য লোকজন জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়, তখন সে নিয়ম অনুযায়ী হেলতে দুলতে একা একাই ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়।

ঘটনাস্থলের কাছাকাছি এসে গুলির শব্দ আর পাখির তীব্র চিৎকার শুনে সে যখন দৌড়ে এল, বুঝল এর কাছেই তার জন্মস্থান নেগ্রিল। এইসব জঙ্গল তার এককালের পরিচিত। অনেক গুলতি ছুঁড়ে মেরেছে সে। তার নীল কালো পোশাক এ গাছ ও গাছে আড়াল করতে করতে, হাতে একটা

মোটা লাঠি সম্বল করে ওই রেল পুলিশটি এগিয়ে গেল। তবে এখানে একটা ভরসা, পুলিশের গায়ে হাত দিলে তার গলায় ফাঁসির দাঁড়ানি বার্ব।

পরিবেশ নিস্তব্ধ হলে মেঠো ইঁদুর আর কঁকড়াদের মাঝে মাঝে যাওয়া আসার মধ্যে রেল পুলিশটি এগিয়ে এসে দেখল, দুটো দেহ মাটিতে পড়ে আছে। সে তাদের পিস্তল দুটো ভালো ভাবে দেখে, পকেট থেকে ছইসেল বার করে কয়েক ফুঁ দিয়ে তাতে পেনসিল বার করে রিপোর্ট লিখতে গিয়ে গলদঘর্ম হল।

পুলিশটি ভাবে— ভালো লোক এই জলা জঙ্গলে কী করছিল ?

বন্দ এখন হাসপাতালে। সংজ্ঞাহীন।

সাতদিন বাদে চোখ মেলল বন্দ। সবকিছু ঘোলাটে। মনে হল, সে যেন সমুদ্রের তলায় ভেসে বেড়াচ্ছে। কে যেন তাকে মারতে আসছে। মনে হল, সে বুঝি এক পরমা সুন্দরী মৎস্যকন্যা। বন্দ চিৎকার করে উঠতে যায় ভয়ে। সে দেখছে আরও কত কী। কিন্তু বন্দ সহ্য করতে পারছে না যেন। আবার চিৎকার করতে যায়। তার গলা আটকে যায়।

নার্স বন্দের মাথায় হাত বুঁলিয়ে ওয়ার্ড সিস্টারকে ফোন করে। একটু বাদে এই মহান রোগীকে দেখতে আসছেন রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার। বয়সে তরুণ, জ্যামাইকার এই ডাক্তারটি এডিনবরা থেকে পাস করেছেন।

ডাক্তার রিপোর্ট দেখলেন, সব শুনলেন। বন্দকে ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। ঘর নিস্তব্ধ। ডাক্তারের সঙ্গে নার্সটির হৃদয় কোমল, কিন্তু চেহারাটা বেশ দশাসই।

বাইরে কিংসটনের রাস্তায় গাড়ি ছুটে চলেছে।

ডাক্তার নির্ভুলভাবে নাড়ি দেখার জন্য ক্রনোমিটার পকেটে ঢুকিয়ে রেখে তার হাত নামিয়ে চার্টে রেকর্ড লিখে রাখলেন। নার্সকে বললেন, জুরের রেকর্ডও রাখতে। আর বললেন, আন্টিবায়োটিকের ডোজ আগের থেকে কমাতে হবে। ইনট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন দিয়ে যেমন খাওয়ানো হচ্ছিল, তেমনই চলবে। ড. ম্যাকডোনাল্ড এসে ব্যান্ডেজ বদলে দেবেন। তিনি আশ্চর্য হলেন, এত বিষাক্ত বুলেট সম্বন্ধে রোগী কী করে বেঁচে গেল। অঙ্গের ওপব কিডনি রক্ষা পেয়েছে।

সাপের বিষ ঠিকমতো ধরতে পেরেই সাভানা লা মার-এর সেই লোকটি যথাযথ ওষুধ সময়মতো না দিলে এ পেশেন্টকে বাঁচানো যেত না। যদিও পাল্‌স এখনও হাই। তবে হাই কমিশনারের অফিস আর পুলিশকে জানাতে হবে, পেশেন্ট ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবে। ওর সম্বন্ধে ঘন ঘন ফোন আসছে। আর বারো নম্বরে যে পেশেন্ট আছে, সে বলছে, বন্দের সঙ্গে দেখা করতে চায়। এর জন্য আমেরিকার রাষ্ট্রদূত আর ওয়াশিংটন খুব চিন্তিত।

চিফ মেট্রন বলে— পুলিশের লোক এসে দেখে গেছে। কাগজে গ্রিন আইল্যান্ডের কাছে ব্রিজ অ্যাকসিডেন্টের ঘটনা হবে হয়তো এটা। কমিশনার অফ পুলিশ নিজে এই ঘটনার দায়িত্ব নিয়েছেন। মনে হয়, এরা দুজন সরকারের আইন দপ্তরের খুব উঁচু পদে আছেন।

ডাক্তার বলেন— ঠিক আছে। লক্ষ রাখবেন। আর অস্তুত এক সপ্তাহ যেন কাউকে পেশেন্টকে মিট করতে না দেওয়া হয়।

সাত দিন কেটে দশ দিন পর।

হাসপাতালে যে ঘবটায় বন্দ আছে, সে ঘরে এখন মন্ত্রণালয়, পুলিশ, উর্কল - বিভিন্ন বিভাগের কর্তাব্যক্তির ভ্রমায়ত হয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তার পোশাক পরে বসে আছেন। এছাড়া আছে পেনসিল ও প্যাড নিয়ে মেরি গুডনাইট। লিটার ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছে। বন্দের ইচ্ছা ছিল,

সবকিছু বলবার আগে তার সাথে যদি লিটারের একবার কথা হত। কিছুই না, বর্ণনাটার যাতে মোটামুটি মিল থাকে। কিন্তু বন্ডের শরীরের কথা বিবেচনা করে তাঁকে সে অনুমতি দেওয়া হয় নি।

গলা বোড়ে কথা আরম্ভ করলেন—কম্যান্ডার বন্ড, আপনি বুঝতেই পারছেন যে, কী কারণে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি।

বন্ড লিটারের দিকে তাকায়। তারপর গুডনাইটের দিকে। গুডনাইট মাথাটা নামিয়ে নেয়।

কমিশনার এবার বলেন—কম্যান্ডার বন্ড, প্রধানমন্ত্রীর আদেশে এবং ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে আজকে আমরা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। সবরকম গুজবকে নস্যাৎ করে আমাদের দ্বীপের সুনামার্থে এবং সুবিচারের জন্যই সত্য প্রকাশ জরুরি হয়ে পড়েছে। যদি সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় তাহলে আর কোর্ট কাছারির প্রয়োজন হবে না। অবশ্য যে সব তথ্য আমরা পেয়েছি, তার ভিত্তিতেই আমরা এতসব কথা বলছি।

- বলুন, আমি সব বুঝতে পারছি।—শান্তভাবে বন্ড বলে।

—থান্ডারবার্ড হোটеле সম্প্রতি যে কয়েকজন আন্তর্জাতিক অপরাধী মিলিত হয়, তাদের মধ্যে রাশিয়ার সিক্রেট সার্ভিস, মাফিয়া, কিউবার সিক্রেট পুলিশেরও সদস্য ছিল। এদের উদ্দেশ্য, অন্তর্ঘাত করে জ্যামাইকার চিনি উৎপাদনের ক্ষতি, গাঁজা এবং জুয়ার বেআইনি কার্যকলাপ এবং জ্যামাইকার শাসন ব্যবস্থার অবনতি ঘটানো। এখন এই দলটির উদ্দেশ্য জ্যামাইকা পুলিশের অপরাধ অনুসন্ধান বিভাগের নজরে আসা। কয়েকটি মিত্র দেশের স্বার্থ জর্ডিত থাকায়, আমরা এদেব মণো যথাসম্ভব গোপনে চব্বি টোকানোর সিদ্ধান্ত নিই। যেমন, মি. নিকলসন ও মি. ফেলিক্স লিটার। ওদেরই অজান্তে ওদেরই খরচায় জ্যামাইকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-এর চাল এরা বানচাল করবার চেষ্টা করে।

বন্ড ঘাড় নেড়ে কমিশনারের কথায় সায় দেয়।

কমিশনার সম্প্রতি দেখে বলেন-- শত্রুদের সঙ্গে সংঘাত করতে গিয়ে এবপর কী কী হয়, সে ব্যাপারটা আমার থেকে আপনি, মি. লিটার এবং মি. নিকলসন আরও ভালো কবে জানবেন ঘটনার সাক্ষী হিসেবে।

খানিক নীরবতা। এ ওর দিকে তাকায়। বন্ড গুডনাইটের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কমিশনার এবার উঠে বলেন—ঠিক আছে। আপনারা মারাত্মকভাবে জখম হলেও, প্রাণে বেঁচে গেছেন এটাই সবথেকে বড়ো কথা। এরজন্য এই মেমোরিয়াল হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সদের কাছে সবাই অশেষ কৃতজ্ঞ। মহামান্য বিচারপতি মরিস কারগিল-এর উপস্থিতিতে এইসব তথ্যসমূহ সত্য বলে প্রতিপন্ন হল।

কমিশনার এবার সামান্য হেসে তার এক অধস্তন কর্মচারীর হাত থেকে প্যাকেট নিয়ে বন্ড, লিটার ও কর্নেল ব্যানিস্টারকে দিয়ে বলেন, এটা তাদের বীরত্বের স্মারক হিসেবে প্রদান করা হল, জ্যামাইকার পুলিশের পক্ষ থেকে—জ্যামাইকার পুলিশ মেডেল।

হাততালি হর্ষধ্বনির পর বিচারপতি মেবি গুডনাইটকে বলেন যে, সবার সাক্ষীসহ সই করা কাগজ তার কাছে যেন মেরি দয়া করে পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে প্রতিলিপিগুলিও।

মেরি গুডনাইট এবার সবাইকে বলে যে, যদি মাননীয় ব্যক্তির এবার দয়া করে বন্ডকে বিশ্রাম করতে দেন। পাশে থাকা একজন নার্সও গুডনাইটের কথায় সমর্থন জানায়।

করমর্দন শুভেচ্ছা কামনার পর সবাই বিদায় নিলে, লিটার হাসতে থাকে। সবাই বেশ অবাক হয়। বন্ড গুডনাইটের দিকে তাকিয়ে এর কাবণ জানতে চায়। গুডনাইট ঠোট উলটে জানায়, সে-ও বুঝতে পারছে না এর কারণ।

বন্দ বলে—কী ব্যাপার? হঠাৎ এত হাসির ফোয়ারা?

লিটার বলে—পরের ধনে আরাম আয়েশ করে, তাদেরকেই শেষ করে শেষে কিনা অন্য রাষ্ট্রের সরকারি পদক। ভাষা যায়।—কথাগুলি বলেই লিটারের শরীরটা সামান্য বেঁকে যায়।

নার্স এগিয়ে এসে তাকে ধরে। বলে—অনেক হয়েছে। এবার নিজের বিছানায় চলুন। বেশি কথা বললে কিন্তু আজ আর আপনাকে ছাড়া হবে না।

—হ্যাঁ, তাই চলুন। তবে আমি সুস্থই আছি। পেশিতে সামান্য টান ধরেছিল এই যা।

বন্দ বলে—হ্যাঁ যাও লিটার। বিশ্রাম নাও। তবে আপশোশ কী জান, স্কারমাস্কার মতো বিশিষ্ট মাথাকে জ্যাস্ত ধরা গেল না।

লিটার বলে— কেন, স্কারমাস্কার হোটেলের খাবার আর ওখানকার মেয়েদের ভুলতে পারছ না তুমি?

কি?

মুখ চাপা দিয়ে গুডনাইট হেসে ওঠে।

॥ সতেরো ॥

এই ঘটনার পর দিন আটকে কেটে গেছে। বন্দ এখন বসে একটা গুপ্তচরবস্তির বই পড়ছিল। তার আর ভালো লাগছিল না। কোনো কাজ নেই তার এখন। এইভাবে হাঁসপাতালে বন্দি জীবন কাটানো যায়। চারটে থেকে সব Visitor-রা আসতে শুরু করবে। মনে হচ্ছিল, সবাব অলক্ষে সে দূরে কোথাও চলে যায়।

Emergency খবর ডিকোড করার যন্ত্রটা নিয়ে মেরি গুডনাইটের প্রবেশ।

-- কী গো, আজ কেমন লাগছে?-- বলে মেরি বন্দকে M-এর একটা ব্যক্তিগত চিঠি দেয়।

বিছানার পাশে বসে মেশিনটা খুলল মেরি। ব্যাগের থেকে টেলিগ্রামটা বার করে শটহ্যান্ডের খাতটা পাশে রেখে, পেন্সিলটা মুখে রেখে মেশিনের মাঝখানে একটা ছোটো সিলিঙার দেখে নিয়ে হ্যান্ডল ঘোরাতে ঘোরাতে ওই মেশিনের নীচের একটা ছোট খোপ থেকে শব্দ বেরিয়ে আসতেই সে নোট করতে শুরু করে দিল।

বন্দ খুলল এবার M-এর ব্যক্তিগত চিঠিটা—‘তোমার ও বন্ধুদের (সি. আই. এ.) রিপোর্ট পেয়েছি। তোমার বগজে আমি অভিভূত। পরের কাজের সংবাদ কখন পাচ্ছি? ভালো থেকো।

গুডনাইট বলে—নিশ্চয়ই তোমার পরের কাজের ব্যাপার নিয়ে? ০০৭-কে ছাড়া M-এর যে চলবে না, সে আমি ভালোভাবেই জানি। আর তার সঙ্গে আমাকেও।

এরপর ওদের মধ্যে সামান্য নরম-গরম কথা হল।

বন্দ বইটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল। যেন মেরিকে পাত্তাই দিতে চাইছে না।

সেটা বুঝে মেরি বন্দকে একটা ধাক্কা দিয়ে ওর প্রশস্ত বুক গভীর চুম্বন দিয়ে অভিমানে সুরে বলে—এই যে, আমাকে কী ভালো লাগছে না তোমার?

—সেটা আমি জানি না।

— তা জানবে কেন?—একটু চুপ করে থেকে বলে মেরি-- শোনো, তোমার এই বীরসুলভ কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রী রানি এর্লাজাবেথের কাছে তোমাকে নাইট উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব এনেছেন। তবে যাকে দেওয়া হবে, তার মতামত জেনে নেওয়ার প্রথা আছে। টেলিগ্রাম করে তুমি সম্মতি জানাও, আর--আমার অভিনন্দন নাও।

—বলে বাচ্চা মেয়ের মতো সে বস্তুকে জড়িয়ে ধরে তার গালে চুমু খেতে থাকে।

চুমুপর্ব শেষ হলে বস্তু বলে—তা এত চুমু দেবার কী আছে?

অভিমান হলেও মেরি বোঝে এটা বস্তুর অভিনয়। তাই সে আবার মনে খুশির জোয়ার এনে বলে—তাহলে আমি সম্মতির ব্যাপারটা লিখে জানাই। আর আমি জানি, রানিকে কীভাবে চিঠি লিখতে হয়। এ্যাই, আমিও থাকব কিন্তু অনুষ্ঠানে। ঠিক তোমার পাশে।

বইটা রেখে বস্তু কয়েক মুহূর্ত মেরি গুডনাইটের চোখের দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে। গুডনাইট বস্তুর বুকে কোমল হাত বুলিয়ে বলে— কী হল ডার্লিং?

বস্তু বলে—লেখ, আমি যা বলছি।

গুডনাইট প্যাড আর পেনসিল নিয়ে রেডি হয়। বলে—বলে যাও।

বস্তু বলতে থাকে—...আপনার পত্র পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। যে সম্মান দিয়ে আপনি আমাকে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছেন, তার উত্তরে জানাই, আমি অত্যন্ত ধন্য মনে করছি নিজেকে। কিন্তু আপনাকে পরিপূর্ণ সম্মান জানিয়ে আমি জানাতে চাই, এই সম্মান গ্রহণে আমি নিতান্তই অপারগ। আমি এক অতি সাধারণ মানের স্কটল্যান্ডবাসী এবং সাধারণ হয়েই দেশের মধ্যে থাকতে চাই। আমার মনে হয়, আমার বস্তুব্য আপনি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করবেন।

...

আপনার চিরবিশ্বস্ত—

..

কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে মেরি গুডনাইট বলে—এত তাড়াহুড়ো করার কী কোনো দরকার ছিল জেমস? মনে হয়, তুমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে এর জবাব দিলে পারতে?

বস্তু বলে—এক বছর বাদে হলেও, আমি এই উত্তরই দিতাম। আমি নিজেকে ‘স্যাব’ জেমস বস্তু বলে কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। আর এই ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রী শুধু নন, M-ও বুঝবেন।

বস্তু এবার মেরির চোখের দিকে চেয়ে বুঝল, নিজেদের স্বার্থের জন্য মেয়েরা কত কাছে আসতে পারে।

গুডনাইট বলে—হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তুমি মোনাগমের পাশে আমার বাড়িতে গিয়ে থাকবে।

বস্তু উত্তর দেয়—আমি এখনও কিছু ঠিক কবি নি। তবে...ঠিক করলে তোমাকে আগে অবশ্যই জানাব।

অক্টোপাস

॥ এক ॥

মেজর ডেপুটী অধৃত মুড়ে ছিলেন। তার সামনে একটা বিরাট অক্টোপাস।

যেন সেটাকে শুনিয়েই তিনি বললেন — শোন, যদি সফল হই, তবে তুই আজ একটা গ্র্যান্ড ফিস্ট পাবি। জব্বর খানা-পিনা।

মুখে তার ডুবুরির মুখোশ। মুখোশ মুখে নিয়ে কথা বললে কাচ ঝাপসা হয়ে যায়। জল থেকে মাথা তুললেন মেজর। পায়ের তলায় বালি। বুক থেকে নিশ্বাস এখনও জলের নীচে। মুখোশটা মুছে নিয়ে রবারের ব্যান্ডটা আবার মাথায় দিলেন।

আবার ডুব!

ওদিকে প্রবালে স্থূপের ওপর একটা শিখিল দেহ, তার গায়ের রং খয়েরি, থলথলে চেহারা, কিন্তু দৃষ্টিটা জ্বলন্ত। মেজরের দিকে তাকিয়ে।

অবশ্যই এটা কোনো মানুষ নয়। শুঁড়ের মাথাটা গর্তের অন্ধকার থেকে দু এক ইঞ্চি বেরিয়ে আছে। দুলছে। সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠছে তার রক্তচোষা গাল। জিভটা বা শুঁড়টা কী যেন টেনে নিতে চাইছে।

একটি অক্টোপাস!

কিন্তু সেটা মেজর ডেপুটীর স্মিথের উল্লাসের কাবণ। এই অক্টোপাসের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা চলছে প্রায় দু-মাস ধরে। আশা আছে, আরও একমাস ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালালে সে পোষ মানবে।

ওঃ, কিন্তু সেই একমাস খুব দীর্ঘ মনে হচ্ছে।

আজই একবার চেষ্টা করে দেখবেন কী, যে অক্টোপাস কতখানি সাড়া দিচ্ছে তার আদব কায়দায়? বর্শার চেয়ে ধারালো কিছুর ডগায় মাংসের তাল তার খাদ্য। সেটাকে ওই অস্ত্র দিয়ে এগিয়ে না দিয়ে যদি হাতে করে দেওয়া যায়। অক্টোপাস কি তখন তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবে?

ব্যাপারটায় বড়ো ঝুঁকি। বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ঠাণ্ডামাথায় স্মিথ ভাবলেন, না, না অক্টোপাস যদি এখন বশ মেনে না থাকে, তাহলে কেলেঙ্কারি হবে। মুখোশের কর্কের ভালভ ছিড়ে গেলে তাকে ডুবে মরতে হবে।

তাছাড়া, ইনস্টিটিউটের প্রফেসর বেচারি ভদ্রলোক, তাকেও কথা দেওয়া হয়েছে - হঠকাবী কোনো কাজ করা হবে না।

সাঁতার দিতে দিতে একটা জিনিসের সম্মান করছেন স্মিথ। স্কর্পিয়ান ফিশ, বাকের বেচারি বলেন, 'স্কর্পিনা লুমিয়েরি।'

জীবনের শেষ অধ্যায়ে পৌঁছেছেন মেজর স্মিথ। অত্যন্ত সুন্দর চেহারা, বুদ্ধিমান, সাহসী অফিসার যিনি ও.বি.ই. রয়্যাল মেরিনস-এ দীর্ঘকাল কাজ করার পর অবসর নিয়েছেন।

জীবনে দুটি জিনিস তার বরাবর প্রিয় — নারীদেহ উপভোগ এবং যুদ্ধ। দুটোর মধ্যেই অদ্ভুত ‘থ্রিল’ আছে। তাই যুদ্ধের পর উইমেন্স রয়্যাল আর্মিতে কাজ করার সময়টা ভালোই কেটেছে।

এখন মেজর স্মিথের বয়স ৫৪। সামান্য টাক, সামান্য ভুঁড়ি। দু-বার ছোটোখাটো হার্ট-অ্যাটাকও হয়ে গেছে। ডাক্তার এখন বরাদ্দ করেছেন, দিনে দু-আউস্‌ হুইস্কি, আর বড়োজোর দশটা সিগারেট।

কিন্তু মেজর এই নির্দেশ মোটেই মানেন না। রাতে হুইস্কিতে ডুবে যান, আর রাশি রাশি ধোঁয়া ছাড়েন। মরলে মরব!

সত্যিই মেজর যেন এখন মরণের দিকে ইচ্ছে করেই ছুটে যেতে চান। হ্যাঁ, অনেকটাই মনস্তাত্ত্বিক রোগ। জ্যামাইকার মাটিতে বাঁধা পড়েছেন তিনি। মনে হয়, অতীতে কোনো অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান! কেমন একটা অপরাধ-বোধ তাকে যেন শুষে নিচ্ছে। বুকটাকে ঝাঁঝরা করে ফেলছে।

ভালোবাসা ?

হতে পারে। দু-বছর আগে মেরি মারা গেছে। তারপর কাউকে আর ভালোবাসা সম্ভব হয় নি। তবু সন্দেহ হয়। আচ্ছা, মেরিকেও কি তিনি দারুণ ভালোবাসতেন? কিন্তু মেরির অভাবটা খুব স্পষ্ট অনুভব করেন। তাই এখনও খুঁজে বেড়ান মেরির আবেগময় আবার ‘মুড়ি’ সাহচর্য! পান না, তাই খুবই একা লাগে।

জ্যামাইকার উত্তর-পাড়টায় হরেক রকম জাতের সমাবেশ। সেখানে মদ্যপান করলেও লোকগুলোকে ভালো লাগে না তার। মেলামেশা সম্ভব নয় ওদের সঙ্গে। বন্ধু-ভূতে পারে এমন লোক কই— প্রাক্তন সেনা, ভদ্রস্থ কৃষিজীবী, বাগানের মালিক অথবা রাজনীতিবিদ এই ধবনের লোক নেই।

তাই একলা অবসাদে ভোগেন মেজর স্মিথ।

মদের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই মনের মধ্যে মৃত্যুর ইচ্ছে প্রবলভাবে জেগে ওঠে।

হয়তো এতদিনে আত্মহত্যা করে বসতেন। ঘুমের ওষুধটা একবারে পুরোপুরি গিলে ফেললেই হল।

কিন্তু—

এখনও নিজেকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্তে আসেন নি তিনি। যদি এমনিতে মৃত্যু হয় ভালো, নিজে নিজেকে মারবেন কেন? যদি তেমন হয়—

স্মিথ এখন যে মাতালদের গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত তাদের মধ্যে চার রকম মানসিকতা দেখা যায়। হয় ফুর্তিবাজ, অথবা গোমড়ামুখো; হয় রাগী, অথবা মনমরা চুপচাপ, বিবাদগ্রস্ত। ফুর্তিবাজরা বাঁদরামি হই-চই ভালোবাসে, মুখ গোমড়ারা অন্ধকারে গুম হয়ে বসে থাকে। রাগীরা মারপিট, রক্তারক্তি করে জেল খাটে, আর মনমরা বিষগ্নরা ঘরের কোণে বিছানায় শুয়ে চোখের জল ফেলে।

মেজর স্মিথ কোন দলে?

তিনি চতুর্থভাগে। মনমরাদের দলে।

তার এই পাঁচ-একর জমির ওপর ভিলা। প্রবালস্তূপের উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে তার কারবার। এদের তিনি বলেন— ‘আমার শোকজন’। বিশেষ করে, নানা ধরনের মাছগুলোকে। পাখি আর মদের প্রেমে পাগল তিনি।

মানুষ নেই। না থাকুক। মানুষকে অত ভালো লাগে না তাঁর। তার চেয়ে এই প্রাণীরা ভালো। কত পরিশ্রম করে তাদের খাদ্য জোগাড় করেন তিনি। তারাও তাদের রক্ষক ও প্রতিপালককে ভালোবাসে। বিরাট মাছ থেকে ছোট্ট মাছ পর্যন্ত— যার যেমন খাবার চাই, তাই সংগ্রহ করেন তিনি সমুদ্রের জলে ডুবসাঁতার কেটে, ত্রিশূলের মতো অস্ত্রটার সাহায্যে।

কিন্তু আজকে মেজর স্মিথ বেশ উদ্বিগ্ন। আজ একটা কাণ্ড ঘটাবার শপথ নিয়েছেন তিনি।

এ সুন্দর পরিবারে, মাছ, সামুদ্রিক প্রাণী ও পাখিদের সুখী পরিবারে হঠাৎ একটি ‘শত্রু’ দেখা দিয়েছে তার।

কে এই শত্রু!

একটা সাঙ্ঘাতিক স্কর্পিয়ান ফিশ।

সাধারণত পৃথিবীর দক্ষিণে সমুদ্র অঞ্চলেই এই জাতীয় ‘স্কর্পিয়ান ফিশ’দের বসবাস। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে যে স্কর্পিয়ান ফিশ দেখা যায়, সেগুলো ছোটো মাত্র বারো ইঞ্চি লম্বা, আর এক দেড় পাউন্ড ওজন। ধ্যাবড়া কুৎসিত চেহারা। তবে ‘হ্যাঁ’ মুখটা বড়ো। এবং সেখানেই বিপদ। ছোটো ছোটো মাছদের গিলে খায়। পিঠের পাখনায় একটা ধারালো সূচ থাকে, ইনজেকশনের সূচের মতো। বিষাক্ত সূচ!

মানুষ মারার বিষথলি থাকে ওদের গায়ে। মানুষ কেন, যে কোনো প্রাণীই মরবে। মাঝে মাঝে জল ছেড়ে এরা বালির ওপর উঠে আসে। প্রয়োজনে পাথরের আড়ালে পালিয়ে যায়।

এইখানে একটা বেশ ডেঞ্জারাস স্কর্পিয়ান ফিশ সম্প্রতি উৎপাত শুরু করেছে।

একটা গ্ল্যান করছেন মেজর স্মিথ। প্রথমে স্কর্পিয়ান ফিশটাকে মারতে হবে। তারপর ত্রিশূল গেঁথে সেটাকে ওই অক্টোপাসের মুখের কাছে ধরবেন। দেখতে হবে অক্টোপাসটা কী করে?

দুটোই মারাত্মক। অক্টোপাসের মতো সর্বভুক রাক্ষস, আর ও বিকট হিংস্র বিষাক্ত মাছ। মাছটা যদি আধমরা থাকে, তবে তো ভালোই। লড়াইটা জমবে। নাকি, আদৌ লড়াই বাধবে না? সেটাই দেখার।

যদি অক্টোপাস ওই বিষাক্ত মাছকে খায়, তবে কতখানি খাবে? আংশিক না পুরোপুরি। যদি খায়, তবে বিষের জ্বালায় অক্টোপাসের কী রকম যন্ত্রণা হবে? সেও কি মরবে?

মোট কথা বৈস্টিউটের প্রফেসর বেঙ্গরি এঃ প্রশ্নগুলোর জবাব চাইছেন।

উত্তরগুলো দিতে হবে। এবং আজই।

তাই চিন্তিত মেজর স্মিথ। এই পরীক্ষা করতে গিয়ে তার ‘প্রিয় অক্টোপুসি’র জীবনও শেষ না হয়ে যায়!

তবে এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর সামুদ্রিক প্রাণী সংক্রান্ত রিসার্চ একটা নতুন মোড় নেবে।

আরেকটা কথা। এই এক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মতো জীবন। এটা থেকেও রেহাই পেতে হবে।

কতগুলো নিয়ম তার জানা। গভর্নমেন্ট হাউস থেকে টেলিগ্রাম যাবে উপনিবেশ বিভাগে। সেখান থেকে গুপ্তচর দপ্তরে। তারপর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এবং অতঃপর পাবলিক প্রসিকিউটরের কাছে কাগজপত্র যাবে।

এই নতুন ঝামেলা সম্প্রতি পাকিয়েছে। একটা লোক এসেছে, কিংসটন থেকে। নাম জেমস বন্ড।

এমনিতে দিনটা স্বাভাবিকভাবে শুরু হয়েছিল। হার্টের ওষুধ, ব্রেকফাস্ট, পাখিদের খাবার দেওয়া, অন্যান্য প্রাণীদের পরিচর্যা ইত্যাদি।

তারপর ব্র্যান্ডি আর জিঞ্জার।

পরিচারক হাজির। তার নাম লুনার।

—মেজর সাহেব, এক ভদ্রলোক এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—কী নাম?

—নাম বলেননি। গভর্নমেন্ট হাউস থেকে এসেছেন।

—সিটিং রুমে বসাও, আমি আসছি।

সিটিং রুমে একজন লম্বা লোককে দেখলেন স্মিথ। লোকটার পরনে নীল স্যুট। জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখছেন।

ঠিক হ্যান্ড শেক হল না।

—আমি স্মিথ! আপনি গভর্নমেন্ট হাউস থেকে এসেছেন শুনলাম। স্যার কেনেথ কেমন আছেন?

—ঠিক জানি না। আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। আমি জেমস বন্ড। ডিফেন্সের লোক। কোথাও বসে একটু কথা বলতে চাই।

— বেশ তো। এখানেই বসতে পারেন। নাকি বাগানে? রাম বা জিঞ্জার চলবে?

— নো, থ্যাংকস! এখানেই বসা যাক।

জানলার মেহগনি গোবরাট বেশ চওড়া। বন্ড নামে লোকটা তার ওপরেই বসল। আর প্র্যাস্টারস চেয়ারের হাতলে পা রেখে বসলেন মেজর স্মিথ। তার একটা পা কাঠের। সেটা মেঝের ওপর রাখলেন।

—বলুন, কী করতে পারি? নর্থ-শোরে কি আবার গোলমাল বেধেছে?

সিগারেট ধরাল বন্ড। বলল—আসলে আপনার কাজের বিষয়েই কথা বলব। যুদ্ধের পর আপনাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছিল, মানে যখন আপনি 'মিসলেনিয়াম অবজেকটিভ ব্যুরো'র হয়ে কাজ করতেন—

জোরে হাসলেন স্মিথ।

—ওঃ হোঃ এম. ও. বি। বেশ, বেশ বলুন। কাজটা আমি খুব এনজয় করতাম।

পকেট থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে মুখে পুরলেন।

জেমস আগ্রহী।

স্মিথ বলল ও কিছু নয়, বদহজমের বড়ি। শরীরটা ফিট নয়, এখন তো আর পঁচিশ বছরের জোয়ান নই। যাই হোক—

বন্ড বলল—টিবল্ এর কাজ সম্পর্কে কিছু মনে আছে? কিটজবুয়েল-এর পূর্বে ওবের আউরায় সম্পর্কে?

এই নামটা মেজর স্মিথের বৃকে গাঁথা।

—ওঃ হোঃ, গোলমালে ব্যাপার। গেস্টাপোর দল বেশ্যা নিয়ে মস্ত। মদে ডুবে আছে। আমাদের হাতে কাগজপত্র দিয়েছিল। তাই আমরাও বেশ জুলুম করলাম না। বেশিরভাগকে মিউনিখ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলাম। কয়েক জনের ফাঁসি হয়েছিল বোধ হয়। আমরা ওদের অন্যলোকজনকে খুঁজতে গেলাম—মিটের শিল ভ্যালিতে।

—আমি তখন কর্তৃত্বের দিক থেকে নম্বর টু!

কম্যান্ডিং অফিসার ছিলেন কর্নেল কিং, একজন আমেরিকান।

—রাইট। ঠিক বলেছেন। খুব ভালো লোক।

—আপনি তো জার্মান জানেন। তাই শেষ পর্যন্ত সব কাগজপত্র আপনাকে দেওয়া হয়েছিল।

—আমি মস্তব্যাসহ ফেরত দিয়েছিলাম।

—সব কাগজপত্রই? কোনোটা থেকে যায়নি তো?

—না, না। সবই দিয়েছিলাম। স্যালজবার্গ কাউন্টার ইনটেলিজেন্স খুব খুশি হয়েছিল। কোথাও আছে হয়তো এখনও। খুব সম্ভব ন্যূবেনবার্গ ট্রায়ালের সময় ওগুলো কাজে লেগেছিল!...ওঃ, এম.বি.ও.-তে কী সুন্দর কেটেছিল। মদ, মিউজিক, মেয়েছেলে—

মেজর স্মিথের জীবন ঘটনাবলি ও বিচিত্র, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ। তার আগে ছিলেন কম্যান্ডো বাহিনীতে। ১৯৪১ সালে। এই কম্যান্ডোদের কাজ ছিল শত্রু এলাকার আকস্মিক হানা দেওয়া। সবাই ট্রেনিং পাওয়া। রয়্যাল মেরিনস্-এ মাউন্টব্যাটেনের অধীনে যে কমান্ডো অপারেশনস তৈরি হয়। তবে হেড কোয়ার্টার্সে তাকে বদলি করা হয়। জার্মান ভাষা জানায়, তার উপর যুদ্ধবন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

ধীরে ধীরে M.O.B.I তারপর জার্মানির আত্মসমর্পণের পর এই বাহিনীর কর্নেল হন তিনি। দক্ষতা দেখানোর পর প্রমোশন—মেজর স্মিথ।

বন্দ জিজ্ঞাসা করল—হ্যানস ওবারসোর নামটা আপনার মনে পড়ে কি?

—ঠিক স্মরণে আসছে না।...দাঁড়ান একটু ভাবি।

—আমি সাহায্য করছি। যেদিন আপনি কাগজপত্রগুলো পান সেদিন আপনি কিটজ বুয়েল-এ এক দক্ষ পাহাড়ী, খোঁজে গিয়েছিলেন। তখন ওবারসোরের কথা আপনাকে বলা হয়েছিল। ওকে আপনি আরেস্ট করেন। তার জিপে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যান।

চুপচাপ শোনেন স্মিথ। তারপর—লন—নাঃ, কিছু মনে পড়ছে না।

বন্দ আরেকটু বর্ণনা দিল। লাভ হল না। এরপর নোটবই বের করে বন্দ বলল—ওই সময় আপনার সঙ্গে ছিল ওয়েবলি স্কট বন্দুক। ৪৫ ক্যালিবারের।

বন্দুকটার সিরিয়াল নম্বর—৮৯৬৭/৩৬২।

—হ্যাঁ, সেটা মনে আছে। তবে নম্বরটা মনে নেই।

—নম্বরটাও ঠিক আছে। খাতায় আপনার সেই আছে।

—হতে পারে।...কিন্তু এসব আলোচনার দরকারটা কী?

—আলোচনার দরকারটাও আপনি জানেন, মেজর স্মিথ। স্মিথ ভুকুটি করে।

বন্দ বলে—আমি একটু বাগানে বেড়িয়ে আসি। আপনি শান্ত মনে চিন্তা করুন। কিছু মনে পড়লে আমাকে ডাকবেন। নিজে থেকে বললে আপনারই ভালো। জেনে রাখুন। আপনার সম্পর্কে বেশিরভাগটাই আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি। কিংসটনে এ-ফু ব্রাদার্সদের সঙ্গেও কথা হয়েছে আমাদের।

মেজর স্মিথ যেন হালকা বেঁধ করলেন। আর কী, তাহলে সবই ফাঁস হয়ে গেছে। এ-ফু ব্রাদার্সরা সবই বলে দেবে।

ব্র্যান্ডি ও জিজ্ঞারের গ্লাসে চুমুক দিলেন স্মিথ।

সিগারেট ধরালেন। এটা কুড়ি নম্বর সিগারেট।

বেলা এগারোটা। এই বস্তু নামে লোকটার পেছনে আর বেশি সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তার বন্ধু-প্রজা-অনুচরের দলের খাবার সময় হয়েছে। তারা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের প্রতিপালক কোথায়?

যাইহোক, বস্তুকে যেটুকু জানাবার আছে সংক্ষেপে জানিয়ে দেবেন তিনি। বেশি কথা খরচা করে লাভ নেই।

সেই অতীত কাল।

টিফেন ব্রনার হোটেল। এর দুটি ঘরের বিছানার ওপর একগাদা কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিছু কাগজের ওপর লেখা : **KOMMANDOSACHE HOECHT VERTRAULICH** ইত্যাদি। এই সব কাগজগুলোর ওপরে চোখ বোলাচ্ছিলেন মেজর স্মিথ। এই সব কাগজের মধ্যেই রয়েছে জার্মান শত্রুপক্ষের অনেক গোপন তথ্য। নামগুলো বড়ো-ছোটো সবরকমের। কোনোটা মোটা পুরু; কোনোটা পাতলা। ওপরে লেখা **VAULTA**, তার নীচে **WILDE KAISER**-ইত্যাদি।

সেই সময় অর্থনৈতিক দিক থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রিটেন চরম দুর্দশায়।

একটা বড়ো অস্ত্রিয়ান ম্যাপ দেখছিলেন স্মিথ। হঠাৎ একটা জায়গায় নজর আটকে গেল। কাইজার পর্বতমালার পূর্বে সবচেয়ে উঁচু চূড়োটা, কুঁজেব মতো দেখায়। ওখানে জনবসতি নেই বলা যায়। খোঁচা খোঁচা ধারালো পাথরে চূড়োটাকে হিংস্র দেখায়।

এখানেই একটা নুড়ির টিলা আছে।

আর তার মধ্যেই আছে গুপ্ত ভাণ্ডার!

মেজর স্মিথ এতক্ষণ সেটাই হয়রান হয়ে খুঁজছিলেন।

বস্তু এইমাত্র যেমন বলল, শুকটা সেইরকমই হয়েছিল বটে। ভোর চারটের সময় ওবারসোর -এর ঘরে গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন স্মিথ। পরিবারকে বলা হয়েছিল— তাকে মিউনিখ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তেমন কিছু সিরিয়াস না হলে ও এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসবে।

স্মিথ নিজের পরিচয় গোপন রেখেছিলেন। এমন কী জিপের নম্বরটাও ঢাকা ছিল। তাছাড়া কিট্জবুয়েল মিলিটারি গভর্নমেন্টের পতন আসন্ন। কে আর মনে রাখবে ব্যাপারটা!

ওবারসোরও বুঝেছিল, এদের সঙ্গে উলটোপালটা আচরণ করে লাভ নেই।

তখন ভোর হচ্ছে। পাহাড়ে চূড়োগুলোর সৌন্দর্য সম্বন্ধে খুব প্রশংসা করছেন স্মিথ। ওইগুলো আভাস ইঙ্গিত।

জিপ এসে পৌছালো পাহাড়ের নীচে। এক টুকরো সমতল জমির উপর গাড়িটা রাখা হল। সবুজ ঘাস। চূড়োটাকে বলা হয় 'স্বর্ণ শিখর'।

সোজাসুজি কথাটা তুললেন মেজর স্মিথ— শোনো ওবারসোর। আমার বিশ্বাস তুমি নাৎসিদের দলের নও। আমরা কী চাই, ভালো করে জেনে রাখো। কাইজার পাহাড়ে উঠব আমরা। যা কাজ সব ঠিক মতো হয়ে গেলে তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব। বলব—মিউনিখে তোমায় জেরা করে কিছু পাওয়া যাইনি। বুঝেছ?

প্রাণভয়ে ভীত ওবারসোব কৃতজ্ঞ। মেজর স্মিথই তাকে মুক্ত কবতে পারেন। তার একটা সই মানে ওবারসোরের নবজন্ম।

ওরা পাহাড়ে উঠতে থাকল। চারিদিকে পাইন গাছ। স্মিথের পোশাক পাহাড়ে চড়ার উপযোগী-জ্যাকেট, হাফ-প্যান্ট, জুতো। শুধু বন্দুকটা বইতে হচ্ছে। ওবাবসো সুট পরেছে, পায়ে সাধারণ জুতো। তবুও বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না।

— ওটা কী বলুন তো? নাম নিশ্চয় শুনেছেন।

— তুমিই বলো।

— ওটাই হচ্ছে ফ্র্যানজিসকানার হপ্ট।

— ওহো, তাই নাকি।

—ওরই নীচে ছোটো হিমবাহ বইছে। আমরা পাশ কাটিয়ে উঠব। অনেক ফটিল আছে।

মেজর স্মিথের মানস চোখে এখন শুধু সারি সারি সোনার বাটগুলো ভাসছে। ওবারসোর ঘামছে। অবশ্যই উত্তেজনায়। সোনার বাটগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে নামাতে হবে।

সূর্য এখন তাপ ছড়াচ্ছে।

বড়ো বড়ো পাথর, আব ছোটো ছোটো নুড়ি। খাড়াই বেয়ে উঠছে ওরা। এসে গেছে, এসে গেছে। গুপ্তধনের চুড়ো আর বেশি দূরে নয়।

ভীষণ গরম। চুড়োটা বর্শার মতো, যেন আকাশকে বিধতে চাইছে। ওরা জামা খুলে দৌড়ছে।

সামনে একটা পাহাড়ি বরনা। ওরা মুখ হাত ধুয়ে নিল।

এবার পাহাড়ে উঠতে অত বেশি কষ্ট হচ্ছে না। ওবাবসোর পাথরগুলো টেনে টেনে পরখ করছিল। হঠাৎ সেই টানে একটা পাথর খুলে বেরিয়ে এল। কিন্তু শব্দ শোনা যাচ্ছে। মেজর স্মিথ সামান্য শঙ্কিত।

পাথরটা অনেক নীচে ঝোপের ওপর গড়িয়ে পড়ল।

স্মিথ জিপ্সেস করলেন—এখানে কাছাকাছি লোকজন আছে নাকি?

—না, ‘কুফস্টেন’-এর আগে জনবসতি নেই। কী করে হবে? পশুচারণ অসম্ভব, জলের দারুণ অভাব। শুধু মাঝে-মাঝে কিছু লোক পাহাড়ে চড়তে আসে, পর্বত-আরোহীর দল!

হিমবাহের পাশ দিয়ে যাচ্ছে ওরা। কাঠগুলো বেশ বড়ো। এবং বিপজ্জনক বটে। কুঁজোর মতো চুড়োটা প্রায় একশো ফুট উঁচুতে এখনও! একটা ভাঙাচোরা ‘বিশ্রাম লজ’ দেখা যাচ্ছে। পুবোনো কাঠের পাটাতনগুলো জীর্ণ।

সেই বেস্ট-লজে পৌঁছাতে পাঁচ ঘন্টা লেগে গেল।

টয়লেটের ছুতো করে মেজর স্মিথ একা দল ছেড়ে সরে এলেন। পূর্বমুখী হাঁটতে থাকলেন। এখান থেকে অস্ট্রিয়া এবং ব্যাভিরিয়ার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়।

১২০ স্টেপ যাবার পর একটা পাথরের ছোটো টিবি। গুনে গুনে স্টেপ ফেলছেন স্মিথ। অর্থাৎ ফেবোর পাথরের হৃদিশটা স্মরণ রাখতে হবে।

বন্দুকটা হাতেই আছে। আরও এগোলেন স্মিথ।

ফিরে এসে দেখলেন, কুটিরের মধ্যে আগুন জলছে ওবারসোর। ভয় হল, নীচ থেকে কেউ যদি আগুন দেখে ফেলে!

—ওবারসোর, আরে বাইরে এসো একবার।

—ইয়েস মেজর।

—ওই মোড়কের মধ্যে কী?

—একে বলা হয় 'সলডাট', সেকা মাংস।

—আচ্ছা, এখান থেকে ইনসব্রাক দেখা যায়?

পথ দেখাতে ওবারসোর এগিয়ে গেল। তার পেছনেই স্মিথ। বন্দুক তুলে ধরলেন।

দডাম! দডাম!

দুটি গুলি! ওবারসোরের মাথা পেছন দিকে ঢুকে গেল। অতি সহজে।

ওবারসোর ঢলে পড়ল। পাহাড়ের ঢাল দিয়ে নীচে গড়িয়ে গেল। হিমবাহের জমাট বরফের ওপর আছড়ে পড়ল তার মৃতদেহ।

গুলির শব্দে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি জাগল।

এবার ঢাল বেয়ে নামতে থাকলেন স্মিথ। মনে হল, কেউ যেন তাকে তাড়া করেছে।

দু'হাতে পাথর ঘাঁটছেন তিনি। হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে।

পাগলের মতো যেন পরশমণি খুঁজছেন তিনি।

খুঁড়ছেন, ঘাঁটছেন, খুঁড়ছেন—নানা সাইজের পাথরের টুকরো— অনেকক্ষণ ধরে।

ইউরেকা!

এবার পাওয়া গেছে। কী এটা?

একটা লোহার বাস্ক। জং ধরে ছাইবণ্ডা হয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় বোধহয় অস্ত্র রাখা হত। আবছা নম্বর দেখা যায় এখনও।

প্রায় 'হর' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন স্মিথ। কোনো মতে সামলে নিলেন স্মিথ। এক পলকে দুনিয়ার যতরকম সুখস্বপ্ন আছে দেখে ফেললেন বেস্টলি গাড়ি। মন্টিকার্লোর ফুর্তি, সুন্দর ফ্ল্যাট-ব্যালকনি। দামি পোশাক, বড়লোকি সুস্বাদু যতবকম খাদ্য আছে। শ্যাম্পেন ... আর হাঁ, প্রিয় গলফ খেলাটাও মনে পড়ল বটে।

পনেরো মিনিট একা একা এই দিব্যস্বপ্ন দেখলেন স্মিথ। হাতঘড়ি দেখে উঠে পড়লেন।

বিশাল ভারী বাস্কটা। টেনে তোলা মুশকিল, যদিও দু'পাশে হ্যান্ডেল আছে। একটা দিক ধরে পাথরের ওপর দিয়ে ছেঁড়িয়ে, ঘষতে ঘষতে টানতে থাকলেন। রুমাল জড়ালেন হ্যান্ডেলে।

কুটির পর্যন্ত টেনে আনলেন বাস্কটাকে।

সেই মাংসের টুকরোটা চিবোলেন।

কোথায় রাখা যায় এটা।

এর মধ্যে যা আছে, তার মূল্য নিশ্চয়ই ৫০,০০০ পাউন্ডের কম নয়।

মেজর স্মিথ এই মুহূর্তে তার নতুন পরিচয় ভাবতে শুরু করলেন।

আমি কে? আমি এখন একজন সাংঘাতিক ক্রিমিনাল। এটা গার্ডকে খুন করে ব্যাংক ডাকাতির চেয়েও বড়ো অপরাধ। এখন তিনি রক্ষক নন, ভক্ষক।

তার অপরাধের এখন একটাই শাস্তি— মৃত্যু।

এখন কী করণীয়? এই 'পাপের দৌলত' নিয়ে বাকি জীবনটা সুখে কাটাতে হবে।

হিমবাহের কিনারায় বাস্কটাকে টেনে আনলেন তিনি। এটাকে অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে। শূন্যে ঠেলে দিলেন বাস্কটাকে।

বান বান বানাৎ।

আওয়াজ ভেসে এল। বাস্ফটা কি পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে খুলে গেল? ভালোই তো! মেহনত করে আর খুলতে হল না।

এইবার সাবধানে নামতে লাগলেন। জীবন এখন তার কাছে প্রিয়। এখনই মরণ হলে চলবে না। তিনি এখন বিশাল ঐশ্বর্যের মালিক। বাকি জীবনটা আরামে বিলাসে কাটাতে হবে।

অনেক কষ্টে বাস্ফটার কাছে এলেন স্মিথ।

ওই তো, লোকটার মৃতদেহ। ওবারসোরের শবীর এখন প্রায় বরফ হয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় অজস্র লাশ দেখেছেন তিনি। মৃতদেহ তার কাছে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার ব্যাপার নয়। ওবারসোরের দেহটাকে টেনে একটা গভীর ফাটলেব মধ্যে গলিয়ে ফেলে দিলেন। পা দিয়ে কিছু বরফ আর তুষার ঢুকিয়ে দিলেন পাথরে। সুন্দর কবর হয়ে গেল দেহটার।

এবার বাস্ফটার কাছে এলেন স্মিথ।

হ্যাঁ, প্রকৃতি তার কাজ সহজ করে রেখেছে। পাথরে ধাক্কা খেয়ে খুলে গেছে বাস্ফের ডালা।

হ্যাঁ, যা আশা করেছিলেন, তাই। সূর্যের আলোয় বাকমক করছে সোনার বাট। থাকে থাকে সাজানো। ঈগল পাখির পায়ের নীচে স্বস্তিকা চিহ্ন! রাইফস ব্যাংকের টাকশালের ছাপ—১৯৪৩—খোদাই করা।

বাস্ফের জিনিস বাস্ফেই রেখে তালো বন্ধ করলেন স্মিথ। বাস্ফটাকে দড়ি দিয়ে বাঁধলেন। ধাক্কা খেয়ে একটা দিক তুবড়ে গেছে। এবার মোটা দড়িটা হেঁচড়ে টেনে বাস্ফটাকে টেনে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে নামতে থাকলেন।

বেলা একটা। প্রচণ্ড রোদ। প্রখর তাপ সূর্যের।

হিমবাহের জলে রুমাল ভিজিয়ে ঘাড়-কপাল-মুখ মুছলেন। আপাতত এই ঢালটা ঠিক আছে। কিন্তু তারপর? এই প্রচণ্ড ভারী বাস্ফটাকে প্রায় কুড়ি মাইল নিয়ে যাবেন কী করে? কাঁধটা আহত। ওই আহত কাঁধে বাস্ফ বইবেন কী করে?

যে করেই হোক, সাফল্য চাই। বহুতেই হবে।

পাহাড়ের নীচে একটা ফারগাছ। ফুলে ফুলে ভরে আছে। তার তলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। সামান্য দূর হল ক্লাস্তি।

দুটো মোটা সোনার বাট বের করলেন। শাটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। এবার বাস্ফটাকে এক জায়গায় পুঁতে রাখতে হবে।

গর্ত খোঁড়া হল। বাস্ফটাকেও কবর দেওয়া হল। তবে চিরকালের মতো নয়। প্রয়োজন মতো মাঝে মাঝে এসে এই কবর খুঁড়ে তাকে বের করে আবার কবর দেওয়া হবে। এইভাবে চলবে, আর পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-ঐশ্বর্যের শীর্ষে উঠে যাবেন মেজর স্মিথ।

কাজটা শেষ হল। অর্থাৎ, সোনার বাট ভর্তি বাস্ফটাকে মাটির তলায় চাপা দেওয়া।

এবার কী অমানুষিক কষ্টে তিনি জিপের কাছে পৌঁছালেন। তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। পোশাকের মধ্যে দুটি বিশাল ওজনের সোনার বাট। এ দুটোও তাকে শক্তি জুগিয়েছে—অবশ্যই,—তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জিপের কাছে এসে মাটিতে গুয়ে পড়লেন তিনি। এই হাঁটা তার প্রাণশক্তি গুণে নিয়েছে। পরিশ্রান্ত স্মিথ যেন কিছুক্ষণ লুটিয়ে পড়ে রইলেন।

কাজ বাকি আছে। এই ভারী, বিশাল ওজনের সোনার বাট দুটো নিয়ে তো শহবে ফেরা যাবে না। এগুলোকেও সাবধানে রাখতে হবে। এখানেই কোথাও! কোনখানে?

এমন জায়গায়, যেখানে চিহ্নটা শুধুমাত্র মেজর স্মিথের মনে থাকবে। আর কেউ বিন্দুমাত্র বুঝতে পারবে না।

তারপর হোটেল ফেরা, জিপ চালিয়ে।

চেহারা হাল এখন বুনো জানোয়ারের মতো হয়েছে। স্নান সেরে জামাকাপড় পালটে ভদ্র হতে হবে।

ঘরে ফিরে একবোতল মদ, রাতের খাবার — তারপর মরার মতো ঘুম। পরদিন M.O.B. বাহিনীর অভিযান মিটারসিল ভ্যালির দিকে।

এরপর দু'মাস কেটে গেল। যুদ্ধ থেমে গেছে।

লন্ডনে ফিরলেন স্মিথ।

কিন্তু যুদ্ধের লড়াই থামলেও জীবনে সমস্যার লড়াই চলতে থাকল স্মিথের। সোনা স্মাগলিং এক বিরাট সমস্যা। কিন্তু সোনার বাট দুটো তো সারাফক্ষ বয়ে বেড়ানো যায় না। সবচেয়ে ভালো যদি ইংলিশ চ্যানেলের ওপরে কোথাও লুকিয়ে রাখা যায়।

তাছাড়া সরকারি কাজ শেষ হচ্ছে না। জিজ্ঞাসাবাদের বিশেষ পদ নিয়ে জার্মানি গেলেন। সোনার বাট দুটো এখনও নিজের বাসস্থানেই, একটা সাধারণ লোহার ট্রাংকে রাখা।

প্লেনে করে বার দু-তিন ইংল্যান্ডে যাবার সময় বাট দুটো একটা একটা করে নিয়ে যাবার চিন্তা করেছিলেন।

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত নিজের এক বুড়ি কাকিমার খোঁজ পেয়ে গেলেন। তিনি থাকেন কেনিংসটনে! তার ঘরে একটা নিরাপদ জায়গা পাওয়া গেল।

M.O.B. হেডকোয়ার্টারের বহু মেয়ের সঙ্গে রাত কাটাতেন। তাদেরই একজনকে বিয়ে করলেন।

তারপর চাকরি ছেড়ে জ্যামাইকা চলে গেলেন।

মেয়েটা, মানে তার স্ত্রী, একসময়ে উইমেনস্ রয়্যাল নেভাল সার্ভিসে কাজ করত। মোটামুটি সুন্দরী।

এরপর জ্যামাইকায় স্থায়ী বসবাস। এখানে কোনো কড়াকড়ি নেই। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের জের জ্যামাইকার উপর পড়েনি। মনোরম জায়গা, আলো ঝলমল, সূর্যকিরণ, সুস্বাদু খাবার, ঢালাও মদ, সঙ্গে নববিবাহিত স্ত্রী মেরি।

মেরিকে ইতিমধ্যে সোনার বাট দুটো দেখানো হয়েছিল। অবশ্যই রাইখস্‌ব্যাকেব ছাপগুলো টেঁছে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মেরিকে বুঝিয়ে বলেছিল— শোন। পাউন্ডের দাম কমেছে। কাগজের নোটের কী দাম আছে বলো? এই সোনার বাটের টুকরো বেচে যা পাব, সারা জীবন স্বর্গসুখে কেটে যাবে।

স্ত্রী মেরি কর্নেল আহ্লাদে আটখানা। স্বামীর গলা জড়িয়ে চুমু খেল।

—ওঃ স্মিথ, তুমি সত্যিই দারুণ লোক! আমি সৌভাগ্যবতী! এখন আমরা ধনী!

—অবশ্যই ধনী! কিন্তু খবরদার, রহস্যটা যেন ধরা না পড়ে। তাহলে দারুণ বিপদ! জ্যামাইকার সব ডাকাত আমাকে অ্যাটাক করবে!

— পাগল নাকি! একথা কেউ ফাঁস করে।
স্ত্রী এখন ঐশ্বর্যবান স্বামী সোহাগিনী।

এটার নাম প্রিন্সেস ক্লাব — রাজপুত্রদেব ক্লাবই বটে। জাঁকজমক বাহারের দিক থেকে। অতিথি ও আগন্তুক-সদস্যদের সর্বকম ভোজনের আপ্যায়িত করার ব্যবস্থা রয়েছে।

এবার দুজন নতুন অতিথি-সদস্য — স্মিথ আর মেরি। ব্যস, এখন দিনগুলো যেন সোনার খাঁচায় বন্দি হয়ে গেল। নিজেদের নিয়ে মত্ত তারা। খানা-পিনা, নাচ-গান, আনন্দফুর্তি! মেরির জন্য টেনিস লন। স্মিথের জন্য গলফ-এর মাঠ। সন্ধ্যাবেলা মেরি ব্রিজ খেলে। আর স্মিথ তখন তার 'লোকজন', মানে সামুদ্রিক প্রাণী, পোকামাকড় নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

দু'হাতে খবচ হচ্ছে কুবেরের ধন।

গ্লোমাইকায় ফু-ব্রাদার্সরা খুব সম্মানিত। তারাও বিশাল বিত্তশালী। এখানকার চিনজাতির অবিসংবাদী নেতা।

এদিকে বিশ্ববাজারে সোনার মূল্য বেশ বেড়েছে। এক আউন্স পর্যট্রিশ ডলার, টানজানিয়া বা মরক্কোতে প্রায় ১০০ ডলার। ম্যাকাওতো সোনা স্যাগলিং-এর পীঠস্থান — হংকং -এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ফু-দুই ভাই জমিয়ে কারবার করছে।

সোনার বাট দুটো দেখে ফু ভাইরা খুশি। শুধু মুছে ফেলা ছাপ দেখে জিজ্ঞেস করল — কোন দেশের সোনা?

বড়ো ভাই খুব ভদ্র। বলল— মেজর, যাচাই করাব কোনো প্রশ্ন নেই। তবুও বিশ্ববাজারে কিছু ব্যাংক এবং ব্যবসায়ীরা কাছে সোনা আছে যেগুলো সম্পূর্ণ খাঁটি নয়।

মেজর স্মিথ জিজ্ঞেস করলেন— জাল সোনা? গিলটি করা সিসের বাট?

—না, না। সে কথা বলছি না। তবে আপনার এই সোনার বাট দুটো কোন দেশের?

—মনে পড়ছে না। যুদ্ধের সময়ে—

—বেশ। যদি মনে না পড়ে। আম'র যাচাই করে নিতে পারি। নানারকম পদ্ধতি জানা আছে আমাদের। মানে, খাঁটি সোনা পরীক্ষার পদ্ধতি। এগুলো এখন আমাদের কাছে থাক। দয়া করে, লাঞ্ছের পর আসুন।

ওদের কাছে সোনার বাট রেখে যেতে হবে। ত'ছাড়া উপায় কী। ওদের বিশ্বাস করতে এখন মেজর স্মিথ বাধ্য। কী দাম বলবে কে জানে! যা বলবে তাই মনে নিতে হবে।

লাঞ্ছের পর আবার মিটিং। ওরা ব্রিফকেস খুলে বাট দুটো বার করল। টেবিলের ওপর সাদা রাইটিং প্যাড, এবং সোনার ফাউন্টেন পেন।

বড়ো ভাই বলল— দেখলাম। চমৎকার! সোনা'র বাট দুটো কোথাকার, বুঝে গেছি। আপনার নিশ্চই জানতে আগ্রহ হচ্ছে?

—তা হচ্ছে বইকি!

—জামানির। খুব সম্ভব রাইখস্‌ব্যাকের টাকশালে তৈরি। এতে ১০% সিসা আছে অবশ্য। হিটলারের আমল থেকে এটুকু খাদ মেশাবার পদ্ধতি চালু হয়েছিল। এতে অবশ্য শেষ পর্যন্ত জার্মানদের লাভ হয়নি। সুইজারল্যান্ডে দাম কমে গেল, আরও নানা জায়গায়।

—তার মানে বাট দুটো কে 'আসল সোনা' বলে ধরা হবে না। আপনারা এক্ষেত্রে কী করে থাকেন?

—না, না তা নয়। পুরো খাঁটি নয় তো কী হয়েছে। আমরা যথেষ্ট দাম দেব। মানে ‘একস মিন্ট প্রাইস’ যাকে বলে। প্রায় খাঁটি সোনার দর দিচ্ছি—উনআশি ডলার।

—দামটা কম হয়ে গেল না?

—এর দাম কত হতে পারে, আপনার কোনো আইডিয়া আছে মেজর?

—না।

—খুববেশি হলে এক লাখের কিছু বেশি। এর থেকে আমাদের দালালি—দশ ডলাব— বাদ যাবে। ভেবে দেখুন—

একটু ভেবে মেজর স্মিথ বললেন— অল রাইট। আমি রাজি।

আরেকবার করমর্দন।

শুরু হয়ে গেল কারবার। তিনমাসে একবার তিনি ফু ভাইদের কাছে আসে। হাতে খালি ব্রিফকেস। সেটা পাঁচশো পাউন্ডের করকরে জ্যামাইকান নোট ভর্তি করে চলে যান।

সুন্দরভাবে কারবার চলছে। কোনো গোলমাল হয়নি। নিয়ম, শর্ত, বোঝাপড়াব একটুও এদিক ওদিক হয়নি। এমনকি ইনকামট্যাক্স-এর ব্যাপারটাও ফু-ভাইরা ‘ম্যানেজ’ করে দেয়।

হঠাৎ একবার দেখা গেল টাকাটা পাঁচশোর জায়গায় চারশো পাউন্ড। কেন?

কৌতূহল হলে প্রথমে কিছু বললেন না মেজর স্মিথ। কিন্তু টাকাটা হঠাৎ কমে গেল কেন— এই প্রশ্নটা তাকে চিন্তাগ্রস্ত করল।

প্রসঙ্গটা তোলা হয়নি। তাই কোনো তিক্ততাও হয়নি। বচসা, তর্কাতর্কিও নয়।

হঠাৎ প্রথমবার হার্ট অ্যাটাক হল মেজর স্মিথের—কয়েক বছর অতি আরামে কেটে যাবার পর।

ডাক্তার খাবারের উপব নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। মদ্যপানও চলবে না।

মদের ব্যাপারে শাসনটা মানতেন না স্মিথ। লুকিয়ে চুরিয়ে পানপর্ব সারতেন। মেরি মেনে নিয়েছিল। আসলে কিছু করার ছিলনা তার। স্মিথ ভীষণ জেদি।

তবু মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করত মেরি। বুড়ো কয়সে স্ত্রীর প্রতি প্রেম বাড়ে। তাই মেজর স্মিথ এবার শিশুর মতন অভিমান শুরু করলেন।

মেরি একদিন রাগ করে ঘুমের বড়ি খেল। আসলে স্মিথের উপর চাপ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পরিমাণটা সত্যিই বেশি হয়ে গেল।

ফলে মারা গেল মেরি।

এটা একধরনের আত্মহত্যা। ব্যাপারটা তাই চেপে যাওয়া দরকার। একবার পুলিশের হাত পড়লে সেটা কতদূর গড়াবে, কে জানে!

তবু নানা সন্দেহ- গুজব রটতে থাকল।

মেজর এবার পালিয়ে নর্থ-শোরে চলে এলেন।

বিপত্নীক। একলা জীবন।

কিংসটন থেকে মাইল তিনেক দূরে। একটা বাড়ি পছন্দ হল। নাম দিলে—‘তরঙ্গিনী’, ‘The waves’ জাতীয়।

কিছুদিন পরে দ্বিতীয় হার্ট অ্যাটাক।

ইতিমধ্যে অবশ্য সামুদ্রিক প্রাণীদের নিয়ে একটা সংসার গড়ে তুলেছেন। কিন্তু মদের মাত্রা

কমেনি। ক্রমাগত মদাপান তাকে মৃত্যুব দিকে নিয়ে যাচ্ছে - সেটা জেনে বুঝেও সাবধান হচ্ছেন না তিনি।

কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যুর আগমনের সম্ভাবনায় তত ভীত বা চিন্তিত ছিলেন না স্মিথ।
হলে, হবে।

কিন্তু যেটা আদৌ ভাবাছিল না, সেই বিপদটা এল।

কোথা থেকে হঠাৎ হার্জির এই জেমস বন্ড নামে লোকটা। তার পকেটে যেন একটা মৃত্যু পরোয়ানা রয়েছে।

এই হল অতীতের প্রেক্ষাপট।

এখন এই মুহূর্তে মেজর স্মিথের হাতঘড়িতে ১২-০৫। আরেক গেলাস ব্র্যান্ডি -জিঞ্জার মিক্সচার গলায় ঢেলে বাগানে এলেন তিনি।

বন্ডের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে যা বলার সবই বললেন।

বন্ড বলল -হ্যাঁ, আমার আইডিয়ার সঙ্গে মিলেছে।

লিখিতভাবে সই করে রিপোর্ট দিতে হবে কি?

-দিলে ভালো। তবে আমার কোনো দরকার নেই।

এটা আপনার প্রাক্তন সেনাদলের লোকদের কাজ। আইনগত ব্যাপারটাও আমার কাজের মধ্যে পড়ে না। তবে আমাকে আমাব দপ্তরে একটা বিপোর্ট দিতে হবে। তারা সেটা বয়্যাল মেরিনস্কে পাঠাবেন। তারপর স্কটল্যান্ড মাবফত পাবলিক প্রসিকিউটরের হাতেও যাবে গোটা ব্যাপারটা।

- একটা কথা।

-বলুন।

-ওরা কী করে জানতে পারল? এতদিন পরে?

-হিমবাহের নীচ থেকে ওবারসোর এর লাশ বেরিয়ে এসেছিল। কয়েকজন পর্বত-আরোহী মৃতদেহটা তুলে আনে। ওবারসোর-এর জামার মধ্যে কিছু কাগজপত্র ছিল অটুট। সেই কাগজগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ঘটনাটা এগিয়ে গেল। সূত্র ধরে সলোটটাও পাওয়া গেল। সেটা কোন বন্দুকের বুলেট সেটা ধরা গেল।

-কিন্তু মি. বন্ড, এর মধ্যে আপনার কী ভূমিকা?

- MOB আমাদের সার্ভিসের। তাই আমার দপ্তরে সব কাগজপত্র চলে এল। ফাইলটা দেখলাম। এখন আমার হাতে কোনো কাজ ছিলনা। ফলে, খানিকটা আগ বাড়িয়েই কাজটা নিয়ে নিলাম।

মেজর স্মিথ নিশ্চুপ।

বন্ড বলল—আরেকটা ব্যাপার আছে। এই ওবারসোর আমার দূর পরিচিত, প্রায়-আত্মীয়ের মতো। চমৎকার লোক। যুদ্ধের সময় ওর কাছে অনেক কিছু শিখেছিলাম।এক সময় তাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করতাম।

—বুঝেছি। আই অ্যাম সর্বি।

বন্ড উঠে দাঁড়াল।

--আমায় কিংসটন ফিরতে হবে। চলি।...আপনাকে নিতে লোক আসবে, হুপ্তাখানেক পরে।

বন্ডের গাড়ি ঘর্ষর আওয়াজ তুলে লনে নুড়িপাথরের ওপর দিয়ে চলে গেল।

ডুবুরির পোশাক পরে জলে নামলেন স্মিথ।

বন্ডের শ্রাস্ত নিরুদ্বেগ আচরণ, বিশেষ করে তার শেষদিকে উচ্চারিত কথাগুলো তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।

বন্ড ওকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলনা কেন? কেন এক সপ্তাহ পর লোক আসবে তাকে অ্যারেস্ট করতে? এই কালক্ষেপের কাবণ কী! অনেকটা যেন এইরকম—আসামিকে তৎক্ষণাৎ ফাঁসির মঞ্চে না তুলে, তার হাতে একটা রিভলবার ধরিয়ে দিয়ে চলে যাওয়া।

জ্যামাইকা রেজিমেন্টের কেউ যদি গ্রেপ্তার করতে আসে, সেটা তো বন্ড নির্দেশ দিলেও হতে পারত!

অতএব মনে হয়, মেজর স্মিথকে এই একসপ্তাহের মধ্যে ভেবেচিন্তে আত্মহত্যার সুযোগ দিল বন্ড।

কিন্তু কী করবেন মেজর স্মিথ? আত্মহত্যার বিকল্প কী? অনেক লাঞ্ছনা, দুর্দশা, অপমান! খবরের কাগজে বড়ো বড়ো হেডলাইনে তার অপকীর্তির প্রচার!

তারপর আদালতের শাস্তি মেনে নেওয়া—কমপক্ষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সেই কারাবাসে নিদারুণ মানসিক কষ্ট।

এবং, তারপরে তৃতীয়বাবের হার্ট অ্যাটাক অসম্ভব নয়।

ভালোই। মৃত্যু হলে, পরলোকে স্ত্রী মেরির সঙ্গে দেখা হবে।

আরেকটা পথ, সব দোষ স্বীকার করে নিয়ে আদালতের কাছে মার্জনা চাওয়া। সেটা অবশ্য প্রাণভয়ে ভীত এক মানুষের ভিক্ষাবৃত্তির মতো হবে।

পুরোনো ট্রাংকে সামরিক পোশাক ও মেডেলগুলো নিশ্চয়ই এখনও আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য বিচারের দৃশ্যটা কল্পনা করলেন তিনি।

নাকি মামলা চালিয়ে যাবেন। উচ্চ আদালত পর্যন্ত?

দু-পেগ জিন-খেয়ে জলে নেমেছিলেন।

সঙ্কের সময় একটা ককটেল পার্টি আছে আবার! তারপব পার্ক বিচ ক্লাবে ডিনার।

এবার নিজের কাজে মন দেওয়া যাক।

সেই স্কর্প-শিকার। বিষাক্ত মাছটিকে এখনও মারা যায় নি। যাকে মেরে অস্ট্রোপুসির মুখেব কাছে তুলে ধরা হবে।

হঠাৎ চোখে পড়ল একটা গলদা চিংড়ির শুঁড়।

দূর, মেজর স্মিথের দরকার স্কর্পিয়ান ফিশ। আব বেশি সময় নেই তার হাতে।

বালিব ওপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তার সাক্ষাৎ মিলল। প্রায় এক পাউন্ড ওজন হবে। লাল চোখ কটমট করছে। ত্রিশূলটা দিয়ে এককোপে গাঁথতে হবে। ব্যর্থ হলে, সে ওই বিষাক্ত কাঁটা নিয়ে ছুটে এসে পালটা আক্রমণ করবে।

আবার কিছুটা জলে নামলেন।

ব্যাস, ত্রিশূলের এক মোক্ষম ঘা।

কিন্তু মিস হল। ত্রিশূলের মৃদু স্পর্শ হয়তো লেগেছে। কিন্তু ক্ষতি হয়নি তার। সে পাখির মতো ডানা ঝাপটে মেজর স্মিথের পেটের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটা শ্যাওলা ভরা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

—ওঃ হেল!

মেজর আক্ষেপ করলেন।

বুকের কাছে একটা ব্যথা! যেন মৃত্যুর পদধ্বনি।

অথচ কাজটা সারা গেল না।

জল ছেড়ে উঠে এসে একটা বেঞ্চিতে বসলেন।

ইস, তলপেটটা কেমন অবশ হয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা আলতো আঁচড় লেগেছে। সেই স্কর্পিয়নটা পেটের কাছ দিয়ে চলে যাবার সময় কাঁটার মাথাটা মৃদু স্পর্শ করে ছিল তাব তলপেট। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত!

কী হবে এব ফল? বিষের ক্রিয়া এইটুকুতেই মাবাত্মক হবে না কি? আঙুল দিয়ে দেখলেন, চামড়ায় কোনো সাড় নেই। একটু যন্ত্রণাও শুক হয়ে গিয়েছে ভেতরে।

বইয়ে যতটুকু পড়েছেন, তাতে মেজর স্মিথ জানেন, স্কর্পিয়নের কাঁটার ঘষা খেলে জীবনের মেয়াদ বড়ো জোর পনেরো মিনিট।

সর্বনাশ!

চিকিৎসার ওষুধ আছে—প্রোকন, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিহিস্টামিন, যদি হার্টে সব সহ্য হয়।

কিন্তু এখানে হাতের কাছে সে সব কোথায়?

ভিলায় যদি ফিরে যাওয়া যায়, তবুও ডাক্তারকে খবর দিতে, এবং ডাক্তার আসতে অন্তত একঘন্টা তো লাগবেই।

অসম্ভব যন্ত্রণায় এবার স্মিথের শরীর বেঁকে গেল। হাতে-পায়ে আঙনের হলকা—পুড়িয়ে দিচ্ছে যেন। ঠোঁট দুটোয় যেন সূচ ফোঁটাছে।

স্কর্পিয়ন ফিশটার কথা ভোলা যাচ্ছে না।

অক্টোপুসিকে খেতে দিতে হবে। সে ক্ষুধার্ত, অপেক্ষা করছে।

একা একাই চিৎকাব করলেন স্মিথ—ওরে পুসি, মাই ডিয়ার পুসি, তোর শেষ খাবার তোকে দিয়ে যাব আমি।

বলাব সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ভাগ্য। স্কর্পিয়ন ফিশটা আবার হাতের নাগালে চলে এসেছে। বিম মারা শরীর নিয়ে হামাগুড়ি দিলেন মেজর। মুঠো করে ত্রিশূলের হ্যান্ডেলটা ধরলেন। এক হাতে তলপেট চেপে, আরেক হাতে ত্রিশূল নিয়ে বালির উপর ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে এগোলেন। লক্ষ্যভেদ চাই!

আবার আঘাত।

এইবার সফল। ত্রিশূলের ত্রিমুখে গেঁথে গেছে থলথলে স্কর্পিয়ান, ছটফট করছে, মরেনি। এত সহজে মরে না ওরা।

এইবার অক্টোপুসিও কাছে চল। আমার পুসির কাছে, মাই ডিয়ার পুসি। কতদিনের স্বাদ তাকে এই খাবারটা খাওয়াবেন তিনি।

জলে ডুব দিলেন।

অক্টোপুসির গর্তটা প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে এখনও। এক কোমব জলে। মুখোশের ভিতর মুখ পুড়ে যাচ্ছে। তবে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত মেজর। মিলিটারি ম্যান, এগিয়ে যাচ্ছেন। এ-ও এক যুদ্ধ!

হ্যাঁ, পৌঁছে গেছেন।

হঠাৎ মনে হল কাজটা উচিত হচ্ছে তো। ভুল হচ্ছে না তো। পুসি যদি এই টোপ গিলে মারা যায়? স্যার বেঙ্গরি অক্টোপাস নিধনের নতুন দাঙুয়াই আবিষ্কার করতেন পারতেন।

ত্রিশূলে গাঁথা ঋর্পিয়নটা এগিয়ে দিলেন তিনি।

কিন্তু তার প্রিয় অক্টোপুসি এগিয়ে এসে আঁকড়ে ধরল তার হাতটা। হ্যাডশেক!

হ্যাডশেকই বটে, নির্মম করমর্দন। হাতটা টেনে নিচ্ছে অক্টোপুসি। তার প্রতিপালকের হাত।
শুঁড়ুগুলো সাপের মতো জাপটে ধরলে পাকে পাকে।

মুখোশটা খুলতে পারছেন স্মিথ। টানাটানি করে কোনো লাভ হচ্ছেনা।

আর্তনাদ করলেন স্মিথ! কে শুনছে এই পাণ্ডুবর্জিত জায়গায় মেজরের আর্তনাদ!

ক্রমশ জলের নীচে তলিয়ে গেল মেজরের মাথাটা। জলের বুকে কয়েকটা বুদবুদ জেগে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে।

পুরো উর্ধ্বাঙ্গ এবার জলে ডুবে গেছে। শুধু দুটো পা জলের উপর ভাসছে।

টেউ-এর দোলায় দুলছে, প্রাণহীন।

মেজরের প্রিয় অক্টোপুসি তখন কী করছে?

সে তখন পরম তৃপ্তিতে তার পালনকর্তার ডান হাতটার মাংস খুবলে চেখে চেখে খেতে শুরু করেছে। আর হিংস্র প্রাণীর মতো তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে মুখের মধ্যে কামড়ে টেনে নিয়েছে একটা আঙুল!

ঋর্পিয়নের চেয়ে সুস্বাদু নিশ্চই!!

কেটে গেল অনেকক্ষণ। কত ঘন্টা, কেউ খবর রাখে না।

দুজন জ্যামাইকান বোটম্যান মেজর স্মিথের দেহাংশ দেখতে পায়।

ওরা উদ্ধারকার্যে নামে। প্রথমে ত্রিশূলটা দিয়ে অক্টোপাসটাকে গোঁথে ফেলে ওরা। চিৎ করে উলটে দেয়। তারপর একটা ড্যাগার দিয়ে এক কোপে অক্টোপাসের মুণ্ডুটা কেটে ফেলে।

তিনটে মৃতদেহ ডাঙায় তোলে ওরা।

তিনটে?

হ্যাঁ, মেজর স্মিথের দেহটা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ঋর্পিয়ন ফিশ আর অক্টোপুসির দেহটা সরিয়ে রাখে। পরে রান্না করে খাবে।

রিপোর্টার খবর পাঠায়—অক্টোপাস মেজর স্মিথকে মেরেছে।

কিন্তু এই খবর ছাপলে, ট্যুরিস্টরা পালাবে।

তাই 'ডেইলি' প্লীনার ঘুরিয়ে লেখে : 'জল থেকে মেজর স্মিথের মৃতদেহ পাওয়া গেছে'।

আত্মহত্যা?

লন্ডনে ব্যাপারটা তাই রটে যায়।

বন্দ-ও ফাইলের শেষ প্যারায় এই মন্তব্যই লেখে। এতো একধরনের আত্মহত্যা বটেই।

কিন্তু পোস্টমর্টেম করেছিলেন ডা. গ্রিভস নামে এক বিশেষজ্ঞ।

তাই বোধহয় পরিশিষ্টে বিশদ কথা লেখা হয়।

এক মর্মান্তিক মৃত্যু কাহিনি অজানা থাকে না।

॥ দুই ॥

জুন মাসের গরম।।

এই মুহূর্তে প্রচণ্ড।

জেমস বন্ড এখন অফিসে ফাইল দেখছিল। এখন ওব সেক্রেটারি মেরি গুডনাইট। হ্যাঙারে কোটটা রাখা। পেনসিল নিয়ে ফাইলে দাগ দিচ্ছিল বন্ড।

পৃথিবীটা যেন হঠাৎ বেশ শান্ত-ঠান্ডা ভালো ছেলে হয়ে গেছে। খবরের কাগজ, সিক্রেট ফাইল কোনোটাতেই কোনো বামেলা ঝঞ্জাটের সংবাদ নেই। এই শূন্য শান্ত অলস দিনগুলো বন্ডের কাছে ভীষণ অসহ্য। একটা দুটো শুষ্ক প্রবন্ধ পড়েছে সে—রাশিয়ানরা কীভাবে সায়ানাইড গ্যাসকে কাজে লাগাচ্ছে—ইত্যাদি। একরকম খেলনা-পিস্তল বেরিয়েছে যা দিয়ে নাকি অতি সহজে খুন করা যায়। সায়ানাইডের খোঁয়া ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

টেলিফোন। M-ফোন করেছেন, ডাকছেন।

কোটটা পরে নিয়ে মেরিকে খবরটা জানাল বন্ড।

M-এর সেক্রেটারি মিস মানিপেনির মুখ ভাবলেশহীন। বরাবরই এরকম নিরাসক্ত মুখের ভাবটা বোধহয় ইচ্ছে করে তৈরি করেছে সে। তার যে কাজ, তাতে বোধ হয়, এমন মুখেরই প্রয়োজন— যা দেখে কোনো অর্থ-ভাষা কিছুই বোঝা যাবে না। সামান্য স্বাগত হাসিটুকু ছাড়া আর কিছু নেই।

M-এর ঘরে আরেকজন রয়েছেন—বন্ডের অচেনা।

M অলাপ করিয়ে দিলেন।

—ইনি কম্যান্ডার বন্ড। আমাদের রিসার্চ উইং-এর লোক। আর ইনি ডা. ফ্যানশ।

ফ্যানশ এমনভাবে করমর্দন করলেন যেন অজগর সাপকে ছুঁয়ে ফেলেছেন। বন্ডের মনে হল, লোকটার দৃষ্টিতে যেন ক্যামেরার শাটার লাগানো। পলকের মধ্যে খোলে এবং বন্ধ হয়। কোনো ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মনে হয়।

জুন মাসের গরমে আবার কী কোন নাটকের প্রস্তুতি?

ডা. ফ্যানশ-এর পরনে নীল কোট। চকচকে টাইপিন। চোখে কানে ফিতেয় বাঁধা পাঁশনে চশমা। এক মুহূর্তে এব চরিত্র-পরিচয় কল্পনা করার চেষ্টা করল বন্ড—লেখক, সমালোচক, বিয়ে করেননি। হয়তো কিছুটা হোমো সেক্সু 'ল'!

M বললেন— ডা. ফ্যানশ প্রাচীন রত্নরাজি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। কাস্টমস এবং সি.আই.ডি-এর উপদেষ্টা। মিস ফ্রয়েডেনস্টাইনকে নিয়ে ব্যাপ'বটা সম্পর্কে আমি ওনাকে ডেকেছি।

ভুরু কুঁচকে চিন্তাগ্রস্ত বন্ড।

মিস ফ্রয়েডেনস্টাইন। সে একজন স্পাই। ইংল্যান্ডে নিযুক্ত। কাজ রাশিয়ান K.G.B. সংস্থার হয়ে গুপ্তচরের দায়িত্ব পালন। যোগাযোগ বিভাগে কাজ করে যে, ওর একটা বিশেষ কাজ আছে, তাকে বলে 'পার্পল সাইকার'। একধরনের সাংকেতিক বার্তা সম্বন্ধে তথ্য উদ্ধার করা। এই লিপি উদ্ধার করে যে মূলত ওয়াশিংটনে C.I.A. কে পাঠায়—আসলে C.I.A. কে বিভ্রান্ত করাই তার কাজ। এদের বলা হয় —'ডাবল এজেন্ট'পদ, সেকসান নং ১০০-এ।

মিস ফ্রয়েডেনস্টাইন যে রাশিয়ার স্পাই, সেটা জেনে বুঝেই এখানে কাজ করতে দেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্য রাশিয়ানদেরও বিভ্রান্ত করা।

তিনবছর হল কাজ করছে সে।

M বললেন—ডা. ফ্যানস। ব্যাপারটা কম্যান্ডার বন্ডকে বলুন।

—নিশ্চই! মি. বন্ড, আপনি নিশ্চই বিশ্বের খুব নামকরা জুয়েলারী বিশেষজ্ঞ ফাবেয়ার্জের নাম শুনেছেন, সে রাশিয়ান।

—শুনেছি। জার ও জারিনাদের নানারকমের অদ্ভুত অনেক কিছু তৈরি করতেন। ইস্টার এগ নামে—

—হ্যাঁ। ইস্টার এগ ছাড়াও আরও অনেক কিছু বানাতে জানতেন। বিশেষ করে জড়োয়ার কাজ। অপূর্ব! খুবই দামি ঐশ্বর্যের জিনিস। তারই আঁকা একটা ডিজাইন থেকে জানা গেছে একটা নাম—মিস মারিয়া ফ্রয়েডেন স্টাইন। প্যারিস থেকে রেজিস্ট্রি করা একটা জিনিস পৌছেছে।

—আপনি কী করে খবর পেলেন, ডক্টর?

—আমি এক্সাইজ বিভাগকে পরামর্শ দিই। দামটা, বলা হচ্ছে—এক লক্ষ পাউন্ড। আমার মতে, একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। প্যাকেট খুলে আমাকে দেখানো হয়েছে।

—জিনিসটা কী?

—ওটা এক ধরনের ‘মরকত-গোলক’ বলা যায়।

—তারপর?

—বললাম, দামটা একটুকমই ধরা হয়েছে। সঙ্গে একটা দলিল আছে—রাশিয়ান ও ফ্রেঞ্চভাষায় এই রত্নটার ইতিহাস বলা হয়েছে। একটা ফটোস্টেট কপি আমি করেছি। তাতে মিস ফ্রয়েডেনস্টাইন সম্পর্কে উল্লেখ আছে। কারণ, তারই পিতামহ ১৯১৭ সালে ফারোয়ার্জকে এটি বানাতে অর্ডার দেন। রুবল সংক্রান্ত কারণ জড়িত আছে। যাইহোক ১৯১৮ সালে তার মৃত্যুর পর এটা তার ভাই দখল করে। সেখান থেকে এটা পায় মিস ফ্রয়েডেন স্টাইনের মা। কিন্তু ওরা খুব অল্প বয়সেই রাশিয়া ছেড়ে প্যারিসে চলে আসে। জার-অনুরাগী রাশিয়ান এলাকায় আশ্রয় নেয়। মারিয়ার মা অবশ্য অবৈধ সম্ভান। গত বছর সে মারা গেছে। দলিলে বলা হয়েছে—রত্নটির মালিক এখন মায়ের উত্তরাধিকারিণী মারিয়া ফ্রয়েডেনস্টাইন। দলিলে অবশ্য কারোর সই নেই। যাইহোক, রত্নটা রেজিস্ট্রি পোস্টে প্যারিস থেকে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে।

ডক্টর ফ্যানশ বলতে থাকলেন— নিলামদার সাদবির বিজ্ঞাপন দেখে আমার কৌতূহল জাগে। বলা হয়েছিল ‘জৈনিক ভদ্রমহিলার সম্পত্তি’। বিজ্ঞাপন ছাপার সাত দিন পরে ছিল নিলামের তারিখ। মেয়েটির সঙ্গে দেখা করলাম।

সে একই কথা বলল। যখন জানলাম ‘মিনিষ্ট্রি অব ডিফেন্স’-এ কাজ করে তখন মনে হল, এই লাখ পাউন্ডের চেয়ে বেশি দামী একটা রত্ন সে যে বিদেশ থেকে পেয়েছে—বা তার কাছে পাঠানো হয়েছে, এর একটা রহস্য আছে।

M জিজ্ঞেস করলেন—মূল সূত্রটা কী? মানে এই রত্নটার?

—দেখুন ফাবেয়ার্জ যত জিনিস তৈরি করেছিল তার ৯০% রাশিয়ার বাইরে চলে যেত। কয়েকটা ক্রেমলিনে পড়ে আছে। রাশিয়ানরা একে পুঁজিবাদি মনের খেয়ালি ফল বলে মনে করে।

—ক্রেমলিনে এরকম জিনিস আছে?

—থাকতে পারে। নানা রকমের জিনিস। কিছু গোপনে কিছু প্রকাশ্যে। যেমন পান্নার একটা বল নিয়ে নানা গাল-গল্প শুনেছি। প্রশ্নটা হল, এটা হঠ্যাৎ ইংল্যান্ডে কাজ করছে, এমন একজন গুপ্তচরের কাছে পাঠাবার রহস্যটা কী?

—আপনার কী মনে হয়?

—ব্যংকে সবাই বড়ো অঙ্কের টাকা জমা দেবে। তারপর—সাদবির নিলামে কত দাম উঠবে বলে আপনার মনে হয়?

—চড়া দাম হবে। বলা মুশকিল। তবে লাখ পাউন্ডের কম হবে না।

M একটা হাঙ্কা মস্তব্য করেন। ড. ফ্যানশের কিছুটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বোঝা যায়, রক্তের উপর কারু- শিল্পকে কতটা শুদ্ধ করে। M লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চান।

বন্দ ইচ্ছে করেই বলল— এর মধ্যে আমি কোনও রহস্য বা ঘোরপ্যাঁচ কিছু দেখছি না। তবে ড. ফ্যানশ যে, এই ব্যাপারে কষ্ট স্বীকার করছেন সেটা অবশ্য প্রশংসনীয়।

খানিকটা রাগত ভাবে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ড. ফ্যানশ। সামান্য হ্যান্ডশেক। বাস! বন্দ তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

M কিছু কাগজপত্র ঘাঁটলেন। হঠাৎ তার চোখ চকচক করে উঠল। যেন কিছু আবিষ্কার করেছেন। ১৯৩৫ সালে প্যারিসে মিস ফ্রীয়েভেনস্টাইনের জন্ম। জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাহিনীতে ওর মা কাজ করেছিলেন। যুদ্ধের পরে সরবোনে গিয়ে এমবাসিতে কাজ পায়। নৌবাহিনীতে দো-ভাষীর কাজ করে।

M—বলেন— বাকি খবর তো জানই। যৌন-জীবনের কেছায় জড়িয়ে পড়ে সে যার হাতের মুঠায় চলে যায় সেই লোকটা রাশিয়ার NKVD-র হয়ে কাজ করত। মেয়েটা জোর করে, অনেকটা ব্ল্যাকমেলিং কবে ওদের স্পাই করে নেয়। মায়ের দৌলতে মেয়েটা ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পায়। কারণ অফিস ওকে আমাদের কাছে পাঠায়।

M- খোঁয়া ছেড়ে বলতে থাকেন।— এইবার মেয়েটা একটা মহা ভুল করে। আমাদের কাজে যোগ দেবাব আগে সে একমাস ছুটি নেয়। সেই ছুটিতে সে কী করেছিল খোঁজ নিয়ে আমরা জানতে পারি, ও গিয়েছিল লেনিনগ্রাদে গুপ্তচরের ট্রেনিং নিতে। ফিরে আসার পর আমার অবশ্য ইচ্ছে করেই ওকে নিলাম। ‘পার্পল সাইকারে’র কাজে ঢুকিয়ে দিলাম।

সেই থেকেই কাজ করছে মেয়েটা। KGB-র হয়ে।

হঠাৎ এক বিশাল রক্তে আগমন। এটা একটা নতুন ধরনের টোপ। হয়তো নকল চিহ্ন! মেয়েটা কিন্তু এই কাজের বিনিময়ে কিছু পায়নি। এটাও ভাবার মতো। তবু সে কাজ করছে কেন? ওর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মাত্র পঞ্চাশ পাউন্ড আছে।

M বললেন — তবে এখন শোনা গেছে, ওর নামে মোটা টাকার বকশিশ আসবে এখন।

— ওকে ইংল্যান্ডে যারা অর্ডার পাঠাচ্ছে, কলকাঠি নাড়ছে, তাতে খবর নেওয়া হয়নি?

— দরকার পড়েনি। তাছাড়া খোঁজ নেওয়া বেশ কঠিন কাজ। এখানে KGB-র রেসিডেন্ট ডিরেক্টর সম্বন্ধেই কে কতটুকু জানে?

— সাদবিব নিলামটা একটা বড়ো সুযোগ। ওখানেই টেব পাওয়া যাবে— লোকটা কে?

M একটু বিরক্ত।

বন্দ ব্যাখ্যা করে।

— ড. ফ্যানশ নিলামের ডাক সম্পর্কে বলেছিলেন, ওয়াটস্কির লোক যেন সবচেয়ে চড়া দর হাঁকে। জহরি কাবেয়ার্জকে KGB কাজে লাগিয়েছিল, কিন্তু তিনি KGB সম্পর্কে বিশদ কিছু জানতেন না। অনেক সময় KGB-ও সঠিক জানেন তৈরি রক্তের দাম কত হওয়া উচিত। মেয়েটি কত বকশিশ পাবে, সেটাও ধরা মুশকিল। কিন্তু কেউ যদি আরও দর বাড়াতে চায়, সেটা একমাত্র ও রেসিডেন্ট ডিরেক্টরই চাইবে। আমরা ওকে চিনে ফেললে তথ্য পাব। সরকার ওকে ইংল্যান্ড থেকে তাড়াবে। তাছাড়া KGB-ও ওকে ডেকে নিতে পারে। তবে সহজে ফেরত নেবে, যতক্ষণ না উপযুক্ত বিকল্প পায়।

— ঠিক আছে। তুমি এগিয়ে যাও। কাজটা নাও। চিফ অব স্টাফের সঙ্গে কথা বলো। তবে কাজটা পেয়ে যেন নিজের প্রাপ্তিদর বেশি চড়িও না। আমাদের হাতে এখন টাকা কম।

বন্দ শুধু বলল— ওঃ, নো স্যার!

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ তিন ॥

এজেন্ট স্টিট। ১৩৮ নম্বরটা ওয়ার্টস্কিদের দোকান। অতি আধুনিক, শো-কেসে তেমন কিছু জড়োয়া গয়না নেই। মনেই হবে না যে, ফাবেয়ার্জের তৈরি গয়নার এরাই সবচেয়ে বড়ো ব্যবসাদার। মেঝেতে কার্পেট, দেওয়ালে ফুলের টর, এবং কুইন মেরি ও নানা রাজারানিদের ছবি টাঙানো আছে।

বন্দ দোকানে ঢুকেই প্রথমে কেনেথ স্নোম্যান-এর খোঁজ করল। চল্লিশের কাছাকাছি একজন উঠে এলেন, ফিটফাট পোশাক।

বন্দ বলল— ‘আমি CID-র লোক। কিছু কথা আছে। আমার নাম জেমস বন্দ। ইচ্ছে করলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে খোঁজ নিতে পারেন।

স্নোম্যান বললেন— চলুন নীচে যাই।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে দেওয়ালে বিরাট বিরাট শোক্রম বাকবাক করছে। কাচের আড়ালে নানা মণিমুক্তার বলমলে আলো।

বন্দ বলল— কাল একটা মরকতের গোলক নিলাম হবে সে ব্যাপারে কিছু কথা বলব।

— ও, আচ্ছা। কোনো গোলমাল আছে নাকি?

— না— আমাদের কোনো গোলমাল নয়, তবে লেনদেনটা নিয়ে আমাদের কিছু মাথাব্যথা আছে। এই রত্নটার মালিক মিস ফ্রয়েডনস্টাইনকে আমরা চিনি। অহেতুক চাঁচামেচি করে দর চড়াবার চেষ্টা হবে। এটা একটা চক্রান্ত। খবর আছে, আপনারাই সবচেয়ে বেশি দর দিয়ে কিনবেন।— অনেকটা ঠিকই ধরেছেন। আমরা ওটা কিনতে চাই ঠিকই তবে দাম কতটা চড়া হবে জানিনা। অন্যেরাও দর হাঁকাবে, বিশেষ করে মেট্রোপলিটন। তা আপনারা কি ভাবছেন এর মধ্যে কি জালিয়াতি আছে?

— আমরা জালিয়াতির ভয় পাচ্ছি না।

বন্দ বুঝে গেল এই স্নোম্যানের সঙ্গে সব কথা খুলে বলা চলবে না। সে বলল— মি. স্নোম্যান, আশাকরি আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।

— কী রকম সাহায্য? অবশ্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে আমরা অনেকবার হাত মিলিয়ে কাজ করেছি।

— আমি কিন্তু আসলে প্রতিরক্ষা দপ্তরের লোক।

— তাতে কী হয়েছে? আপনি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন।

— ভালো কথা। কিন্তু আপনাদের ব্যাপারগুলো অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের আওতায় পড়ে যে নিলামের দর চড়াবে, সে আসলে ক্রেতা নয়, সে শুধু ব্যাপারটা উস্কে দিচ্ছে আমাদের মতে সে রাশিয়ান দালাল। তাকেই আমরা খুঁজছি। আপনি জানলে তাকে চিনিয়ে দেবেন। এই সাহায্যটাই চাইছি।

— নিশ্চয়ই সাহায্য করব, যদিও ব্যাপারটা খুব সোজা নয়। সাদবি-র কর্তা পিটাভ উইলসন হয়তো নিলাম হাঁকবে। তার উদ্দেশ্যটাও বুঝতে হবে। আমরা কতদূর উঠব, সেটা আমরা জানি। অন্যেরা কতটা লড়বে সেটা এখনই ধরতে পারছি না।... যাকগে, আপনি যখন বলছেন তখন চক্রান্ত থাকতে পারে। লোকটাকে চেনার চেষ্টা নিশ্চয়ই করব।

— প্লিজ তাই করবেন। আচ্ছা, কতদূর উঠবে বলে আপনার ধারণা।

— সেটাই তো বুঝতে পারছি না। অবশ্য জানলেও বলা যেত না। কারণ ক্লায়েন্টের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়টা আমরা সিক্রেট রাখি।

— বন্ড কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। টিকিটটা হাতে নিয়ে একবার চোখ বুলোয়। ঠিক টিকিট নয়, কার্ড। স্লোম্যানের স্ত্রীর সিট নম্বর দেওয়া আছে। কার্ডে বলা হয়েছে একটি মূল্যবান জহরতের পেটিকা এবং ফাবেয়ার্জের তৈরি একটি অসাধারণ কারু-শিল্প বিক্রি হবে। ওই বিশেষ রত্নটি এক মহিলার সম্পত্তি। স্থান— প্রধান নিলাম ঘর প্রবেশপথ সেন্ট জর্জ স্ট্রিট। মঙ্গলবার। ২০ জুন, রাত সাড়ে নটা।

স্লোম্যান জিজ্ঞেস করলেন — ফাবেয়ার্জ-এর তৈরি কিছু জিনিস দেখবেন নাকি? ফ্রেমলিন থেকে আমার বাবা কিনেছিলেন, ১৯২৭ সালে।

বন্ড অল্প কিছুক্ষণ সময় কাটাল সেখানে। তার মাথায় একটাই চিন্তা- লন্ডনে অবস্থিত কে সেই সোভিয়েত গুপ্তচর?

পরের দিনটাও যথেষ্ট টেনশন রইল। সরকারিভাবে এক্ষেত্রে যা যা প্রস্তুতি নিতে হয় সেসব সম্পন্ন করল বন্ড। সাংকেতিক লিপি উদ্ধারের ব্যাপারটাও খেয়াল রাখতে হবে।

ইচ্ছে করেই মিস মারিয়া ফ্রয়েডেনস্টাইনের সংগে সামান্য হাসিতামাশা করল বন্ড। বুঝতে চেষ্টা করল মেয়েটির সাদা ব্লাউজের নীচে কতটা কালো অঙ্ককার? কী অদ্ভুত ধরণের গোপনীয়তা শিখছে এরা। কী সুন্দর চালিয়ে যাচ্ছে! আজ রাতের মধ্যেই মেয়েটা বিশাল ধনী হয়ে যাবে। এই কাজটা বজায়ই এতদিন ধরে অল্প মাইনে মেনে নিয়েছিল। এবার তার কপাল খুলে যাবে। এবার কে জি বি তাকে সুনজরে দেখবে।

কিন্তু বন্ড সতর্ক। প্রতিরোধের জন্য তারা কী করতে যাচ্ছে, সেটা গোপন রাখতেই হবে।

আসলে মিস ফ্রয়েডেনস্টাইন একজন 'ডাবল' এজেন্ট। সে ব্রিটিশ এবং রাশিয়ান— দু'পক্ষকেই ভাঁওতা দিচ্ছে। উচিতমতো সময়ে এদের শেষ করে দিতে হয়। সায়ানাইড, পিস্তলের কথা মনে পড়ল বন্ডের।

॥ চার ॥

আজ জর্জ স্ট্রিট গাড়িতে গাড়িতে ছেয়ে গেছে। একটু পরেই নিলাম শুরু হবে।

বিশাল ভিড়। সিট দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে যার নিজের জায়গায় বসে খাতা পেনসিল নিয়ে হিসাব করছে। একটি সিটে মি. স্লোম্যানকেও দেখা গেল।

ট্যান্সি থেকে নামল বন্ড। তার নির্দিষ্ট আসন ঠিক স্লোম্যানের পাশেই। সেখানেই বসল বন্ড।

ঘরটা বেশ বড়ো। গ্যালারিটা যেন একটা টেনিস গ্রাউন্ডকে ঘিরে রেখেছে। মাথার ওপর ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে। ছোটো ছোটো সোনালি চেয়ারে দর্শকের দল। উপস্থিত সকলেই সুসজ্জিত।

নানা কথাবার্তা চলছে... পনেরো হাজার পাউন্ড! না-না ষোলো হাজার!... স্যার সতেরো হাজার উঠেছে... এবার আঠারো, উনিশ, কুড়ি.. ইত্যাদি।

বন্দ জিজ্ঞেস করল, এখন কি বিক্রি হচ্ছে?

স্নোম্যান বললেন— ওই চল্লিশ নম্বর মালটা।

মখমলে ঢাকা ট্রে-র ওপরে একটা হিরের নেকলেস। খুব সম্ভব পঁচিশ হাজার উঠবে। একজন ফরাসি আর ইটালিয়ানের মধ্যে লড়াই চলছে।

অচিরেই ফয়সালা হয়ে গেল। শেষ দর পঁচিশ হাজার।

বন্দ বলল— এখনকার নিলাম ব্যবস্থাটা যথেষ্ট জমাটি নয়।

স্নোম্যান বললেন— আর পাঁচমিনিটের মধ্যেই জমে উঠবে।

এখন বিক্রি হবে একটা চুনির ব্রেসলেট, হিরের বর্ডার দেওয়া। শোনা যায় এগুলো নাকি একসময় মিসেস ফিজ হার্বার্ড ব্যবহার করতেন। সেই মিসেস ফিজ হার্বার্ড যার সঙ্গে প্রিন্স অব ওয়েলস মানে চতুর্থ জর্জের বিয়ে হয়েছিল। মিসেস ফিজ হার্বার্ড এই অলংকার দুটি তার ভায়ের মেয়েকে দিয়েছিলেন। সেই মেয়েটিকে নাকি বলা হত “ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী”।

এইবার জোর ডাক শুরু হল। বহু কামেরাম্যান ভিড় করেছে। ইংল্যান্ডের হাতে সোভিয়েত এমবাসির দুশোজন কর্মীর ফটো গোপনে তোলা আছে। সেই ফটোগুলো দেখে সব সুখ মনে রাখা কঠিন। তবু বন্দ চারদিক তাকিয়ে দেখছে কোনো চেনা মুখ চোখে পড়ে কিনা?

কামে আসছে—ষোলো হাজার.... পনেরো হাজার পাউন্ড। আপনিই জিতলেন স্যার!....

দ্বিতীয় অধ্যায়টা শেষ হল। এবার আসল খেলা, আসল নাটক।

বন্দ আর স্নোম্যানের মধ্যে সামান্য কানাকানি হল।

ঘরের মাঝখানের টেবিলের ওপর একটা সুন্দর বাস্র রাখা হল। সাদা মখমলের কভার। তারপর একজন চাবি খুলে সেই পান্নার গোলাটা বের করা মাত্র সারা ঘরে একটা সবুজ আলো ছড়িয়ে পড়ল।

ক্যাটালগে লেখা আছে — এই ভূগোলক ১৯১৭ সালে তৈরি। প্রস্তুতকারক কার্ল হাভেয়ার্জ। তিনি রাশিয়ান। এটা বর্তমানে তার নাতনির সম্পত্তি, যিনি তাঁর মেয়ের মেয়ে।

গোলকের চারপাশ ঘিরে স্ফটিকের ওপর পদ্মরাগ হিরার কারুকর্ম। ছটি স্বর্ণফলকের ওপর দাঁড় করানো।

অন্যান্য তথ্য : গোলকের গায়ে তিন কোনার একটি বার্মিজ চুনি। গোলকটির উচ্চতা সাড়ে সাত ইঞ্চি। তাছাড়া একটা সোনার চাবি আছে।

উইলসন হাতুড়ি মেরে ঘোষণা করলেন— কুড়ি হাজার, কুড়ি হাজার।

স্নোম্যান ফিসফিস করে বললেন—তার মানে পঞ্চাশ হাজারের খদ্দের এসে গেছে। তার মানে এগুলো সবই তোলাই দেওয়া।

দর উঠছে। ত্রিশ... চল্লিশ.... পঞ্চাশ। এবার ষাট... সত্তর... আশি হাজার পাউন্ড, এবার নব্বই.... এবং এইমাত্র একলক্ষ পাউন্ড।

সারাঘরে হাততালির ঝড়।

স্নোম্যান বললেন—ওই তিনজন লোককে লক্ষ করবেন। ওরা বারবার টেলিফোনে কথা বলছে। ওদেরই একজন ক্যামেরা দিয়ে সকলের ছবি তুলেছে। ওই ছেলেটাই সাদবি কোম্পানির লোক। আমেরিকার সঙ্গে লাইন আছে। খুব সম্ভব তাদের সঙ্গেই কথা হচ্ছে।

নিলামদার ঘোষণা করল এক লাখ দশ হাজার.... কুড়ি হাজার। টেলিফোন-খরা লোকটিও দর হাঁকছে।

এখন দব উঠেছে একলক্ষ তিরিশ হাজার।

স্লোম্যান বললেন— এবার আমেরিকা পালাবে। আপনার মক্কেলের চাপ এখন। সে-ই এবার আমাকে তাতাবে।

বন্ড সিট ছেড়ে উঠে রিপোর্টবদের মধ্যে মিশে গেল।

নিলামদাবের হাঁক— চল্লিশ হাজার পাউন্ড।

মি. স্লোম্যান পাঁচ আঙুল তুললেন।

শোনা গেল— একলাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাউন্ড.... এক লাখ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ... একলাখ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড।

এবাব বন্ডের ঘাম ছুটছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি শক্তপোক্ত লোক এগিয়ে এল। চোখে কালো চশমা খুলল। বন্ড বুঝল যতক্ষণ কালো চশমা পরা থাকবে ততক্ষণ দরাদরি চলবে। চশমা খোলাটা একটা ইঙ্গিত। অর্থাৎ দম থামাও।

লোকটার ছবি তুলে নিল বন্ড। স্লোম্যানের কানে কানে বলল— পেয়ে গেছি। কাল আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। থ্যাংকস্।

অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে শুধু মাথা নাড়লেন স্লোম্যান।

শেষ পর্যন্ত একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড। ঘর এবার খালি হতে শুরু করেছে। কেউ কেউ তখনও হাততালি দিচ্ছে।

বন্ড লোকটাকে ভালো কবে লক্ষ করল। লম্বা চুল, ঘাড়ের কাছে একটা ছোটো কুঁজ। এবার লোকটাকে চেনা গেল। ওর নাম পিটার ম্যালিনোস্কি, রাশিয়ান এমব্যাসির কৃষিবিসয়ক সহকারী। লোকটা একটা ট্যান্ড্রি ধরলে। বন্ডও নিজেব গাড়িতে উঠে পড়ল। ড্রাইভারকে বলল ওই গাড়িটা দেখে রাখ, তবে ফলো করার দরকার নেই।

কেনিংস্টন প্যালেস গার্ডেনস্-এ যাবার রাস্তাটায় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ঢোকর মুখে প্রথম বাড়িটাই রাশিয়ান এমব্যাসির।

ফলো করো না বলেও বন্ড আসলে ওই গাড়িটাকে অনুসরণই করছিল।

এমব্যাসির লোহার গেট দিয়ে ঢুকে গেল গার্ডিটা।

বন্ড বলল—ফাইন! ড্রাইভার এবার হেড কোয়ার্টার-এ চল।

॥ পাঁচ ॥

চাঁদমারিব মাথায ঘাসের ওপব শুয়ে গুলি ছোঁড়া প্র্যাকটিস করছে বন্ড। লক্ষ্যভেদের দক্ষতাটা বালিয়ে নিচ্ছে। পরপর কয়েকটা গুলি ছুঁড়ে সুনিধে হয়নি। এবার একটা কিছু করতেই হবে। বাঁকানো ট্রিগারের ওপরে আলতো আঙুলের চাপ দিল বন্ড।

শুটিং রেঞ্জের স্তরতার মধ্যে এবার গুলির আওয়াজ বিকট। মোক্ষম আঘাত। ডামিটা গুলি খেয়ে ছিটকে পড়েছে।

পেছন থেকে চিফ রেঞ্জ অফিসার বললে—ফাইন! চালিয়ে যান।

আরও পাঁচটা গুলি ছুঁড়ল বন্ড। তার হাতের রাইফেলটা অবশ্য বিশেষ ধরনের।

রেঞ্জ অফিসার বলল— শেষ গুলিটা নীচের দিকে গেছে। আমরা বছরের শেষে যখন টিবিগুলো সাফ করব তখন অনেক সীসে ও তামার টুকরো পাই। আপনারটাও সেই ভাগ্যে গেল।

লক্ষ্যভেদের কাগজটা হাতে নিয়ে বন্দ ভাবল— মোটামুটি খারাপ নয়।

ঘড়িতে এখন নটা পনেরো।

কমান্ডার জেমস বন্ডের হাতের টিপ, যাকে মার্কসম্যানশিপ বলা হয়, সেটা ন্যাশনাল রাইফেলস-এর রেজিস্টারে বেশ বড়ো করে উল্লেখ করা থাকে।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির সামনে এসে পড়ল। বন্দ গাড়িতে উঠে বলল—গুড নাইট।

গাড়ি কিংস এভিনিউ ধরে লন্ডনের রাস্তার দিকে উধাও হল।

কোথায় যাচ্ছে বন্দ এখন? অবশ্যই কোনো নারীর সন্ধানে নন।

বার্লিন যাবার প্লেনটা ধরা দরকার। সময় পেলে দু'এক স্বেগ খেয়ে নেবে।

বার্লিনে একজনের সঙ্গে জরুরি সাক্ষাৎকার বাকি। খুবই জরুরি।

বিকেল আড়াইটা। M-এর ঘর। গস্তীর মুখ M-এর। যেন খুব ব্যস্ত।

অতিসংক্ষেপে বন্দকে কিছু তথ্য জানালেন।

— আমাদের 272 কে তুমি চিনবে না। সে যুদ্ধের সময় 'নোভায়া' জিমলয়ায় বন্দি ছিল।

এখন পালাতে পেরেছে। পারমাণবিক বোমা আর রকেটের বিষয় নানা কাগজপত্র আছে ওর সঙ্গে। এই 272 এখন পূর্ব বার্লিনে। তবে কে জি বি এবং পূর্ব জার্মানি স্পাই উইং ওকে ফলো করছে। তবে ও আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কাল থেকে দুদিনের মধ্যে ও দেখা করতে পারবে। সে-ও এক ডাবল এজেন্ট অবশ্য। কে জি বি ওকে গুলি করে মারবে ঠিক কবেছে। একজন মাইপার ঠিক করা হয়েছে যে একগুলিতে ওকে মারতে পারে। কোথা থেকে গুলি কলা হবে সেই জায়গাটা খোঁড়া হচ্ছে।

আগামী কাজগুলো সম্পর্কে একটা মোটামুটি ছক করল বন্দ। অন্ধকারে চারটে জানালা আছে। মাইপার তারই একটা থেকে ট্রিগার টিপবে। স্পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে তার কাজ শেষ হয়ে যাবে।

ঘরে এসে ঘুম দিল বন্দ। গতকালই বার্লিন পৌঁছেছে। জানালার পর্দা সরিয়ে নিশ্চিহ্ন বার্লিনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বন্দ। কানে আসে শুধু ট্রামের ঘড় ঘড়।

পি. সেন্ডার-এর কাছ থেকে পাওয়া পাউরুটির সাথে একটা কাগজে লেখা আছে— আপনি হচ্ছে করলে বেরোতে পারেন কিন্তু পাঁচটার মধ্যে ফিরতে হবে আপনার অস্ত্র (বন্ডের রাইফেল) পৌঁছে গেছে। একজন আর্দালি সেটা বিকেলে ফিট করে দিয়ে আসবে। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল বন্দ। শহর খমখমে, বেশ ঠান্ডা পড়েছে। রাস্তায় লোকজন আছে বটে। তবে যে-যার নিজের তালে। খবরের কাগজ পড়ছে বা হিসেব কষছে।

বিকেলটা কীভাবে কাটাবে বন্দ? লেকের পাড়ে ওই রেস্টুরেন্টটা কেমন?

একটা ছেলে এল কালো রঙের ওপেল ক্যাপিটাল গাড়ি নিয়ে।

ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন সেন্ডারের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়েছে। শোবার ঘরটা বেশ পছন্দ হয়েছে বন্ডের। জানলার গোবরাটে একটা মেটালস্ট্যান্ড তার ওপরেই বসানো হয়েছে উইন্ডেস্টার রাইফেল। এছাড়া আছে এক জোড়া দূরবিন আর ওয়াকিটকি।

কী কাজ ঘটতে চলেছে কে জানে? বন্ডের বুকুর ভেতরে যেন একটা সাপ ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। মনটা অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য একটা বই হাতে নিল বন্দ। কভারে এক উলঙ্গ তরুণীর ছবি। তাকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। বইটার নাম—Verderbt, Verdarnit, Verraten।

বিছানায় শুয়ে বইয়ের পাতা ওলটালেও বন্ডের মনটা অন্যত্র বিচরণ করছে। সে মানস-চোখে দেখছে সীমানার ওপারে জলশ্রোত, পোড়া জমি আর বাঁদিকে তৌকোনো বাড়ির গাছে সারি সারি অঙ্ককার জানলা, কোথাও কোথাও আলো আছে অবশ্য। হাইপার স্কোপটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে বন্ড। একটু পরে নীচের রাস্তায় ভিড় কমে গেল। লাইন দিয়ে আসছে মেসেয়ার অর্কেস্ট্রার দল। সবায়ের হাসি মুখ, হাতে বাজনা, জনাকুড়ি মেয়ে খুবই অল্পবয়েসি। শোভাযাত্রা করে এঁকেবেঁকে চলেছে।

ওদের মধ্যে একটি মেয়ে বড়ো। বেশ লম্বা, একরাশ চুল, উদ্দাম চেহারা। হাতে বেহালা, প্রায় ছুটে চলেছে বাতাসে স্কার্ট উড়ছে।

মেয়েটাকে কাছে পাবার জন্য হঠাৎ যেন অস্থির হয়ে উঠল বন্ড।

এখন পাঁচটা পঞ্চাশ।

ক্যাপ্টেন সেন্ডার বলল— এখনই ছটা বাজবে। ওই ডানদিকের নীচের জানলাটা লক্ষ করুন।

আরেকটি অস্ত্র নতুন ধরনের— কালাশনিকভ সাব মেসিনগান, গ্যাসে চলে। তিরিশটা গুলি ভরা যায়। এটা কে জি বি-র পছন্দের জিনিস। দূরপাল্লার পক্ষে লাগসই।

মিনিটের পর মিনিট পার হচ্ছে। টনটন্ করছে বন্ডের চোখ।

কে এই মেয়েটা? বয়সে বাইশ তেইশ হবে। বনেদি বংশের মেয়ে বলে মনে হয়।

সেন্ডার বলল— সাতটা বাজে। ওরা বন্দুক তাক করে আছে। আপনিও নড়বেন না।

সাড়ে সাতটা। নাঃ হ-হে-এব পাত্তা নেই। চারটে জানলা বন্ধ হয়ে গেল। ওঃ আবও দু'রাত অপেক্ষা করতে হবে।

মান সেবে কয়েক পেগ ছইস্কি গলায় ঢালল বন্ড। বাজনা থামার পর সেন্ডারকে বলে ফেলল— আচ্ছা ওই লম্বা মেয়েটা.... খুব সুন্দর, তাই না?

সেন্ডার বলল— ভালো করে দেখিনি।

বন্ডের চিন্তা গেল না। সোনালি চুল, ছাইরঙের রেনকোট। কোথায় থাকে কে জানে? হয়তো মফসসলের কোনো নোংরা টালির ঘরে। নাকি কাছে কোথাও! বিয়ে হয়েছে কি? নাকি শ্রেমিক আছে?

তারপরে নিজেকে স্থির করল বন্ড। মনস্থির কবল বন্ড। এসব ভেবে লাভ কি?

॥ ছয় ॥

পরের দিন, পরের দিন সন্ধ্যার সময় সেইরকমের সতর্ক প্রহারা, আগের দিনের মতো। সামান্য এধার ওধার। বন্ড মেয়েটাকে আরও দুবার দেখেছে হাইপারস্কোপের ভেতর দিয়ে। সময় কাটানোর আর বিশেষ কোনো কাজ বন্ডের হাতে উপস্থিত নেই। কিন্তু থমথম করা ভাবনা ক্রমশ দানা বাঁধছে, ওদের শোবার ঘরে গুমোটের মতো চাপ সৃষ্টি করছে তৃতীয় দিনে।

তৃতীয় দিন এল। এটাকে কাটাবার জন্যে বন্ড সকালদুপুর মনের সুখে ঘুরে বেড়াল। মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, সিনেমা আর কত জায়গায়। কিন্তু কোনো কিছুই মন দিয়ে দেখেনি। তার মনের পর্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কেবল নানাবকম টুকরো টুকরো ছবি, যেমন সেই মেয়েটা। সেই কালো জানালা, কালো কুচকুচে নলের মুখ। আর তার পেছনে সেই না-দেখা, না-জানা মুখ আজ রাত্রিই যার জীবনের শেষ রাত্রি।

বন্দ ঠিক পাঁচটায় ফিরেছে। সেই ঘামের গন্ধওয়ালা মুখোশটা পরবার আগে খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢালবার জন্যে ক্যাপ্টেন সেন্ডারের সঙ্গে গেলাস ঠোকাঠুকি করেও হয়নি। ক্যাপ্টেন সেন্ডার বন্দকে বাধা দিয়েছেন কিন্তু তাতে কাজ না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে স্টেশনকর্তার কাছে নালিশ পর্যন্ত করবেন বলে শাসিয়েছেন।

বন্দ ভীষণ বিরক্ত হয়েছে, বললে— দেখ বন্ধুবর, আজ রাত্তিরে একজন লোককে খুন করতে হবে আমাকে, তোমাকে নয়। কাজেই শাস্তিশিষ্ট ছেলের মতো সবকিছু চেপে থাকো তো এখন। কাজ শেষ হয়ে যাক, ট্যান্কেয়েরে-র কাছে তোমার মনে যত অভিযোগ জমা আছে সব উজার করে দিও। তুমি কি মনে করো এটা খুব মজার কাজ, তাই না? (M) নম্বরের শিরোপা পাওয়া খুব মজার ব্যাপার, তাই না? তুমি যদি M সেকশন থেকে আমার চাকরি বরখাস্ত করতে পারো আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। কাগজের পাহাড়ের আড়ালে বসে দিব্যি মনের সুখে ডিমে তা দেব। বুঝলে কিছু? বন্দ গলায় হুইস্কিটা ঢেলে বিছানায় শুয়ে পড়ল বইটা নিয়ে। যত শেষ হয়ে আসছে তত বেশি রসের হয়ে উঠছে।

ক্যাপ্টেন সেন্ডার চুপ করে গেলেন। চুপচাপ রান্নাঘরে চলে গেলেন। সেখানের আওয়াজে বন্দ আন্দাজ করল হয় চা নয়, কফির তোড়জোড় হচ্ছে।

হুইস্কির গুণে মায়ুগুলো বেশ শিথিল হতে শুরু করেছে। ভালো কথা—এবার দেখা যাক সুন্দর নায়িকা কীভাবে বিপদের জাল থেকে বের হয়ে আসে।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় দু একটা ব্যতিক্রম ছাড়া যা ছিল তাই আছে। বন্দের সাথে মাইপারস্কেপের দূতাবাসে মেয়েটির সাথে বার দুই দেখা হয়েছে। আবহাওয়া হয়ে উঠেছে আরও থমথমে।

তৃতীয় দিনে বন্দ চিড়িয়াখানা, সিনেমা, মিউজিয়াম, সিনেমাতে গেলেও, ওর মন জুড়ে আছে সেই মেয়েটা, জানলা, কালোনলেব মুখ, আর সেই আগন্তুক— যাকে আজ রাতে মারতে হবে।

ঘড়ি ধরে বিকেল পাঁচটায় ফিরে ভ্যাপসা গন্ধে ভুরভুর করা মাঙ্কটা পরবার আগে গলায় মদ ঢালতে গিয়ে ক্যাপ্টেন সেন্ডার তাকে বলে যে, নিয়ম ভাঙবার জন্য তিনি স্টেশনকর্তার কাছে তার নামে অভিযোগ আনবেন।

এক পেগ সোঁ করে চুমুক দিয়ে বলে বন্দ— দেখ বন্ধু, আজ রাতে যে লোকটা মার্ডার করবে সে হল আমি। তোমার বোধহয় এই ‘০০’ কোড নম্বর নিয়ে মজা করতে দারুণ লাগে? অবশ্য তা তো লাগবেই। তোমাদের তো আর গা লাগিয়ে কাজ করতে হয় না। বাজে বকবক না করে এখন সামনে থেকে সরে পড় তো। — বলে রসের বইটা শেষ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বন্দ।

ঠিক ছটা পাঁচ মিনিটে ক্যাপ্টেন সেন্ডার উত্তেজিত হয়ে চেষ্টা করে বলে ওঠেন — বন্দ ওই দিকে ঝোপের কাছে কী যেন নড়ছে। ক্রাইস্ট। এগিয়ে আসছে, ঝোপ পার হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল, ওদিকে কী, সেটা কি বুঝতে পারছ?

— সীমান্ত থেকে কতটা দূর?

— ভাঙাচোরা জায়গা পার হয়ে ফুটপাথের গায়ে পাঁচিলটা টপকাতে হবে। হাতে মুখে কালো রং মেখে এগিয়ে আসছে। আরও দশ গজ এগিয়ে গেল। যে কোনো মুহূর্তে রাস্তা পার হতে পারে।

ঘাম মুছে নিয়ে বন্দ বলে— ঘরের ভিতর ওদের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি। আপনার ওপেল গাড়ির কাজ শুরু করতে বলে দিন।

মাইক্রোফোনে সংকেত শুনল বন্দ। এক্সহস্ট পাইপ থেকে বিস্ফোরণের শব্দে ওপেল-এর ইঞ্জিনের আওয়াজ চাপা পড়ে গেল।

কালো প্লাভস বা হাতে কালো বং করা কেউ এগিয়ে আসতেই ক্যাপ্টেন সেন্ডার সাবধান করে দিলেন— ওই যে। দেওয়ালে উঠেছে। এইবার লাফ দেবে।

তিনশো গজ দূরে যেখানে গিয়ে বুলেটটা আঘাত করল সেটা সাব-মেশিনগানের নীচের দিকটা। বোধহয় মেয়েটার হাতেও লেগে থাকবে। স্ট্যান্ড থেকে ছিটকে বন্দুকটা পড়ে যেতেই সে লাফ দিল।

— মাথা নীচু করো। — বলতে বলতেই বন্দ নিমেষে বিছানা থেকে মাটিতে ঝাঁপ দিল। একটা সার্চ লাইটের তীব্র আলো জানলাতে পড়ল। তাবপর রাস্তা থেকে আলোটা ঘুরে বাড়ির মধ্যে এসে পড়ল আবার। গুলিব শব্দ।

এতসব শব্দের মধ্যেও বন্দ শুনতে পেল, ওই ওপেল গাড়িটা দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। আর ওটার পিছনে অর্কেস্ট্রার শব্দ। এই শব্দের আড়ালে গুলিব শব্দকে চাপা দেওয়ার মতলব। চলো অন্যান্য মিউজিকের বাস্তু কবে কি শুধুই বন্দুক আনা হয়েছে। তাহলে আসল বাজনাগুলি কোথায়? বাড়িতে? কিন্তু ওই মেয়েটি, সে তো আসল। যদি সে দলের সঙ্গে মিশে গিয়ে পালিয়ে যায়। তাহলে তার দর্শন আশা করা বৃথা— বন্দ ভাবে। তাব এতসব চিন্তার মধ্যে উলটে যাওয়া উইল্ফেস্টারের গায়ে একটা বুলেট লাগল। গবম সিসে আচমকা হাত পড়তেই, হাতটা পুড়ে গেল।

চুলেব মধ্যে থেকে কাচের টুকরো ঝেড়ে সেন্ডার বলে— চল, আমরা বাম্বাঘরে ঢুকি। তুমি ঠিক আছ তো?

—হ্যাঁ। হাতে শুধু একটু গরম ছাঁকা লেগেছে।

একটু পরে যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল, ক্যাপ্টেন সেন্ডার তখন ওয়াকিটকিটা নিয়ে কথা বলছেন— 272-র জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না। আর্মাড করে তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত করতে হবে। আর 007 নিজে মনে কবে রিপোর্ট দেবে। ওভার।

ক্যাপ্টেন সেন্ডার বলেন— আমি দেখেছি, তুমি এইম থেকে দু সেকেন্ড বাদে ট্রিগার দাবিয়েছিলে। আমি কিন্তু এই ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছি বড়োকর্তাকে। আর ‘ট্রিগার’-কে গুলি ছোঁড়বার সময় দিলে কেন?

ছইস্কিতে লম্বা চুমুক ঝেড়ে বন্দ বলে— সে মহিলা।

— So what ! KGB-তে প্রচুর মেয়ে আছে। তাছাড়া ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে রাশিয়ার মেয়েরা তো বরাবরই আগে থাকে। আচ্ছা, এঁদের মধ্যে, দু’জন হল— ডনস্কায়া আর লোমোভা। দুর্দান্ত শূটার। হয়তো ওদেরই কেউ হবে। যেই হোক, রেকর্ড থেকে নিশ্চই বার করা যাবে।

গ্যাসে টান মারতে মারতে বন্দ বলে— সোশাল চুল, চলোর বাস্কে সে-ই হয়তো আর্মস নিয়েছিল।

—কিন্তু তোমার ওপর তো খোলাখুলি অর্ডার থাকা সত্ত্বেও তুমি ট্রিগার-কে শেষ করলে না। তবে শুকে মেরে ফেললেই ভালো করতে। সরি, রিপোর্ট তো আমায় করতেই হবে। তাই আমি—

নীচে গাড়ির হর্ন শুনে সেন্ডার বলেন— চল, আর্মারড করে এসে গেছে। বেরোন যাক।

রেডি হয়ে বেরোতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বন্দ। এই ভ্যাপসা, বন্ধ জায়গাটা ছেড়ে যেতে তার মন চাইছে না।

এখানে বসেই কথা না বলে সে একটি মেয়েকে ভালোবেসেছে। যার সঙ্গে বন্ডের পেশার কোনো ফারাক নেই। সে বন্ডকে মারতে পারে নি বলে হয়তো KGB তাকে কোর্ট মার্শাল করবে বড়ো জোর। প্রাণে তো বেঁচে থাকবে।

বন্ডের কল্পনা অনেকদূর এগিয়ে যায়— কোর্ট মার্শাল হয়ে ওরা যদি দৈবক্রমে একই জায়গায় থাকে। তাহলে—

— কি যাবে না? — ক্যাপ্টেন সেন্ডার খোঁচা মারেন।

সামান্য চমকে ওঠে বন্ড— হ্যাঁ যাব। শোনো, স্টেশনের কর্তাকে বোলো যে, আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।... খুব বেশি হলে ওরা আমার ‘০৮’ কোডটা কেড়ে নেবে।

ফর ইওর আইজ ওনলি

॥ এক ॥

বি. এস. এ. এম. টোয়েন্টি মোটর সাইকেল যেন উড়ছে। উষ্কার মতো তীব্রবেগে ধাবমান। চালকের দেহ কম্পমান, কিন্তু তার রক্তে চঞ্চলতা নেই, বরফ ঠান্ডা চোখ দুটির দৃষ্টিতে আগুন।

চোখে সানশ্লাস, হ্যান্ডবাবের উপর দিয়ে সামনে দৃষ্টি সুদূরের লক্ষ্যে; হেঁটের ফাঁক দিয়ে দস্তপাটি ঈষৎ দৃশ্যমান। মুখভর্তি যেন বাতাস, গাল ফুলে উঠেছে! মাথায় লোহার হেলমেট, কবজিতে চামড়ার গ্লাভস্। যেন পশুর কালো খাবা।

চালকের পরনে ডিসপ্যাচ-রাইডারের পোশাক। মোটর সাইকেলের রং অলিভ-সবুজ। ভালভ, কার্বুরেটর ইত্যাদি উন্নতমানের, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে এমন দেখা যায়। পেট্রল ট্যাংকের উপর রয়েছে একটি রিভলভার।

সকাল সাতটা। মে-মাস। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। বিশাল ওকগাছের লাইন।

সামনে প্যারিস-মস্তাজ ক্রসিং। এবার নতুন রাস্তা। মোটর সাইকেল ছুটেছে সেন্ট জার্মেন, উত্তরে।

অবশ্য আরেকজনও ছুটেছে। কম বয়সি, সে-ও এক ডিসপ্যাচ-রাইডার। সে খুব জোরে চালাচ্ছে না, তার গতিবেগ ঘন্টায় চল্লিশ মাইল।

যে খুব জোরে চালাচ্ছিল, সে হঠাৎ স্পিড কমিয়ে আনল। চলতে চলতে রিভলভারটা হাতে নিল। সামনে চালকের মোটর সাইকেলের আয়নায় তার চেহারা ফুটে উঠল।

তরুণ চালক ভাবল কে এই লোকটা! সে-ও গতিবেগ কমায়। আসুক না কাছে, গল্প করা যাবে! রাইডারদের নামগুলো মনে কবার চেষ্টা করল— আলবার্ট, সিড, নাকি ওয়ালি?

রিভলভার হাতে আগস্তক চালক, এবাব স্পিড কমায়। দুজনের মধ্যকার দূরত্ব এখন খুব কম। তিরিশ-চল্লিশ গজ হবে। মাইল পোস্টে দেখা যাচ্ছে— সেন্ট জার্মেন আর মাত্র এক কিলোমিটার দূরে।

দূরত্ব যখন মাত্র বিশ গজ, তখন রিভলভার গারী চালক হঠাৎ গুলি চালাল। ক্ষিপ্ত গতিতে তরুণ চালক লাফাল বটে, কিন্তু শিরদাঁড়ায় বিদ্ধ হয়েছে গুলি। আর্তনাদ করে সে গড়িয়ে পড়ল ঘাসফুল ভরা মাঠে।

অনুসরণকারী মোটর সাইকেলের চাকা তার মৃতদেহের উপর দিয়ে চলে গেল।

হত্যাকারী এবার উলটোমুখে ছুটল। রাস্তার একপাশে এসে থামাল মোটরবাইক। বাইক রেখে এবার সে হেঁটে এসে দাঁড়াল মৃতদেহের কাছে। মৃতের পোশাকের মধ্য থেকে মানিব্যাগ বের করল, কবজি থেকে খুলে নিল রিস্টওয়াচ।

কাঁধের উপর ডিসপ্যাচ কেস নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। খানা পেরিয়ে নরম জমি। হাঁশিয়ার— নিজেকে সতর্ক করল সে।

চিন্তা নেই। এ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে শুধুমাত্র পুলিশের কুকুর।

আবার মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিল সে। রহস্যময় হত্যাকারী আবার উড়ে চলল ঘন্টায় প্রায় সত্তর মাইল বেগে।

স্তব্ধ অরণ্যে শোনা গেল শুধু দীর্ঘশ্বাস।

॥ দুই ॥

এখন রাত। কাফের নাম ফোকে! সামান্য মদ্যপান করেছিল জেমস বন্ড। সামান্য খেয়েও কেমন যেন নেশা হয়ে যায়। বিটার ক্যাস্পারি, এক চাকলা পাতিলেবু! সঙ্গে পেরিয়ারের সোডা।

প্যারিসে এলে এইখানেই আশ্রয় নেয় বন্ড। বাঁধাধরা ঠিকানা। খাওয়া-থাকা একই জায়গায়। টার্মিনাস লর্ড! ভাড়া কম। তবে যেতে হয় ডিলাপে বা রোটান্ডে। অবশ্য ডিনার খাওয়ার ভালো রেস্তোরাঁ বলো ভেকোর, ক্যানটেন বা কোচন-ডি-আর!

ডিনার খেয়ে বন্ড সাধারণত ফেরে যেখানে তার নাম প্রেস-সিডাল।

বন্ড আজ রাতে এল এক পুরোনো বল ড্যান্সের আড্ডায়। হাঙ্গারিয়ান সীমাস্ত্রের একটা গোলমালের সুরাহা করার দায়িত্ব রয়েছে। কিছু হাঙ্গারিয়ানকে তাড়াতে হবে। লন্ডন থেকে সোজা এসেছে বন্ড।

রেস্তোরাঁয় বসে নানা ভাবনায় মগ্ন সে।

অনেক উলটোপালটা মজার চিন্তা মাথায় আসছে। ভালো লাগে না প্যারিসকে। বিশেষ করে মহাযুদ্ধের পর থেকে। ১৯৪৫-এর পর একটা দিনও প্যারিসে ভালো কাটেনি। শহরটা নিয়ে যেন কাড়াকাড়ি করছিল রাশিয়ান, বুলগেরিয়ান, রুমানিয়ান এবং জার্মানরা!

ওয়েটার এসে টেবিলের উপর ট্রে রাখল। পেরিয়ারের গেলাস। এক চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল বন্ড।

কিন্তু মেয়েটার তো পাস্তা নেই। এখনও আসছে না কেন?

অদ্ভুত মেয়েটা। ছিমছাম, কিন্তু মনে হবে যেন রবারের বর্ম পরে আছে।

এসেছে। ওই তো গাড়ি থেকে এগিয়ে আসছে।

বন্ড সজাগ। রেনকোট গায়ে মেয়েটির চলায় ছন্দ আছে। একটু বেপরোয়া হাবভাব।

মেয়েটি দেখতে পেয়েছে বন্ডকে। হাসছে। কাছে এসে চেয়ার টেনে বসে পড়ল। ঠোঁটে চাপা-হাসি।

মেয়েটি বলল— সরি, দেরি হয়ে গেল। অফিসে চলুন, জোরে ড্রাইভ করবেন।

গাড়ি স্টার্ট দিল মেয়েটি। বলল— কোথা থেকে আসছেন? এত তাড়া কীসের?

— আমি মেরি অ্যান ক্যাসেল। গ্রেড্-টু অ্যাসিস্ট্যান্ট। স্টেশন থেকেই এখানে এসেছি।

হেড কোয়ার্টারে 'এম' সংকেত পাঠিয়েছে— জরুরি! বন্ড কোথায়? ওকে খুঁজে বের করো। যেখানে যেখানে আপনাকে পাওয়া সম্ভব, তার একটা লিস্ট দিলেন আমাদের দুজনকে— মানে আমি এবং আরেকটা মেয়েকে। আপনাকে এখানে না পেলো—

— বাঃ, বেশ। তা, কতদিন আছেন সার্ভিসে?

— পাঁচ বছর।

গাড়িটা এখন ঢুকছে এভিনিউ ম্যাটিগন। মেয়েটি ড্রাইভ করতে করতে বলল— এ গাড়িটা বড়ো বিদ্যুটে।

॥ তিন ॥

হেড কোয়ার্টারে এল ওরা।

উইং কম্যান্ডার রাটার মোটা মানুষ।

চেন শ্যোকাব। জিঞ্জেরস কবল— কোথায় পেলো জেমস বন্ডকে?

-- কোকে-তে! রাসেল ওকে ধরেছে।

-- ভালো। বসো। কাজের কথা সেরে ফেলি। কাল সকালেই একটা খুন হয়েছে। সেন্ট জার্মেন যাবার পথে এক ডিসপ্যাচ-রাইডারকে গুলি করা হয়েছে। কেস, ঘড়ি, মানিব্যাগ নিয়ে গেছে হত্যাকারী।

বন্ড জিঞ্জেরস করে— খুন কি মানিব্যাগের জন্য?

— বলা কঠিন। সকাল সাতটায় খুন! এ সময় তো ছিনতাই-এর জন্য খুন হয় না কেউ।

একটা ম্যাপ দেখিয়ে সিকিউরিটি বলে— এই দেখ ভার্সাই, পার্কের চৌমাথা। এই হল ক্রসিং। করপোর্যাল কেটস যাচ্ছিল ডিসপ্যাচ কেস নিয়ে। সেই খুন হয়েছে।... শেষ পর্যন্ত পুলিশ কুকুর নিয়ে লাশ খুঁজে বের করতে হয়েছে। গোপন দলিল খোঁয়া গেছে। খুনি হয়তো আশ্রয় নিয়েছে প্যারিসের কোনো দূতাবাসে।

বন্ড গোটা ব্যাপারটা শুনে বিরক্ত— এতে আমার কী কবার আছে? 'এম' যে কেন আমাকে—

— আমিই 'এম'-কে অনুরোধ করেছিলাম। বন্ড নাকি অদৃশ্য সূত্র-ও দেখতে পায়!

বন্ড বলে— দেখা যাক। কিন্তু কার কাছে রিপোর্ট দিতে হবে?

— রাসেলকে।

— বাসেল?

-- আরে, ও ইতো আপনাকে খুঁজে এনেছে।

॥ চার ॥

ন্যাটো গোষ্ঠীর অন্যতম শাখা 'শেপ'।

ওরা এবার পৌছে গেল শেপ-এব হেডকোয়ার্টারে।

দরজার গায়ে নেমপ্লেট— কর্নেল জি.এ স্কাইবার। চিফ অব সিকিউরিটি।

চেকিং-এর বাড়াবাড়ি দেখে বন্ড বলল, এত সাবধানতা! কোনো স্পাই এখানে ঢুকতে সাহস পাবে না।

চিফ বলেন— উপায় নেই। কবতেই হবে।

— উইং কম্যান্ডার র্যাটারের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে? নতুন কিছু ঘটেছে তারপর?

— হ্যাঁ, বুলেটটা পাওয়া গেছে। আর্মি বুলেট, বোঝা যায়, গাড়ি চেপে পিছু নিয়েছিল খুনি।

বন্ড বলে— খুনিব হাত পাকা, না সৌখিন, জানি না। তবে যা যা বললেন, তাতে মনে হয়, আপনাদের লোক খুনিকে সন্দেহ করে নি, বন্ধু ভেবে গাড়ির স্পিড কমিয়ে তাকে কাছে আসতে দিয়েছিল। খুনিও সেই সুযোগটা নিয়েছে।

— বেশ। কিন্তু নতুন পয়েন্ট আর কিছু আছে?

-- আজ রাতে এই পর্যন্ত। আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না।

উঠে দাঁড়ায় বন্ড। বলে— ক্যান্টিন আব অতিথিশালা কোন দিকে?

চিফের নির্দেশে হাঁটাচুল এক ছোকরা আসে। তাকে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হয়।

বন্ড বলে— শুড নাইট।

নিজের কামরায় এসে নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে বন্ড।

ভোরবেলা। সেন্ট জার্মেন অরণ্য। তারই একটা বড়ো গাছের উঁচুডালে মাচায় শুয়ে বন্ড নজর রাখছিল এক টুকরো সবুজ জমির উপর। পাশেই ডি-৯৮ সড়ক, যেখানে কিছুদিন আগে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

বন্ডের পরনে এয়ার প্যাবাট্রজারের পোশাক। সবুজ-বাদামির উপর কালো ছোপ ছোপ ছত্রী বাহিনীর ইউনিফর্ম। আবছা-অন্ধকারে নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন রাখা যায়।

‘শেপ’ সিকিউরিটিতে দু-দিন কোনো কাজ হয়নি। সময়ের অপচয়। বন্ড পালাবার ধান্দায় ছিল। কর্নেল তাকে টেলিফোনে জানিয়েছিল— জঙ্গলে আবার পুলিশ কুকুর নিয়ে বিস্তর খোঁজা হয়েছে, কিছুই পাওয়া যায় নি!

বন্ড বলল— সবই ব্যর্থ হল। যাকগে, পুলিশ কুকুরদের ডিউটি অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে পারলে খুশি হতাম।

— ব্যবস্থা করা হবে। তা, আপনি কতদিন এখানে থাকছেন? হল্যান্ড থেকে একটা টপ-লেভেল টিম আসছে। এখানে তো জায়গার অভাব। আপনার ঘরটা—

কুকুরদের ডিউটি অফিসার ফরাসি। সে বলল— অ্যালসেশিয়ানের দল তন্নতন্ন করে খুঁজছে, কিন্তু—

— কিছুই পাওয়া যায়নি। তাই তো?

— ওরা জিপসিদের গন্ধ পেয়েছিল।

— কোথায়?

— এই দেখুন ম্যাপে দাগ দেওয়া রয়েছে। জায়গাটার নাম ইটয়েল পারফেট। যে জায়গায় খুন হয়েছে, তার নাম ক্যারিফোর দ্য কুরি।

জিপসিরা এসেছিল শীতকালে। এখানে তাঁবু গেড়েছিল। কবে চলে গেছে, বলা মুশকিল।

বন্ডের গাড়ি ছুটে চলল কুখ্যাত ডি-৯৮ হাইওয়ে দিয়ে। ক্যারিকোর রয়ালে এসে ব্রেক কষল বন্ড। বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পায়ে হেঁটে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

জায়গাটা মাঝারি সাইজের। দুটো টেনিস কোর্ট জোড়া দিলে যতটা হয়। সবুজ ঘাস। লিলি ফুল আর বুবেলের গুচ্ছ। ঝোপটার কাছে এল বন্ড। টিবিটাকে একপাক ঘুরে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। ঘাসগুলো এখানে মুচড়ে গেছে। জিপসিরা বোধহয় এখান দিয়েই চলাফেরা করত।

দুটোগাছের গুঁড়ির মধ্য দিয়ে রাস্তা। গুঁড়ির গায়ে আঁচড়ের চিহ্ন। কাদার চাপ দিয়ে ছাপগুলো লুকানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

নাকি এসব অল্পবয়সি পিকনিক পাটির কাণ্ড!

এই গুঁড়িতে আঁচড়ের দাগ তিনটি, ওটাতে চারটি।

সেদিন ফিরে গেছিল বন্ড। কিন্তু আজ আবার ভালো করে দেখার জন্য সে এখানে এসেছে। গাছের মাথায় তার আস্তানা। ‘এম’-এর নির্দেশে এখানে আসতে হয়েছে তাকে।

শোনা গেছে, জিপসি দলে ছিল ছ-জন ছেলে, দু-জন মেয়ে। বিদেশি চরদের সবচেয়ে সুবিধা এই জিপসি বেশে। ওরা কি বনের মধ্যে কোনো গোপন গর্ত বা সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে?

এটা বন্ডের অদৃশ্য সূত্র।

আঁচড়ের চিহ্নগুলো অবশ্যই রহস্যময়। জিপসিরা কি সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে আবার হাজির হবে? মেরি রাসেলকে সব জানিয়েছে বন্ড!

রাসেল বলেছে— সাবধান!

ইতিমধ্যে এসে গেছে চারজন সিক্রেট সার্ভিসের যুবক। ওরা বন্ডের ইশারার জন্য অপেক্ষা করছে। ইস্তিত পেনেই 'শেপ' ইনটেলিজেন্সকে উচিত শিক্ষা দেবে।

ওক গাছের উঁচু ডালে শুয়ে এইসব কথাই ভাবছিল বন্ড, মনে মনে হাসছিল। শত্রু উচ্ছেদের একই উদ্দেশ্য নিয়ে দুটো দল নিজেদের মধ্যে রেবারেবি করে শক্তিক্ষয় করছে।

এখন সকাল ছ'টা। ব্রেকফাস্টের সময়। পকেট হাতড়ে বন্ড পেল শুধু গ্লুকোজ 'ট্যাবলেট'। দুবে একটা কাঠবেড়ালি শেকড় কামড়াচ্ছে। ঘাসের উপর একজোড়া পায়রা খেলা করছে। এটা ওদের প্রেমকুঞ্জ। গোলাপ-ঝাড়ের উপর মৌমাছি উড়ছে। যেন রূপকথার দৃশ্য। সোনালি রোদ, ভোমরার নাচ, পাখির গান, ঘাসের দোলানি।

হঠাৎ পায়রার দল পাখা ঝটপটিয়ে জমি ছেড়ে উঠে এল গাছের উঁচু ডালে। অন্যসব পাখি, এমনকি কাঠবেড়ালিটাও উধাও হয়ে গেল। কেন? কী ব্যাপার?

নিঃশব্দ অরণ্য। নিব্বুম। বন্ড সতর্ক।

আরে, ওই গোলাপ ঝাড়টা কাঁপছে কেন? চোখে পড়ল একটা বড়ো লাল গোলাপ। অস্বাভাবিকভাবে থরথর করে কাঁপছে। এবার আশ্চর্য, পাপড়িগুলো ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। ওখানে যেন লেম্বের মতো কী একটা, সূর্যের আলোয় চকচক করছে।

আরে জিপসি।

বন্ড অবাক। জিপসিরা তৈরি করেছে 'গোলাপ চক্ষু'। অদ্ভুত যন্ত্র, অণুঘীর্ণনের জন্য। যা জার্মানরা পারেনি, ইংরেজরাও অসমর্থ, সেখানে জিপসিরা গোপনে তৈরি করেছে গোলাপের আড়ালে পর্যবেক্ষণ চোখ—পেরিস্কোপ!

... এবার একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাটির টিপির নিচ থেকে? হ্যাঁ, ইলেকট্রিক মোটরের আওয়াজ। গোলাপঝাড়ের পাল্লা খুলে যাচ্ছে! দুটো ধাতুনির্মিত দরজার পাল্লা। গোলাপঝাড় যেন দু-ভাগ হয়ে গেল। বাঃ! গুপ্তশত্রুদের বা দেশীয় বিশ্বাসহস্তাদের বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না।

এবার দেখা যাচ্ছে একটা মাথা! চিতাবাঘের মতো নীচ থেকে সম্ভরণে উঠে আসছে। তারপর দেখা গেল সামনে এসেছে আরো একজন। তার হাতে দেওয়া হল তিন জোড়া জুতো। এক জোড়া সে বেছে নিল। অপরজনের হাতে রিভলভার।

গর্ত থেকে ওরা বের করল একটা মোটর সাইকেল। জুতোগুলো এমন যে মাটিতে ছাপ পড়ে না।

মোট তিনজন। ওরা এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে। একজনের পরনে রয়াল কোর্স অব সিগন্যালস-এর পোশাক। মোটর সাইকেলটা অলিভ সবুজ—বি. এস. এ. এম. টোয়েন্টি।

এই তো দেশের বিশ্বাসহস্তা, পঞ্চম বাহিনীদের ডেরা। এখান থেকে বিদেশে খবর, তথ্য পাচার হয়।

বন্ডের ঘড়িতে এখন ছ'টা পঞ্চাশ।

হুঁ, ওরা আবার যাচ্ছে তো কোনো এক নতুন ডিসপ্যাচ-রাইডারের সন্ধানে। তাকে মেরে তথ্যের কেস লুটতে হবে। কুচক্রীদের জব্বর প্ল্যান।

ওরা চারপাশে তাকিয়ে নিশ্চিত হল—না, কেউ কোথাও নেই। দুটি লোক ফিরে গিয়ে মোটর সাইকেলটা দলপতিকে দিল। চলে গেল ওরা। সুড়ঙ্গের গোলাপ দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

এইবার বন্ড মগডাল থেকে নেমে এল। হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছে গেল গাছের গুড়ির কাছে। তারপর নিঃশব্দে উধাও হয়ে গেল।

মেরি রাসেল সব গুনে বলল— এটা ‘শেপ’-এর কর্তব্য। এ কাজ আপনার করার কথা নয়।

বন্দ বলল— আঃ, আমার কথা শোনো। এখন ‘এম’-কে রিপোর্ট পাঠাও।

— আঃ, আপনি কি রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে খেলার লড়াই করে বাহাদুরি দেখাবেন?

বন্দ এবার কঠোর— যা বলছি, ক’রো। রিপোর্ট পাঠাও। দিস ইজ মাই অর্ডার।

রাসেল বলে— যা ইচ্ছে করুন। আমার কী! আমি যন্ত্রের মতো আদেশ পালন করছি।

আজ সকালে বন্দ প্রস্তুত হচ্ছে। নতুন অভিযান। বি.এস.এ. মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনে স্টার্ট দেয় বন্দ। ক্যারিকোল রয়্যালের রাস্তায় আজ কী ঘটবে— কে জানে।

করপোরাল বলে— এখন প্রায় সাতটা বাজে।

— ও. কে.।

বন্দ বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে যায়।

ক্রমশ! রোড নং - ১৮৪, এল ৩০৭ হাইওয়ে, এবার সেই ডি-৯৮, খুনের রাস্তা। পেটের কাছে রিভলভার, জ্যাকেটের তলায়।

ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল স্পিড। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে টানেল। সুড়ঙ্গের মুখে কানফটানো শব্দ, কামানের গোলার মতো। এবার ক্যারিকোর রয়্যাল, পিচ রাস্তা। স্পিড কমে হল চল্লিশ।

স্পাই-এর দল আগে থাকতেই খবর পায়নি তো!

আরে ওটা কী? একটা কালো বিন্দু— ক্রমশ একটা মাছি, এবাব যেন ভোমরা, এবার গুবরে পোকা। হ্যাঁ, এইবার স্পষ্ট— একটা ত্র্যাশ্ হেলমেট পরা মোটরবাইক আরোহীর মাথা! ঝড়ের মতো ছুটে আসছে।

কাছে এসে গেছে সে। সম্ভাব্য খুনি! বন্দ প্রস্তুত।

আততায়ীর রিভলভার গর্জে উঠল— পরপর দু’বার। বন্দ সরে গিয়ে জবাব দিল। কোন্ট রিভলভার। একবার।

দুলে উঠল হত্যাকারীর বাইক। অন্ধের মতো ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল বীচগাছের গুঁড়ির উপর।

গুলিবিদ্ধ আরোহী জড়িয়ে গেল দোমড়ানো বাইকের গায়ে।

বন্দ কাছে গিয়ে দেখল বিকৃত মৃতদেহটা।

হঠাৎ কেঁপে উঠল গোলাপঝাড়।

শিস দিতে গিয়ে থেমে গেল বন্দ।

দরজার পান্না খুলে সে দেখে জুতো পরিহিত দুই মূর্তিমান আবির্ভূত।

ওরা বন্ডের কাছে এল। কী যেন জিজ্ঞেস করল, খুব সম্ভব রাশিয়ান ভাষায়।

রিভলভার তুলে ধরল বন্দ— হ্যান্ডস্ আপ!

দুটো লোক দৌড় দিল দরজার দিকে।

হঠাৎ রাইফেলের গর্জন। একজন লুটিয়ে পড়ে। বন্ডের সেই সিক্রেট সার্ভিসের চার যুবকের দল।

দ্বিতীয় লোকটা লাফ দি়োঁছিল বন্ডের গায়ের উপর। কিন্তু তার আগেই—

কার রিভলভারের গুলি এসে বিধল লোকটার পিঠে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার দেহ।

— কে ছুঁড়ল এই গুলি?

বন্দ তার চার সাগবেদকে জিজ্ঞেস করে।

— না স্যার, আমরা নই।

— তবে?

গাছের আড়াল থেকে এগিয়ে এল মেবি বাসেল। বলল— ভয় ছিল, গুলিটা না আপনার গায়ে লাগে!

বন্দ খুশি। বলে— এসো আমাব সঙ্গে। আবেকটা পাখির বাসার খোঁজ পেয়েছি।

— এটাও আপনার অর্ডার নাকি?

— ইয়েস।

॥ সাত ॥

টেবিলের 'আলেকজান্দ্রিয়া'র গেলাস নিয়ে বসেছিল বিচিত্র মোটা গৌফওয়াল। একটা লোক। অদ্ভুত দুর্বোধ্য ইংরেজি বলছিল।

বন্দ তার সামনে গিয়ে বসল।

ওয়েটার বলল— গুড ইভিনিং, স্যার।

গৌফওয়াল। লোকটার নাম ক্রিস্ট্যাটোস। সে বন্দকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। ওর ভাবগতিক দেখে বন্দও মজা পাচ্ছিল। দুর্বোধ্য উচ্চারণে সে বোঝাতে চেয়েছিল। এই ধরনের কারবারে খুব ঝুঁকি আছে— 'ইন দিস্ পিজনিস ইজ মাচ্ রিস্কিও।'

বন্দ নীচু স্বরে বলল— শোনো, এই বিজনেসে কিন্তু টাকার অভাব নেই। ডলাব, ফ্রাঁ, বলিভার— যাতে চাইবে পাবে।

এদিকে 'এম' ডেকে পাঠিয়ে দিলেন বন্দকে।

— আচ্ছা 007, হাতে কেমন কাজ আছে?

— কিছু পেপার ওয়ার্কস্ আছে।

- তার মানে?

— মানে বেশি পরিশ্রমের কোনে। কাজ নেই।

— বেশতো, কাগজে কাজ কিছু নিয়ে নাও। যেমন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বিষয়— আফিং নিয়ে যে স্মাগলিং চলছে। রিপোর্ট কাগজপত্র দেখে নাও।

বন্দ ফাইলটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এম. জিজ্ঞেস করেন— কিছু বলবে?

— দুটো কথা স্যার। এক, কেন আমরা এই চোরাকারবারীদের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছি। দুই, এদের খবর কি স্টেশন ওয়ানের কাছে পাব?

— আমি ব্যক্তিগত ভাবে মাথা ঘামাতে চাইন'। মনে পড়ে তুমি বছরের শুরুতে মেক্সিকো গিয়েছিলে? সেখানে আফিং চাষিদের হাতে মরতে মরতে বেঁচে গেছ। নানা দপ্তর থেকে এই ধরনের কাজের চাপ আসছে। যেমন ইটালিয়ান দলটাকে ধরার ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত এই ধরনের বিষয়গুলো প্রাইম মিনিস্টার পর্যন্ত গড়ায়। তিনিও শুনেছেন— পর্বতপ্রমাণ 'হেরোইন' চালান হচ্ছে দেশের মধ্যে দিয়ে। ইটালিয়ান পুলিশ বিশেষ কিছু করতে পারেনি।

— কেউ বোধহয় এদের সাপোর্ট করছে।

— সম্ভবত। সি.আই.এ. অনেক কিছু জানে। ওয়াশিংটনে ওদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তবে হ্যাঁ, একটা লোককে যদি ধরতে পারো, নাম ক্রিস্ট্যাটোস! লোকটা স্পাই। আফিং-এর

চোরাকারবারের বেশ কিছু খবর রাখে। সে তোমার সঙ্গে পরশু রোমে দেখা করবে।
রিপোর্টগুলো ঝটপট পড়ে নাও।

— এই চোরা কারবার বন্ধ করার কাজটায় খরচা আছে। ব্যয়সাপেক্ষ। কত দেবেন?

— এক লাখ পর্যন্ত।

এই ছিল পটভূমিকা।

সেই ক্রিস্ট্যাটোস এখন বন্ডের মুখোমুখি। সে এই কথাটাই জিজ্ঞেস করে— মি. বন্ড, খবর পেতে হলে কত দেবেন?

— পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড।

— আসছি। — বলে উঠে যায় সে।

বন্ড বেশ ক্ষুধার্ত। আধগেলাস কিয়ান্তি পান করে মাখন-রুটির প্লেট টেনে নেয় বন্ড।

অন্য টেবিলে একটা লোক স্প্যাগেটি খাচ্ছে। তার সঙ্গে রয়েছে একটি মেয়ে। লোকটা খেতে খেতে বলছে— স্পাই দেখলেই ধরে ফেলা যায়।

ক্রিস্ট্যাটোস ফিরে এল। এসেই বকবক শুরু করল। যত বাজে কথা। ইলেকশান, আলফা রোমিও ইটালিয়ান ও ইংলিশ জুতোর তুলনা— ইত্যাদি ইত্যাদি।

কফি আসে।

ক্রিস্ট্যাটোস বলে— এবার কাজের কথা। পিজিনেস! আমেরিকানদের অনেক খবর দিয়েছি। এবং আপনাকে দেব।

— বেশ।

— আমার চাই দশ হাজার আমেরিকান ডলার। কাল লাঞ্চের সময় নোট নিয়ে আসবেন। পুরো দলটা আপনি গুঁড়ো করে দেবেন। কাজ শেষ হলে আমাকে দেবেন আরও বিশ হাজার।

— বেশ।

— আরেকটা কথা। মরে গেলেও এসব কথা আর কাউকে জানাতে পারবেন না।

— বেশ।

— আরেকটা শর্ত। এই গ্যাং-এর পান্ডাটাকে আগে খতম করতে হবে।

— কেন? এখনই—

— প্রমাণ করবেন না।

— আমি আত্মরক্ষার জন্য ছাড়া অন্য কারণে কাউকে মারি না।

— মনে রাখবেন, আমি শুধু খবর দিয়ে খালাস। কাজটা আপনাকে একাই করতে হবে। কাজের মধ্যে আমি নেই।

— ঠিক আছে।

এবার বিস্তর খবর দেয় ক্রিস্ট্যাটোস। এদের নাম পুলিশের লিস্টে আছে। একশো জন অতি কুখ্যাত। এরা টাকা সংগ্রহ করে বেরুট, ইস্তানবুল ও ম্যাকাও থেকে। সবই বিশ্বকুখ্যাত স্মাগলিং কেন্দ্র। এদের চিফ মিলানে ওষুধের দোকান খুলেছে। 'ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস' রেলপথে চোরাচালান হচ্ছে। মিলানের ওষুধ কোম্পানির নাম— ফার্মেসিয়া কলম্বাস। এখানে কাঁচা আফিং থেকে 'হেরোইন' তৈরি হয়। মোটরে ডেলিভারি যায় ইংল্যান্ডের দালালদের কাছে।

— মোটরে! মালটা কোনখানে থাকে?

— স্টেপনিতে। একটা স্টেপনিতে বিশ হাজার পাউন্ডের 'হেরোইন' থাকতে পারে।

— পালের গোদা কে?

— সে দলের কাছে দ্য ডাভ বলে পরিচিত। আসল নাম— এনরিকো কলম্বো। এই রেস্টোরাঁর মালিক। ওই দেখুন। স্প্যাগেটি খাচ্ছে। সঙ্গে মেয়েটার নাম লিলি বন। ভিয়েনায় থাকে। পেশা অঙ্ককার জগতের কাজ।

মনে হল, সেরেটি যেন বন্ডকে ইশারা করছে।

সিনেমা ভাঙবে এখনি। তার মানে, এখানে ভিড় বাড়বে।

এরপর এনরিকো কলম্বো সম্পর্কে কিছু খবর শুনল বন্ড।

ওদিকে সেই টেবিলে ঝগড়া শুরু হয়েছে। ভিয়েনা সুন্দরী রেগেমেগে উঠে দাঁড়িয়েছে।

— ‘ওরে ইটালিয়ান ব্যাণ্ড!’ — বলে পানীয় ভর্তি গেলাস ছুড়ে মারল এনরিকোর মুখে।

তারপর ছুটে এল বন্ডের সামনে।

হই-চই-এর মধ্যে বন্ড বলল— আপনাকে ট্যাক্সিতে তুলে দেব?

— হ্যাঁ, যদি দয়া করে—

ট্যাক্সিতে উঠল দুজনে। গাড়ির জানলা দিয়ে বন্ড ক্রিস্ট্যাটোসকে বলল— কাল ফোন করব।

চলছে ট্যাক্সি। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

বন্ড বলল— কিছু খেলে হত না?

— না। ভীষণ ক্লান্ত। কাল ভেনিস যাচ্ছি।

— আরে, আমিও তো কাল যাচ্ছি।

— আপনার নাম। আপনি ইংরেজ?

— হ্যাঁ, নাম জেমস বন্ড। লেখক।

— আপনি ক্রিস্ট্যাটোসের সঙ্গে কথা বলছিলেন। একনম্বর শয়তান। এই তো আমার হোটেল এসে গেছে। এখানেই নামব।

ট্যাক্সি থামে। হোটেল অ্যামবাসাডার। মেয়েটি নেমে যায়।

— আপনার নামটা জানা হয়নি।

— মিস লিলি বন্ড।

॥ আট ॥

রোম থেকে ভেনিস যাবার ভালো ট্রেন ল্যাগুনা এক্সপ্রেস। কোচে চাপার আগে লন্ডনের সঙ্গে এক রাউন্ড আলোচনা সারল বন্ড— টেলিফোনে। ভেনিস পৌঁছে হোটেলে টানা আট ঘন্টা ঘুমিয়ে সমস্ত অবসান ও ক্লান্তি দূর করল সে।

সুন্দর আবহাওয়া। মনোরম ভেনিস। এখন ট্যুরিস্টের ভিড় তখন কিছু নয়। তবে হাজার হাজার ট্যুরিস্টকে আশ্রয় দিতে পারে— এমন শহর ভেনিস।

দিনভর ঘুরে বেড়াল বন্ড। এমনকি গির্জাতেও গেল। বন্ডের মাথার পিছনে অদৃশ্য চোখ আছে, যা দিয়ে সে অনুসরণকারীকে দেখতে পায়। কেউ ‘ফলো’ করছে না তো!

হোটেল ফিরে লাঞ্চ খেল। ঘরে বসে রিভলভারে সেফটি ক্যাপ লাগিয়ে কয়েকবার প্র্যাকটিস করল।

নীচে এসে সে জলপথ ধরল। স্পিডবোটে অ্যালবেরোনি।

অ্যালবেরোনিব জেটি থেকে আধমাইল দূরে মাটির রাস্তা। মরুভূমির মতো ধু-ধু করছে এই জায়গাটা। জেলেদের গ্রাম। স্টুডেন্ট হোস্টেল আছে অবশ্য। বড়ো বড়ো প্রান্তরে ইটালিয়ান

কামান! গলফ্ ময়দান তারকাটা দিয়ে ঘেরা। দু-এক জায়গায় ডেঞ্জার বোর্ডে লেখা : সাবধান!
মাইন পোতা আছে।

বন্দ হাঁটছিল। প্রায় আধমাইল হেঁটে কিছুটা ক্লান্ত সে। সমুদ্রের পারে কয়েকটা কাঠের
ঘব স্নানার্থীদের জন্য। এখন একদম ফাঁকা।

হঠাৎ একটা ছাতার তলায় দেখা গেল লিলি বম্কে। পরনে কালো রঙের সাঁতারের
পোশাক।

— তুমি এখানে? — বন্দ জিজ্ঞেস করল। — এত নিরালায়।

— আমি গ্রেটা গার্বোর মতো নির্জনতা ভালোবাসি।

— আচ্ছা, ওই এনরিকো কলম্বো কেমন লোক?

— বহুৎ ধুরন্ধর। অনেক গুণ আছে তার। মানে হাজারো বদদোষ। খুনি-খুনি মন। ভীষণ
সন্দেহবাতিক।

দূরে দেখা গেল তিনজন গুন্ডাটাইপের লোক এদিকে এগিয়ে আসছে। মনে হবে যেন মার্চ
করছে।

— চললাম— বলেই বন্দ উঠে গেল হঠাৎ।

তিনমূর্তি রোডের মধ্যে হাঁটছে। বন্দ একটু দূরে। টাই খুলে ফেলল। চোখে পড়ল একটা
জটলা, পাঁচ-ছয় জন ছেলে। বর্ষা হাতে।

হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। গম্ গম্ কবে কেঁপে উঠল চারদিক। একটা লোক খণ্ডবিখণ্ড হয়ে
গেল মুহূর্তের মধ্যে। আরেকটা এখন ছুটছে। বন্ডের পিছনে। ওর হাতে একটা রিভলভার!

দেখা গেল, ছেলেগুলো 'হারপুন' নিয়ে বন্ডের দিকে তাগ্ করছে। তাদের মাঝখানে
কলম্বো। দূর থেকেই চিৎকার করে বলল— ও মি. বন্দ, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট! মশাই
আপনার টয় পিস্তল রেখে দিন। এদের 'হারপুন' অব্যর্থ।

বন্দ বলল— আমার হাতের টিপ্ অব্যর্থ। আপনি-আমি দুজনেই মরব।

বন্দ টের পায়নি, এক সম্ভাব্য আততায়ী ঠিক তার পিছনে এসে গেছে। আচমকা রিভলভার
বাট্ দিয়ে সে বন্ডের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল।

জ্ঞান হারাল বন্দ।

II নয় II

যখন আবছা জ্ঞান ফিরল, বন্দ টের পেল সে যেন জাহাজে, ভাসছে সমুদ্রের উপর। একটা
বাল্কের উপর শায়িত সে। মাথা ঘুরছে, ঘাড়ে তীব্র যন্ত্রণা।

গুনতে পেল হাসির শব্দ। চেনা কণ্ঠ।

— কী, কেমন লাগছে? ব্যথা! আহা, সেরে যাবে।

একটা নাবিক। চেনা-চেনা লাগছে।

কী মতলব কলম্বোর কে জানে! উঠে বসল বন্দ। যন্ত্রণার মধ্যেও ড্রয়ার হাতড়ে সিগারেট
পেল। রিভলভারটা অবশ্য উধাও!

নাবিকটা বন্দকে নিয়ে এল অন্য একটা ঘরে। টেবিলে নানা খাবার সাজানো। চেয়ারে
বসানো হল বন্দকে।

দরজা ঠেলে কলম্বো ঢুকল। বন্ডের কাছে এসে বসল। হেসে বলল— খান, বন্ধু, খিদে
পেয়েছে নিশ্চয়। খেতে খেতে কাজের কথা শুরু করুন।

বন্দ সপ্রতিভভাবে বলল— এত কাণ্ডকারখানার কী দরকার ছিল। আমি তো এসেছি ইচ্ছে করেই আপনার ফাঁদে পা দেব বলে। তবে ভুলবেন না, যদি আমি কাল দুপুর বারোটোর মধ্যে ছাড়া না পাই, তবে পুলিশ আপনাকে আচ্ছারকম ধোলাই দেবে।

কলস্বো সামান্য অপ্রতিভ। বলল— তবে আপনি পালাচ্ছিলেন কেন?

— আপনি ভাড়াটে গুণ্ডা লাগালেন কেন? লিলি বম একাই তো আমাকে কবজা করতে পারতো?

কলস্বো বলল— কিন্তু আপনি তো আমাকে খুন করার শপথ নিয়ে এসেছিলেন। আমি কী করে আপনাকে বন্ধু ভাবব?

বন্দ কিছু বলাব আগেই দেবরাজ থেকে একটা টেপ রেকর্ডাব বের করল কলস্বো। সুইচ অন করতেই শোনা গেল— ‘দশ হাজার ডলার চাই, আমেরিকান ডলার। কাল লাঞ্চার সময় পুরো নোট আনবেন। ... একটা শর্ত, আগে এই গ্যাং-এর পান্ডাটাকে খতম করতে হবে।’

হ্যাঁ, ক্রিস্ট্যাটোসের গলাই বটে।

বন্দ বলল— আমি তো কাউকে খুন করার কথা দিই নি।

— কিন্তু আপনার মনে তো সেই মতলব আছে। সেটা মিথ্যে?

— সবটা মিথ্যে নয়।

— শুনুন, আমিই স্মাগলাব। সিগারেট থেকে শুরু করে মেডিসিন – এমন কি হিরের চোবা কারবার করি। ব্ল্যাক মার্কেটে সোনা সাপ্লাই কবি। কিন্তু আফিং হিবোইন – না, না, এসবের মধ্যে আমি নেই একদম!

— তার মানে ক্রিস্ট্যাটোস মিথ্যে বলেছে?

— বটেই তো। ও গভীর জলের মাছ।

— কিন্তু আপনার সঙ্গে ওর শত্রুতা কেন?

— আবে স্মাগলারদের মধ্যে তো শত্রুতা লেগেই থাকে। আপনাকে আমার দিকে ভিড়িয়ে দিয়ে ও নিজেদের বড়ো বড়ো চাঁইকে বাঁচাতে চেয়েছে। তবে, আমি একটা মারাত্মক খবর জানি। কাল লড়াই হবে।

— কীসের লড়াই? কোথায়?

— সান্তা মেরিয়ার আনকোনার উত্তরে ছোটো একটা বন্দরে লড়াই হবে।

— আপনার সহযোগিতা চাই। কত নেবেন?

— এক পয়সা নয়। কেন থাক—

কলস্বো উঠে গিয়ে ড্রয়ার থেকে কী যেন বের করে বন্ডকে দেখে— নিন, আপনার রিভলভার! এখন ঘুমান, ভোরবেলায় কফি পাবেন।

॥ দশ ॥

কলস্বো মিথ্যে বলেনি।

তবে স্মাগলারদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে বন্ডের কোনো আগ্রহ নেই। গুলিবর্ষণ শুরু হতেই সে এক লাফ দিয়ে বাবে; ফুট নীচে পাথুরে জেটির উপর এসে পড়ল।

দুম্ দুম্ শব্দ। একটা বিশাল নিউজ থ্রিষ্টের রোল গড়িয়ে আসছে। ওই যে একটা বদমাস। বন্ডের রিভলভার দু'বার গর্জন করল। আছড়ে পড়ল সে।

বন্দ এবার ছুট দিল গুদামের দিকে।

আরে একী! রোল ফুটো হয়ে ঝুর ঝুর করে কী যেন ঝরে পড়ছে!

আরেব্বাস। এ কীসের গন্ধ। মিষ্টি মিষ্টি!

এই তো কাঁচা আফিং!

পা টিপে টিপে বাইরে এল বন্দ। চারদিকে মৃত্যুর গন্ধ! পিছনের দরজায় একটা লোক ওৎ পেতে আছে।

চিনতে পারল বন্দ— ক্রিস্ট্যাটোস।

গুলি ছুঁড়ল বন্দ। কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ।

গাড়ি চালিয়ে পালাচ্ছে ক্রিস্ট্যাটোস।

শেষ পর্যন্ত উধাও হয়ে গেল।

আবার মধ্যে অবতীর্ণ কলস্বো।

— মাই ফ্রেন্ড, আলবানিয়ান শত্রুপক্ষের দুজন খতম, বাকিগুলো আহত। এবার পালান আপনিও। কারণ, জাহাজের সব কল খুলে দিয়েছি। হু হু করে জল ঢুকছে। পুলিশ আসার আগেই আমাদের ভাগতে হবে।

জাহাজের গুদামঘরে আগুন লেগেছে।

হাঁটুজল ভেঙে ডেক পেরিয়ে ওরা জেটিতে ফিরে এল।

॥ এগারো ॥

ন্যাসো। ডিনার পাটি জমে উঠেছে।

বিরাত ধনী হার্ভে মিলার। মিস্টার ও মিসেসকে প্লেন ধরিয়ে দিতে গেছেন গভর্নরের এ. ডি. সি.। তিনিই এতক্ষণ আসার মাতিয়ে রেখেছিলেন।

গভীর রাতে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে জাহাজে, তার মূলে যে বন্দ স্বয়ং, একথা জানে শুধু পুলিশ চিফ আর দুজন অফিসার।

আসরে স্বয়ং গভর্নর উপস্থিত। তিনি চুরুট ধরিয়ে গল্প করার মুডে রয়েছেন। ফিলিপ মাস্টার্স বলে একজনের কথা বলছিলেন তিনি।

— আমার চেয়ে সে একবছরের জুনিয়র। অক্সফোর্ডে পড়েছে। কৃতী ছাত্র। নাইজেরিয়ায় শ্রমিক সরকারের আমলে চাকরি পায়। ক্রমশ পদোন্নতি হয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। তখন সে বারমুডায় বদলি হয়।

এরপরেই আসে রোভা নামে এক এয়ার হোস্টেসের কাহিনি। একবার বিমানে চেপেই এমন ভালোবাসা হয় যে রোভা ফিলিপকে বিয়ে করে ফেলে। সুন্দরী রোভা।

বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে ঘর সংসারে মন দেয়।

ছ'মাস আনন্দে কাটে। কিন্তু এরপর বোরিং লাগে রোভার। কিছুতেই মন ভরে না। শেষে গলফ খেলা শুরু করে। আলাপ হয় এক সুন্দর যুবকের সঙ্গে। তার নাম ট্যাটারসল। এবার অসংযত জীবন শুরু হল রোভার। রাত করে ঘরে ফিরত। সুখী দম্পতির মধ্যে সম্পর্কের চিড় ধরল। ঝগড়া, কান্না, শেষপর্যন্ত ফিলিপ ক্ষুর দিয়ে কবজির শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

তারপর অনেক ঘটনা। ট্যাটারসল এক সময় সরে দাঁড়ায়। রোভা অনুতপ্ত হয়। ঘর সংসারে মন দিতে চায়।

গভর্নর বলেন— এরকম বহু ঘটনা দেখেছি মানুষের দাম্পত্য জীবনে। মি. বন্দ, আপনি বিয়ে করেন নি, তাই এসব বুঝবেন না।

— শেষ পর্যন্ত কী হল?

— শেষ পর্যন্ত আবার গোলমাল। আমার ছাড়াছাড়ি। এবার ফিলিপ উদ্যোগ নিল। সে রোডকে প্র্যাকটিকালি লাথি মেরে চলে গেল।

— আর রোডা কী করল।

— করুণ অবস্থা। গভর্নবের স্ত্রীর দয়ায় একটা হোটেলে রিসেপশনিস্টের কাজ পেল। এবার হঠাৎ তার ভাগ্যে নাটকীয় পরিবর্তন। এক কানাডিয়ান কোটিপতির সঙ্গে প্রেম হল। রোডা এখন তার স্ত্রী। ওরা কানাডায় থাকে।

— খুব সুন্দর গল্প। শুড নাইট।

বিদায় নিল বন্দ। গল্পটা কী একটা শিক্ষা!

॥ বারো ॥

স্টিং-রে গভীব জলের প্রাণী। লেজ দশফুট লম্বা।

সাঁতার দিতে বন্দ লক্ষ রাখছিল। আজ সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, একটা স্টিং-রে মারতে হবেই।

এটা সিসিলি দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপ। ভারত মহাসাগরের জলে অ্যানিমোড লতার জাল। বিশাল প্রবাল স্থূপ।

কোথায় লুকিয়ে পড়ল স্টিং-রে-টা?

ওই তো বালিব উপর। মৃদু স্পন্দন বালির উপর। একটু নীচে লুকিয়ে আছে স্টিং-রের শরীরটা। বিষাক্ত পাখা নিয়ে সামান্য বিম্ মেরে আছে। ত্রিন্দাদাস ব্যবসায়ী নাকি একসময় স্টিং-রের লেজ দিয়ে চাবুক তৈরি করত। এখন সিসিলি-তে এই ধরনের চাবুক রাখা আইনবিরুদ্ধ।

একটু আগে বন্ডের তীক্ষ্ণ 'হারপুন' স্টিং-রেটার পিঠে বিধেছে। তবু আহত পিঠ নিয়ে প্রাণীটা সাঁতারে গেছে অনেক দূর। কিন্তু এইবার তার মৃত্যু সমাগত।

হঠাৎ শূন্যে লাফিয়ে আবার বালির উপর আছড়ে পড়ে খাবি খেতে লাগল স্টিং-রে। ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেল। তার ইহলীল শেষ।

সমুদ্রতীরে রাস্তার উপর বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী ফাইডেল-এর গাড়ি, স্টেশন ওয়াগন।

ফাইডেল, কমবয়সি কোটিপতি। ফাইডেল ২'৬"। হোটেল, বজরা— সবই আছে। আধুনিক লাক্সারি বজরা। সব রকম আবামের বন্দোবস্ত রয়েছে।

পোশাক বদলে ফাইডেলের গাড়িতে উঠে বন্দ। ফাইডেল নিজেই ড্রাইভ করছে।

— বজরাটায় থেকেছ কখনও?— ফাইডেল জিজ্ঞেস করে।

— না, আপনার বজরা?

— না, আমার নয়। মালিকটা এক আমেরিকান বদমাস। নাম মিলটন ফ্রেস্ট। লোকটা বদমাস হলেও, বজরাটা সুন্দর, আরামের। জানেন, আমি মিসেস ফ্রেস্টকে নিয়ে শাগ্রিন দ্বীপে বেড়াতে যাচ্ছি। মিস্টার ফ্রেস্টের জন্য সামুদ্রিক নমুনা সংগ্রহ করব। দ্বীপটায় বছরকম মাছ আছে। আপনিও চলুন।

— কেন? আমি ওখানে গিয়ে কী করব?

— আরে মশাই, জমবে ভালো। চলুন।

বন্ডের মনে পড়ে গেল 'এম'-এর মিসেজ। জরুরি বার্তায় বলা হয়েছে— 'মালদ্বীপের জাহাজ যাঁটিতে গোলমাল। সিংহল থেকে কম্বিনিস্টরা এসেছে। স্ট্রাইক চলছে, পাশাপাশি

নাশকতা, জাপানি নৌকা, ইংরেজ অপরাধী আর ফ্রান্সের দালালের মধ্যে আঁতাত হয়েছে।
একটা রিপোর্ট পাঠাও।’

একটু বন্ড ফাইডেলকে বলে— বেশ। চলুন।

বার্বে ফ্যামিলির বিশাল প্রাসাদে উঠছিল বন্ড। সাতটা দিন কেটে গেল সাঁতার কেটে।
ফ্রেস্টের বজরা সত্যিই মনোরম।

মিলটন ফ্রেস্টের সঙ্গে আলাপ হল। মজবুত চেহারা, বয়েস বছর পঞ্চাশ হবে, কাঁচাপাকা
চুল। ডান হাতে উলকিতে ঈগলের ছবি।

— আপনিই মিঃ বন্ড! কী করেন?

— গভর্নমেন্ট সার্ভিস।

— হাঃ হাঃ, দাসত্ব আপনাদের রক্তে, মানে ইংরেজ জাতের মধ্যে। আপনারা খুব ভালো
বাটলার বা খানসামা হতে পারেন।

সাঁতারের পোশাক পরিহিতা এক সুন্দরীর আগমন।

— ইনিই আমার স্ত্রী। মিসেস ফ্রেস্ট। আমার পঞ্চম স্ত্রী। বয়েসে অনেক ছোটো। লোকে
তাই ঠাট্টা করে।

সকলের সঙ্গে আলাপ হল।

মিসেস ফ্রেস্ট বলে— এক সময় রিসেপশনিস্টের কাজ করতাম। ওর হঠাৎ পছন্দ হয়ে
গেল আমাকে। ব্যস বিয়ে হয়ে গেল।

ওরা এবার বেরিয়ে আসে।

দূরে মাহে দ্বীপ। সবুজ উপকূল দেখা যাচ্ছে।

এরপর জাহাজ পরিক্রমা। সব কিছু দেখানো হল। ওরা এবার এল ফ্রেস্ট দম্পতির শয়ন
কক্ষে।

দেয়ালে একটা তিনফুট লম্বা শংকর মাছের চাবুক। বন্ড চমকে উঠল।

বন্ড বলল— ওঃ, আজ সকালেই একটা শংকর মাছ মেরেছি।

ফ্রেস্ট বলে— হুঁ, আরবরা এই দিয়ে বউকে শায়স্তা করে।

— এটা তো সিসিলিতে বেআইনি?

— এ জাহাজটা আমেরিকার। সিসিলির নয়। আসুন, চিয়ার্স।

পানীয়ের গ্লাস হাতে নেয় ফ্রেস্ট।

নানা কথা। ফ্রেস্টের মুখ থেকে জানা যায়— ফাউন্ডেশন কাকে বলে। ট্যাক্স ফাঁকির জন্য
বড়োলোকেরা এমন সংস্থায় কালো টাকা রাখে। বৈজ্ঞানিক অভিযানের অজুহাতে এই টাকায়
সমুদ্র ভ্রমণ হয়। ফাউন্ডেশনের টাকায় তৈরি হয় ন্যাচারাল হিস্ট্রির জাদুঘর, ছোটোদের সুইমিং
পুল, আরও কত কিছু।

— আচ্ছা, হিলব্র্যাণ্ড মাছ সম্পর্কে কিছু জানেন?

— যতদূর জানি, এটা দুঃখাপ্য মাছ। ১৯২৫ সালে প্রফেসর হিলব্র্যাণ্ড শাগ্রিন দ্বীপের
সমুদ্রে সর্বপ্রথম এই মাছ ধরেন। একটা মাছই নাকি আজ পর্যন্ত ধরা পড়েছে। ইঁপা ছয়েক
লম্বা। ফাউন্ডেশন এই নিয়ে গবেষণা চালাতে চায়। ভাবুন তো, শুধু টাকা ওড়ানোর ধান্দা!

হঠাৎ মিসেস ফ্রেস্টের একটা নির্দোষ মন্তব্যে অহেতুক খেপে গেল মি. ফ্রেস্ট— শোনো,
তোমার চূপচাপ থাকাই মঙ্গল। নয়তো চাবুকটা যে ব্যবহার করতে হবে— রাত্রিবেলা। হেঃ
হেঃ—

পরদিন ভোর। দূরে দেখা যাচ্ছে ‘শ্যাগ্রিন’ দ্বীপ। স্পিডবোট পৌঁছে গেল এই ছোটো প্রবাল দ্বীপে। উপকূল থেকে বিশ গজ দূরে বালির উপর তাঁবু খাটানো হল।

সাঁতারের মুখোশ পরে বন্ড আর ফাইডেল জলে নামল। মিসেস ফ্রেস্টও যোগ দিল। শামুক তোলার খেলায়। বন্ড খুঁজছে হিন্ডারব্র্যান্ড মাছ।

সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে থাকে — এই মেয়েটাই চাবুক খায়। একদিন হয়তো রেগে গিয়ে স্বামীকে গুলি করে দিতেও পারে। তবে অদ্ভুত মনের মেয়েরা অনেক সময় চাবুক খেতে ভালোবাসে। হঠাৎ হইচই। মিস্টার ফ্রেস্ট জলে নেমে পড়েছেন। ব্যাপার কী? হিন্ডারব্র্যান্ড মাছ নাকি দেখা গেছে।

মিস্টার ফ্রেস্ট বলেন, এই মাছ ধরতে হলে জলে বিষ ঢালতে হয়। বিষের নাম রোটেনন্। মাছ দমবন্ধ হয়ে মাঝা যায়।

দু’মিনিট কেটে গেল। একটিমাত্র প্রাণীকে মারার জন্য জলে বিষ ঢাললে হাজার হাজার সামুদ্রিক প্রাণী মারা যাবে। সেটাওতো ভাবা দরকার।

বন্ড ঠিক করল, মাছটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে।

এদিকে জলে বিষ ঢালা হয়ে গেছে। শ্রোতে ভেসে আসছে রাশি রাশি মৃত অক্টোপাস, বাণ মাছ, সাদা সাদা নানা ধরনের মাছ। ঐতো আসছে একটা হিন্ডারব্র্যান্ড। এখনও বেঁচে আছে বোধহয়, কিন্তু তার মরণ আগত। বন্ডের দুপায়ের ফাঁকে এসে, হিন্ডারব্র্যান্ড স্থির হয়ে গেল। কিছু করার নেই।

ফ্রেস্টের হাতে মাছটা তুলে দিয়ে, বন্ড আবার জলে ঝাঁপ দিল।

আজ রাতে ডিনারে মিস্টার ফ্রেস্টের পানীয়ের মাত্রা অনেকটা বেড়ে গেছে। তার কথা শুনতে শুনতে বন্ড আর ফাইডেলের কান ঝালাপালা।

যুদ্ধের কথা থামানোর জন্য বন্ড জিজ্ঞেস করে — আমেরিকা সম্পর্কে কিছু বলুন।

— আরে যুদ্ধের সময়ে আমেরিকা ছিল শিশু। এখন একেবারে বৃদ্ধ। বুদ্ধি পাকার সুযোগ পায়নি।

মিসেস ফ্রেস্ট কিছু বলতে গেলেই চাবুক মারার ইঙ্গিত দেন মিস্টার ফ্রেস্ট। বন্ডের ইচ্ছে হল একটা ঘুমি মেরে মাতালটাকে থামিয়ে দেয়। ফ্রেস্ট এবার ফাইডেলের সঙ্গে বকবক শুরু করেন। শুনতে শুনতে মিসেস ফ্রেস্ট ক্লাস্ত।— আমার ঘুম পেয়েছে।

বন্ড বলল— যান আপনি শুতে যান। এখানে কথাবার্তা শুনলে এমনিতেই আপনার মন খারাপ হয়ে যাবে।

মিসেস ফ্রেস্ট একটু অস্বস্তি পায় — না, না, তা নয়, কিছু মনে করবেন না।

মিসেস ফ্রেস্ট চলে যাওয়ার পর মিস্টার ফ্রেস্ট হঠাৎ বন্ডকে সতর্ক করে দেয়— বন্ধু, বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। আমিও শুতে যাচ্ছি।

ওরা চলে যাবার পর বন্ড শাওয়ারে স্নান করে। হঠাৎ নারীকণ্ঠের আর্ত চিৎকার। প্রথমে জোরে, তারপরে আস্তে, তারপর খেমে যায়। মরে গেল নাকি মেয়েটা? যাক্গে, ভেবে আর কী হবে। পরদিন সকালে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা।

হঠাৎ অদ্ভুত শব্দ। ডেকের সিঁড়িতে পা দিয়ে বন্ড শুনতে পেল খট্ খট্ জুতোর শব্দ। তারপরই ভয়াবহ দৃশ্য।

ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে মিস্টার ফ্রেস্টের মৃতদেহ। বিকট মুখ।

তার হাঁ-করা মুখের মধ্যে কী যেন লটপট করছে! না, ওটা ক্রেস্টের জিভ নয়। একটা লেজ! হিন্ডার ব্রান্ড মাছের লেজ।

দেখে মনে হচ্ছে, মিনিটখানেক আগে মারা গেছে ক্রেস্ট। মৃতদেহের পাশে এসে দাঁড়ায় বন্ড। কে খুন করল ক্রেস্টকে? ফাইডেল না কি মিসেস ক্রেস্ট? আর এ কী অদ্ভুত কায়দা। দুঃপ্রাপ্য মাছ দিয়ে হত্যা?

কিন্তু লাশটা সরাতে হবে। ধরা পড়লে বন্ডও জড়িয়ে যাবে। এমন কিছু করতে হবে যাতে মনে হয়, দোলনা ছিঁড়ে ডেকে পড়ে গেছে ক্রেস্ট। মস্ত অবস্থায় গড়িয়ে গিয়ে পড়ে গেছে সমুদ্রের জলে।

ঘড়িতে তখন সোয়াদুটো। প্ল্যানমাফিক কাজ হাসিল করে নিজের ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়ল বন্ড।

II চোদ্দো II

এখন সন্ধ্যে ছটা। ডেকে ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। বন্ড, ফাইডেল আর লিজ মানে মিসেস ক্রেস্ট। লিজের পবনে সাদা ফ্রকে কালো বেন্ট, গলায় কালো রুমাল, শোকের চিহ্ন।

তিনজনেই চুপচাপ।

ওয়েভ ক্রেস্ট বজরা এবার ক্যানন পয়েন্ট ঘুরে এগিয়ে গেল।

লিজ বলল— ‘বন্ড’ এবার ঝামেলা হতে পারে। আপনি সঙ্গে থাকুন।

ফাইডেল বলল— চিন্তা করবেন না। চিফ জাস্টিস আমার কাকা। একটা তদন্ত হবে। পরণ্ড ছাড়া পাবেন।

বন্ড ভাবল— উনি তাহলে ‘খুনি’।

III পনেরো II

আবার নতুন পটভূমিকা!

জ্যামাইকার সবচেয়ে সুন্দর পাখির নাম, ডক্টর হ্যামিং বার্ড এক আব একটা নাম, স্টিমার টেল।

বিয়ের পর, কনটেন্টে এসে শান্তিতে ছিলেন, মিসেস হ্যাভলক।

এখন চা খেতে খেতে মিসেস হ্যাভলক যার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, ‘তার নাম ‘পিরামাস’। সেও একধরনের প্রাণী। মধু খেতে এসেছে। ফুলের উপর উড়ে বেড়াচ্ছে। খেলাও বটে, মধুপানও হয়।

মিস্টার হ্যাভলকের সঙ্গে চা খেতে খেতে নানা পারিবারিক কথা বলছিলেন মিসেস হ্যাভলক। ঠাকুরদার আমলে জমির কথা, ব্লু-হারবার হোটেলের কথা, জিমি-ফার-কুয়ারসনের কথা, পানামা রোগের কথা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হচ্ছিল, ‘উরসুলার’ কথা আরও নানা বিষয়— রাহাজানি, সমিতির ফান্ড, সরকারি টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি।

বারান্দায় এল নিগ্রো পরিচারিকা, নাম ‘আগাথা’। বিশাল চেহারা, ওর সঙ্গে দু’একটা টুকটাক পারিবারিক কাজকর্মের প্রশ্ন করলেন মিসেস হ্যাভলক। হঠাৎ গাড়ির আওয়াজ। আগাথা খবর দিল—

কিংসটন থেকে একজন এসেছেন কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে চান। সম্মতি পেয়ে ঘরে এলেন তিনজন। একজন হাত বাড়িয়ে বললেন, আমি মেজর গনজালিস। ‘হাভানা’ থেকে আসছি। এরা দুজন আমার সেক্রেটারি।

— বলুন কী করতে পারি ?

— একটা ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমাকে পাঠিয়েছেন হাভানার এক বিশিষ্ট ক্ষমতাবান মানুষ। আপনার জমিজমার দরদাম জানার জন্য। নির্ভয়ে খোলাখুলিভাবে ন্যায্য দাম চাইতে পারেন।

— কিন্তু এই সম্পত্তি তো বিক্রি করা হবে না। এখানকার কোনো জমি বিক্রি হবে না। উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। তার মানে এ নিয়ে আর কথাবার্তা বলতে চাননা তিনি।

মেজর বললেন— দাঁড়ান। এই বাড়িটা ধরুন এবং এই খলিটা। এর মধ্যে মোট রয়েছে পাঁচ লক্ষ ডলার। অর্থাৎ আপনাদের হিসাবে এক লক্ষ আশি হাজার পাউন্ড। আমার বন্ধু ইচ্ছে করলে পুরোপুরি দু'লাখ পাউন্ড দিতে পাবেন। দলিলপত্র পরে হবে। আপনি এখন শুধু একটা কাগজে সই করে দিন।

এবার মিসেস হ্যাভলক রাগে ফেটে পড়লেন— মেজর এবার যান। নয়তো পুলিশ ডাকতে হবে।

মেজর বললেন,— তার মানে আপনি বেঁচে থাকতে এ জমি বিক্রি হবে না। এটাই কি শেষ কথা কর্নেল ?

একথার মানে কী ? বেঁচে থাকতে ? এটা কি খুনের ছমকি ?

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ শেষ কথা। অদ্ভুত হাসি হেসে মেজর বলেন— ঠিক আছে তাহলে এ জমির পরবর্তী মালিকের সঙ্গে আমার বন্ধু কথা বলবে। মানে আপনার মেয়ের সঙ্গে।

উঠে দাঁড়ালেন মেজর। তার দুই সঙ্গী কোর্টের ভিতব থেকে বের করল চকচকে বিভালবার। গর্জে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র, মি. ও মিসেস হ্যাভলকের মৃতদেহও পড়ে বইল মেঝের উপর।

হাঁটু মুড়ে বসে মেজর গনজালিস মৃতদেহ দুটি পবীক্ষা করলেন— কোথায় কোথায় বুলেট বিঁধেছে। তারপর ওরা বেরিয়ে এসে উঠল কালো সিডান গাড়িতে, জ্যামাইকার নাম্বারপ্লেট। নিজে ড্রাইভ করলেন গনজালিস।

জোড়া খুনের প্রায় আধঘন্টা পরে ওরা পৌঁছে গেল বন্দরে। জেটিতে আসার আগে, ওরা গাড়িটা লুকিয়ে বাখল, রাস্তার পাশে একটা ঝোপের আড়ালে।

জলে ভাসছে জাহাজ। অর্ধেকটা তোলা হয়েছে নোঙর। জাহাজের মাথায় পত্‌পত্‌ করে উড়ছে মার্কিন পতাকা। ওরা শান্ত মনে জাহাজে ওঠে। শুরু হল যাত্রা। এটা একটা টুরিস্ট জাহাজ। যাত্রীর ভিড়। হইচই চলছে। বোধহয় কোনো ফিল্মস্টার আছে ওদের মধ্যে।

॥ ষোলো ॥

এই ঘটনার পব একমাস কেটে গেছে।

এখন অক্টোবর। লন্ডন। শীত আসছে।

‘এম’ এর অফিসঘরের জানলা দিয়ে ভেসে আসছে ঘাস কাটার যন্ত্রের মোটরের আওয়াজ।

‘এম’-এর সামনে চেয়ারে বসে আনমনা ছিল বন্ড। সেটা ‘এম’ লক্ষ করেছেন। তিনি বললেন— ‘জেমস’ আমি বড়ো একা।

— কর্তা-কে তো শুধু ছকুম দিতে হয়। বাকিরা ছকুম মেনে চলে। তার তো কোনো কাজ নেই, তাই তিনি একা।

— ‘জেমস’, একটা বিপজ্জনক বয়স আছে, যে বয়সে অনেক শক্তিম্যান মানুষও হারতে থাকে। তাব শরীর কষ্ট পায়, দুর্ঘটনা ঘটে, নানারকম রোগে ভোগে। চল্লিশের পর, এই

বিপজ্জনক বয়সটা তোমার এখনও আসেনি। তবে, তুমি কি জানো, তোমার দেহ এবং মন আসলে কতখানি মজবুত?

কথাটা শুনে বন্দ বিরক্ত। বলে — কারণটা যদি গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে আমি অসুস্থ অবস্থার মধ্যেও দাঁড়িয়ে উঠতে পারি।

চুপ করে থাকেন ‘এম’। তারপর জানালা দিয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে বলেন— আচ্ছা হ্যাভলক দম্পতির মার্ভার কেসটা তোমার মনে আছে?

— হ্যাঁ, জ্যামাইকার ঘটনা। খবরের কাগজে পড়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে মেয়ে দেখে বাবা-মা দুজনেই খুন হয়েছে। পরিচারিকার মুখে শোনে যারা গাড়ি চেপে এসেছিল তাদের দেখতে কিউবার অধিবাসীদের মতো। গাড়িটা নাকি চোরাই গাড়ি, কিন্তু এমন কেস তো আমার কাছে আসে নি।

— আমি পাঠাইনি।... এখন ভাবছি। হ্যাভলক দম্পতি ছিল আমার বন্ধু। আমি ওদের বিয়েতে উপস্থিত ছিলাম। ১৯২৫ সালে মন্টায়।

এবার সংক্ষেপে কেসটার পটভূমিকা বর্ণনা করেন ‘এম’।

— তখন এক নাৎসিনি খুনি, তার নাম ভন্-হ্যামারস্টাইন। নানারকম উৎপাত করছিল। বাটসটার আমলে জমিয়ে কাজ করত হ্যামারস্টাইন। কিন্তু কান্স্ট্রোর জয়ের পর সে পালাবার মতলব করল। কিউবার বাইরে টাকা পাঠাতে লাগল। বিস্তর জমিজমা কিনতে থাকল। তার হয়ে যে কাজ করত সেই লোকটার নাম গনজালিস। এই গনজালিসই তার গুণ্ডা দিয়ে হ্যাভলক দম্পতিকে খুন করেছিল। তারপর তাদের পঁচিশ বছরের মেয়ে ‘জুডির’ ওপরেও চাপ সৃষ্টি করা হয়। অবশ্য এখন হ্যামারস্টাইন পালিয়ে গেছে।

— কোথায় পালিয়েছে?

— কানাডিয়ান বর্ডারের কাছে, উন্সবুর্ভার্নমন্টে। ওখানে একটা জায়গা আছে। ‘একো-লেক’। ফাঁকা জায়গা। পুরো অঞ্চলটি লিজ নিয়েছে হ্যামারস্টাইন।

‘বন্দ’ বলল— আমি রক্তের বদলে রক্ত চাই। বিদেশি অপরাধীদের এটাই সবচেয়ে বড়ো দাওয়াই। এদের ফাঁসি নয় খুন করা দরকার।

একটা ফাইল সই করে এগিয়ে দিলেন ‘এম’। লাল রং-এর ফাইল। কভারে বড়ো বড়ো করে লেখা আছে— “ফর ইওর আইজ ওনলি”। এটা সাংকেতিক বাণী। মানে একান্ত গোপনীয়।

॥ সতেরো ॥

‘মনট্রিল’। শুক্রবার এখানে পৌছেছে ‘বন্দ’। সে এখন মাউন্টেড পুলিশের দপ্তরে। এ জায়গার নাম ‘ওটাওয়া’।

নির্দেশমতো কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে গেল ‘বন্দ’।

অফিসার বললেন — ধরে নিন আমার নাম কর্নেল ‘জনস্’। তবে কমিশনার আমার কর্তা। আমি তার হুকুমে চলি।

কাজের কথাবার্তা এগিয়ে চলল। নানাবিষয়ে খুঁটিনাটি কথা, পরনের পোশাক থেকে শুরু করে কেমিক্যালস এবং গাড়ি, রাইফেল ইত্যাদি ইত্যাদি। বন্দুকের লাইসেন্স এগিয়ে দিলেন কর্নেল। তারপর জিজ্ঞেস করলেন আপনার রিভলবার আছে?

— আছে।

-- লাইসেন্স নাম্বারটা দিন।

এবার সামনে একটা ম্যাপ রেখে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন কর্নেল।

— এ হল ১৭ নম্বর রাস্তা। এই রাস্তা ধরে মনট্রিল যান। তারপর ৩৭ নম্বর রুট, সেন্ট অ্যানি ব্রিজ পেরিয়ে ৭ নম্বর রাস্তা ধরুন। এইবার 'প্রাইক' নদী। তারপর ধরবেন ৫২ নম্বর রুট। এইবারে ফ্রেলিগস্‌বর্গ, এখানে গ্যারেজে গাড়ি রাখুন।... ঠিক আছে?

তারপর আবার বললেন— বিপদে পড়লে এই ম্যাপটা পুড়িয়ে ফেলবেন।

'একো-লেক' সেখানে লেখা আছে ম্যাপের উপর, সেটার পাশে একটা ক্রস চিহ্ন।

এবার একটা ফটোগ্রাফ এগিয়ে দিল কর্নেল। একো-লেক।

নকল হুদ। সাঁতারের জন্য ডাইভিং বোর্ড আছে। লেকের পাশেই জঙ্গল। কোথাও একটা টেনিস কোর্ট হয়তো আছে। বোঝা যায় অ্যাটম বোমের অঞ্চল থেকে অনেক দূরে শান্তিতে বিশ্রামের জন্য এটা হল কোনো এক কোটিপতির রেস্ট হাউস।

বন্ড জিঙ্কস করল, স্যাভেজ রাইফেলে 'হেয়ার ট্রিগার' টানার কোনো বিশেষ কায়দা আছে কিনা।

কর্নেল টেকনিকটা বুঝিয়ে দেন।

সেই রাতটা এবং পরের দিনটাও মনট্রিলের বাইরে কাটাল 'বন্ড'। জায়গাটার নাম কো-জী-মোটর কোর্ট। পাহাড়ি বৃট পরে কিছুটা পথ হাঁটল বন্ড। তারপর সঙ্গে হতেই ডিনার সারল। যেমন নির্দেশ দেওয়া ছিল, সেইভাবেই রঙিন জলে স্নান করল। গায়ের রঙ পালটে গেল বন্ডের। এবার তাকে মনে হবে 'রেড-ইন্ডিয়ান'। শুধু চোখ দুটো নীলচে-ধূসর।

সদব রাস্তা ধরে একশো গজ হাঁটার পরেই কালো পথটা চোখে পড়ল। এই রাস্তাটাই সোজা চলে গেছে জঙ্গলের ভিতর। এবার একটা ভাঙা অঙ্ককার খামার বাড়ি, আরও অনেকটা যেতে হবে। কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিল। এখন চারপাশ নীরব। এরপর ১০৮ এবং ১২০ নম্বর রাস্তা। উপরে উঠতে হবে। এইখানে সেই বাড়ি। জানালায় পর্দা ঝুলছে। এই ঘরে রয়েছে চারটি ভয়ঙ্কর মানুষ। পশুর সমতুল্য।

শীঘ্রই নাটক শুরু হবে। মঞ্চ এখন ফাঁকা।

এইবার বোঝা যাচ্ছে একো-লেকের নামের মানে কী? প্রতিধ্বনি হুদ। অতি অল্প শব্দ হলেও 'একো' হয়।

ভোর হয়ে আসছে। একটু কফি খেলে হয়। তারপর তো হামলা চালাতে হবে। ফায়ারিং পয়েন্টে গিয়ে গুলি চালাতে হবে।

ফ্লাস্কে চুমুক দিয়ে তৃপ্ত হল বন্ড। হুইস্কি আর কফি মেশানো রয়েছে। শরীর উত্তপ্ত হল এবার।

বেলা আটটা। সামনে একটা 'ম্যেপল' গাছ। ঘাসের উপর দিয়ে এবার হামাণ্ডি দিতে হবে।

কেমন একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। এ নিস্তব্ধতা মধ্য সামান্যতম শব্দ বেশ জোরে শোনা যায়। হ্যামারস্টাইন কি অরণ্যেও পাহারাদার রেখেছে? কাঁধ থেকে রাইফেল নামায় বন্ড। বুকে হেঁটে পাঁচশো গজ যাওয়া খুব সহজ নয়। দূরে দুটো উদ্‌বিড়াল, ওরাও বন্ডের মতোই বুকে হেঁটে এগোচ্ছে।

হঠাৎ মেয়েলি গলায় গর্জন। - নড়বে না, লাশ ফেলে দেব।

বন্ড দেখতে পেল, একটা তির্যক ফলা। ইম্পাতের নীলচে তির্যক

কোমরের রিভলবারের দিকে ডান হাতটা এগিয়ে গেল বন্ডের।

আবার মেয়েলি গলা।

— ডান হাত নাড়বেন না। কে আপনি? রক্ষী?

— না আপনি কে?

— আমি যেই হই, আপনি কী করছেন এখানে?

গলায় স্কটল্যান্ডের সুর। বন্দ বলে— তিরটা সরান।

— আপনি রিভলবার ধরবেন না।

— ঠিক আছে।

বন্দ এবার উঠে দাঁড়াল একটু সাবধানে। ঘাসের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল তীরন্দাজ মেয়েটি। দেখতে মঙ্গ নয়, পরনে শার্ট-প্যান্ট জলপাই রংয়ের সোনালি চুল আঁট করে বাঁধা। কোমরের বেস্টে একটা ছুরি। কাঁধে তির ভরতি তুণ।

বন্দ হেসে বলল— তোমার নাম দিলাম ‘রবিনা হুড’, মানে মেয়ে রবিন হুড। আমার নাম ‘জেমস বন্দ’। কফি খাবে, কিন্তু এর সঙ্গে কড়া জল মেশানো আছে।

মেয়েটি একটু দূরে বসল। ভঙ্গি রেড ইন্ডিয়ানদের মতো। মুখে ফ্লাস্ক উপুড় করে কিছুটা পানীয় গলায় ঢেলে বলল,— তুমি কি চুপিচুপি হবিগ শিকারে এসেছ? এখন এখানে হরিণ পাবে না। যদি চাও আমি পথ বলে দেব।

বন্দ বলে— তুমি কি শিকারের ধান্দায় এসেছ?

— হ্যাঁ।

— লাইসেন্স আছে?

— অবশ্যই।

— দেখি।

লাইসেন্স-এ নামটা দেখে একটু চমকে ওঠে বন্দ— জুডি হ্যাভলক। লাইসেন্স ইস্যু করেছে ভারমেটের বেনিংটন অফিস। জুডির বয়স লেখা রয়েছে— পঁচিশ। জন্মস্থান জ্যামাইকা।

বন্দ বলে— তুমি জুডি হ্যাভলক। তুমি কি তির ধনুক নিয়ে পিতা-মাতার খুনের প্রতিশোধ নিতে এসেছ এখানে। তবে, তোমার যা পদ্ধতি, তাতে নিজের জন্য কবরটা খুঁড়ে রাখা ভালো।

জুডি বলে— আপনি কে? এখানে কেন? এত ইতিহাস কে জানাল আপনাকে?

বন্দ স্থির করল— জুডির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করাই সম্ভব।

— শোনো, আমার নাম তো আগেই বলেছি। আমি এসেছি লন্ডনের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে। তোমার জীবনের ট্র্যাজেডি আমি জানি। আমি সঙ্গে এনেছি মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা। মানে, তোমার পিতৃহস্তাদের কাজের প্রতিশোধ আমিও নিতে চাই। ওই বাড়ির লোকজন-গুলোই সকল পাপের মূলে।

এবার সোজা মনে নিজের ইতিহাস জানায় জুডি।

—ওরা তিন সপ্তাহ আগে আমার প্রিয় টাট্টু ঘোড়াটাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। আমার অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে গুলি করে হত্যা করেছে। চিঠিতে হুমকি দিয়েছে— তোমার মাথার উপর খাঁড়া বুলছে। আমিও ঠিক করেছি একটা নোটিশ ছাপাব। তাতে লেখা থাকবে— ‘যো হুকুম’— জুডি! অর্থাৎ, আমি মরতে বাজি আছি।

বন্দ একমনে শুনতে থাকে।

জুডি বলে— এরপর কিউবা গেলাম। শুনেছিলাম, খুনির দল কিউবার অধিবাসী। দামি পোশাক গয়নায় সেজে হোটেলের জুয়ার আড্ডায় যোগ দিলাম। উদ্দেশ্য, ওই অপরাধীদের খুঁজে বের করা। সবার সঙ্গে মিশতাম, নানা প্রশ্ন করতাম।

জুডি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

বন্ড বলে— তারপর?

-- তারপর, শুনলাম ওরা কিউবা ছেড়ে পালিয়েছে। বাটিসটা সরকার ওদের অপরাধের অনেক খবর পেয়েছে। পুলিশ খুঁজছে ওদের। এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আলাপ করলাম। তার থেকে আরও কিছু তথ্য পেলাম। কিউবা থেকে এলাম আমেরিকায়। শুনলাম, পিনকারটনরা বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা। ওদের কাছ থেকে ঠিকানা পেলাম। অবশ্য মোটা টাকা দিতে হয়েছিল।

— কিন্তু এই জায়গায় কীভাবে এলে?

— প্লেনে বেনিংটন পর্যন্ত এসেছি। তারপর হাঁটা পথ। হেঁটেই চলেছি কয়েকদিন। চারদিন ধরে পাহাড়ি পথ দিয়ে ওঠা নামা কবেছি। অবশ্য জ্যামাইকার পাহাড় অঞ্চলেই আমার বাড়ি। তাই এমন পথে হাঁটা আমার অভ্যাস ছিল। তবে এ পথটা বেশি দুর্গম।

বন্ড জিজ্ঞেস করে— এখন কী করবে?

— তিরের আঘাতে ভন হ্যামারস্টাইনকে হত্যা করব। তারপর আবার হাঁটাপথে বেনিংটন ফিরে যাব।

মেয়েটা এমনভাবে এ-কথা বলল যেন মনে হবে বলছে— চলো, ফুল তুলব! সহজ সুর, খুন করা যেন একটা অতি মামুলি ব্যাপার!

হঠাৎ জগদলে খসখস শব্দ। কারা যেন ডালপালা সরিয়ে এদিকে আসছে।

বাইনকুলার দিয়ে বন্ড দেখল— বেঁটে বেঁটে তিনজন পুরুষ, আর দুটি মেয়ে। মেয়ে দুটি কৃষ্ণবর্ণ, পরনে স্নানের পোশাক। মেয়েগুলো কথা বলছে খুব সম্ভব স্প্যানিশ ভাষায়, কারণ তাদের উচ্চকণ্ঠ টুকরো টুকরো ভাবে কানে পৌঁছচ্ছে বন্ডের।

পুরুষগুলোর মধ্যে একজন বেশ সপ্রতিভ। তাকেও চিনতে পারে বন্ড— এ নিশ্চয় সেই তথাকথিত মেজর গোনজালিস। বাকি দুটো বডিগার্ড।

জুডি জিজ্ঞেস করল— কী দেখলে?

— গোনজালিসকে চিনেছি। দুটো বডিগার্ড। মেয়ে দুটো অচেনা। কিন্তু হ্যামারস্টাইন তো এখনও আসেনি।

এবার এল ট্রেনার-জাতীয় একটা লোক। ওদের ব্যায়াম শিক্ষা শুরু হল। কদাকার চেহারা। খালি গা, ল্যাণ্ডট পরা। সারা গা ভর্তি কালো লোমে। চারকোনা মুখ, জার্মানদের মতোই, কদাকার চেহারা।

ফটোতে দেখে এবং চেহারার বর্ণনা শুনে যা ধারণা হয়েছিল বন্ডের, মিলে গেল।

হ্যাঁ, এই হচ্ছে ভন হ্যামারস্টাইন।

জুডিও দূরবিনে তাকে দেখতে পেল। বর্ণনা অনুযায়ী সেও কুখ্যাত অপরাধীকে চিনতে পারল।

জুডি কি এবার তির ধনুক নিয়ে তৈরি হবে?

বন্ড একমুহূত চিন্তা করল।

না, এখন তির ছোঁড়া উচিত হবে না। তাহলে বিস্তর গণ্ডগোল বাধবে। নিজেদেরই বিপদ ঘনিয়ে আসবে।

তবে?

এখন যে করেই হোক জুডির হঠকারিতা থামাতে হবে। কী করা যায়? রিভলবারের বাট দিয়ে মেয়েটাকে একটা ঘা মারলেই অজ্ঞান হয়ে যাবে। তারপর হাত-পা বেঁধে শুইয়ে রাখলেই হবে।

রিভলভারে হাত দেয় বন্দ।

জুডির কি মাথার পিছনে চোখ আছে। বলল— ওসব মতলব ছাড়ুন। রিভলভার দিয়ে মাথায় মারবেন না। আমি তো মোমের পুতুল নই। দূরে থাকুন। আমি একশো গজ দূরে থেকে পাখি মারি। নিজের মৃত্যু ডেকে আনবেন না।

বন্দও ধমক দিল— তুমি তো আচ্ছা মেয়ে! খেলনা অস্ত্র নিয়ে কাজ সারতে চাইছ। চার চারটে বদমাস, তাদের তির-ধনুক দিয়ে কী করবে তুমি?

জুডির দুচোখে আশুন।

— খুন হয়েছে আমার বাবা-মা, আপনার তো নয়। আমি এখানে আগেও এক রাত কাটিয়েছি। ওদের কাজকর্ম আমার জানা আছে। আমার টার্গেট হ্যামারস্টাইন, অন্যদের নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আমার শত্রুকে কীভাবে মাটিতে শুইয়ে দিতে হয়, আমি জানি। আপনি সরে যান।

বন্দ তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এবার বন্ডের পায়ের দিকে তিরের ফলা! জুডি বলে যান, যা বলছি করুন। সরে যান। আমাকে বাধা দেবেন না। আমি হ্যামারস্টাইনকে মারবই। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সাপের মতো ফুঁসছে মেয়েটা। প্রতিশোধ-স্পৃহায় পাগল হয়ে গেছে।

বন্দ শান্ত সুরে বলে— জুডি, প্রতিশোধটা আমরা দু'জনে মিলে নিতে চাই। ওরা আমারও শত্রু। দেশে তোমার বাবা-মাকে খুন করেছে, আমার দেশের সর্বনাশ করেছে। আমি ওদের খতম করতে এসেছি। আমার কাছে যে আধুনিক অস্ত্র আছে, তা দিয়ে আমি ওদের চারটেকে একসঙ্গে শেষ করে দিতে পারি। আমি আগে গুলি চালাই তুমি পরে তির ছুঁড়ে আমাকে সাহায্য করো।

— না। বরং পরে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন। যদি প্রয়োজন হয়।

— তোমার প্ল্যানটা আমায় বলো।

— প্ল্যান ঠিক আছে। ওই কুকুরগুলো এখন স্নানের জন্য জলে নামবে। বেঁটে গার্ড দুটো পাহারা দেবে। আমি একটা বিশেষ জায়গা ঠিক করেছি, যেখান থেকে তির ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ সম্ভব হবে। এখনও বলছি, আমার কথা শুনুন। আমার কাজ আমায় করতে দিন।

রাগ চেপে বন্দ বলে— বেশ। যাও, তুমি তির চালিয়ে চেষ্টা করো। না পারলে তখন আমি—

ভালো কথা।

তির-ধনুক হাতে গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেল জুডি।

মরুক গে! তবে এখন গুলি চালানো যাবে না। বন্দ ভাবে— তাহলে জুডির জীবনও বিপন্ন হবে।

টেলিস্কোপে দেখল বন্দ— মেয়ে দুটো ব্রেকফাস্টের কাপ-প্লেট সরাচ্ছে টেবিল থেকে। কোচের উপর বসে খবরের কাগজ পড়ছে হ্যামারস্টাইন। গোনজালিস চুকট টানছে। এবার ওরা কথা বলছে ইংরেজিতে।

গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে স্যাভেজ রাইফেলটা ভালো করে পরীক্ষা করল বন্দ।

হঠাৎ গুলির শব্দ। চমকে উঠল বন্দ। উপত্যকায় একটা ছোটো আশুনের বিলিক!

না, তেমন কিছু নয়। একটা মাছরাঙা পাখি গুলিবিদ্ধ হয়ে আছড়ে পড়ল ভন হ্যামারস্টাইনের পায়ের কাছে। টমিগানের গুলি। সবাই হাততালি দিচ্ছে।

আবেকবাব ফায়ারিং। এবার একটা বোতল। গাছের ডালে বসানো ছিল। লক্ষ্যভেদ নিখুঁত। টার্গেট প্র্যাকটিস।

এবাব স্নান শুরু। কালো মেয়ে দুটো আগেই জলে নেমেছে। হ্যামারস্টাইন ডাইভিং বোর্ডে উঠেছে। ঝাঁপ দেবে। গোনজালিস ঘাসেব উপর বসে আছে।

জুডি কোথায় গেল?

এইবার শূন্যে লাফ দিল হ্যামারস্টাইন।

সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা রূপালি ঝিলিক আকাশের গায়ে দিনের বেলাতেও দেখা দিল। কিছু একটা যেন আঘাত করল হ্যামারস্টাইনের পিঠে। সোঁ সোঁ করে জলের দিকে নামতে থাকল ওর শরীরটা!

আঃ, অপূর্ব ডাইভ! সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখল গোনজালিস।

কিস্ত একী! কোথায় গেল হ্যামারস্টাইন?

জলেব ভিতব থেকে তো কেউ উঠে আসছে না। ছোটো ছোটো ঢেউ তুলে স্থির হয়ে গেল জল। কই, সাঁতারুর মাথা তো ভেসে উঠছে না।

একটা দমবন্ধ স্তব্ধতা।

তাব তিবিশ সেকেন্ড পবেই ভেসে উঠল গোনজালিসের জার্মানগুরুর দেহটা। উপুড় হয়ে ভাসমান একটা মৃতদেহ।

একটু ভালো করে লক্ষ করা মাত্রা দেখা গেল — গুরুর পিঠে একটা ইম্পাতের শিক গিঁথে গেছে মেরুদণ্ডের পাশে। এটা ইম্পাত ফলাই কি এক সেকেন্ডের জন্য সূর্যের রোদে ঝিলিক দিয়েছিল? এখন শুধু অ্যালুমিনিয়াম পালকটা ঝিকঝিক কবছে দিনের আলোয়।

হ্যামারস্টাইনের মৃতদেহটা ঘিরে জলটা ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল গোনজালিস। গার্ডদের অর্ডার দিল— ফায়ার!

জঙ্গলেব দিকে লক্ষ করে গলে উঠল রক্ষীদের টমিগান। গুলির পর গুলি। বৃষ্টির মতো ঝরতে থাকল বুলেট।

এবার ওদিকে জবাব দিল বন্ডের স্যাভেজ রাইফেল।

একজন রক্ষী লুটিয়ে পড়ল। আরেকজন দৌড় দিল।

বন্ড আবার ফায়ার করল। না, লক্ষ্যভ্রষ্ট। আবাব।

হ্যাঁ, এইবাব লেগেছে, পলায়মান রক্ষী ছিটকে পড়ল লেকের জলে। মরতে মরতেও লোকটা টমিগান দিয়ে আকাশে গুলি চালাল। পরপর। কী ব্যাপার, আসলে ট্রিগারে আটকে গেছে আঙুল। তাই মরার পরেও গুলি চলছে!

গোনজালিস লুকিয়েছে প্রথম গার্ডের বডি আড়ালে। এবার সে গুলি চালাল মেপলগাছ লক্ষ করে। গোনজালিস দেখে ছিল— ওখান থেকে 'স্যাভেজ' রাইফেলের গুলি আসছে। একটা বুলেট এসে বিধল গাছের ডালে, আবেকটা গুঁড়িতে। ঝুরঝুর করে একরাশ পাতা ঝরল বন্ডের মাথায়।

এবার বন্ডের দুটি গুলি বিধল গার্ডের মৃতদেহে। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বাগানে পাতা চেয়ারেব দিকে ছুটছে গোনজালিস।

আর গুলি খরচ করতে চাইল না বন্দ। সে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। গোনজালিস এবার স্পষ্ট দেখতে পেল বন্দকে। ঘাসের উপর হাঁটু মুড়ে বসে গুলি চালাতে উদ্যত হল গোনজালিস।

টেলিফোন সাইট দিয়ে তাগ করল বন্দ। রাইফেলের মুখ ঘুরলো যখন ক্রস চিহ্নটা এসে পড়ল গোনজালিসের বুকে।

ফায়ার!

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পারল না মেজর। টমিগান হাতে এলোমেলো গুলিবর্ষণ করতে করতে সে ঘুরে পড়ল লেকের জলে। আর উঠল না।

এক মিনিট অপেক্ষা করে আবার মেপল গাছের দিকে এগোল বন্দ।

জুড়ির গায়ে এলিয়ে বসে আছে জুডি। তিরধনুক মাটিতে গড়াচ্ছে। জুড়ির দু-কাঁধ রক্তাক্ত! ওর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল বন্দ।

— জুডি, খেলা শেষ। কোথায় লেগেছে তোমার?

— ও কিছু না।

— বলছিলাম—ওরা পেশাদার খুনি। এবার আমাদের পালাতে হবে। মেয়ে দুটো গেছে সীমান্ত রক্ষীদের খবর দিতে।

জুড়ির কোমরের খাপ থেকে ছুরিটা নিল বন্দ। ওর শার্টের কাঁধের কাছটা কেটে ফেলল। না, বুলেট বেঁধে নি, কিন্তু ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি করেছে।

কোনোমতে নিজের রুমাল দিয়ে ক্ষতস্থানটা ব্যান্ডেজ করলো বন্দ।

— চলো।

— কোথায়?

— যাত্রা শেষ পর্যন্ত অনেক দূর। লন্ডন।

— লন্ডন?

— হ্যাঁ, তার আগে এখানে প্রস্তুতিপর্ব সারতে হবে।

— এখন কোথায় যাব আমরা?

— কো-জী মোটেল। ভালো জায়গা, তুমি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠবে। তারপর—

জুড়ির মুখে ম্লান হাসি।

বন্দ বলে— হাঁটতে পারবে।

— পারব।

এক কাঁধে রাইফেল, আরেক কাঁধে জুড়ির তির ধনুক নিয়ে এগিয়ে গেল বন্দ।

পিছু পিছু জুডি হ্যাভলক। মাথার ব্যান্ড খুলতেই একগুচ্ছ সোনালি চুল ছড়িয়ে পড়ল কাঁধে।

ইউ ওনলি লিভ টোয়াইস

॥ এক ॥

বন্ডের গা ঘেঁষে বসে আছে 'গেইশা'। হাসি-ঠাট্টায় মজে আছে জেমস বন্ড।

মাদাসকে দেখে মনে হবে যেন 'নো' নাটকের কোনো চরিত্র। বন্ডের তামাসা উপভোগ করে যেন লজ্জায় মুখ ঢাকছে। তারপরে আরও ধনিষ্ঠতা। এরা আনন্দ দেওয়ার নানারকম কাজ জানে।

এখানে কামনা ও লালসার প্রকাশ্য বাধাহীন প্রদর্শনী। বন্ডের সামনে লাল ল্যাকারের টেবিল। ওপাশে কালো 'যুকাতা' পরে বসেছিল একজন। ইনিই জাপানি সিক্রেট সার্ভিসের চিফ, নাম টাইগার টনাকা।

বন্ডের সামনে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে টনাকা।

— যদিও ছেলেখেলা চলছে। তবু তুমি জিততে পারবে না বন্ড!

কথা হচ্ছে চিনামাটির বাসনপত্র নিয়ে। 'সাকে' খাওয়ার পদ্ধতি নিয়ে।

টনাকা বলে — প্রথমে পয়লা পাত্রে 'সাকে' মানুষ খায়। তারপর দ্বিতীয় পাত্রের 'সাকে' খায় প্রথমকে; তারপরে 'সাকে' খায় মানুষকে!

হাসির রোল। বন্ড বোঝে, তাকেই ঠাট্টার বিষয় করা হয়েছে।

একেই বলে 'গেইশা পার্টি'! হাসাহাসি, মজার গল্প।

অবশ্য বন্ড একটা বিশেষ কাজে এসেছে। এই পার্টি হচ্ছে তারই সুবিধার জন্য, খরচ হচ্ছে প্রচুর।

গরম 'সাকে'র পাত্রে চুমুক দেয় বন্ড। বড়ো বড়ো চুমুকে খালি হয়ে যায় পাত্র। আবার আসে 'সাকে'।

বন্ড বলে — টাইগার, এবার তোমার পালা। শুরু করো।

এরপর কাগজ-কাঁচির খেলা।

খেলাটা পুরোনো। কাঁচি কাটবে কাগজ, কাগজ মুড়বে পাথর, কাঁচি এবার পাথরকে ভেঁতা করবে। অর্থাৎ হাতের মুষ্টি হবে পাথর। দুই আঙুল কাঁচি, আর হাতের তালু হবে কাগজ। হাতের মুঠোয় কি আছে বলতে হবে।

টনাকা চিৎকার করে বলল -- বন্ডো-সান, তুমি আমাদের অতিথি। আমাদের উচিত এই খেলায় তোমাকে জিতিয়ে দেওয়া। তবে আমি গেমায় এই খেলায় হারিয়ে দেব। তাই আগাম ক্ষমা চেয়ে রাখছি।

— নো টাইগার। তা হবে না। তোমায় নিজে জেতার জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা করতে হবে। কারণ, এখানে আমি তোমার নাকটা নোংরায় ঘষে দেব। সেটাই প্রমাণ করবে, জাপানের চেয়ে ব্রিটেনের, বিশেষ করে স্কটল্যান্ডের শ্রেষ্ঠত্ব।

টাইগারের কালো চোখ জ্বলে উঠল।

বন্ডের মনে পড়ে গেল ডিকো হেন্ডারসনের স্তূর্ক বাণী — শোনো, বোকা ইংরেজ! জাপানিদের

শরীরে মাধু আর তাতারের রক্ত বইছে। ওরা জুডো জানে। ওই লোকটি যুদ্ধের আগে জাপানের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করত। ন'কোটি জাপানির মধ্যে সিক্রেট সার্ভিসের শীর্ষস্থানটা কে নিয়েছে?’

জাপানে থাকার সময় বন্দ 'পদ্মাসন' অভ্যাস করত। ডিকো বলেছিল --- ওদের সঙ্গে মিশতে হলে মাটিতে বসা শিখতে হবে। বন্দ বুঝেছিল টাইগারকে চটানো ঠিক হয় নি।

একটি মেয়ে এবার বড়ো পাত্রে 'সাকে' নিয়ে আসে। এক চুমুকে সেটা শেষ করে বন্দ। টনাকার দিকে তাকিয়ে বলে -- 'অলরাইট'?

খেলা চলতে থাকে। টাইগারের মুষ্টিবদ্ধ হাত। পাথর হাতের মুঠোয়? বন্দ হাতের তালু প্রসারিত করে। টাইগার বলল --- বন্ডো-সাব, এবার তোমার শেষ!

কিন্তু অনেক কসরৎ করে প্রথম দানটা জিতল বন্দ। দ্বিতীয়টা টাইগার। তৃতীয় দানটাই শেষ খেলা। বন্দ ভাবল এবার কি হেরে যাওয়াই ভালো!

কিন্তু শেষপর্যন্ত জিতে গেল বন্দ। ২-১।

টাইগার লজ্জিতভাবে জিজ্ঞেস করে --- খুব ঠান্ডা মাথায় খেলতে পারো তুমি। রহস্যটা বলবে?

বন্দ বলল --- তুমি ইম্পাতের মতো কঠিন। তোমাকে বুঝেই কায়দা প্রয়োগ কবেছি। কাগজেব সংকেত বুঝেছি।

হঠাৎ টাইগার বলে --- বন্ডো-সাব, তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। আজ রাতে আমার বাড়ি থাকবে?

--- সানন্দে।

পানীয়ের গেলাস এল। দিগন্তে ইয়োকোহোমার আলো।

সুন্দর নকশার এই বাড়ি! চৌকো ঘরের ঐতন দিকে কাঠের পাটিশন। বেডরুম, রিডিং রুম, বারান্দা --- সবই আছে।

টাইগার বলল --- তুমি তো সিগরেট খাও। আছে, খেতে পার। কিন্তু যে কথা আমি বলব, শপথ করো, কেউ তা জানবে না।

॥ দুই ॥

এর আগের পটভূমিকা। লন্ডন।

এম. বসে আছেন জানালার কাছে।

বৎসর-পূর্তির ছুটি। দুটি হপ্তা মাছ ধরে কাটাবেন, আর দু-হপ্তা কফি-স্যান্ডইউচ! এম. ক্লাব-ট্রাব খুব একটা ভালোবাসেন না।

কিছু অতিথি এখানে উপস্থিত।

পোর্টার কিন্ত জিজ্ঞেস করলেন --- হাভানা সিগার? বাঃ, কান্স্রোকে এর বদলে কী পাঠাবে? এম. উত্তর দিলেন না।

স্যার জেমস জিজ্ঞেস করলে --- বন্ধু, তোমার সমস্যাটা কী?

--- কোন্ সমস্যা?

স্যার জেমস এখন ইংল্যান্ডের শীর্ষস্থানীয় নিউরোলজিস্ট। মায়ু-বিশেষজ্ঞ। এম.-কে নীরব দেখে আবার বললেন

— আরে একটু কথা বলো মুখ ফুটে। কী এত তোমার চিন্তা।

— আমি 007 সম্পর্কে বিশেষ চিন্তিত।

— নতুন কী ঘটেছে?

— অফিসে দেরিতে আসছে। ফাঁকি দিচ্ছে। নানারকম ভুল করছে। জুয়া খেলে টাকা ওড়াচ্ছে।

এ ছাড়া মদের নেশা বেড়ে চলেছে। এমন লোকের এত অধঃপতন!

— আমার মনে হয় 007 একটা বড়োরকম চোট পেয়েছে।

এম. চুপ করে রইলেন।

স্যার জেমস বললেন — ও বিয়ে করেনি বহু দিন। হঠাৎ যে মেয়েটাকে ও বিয়ে করবে বলে ঠিক করল, তাকে কয়েক ঘণ্টা পরেই এক বদমাস গুলি করে মারে! অবশ্য বন্দু নিজেও গুলিতে আহত হয়। কিন্তু বেঁচে যায়। সেই থেকে — তা মেয়েটির যেন কী নাম?

— অর্নেস্ট। অর্নেস্ট স্ট্যাভরো ব্লোফেন্ড!

— হুঁ! এ-এক প্রচণ্ড শক। জীবনের প্রতি বন্ডের আগ্রহ কমে যায়। এটা সাইকো-নিউরোসিস। ভালোবাসার পাত্রীর মৃত্যুর জন্য ও নিজেকে দায়ী ভাবছে। আচ্ছা, ওকে কি সম্প্রতি কোনো কাজ দিয়েছ?

— দিয়েছি। পাবেনি।

— হুঁ, নিউরোসিসের লক্ষণ।

দুম করে এম. বলে বসেন -- ওকে ছাড়িয়ে দেব ভাবছি। পেনশন দিয়ে বসিয়ে দেব।

— একজন সেরা লোক হারাতে তুমি।

— সেরা লোক? ছিল এক সময়ে। এখন নয়।

একটু চুপ করে থেকে স্যার জেমস বললেন — ওকে আরেকটা চান্স দাও। প্রয়োজনে আমি দায়িত্ব নিতে পারি।

এম বলেন -- কেমন সুযোগ দিলে ভালো হবে?

— এমন কাজ দাও যেটা ভীষণ জরুরী, কিন্তু সফল হওয়া প্রায় অসম্ভব। দেখবে, ও আবার —

II তিন ।

লাল টেলিফোনে শব্দ। বহুদিন বাদে।

তার মানে জরুরি বার্তা।

বন্ডের সেক্রেটারি মেরি গুডনাইট রিসিভারে সাড়া দিয়ে চমকে ওঠে; পরমুহূর্তে — 'ইয়েস স্যার' — বলে পাশের ঘরে ছুটে যায়। চিৎকার করে বলে — ও জেমস, এম. তোমাকে চাইছেন।

বন্ড ঘরে নেই। ওঃ, কোথায় গেল লোকটা। ড্রয়িং রিভলভারটা ঠিক আছে। এটা সঙ্গে না নিয়ে বন্ড তো কোথাও যায় না। তাহলে —

কোথায় বন্ড?

মেরি হয়তো জানে না প্রকৃতির নিয়ম। তিরিশ বছর বয়সে না পৌঁছনো পর্যন্ত মানুষ বোঝে না শরীর-স্বাস্থ্য রাখার সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন ঋতু ও প্রকৃতির বিধান মেনে চলা।

বন্ডও এতদিন সেকথা ভাবেনি।

আজ বুঝেছে বন্ড - এটা কত নির্মম সত্য। শরীরটা যেন ধসে পড়ছে। মনটাও।

আজ আটমাস হল ট্রেসি তাকে ছেড়ে গেছে। বন্ড অস্থির। শুধু চিকিৎসক নয়, মনোবিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হয়েছে তাকে। তাদের বলেছে — দেখুন, কেমন হয়ে যাচ্ছি আমি, শরীর খারাপ, ঘুম নেই, অরুচি, ড্রিংক বেড়েছে, কোনো কাজকর্ম করতে পারছি না। আমায় সুস্থ করে তুলুন। অনেক চিকিৎসা হয়েছে। হার্ট, ব্লাডপ্রেশার ইত্যাদি। ঘুমের ওষুধ, ট্র্যাংকুলাইজার, টনিক — সবই দেওয়া হয়েছে। শেষ মেস — হিপনোটিস্ট। কিছুতেই কিছু হয়নি।

একটা নির্জন বাগান। বন্ড চুপচাপ বসে আছে অনেকক্ষণ। এই পার্ক থেকে অফিস তো দশ মিনিটের পথ।

এখন বেলা তিনটে। অফিসে পৌঁছনোর কথা আড়াইটা। উঃ, কী গরম। কপালে ঘাম মুছে বসেই রইল বন্ড। আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে — পরমাণু বোমার জন্য?

ছুটি শেষ! কোথায় আর যাবে সে। এই বাগানটাই তো ভালো। সুন্দর গোলাপ, মিষ্টি গন্ধ! নাঃ, অফিসে যাওয়াই ভালো। ইস্, কী কষ্ট! কিন্তু কিসের কষ্ট বোঝা যায় না।

বাড়ি এল বন্ড। লিফটম্যান বলল — স্যার, আপনাকে সেক্রেটারি খুব খুঁজছেন।

ঘরে ঢুকতেই মেরি বলল — এম. তোমাকে খুঁজছেন।

— কে এম.?

তারপর লাল টেলিফোনটা তুলে বন্ড বলে --- 007 বলছি স্যার। ভেরি সরি স্যার! দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছিল স্যার। দুঃখিত। এখনি আসছি স্যার।

॥ চার ॥

জানালা ধারে দাঁড়িয়েছিলেন এম। পরনে নীল রঙের স্যুট। বন্ডের দিকে না ঘুরেই বললেন — সিট ডাউন। একটু পরেই নিজের চেয়ারে এসে বসলেন।

— তোমায় কেন ডেকেছি জানো?

— আন্দাজ করতে পারি। আমি কি পদত্যাগ করব?

— কী বাজে কথা বলছ..... যাকগে, শোনো। এতদিন যে অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছিলে, সেটা অনেকেরই মাঝে-মধ্যে হয়।

— আমি ব্যর্থ হয়েছি। শরীরও খুব খারাপ।

— দূর, কিস্যু হয়নি তোমার।

— অফিসের কাজ আর আমার দ্বারা হবে না স্যার!

দুম করে টেবিলের উপর ঘুমি মারলেন এম। চিৎকার করে বললেন — কী পেয়েছ তুমি! আমি তোমায় ডেকেছি প্রমোশন দেব বলে। আর তুমি ইস্তফার কথা বলছ! শোনো, তুমি আপাতত প্রমোশন নিয়ে কুটনৈতিক শাখায় যাও। মাইনে ভালো বাড়বে। ইচ্ছে করলে তুমি নতুন সেক্রেটারি নিতে পারো। আর এক সপ্তাহের মধ্যে তোমায় জাপান যেতে হবে। কাজটা বেশ কঠিন। তাছাড়া এই কেস সম্বন্ধে কোনো ফাইল নেই।

বন্ড আবার দ্বিধাগ্রস্ত।

— স্যার, আমায় টানছেন কেন?

— কারণ, তুমি পারবে। মারপিটের কোনো ব্যাপার নেই। শুধু মাথা ঠান্ডা করে এগোতে হবে। মস্তিষ্কের কাজ। আচ্ছা, তুমি সাংকেতিক অক্ষর বা বার্তা বুঝতে পারো?

— অতি সামান্য।

— জাপানিরা এ ব্যাপারে খুব কুশলী। ওরা রাশিয়া সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জেনে গেছে।

— সি. আই. এ. আপনাকে সাহায্য করবে তো?

— খুব একটা কিছু কববে বলে মনে হয় না। শোনো, টাইগার টনাকা নামে একটা লোক আছে। টোকিওতে। জাপানি সিক্রেট সার্ভিসের চিফ। ওর কাছে যাবতীয় তথ্য আছে। সেগুলো জানতে হবে। তবে লোকটা কিন্তু সি. আই.-এর কেনা গোলাম।

‘এম’-এর কথা শুনে বন্ড কৌতূহলী।

‘এম’ বলতে থাকেন — লোকটা আমাদের খুব একটা পাত্রা দেয় না। তাছাড়া আমাদের সার্ভিস সম্পর্কে ওরা বিশেষ কিছু জানে না। ১৯৫০ সাল থেকে জাপানে আমাদের কোনো অফিস নেই। সবই এখন আমেরিকানদের হাতে। এ অবস্থায় তুমি চেষ্টা করো কী কী তথ্য পাওয়া যায়।

‘বন্ড’ চুপ করে থাকে। তারপরে বলে — আমি চেষ্টা করব স্যার।

‘এম’-এর নির্দেশ অনুযায়ী ‘বন্ড’ চিফ-অফ-স্টাফের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

চিফ-অফ-স্টাফ কর্নেল ‘ট্যানার’ বন্ডের প্রিয় বন্ধু। তিনি উৎসাহী হয়ে বললেন — কী মনে হয় ‘জেমস’, পারবে তো?

— যদিও অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, চেষ্টা করব। আচ্ছা এই ‘টাইগার’ লোকটা কেমন? আমি কি অস্ট্রেলিয়ানদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাব? ধরো যদি মূল্যবান তথ্য পাই, বা মূল্যবান কোনো জিনিস, সেগুলো কীভাবে পাঠাব।

‘ট্যানার’ বলেন — টোকিওতে তুমি যার সঙ্গে কাজ করবে সে অস্ট্রেলিয়ার লোক। নাম হেন্ডারসন। ভালো লোক। তাছাড়া ওখানে আমাদের ‘হ্যামিলটন’ আছে। মাল পাচার করার ব্যাপারে ‘হেন্ডারসন’ সাহায্য করবে। মেলবোর্নের ভেতব দিয়ে মাল আসতে পারে। যোগাযোগের লোক থাকবে। আর কী চাই?

— সি. আই. এ. চটে যাবে নাতো?

— জাপান কি ওদের কেনা নাকি? তবে সবই নির্ভর কবছে ‘টাইগার টনাকার’ ওপর। তুমি সাবধানে কাজ করবে।

॥ পাঁচ ॥

এরপর একসপ্তাহ কেটে যায়। জাপানগামী প্লেন ধরে ‘বন্ড’। জাপান এয়াবলাইন্সের হোস্টেসের পরনে কিমোনো ও ওবি। মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলে — ওয়েলকাম, শুভ যাত্রা।

একটি বেতের ঝুড়িতে গরম তোয়ালে আর নানাধরনের খাবারের তালিকা বন্ডের হাতে দেয় মেয়েটি। উত্তর মেরুর ওপর দিয়ে উড়োজাহাজ যাবে। টোকিওতে।

প্লেন এখন তিরিশ হাজার ফুট উঁচুতে। ‘বন্ড’ ব্র্যান্ডির আর্ডার দিল। এইটুকু পান করতে করতে, সে উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত চলে যাবে। অসম্ভবকে সম্ভব করতে দরকার হলে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে হবে তাকে।

এখন ডিকো হেন্ডারসন আর বন্ড মুখোমুখি বসে আছে। টেবিলের ওপরে ‘সাকে’র গেলাস। এ ছোট্ট পানশালাটায় বেজায় ভিড়। এইমাত্র ডিকো ঠাট্টা করে একটা ছড়া শোনাল। বন্ডের ভালো লাগে নি। সে বলল,

— একদম গাঁইয়া ছড়া। আসল কথা বলো।

ডিকো আঙুল তুলে দেখায়, — ঐ যে নীল স্যুট পরা লোকটা, ও 'টাইগারের' লোক।

চাপা স্বরে একটা খারাপ গালাগাল দেয় ডিকো।

বন্দ হাসে।

ওদের প্রথম আলাপে তার কথা মনে পড়ে। টোকিওতে নামার পর ছোটো পানশালায় হঠাৎ তার সামনে ছাই রংয়ের স্যুট পরা একটা লোক এসে হাত এগিয়ে দেয়।

— আমি হেন্ডারসন, তুমি নিশ্চয় বন্দ? চিনতে পেরেছি এই জন্য যে প্লেনে আর কোনো ইংরেজ ছিল না। যাই হোক চল, বাইরে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে।

গাড়িতে যেতে যেতে হেন্ডারসন বলে — আগে আমার হোটেলে চল। 'ওকুরা' হোটেল। খুব আধুনিক। রয়্যাল ওরিয়েন্টালে এক আমেরিকান খুন হয়েছে। তোমাকে আমরা হারাতে চাই না। চল একটু পান করা যাক।

যেতে যেতে হেন্ডারসন বলতে থাকে, টোকিও কিন্তু বাজে জায়গা। খুব গরম, খুব ঠান্ডা, খুব বৃষ্টি, প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। তবে ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে।

ওকুরা হোটেলের পানশালা। বাঁশ দিয়ে ঘেরা। খানাপিনা শেষ করে নিজের ঘরে ঢুকে বন্দ দেখে টেবিলের ওপর একটা কার্ড রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান দূতাবাস থেকে এসেছে। মনে পড়ে যায়, হেন্ডারসন এ ব্যাপারে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

তাছাড়া আজকে ডিকোর সঙ্গে বসে পানের মাত্রা একটু বেড়ে গিয়েছিল। আট ফ্লাস্ক 'সাকে' শেষ হয়েছে। ডিকো বলেছিল।

— টাইগার এবং তার কর্তারা সবকিছু দুভাবে বিচার করে। আইনসভা আছে বটে, কিন্তু ওরাই সর্বসর্বা। তবে সব কিছুর শীর্ষে রয়েছেন, সম্রাট নিজে।

বন্দ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা এই টনাকা লোকটা তোমার বন্ধু না শত্রু।

— দুটোই বলতে পারো। একদিক থেকে আমরা দুজনে এক। আমাদের দু'জনের একই নেশা। তবে ওর একটা দুর্বলতা আছে। বারবার বিয়ে করতে চায়। তবে আমার ওপর ওর কিছুটা শ্রদ্ধা আছে।

'ডিকো' এবার নানাধরনের ব্যাখ্যা দেয়। কীভাবে জাপানিদের সঙ্গে চলতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাদের প্রতি জাপানীদের শ্রদ্ধা থাকে, তারা তাকে অন্তত নিজেদের সমকক্ষ করে তুলতে চায়।

ডিকো বলে — জাপানীরা ভিন্ন ধরনের জীব। যেমন, যতই সভ্য হোক, গায়ে সামান্য আঁচড় লাগলেই ওদের ভেতর থেকে 'সামুরাই' এর আত্মা বেরিয়ে আসে। তবে যাদের হাতে চোঙা, তাদের মেশিনগান দিয়ে কি হবে?

ডিকোর সাথে কথাবার্তায় এবার কিছুটা মাতলামি এসে যায়। দুজনেই দুজনকে কিছুটা সস্তার গালাগাল শোনায়। পরিস্থিতিটা সহজ করার জন্য ডিকো বলে — চল আমরা কোথাও গিয়ে আগে বাণ-মাছ খাই, তারপরে 'প্লাংক' পান করবো। তারপর যাবো, আনন্দ ফুঁর্তির আড্ডায়, এবং তারপরই তুমি জানতে পারবে আমার প্রকৃত মতামত।

'বন্দ' বলে ঠিক আছে, বাণ-মাছ আমার খুব প্রিয়। আমি দেব ফুঁর্তির খরচ, আর তুমি দেবে খানাপিনার দাম।

এখন সকাল দশটা। হেভারসন বন্ডের ঘরে এল। দুই চোখ রক্তাভ।

দুজনের মধ্যে আবার কিছুক্ষণ ধরে, হাসি-ঠাট্টা, হালকা কথাবার্তা চলতে থাকল।

এইবার ডিকো বলল, চলো, টাইগার অপেক্ষা করছে।

এখন গ্রীষ্মকাল। পথে বেজায় ধুলো। দারুণ গরম। প্রায় আধঘন্টা ধরে গাড়ি ছুটে চলল 'ইয়োকোহোমার' পথে। মেটে রং-এর একটা বাড়ির সামনে থামল গাড়ি। বোর্ডে লেখা আছে 'এশিয়ান লোক সংঘ' — ভিতরে ঢুকল ওরা। সামনে হলঘর।

যোগাযোগ বিভাগের অফিসের দিকে যেতে যেতে দেখা গেল, দুপাশে সারিবদ্ধ ঘরগুলোর দরজা খোলা। দেওয়ালে নানা মানচিত্র। এবার ডকুমেন্টস্ বিভাগ, এখানেই এক বিরাট লাইব্রেরি। একটা লোক উঠে দাঁড়িয়ে ওদের 'চেকিং' করল। ডিকো সামান্য বিরক্ত। বলল — এখানেই একটু বাড়াবাড়ি আছে। এটা মহাফেজখানা, সম্প্রসারণ চলছে।

একটা টেপেরেকর্ডার। একে জাপানিরা বলে 'পাপিয়ামেঝে' প্রাচীনকালের মডেল। এর ওপর দিয়ে হাঁটলে আওয়াজ হয়। অবাস্তিত লোক এলে গৃহস্থ টের পেয়ে যেত।

এইবার একটা ঘর। দরজায় স্পাইহোল। দেখা গেল প্রকাণ্ড এক চোখ তাদের দেখছে। তারপর দরজা খুলে গেল। 'ডিকো' বলল — যাও, টাইগারের সঙ্গে কথা বলো। সে তোমাকে হোটোলে পৌঁছে দেবে। আমাব সঙ্গে পরে দেখা হবে।

ঘর তো নয় এক বিরাট বাস। সারি সারি বোতাম। একটা বোতাম টেপামাত্র পুরো ঘরটা নীচের দিকে নামতে থাকল। ও এটা তাহলে লিফট। টাইগারের অদ্ভুত কাণ্ড। লিফটের দরজা খুলতেই যেন দেখা গেল, যেন পাতাল-রেলের প্ল্যাটফর্ম। একইরকম দেখতে দুটি সুড়ঙ্গ। একটি লোক এগিয়ে এসে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল — কম্যান্ডার আমার সঙ্গে আসুন।

এবার একটি লালকাপেট পাতা ঘর। ডিকো যেমন বর্ণনা দিয়েছিল, সেইরকম দেখতে একটি লোক চেয়ারে বসে আছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল — গুড মর্নিং কম্যান্ডার, বসুন। কেমন লাগছে আমার অফিস। হ্যাঁ মাটির নীচে অবশ্য। টোকিওতে তো অফিসের জায়গা নেই, তবে পাতালরেল চালু হলে আমাদেরও জায়গা পালটাতে হবে।

বন্ড বুঝতে পারল টাইগার বেশ কিছু তথ্য জানে। প্রশ্ন করাতে টাইগার বলে — সি. আই. এ. আমাদের হয়ে কাজ করে। যথেষ্ট সাহায্য পাই ওদের কাছ থেকে।

বন্ড বলে — ওরা তো প্রশান্ত মহাসাগরকে নিজেদের ঘরের পেছন দিকের বাগান হিসেবে প্রস্তুত করতে চায়।

টাইগারে হাসে কিন্তু আপনি তো বাগানের ঘাস কাটার যন্ত্রটা বাগাতে চান। তাই না?

— কিন্তু সবাই স্বীকার করে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এমন দেশ, যারা পৃথিবীর এই অংশে আগ্রহ দেখাতে পারে, ন্যায্য কারণেই।

টনাকা হাসে। আপনাদের ভাগ্য ভালো! আমরা অস্ট্রেলিয়ার বদলে পার্ল হারবার আক্রমণ করেছিলাম। যাকগে ধূমপান চলে তো?

একটা সিগারেট তুলে নিল বন্ড। টাইগার বলে, কেমন লাগছে জাপান? আনন্দ-ফুর্তি করছেন তো?

— ডিকো সঙ্গে রয়েছে, ফুর্তি না করে উপায় নেই। এইবার টনাকা জিজ্ঞেস করে, আমরা কী করে আপনাকে সাহায্য করতে পারি বলুন তো।

— একটি মূল্যবান যন্ত্র আছে। ট্রেডমার্ক বোধ হয় ম্যাজিক চুয়াল্লিশ। ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বের করে টনাকা। তার থেকে বের করে দুটো হলুদ রঙের টাইপ করা কাগজ। যা জানবেন কাউকে প্রকাশ করবেন না।

কাগজটায় লেখা আছে --- সংকেত, শনি সরেছে। ১লা সেপ্টেম্বর সুপ্রীম সোভিয়েটের ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে — দুশো মেগাটনের অস্ত্র, আমাদের হাতে। সেপ্টেম্বরের কুড়ি তারিখে, টেস্ট হবে।

‘নোভাৎসমলয়া’ সমস্ত গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়বে, উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর এবং আলাস্কা অঞ্চলে। আই. বি. এম.-এর এই ধরনের অস্ত্র লন্ডনে নিক্ষেপ করলে, নিউ ক্যাসল এবং কারলাইর দক্ষিণে বিশাল এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।

...ব্রিটেনের মিত্রতার এখন কোনো মূল্য নেই। তাই আমেরিকা ব্রিটেনকে বাঁচাতে যাবে না।... যদি এই কৌশল সফল হয়, তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হবে এবং ভবিষ্যতে আমেরিকার সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্ভব হবে। প্রয়োগের আগে ব্রিটেনের সমস্ত রাশিয়ান নাগরিককে সরিয়ে নিতে হবে। এতে সন্ত্রাস ও উত্তেজনা দেখা দেবে। সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। যখন সংকেত যাবে, ‘বিদ্যুতের আঘাত’, তখনই কাজ শুরু হবে। ‘সেন্টার’।

কাগজের লেখাটা পড়ে বন্ড জিজ্ঞেস করল, এক নম্বর জায়গায় কে রয়েছে? ক্রুশেভ?

— ইয়েস। কম্যান্ডার আমাদের কাছে, সম্মানটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কথার খেলাপ মানে অসম্মান। তাই না?

বন্ড বলে — হ্যাঁ। শত্রুপক্ষের বার্তা সোজাসুজি পাওয়া গেল। কিন্তু এটা যখন ওয়াশিংটন থেকে লন্ডন যাবে, তাতে অনেক ভেজাল থাকবে।

টনাকা বলে, কম্যান্ডার যখন ইংল্যান্ডে ছিলাম, আপনার দেশের লোক আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছিল। কিন্তু আমি প্রতিদানে খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। সেটা ভুল। আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। হয়তো এই গোপন খবর ফাঁস কবে আমি দেশদ্রোহীর মতো কাজ করলাম। কিন্তু আপনাকে দেখে আমি যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হচ্ছি।

ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়ায় বন্ড।

আবার সেই চোরাকুঠুরি দিয়ে বাইরে আসে। এবার মেলবোর্নের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তার মাধ্যমে লন্ডনে।

॥ সাত ॥

একটা মাস কেটে যায়। ‘জেমস বন্ড’ এখন টাইগারের কাছে। ‘বন্ডো-সান’ নামটা জাপানি শব্দ ‘বনডু সান’-এর মতো। এর অর্থ পাকা দাড়িওয়ালা পুরুত।

দুঃখের বিষয় বন্ডের কাজ কিন্তু তেমন ভাবে এগোয় নি। অনেকটা সময় আড্ডা এবং হইচই-এর মধ্যে কেটেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য ডিকো কিছু পরামর্শ দেয়। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট কেনেডি একটি কড়া বক্তৃতা দিয়েছে। তিনি বলেন, পৃথিবীর কোথাও যদি রাশিয়া সোভিয়েট সীমানার বাইরে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় তাহলে আমেরিকা তার যথাযোগ্য উত্তর দেবে।

মস্কো থেকে একই ধরনের পালটা হুমকি আসে।

কিছুদিন পবে আবার বন্ডের ডাক পড়ে। টাইগারের সেই পাতাল হাফিসে।

টাইগাব বলে — নতুন খবরটা শোনো। কেন্দ্রীয় কর্তারা সমস্ত কৌশল প্রয়োগ আপাতত স্থগিত রেখেছে।

বন্ড বলে -- ধন্যবাদ। তুমি এই তথ্যটা দিয়েছিলে বলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা কমানো গেছে। বিশেষ করে ইংল্যান্ড তো যথেষ্ট উপকৃত। আমার আবও কিছু প্রশ্ন আছে।

-- তুমি নিশ্চয়ই সেই যন্ত্রটা চাইছো? 'ম্যাজিক চুয়াল্লিশ'। সেটা পেতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তবে পাওয়া যাবে। কিন্তু দাম বাড়বে। কত দাম দেবে তোমরা?

বন্ড বলে চিনে আমরা জাল পেতেছি। তার নাম 'ব্লু-কট'। সেখানকার সমস্ত তথ্য তোমাদের দেব।

-- তা সব তথ্য আমাদের জানা। আমবা ওব নাম দিয়েছি 'কট অরেঞ্জ'। এগুলো নতুন কিছু নয়। আর কী দিতে পারো তোমরা?

— আর-ও অনেক কিছু দিতে পাবি। তুমি একটা দাম ঠিক করো না।

টাইগার চুপ করে থাকে। তারপর বলে — সব হিসেব আমার জানা নেই। তবে তোমার সঙ্গে যা কথাবার্তা হল, সেটা আমার কর্তাকে জানাতে চাই।

॥ আট ॥

সেই গাইশা পাটি শেষ হল। একটু আগে টাইগাব ঠাট্টার ছলে বন্ডকে মৃত্যুব হুমকি দিয়েছে। এই ঘরটা বদলে বাঘের মাথা, চেয়ারটা বাঘের চামড়ায় মোড়া। টাইগাব বলেছিল, তার জন্ম ব্যাঘ্র বাশি আর বন্ডের হয়তো, ইঁদুর রাশি।

'সাকের' পাত্রে চুমুক দিয়ে বন্ড বলে — আমার মৃত্যু হলে তোমারও বিপদ হবে। তোমাকে আমি বিপদে ফেলতে চাই না।

টাইগার বলে, একটা গল্প শুনবে!

— সংক্ষেপে একটা গল্প শোনায় টাইগাব। একশো বছর আগেকার কথা। যখন জাপানকে পশ্চিমী ধাঁচে আধুনিক করাব কর্মকাণ্ড শুরু হলে। সেই সময় যারা এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিল, তারা বেশির ভাগই বিদেশি যেমন 'লাফকেডিও' 'হান'। সে আমেরিকান, কিন্তু জন্ম ইউরোপে। পরে সে জাপানের নাগরিক হয়। স্কটল্যান্ডের জাপানিদেরও খুব ভোগান্তি হত। এদিকে আমেরিকানরা নিজেদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়েছে। তারা প্রাচ্যের জীবনধারণ আকৃষ্ট হচ্ছে।

বলতে বলতে টাইগার নিজের বিবক্তি প্রকাশ করতে থাকে। সে বলে — আমেরিকানরা অবশ্য আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমাদের টি-পাটি, ফুলের সাজসজ্জা, আর নাট্যানুষ্ঠান তারা ভালোবাসে, যদিও খুব একটা বোঝে না। আমাদের পুবাণের গল্পগুলো ওবা মুগ্ধ হয়ে শোনে, কারণ ওদের শিক্ষার দৌড় তো শুধু টেলিভিশন পর্যন্ত।

আবার তর্ক বাঁধে।

বন্ড বলে — আমি বহু খারাপ লোক দেখেছি টাইগার।

-- এই জানুয়ারি মাসে এখানে একজন শয়তান এসেছে। মানুষের আকারে বিরাট শয়তান।

— তাব কি মাথায় গোলমাল আছে?

— না, সে হিসেব করে চলে। প্রতিভাবান লোক। বিজ্ঞান গবেষক। তিনি এমন একটা জিনিস সংগ্রহ করেন, পৃথিবীতে যার তুলনা নেই।

— কী সংগ্রহ করেন তিনি ?

— তিনি সংগ্রহ করেন মৃত্যু।

চমকে ওঠে বন্দ।

— তার মানে লোকটা কি খুনি ?

— না। সে এমন কাজ করে যাতে মানুষ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। সে এমন পথ দেখায় যাতে মানুষ আপনা থেকেই নিজেকে মেরে ফেলে। এখন পর্যন্ত, মাত্র ছ'মাসের মধ্যে পাঁচশো জাপানি তার শিকার।

— তাকে ফাঁসি দিচ্ছ না কেন ?

— অত সোজা নয়।

এবারে এক আশ্চর্য কাহিনি শোনায় টাইগার।

তার নাম 'শ্যাটারহ্যান্ড'। তিনি জানুয়ারি মাসে এদেশে আসেন। তার স্ত্রী 'এমি শ্যাটারহ্যান্ড'। তাদের সুইস-পাসপোর্টে পরিচয় আছে উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ বলে।

তারা সঙ্গে এনেছিল সারা পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করা নানা মূল্যবান লতাপাতা ও চারাগাছ। তারা চেয়েছিল, দশলক্ষ পাউন্ড খরচ করে একটি বাগান বা পার্ক তৈরি করবে।

টাইগার জানায় — বোটানিস্ট নানা জায়গা ঘুরে বেড়াল। দক্ষিণ দিকে কারশু দ্বীপের একটা পুরোনো দুর্গ তার খুব পছন্দ হল। 'ফাকুওকা' নামে এই দুর্গ-প্রাসাদের যুদ্ধে রাশিয়ান নেভির পরাজয় হয়েছিল। প্রচুর গাছপালার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো এই জমিতেই পোতা হয়। পাঁচশো একর জমি, জমির নীচে বেশ কিছু আগ্নেয়গিরির গোপন অস্তিত্ব ছিল। তাই গাছপালা গজালে আগ্নেয়গিরির উদগীরণ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত থাকে।

ডক্টর শ্যাটারহ্যান্ড এবং তার স্ত্রী আশেপাশের স্থানীয় লোক নিয়ে কাজ শুরু করেন। আশ্চর্য, তার মধ্যে ছিল বেশ কিছু 'ব্ল্যাক ড্রাগন' সোসাইটির সদস্য।

'ব্ল্যাক ড্রাগন' একটি নিষিদ্ধ সংগঠন। সামুরাইদের গোপন সংস্থা। এর মধ্যে নানা মিশ্রণ — ফ্যাসিবাদী, সামরিক বাহিনীর পদচ্যুত লোক, সিক্রেট এজেন্ট ইত্যাদি — সবাই এখানে যোগ দিয়েছিল। এবং চরমপন্থী।

ড. শ্যাটারহ্যান্ডের লোকেরা চাকর ও মালির সাজে সেজে থাকত। পুলিশ তাকে সতর্ক করেছিল, কিন্তু ডাক্তার বিশেষ কান দেয়নি। ডাক্তারের দলবল তার প্রতি অনুগত ছিল।

কথা শুনতে শুনতে একটা কাগজ তুলে নেয় বন্দ। এক বিশাল তালিকা। উদ্ভিদের বিষ নিয়ে নানা মন্তব্য ও গুণবর্ণনা। কাগজের উপর জাপানের কৃষিবিভাগের শিলমোহর।

প্রধানত ছয়টি বিভাগ — ডেলিয়ান্ট, ইনযেবরিয়্যান্ট, কনভালসিভ্যান্ট, ডিপ্রেস্যান্ট, অ্যাসথেনিক এবং ইরিট্যান্ট।

এ ছাড়া রয়েছে বহুবিধ গাছের নাম, সবই বিষাক্ত গাছ — যেমন ফিশ পয়জন ট্রি, গায়েনা পয়জন, মালয় অ্যারো পয়জন, পয়জন আইভি, হলুদ করবী, ফিজিক নাট, ডিভাইন মাশরুম — ইত্যাদি ইত্যাদি।

তালিকা পড়ে হতবাক বন্দ।

— ওঃ গড! ডা. প্যাটারহ্যান্ডের বাগান তো খুব ভালো জায়গা!

বন্দ প্রশ্ন করে — আচ্ছা, ডাক্তারের কী ইচ্ছে ছিল বলতো ?

অদ্ভুত এই সুইস ডাক্তারের কাহিনি।

বন্দ তাজ্জব হয়ে ভাবতে থাকে। তখন রাত তিনটে।

টাইগার বলে — আজকের জাপান টাইমস্ পড়েছ?

— না।

— আঠারো বছর বয়েসের একটা ছেলে সুইসাইড করেছে। বাড়ি তৈরির জন্য ইটগুঁড়ো করার একটা ইঞ্জিন চলছিল। ছেলেটা হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে তার নীচে গুয়ে পড়ে।

— কেন?

— সে দুবার ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় ফেল করেছিল। এক অর্থে, জাপানিদের কাছে আত্মহত্যা একটা মহান কাজ!

টাইগারের সঙ্গে এই বিষয়ে আরেক রাউন্ড তর্ক শুরু হয়। টাইগার বোঝায় — জাপানিতে 'জিসাংসু' কথাটার অর্থ আত্মহত্যা। এই নিয়ে এমন সব গল্প আছে যা ছোটোদেরও মনে উৎসাহ জোগায়। প্রত্যেক বছর পঁচিশ হাজার সাধারণ জাপানি আত্মহত্যা করে!

আত্মহত্যা প্রসঙ্গে ডা. শ্যাটারহ্যান্ডের কার্যকলাপের কথা এসে যায়। ডাক্তারের বাগানের গাছে নানা বিষাক্ত ফল ঝুলে থাকে। লাল জাম বা গোলাপি ফল তো আছেই। মাটির নীচে টগবগ করছে আশ্বেয়গিরির লাভা! উত্তাপ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। গোটা জায়গা যেন মরণের বাজার!

বন্দ চিৎকার করে ওঠে — তবু তোমরা লোকটাকে অ্যারেস্ট করো নি? জায়গাটা উড়িয়ে দাও নি?

— আরে ডাক্তার যে একটা ভালো প্রস্তাব দিয়েছে। এখানে একটা গবেষণা কেন্দ্র হতে পারে। এব ফলে বিষ থেকে অনেক ওষুধ তৈরি করা যায়। ডাক্তারের ইচ্ছে — ভালো কোনও চিকিৎসাকেন্দ্রকে সে দান করতে চায়!

উজ্জেক আলোচনা চলতে থাকে। অক্লান্তভাবে এর ইতিহাস বর্ণনা করে টাইগার। তার মধ্যেই সে জানিয়ে দেয় — একমাস আগে আমার এক বিশেষ প্রতিনিধিকে ওখানে পাঠিয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন। তাকে বলা হয়েছিল বাগানে গিয়ে সবকিছু দেখে একটা বিশদ রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। এক সপ্তাহ পরে লোকটাকে উন্মাদ অবস্থায় সমুদ্রের তীরে পাওয়া গেল। প্রচণ্ড বিকারগ্রস্ত, উলটোপালটা কথা। শুধু বলছে 'হাইকু' 'হাইকু'! 'হাইকু' মানে একটা সতেরো মাত্রার কবিতা — ফড়িং নিয়ে! আশ্চর্য, লোকটা বিড়বিড় করে আবৃত্তি করছিল — 'আমি একা! সুগন্ধি কবরের উপর দিয়ে উড়ছে একটা গোলাপি ফড়িং!'

বন্দ হাই তুলল — টাইগার, এবার শোবার সময় হয়েছে। কাল আবার কথা হবে।

টাইগার এবার বলল — তোমরা কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। তোমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়ন এখন সর্বেসর্বা।

— তাহলে তুমি ইংল্যান্ডে এসে অবস্থা দেখে যাও।

এইবার হাসল টাইগার — বন্ডো-সান, আসলে তোমাকে আমি বাজিয়ে দেখছিলাম। আসলে তোমাকে ওই বাগান, মানে মৃত্যুপুরিতে ঢুকতে হবে।

শিশির-ভেজা রাস্তার উপর দিয়ে চলছে কালো টয়োটা। টাইগার বন্ডকে রাজি করিয়েছিল — মৃত্যুপূরীর ব্যাপারটা ফয়সালা করতে হবে — এবং তার বিনিময়ে বন্ড পাবে সেই দুর্মূল্য যন্ত্র ‘ম্যাজিক ৪৪’।

বন্ড এখন অস্থিরমনা। তাই ঠিক হয়েছে। একটা বিলাসবহুল স্নান করা যাক। তাই আজ হামাম যাচ্ছে ওরা, লাক্সারি স্নান-ঘর।

স্নান ঘরে একটি সুন্দরী জাপানি মেয়ে। পরনে সংক্ষিপ্ত পোশাক। তার উপরে দায়িত্ব আছে সব দেখাশোনার যাতে বন্ড আরামে স্নান করতে পারে। টাইগার সব বুঝিয়ে দিয়েছিল।

মেয়েটার বয়েস আঠারো, নাম মারিকো ইচিবান। এর অর্থ এক নম্বর সত্য।

এর কিছু পরে, টোকিও মেল স্টেশনে টাইগারের পিছু পিছু যাচ্ছিল যে, তাকে নতুন লোক বলে মনে হবে। কারণ, বন্ডের চেহারা, পোশাক সব কিছু বদলে গেছে। মুখ আর হাতে বাদামি ছোপ। তেল চপচপে চুল, ছোটো করে ছাঁটা। গায়ে সাদা সুতির শার্ট, কালো প্যান্ট, প্লাস্টিকের স্যাভেল পায়ে।

যাত্রীর ভিড়। এখন বন্ড আপাতদৃষ্টিতে পুরোপুরি জাপানি। এই বেশেই তাকে সাজিয়ে দিয়েছিল হামামের মরিকো।

টাইগার বলেছিল -- তোমার পশ্চিমি কায়দা-কানুন এখন ভুলে যাও। আর একটা কথা। কখনো মুখ খারাপ করবে না।

— মানে?

— মানে গালাগালি দেবে না, খারাপ ভাষা ব্যবহার করবে না।

ওরা ট্রেনে চড়ে যাত্রা করেছিল। খাবার এল। রুপোলি অক্টোপাস আর ভাত। চপস্টিক নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল বন্ড।

আরে মনিব্যাগটা গেল কোথায়? টাইগার অবাক। বলল — জাপানে এমন ব্যাপার বেশি ঘটে না। যাকগে চূপচাপ থাকো। নইলে পুলিশ এসে অযথা জটিলতার সৃষ্টি করবে। আমি দুঃখিত। গামগারিতে নামল ওরা। সুন্দর গ্রাম। তারপর তোবায় যাবে ওরা। সমুদ্র তীরে।

এবার পাইনে ঢাকা একটা বাড়ি। অনেকে অপেক্ষা করছিল। সবাই স্বাগত জানাল।

টাইগার ‘সাকে’র অর্ডার দিল। ঘরে এসে বসল ওরা। টাইগারের নির্দেশে বন্ড প্যান্ট শার্ট ছেড়ে ‘যুকাতা’ পরল।

‘সাকে’ এল। পান উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে শলাপরামর্শ শুরু হল। আবার আত্মজীবনী। টাইগার বলতে থাকল :

— সেটা আমার জীবনে একটা অন্যতম আবিষ্কার। আমার বয়েস তখন চল্লিশ। ‘কেমপিইতাই-এর কাজ ছেড়ে আমি যোগ দিলাম কামী-কাজের ট্রেনিং-এর দলে। সেখানে ঢোকা সহজ ছিল না। স্কোয়াড্রনে তরুণের সংখ্যাই বেশি। এয়ারক্র্যাফট বেশি নেই। আমরা ‘বাকু’ — অর্থাৎ ছোটো প্লেন দিয়ে কাজ চালাতাম।

— কাজটাও কঠিন, কারণ কোন ইঞ্জিন নেই। তবু হাজার পাউন্ডের বিস্ফোরক রাখা যেত। পাইলটের কাছে থাকে শুধু দিক-দর্শনের যন্ত্র। বিমান যুদ্ধের ইতিহাসে ‘কামী-কাজে’ অনেক কিছু করেছে। শোনা যায়, ২৭৬টা রণতরী ডুবিয়ে দিয়েছে ওরা। ‘কামী-কাজে’ এক বিশেষ বাহিনী বটে।

— যুদ্ধে ব্যর্থ হওয়ায় আডমির্যাল ওনিশি সুইসাইড করেন।

যুদ্ধ এবং আত্মহত্যার নানা বিচিত্র কায়দাব কাহিনি শুনতে শুনতে খাওয়া সারে বন্দ। ভাত, গলদা চিংড়ি, আর কোয়েলের ডিম। বন্ডের মনে হল চিংড়ি মাছের মাথাটা যেন নড়ছে।

টাইগার সিক দিল — আঃ, বডো সান, সহজ হও। জাপানি জীবনযাত্রার সঙ্গে তোমায় তাড়াতাড়ি পরিচিত হতে হবে।

এরপর ওরা এল একটা মন্দিরের কাছে। শিনটো ধর্মের সবচেয়ে বড়ো মন্দির। সবাই সূর্যের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে।

ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে ক্রমশ পুরোহিতের সামনে এসে বসল।

এরপর আরেক অনুষ্ঠান। এখানে নাকি বন্ডকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

এটা একটা খাটাল। সারি সারি অনেক চালা ঘরে গোরুর পাল জাবর কাটছে।

গোয়াল দর্শনের পর ওদের গাড়ি এগিয়ে গেল গ্রামের আরও ভিতরে। সামনে একটা সুন্দর রোস্তোরী। গোয়ালে বন্ডের নতুন অভিজ্ঞতা — গোরুকে বিয়ার খাওয়ানো হয়।

টাইগার বলে — তুমি গোরুর মাংস খাও ?

— না।

তবু টাইগারের অর্ডারে সুস্বাদু স্টিক এল — খেয়ে দেখ, ভালো লাগবে।

এবার জকরি কথা। বন্ডকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এক অতি গোপন ট্রেনিং সেন্টারে। সেটা গড়ের দুর্গ। নাম — সেন্ট্রাল মাউন্টেনিয়ারিং স্কুল। ‘নিনজুৎসু’ নামে একটা কৌশল শেখানো হয়, যাকে বলা যায় অপহরণের কৌশল। এর আরেক নাম ‘বুশিডো’। দুটো স্কুল আছে — ইগা এবং তুগাকুরে। যাবা ট্রেনিং দেয়, তারা ওই স্কুল থেকে এসেছে।

গাড়ি চলছে, পথে ধুলো উড়ছে।

হঠাৎ দেখা গেল, মোটরবাইকে চড়ে কে যেন অনুসরণ করছে ওদের।

টাইগার বলল — পুলিশ হতে পারে।

দুর্গের গেটের সামনে এসে গাড়ি থামল। পরিখার জলের উপরে কাঠের সেতু। টাইগার তার পরিচিতির কার্ড দেখাল। সাদা পোশাকের রক্ষীরা পথ ছেড়ে দিল। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের ছেলেরা খেলা দেখছে — দুর্গ রক্ষণের মহড়া।

হঠাৎ রয়ামপার্ট থেকে ছইসিল বাজল। দশ জন লোক বেরিয়ে এল জঙ্গলের মধ্য থেকে। তাদের পরনে কালো পোশাক, কালো পট্ট দিয়ে চোখ ঢাকা। যুদ্ধের মহড়া শুরু হল। আক্রমণকারীরা পাঁচিল টপকেছে। প্রতিপক্ষের উপব ‘বোজুৎসু’ প্রয়োগ করবে। দুজন করে লোক নামছে দেয়াল ধরে।

লড়াই চলছে। মার খাচ্ছে প্রতিপক্ষ। মাথা বা পেট টিপে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে ওরা!

একসময় খেলা শেষ হয়। টাইগার বক্তৃতা দেয়। খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানায়।

হঠাৎ খবর আসে — এক মাইল দূরে মোটর সাইকেলের চাকার দাগ দেখা গেছে। অবশ্যই একজন আরোহী এদিকে আসছিল। তাড়া করায় সে ফিরে গেছে। কে সে?

সৌজন্য বিনিময়ের পর এবার বিদায় নেবে বন্ড ও টাইগার। ওরা এবার রওনা হল কায়োটোর রাস্তা ধরে। পথে টাইগার জিজ্ঞেস করল — কী বডো-সান, কেমন লাগল এই ট্রেনিং দৃশ্য?

— খুব ভালো। আন্তরিকতা বেশি আছে। কাজে দেবে। ‘বোজুৎসু’ কৌশলটা আমার খুব ভালো লাগেছে।

— জানো কি, এই ট্রেনিং নিতে গিয়ে কয়েকটা ছাত্রকে মরতে হয়েছে?
— তাই নাকি? ওরা তো খেলছিল, আমাদের আনন্দ দিতে এসেছিল।
— হ্যাঁ। কিন্তু মরতে হয়েছে কয়েকটাকে।
আনন্দদানের প্রতিফল মৃত্যু!
মনটা খারাপ হয়ে গেল বন্ডের।

॥ এগারো ॥

কায়োটো।

এখানকার খুব নামজাদা হোটেল মিয়াকো। সবরকম আরামের বন্দোবস্ত আছে।

এখানেই আজ পুলিশ কর্তার সঙ্গে টাইগারের ডিনার।

তার আগে আবার নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলল, জাপানি কাব্য-সাহিত্য নিয়েও কিছু আলোকপাত করল টাইগার। দু-একটা লাইন আবৃত্তি করেছিল টাইগার। যেমন —

আমার মধ্যে রয়েছে মুলো—
ভীষণ তিস্ত, যেন কীমড়াচ্ছে আমায়—
কিন্তু আমি হেমস্তের হাওয়া
অনুভব করছি।

অথবা —

ফুলের গন্ধে মাখামাখি হয়ে
প্রজাপতিটা সুগন্ধ ভরে নিচ্ছে
পাখায়, ডানায়!

— বা! — বন্ড বলে।

— এবার তুমি একটা 'হাইকু' লেখো তো।

— হাইকু?

— একি ভুলে গেলে। হাইকু, মানে ছড়া।

বন্ড হাসে। কবিতা লিখতে হবে! একী কাণ্ড। বলে— আচ্ছা, পেন আর প্যাডটা দাও।

বিস্তর মাথা ঘামিয়ে কাটাকাটির পর একটা কিছু খাড়া হয়।

টাইগার বলে -- পড়ে। তো।

বন্ড পড়ে—

দুবার তুমি বেচে ওঠো —
প্রথমবার — যখন জন্ম নাও—
দ্বিতীয়বার — যখন মৃত্যুর দিকে তাকাও।

টাইগার সোৎসাহে হাততালি দেয় — দারুণ হয়েছে।

এবার আলোচনার অন্য বিষয়। সামো কুস্তিগীরদের কথা। অদ্ভুত তাদের অনুশীলন ও গা-মালিশের ধরন। অঙ্গচর্চার এমনই বৈচিত্র্য যে, ওরা ইচ্ছে করলে ওদের কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুরক্ষিত রাখতে পারে। শত্রুপক্ষ অত্যাচার চালালেও সহ্য করতে পারে।

সন্ধ্যা হয়। ওরা পৌছে যায় বেপ্পু শহরে। কায়শুর দক্ষিণে এই দ্বীপ। কাল সকলে ওরা যাত্রা করবে ফাকুওকা!

বেপপু-তে নানা উষ্ণ প্রস্রবণ। তবু এগুলো যেন 'নরক', সুন্দর নরক। গন্ধকের পচা গন্ধ, কাদার স্রোত, অবশ্য তার মধ্যে নানাবর্ণ — লাল, কমলা, নীল। দশটি 'সুন্দর নরক'!

ফিরে যাবার সময় বন্ড দেখল একটা লাল চাকা, শিকল দিয়ে জড়িয়ে তাল বন্ধ!

— টাইগার, ওটা কী?

— প্রস্রবণে গতি নিয়ন্ত্রণ করার চাকা।

যেতে যেতে টাইগার বলে — বন্ডো-সান, তোমার-আমার একত্রে যাত্রার আজ শেষ দিন।
চমকে ওঠে বন্ড।

টাইগার বলে — আজ তোমার সম্মানে আমি এক বিশেষ ভোজসভার আয়োজন করেছি।
'ফাণ্ড' ভোজন।

'ফাণ্ড' একধরনের জাপানি মাছ। অপূর্ব স্বাদ, কুস্তিগীরদের প্রিয় খাদ্য। তবে এই মাছের লিভারে হঠাৎ কোনো একটা শিরায় বিষ থাকে। তাই খুনি এবং আত্মহত্যার ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছে মাছটার বিশেষ মূল্য আছে। টাইগার হাসিমুখে জানায় এই তথ্য।

বন্ড বলে — বাঃ, আমি এমন মাছই খেতে চাই।

টাইগার বলে — এটা আশংকা করা যায়। তাই রেস্টুরেন্টে কুकिং সেকশনে বিশেষজ্ঞ রাখা হয়।

ভোজসভা। রেস্টুরাঁর দেয়ালে ফাণ্ড মাছের ছবি।

বন্ড বলল — আগে 'সাকে' পান করি। তার পর এক পুণ্যবান আত্মহত্যায় নামব। আমি মরলে ওই ডাক্তারের সুবিধা হয়ে যাবে অবশ্য।

এল ফাণ্ড মাছ। তেমন কিছু স্বাদ নেই, তবু প্রশংসা করল বন্ড। ভাবল, কুकिং সেকশনের বিশেষজ্ঞ কোন্ কৌশলে বিষ পরিহার করে এই মাছ রান্না করে!

খাওয়া শেষ।

পরদিন ভোর ছুটায় পুলিশ কর্তাব গাড়ি এল ওদের নিয়ে যাবার জন্য।

গাড়ি ছুটছে। হঠাৎ বন্ড বলল — টাইগার, আমার মানিব্যাগ চুরি করেছে বলে আমি খে লোকটাকে সন্দেহ করেছিলাম, সে আমাদের অনুসরণ করছে। মোটরবাইকে চড়ে পিছু পিছু আসছে।

আঁকা-বাঁকা রাস্তায় গাড়ি ছুটছে ঘন্টায় আশি মাইল বেগে। এইবার মোটরবাইক চালককে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল।

টাইগারের নির্দেশে গাড়ির ড্রাইভার দু-একবার সাইরেন হর্ন বাজাল। এটাই একধরনের সতর্কীকরণ। দসী পুলিশ অফিসার রিভলভার বের করে প্রস্তুত রইল।

কাছে এসে গেছে মোটর সাইকেল।

টাইগার বলল — বন্ডো-সান, ওর কাছে বন্দুক আছে।

বন্ড বলল — দেখছি।

গাড়ির দরজার পাশে ঘেঁষে গেল বন্ড। মোটর সাইকেল এবার প্রায় গাড়ির পাশাপাশি। বাঁপ দিল বন্ড! জড়াজড়ি, মারামারি করতে করতে ওরা গড়িয়ে পড়ল শুকনো নালায়।

লোকটার দেহ স্থির। টাইগার বলল — মরে গেছে লোকটা। ও একটা ব্ল্যাক-ড্রাগন।

লোকটার পোশাকে তল্লাশি চালিয়ে কতগুলো সাধারণ জিনিসপত্র পাওয়া গেল। তার সঙ্গে

পাওয়া গেল বন্ডের সেই মানিব্যাগ। আশ্চর্য, ব্যাগের মধ্যে পাঁচ হাজার ইয়েন অটুট রয়েছে। একটা ছোটো ডায়েরি। সবই টাইগারের কাছে জমা দেওয়া হল।

টাইগার বলল, এ লোকটা আমাকে প্রধান শত্রু বলে চিনতে পেরেছে। তবে লোকটা পাগল অথবা খুব বড়ো শয়তান।

ফাকুওকা অঞ্চলের রাস্তার ধারেই সি. আই. ডি. অফিস। ঘরভর্তি লোক। সবাই ওদের স্বাগত জানাল। জানা গেল, গত এক সপ্তাহের এখানে কুড়িটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সমুদ্রের ধারে পাথুরে পথ, একটা পার্ক, টালি-বসানো ওয়াচ-টাওয়ার, পাশ দিয়ে দশফুট উঁচু পাঁচিল। নানারকম জাপানি কারুকাজ, অদ্ভুত বাড়িটার ডিজাইন, ড্রাকুলা মডেলের।

টাইগার বলল — ডিপার্টমেন্ট সেফে সাঁতারের সাজসরঞ্জাম পাঠিয়েছে। জানা গেছে সমুদ্র থেকে আট মাইল দূরে আমা-দ্বীপ আছে, সেখানে আমা জাতি বাস করে। এখানে মেয়েরা শামুক কুড়ায়। ওরা অসাধারণ সুন্দরী। উলঙ্গ হয়ে জলে নেমে ওরা বিনুক কুড়ায়। অনেক বিনুকের মধ্যেই মুক্তা থাকে। মনে হয় প্রায় পঞ্চাশটা দ্বীপ আছে এই রকমের।

বন্ড বলে কিন্তু আমি কীভাবে ঐ দ্বীপে যাব? কেউ একটু যদি পথ দেখিয়ে দিত —

টাইগার বলে — একটি জাপানি ডাইভিং মেয়ে তোমায় সাহায্য করতে পারে। ওর নাম 'কিসী সুজুকি'। সুন্দরী, হলিউডের একটা ছবিতে কাজ করেছে। দুঃখের বিষয় ছবিটা ফ্লপ করেছিল। মেয়েটা তাই আবার নিজের জীবনের ফিরতে চায়। জাপানি খবরের কাগজে ওর নাম দেওয়া হয়েছে জাপানি গ্রেটা গার্বো।

আরও নানাধরনের শলাপরামর্শ হল। টাইগার বলল — রাতে তুমি কালো পৌশাক পরবে। দিনের বেলায় জাপানি ছদ্মবেশে থাকবে।

— আমি একটা ছোটো বন্দুক রাখতে চাই।

— সেটা উচিত হবে না। তোমার কোমরে 'নিনজো চেন' জড়ানো থাকবে। সেটাই তুমি অস্ত্র হিসাবে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করবে।

বন্ডের সামনে একটা ছবি দেখায় টাইগার। ছবিটা দূর থেকে টেলিলেন্স দিয়ে তোলা। বিরাট চেহারার একটি লোক, গায়ে বর্ম, মাথায় শিরস্ত্রাণ। প্রাচীন জাপানি যোদ্ধাদের মতো কোমরে তলোয়ার, তলপেটের ওপরে ঢাল।

টাইগার বলে, ওর সঙ্গে একটি মেয়ে থাকে। কুৎসিত দেখতে। কিন্তু ভীষণ ডেঞ্জারাস। এই দুজনকেই তোমায় খতম করতে হবে।

বন্ড জিজ্ঞেস করল — ব্ল্যাক ড্রাগন সম্পর্কে আর কোনো তথ্য আছে?

— ঐ লোকটা বিশেষ লেখাপড়া জানে না। তবু ডায়েরির প্রথম পাতায় ও নিজের কাজের কথা নোট করেছে।

— কী কাজ?

— ওর কাজ আমাকে অনুসরণ করা এবং সেই বিষয়ে রিপোর্ট করা।

পরদিন প্রস্তুত হল বন্ড। মনে পড়ল, 'এম' যে নামটি করেছিল, এই লোকটিই বোধহয় সেই কুখ্যাত 'ব্রো ফেন্ড', 'স্পেস্টার' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। এর কাজ চরবৃত্তি, সন্ত্রাস, প্রতিহিংসা ইত্যাদি।

যতদূর জানা গেছে, ব্রোফেন্ড যথেষ্ট প্রতিভাবান, কিন্তু বন্ড পাগল। অনেকটা ক্যালিগুলা, নিরো, হিটলার প্রমুখ মানবজাতির বিশাল শত্রুদের মতো।

সাজসরঞ্জামের মধ্যে বন্ড নিল, একজোড়া সাঁতার কাটার পাতলা ডানা, খানিকটা সেক্স মাংস, কিছু ট্যাবলেট আর জল। এছাড়া পকেটে রাখল ছোটো একটা ছুরি আর লোহার পাতলা শেকল।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল টাইগারের সাথে। হালকা কিছু ঠাট্টা তামাসাও। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে একটা ছোটো দ্বীপ। উত্তরে একটা ছোটো বন্দর। অপরদিকে খাড়া পাহাড়। ওখানেই ডা. শ্যান্টাহ্যান্ডের সাম্রাজ্য, সমুদ্রের ধার পর্যন্ত।

বন্ড চিন্তিত, রাতের অন্ধকারে আধমাইল সাঁতার দিতে হবে। ঐ দুর্গম দুর্গের দেওয়াল পার হতে হবে। দ্বীপটাকে মনে হয় যেন আগ্নেয়গিরির কালো কালো পাথর দিয়ে তৈরি। তবে পাহাড়ের শীর্ষে যথেষ্ট গাছপালা, মনে হতে পারে, এক সবুজ স্বর্গ।

ওরা এসে পৌঁছে গেল, একটা ঘনবসতি গ্রামে। এখানেই একটা জেটি ঘাট, একদল প্রবীণ বৃদ্ধ ওদের স্বাগত জানাল। সামনে দাঁড়িয়ে এক পুরোহিত। তার পরনে লম্বা হাতা লাল কিমোনো; মাথায় চকচকে টুপি।

পুরোহিতের বাড়িতে ওরা আমন্ত্রিত। ছোটো ছোটো নুড়ি দিয়ে তৈরি রাস্তা, সবাই ঘরে ঢুকে, কাঠের মেঝেতে গোল হয়ে বসল।

এটাই সুজুকি পরিবার। বন্ডকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, এক বিখ্যাত বিদেশি নৃতত্ত্ববিদ হিসাবে। পুরোহিত জানাল — নৃতত্ত্ববিদের কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার যেন সৎ ও আন্তরিক হয়।

টাইগার বন্ডের কানে চুপিচুপি বলল — অর্থাৎ তোমায় সংঘ, জীবনযাপন করতে হবে।

ওরা এসে দাঁড়াল সমুদ্রের তীরে। ছোটো খাটো একটা ভিড়, বাজার ধরনের। হাসতে হাসতে একদল মেয়ে ছুটে এল নতুন আগন্তুকদের অবাক চোখে দেখতে লাগল। সকলেরই সুন্দর শরীর, নামমাত্র পোশাক, কোমরে বাঁধা ছোটো গাঁইতি, মাথায় সাদা কাপড়ের পট্টি।

ওদের মধ্যে একটি মেয়ে বেশ লম্বা। সেই যেন মধ্যমণি। তার পাশে পাশে চলছে এক বৃদ্ধা। বন্ড অনুমানে বুঝতে পারল, এই মেয়েটাই কিসী সুজুকী।

বৃদ্ধা এক জেলেনি। ওদের ভাষা ইংরেজিতে তর্জমা করছিল টাইগার। পুরোহিত জানাল — কিসী সুজুকীর পরিবারে বন্ড অতিথির মর্যাদা পাবে।

এইবার কিসী সুজুকী হাত বাড়িয়ে নিজের পরিচয় দিল। বলল — আমার নাম কিসী সুজুকি। বন্ড বলল — আমার ‘তারো-তদোরকি’। আপনাদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে আমি ধন্য।

কিসী হেসে জিজ্ঞেস করল, আপনি আলু কুটতে পারেন? পারি। তাছাড়া আমার আরও কিছু গুণ আছে। আমি উৎসাহী, নৌকা চালাতে পারি, তার ঘুমের মধ্যে কখনও নাক ডাকি না।

কিসী হাসতে থাকে। বন্ড আবার জিজ্ঞেস করে, কাল আমরা কখন নৌকা নিয়ে যাত্রা করব? খুব ভোরে, সূর্য ওঠার আগে, পাঁচটা নাগাদ।

এইবার বিদায় নেবে টাইগার। বোটের ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। টাইগার বলল — ‘বন্ডো-সান আমি নিশ্চিত, তুমি সফল হবে।

অদৃশ্য হল মোটর লঞ্চ।

কিসী বলল — ‘তদোরকি সান’ আমার সঙ্গে এসো। আমরা আজ থেকে বন্ধু, সমান সমান।

॥ বারো ॥

এখন রাত নটা। নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল বন্ড।

কিসী এল ভোরের আগে। গায়ে সাদা পোশাক, ঢেউ খেলানো চুলের ওপর সাদা রুমাল জড়ানো।

সাজ-সরঞ্জাম গায়ের সঙ্গে রয়েছে। গাঁইতিটা সাদা পোশাকের ওপর ঝুলছে। কিসী বলল — তোমায় নৌকা বাইতে হবে। আর ডেভিডের প্রতি তোমায় সদয় থাকতে হবে। বন্ড বলল — ডেভিড কে? কিসী বলল — অপেক্ষা করো জানতে পারবে।

কিসী ভেতরে গিয়ে নিয়ে এল একটি বালসা কাঠের গামলা, আব চমৎকার পাকানো এক দড়ি। দড়িটা বন্ডের হাতে দিয়ে নিজে গামলাটা নিয়ে পথ হেঁটে এগিয়ে চলল। পথের শেষে একটি খাঁড়ি। সেখানে একটি নৌকা শুকনো ডালপালায় ঢাকা। সেটাকে তুলে খড়-টড় সরিয়ে সমুদ্রের জলে নামানো হল। দড়ি আর কাঠের গামলা নৌকার ভেতর বন্ড রাখল।

কিসী তখন খাঁড়ির আর একদিকে গিয়ে পাথরের সঙ্গে বাঁধা একটি সুতুলি খুলে গোটাতে গোটাতে চাপা শিস দিতে লাগল।

শিস শুনে খাঁড়ির জল আলোড়িত হতে লাগল। বন্ড অবাক হয়ে দেখল একটা মস্ত পানকৌড়ী তীব্রবেগে তিরের দিকে ছুটে এসে কিসীর পায়ে ঘাড় গুঁজল। খুব সম্ভবত রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। কিসী ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগল। তারপর পাখিটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নৌকায় এসে উঠল। পাখিটাও ওর পিছন পিছন সাঁতরে এসে নৌকায় উঠল।

বন্ডকে পাখিটা কোনো গ্রাহ্য করল না, নৌকায় উঠে ডানা ঝাপটতে ঝাপটতে পাটাতনের ঘুপচিতে গিয়ে বসল। ধীর স্থির হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

বন্ড নৌকা বাইতে লাগল, কিসীর নির্দেশ অনুযায়ী নৌকো চলতে লাগল উত্তরদিকে।

বন্ড কিসীকে পানকৌড়ির কথা জিজ্ঞেস করল। কিসী বলল — এই পাখিটা আমার প্রিয়। আমি ওকে যত্ন করে বড়ো করেছি। এই দ্বীপে ভীষণ একলা লাগত। তুমি এলসেছো ভালোই লাগছে।

— ডেভিড কে?

পাখিটাকে এই নামে আমি ডাকি। আমার এক প্রিয় অভিনেতার নামে। ডেভিড নিভেন। তুমি নিশ্চয় নাম শুনেছো?

— অবশ্যই।

মজা পায় বন্ড। কিসীর চোখের রং বাদামি। নরম মেয়ে কিন্তু হাতের তালু, পায়ের তলা খুব রুক্ষ। বন্ড জানত ‘আমা’ মানে সমুদ্রের মানুষ বা সমুদ্রের মেয়ে।

অনেকক্ষণ নৌকা বাইল ওরা। কিসী জিজ্ঞেস করল — তুমি এখানে কতদিন থাকবে?

— বোধহয় আর দু-তিন-দিন।

— আবার আমি একা হয়ে যাব।

বন্ড প্রসঙ্গ ঘোরাবার চেষ্টা করল।

— তুমি সিনেমায় ফিরে যেতে চাও?

— না। হলিউড আমার জঘন্য লেগেছিল।

দাঁড় তুলে নৌকা থামাল বন্ড। কিসী জলে নামল। ওর কোমরে দড়ি বাঁধা, দড়ির অপর প্রান্ত বন্ডের হাতে। কিসী বলল — দড়িতে যখন হ্যাঁচকা টান পড়বে, তখন আমায় টেনে তুলবে।

জলের নীচে নেমে গেল কিসী। ঘড়িতে সময় দেখল বন্ড। এক, দুই, তিন করে পঞ্চাশ সেকেন্ড। এইবার দড়িতে টান পড়ল। কোমর পর্যন্ত জলের ওপর ভেসে উঠল কিসী। জলে ভেজা শরীর। পাতলা আবরণের তলায় ঝকঝক করছে। পরমুহুর্তে আবার জলের তলায় হারিয়ে গেল সে।

গামলায় ভর্তি হয়েছিল কিছু রূপোলী মাছ। কিসী বলল — মাছ ধরা শেষ। এবার তুমি জলে নামো। যা দেখার দেখে নাও। আমি টেনে তুলব।

বন্ড ডাইভ দিল। কিছুটা আনাড়ি। দেখতে পেল একটা লতায় ঢাকা পাথর, লতাপাতা সরাতেই হাত দিয়ে বুঝতে পারল, একটা ডিমের আকারের খোলক।

সেটা সংগ্রহ করতেই অনেক পরিশ্রম করতে হল।

যথাসময়ে উঠে এল বন্ড। দুপুরের খাবার বলতে শুধু ভাত, ছোটো ছোটো মাছ, আর শাক-পাতা। একটু বিশ্রাম, আবার বেলা চারটে পর্যন্ত কাজ।

এবার বাড়ি ফিরতে হবে। বন্ড একটু অসুস্থ বোধ করল। হাতে, পিঠে ব্যথা। মনে হবে কেউ যেন ওকে লাঠি দিয়ে মেরেছে। এখন সোনালি রোদ। ওরা ঘরে ফিরল।

পরের দিনটাও বেশ উজ্জ্বল। কিসী অনেক সেবা করে বন্ডকে সুস্থ কবে তুলেছিল। শরীরের ব্যথা বেদনা সেরেছে। হাতের ফোঁসকাটা অবশ্য রয়ে গেছে। দুর্গের ব্যাপারে কিছু জানতে চেয়েছিল বন্ড। কিসী বলেছিল — এই ব্যাপারে আলোচনা নিষিদ্ধ। আমাদের বিশ্বাস ওটা শয়তানের বাসা। অনেকে বলে ওখানে রয়েছে এক বিদেশি, সে খুবই ক্ষতিকর। বলা হয় অনেক শয়তান ম'রে এই শয়তান তৈরি হয়েছে।

তিনদিন কেটে গেল। ব্রেকফাস্টের সময় কিসী এসে বলল — ‘কানুসি-সান’ লোক পাঠিয়েছে। তারা জিজ্ঞেস করছে পুলিশের লঞ্চ কেন এসেছিল? আমার মনে হয় ঐ দুর্গকে নিয়ে কিছু গোপন খবর তুমি জানো। আমাকে নিশ্চিত্তে বলতে পারো।

বন্ড বলে আমি তোমায় সব বলব। আগে তোমার কথা বল। কিসী বলে, দ্বীপের মশ্যে রয়েছে মৃত্যুর রাজা। তাকে বিনাশ করতে একজনকে পাঠাবেন আমাদের ‘জিজো’ অভিভাবকেরা। ছয়জন ‘জিজো’ অভিভাবক আছেন আমাদের। জিজো হচ্ছেন আমাদের রক্ষক দেবতা। বোধহয় বৌদ্ধ দেবতা। তিরের কাছে তাদের মূর্তি আছে।

বন্ড বলে, আমি তো নৃতত্ত্ববিদ। তোমার অভিভাবকদের দেখতে যাব।

পরের দিন রওনা হল ওরা। অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে গ্রাম ছাড়িয়ে একটা টিলার সামনে ওরা এসে দাঁড়াল। শরৎকাল, একটা মন্দির, হজস লাল ফুল।

কিসী বলে — এখানে একটা গুহা আছে। লোকে বলে ভূত-প্রেতের বাসস্থান।

এখন দশটা বাজে। দূরে একদল চাষি কোদাল হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কালো মুখোশ।

আজ রাতেই বন্ড সেই প্রাচীর টপকে যাবে। চিণ্ডা হল এই রক্ষীদের কী কবে এড়ানো যায়।

বন্ড বলল - কিসী, আজ রাতে আমি ঐ দুর্গে যাব।

— জানি। তুমি একা যাবে?

— হ্যাঁ।

— তুমি আবার ফিরে আসবে তো?

— হ্যাঁ কিছুদিনের জন্য, তারপর আমায় ইংল্যান্ডে ফিরতে হবে।

— আমি প্রার্থনা করছি, তুমি এখানে আরও অনেকদিন থাকবে।

ওরা টিলা থেকে নেমে এল। এই পথটা গেছে গ্রামের পূর্ব দিকে। এখানে পাথুরে বেলাভূমি। বেদির উপর পাঁচটা পাথুরে মূর্তি। ষষ্ঠ মূর্তিটার মাথা নেই।

মূর্তিগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বন্ড। কেমন যেন ভয় করছে, ইচ্ছে হল এদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করতে।

কয়েক সেকেন্ড পরেই সে মনে মনে আবৃত্তি করল,

— ভাগ্য যেন সহায় হয়।

— কিসী হেসে বলল— তুমি সফল হবে।

— কী করে বুঝলে?

— ঐ তো আমাদের অভিভাবকেরা মাথা নেড়ে আশীর্বাদ করলেন।

এবার অতি সাবধানে পুব তীরে পৌঁছল ওরা। পাথরের খাঁজে নৌকাটা লুকিয়ে রাখা হল। তখন রাত এগারোটো। বন্ড তৈরি। গায়ে নিন্জা পোশাক। চোখে কালো চশমা, হাতে একটা মোড়ক। এই প্যাকেটটা সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। কিসীর কাছ থেকে বিদায় নিল বন্ড। নির্জন শান্ত সমুদ্র জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল “জেমস বন্ড”।

কিসী আর বন্ড দুজনেই পাশাপাশি সাঁতরাচ্ছিল, এইবার একটু এগিয়ে গেল কিসী। বন্ড তাকে অনুসরণ করছিল। ওরা এগিয়ে চলল সেই বিশাল প্রাচীরের দিকে।

বন্ডকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল কিসী। দূর থেকে হাত নাড়ল। আবছা-অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওর ছায়া।

সামনেই পার্ক। সাবধানে চারদিক দেখল বন্ড।

একটু দূরে আল্গেয়গিরির বিশাল হাঁ-মুখ। পাঁচিলের গায়ে একটা গুমটি ঘর। দরজা খোলা, ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। এগিয়ে গেল বন্ড। কালো নিন্জা পোশাকে সে গাছের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেল।

এবার পায়ের কাছে লেক। মাটির তলায় গরম কিছু যেন ফুটে টগবগ করছে। ফাঁক দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরচ্ছে। গাছের ফাঁক দিয়ে দুর্গের মিনার দেখা যাচ্ছে। জ্যেৎস্নায় ঝকঝক করছে দুর্গ! বিশাল কেপ্লা। দরজায় অজস্র পেরেক পৌঁতা। চৌকাঠে তালা লাগিয়ে রাখা হয়েছে, কারণ দরজার কড়া ভাঙা।

ফিরে আসে বন্ড। কাল দেখা যাবে।

এখন লেকের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কেপ্লার কাছে পৌঁছায় বন্ড। ঝোপের মধ্যে অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়। কোনো পশুর চাপা আর্তনাদের মতো। না, পশু নয়, একটা মানুষ। টলতে টলতে হাঁটার চেষ্টা করছে। মনে হয় আহত।

হঠাৎ লোকটা চিৎকার করতে করতে লেকের জলে ঝাঁপ দেয়। জলে আলোড়ন জাগে। এক ঝাঁক ছোটো ছোটো মাছ লোকটার শরীরটাকে খুবলে খুবলে খাওয়ার চেষ্টা করছে। লোকটার আর্তনাদে এখন মৃত্যুর ধ্বনি! সত্যিই তাই, বন্ড দেখতে পায়, মাছগুলো লোকটার গলার নলি টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

এই তো খুনে মাছের দল! বন্ড শিউরে ওঠে।

ইস, ডাক্তার কত রকমের মৃত্যু-পরিকল্পনা করে রেখেছে। বিশেষ করে মানুষ যাতে পথ ভুল করে, বা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তরল আগুনের মধ্যে পড়ে যায়।

দেয়াল ধরে এগিয়ে যায় বন্ড। এবার একটা ফাঁকা জায়গা, অনেকটা টেনিস কোর্টের মতো।

এখন চন্দ্রমল্লিকার মরশুম! একটা বড়ো ফুলের টবে একগুচ্ছ চন্দ্রমল্লিকা! পিছনে গুহা। গুহার সামনে অন্ধকারে লুকায় বন্ড। দেখতে পায় এক ভদ্রলোক, পরনে ফ্রক-কোট, প্যান্ট, মাথায় হ্যাট। লোকটার হাতে বন্ধ ছাতা। অদ্ভুতভাবে ছাতার বাঁটাটা মাটিতে ঠুকছে সে। যেন কোনো প্রার্থনা জানাচ্ছে।

ধীরে ধীরে লোকটা এসে দাঁড়ায় ফুটবল রন্ধ্রমুখের সামনে। কে লোকটা — জানার আগেই আবার একটা আর্ত-চিৎকার। এক বলক তপ্ত বিষাক্ত হাওয়া এসে লোকটাকে আঘাত করেছে। কাঁদাজলে লুটিয়ে পড়ে সে। অবধারিত মৃত্যু। জলের উপর ভাসতে থাকে শুধু ওর টুপিটা।

বমি পায় বন্ডের। সারা গা গুলিয়ে উঠেছে। এত সহজে মৃত্যু। পর পর। অদ্ভুত এই মৃত্যুর শোভাযাত্রা। বন্ড এখন কোথায় যাবে?

এইটা বোধহয় মালির ঘর। ফাঁকা। এইখানেই আপাতত আশ্রয় নেওয়া যাক। ভালো ঘুম হল না। ঘুমের মধ্যেই অনেক হল্লা চিৎকার কানে এল তার।

ভোর হল। আবার চিৎকার! উঠে বসল বন্ড। ঘরে বসেই দেখতে পেল — এক চাষি, পরনে নীল পোশাক। প্রাণপণ দৌড়ছে লেকের পার দিয়ে। পিছনে পিছনে চারজন গার্ড। যেন চোর-পুলিশ খেলা চলছে। রক্ষীদল হাসছে!

ধরা পড়ে গেছে লোকটা। ওরা ঘিরে ধরেছে। লাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছে। পরক্ষণেই ওরা লোকটাকে চ্যাংদোলা করে শূন্যে ওঠায়, তারপরেই ছুঁড়ে ফেলে দেয় লেকের জলে। সে একই দৃশ্য। ফুটবল টগবগে জলে দঙ্ক হয়ে তলিয়ে যায় লোকটা। রক্ষীদের নিষ্ঠুর হাসির শব্দে মুখরিত অরণ্য।

বন্ডের রিস্টওয়াচে বেলা ন'টা।

কেল্লার দিকে তাকায় বন্ড। চারজন রক্ষী এখন 'অ্যাটেনশন'-এর ভঙ্গিতে। বোধহয় কোনো ভি. আই. পি. এবার দর্শন দেবেন!

হ্যাঁ, যা আশা করা গিয়েছিল — ব্রোফেল্ড বেড়াতে আসছেন। গায়ে বর্ম, মধ্যযুগীয় যোদ্ধার সাজ, ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ। পাশে তার সঙ্গিনী সেই কুৎসিত মহিলা। এই মহিলার নামই ইরমা কান্ট!

ডিকো হেভারসনের কথাগুলো মনে পড়ে যায় বন্ডের। যা যা শুনেছিল, সবই প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। ব্রোফেল্ডের নির্দেশেই কাজ ঘটছে এখানে। এমন কায়দা, যাতে মানুষ নিজেই নিজেকে মারতে চায়।

টাইগার বলেছিল — এখানে প্রায় বিশজন রক্ষী আছে।

ব্রোফেল্ড কথা বলার সময় মুখের পর্দা তুলে নেয়। ওরা জার্মান ভাষায় কথা বলছিল। খুব সম্ভব 'মৃত্যু-খেলা' নিয়ে আলোচনা চলছিল। বন্ড শুনতে পেল ব্রোফেল্ড বলছে — দুটি জিনিস আমাদের খুব কাজে লাগে — পিরানায়ার বিষ তরল এই আন্ডেয়গিরির কাদা।

এক সাগরেদ সাই দেয় — সমুদ্রের হাঙরও খুব প্রয়োজনীয় স্যার।

— না, হাঙরেরা সবসময় কাজ করতে পারে না। যে গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসাবাদের পর সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলাম, সেটার দেহ তো হাঙরে খায়নি। এর চেয়ে লেকের জলে ভাসিয়ে দেওয়াই ভালো।

আরেকজন বলল — ফাকুওকা থেকে প্রায়ই পুলিশ আসছে।

— হুঁ, এটা বাঞ্ছনীয় নয়। ওরা চাষীদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতে পারে। কেউ কেউ পাঁচিল টপকাচ্ছে আর মরছে। তবে এমন কেস বেশি হলে আবার বড়ো রকমের তদন্ত শুরু হতে পারে।

তাহলে কি করা যায়? — কুৎসিত মহিলা জিজ্ঞেস করল।

— বিকল্প ভাবে হবে। ব্রাজিল বা দক্ষিণ আমেরিকায় উপযুক্ত জায়গা বাছতে হবে।

— এত লোক পাবে কোথায় ?

— সংখ্যার চেয়েও আদর্শটা বড়ো। নতুন টেকনিক দরকার।

— তা ঠিক। তবে ইতিমধ্যেই, অর্নেস্ট, তুমি অকল্পনীয় কৌশল বের করেছ। লোকে যা কল্পনা করত, গল্পের বই-য়ে পড়ত, তুমি সেসব বাস্তবে কার্যকরী করেছ! তোমার রাজ্য যেন এক মৃত্যুর ডিজনিলান্ড! তার চেয়েও সুন্দর।

— হুঁ, একসময় পৃথিবীর টনক নড়বে আমার কাজকর্ম সমীক্ষা করে। পৃথিবী আমাকে সম্মান করেনি, বরং পাগলা কুকুরের মতো গুলি করে মারতে চেয়েছে। তাই —

বন্ডের বুকে মৃদু কম্পন। বলে কী ?

ব্লোফেন্ড চলে যাচ্ছে। যেতে যেতে বলছে — মালির ঘবের দরজাটা খোলা কেন ? আমি একবার দেখে আসি। চাবি দাও না কেন ? যে কোনো স্পাই ওখানে লুকিয়ে থাকতে পারে।

বস্তার আড়ালে লুকায় বন্ড।

ব্লোফেন্ডের তলোয়ার বস্তার স্তূপের গায়ে আঘাত করে। সে বলে — না, এখানে কেউ নেই। তবে, তোমরা সতর্ক থেকো।

বন্ড ভাবে — ভাগ্য ভালো। এই ব্লোফেন্ড লোকটা অবশ্য পাগল, বিকৃত মস্তিষ্ক। হিটলারের মতো চিৎকার করে।

॥ তেরো ॥

এখন সন্কে ছটা। কেবল ঘন্টাধ্বনি শোনা যায়।

লেক থেকে মৃতদের জামাকাপড় তোলা হচ্ছে। হাসতে হাসতে কাজ করছে রক্ষীর দল। জামা কাপড়ে কিছু হাড়গোড় জড়িয়ে আছে। ওরা মজা পায়!

রাত নটা। বাইরে জ্যোৎস্না। নিস্তব্ধ পৃথিবী। হাঁটতে হাঁটতে গুপ্ত পথটার কাছে পৌঁছে যায় বন্ড। পকেট থেকে টর্চ আর 'উখো' বের করে। কাটতে থাকে জং-ধরা শেকলটা। তালাটা উপড়ে ফেলে বন্ড। দরজাটা চাপ দিতেই খুলে যায়।

বাদুড় উড়ছে। মাকড়সার জাল। পা টিপে টিপে এগোয় বন্ড। সামনে সিঁড়ি। সবশেষে চকচকে কাঠের দরজা। ফাঁক দিয়ে দেখা যায় মৃদু আলোর আভাস।

একটা অগোছালো হলঘর। কুপি জ্বলছে। লাল কার্পেট। এরপর অন্দরমহল। ধুলোর গন্ধ।

একজন রক্ষীকে দেখা যায়। এই কি সেই মালি ? সস্তূর্ণণে এগিয়ে যায় বন্ড। এখানে মেঝেটা ঝকঝক করছে। এটাই বোধহয় তথাকথিত 'পাপিয়া মেঝে'! দরজার ওপার থেকে মিউজিকের সুর ভেসে আসছে।

হঠাৎ বন্ডের পায়ে তলার কাঠ সরে যায়। নীচে পড়ে যায় বন্ড। আদৌ প্রস্তুত ছিল না। নীচে জল। মাথা বিম্ব বিম্ব করে। তবু সাঁতরাতে থাকে বন্ড। কিন্তু আর পারা যাচ্ছে না। সংজ্ঞা লোপ হয় তার।

কে যেন ওর গালে চড়-থাগড় মারছে! চোখ মেলে বন্ড।

ওঃ, সেই রক্ষীটা। খুদে খুদে চোখ। লক্ষ করে, তার গায়ের জামা খুলে নেওয়া হয়েছে। পরনে শুধু ছোটো নিনজা প্যান্ট। রক্ষীর কোমরে পিস্তল। বন্ডকে ইশারা করে সে। সংকেত বোঝে বন্ড। বাধ্য ছেলের মতো অনুসরণ করে রক্ষীকে।

বোঝা যায় এটা তথাকথিত লাইব্রেরি। ব্রোফেন্ড দাঁড়িয়ে আছে। পরনে কালো কিম্বোনোর উপর সোনালি সুতায় ড্রাগন আঁকা। তার পাশে রয়েছে সেই কুৎসিত মহিলা ইরমা বান্ট।

ব্রোফেন্ড গার্ডকে জিজ্ঞেস করে — কে এই লোকটা?

— মনে হয়, আততায়ী। আপনাকে খুন করার জন্য একে পাঠানো হয়েছে।

— লোকটা তো বেশ লম্বা। এ কি জাপানি?

ইরমা হঠাৎ গভীরভাবে বন্ডের মুখটা লক্ষ করে। ভুরু কামানো, ডান-গালে কাটা দাগ। পরিচিত মুখের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। চিৎকাব করে ওঠে ইরমা — এ তো সেই ইংরেজ এজেন্ট। সেই বন্ড। জেমস বন্ড, যার স্ত্রীকে তুমি হত্যা করেছিলে। ওর তখন ছদ্মনাম ছিল স্যার হিলারি ব্রে।

— হ্যাঁ। মিল আছে চেহারার সঙ্গে। কিন্তু ও কী করে এখানে এল?

— নিশ্চয় জাপানের সিক্রেট সার্ভিস ওকে ভাড়া করে এনেছে।

— ঠিক আছে। দেখা যাক। ব্যাপারটা অবশ্য অবিশ্বাস্য।

॥ চোদ্দো ॥

‘দেখা যাক’ কথাটার অর্থ পরীক্ষা করা হবে।

সেই ‘জিজ্ঞাসাবাদের ঘরে’ পরীক্ষা! ঘরে এখন দশ জন গার্ড। জেরা শুরু হবে, অর্থাৎ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক অত্যাচার।

ব্রোফেন্ডের নির্দেশে একজন বিশাল ঘুঁষি চালাল বন্ডের মাথায়, ঠিক আহত স্থানে। তারপরে আবার বাঁ হাতের মুষ্ঠ্যাঘাত। বন্ডের মাথার ভিতব যেন বোমা ফাটল। পরপর দশটা ঘুঁষি।

কিছু একটা করা দরকার — যতক্ষণ শরীরে একবিন্দু শক্তি আছে। প্রাণপণ শক্তিতে লাথি ছুঁড়ল বন্ড মোক্ষম জায়গা লক্ষ করে। রক্ষীটা আতর্নাদ করে লুটিয়ে পড়ল।

— হন্ট! — ব্রোফেন্ডের মুখে হিটলারের গর্জন।

একটু চূপ করে থেকে আবার গর্জন — লোকটা সোজা পথে চলবে না। পাশের ঘরে নিয়ে চল।

ভীষণ গরম এই ঘরটা। কুপি জ্বলছে। ব্রোফেন্ড আর ইরমা এসে আর্ম চেয়ারে বসল। একটা কিচেন ব্লক। একটা পাথবেব বেদি মতন সিট। ফাঁটা ফাঁটা শুকনো কাদা। বেদির মাঝখানে একটা গর্ত। সেই গর্তের উপর বসানো হল বন্ডশে।

বসতেই উত্তপ্ত ছেঁকা। সারা দেহ শিউরে উঠল। নীচে বোধহয় টগবগ করে ফুটছে ‘তরল আগুনে’র জল। বুবল বন্ড — সেই উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে নালা কেটে ঘরের তলায় আনা হয়েছে। এই অত্যাচারটাই ‘উষ্ণ প্রস্রবণ প্রক্রিয়া’ বলে পরিচিত।

ব্রোফেন্ড ইংরেজিতে বলে — আমি যা বলছি, তার জাপানি অনুবাদ করো। যদি বোবা কালো জাপানি হও তুমি — যা তুমি বোঝাতে চাইছ — তাহলে ওখানেই বসে থাকো। তোমার নিম্নাঙ্গ পুড়ে যাবে। এবার উত্তর দাও। তুমি কে? কে তোমায় পাঠিয়েছে কী উদ্দেশ্যে?

বন্ড হাঁটুর মধ্যে কনুই রেখে চূপচাপ বসে থাকে।

হঠাৎ সারা ঘর গমগম করে ওঠে। মনে হবে, নীচে সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেন চলছে। আসলে কাদার চাপ ছিটকে উঠছে ওই পাথরের আসনের ছিদ্র দিয়ে। নীচের গন্ধকের বাষ্প ঘর ভরে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে বন্ড।

ব্রোফেন্ড বলে — এর পরে ব্রো-ল্যাম্প প্রয়োগ হবে। সেটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক। যদি সব কথা খুলে বল তাহলে দ্রুত মৃত্যুর পুরস্কার, তলোয়ারের এক কোপে তোমার প্রাণ নেওয়া হবে।

বন্ড উত্তর দিল — তুমি অতি মুর্থ ব্রোফেন্ড। লন্ডন এবং টোকিওর অনেকেই জানে এখন আমি এখানে। আজ রাতেই তারা আসবে। তুমি যদি আমাকে মেরেও ফেলো। নিজে কিন্তু বাঁচবে না।

— মিথ্যে বলছ বন্ড। পুলিশ তাহলে এতক্ষণে চলে আসত। সঙ্গে আসত সি. আই. এ.-র কোনো বড়ো অফিসার। একজন ইংরেজ এখানে আসতে পারে না। বন্ড, তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে, এই পৃথিবীতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান লোকদের মধ্যে আমি একজন। তোমার আর কিছু বলার আছে।

— হ্যাঁ, বলছি, আমায় মারলে তুমি ও তোমার সঙ্গিনী আগামী খ্রিস্টমাসের মধ্যে মারা যাবে।

— আমি এখনও আমার তলোয়ারটা কোনো দিন ব্যবহার করিনি বন্ড। এবার হয়তো সেটার উদ্বোধন হবে!

বন্ড মুখ তুলে দেখল — বিশাল আকৃতির লোক এই ব্রোফেন্ড।

লম্বায় দু-ফুট চার ইঞ্চি, বলিষ্ঠ শরীর। তলোয়ার হাতে নিয়ে, ধীরে ধীরে বন্ডের সামনে এসে দাঁড়াল। তার কালো জামার হকের কাছে ড্রাগনের উষ্ণিটা এবার স্পষ্ট দেখতে পেল বন্ড।

ব্রোফেন্ড হেসে বলল — তোমার সেই “অপারেশন থান্ডারবল” মনে আছে? তখন এটাই তোমার নাম দেওয়া হয়েছিল, মানে তোমার কাজের। বড়ো লোকের ছেলেরা দামি খেলনা নিয়ে খেলে। আমি গরিবের ছেলে, আমিও দুটো খেলনা নিলাম, দুটো পারমাণবিক বোমা। পৃথিবীকে বোঝাতে চাইছিলাম — কেউ যেন ছেলেমানুষি না করে।

দক্ষ রাজনীতিকের মতো নানা বিষয়ে বুদ্ধতা দিচ্ছে ব্রোফেন্ড, — জীবাণু যুদ্ধ, মৃত্যুদুর্গ, শারীরিক উপসর্গ, দেহযন্ত্র, আগ্নেয়গিরি, আত্মহত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। সে বোঝাতে চাইছে, মানুষকে সহজে এবং বিনা পরিশ্রমে মরতে দেওয়া উচিত। এটা নরহত্যা নয় বরং কল্যাণকর কাজ। মানুষকে যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে ঠেলে না দিয়ে, অনায়াসে মরার সুযোগ দেবার কথা, পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত কেউ ভাবতে পারে নি।

বন্ড বলল — কালকেই তো দেখলাম কত নিষ্ঠুরভাবে একজনকে খুন করলে তোমরা।

— আরে সে তো মরতেই এসেছিল। কিন্তু দুর্বল মনের লোক তো, তাই আমরা তাকে কিছুটা সাহায্য করেছিলাম। যাকগে, তুমি কীভাবে মরতে চাও বল, শাস্তভাবে মাথা এগিয়ে দেবে, নাকি বাধা দেবে? বাধা দিলে বিশ্রীভাবে মাথা কাটা যাবে।

বলতে বলতে দু'হাতে তলোয়ারটা মাথার উপর তুলে ধরল ব্রোফেন্ড।

বন্ড লক্ষ করেছিল, কুৎসিত মহিলার হাতের কাছে একটা বেল আছে। এক সেকেন্ডের মধ্যে বন্ড ঝাঁপিয়ে পড়ল মহিলার উপর। হাতের কাছে একটা রড পেয়ে গেল। তলোয়ারের কোপ থেকে শরীরটা বাঁচতেই ব্রোফেন্ডের আঘাত যেন হাওয়ার মধ্যে আছড়ে পড়ল। ক্ষীপ্রগতিতে, বন্ড সজোরে আঘাত করল ব্রোফেন্ডের বুকে। টাল সামলে সামান্য পিছু হটল ব্রোফেন্ড। আবার তলোয়ারের আঘাত, বন্ডের বাঁ পাজর ছুঁয়ে গেল। রক্তের রেখা দেখা দিল বন্ডের গায়ে।

চলতে থাকল এ অদ্ভুত অসম লড়াই। লাঠি এবং তলোয়ারের যুদ্ধ। কিন্তু বন্ড বুঝতে পারছিল, সে হেরে যাবে। তবুও প্রাণপণে যুঝতে থাকল বন্ড। এক সময়ে কবজিতে লাঠির আঘাত পড়ায়

ছটিকে গেল ব্রোফেন্ডের তলোয়াব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্ডের হাত থেকেও লাঠি খসে পড়ল। এবার হাতাহাতিব লড়াই। ব্রোফেন্ডের আঙুলে বিষাক্ত নখ বন্ডের চোখ উপড়ে নেবার চেষ্টা করল। বন্ডের দুই থাবা এবার ব্রোফেন্ডের গলায়। বজ্রচাপে জিভ বেরিয়ে এল ব্রোফেন্ডের। অসীম শক্তিতে সাঁড়াশির মতো চাপ দিল বন্ড।

ব্রোফেন্ডের প্রাণশূন্য দেহ মাটিতে পড়ে গেল।

এবার পালাতে হবে। কোনদিক দিয়ে? একটু দূরে মেয়েমানুষটা জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে আছে। থাকুক।

দরজায় রক্ষী। ওখান দিয়ে পালানো যাবে না; ভেতরের বারান্দায় এল বন্ড। দেখা গেল রেলিং-এব সঙ্গে মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা বিরাট গ্যাস-বেলুন উঁচুতে উড়ছে। বন্ডের মনে পড়ে গেল একটি সিনেমার দৃশ্যের কথা। 'ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্ক' অভিনীত একটা পুরনো ফিল্ম। এই বেলুনটাই তাকে বাঁচাতে পারে। দড়িটা কেটে হাতে জড়াল বন্ড, তারপর শূন্যে ভাসিয়ে দিল নিজেকে। গ্যাস-ভরা বেলুন তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল সমুদ্রের দিকে।

নীচ থেকে রক্ষীদল গুলি ছুঁড়ল। বেশ কয়েকটা বুলেট বন্ডের মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বেলুনের কাছি ধরে দোলনার মতো দুলছে বন্ড। দুলতে দুলতে দেখতে পেল কেমনাটা যেন কাঁপছে, জ্যোৎস্নার আলোয় বিশাল কেমনার চূড়াটা কম্পমান। পরমুহূর্তেই কেমনার উপর ভাগটা ভেঙে পড়ল। তারপর মাঝের অংশটাও। একটা উত্তপ্ত হাওয়ার বিশাল ঢেউ বেলুনসহ বন্ডকে জোরালো ধাক্কা দিল।

কী ব্যাপার? কেমনাটা ভেঙে পড়ল কেন?

দেখা গেল লকলকে শিখা যেন নরককুণ্ড থেকে উঠে আকাশ ছুঁতে চাইছে।

একি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ? হঠাৎ একটা গুলি লেগে বেলুন ফুটো হয়ে গেল। এবার শূন্য থেকে দ্রুতগতিতে নেমে আসছে বন্ড। ঐ তো নীচে সমুদ্র? আঃ সমুদ্রেই হোক শান্তির আশ্রয়।

৭ পনেরো ৭

লন্ডন অফিসে বসে, "এম" রিপোর্ট লিখছিলেন।

— যারা আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন, তারা নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের প্রতিরক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার জেমস বন্ড বেশ কিছুদিন ধরে নিরুদ্দেশ। তিনি কার্যসূত্রে জাপানে গিয়েছিলেন। আমাদের আশঙ্কা সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে। আমরা বিশেষ দুঃখিত, তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। বরাবর খুবই সুনামের সাথে তিনি কাজ করেছেন, বিভাগের প্রধান হিসাবে আমি তার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানাচ্ছি।

— জেমস বন্ডের বাবা স্কটিশ। তার নাম এ্যান্ড্রু বন্ড তার মা জাতে সুইস। জেমসের প্রাথমিক শিক্ষা বাইরে। তিনি ফরাসি ও জার্মান ভাষা জানতেন। মাত্র ১১ বছর বয়সে জেমসের পিতামাতা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

— বন্ড খেলাধুলা, ব্যায়াম ও কুস্তিতে দক্ষতা অর্জন করে। স্কুল ছাড়ার পর ১৯৪১ সালে পিতার এক সহকর্মীর সাহায্যে বন্ড ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টে চাকরি পায়। তার বয়স তখন উনিশ।

এই বিভাগে তাকে অনেক গোপনীয় কাজ করতে হয়। R.N.V.R. দফতরের বিশেষ শাখায় কাজ করতে করতে তিনি উচ্চপদে আসেন, কমান্ডারের পদে।

আমি বন্ডের নানা কাজে বিশেষ সন্তুষ্ট। কাজ করতে গিয়ে বহুবাবই তাকে প্রাণ নিয়ে খেলা করতে হয়েছে।

বন্ডের এক বন্ধু এবং সহকর্মী তার সম্পর্কে, বিশেষ করে তার অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে বহু বই লিখেছে। এই বইগুলো যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। ১৯৬২ সালে বন্ড 'টেরেসা' নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করেন, কিন্তু ট্র্যাঙ্কেডির মধ্যে দিয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবাহিত জীবনের সমাপ্তি ঘটে। বন্ড নিঃসন্তান, যতদূর জানি তার কোনো জীবিত আত্মীয়স্বজন নেই।

— জেমস বন্ডের সঙ্গে আমি গত তিনবছর ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি। সে জন্য আমি খুশি এবং গর্বিত। ওর স্মৃতিফলকে ওর নিজের কথাই উৎকীর্ণ করা যেতে পারে।

— “অযথা দীর্ঘ কালক্ষেপ করে আমি দিনগুলোর অপচয় করব না, বরং সময়ের সদ্ব্যবহার করব।”

II ষোলো II

দূর থেকে কিসী দেখতে পেয়েছিল, আকাশের বৃকে একটা লাল পোশাকের কেউ যেন সমুদ্রে আছড়ে পড়ল।

কিসী বুঝেছিল, এই হবে জেমস বন্ড। শত্রুর হাত থেকে বোধহয় বাঁচতে পেরেছে।

দ্রুত সাঁতার দিয়ে এগিয়ে চলল কিসী। বন্ডের কাছে পৌঁছতেই অবাক হয়ে দেখল, বন্ড যেন ওকে চিনতে পারছে না। বন্ড যেন দেখছে শুধু একটা মুখ, শত্রুর মুখ। কিন্তু তাকে আঁঘাত করার শক্তি নেই বন্ডের।

কিসী বন্ডের হাতের তলায় হাত রাখে। বৃকের ওপর টেনে নেয় বন্ডের মাথা, তারপর চিৎসাঁতার কেটে এগিয়ে চলে।

এতো সাঁতার নয়, আধমাইল ব্যাপী স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ। তীরে এসে পাথরের ওপর বন্ডকে শুইয়ে দিয়ে নিজেও ওর পাশে লুটিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরল বন্ডের, কিন্তু শূন্য দৃষ্টি, বলল, তুমি কে? আমি কোথায় এলাম?

— আমি কিসী সুজুকী। তুমি তদেরকি। মনে পড়ছে আমরা এই দ্বীপে থাকতাম। কত সুখে দিন কাটত আমাদের। চল আমার বাড়ি, সেখানেই তুমি থাকবে, ডাক্তার দেখাতে হবে।

অতি কষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কিসীর পাশে পাশে হাঁটতে থাকল বন্ড। আপাতত বন্ডকে নিয়ে মন্দিরের পেছনে একটা নির্জন গুহায় নিয়ে এল কিসী। এখানে আমাদের কিছুক্ষণ থাকতে হবে। তুমি বিশ্রাম নাও। ডাক্তার আসবে।

ভোর হল? বাড়ি গেল কিসী। বাবা, মাকে সঙ্গে নিয়ে গুহার দিকে এগিয়ে গেল। পথে পুরোহিতের সঙ্গে দেখা। পুরোহিত বললেন — আমি আশীর্বাদ জানাই। সেই কুখ্যাত শয়তান এবং তার সঙ্গিনী মরেছে। মৃত্যু-দুর্গ ধসে পড়েছে। আমাদের ছয় অভিভাবকের কথা সত্যি হয়েছে। সমুদ্র-পার থেকে যে বিদেশি এসেছিল, সেই আমাদের উদ্ধার করেছে। সে এখন কোথায়?

— মন্দিরের পেছনের গুহায়। ভীষণ আহত। আমি চাই ও এখানেই থাকুক। তার সুযোগ আছে, ও অতীতের কোনো কথা মনে করতে পারছে না। আমার মনে হয় মনে করানোর দরকার নেই।

— সেটা উচিত হবে না কিসী। একসময় ও স্মৃতি ফিরে পাবে। দেশে ফিরে যাবে। সরকারি অফিসার, নিশ্চয়ই নিজের দেশে সুনামি লোক। ভগবান ওকে পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে। কিসী বলে, আমরা ওকে সাহায্য করেছি, ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি, আমরা কি কিছুই পাব না?

— আগে ও সুস্থ হয়ে উঠুক, তারপর তোমার বাড়ি নিয়ে য়েও।

ডাক্তারের চিকিৎসায় ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠে বন্দ। দিন কেটে যায়। ঘটনা ঘটতে থাকে। ‘ফাকুওকা’ থেকে পুলিশ এসে খবর নিয়ে যায় বারবার। টোকিও থেকে একজন অফিসার আসেন, তার নাম ‘টনাকা’। যতদূর সম্ভব বন্দকে আগলে রাখার চেষ্টা করে যায় কিসী।

এখন শীত। বন্দ সম্পূর্ণ সুস্থ, শারীরিক দিক থেকে। কিন্তু ষোলাটে চোখের দৃষ্টি, অতীতের কিছুই মনে পড়ে না।

জাপানি ভাষা শিখে নিয়েছে বন্দ। নৌকা চালায়, মাছ ধরে। এমনকি লোকের বাড়ি গিয়ে ছোটোখাটো ছুতোরের কাজও করতে পারে।

কিসীর আশা বন্দ নিশ্চয়ই একসময়ে তাকে ভালোবাসবে। সে অপেক্ষায় থাকছে।

একদিন কিসী সবাইকে জানাল, সে ফাকুওকা যাচ্ছে। ফাকুওকায় পৌঁছেই কিসী ‘দি হ্যাপী শপ’ বলে একটি দোকানে গেল। দোকানের মালিক একজন বুড়ো বসেছিল। কিসী তাকে তার নিজের সমস্যার কথা বলল। বুড়ো লোকটি সব শুনে কিসীকে একটি ওষুধ তৈরি করে দিল, আর কিছু বই দিল।

কিসী পাঁচহাজার ইয়েন দিয়ে সেই ওষুধ আর বইগুলি নিয়ে বাড়ি চলে এল মহাখুশি হয়ে।

বন্দ জেটিতে কিসীর জন্য অপেক্ষা করছিল। এই প্রথম কিসীর কাছ-ছাড়া হয়ে সারাদিন ধরে কিসীর অভাব অনুভব করছিল বন্দ। কিসী আর বন্দ কিছুক্ষণ সমুদ্রের ধারে গল্প করতে করতে হাঁটল, তারপরে দুজনে বাড়ি ফিরে এল?

বাড়ি ফিরে কিসী মহানন্দে মাংস রান্না করে তাতে বুড়োর দেওয়া ওষুধটা মিশিয়ে খেতে দিল বন্দকে। বন্দ চেটেপুটে সব খেয়ে রান্নাব পশংসা করে ঘরে শুতে চলে গেল।

কিসী সুন্দর সেজে ঘরে গেল। বন্দ কিসীর আনা বইগুলি দেখছিল। কিসীকে দেখে বন্দ হাসল, তারপর কিসীকে কাছে ডেকে নিল। বইগুলোতে রয়েছে ভালোবাসার বিস্তর বিবরণ ও কিছু তথ্যচিত্র। দেখতে দেখতে বন্দের মনে যেন নতুন উদ্দীপনা ও শক্তির সঞ্চার হল। আবাব সেই পুরোনো সুপরিচিত শক্তিমান জেমস বন্দ। কিসীর হাত ধবে কাছে টানলো সে।

সুন্দর কাটলো রাতটা। কিসী খুশী।

॥ সত্তেরো ॥

এখন বসন্তকাল। মাছ ধরতে ধরতে বারবার উদাস হয়ে যায় বন্দ। মাছ ধরার সময়ে কিসীর সঙ্গে ডেভিড থাকে, সেই পাখিটা।

বন্দ বলল, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে কিসী।

— বল।

বন্দ বলে — কাগজে দেখলাম ‘কটা কথা। — ‘জ্লাদিভোসুক’। এটা কী কোনো দেশের নাম? আমার একটু একটু মনে পড়েছে, এটা কি রাশিয়ার কোনো জায়গা?

— হ্যাঁ।

— মনে পড়ছে, রাশিয়ার সঙ্গে আমার জীবনের অনেক কিছু জড়িয়ে আছে। আমি কি সেখানে কখনও গিয়েছি? এখানে আসার আগে আমি কোথায় ছিলাম?

কিসী চুপ করে থাকে। বন্ড বলে — আমি ঐ জায়গায় যাব কিসী, তুমি আমায় সাহায্য কর। বুক ফেটে কান্না এল কিসীর। কিন্তু পুরোহিতের উপদেশ মনে পড়ে গেল। রুদ্ধকণ্ঠে সে বলল — হ্যাঁ সাহায্য করব।

— আমি কী ভাবে যাব?

একটু ভেবে কিসী বলে — আমরা মেল-বোটে ফাকুওকা যাব, সেখান থেকে আমি তোমাকে ট্রেনে উঠিয়ে দেব। আমার যা টাকাকড়ি আছে তাই নিয়ে তুমি রওনা হয়ে যাও। প্রথমে ‘হোক্কাইডো’, তার পর ‘শাখালিম’ রাশিয়ার অঞ্চল। সেখানে গেলেই জ্লাদিভোস্তকের সন্ধান পাবে।

এখন মেঘহীন সুন্দর সকাল। বন্ড চলে যাবে, খুব সম্ভব কাল। চিরবিদায় জানাতে হবে। অনেক কষ্টে কান্না চাপে কিসী। মুখ ঘুরিয়ে নেয়। জানে না কিসী, একেই টাইগার বলত “তিতিরের কান্না”!

কিসীর “তদোরকি” এখনও জানে না, যে ওর নাম “জেমস বন্ড”। কিন্তু একটুকরো কাগজে একটা রাশিয়ান শব্দ ওর মনকে নাড়া দিয়েছে। ধীরে ধীরে হয়তো —

বন্ড নৌকার দাঁড় টানল। কাল চলে যাবে।